West Bengal Form No 2576

A.G.W.B. Form No. 371 (Inner sheet)

| | | | Rs. | P |
|---|---|---|---|---|
| | | Brought forward — | | |

৭ম বর্ষ] শনিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সাল Saturday, 25th May, 1940 [২৮শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—**

২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইবে। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে বীরেন্দ্র-যতীন্দ্র-মনোরঞ্জন নগর নামীয় সম্মেলনের জন্য বিস্তীর্ণ স্থান প্রস্তুত হইতেছে। ব্যাপক নৌ-ধর্মঘট সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা আভা মজুমদার সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত মহিলা সম্মেলনে সভানেতৃত্ব করিবেন এবং শ্রমিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। বাঙলা দেশের সম্মুখে আজ অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে. ইহার ভাবী কর্মপন্থায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে এবং [illegible] কর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এই বিশেষ সম্মেলনে বাঙলা দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র এই সম্মেলন কর্ম্মের উদ্দীপনাকে জাগ্রত করিবে. এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল দিক হইতেই এই সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক অধিক. সেই গুরুত্ব দেশবাসিগণ উপলব্ধি করিবেন। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য দেশের সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়াছে, আমরা সে পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। [illegible] বাঙালী জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ভারতের [illegible] নিয়ন্ত্রণে বাঙালী [illegible] অগ্রণী হইবার দাবী রাখে।

**ঢাকা সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য—**

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বাঙলা দেশের সকল [illegible] তাবাদী শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। এই দেশ [illegible] সেজন্য এই সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সম্মেলন, কৃষক, ছাত্র ও শ্রমিক ইহাদের [illegible] সম্মেলন [illegible]বে। অর্থাৎ এই সব কর্ম্মীদের [illegible] হইতে বাঙলার জনমতের যাঁহারা যথার্থ প্রতিনিধি তাঁহারা [illegible] মিলিত হইতেছেন; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য লোক উন্মুখ হইয়া আছে। বর্ত্তমানের এই সংকট মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা কেহই আগাইয়া আসিতেছেন না, সকলেই উদাসীনভাবে দিন কাটাইবার উপযোগী আধ্যাত্মিকতা ফলাইতেছেন; কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যে বাঙলা, সেই বাঙলাই আজ আবার উন্নত মস্তকে অভীষ্ট সাধনপথে অভিযানের অনুকূল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনের ইহাই হইল উদ্দেশ্য এবং অভিধেয়।

**ভারতের সমস্যা—**

মিঃ আমেরী নূতন ভারতসচিব হইয়াছেন। পার্লামেণ্টের ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইন সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় তিনি ভারতের শাসন-সংস্কারের তৎকালীন বিরোধী মিঃ চার্চ্চিলের বিরুদ্ধতা করেন; তাঁহার ভারতবাসীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের এই নজীর ঢাকে ঢোলে পিটান হইতেছে। আমেরী সাহেব সেদিন ভারতের সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ধরিবার ছুঁইবার মত সে কথার ভিতর কিছুই নাই। তিনি বার্কের বচন আওড়াইয়াছেন, সুতরাং আমাদের চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হইবে, এমন কোন সম্ভাবনা আমরা দেখি না। মহাত্মাজীর একান্ত অন্তরঙ্গ একজন শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী। দোষের ভিতর গুণ দেখাই ঈদৃশ মহাত্মাদের মাহাত্ম্য। তাই তিনি চার্চ্চিল সাহেবের নিকট হইতে ভারতবাসীদের স্বায়ত্তশাসন লাভের সম্ভাবনা অধিক দেখিয়াছেন। কিন্তু সম্ভাবনা ধরিয়া বসিয়া থাকিবার সময় আর নাই। সম্প্রতি যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সমগ্র দেশ সেই অচল অবস্থার অবসান দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী নিজেই সেদিন বলিয়াছেন যে, এই অচল অবস্থা আর দীর্ঘ দিন চলিতে পারে না। কিন্তু এই অচল অবস্থা দূর করিবার কাজের পথ মহাত্মাজী কিংবা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নিজেরা কিছুই দেখাইতেছেন না; তাঁহারা ধীরে

ধীরে আধ্যাত্মিকতার সংক্ [illegible] আওড়াইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন; [illegible] নিজেদের দুর্ব্বলতা, ভেদ [illegible] বারংবার বলিয়া এবং বুঝাইয়া [illegible] পস-নিষ্পত্তির জন্য অপর পক্ষের ঐকান্তিকতাকে শিথিল করিয়া দিতেছেন এবং সেইভাবে অচল অবস্থাকে স্থায়ী রাখিবার পথই পরিষ্কার করিতেছেন। রাজনীতিক-অধিকার-জাগ্রত জাতি এ জিনিস চায় না—স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের অবদানে উদ্বুদ্ধ বাঙলার তরুণগণ এইরূপ নিষ্কর্ম্মার যুক্তি সমর্থন করে না। বর্ত্তমানে প্রয়োজন সাহসের সঙ্গে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করার এবং কর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার। কংগ্রেসকে শক্তি যদি বৃদ্ধি করিতে হয় কর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। বৃহত্তর আদর্শের উদ্দীপনার পথেই ক্ষুদ্রতর স্বার্থের বিচার-বিবেচনা দূর হইবে। এখন যত রাজ্যের অন্তরায় বড় হইয়া দেখা দিতেছে আদর্শের আলোকসম্পাতে—"বিটপীতে বিকট ভূত" দেখিবার ক্লীবত্ব এবং কার্পণ্য হইতে জাতি বাস্তবিক উদ্ধার পাইবে। সুতরাং আধ্যাত্মিকতার অলস আমেজে বসিয়া থাকিবার দিন নাই, জাতির সমস্ত শক্তিকে সংহত করিবার আজ আহ্বান আসিয়াছে।

---

**অযৌক্তিক যুক্তি—**

যুক্তপ্রদেশের ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা সেদিন একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—'ব্রিটেনের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার পূর্ব্বে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা একমত হইয়া তাহাদের দাবি পেশ করিবে, এই জিদ অত্যন্ত অযৌক্তিক। কারণ, ব্রিটেন কর্ত্তৃক এতদিন মুসলমানদের পৃথক থাকার নীতি সমর্থিত হইবার পর বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের ঐক্য হওয়ার আশা করা বৃথা। ব্রিটেনের পক্ষে প্রথমে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা উচিত, তাহা হইলেই উভয় সম্প্রদায় মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মতি-ক্রমে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, উহা যথার্থই ভারতবাসীদের সর্ব্বসম্মত হইবে। মহারাজকুমার গূঢ় কথাটা বলিয়া দিয়াছেন।'

হিন্দু-মুসলমান একমত হও—আমরা স্বাধীনতা তোমাদিগকে দেওয়ার জন্য তৈরীই আছি, এ কথা বলা, আর স্বাধীনতা আমরা তোমাদিগকে দিতে রাজী নই, ইহা বলা একই কথা। সকলের সম্মতি হউক তবে স্বাধীনতা যদি পাইতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীকে প্রলয়ান্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এমন ধারার ধাপ্পাবাজি আমরা এ যাবৎকাল অনেক দেখিলাম, সুতরাং এখন উহা অচল। ভারত-হিতৈষী বিলাতের বন্ধুবর্গ এ সত্যটি যত সত্বর উপলব্ধি করেন ততই মঙ্গল।

---

**ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট—**

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ জানেন, বাঙলা সরকার ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য স্যার ফ্রান্সিস [illegible]ডকে সভাপতি করিয়া এই কমিশন নিযুক্ত করেন। [illegible] বন্দোবস্তের রদ এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে কমিশনের সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই। কমিশনের বারজন সদস্যের মধ্যে নয়জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর এবং গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি তিনজন উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়া ভূমিস্বত্ব সরকারে [illegible] করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এইভাবে ভূমিস্বত্ব [illegible] করিয়া লইতে কোটী কোটী টাকা বাঙলা সরকারকে [illegible] করিতে হইবে। জমিদারদের নীট লাভের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলে ৯[illegible] কোটী টাকার দরকার হইবে, বারগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে প্রয়োজন হইবে আরও তের কোটী আটান্ন লক্ষ টাকার, ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দিলে [illegible] কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা আরও অধিক লাগিবে। [illegible] জমির স্বত্ব এবং প্রজা কর্ত্তৃক খাজনা বি[illegible] করা জমির স্বত্ব ক্রয় করিতেও আরও তের কোটী টাকার প্রয়োজন। জলকর এবং খালস্বত্ব—এগুলি ক্রয় করিতেও কয়েক কোটী টাকা লাগিবে। জমিদারী প্রথার আমরা অনুরাগী নহি, [illegible] ব্যাপারেই যুক্তিতর্কের দ্বারা গুণ কিছু কিছু বাহির করা যায়, কিন্তু সেই মার [illegible] কাটাইয়া বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিষ্ঠার জন্য [illegible]লোচিত পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিলে জাতীয় অগ্রগতির দিক হইতে তাহা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জমিদারী প্রথা রহিত করিলে কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিলেই যে দেশের অধিকাংশের স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে, [illegible] মূলে কোন যুক্তি নাই। জমিদারদের বদলে সরকার জমিদার হইয়া বসিলেই [illegible] হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে, ইহা অলীক কল্পনা মাত্র। সবই নির্ভর করে সরকারের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালীর উপর। কৃষকদের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগের আমরা পক্ষপাতী। সেক্ষেত্রে সরকার কৃষকদের স্বার্থের জন্য বেশী কাজ অপেক্ষাকৃত সহজে করিতে পারেন কিন্তু সেই কাজ করিবার ইচ্ছা থাকা দরকার। বাঙলাদেশের বর্ত্তমানে যাঁহারা মন্ত্রী তাঁহাদের নীতি দেখিয়া আমাদের মনে এমন বিশ্বাস এখনও দৃঢ় হয় নাই যে, ভূমি স্বত্ব [illegible] মালিকানা হাতে পাইলে পূর্ণোদ্যমে তাঁহারা দেশের অধিকাংশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে আত্মনিয়োগ করিবেন। বাঙলা সরকার এই রিপোর্ট পরীক্ষা করিবার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ অভিজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি রিপোর্ট দিলে তাঁহারা এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং কি ব্যবস্থা তাঁহারা অবলম্বন করিবেন [illegible] জানি না। তবে একথা সত্য যে, তাঁহাদের মতামতের চেয়ে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া বাঙলার অধিকাংশের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংস্কারমুক্ত একনিরপেক্ষ জনমতের জাগরণ বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশের [illegible] কাম্য।

**কৃষকদের আর্থিক সমস্যা—**

জমিদারি প্রথার জন্য দরদ আমাদের নাই, যদি আমরা দেখিতে পাই বাঙলা দেশের অধিকাংশ যে কৃষক সেই কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য কর্ত্তারা কার্য্যত দরদী হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা চাই কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি। বাঙলার কৃষকদের খাজনার আয় হইতে জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের কর্জ্জের টাকা যদি শোধ করিতে হয়, তাহা হইলে কৃষকদের খাজনা কমিবে ত নয়ই, বরং আরও বাড়াইতে হইবে। বাঙলার কৃষকেরা অভাবে অবসন্ন, ইহার উপর যদি আরও খাজনা বাড়ে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে। জমিদারেরা হাতে নগদ টাকা পাইলে ব্যবসাদার হইয়া উঠিবেন, ইহা শুধু একটা অনুমান মাত্র। ব্যবসাদারি করিতে হইলে অনুযায়ী শিক্ষা এবং মনোবৃত্তি থাকা আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের ... র পিছনে না থাকিলে জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশই সে ... পা দিতে চাহিবেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলা দেশের ... যে সমস্যা, কোন রকম জোড়াতালি দিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে; সকলের স্বার্থ বজায় রাখিয়া ইহার ... হা করা কঠিন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সুদৃঢ় করিবার ... সংকল্পশীলতা লইয়া এই পথে নামা প্রয়োজন; কিন্তু বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের তেমন সংকল্পশীলতার পরিচয় এ পর্য্যন্ত কার্য্যত কোন দিকে পাওয়া যায় নাই।

---

**বাঙালী গোলন্দাজবাহিনী—**

বাঙলা দেশের উপকূল রক্ষার জন্য বাঙালীদিগকে লইয়া একটি গোলন্দাজবাহিনী গঠন করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঙালীরা এতদিন পর্য্যন্ত অসামরিক জাতি বলিয়াই কর্ত্তাদের কাছে গণ্য হইতেছে। এখনও তাঁহাদের সে বিষয়ে যে চোখ খুলিয়াছে ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যখন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোন শাসক শক্তিরই জাতির সমস্ত শক্তিকে আত্মরক্ষার জন্য জাগ্রত করিবার পক্ষে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দেখান উচিত নয়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এদেশের লোককে সামরিক শক্তিতে যথেষ্টরূপে ... করেন নাই। এবিষয়ে ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব এবং সামরিক ... প্রাধান্য তাঁহারা তাঁহাদের জাতি গোষ্ঠীর জন্যই ... করিয়া রাখিয়াছেন, এই নীতি আত্মঘাতী নীতি। অতীতের সে আলোচনা করিয়া এখন আর লাভ নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এখন উচিত এদেশের লোকদের আত্মরক্ষায় এই অসহায়তা দূর করিবার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টিপাত করা। বাঙালী গোলন্দাজবাহিনী গঠনের প্রস্তাবে এদিকে তাঁহাদের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার পরিচয়ে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, বাঙলার যুবকেরা দলে দলে এই বাহিনীতে যোগদান করিবেন।

**বলং বলং বাহুবলং—**

আত্মার বল—ব্রহ্ম বল খুবই ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই বলের বুজরুকী ভাল নয়। মানুষের মত এই জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শারীরিক বলেরও প্রয়োজন আছে। আত্মার বলে স্বাধীনতা পাওয়া গেলেও দুনিয়ার যে অবস্থা, তাহাতে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার উপায় নাই। সেদিন শিমলা ব্যায়াম সমিতিতে সুভাষচন্দ্র এই বিষয়ের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, দেশের পক্ষে প্রধান প্রশ্ন আজ হইল এই যে, স্বাধীনতা পাইলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি না। দেশ রক্ষার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন; সুতরাং ওদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যভার নিজেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এদেশে রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে বলিতে গেলে উদাসীন, সুতরাং দেশের লোককেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে। বাঙলার সর্ব্বত্র যুবকদের শরীর চর্চ্চার উদ্বোধন হওয়া প্রয়োজন। যাহারা মানুষ আত্মার বলে বলীয়ান হইতে পারে তাহারাই, বাহুর বলে বলীয়ান না হইলে মানুষই হওয়া যায় না, এই হিসাবে শারীরিক চর্চ্চার প্রয়োজন সত্ত্বসংশুদ্ধি অপেক্ষা অধিক।

---

**পাট অর্ডিন্যান্স—**

বাঙলা সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ফাটকা বাজারে পাটের ও চটের সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে পাকা গাইটের সর্ব্বোচ্চ দর ৯০ এবং সর্ব্বনিম্ন দর ৬০ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাট-কলের মালিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ, আর পাটচাষীরা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত। নির্দ্দিষ্ট দামের জন্য বেশী দিন পাট ঘরে ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাটের এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান, অর্ডিন্যান্স জারী বা হুকুমের জোরে হইবে না। প্রয়োজন গবর্ণমেণ্ট হইতে কার্য্যকর কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বনের। পাটের দাম চড়া রাখিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন আগামী বৎসরে যাহাতে পাটের উৎপাদন বেশী না হয়, তাহা করা; দ্বিতীয় প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্দিষ্ট দামে পাট কিনিয়া রাখা এবং সেজন্য গুদামের ব্যবস্থা করা; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে সব কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কমিশন কমিটির আড়ম্বর কমাইয়া গবর্ণমেণ্ট যদি এই কাজের পক্ষে নামিতেন, তবেই বাঙলার কৃষকদের ঘরে পাটের লাভের টাকা উঠিত এবং বাঙলাদেশের কৃষকদের আর্থিক সমস্যার অন্তত আংশিক সমাধান হইত।

---

**কর্পোরেশনের অধিকার—**

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় সুভাষচন্দ্র বলেন—"কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলর

গণ মুসলীম লীগ কাউন্সিলারদের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছেন। তাহা যতদিন সম্ভব, ১ মাস, ২ মাস অথবা ৬ মাস, যতদিন হউক না কেন থাকিবে। মুসলীম লীগের কাউন্সিলারেরা যদি অন্যায় আবদার করেন, তবে অবশ্যই কংগ্রেসী দল তাহাতে বাধা দিবে—তাহার ফলে হয়ত চুক্তি ভাঙিয়া যাইতে পারে; কিন্তু যতদিন সম্ভব ততদিন এক সঙ্গে কাজ করিতে আপত্তি কি থাকিতে পারে। ভবিষ্যতে যদি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের আর একটি অধ্যায়—যাহার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাকা করানোর চেষ্টা হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু লইয়া লড়াই করিব।" এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না, তবু একদল লোক নিজেদের কার্জ বাগাইবার জন্য যেভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ সব আরোপ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল হইয়াছে।

---

### আমেরিকা ও ইটালী—

আমেরিকা ও ইটালী এই দুই শক্তির মতিগতি লইয়া আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। মার্কিন রাষ্ট্রনীতিকদের মুখপাত্রস্বরূপে মিঃ কার্ডেল হল সেদিন গভীর তত্ত্বকথা আওড়াইয়াছেন। তিনি বলেন, স্বৈরাচার জগতে আজ যেভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা যদি সংযত না করা যায়; তাহা হইলে সমগ্র জগতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিপর্য্যস্ত হইবে, জগতে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে এবং মানব সমাজের চূড়ান্ত রকমের নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে। আমেরিকা এখন পর্য্যন্ত এইভাবে উপদেষ্টার কাজই চালাইতেছে; কিন্তু দীর্ঘ দিন সেইরূপ থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইটালীর সুর ক্রমেই চড়া হইয়া পড়িতেছে। ইটালী যদি সত্য সত্যই জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দেয়, তাহা হইলে আমেরিকাও মিত্রপক্ষে যোগদান করিবে। হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে জার্ম্মান অভিযানের পর আমেরিকার সুর এ সম্বন্ধে দিন দিনই স্পষ্টতর হইতেছে। ইটালী এবং আমেরিকা যদি সংগ্রামে যোগদান করে, তাহা হইলে সংগ্রাম পৃথিবী ব্যাপী আকার ধারণ করিবে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। আমরা ভারতবাসী এখনও আমরা যুদ্ধ হইতে নিজদিগকে দূরে মনে করিয়া আশ্বস্তি লাভ করিতেছি; কিন্তু সেই আশ্বস্তির আতিশয্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে যেন উদাসীন না রাখে।

---

### ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ—

এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুইটি ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়া গেল। এই দুইটি ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ বাঙলায় ঘটে নাই; কিম্বা বাঙলার নিকটবর্ত্তী স্থানেও ঘটে নাই। আগের ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—ফ্রণ্টিয়ার মেলে। এই ট্রেণ সঙ্ঘর্ষে কয়েকজন লোক নিহত হয় এবং অনেক লোক আহত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে গত ২০শে তারিখে বাঙ্গালোর মেলের সঙ্গে একখানা মাল গাড়ীর ঠোক্কর লাগিয়া। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে ক্ষতি কিরূপ ঘটিয়াছে, জানা যায় নাই; কিন্তু ঘন ঘন এইরূপ ট্রেণ সঙ্ঘর্ষের ব্যাপার মাত্রেই আতঙ্কের কথা। এইরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে, শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, সেজন্য কার্য্যকর ব্যবস্থা অচিরে অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য।

---

### বিপিনচন্দ্র পাল বার্ষিকী—

বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইল। বাঙালী বাঙলার যে সব সন্তানের জন্য গর্ব্ব করিতে পারে, তন্মধ্যে বিপিনচন্দ্র অন্যতম। তিনি বাগ্মী ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন, ভারতীয় ভাবধারার ভাবের ভাবুক এবং সাধক ছিলেন এবং এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ছিলেন নেতা। তাঁহার নেতৃত্বের শক্তি বাক্যগত ছিল না, ছিল ভাবগত। এ দেশের "স্ব"-ভাবের ধারা ধরিয়া তিনি জনমনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতি ছিল, দেশের সেবা, অর্থাৎ দেশের নরনারীর সেবা এবং সেই সেবা বা আত্মনিবেদনের পথে আত্মোপলব্ধি। আত্মনিবেদনের একান্ত আশ্বস্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই অভয়ত্বের মন্ত্র তিনি দেশকে শুনাইয়াছেন, সেই মন্ত্র তাঁহার মনন-শক্তিতে সঞ্জীবিত ছিল বলিয়াই বাঙলা দেশে তাহা নব জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছিল।

# জার্ম্মানীর প্যারাসুট বাহিনী

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রোম নগরীর পতনের পর ইটালীর স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তান গ্যারিবল্ডী তাঁহার পরাজিত সঙ্গী সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ভাগ্য-লক্ষ্মী আজ আমাদের উপর সুপ্রসন্না না হইলেও আগামী কল্য সুপ্রসন্না হইবেন। আমি রোম ছাড়িয়া যাইতেছি। বিদেশীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে ইচ্ছুক যাঁহারা তাঁহারা আমার সঙ্গে আসুন। তাঁহাদিগকে দিবার কিছুই আমার নাই,—বেতন নয়, বাড়ী ঘর নয়, আহার্য্য নয়। বুভুক্ষা, তৃষ্ণা, আবশ্যক অভিযান, সংগ্রাম এবং মৃত্যু, হে সৈনিকগণ ইহাই আমার দান। যাঁহারা অন্তরের সহিত দেশকে ভাল-বাসেন, যাঁহাদের স্বদেশপ্রেম শুধু বাক্যগত নয়, তাঁহারাই আমার অনুসরণ করুন।'

সেদিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে গ্যারিবল্ডীর সেই বক্তৃতা স্মরণ করাইয়া দেয়। মিঃ চার্চ্চিল পার্লামেণ্টের সদস্য-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"দিবার আমার কিছুই নাই, শুধু আছে রক্ত, শ্রম, অশ্রু এবং ঘর্ম্ম। আমাদের সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষাকাল উপস্থিত। আমাদের

ট্যাঙ্কের অগ্রগতি

আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী কামান

সম্মুখে অনেক—অনেক দীর্ঘ মাসের সংগ্রাম এবং দুঃখ কষ্ট রহিয়াছে।"

মিঃ চার্চ্চিল অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টবাদী, দেশবাসীকে তিনি একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে,—"শত্রুরা বজ্রের মত এই দেশেও হানা দিতে পারে।"

গত ১৯শে মে তারিখেও ব্রিটিশের প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলেন—"পশ্চিম সীমান্তে একটু স্থিরতা আসিবার পর জার্ম্মানীর যে সেনাদল কয়েক দিনের মধ্যে হল্যাণ্ডকে ধ্বংসে পরিণত করিয়াছে, তাহার কতকাংশ আমাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে,. ইহা আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে। আমরা সেজন্য প্রস্তুত আছি, আমিরা সে আক্রমণ সহ্য করিব এবং তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।"

অবস্থার গুরুত্ব কতখানি উহা হইতেই বুঝা যায় ইংলণ্ড আক্রমণ! ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ড কোনদি বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় নাই। যাহা এতদিন হয় নাই, ( সাহস এতদিন কেহ করে নাই, আজ তাহা কি সম্ভ হইতে পারে? সামরিক ঘটনার দিক হইতে বিচার করিে একেবারে অসম্ভব নয়। তবে সে আক্রমণ অর্থে অধিকার ন বিমানবহরের জোরে ইংলণ্ডে হানা দেওয়া সম্ভাবনার একেবা বাহিরে বলা যায় না। মিঃ চার্চ্চিল সেই আশঙ্কাই প্রকা করিয়াছেন। সামরিকভাবে ইংলণ্ড অধিকার ইহা কখন

সম্ভব হইতে পারে না, ইংরেজ তেমন জাতিই নয়। অনেক ঝুঁকিতে সাময়িক হুমকি মাত্র হইতে পারে। হিটলার তেমন চেষ্টা করিবেন কেন? সামরিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ইহাতে হিটলারের দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া তিনি হয়ত মনে করিতেছেন। প্রথমত ইহাতে নাৎসীদের উৎসাহ বাড়িবে, দ্বিতীয়ত হিটলারের ধারণা এই যে, তাহার ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে।

নরওয়ের লড়াইএ জার্ম্মানীর বিমান শক্তির পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বিমান বহরের সম্বন্ধে যে সব কথা শুনা যাইতেছিল, সেই বিমান বাহিনীর অনেক ভিতরের কৌশল ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। নরওয়ের তাহাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল; দক্ষিণ নরওয়েতে মিত্রশক্তি জার্ম্মানীকে হারাইতে পারে নাই। উত্তর নরওয়ের নার্ভিকের কথা বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে, জার্ম্মানেরা যদি উড়োজাহাজের পথে নার্ভিকে সেনা, রসদ এবং গোলা-বারুদ পাঠাইতে না পারিত, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় নার্ভিকের কেল্লা বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। বিমানশক্তির জোরে জার্ম্মানী নার্ভিককে টিকিয়া আছে।

বলা বাহুল্য, জার্ম্মানী পশ্চিম সীমান্তেও এই শক্তি ষোল আনা খাটাইবার জন্য চেষ্টা করিবে। হল্যাণ্ডের ব্যাপার হইতে বুঝা গিয়াছে যে, জার্ম্মানীর প্যারাসুট বাহিনীর
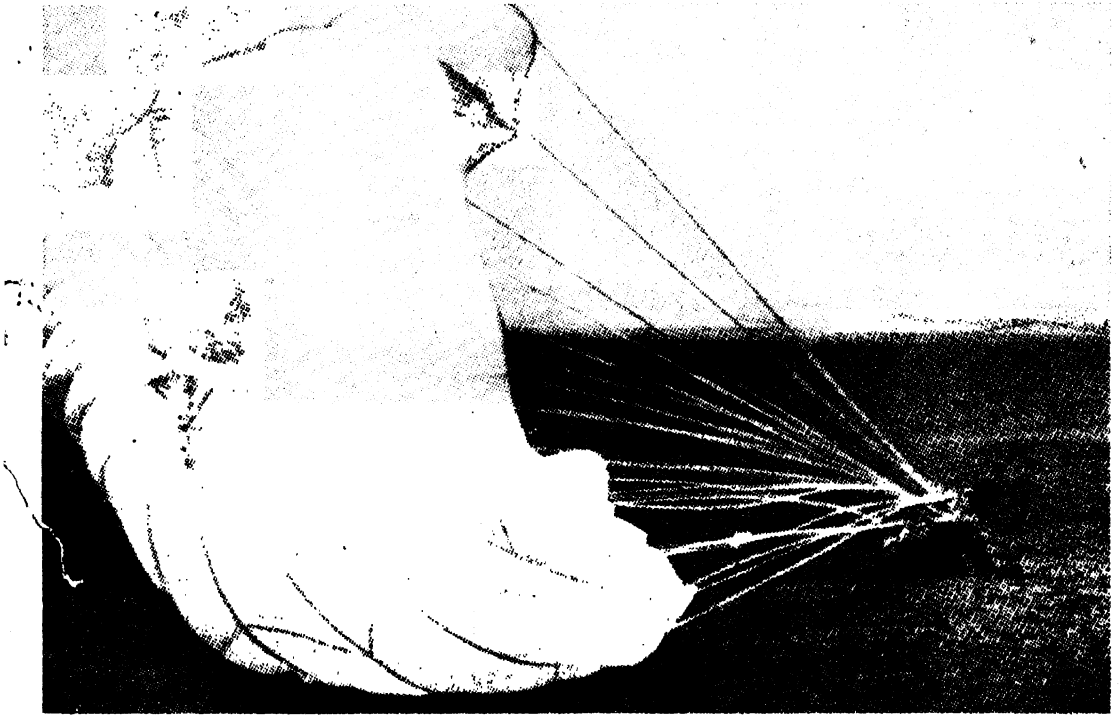
প্যারাসুট সাহায্যে সৈন্যের ভূমিতে অবতরণ

রাজধানী অসলো শহর দখল করিবার পর জার্ম্মানেরা উড়োজাহাজের সাহায্যেই অসলোর কেল্লায় সেনা পাঠাইয়াছে, রসদ যোগাইয়াছে এবং গোলা-বারুদ প্রেরণ করিয়াছে। অন্য কোন পথ তাহাদের পক্ষে বিশেষ খোলা ছিল না। ইংরেজের রণতরীসমূহ তাহাদের রসদবাহী জাহাজ সব ডুবাইয়া দেয় এবং জার্ম্মান রণতরীর বহরকে লড়াইএ আংশিকভাবে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। জার্ম্মানেরা সমুদ্রপথ সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সমুদ্রপথ বন্ধ হইবার পর জার্ম্মানেরা কেবল এক উড়োজাহাজের উপর নির্ভর করিয়াই নরওয়েতে যাহা কিছু করিয়াছে ইহা বেশই বুঝা যায়। জার্ম্মানেরা অসলো, বার্গেন এবং ট্রণ্ডহিমে উড়োজাহাজযোগে কত সৈন্য পাঠাইয়াছিল ঠিক জানা যায় না, তবে ইহা ঠিক যে, যে পরিমাণ সৈন্য তাহারা পাঠাইয়াছিল তাহাই কর্ম্মতৎপরতা সেখানে কি রকম বাড়িয়াছিল। এই প্যারাসুট বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ জার্ম্মান রণনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্যারাসুটযোগে উড়োজাহাজ হইতে অবতরণের চাতুর্য্য প্রথমে দেখায় রুশ বিমান বীরেরা। রুশ বিমান বীরগণ ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধে উঠিবার বাজিতে বিপদ কাটিয়া নীচে নামিবার জন্য প্যারাসুট ব্যবহার করিয়াছিল। জার্ম্মানী রুশিয়ার এই কৌশলকে রণনীতিতে প্রযুক্ত করিতেছে। রুশিয়া পোল্যাণ্ডের রণাঙ্গনেও এই কৌশল অবলম্বন করে এবং প্যারাসুটযোগে পোল সেনাদের পিছনে সৈন্য নামাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করে। নরওয়েতে জার্ম্মানেরা বহুসংখ্যক প্যারাসুটের সাহায্যে জলপথে ইংরেজ এবং ফরাসীর রণতরীর পাহারা পাড়ি দিয়া সৈন্য নামাইয়াছিল। ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডেও তাহারা এই

চেষ্টা করিতে পারে, ইহা বুঝিয়াই ব্রিটিশ এবং ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ নানারূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এক একটি প্যারাসুটে কত সৈন্য লওয়া চলে, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা গবেষণা আগে হইয়াছে। এখন জানা গিয়াছে, বড় আকারের একখানা জবরদস্ত সেনাবাহী বিমানপোত ২০ হইতে ২৫ জন করিয়া সৈন্য একেবারে প্যারাসুট সাহায্যে নামাইয়া দিতে পারে। প্যারাসুট বাহিনীর ঝুঁকি কম নয়। প্রথমত তাহাদিগকে জীবনের আশা ছাড়িয়াই শত্রুর দেশে অবতরণ করিতে হয়; শুধু তাহাই নহে, অবতরণের সময়ও বিপদ আছে। উড়োজাহাজ হইতে লাফ দিয়াই তাহারা প্যারাসুটের দঁড়ি ছাড়ে না, কতকটা দূর পর্য্যন্ত ইট পাথরের মত তাহারা উড়োজাহাজ হইতে নীচে পড়ে, তারপর প্যারাসুটের দঁড়ি খুলিয়া দেয়। পড়িতে গিয়া অনেকের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, অবশিষ্ট সৈন্য মাটিতে নামে। যদি তাহারা বহু উপর হইতে প্যারাসুট খুলিয়া শূন্যে ভাসিয়া নামে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। নরওয়ের লড়াইতে এই বিষয়ে তাহাদের চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং অসুবিধা অনেক আছে এই উপায়ে, তবে যেখানে আশে পাশে শত্রুপক্ষের সৈন্য নাই, এমন স্থানে কিংবা রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রদীপের সময় এই সৈন্যদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়।

জার্ম্মানেরা নরওয়ে হল্যাণ্ড দখল করিবার পর ৪টি প্রথম শ্রেণীর উড়োজাহাজের ঘাঁটি অধিকার করিয়াছে। ব্রিটিশ উপকূল হইতে ঐগুলির দূরত্ব একশত মাইলের অধিক নয়। বেলজিয়ামের অবস্থার কথাও এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। মিত্রপক্ষ ঐ সব বিবেচনা না করিতেছেন ইহা নয়। তাহারা বুঝিতেছেন যে, জার্ম্মানী সেনাবাহী উড়োজাহাজের সাহায্যে তাঁহাদের সেনাবাহিনীর পিছনে গিয়া প্যারাসুটীদিগকে নামাইয়া দিতে পারে, এবং তাহাদের লাইন বিগড়াইয়া দিতে পারে। নরওয়ের ট্রণ্ডহিমে তাহারা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

ট্যাঙ্কের সাহায্যও জার্ম্মানী বিশেষভাবে গ্রহণ করিতেছে দেখা যাইতেছে। পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় জার্ম্মানী বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু বেলজিয়ামের লড়াইতে এক সঙ্গে প্রায় দুই হাজার ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। বিগত মহাসমরে ১৯১৬ সালের পূর্ব্বে ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয় নাই। প্রথমত ট্যাঙ্কে তেমন সুবিধা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ক্যামব্রের লড়াইএতে ব্রিটিশ পক্ষ ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়া বিশেষ সাফল্যলাভ করেন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে জার্ম্মানেরা সর্ব্বপ্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে ট্যাঙ্কের শক্তি সব চেয়ে বেশী ফরাসীদের। একখানা ৩০ হন্দরের ট্যাঙ্কে দুইটি কামান এবং দুইটি মেশিন কামান লওয়া যায়। স্পেনের লড়াইতে দেখা গিয়াছে যে, জার্ম্মানদের ট্যাঙ্কের চেয়ে রুশিয়ার ট্যাঙ্কগুলি ভাল। জার্ম্মানীর ট্যাঙ্কগুলি শক্ত লোহার তার দিয়া ঘেরা; সেগুলি দ্রুত চলে বটে; কিন্তু বেশী দোল খায় বলিয়া সৈন্যদের তাক ঠিক থাকে না। এখন জার্ম্মানেরা খুব সম্ভব এ বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছে।

ট্যাঙ্কের জন্য ভয় মিত্রপক্ষের বা ইংরেজের নাই। প্রশ্ন হইতেছে বিমান শক্তির এবং প্যারাসুট বাহিনীর। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেদিন তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যুদ্ধরত অন্যান্য শক্তির সকলের সমবেত শক্তির চেয়ে জার্ম্মানীর উড়োজাহাজ উৎপাদনের শক্তি অনেক বেশী। তিনি এই প্রসঙ্গে আমেরিকার কথা অবশ্য বাদ দিয়াছেন এবং ইহাও সত্য যে, আমেরিকা নিজের শুধু ব্যবসার স্বার্থের জন্য নয়, নিজেদের নিরপেক্ষতার দিক হইতে বিচার করিয়াও মিত্রপক্ষকে সমরোপকরণ দিয়া প্রাণপণ সাহায্য করিবে। ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামের রণাঙ্গনেও ব্রিটিশ বিমানের তৎপরতার পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু জার্ম্মানী অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত পণ করিয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। বিগত মহাসমরের এই নীতির ফলে প্যারিসের একরকম দ্বারদেশ হইতে তাহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছিল, এবারও দারুণ ক্ষতিতে অবসন্ন হইয়া সেই পন্থাই তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে যাহাতে জার্ম্মান প্যারাসুটীরা অবতরণ করিতে না পারে, সেজন্য ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। থানায় থানায় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে, জংলা অঞ্চলে পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাহারা দিয়া ফিরিবার জন্য ছোট ছোট বাহিনী গঠন করা হইয়াছে।

শত্রুপক্ষকে ইংলণ্ডের দিকে আসিতে হইলে সমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতেই হইবে এবং বহুসংখ্যক রণতরী সদাসর্ব্বদা ব্রিটিশ উপকূলে পাহারা দিতেছে। এই সব রণতরী উড়োজাহাজধ্বংসী কামানসমূহে সুসজ্জিত। জার্ম্মানীর উড়োজাহাজের পক্ষে এই সব জাহাজের পাহারা এড়াইয়া কিংবা উড়োজাহাজধ্বংসী ব্রিটিশ কামানকে উপেক্ষা করিয়া উড়িয়া আসা সহজ নহে। যদি সহজই হইত, তাহা হইলে জার্ম্মানী সে চেষ্টা করিত; কিন্তু জার্ম্মানী সে চেষ্টা করিয়াও সুবিধা পায় নাই। এই সব রণতরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া ইংরেজের উড়োজাহাজ বাহিনী কার্য্যে তৎপর হইয়া রহিয়াছে। দিবারাত্র ইংলিশ চ্যানেলে চলিতেছে পাহারা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ সার্চ্চলাইট জ্বালিয়া ইংলণ্ডের উপকূলভাগ হইতে শত্রুপক্ষের বিমানের উপর গুলিবৃষ্টি করিবার পাকা ব্যবস্থা আছে। উপকূলভাগে পাহারার জন্য সদাসর্ব্বদা উড়োজাহাজ ঘুরিতেছে। জার্ম্মানীর ইংলণ্ড আক্রমণ উদ্যোগ এই সব দিক হইতে বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে কত কঠিন। ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন নেপোলিয়ান; সে ১১৯ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তিনি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিবার জন্য জাহাজে সৈন্য পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সে সব জাহাজ ইংলণ্ডের দিকে রওনা হইতে পারে নাই। কেমন করিয়া জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে হয় ইংরেজ তাহা জানে।

# ভারতের আদমসুমারি

শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত

এই বৎসর ৩১,০০,০০,০০০ কোটির অধিক ভারতবাসীকে গুনিয়া, বাছিয়া, হিসাবে লিখিয়া রাখা হইবে। এই দশ বৎসরে দেশে কত লোক বৃদ্ধি পাইল, কোন্ ভাষায় কতজন কথা বলে, কতজন বিদেশী এদেশে আছে, কতজনের কি ব্যবসা, কোন্ প্রদেশে বা কোন্ জেলায় কত লোকের বাস, কতজন সামান্য লেখাপড়া জানে, কতজন মুর্খ এবং কতজন অন্ততঃ একটি বিদেশীয় ভাষা জানে ইত্যাদি বহুরকম বিষয় এই হিসাব নিকাশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রতি নগর, গ্রাম, বাড়ী, নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিয়োজিত গণনাকারিগণ বড় বড় কাগজ খুলিয়া দাগকাটা ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শব্দ লিখিয়া ফেলিবে। গণনাকারী জিজ্ঞাসা করিবে জন্ম কোনখানে, জাতি কি, পেশা কি, নাম সই করিতে জানে কি না, ইংরেজী জানে কি না, মাতৃভাষা কি, বিবাহিত কি না, স্ত্রী কিংবা পুরুষ, সন্তানাদি কি, এই প্রকার নানা প্রশ্ন।

আদমসুমারির (Census) আর অধিক বিলম্ব নাই এবং কাজটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি দশমবর্ষে লোক গণনা করিতে হইবে আইনে এরূপ বিধান আছে। এই লোকগণনা ভিত্তি করিয়াই আমাদের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি চলিতেছে। যদি এই গণনায় ভুল হয় তবে এদেশের শাসনপদ্ধতিরও অনেক ওলটপালট হইবার সম্ভাবনা আছে। কেহ কেহ বলেন, বিগত ১৯৩০ সালের গণনায় অনেক মারাত্মক ভুল আছে। আমি নিজে জানি আমি এবং আরও ৮।১০ জন লোক উক্ত গণনাভুক্ত নহি। আমরা সে বৎসর মোটরলঞ্চে আসাম ও বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া ব্যবসায় উপলক্ষে যাইতেছিলাম। পূর্ব্বে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ঠিক সময়মত আমাদের লঞ্চ পথে আটক করিয়া গণনা করা হইবে। দুঃখের বিষয় সারারাত নদীর তীরস্থ গ্রামসমূহের পাশ দিয়া চলা সত্ত্বেও কেহ আমাদিগকে হিসাবে লিখিয়া লইল না।

আমাদের দেশে যে প্রথায় এই গণনা করা হয়, তাহাতে অনেক গলদ আছে। সাধারণ বেগারধরা লোকের সাহায্যে প্রাথমিক গণনা করা হয় এবং এই গণনাকার্য্যে তাহারা বিশেষ কোনও দায়িত্বের ধার ধারে না। কোনওমতে তাহারা কাগজপত্র উপরস্থ বেগারের হাতে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করে।

ভারতের এই বিরাট লোকসংখ্যা গণনা করা মোটেই সহজসাধ্য কর্ম্ম নয়। এজন্য একটি বিরাট কর্ম্মবাহিনীর প্রয়োজন, তাহাদিগকে এক বৎসরকাল বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার দরকার, কার্য্যক্রম ও কার্য্যসূচী এরূপভাবে প্রস্তুত করা উচিত যাহাতে কার্য্যান্তে কোনও ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয়। অবশ্য এরূপ কথা উঠিতে পারে যে, এই যে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করা হইবে কার্য্যান্তে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে। গভর্ণমেণ্টের এরূপ একটি বিরাট বাহিনী সদাসর্ব্বদা নিয়োজিত রাখারও প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ষ্টাটিষ্টিক্‌সের অনেক তথ্য মোটেই সংগ্রহ করা হয় না, তাহার ব্যবস্থা না থাকায় দেশের ক্ষতি হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। বিশেষত বঙ্গদেশের মত এরূপ ঘন বসতিবিশিষ্ট স্থানে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনি, উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয়, সরবরাহ যথারীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে ষ্টাটিষ্টিকস কর্ম্মকর্ত্তাদের নখদর্পণে থাকা দরকার। এদেশে এতকাল পাটের পূর্ব্বাভাস যেভাবে সংগ্রহ করা হইত তদনুরূপ প্রথা যে কোনও দেশের পক্ষে লজ্জাকর। বাঙলাদেশের কৃষিসম্পদ বা কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে কাহারও কোনও জ্ঞান নাই। বঙ্গদেশে কত দুগ্ধ, কত ফল, কত শাকসবজি উৎপন্ন হয় কেহ জানে না। এদেশে পশুমৃত্যুতে জাতির কত ক্ষতি হয় কেহ বলিতে পারে না। বাঙলাদেশের রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, গাড়ী, নৌকা, মাল, যাত্রী সম্বন্ধেও বহু তথ্য সংগ্রহ করিবার আছে এবং এ সকল বিষয়েও নানাপ্রকার কার্য্য করিবার আছে। দেখিয়া মনে হয় যেন এই লোকগণনার জন্য বিশেষ বুদ্ধিমান বা শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন না। এরূপ ধারণা ভুল। গণনাকার্য্যের জন্য এরূপ লোকের প্রয়োজন যাহারা একমাত্র কে লটারির প্রথম পুরস্কার পাইবে তাহাই বলিতে পারিবে না, তদ্ভিন্ন অপর সকল প্রকার বাস্তব তথ্যের সম্পূর্ণ সন্ধান লইতে পারিবে। এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া রীতিমত চৌকস লোক সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই সেন্সাসে আমরা অনেক বিষয়ের সন্ধান চাই,—ভারতে মোট বেকারসংখ্যা কত, কতজন গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত উপার্জ্জন করে না। আমরা এই গণনায় দেশের শিক্ষার ও শিক্ষিতের বিষয় অনেক তথ্য পাওয়ার আশা করি। আমাদের জানা দরকার কতকগুলি লোক যথেষ্ট শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এই গণনায় আরও একটি বিষয় সংগ্রহ করা দরকার, কত লোক গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জমির মালিক না হইয়াও কৃষক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আরও একটি গুরুতর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কত অ-বাঙালী বাঙলায় অর্থোপার্জ্জন করিতেছে এবং তাহারা কে কিভাবে টাকা উপার্জ্জন করে।

এইভাবে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার কাগজ প্রস্তুত হইয়া গেলে সেই সকল কাগজ দেখিয়া বাকী কাজ কলের সাহায্যে করা হইবে। কলের কাজে ভুল হয় না, কিন্তু মানুষের কাজে প্রতিপদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এজন্য কল ব্যবহারই শ্রেয়। অপর কথা, কলে সময় ও শ্রমের লাঘব করিবে এবং ব্যয়সংক্ষেপ করিবে। যে কাজ করিতে বহু লোকের বৎসরাধিককাল সময়ের প্রয়োজন হইবে সেই কাজে কলে আট বা দশ দিনের অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

এখন এই কলে কিভাবে কাজ হইবে দেখা যাক। এজাতীয় যন্ত্রকে সাধারণত ট্যাবুলেটিং মেশিন বলা হয়। এদেশে বৃটিশ ট্যাবুলেটিং মেশিন কোম্পানির হলারিথ মেশিনেরই ব্যবহার। এই হলারিথ যন্ত্রে হিসাব করিতে প্রথমে কার্ড প্রস্তুত করার প্রয়োজন। ইহা চওড়ায় একটি পোস্টকার্ড অপেক্ষা ছোট, কিন্তু লম্বায় কিছু বড় এবং অপেক্ষাকৃত হালকা একপ্রকার শক্ত কার্ড এই যন্ত্রের খোরাক। কার্ডের মধ্যে ১ হইতে ৮০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখিত কতকগুলি লাইন থাকে। ছোট ছোট টাইপরাইটার যন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্ডের মধ্যে কতকগুলি করিয়া অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখা হইবে। এই ছিদ্রে সাঙ্কেতিকভাবে ভারতের লোকের বিবরণ নির্দ্দেশিত হইবে। প্রতি ব্যক্তির জন্য পৃথক এক একখানি কার্ড ছিদ্র করা হইবে। এই কার্ডই এই বিরাট ব্যাপারের প্রতি খুঁটিনাটি প্রকাশ করিবে।

একটি যন্ত্রে কার্ড বাছাই করা এবং অপর আর একটি যন্ত্রে হিসাব করা হয়। যদি সবগুলি কার্ড ওলটপালট করিয়া বাছাই করা যন্ত্রে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যন্ত্রচালককে বলা হয় যে বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান জেলার কার্ডগুলি পৃথক করা হোক। চালক অতি অল্প সময়ের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার কয়েক লক্ষ কার্ড আনিয়া হাজির করিবে। যদি বলা হয় বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কার্ড চাই, যন্ত্রী তাহাও অতি অল্পক্ষণেই করিবে। যদি বলা হয় [illegible] ব্রাহ্মণদের কার্ড চাই, তাহাও অতি অল্পকালের মধ্যেই বাছাই হইয়া যাইবে। এসব বাছাইয়ে ভুল হওয়া অসম্ভব।

এইবার দ্বিতীয় যন্ত্রে কার্ডগুলি রাখিয়া যদি ইচ্ছা করা যা[illegible]

( শেষাংশ ৬১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# কমলার খেয়াল

(গল্প)

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

—"শালারা একেবারে ডাকাত! দিনের বেলায়ও একটু বসবার জো নাই,—নে মর্ মর্!!" হাতের কবজির উপর দীননাথ ঠাস করিয়া এক চড় মারিল, তারপর আরো একটা, আরো একটা!

—"শালারা!!......ছুঁচটা আবার গেল কোথায়।" চড়-প্রক্রিয়ায় সূতা হইতে কখন সূচটা খুলিয়া গিয়াছে। দীননাথ মাথা নোয়াইয়া খুঁজিতে লাগিল। একে বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, সব কিছুই ঝাপ্‌সা মনে হয়। পুরু চশমা আঁটিয়া কোন রকমে কাজ চলে মাত্র। চশমার একদিক সূতা দিয়া বাঁধা, বারে বারে খুলিয়া যায়। আঙুল বুলাইয়া খুঁজিতে লাগিল, সবশেষে পাওয়া গেল। কিন্তু আর এক বিপদ। সূচে আর সূতা পরানো যায় না। একবার, দুইবার,—প্রত্যেকবারেই সূতা ফস্কাইয়া গেল।

—"এসব কি আমার কাজ! আমার পোষায় না!! বাবা, কি দিকদারি!"

হঠাৎ হো হো হাসির শব্দ!

কমলার শব্দের মত মনে হইতেছে। বৃদ্ধ কান পাতিয়া রহিল,—এইবার আরো সামনে প্রায় পিছনে। ঘাড় ফিরাইয়া দীননাথ দেখিল, কমলা-ই।

—"তুই!"

—"তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেছ বাবা?"

—"এখন এলি যে?"

—"এমনি—তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয় না বুঝি।" কমলা হাসিল।

—"হু", একটু থামিয়া দীননাথ গম্ভীর হইয়া কহিল—"অক্ষয়কে জিগ্‌গেস্ করেছিস?"

কমলা নিরুত্তর!

—"এ ভারী অন্যায়। অক্ষয়কে জানানো উচিত ছিল।" এভাবে না বলে চলে আস্‌লে অক্ষয় রাগ করবে।"

কমলা হাসিয়া কহিল—"ইস্, ওকে আবার বল্‌তে যাবো কেন?"

দীননাথ অবাক হইল, কহিল,—"বাঃ যাবিনে, ওযে হ'ল তোর গুরুজন, মেয়েমানুষের এক সোয়ামী ছাড়া—" কথা আর শেষ হইতে দিল না, কমলা হাসিয়াই কুটিকুটি!

—"তোমার এসব কথা এখন রাখো।" কাপড়টা একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"সেলাই আর করতে হবে না, আমি এসেছি। ঐ দেখো পেয়ারাগুলি সব খেয়ে ফেললো। তুমি ত কিছুই দেখো না—ঐ, ঐ—কে রে?"

প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকখানা ঘর। মাঝে সরু একটু উঠান। এর পরেই একটা আধ-মজা পুকুর। দক্ষিণ পাড়ে পুটিকয়েক গাছ। এতক্ষণ ছেলেপুলের কলরবে মুখরিত ছিল, কমলা আসিতে না আসিতেই এদিকে ততক্ষণে নীরব হইয়া গিয়াছে—কেহই নাই! গাছের নীচে শুধু চিবানো ছিবড়ে।

—"ইস, সব খেয়ে ফেলেছে, একটাও নাই!" কোমরে কাপড় জড়াইয়া কমলা গাছে উঠিল। বাঁদিকে খোলা মাঠ, শুধু সবুজ! সবুজ!! মাঝে মাঝে এক-আধটা ডোবা—বৃষ্টির জল আটকাইয়া রোদে চিক্‌চিক্ করিতেছে।

কমলা এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল।

মাঠে কে কাজ করিতেছে? সুরথের মত মনে হয় না? বাঃ ঐ যে এক রকমই চলন—এই যে, কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গি যে অবিকল ওরই মত!—হ্যাঁ সুরথ-ই! কমলার ইচ্ছা হইল একবার ডাক দেয়, কিন্তু কি দরকার? গরজ বুঝি শুধু একা কমলার-ই! আর তাহার গলার সুর পেঁছাইবেও না বোধ হয়। একবার চোখাচোখি হইলে বরং হাতছানি দিয়া ডাকা যায়। কিন্তু ছাই—এদিকে একবারও চাহে না যে! কমলার কি এতো মাথাব্যথা!

—"ওমা! কমলা যে—কখন এলি?"

"আর এলি; একবার ত খোঁজও নাও না, রাঙা খুড়ীমা।"

কমলা তর তর করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

রাঙাখুড়ী কহিল,—"তোদের আবার খোঁজ! তোরা হলি বড় গেরস্ত—আর আমরা—"

—"তোমাদের শুধু এক কথা খুড়ীমা। এতদিন পরে দেখা হলো—কই একটু জিজ্ঞাসা করবে; তা না শুধু—তোমা বড়মানুষ, বড়মানুষ!" রাঙাখুড়ী হাসিল।

কমলা কহিল—"মণি কেমন আছে? আরে ঠিক—মানদা নাকি এসেছে?"

রাঙাখুড়ী হাসিয়া কহিল,—"ইস, মানদার উপর যে খুব টান, আমরা বুঝি কেউ নই!—যাই—একবার দুপুরে যাস্। খোকাকে দেখে আসবি!"

মানদা কমলার সই। বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকে, ইদানীং আসিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণদিকে খালের দু'একটা বাড়ীর এপাশে মানদার বাড়ী। বৎসরের অন্যান্য সময় খালে জল থাকে না, কেবল বর্ষায় জল হয়। বাঁশের সাঁকোই তখন একমাত্র এপার-ওপারের যোগসূত্র। এখন বোধ হয় কিছু জল হইয়াছে—আধ হাত, বড়জোর এক হাঁটু।

মাঠের ভিতর দিয়া যাওয়া যায়, পাড়ার ভিতর দিয়াও একটা রাস্তা আছে, সেটা আরো সোজা। এদিকে মাঠে সুরথ কি কাজ করিতেছে, কমলা মাঠের রাস্তা ধরিয়াই চলিল। দুইদিকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পাটক্ষেত—যখন-তখন ঘন বৃষ্টিতে পাতাগুলি ভিজিয়া ভারী হইয়া নীচ দিকে ঈষৎ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির জলে পাতার গা হইতে ধুলা মুছিয়া আরো শ্যামল দেখাইতেছে। সরু আইল, গরু-বাছুরের পায়ে পায়ে এখানে একটু ভাঙ্গা, ওখানে গর্ত—চলা কষ্টকর!

সুরথ কাজ করিতেছিল। কমলা পিছন হইতে হাসিয়া কহিল,—"ইস, খুব মনোযোগ যে, কি এতো করছিস! সর্ ত দেখি"

সুরথ হাসিয়া কহিল,—"এই দেখ। তারপর........!"

—"ওরে বাবা, এই করেই এর্তো—কাদা মেখে একেবারে ভূত! হাঁ, হাঁ, বেশ ছিরি হয়েছে।"

—"তোর যে কথা।"

—"আমার বুঝি কথা, এই দেখ।" একমুঠা কাদা নিয়া সুরথের দিকে ছুড়িয়া মারিল—"ভূত! এই হিজল গাছের ভূত! —হাঁ হাঁ!

সুরথ হাসিয়া কহিল—"তুই ভারি দুষ্টু!"

"দুষ্টু বুঝি! হাঃ হাঃ—এই নে।" আরো একমুঠা কাদা ছুড়িয়া মারিল।

"তবে তুইও নে!"

সুরথ কাছে আসিতেই কমলা তীব্রবেগে পিছনে সরিয়া গেল; জিব কাটিয়া কহিল,—"ছিঃ, তুই না বেটাছেলে।"

সুরথ হতবাক্‌ হইয়া গেল, কিছুই বলিতে পারিল না, বোধ হয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

কমলা আরো দূরে সরিয়া গিয়া কহিল—"আমি না পরস্ত্রী। আমার গায় হাত দিতে চাস্‌।"

সুরথ আরো অবাক হইয়া গেল। লজ্জায় এদিকে আর চাহিতেও পারিল না।

কমলা শরীরটা ঈষৎ বাঁকাইয়া, চোখের অপরূপ ভঙ্গি করিয়া কহিল,—"হাঁ, হাঁ, তুই ভারি বোকা! কিছুই বুঝতে প্যারিস না।"

—"কমলা, একটু দাঁড়া!"

—"ইস, আমি পারবো না।"

—"একটা কথা; কমলা! কমলা!!"

—"আমি পারবো না—অ-নে-ক কাজ।"

কমলা চলিয়া গেল।

বেলা অনেক হইয়াছে। সূর্য্য প্রায় মাথার উপর। আকাশে ফিকা ঘোলাটে মেঘ। তবু যেন গরমের একটুও কমতি নাই। এই এতোটুকু রাস্তা হাঁটিতেই কমলা কেমন ঘামিয়া গিয়াছে। মানদার বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। ঐ দিকেই তাহাদের ঘাট, কিন্তু কাহাকেও দেখা যায় না। মানদার বোধ হয় খাওয়া হইয়া গিয়াছে—না হয় স্নান তো নিশ্চয়ই! দূর ছাই! তবে এখন গিয়া কি লাভ!

কমলা আবার মাঠের দিক দিয়াই ফিরিয়া চলিল। সুরথ মাঠেই দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিয়া কহিল,—"কমলা"!

"চুপ! কি যে, তোর একটুও বুদ্ধি নাই।"

"কমলা!"

কমলা কিছুই জবাব দিল না, কিছু দূরে সরিয়া আসিয়া ফিক করিয়া হাসয়া কহিল—"ঐ দেখ, মধুর কাকা,—বেলা অনেক হয়েছে!"

দুপুর বেলা; দীননাথ কিছুক্ষণের জন্য একবার গড়াইয়া নিয়াছে। বাছুরটা বোধ হয় বাঁধা হয় নাই, গাইটাকে ঘাস দিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। অন্যদিন বেশী দুধ না হইলে বরং চলে; কমলা আসিয়াছে, আজ একটু দুধ না হইলে কেমন কথা! আর খাইবে-ই বা কি? মাছ ত বাজারে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়; গুঁড়া কাচকী, ইচা আর ওজানো ট্যাংরা!

দীননাথ উপুড় হইয়া গরুকে ঘাস দিতেছিল, পিছনে শব্দ, দুর্ব্বল পায়ের শব্দ!

—"কে কমলা!"

—"আজ্ঞে আমি!" প্রায় বৃদ্ধ এক ব্যক্তি, দীননাথকে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মাথার চুল তামাটে, মাঝে মাঝে পাকা চুল, চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে; হাতে একটা লাঠি।

দীননাথ চশমার সুতা ভাল করিয়া বাঁধিয়া নিল,—"কে অক্ষয় বাবাজী?"

—"আজ্ঞে!"

—"বসো বাবাজী; যাও ঘরে গিয়ে বসো! কমলা, কমলা!" কিন্তু কমলার কোনই শব্দ পাওয়া গেল না।

"ও বুঝি বাড়ী নেই। একেবারে পোলাপান! চলো বাবাজী চলো। শরীর ভাল ত!"

—"আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে—ভালই আছি!"

"শরীরের দিকে একটু নজর দিও বাবাজী। যে বৃষ্টি!"

উভয়ে আসিয়া ঘরে বসিল। দীননাথ বসিল একটা জলচৌকির উপর আর অক্ষয় চৌকির উপর। একপাশে তামাকের সরঞ্জাম!

তামাক সাজাইয়া দীননাথ অভ্যাসবশত হুঁকা বাড়াইয়া কহিল,—নাও বাবাজী।

অক্ষয় সবিনয়ে আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"আজ্ঞে আপনি গুরুজন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুরুজন! কিন্তু তোমার বয়সও মানতে হয়। বাবাজী আমরা ছোটলোক—এতে দোষ নাই—হাঁ, হাঁ। দীননাথ প্রচুর হাসিল। তামাক টানিতে লাগিল, ভুড়ুক, ভুড়ুক!

—"দেখ বাবাজী! কমলা আমার একটু খেয়ালী। ওকে তুমি একটু বুঝিয়ে রেখ! তুমি কি ওর উপর রাগ করেছ!"

অক্ষয় কহিল—"না, না ওকে আমি কোনদিন কিছু বলি না—এই অসুবিধা!"

—"অসুবিধা ত হবেই।"

—"সংসারের ভার ওরই উপর। আমি পারি না—ওই সব দেখে। একটু এদিক ওদিক হলেই সব অচল! তাই তো—নইলে দু'চার দিন এখানে থাকবে, তাতে আর এমন কি!"

—"বুঝেছি। কমলা আমার লক্ষ্মী মেয়ে। কি বল বাবাজী!"

অক্ষয় যেন লজ্জায় মরিয়া গেল, সবিনয়ে কহিল,—"আজ্ঞে।"

আনন্দে দীননাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া আসিল, কহিল —"হাঁ, হাঁ, সে আমি জানি। তুমি কমলার কদর বুঝবে। কমলা কি আমার—!"

"কমলা তোমার কি বাবা?"

দীননাথ কথার মাঝে থামিয়া গেল।

কমলা ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া একপাশে একটু সরিয়া কহিল,—"কি বলছিলে বাবা!"

—"তুই যে না বলে পালিয়ে এলি, এই দেখ, বাবাজী

এসে হাজির।”

কমলা অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া কহিল—“কি তুমি আমায় মারবে নাকি—মার না দেখি—ইস।”

লজ্জায় অক্ষয় মাথা নীচু করিয়া রহিল। কাছেই গুরুজন, তার সামনে স্বামী-স্ত্রীতে কথা!

কমলার কিন্তু কোন খেয়াল নাই। কহিল—“স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে নেই জান,—মারলে আর যাব না—ঠিক যাব না!”

অক্ষয় তবু নিরুত্তর।

এইবার দীননাথের ব্যস্ত ভাব দেখা গেল। চশমাটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া একটা নিমা গায়ে দিল।—“আমি একটু আসি কমলা। বস বাবাজী! একটু বিশ্রম কর।”

বাহির হইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল—“আজ্ঞে—আমাদের যাবার—”

“হাঁ, হাঁ। যাবে নিশ্চয়ই। আজ কি করে যাবে!”

—“আজ্ঞে”

—“রাত্তির বেলা—সাপ খোপ—হুঁ, না, না, আজ নয়। আরে বাবাজী একটু বিশ্রাম কর, একটু আমোদ আহ্লাদ কর। কথায় বলে, শ্বশুর বাড়ী না মথুরাপুরী। —হাঁ, হাঁ!” প্রচুর হাসিয়া দীননাথ বাহির হইয়া গেল।

এবার অক্ষয়ের কথা কহিবার পালা; —বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে সুরু করিল—তুমি এসেছো, আমি ত ওদিকে অস্থির; প্রথমে ভেবেছি, ছিদাম কাকার বাড়ীতে গেছ। ওমা, এদিকে বেলা বেড়েই চলল, তবু তুমি আস না। এদিকে খুঁজি, ওদিকে খুঁজি, তবু তোমাকে পাই না—তারপর এখানে এসেছি!”

কমলা কিন্তু হাসিয়া ফেলিল, কহিল—ইস কত ভাব আমার জন্যে।”

—“তাতো তুমি বলবেই। এদিকে ত সব বিশৃঙ্খল, গরুগুলির খাওয়া নেই—রান্নাঘরে বাসনকোসন—কিছুরই ঠিক নেই।—”

—“আমি কি করব?”

—“তুমিই ত সব মেজবৌ। তোমার বাড়ী—তুমি চল। আমি বুড়োমানুষ কিছুই পারি না, তুমি চল—তুমি বিনে সব যেন অন্ধকার!”

কমলার হাসি পাইয়াছিল, কিন্তু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিজেকে সামলাইয়া নিল, কহিল—তুমি যে বুড়ো, দুবৎসর আগেও একথা ভাল করে জানতে।”

সবিস্ময়ে অক্ষয় কহিল—“তা ঠিক। তবে একথা আজ তুলছ কেন?”

কমলা কহিল—“একথার কোন দরকার ছিল না সত্যি, কিন্তু বিয়ের সময় একথা ভাবলেই বোধ হয় ভাল হত।”

“ওঃ সেকথা। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এই তিনটায় মানুষের হাত নাই। ভগবান জোড় মিলিয়ে সংসারে ছেড়ে দেন—এই দেখ না—নইলে তোমার সাথে আমার বিয়েই বা হবে কেন? সবই তাঁর বিধান!” অক্ষয় ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইল,—“চল মেজবৌ, বাড়ী চল।”

—“আমি যাব না।”

অক্ষয় অবাক হইয়া গেল। —“তুমি যাবে না। রাগ করেছ!”

কমলা কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া জবাব দিল,—“না।”

“তবে।”

“আমার ইচ্ছা, আমি যাব না।”

বৃদ্ধ দীননাথ ঠুক ঠুক করিয়া চলিয়াছে। রাস্তা মোটেই ভাল নয়। দুই পাশে কচুগাছ—বর্ষার জল পাইয়া সতেজে বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিধুদের বাড়ীর ওদিকটা আরও খারাপ। বড় বড় গাছ তাহার নীচ দিয়া সরু রাস্তা—মাঝে মাঝে আবার জল। দীননাথ চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—যে সাপের রাজত্বি! বিশ্বাস করা যায় না। আর একটু দূরে—এই যে কৈলাসের বাড়ী দেখা যায়। এইখানে আসিয়া দেখিল, —কৈলাসের বাড়ী আজ নীরব। কেহ নাই। দুপুরদিকে কয়েকজন প্রাচীন গোছের লোক, এখানে আসিয়া বসে, তাস-পাশা, দশ-পঁচিশ খেলে—কোনদিন শুধু মাত্র গল্পই হয়। আজ কেহ আসে নাই—কিন্তু এখানে বসিলে চলিবে না। সূর্য্য এলাইয়া গিয়াছে, রোদের তেজ নাই। ঘরে বাবাজী, একবার বাজারে যাইতে হইবে, ঠাকুরবাড়ীতেও যাওয়া দরকার —কাল শনিবার, কমলা যইবে, কখন বারবেলা লাগিবে। রাস্তা অনেক, সন্ধ্যার আগে ফিরিতে পরিলে ভাল—যে রাস্তা!

“বাবুদাদা!”

“কি রে শালা।”

“বাঃ, তুমি যে চলে যাচ্ছ!” একটি ছোট শিশু দীননাথের হাত জড়াইয়া ধরিল।

দীননাথ কহিল,—“আজ যাই যাদুমণি। অনেক কাজ!”

“ইস তোমার কেবল কাজ। এখন যাও ত দেখি।” দীননাথকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—“খুব বুঝি কাজ!”

“আজ ছেড়ে দাও, সত্যি অনেক কাজ।” শিশু কোন কথা কহিল না এবং কোন কথা শুনিতেও চাহিল না।

—“দেখ, আজ আমার বাজারে এখুনি যেতে হবে; তারপর ঐ যে গ্রাম দেখছ না, সেখানে যাব—ছাড়, সন্ধ্যা হয়ে যাবে!”

“বারে আজ গল্প বলবে না, কালকের ঐ গল্পটা—উহুঁ ছাড়ব না।”

দীননাথ নিরুপায় হইয়া কহিল—“রাত্রে এসে বলব, এখন ছাড়।”

—“তবে বাজার থেকে আমার জন্য কি আনবে, আগে বল।”

—“খুব সুন্দর দেখে তোমার জন্য একটা জিনিস আনব।”

—“দূর ছাই। পুতুল না কিন্তু! ঐ যে গোল গোল মারবেল, চুষে চুষে যে খায়! কারু কাছে বল না যেন—তুমি যে ই-য়ে!”

দীননাথ হাসিয়া কহিল—“আচ্ছা তাই হবে।” এখন ছেড়ে দাও বেশী দেরি হলে কমলা আবার ভাববে!

অবাক কাণ্ড! দীননাথকে একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া শিশুটি অভিমানের সহিত কহিল,—"বুঝেছি কমলাই তোমার সব, আমাকে একটুও ভালোবাস না—বুঝেছি! আড়ি, আড়ি, তোমার সাথে আড়ি!"

দীননাথ হাসিয়া কহিল,—"দূর শালা, বেইমান!"

কৈলাসের এই নাতি নীলুকে নিয়াই দীননাথের অনেক সময় কাটে। বুড়া বয়স, টুকিটাকি কাজ ছাড়া অন্য কাজের চাপ তাহার দুর্ব্বল, জরাগ্রস্ত শরীর বহিতে অক্ষম, তখন সম্বল এই শিশুটি। সত্যি নীলুকে তাহার বড় ভাল লাগে। স্বভাব অনেকটা কমলার ছোটবেলাকার মত। এই শিশুটির চাল-চলন কমলার কথাই মনে করিয়ে দেয় বেশী! বোধ হয় কমলার বয়স তখন দুই কি তিন, কয়েক দিনের জ্বরে কমলার মা মারা যায়। অনেক সন্তান মরিয়া এই কমলা! একাধারে কমলার মা ও বাবা এবং সংসারের রক্ষণকর্ত্তা, এই কয়টির চাপে দীননাথের বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইল। সংসারের কাজের মাঝে ছোট এক শিশু এই কমলাকে লালন করা কত যে কষ্ট, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই, তবে নিজেকে সে গড়িয়া নিল। তাহার কোন ক্লান্তি ছিল না এবং তাহার সব কিছুর মাঝে কমলার প্রতি স্নেহের সৌরভই ফুটিয়া উঠিত বেশী! কমলার বয়স তেরো কি চৌদ্দ—মেয়ের বিবাহ; দীননাথকে আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। শুধু একমাত্র মেয়ে—অবস্থা তাহার ভাল নয়—ক্ষেতখামার যা আছে—সংসার চলে মাত্র। নিজের দারিদ্র্য সহ্য করা যায়, কিন্তু তাহার আদরের কমলা যে অস্বচ্ছল গৃহের গৃহিণী হইবে, ইহা মানা দূরে থাক, কল্পনাতেও বাধিত! রূপের এবং বুদ্ধির খ্যাতি কমলার একটু ছিল, চারিদিক হইতে কয়েকটা কথা আসিল। দীননাথের কোনটাই পছন্দ হয় না। সুরথের কথা মানদা একবার বলিয়াছিল। কমলার মৌন সম্মতিও ইহাতে ছিল হয়ত, কিন্তু সুরথের বয়স কাঁচা, টাকা কড়ি কিছুই নাই, তাছাড়া মুরুব্বীও কেহ নাই। দীননাথ একটু মুচকি হাসিল—ছেলে বয়সের একটু টান!—এই ত—হাঁ! হাঁ!! কিন্তু পয়সা ছাড়া সবই মিথ্যে। অক্ষয়ের বয়স একটু বেশী সত্য—আর বয়সের কথা কিছুই বলা যায় না—যার যেমন নিয়তি। কিন্তু খাওয়া পরার কোন অভাব নাই। কেমন সুখে আছে। তৃপ্তিতে দীননাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া আসিল।

এদিকে সন্ধ্যার আর বেশী বাকি নাই। আকাশে মেঘ; সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই মনে হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার গাঢ় হইলে আর উপায় থাকিবে না—একেই অন্ধ, তাহার উপর রাস্তাঘাট দুর্গম—দীননাথ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল।

সকলের অনুমান ঠিকই হইল। সন্ধ্যার পর একবার খুব জোর বৃষ্টি হইয়া, সেই যে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার আর বিরাম হইল না এবং সহজে যে থামিবে, তাহারও কোন লক্ষণ বুঝা গেল না।

একটা হারিকেনের আলো কমাইয়া সুরথ হিজল গাছের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। নড়িবার উপায় নাই— বাঁধের ঐ পিঠে মাছের আওয়াজ, শীঘ্রই উজাইয়া উঠিবে। একটু শব্দ হইলেই, তাহার সারাদিনের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে—মাছ আর উঠিবে না। অধীর আগ্রহে সুরথ সেদিকে চাহিয়া রহিল।

"সুরথ! সুরথ!"

কোমল কণ্ঠের ডাক, সুরথ ফিরিয়া চাহিল; দেখিল কমলা তাহার প্রায় পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তবু যেন সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিস্ময়ে কহিল,—"তুই কমলা, এখানে!"

"আমার ইচ্ছে।"

—"কিন্তু এখানে দেখলে লোকে যে তোকে নিন্দে করবে!"

—"তা করুকগে" একটু হাসিয়া কমলা কহিল,—"করেও কোন লাভ হবে না, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের নিন্দাবাদে আমার কিছু আসবে যাবে না!"

সুরথ একথায় সায় দিতে পারিল না, তেমনিভাবে কহিল,—"তবু—।"

কথা আর শেষ হইতে দিল না; কমলা জ্বলিয়া কহিল; —"আমার বাপ-সোয়ামীর কথা ভাবছিস—ওদের আমি গ্রাহ্যির মধ্যে আনি না। ওরা চেনে কেবল টাকা এবং আমাকে দেখে ও ভাবেই। বলত সুরথ—একি মিথ্যে!"

সুরথ কিছুক্ষণ নীরব রহিল, পরে কহিল,—"সত্যি কি মিথ্যে তার বিচার আমি জানি নে, তবে আমার টাকা নেই একথা সত্যি!"

—"আমি সে কথা বলি নি।"

—"আর অস্বীকার করেও কোন উপায় নেই, কিন্তু দারিদ্র্যকে বরণ করে সুখ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার কোন মানে নেই!"

কমলা কহিল—"সুরথ, তুই চুপ কর, একথা আমি শুনতে চাইনে; জানি এইটে তোর অভিমানের কথা!"

সুরথ একথার কোন সরাসরি জবাব দিল না, কহিল—"কিন্তু যা হবার হয়েছে, ফেরান যখন সম্ভব নয়, তখন ভেবে আর কি লাভ কমলা! সব ভগবানের হাত!"

—"ভগবানের হাত!" একটু থামিয়া কমলা আবার কহিল—"শুধু কি তাই; তাছাড়া আর বুঝি কিছু নেই! তোর কথা আমি মানতে পারছি নে। আচ্ছা বলত!"

সুরথের একটা হাত নিজের কোমল হাতের মুঠায় টানিয়া আনিল, অহেতুক চাপ দিয়া কহিল,—"আচ্ছা, বলত, সত্যিই এই তোর মনের কথা; আমার মুখের দিকে চেয়ে বলত!"

সুরথ মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না।

কমলা আবার কহিল,—"আমি জানি, এ তোর মনের কথা নয়। তোর সাথে আমার বিয়ে হোক, একথা কি তোর এখনও মনে হয় না!"

সুরথ কোন উত্তর দিতে পারিল না। সহসা, কমলার কোমল দেহ তাহার মাংসবহুল দেহের মধ্যে টানিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। প্রবল উত্তেজনায় উভয়ের দেহ থর থর

করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না।

সুরথ কহিল,—"কমলা! এর কোন উত্তর নেই। ভগবানের উপর দোষ দিয়ে তবু বরং সান্ত্বনা মেলে। কিন্তু কপালে আমার দুঃখ নিয়েই জন্ম। বোধ হয় এর জ্বালাই চিরদিন বইতে হবে।"

"সুরথ! তুই কি বলছিস।"

সুরথের কানে বোধ হয় একথা পৌঁছিল না, সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—"কি যে দুঃখ কমলা, তোকে কি বলব—বড় আশা ছিল, তোকে নিয়ে ঘর বাঁধব—সব শেষ হয়ে গেছে!"

"সুরথ!"

সুরথ চমকিয়া চাহিল।

—"তুই না ব্যাটাছেলে, এতো দুঃখ কিসের। বিয়ে করে ঘর সংসার কর।"

—"ইচ্ছে থাকলেও বোধ হয় আর পারব না।"

কমলা কহিল—"কিন্তু তোর একথা ঠিক নয়, তোকে বিয়ে করতেই হবে।"

সুরথ একটু চুপ করিয়া কি যেন চিন্তা করিল, পরে কহিল,—"এতে তুই সুখী হবি?"

"খু-উব।" কমলা হাসিয়া কহিল,—"খুব সুখী হব। বেশ টুকটুকে দেখে এক লক্ষ্মী বৌ আনবি—আমার মত নয় কিন্তু, তবে আমার কথাই মনে কেবল হবে। আমার জীবন নয় গেছেই—তোর সংসার দেখেই সুখী হব।"

সুরথ কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা কহিল,—"আমার কথা ভাবছিস। ওতো বেশ সোজা। বুড়া স্বামীর বাতে কেবল তেল মালিশ করব!"

কমলা হাসিল। সুরথের গায়ে নিজেকে এলাইয়া দিয়া কহিল,—"তুই কি বলিস সুরথ! এ সত্যি নয়।"

সুরথের সবল শরীরের পাশে অথর্ব্ব অক্ষয়ের অশক্ত দেহের কল্পনা করিয়া কমলা যেন আরও জ্বলিয়া গেল। ঐ লোল চর্ম্মসার দেহের রোগের সেবা করিতে করিতে অচিরেই হয়ত তাহার সিঁথির সিন্দুর নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাহার পর রহিবে শুধু—যে টাকা নিয়ে এতো বাছবিছার—সেই টাকা। সেই টাকার তদারকে তাহার বাকী জীবনটুকু কাটাইতে হইবে—ভবিষ্যতের কোন আশা নাই—এইতো তাহার জীবন! তাহার সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সুরথের সংসার যাত্রা এখন আরম্ভ হয় নাই। তাহার জীবনকে ব্যথার তীর হানিয়া এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিবার কমলার কোন অধিকার নাই! সুরথের জীবন সুখ-আনন্দে ফেনাইয়া উঠুক, ইহাই সে চায়, এ কামনাই সে চিরদিন করিতেছে।

ভোরের দিকে আকাশ কাটিয়া অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে; মনে হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে আর বৃষ্টি হইবে না।

কমলা অক্ষয়কে কহিল—"চল।"

—"কোথায় মেজবৌ!"

—"আমাদের ঘরে—আমাদের বাড়ীতে।"

অক্ষয় হাঁ করিয়া রহিল, কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছে না।

দীননাথ তামাক খাইতেছিল। কমলা আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"বাবা চললাম।"

—"কোথায় মা।"

—"কেন আমাদের বাড়ী।"

দীননাথ সরাসরি কোন প্রতিবাদ করিল না, কহিল,—"আজ বিকালে গেলে হত না, কি বল বাবাজী।"

কিন্তু অক্ষয় কোন কথা কহিবার আগেই কমলা কহিল,—"না, এক্ষুনি যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ দীননাথ চুপ করিয়া রহিল। কমলার খেয়াল তাহার অজানা নয়। প্রতিবাদে কোন কাজ হইবে না, ইহা সে জানে, শুধু কহিল,—"তোর মর্জ্জি আমি বুঝিনে, তবে বুড়ো বাপকে মাঝে মাঝে দেখে যাস মা।"

অশ্রুপ্রবাহে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল।

---

# ভারতের আদমসুমারি

( ৬১৪ পৃষ্ঠার পর )

বর্দ্ধমানে কত লোক চাকরি করে, কত লোক ব্যবসা করে, কত লোক বেকার তাহা বাহির করা দরকার। যন্ত্রটির পক্ষে এসকল সংবাদ হিসাব করিয় দেওয়া মাত্র দুই বা তিন ঘণ্টার কাজ। বাঙলায় কোন্ জেলায় কত হিন্দু, কত মুসলমান, কত খৃষ্টান, কত শিখ এবং কত বৌদ্ধ আছে তাহা জানিতেও সামান্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের মাত্র প্রয়োজন। কত সময়? একটি একটি করিয়া দ্রুতবেগ কার্ডগুলি হাতে উঠাইয়া লইতে যত সময়ের প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধেক সময়।

একবার এই কার্ড প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তাহা এই যন্ত্রে ফেলিয়া কতপ্রকার তথ্য প্রকাশ করা যায় তাহা সাধারণত আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু হিসাব করিতে পারি। এক হইতে আশি পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি পর পর লিখিয়া প্রতি দুইটি সংখ্যার মধ্যে গুণ চিহ্ন দিলে যে অঙ্ক হয় সেই অঙ্ককে কষিলে যত হয় তত প্রকার হিসাব আমরা এই কার্ডের সাহায্যে করিতে পারি। যথা:—১×২×৩×৪×৫.........৭৯×৮০= ইত্যাদি।

ফলে অভ্রান্ত হিসাব প্রস্তুত করিলেও সামান্য দুই একটি ভুল হইতে পারে। অনেকে হয়তো গণনাকারীর নিকট কোন কোন কথা গোপন করিবে বা কোন কোন কথা অসত্য বলিবে। অবশ্য বিশেষ কারণ থাকিলেই লোকে এসব করিবে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সে স্থলে সামান্য কয়েকটি 'কার্ডে' সাধারণ দুই একটি ভুল থাকিবে এবং সে ভুল অতি তুচ্ছ। বিগত গণনায় যে সকল ভুল দেখা গিয়াছে তাহা দুঃসহ, যথা:—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার আট নয় লক্ষ লোকের মধ্যে একজনও নাকি কোনও বিদেশীয় ভাষা জানে না, গণনার হিসাবে এরূপ প্রকাশ। অথচ সকলেই জানেন যে, একটি মহকুমায় যতগুলি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা ইংরেজী জানেন, থানার কর্ম্মচারী, স্কুল মাষ্টার ও ছাত্র, রেলের কর্ম্মচারী, ডাক্তার—ইঁহারাও ইংরেজী জানেন। এতদ্ব্যতীত কিশোরগঞ্জ মহকুমার হাজার হাজার লোক ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে।

এবার আর যাহাতে এসকল দারুণ ভুল না হয়, তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

# ভারতের কৃষক ও শ্রমিক

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

( ক )

মানুষের অশন, বসন, বিলাস ও প্রয়োজনের বস্তু যোগাইতেছে কৃষক ও শ্রমিক। ইহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই যাহার যেটি দরকার সে সেটি পাইতেছে। পৃথিবীতে যে কিছু ধন উৎপন্ন হইতেছে, যে সম্পত্তি সঞ্চিত হইতেছে, তাহার সকলের মূলে আছে কৃষক ও শ্রমিকের পরিশ্রম।

সভ্যতার যখন বিকাশ হয় নাই, তখন শ্রমবিভাগও হয় নাই। মানুষ পশু শিকার করিয়া ও বনের ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। প্রত্যেককেই আহার সন্ধানে যত্নবান হইতে হইত। একে অপরের আহার যোগাইত না, কেহ বসিয়া থাকিলে খাইতে পাইত না। ক্রমে মানুষ অস্ত্রের ও আগুনের ব্যবহার শিখিল; লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়া জমি চাষ করিতে লাগিল। বন্য পশুদের মধ্যে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতিকে পোষ মানাইয়া নিজের কাজে লাগাইতে লাগিল। তখনও মানুষ এক গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শিখে নাই। কিছুকাল একস্থানে বাস করিবার পর যখন গবাদি পশুর খাবার দুর্লভ হইয়া উঠিত, অথবা চাষ করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত না, তখন তাহারা সেই অঞ্চল ছাড়িয়া অন্য অঞ্চলে যাইয়া বাস স্থাপন করিত।

তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই। জমিজমা, গরু-বাছুর সমস্তই ছিল দলের। দুধ, পশম, ফসল যাহা কিছু হইত, তাহাতে দলগত সকলেরই সমান অধিকার ছিল। পাথরের অস্ত্র ছাড়িয়া মানুষ যখন লোহার অস্ত্র তৈয়ারী করিতে শিখিল, তখন হইতে ঐ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। যাহার গায়ে বেশী জোর, যে অস্ত্র চালনায় বেশী কৌশলী, সে দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল। একদল অপর দলকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিতে পারিলে, শত্রুদের মধ্যে বহু ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিত এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিত। এইরূপে দাস ও প্রভুর মধ্যে অবস্থার পার্থক্য ঘটিল। দাসদিগকে গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে দেওয়া হইত।

দলস্থ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে ক্রমে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হইল। প্রথম শ্রমবিভাগ হয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে। পুরুষ পশু শিকার করিত; শত্রুদের হাত হইতে দলস্থ শিশু ও নারীকে রক্ষা করিত; আর নারী গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত ও ফলমূল আহরণ করিত। অনেকের মতে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত করে নারী প্রথম। আহার প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেওয়া নারীর কর্ত্তব্য ছিল। সুতরাং আহার্য্য বস্তুর সংগ্রহের চেষ্টায় নারীর পক্ষে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করা বিচিত্র নহে।

সভ্যতার আরও কিছু বিকাশ হইলে কৃষিকার্য্যের ভার পুরুষেরাই গ্রহণ করিল। নারীকে শিশুপালন ও গৃহস্থালির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম প্রত্যেক গৃহকর্ত্তাকে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সংগ্রহ করিতে হইত। এখন যেমন কৃষক শস্য উৎপাদন করে, কুমার হাঁড়ি তৈয়ারী করে, ছুতার আসবাবপত্র তৈয়ারী করে, দরজী জামা সেলাই করে, মাষ্টার ছাত্র পড়ায়, সেকালে এরূপ শ্রমবিভাগ ছিল না। একই ব্যক্তিকে এ সমস্ত কাজই করিতে হইত। কিছুকাল পরে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কার্য্যভার গ্রহণ করিল। তাহার ফলে প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ কাজে নিপুণতা লাভ করিল। এক কাজ বহুদিন ধরিয়া করিলে তাহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কাজ করিতে করিতে অনেকটা স্বভাববশেই বিনা চেষ্টায় কাজ হইয়া থাকে।

সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে দল বা গোত্রের সকল লোকের মধ্যে সমান ভাগে জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজের নিজের জমি চাষ করিত। কিন্তু দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা বেশী জমি পাইত। এই সকল দলনায়ক নিজেরা জমি চাষ না করিয়া অপরকে দিয়া চাষ করাইতে আরম্ভ করিল এবং নিজেরা যুদ্ধবিগ্রহে সময় অতিবাহিত করিত। একজন বড়লোকের বা শক্তিমান লোকের আশ্রয় না পাইলে জমিজমা ও ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হয় দেখিয়া দুর্বল কৃষকেরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য স্বীকার করিল। শক্তিমান্ লোকেরা আবার অপর দলের বা গোষ্ঠীর লোকদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের জমি নিজেদের অনুগত লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কৃষক জমির মালিক হইতে রায়তে পরিণত হইল।

শ্রমবিভাগ হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না রাস্তাঘাটের সুবিধা হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত একস্থানের লোক অপর স্থানের উৎপন্ন জিনিস ক্রয় করিতে পারিত না। যখন গমনাগমনের সুবিধা হইল, তখন একদল লোক এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিল। তাহারা যে দামে জিনিস খরিদ করিত তাহার কিছু বেশী দামে বিক্রয় করিত। এই দলের লোক বণিক নামে অভিহিত হইল।

বণিকেরা যখন দেখিল যে, জিনিসের চাহিদা বাড়িতেছে, তখন তাহারা ঐ জিনিস সরবরাহ করিবার জন্য শিল্পীদের সহিত চুক্তি করিত। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস দিবার জন্য তাহারা শিল্পীকে টাকা দাদন দিত অথবা জিনিস তৈয়ারীর কাঁচামাল সরবরাহ করিত। এতদিন শিল্পী ছিল স্বাধীন। যে কাপড় বুনিয়া বাজারে বিক্রয় করিত, সে যখন খুশি কাপড় বুনিতে পারিত; যে কয়খানি খুশি কাপড় তৈয়ারী করিত, কিন্তু এখন তাহার স্বাধীনতা কিছু কমিয়া গেল। সে এখনও যখন খুশি কাজ করিতে পারিত বটে, কিন্তু সময়মত জিনিস যোগাইবার জন্য নিজের ইচ্ছামত বসিয়া থাকিতে পারিত না।

এই অবস্থার পর যাতায়াতের সুবিধা আরও বাড়িয়া গেল। বণিকেরা দূর দেশে বাণিজ্য করিতে বাহির হইল। অনেক জিনিসের চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল। ঐ সব জিনিস হাতে বা অল্পদামী যন্ত্রে তৈয়ারী করিতে বহু সময় লাগে; তাই নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইতে লাগিল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে সামান্য কয়েকজন লোক অনেক বেশী জিনিস তৈয়ারী করিতে পারে। যাহারা বাণিজ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং যে সকল পরাক্রান্ত ব্যক্তি জমিদারি করিয়া ধনসঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে অগ্রসর হইল। যন্ত্রের দাম বেশী বলিয়া শিল্পীরা যন্ত্র খরিদ করিতে পারিল না। যন্ত্র এক জায়গায় বসান হইল। আর সেই জায়গায় শত শত শিল্পী আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। যাহারা স্বাধীন শিল্পী ছিল, যন্ত্রের যুগে তাহারাই হইল শ্রমিক বা মজুর। তাহারা নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া অপরের দাসত্ব স্বীকার করিল কেন? তাহার কারণ এই যে, যন্ত্রে তৈয়ারী জিনিস হাতে তৈয়ারী জিনিস অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় করা যায়। সেইজন্য কেহ আর বড় একটা হাতে তৈয়ারী জিনিস কিনিতে চাহিল না। জীবিকার অভাবে স্বাধীন শিল্পীরা নিজের নিজের জাত-ব্যবসা ছাড়িয়া দিল। নূতন কলকারখানায় যে তাহারাই আসিয়া কাজ লইল তাহা নহে, অনেক চাষীও বড়লোকের কাছে জমি বিক্রয় করিয়া কলের মজুর হইল।

শিল্পী যখন শ্রমিক হইল, তখন তাহাকে সময়মত

কারখানাতে আসিতে হইল। মালিকের নির্দ্দেশমত তাহাকে কাজ করিতে হয়। সে নিজের খেয়ালমত কোন কাজই করিতে পায় না। যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়। যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে তাহার অনেক সুবিধা হইল। অনেক কঠিন কাজ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে সম্পাদন করা যায়। যে সমস্ত ভারী জিনিস এক জায়গা হইতে অন্য জায়গাতে লইয়া যাওয়া যায় না অথবা উঁচুতে উঠান যায় না, তাহা অনায়াসেই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা যায়। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করিতে যাইয়া শিল্পী অনেকটা যেন যন্ত্রের মতনই হইয়া পড়িল। বড় বড় কলকারখানায় কাহাকেও কোন একটা সম্পূর্ণ জিনিস তৈয়ারী করিতে দেওয়া হয় না। একটি কাজকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করিয়া তাহার একটিমাত্র ক্ষুদ্র অংশ একজনের উপর তৈয়ারী করিবার ভার দেওয়া হয়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ শ্রমিক সেই কার্য্যই করিতে থাকে। কিন্তু কলের সাহায্যে কাজ করিতে হইলে অন্যমনস্ক হওয়া চলে না; নির্ব্বোধের মত কাজ করিলে চলে না। কলের কাজে বুদ্ধির দরকার হয়, তাই কারখানার মজুরেরা নির্ব্বোধ না হইয়া বরং কৃষকদের অপেক্ষা বেশী চটপটে ও বুদ্ধিমান হয়।

( খ )

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে এখনও তিন ভাগের দুইভাগ লোক চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করে। শতকরা আরও বিশ-পঁচিজন লোক কৃষিকর্ম্মের আনুষঙ্গিক কাজ—যেমন গরুর গাড়ী চালান, ফসল ও তরকারি বিক্রয় প্রভৃতি করিয়া অন্নসংস্থান করে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই যখন চাষবাসের সঙ্গে জড়িত, তখন কৃষকদের মঙ্গল ও অমঙ্গলের উপরেই দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। কৃষকদের অবস্থা ভাল হইলে কলকারখানায় তৈয়ারী জিনিসের চাহিদা বাড়ে। ডাক্তার চিকিৎসার জন্য রুগী পায়, উকিল মক্কেল পায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র বাড়ে। কৃষিপ্রধান দেশে আয়ের উৎসই যখন কৃষি, তখন কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হইলে কাহারওই মঙ্গল নাই।

আমাদের দেশের কৃষকেরা কর্ম্মঠ, সহিষ্ণু ও সাধারণত মিতব্যয়ী। পুরুষানুক্রমে কৃষিকর্ম্ম করিয়া ইহারা বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছে। তথাপি আমাদের চাষের অবস্থা অন্যান্য সকল সভ্য দেশের অবস্থা অপেক্ষা অনেক খারাপ। আমাদের দেশে এক একর জমিতে পঞ্চাশ সেরের বেশী তুলা হয় না। আমেরিকাতে সেই জায়গাতে নব্বই সের এবং মিশরে দুই শ সের তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আখের বেলাতেও ঐরূপ। কিউবাতে এক একরে যতটা চিনি উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র জন্মে। জাভাতে কৃষকেরা যত আখ জন্মায়, আমাদের দেশের কৃষকেরা সেই পরিমাণ জমিতে তাহার ছয় ভাগের একভাগও জন্মাইতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকের এইরূপ হীনতার কারণ কি? ইহার জন্য যে কেবলমাত্র কৃষকেরাই দায়ী তাহা নহে, আমাদের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং সরকারের উপযুক্ত সাহায্যের অভাবও এজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। আমাদের চাষের অবনতির একটি প্রধান কারণ হইতেছে সেচের অভাব। ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চাষীকে বসিয়া থাকিতে হয়। সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হইলে তবে ভাল ফসল হয়। আবার অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলে কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। তাহারা কেবলমাত্র ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। বিহারে যতটা জমি চাষ করা হয়, তাহার এক শ ভাগের তেইশ ভাগ মাত্র জমিতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা আছে। আর বার আনারও বেশী জমি ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে।

জলের অভাব ছাড়া উৎপন্ন শস্য রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেও কৃষকের অনেক ক্ষতি হয়, পোকামাকড়, ইঁদুর, কীট, পতঙ্গ এবং বন্য পশু মাঠ হইতে শস্য খাইয়া ফেলে বা নষ্ট করে। ইহাদের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করিবার জন্য জমি বেড়া দিয়া ঘেরা দরকার। রীতিমত পাহারা দেওয়া দরকার এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কীটপতঙ্গ ধ্বংস করা প্রয়োজন। এই সব করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, আমাদের কৃষকদের তাহার একান্তই অভাব। সরকার হইতে কৃষকদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা আমেরিকা, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার এখনও সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কৃষিকর্ম্মের জন্য অর্থ জোগাইবার ভার দেওয়া হইয়াছিল সমবায় ঋণদান সমিতির উপর। ঐ প্রকার সমিতি স্থাপিত হওয়ায় অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিহারে শতকরা মাত্র দুইজন লোক ঐ প্রকার সমিতির সভ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রকমে হ্রাস পাওয়ায় কৃষকেরা সমবায় ঋণদান সমিতির নিকট তাহাদের ধার শোধ দিয়া উঠিতে পারে নাই। উহার ফলে উক্ত সমিতিগুলি তাহাদের আমানতকারীদের আমানত চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে নাই। ইহার ফলে সমবায় সমিতির উপর লোকের আস্থা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বিহার সরকার সমবায় সমিতিকে বিশ লক্ষ টাকা ধার দিয়া তাহাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। আমাদের দেশের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি কৃষিকর্ম্মের জন্য কোনরূপ ধার দেয় না। কয়েক বৎসর হইল যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতেও কৃষির উন্নতির জন্য ধার পাইবার কোন সুবিধা নাই। এই সব কারণে কৃষকদের এখনও মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার লইতে হয়। মহাজনের অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি বিহারের সরকার বাহাদুর সুদের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন। বন্ধকী ঋণের উপর শতকরা নয় টাকা ও অন্যান্য ঋণের উপর শতকরা বার টাকার বেশী বৎসরে কেহ সুদ লইতে পারিবে না। কিন্তু মহাজনেরা এত অল্প সুদে টাকা ধার দিতে চাহিতেছে না। সেইজন্য কৃষকদের মধ্যে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

জমির স্থায়ী উন্নতি করিতে হইলে দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণ পাওয়া কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। ঐরূপ ঋণ পাইলে, সে জমি ঘিরিয়া লইতে পারে, জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিতে পারে, জমির উপর বা কাছে নিজের বসতবাটী তুলিতে পারে। আর অল্প সুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণ পাইলে, সে ভাল বীজ কিনিতে পারে, জমিতে সার দিতে পারে এবং কোন গরু-বাছুর বা হাল লাঙ্গল কিনিতে হইলে তাহা কিনিতে পারে। টাকার অভাবে সে এইসব কিছুই কিনিতে পারিতেছে না।

কৃষি বিভাগ হইতে চাষের উন্নতির জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। প্রাদেশিক সরকার ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় ঐ সকল উন্নতি বর্ণনা করিয়া পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইজন লোকই নিরক্ষর। সুতরাং ঐ সকল উন্নতির কথা তাহারা জানিতে পারিতেছে না। কৃষির উন্নতির জন্য জনশিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

( গ )

এদেশে কলকারখানার বিস্তার হইয়াছে। কাপড়ের কলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী এবং উহা স্থাপিত হয় সবচেয়ে প্রথম। এখন ভারতবর্ষে তিন শ আটানব্বইটি কাপড়ের কল আছে। এবং উহাতে পাঁচ লক্ষ পনের হাজার শ্রমিক কাজ করে। কাপড়ের কলের পরই চটকলের নাম উল্লেখযোগ্য। চটকলগুলি কলিকাতার নিকটে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এক শ

চারটি চটকলে দুই লক্ষ ঊননব্বই হাজার শ্রমিক কাজ করে। কাপড় ও চটের গাঁইট বাঁধার জন্য দুই হাজার পাঁচ শ সাতচল্লিশটি কল আছে এবং উহাতে এক লক্ষ আশি হাজার শ্রমিক কাজ করে। রেলের কারখানা আছে এক শ একাত্তরটি এবং উহাতে এক লক্ষ তের হাজার লোক কাজ করিয়া থাকে। চিনির কলের সংখ্যা গত আট বৎসরে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। ৪০টি কলের জায়গায় এখন এক শ চুয়াত্তরটি কলে চিনি তৈয়ারী হইতেছে এবং ঐ কলগুলিতে তিয়াত্তর হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে। চায়ের বাগিচা আছে নয় শ চুরানব্বইটি। অধিকাংশ চা-বাগানই হইতেছে আসামে ও জলপাইগুড়িতে। ঐ সকল চা-বাগানে ছেষট্টি হাজার মজুর চা উৎপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে। একশটি দিয়াশালাইএর কারখানায় একুশ হাজার শ্রমিক, নয়টি কাগজ তৈয়ারির কারখানায় সাড়ে ছয় হাজার শ্রমিক; চৌষট্টিটি বৈদ্যুতিক জিনিস উৎপাদনের কারখানায় সাড়ে সাত হাজার লোক নিযুক্ত আছে। বড় বড় কলকারখানায় সর্ব্বসাকুল্যে আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় আমাদের দেশের চাষীর কার্য্যকারিতা যেমন কম, তেমনি এদেশের শ্রমিকদেরও কর্ম্মকুশলতা বিদেশীয় শ্রমিকদের তুলনায় খুবেই অল্প। ইহার কয়েকটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত ওদেশের শ্রমিকেরা সুশিক্ষিত আর এখানকার শ্রমিকেরা অজ্ঞ ও নিরক্ষর। বিলাত ও আমেরিকার মজুরদিগকে লিখিত উপদেশ দিলেই তাহারা ঘড়ি ঘণ্টা বাঁধিয়া ঠিকমত কাজ করিতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমিকদিগকে সকল কথাই মুখে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। ওদেশের শ্রমিকেরা গ্রামের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র শিল্প কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। আর আমাদের দেশের খনির ও কলের মজুরেরা ফসল বুনিবার ও কাটিবার সময়ে দেশে চলিয়া যায়। আবার কিছুদিন পরে আসিয়া কলে কাজ করে। এইরূপ করার ফলে তাহারা একাগ্রমনে না পারে কৃষিকর্ম্ম করিতে, না পারে কারখানায় কাজ করিতে। এইজন্য তাহাদের কোন বিষয়েই তৎপরতা বৃদ্ধি পায় নাই।

আমাদের দেশের মজুরদের অপেক্ষাকৃত অল্প নৈপুণ্যের অন্যতম কারণ হইতেছে, আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির অভাব। শ্রমিকদের বেতনের হার অল্প। সেইজন্য কারখানার মালিকেরা আধুনিকতম যন্ত্রপাতি খরিদ করা অপেক্ষা মজুর দিয়া কাজ করানর বেশী পক্ষপাতী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মজুরদের নৈপুণ্য দেহের শক্তি অপেক্ষা যন্ত্রপাতির উন্নতির উপর অধিক নির্ভর করে।

কি বোম্বাই অঞ্চলে, কি কলিকাতা অঞ্চলে শ্রমিকদের বাসস্থানের দুরবস্থা বর্ণনার অতীত। একটি ছোট ঘরে শ্রমিক তাহার স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও গৃহপালিত দুই একটি পশু লইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য মজুরদের বস্তির নোংরামির শেষ নাই। এইরূপ কদর্য্য অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নৈপুণ্য দেখান যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান থাকায়, শ্রমিকেরা দ্বিপ্রহরে খাইবার অবসরের সময় কারখানার নিকটবর্ত্তী কোন হোটেলে সস্তায় টাটকা ও গরম খাবার খাইতে পারে না। তাহারা সকাল বিকাল কাজে যাইবার সময় যে খাবার সঙ্গে লইয়া যায়, দ্বিপ্রহরে সেই বাসী খাবারই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উদর পূরণ করে। অধিকাংশ কারখানাতেই শ্রমিকদের খাইবার জায়গার সুব্যবস্থা নাই। এই সকল প্রতিবন্ধ থাকার দরুণ আমাদের দেশের শ্রমিকেরা পশ্চিম জগতের শ্রমিকের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে পারিতেছে না।

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ভারত সরকার আইন অনুসারে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নর বা নারী দিনে দশ ঘণ্টা বা সপ্তাহে চুয়ান্ন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে বাধ্য হয় না। কিন্তু যদি কারখানাটি এমন হয় যে, বছরে কোন কোন সময় তাহা বন্ধ থাকে, তাহা হইলে মালিকেরা শ্রমিকদিগকে দিনে এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করাইতে পারে। বার বছরের বেশী ও পনের বছরের কম কোন বালক বা বালিকা পাঁচ ঘণ্টার বেশী দিনে কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাদের বয়স পনের বছরের বেশী হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া ধরা হয়। স্ত্রীলোকেরা রাত্রিকালে কাপড়ের কলে কাজ করিতে পারে না। গত বৎসরের জুলাই মাস হইতে খনির নীচে স্ত্রীলোকের কাজ করা বন্ধ হইয়াছে। যেসব কারখানায় কুড়িজন বা তাহার অধিক শ্রমিক কাজ করে এবং যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তিতে কল চালান হয়, সেখানে সরকারী ইনস্পেক্টর যাইয়া দেখিতে পারেন যে, যন্ত্রপাতি ভালভাবে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে কি না—উহাতে শ্রমিকদের কাপড়ে-চোপড়ে আটকাইয়া যাইয়া বিপদের আশঙ্কা আছে কি না—কারখানায় আলো-বাতাস খেলে কি না এবং ঘরগুলি পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখা হয় কি না। যদি কোন কারখানার মালিক এই সকল নিয়ম না মানিয়া চলে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩৫ সালে খনি সম্বন্ধীয় আইনে নিয়ম করা হইয়াছে যে, কোন শ্রমিক সপ্তাহে চুয়ান্ন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে বাধ্য নয়। যদি সে খনির উপরে কাজ করে, তাহা হইলে দিনে দশ ঘণ্টা এবং খনির নীচে কাজ করিলে দিনে নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে বাধ্য নয়। চা-বাগান, কফি ও রবারের ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে একটি আইন করা হইয়াছে। উত্তর বিহার ও গোরক্ষপুর অঞ্চল হইতে কুলী সর্দ্দারেরা প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তিকে আসামের চা-বাগানে লইয়া যায়। তাহারা অনেক সময়ে উহাদিগকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং একবার চা-বাগানে লইয়া গেলে আর সেখান হইতে সহজে আসিতে দেয় না। উহাদের হাত হইতে অজ্ঞ শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে, সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত সর্দ্দার ভিন্ন অন্য কেহ কুলী সরবরাহ করিতে পারিবে না। কোন কুলী তিন বৎসর কাজ করিবার পর বাড়ী আসিতে চাহিলে, তাহাকে বাড়ী আসিবার সুবিধা দিতে হইবে। তাহাকে যদি চা-বাগানের মালিক প্রহার করেন অথবা সে যদি পীড়িত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে দেশে আসিবার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।

১৯৩৬ সালে বেতন-দান-বিধি অনুসারে কোন কলকারখানার মালিক শ্রমিকদের এক মাসের বেশী বেতন বাকী রাখিতে পান না। যদি কোন শ্রমিক কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে উহাকে তাহার বেতন হইতে টাকায় দুই পয়সার বেশী জরিমানা হিসাবে কাটিতে পারিবেন না। জরিমানা হইতে যে টাকা আদায় হইবে, তাহাও শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের একটি আইন অনুসারে কোন শ্রমিক তাহার নিজের বিনা দোষে কারখানার কোন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য কাজ করিতে করিতে যদি এরূপভাবে আহত হয় যে, তাহার আর খাটিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে কারখানার মালিক তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য; আর অনুরূপ ক্ষেত্রে উহার মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারবর্গ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঁয়ত্রিশ শত টাকা পাইবে।

কলকারখানার মালিকেরা অনেক সময়ে শ্রমিকদিগকে অল্প বেতন দিয়া বেশী খাটাইয়া লয়। তাঁহারা যাহাতে শ্রমিকদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিতে পারেন, সেইজন্য শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন নামক শ্রমিক সঙ্ঘে দলবদ্ধ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন

# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

**শ্রীহাসিরাশি দেবী**

২

আধখানা ডাঁটি সমেত ভাঙ্গা ছাতাটাকে হাতে তুলে নিয়ে, বিপিন বাড়ি ছেড়ে, পুকুরপাড়ের পথ বয়ে যে বাড়িটায় এসে উঠল, সে বাড়ি পাকা ইমারত নয়, ইটের দেওয়ালের ওপরে গোলপাতার ছাউনি।

খান দুই ঘর ঠিক পাশাপাশি, এক পাশে তুলসীমঞ্চ, অন্য পাশে গরু রাখবার চালা বাঁশের খোঁটায় ভর করে ঝুলছে। তার ওপরে পুঁই আর দু-একটা কি শাকসবজির মাচা, উঠনের একপাশে গোটাকতক ফলন্ত কলাগাছ আর লঙ্কার চারায় মেশামিশি। এরা সকলে যার স্নেহযত্নে দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হয়, সেই মানুষটি তখন বোধ হয় ঘরের বাসী কাজের পাট শেষ করে, সবেমাত্র স্নানশেষে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

জলপূর্ণ মাজা চকচকে কলসীটি বারান্দার একধারে নামানো। উঠানের খানিকটা জলে ভিজে, জলে ভেজা পায়ের দাগও দেখা যায়; আর দেখা যায় গৃহকর্ত্রীর নিরাভরণ দেহে ভিজে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে ওঠা তার গত যৌবনের অনুজ্জ্বল শ্রী, যা আজও তার দেহ থেকে নিশ্চিহ্নে মুছে যায় নি।

লোকে ডাকে মানিকের মা বলে, কিন্তু নাম ওর সৌদামিনী।

সৌদামিনী বিপিনকে দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। চুল ঝাড়া স্থগিত রেখে, গায়ে মাথায় কাপড় টানতে টানতে বললে, "আদুর বাপ যে, কি মনে করে?"

"মনে? —মনে কিছু না থাকলে কি আর আসতে নেই মানিকের মা?" বলতে বলতে বিপিন বারান্দায় উঠে একখানা জলচৌকি টেনে নিয়ে বসল। একটু হেসে সৌদামিনী বললে, "আসতে নেই কে বলেছে গা? মানুষেরই বাড়ি তো মানুষ এসে থাকে; তা নয়তো আসবে যাবে কি জন্তু-জানোয়ারের ঘরে? কথাতেই আছে—

এলে গেলে মানুষের কুটুম,
চাটলে চুটলে গরুর কুটুম।"

বিপিন দুঃখের সঙ্গে জানালে, "সে কথা আর বল কেন মানিকের মা; মানুষ তো সব সময়ে সব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। আর মানুষেরই বা দোষ দিই কেন, সংসারেরই দোষ! সংসারের নানা অভাব-অনটনের সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে মনুষ ভাবে—নিজের জ্বালাতেই একে অস্থির, এর মধ্যে বুঝি আবার পরের দুঃখেরও ভাগ নিতে হয়! তাই তো আপত্তি।"

বলে বিপিন একটু থামল; দেখল, সৌদামিনীর মুখে-চোখে হাসির ইঙ্গিত ভেসে উঠেছে; সে বারান্দায় উঠে কাপড় ছাড়তে ঘরে চলে গেল। খানিক পরে এল ভিজে কাপড়খানাকে হাতের ওপর ফেলে। বললে, "বস আদুর বাপ, আমি হাতের কাজ কয়টা সেরে ফেলি। আর বেলাও তো হল বড় কম নয়,—উঠনের মাঝখানে রোদ্দুর এসে পড়েছে, বেলা যেতে কতক্ষণ!"

বলতে বলতে সে উঠনের এক পাশে খাটানো বাঁশের আলনায় কাপড় মেলে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

কাঠ জেলে, রান্না চড়িয়ে যখন ফিরল, তখন বিপিন হুঁকো-তামাকের সদ্‌ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। মুখ তুলে বললে, "এত বেলা হল যে আজ?"

"আর বল কেন? গেরস্ত ঘরের কাজ তো আর অল্প নয়,—হাতের কাজ টেনে নিয়ে করবারও দোসর নেই। এক হাতেই সব সারিতে হবে তো? তাই তো বলছি, সেই সূর্য্যি উঠতে যে কাজে হাত দিয়েছি, বেলা গড়িয়ে এল, এখনও পর্য্যন্ত বিরাম বিশ্রাম নেই।"

হাসিমুখে বিপিন বললে, "তা বটে। কিন্তু ছেলেও তো তোমার নেহাত ছোটটি নেই মানিকের মা। বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে; বিয়ে দিয়ে দিব্যি ডাগর-ডোগর বউটি আনলেই তো তোমার কাজের দোসর জোটে, এক হাতে সব কাজ করবার দরকার হয় না। চাই কি, বসেও দুটি রান্না ভাত খেতে পার।"

সৌদামিনীর উজ্জ্বল মুখখানায় চকিতের জন্য যেন একখানা কালো ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। অনেকদিন আগে এই বিপিনের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে গ্রামের লোকের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও সে বদনাম একেবারে গ্রামের বুক থেকে নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে যায় নি বলেই সৌদামিনী হঠাৎ বলে ফেললে, "কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে শুনি? তাই বলছি, মুখে বলাই সহজ, কাজে কি আর সহজ?"

"আর আমি যদি আমার আদুকে তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিই মানিকের মা?"

"আদুকে?"

সৌদামিনী হঠাৎ যেন নিজেকে বিশ্বাস করলে না; তাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে বিপিনের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। পরে বললে, "কি বলছ তুমি?"

"বলছি ঠিকই। কেন, বিশ্বাস হয় না আমার কথায় যে, আমি আমার আদুকে ইচ্ছে করলেই তোমাকে দিয়ে দিতে পারি?"

বিপিন মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সৌদামিনী আবার খানিকটা চুপ করে রইল; পরে বললে, "কিন্তু তার পিসীর যদি তাতে মত না থাকে?"

বিপিন এবার হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আরে, মেয়ে হল আমার, তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে আমাকে যতখানি ভাবতে হবে, ততখানি ভাববে কি আর পরে?"

সৌদামিনী বললে, "কিন্তু তার নিজের পিসী, তোমার নিজের ছোট বোন তো আর পর নয় তার! আর বিশেষ করে মা মরার পর থেকে সেই-ই যখন ওকে বুকে করে এত বড়টা করে তুলেছে—তখন তাঁর কথাই বা তুমি ঠেলবে কেমন করে?"

"তোমাকে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না, আমার ভাবনা আমার কাছে। তাই নিয়ে অপরের ঢালাপেঁচা করা আমার সয় না। তাই বলছি, সে ভাবনা আমার! আমার মেয়ের

ভবিষ্যতের উপায় করতে যেটুকু ভাল মনে করব, সেটুকু কারও কথাতেই আমি করতে ভুলব না, ভোলবার মানুষ আমি নই। এখন কথা হচ্ছে, তাকে তুমি মানিকের বউ বলে ঘরে নিতে রাজী আছ কি না?"

একটু বিমনাভাবে সৌদামিনী বললে, "আমার আবার রাজী অরাজী। কোনওকালে যা করিনি, আজ সেই কথা তুলে ঠাট্টা মস্করা তুমি করতে পার আদুর বাপ, কিন্তু আমি পারি নে।"

"বটে!"

বিপিনের মুখে চোখে কথায় বার্ত্তায় যেটুকু কঠিনতার আভাস এসে পড়েছিল, সৌদামিনীর এই কথায় যেন আর তার ছায়াও কোথাও রইল না। ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি তার যেন আরও উজ্জ্বল, আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর হাতের হুঁকোটা মুখে তুলে পর পর আর গোটাকতক টান দিয়ে বললে, "হুঁ।"

সৌদামিনী উঠে গেল রান্না দেখতে। একটু পরে ফিরে এসে দেখলে বিপিন তখনও তেমনিভাবে বসে হাতের হুঁকোয় টানের পর টান দিয়ে চলেছে ঘন ঘন। সৌদামিনী বললে, "বসে বসে যে এখনও তামাক খাচ্ছ, আজ আর খাওয়া-দাওয়া করবে না বুঝি?"

মুখ তুলে বিপিন বললে, "বেঁচেই যখন আছি, তখন ওটাকে বাদ দিলে চলে কই। কিন্তু করি কোথায়? বাড়ি গিয়ে হয়তো দেখব, মেয়েতে আর মেয়ের পিসীতে চুলোচুলি বাধিয়েছে, হাঁড়ি হেঁসেল বন্ধ।"

"তবে এইখানেই একটা ডুব দিয়ে এসে না হয় চারটি খেয়ে নাও।"

"না, না; তা হলে ওরা বড় ভাববে, বরঞ্চ সেটা অন্যদিন হবে মানিকের মা, আজ থাক।"

সৌদামিনীর মুখে কৌতুকের হাসি ভেসে উঠল। বললে, "থাকবে কেন, আজই যা হয় হ'ক, আমি নয় ওদের বলে আসছি।"

বিপিন কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিপন্ন দৃষ্টিতে, তারপরে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে নিতান্ত অসংলগ্ন উত্তর দিলে। —"তোমার সব তাতেই ঠাট্টা মানিকের মা।"

সৌদামিনী হাসি চেপে বললে, "মরণ আর কি! ঠাট্টা-তামাশা করতে যাব আমি? তোমার সঙ্গে? কি যে বল আদুর বাপ! লোকেই বা এসব কথা শুনলে বলবে কি বল দিকি?"

বিপিন এবার সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। একবার চারিদিকে তাকিয়ে, হাতের হুঁকোটা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। বললে, "না মানিকের মা, সত্যিই বেলাটা অনেক বেড়ে গেছে। এর পর চান করতে হবে, খেতে হবে, আজ আর তোমার কথা রাখতে পারব না। পারি তো পরে আবার একদিন আসব তোমার নেমতন্ন রাখতে।"

বিপিন উঠে ভাঙ্গা ছাতাটাকে তুলে নিয়ে এগুলো বাড়ির দিকে। কিন্তু দুই এক পা এগিয়েই ফিরল তখনই। বললে, "দেখেছ মানিকের মা, মেয়ের কাণ্ডখানা?"

বলে ভাঙ্গা ছাতাটা তুলে দেখিয়ে বললে, "এই দেখ তার সাক্ষী, আস্ত ছাতিটা দুখানা করে রেখেছে। সাধে বলছি ওর ভার তুমি নিজের হাতে তুলে নাও মানিকের মা, আমি বাঁচি। দিনরাত্তির ঘরের দৌরাত্ম্যি আর পরের কথার জ্বালা থেকে রেহাই পাই।"

বিপিন যেন বড় আশা করেই তাকাল সৌদামিনীর দিকে। কিন্তু সৌদামিনীকে এ বিষয়ে একেবারে নিৰ্ব্বাক থাকতে দেখে আবার বাড়ির পথ ধরল।

ডাইনে বাঁয়ে বাগান, ঝোপ, জঙ্গল পিছনে ফেলে পুকুরের পাড়ের পথ বয়ে বরাবর যখন নিজের বাড়ি এসে পোঁছল, তখন সত্যই একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্রের পর পরিশ্রান্ত পিসী-ভাইঝি আহারে বসেছে।

বিপিনকে বাড়ি ঢুকতে দেখে খেতে খেতেই অন্নদা মুখ বাড়িয়ে বললে, "ঐ দরজার পাশেই তেলের বাটিটা রয়েছে দাদা, মেখে ডুব দিয়ে এস, আমার খাওয়া হয়ে এল বলে।"

সে কথার জবাব না দিয়ে বিপিন বললে, "আজও তোদের এত বেলা গেল যে খেতে? আবার কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিলি বুঝি?"

অন্নদা উত্তরে দিল, "না, গুঁড়ো কয়লার কাঁড়ি জমে উঠেছিল মণ দুই, সেগুলোর গুল দিতে দিতে বেলা গেল। তুমি চান করে এস।"

বিপিন শুষ্ক মুখে বললে, "আমার জন্যে তোর তাড়াতাড়ি করতে হবে না অন্ন; আমি আজ চান করব না, খিদেও নেই তেমন; যা হ'ক আর যখন হ'ক দুটো মুখে দিলেই চলবে এখন।"

ব'লে সে তামাক সাজতে বসল। মুখ ফিরিয়ে আদু একবার আড় চোখে বাপকে দেখে নিলে।

খেতে খেতে আস্তে আস্তে বললে, "কি ছাইএর রান্নাই হয়েছে! কোনওটায় নুন বেশী, কোনওটায় বা ঝালে পোড়া; কোনওটাই মুখে তোলবার উপায় নেই যেন।"

মৃদু অথচ তিক্ত স্বরে অন্নদা উত্তর দিলে, "না খাস, উঠে যা; গিলতে হবে না তোর। তোর মুখের মত রান্না করতে শিখি নি, শিখবও না কোনও কালে। ইচ্ছে হয় তুই নিজে রাঁধিস, বয়স তো বাড়ছে; সংসার চালাবারও সময় হয়েছে ঢের। বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিনে হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে প্রাণ যেত, এখন পরের রান্নার খুঁত ধরতে লজ্জা করে না তোর?"

আদু আর কথা কইলে না, তিনচার গ্রাসে পাত থেকে ভাত তরকারি নিশ্চিহ্ন ক'রে উঠে পড়ল। অন্নদা বললে, "এখুনি তো পাড়া বেড়াতে বার হবে, তার আগে একখানা আসন পেতে জল দিয়ে একখানা ঠাঁই ক'রে দিয়ে বার হও যে চুলোয় হয়। আবার সন্ধ্যে হ'লে বাড়ি ফিরো পাড়া বেড়ানো শেষ ক'রে। কিছু বলব না আমি, কোনও কৈফিয়ৎ চাইব না তোমার কাজের।"

আদু কানও জবাব দিলে না; নীরবে বিপিনের খাবার জায়গা করে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। (ক্রমশ)

# রাশিয়ার নারীশক্তি

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রমাণ করে যে সব রাশিয়ান মেয়েরা সার্থক করেছে তাদের শিক্ষা ও নবলব্ধ স্বাধীনতা তাদের সংখ্যা স্বল্প নয়। কঠিন কঠিন শ্রমসাধ্য কাজেও তারা বিজয়িনী হয়েছে। কেউ বা ডুবুরীর পোশাকে নিমগ্ন হয়েছে সমুদ্রের তলায় রহস্যের সন্ধানে, কেউ গিয়েছে তুষারাবৃত মেরু প্রদেশে নূতন তথ্য জানতে, কেউ করেছে তুলার চাষ—কেউ চালিয়েছে এক্সপ্রেস ট্রেন, কেউ বা পড়েছে প্যারাসুট হাতে লাফিয়ে নির্ভয়ে। সৈন্যাধ্যক্ষ জাহাজের কাপ্তেন, এরোপ্লেন চালক, খবরের কাগজের সম্পাদক, বড় বড় সরকারী চাকরি, সব ক্ষেত্রেই তারা কাজ করেছে দক্ষতার সঙ্গে। এমন কোনো কর্ম্মক্ষেত্র

রাশিয়ার নারী সৈনিক

নেই যেখানে না মেয়েরা আপন শক্তিতে অধিকার লাভ করেছে, কারণ সাম্যবাদী সোভিয়েট রাজ্যেও পূর্ব্বে সংস্কার বশত মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে রাখবার একটা ইচ্ছা অনেকেরই মধ্যে ছিল। অনেকেই মনে করতেন যে এমন বহু কাজ আছে যেগুলি মেয়েদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব ও স্বাস্থ্যকর নয়। তাই আইনত কোনো বাধা না থাকলেও অনেক কাজেই মেয়েদের প্রবেশ অনায়াসে ঘটেনি। অনেক বাধা লঙ্ঘন করতে হয়েছে নবযুগের কর্ম্মী নারীদের। পুরানো সংস্কারের অমূলকতা আজ ভালভাবেই তাঁরা প্রমাণ করেছেন। যে সব শক্তিমতী বীরনারীরা পুরানো সংস্কার ছিন্ন করে এমন সব কাজের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছেন যেখানে স্ত্রীজাতির প্রবেশ পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল, তাঁরা অধিকাংশই গ্রাম্য চাষী ও শ্রমিকের ঘরের মেয়ে।

অল্গা কোমোভা (Olga Komova) হলেন প্রথম মেরু যাত্রিনী। দীর্ঘদিন তিনি আবহাওয়াতত্ত্ব Chukchi জাতের ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে অনেক বাধা অনেক নিষেধ সত্ত্বেও তিনি শীতকালে সমস্ত লোকসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মেরু প্রদেশে বহুদিন বাস করেন। প্রথম যেবার মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন সেবার বরফের খণ্ডে লেগে তাঁদের জাহাজ ভেঙ্গে যায় ও তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হয়, তা সত্ত্বেও নিরুদ্যম না হয়ে তিনি বহুবার সে পথে গিয়েছেন। আজ শত শত মেয়ে যাচ্ছে মেরু প্রদেশের তুষারাবৃত পথে।

প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকের পদ লাভ করেন এলিজাবেথ (Elisabeth Kuyuetsova)। মেয়েদের নাবিক হওয়া কিছু নিষিদ্ধ ব্যাপার নয় আইন অনুসারে, কিন্তু কখনো কেউ মনেই করতে পারত না যে মেয়েরাও নাবিকের কাজ করতে চাইবে এবং পারবে। এলিজাবেথের ছিল সমুদ্র যাত্রার প্রচণ্ড শখ—তিনি ছোট ছোট করে চুল ছেঁটে নাবিকের পোশাক পরে কাপ্তেনের কাছে পদপ্রার্থিনী হয়ে গেলেন। কাপ্তেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল খুবই, আপত্তিও করেছিল অনেক রকম, কিন্তু এমন কোনো নিয়ম ছিল না যাতে সবরকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র স্ত্রীজাতীয়া বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা যায়। আজ এলিজাবেথ কাপ্তেনের পদ লাভ করেছেন। তাঁর চালিত জাহাজ ভাসছে বিদেশের সমুদ্রেও। প্রথম এক্সপ্রেস ট্রেন চালক জিনাইদাকেও (Zinaida Froitskaya) অনেক বাধা লঙ্ঘন করতে হয়। রেলওয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে সসম্মানে পাস করেও তাঁকে সামান্য

মেকানিকের কাজ করতে হয়। অনেকবার চেষ্টা করেও কোনো সুবিধে না পেয়ে তিনি আবার স্কুলে গিয়ে ইঞ্জিন চালকের সাহায্যকারীর পদ পাবার জন্য একটি পরীক্ষা পাস করলেন। তারপর বহুদিন তিনি ট্রেন চালকের সাহায্যকারী ছিলেন। একবার একলা চালাবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করায় তাঁকে এ কাজ থেকে বিদায় করবার চেষ্টা হয়। এই সময় তিনি রেলওয়ে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর সহানুভূতি ও সাহায্যে নিজের অভীষ্ট লাভ করেন। অবশেষে তিনি একা এক্সপ্রেস ট্রেন পর্য্যন্ত চালাতে লাগলেন। আজ বহু মেয়েই এ কাজ করছে। প্রথম পাইলট ছিলেন যুদ্ধের জাহাজে Paulina Osipenko। আজ মেয়ে এরোপ্লেনচালকের সংখ্যা অল্প নয়।

এ ছাড়া কৃষিশিক্ষা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা পাস করে ট্রাক্টর চালিয়ে দলে দলে মেয়ে কৃষিকার্য্যে উন্নতি করছে নানা উপায়ে। সব প্রথম মারিয়া (Maria Dem Chenko) আখের চাষে আশ্চর্য্য উন্নতি করায় তার দৃষ্টান্তে আরও অনেক মেয়ে দলবদ্ধভাবে আখের চাষ করে অভাবনীয় রকম ফসল ফলাতে শুরু করেছেন। অনেকে নিযুক্ত হচ্ছে বেতার পরিচালনার কাজে, আবহাওয়া নির্দ্দেশের কাজে। এমনি করে অল্পদিনের মধ্যে সব রকম কাজেই মেয়েদের প্রবেশ একটা সহজ ঘটনা হয়ে উঠেছে। যখন কোনও মেয়ে যুদ্ধ-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন বা রেলওয়েতে কোন উচ্চ পদ পান, কেউ মনেই করে না যে একটা অঘটন কিছু ঘটেছে।

প্রাচ্য সোভিয়েট রাজ্যেও মুসলমান মেয়েরা পর্য্যন্ত পেয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, যদিও সেখানেই সবচেয়ে বেশী কুসংস্কার ও গোঁড়ামি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মানুষের বুদ্ধি, জড় করে রেখেছিল তাদের কর্ম্মক্ষমতা। মুসলমান রাজ্যে অবগুণ্ঠিত মেয়েরা যে অবরোধ ও পরাধীনতার মধ্যে সর্ব্বদা সব রকমে বন্দিনী হয়েছিল, সেখান থেকে তাদের আজকের এই সম্পূর্ণ মুক্তি একটা সহজ ঘটনা নয়। বহুদিন থেকে একটা প্রবাদ বা পরিহাস বাক্য চলতি ছিল যে, যদি পরামর্শ নেবার মত কোনো পুরুষ কাছাকাছি না থাকে তাহলে স্ত্রীর পরামর্শ নাও ও তার বিপরীতটি কর। যদিও বিপ্লবের পরে মেয়েরা আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আইনত পেল তবুও সমাজে তার ব্যবহার ঘটিয়ে তোলা ত সহজ নয়। অনেক বাধার মধ্যে দিয়েই আজ প্রাচ্য সোভিয়েটের মেয়েরাও নূতন নূতন কাজে নিজেদের শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে খুব ভাল-ভাবেই। ব্যবসায়ে, কৃষিকার্য্যে, শিক্ষা বিস্তারে, সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে এরোপ্লেন চালনায় সর্ব্বত্রই Wzbek প্রভৃতি স্থানের মেয়েরা খুবই দক্ষতা দেখাচ্ছে। অভিনেত্রী হালিমা অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছেন অথচ বহু দুঃখ ও অত্যাচারে নিপীড়িত ছিল তার বন্দিনী মায়ের জীবন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যেই হালিমা সমস্ত শিক্ষা লাভ করে।

এক দরিদ্র জেলের মেয়ে বাল্টা Turkman Soviat Socialist Republic-এ প্রধানা কর্ত্রী। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়—তাঁর স্বামী তাঁকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখতেন পাছে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন চলেছে তা চঞ্চল করে তোলে তাঁর বন্দিনী স্ত্রীকে। একদিন চুপি চুপি বাল্টা পালিয়ে এলো শহরে—শিক্ষয়িত্রীর কাজ শেখবার জন্য স্কুলে ভর্ত্তি হল—আইন তার পক্ষে ছিল, স্বামী সাহস করলে না বিরুদ্ধতা করতে। রাষ্ট্র থেকে সব রকম সাহায্য পেয়ে ক্রমে তিনি গ্রাজুয়েট হলেন। এই রকমে হাজার হাজার মেয়ে পেয়েছে শুধু স্বাধীনতা বা শিক্ষা নয়, সেই স্বাধীনতা বা শিক্ষাকে সার্থক করবার প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র। সব রকম পুরুষোচিত খেলাতেও রাশিয়ান মেয়েরা কৌশলী হয়েছে, আনন্দ পাচ্ছে নানারকম কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে। সোভিয়েট ইউনিয়ন-এ ৩০ লক্ষ খেলোয়াড় মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সাঁতার, পাহাড় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া, হকি খেলা সব ব্যাপারেই তাদের উৎসাহ ও দক্ষতা প্রচুর, এ ছাড়া মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুমঙ্গল ইত্যাদির জন্য বহু অর্থ রাষ্ট্রকোষ থেকে ব্যয় হয়। তার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজধানীর তেইশভাগের একভাগ মস্কোর Pervomaisky ডিস্ট্রিক্ট ধরা যেতে পারে, ঐ স্থানের লোকসংখ্যা ১৪০,০০০ এবং ১৯৪০ সালের বাজেটে ঐ স্থানে ১৬,৭৪২,০০০ রুবেল খরচ হবে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ও ৭,১৬৭,-০০০ খরচ হবে শিক্ষার জন্য ২৭,৯৮২,০০ রুবেলের মধ্যে। প্রত্যেক ভাবী মা প্রথম মাস থেকেই সবরকম যত্ন, প্রয়োজনীয় ওষুধ পথ্য, ডাক্তারের ব্যবস্থা প্রভৃতি সাহায্য ভালভাবে পায়। প্রত্যেকেই এক মাসের শিশুকে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে মানুষ করবার জন্য দিতে পারে—যদিও অবশ্য যাদের মায়েরা কোনও কাজে, পড়াশুনায় বা বৃহৎপরিবারের ভারে আবদ্ধ হয়ে আছে তাদের সন্তানেরাই প্রথমে স্থান পায়। এই বৎসরের আরম্ভে এই ডিসট্রিক্ট-এ ১৬টি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ১৪০০ শিশুর ব্যবস্থা ছিল; আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান এ বছর তৈরী হবে। এখানে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের রাখা হয়। ঐ ডিসট্রিক্ট-এ হাসপাতাল, ঔষধালয়, নার্সিং হোম প্রভৃতি স্থানে ৩,০০০ লোক কাজ করে। বিদেশী সংবাদপত্র থেকে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করলাম। আমাদের দেশের মেয়েদের আজ যে অবস্থা ঐ বৃহৎ স্বাধীন দেশের মেয়েরা মাত্র ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক সেই রকম অবস্থাতেই ছিল। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বুদ্ধি অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জড় তাদের কর্ম্মশক্তি। কিন্তু এই স্বল্পদিনের মধ্যে তারা কি করে এমন আশ্চর্য্যভাবে সুশিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম হয়ে উঠল যারা অর্থে সামর্থ্যে বুদ্ধিতে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না এই অধীন দেশের অধীনতম মেয়েদের চেয়ে।

# বুদ্‌বুদ

( চিত্র )

পুলকেশ দে সরকার

দোতলার জানালার একটা পাট খুলিয়া গেল।

...ঝি এয়েচ—য়্যা, ঝি এয়েচ? ও ঝি—ঝি এয়েচ?—ও মেয়ে—কেউ সাড়াশব্দ দিচ্চে না—সাড়াশব্দ দিচ্চে........

জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু কাশির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। বয়স গড়াইয়া সুপ্রাচীনতায় ঠেকিয়াছে—হাঁপানি সুযোগ বুঝিয়া প্রতিনিয়তই গলা টিপিয়া জিভ বাহির করিয়া দিতে চাহে।

বাড়ীর কর্তা।

আবার জানালা খুলিয়া গেল।

...বোমা উঠেচো—বোমা উঠেচো—বোমা?

কেহ জবাব দিল না।

...কলতলায় কে গা—য়্যা কলতলায় কে? ওদের বাড়ীর ঝি বুঝি?—ওদের বাড়ীর—হ্যাঁগা কলতলায় কে?

জবাব হইল, আমাদের ঝি।

...বড্ড সকালে আসে তো—য়্যা, বড্ড সকালে আসে—খুব ভো—রে আসে। আমাদের বোমা ওঠেনি?

না।

কর্তা কাশিতে কাশিতে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সিঁড়ি বাহিয়া একটি ছেলে নামিয়া আসিল।

বন্ধ জানালার ভিতর হইতেই হাঁক আসিতে লাগিল—ন—এই ন—ন—এই ন......

কেন? জবাব দিয়া ছেলেটি মনে মনেই বলিল, এই এলাম ওপর থেকে আর অমনি ন-ন-ন!

আবার ডাক আসিল—ন—এই ন।

ছেলেটি নীচে হইতেই বলিল, বলুন।

এইবার জানালা খুলিয়া গেল।

...কয়লা-টয়লাগুলো ভেঙে রাখ্। ঝি আসে নি? য়্যা—ঝি আসেনি?

না।

...কয়লা-টয়লাগুলো ভেঙে রাখ্। দেখিস চারদিক ছিটোস না যেন—বড্ড মাগ্যি হোয়েছে আজকাল কয়লা—বড্ড মাগ্যি হোয়েছে—এক টুকরো ছিটোস না যেন। গুঁড়োগুলো ঝেঁটিয়ে পোষ্কার কোরে রাখিস—গুল হবে—কয়লা বড্ড মাগ্যি—

জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কয়লা ভাঙিতে লাগিল। ঝি আসিল। ছেলেটি বলিল, দাদামশাই ঝি এসেছে।

জানালা খুলিয়া গেল।

......ঝি এয়েচো—এত দেরি কোরলে কেন, ও মেয়ে—যাকগে আগে রোয়াক ধুয়ে দাও—আগে বাইরের রোয়াকটা ধুয়ে দাও—প্রথমে এসেই রোয়াকটা ধুয়ে দেবে, বোঝো? আগে রোয়াকটা ভাল কোরে ধুয়ে দাও। —আর অত দেরি কোরো না, দোহাই তোমার বড্ড দেরি কোরেচো আজ......

ঝি জবাব দিল: কি দেরি হোয়েছে, আর এক বাড়ী কাজ সেরে তবে আসতে হোয়েছে, তোমার কেবল দেরিই হয়—

কর্তা প্রতিবাদ জানাইলেন। দেরি হয়নি? দেরি হয়নি তুমি বোলচো?

ঝি বলিল, রোজ যেমন আসি তেমনিই এসেছি।

বোমা বলিল, যাকগে তুমি রোয়াকগুলো ধুয়ে ওপরে এসো।

...বোমা উঠেচো—ছেলেমেয়েরা উঠেচে?

জবাব হইল, ওরা কেউ ওঠেনি।

...উঠলে জামা কাপড় পরিয়ে দিও—বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ—ভীষণ ঠাণ্ডা.........

জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

রোয়াক ইত্যাদি ধুইয়া ঝি চৌবাচ্চা হইতে বালতিতে জল তুলিয়া উপরে গেল। দুই একটি ছেলেপিলে নামিতে লাগিল।

জানালা খুলিয়া গেল।

...বুলু উঠেচে—য়্যা কাতু, বুলু উঠেচে?

না—

...খালি গায়ে বেরোয় না যেন—জামাটা বেশ কোরে গায় দিয়ে বেরোয় যেন—অমনি যেন না বেরোয়।......

কাশিতে কাশিতে কর্তা জানালা ভেজাইয়া দিলেন।

পরক্ষণেই সাইকেল আরোহী এক দুধওয়ালা সশব্দে দরজায় আসিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া বলিল, দুধের জায়গাটা দেবেন। সাড়া না পাইয়া আবার বলিল। ঝি যাইতেছিল, তাহাকে বলিল, ও মেয়ে, দুধের জায়গাটা?

দুধের ঘটিটা পাইয়া হাঁকিল, দুধ দিচ্ছি দেখুন।

জবাব নাই।

আবার বলিল, দুধ দিচ্ছি দেখুন।

য়্যা—দাও দাও, বলিয়া এইবার জানালা খুলিয়া গেল। মাপমত দুধ দেওয়া হইল, কর্তা বলিলেন, দাও দাও আরেকটুকু দাও।

দুধওয়ালা দিল।

কিন্তু কর্তা বলিলেন, যেটুকু দিলে তার আদ্ধেক পড়েই গেল—কি দিলে?

দুধওয়ালা আরেকটুকু দিয়া বলিল, দামটা দেবেন আজ?

কর্তা বলিলেন, আশ্চর্য ঘোষ তুমি, হিন্দুর ছেলে বেস্পতিবার কি কোরে চাইলে? আজ যে বেস্পতিবার—আজ কি কেউ কাউকে—

জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দুধওয়ালা চলিয়া গেল। পরক্ষণেই একটা অস্পষ্ট আহ্বান ধ্বনি কানে গেল। জানালা খুলিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া গেল।

...ন—নু—

কি!

...দোকানে যাবিনে? দোকানে যাবিনে তুই? তুই আজ দোকানে যবিনে জিনিসপত্তর আনতে.....

যাব—দিন না—

...ওরা সব উঠেচে?

উঠেচে

ভাল করে সব জামা-কাপড় গায় দিয়েচে? বুলু জুতো পায় দিয়েচে? কোতায়? ওরা সব কোতায়?

রান্নাঘরে।

...রান্নাঘরে? নে যা দোকানের পয়সা নে যা। দাখুর কাল বড্ড জ্বর হোয়েছে। ও কি কি খাবে তাই ভাবছি—আহা-হা আহা-হা—দোকানের পয়সা নে যা।......

জানালা বন্ধ হইয়া গেল। একঝলক কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। ন-ছেলেটি খাবারের জন্য দোকানে চলিয়া গেল।

তাহার পরেই—

চৌবাচ্চায় জল ধরছে—বোমা চৌবাচ্চায় জল ধর'ছে, য়্যা, চৌবাচ্চায় জল ধরছে? ঝি কোতা? বৌ—অ বৌ, চৌবাচ্চায় জল ধরিয়েচে? কাল আমি দেখিনি—চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল ছিল না—আজ চৌবাচ্চায় জল ধরানো হয়েছে? কাতু, দেখতো চৌবাচ্চায় জল ধ'রেছে?

না—

য়্যা! জল ধরেনি এখনো? আটটা বেজে গেল, চৌবাচ্চায় জল ধরেনি এখনো? সব গোলমাল হ'য়ে গেল—আমি দেখিনি বোলে সব সংসার গোলমাল হোয়ে গেল—আটটা বেজে গেল চৌবাচ্চায় এখনো জল ধরেনি? সৃষ্টি কি দিয়ে নাইবে—সৃষ্টি কি ক'রে নাইবে?—

ঝিকে দেখিয়া বলিলেন—হ্যাঁ বৌ, চৌবাচ্চায় জল ধরাওনি কেন? হ্যাঁগা—চৌবাচ্চায় জল ধরবে কখন? ও কলটা খামাখা খুলে রেখেছো তবু চৌবাচ্চায় জল ধরনি—

ঝি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বাসী জল নিয়ে কাজ করছি—ওদিকে হাত-পা ধুচ্ছে, কল খুলব কখন?

কর্তা বলিলেন, তাহ'লে চৌবাচ্চায় জল হবে না?—জল আজ হবে না চৌবাচ্চাতে?—

এতক্ষণে বৌমা বলিল, হবে হবে বাবা ঃ আপনি থামুন তো?

য়্যা!

কিছু নয়, যান।

চৌবাচ্চায় জল হ'ল না—

বহু কষ্টে জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দোকান করিয়া ছেলেটি ফিরিল। খাবারের জন্য ছোট ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল ও ছেলেটির অনুসরণ করিল। দাদু জানালা খুলিয়া বলিলেন, নে যা—নে যা—এই কাতু, তিনটে বাটি নিয়ে আয়—

ছেলেমেয়েরা সব খাবার লইয়া নামিয়া আসিলে আবার জানালা খুলিয়া গেল। সমুখেই ঝিকে পাইয়া

তুমি এখনও চৌবাচ্চায় জল ধরতে পারলে না—চৌবাচ্চায় জল ধরাতে পারলে না এখনো? ও মেয়ে, চৌবাচ্চায় জল ধরিয়েছে?

ঝি চটিয়া গেল ঃ ঢের ঢের বাবু দেখেছি—কাজের পেছনে এমন খ্যাচর খ্যাচর—

কর্তাও চটিলেন ঃ চৌবাচ্চায় জল ধরাসনি কেন? তুই চৌবাচ্চায় জল ধরাসনি কেন হারামজাদী!

দেখেছেন মা—দেখেছেন? ইহার পর ঝি বাড়ী মাথায় তুলিল। জানাইল এইভাবে সে কাজ করিতে পারিবে না।

কর্তা বলিলেন, না পারিস, যা—তোর মত—

ঝি বলিল, ওরকম তুই-তুই বোলো না বোলে দিচ্ছি।

কর্তা বলিলেন, তুই—তুই—তুই—

ঝি রাগিয়া চটিয়া চলিয়া গেল।

যাক্‌গে ওরকম ঝি ঢের পাওয়া যাবে—এই শীতকালটা—আর দু'মাস—আর দু'মাস—তার পরেই বেটীকে—

বৌমা বলিল, কি আরম্ভ কোরেছেন আপনি?

কর্তা থামিলেন।

কিন্তু একটু পরেই—

ন—এই ন—ন—এই ন!

জবাব হইল, বলুন না।

বাজার যাবিনে? আজ বাজার যাবিনে? বাজারের ধামাটা নে আয়—কি কি আছে দেখে দি—ধামাটা নে আয়। বৌমাকে জিগ্‌গেস কর, কি মাছ আনবি? ধামাটা নে আয়।

ধামা লইয়া গেলে কর্তা কয়টি আলু আছে; কয়টি বেগুন আছে, কয়টি লঙ্কা আছে গুনিতে গুনিতে বলিলেন, বোমা, অ বোমা এই উচ্ছেটা পেকে গেল কেন? পেকে গেল কেন এই উচ্ছেটা, হ্যা বোমা।

বৌমা বলিল, পেকে গেলে আমি তা কি করব?

এই আলুর নীচেয় চাপা ছিল, বড্ড মাগ্যির উচ্ছে, ছটা সাতটা পয়সায়—উচ্ছে একটা পেকে গেল দেখলে না? আলু আজ লাগবে নাকি?

বৌমা বলিল, দেখুন না।

আলু বেশী দিও না তরকারিতে—তরকারিতে অত বেশী কোরে আলু দিও না—বড্ড পেট ভার হয় আলুতে।

বৌমা বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা।

ন বাজারে চলিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পর কর্তা হাঁকিলেন—ন—ন—এই ন।

বৌমা বিরক্ত হইয়া বলিল, ন বাজারে গেছে না?

আসেনি—আসেনি ন—ন এখনও বাজার থেকে আসেনি—হ্যাঁ বৌমা, ন আসেনি বাজার ফিরতি? বাঃ বাঃ! বোমা ন আজকাল বড্ড চুরি শুরু কোরেছে—বাড়ী যাবে বলে বড্ড চুরি করছে—বাজার থেকে বড্ড চুরি শুরু করেছে আজকাল। এখনো এলো না কেন, হ্যাঁ বৌমা............

এক মিনিট না যাইতেই কর্তা ঠক্‌ঠক্ করিয়া নামিয়া আসিলেন—নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জিভটা অসম্ভব রকমে বাহির হইয়া আসে—আট হাত একখানা কাপড় পরেন, হাতে একটা লাঠি ঠুকঠুক করিয়া চলেন। নামিতে নামিতে ডাকিলেন, বোমা টাকাটা হারিয়েছে, ন আজ টাকাটা হারিয়েছে—তাই আসচে না—আজ বাজারের টাকাটা

াবিয়েছে—তাই আসচে না এখনো—আসচে না তাই সে খনো—আমার কি হবে, ও আসচে না কেন বাজার—

ন আসিয়া গেল।

কি মাছ এনেছিস—রোজ ঠ'কে আসে—মাছের চড়া াম—ওকে ছেলেমানুষ—ওরা আরো ঠকায়—রোজ ঠকে াস—বোমা, মুড়োটা আমায় দিও—আমি আর কিছু খাব া—বলিতে বলিতে নীচের একটা ঘরের দিকে যাইতে যাইতে লিলেন, সন্টে উঠেচে? সন্টে উঠেচে?

সন্টে বা সৃষ্টিধর তাঁহার একমাত্র পুত্র। অত্যন্ত আদরে করিবাকরি ছাড়িয়া গৃহে পাগল সাজিয়া পরমানন্দে য়মিত খাইতেছে ও বৃদ্ধের নাতি-নাতনীর সংখ্যা বৃদ্ধি রিতেছে।

আস্তে ভেজানো দরজাটা খুলিয়া আধ মিনিট পর্য-ক্ষণের পর আবার ভেজাইয়া দিয়া বলিলেন, সন্টের ঘরটা য়ে দিও বোমা, ওর ঘরটা ধুয়ে দিও। দেখি, চৌবাচ্চায় ল কতটা হোলো.........আমি রোয়াকে বোসচি, রোয়াকে াসচি আমি.........বলিয়া বাহিরে গেলেন।

দুপুরের স্নানটা উপরেই হয়, ন জল তুলিয়া দেয়। ম্প্রতি স্নানের পর ঐ নিদারুণ হাঁপানি লইয়াই বাঙলা গীতা ীৎকার করিয়া পড়েন—মনে হয়, ভগবানচন্দ্র কানে খাট, তাই শ্চুপ ডাক শুনিতে পায় না। পায়খানাটাও কোনদিন পরেই সারেন। ন-কে নামাইয়া আনিতে হয়।

হঠাৎ বৌমার ডাক পড়ে ঃ

বোমা!—বাঃ!

অর্থাৎ খাবার এখনো পেঁাছাইল না? তাই রাগ করিয়া লেন, বেশ, বেশ, আমি আজ আর খাব না—আমার আজকে াওয়া দাওয়া নেই—বেশ বেশ—

জানালা বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু খান।

দুপুরটা একরকম কাটিয়া যায়।

কিন্তু ঠিক সাড়ে তিনটায় নামিয়া আসেন।

কলে জল এয়েচে, য়্যা, কলে জল এয়েচে.........বলিয়া লের ট্যাপটা নাড়িয়া দেখেন ও চৌবাচ্চায় পূর্বসঞ্চিত জল খিয়া পায়খানায় গিয়া বসেন। হাঁপানিজনিত একপ্রকার াওয়াজ আসিতে থাকে। তারপর এককালে সশব্দে—ন—ন—ন্দ্র পায়খানাটি প্রকম্পিত হইতে থাকে।

অর্থাৎ শৌচকর্মের জল চাই। তগাদাটাই বেশী, ইলে এক সময় কাহারও না কাহারও সৌজন্যে জল মিলিয়া য়।

হাত পা ধুইয়া রাস্তায় সংলগ্ন রোয়াকে গিয়া বসেন। ন্তু ঐখান হইতেই হঠাৎ হাঁকিতে থাকেন ঃ

বোমা—বোমা—নেবু রাখবে নাকি বোমা—নেবু রাখবে?

এই ডাকেই নেবুওয়ালা থমকিয়া দাঁড়ায় কিন্তু ভিতর ইতে কোনও জবাবই আসে না। নিরাশ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া সন, বোমা কিছু বোলছে না।

নেবুওয়ালা চলিয়া যায়।

চলমান কোন লোককে আহ্বান করিয়া বলেন, ও তোমার মাথায় কিসের ঝুড়ি গা?

ঝুড়িওয়ালা জবাব না দিয়া চলিয়া যায়। একটি রিক্সা-ওয়ালা ঠুনঠুন করিয়া আগাইয়া যায়। বৃদ্ধ একদৃষ্টে তাকাইয়া থকে। একটি ঝি পথাতিক্রম করিতে থাকে। বৃদ্ধ বলিয়া উঠেন, মেয়ে—অ-মেয়ে—মেয়ে—

ঝি একটু দাঁড়ায়—

অ-মেয়ে একটি ঝি দিতে পার—একটি ঝি—

কেন আপনার বাড়ীর ঝি কি হোলো?

বৃদ্ধ বলেন, ওকে আর রাখব না, যে আছে তাকে আর রাখবো না, বড্ড মুখে মুখে জবাব করে, বড্ড জবাব করে সে, রাখবো না তাকে, কাজকর্মও দেখছি--হ্যাঁ গা আছে তোমার হাতে লোক-টোক?

ঝি বলিল, সবাই কাজে নেগে গেছে—আপনার কিরকম কাজ—

বৃদ্ধ কথা কাড়িয়া বলেন, কাজ কিছুই নেই—কাজ তেমন কিছুই নেই, ও তুমি যা ভেবেচ তা নয়, ও মুখ করে তাই ওকে ছাড়ানো, নইলে কাজ কিছু নেই। রোয়াকটোয়াকগুলো ধোয়া, উঠোনে জল দেওয়া, ওপরটা ভিজে ন্যাকড়ায় মুছে নেয়া আর বাসনমাজা—এই। কাজ কিছুই নেই।

মাইনে কত?

চার টাকা—মিথ্যে কমিয়ে বোলে কি হবে চার টাকা, আর কাপড় কাচলে আর আট আনা—এই। আমার বোমা বড় ভদ্রলোকের মেয়ে—খুব ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না—খুব মিলেমিশে থাকতে পারবে।

ঝি বলিল, আমি দেখতে পারি।

বৃদ্ধ বলিলেন, দেখবে? এসো এসো, বলিয়া কাশির সঙ্গে 'বোমা' 'বোমা' আহ্বানে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন, 'বোমা' উৎকর্ণ হইল। নাও, এ তোমার কাজ কোরবে। লোকটাকে দেখে ভাল বোধ হোচ্ছে, ওর মুখ দেখেই বোধ হোচ্ছে লোকটা ভাল হবে, ভালই হবে লোকটা, ও মুখ দেখলেই চেনা যায়—ঝিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমিও আর এ বাড়ী ছাড়তে চাইবে না, দেখো তুমি, বোমা আমার বড্ড ভদ্রলোকের মেয়ে। নাও—বৃদ্ধ কাশিতে লাগিলেন, নাও দেখে শুনে নাও।

ঝি দেখিয়া শুনিয়া বলিল, তা আজ থেকে তো আর নাগতে পাচ্ছিনি, কাল—

কাল? আচ্ছা—কি বল বোমা? কালই ও মাগীকে তাড়াব—কালই ওকে তাড়াবো—ওর বড্ড মুখ হোয়েছে, বোমা কি বল?

আবার রোয়াকে গিয়া বসিলেন।

গাড়ী যায়, মানুষ যায়, বৃদ্ধের প্রশ্ন জাগে, ঔৎসুক্যও হয়, কিন্তু প্রায় সবটাই জানা জানা, নূতনত্ব কিছু নাই, ফর-মুলা বাঁধা। লোকজনের ফ্যাশন বদলাইয়াছে, মেয়েরা পায়ে হাঁটিয়া চলে। কত রকমের মানুষ। কিন্তু তাঁহার ছেলের মত সুন্দর কেহ নহে, অমন সোনার সব নাতি-নাতনী তাঁহার।

হাঁক দেন। বোমা, অ-বোমা, ছেলেপুলেদের হাত পা ধুয়ে জামা কাপড় পরিয়ে দাও। ন কোথায়? ন কোথায় গেল? য়্যা, বোমা, ন কোথায় গেল?

বৌমা ভিতর হইতে জবাব দিল, ন নেই।

নেই? কোথায় গেল হারামজাদা, ওকে আজ আমি যমের দুয়োরে পাঠাব বোমা, ও গেল কোথায়, আসুক সে আজ, আজ তাকে আমি খুন কোরবো, ন লাফাচ্ছে—জামা গায়ে দিয়ে লাফাচ্ছে, ন কেবল লাফাচ্ছে। ওকে আর রাখবো না..বোমা, বোমা ওকে আর রাখবো না—কাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিলেন, হ্যাঁগা ছোট ছেলে আমায় একটা দিতে পার, এই আমায় চাদ করিয়ে দেবে আর বাজারটা কোরবে?

আচ্ছা দেখবো বলিয়া শ্রোতা চলিয়া যায়।

এক একটি নাতি নাতনী আসিয়া জুটিতে লাগল।

দাদু, মুড়ি খাব।

দাদু বলিলেন, এই আনাচ্ছি।

আমি বিস্কুট খাব দাদু।

সব হবে, সব হবে, বোসো দাদারা—এই সোনার চাঁদ নাতি আমার, ন কোথায় গেল, কে এনে এদের মুখে চাট্টি খেতে দেবে—আমি থাকলুম পড়ে, কে দেবে এনে এদের মুখে—আহা হা আহা হা—

আলু কাবলি!

নাতি নাতনী কলস্বরে দাবী করিল, আলুকাবলি দাদু, আলুকাবলি।

আলুকাবলিওয়ালা থমকিয়া দাঁড়াইল।

নে এক পয়সার নে।

ছেলে মেয়েরা এক পয়সার দাও বলিয়া আলুকাবলি-ওয়ালার চারিদিকে লাফাইতে লাগিল। ইত্যবসরে বৃদ্ধ এক হাত জিভ বাহির করিয়া শরীরের কোথা হইতে যেন একটা টাকা-পয়সার থলিয়া বাহির করিলেন ও তাহা সমস্ত মেজের উপর ঢালিয়া দিলেন; একটি পয়সা বাহির করিয়া কাবলি-ওয়ালার হাতে দিলেন। ঠোঙাটা নিজ হাতে লইয়া নাতি নাতনীকে বিলি করিতে লাগিলেন ও একটা আলু নিজের মুখেও ছুঁড়িয়া দিলেন। কিন্তু কি মনে করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠটি চেঁচাইতে লাগিল। কান্না থামে না। বৃদ্ধ একটা পয়সা দিয়া বলিলেন, নেবু খাবি, য়্যা, নেবু খাবি?

ক্ষুদ্র নাতি পয়সা পাইয়া চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যার ছায়া চারিদিকে ঘিরিতে শুরু করিতেই বৃদ্ধ অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং কলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন, বোমা, আমি আজ আর কিছু খাব না, আজ কিছু খাব না আমি বোমা, আজ আমার বড্ড অসুখ কোরেছে,—বড্ড অসুখ কোরেছে আজ—কিছু খাব না।

বোমা জিজ্ঞাসা করিল, দুধ?

বৃদ্ধ বলিলেন, না। পরে বলিলেন, দুধটা খাব না ভাবছি। দুধটা খাব কি না......আমি চললুম, আমি আর থাকতে পাচ্ছিনি, আমি ওপরে গেলুম বোমা। থা'লে ঐ দুধই একটু দিও। কতটা আছে? পোটেক হবে? পোটেক না হয় তো—ভাবছি—শুধু দুধ খাব কি না—ওতে একটু সাবু দেবে কি না ভাবছি। আমি ওপরে গেলুম।

উপরে গেলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জানালা খুলিয়া গেল।

আলু আছে, বোমা, আলু আছে? আলু থাকে তো একটু আলু সেদ্ধ আমায় দিও।

বোমা উষ্ণ হইয়া বলিল, আলু সেদ্ধ আবার কি?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা কি কোরবে ভাবছি। য়্যা, দম? আলুর দম কোরবে বোমা? কি কোরবে তাই ভাবছি থা'লে এক কাজ কোরো, বোচো? ময়দা আছে? এক মুঠো ময়দা আচে? খানকতক বোচো? অ বোমা—

বোমা প্রখর উত্তপ্ততায় জবাব দিল—বুঝেচি, বুঝেচি; সাবু আর হবে না তো?

বৃদ্ধ বলিলেন, ভাবচি।

জানালা কিন্তু বন্ধ হইয়া গেল।

এমনি অনর্গল।

কিন্তু আজে সে কণ্ঠ নিশ্চুপ; আজ সে বাড়ী নিঝুম। কর্তার নির্বাক নিশ্চল দেহটাকে ধরাধরি করিয়া এইমাত্র নামানো হইয়াছে। কেহ কাঁদিবার ছিল না।

---

# ভারতের কৃষক ও শ্রমিক

( ৬২২ পৃষ্ঠার পর )

কারখানার শ্রমিকদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট করে। কিন্তু যখন তখন ধর্ম্মঘট করা যেমন শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি দেশের শিল্প উন্নতির পক্ষেও হানিকারক। ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকেরা বেতন পায় না; তাহাদের পরিবারবর্গের কষ্টের সীমা থাকে না। কলকারখানার কাজ বন্ধ থাকিলে উপযুক্ত পরিমাণে জিনিস তৈয়ারী হয় না; সামান্য যাহা কিছু তৈয়ারী হয়, তাহাতে অনেক খরচা পড়ে এবং সেইজন্য উহার চাহিদা কমিয়া যায়। জিনিসের চাহিদা কমিলে, নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে; ফলে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে, এই সব কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, তবে ধর্ম্মঘটে অগ্রসর হওয়া উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন কেবলমাত্র ধর্ম্মঘট ঘোষণার জন্যই গঠন করা হয় না। ট্রেড ইউনিয়ন হইতে দুঃস্থ শ্রমিকদিগকে সাহায্য করা, সভ্যদের নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার উন্নতি বিধান করা প্রভৃতি কার্য্য হওয়া প্রয়োজন। দেশের সরকার ও সাধারণ জনমতের পক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতি সাধনার্থ বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। কবির ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচ সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"

# নিউইয়র্কের পথে

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস



লণ্ডন নগরীর কথা লিখে অনেকে অমর হয়ে গেছেন। বই লিখে অমর হবার ইচ্ছা আমার নেই, যে দু-এক বিষয় আমার জীবনে রেখাপাত করেছে আমি তাই সংক্ষেপে লিখতে চাই। সেইজন্যই আমি ওই মহানগরীর কোনও ঐতিহাসিক সংবাদ রাখি নি, রাখতে মনও যায় নি।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, একদিন মিঃ চেম্বারলেনের বাড়ীটা গিয়ে দেখে আসি। ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেখানে সেখানে শোনা যায়। কলোনিঅ্যাল অফিস, ইণ্ডিয়া অফিস, এ সবই কাছে কাছে। তাই সামান্য সময় সেদিকে কাটালেও মন্দ হবে না ভেবে ডাউনিং স্ট্রীটে গেলাম। তখন বেলা দশটা। লণ্ডনে কোনদিন আমি এত সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি নি। আমার নিয়ম ছিল প্রাতে তিনটেয় শোয়া এবং বারটায় শয্যা ত্যাগ করা। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই এত সকাল সকাল সেখানে যেতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম, ১০নং বাড়ির সামনে অনেক সেপাই থাকবে, ইনফরমার, গুপ্ত পুলিস এ সব তো নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখি সেই গলিটায় একটা লোকও নেই।

সেকেলে ধূসর বর্ণের উঁচু বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। কাছের একটা তামাকের দোকানে গিয়ে কয়েকটা সিগারেট কিনলাম। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত বড় বড় লোক এখানে বাস করেন অথচ ওদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিস নেই কেন?' লোকটি বললে, এরা সবাই সিভিলিয়ান। অর্থাৎ সিভিলিয়ান ছোট হ'ক বড় হ'ক তার বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সে নিজেই করবে। আমাদের দেশের কথা মনে হ'ল। তিন পয়সার বাবুরও দরজায় চার পয়সার বন্দুকধারী সেপাই পাহারা দেয়। সূর্য্যের চেয়ে সূর্য্যের কিরণই প্রখর।

সেই ইংরেজ সাথীটি একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'দেখা ত হয়েছে, এখন চলুন আবার গিয়ে একটু ঘুমই।' আমি বললাম, 'চলুন। পথে আপনার উপযোগী খাদ্য কিনে নিন, রুমে গিয়ে রান্না ক'রে খেয়েই শুয়ে পড়বেন। আমিও রান্না করব।' তাই হ'ল। বিকালে দশটায় ঘুম থেকে উঠে আমরা বেড়াতে বেরলাম। অনেকক্ষণ হ'ল সিনেমার টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়েছে অথচ সূর্য্য কিরণ তখনও বর্ত্তমান; পথের আলো পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নি। একটি বড় রেস্তরাঁয় ব'সে কাগজ কলম নিয়ে এ দেশে রাত্রি দশটার সময়েও সূর্য্য ডোবে না কেন, তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাকে হিসেব করতে দেখে ইংরেজ সাথীটি আশ্চর্য্য হ'ল। জিজ্ঞাসা করল, 'এসব আপনাদের দেশে শেখানো হয় না?' আমি বললাম, 'আমাদের দেশে ভূগোল অবশ্যপাঠ্য নয়, যার ইচ্ছা হয় সে পড়ে। ইংরেজ সাথীটি বললে, 'যারা ভূগোল জানেনা তারা চোখ থেকেও অন্ধ।' সে মামুলী কথায় আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। চা খাওয়া হয়ে গেলে আমরা চললাম টেমস নদীর তীরে।

রাত্রি গভীর। পথে লোকজনের চলাচল কম। মাঝে মাঝে দু-একটা মোটরকার একটু বেশী জোরে ছুটে চলেছে। আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথে উঠলাম। সামনেই টেমস, যেন কলকাতার গঙ্গা। নদীর জলে আলো পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর জল নীরবে সাগরের দিকে চলেছে। ভাটা আরম্ভ হ'লেই তা বুঝতে পারা যায়। দেখলাম, আমাদের মত আরও অনেকে নদীর সৌন্দর্য্য দেখতে এসেছে। তারা সত্যই সৌন্দর্য্য দেখতে এসেছে না আর কিছু কারণ আছে তা বোঝবার উপায় নেই। তাদের অনেকেরই শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ বস্ত্রে ঢাকা। শুধু পুরুষ নয় স্ত্রীলোকও আছেন। তাতে শুষ্কমুখ যুবক যেমন আছেন তেমনি শুষ্কমুখ যুবতীও আছেন। সবাই নীরব। মাঝে মাঝে যাও দু-একটা কথা হচ্ছে তা অপরের কানে পৌঁছয় না।

পুরুষ সব সময়েই মেয়েদের সম্মান দেখায় এটা ইউরোপীয় সমাজের একটা সুন্দর রীতি। আমি সেই রীতির অনুকরণ করতে ভুলি নি। যখনই অসাবধানে কোনও স্ত্রীলোক আমার উপর এসে পড়েছেন তখনই আমি ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু ফল তাতে সুবিধার হয় নি। ওঁরা হয়তো ভাবে আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে। আমি বিদেশী কিনা! দু-একবার আমার ইংরেজ সাথীটিকে দু-একজন মহিলা সাবধান ক'রে বলেছেন, এমন লোকের সঙ্গে কেন? তা ওদের দোষ নেই, আমাদের দেশের নাবিক, ছাত্র এবং ভদ্রলোক অনেক সময় লণ্ডনে গিয়ে ভুলে যান যে তারা লণ্ডনে কি কলকাতায়। অশিষ্টতায় তারা উদ্দাম হয়ে উঠে। তাই ইণ্ডিয়ান দেখলেই এরা ভাবে হয়তো অত্যাচার করবে। টটেনহাম কোর্ট রোডে যদি কোনও ইণ্ডিয়ান নাবিক এসে বিকালে দাঁড়ায়, তবে পুলিস অমনি গলাধাক্কা দেয়, কখনও বা ধরেও নিয়ে যায় গারদে। সেরূপ নালিস আমার কাছে অনেকবার করা হয়েছে। প্রতিবাদ করবার জন্য টটেনহাম কোর্ট রোডে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি, কারণ ভাল করেই জানতাম এখানকার পুলিস মানুষ, আমাদের দেশের পুলিসের মতন নয়। আমাকে ধরেছে এবং যখনই তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছি তখনই পুলিস ক্ষমা চেয়েছে। বুঝেছে আমি অসৎ লোক নই।

ইউরোপীয়দের মাঝে চোর, লম্পট, ডাকাত সবই আছে। কিন্তু তাদের মাঝে নারীধর্ষণ দেখাই যায় না। "World News" নামক পত্র ব্রিটিশ জাতির যত সব দোষ ও নিন্দার বিষয় প্রকাশ করে। পড়লে দেখা যায় নারীধর্ষণের বিবরণ তাতে নেই। আমাদের দেশে নারীধর্ষণ ত সমাজের অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত আর বাইরে থাকলাম না, কারণ আমার ইংরেজ সাথীটি কাল পল্টনে ভর্তি হবে। তার পল্টনে ভর্তি হবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু পেটে কিছু দিতে হলে, মাথা গোঁজবার একটা স্থান পেতে হ'লে, এ ছাড়া আর উপায় কি।

এই জগতে প্রগতিশীল জাতি একটা মাদকতার মাঝেই থাকতে ভালবাসে। জার্মান, ইতালিয়ন, রুশ, জাপানী, এই সব জাতির মধ্যে সেই মাদকতা আছে; তাই তারা কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সে মাদকতা নেই। সেই একঘেয়ে রক্ষণশীল দলের একই ধরনের কথা।—ঐ যায়, ঐ ধরি। আমার ধারণা বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয়তার অভিব্যক্তি ব্যাহত হয়। যাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আছেও পার্লামেণ্টে তাদের দল হালকা। বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয় মানসিকতায় উন্মাদনা আসে না। বিদ্রোহের ভাব জাতীয়তায় ঔদার্য্যও আনে। সেই কারণে মানুষ দেশের জন্য জাতির জন্য প্রাণ তো দূরের কথা তার চেয়েও মূল্যবান জিনিস যদি কিছু থাকে, দান করবার প্রেরণা বোধ করে।

রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট কর, অতি সত্বর তা কাজে পরিণত হউক, এই কথা সকলের মুখে, সকল সংবাদপত্রে প্রত্যেক দিন লেখা হচ্ছে। মিঃ লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে পথের পথিক পর্য্যন্ত এই মতের পোষক। হাইড পার্কে লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে কত বক্তা যে তার উপকারিতার কথা প্রচার করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। হাইড পার্কের বক্তৃতা শোনাটা আমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে বলেন, তাতে নাকি কোনও ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন না। যেখানে ইংরেজ ভদ্রলোক থাকেন না, সেখানে ভারতীয় ভদ্রলোকও যেতে ভয় করেন। বাস্তবিক কোনও ভারতীয় ভদ্রলোক সেখানে দেখিনি বললেও দোষ হয় না। সেদিন এক পার্লামেণ্ট সদস্য বক্তৃতা দেবেন। লোকে লোকারণ্য, কারণ হাইড পার্কে ভদ্রলোকের এই বুঝি প্রথম আগমন। তাঁরই বক্তৃতা শুনতে আগ্রহ করে দাঁড়ালাম গিয়ে। তিনিও রাশিয়ার

সংগে প্যাক্ট করার যুক্তি দেখালেন। যুক্তিগুলি বেশ সুন্দর; এবং সরল ভাষায় বলার দরুন আমিও বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হয় তবে রশিয়ার সংগে মিতালি অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রশ্ন করার সময় আমি বলেছিলাম, এ যে আদায় কাঁচকলায় মিলন, এও কি সম্ভব? তিনি বলেছিলেন,—'pact is adjustable, because it is nothing but a pact'। সংগে সংগে একথাও বলেছিলেন, 'আদা আর কাঁচকলার মিলকেই বলে প্যাক্ট।'

ইংরেজ সাথীটি যাবার বেলায় অন্য এক সংগী জুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইনিও বেকার। এ'র পল্টনে ভরতি হবার উপায় নেই। জাতিতে ইনি গ্রীক। এখনও naturalised হন নি। তাই আমার সংগে বন্ধুত্ব করতে একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন। এ'র মতবাদটাও অন্যরকমের। এ'র পিতা-মাতা বাধ্য হয়ে এথেন্স পরিত্যাগ করেছেন। এ'দের মত হল, গ্রীসে রিপাবলিক গভর্ন-মেণ্ট হওয়া চাই। যেদিন রাজা জর্জ এথেন্স পে'ছৈছিলেন, সেই দিনই মিঃ হর‍্যাসিও, এ'র পিতা সপরিবারে ইউরোপের নানা দেশ বেড়িয়ে শেষটায় ডিমক্র্যাসির রাজ্যে এসে পে'ছেছেন। ডিমক্র্যাসি আর হিপক্র্যাসি শব্দ দুটো আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, যেন একটা ফ্যাশন! আমি কিন্তু এ সবে নেই। ডিমক্র্যাসি আর হিপক্র্যাসি আমার কাছে সমান। আমার নবাগত বন্ধু হিপক্র্যাসি শব্দটাই ব্যবহার করতেন বেশী। যার যে মত সে পালন করুক, ব্যবহারে বিরোধ না ঘটলেই হল।

নূতন বন্ধু আসার সংগে সংগেই নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হল। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'আপনি আমেরিকা যাবেন, টিকিট কিনে রাখুন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তবে মহা বিপদে পড়বেন।' আমিও অনেকদিন চিন্তা করে একদিন টিকিট কেনার জন্য গিয়েছিলাম। নূতন সাথীটিকে বলেছিলাম, 'এ দেশ ছাড়বার আগে একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখতে হবে।' কথাটা তিনি বুঝতেই পারেন নি, কারণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সাধারণ্যে শুধু 'ইয়ার্ড' নামেই পরিচিত। অনেক কথার পর যখন বুঝলেন তখন বললেন, 'এতে আর কি, গেলেই হল।' এ যেন আমাদের দেশের যাত্রাগানের আসর, কষ্ট করে গেলেই যেখানে হ'ক ঠেসাঠেসি করে বসতে পাওয়া যাবে। আমি কোথায় ভাবছিলাম আবেদন-নিবেদন করব, তারপর 'পাস' আসবে, কত কি হবে, তারপর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হয়ত মনের বাসনা পূরতে হবে, না নূতন সাথীটি একদিন ঘুম থেকে উঠেই বললেন, 'চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখতে।'

বাসে যাওয়া ঠিক হল। অটোগ্রাফের বইটা সংগে করে নিলাম, উদ্দেশ্য, যদি বড়কর্ত্তার দেখা পাই তবে তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে আসব। আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই আমার নূতন বন্ধু বললেন, 'এখানে আপনি একা যান, তাতে ভাল হবে, শ্বেতকায় সংগে থাকলে ওদের সন্দেহ হবে।' হন্‌হন্‌ করে একটা অফিসে গিয়ে ঢোকা দিলাম। প্রবেশের অনুমতি হল। ঢুকে অভিপ্রায় জানাতেই শুনলাম 'আরে না মশায়, এটা নয়, একটু সোজা এগিয়ে গেলে যে বড় দালানটা পাবেন, তার বাঁদিকে একটা দরজা আছে তাতে গিয়ে ঢোকা দেবেন।' সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী; আসার উদ্দেশ্য?'

'আসার উদ্দেশ্য দেখা, এর বেশী নয়।'

'এ যে মিউজিয়ম নয়, চিড়িয়াখানা নয়, এটা কি জানা আছে মশায়ের?'

'আজ্ঞা হাঁ তা বেশ জানা আছে, আরও জানা আছে নভেল। ইংরেজী নভেল পড়লেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর কথা শুনতে হয়। আমার ইচ্ছা হয়েছে একবার স্থানটাকে দেখে ফেলি, তবে নভেলের

জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন তো, আপনাদের সাদা লোক এখানে বিনা কাজে আসে না কেন? আমার একজন বন্ধু এ দরজা পর্য্যন্ত এসেই চলে গেলেন, বললেন তিনি এলে আমার সুবিধে হবে না।' ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জবাব ইয়ার্ডের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বললেন। আমি বললাম, 'এবাড়িটা কি তবে ইয়ার্ডের নয়?' ভদ্রলোক তার কোনও জবাব না দিয়ে একজনা সংগী দিলেন। সংগীটি আমাকে অন্য বাড়িতে রেখে চলে গেলেন।

একে একে সেখানে অনেকে এলেন তাঁদের দেখলাম যেন প্রশ্ন করতে উৎসুক, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে একে একে সকলেই চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন লম্বা এবং গম্ভীর লোক এসে আমার কাছে বেশ আরাম করে বসে বললেন, 'এখানে আসার আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'আজ্ঞে সেরূপ কিছু নয়, তবে বাড়িঘরগুলি দেখলে আনন্দিত হব, হয়তো বই লেখার পক্ষে সুবিধা হবে।'

'তবে আপনি লেখক? তা কি দেখবেন চলুন।'

সংগে চললাম। অনেক দেখলাম, কোথাও বিভীষিকা নেই, সর্ব্বত্রই সহজভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য। কই এখানে তো আমার ভয় করছে না। ভয়ের প্রয়োজন কলোনিতে, যেখানে ভয় দেখিয়ে অসভ্যকে সভ্য করতে হয়। আর দেখতে ভাল লাগল না। বিদায়ের বেলা লম্বা এবং গম্ভীর ভদ্রলোকটির অটোগ্রাফ নিয়ে আসতে ভুলিনি। পথে আসতে আসতে কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যই তো, অসভ্যকে সভ্য করতে হলে ভয় দেখানো দরকার।

বাইরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম। নূতন সাথীটি হঠাৎ এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। কেমন দেখেছি জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা সিনেমা দেখার সময় হয়ে যাচ্ছে, বলে ফের বাস ধরলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কথা আমার আর মনে ছিল না, আমি গংগাদীন দেখতেই মত্ত হয়েছিলাম। গংগা-দীন দেখে অনেকে ভাবে হয়তো কোনও ভারতীয় সেই পার্ট করেছে, কিন্তু তা নয়। আমি এখন একটু কলাবিদ্যার চর্চা করি তাই কে কি রকম অ্যাকটিং করল তারই আলোচনা করতে ভালবাসি। নূতন বন্ধুটি রাজভক্তি নিয়েই অনেকক্ষণ বকাবকি করছিল। আমি ভাবছিলাম গংগাদীনের কথা।

এবার আমেরিকার টিকিট কেনার পালা। ভেবেছিলাম, টাকা ফেলব টিকিট কিনব। কিন্তু আমেরিকা কেন, যে কোনও বিশেষ দেশে যেখানে একটু অর্থাগমের পথ খোলা আছে সেখানকার টিকিট কিনতে ভারতীয়দের বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। বাঙালী ও পলাতক জার্মান ইহুদী দ্বারা পরিচালিত একটা নূতন টুরিস্ট কোম্পানিতে টিকেট কিনতে গেলাম। তারা ত আমাকে পেয়েই খুশী। তারা জানত না যে আমি ভারতবাসী, নতুবা এমন অনুগ্রহ এবং আগ্রহ দেখাত না। বাঙালী মহাশয়ও আবার অ্যারিস্টোক্র্যাট, তাই ভাবেন সমস্ত জগৎটাই বুঝি ফ্রান্স এবং জার্মানি। আমি চুপ করে বসে ওদের চালচলন দেখতে লাগলাম। জাহাজের নাম ঠিক হল 'জার্ভিক', আটাশ হাজার টন, অল্প 'রলিং'-এ নড়বেও না। কিন্তু টিকেট আসে না। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বসে বললাম, 'মহাশয়রা, আপনারা আমার হয়ে টিকিট এনে রাখবেন আমি কাল এসে নিয়ে যাব।'

নূতন সাথীটি আমাকে বলতে লাগল, 'টিকিট বিক্রি না করার কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না, যুদ্ধ তো বাধে নি। ভারত-বাসীকে সাম্রাজ্যবাদীরা কত যে হীন করে রেখেছে তা সামনে দাঁড়িয়েও ঐ গ্রীক যুবক বুঝতে পারছে না। ভারতবাসীর দরজা চারিদিক থেকে বন্ধ। যারা লণ্ডনে যায় তারা এ কথা হাড়ে হাড়ে বোঝে কিন্তু মুখে বলবে না।' চড় খেয়ে চড় হজম করে, হাসতে আরম্ভ করে। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম টিকিট তখনও

২৬

আরো চার-পাঁচদিন কেটে গেছে! বিমলের জ্বরের মাত্রা বাড়ের দিকে না গিয়ে এ ক'দিন প্রায় মন্থর আছে—অর্থাৎ একশো দুয়ের উপর টেম্পারেচার আর ওঠেনি,—নামে একশো-একে! উপসর্গাদিও বড় নেই—শুধু কেমন আচ্ছন্নভাব, মাঝে মাঝে সে-ভাব কেটে একটু যেন স্বাচ্ছন্দ্যের চমক দেয়!

ডাক্তারবাবু বললেন,—টাইফয়েড নয়...

বেহারিবাবু বলেন,—অলকা-মায়ের পয় আছে!

সুশীলা বলে,—সত্যি!...ভয় হয়েছিল একটু! উনি আসা অবধি যেন যাদুমন্ত্র পড়া হলো!

অলকা স্থির হয়ে সব কথা শোনে! তার বুকের মধ্যে যা হয় সে-ই জানে! এবং জেনে নিরুপায়তার হাহা-শ্বাসে চোখের সামনে সে দেখে,...শুধু কুয়াশা!

কালু রোজ এসে খবর দিয়ে যায়, সিনেমার বাবুরা বার-বার এসে ফিরে যাচ্ছে......তারা বলছে, তাদের লোকসানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! অলকা জবাবে বলে—তাঁদের বলিস, আপন-জনের এমন অসুখে মন স্থির করে' কেউ কাজ করতে পারে না! বিশেষ সিনেমার কাজ...

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিমল অনেকখানি স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল!

বিমলের শিয়রে অলকা বসে আছে.........এখন মাথায় আইস্ ব্যাগ দেবার দরকার নেই, তবু শিয়রের আসনটুকু অলকার কায়েমি আছে ঠিক। সরে' বসেছিল সে—কিন্তু বিমল অনুযোগ তোলে,—না, দূরে নয়! তুমি কাছে বসো.........নাহলে আবার অসুখ করবে!

আজ দুজনে কথা হচ্ছিল।

অলকা বললে—এবারে আর ভয় নেই! ডাক্তারবাবু বললেন, আস্তে-আস্তে সেরে উঠবেন আপনি...

বিমল কোনো জবাব না দিয়ে করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে!

অলকা বললে,—আমাকে এবারে ছুটি দিন। সত্যি, পরের চাকরী করি—তারা যে চোখ রাঙাচ্ছে!

বিমল বললে,—দাসখৎ লিখে দিয়েছো?

মৃদু হেসে অলকা বললে—একরকম তাই বৈ কি! টাকা দিচ্ছে,—কাজ নেবে না হিসেব করে'?

বিমল বললে—কত টাকা তারা দেছে?

অলকা বললে,—তা অনেক টাকা! আমি প্রত্যাশা করিনি এত টাকা।

বিমল বললে,—আমি সে টাকা দেবো...ফিরিয়ে দাও তাদের টাকা!

অলকা বললে,—তা বুঝি হয়?

বিমল বললে—কেন হবে না?

অলকা বললে,—তার পর?

বিমল বললে,—তুমি সিনেমার কাজ করবে না!

—কি করবো তবে?

বিমল বললে—মেয়ে মানুষে যা করে...বিয়ে করে' ঘর-সংসার করবে।

একটা উদ্যত নিশ্বাস সবলে রোধ করে' অলকা বললে,—বেশ,—বিয়ের ব্যবস্থা হলে তাই করা যাবে; কিন্তু যদ্দিন সে-ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন দিন চালাতে হবে তো!

বিমল বললে—দিন চালাতে মানুষের অনেক বেশী টাকার দরকার হয় না।

অলকা বললে—সকলের দরকার না হতে পারে—আমার হয়!...বলেছি তো, কেন দরকার হয়!

বিমল কোনো জবাব দিলে না,—অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে।

অনেকক্ষণ...

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল অন্য দিকে তাকালো!

অলকা চেয়েছিল বিমলের পানে...বললে,—হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো যে! কি ব্যথা মনে জাগলো, শুনি...

বিমল এ-কথারও জবাব দিলে না...অলকার পানে তাকালো...শূন্য উদাস দৃষ্টি!

অলকা বললে,—দুশ্চিন্তা জাগলো না কি?...না, না...দুশ্চিন্তা নয়...তাহলে জ্বর বাড়বে!

বিমল বললে,—তাই আমি চাই...

—কি চান?

বিমল বললে—আমার জ্বর খুব বাড়ুক...একশো তিন, চার, পাঁচ, ছয়...

অলকা বললে—এ-কামনা কেন?

বিমল বললে—তাহলে নিশ্চিন্ত মনে তুমি চাকরি করতে যেতে পারবে—বারণ করবার শক্তি আমার আর থাকবে না!

ছোট একটা নিশ্বাস অলকা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না! মলিন মৃদু হাস্যে অলকা বললে,—আমাকে তাহলে ঠিক চিনেছেন!...কিন্তু না, সত্যি, কেন আমাকে এমন করে' আপনি বাঁধতে চান, বলুন তো? তাতে আপনার কি লাভ?

বিমল কোনো জবাব দিলে না...উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে...

অলকা সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করলো, বললে,—সত্যি, আমাকে আপনি মুক্তি দিন!...এমন করে' বাঁধবেন না। এ-বাঁধনে আমি যে কতখানি ব্যথা পাই...আপনিও ব্যথা পাবেন!... আমার চিন্তা ছেড়ে দিন!...আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যত ভাবেন, সত্যি বলছি, আমি তার সিকির সিকিও ভাবি না।...ভাবি না, কারণ, ভেবে কোনো দিকে কোনো কূল-কিনারা পাবো না তো!...কিন্তু আপনি কি-দুঃখে এত ভাবেন? পৃথিবীতে সবার দিন কি স্বচ্ছন্দ-সুখে কাটে?... আমার জীবনে প্রথম থেকেই অন্ধকার নেমেছে...আপনারা পাঁচজন দয়া করে সে-অন্ধকারে যে স্নেহের রশ্মি বর্ষণ করেন সেই রশ্মিই আমার চিরদিনের সূর্য্যের আলো...তাতেই আমার মন আলো পেয়ে ধন্য হয়!

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে' অলকা যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল...সে চুপ করলো।

বিমল চেয়ে রইলো অলকার পানে...অলকার দৃষ্টিও বিমলের মুখের উপর থেকে ফিরতে চায় না!

বিমলের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু...তোয়ালে দিয়ে সে ঘর্ম্ম-বিন্দু অলকা মুছিয়ে দিলে। বিমল শ্রান্তিভরে অলকার একখানি হাত নিজের হাতে ধরে' আবেগভরে বললে,—আমি তোমার কিছু করতে পারি না অলকা? কোনো উপকার?

অলকার বুকখানা ছাঁৎ করে' উঠলো। কম্পিত স্বরে সে বললে,—আপনি আমার অনেক করেছেন—অনেক উপকার —ভগবান আমার যে-অনিষ্ট করেছেন...আরো যে অনিষ্ট করবেন বলে' ভগবানের মনে সঙ্কল্প,—সত্যি বলছি, আপনার উপকারে সে-অনিষ্টের চিহ্নও আমার দেহে-মনে নেই! আপনার সে উপকারের ফলে ভগবানকে আরো অনিষ্টের সঙ্কল্পও বুঝি-বা ত্যাগ করতে হবে!

কথার শেষের দিকে একরাশ অশ্রু বুকের মধ্য থেকে উথলে এসে জমলো অলকার চোখের পিছনে...

এমন সময় ঘরে এলো প্রতিমা...

প্রতিমাকে দেখে বিমলের পাণি-বন্ধন থেকে অলকা নিজের হাত মুক্ত করে' নিলে...

প্রতিমা বললে—দু'টা বাজে। এবার স্পঞ্জিং করতে হবে। ডাক্তারবাবু বলে' গেছেন, স্পঞ্জিং করলে রাত্রে জ্বরটা আরো নামে কি না, দেখবেন।

অলকা বললে,—জল গরম হয়েছে?

প্রতিমা বললে—সিধু গরম জলের কেট্‌লি আনছে! এনামেলের বোল্ এখানেই আছে।

অলকা বললে,—আমি তাহলে টয়লেট্-ভিনিগারটা দি—

অলকা উঠলো...

স্পঞ্জিংয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে' অলকা গেল পাশের ঘরে।

কালু এসেছিল—সিধুর কাছে ছিল।

কালুকে দেখে অলকা প্রশ্ন করলো—কি রে কালু? কোনো খপর আছে?

কালু বললে,—খপর আছে। সিনেমার সেই বাঙালী-বাবু এসেছেন; ত্রিদিববাবু...আর তাঁর সঙ্গে একজন মাড়োয়ারি বজরঙ্গবাবু!

বজরঙ্গবাবু সিনেমার মালিক।

অলকা বললে—কি বলে তারা?

কালু বললে,—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়!... এখানে এসেছে...বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—সদরে।

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা চারিদিকে তাকালো, তারপর বললে—এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

কালু গেল ডাকতে...অলকা চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো...

সিধু বললে—কে দিদিমণি?

অলকা বললে—আমি যাদের কাছে চাকরি করি, তারা।

সিধু অবাক! দিদিমণি চাকরি করেন!

সিধু বললে—তুমি চাকরি করো! কি দুখে চাকরি করো দিদিমণি?

মৃদু হেসে অলকা বললে—তুমিও যে দুঃখে চাকরি করো সিধু, আমাকেও ঠিক সেই দুঃখে চাকরি করতে হয়!

সিধু যেন হতভম্বঃ দিদিমণি এমন—এমন বেশভূষা—এমন মন—দিদিমণি চাকরি করেনঃ—প্রভাব কাটলে সিধু বলে,—দাদাবাবু জানেন?

—জানেন বৈ কি!

সিধু বললে জেনেও দাদাবাবু তোমাকে চাকরি করতে দেন?

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে—দাদাবাবু কি করবেন, বলো?

সিধু বললো—কি করবেন, তা জানি না। চাকরি বন্ধ করেন নি কেন, আমি শুধু তাই ভাবছি!

মৃদু হেসে অলকা বললে—মানুষ সব দিতে পারে—ভাগ্য দিতে পারে না, সিধু!

কালুর সঙ্গে এ-ঘরে বজরঙ্গ এবং সেই ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য।

অলকা বললে—আসুন.........নমস্কার!

তারা বললে—নমস্কার!

অলকা বললে,—তাড়া দিতে এসেছেন?

বজরঙ্গ বললে,—হামার তো সত্যনাশ হতে বসেছে অলকা দেবীঃ পরের ষ্টুডিয়ো ভাড়া নিয়ে কাজ.........বসে' বসে' ভাড়া গুণছি.........বহুৎ নোকসান্ চলিয়েছে.........

অলকা বললে—আমার যে যাবার উপায় নেই বজরঙ্গবাবু...... এ ক'দিন অন্য সীনের কাজ সেরে নিন্ না.........

ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য বললে,—তা হয় না। তার কারণ, এ-শেট্ শেষ না হলে ওদের 'ফ্লোর' ক্লীয়ার হবে না.........ফ্লোর ক্লীয়ার না হলে ওখানে অন্য শেট্ হবে কি করে? অলকা একাগ্র মনোযোগে কথাটা শুনলো.........এ-কথার অন্তরালে দাসত্বের উপর যে মৃদু ইঙ্গিত, সেটা কাঁটার মতো মনে বিঁধলো! ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করে' অলকা বললে,—যদি আমার নিজের একটা শক্ত অসুখ করতো?

বজরঙ্গি জবাব দিলে,—সে হালাদা বাত্ অলকা দেবী। তাহলে তো কোনো কথাই থাকতো না!.. .. .লেকেন্.........

অলকা মৃদু নিশ্বাস ফেললে,—মুখে কোনো কথা বলতে পরলো না।

ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য বললে,—বন্ধুর অসুখের জন্য কোম্পানি লোকসান সইতে চায় না, অলকা দেবী.........

কথাটা শেষ করে' ত্রিদিব একটু হাসলো। অলকার চোখের কোণে বিরক্তির একটু স্ফুলিঙ্গ দেখেই ত্রিদিব আঁকলো নিজের অধরে এ হাসির মৃদুরেখা! এ হাসির অর্থ—ও-স্ফুলিঙ্গে আমাকে বিদ্ধ করো না দেবি,.........আমি আছি তোমার পক্ষে—কোম্পানির অভিযোগ-অনুযোগ যথাসাধ্য এ ক'দিন মোচন করবার প্রয়াস পেয়েছি! কিন্তু বোঝেন তো, পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সকে এ জাত কতখানি শিরোধার্য্য করে' চলে'।

অলকার কিন্তু কেমন অসহ্য বোধ হলো! বজরঙ্গির পানে চেয়ে অলকা বললে,—তাহলে কি বলেন? যদি আরও দু'দিনের ছুটি চাই? মঞ্জুর হবে না? বজরঙ্গি বললে—সে বাত্ নয় অলকা দেবী। ক'দিন আপনি যান্ নি......... আপনার ঘরে এসে দেখা ভি পাই নি.........এক্‌টা খবর ভি না! .........ওদিকে ষ্টুডিয়োওয়ালা তাড়া দিচ্ছে.........ক'দিনের ষ্টুডিয়ো-ভাড়াও তারা আদায় করে লিয়েছে! কাজেই বুঝচেন তো.........না হলে হামার কি, বলুন? আর্টিষ্ট-লোকের দায়-অদায় দেখতে হামি নারাজ নেই!

কথার শেষ দিকটায় বজরঙ্গি খানিকটা অসাহয়তার করুণ আমেজ মিশিয়ে দিলে! অলকা বললে,—তাহলে কি চান্? মানে, এখনি আমাকে চাকরি রাখতে যেতে হবে?.........বলুন ......সত্যি, আমি বুঝতে পারি নি, দাসখৎ লিখে দিয়েছি...... অতএব আমার নিজের মন, বা সে-মনে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা, মায়া-মমতা কিছুই থাকতে পারে না!

অলকার কথাগুলো ত্রিদিবের মনের কোন্ জায়গায় এসে লাগলো যেন পাথর-কুচির মতো!

ত্রিদিব বললে,—বিমলবাবু তো আপনার আত্মীয় নন্......... তাছাড়া বড়লোক-মানুষ—দু'জন নার্শ রেখেছেন, সেবা-পরিচর্য্যার জন্য!

এ-কথার উত্তরে একরাশ বাক্য অলকার মনের মধ্যে বিদ্রোহীর বেশে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রচণ্ড আঘাত দেবার মার-মুখী-মূর্ত্তিতে ঠেলাঠেলি করে' দাঁড়ালো.........অলকা তাদের চকিতে নিরস্ত রুদ্ধ করে' শুধু অপলক কঠিন দৃষ্টিতে চাইলো ত্রিদিবের পানে! সে-দৃষ্টিতে যেন ধারালো তীর.........

ত্রিদিব মুষড়ে গেল। বললে,—মানে, কাল একটার সময় যদি আপনি দিয়া করে' যাবেন.........মানে, যে-সময়টায় বিমলবাবু একটু সুস্থ বোধ করতে পারেন এবং আপনাকে এ'রা spare করতে পারেন.........say, তিন-ঘণ্টা, চার-ঘণ্টা.........তাহলে আপনার জন্যে এইখানেই গাড়ী পাঠিয়ে শীনটুকু চট্‌পট্ শেষ করে' ফেলা যায়!.........মানে, just a favour—

অলকা বললে,—Favour নয়, ত্রিদিববাবু.........যেখানে মনিব—ভৃত্যের সম্পর্ক.........সেখানে চাকর favour করবে কি...... আমি যাবো.........আমাকে যেতেই হবে!.........বেশ, কাল যখন খুশি আপনারা গাড়ী পাঠাবেন.........এখানে না। আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবেন।.........কখন্ গাড়ী পাঠাবেন, শুধু সেইটুকু দয়া করে' বলে' যান্.........

ত্রিদিব একটা নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললে,—মানে,—আপনি রাগ করবেন না! জানি এ-সময়ে আপনার মনে খুবই উদ্বেগ, চঞ্চলতা,—এ-রকম মন নিয়ে কাজ করা চলে না......... বিশেষ ফিল্মের কাজ!.........

বজরঙ্গি বললে—তাহলে কাল যদি বেলা দশটায় গাড়ী পাঠাই?

অলকা বললে,—পাঠাবেন। আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবেন ......আমি ready থাকবো......বেলা দশটায়...এক-মিনিটও গাড়ীকে wait করতে হবে না!

কথার মধ্যে একবিন্দু আর্দ্রতা নেই! ত্রিদিব তা লক্ষ্য করলো .........সে বললে,—তারপর say বেলা দুটো, বড়-জোর তিনটে.........আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবো'খন।

অলকা বললে—কোনো দরকার নেই তার। যতক্ষণ না কাজ চোকে, আমি থাকবো.........থাকতে আমি বাধ্য.........under terms of our Agreement.........তাহলে এই কথাই রইলো .........আপনারা আসুন! এ-কথা বলে' অলকা কোনোমতে একটু কাষ্ঠ নমস্কার জানিয়ে ঢুকলো বিমলের ঘরে।

স্পঞ্জিং সেরে প্রতিমা তখন বিমলের গায়ে কাচা-জামা পরিয়ে দিচ্ছে.........

অলকাকে দেখে বিমল বললে,—কোথায় গেছলেন?

অলকা বললে,—চাকরি বজায় রাখবার ব্যবস্থা করতে!

বিমল কোনো জবাব দিলে না।

ডাক্তারের অনুমান সার্থক-সফল হলো। স্পঞ্জিংয়ের ফলে সে-রাত্রে জ্বরের উত্তাপ বাড়লো না.........দীর্ঘকালের পর অখণ্ড সুনিদ্রায় বিমলের রাত্রি অতিবাহিত হলো।

পরের দিন সকালে যথারীতি নিয়মকৃত্য সেরে অলকা যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। প্রস্তুত হয়ে বিমলের কাছে এসে বললে,—আমাকে অনুমতি দিতে হবে। খোলা খড়খড়ি দিয়ে বিমল চেয়েছিল বাহিরে স্নিগ্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পানে। অলকার পানে বিমল ফিরে চাইলো। দু'চোখে রোগশীর্ণ করুণ দৃষ্টি!

মমতায় অলকার মন ভরে গেল! মনে হলো.........

কিন্তু না.........এত মমতা তার সাজে না! কি-লগ্নে যে তার জন্ম হয়েছিল.........মন যেন সর্ব্বক্ষণ নাগপাশে আবদ্ধ!

অলকা বললে,—বাড়ী যাচ্ছি.........

বিমলের দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন মেঘের ছায়া আরো নিবিড় হয়ে নামলো! দেখে অলকার বুকখানা উঠলো দুলে'.........

অলকা বললে—একেবারে চলে' যাচ্ছি না। আবার আসবো! মানে, ক'দিন একটিবারও ওদিকে পা বাড়াতে পারিনি!......... আপনি আজ ভালো আছেন তো—কেমন? আমাকে খানিক-ক্ষণের জন্য ছুটি দিচ্ছেন? যেন কে কাকে কি বলছে! বিমল কোনো জবাব দিলে না—দু'চোখে উদাস করুণ দৃষ্টি!

অলকা ভাবলো, বেশী ঘাঁটানো ঠিক হবে না! ঘাঁটাতে গেলে মনের চারিদিকে এত-রকম.........শুধু তার মনেই নয়......... বিমলের মনেও.........তাই সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য আবেগ-ভরে বিমলের দু'খানি হাত নিজের হাতে আবদ্ধ করে' অলকা বললে,—প্রতিমা আছে.........যা দরকার হয়, করবে.........যত শীগ্‌গির পারি, আমি ফিরে আসবো।.........লক্ষ্মীটি......... কোনো আপত্তি করবেন না!.........আমার মন এইখানেই রইলো, জানবেন,.........সত্যি.........শুধু দেহখানাই নিয়ে যাচ্ছি আমি!

এ-কথা বলে' করগ্রন্থি মুক্ত করে' অলকা তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে আসবামাত্র সিধুর সঙ্গে দেখা.........সিধুর হাতে ছোট প্লেটে কতকগুলো কোটা তরকারি!

অলকা বললে—আমি এখানে খাবোনা এবেলায়......... একবার বাড়ী যাচ্ছি সিধু.........

সিধু সবিস্ময়ে অলকার পানে চাইলো.........অলকা দাঁড়ালো না—চকিতে সে-ঘর পার হয়ে ল্যাণ্ডিং অতিক্রম করে'।.........

সিঁড়ির সামনে বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো আটটা।

২৭

ছবি তোলা হচ্ছিল অতি-আধুনিক কাহিনী নিয়ে।

বেলা চারটে বেজে গেল, দুটির বেশী শট্ নেওয়া হলো না! তার কারণ, ডাইরেক্টর এবং প্রোডিউশারের বহু বন্ধু শেটে ছিলেন, তাঁরা এ-শীন্‌কে খুব চটক্‌দার সেক্সঅ্যাপীলে ফুটিয়ে তোলবার জন্য এত রকমের সদুপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছি-লেন যে খাতায়-লেখা শিনারিয়োর লাইন ছেড়ে গল্প যেন আকাশ-পথে উড়তে চায়! দারুণ দুর্ভাবনা সবার মনে.........

গল্প-লেখক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য চাইলো অলকার দিকে...... অলকা গম্ভীরমুখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত-নির্বিকার চিত্তে শেটের একপাশে ছিল বসে.........ত্রিদিব কাছে এলো.........এসে প্রশ্ন করলে,—আপনার কেমন লাগছে এ শীনটা ভেঙ্গে-চুরে যে-বেশে আবার গড়া হলো?

অলকা বললে—আমার লাগালাগি আবার কি? আপনাদের ছবি, আপনাদের গল্প—আপনারা করবেন তার ভালো-মন্দের বিচার!

অলকার মনের বিরাগ এখনো যায় নি—একটা নিশ্বাস ফেলে ত্রিদিব বললে,—বড্ড দেরী হচ্ছে আপনার—না? বলেছিলুম, তিন-চার ঘণ্টার জন্য.........কিন্তু কি জানেন, বজরঙ্গিবাবু বলছেন, অলকা দেবীকে যখন পাওয়া গেছে, এ-শীন্‌টা সেরে ফেলুন!.........

অলকা বললে—তাই করুন।

ত্রিদিব বললে,—তাহলে রাত নটা-দশটা বাজতে পারে। .........এত দেরী হতো না! মানে, পাঁচজনে নানা পরামর্শ সুরু করলো কি না.........and to make the scene rather alluring।.........তা আপনি পারবেন অত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকতে?

অলকা বললে,—এগ্রিমেণ্ট করেছি ত্রিদিববাবু.........থাকতে বাধ্য! কথাটা বলে' অলকা হাসলো.........ম্লান হাসি—

ক্ষণেক চুপ করে' থেকে ত্রিদিব বললে,—মানে, এ-শেট্‌টা বড়-জোর আর একদিন খাড়া রাখা চলবে!.........নাহলে.........

অলকা বললো,—আমার জন্য আটকাবে না ত্রিদিববাবু! আটটা-নটা-দশটা কেন, সারা রাত যদি শুটিং চলে, আমাকে পাবেন.........

ত্রিদিব বিস্মিত হলো.........বললে,—কিন্তু.........

সে-কথায় কর্ণপাতমাত্র না করে' অলকা শুধু বললে,—আপনা-দের এখানকার ষ্টুডিয়োর টেলিফোনটা যদি একবার ব্যবহার করতে পাই.........

—নিশ্চয়—আসুন!

অলকাকে নিয়ে ত্রিদিব এলো ষ্টুডিয়োর অফিস-ঘরে। এই ঘরে টেলিফোন.........রিশিভার ধরে' অলকা বললে,—হ্যালো.........

ওদিকে বিমলের ঘরের টেলিফোন.........

অলকা বললে,—প্রতিমাদি?—হ্যাঁ, আমি অলকা.........জ্বর এখন কত?......একশো-পয়েণ্ট চার......বটে!......হুঁ......হুঁ .........ও.........আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন, বড্ড দরকারী কাজ পড়েছে কি না.........না করলে নয়!.........হ্যাঁ, হ্যাঁ.........কাজ চুকলেই যাবো.........নিশ্চয় যাবো!.........হুঁ.........নিজে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কইতে চান? বলুন, আজ নয়.........জ্বরটা যেদিন একেবারে থাকবে না, সেইদিন।......... ছেড়ে দিলুম.........ডাক পড়েছে.........

রিশিভার রেখে অলকা নিমেষের জন্য দাঁড়ালো.........স্তম্ভি-তের মতো.........দু'চোখ পলকের জন্য মুদ্রিত।

তারপর হাত ব্যাগ থেকে দু'আনা বার করে' অলকা দিলে বেয়ারার হাতে.........

রাত্রে সেদিন কাজ চুকলো রাত্রি প্রায় একটায়.........

ত্রিদিব এসে বললে,—নিজের বাড়ীতে যাবেন? না.........

অলকা বললে,—রোগীর বাড়ীতে এত রাত্রে আর ফিরবো না.........

বজরঙ্গি বললে,—মেহেরবানি করে' কাল বেলা নটায়......... গাড়ী যাবে পোনে ন'টায়.. ......

অলকা বললে,—আচ্ছা.........

পর পর দু'দিন নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ মিললো না.........শুটিং নিয়ে সকলে প্রমত্ত!

অলকার বিরক্তি যেমন নেই, আগ্রহও তেমনি আগেকার মতো উৎসারিত বা উচ্ছ্বসিত দেখা যায় না।

দুপুরবেলায় ত্রিদিব বললে,—একটু সময় পেয়েছেন তো.........এইবেলা টেলিফোন্ করে' অসুখের খপরটা নিতে পারতেন.........

অলকা বললে,—সকালে খপর নিয়েছি, জ্বর ছেড়েছে।

ত্রিদিব বললে,—এ-শেটের কাজ হলে তিন দিন আপনি ছুটি পাবেন..........তারপর কথা হচ্ছে আসাম যাবার। আসামে ক'টা যে-শট্ নেওয়া হবে, আপনিই তাতে সব। মানে, ঐ পাহাড়ে.........চা-বাগানে।.........বোধহয়, এক মাস থাকতে হবে।.........অসুবিধা হবে না?

অলকা বললে—অসুবিধা কিসের? না.........আমি যখন যেখানে থাকবো সেই আমার ঘর.........সেই আমার দেশ.........

কথাটা বলে' অলকা গেল বাইরে..........ত্রিদিব লক্ষ্য করলে, এ যেন আর-এক অলকা!.........

চারদিন পরে শেট্ থেকে ছুটী মিললো.........তখন সন্ধ্যা হয় হয়!

অলকা এলো বাড়ী.........ত্রিদিব সঙ্গে এসেছিল। বললে,—আসামের সিকোয়েন্সগুলোয় একটু অদল-বদল করতে হবে। কাল আসবো'খন পরামর্শ করতে—কি বলেন?

অলকা বললে,—আসুবেন।

—কখন এলে আপনার অসুবিধা হবে না, বলুন তো?.........সন্ধ্যার পর যদি আসি?

—তাই আসবেন।

—অল্ রাইট্..........এখন তাহলে নমস্কার!

রাত প্রায় আটটা। মুখ হাত ধুয়ে ষ্টুডিয়োর রঙ-কালি ধুয়ে মুছে সেখানকার আবহাওয়ার ছোপ্‌টুকুও যাতে দেহে-মনে লেগে না থাকে, এজন্য ছোট বারান্দায় ডেক-চেয়ারে অলকা পড়েছিল.........একরাশ জ্যোৎস্না.........কি চমৎকার লাগছিল! অলকা ভাবছিল.........

ভাবছিল অনেক কথা.........নিজের কথা,.........সেই সঙ্গে ঐ যে পাশাপাশি বহুদূর পর্য্যন্ত বাড়ীর পর বাড়ী......ঘরের পর ঘর—ওসব বাড়ী-ঘরে যারা বাস করে, তাদের কথা: তারা কি অলকার মতো এতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করে? কোনো মতে একটার পর একটা দিন কাটলে অলকার মতোই কি তারা নিশ্বাস ফেলে ভাবে, আঃ, এ-দিনটা তাহলে কাটলো! একটু স্বস্তি......সঙ্গে সঙ্গে আগামী কালকের জন্য আবার অনিশ্চয়তার সেই গুমট্ জমাট ভাব! স্বস্তি নেই: আরাম নেই.........স্বাচ্ছন্দ্য নেই! যখন সুখের বন্যায় আপ্লুত, তখনি সঙ্গে সঙ্গে মন বলে ওঠে; কিসের আনন্দ করিস্ রে! এ-বন্যার জল বড়-নিমেষের......ঐ দ্যাখ্ পিছনে মরু-বালুকার বিস্তীর্ণ পাহাড়!......

নিশ্বাসের বাষ্পে বুক ভরে' উঠছিল! ঐ সব বাড়ী-ঘরে আলো জ্বলছে......বারান্দায়-ঘরে মানুষের জটলা......কোনো ঘরে চলেছে গান-বাজনা, কোনো ঘরে বা কলকথা, কলহাসি!.........সন্ধ্যার পর দেহমনকে কি স্বচ্ছ আনন্দ-ধারায় সকলে ভাসিয়ে দেছে! সন্ধ্যায় এই চাঁদের আলোয়......... এই স্নিগ্ধ বাতাসে.........তার মতো কেউ কি আজকের আনন্দ-ভোগে বঞ্চিত হয়ে আগামী-কালকের অনিশ্চিত দুর্ভাবনার ভারে শঙ্কাতুর হয়ে আছে?

নিশ্বাস ফেলে অলকা ভাবলো,—এ কি জীবন!......এর চেয়ে......কিসের সঙ্গে এ জীবনের তুলনা......এ জীবনের চেয়ে কি আরো শ্রেয়, কাম্য......মনে এলো না......দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য-ভার পাথরের মতো বুকে চেপে বসলো! অলকা উঠে দাঁড়ালো! তার মন কারো সুখে হিংসা করছে না....... কারো উপর তার বিদ্বেষ নেই......কারো সঙ্গে বিরোধ নেই!......

মনে পড়লো বাল্যকালের কথা......ক'বছরের মধ্যে তার মনকে নিয়ে এ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! আশেপাশে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই—সাথী নেই—অথচ মানুষের ভিড় বিরাট বিপুল হয়ে পাশে জমছে!

অলকা বসতে পারলো না......ঘরে এসে শ্লীপার খুলে নাগরা জোড়া পায়ে এ'টে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়লো—

এলো সোজা বিমলকান্তির ফ্ল্যাটে! ক'দিনে হয়তো সেরে উঠেছেন.........হয়তো অনেক অভিমানের কথা বলবেন!......

বলুন! সে-কথা যে কত ভালো লাগে......

শুধু কথাই! তার বেশী অলকা চায় না......চাইবার অধিকার তার নেই! একটা নিশ্বাস অলকা রোধ করতে পারলো না!

বিমলকান্তির ফ্ল্যাটে আসবামাত্র সামনে দেখা সিধুর সঙ্গে। সিধু বললে,—এসেছো দিদিমণি......তবু ভালো! আমি ভাবছিলুম, দুদিন স্নেহ দিয়ে কোথায় চলে গেল......অলকা বললে—বড্ড কাজ পড়েছিল সিধু......এক মিনিটের জন্যও তাই আসতে পারিনি!......তোমার বাবু কেমন আছেন? সিধু বললে—দ্যাখো গে দিদিমণি নিজের চোখে!......মানে, ভালো আছেন।

—আমায় খুঁজেছিলেন?

—না।

অলকার বুকখানা ধক্ করে উঠলো! আর কোনো কথা না বলে স্পন্দিত বক্ষে অলকা প্রবেশ করলো বিমলকান্তির ঘরে। একখানা ইজিচেয়ারে বসে আছে বিমলকান্তি......অর্দ্ধশায়িত-ভাব। গায়ে শাল জড়ানো। নার্শ সুশীলা বিমলের মাথায় ব্রাশ চালাচ্ছে! ঘরে প্রবেশ করবামাত্র অলকার সঙ্গে বিমলের দৃষ্টিবিনিময়।

অলকা বললে,—আমি এসেছি—

বিমল কোনো কথা বললে না......সুশীলা বলে উঠলো,—তবু ভালো, আমাদের কথা আবার আপনার মনে পড়েছে!

অলকা বললে,—মনে পড়লেই বা কি করবো! আমি যে কতখানি পরাধীন......

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অলকা একবার অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাইলো......দেখলো, বিমল দু'চোখ মুদ্রিত করেছে।

( ক্রমশ )

[লেখকের কৈফিয়ৎ : গ্রন্থের বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে পত্র লিখিয়া উপন্যাসখানির পরিণতি-সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের সে-সব প্রশ্ন শিরোধার্য্য করিয়া রাঙ্গামাটীর পথের দু'চারটা মোড় বাঁকাইয়া সেখানে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা দু'এক সংখ্যা দেখে রাঙ্গামাটীর পথের চিহ্ন যে দেখেন নাই,—ইহাই তার কারণ। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাদের সেবার জন্যই এ ত্রুটি—ইহা ভাবিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিলে সুখী হইব। ইতি শ্রীসৌরীন্দ্র............।]

# ফ্রয়েড

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

লণ্ডনে সম্প্রতি ফ্রয়েডের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর করতলগত হলে, ইহুদী হবার অপরাধে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। (জীবনের শেষ ক'দিন তিনি লণ্ডনেই ছিলেন এবং এখানেই তিনি তাঁর সব শেষ কীর্ত্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।) চিরকাল ধরে প্রতিভাধরদের ওপর রাষ্ট্রশক্তির যে নিপীড়ন চলেছে, নাৎসী শাসকদের হাতে ফ্রয়েড আইনষ্টাইনের লাঞ্ছনা তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ক্ষুদ্র সীমা থেকে বহিষ্কৃত হলেও, আচার্য্য ফ্রয়েড বিশ্বের চিন্তারাজ্যে যে চিরন্তন শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তার কাছে দেশ ও কালের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

ফ্রয়েডের আবিষ্কার ও গবেষণা আজ বিশ্বের ভাব-জগতে যে পরিবর্ত্তন এনেছে, তার ওপর নির্ভর করেই বিংশ শতাব্দীর শারীর বিজ্ঞান ও আচার বিজ্ঞান একটি নূতনতর পরিণতির সন্ধান পেয়েছে। মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার, জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে সমস্ত সংস্কার বহুকাল ধরে সশ্রদ্ধ অনুরাগে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, আচার্য্য ফ্রয়েড তাদের মূলে সজোরে নাড়া দিয়েছেন—শুধু নাড়া দেওয়াই নয়, পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের জীর্ণ সৌধকে ভেঙে তিনি তার ওপর নূতন চিন্তার প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মার্কসের দর্শন যেমন সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে একটি নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়েছে, আচার্য্য ফ্রয়েডের গবেষণা তেমনি তার ভাব-জীবনে একটি বিচার-বিশুদ্ধ সত্য দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছে। এই সত্যকে যাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা তো বটেই, যাঁরা স্বীকার করেন নি, তাঁরাও একে বাতিল করতে পারেন নি। বস্তুত যন্ত্র বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও গবেষণাসমূহ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে যথেষ্ট গরিমা এবং মর্য্যাদা দান করলেও, তারা হল বাইরের জিনিস—মানুষের ইতিহাসে যা শ্রেষ্ঠতর মহত্তর সেই মনোরাজ্যের ওপর মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষী যে নূতন আলোক সম্পাত করেছেন, তার তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

আচার্য্য ফ্রয়েডের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়ার সঠিক এবং সমগ্র আলোচনা সাময়িক পত্রের নিরূপিত গণ্ডীর ভেতর হওয়া সহজ বা সম্ভব নয়—তা করার শক্তিও আমার নেই। মোটা-মুটিভাবে তাঁর প্রধান গবেষণার মূল তত্ত্বগুলো শুধু আমি এখানে হাজির করতে চেষ্টা করব।

অষ্ট্রিয়ার এক উন্মাদাগারে পর্য্যবেক্ষকের কাজ করতে করতে ফ্রয়েড প্রথম অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করেন এবং স্বাভাবিক মানুষই কি কারণপরম্পরায় অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, তার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই অনুসন্ধানের মুখেই তিনি দেখতে পান যে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে যে সমস্ত বাসনার জন্ম হয়, তাদের যথাযথ চরিতার্থতা না হওয়ার ফলেই মানুষের মনে বৈকল্য দেখা দেয় এবং এই বিকৃতি কোন মহৎ পথে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ না পেলে শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদনায় পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ মানব মনের সু ও কু দুরকম পরিণতির মূলে আছে এক বা একাধিক অবদমিত ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া। লোকাচার, ধর্ম্মাচার, রাষ্ট্রবিধি, নানা শাসন-অনুশাসনের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন। সুতরাং ইচ্ছা-শক্তি দমন করবার প্রয়োজন হয় না, এমন মানুষই নেই। এই অবদমনই শিল্পীর ক্ষেত্রে আর্টের ভেতর দিয়ে, কবির ক্ষেত্রে কাব্যের ভেতর দিয়ে, সাধকের ক্ষেত্রে সাধনার ভেতর দিয়ে, কর্ম্মীর ক্ষেত্রে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতার রাস্তা খোঁজে। জীবনে যা মিলল না, বাস্তবে যা সফল হল না, কল্পনার ভেতর দিয়ে তাকে সত্য সম্ভব এবং উপভোগ্য করে আত্ম-বিনোদনের প্রবৃত্তি থেকেই আর্ট ও সংস্কৃতির জন্ম—কিন্তু এ দিকটা হল অবদমিত বাসনার দিব্য রূপ (Sublimated form); আবার এই বঞ্চনা ও ব্যর্থতাকে ভোলার জন্যে কুক্রিয়া করা, ইতর পথের অনুসরণ করা, অনৈসর্গিক আচরণের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে আসে অপরাধ প্রবণতা, সেও অবদমিত ইচ্ছাশক্তিরই স্থূল রূপ (gross form)। এই দুই রূপেই অবদমিত বাসনাসমূহ প্রকাশ পেয়ে থাকে—মানুষের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কীর্ত্তি এবং জঘন্যতম কুকীর্ত্তি, দুয়েরই মূল নিবদ্ধ এক জায়গায়—আর সে জায়গাটি হচ্ছে মানুষের অবচেতন মন।

প্রত্যক্ষ জীবনে যে সমস্ত কামনা স্ফূর্ত্তি পায় না, সফল হয় না, সেগুলো পোষকতার অভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে যায় বটে কিন্তু নিঃশেষ হয় না। তারা গিয়ে এই মগ্ন চৈতন্যে বাসা বাঁধে—তারপর শিক্ষা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক এবং বৈজিক প্রভাব অনুসারে সেগুলি মানুষকে ভালো বা মন্দের দিকে চালিত করে। মানুষের সমস্ত কাজ, এক কথায় মানুষের সমস্ত ইতিহাসেরই গোড়ার কথা এই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, তা হলে কি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষই নেই? আচার্য্য ফ্রয়েড বলেন, 'আদর্শ স্বাভাবিক' বলতে যা বোঝায়, সে রকম মানুষ দুর্লভ। কোন না কোন দিকে একটা বৈলক্ষণ্য, একটু বৈপরীত্য মানুষ মাত্রেরই আছে এবং বাইরের বাধা-নিষেধের (taboo) ফলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত

ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণই তার একমাত্র কারণ। এই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে পারলে বা তাদেরকে যথাযথ আত্ম-প্রকাশের পথ দেখাতে পারলে, তাদের আনুষঙ্গিক বিকৃতি-গুলোও সারিয়ে তোলা যায়, এ কথাও ফ্রয়েডই প্রথম প্রতিপন্ন করলেন। উন্মাদ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত গবেষণা হয়েছিল, তাদের ষোল আনা ব্যর্থতা, ফ্রয়েডরই এই 'ইচ্ছা পূরণ' পদ্ধতির দ্বারা যেমন অনেকাংশে নিরাকৃত হল, তেমনই এই গবেষণার পর থেকে মানুষের মনোবৃত্তির মূল-সূত্র নিয়েও টানাটানি পড়ে গেল। মানব মনের ভালো ও মন্দ অবস্থান্তরই কোন না কোন অবদমনের ফল, এ কথা সহসা কেউ স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু ফ্রয়েড দেখালেন, স্বপ্ন ও মূর্চ্ছার অবস্থায় মানুষের সামাজিক মন যখন বাইরের শাসন বল্গা থেকে মুক্ত তখন সে যা বলে, যা করে, তা তথাকথিত সংস্কারের মুখ চায় না, বরং তার বিরুদ্ধ পথেই চলে। গোপন মনের এই স্পৃহা শক্তিই বাইরের চাপে ঢাকা পড়ে আশপাশ দিয়ে নানা আকারে ফুঁড়ে বার হয়—ভাবের উন্নয়ন (sublimation) বা অধোগমন (perversion) দুয়েরই মূল এখানে—সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুই বৃত্তির সমমাত্রিক ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলে বলেই তারা দলে দলে ধার্ম্মিক, শিল্পী, কর্ম্মীও হয় না, আবার খুনী, দুশ্চরিত্র, কদাচারীও হয় না। যার একটা দিক প্রবল হয়ে ওঠে, সে-ই তদনুযায়ী রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, তারাই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন !

অবদমিত বাসনার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেও ফ্রয়েড আর একটি বিস্ময়কর সত্যে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাসনা মাত্রেরই মূলে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট-রূপে থাকে রতি-প্রেরণা (sex urge)। এই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা শক্তির মোটর স্বরূপ। কাব্যে, গানে চিরকাল ধরে যে কেবল প্রেমই একাধিপত্য করে আসছে, তার কারণ এই। বৈষ্ণব, সুফী, খৃষ্ট, বাউল......সকল ধর্ম্মেই যে সাধ্য ও সাধকের মধ্যে একমাত্র কান্তা ভাবই প্রাধান্য লাভ করে আসছে, তারও কারণ এই। এই ভাবে মানুষের সকল কাজ, সকল চিন্তা, সকল নীতির স্বরূপ নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, গৌণ বা মুখ্যভাবে যৌন-বাসনাই তাকে চালিয়ে নিয়ে চলছে। এই বৃত্তির পরিপূর্ণ চরিতার্থতা মানব জীবনে দুর্লভ—তাই মানুষের জীবন ষোল আনা স্বাভাবিক হওয়াও দুরূহ।

আচার্য্য ফ্রয়েডের এই গবেষণায় নৈতিক শুচিবায়ু-গ্রস্তেরা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ধর্ম্ম, শিল্প, প্রেম, এক কথায় মানব সভ্যতার যাবতীয় মহৎ উপাদানই এইভাবে জড় দেহ-বৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ায় পৃথিবীর যুগার্জ্জিত ঐতিহ্যই ভেঙে গেল। তাঁরা ফ্রয়েডকে অশ্লীলতার প্রচারক এবং সভ্যতার শত্রু বলে চীৎকার করতে লাগলেন—কিন্তু আচার্য্য ফ্রয়েড যে নিষ্ঠুর সত্য উদ্ঘাটিত করে দিলেন, অনধিকারীর হাতে তার অপব্যবহার হলেও, বিজ্ঞানী সমাজ এই মতবাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

অবশ্য একথা সত্যি যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির মূল যাই হক, বাইরে যেটা যেরূপে প্রকাশ পায়, পার্থিব হিসাবে তার তাই মূল্য। সুতরাং শিল্পীর শিল্পকে প্রচ্ছন্ন রতি-বাসনার ভাবগত বিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া বা দুষ্কৃতকারীর অপ-কার্য্যকে অবদমিত ইচ্ছাশক্তির প্রতিক্রিয়া বলে ক্ষমা করে যাওয়া সঙ্গত নয়। আদি সত্য যাই হক, দীর্ঘদিনের সংস্কার ও অভ্যাসে মানুষ যে আপেক্ষিক সত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, তার ওপরই সভ্যতার স্থিতি। তা ভেঙে দিলে মানুষের কল্যাণ করা হবে না। ফ্রয়েড নিজেই সেকথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এ কথা আমি কখনো বলি নি যে জগতে সেক্সই একমাত্র সত্যি, আর সবই মিথ্যা। সব বস্তুই আসলে ইলেকট্রন, তাই বলে সোনার কি কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই? সেক্স যদিও চরম সত্য, তবু দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, যাবতীয় মহৎবৃত্তিও ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য। হাতের কাছকার সত্যকে সত্য জেনেই, পিছনের পর্দ্দাটা সরিয়ে দেখা দরকার —নইলে দুদিকেই ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা। আমরা যদি এই কথাটি মনে না রেখে, ফ্রয়েডকে বিচার করতে বসি, তাহলে শুধু ভুলই করব না, বিংশ শতাব্দীর এই ধ্যানী মনীষীর জীবনব্যাপী সাধনাকেও অপমানিত করব।

# নিউইয়র্কের পথে

( ৬৩২ পৃষ্ঠার পর )

আসেনি। অফিসের চাপরাসীকে নিয়ে 'জার্ভিকে'র অফিসে গেলাম। ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে ছোট কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বলতে লাগল ভিসা পেলেই তো হবে না, ফিরে আসার টাকা জমা দেওয়া চাই। এটি না হলে কেন টিকেট বিক্রিই হতে পারে না। ব্যাঙ্কে জমা একশত পাউণ্ড-এর একখানা রসিদ দেখালাম। রসিদখানা দেখে সকলের ধড়েই প্রাণ ফিরে এল।

ভারতবাসী তুমি রাজা হও, প্রজা হও, তোমার সম্মান নিগ্রোদের চেয়ে বেশী নয়। তুমি যে রূমে থাক, তাতে প্রকাশ্যে কোনও ইউরোপীয় থাকবে না, এক টেবিলে খাবে না, তুমি পতিত এবং ঘৃণ্য। কারণ তুমি পরাধীন। জার্ভিক জাহাজে প্রচুর স্থান ছিল। জাহাজের মানচিত্র দেখে জাহাজের মধ্যস্থলে আমার কেবিন ঠিক করতে বললাম। অনেক চিন্তা করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হল, কারণ তখনও জাহাজে অনেক জায়গা ছিল। স্বর্ণময় চকচকে মুদ্রাকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল এগার যেমন পদাঘাত করতে পেরেছিলেন এমন আর কেউ পারেন নি। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে আমার টিকিট কেনা হল, আমি শান্তিতে নূতন সঙ্গীকে নিয়ে রিজেন্ট পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম। রিজেন্ট পার্কের ঘাসের উপর বসতে আমি ভালবাসি, রিজেন্ট পার্কের বৃক্ষতলে বসে পবিত্র বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে আমি বড়ই আরাম পাই। লণ্ডন নগরীর অন্তর্গত অসংখ্য কলকারখানার চিমনি থেকে যে কয়লার ধোঁয়া বেরয় তা নিয়তই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের নাকে প্রবেশ করে। সেই জন্যে প্রত্যেকে দুটি করে রুমাল রাখে। রিজেন্ট পার্কের বাতাসে সেই কদর্য্যতা নেই, সেখানে বসতে ভাল লাগার সেও এক মস্ত কারণ।

(ক্রমশ)

# আজ-কাল

**ভারতের আবহাওয়া**

ইওরোপে মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ায় ভারতবর্ষের ঘটনাস্রোতে যেন ভাটা পড়েছে। এক শ্রমিক ও কৃষকের চাঞ্চল্য কিছু দেখা যাচ্ছে। আর এখানে ওখানে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কমিটি গঠনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইদানীং কংগ্রেসের কোনো কোনো নেতা যেভাবে ব্রিটেনের প্রশস্তি আরম্ভ করেছেন তাতে সত্যাগ্রহ কমিটি গঠনের ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ হয়ে পড়ছে।

ঝরিয়াতে কয়লাখনির শ্রমিকরা যে মাগ্‌গি ভাতা চেয়েছিল, মালিকরা যুদ্ধের ফলে বেশী মুনাফা পাওয়া সত্ত্বেও সে প্রার্থনায় বিচলিত হন নি। ফলে প্রায় ১৩টি খনির ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘট এখন পুরোদমে চলছে। শ্রমিক কর্ম্মীদের অনেককে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে বহিস্কৃত অথবা আটক করা হয়েছে। কলিয়ারির মালিকরা অধিকাংশই ইউরোপিয়ান কোম্পানি।

**ফ্লাউড কমিশন**

বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট যে ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের রিপোর্ট বার হয়েছে। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য মনে করেন যে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" এখন আর চলতে পারে না। তাঁরা সুপারিশ করেছেন যে, নীট আয়ের দশ থেকে পনের গুণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমস্ত জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব গবর্ণমেণ্ট কিনে নিন (দেবোত্তর, ওয়াকফ ও শিক্ষা ট্রাষ্ট বাদ দিয়ে); ভবিষ্যতে রায়তরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সরাসরি জমি বন্দোবস্ত করবে; জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব না কেনা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতির জন্যে কৃষি জমি ও আয়ের উপস্বত্বের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করুন।

কমিশনের সদস্য বাংলার বড় জমিদার বর্দ্ধমানের মহারাজা এবং গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" উঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এ প্রসঙ্গে কমিউনিজমের নাম পর্য্যন্ত টেনে আনতে ছাড়েননি।

## ইওরোপ

**মহাযুদ্ধ**

জার্ম্মানীর পশ্চিম-অভিযান দুঃসাহসিকভাবে এগিয়ে চলেছে। এখন জার্ম্মান বাহিনী উত্তর ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং প্রচণ্ডতম লড়াই হচ্ছে সেইখানে।

**হল্যাণ্ড**

চারদিন যুদ্ধ করার পর হল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ডাচ কমাণ্ডার-ইন-চীফের ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, মিত্রশক্তির স্থলসৈন্য হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ জীল্যাণ্ডে ছাড়া আর কোথাও ডাচদের সাহায্যে যেতে পারেনি। বহুগুণ শক্তিমান জার্ম্মান বাহিনীর সঙ্গে আর লড়াই চালানো নিরর্থক বুঝে দেশকে পূর্ণ ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্যে ডাচ-অধিনায়ক যুদ্ধ থামিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেন। হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করার আগেই রাণী ও রাজপরিবার ইংলণ্ডে চলে' যান। এর পরেও জীল্যাণ্ডে লড়াই চলে; কিন্তু জার্ম্মান ইস্তাহারে এখন জানা যায়, তারা ঐ প্রদেশটাও দখল করে' নিয়েছে। নির্ব্বিচার জার্ম্মান বিমান-আক্রমণে ডাচ রাজধানী রোটারডাম শ্মশানে পরিণত হয়েছে; সেখানে বোমা বর্ষণে এক লক্ষ লোক নাকি মারা গেছে। অন্যান্য জায়গায়ও হল্যাণ্ডের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করার পর ইষ্ট ইণ্ডিজের ডাচ গবর্ণরই সেখানকার পূর্ণ শাসনভার নিয়েছেন; ডাচ ইণ্ডিজে সামরিক আইন জারী হয়েছে এবং সমস্ত জার্ম্মান ও জার্ম্মান-সমর্থকদের আটক করা হয়েছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার কাছ থেকে অ-প্রতিবন্ধকতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে জাপান ঘোষণা করেছে যে, অন্যেরা যদি ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে হাত না দেয় তাহলে সেও দেবে না।

**বেলজিয়াম**

হল্যাণ্ডের লিম্বুর্গ প্রদেশ এবং লুক্সেমবুর্গ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে জার্ম্মানরা বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। মাষ্ট্রিষ্ট থেকে তারা অ্যালবার্ট খালে পড়ায় বেলজিয়ামের পূর্ব্ব ব্যূহ অকেজো হয়ে যায়; তারপর জার্ম্মান বাহিনী দ্রুত লিয়েজ, নামুর, মালিন, লুভ্যাঁ, ব্রুসেল্‌স্ ও অ্যান্ট্‌ওআর্প দখল করেছে; লিয়েজ ও নামুরের কয়েকটা দুর্গ এখনো অসমসাহসে জার্ম্মানদের বাধা দিচ্ছে। ব্রুসেল্‌স্-এর পতনের আগে বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট সমুদ্রতীরের বন্দর ওস্টেণ্ড-এ চলে' যান। বেলজিয়ান রাজ-পরিবার এখন সেখান থেকে ফ্রান্সের স্যাঁতাদ্রেস্-এ চলে এসেছেন। বেলজিয়ামের পশ্চিম অংশে শেল্ড নদীর ধার দিয়ে মিত্রশক্তি ও বেলজিয়ান বাহিনী জার্ম্মানদের বাধা দিচ্ছে। বেলজিয়ামের তিন চতুর্থাংশই এখন জার্ম্মানদের দখলে এসেছে; অয়পেন, মালমেদি ও মোরেসনেৎ প্রদেশ তিনটে হিটলার জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবার আদেশ দিয়েছেন এবং অষ্ট্রিয়ার ডাঃ জাইস-ইন্‌কোয়ার্ট-কে তার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেছেন; ডাঃ জাইস-ইনকোয়ার্ট না যাওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মান অধিকৃত বেলজিয়ান অঞ্চলে জেনারেল ফাল্‌কেন-হাউসেন সামরিক শাসন চালাবেন।

**ফ্রান্স**

নামুর দখল করার পর জার্ম্মান বাহিনী বেলজিয়াম থেকে ফরাসী সীমান্ত পর্য্যন্ত মেজ নদী ধরে' প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে এবং মাজিনো লাইনের উত্তর-পশ্চিমে সেদাঁর কাছে ফরাসী ব্যূহ ভেদ করে। তারপর হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফরাসী সীমান্ত জুড়ে ২৫০ মাইল জায়গায় হিংস্র লড়াই বাধে। জার্ম্মান বিমানবহর খুব নীচু দিয়ে আগে আগে উড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপর বোমা বর্ষণ করতে ও মেশিনগান চালাতে থাকে, তার পিছনে আসতে থাকে জার্ম্মান ট্যাঙ্কবাহিনী এবং তার পিছনে পদাতিক সৈন্য। এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে জার্ম্মানরা তাদের কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে; বিমান ও ট্যাঙ্কের উপরোক্ত সমন্বয়ে তাদের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র ও ক্ষিপ্র আকার ধারণ করে। ফলে ফরাসী সৈন্যেরা পর্য্যুদস্ত হয়ে' হটে যেতে বাধ্য হয় এবং জার্ম্মান বাহিনী সেদাঁ অঞ্চলের ব্যূহ ভেঙে ফেলে উত্তর-পূর্ব্ব ফ্রান্সে প্রবেশ করে। ফরাসী ব্যূহের এই ভাঙন ক্রমে জার্ম্মানদের চাপে আরও প্রশস্ত হয় এবং জার্ম্মান সৈন্যেরা এই জায়গা দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। তারা প্রায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে ফ্রান্সের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে; এই অর্দ্ধবৃত্তের অগ্রবিন্দু এখন হচ্ছে পেরোন শহর এবং নীচের প্রান্ত-বিন্দু হচ্ছে লাওঁ শহর। জার্ম্মানরা

ফরাসীদের নিম্নলিখিত প্রধান শহরগুলো দখল করে' নিয়েছেঃ—সেদাঁ, রেতেল, লাওঁ, ল্য কাতো, ইরস, মেজিয়ের, স্যাঁ কাঁত্যাঁ, পেরোন। তাদের গতি ইংলিশ চ্যানেলের দিকে, তবে এই বৃত্তের মধ্যে তারা প্যারিসকেও বেড় করে' নিতে পারে। এখন প্যারিস থেকে জার্ম্মানরা খুব বেশী দূরে নেই।

**প্রতিরোধ**

জার্ম্মান মেকানাইজ্‌ড্‌ বাহিনী ও বিমানবহরের এই রকম নতুন ধরনের মিলিত আক্রমণে মিত্রশক্তি-বাহিনী প্রথমে অনেকটা বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী তখন এই ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করবার উপযোগী করে তাঁদের ব্যূহ পুনঃ-সংগঠন করেন। এখন বেলজিয়ামে শেল্‌ড্‌ নদীর ধার দিয়ে বৃটিশ ও বেলজিয়ান সৈন্য এবং উত্তর ফ্রান্সে ফরাসী সৈন্য প্রতিপক্ষকে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে; তারা পাল্টা-আক্রমণেও উদ্যোগী হয়েছে। বৃটিশ বিমানবহর এই সংঘর্ষে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের পাল্টা-আক্রমণে জার্ম্মানদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে বলে' জানা যায়। জার্ম্মানরা স্বীকার করেছে যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে এ পর্য্যন্ত তাদের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে। মিত্রশক্তির ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায় নি।

**জার্ম্মান অভিযানের গতি**

জার্ম্মান অভিযানের গতিবিধি দেখে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা অনেকটা অনুমান করা যায়। মনে হচ্ছে, ইংলণ্ডই জার্ম্মান আক্রমণের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এবং জার্ম্মানরা চারিদিক থেকে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করে' ফেল্‌তে চাচ্ছে। একদম উত্তরে নরওয়ে, তার নীচে ডেনমার্ক, তার দক্ষিণে হল্যাণ্ড, তারপর বেলজিয়াম এবং পরিশেষে ফ্রান্স—এই দেশগুলোর উপকূলভাগ জার্ম্মানীর হাতে চলে গেলে ইংলণ্ড প্রায় সব দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ে। এই দেশগুলোর মধ্যে এক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপকূল ছাড়া অন্য সব দেশ জার্ম্মানীর দখলে ইতিমধ্যেই এসে গেছে। এখন জার্ম্মানী একসঙ্গে ফরাসী ও বেলজিয়ান উপকূল অধিকার করবার চেষ্টা করছে। যদি জার্ম্মানীর এ উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহলে যে ইংলণ্ডের উপর প্রত্যক্ষভাবে একটা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হবে তাতে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল তাঁর বক্তৃতাতেও সে সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন।

**গেষ্টাপোর কার্য্যকলাপ**

জার্ম্মান আক্রমণের দ্রুত সাফল্যে একটা বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যা জার্ম্মান সামরিক কৃতকার্য্যতার একটা বড় ভিত্তি। সে বিষয়টি হচ্ছে জার্ম্মান গোয়েন্দা বিভাগ বা গেষ্টাপোর অসাধারণ দক্ষতা। দেখা গেল, যে দেশেই জার্ম্মানরা আক্রমণ চালিয়েছে সেই দেশের সমস্ত ব্যাপারের নাড়ীনক্ষত্র তো তাদের নখদর্পণে রয়েছেই, উপরন্তু সেই দেশের ভিতরে এমন বহু লোকের সঙ্গে তাদের সংযোগ রয়েছে যারা বাইরের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। জার্ম্মান গেষ্টাপোর এই অদৃশ্য বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বল্কান রাষ্ট্রগুলি ও অন্যান্য অনাক্রান্ত দেশ আগে থেকেই সতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে।

২০-৫-৪০

—ওয়াকিবহাল।

---

# অমা-শর্ব্বরী

**শ্রীসোমনাথ রায়**

অমা-শর্ব্বরী।
বন্দিনী কাঁদি মরে,
আকাশে জুটেছে কাল পেচকের দল;
রাতের বাদুড় আর আর নিশাচর।

বন্দী এরাও,
মুক্তি এদেরও চাই।
ধরণী মুখর ইহাদেরই কোলাহলে।

কর্কশধ্বনি ভেদ করি আসে—
ওই শুন ক্রন্দন;
ভাবিলাম রাজনীতি এই বুঝি হবে।
মুক্তিকামী মন নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে সঙ্কুচিত।

*      *      *

নিশীথ হয়ো না ভোর
ঢেকে ফেল অমানিশি
ধরা পড়ে যাবে পেচক-স্বন্দ্ব নেতাদের দুর্ব্বলতা।

---

# পুস্তক পরিচয়

**কপোত-কপোতী**:—লেখিকা অনুরোধা দেবী। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১ টাকা। অনুরোধা দেবীর কবিতাগুলির অধিকাংশ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলির বেশ একটু হালকা ভাব আছে। ইতিপূর্ব্বে লেখিকার কোন বই প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না, প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 'কপোত কপোতী' সমাদর লাভ করবে বলেই বিশ্বাস। বইটির প্রচ্ছদপট ও ছাপা যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকের চিত্তকে যে আকৃষ্ট করে তুলবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

# সাহিত্য-সংবাদ

**হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার**

**—নিখিল বঙ্গ পত্রিকা প্রদর্শনীর ফলাফল—**

বিগত নিখিল বঙ্গ হস্তলিখিত পত্রিকায় ফলাফল বাহির হইল। ভবানীপুরের "শ্রী", হাওড়ার "আলো" ও সাঁতরাগাছির "প্রভাতী" যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে। পত্রিকার সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ পত্রিকা ফেরত লইয়া যান। স্বাঃ—শ্রীমনসা দে, সম্পাদক, হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার।

### কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াছে। প্রথম দুই সপ্তাহ অপেক্ষা তৃতীয় সপ্তাহের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলায় তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। লীগ খেলা যে ক্রমশই জমিয়া উঠিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন্ দল হইবে তাহা এখন বলা বড়ই কঠিন। মোহনবাগান, কালীঘাট, ইস্ট বেঙ্গল, রেঞ্জার্স প্রভৃতি ক্লাবসমূহের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম দুইটি খেলায় পরাজয় বরণ করিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে পরবর্ত্তী চারিটি খেলায় জয়লাভ করা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ানসিপের ভরসা বিশেষ করা যায় না। এই দলের দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় বিমল মুখার্জ্জি ও বেণীপ্রসাদ এখনও পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে খেলিতে পারিতেছেন না। তাহা ছাড়া দুই একজন খেলোয়াড় গত বৎসরের খ্যাতি অনুযায়ীও খেলিতে পারিতেছেন না। দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় প্রেমলাল স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য দেশে গিয়াছেন। কবে যে তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মোহনবাগান দল গত বৎসরের অর্জ্জিত গৌরব পুনরায় যে লাভ করিবে ইহা কোনরূপেই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে তৃতীয় সপ্তাহের কয়েকটি খেলায় যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা যদি শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারে, তবে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

কালীঘাট লীগের সূচনা হইতে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ খেলিতেছে। এখনও পর্য্যন্ত এই দল কোন খেলায় পরাজয় স্বীকার করে নাই। এই বৎসরের যোগদানকারী দলসমূহের মধ্যে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন অন্য কোন দলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই দল যোগদানকারী ভারতীয় দলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এখনও করিতে পারে। আক্রমণভাগের খেলা রক্ষণভাগ অপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে। বৃষ্টি ও কর্দ্দমাক্ত মাঠে এই দলের খেলোয়াড়গণ কোন বৎসরই ভাল খেলিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া এই দলের জোসেফ, রামানুদ, কানাইয়া ও আপ্পারাও যাঁহারা বর্ত্তমানে দলকে বিভিন্ন খেলায় জয়লাভ অর্জ্জন করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল খেলিতে পারেন নাই। সেইজন্য আশঙ্কা হয় এই দল শেষ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান নাও হইতে পারে। এই দলের পক্ষে লীগ বিজয়ী হওয়া যে কষ্টসাধ্য ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইস্ট বেঙ্গল দল ভারতীয় দলসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল। এই দল লীগের যে কোন দলের সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারে। এই বৎসরেও তাহার কোনই ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না। এখনও পর্য্যন্ত এই দল একরূপ ভালই খেলিতেছে। তবে এই কথা ঠিক যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসর এই দল সেইরূপ শক্তিশালী করিয়া গঠন করা সম্ভব হয় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার খেলায় যোগদানে দল অধিকতর শক্তিশালী হইবে। সুতরাং লীগ খেলায় যেরূপভাবে এই দল অগ্রসর হইতেছে তাহাতে লীগ বিজয়ী হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোনই কারণ থাকিবে না।

ইউরোপীয় দলসমূহের মধ্যে রেঞ্জার্স ও পুলিস দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেলিতেছে। এই দুই দলের মধ্যে রেঞ্জার্স দলেরই লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার কিছু আশা আছে। তবে এই দলের প্রধান গলদ খেলায় কোন সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। একদিন শক্তিশালী বর্ডার সৈনিক দলকে ৪—১ গোলে পরাজিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন কাস্টমস দলের নিকট পরাজয় বরণ করা এই দলের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিবে। পুলিস দল খেলায় ক্রমশ উন্নতি করিতেছে। তাহাদের খেলার ধরন দেখিয়া মনে হয়, কিছুদিন অনুশীলনের পর এই দল ভালই খেলিবে এবং লীগ তালিকায় এই দলের স্থান উপরিভাগেই হইবে। বর্ডার সৈনিক দল প্রথম তিনটি খেলায় পর পর বিজয়ী হইয়া অনেকেরই মনে আশা জাগাইয়াছিল যে, এই দল লীগ বিজয়ী হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। এই দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের যে কোনই সম্ভাবনা নাই ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

ই বি আর ও কাস্টমস এই দুইটি দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। লীগ তালিকার মধ্যভাগে ইহাদের স্থান থাকিবে। ক্যালকাটা, ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন এই তিনটি দলের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। ইহারা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়া যাইবার জন্য যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই পর্য্যন্ত লীগ খেলায় যে ফলাফল হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

**লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান**

**প্রথম ডিভিশন**

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কালীঘাট | ৭ | ৫ | ২ | ০ | ১০ | ১ | ১২ |
| রেঞ্জার্স | ৭ | ৩ | ২ | ২ | ১২ | ৬ | ৮ |
| মোহনবাগান | ৬ | ৪ | ০ | ২ | ৬ | ৫ | ৮ |
| ইস্ট বেঙ্গল | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ৫ | ২ | ৭ |
| ই বি আর | ৬ | ২ | ৩ | ১ | ৮ | ৫ | ৭ |
| পুলিস | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ৯ | ৭ | ৭ |
| বর্ডার রেজিমেণ্ট | ৭ | ৩ | ১ | ৩ | ৮ | ১০ | ৭ |
| কাস্টমস | ৫ | ১ | ৩ | ১ | ২ | ৪ | ৫ |
| এরিয়ান্স | ৬ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ৮ | ৪ |
| ক্যালকাটা | ৫ | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ৭ | ৩ |
| ভবানীপুর | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৩ | ৭ | ২ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ২ | ৮ | ২ |

### কলিকাতা ফুটবল বিরোধ

কলিকাতা ফুটবল বিরোধ সম্পর্কে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম ফলত তাহাই হইয়াছে। বাঙলা সরকারের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত দ্রুত কোন মিটমাট হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। আই এফ এ বাঙলা সরকারের মনোনীত সালিশী বোর্ডের সহিত সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা এক প্রস্তাবে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে, আই এফ এর সহিত আলোচনা করিবার পর বাঙলা সরকারের বোর্ড গঠন করা উচিত হয় নাই। তাহা ছাড়া যে সকল সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। আই এফ এ সেই বোর্ডের সহিত সহযোগিতা করিবে যাহাতে কোন সরকারী কর্ম্মচারী বা কোন ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ নাই। এই প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিয়া বাঙলা সরকার পুনরায় এক নূতন বোর্ড গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। মহমেডান স্পোর্টিং ও আই এফ এর সহিত আলোচনা করিয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। আলাপ আলোচনা তারপর বোর্ড গঠন, সুতরাং তাহা সম্ভব হইতে ফুটবল মরসুম যে শেষ হইয়া যাইবে না, কে বলিতে পারে?

### পরলোকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলার অমর সিং

২১শে মে প্রাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলার অমর সিং জামনগরস্থ বাসভবনে "ক্রিকেটার্স কটেজে" নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ সারা ভারতের ক্রীড়ামোদীকে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হারাইল। ১৯৩২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত কি বিদেশে কি স্বদেশে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলিয়া তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতীয় ক্রিকেটের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯১০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কাথিয়াওয়ারে অমর সিংহের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তাঁহার ক্রিকেট খেলার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার রামজী সিং তাঁহাকে বাল্যকালে ক্রিকেট খেলার কৌশল শিক্ষা দেন। ভ্রাতার সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে বোলিং বিষয় পারদর্শিতা লাভ করেন। স্কুলের পক্ষ হইয়া তিনি বিভিন্ন খেলায় যোগদান করিয়া বোলিং ও ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার ভ্রাতা রামজী সিং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলিতে যাইলে অমর সিং তাঁহার সহিত গমন করিতেন ও ভ্রাতার বোলিং কৌশল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন। এইরূপে বাঙলা দেশের ময়মনসিংহ ও ঢাকায় যখন রামজী সিং বিভিন্ন খেলায় যোগদান করেন, তখন বালক অমর সিংহ ভ্রাতার সহিত আসিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অমর সিংহের ক্রিকেট খেলার খ্যাতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখিয়া পাতিয়ালা মহারাজা তাঁহাকে নিজ রাজ্যে নিযুক্ত করেন। পাতিয়ালায় চাকরির জন্য পদার্পণ করিলে অমর সিংহের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় ট্যারাণ্টের পরিচয় হয়। ট্যারাণ্ট যুবক অমর সিংহের ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন, ও নিজে বোলিংয়ের বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের কথা উঠিলে ট্যারাণ্ট অমর সিংহকে বাছাই খেলায় লইবার জন্য জিদ করেন। তাঁহার ইচ্ছায় অমর সিং ঐ বাছাই খেলায় স্থান পান এবং বোলিং ও ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যগণকে চমৎকৃত করেন। খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের সময় ট্যারাণ্ট অমর সিং সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন, "অমর সিংহের বোলিং ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে বিশেষ বেগ দিবে। মরিস টেটের সহিতও ইহার তুলনা করা চলে।" ট্যারাণ্টের উক্তি অমর সিং অক্ষরে অক্ষরে সফল করেন। ভারত ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলিয়া তিনি বিভিন্ন খেলায় বোলিং ও ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট ক্রিকেট সমালোচক উইসডেন অমর সিংহের ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "অমর সিং ভারতীয় একাদশের মধ্যে যে একজন মারাত্মক অল রাউণ্ডার ইহা লিখিতে আমরা বাধ্য। লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় তিনি ব্যাটিংয়ের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দেন। বিশেষ করিয়া স্কারবরোর খেলায় তাঁহার মারের তীব্রতা প্রকৃতই দর্শনীয় হইয়াছিল। বোলার হিসাবে অমর সিং একজন শ্রেষ্ঠ বোলার। তাঁহার বল অনেক সময়েই খেলোয়াড়গণের বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়। বিগত মহাসমরের পর অমর সিংহের ন্যায় বোলার ইংল্যাণ্ডে যে পদার্পণ করে নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।" এইবারের ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন খেলায় বোলিং ও ব্যাটিংয়ের কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) লেস্টারের বিরুদ্ধে খেলিয়া ৯০ রানে ৮টি উইকেট দখল করেন।

(২) উরস্টারের বিরুদ্ধে ৭৮ রানে ৫টি উইকেট পান।

(৩) ইসেক্স দলের বিরুদ্ধে ৪৫ রানে ৪টি উইকেট পান।

(৪) সাসেক্সের বিরুদ্ধে ৬৪টি রানে ৪টি উইকেট পান।

(৫) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২০ রানে ৬টি উইকেট পান।

(৬) কেণ্টের বিরুদ্ধে ৫৭ রানে ৫টি উইকেট পান।

(৭) ল্যাঙ্কাসায়ারের বিরুদ্ধে খেলিয়া তিনি ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ১৩১ রান করেন। এই রান সংখ্যার মধ্যে ১টি ওভার বাউণ্ডারী ও ১৪টি বাউণ্ডারী হয়।

(৮) লেভিসন গাওয়ারের দলের বিরুদ্ধে ১০৭ রান করেন।

এই ভ্রমণের সময় তিনি ১১১টি উইকেট পান ও প্রত্যেক উইকেটের গড়পড়তা রান হয় ১৯.৬২।

### বিদেশে প্রথম ভারতীয় পেশাদার খেলোয়াড়

১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে অমর সিং যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহার ফলে ১৯৩৩ সালে ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের কোলন ক্লাব পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে অমর সিংহকে নিযুক্ত করিতে রাজি হন। এই সময় তিনি পাতিয়ালা রাজ্যেই চাকরি করিতেছিলেন। পাতিয়ালার মহারাজা অমর সিংহকে বিলাতে যাইবার অনুমতি দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কোলন ক্লাবে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে এই দলের পক্ষে খেলিয়া তিনি ব্যাটিং ও বোলিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯৪০ সাল হইতে তিনি ল্যাঙ্কাসায়ার দলের হইয়া খেলিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল না। অমর সিংহের পূর্ব্বে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে বিদেশে পেশাদার হিসাবে কোন দলে যোগদান করার সৌভাগ্য হয় নাই।

### ১৯৩৬ সালের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ দল

কোলন ক্লাবের অনুমতিক্রমে অমর সিং ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের হইয়া খেলিবার অধিকার পান। এই ভ্রমণের সময় তিনি মোট ৭টি খেলায় যোগদান করেন। ব্যাটিংয়ে ২৯২ রান সংগ্রহ করেন ও বোলিংয়ে ২৬টি উইকেট পান। ট্রাফোর্ড টেষ্টে তিনি বোলিংয়ে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেন। নেভিল কাডিস তাঁহার এই খেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় দলের পরাজয়ের মুখে অমর সিংহের খেলার যে কৃতিত্ব দেখিয়াছিলাম তাহা আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। তাঁহার ব্যাটিং ও বোলিং খুবই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। তাঁহাকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বোলার বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। লর্ডস মাঠে ২৪ ওভার বল দিয়া ৩৫ রানে ৫টি উইকেট লাভও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।"

### ভারত ভ্রমণকারী বৈদেশিক দল

ভারত ভ্রমণকারী বৈদেশিক দলসমূহের অধিনায়কগণ সকলেই অমর সিংহের বোলিং ও ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩৮ সালে লর্ড টেনিসন তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন,—"অমর সিংহের ন্যায় জোসেফিয়ান হিটার আমি আর দেখি নাই। বোলার হিসাবে ওরিলীর পর তাঁহাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।" জার্ডিন, ম্যাকার্টিনী, রাইডার, প্রভৃতি সকলেই অমর সিংহের প্রশংসা করেন।

### ব্যাটিংয়ে রেকর্ড

দ্রুত রান তোলায় অমর সিং অদ্বিতীয় ছিলেন। কি বিদেশে ও কি স্বদেশে তাঁহার এই বিষয় যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৯৩৪ সালে কাথিয়ারে তিনি ২২ মিনিটে ১০০ শত রান করিয়া এক নূতন রেকর্ড করেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল।

# সমর-বার্ত্তা

১৬ই মে—

বার্লিনের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, ফ্রান্সের সেডান অঞ্চলে মিউজ নদী অতিক্রম করায় জার্ম্মানরা ম্যাজিনো লাইন ভেদ করিয়াছে। অপরপক্ষে প্যারিসের কর্তৃপক্ষ মহল দাবী করেন যে, ঠিক ম্যাজিনো লাইন, যাহা রাইন হইতে সেডানের ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মণ্টমেডি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা ভাঙ্গে নাই।

বেলজিয়ামের নামুর হইতে ফ্রান্সের সেডান পর্য্যন্ত মিউজ-এর যুদ্ধ সমস্ত দিন প্রচণ্ডভাবে চলে। জার্ম্মানরা এই যুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতেছে এবং ১৯১৪ সালের কৌশলের পরিবর্ত্তে পোলিশ অভিযানের কৌশলে আক্রমণ চালাইতেছে। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম গোলন্দাজ সৈন্য ব্যবহার করিতেছে, তৎপরিবর্ত্তে সাঁজোয়া মোটরাইজড্ বাহিনী লইয়া তাহারা অতি ক্ষিপ্রভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং বিপুল সংখ্যক বিমান নিয়োজিত করিতেছে। এই বিমানবহর ফরাসী পদাতিক বাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে ও মেসিন গান চালাইতেছে। ফরাসী পদাতিক সৈন্যেরা প্রশংসনীয়ভাবে বাধা দিয়াছে; কিন্তু কয়েকটি স্থানে তাহারা বিপুলসংখ্যক ট্যাঙ্কের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয়। ফলে তাহাদিগকে হটিয়া আসিতে হয়।

জীলাণ্ডের উত্তরে মিত্রশক্তি ও জার্ম্মান বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়।

জার্ম্মান যান্ত্রিক ও বোমারু বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ফরাসী সৈন্যদের সুরক্ষিত ম্যাজিনো লাইনের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ফরাসী বাহিনী দুর্গের বাহিরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহাদিগকে স্থলপথে ও আকাশে সক্রিয় যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ফলে ফরাসী সৈন্যদিগকে নূতন করিয়া সন্নিবেশ ও সংস্থাপন করিতে হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বেলজিয়ামের রণক্ষেত্র হইতে কামান ও গোলাগুলীর প্রচণ্ডতায় ইংলণ্ডের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী শহরের ঘরবাড়ী-গুলি ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠে।

১৭ই মে—

বার্লিনের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, জার্ম্মান বাহিনী ম্যাজিনো লাইন ভেদ করিয়া একশত কিলোমিটারের উপর অগ্রসর হইয়াছে। তদুপরি ইস্তাহারে অন্যান্য দাবীর সহিত এই দাবীও করা হইয়াছে যে, ডেনান্টের পশ্চিমে ফরাসী সাঁজোয়া বাহিনী জার্ম্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীকে বাধা দেয়। ফরাসীরা পরাজিত হয়।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, বেলজিয়ামের লুভেনের দক্ষিণদিকবর্ত্তী বৃটিশ ও ফরাসী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় জার্ম্মান বাহিনী ব্রুসেলস্-এ প্রবেশ করিয়াছে।

বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট ব্রুসেলস হইতে অস্টেণ্ডে স্থানান্তরিত হয়।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চ্চিল একদল বিশেষজ্ঞ সহ প্যারিসে গমন করেন। প্যারিসে পৌঁছার পর তিনি ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ রেণোঁ, মঃ দালাদিয়ের এবং জেনারেল গ্যামেলার সহিত আলোচনা করেন।

১৮ই মে—

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মান বাহিনী প্যারিস হইতে ৭০ মাইল দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের একটি ইস্তাহারে বলা হয় যে, বেল-জিয়ামের এণ্টোয়ার্প টাউন হলের উপর জার্ম্মান যুদ্ধ পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

জার্ম্মান সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, ব্যাপক আক্রমণের পর লুভিনের পতন হইয়াছে। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর জার্ম্মান বাহিনী লুভিনের উত্তরাঞ্চলের ব্যূহ ভেদ করিয়া মালিন দখল করিয়াছে।

১৯শে মে—

হের হিটলারের হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, ভালচেরেনের যুদ্ধে জয়লাভ করায় এক্ষণে সমগ্র হল্যাণ্ড উহার দ্বীপপুঞ্জ জার্ম্মানদের করতলগত হইল। উত্তর বেলজিয়ামে এণ্টোয়ার্প অধিকার করার পর জার্ম্মান বাহিনী শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলকে আরও হঠাইয়া দিয়াছে। শত্রুপক্ষ দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম করিতেছে। এণ্টোয়ার্পের পশ্চিমে জার্ম্মান বাহিনী বেলজিয়ামের সেলডে নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং ব্রুসেলসের পশ্চিমে জার্ম্মান বাহিনী ডেলডেতে পৌঁছিয়াছে। ফ্রান্সের লাফেরের ও মবিউজের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় সংগ্রাম চলিয়াছে। ফ্রান্সের সেণ্ট কুয়েণ্টিন ও লেকটো জার্ম্মানদের হস্তগত হইয়াছে। ফ্রান্সের মণ্টমেডির উত্তর-পশ্চিমে ম্যাজিনো লাইনের অন্তর্গত একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি (৫০৫ নং) জার্ম্মানরা দখল করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত (ডাচ সৈন্যদল ব্যতীত) এক লক্ষ দশ সহস্র সৈন্য যুদ্ধে বন্দী করা হইয়াছে।

জার্ম্মান সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, হের হিটলার ডাঃ সাইসিন কোয়ার্টকে জার্ম্মান রাইনের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়ামের ইউপেন, মালমেডি ও মোরেসনেট এই তিনটি এলাকার কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ডাঃ সাইসিন কোয়ার্টের উপর জার্ম্মান বাহিনী কর্ত্তৃক ডাচ এলাকার জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি ডাচ বে-সামরিক অধিবাসীদের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবেন।

জেনারেল গ্যামেলার স্থলে জেনারেল ওয়েগাঁকে ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর কর্ত্তা এবং সমস্ত রণাঙ্গনের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

২০শে মে—

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, জার্ম্মান বাহিনী বেলজিয়ামের ডেণ্ডার নদী অতিক্রম করিয়া উত্তর সেল্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মানরা ক্যাম্ব্রে-পেরোন রাস্তা ধরিয়া ১৯১৬ সালের সোম রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। লীজের সমস্ত আভ্যন্তরীণ দুর্গ এবং একটি ব্যতীত নামুরের সমস্ত দুর্গ জার্ম্মানদের দখলে আসিয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারেল ফন ফলকেন হাউসেন বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্যারিসের খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মানরা রটারডামের উপর যে সকল বোমা নিক্ষেপ করে, তাহার প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ২০০০ পাউণ্ড (২৫ মণ) করিয়া। এই অতিকায় বোমা বর্ষণের ফলে রটারডাম শহরের এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়াছে এবং এক লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে।

বেলজিয়ান রাজ পরিবার ফ্রান্সের সেইটিএব্রেসীতে যাত্রা করিয়াছেন।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মান লাঁও (ফ্রান্স) অধিকার করিয়াছে এবং ওয়াসমাইনে খালের তীরে পৌঁছিয়াছে।

২১শে মে—

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্ম্মানরা ফ্রান্সের আরাস, এমিয়েন্স ও এ্যাবিভিল শহর দখল করিয়াছে। তদুপরি এই দাবীও করা হইয়াছে যে, ফরাসী সপ্তমবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল গিরাকে জার্ম্মান সৈন্যেরা বন্দী করিয়াছে। জেনারেল গিরা সম্প্রতি ফরাসী নবম বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।
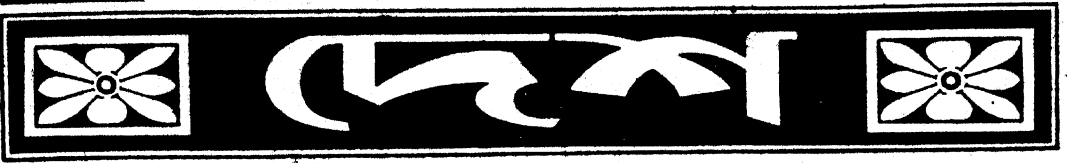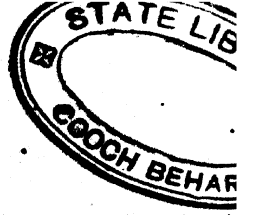
৭ম বর্ষ ] শনিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 1st june, 1940 [ ২৯শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন—**

বাঁঙলা দেশের কয়েকটি প্রাদেশিক সম্মেলন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সম্মেলনের পাবনার অধিবেশন, কুমিল্লা অধিবেশন, বরিশালের অধিবেশনের কথা, এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জলপাইগুড়ির সম্মেলন ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে একটা নূতন সুর ধরাইয়া দেয় এবং পরপ্রত্যাশা ছাড়িয়া স্বাবলম্বনের শক্তির উপর জাতিকে নির্ভরের প্রেরণা প্রদান করে। বিগত ঢাকার অধিবেশনেও এই হিসাবে বাঙলা দেশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। জাতির পক্ষে আজ বড়ই সঙ্কটকাল আসিয়াছে—এই সঙ্কটকালে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু অগ্নিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ বাঙলা দেশের একজন কর্ম্মযোগী সন্তান ঢাকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে জাতির সম্মুখে আসন্ন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের জীবন বহু অভিজ্ঞতাময়; এই জন্য তাঁহার বক্তৃতায় ধোঁয়াটে কথা কিছু নাই। স্বাধীনতা কাহাকে বলে আধ্যাত্মিক পরিভাষার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন; বলিয়াছেন তিনি জাতিকে, আমরা কি চাই, সে কথা এবং স্বাধীনতা পাওয়া বলিতে কার্য্যত কি অধিকার পাওয়া বুঝায় তাহা। শুধু কথা নয়, সেই স্বাধীনতা পাইতে হইলে কার্য্যত কি করা এখন দরকার, তৎসম্বন্ধে একটি গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিও তিনি দিয়াছেন। কংগ্রেসী দক্ষিণী দলের নৈষ্কর্ম্মের অবসাদ হইতে জাতিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে তাঁহার এই নির্দ্দেশ সাহায্য করিবে। এই হিসাবে শুধু বাঙলা দেশে নয়, পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতের উপর ঢাকার এই রাষ্ট্রীয় সম্মেলন প্রভাব বিস্তার করিবে। বাঙালী চিরকাল ভারতের রাষ্ট্রনীতিক নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা আবার সেই দিনের সূচনা পাইতেছি। আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে সকল দিকে। বাহিরের অকেজো বাঁধা বুলি যতই দার্শনিকতার মধুর মোড়কে ভরা হউক না কেন, বাঙালীকে সে জিনিষ আর সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে না।

---

**ঢাকা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত—**

দেশের সকল শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে—ঢাকা সম্মেলনের ইহাই হইল বাণী। দেশ-সেবার ব্যাপকতর কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মেলন সকলকে আহ্বান করিয়াছে। দেশের সকল সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ স্বীকার এবং তৎ-প্রতীকারের পন্থাসমূহের সমন্বয়ের দ্বারাই একটা গোটা জাতিকে কার্য্যত উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হইতে পারে। ঢাকা সম্মেলনে বাঙলার কোন সমস্যাই উপেক্ষিত হয় নাই। ঢাকা সম্মেলনে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের এবং রাজ-নীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের দাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ, অথচ এই মিথ্যা গ্লানি-ভার বাঙলাকে অনর্থক বহন করিতে হইতেছে এবং ইহাকে অপসারণ করিবার বিরুদ্ধে যুক্তিও কিছুই নাই। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বৈষম্য এবং অপ্রীতির ভাবেরই ঐ স্তম্ভ বিগ্রহস্বরূপ। ঐ স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত করিলে, উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাবই বৃদ্ধি পাইবে। আমরা বহুদিন হইতেই এই কলঙ্ক হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য যুক্তি দেখাইয়া আসিতেছি। ঢাকা সম্মেলন এই প্রস্তাব জাতির মনোভাবেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সম্বন্ধে জাতির দাবী এ পর্য্যন্ত পূর্ণ করা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই দাবী পূর্ণ করিলে শান্তি এবং শৃঙ্খলার অনুকূলতাই করা হইবে। দেশের লোকের মনে বিশ্বাস ও প্রত্যয় বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে জনমতানুকূল শক্তিকে নিজেদের পক্ষে সংহত করিবার নীতি শাসকদের পক্ষে রাজনীতিক দূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইবে।

**যুদ্ধ ও ভারত—**

ভারতের সমরসজ্জার সম্বন্ধে বড়লাট সম্প্রতি একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, জগতের অবস্থা যেমন, তাহাতে দেশরক্ষার প্রতি ভারতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সর্ব্বাংশে সার্থক করিবার জন্য ভারতের জাতীয়তা-মূলক মনোবৃত্তিকে এই দিকে উদ্বোধন করা উচিত। ভারত-রক্ষা বিষয়ে ভারতের কোন রাজনীতিক দলের মধ্যেই মতভেদ নাই। সকলেই এদিককার অসহায়ত্ব দূর করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং এইদিকে ভারতবাসীদিগকে সুযোগ দেওয়া হইতেছে না, ইহাই জাতির অভিযোগ। ভারত সরকার আজ জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের শক্তি, সামর্থ্য, উপকরণ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং বাহির হইতে কি পরিমাণ সমরোপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স, এবং দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদিগকে পূর্ণরূপে সজ্জিত করা হইবে। নূতন বিমান বাহিনী গঠনের জন্য লোক লওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। নূতন যে স্থলবাহিনী গঠিত হইবে, তাহাতে যান্ত্রিক সৈন্যদল, পদাতিক ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, সৈন্যবাহী মোটরবাহিনী প্রভৃতি থাকিবে। আমাদের প্রস্তাব এই যে, ভারতের এই সমারায়োজনে দেশের জাতীয়তামূলক মনোবৃত্তির সঙ্গে সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা শাসকদের আবশ্যক এবং অবিলম্বে এ পথে যে সব আন্তরায় আছে, সে সব দূর করা উচিত। ভারতের বিপুল জনবল রহিয়াছে, ধনবলও তাহার কম নয়। আত্মরক্ষায় জাগ্রত স্বাধীন ভারতকে প্রতিহত করিতে পারে, এমন শক্তি জগতে কাহারও নাই। ভারতবাসীর সামরিক যোগ্যতা হইতে কল্যাণ শুধু ভারতেরই নয়, তাহা ব্রিটেনেরও বল সঞ্চার করিবে।

---

**ভারতে সমরোপকরণ নির্ম্মাণ—**

ভারত সরকার তাঁহাদের ইস্তাহারে বলিয়াছেন,—"এই সমস্ত পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আদেশ জারী করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের জন্য যে স্থলবাহিনী গঠন করা হইবে, তাহাতে যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদল, পদাতিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, মোটরযান প্রভৃতি থাকিবে। এই সমস্ত সৈন্যদল গঠন করা হইলে, ভারতীয়গণ সৈন্যদলে বহু চাকুরী পাইবে। এতদ্ব্যতীত সমরোপকরণ তৈয়ার করার জন্য মালপত্র উৎপাদনের ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইতে পারে।" ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের বিপুল জনশক্তিকে দেশরক্ষায় জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদের অতিরিক্ত সাবধানী নীতি ভারতকে অসহায় করিয়াছে। আজ তাঁহাদের দৃষ্টি যে এদিকে জাগ্রত হইয়াছে, ইহাও সুখের বিষয়। আমরা আশা করি, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানসম্মত সমরশিক্ষায় সকল দিকে দেশের লোককে সুবিধা দান করা হইবে। এদেশে উপকরণের অভাব নাই; সেই সব উপকরণ দ্বারা সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য অবিলম্বে দেশে কারখানা খোলা হইবে এবং এদেশের লোকদিগকে সেগুলি প্রস্তুত এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করা হইবে আমরা এ আশাও করিতেছি স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত যোগ্যতা থাকা দরকার, এদেশের যুবকদের এই যোগ্যতা লাভের সুযোগ যতভাবে, যত দিক হইতে পাওয়া যায়, ততই ভাল।

---

**ভারতসচিবের বিবৃতি—**

সেদিন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি সভায় স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—"ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে জাতির অদৃষ্টে যখন ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে, তখন ভারত রক্ষাকার্য্যে বাঙলা দেশেরও কিছু করিবার আছে। আমাদের নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির অপেক্ষা করিতেছেন। মহাযুদ্ধের পর পুরাতন জগৎকে আমরা আর দেখিতে পাইব না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যদি রাষ্ট্রনীতিক বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে এই সময়ে তাঁহারা মানব জাতির মহা উপকার করিতে পারিতেন। ভারতে প্রচুর ধনবল ও জনবল রহিয়াছে। স্বাধীনতা ও ও গণতন্ত্রের আদর্শকে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সহানুভূতির সহিত দেখিতেন এবং ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এদেশের জনসাধারণের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন। ভারতবাসী মিষ্ট কথায় ভুলিবে না। বাস্তবিক সরকারের নীতির যদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে কার্য্যে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা হউক।' নূতন ভারতসচিব আমেরী সাহেবের বিবৃতি পাঠ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন,—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র প্রভুত্বের অহমিকা লইয়া পৃষ্ঠপোষকতা-মূলক উদার অনুগ্রহের মনোবৃত্তি ত্যাগ করেন, ততই মঙ্গল। বাহিরে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতে ব্রিটিশ নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমাদের বহু সহকর্ম্মী কারাগারে এবং আরও অনেককে কারাগারে প্রেরণ করা হইতেছে।" ভারত-বর্ষের জনগণ নাৎসীদের জয় কামনা করে না। নাৎসীদের কর্ম্মনীতি মানব-স্বাধীনতার বিরোধী, ভারতবাসীরা ইহা ভালভাবে জানে। স্বাধীনতা যাহারা চায়, তাহারা নাৎসীদের নীতির বিরুদ্ধতা করিতে বাধ্য। ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইলে, এই হিসাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইত। অবিশ্বাস ও অপ্রত্যয়ের ভাব ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগকে এখনও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। নূতন ভারত-সচিব কমিটি কনফারেন্সের পুরাতন কথা আওড়াইয়াছেন। এই সব এক-ঘেয়ে কথা ভারতবাসীরা আর শুনিতে চায় না—জগতে অন্য সব জাতির কাম্য যাহা, ভারতবাসীরা চায় সেই স্বাধীনতা। আমেরীর বক্তৃতায় যুদ্ধের পর যে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই; এমন কি, ভারতবাসীদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার

পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করেন নাই। এমন কথা তিনি বলেন নাই যে, ভারতবাসীদের নির্ণীত শাসনতন্ত্রই তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন। নূতন ভারতসচিবের উক্তি ভারতীয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

**বাঙালী যুবকদিগকে আহ্বান—**

বিদ্যাকে আয়ত্ত করিলে আর কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না—অন্য বিদ্যার মত সামরিক বিদ্যার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ভারত সরকার সমরসজ্জার যে আয়োজন করিয়াছেন, বাঙালী যুবকদের এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। এক্স-সারভিস এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে কুমার বি এন রায় চৌধুরীর আহ্বান দেশের সর্ব্বত্র যুবকদের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিবে, আমরা ইহা আশা করি। তিনি বলেন, উপকূলরক্ষী বাহিনীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য হাজার হাজার যুবক আসিয়া নাম দিতেছে; কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী উৎসাহ যুবকদের জাগা দরকার, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত নূতন সামরিক বাহিনীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য। তিনি এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, এই সব বাহিনী গঠনে বাঙালী যুবকদল প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিবে। যুবকদের সাহস, শৌর্য্য এবং দেশরক্ষার যোগ্যতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই জাতির বাস্তবিক লাভ, বচনদক্ষতা হইতে এই কর্ম্মদক্ষতা আজ দেশের পক্ষে প্রয়োজন। সকল রকম অসহায়ত্ব হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য বাঙলার যুবকশক্তি জাগ্রত হউক, আমরা ইহাই চাই।

**সমর বিভাগের আবিষ্কার—**

ভারতের রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী কয়েক মাস পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ভারত সরকার মাত্র একটি বিমানবহর গঠনের কাজে হাত দিবেন এবং প্রত্যেকটি বিমান বহর গঠন করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবে। এদিকে 'ইউনাইটেড প্রেস' সিমলা হইতে খবর দিতেছেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম বহরের গঠন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় বহরের জন্য সত্বরই লোক লওয়া হইবে। অতি সত্বরই শিক্ষিত চালক এবং ইঞ্জিনিয়ারদিগকে কাজে লওয়া হইবে, কিছু সময় পরে বিমানবিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য ভারতীয়দিগকে সেনাদলে ভর্ত্তি করা আরম্ভ হইবে। ভারত সরকার সমরসজ্জা সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচার করিবার পর সমর বিভাগ বলিতেছেনে যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী গঠনের কাজ তাড়াতাড়ি করিয়া আগাইয়া যাইবার মত মাল-মসলা এদেশে আছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে। সমর বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছেন—ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক সুদক্ষ বিমানচালক এবং পর্য্যবেক্ষক পাওয়া যাইতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমর বিভাগ এতদিনে যে এ সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। আমরা ভারতবাসী, আমাদের কাছে কিন্তু ইহা নূতন কিছুই নয়, সুদৃঢ় সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হইবার সকল উপাদানই এদেশের আছে। ধন বল, জন বল কিছুরই অভাব নাই। দুঃখের বিষয় বৃটিশ সামরিক কর্ত্তারা এদিক উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি এ বিষয়ে চৈতন্য হয়, তবেও ভাল।

**স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও ভারত—**

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ইঙ্গ-সোভিয়েট বাণিজ্য আলোচনা চালাইবার জন্য গত ২৭শে মে মস্কো রওনা হইয়া গিয়াছেন। এমন লোকের কথার গুরুত্ব ব্রিটিশ জাতির কাছে অবশ্যই কিছু আছে। ইনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলেন,—'গণপরিষদের সাহায্যেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু ইহাই নয়, তিনি একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, জিন্না সাহেবের পাকিস্থানী প্রস্তাব ভারতবাসীরা সমর্থন করে না। ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের নেতৃত্বের অপেক্ষা করিতেছে এবং কংগ্রেসের দাবীই জনমতের দ্বারা সমর্থিত।' অধিকাংশের মতই গণতান্ত্রিকতার গোড়াকার কথা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি গণতান্ত্রিকতারই সমর্থক হন এবং ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক শাসন দেওয়াই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই—যত সমস্যা সকলই হইল মনগড়া; কংগ্রেসের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইলেই, অন্তত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা না করিবেন, ততদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ প্রভৃতি সাজান সমস্যা দেখা দিতে থাকিবেই। এ সত্যটি জলের মত পরিষ্কার। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস সে কথাটা বলিয়া দিয়াছেন।

**জিন্না সাহেবের জিদ—**

দেশের সকল দল, সকল সম্প্রদায় ঐক্যের উপর জোর দিতেছেন; কিন্তু জিন্না সাহেবের পথ ভিন্ন। তিনি এখনও ভেদবাদের উপরই জোর দিয়া ভারতের সঙ্ঘশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাহাই নহে ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টকে পর্য্যন্ত শাসাইয়া বলিতেছেন যে, আমরা মোশ্লেম লীগওয়ালারা আমাদের সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন ঘোষণা যেন তাঁহারা না করেন। কংগ্রেসের উপর আক্রমণ করিয়া জিন্না সাহেব বলিয়াছেন, কংগ্রেস মোশ্লেম ভারতকে কংগ্রেসের কৃপার ভিখারী করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতেছে। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত হুবলীতে কিছুদিন আগে মুসলীম লীগের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনেও জিন্না সাহেব তম্বী করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থানী কর্ম্মপদ্ধতি পাকা করিবার জন্য সংগ্রাম করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের ঐক্য এবং সংহতি এইরূপে পাকিস্থানী-ওয়ালাদের প্রশ্রয়ে নষ্ট না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জিন্নার দল সন্তুষ্ট হইবেন না। বর্ত্তমানের এই সঙ্কটকালে ভেদ-বিভেদ বাড়াইবার এই যে চেষ্টা চলিতেছে, ইহার অনিষ্টকারিতা কত,

বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারতের ঐক্যবন্ধ শক্তির উদ্বোধনই যদি বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত, এই সব ভেদবাদীদের মুখ যাহাতে বন্ধ হয় এমন ব্যবস্থা করা। ভারত এখনও মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার যুগে পড়িয়া নাই। জগতের ঘটনাচক্রের গতিতে সে মনোবৃত্তি ধরিয়া থাকিলে ভারত পিষ্ট হইবে। বাঁচিতে হইলে ভারতের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলকে তাঁহাদের সকলের মাতৃভূমি এই ভারতভূমির স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে। এমন সঙ্কল্পশীলতাকে যে শিথিল করিবে. সে ভারতের শত্রু।

---

**রেলের ভাড়া হ্রাস—**

কিছুদিন হইল, রেলের মাশুল এবং ভাড়া শতকরা ১২॥ টাকা হারে বৃদ্ধি করা হয়। দেশের চারিদিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে সমালেচনা হইতে থাকে। সেইসব সমালোচনার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তাঁহরা নানাদিক হইতে বিবেচনা করিয়া ঐ হারে মাশুল এবং ভাড়া বাড়াইয়াছিলেন। এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধি ব্যবসা ব্যাণিজ্যের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব হয়ত বিস্তার করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করিতেছেন এবং এই সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া যেখানে আবশ্যক ভাড়ার হার বদলাইবার ভার গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের কর্ত্তাদিগকে দিয়াছেন। যেখানে বুঝা যাইবে যে. ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ক্ষতি হইতেছে, সেখানে ভাড়ার হার কমান হইবে। ভাড়া বা মাশুল বাড়াইলে যে আয় বাড়ে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে কমে, গবর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা একথাটা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। আমরা আশা করি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার হার কমানোর ঔচিত্য গবর্ণমেণ্ট এখন উপলব্ধি করিবেন এবং আয় বৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ভাড়া কমাইবেন।

---

**বাঙলায় নূতন কলেজ—**

বাঙলা দেশে এ বৎসর তিনটি নূতন কলেজ হইল। মালদহে ফজলুল হক আদিনা কলেজ, বরিশালে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলু হকের পৃষ্ঠপোষকতায় ফজলুল হক কলেজ এবং সিরাজগঞ্জ কলেজ। কলেজের সংখ্যা মফঃস্বলে বাড়িলে সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় ছেলেরা লেখাপড়া শিখিতে পারে; সুতরাং সে দিক হইতে ইহা বেশ ভাল;কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ যাহাতে উন্নত থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, বাঙলা দেশে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এখন সাম্প্রদায়িকতার দৌরাত্ম্য আসিয়া ঢুকিতেছে এবং জাতির যাহারা আশা-ভরসাস্থল, যাহাদের মধ্যে আশা করা যায় সার্ব্বভৌম উদার আদর্শ সেই সব তরুণদের মধ্যেও সেই বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাজসাহী কলেজে সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কম হয় নাই। যে সব কলেজে এইরূপ হীন সাম্প্রদায়িকতা ছড়াইবার কেন্দ্রস্বরূপে পরিণত হইতে পারে, তেমন কলেজ দেশে না থাকাই ভাল। আমরা আশা করি, মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙলা দেশের নূতন তিনটি কলেজ সেই আতঙ্ক হইতে মুক্ত থাকিবে। কলেজগুলি হিন্দু এবং মুসলমানের সমবেত সংস্কৃতির প্রসারে বাঙলার শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

---

**চাউলের মূল্য—**

যুদ্ধের পর চাউলের মূল্য বাড়িয়াছে, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি এবং ইন্সিওরেন্সের খরচা বাড়াই, ইহার মূলে অনেকটা রহিয়াছে। চাউলের দাম কম থাকিলে চাকুরীজীবীদের সুবিধা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙলা দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী এবং তাহারাই ধান্যের চাষী। ধানের দর বাড়িলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে; এই দিক হইতে আমরা চাউলের বাজার একেবারে মন্দা থাকে, ইহা চাহি না। অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ধান্য এবং চাউলের সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ বেশী। এখানে ধান্যের চাষ যেমন হয় ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী, সেইরূপ এই প্রদেশের লোকের প্রধান খাদ্যই হইল চাউল; সুতরাং চাউলের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সরকারের চেয়ে বাঙলা সরকারের কর্ত্তব্য বেশী। কেহ কেহ এখন প্রস্তাব করিতেছেন যে, চাউলের বাজার তেজী রাখিবার জন্য রেঙ্গুনী চাউলের উপর আমদানী শুল্ক বসান দরকার। রেঙ্গুনী চাউলের উপর দরদ অবশ্য আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু চাউল বাঙলার যখন প্রধান খাদ্য, তখন চাউলের আমদানী চলতি রাখিবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা আমাদের মতে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রেঙ্গুনী চাউল যাহাতে বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়া বাঙলার চাউলের বাজারকে একেবারে মন্দা করিয়া না ফেলে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা ভাল; কিন্তু রেঙ্গুনী চাউল এদেশে যে পরিমাণ আমদানী হইতেছে, তাহাতে ঐরূপ আতঙ্কের কারণ ঘটিবে বলিয়া এখনও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমানে চাউলের দাম যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে বেশ চড়াই বলা যাইতে পারে।

---

# হিন্দু সমাজের ব্যাধি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(১১)

কাশীর বিখ্যাত মনীষী ডাঃ ভগবানদাসের পত্র উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। সুতরাং হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রতিকারকল্পে ডাঃ ভগবানদাস যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাঃ ভগবানদাস মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি Ideal বা আদর্শ মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কোন সমাজ উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দু সমাজে যতদিন অবিকৃত ছিল, ততদিন হিন্দু সমাজে কোন জটিল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, বেকারের দলও দেখা দেয় নাই। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা সুসংগত সামঞ্জস্যও ছিল। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন হইতে বিকৃত হইয়া জাতিভেদে পরিণত হইতে লাগিল, তখন হইতেই হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। ডাঃ ভগবানদাসের অভিমত এই যে, যদি হিন্দু সমাজে পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমানের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হইবে। যে কর্ম্মবিভাগের নীতির উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমানকালে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন সমাজই তাহা অনুসরণ করে নাই; ফলে ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচের আত্যন্তিক বৈষম্য ঘটিয়াছে। এত দুঃখদৈন্য বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে উহাই। সমাজতন্ত্রবাদ বা ধনসাম্যবাদ এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য যে সব উপায় চিন্তা করিতেছে, ডাঃ ভগবানদাসের মতে সেই সব উপায়ে সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে না। আর্য্যহিন্দুদের উদ্ভাবিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি নিহিত আছে। ইহাকে এক হিসাবে Practical Socialism বলা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজ যদি সেই প্রাচীন আদর্শ গ্রহণ করে, তবে আবার সে পূর্ব্বের গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে।

কিন্তু 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' যতই 'আদর্শ' ব্যবস্থা হোক, বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজে তাহা ঠিক ঠিক প্রচলিত করা অসম্ভব। যমুনার জল যেমন উজান বহানো যায় না, প্রাচীন যুগের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও তেমনই এ যুগে ফিরাইয়া আনা যায় না।

ডাঃ ভগবানদাসও তাহা জানেন। তিনি প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থায় সমাজে শিক্ষক, রক্ষক, পালক ও ধারক এই চতুর্ধা বিভক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত সহযোগ ও সহকারিতার ফলে সামাজিক স্বস্তি ও সম্পদ সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিল।

It was framed by the ancient thinkers of India, who had discovered the greater, nobler, and for the humanity, the far more useful complimentary half-truth and fact of human evolution in accordance with the great "Law of alliance for existence." (Dire need for a scientist manifesto).

ডাঃ ভগবানদাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—It has obviously degenerated utterly and become a curse instead of blessing. অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত ও অধঃপতিত হইয়াছে এবং হিন্দু সমাজের পক্ষে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাও মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই, এমন কি অভিশাপস্বরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবস্থার মারাত্মক দোষ এই যে, ইহাতে সমাজে ধনী দরিদ্রের মধ্যে আত্যন্তিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ ধনসম্পদ বাড়াইবার যে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি কোটিপতি, লক্ষপতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের ভোগবিলাসের আড়ম্বর বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অপরদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্দ্ধাশনে অনশনে রোগে ব্যাধিতে পশুর ন্যায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সংগে সংগে ঐশ্বর্য্যও ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য সমাজের সর্ব্বস্তরে ন্যায়সংগতভাবে বণ্টিত হইতেছে না। ফলে বিরাট অন্ন সমস্যা বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরিয়া সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, কৃষক ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করিয়াছে। ডাঃ ভগবানদাসের ভাষায়—Humanity is in imminent danger of dying from mutual hatred—born of lack of equitable distribution of sufficient bread.

এই বিদ্রোহের মধ্য হইতেই Socialism and Communism—সমাজতন্ত্রবাদ ও ধন সাম্যবাদের জন্ম এবং সোভিয়েট-রাশিয়া এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমানে জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ ভগবানদাস মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন আর্য্যদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরই সোভিয়েটের এই সাম্যবাদমূলক ব্যবস্থা vast experiment বা সুমহৎ পরীক্ষা হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই পরীক্ষার পথে সোভিয়েট-রাশিয়া যেমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার কতকগুলি বিষয়ে মারাত্মক এবং নিষ্ঠুর ভ্রমও করিয়াছে—

The vast Russian experiment now in progress, is the second effort of mankind in the same direction; but, while it has achieved marvels, it has also committed many serious and cruel mistakes, is still undergoing great internal tribulations and is correcting its errors.

সেইজন্য ডাঃ ভগবানদাস মনে করেন যে, একদিকে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনসাম্যবাদ—অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—ইহার মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করিলে কেবল হিন্দু সমাজ নয়, বর্ত্তমান বিশ্বমানব সমাজের সমস্যারও মীমাংসা করা যাইতে পারে। ইহার নাম দিয়াছেন তিনি 'নূতনতর ও উন্নততর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদিগকে সেই নূতন পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

The right middle course between impossibly equilatarian communism and criminally inequitous capitalism, a new and complete scheme of social structure (a newer and better 'Barnasramdharma').

ডাঃ ভগবানদাস যে সুসংস্কৃত বৈজ্ঞানিক 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের' কথা বলিয়াছেন, আদর্শ হিসাবে তাহা খুবই উচ্চ সন্দেহ নাই, উহার মূল উদ্দেশ্য আমরা সমর্থনও করি। কিন্তু ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর কিনা বা হইলে কবে সম্ভবপর হইবে, তাহা বলা কঠিন। সুতরাং সেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য

প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া হিন্দু সমাজের দুর্গতি রোধ করিবার জন্য অবিলম্বেই আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মতে এখন প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক সাম্যবাদ ও কর্ম্মযোগের আদর্শ প্রচার করা এবং সাহসের সঙ্গে তদনুযায়ী সংস্কার প্রচেষ্টা করা। সাম্যবাদের কথা উঠিলেই, কতকগুলি অজ্ঞ ব্যক্তি মুরুব্বীয়ানার চালে বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যঋষিরা যে সাম্যবাদের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার চেয়ে বড় আদর্শ আর কোথায় আছে? 'জীবমাত্রেই ব্রহ্ম'—এই আদর্শ ত হিন্দুদেরই। কিন্তু কেবল প্রাচীন আর্য্যঋষিরা কেন, বুদ্ধদেব, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষেরাও ত ঐ মহান সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তবু হিন্দু সমাজের এই দুর্দ্দশা কেন, জাতিভেদ এখনও লুপ্ত হয় নাই কেন, তথাকথিত "শূদ্রেরা" এখনও মানুষের অধিকার পায় নাই কেন? তাহার কারণ, কেবল কথায় চিড়া ভেজে না। মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলিব এবং কার্য্যকালে ভেদ ও বৈষম্যের দুর্গ আরও পাকা করিতে থাকিব, ইহা ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণা, জঘন্য স্বার্থপরতা। সুতরাং হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণীয়দের আজ ভণ্ডামি ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজেদের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত স্বার্থ, দম্ভ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সমাজের কল্যাণ, তথা নিজেদের কল্যাণের জন্যও তথাকথিত "শূদ্রদের" মানুষের অধিকার দিতে হইবে। এই শূদ্রশক্তি যতদিন অবজ্ঞাত, দলিত, পিষ্ট হইয়া থাকিবে, ততদিন হিন্দু সমাজের কল্যাণ নাই, উহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের পথেই টানিয়া লইয়া যাইবে। "শূদ্রদের" মধ্যে যদি আমরা মনুষ্যত্বের বোধ জাগাইতে পারি, তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে পারি, তবে তাহাদের মধ্য হইতে যে প্রচণ্ড শক্তি জাগ্রত হইবে, তাহা হিন্দু সমাজে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমানে সমাজের শূদ্রশক্তির মধ্যে যে হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। কিন্তু তাহারা একা মরিবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই মরিব। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা হিন্দু সমাজের কেহ নহে, হিন্দু সমাজের ভাল মন্দে তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। কতকটা নৈরাশ্যে, কতকটা প্রতিশোধ স্পৃহায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। যাহারা করিতেছে না, তাহারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কৃত্রিম "তপশীলী জাতির" সৃষ্টি করিয়া হিন্দু সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছেন। অতএব এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তবে ধ্বংস নিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত কর্ম্মযোগ ও রজোগুণের আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মবিমুখতা এবং একটা তামসিক অহিংসার ভাব হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশেষত তাহার নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ফলে স্ব স্ব বৃত্তিকে তাহারা হীন মনে করিতে শিখিয়াছে। কৃষিজীবী হিন্দুরা যে কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিতেছে, তাহার মূলে কেবল তাহাদের অক্ষমতা নয়, কৃষিকার্য্যের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবও আছে। ফলে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইতেছে, সমস্ত জমি মুসলমান কৃষকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে ঘোর দুর্লক্ষণ। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে আর অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই হিন্দুরা ভূমিশূন্য বেকার শ্রমিকের দলে পরিণত হইবে। অতএব হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে কর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে হইবে। হিন্দু কৃষকেরা আবার যাহাতে জমিতে ফিরিয়া যায়, পরিত্যক্ত শ্রমশিল্পগুলি গ্রহণ করে, তাহার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গ্রাম্য কুটীরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণীয়েরা যাহাতে গ্রামে থাকিয়াই ঐ সব শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এটা ত অর্থনৈতিক সমস্যা—ইহার সঙ্গে হিন্দুর সামাজিক সমস্যার সম্বন্ধ কি? কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা জানেন যে, অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সমাজের উপর কতখানি কাজ করে। কর্ম্মহীন হতাশ বেকারের দল লইয়া কোন সমাজই রক্ষা করা যায় না, হিন্দু সমাজকেও রক্ষা করা যাইবে না।

তারপর রজোগুণের কথা। অহিংসার নামে যে ঘোর তামসিকতা হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বামী বিবেকানন্দ বহু পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য চাই রজোগুণ—বীর্য্যবান কর্ম্মের সজীবতা। কিন্তু তাঁহার কথা আমরা ভাল করিয়া শুনি নাই। আর এই অহিংস তামসিকতার সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে—অদৃষ্টবাদ, পরলোক বিলাসিতা, ইহলোকের প্রতি ঔদাসীন্য। সমস্ত মিলিয়া হিন্দু জাতিকে এমন শান্ত, নিরীহ, বশংবদ non-aggresive ও submissive করিয়া তুলিয়াছে যে বর্ত্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতাও হিন্দুদের প্রকৃতিতে এই ভাব দৃঢ়মূল করিয়া দিয়াছে। জীববিজ্ঞানের দিক হইতে এই Non-aggressiveness বা সবল মনোভাবের অভাব একটা জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাধি—ক্ষয়রোগেরই তুল্য। বহু প্রাচীন জাতি—প্রাচীন সভ্যতা ইহার ফলে ধ্বংস হইয়াছে। হিন্দুরা যদি সময় থাকিতে এই "পরাজিতের মনোভাব" ত্যাগ করিয়া সবল, সতেজ মনোভাবের অনুশীলন করিতে না পারে, তবে জীববিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তাহাদেরও অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যু হইবে। পৃথিবীতে দুর্ব্বলের স্থান নাই—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই মহাসত্য আজ আমাদিগকে জাতি হিসাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

(ক্রমশ)

# অসমাপ্ত কবিতা

( গল্প )

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাতাসে বাসন্তীর চুল উড়িতেছিল।

বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অফিসের পোষাক পরিতে পরিতে হীরেন্দ্র বলিল, "দেখছ বাসন্তী, কি রকম বাতাস দিয়েছে! আজ আমারই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে।"

"লেখ না কেন", বাসন্তী বলিল সহাস্যে।

"মিল পাই না যে", কোটের বোতাম লাগাইয়া হীরেন্দ্র বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, তুমি কি একেবারে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলে বাসন্তী? কতদিন লেখ নি বল তো!"

"সময় কই, সংসারের—"

"রাখ তোমার সংসার," হীরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "সেই সব কথা তোমার মনে আছে? নতুন বিয়ের পর কত মধু-রাত্তিরে তুমি কবিতা লিখে—"

"থাম, থাম," বাসন্তী চোখ রাঙাইল, "কি যে বল!"

হীরেন্দ্র বলিল, "শোন, আজ আমি কোন কথাই শুনব না, অফিস থেকে ফিরে তোমার কবিতা শুনতে চাই—"

"দোহাই তোমার, রক্ষা কর—"

"আমার অবাধ্য তুমি কখনও হও না," হীরেন্দ্র ঘরের বাহিরে পা দিয়া বলিল, "বুঝলে তো?"

"হ্যাঁ," মহাবিপন্ন হইয়া বাসন্তী বলিল, "কিন্তু লিখব ছাই কি নিয়ে?"

"কেন, আমাকে নিয়ে," হাসিয়া হীরেন্দ্র চলিয়া গেল।

* * * *

কবিতা একটা লিখিতেই হইবে। দুপুরবেলা সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া বাসন্তী কাগজ কলম লইয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিল। সে একবার চারিদিক তাকাইয়া লইল। তাহার ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিয়া বারান্দায় খেলা করিতেছে। আর, প্রথম বসন্তের বাতাস বাসন্তীকে বারবার বিচলিত করিতেছে। সে অকস্মাৎ প্রেরণা পাইল। কিন্তু লিখিবে কি, আজ এই অলস মন্থর মধ্যাহ্নে বসন্তের ব্যাকুল বাতাসে বাসন্তীর অনেক কথাই যে মনে পড়িতেছে একে একে!

এককালে বাসন্তী প্রচুর কবিতা লিখিত। অনুভূতি পাইত, প্রেরণা পাইত, পাইত আনন্দ—তখন তাহার বয়স কতই বা! আর, পৃথিবী তখন বাসন্তীর নিকট অন্যরকম ছিল; যখন তাহাদের প্রথম বিবাহ হয়।

কোনদিন হয়তো মেঘে মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল অথবা কোন জ্যোৎস্না মত্ত রাত্রে বাসন্তীর ঘুম ভাঙিয়া গেল—তখন সে বসিত লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া আর পাশে বসিত হীরেন্দ্র। বাসন্তী কবিতা লিখিত। লেখা শেষ হইবার পর হীরেন্দ্র বলিত, "দেখি কি লিখলে?"

"ভাল হয় নি, দেখাব না," বাসন্তী মুচকিয়া হাসিত।

"দেখাতেই হবে।"

"কিছুতেই না।"

"কেড়ে নেব।"

"ইঃ—"

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ হাসাহাসি হইত। অবশেষে হীরেন্দ্র বাসন্তীর কাছ হইতে কাগজটি টানিয়া লইত।

"বাঃ," হীরেন্দ্র পড়িতে পড়িতে বলিত, "তোমার কবিতা কিন্তু দিন দিন সত্যই খুব ভাল হচ্ছে বাসন্তী।"

বাসন্তীর মনে হইত তাহার কবিতা রচনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সে পাইত। প্রশংসা সে অনেক পাইয়াছে, বহু পত্রিকায় তাহার কবিতা নিয়মিত ছাপা হয়। কিন্তু তাহার স্বামীর প্রশংসা পাইলে সারা মুখ প্রচুর খুশিতে ঝলমল করিয়া উঠিত। এমনি করিয়াই তাহার দিন কাটিত।

তার পর তাহাদের একটি ছেলে হইল। উঃ, কি আনন্দ সেদিন দুইজনের। হাসি আর মুখে ধরে না! সে বড় হইতে লাগিল। নাম তাহার দেওয়া হইল পিপু। প্রথম ছেলে, কাজেই বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল। এর পর বাসন্তীর কবিতা লেখা কমিয়া গেল। আর ওসব করিবার সময়ই বা কোথায়! ছেলের দেখাশুনা করিতে হয় সব সময়। কিন্তু বাসন্তী লিখিত তবুও তবে খুব কম।

আজ নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ দুপুরে কবিতা রচনা করিতে গিয়া বাসন্তীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে কত বিগত রঙিন মুহূর্ত একে একে! সে সব কোন যুগের কথা! আজ মনে হয় কোন রাত্রে সে যেন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কিন্তু বেশ ভাল লাগিতেছে তাহার ভাবিতে।

তার পর আর একটি হইল, এবারেও ছেলে। এবার একেবারে বাসন্তীর কবিতা রচনা করা গেল কমিয়া আর সংসারের কাজও গেল বাড়িয়া। দ্বিতীয় ছেলেটি বড় কাঁদুনে হইল। কাজেই বাসন্তীর লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখা আর হইয়া উঠিত না।

হীরেন্দ্র বলিত, "বন্ধুরা বলে, তোমার স্ত্রীর লেখা আর দেখি না কেন হে হীরেন? সত্যি বাসন্তী কি কর তুমি সারা-দিন?"

বাসন্তী হাসিয়া বলিত, "যা রত্ন দিয়েছ দুটি, তাদের সামলাতেই দিন কেটে যায়।"

"ও তোমার বাজে কথা, কেন অন্য কবিদের কি ছেলে-পুলে নেই?"

"জানি না বাপু অত।"

"লিখতেই হবে তোমাকে।"

"ও বাবা, জোর?" বাসন্তী হাসিয়া ফেলিত।

"হাসি নয় কবি, লিখ একবার—"

হীরেন্দ্র কথা শেষ করিতে পারিত না। হঠাৎ ছেলে কাঁদিয়া উঠিত পাশের ঘরে আর বাসন্তী ছুটিয়া যাইত। বাসন্তীর যে লিখিবার ইচ্ছা ছিল না এমন নয়, কিন্তু আজ কাল করিতে করিতে লেখা আর শেষ অবধি হইয়া উঠিত না। তার উপর আবার একটি মেয়ে হইল বাসন্তীর। দিন

যাইতে লাগিল। সংসারের চাপে কবি বাসন্তী চূর্ণ হইয়া গেল। আজ কবিতার কথা ভাবিলে তাহার হাসি পায়। একদিন যেমন তাহার দুরন্ত ইচ্ছা ছিল কবিতা লিখিবার তাহা আজ আর নাই। এখন ওসব মনে হয় ছেলে মানুষি।

* * * *

কিন্তু আজ বাসন্তীকে লিখিতেই হইবে। হীরেন্দ্র অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে আর তাহার নিজেরও বহু বিগত দিনের কথা ভাবিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে এখন একটু একটু। সত্যই তো বাসন্তী কতদিন লিখে নাই! কতদিন সে সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে নাই! অকস্মাৎ প্রেরণার আবেশে অবশ হইল বাসন্তীর সারা অঙ্গ। পূর্ব্বে কবিতা লিখিবার আগে তাহার যেমন শিহরন আসিত, আজ আবার তাহা আসিল, আবার সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল বার বার।

বাতাসে কক্ষ আলোড়িত। বাসন্তী লিখিয়া চলিয়াছে একমনে। খুশিতে তাহার সারা মুখ ঝলমল করিতেছে। বেশ সুন্দর হইতেছে লাইনগুলি। হীরেন্দ্রের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। এমন লাইন বাসন্তী খুব কমই লিখিয়াছে। নূতন দীপ্তি তাহার সারা মুখে। সে সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেল। লাইনের পর লাইন নিমেষে নিমেষে নির্ণিমেষে আপনার মনে বাসন্তী রচনা করিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনিয়া চমকিয়া বাসন্তী মুখ তুলিল। আলমারির উপর হইতে তাহার মেজো ছেলে জিজি বে-কায়দায় পড়িয়া গিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাসন্তী খাট হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিল জিজির কাছে। চোখ ওর বন্ধ এখনও। অজ্ঞান হইয়া গেল নাকি! বাসন্তী ঘাবড়াইয়া গেল। কি করিবে সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া গেছে। ভয়ে বাসন্তী নিজেই কাঁপিতে লাগিল থর থর করিয়া। ছেলেটা আলমারির উপর উঠিল কেমন করিয়া। বাসন্তীর অন্য ছেলেমেয়েদের মুখও কালো হইয়া গেছে ভয়ে।

আঘাত বিশেষ কিছুই নয়। কয়েক মিনিট পরই জিজি তড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এইবার বাসন্তীর ভয় কাটিয়া গেল, ছেলের মাথায় দিল সে ঠান্ডা জল, তারপর দিল তাড়া। কিন্তু কে কান দেয় মায়ের কথায়। চীৎকার করিয়া ছেলেমেয়েরা ফের খেলা আরম্ভ করিল। তাহাদের দেখিলে কে বলিবে যে একটু আগে কিছু হইয়াছিল।

বাসন্তী ফিরিয়া আসিল খাটের কাছে আবার। লিখিবার প্রেরণা চলিয়া গিয়াছে, ইচ্ছাও নাই। আর অর্দ্ধেক লেখা কাগজটাও যে নাই। বসন্ত বাতাসে কোথায় উড়িয়া গেছে কে জানে! ক্লান্ত হইয়া বাসন্তী শুইয়া পড়িল।

---

# ধরণী আমার

শ্রীআবদুল হালিম

প্রথম যেদিন চোখ মেলেছিলুম,—
ধরণী ছিল কচি মেয়ের মত,
ভাস্বর,
আর ছিল প্রকাশমুখীন এক ভাব
যে প্রকাশে ফুটে ওঠে..............
ফুটে ওঠে
মানুষ,
সভ্যতা,
আর সমাজ।

জীবনের স্তরে স্তরে পরিণতি এল—
এল তিক্ত অভিজ্ঞতা........
কষায় যার আস্বাদন;
দেহ আর মন বিষিয়ে গেল।

গেল বিষিয়ে...........
নিভে গেল
কৈশোরের স্বপ্ন!
যে স্বপন ভরে ছিল,
ভরে ছিল,
আলোর সোণায়।

মরার মত প'ড়ে ধরণী
শত শতাব্দীর যেন গলিত শব
চারদিকে শকুণি আর চিল......
কামান আর গোলা,
বীভৎস মানুষ,
বর্ব্বর সমাজ।

# নিজামের রাজ্য

(ভ্রমণ-কাহিনী)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তিন

ঔরঙ্গাবাদ

ঔরঙ্গাবাদে যে ধর্ম্মশালাটিতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সেটির পাশেই ডাকবাংলো। আর নিকটেই ডাকঘর, বাসের আড্ডা, একা, টাঙ্গা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেক যাত্রী গাড়ী পৌঁছিলেই দৌলতাবাদ, এলোরা ও অজন্তা যাইবার জন্য যাত্রী-দিগকে প্ররোচিত করে।

আমরা ধরমশালার ঘরটিকে সেখানকার চাকরকে দিয়া ধোয়াইয়া মোছাইয়া পরিষ্কার করিলাম। তক্তাপোশ আনিয়া বিছানা পাতিলাম, একটি ছোট টেবিল ও দুইখানি চেয়ার আনিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সব গুছাইয়া ফেলিলাম। ধরমশালাটির প্রাঙ্গণে একটি বাগান, কয়েকটি কল এবং স্নানের ঘর থাকায় যাত্রিনিবাসের দিক দিয়া এই বাড়ীটি বেশ ভাল। বাড়ীটি দ্বিতল। দ্বিতলের ঘরে থাকিতে হইলে যিনি ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহার অনুমতি লইতে হয়। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ধরমশালার তত্ত্বাবধান করিতে আসেন। একজন তত্ত্বাবধায়ক আছেন তিনিও বেশ ভাল লোক, আমাদের সুখসুবিধার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এই ধরমশালায় তিনদিন পর্য্যন্ত থাকিতে কোন ভাড়া লাগে না, তবে বিজলিবাতি, স্নানের জন্য গরম জল ইত্যাদি বাবদ পারিশ্রমিক হিসাবে ধরমশালার ভৃত্যকে কিছু বকশিশ দিলেই চলে। যাত্রিদলের মধ্যে অ-বাঙালীই বেশী। আমরা কয়েকজন বাঙালী পুরুষ ও মহিলাকে দেখিয়া পুলকিত হইলাম। ইঁহারা কলিকাতার বিশিষ্ট পরিবারের লোক। বিখ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমল রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার কন্যাও ছিলেন, কাজেই পরিচয় ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু ভারতের অদ্বিতীয় নৃতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় অমলবাবুর শ্বশুর। শরৎবাবুর স্নেহ, উদারতা এবং ঘনিষ্ঠতা সর্ব্বদা আমার মনে থাকিবে। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও কত না ক্লেশ করিয়া শিশুভারতীর জন্য ভারতের আদিম জাতিদের বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। অমলবাবুর সহিতও নানাভাবে পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহার ভ্রাতা ও কন্যা প্রভৃতিকেও এই নিজামের রাজ্যে যাইয়া যে কিরূপ ভাল লাগিয়াছিল বিদেশে বেড়াইতে যাঁহারা যান তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন।

ইঁহারা আমাদের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ Zone Ticket কিনিয়া অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই মোটরগাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল কাজেই তাঁহারা বেলা ৯ টার সময়ই খাওয়াদাওয়া সারিয়া ঔরঙ্গাবাদ ও এলোরা দেখিতে চলিয়া গেলেন।

মানুষ প্রথমেই খাদ্যের জন্য ব্যাকুল হয়। ধরমশালার প্রবেশ-পথের পাশে এবং বাহিরে রাস্তার উপর কয়েকটি দোকান আছে। সেখানকার একটি দোকানের মালিক রাজারাম। জাতিতে রাজপুত। মাথায় মস্তবড় পাগড়ি, একটি চক্ষু অন্ধপ্রায়, প্রকাণ্ড একটা লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল—"আপনাদের খাওয়ার কি করিতে হইবে বলুন।" সে গর্ব্ব করিয়া কহিল, যত বাঙালীবাবু ও মাঈ লোকেরা আসেন, তাঁহারা সকলেই দোয়া করিয়া তাঁহার কাছেই খানা খান। সে ডাল, খুব সরু চালের ভাত, ভাজি (তরকারি), দহি সব দিতে পারে, রান্নাও খুব ভাল। প্রতি থালা চারি আনা মাত্র। ধরমশালার ম্যানেজার এবং অন্যান্য যাত্রীরাও তাহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিলে আমরাও তাহাকেই খানা পাকাইবার অনুমতি দিলাম। এদিকে আমরাও স্নান জলযোগ সারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। ঠিক হইল বেলা ১১-১২টার সময় মোটরে করিয়া ঔরঙ্গাবাদ দেখিতে বাহির হইব। রাজারাম ট্যাক্সি ঠিক করিয়া দিল। আমরা পিতা পুত্রী এবং মাদ্রাজী ভদ্রলোক সহযাত্রী হইলাম। ভদ্রলোকটির নাম জি সুবারিডু (G. Subaridoo), ইঁহার বাড়ী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বাদালপলিন্টেয়, ইয়াগোনটি পল্লী, জিলা কারনোলা। এই ভদ্র-লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কালো হইলেও মুখে বেশ শ্রী আছে, মস্তবড় ব্যবসায়ী, ভারতের নানা স্থানে তাঁহার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে, কলিকাতাতেও তাঁহার কারবার চলে। ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন না, কিন্তু উর্দ্দু ও হিন্দী বলেন অতি চমৎকার। কাজেই ইঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই। সুবারিডু ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া এইবার এলোরা, অজন্তা, দৌলতাবাদ এবং আরও অনেক স্থান পর্য্যটন করিবেন। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইবার জন্য ভাড়া স্থির হইল আট টাকা। আমাদের মনে হয় যাত্রীদের দলবদ্ধ হইয়া ঐ অর্থে ৩।৪জনে মিলিয়া ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বেড়ানোই ভাল, তাহাতে স্বাধীনতা থাকে। সময়ের জন্য তাড়া থাকে না, কিন্তু বাসে গেলে অনেক সময় ভাল করিয়া দেখাশুনাও করিতে পারা যান না। সেইজন্য আমরা ট্যাক্সিতে বেড়ানই সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম।

ধর্ম্মশালাটির সম্মুখের পথটি ঔরঙ্গাবাদ বা আওরঙ্গাবাদ সিটির দিকে চলিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে শহর। বাড়ী ঘর সব বিক্ষিপ্তভাবে দূরে দূরে অবস্থিত। পথের ধূলা উড়াইয়া একা গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, বিচিত্র পোশাক পরা দেশ বিদেশের পুরুষ ও নারী হল্লা করিতে করিতে যাইতেছে। হাওয়া গাড়ীর ও বাসের ভোঁ ভোঁ শব্দ পথযাত্রী পথিককে সচকিত করিয়া বেগে এলোরা, অজন্তার দিকে চলিয়াছে। রাস্তার বিপরীত দিকে একটা সাপুড়িয়া সাপের খেলা দেখাইতেছে, ছোট এক দর্জীর দোকানে সেলাইয়ের কল খট্ খট্ শব্দে জামা সেলাই করিতেছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতেছিলাম।

চারিদিকে মুক্ত প্রান্তর। দূরে দূরে নীল ভূধর শ্রেণী। শ্যামল বন্ধুর ভূমির মধ্য দিয়া নানাদিকে পথ। কোন পথের দুই দিকে তরুশ্রেণী, কোথাও কিছুই নাই। দূরে দৌলতাবাদের দুর্গ-গিরি দেখা যাইতেছে। শীতের বাতাস বেশ জোরে বহিতেছে। ধর্ম্মশালায় যাত্রীদল কেহ আসিতেছে, কেহ বা যাইতেছে। কেহই স্থির নাই। শুধু যাওয়া-আসার অশ্রান্ত গতি। ভাবিতেছি কখন শহর দেখিতে বাহির হইব। এখানে থাকিলে মন চায় বাহির হইতে।

আমরা যে ঔরঙ্গাবাদের কথা বলিব, তাহার একটু প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি। আওরঙ্গাবাদ বা ঔরঙ্গাবাদ শহরটি নিজাম রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নিজামের রাজধানী হাইদরাবাদ হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ২৭১ মাইল। এক সময়ে ঔরঙ্গাবাদ বেশ জনাকীর্ণ ছিল; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গাবাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার, ক্রমশ হ্রাস পাইয়া উহা পনের-কুড়ি হাজারে মাত্র দাঁড়ায়। বর্ত্তমান সময়ে জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬,৮৭৬এ দাঁড়াইয়াছে। সম্রাট আলমগীরের এই নগরীটি

অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আওরঙ্গাবাদ শহরটি মালিক অম্বর ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মালিক অম্বর আহ্মদনগর রাজ্যের অমাত্য ছিলেন, তিনি একজন আবেসিনীয় দাস ছিলেন। তখন ইহার নাম ছিল কির্কি এবং শহরটির চারিদিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন ঃ—

Daulatabad, including the imperial portion of the late Ahmadnagar kingdom; capital Aurangabad (formerly Khirki), a few miles from Daulatabad, which was considered the principal of many important fortresses.'' The Oxford History of India, by V. A. Smith, page 400.

আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে—

অবস্থিত। রাজধানী ছিল নান্দার, দুর্গ কান্দাহার। এ দুইটি স্থানই এখন নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। (৪) দৌলতাবাদ—আহ্মদনগরের রাজাদের নিজস্ব ভূভাগ সংবলিত। রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ বা আওরঙ্গাবাদ। এই চারিটি প্রদেশে মোট ৬৪টি দুর্গ ছিল। এই কয়টি প্রদেশের রাজস্ব ছিল পাঁচ কোটি টাকা। এই রাজস্ব লব্ধ অর্থ দ্বারাই ঔরঙ্গজেবের বিচার বিভাগ ও সৈনিক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত।

ঔরঙ্গজেবের রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মুর্শিদকুলি খাঁর নামের সহিত বাঙালী মাত্রেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ পারস্য দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের সহিত দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেওয়ান
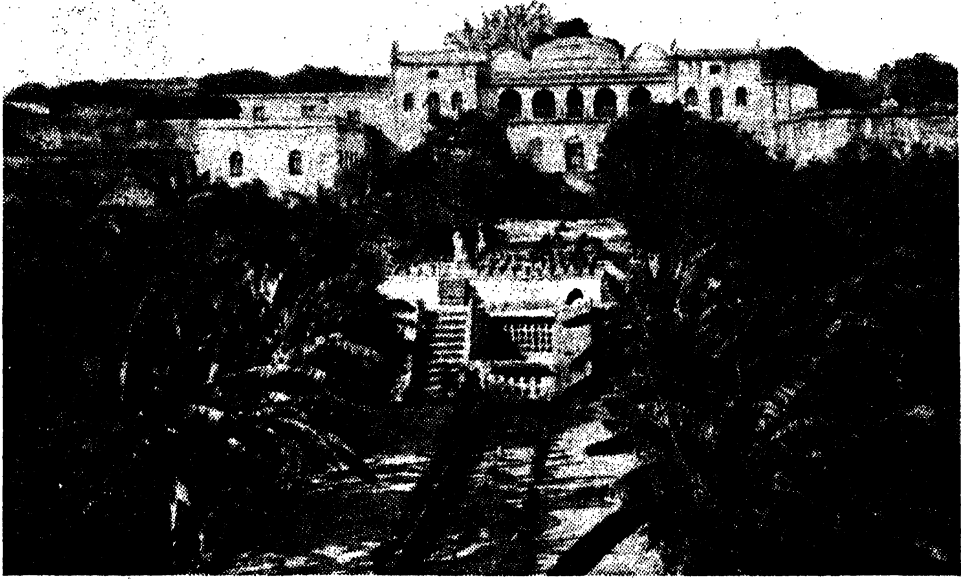
কিল্লা আর্ক বা দুর্গপ্রাসাদ ঃ ঔরঙ্গাবাদ

"The present name of the city dates back to 1657 A.D. when Aurangzeb as Viceroy of the Decan made it his residence and erected palaces and other buildings for himself and his nobles.

ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বৎসর। তাঁহার শাসনাধীনে চারিটি প্রদেশ ছিলঃ (১) খান্দেশ—তাপ্তি নদীর অধিত্যকা প্রদেশ, রাজধানী ছিল বুরহানপুর, আশিরনগর দুর্গ ছিল এই প্রদেশ ভুক্ত। (২) বেরার—বিরার—খান্দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত; বর্ত্তমানে উহা মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজধানী ঐলিচপুর; দুর্গ গাউইলগড়। (৩) তেলিঙ্গানা—বা তেলুগুদেশ। বন জঙ্গল ও পর্ব্বত পরিবেষ্টিত প্রদেশ। বেরার এবং গোলকুণ্ডা প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টোডরমল্লের ন্যায় তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের জরিপ ইত্যাদি করিয়া রাজস্বের সুব্যবস্থা করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রজা ও কৃষকগণের নিকট হইতে নগদ টাকা, শস্য বা তাহাদের সাধ্যানুরূপ দ্রব্যাদি রাজস্বরূপে গ্রহণ করিতেন। চাষারা যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে চাষবাস করিতে পারে এবং তাহাদের কোনরূপ আর্থিক ক্লেশ না হয় সেজন্য তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইত, ফলে কৃষকদের ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। A capable observer noted in 1658 that then there was no waste land near Aurangabad। ইহা হইতেই মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং ঔরঙ্গজেবের প্রজাপ্রীতি এবং শাসননীতির মধ্যে যে কিরূপ উদারতা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঔরঙ্গজেব প্রথমবার ১৬৩৬—১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ প্রতিনিধি

ছিলেন। পরে আবার ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে—

"Towards the end of the year (1653) he took up his residence at the official capital, either in the fort of Daulatabad or in the neighbouring town of Aurangabad."

তাঁহার কাছে ঔরঙ্গাবাদ বিশেষ প্রিয় ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং জলবায়ু তাঁহার নিকট অত্যন্ত আরামপ্রদ মনে হইত। এখানে তাঁহার যে সব কীর্ত্তি চিহ্ন আছে এইবার সেই সবের কথা বলিব।

আমরা বেলা ১১টার সময় ট্যাক্সিতে চড়িলাম। রাজারাম আমাদের আহারের ব্যবস্থা বেশ ভালই করিয়াছিল। তাহার সত্তর বৎসর বয়স্কা পত্নী বাঙালী যাত্রীদের জন্য রান্নাবান্না করিতে করিতে অনেকটা বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। আর সকলের চেয়ে রাজারামের যত্ন ও সমাদর বেশ ভাল লাগিয়াছিল।

গাড়ী পথের ধূলি উড়াইয়া চলিতে লাগিল। আমরা বোম্বে ও পুনা হইতে শুনিয়াছিলাম যে ঔরঙ্গাবাদের ছোট তাজমহলটি অতি সুন্দর—আগ্রার তাজমহলের অনুকরণে নির্ম্মিত। কাজেই প্রথমে সেই পথেই চলিলাম। দূর হইতেই রৌদ্রকিরণে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত বিবি-কা-মাকবারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা যে পথ দিয়া যাইতেছিলাম—সেই পথের এদিকে ওদিকে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর বাড়ী, ক্লাব, অফিস, আদালত প্রভৃতিও চোখে পড়িয়াছিল। মুক্ত মাঠের মধ্যে বাড়ী গুলি অবস্থিত থাকায় দূর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়।

আমরা শীঘ্রই আসিয়া বিবি-কা-মাকবারার তোরণ সমীপে আসিয়া পৌঁছিলাম। সম্মুখে খুব বড় প্রাঙ্গণ। তারপর প্রবেশ-তোরণ। তোরণটি বেশ উচ্চ; মধ্য দিয়া পথ। পথের দুই ধারে বাগান—জলপ্রণালী, শ্রেণীবদ্ধ বিলাতী ঝাউগাছ। তারপরে বিরাট চত্বরের উপর ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা পত্নী রাবিয়া দুরানীর সমাধি হর্ম্ম্য বিদ্যমান। সমাধি মন্দিরের তোরণ দ্বার পিত্তল দিয়া আবৃত। উহার এক পার্শ্বে খোদিত লিপি আছে। লিপিটি এই—"১০৮৯ হিজরীতে শিল্পী আতাউল্লার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হায়াৎ খাঁ শিল্পীদ্বারা এই দ্বার নির্ম্মিত হয়।" দ্বারের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাখির মূর্ত্তি আছে। আমরা প্রশস্ত ভিত্তিভূমির চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। চারি কোণে চারিটি মিনার আছে। কয়েকজন তামিলী যুবক একটির পর আর একটি মিনারের উপর উঠিতেছিল এবং চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছিল। তাহার একবর্ণও আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমরা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া সমাধিকে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলাম। রাবিয়া দুরানী সম্রাট আলমগীরের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। এখানেও তাজমহলেরই মত বিবিধ লতা, ফুল ও ফল খোদিত দেখিলাম।

পানচাক্কির পাশের খাল : ঔরঙ্গাবাদ

সকলের চেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কয়েকটি ড্রাগনের খোদিত মূর্ত্তি। ইহা হইতে শিল্পীদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা হয় যে, তাহারা হয়তো বা এই স্থানে চীনা বা জাপানী ড্রাগনের আদর্শে এই মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছে। সমাধির উচ্চস্থানে অনেক মৌচাক। মাছিরা ভন্ ভন্ করিয়া উড়িতেছে। এখানে জন সমাগম মাত্রই দেখিলাম না। তারপর কেহ বকশিশের জন্যও প্রার্থনা করিল না। বিরাট পুরী, চারিদিকে মুক্ত প্রান্তর ঢেউ খেলিতে খেলিতে কোন্ দূর পর্ব্বতসীমায় যাইয়া ঠেকিয়াছে। একটা স্তব্ধ বিজনতা এখানে ঘিরিয়া আছে। আজ কোথায় আলমগীর বাদশাহ, কোথায় তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী, কোথায় তাঁহার পুত্রকন্যাগণ! আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম—মানুষের গর্ব্ব, তেজ, অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা কি তার পরিণাম। দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম :—

"চারি কোণে চারি স্তম্ভ, সুদীর্ঘ সুসম
শরীর রক্ষক বীর পুরুষের মত।
দণ্ডায়িত কাল সঙ্গে করি পরাক্রম
তনু শুভ্রে নভ নীল করিয়া লাঞ্ছিত।
* * * *
সম্মুখে উদ্যান যেন মরকত বন
তরু শ্রেণী দুই পাশে সখি শ্রেণী প্রায়।
শোভে মাঝে জলযন্ত্রে শীত প্রস্রবণ
মোগল মহিষী যোগ্য ভোগ্য সমুদয়।"

লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঔরঙ্গাবাদের বিশেষ দর্শনীয় স্থান হইতেছে বিবি-কা-মাকবারা—অর্থাৎ বেগম রাবি দুরানির সমাধি ভবন। অনেকে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং দুই একজনের লিখিত ভ্রমণ কাহিনীতেও পড়িয়াছিলাম যে, এই সমাধি ভবন সম্রাট ঔরঙ্গজীব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা কথাটা শুনিয়া কেমন সন্দেহ হইয়াছিল, যে ইসলামবিশ্বাসী সাধু ও ত্যাগী সম্রাট, নিজের সুখ সুবিধা ও বিলাসের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না, তিনি এই সমাধিভবন নির্ম্মাণের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয় করিবেন? সত্যই তাই। বিবি-কা-মাকবারা ঔরঙ্গজেব নির্ম্মাণ করেন নাই। করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র আজম সাহা। এই মাকবারা নির্ম্মাণ করিতে ৬৬৮,২০৩।৶০ আনা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা তাজের অনুকরণে নির্ম্মিত হইলেও কোনরূপেই যে তাজের সঙ্গে তুলনীয় নহে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞ স্থপতি বিদ্যাবিশারদেরা বলেন:

"The building is a replica of the Taj, in comparison with which it suffers, but the building has certain features which place it among the most important monuments of its kind in India. For instance, the minarets at the four angles of the platform of this monument show a better sense of proportion than those of the Taj which look somewhat weak in the general scheme. The mosaic tiles of the main gateway of this building represent another feature which for its technique and elegance is unique in India. The patterns are floral, representing roses. The red porphry floor of the mosque of this building is also very attractive, slabs of such size and purity of colour and material being rarely found."

সত্যই এই সমাধি মন্দিরের চারি কোণের সুসম স্তম্ভ, সম্মুখের তোরণ, পাথরে খোদাই গোলাপ লতাপাতা ফুল-ফল, ব্যবহৃত মূল্যবান প্রস্তর রাজি এই সমাধি ভবনটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তাজের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও মোগল স্থাপত্যের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আমরা বিবি-কা-মাকবারা দেখিয়া পানচাক্কি দেখিতে আসিলাম। আসিবার পথে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান, সমাধি ভবন, কোনটি মাথা তুলিয়া আছে, কোনটি ধ্বংসমুখে পতিত, ইট পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, খোদিত লিপির কোনটি গায়ে সংলগ্ন, কোনটি ভগ্ন, কেবলি ধ্বংস চিহ্ন সব। কোথাও কোনও প্রাচীন দেওয়াল কতক দূর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে। তার পর আর কোন চিহ্নই নাই।

পানচাক্কির কাছে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই জলধারার ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিতেছিলাম। রাস্তার উপর হইতেই নির্ম্মল সলিলরাশিপূর্ণ সরোবর দেখিলাম। কে জানে কোন্ অজানা স্থান হইতে জল আসিতেছে, এ জলের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—কেবলি আসিতেছে। বড় বড় সব গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অতি মনোরম শোভা। পানচাক্কি শব্দের অর্থ হইতেছে পান-জল, চাক্কি চক্রের সাহায্যে আকর্ষিত জল অর্থাৎ জলযন্ত্র সাহায্যে এখানে জল আসে বলিয়া পান বা পানি চাক্কি হইতে 'পানচাক্কি' নামে দাঁড়াইয়াছে।

আবার মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ-পথে পানচাক্কির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দূর হইতে দেখিলাম একটি ভদ্রলোক একটি ঘরের বারান্দায় বসিয়া কি যেন লেখাপড়া করিতেছেন। আমরা তাঁহার কাছে যাইয়া ইংরেজীতে সম্ভাষণ করিবামাত্রই তিনি আমাদের পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের নাম এফ রহমান। রহমান সাহেব বোম্বের Illustrated Weeklyর একটি Cross puzzle-এর সমস্যা পূরণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি অতি সুন্দর সুমিষ্ট জল আনিয়া দিলেন। আমরা তিনজনে জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। শীতল শিকর-সিক্ত সমীরণ আমাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দিতেছিল।

রহমান সাহেব পূর্ব্বে নিজামের শিক্ষা বিভাগে ছিলেন। সম্প্রতি কয়েক মাস হইল পানচাক্কির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আমার কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন—আমারও একটি কন্যা আছে, সে এইবার ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া আই এ পড়িতেছে। আমার পত্নী ও কন্যা এখানে থাকিলে আজ বড়ই আনন্দিত হইতেন। আমার মেয়ে ও স্ত্রী দুইজনেই বেশ ইংরেজী বলিতে পারেন। রহমান সাহেবের দাড়ি, গোঁফ কামানো। পায়জামা পরা ও পাঞ্জাবি গায়ে। দীর্ঘ দেহ গৌরবর্ণ পুরুষ। অত্যন্ত সদালাপী। রহমান সাহেব বলিতে লাগিলেন—"এই নির্জ্জন স্থানে—My days among the dead are past"—দেখুন না চারিদিকে সমাধি। কি আর করি, বসে বসে কবিতা লিখি। আর Illustrated Weekly-Puzzle পূরণ করিয়া সময় কাটাই। কয়েকবার Prize পাইয়াছি তাই বেশ লোভ হয়। আমার অনুরোধে তিনি তাঁহার লিখিত কয়েকটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদও করিয়া দিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটিকে আমাদের বেশ ভাল লাগিল, কিভাবে কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।—তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সব দেখাইলেন।

বাবা শাহ মুশাফির নামক একজন সাধু পুরুষ এখানে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইঁহার পরিচয় ইত্যাদি এখানে লিখিত আছে সময়াভাবে আমরা সেই বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া আনিতে পারি নাই। রহমান সাহেব আমাদের যত্ন সহকারে সমাধি স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে যুঁই ও চামেলি গাছ অজস্র পুষ্পসম্ভারে চারিদিক সুরভিত করিয়া দিয়াছিল, অসংখ্য গোলাপ ফুটিয়াছিল। আমরা সমাধি বেদীতে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিলাম। সেই কক্ষটি মধুর সৌরভে সুরভিত। ধূপ জ্বলিতেছে—অগুরুর মৃদু সৌরভ কক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গম্ভীর মাধুর্য্যে চারিদিক পূর্ণ। এই স্থানে নানাদেশ হইতে আগত অনেক মুসলমান ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া অধ্যয়ন করে।

পূর্ব্বে এখানে অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ছিল, তাহার অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রহমান সাহেব একটি পুরাতন পাথরের সিন্দুক হইতে কতকগুলি অতি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি বাহির করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকখানি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি সেগুলি রক্ষার জন্য এবং পুঁথিশালাটিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য কয়েকটি সুন্দর সুন্দর আলমিরা ও একটি কক্ষ সজ্জিত করিতেছেন। তখনও মেজের কাজ শেষ হয় নাই। তিনি আমাদিগকে একখানি অতি ক্ষুদ্র "কোরান শরীফ" দেখাইলেন—২½×২ ইঞ্চি। এই সমাধি মন্দিরটির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য জায়গিরের আয় প্রায় লক্ষ টাকা। উদ্যানটিও অতি সুন্দর। রহমন সাহেব আমাদিগকে এক পাশের সিঁড়ি দিয়া

নীচে লইয়া আসিলেন। সেখানে দেখা গেল—একটি স্রোতোধারা কল কল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। নদীটি পূর্ব্ববঙ্গের খালের মত অল্প পরিসর। অনেকে নৌকায় করিয়া বেড়াইতে যান। বাবা শাহ মুজাফরের সমাধি ভবনটি ঈষৎ লোহিতাভ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়।

কোথা হইতে এখানে অনবরত জল আসিতেছে, কোথায় ইহার উৎসধারা তাহা জানিতে একটা কৌতূহল জন্মে। রহমান সাহেব বলিলেন, নিজাম সরকারের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী বহু অনুসন্ধানে ঔরাঙ্গাবাদ এবং দৌলতাবাদের মধ্যে এক নিভৃত পর্ব্বত বক্ষে জল সরবরাহের বিরাটাকার সব চৌবাচ্চা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে জল আসিত এবং তাহা হইতেই চারিদিকে জল সরবরাহ হইত। সত্য কথা বলিতে কি আজিও ঔরঙ্গাবাদের এই জল সরবরাহের রহস্য রহস্যাবৃতই রহিয়াছে। ঔরঙ্গজেবের প্রাসাদের পার্শ্বেই নাকি পূর্ব্বে জল সরবরাহের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ছিল। অনেকে বলেন, মালিক অম্বার ঐ যন্ত্রাদি আবিষ্কার করেন।

আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। শাহ মুসাফিরের এই সমাধি ভবনটি বেশী প্রাচীন নহে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। এই মসজিদ সংলগ্ন একটি জাঁতার কল, যে খালটির কথা বলিয়াছি, তাহার স্রোতোধারায় পরিচালিত হইত। যখন কল চলিত না, তখন উহার জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া শত শত প্রস্রবণের সৃষ্টি করিত।

আমরা আমাদের এই নব পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইতে বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিজ হস্তে যুঁই, মালতী, গোলাপ প্রভৃতি ফুল তুলিয়া তিনজনকে উপহার দিলেন—হাসিয়া কবি রহমান সাহেব বলিলেন—"ফুলের সুরভির মত আমার স্মৃতি যেন আপনাদিগকে আনন্দ দেয়।" আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কিল্লা আর্ক দেখিতে আসিলাম। কিল্লা আর্ক বা দুর্গ প্রাসাদটি নিজাম গভর্নমেণ্ট সংস্কার করিয়াছেন এবং বাগানটিকেও নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন। বাগানের সম্মুখ দিকের বাড়ীটি ব্যতীত আর সব কয়টিই সংস্কৃত হইয়া রূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে। বাগানটি অতি সুন্দর। আমরা এখানে কিল্লা আর্কের যে চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহা সংস্কারের পূর্ব্বেকার চিত্র।

ঔরঙ্গাবাদের প্রাচীন নাম ঘির্কি, সে কথা আগেই বলিয়াছি। মালিক অম্বর নিজামসাহী রাজ্যের রাজধানী করিবার জন্যই এই স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। মালিক অম্বরের নির্ম্মিত নৌখাণ্ডা প্রাসাদ, বাহারি-কুল বা জরকাল তোরণ, জামি মসজিদ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া আজিও তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ঘির্কির ইতিহাস জানা যায় না। সম্ভবত তখন এখানে বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কেননা এ স্থানের চারিদিকে বৌদ্ধ গুহা মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া সেকালের বৌদ্ধ প্রাধান্যের ইতিহাস বলিতেছে।

ঔরঙ্গাবাদে বাঙালী বেশী থাকেন না। মিঃ রফিফ আমাকে ডাক্তার শীলের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সিটিতে থাকেন, তাঁহার পত্নীর ও ডাক্তার শীলের রফিফ সাহেব খুব সুখ্যাতি করিলেন। শ্রীযুক্তা শীল জায়া নাকি উর্দ্দু ও হিন্দী এমন সুন্দর বলিতে পারেন যে, এ দেশীয় মহিলারাও কোনও ত্রুটি ধরিতে পারেন না। বঙ্গীয় মহিলারা ভাষা শিক্ষা অতি সহজেই করিতে পারেন, আমি বিদেশে বহু স্থানে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা শহরের বাহিরে ধর্ম্মশালায় থাকিতাম—আর ডাক্তার শীল থাকেন সিটি হাসপাতালে। ইচ্ছা করিয়াও তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারি নাই এবং সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

ঔরঙ্গাবাদের 'সিটি' অংশ জনাকীর্ণ। পথ ঘাট সংকীর্ণ। ধূলা বালি ভরা অপরিচ্ছন্ন। সেই নাগরিক গোলযোগ। সেই দোকান—বিদেশী পণ্য পরিপূর্ণ। সেই মাড়োয়ারী মহাজনের প্রাধান্য। কোন বৈচিত্র্য নাই। এক স্থানে একটি মেলা জমিয়াছিল, সেখানে অনেক ভিন্ন ভিন্ন রকমের মাটির পুতুল বিক্রী হইতেছিল আমরা কয়েকটি পুতুল কিনিয়াছিলাম—কিন্তু সে পুতুল আর কলিকাতা পৌঁছিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা শেষে ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। রাজারাম পেয়ালা ভরতি দুধ আনিয়া দিলে শ্রান্তি দূর করিলাম। সন্ধ্যার শীতে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তাহার কাছে তাহার জীবনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন ঔরঙ্গাবাদের সমীপবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গগুলি দেখিবার ব্যবস্থা স্থির করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বারান্তরে ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দিরের কথা বলিব।

(ক্রমশ)

# নন্দা

( উপন্যাস )

শ্রীঅমিয়া সেন

শ্রাবণের প্রথম প্রভাত।

মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অবিরাম বর্ষণধ্বনির শব্দে নন্দা অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারে নাই। নিঃসঙ্গ শয্যায় অনেকক্ষণ কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে লইয়া এপাশ ওপাশ করিয়া কাটাইয়া অবশেষে রাত্রির শেষ যামে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতে তাই বেশ একটু বেলা হইয়া গেছে।

বাহিরের মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া তার সদ্য উন্মীলিত দুই চোখ জুড়াইয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশ তার একটুও ভাল লাগে না। আকাশের বর্ষণধারার সঙ্গে তার অন্তরও কাঁদিয়া সারা হয়।

আজ তাই শ্রাবণের প্রথম প্রভাতেই আকাশের নির্ম্মল রূপ, পৃথিবীর সহাস মুখ তার অন্তরে আনন্দের বান ডাকিয়া দিল।

দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে সে অন্তরের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া শ্রাবণের এই মেঘহীন স্বর্ণোজ্জ্বল প্রথম প্রভাতকে বন্দনা করিল। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া লঘুপদে নন্দা নীচে নামিয়া আসিল।

যামিনী তখন স্নান করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সিক্ত বস্ত্রে পূজার দালানের দিকে যাইতেছিলেন।

শীত, গ্রীষ্ম বার মাস খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ এবং স্নান করা যামিনীর অভ্যাস। স্নানান্তে পূজা করিতেই তাঁর বেলা নয়টা দশটা বাজিয়া যায়।

সম্মুখে নন্দাকে দেখিয়া যামিনী থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর মন্ত্রোচ্চারণ মুলতুবী রাখিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, "এত বেলা করে কি গা গেরস্তর বউ ঝিদের উঠলে চলে! দেখ তো, কোন্ ঘরের বউদের উঠতে বাকি আছে? ছি ছি দিন দিন তোমার মতিগতি যে কি হচ্ছে, ভগবান জানেন। শরিকদের কাছে আমার নাম না হাসিয়ে তুমি ছাড়বে না।"

বলিয়াই তিনি হন হন করিয়া পূজার দালানে গিয়া ঢুকিলেন। নন্দার মনের সব আনন্দ এক নিমেষে উবিয়া গেল। পৃথিবীর প্রফুল্ল মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া গেল। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও এরা ক্ষমা করিতে জানে না; এমনি সঙ্কীর্ণ, এমনি অনুদার মন!

একটা নিশ্বাস চাপিয়া রান্নাঘর হইতে বাসী বাসনের বোঝা লইয়া নন্দা ঘাটে নামিল।

চাকর অবশ্য একজন আছে, কিন্তু সে ঘর ধোয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নহে। বাহির বাড়িতে বাবুদের পানটা, তামাকটা সরবরাহ করা, আর তাঁদেরই বাহিরের দু-একটা ফাই-ফরমাশ খাটাই তার কাজ। মাহিনা কালেভদ্রে পায়। দেবনারায়ণের পিতামহ নিজের জমিদারির মধ্যে তাহাদের বাস্তুভিটার জায়গা দিয়া সেটুকু নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিষ্কর জমি ভৃত্য ভোলানাথের তিন পুরুষ ধরিয়া ভোগ করিতেছে। কাজেই বিনা মাহিনার কাজে তাহার মনে মনে আপত্তি থাকিলেও কৃতজ্ঞতার খাতিরে মুখে বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। দুবেলা খোরাকের বিনিময়ে নিয়মিত দুবেলা আসিয়া হাজিরা দেয়। দেশের মধ্যেই তার বাড়ি।

বিস্তীর্ণ ঘাট।

প্রাচীন কর্ত্তাদের আমলের বাঁধানো ঘাট। আজকালকার দিনে অত বড় ঘাট বড় কেহ বাঁধায় না। পুকুরটাও এককালে সেই অনুপাতেই ছিল, বর্ত্তমানে হাজিয়া মজিয়া তার এক তৃতীয়াংশে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ঘাটের বাঁধানো ধাপগুলাও সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বর্ত্তমানে উঠানামার পক্ষে বন্ধুর ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নন্দা বাসনের বোঝা লইয়া সাবধানে নামিতে লাগিল।

ঘাটের ওপাশের কিনারায় মেজো শরিকের মেজোগিন্নী ও ছোট শরিকের পুত্রবধূ নীলিমা অনুচ্চস্বরে কি যেন বলাবলি করিতেছিল। নীলিমা আসিয়াছিল সকাল বেলার ছাড়া কাপড় ধুইতে, আর মেজোগিন্নী প্রাতঃকৃত্য সারিতে।

পাঁচ শরিকের মধ্যে নীলিমাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত।

নন্দারা মেজো শরিক। মেজো শরিক হইলেও যামিনী মেজোগিন্নীর চেয়ে বয়সে বড়। মেজোগিন্নী দ্বিতীয়পক্ষ।

নামিতে নামিতে নন্দার কানে মেজোগিন্নীর একটা কথা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের মত যাইয়া বিঁধিল। মেজোগিন্নী বলিতেছিলেন, "বুঝলে নীলিমা, সেজোগিন্নীর অংখার দেখো, এই বউই ভাঙবে। এখুনি তো দেখতে পাই, শাশুড়ীকে গেরাহিই করে না, এর পরে, আজকালকার মেয়ে তো, এই যে ছেলের চাকরি নিয়ে এত অংখার, আর দুদিন বাদে সুবো যদি বউ নিয়ে না পিট্‌টান দেয় তো আমি—"

নীলিমা বাধা দিয়া কহিল, "তাতে কি?"

মেজোগিন্নী চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "তাতে কি? আর কি তা হলে সুবো একটি পয়সাও বাবা মাকে দেবে মনে করেছ?"

নন্দা সবই শুনিতে পাইতেছিল, বিতৃষ্ণায় তার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল; ইচ্ছা হইতেছিল, এখান হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু একে তো বেলায় উঠিয়াছে, তার উপর এখন কোন কাজে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, তাহাকে মুশকিলে পড়িতে হইবে। তাই সে নীরবে নতমুখে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ইহাদের এমনি অহেতুক ও অনাবশ্যক পরচর্চ্চা পূর্ব্বে তাহাকে অত্যন্ত ক্লেশই দিত, কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া শুনিতে শুনিতে সেও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

নন্দার সাড়া পাইয়া মেজোগিন্নী তাহাকে ছাড়িয়া তনিমাকে লইয়া পড়িলেন। তনিমা বড় তরফের তৃতীয় পুত্র-বধূ। সম্পর্কে নন্দার বড় জা, নীলিমা নন্দারও ছোট। "তা যাই

বল নীলিমা, তনিমা বড় স্বার্থপর বউ, এই বয়সেই স্বোয়ামী-পুত্তুর বেশ চিনেছে।"

এবার নন্দা মনে মনে বড় আহত হইল। তনিমার স্বভাব সত্যই চমৎকার। আর স্বার্থপরতার কথা বলিলে বলিতে হয় সে ছাড়া এই ভিন্ন অভিন্ন বিশাল পরিবারটির প্রত্যেকেই ঘোর স্বার্থপর।

নীলিমাও কি জানি কেন মেজোগিন্নীর এই মন্তব্যটি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারিল না। কহিল, "তা মেজো-জ্যাঠাইমা, স্বোয়ামী-পুত্তুর এই সংসারে কেই-বা চেনে নি বলুন।"

কথাটি আবার মেজোগিন্নীকে একটু খোঁচা দিল। তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ প্রভার উলঙ্গ স্বার্থপরতার সঙ্গে এ ঘরের প্রত্যেকেই পরিচিত। কি রসনার ধারে, কি সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয়ে প্রভার স্থান এই বিরাট পরিবারটির সমস্ত নারীমণ্ডলীর উপরে। বাহিরে রসনার সাহায্যে তাহা প্রবলভাবে অস্বীকার করিলেও, মনে মনে মেজোগিন্নীও বোধ হয় সে সত্য অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

ঈষৎ ঝাঁজের সহিত কহিলেন, "তা বলে তনিমার মত কেউ নয়, তা বলে দিচ্ছি। এই তো সেদিন স্বচক্ষে দেখলুম, চারুর ছেলের পাতে বড় মাছের মুড়োটা পড়েছিল বলে চারুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর করলে। আরে ম'ল তোর ঐ দুধের ছেলে কি অত বড় মুড়োটা দাঁত দিয়ে ভাঙ্গতে পারে?"

বলা বাহুল্য, ঘটনাটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। নন্দার সমস্ত অন্তর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। নীলিমা চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বলেন কি, সত্যি?"

"না তো কি. আমি বুড়োমানুষ তোমার কাছে মিছে কথা বলছি?" বলিয়া বিজয়গর্ব্বে মেজোগিন্নী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নীলিমা অর্দ্ধ অবিশ্বাস আর অর্দ্ধ বিশ্বাসের দোলায় দুলিতে দুলিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল, "কি জানি, মানুষ চেনা ভার, তনিমাদিকে তো ভাল বলেই জানতুম।"

নন্দার ইচ্ছা হইল, একবার বলে—ওরে, সে ভালই। মিছামিছি তোমরা তাহার গায়ে নিন্দার কাদা লেপিতেছ। কিন্তু সে কিছুই বলিল না, নীরবেই আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, সে দেখিয়া আসিতেছে, এমনই হয়। ক্রমাগত পরস্পরের সম্বন্ধে অযথা বিষোদ্গীরণ করিতে করিতে আজ ইহারা এমন একটি জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। নিরপেক্ষচিত্তে কেহ কাহারও সত্যাসত্য যাচাই করিয়া দেখিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া, মমতা হারাইয়া আজ ইহারা শুধু পরস্পরকে আক্রমণ করিবার আনন্দেই বাঁচিয়া আছে।

মেঘমুক্তির মহানন্দে আজ বহুদিন পরে সূর্য্য পৃথিবীতে তাহার মুক্ত হাসি ছড়াইয়া দিয়াছে। গ্রামের চারায়, আমগাছের মাথায় মাথায়, পুকুরের ঘোলা জলে সূর্য্যকিরণ দুরন্ত শিশুর মত হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছিল।

নন্দার আর কোনদিকে ফিরিয়া চাহিল না। আজিকার সুন্দর প্রভাত তাহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মানুষের হীন পরিচয়ে তাহার অন্তরের রুদ্ধ বেদনা গুমরিয়া উঠিতেছিল। ছাই মাটি দিয়া সে একখানা তেলমাখা থালা সজোরে ঘষিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

৪

প্রবীরের বিবাহের বয়স পার হইয়া চলিয়াছে, এই বলিয়া যামিনী দেবনারায়ণের কাছে প্রবীরের বিবাহের জন্য ধরিয়া পড়িলেন। প্রবীর যামিনীর কনিষ্ঠ পুত্র, সুধীরের অনুজ। ম্যাট্রিক পাস করিয়া তাস পাশার আখড়া লইয়া সে বেকার বসিয়া আছে। সংসারের কোন ভাবনার বালাই নাই। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে।

তাহার চরিত্র সম্বন্ধেও লোকে নানান কথা বলে এবং সে কথা যে সর্ব্বাংশে মিথ্যা নয়, যামিনীর মায়ের প্রাণ তাহা মানিতে না চাহিলেও দেবনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির আর সকলেই তাহা কিছু কিছু মানে। তাই এহেন গুণধর ছেলের বিবাহের প্রস্তাবে তিনি হঠাৎ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "কোন কাজ কর্ম্মের যোগাড় হ'ল না, কিছু যে কোনদিন চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে করবে তারও ভরসা দেখি না, তবে কি ক'রে এখন বিয়ে দিই বল।"

পুত্র সম্বন্ধে যে অপবাদটিকে এতদিন যামিনী সর্ব্বদা যুক্তিতর্ক দিয়া খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইতেন, এখন দেবনারায়ণের দৃঢ় অনিচ্ছা দেখিয়া এই অনিচ্ছা নাশ করিতে সেই অপবাদটিকেই কাজে লাগাইলেন। কহিলেন, "সোমত্ত ছেলে বিয়ে না দিলে কি এ সব দোষ শোধরায়? ঘরের অভাবের কথা বলছ? আমরা যা খাচ্ছি পরছি সেও তাই খাবে পরবে। তা ব'লে ছেলের বিয়ে দেব না? বয়সও তো কম হ'ল না, এখন যদি দিন দিন এই রকম নিন্দা মন্দ রটতে থাকে, শেষে যে কনে মেলাই ভার হয়ে দাঁড়াবে।"

দেবনারায়ণ এ যুক্তি না মানিয়া পারিলেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা হ'লে সুবোর কাছে চিঠি দিই, তার মতামতটা তো জানা দরকার।"

"হ্যাঁ, তা দাও। এদিকে কনেরও খোঁজ কর।" একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আর তুমি অত ভাবছই বা কেন? বীরু কি চিরকালই এমনি থাকবে নাকি! বিয়ে থা করলেই দেখো ওর মতিগতি ফিরবে। সংসারে মন বসবে। তখন দেখো চাকরি বাকরিরও চেষ্টা করবে।"

গৃহিনীর যুক্তির কাছে কর্ত্তার যুক্তি হার মানিল। মহোৎসাহে তিনি কনে খোঁজা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, অনেকগুলা। যামিনীর ইচ্ছা প্রবীরের বউ একটু সুন্দরী হয়। যা বদমেজাজী ছেলে! লোকেও নানা কথা বলে। কিন্তু আজকাল সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যেন ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই সম্বন্ধ স্থির করিতে একটু দেরি হইতে লাগিল।

নন্দা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রবীরের বিবাহের নামে সংসারের তথা তাহার নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা এক মুহূর্ত্তে তার চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মত ভাসিয়া উঠিল।

পাঁচ বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে প্রবীরের সেই এক লক্ষ্মীছাড়া ভাব। এই যে সংসার দিন দিন ধাপে ধাপে অবনতির পথে নামিয়া চলিয়াছে, ইহার জন্য কোনদিন সে প্রবীরকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে দেখে নাই। দিব্য আনন্দের স্রোতে গা ভাসাইয়া স্থানে অস্থানে ধার কর্জ্জ করিয়া যেখানে সেখানে বনেদী বংশের বড়মানুষী চাল চালিয়া তাহার দিন একভাবেই কাটিতেছে। পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমশ সংকীর্ণ হইতে হইতে আজ এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা হইতে এখন আর সমগ্র পরিবারের সমস্ত খরচ কোনক্রমেই উঠানো যায় না; কোনও মতে অন্ন বস্ত্রটা টানাটানি করিয়া চলে, কিন্তু বনেদী ঘরের ঠাট ঠমক বজায় রাখিবার খরচ তো সামান্য নয়। বার-মাসের পূজা পার্ব্বণ, সাংসারিক অন্যান্য ব্যয় তো আছেই। সুধীরের মাত্র সত্তর টাকা মাহিনা এতগুলি ব্যয়ের নির্ভর-স্থল।

এই অবস্থার উপরে যামিনী কেন যে আর একটি কুমারীকে তাহার ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য এই সংসারে টানিয়া আনিতেছেন, নন্দা তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার উপর তাহার নিজের ভবিষ্যৎ? নন্দা শিহরিয়া উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, প্রবীরের ছোট বোন অমিতা,যামিনীর ষষ্ঠ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যা।

যামিনী ছেলের বিবাহ লইয়া মাতিয়াছেন, কিন্তু অমিতার সম্বন্ধের কোনও খোঁজ নাই। খোঁজ মিলিতেও অবশ্য একটু কষ্ট আছে, অমিতা কালো। তবু যদি ছেলের বিবাহ দিয়া সেই টাকায় মেয়ের বিবাহের একটা সুরাহা হইত, তো একটা কাজের মত কাজ হইত। এ যে কিছুই হইবে না।

প্রবীর যে কোনদিন কিছু করিবে, নন্দা তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, অথচ সে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। ইহার পর বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল সন্তান। হয়তো মা ষষ্ঠীর কৃপা বন্যার বেগেই আসিয়া সংসারের কষ্টসাধ্য সচলতাটুকুও ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার সন্তান হয় নাই বলিয়া সকলেরই তো আর তেমন হইবে না! তাহার পূর্ব্বে অমিতার বিবাহ আছে। হউক কালো মেয়ে তবু বনেদী ঘরের মেয়ে যার তার হাতে তো দেওয়া সম্ভব নয়। একা সুবীর কি করিবে? চিন্তা করিয়া নন্দা কূল পাইল না। তাহার ব্যথিত ব্যাকুল হৃদয় শুধু সুবীরের জন্য কাঁদিয়া মরিতে লাগিল।

অবশেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সে সুবীরকে সব কথা খুলিয়া লিখিল। সে যেন দেবনারায়ণকে বারণ করিয়া লেখে, এখন প্রবীরের বিবাহ দিতে। আগে অমিতার সম্বন্ধ স্থির হউক।

উত্তরে সুবীর বাপ মাকে কিছু লিখিল না। লিখিল নন্দাকে।—

আমার নন্দা,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি যা ভাবিয়াছ, আমি তা অনেক আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছি। প্রবীরের বিবাহে সংসারের দারিদ্র্য বাড়িবে বই কমিবে না, তা আমি জানি। অমিতার বিবাহের ভাবনাও যে আমি ছাড়া কেহ ভাবিবে না, তাহাও আমি জানি। কিন্তু রানী আমার, প্রতিকারের কোনও হাত নাই। প্রবীর বাবা মার ছোট ছেলে, শখ যখন হইয়াছে, বিবাহ দিবেনই। আমি বারণ করিলে শুনিবেন কেন। আরও হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। কাজ কি! আমার জীবন এমনি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতেই মহা-জীবনের তীর্থে যাইয়া মিলিবে। এপারে আমার জন্য শান্তি বিধাতা লেখেন নাই; দেখি, ওপারে যদি মেলে। কাহারও উপরই আমার কোনও অনুযোগ নাই, আমার ভবিষ্যৎ আমি ভালই জানি, শুধু অন্ধকার। তুমি আমার জন্য ভাবিয়া মন খারাপ কেন কর?

ভালোবাসা নিও।

তোমার বীর।

নির্জ্জন মধ্যাহ্ন। আকাশ মেঘমেদুর, কিন্তু বৃষ্টি নাই। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর এখন সবাই উপরে যে যাহার ঘরে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে।

নন্দা ধীরে ধীরে ঘাটের কাছে একটা আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিল, হাতে তার সুবীরের খোলা চিঠি। চোখ তুলিয়া সে আকাশের দিকে তাকাইল, দুই চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। মন নিবিড় ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কান্নার বেগ চাপিতে চাপিতে সে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিল। মনে মনে কহিল, নিষ্ঠুর, তুমি কেবল তোমার দিকটাই দেখিলে, আমার কথা একবারও ভাবিলে না!

তাহার মন চিরদিনই বিদ্যানুরাগী। সে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, আরও পড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাল সম্বন্ধ হাত ছাড়া হইবার ভয়ে পিতা জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। বিবাহে প্রথমে নন্দার যতই আপত্তি থাকুক, সুবীরকে দেখিয়া তার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল, মনে হইল তাহার ধ্যানের রাজপুত্র বুঝি আজ তার চোখের সম্মুখে থামিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারপর কুমারী হৃদয়ের কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কত মধুর কল্পনা লইয়া ঘর বাঁধিবার আশায় সে আসিল স্বামী গৃহে। কিন্তু কি পাইল সে? তার শিক্ষিত, মার্জ্জিত, সরল, অন্তর এখানে পদে পদে আহত হয় নির্লজ্জ স্বার্থপরতা আর নির্দ্দয় সমালোচনার ধাক্কায়; দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যে তার চলিবার পথ, আর—

রোদনবিহ্বল নন্দা বিপুল অভিমানে চোখ তুলিয়া নিজের পানে চাহিল।

—আর এই ঘর নিকাইতে, বাসন মাজিতে আর পদে পদে ব্যক্তিত্বের মনুষ্যত্বের অপমান সহিতেই কি সে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল? তার এত আশা ভরসা, শিক্ষা, দীক্ষা আজ কিসের জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল?

নন্দার কোমল নারীপ্রাণ আবার ভাঙিয়া পড়িল।—তবু

(শেষাংশ ৬৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# হয়তো কিনা ও নাকি

(বানান প্রসঙ্গ)

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

কথা বলার বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী ও রীতির বৈচিত্র্যে শব্দার্থের ব্যাপ্তি ও সংকোচ বশত কালে কালে ভাষায় পুরানো শব্দের যোগে কখনও কখনও নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরানো শব্দগুলি যুক্তাবস্থায় তাহাদের পূর্ব অর্থ হারায় এবং নবগঠিত শব্দটি এক স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—'যখন-তখন'। 'যখন'=যে সময়ে এবং 'তখন'=সে সময়ে; অথচ 'যখন-তখন' মানে ঘন ঘন বা অসংগত কালে। এইরূপ অনেক আছে, যেমন—'যা-তা, যেমন-তেমন, যে-সে' ইত্যাদি। অতএব ইহারা ভাষায় স্বতন্ত্র শব্দ রূপে বর্ণনীয়।*

এইরূপ শব্দের মধ্যে কতকগুলির যুক্তরূপে লেখন ভাষায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কতকগুলির যুক্তরূপ সাধারণত লেখকদের অনবধান জন্য এখনও স্থির হইতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ 'হয়তো, কিনা, নাকি' এই তিন শব্দের উল্লেখ করা যায়। 'হয়, তো, না, কি' ইহারা আলাদা শব্দ এবং 'হয়তো, কিনা, নাকি' ইহারা আলাদা শব্দ। লেখায় এইসকল শব্দের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন দৈবাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ 'হয়তো' লিখিতে 'হয় তো' লেখেন, কেহ 'হয় তো' লিখিতে 'হয়তো' লেখেন; কেহ 'কি না' লিখিতে 'কিনা' লেখেন, কেহ বা 'না কি' লিখিতে 'নাকি' লিখিয়া বসেন; ইত্যাদি। ইহা অকর্তব্য, ইহাতে শব্দগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ব্যাহত হয়। নিম্নে শব্দগুলির অর্থসহ যথাপ্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

*এইরূপ শব্দ চলন্তিকায় (৩য় সংস্করণ) স্বতন্ত্র শব্দরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

**হয় তো ও হয়তো।**—'হয়' মানে ঘটে বা বর্তমান থাকে; এবং 'তো' হইল আশা, অনুমান, অনুরোধ ইত্যাদি সূচক অব্যয়। এই দুই শব্দের যোগে সৃষ্ট 'হয়তো' স্বতন্ত্র শব্দ, অর্থ—সম্ভবত। লেখায় শব্দগুলির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা অবশ্য-কর্তব্য। যেমন—'যদি বৃষ্টি হয় তো যেতে পারব না; যেরকম মেঘের ঘটা হয়তো বৃষ্টি হবে। যদি উপোস দিতেই হয় তো দেব; দেশের যেরকম দুরবস্থা, হয়তো সত্যিই উপোস দিতে হবে।'

**কি না ও কিনা।**—'কি' এখানে প্রশ্নার্থক অব্যয়, এবং 'না' একটি নঞর্থক অব্যয়। সাধারণত ইহা অভাব, নিষেধ, অসম্মতি, বৈপরীত্য, ক্রিয়ার অঘটন ইত্যাদি সূচনা করে। এই দুই শব্দের সহযোগে স্বতন্ত্র শব্দ 'কিনা'র উদ্ভব, অর্থ—যেহেতু। বিতর্ক বা সংশয় ইত্যাদি সূচক প্রশ্নে 'কি' ও 'না' শব্দের বিযুক্ত প্রয়োগ এবং যেহেতু অর্থে যুক্ত প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। যেমন—'বাঁচবে কি না বুঝতে পারছি না; বুঝতে পারছি না কিনা তাই ভয় হচ্ছে। সত্যি কথা কি না কে জানে; একের নশ্বর মিথ্যুক কিনা তাই এত সন্দেহ হচ্ছে। হবে কি না জানি না। জল হয়েছে কিনা তাই এত কাদা।'

**না কি ও নাকি।**—'না'এর অর্থ উপরেই বলিয়াছি, 'কি' হইল এখানে কোন বিষয় বা বস্তু ইত্যাদি বাচক সর্বনাম। এই দুই শব্দের যোগে সৃষ্ট 'নাকি' শব্দ সন্দেহ বা অনিশ্চয়-সূচক প্রশ্নে প্রযুক্ত। প্রয়োগে ভেদ প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। যেমন—'জল না কি বুঝতে পারছি না। সে নাকি বিয়ে করেছে?'

# নন্দা

(৬৬২ পৃষ্ঠার পর)

সে সব সহিতে পারিত, যদি সে সুবীরের শান্তি ও সান্ত্বনা-ময় বাহুর আশ্রয় লাভ করিতে পাইত। কিন্তু সুবীর তো তা বুঝিল না, বুঝিতে বোধ হয় চায়ও না। নন্দার চোখের জল শুখাইয়া উঠিল। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সে জলের দিকে চাহিয়া রহিল।

বর্ষাবেলার সিক্ত বাতাস তার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বহিয়া গেল। কয়েকটি কাঁচাপাকা আমপাতা তাহার গায়ে মাথায় ঝরিয়া পড়িল। ঈষৎ চমকিয়া নন্দা সেই দিকে চাহিল। গভীর একটি ব্যথার শ্বাস তার মর্মমূল হইতে উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, ঐ ঝরাপাতার মত তাহার জীবনও একদিন অবহেলায় বাতাসে বুঝি এমনি করিয়া মাটিতে খসিয়া পড়িবে। সার্থক হইবার কোনও উপায় তাহার নাই। সংসার তাহাকে না দিল কোনও সুযোগ না দিল কোনও সম্মান। দুই বৎসরের না-দেখা স্বামীকে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অভিমান ও ক্ষোভের আবেগে চাপা পড়িয়া গেল, তাহার স্থানে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, বৈরাগ্য। স্বামী তাহার কে, কেউ তো নয়! ইহারা তাহার এবং সে ইহাদের। নন্দা এখানে আগন্তুক।

আকাশ কালো করিয়া আবার মেঘ উঠিল, আঁচলটি গায়ে জড়াইয়া নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতের চিঠিটার দিকে চাহিয়া আবার তাহার চোখে জল আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি সেটাকে টুকরা টুকরা করিয়া বাতাসে উড়াইয়া নন্দা ঘাটে নামিল।

(ক্রমশ)

# ম্যানিহুর

সুবোধ ঘোষ

হিরোতা মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল এপোলো বন্দরের অভ্রলেহী টাওয়ার আর ঠাসাঠাসি নোঙর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সমুদ্রের বুক চিরে হিরোতা মারু চলল ক্ষুব্ধ সিন্ধুঘোটকের মত সাঁতার দিয়ে—তার সধূম প্রশ্বাসবায়ু মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফান্টা পাহাড়ের ছোট চুড়োটাকে ধরল ঘিরে। বোম্বাইয়ের মাথার ওপর তার ঘনমসী কালো ধোঁয়ার সুগোল মারাঠী টুপিটা শুধু সুস্থির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।

ঠিক এমনি সময়ে হাঁ করে এই আকাশ ভুবনের খেলা দেখাটা যে কত বড় মূঢ়তা তা টের পেলাম ডেকের ওপর দৃষ্টি পড়তে। শোনপুরের মেলার একটা ভগ্নাংশ যেন—এত ভীড়! এরি মধ্যে বিছানা বিছিয়ে যে যার জায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। বাক্স তোরঙ্গ বদনা ছড়িয়ে চৌহদ্দি রেখেছে পাকা করে। স্থান নেই। কিন্তু স্থান চাই; শুতে হবে। এডেন পেঁছিতে পুরো দুটী দিন; ঠায় দাঁড়িয়ে তো আর যাওয়া যায় না।

কাথিয়াবাড়ী বেনেরা তাদের ছেঁড়া জুতোগুলো পর্যন্ত দুহাত অন্তর এলোপাথাড়ি করে সাজিয়ে রেখেছে—যতদূর পারে দখলের পরিধি রেখেছে ফলিয়ে। মূর্তিমান স্বার্থোন্মাদ সব, ক্ষুরের মতন শান দেওয়া সওদাগরী বুদ্ধি; শত অনুরোধেও কোন ফল হবে না।

জাঞ্জিবারী বেণেরা চলেছে। লবঙ্গ বেচা টাকায় লাল লাল চেহারা। প্রত্যেকের দুটী করে বিছানা, একটি শোবার আর একটি নেমাজ পড়বার। সামনে দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছা গেলেও এরা আধ হাত জায়গা ছেড়ে দেবে না। আমারি মত নিরুপায় এক পালেস্তানী ইহুদী সাহেব অগত্যা তার সুটকেসটার ওপরেই বিছানা পেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আমি কি করি?

নজরে পড়ল ডেকের শেষ প্রান্তে খাঁচার মত মুখোমুখি দুটো বেশ সুপরিসর কাঠের ঘর, ওপরে নোটিশ লেখা—For horses only; শুধু ঘোড়ারা থাকিবে। এখন কিন্তু ঘোড়ারা নেই; ফিরতি পথে রেসের ঘোড়া যাবে। বাক্স বিছানা সমেত একটা খাঁচায় ঢুকে পড়লাম। দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজের কোরিয়ান মেথরটা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে আপত্তি করতেই একটা সিগারেট উপহার দিলাম। খুসী হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় খাঁচাটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বিস্মিত হতে হল। সপরিবারে এক বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুটী ছোট ছোট ছেলে—একটী বছর পাঁচেক আর একটী দুগ্ধপোষ্য, মাত্র হামা দেবার বয়সে পেঁছেছে। খুসী হলাম দেখে। বাঙালী সহযাত্রী, তবু মনের সুখে বাঙলা বলা যাবে—দিন যাবে ভালয় ভালয়। তা ছাড়া একজোড়া বাঙালী খোকা; জাহাজী জীবনে ক্বচিৎ এমন ষোল আনা স্বদেশী সঙ্গ মেলে।

কিন্তু বড় নিরাশ হতে হল। অবাক হলাম ভদ্রলোকের সৌজন্যবোধের অভাব দেখে। এঁদের দিকে এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক চকিতে একবার দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে কাঠের সিন্ধুকটার আড়ালে গিয়ে বসলেন। সাগ্রহ আলাপনের উৎসাহটা উদ্যোগেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। নিজের খাঁচায় ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ হয়ে।

শুয়ে শুয়ে দেখছি মহিলাটি স্টোভ জেবলে খিচুড়ী রাঁধলেন। ভদ্রলোক আর বড় ছেলেটা খেয়ে নিল। শিশি থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে নিয়ে জ্বাল দিলেন—ছোট ছেলেটাকে খাওয়ান হল। ভদ্রলোক সিগারেট মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। মহিলাটীও খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তোরঙ্গ থেকে কাঁথা বার করে সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের দিকে জাহাজের দোলা বেড়ে ওঠায় ঘুম গেল ভেঙে। চোখ বুজেই শুনছি মাথার কাছে কুর কুর একটা শব্দ। চেয়ে দেখি বড় ছেলেটা আমারি মাথার কাছে বিছানার কোণে বসে এক বাটি গরম কফি নিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মিছরির চিবোচ্ছে সশব্দে। ছোট ছেলেটাও মেঝের ওপর বসে একটা খালি সিগারেটের কৌটো নিয়ে দুহাত দিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ছে। বড় ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম—কি খোকা, নাম কি তোমার?

—পটল।

—ও তোমার কে হয়?

—আমার ভাই পল্টু।

—আর ওঁরা কারা? বাবা আর মা?

—হাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—আমরা যাচ্ছি কেপ।

—তোমার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন?

—হাঁ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল পটল। এবার তার পালা। প্রশ্ন করল—তুমি কে?

—আমিও চাকরী করি। যাচ্ছি এডেন।

—তোমাকে কে রান্না করে দেয়?

—আমি হোটেল থেকে খাবার কিনে খাই।

—তবে তোমাকে হাওয়া করে কে? যখন কাশি হয়?

পটলের প্রশ্নে কৌতুক আর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাবার বুঝি খুব কাশি হয়?

—হাঁ, হাঁপানি কাশি। কাউকে বলবেন না কিন্তু।

—কেন বল ত?......পটলের কথাবার্ত্তা ধাঁধার মত ঠেকছে।

—জাহাজের ডাক্তার আমাদের নামিয়ে দেবে তা হ'লে।...... পটল উত্তর দিল।

এইবার বুঝলাম। ছেলেটির বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। দেখলাম আলাপের সঙ্গী হিসেবে পটল নেহাৎ নগণ্য নয়। এ বিষয়ে বাপের চেয়েও ঢের বেশী শালীনতার পরিচয় দিয়েছে সে।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার নাম কি?

—বিকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—তোমাদের বাড়ী কোথায় পটলবাবু?

—কিম্বার্লি।

—আর মামাবাড়ী?

পটল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—ইণ্ডিয়া। আমার প্রশ্ন-প্রবাহে বাধা পড়ল। এ সব আবার কি বলে। বাড়ী কিম্বার্লি, মামাবাড়ী ইণ্ডিয়া? মনে মনে বিচার করে দেখলাম—তাই হবে বোধ হয়। বেচারা গাঙ্গুলী হয়ত বহুদিন দেশ ছাড়া। পেটের দায়ে পড়েছে গিয়ে সুদূর কিম্বার্লি।

এবার নজর পড়ল ছোটটার ওপর। ডাকলাম—পল্টু। ছেলেটা দ্রুত হামা দিয়ে চলে এল। পটল চেঁচিয়ে উঠল—বিছানায় বসাবেন না, মুতে দেবে। এই বলে সে পল্টুকে সবলে দুহাত দিয়ে বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বেতাল পা ফেলে চলে গেল।

পটলের মা যে আধুনিকা নন, তা বুঝতে দেরী হয় না। মাথার ঐ ঘোমটাটিই তার প্রমাণ। তবে তিনি সাহসিকা নিশ্চয়ই। দুইটি শিশু সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দূর কিম্বার্লিতে গিয়ে সুখে ঘর করছেন—বাঙলার ছায়াসুনিবিড় পল্লীর একটুকরো সংসার কৃষ্ণ মহাদেশের কোলে এক মরু উপত্যকায় ছিটকে গিয়ে পড়েছে।

খাওয়া শোওয়ার সময়টুকু ছাড়া পটল আর পল্টু সব সময় আমারই আশে পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। পল্টু এক একবার ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে—বিছানায় তুলে নিই। পটল ওর মায়ের ইসারা পেয়ে—কখনও কখনও চলে যায়—ডেকের দোকান থেকে সোডা দেশালাই সিগারেট কিনে আনে। দুপুরে যখন মহিলাটি গাঙ্গুলী মশাইয়ের সঙ্গে স্নানাগারের দিকে যান পটল তখন বসে বসে জিনিষপত্র পাহারা দেয়, পল্টুর ওপর চোখ রাখে।

দিন কাটছিল। আর কটাই বা দিন? গাঙ্গুলীর অসামাজিকতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম সত্যি কিন্তু পটল আর পল্টু সে ত্রুটী ভালভাবেই মিটিয়ে দিচ্ছে। দিবারাত্র সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছাস; কান ও মন দুই বধির হয়ে যায়। পল্টু ও পটল আচমকা এসে এসে মিঠে কলরব জাগিয়ে তোলে। একটু স্বজনতা পাই, তাতেই মন ভরে ওঠে।

পটল ছেলেটা বড় কাজের। খিচুড়ী রান্না থেকে বিছানা করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। ভাবছি এত বুদ্ধিমান ছেলেটা, লেখাপড়া শিখছে তো? নইলে হয়তো কপালে কুলিগিরি আছে—যে সাংঘাতিক দেশে থাকে? পটল এসে ডাকল—মিস্টার, কি করছ? জিজ্ঞাসা করলাম—পটলবাবু তুমি লেখাপড়া কর না?

—হাঁ, আমি আর মা পড়ি।

—কে পড়ায়?

—বাবা। পল্টুও পড়বে আর একটু বড় হলে।

চুপ করে এদের কথাই ভাবছি। গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। পটলের সঙ্গে এমনি ধরনের খণ্ড আলাপের ভেতর দিয়ে তাদের পরিচয়টা ক্রমশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

পটল বলল—জান মিস্টার আমি বিলাত যাব পড়তে। বাবা বলেছে। বললাম—তাই নাকি? বেশ বেশ, নিশ্চয়ই যেও পটলবাবু। পটল আবার বলল—আমার বিয়ে হবে মেমের সঙ্গে, মা বলেছে। লজ্জিত হয়ে পটল বালিশে মুখ গুজে রইল।

আদর করে পটলের মাথাটা ঝেঁকে দিয়ে বললাম—বিয়ের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। পটল একটু সিরিয়াস হয়ে সাগ্রহে বলল—তবে তোমার নাম লিখে দিয়ে যাও। চিঠি দেব।

নাম লিখে দিতে হ'ল।

গাঙ্গুলী তার নিত্যকার নিয়ম মত বৈকালীন ভ্রমণের জন্য ওপরের ডেকে উঠে গেলেন। আমিও উঠব উঠব করছি। মহিলাটী বালতিতে খিচুড়ীর চাল ধুচ্ছেন—মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে।

দেখছি। স্থির দৃষ্টি নিয়ে দেখছি ঐ মহিলাটীকে। মহিলা? মিসেস গাঙ্গুলী? পটলের মা?

চোখ দুটোকে লোহার শিক দিয়ে কে যেন নির্ম্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল। এ তো মহিলা টহিলা নয়! এ যে আমাদের ভৈরব মালীর মেয়ে মালতী।

এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ীর ঝি ছিল। কথাবার্ত্তা নেই হঠাৎ জেঠীমার গয়না চুরি করে পালায় শিশির বেয়ারার সঙ্গে। ধরা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাড়ায়। তার প্রণয়াস্পদ শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুজি করেও হদিস পায় নি।.....সব জানি। আমি ওর সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত। ওর পাপ-জীবনের সমস্ত তালিকাটী আমার কাছে গচ্ছিত।

এখন বুঝেছি ঐ আধ হাত ঘোমটার অর্থ। ছি ছি, একেই এতদিন মনে মনে এত স্তুতি করে এসেছি। ঘটনার পাকে এত বড় ব্যঙ্গ লুকিয়েছিল প্রহেলিকার মত!

গয়নার শোকে জেঠীমার বুকফাটা চীৎকার শুনতে পাচ্ছি। ডাকব পুলিশ। আমি শুধু ওর চিত্রগুপ্ত নই, আমি এবার ওর যম।

......সোজা জিজ্ঞেস করব—ভাল চাস তো মাগি জেঠীমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দে। তা হ'লে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই।

......আরো জানবার আছে। সুস্পষ্ট উত্তর চাই—শিশিরকে খুন করল কেন? গাঙ্গুলীর সঙ্গে কতদিন আছে?

......না হয় একবার সামনে আসুক। ক্ষমা চা'ক, অকপটভাবে স্বীকার করুক অপরাধ। তারপর বিচার করা যাবে ছেড়ে দেওয়া যায় কি না।

......কানটা ধরে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়—এখনো পিরিতের ব্যবসা ছাড়তে পারলি না। গাঙ্গুলীর কাঁচা মাথাটা না খেলে আর চলছিল না। কেন? সন্ন্যাসিনী হতে পারিস নি—বৃন্দাবন-টন গিয়ে।

অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু বলা আর হ'ল না আজ। একটা অজ্ঞাত সংকোচে মনের সমস্ত উদ্ধত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বলতেই হবে।

কিংকর্ত্তব্য গুলিয়ে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম পল্টু তার অর্দ্ধভুক্ত বিস্কুটের গুড়ো ছড়িয়ে বসে বসে আমার বিছানাটাকে নোংরা করছে। একটান মেরে নামিয়ে দিলাম—যা এখান থেকে এক্ষুনি চলে যা।

পটল ছবির বই দেখছিল। বললাম—এই ছোঁড়া, ভাগ্ হিঁয়াসে। আর আসিস না।

পটল ও পল্টু চলে গেল।

......গাঙ্গুলীকে ডেকে একবার সাবধান করে দেব। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছি। না হয় রক্ষিতাই রেখেছে কিন্তু ইডিয়টটা কি আর কাউকে পায় নি! এমন একটা বিষকন্যাকে করেছে সহচরী। এর একটী ছোবলে যে গরল উগরে আসবে তাতে কটী মুহূর্ত্ত টিকে থাকবে ওর এই সংসারবিলাস!

.........শিশির বেয়ারা ঘটিত কাহিনীটা শুনিয়ে দেব, তাতেও যদি মূর্খ লোকটার হুঁস হয়। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে ওকে বলেও কোন সুফল হবে কি? এই গাঙ্গুলীই হয়তো একটী রসাতল-চারী নররূপী সরীসৃপ। জেনে শুনেই কাল নাগিনীর সঙ্গে এক বিবরে বাসা বেঁধেছে।

......নাঃ, কিছু একটা করতেই হবে। এই পুংশ্চলী নারীটার এত নিখুঁত সাবিত্রীব্রতের অভিনয় আর সহ্য হয় না।

পটল আর পল্টু এদিকে আর আসে না। নিশ্চিন্ত হলাম। আর যেন না আসে। এখন কি করা কর্ত্তব্য সেইটাই ভাবি।

......যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। দুজনকেই ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব—আর যেন ভবিষ্যতে কোন কেলেঙ্কারী না করে। যেন দুজনে মিলে মিশে ভালভাবে থাকে। আর ছেলে দুটোকে যেন আর্য্যসমাজের অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয় যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারে।

মাথার কাছে খস খস একটা শব্দ হতে তাকিয়ে দেখি পটল

এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যাদিনের মত বিছানা ঘেঁসে নয়—একটু দূরে। তাকাতেই বলল—মিস্টার তুমি আমাদের মারবে কেন ?

—কে বলেছে আমি তোদের মারব ?

—হাঁ, মা বলেছে, তোমার কাছে গেলে তুমি মারবে। বড় পাকা পাকা শোনাল ছেলেটার কথা।—যা নিজের জায়গায় যা, চট্ চট্ করিস না এখানে।

পটল পল্টু নিজেদেরই বিছানায় বসে সারাদিন খেলে, আবোল তাবোল বকে, খায় আর ঘুমোয়। মালতীর মাথায় এই কদিন আর ঘোমটার বালাই নেই। এ দৃশ্য দেখি, চক্ষু পোড়ে, অন্তর্দাহও হয়।

......আজই তলব করব দুজনকে। শেষ সাবধান বাণী শুনিয়ে, প্রতিজ্ঞা করিয়ে, ছেড়ে দেব।

পটল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বলল—মিস্টার তোমার দেশলাইটা দাও তো। স্টোভ জ্বালতে হবে শিগগির দাও। পটলের মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—কেন পটল কি হয়েছে ? অত হাঁপাচ্ছ কেন ?

—তেল কর্পূর গরম করব। বাবার হাঁপানি ধরেছে, বুক ব্যাথা করছে।

দেখলাম গাঙ্গুলী মশায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন। সাঁ সাঁ করে হাঁপাচ্ছেন বুকে হাত রেখে। মালতী একহাতে বুকে হাত বুলোচ্ছে অপর হাতে করছে পাখার বাতাস।

পটল স্টোভ ধরিয়ে একটা বাটিতে তেল কর্পূর চড়িয়ে দিল।

ওদিকে আমার কিছু করবার নেই। ভাজা কর্পূরের সুগন্ধ ভেসে আসছে। পল্টু সবেগে হামা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এর সঙ্গেও আজ আমার কোন কাজ নেই।

হাঁপানির জোর বেড়ে চলেছে ক্রমশ। এবার সাঁ সাঁ শব্দ ছেড়ে দস্তুর মত আর্ত্তনাদ সুরু হ'ল। মালতী একাগ্র মনে গাঙ্গুলীর পায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চুপ করে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জল আর আকাশের নীলঘন রূপ ফিকে হয়ে এসেছে। এডেন বোধ হয় আর বেশী দূর নয়।

শেষে কথাটা শুনিয়ে দিয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু কখন বলি ?

পটল আস্তে আস্তে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল—ডাক্তারকে কিন্তু বলে দিও না মিস্টার। আমাদের নামিয়ে দিলে খুব কষ্ট হবে, বুঝলে।

কর্ত্তব্য আর স্থির হ'ল না। একটা অলক্ষ্য ভীরুতা এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল—বলা আর হ'ল না।

ভাবছি পটল ও পল্টু। বড় হবে বিলেত যাবে। মেম বিয়ে করবে। এদের জীবনশোণিত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে মহা-মানবের সহস্র স্রোতে।

ভাবছি—মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা ? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেক দিন। আজ যাদের দেখছি তারা আর কেউ নয়। তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।

চিন্তার আবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখতন্দ্রা ধীরে নেমে আসছে, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠতে হল—শিশুর আক্রমণে। পল্টু তার দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমার নাক; তার মুখের লালায় আমার সমস্ত মুখ প্রলিপ্ত করে তুলেছে।

তুলতুলে কচি মানুষের মুখ, জেলির মত নরম ঠোঁট। নতুন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি পল্টুর দুধে মুখে। পল্টুকে বুকের ওপর তুলে নিলাম।

এডেনের গ্যারিসন আর কয়লার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। যাত্রী-দের কোলাহল শুনছি—এডেন এডেন। এডেন এসে পড়েছে।

মনে পড়ল আমাকেও নামতে হবে, কিন্তু পল্টু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার বুকের ওপর—সুখসুপ্ত মানুষের ভবিষ্যৎ কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

পল্টুর ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

---

## মনুষী ক্ষুধা

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

মানুষী ক্ষুধার তীব্র দহনে জ্বলে
পুড়ে লাল হলো ধূসর মাটির ধরা;
পৃথ্বী কাঁপিছে অশ্বখুরের তলে
মানুষের হাড়ে পাহাড় হতেছে গড়া।

শান্তি-কামীরা শস্ত্র শাসনে রত
লোহিত সাগরে জাহাজের ভিড় বাড়ে;
মৃত্যু পরিধি নিত্য বাড়িছে কত
অঙ্ক দিয়ে কে সংখ্যা গনিতে পারে ?

মিথ্যাবাদীর মিষ্ট চাটুতে ভুলি।
যুদ্ধ বিরোধী মৃত্যু বিলাসে মাতে!
ফুৎকারে উড়ে হাজার মাথার খুলি
রাত্রি ঘনায় স্তব্ধ আঁখির পাতে।

গলিত শবের গন্ধে আতুর বায়ু
পরিখায় সেনা মৃত্যু-প্রহর গোনে
নিমিষে নিমিষে শিথিল বুকের স্নায়ু
আহত ঘোড়ার আর্ত্তককানি শোনে।

বাঘের নয়নে স্তিমিত রক্ত ক্ষুধা
সিংহ ভুলেছে হিংসা শিকার পেরে,
শাসকের চোখে বিষ শুধু নাই সুধা
মানুষের ক্ষুধা হিংস্র সবার চেয়ে।

# নক্ষত্র চেনা

শ্রীকামিনীকুমার দে

(জ্যৈষ্ঠের আকাশ)

[সুবিধার জন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা সমগ্র আকাশকে ৮৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের এক এক ভাগকে নক্ষত্রমণ্ডল বলা হয়। কতকগুলি মণ্ডলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি লইয়া এক একটি বিশেষ আকৃতি কল্পনা করা যায়, প্রথম পরিচয়ের সময় এই বিশেষত্বগুলিই আমাদিগকে সাহায্য করে। এখানে কেবল কতকগুলি প্রধান মণ্ডলের পরিচয় মাত্র দেওয়া হইবে। সমগ্র আকাশে খালি চোখের গোচর প্রায় ছয় হাজার নক্ষত্রের মধ্যে বেশী উজ্জ্বল ২০টি নক্ষত্রকে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র বলা হয়। ইহাদের উজ্জ্বলতার জন্য ইহারা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে চিনিবার সুবিধা। চিত্রে এই শ্রেণীর নক্ষত্র * চিহ্ন দ্বারা দেখান হইবে। এইরূপে দৃষ্টিগোচর সমগ্র আকাশের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় জন্মে।

দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্রগুলি মাথার উপর উল্টাইয়া ধরিয়া উঃ, পঃ, পূঃ প্রভৃতি দিকের সহিত মিলাইয়া তবে নক্ষত্রদের পরিচয় লইতে হয়।]
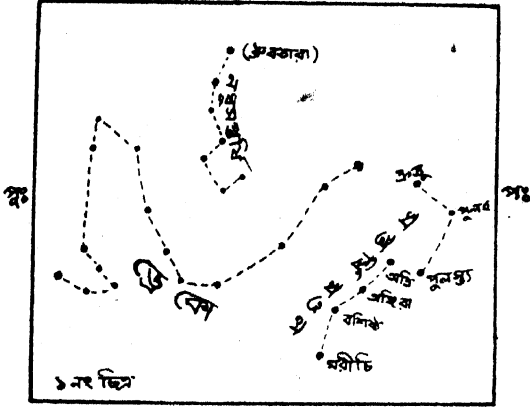
শীতকালের সান্ধ্য আকাশে যেসকল নক্ষত্র দেখা যাইত, এখন আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। যে নক্ষত্রগুলি সেসময়ে পশ্চিমাকাশে ছিল, এখন তাহারা পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছে। ইহাদের অনেককেই এখন অপরিচিতের মতনই মনে হয়। সপ্তর্ষি মণ্ডল এখন পশ্চিমাকাশে হেলিতে আরম্ভ করিয়াছে [ ১নং চিত্র ]।
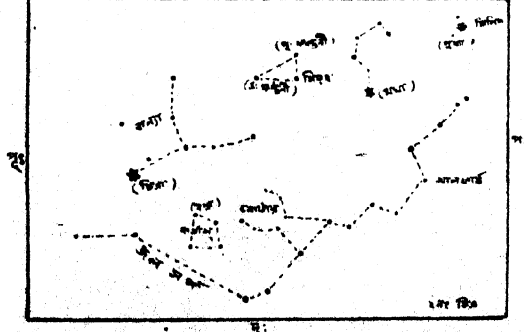
সিংহ মণ্ডল মাথার উপর দিয়া পশ্চিমাকাশে চলিয়াছে। ছয়টি নক্ষত্র মিলিয়া কাস্তের মত আকৃতি এবং তাহার পূর্ব্বদিকে তিনটি নক্ষত্র মিলিয়া সমকোণী ত্রিভুজ এই মণ্ডলের বিশেষত্ব। কাস্তের গোড়ায় প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র মঘা।* চিত্রে পূর্ব্ব-ফল্গুনী এবং উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ও দেখান হইয়াছে [২নং চিত্র]। সিংহের পশ্চিমদিকে কর্কটরাশিতে পাতলা একটু উজ্জ্বল মেঘের মত একটি জায়গা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা কতকগুলি নক্ষত্রের জটলা—নাম প্রিসিপ নক্ষত্রপুঞ্জ। দেখিতে মৌচাকের মত বলিয়া ইহা মৌচাক নক্ষত্রপুঞ্জ নামেও পরিচিত। বাইনকিউলার দিয়া ইহার কতকগুলি নক্ষত্র পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়। এই নক্ষত্রপুঞ্জের
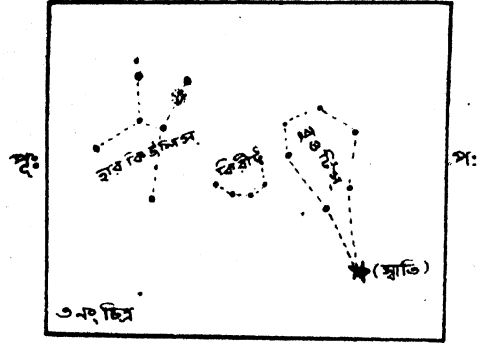
কাছে পুষ্যা নক্ষত্র। অস্তোন্মুখ মিথুনরাশির উজ্জ্বল তারা পুনর্ব্বসুদ্বয় এখনও একেবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হয় নাই। এই পাশাপাশি তারা দুটির মধ্যে দক্ষিণেরটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে পরিগণিত।

সিংহ মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে কতকটা ইংরেজী অক্ষর (বড়) Yএর আকারে সজ্জিত একটি নীল রংএর প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল
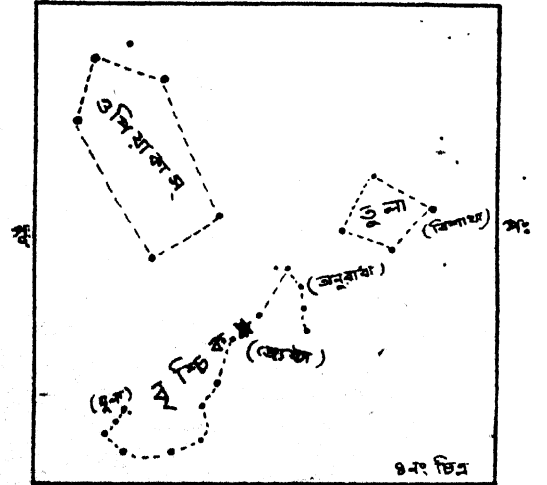
নক্ষত্র এবং আরও পাঁচটি তারা দেখা যাইতেছে, ইহারা কন্যা মণ্ডলের অন্তর্গত, প্রথম শ্রেণীর তারাটির নাম চিত্রা [ ২নং চিত্র ]। চিত্রার উত্তরদিকে কমলা রংএর প্রথম শ্রেণীর তারাটি বুওটিস-মণ্ডলের স্বাতি [ ৩নং চিত্র ]। সিংহের উত্তর-ফল্গুনী, কন্যা-

* নক্ষত্রদের পরিচয় দেওয়ার একটি প্রণালী এই যে এক একটি মণ্ডলের তারাগুলিকে উজ্জ্বলতার ক্রমানুসারে গ্রীক বর্ণমালার আলফা, বিটা প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। সর্ব্বোজ্জ্বল তারাটি আলফা, তার পরেরটি বিটা ইত্যাদি ক্রম।

মণ্ডলের চিত্রা এবং বুওটিস মণ্ডলের স্বাতি একটি বৃহৎ সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণায় রহিয়াছে।

চারিটি নক্ষত্র লইয়া গঠিত একটি ক্রুসের মত দক্ষিণ ক্রুস নামক মণ্ডলকে সোজা দক্ষিণ দিকে, ২৮° ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণস্থ স্থানসমূহ হইতে দেখা যায়। ক্ষিতিজ রেখার নিকটে আছে বলিয়া খোলা মাঠে না হইলে ইহাকে ভালরূপে দেখিবার সুবিধা হয় না। সন্ধ্যায় খাড়া একটি ক্রুসের মত এই সুন্দর মণ্ডলকে দেখিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়। দক্ষিণ ক্রুসের কিছু পূর্ব্বদিকে দুইটি প্রথম শ্রেণীর তারা তাহাদের উজ্জ্বলতার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব্বদিকেরটি সেণ্টারস মণ্ডলের আলফা এবং পশ্চিমেরটি বিটা।* ইহাদের উপরে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের নক্ষত্রগুলিও সেণ্টরাস মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সেণ্টরাস একটি খুব বড় মণ্ডল কিন্তু ইহার নক্ষত্রগুলিকে লইয়া বিশেষ কোনও আকৃতি কল্পনা করা যায় না। আলফা চিহ্নিত নক্ষত্রটির কাছে খালি চোখের অগোচর একটি তারা আছে---উহা আমাদের নিকটতম নক্ষত্র, কিন্তু এই নিকটতম নক্ষত্র হইতে আমাদের কাছে আলো পেঁছিতে চারি বৎসরেরও বেশী সময় লাগে। [ আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।]
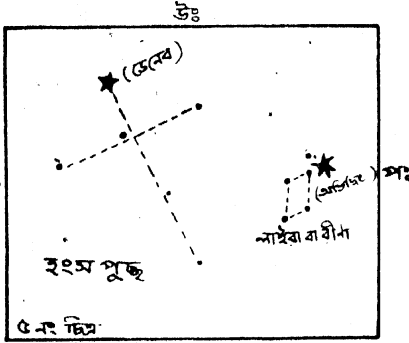
সন্ধ্যার কিছু পরে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া একটি প্রকাণ্ড বিছার মত আকৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহারা বৃশ্চিক মণ্ডলের তারা [৪নং চিত্র]। এখানে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারাটি দেখা যাইতেছে তাহার নাম জ্যেষ্ঠা। জ্যোতির্ব্বিদেরা এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারিয়াছেন নক্ষত্রদের মধ্যে এই জ্যেষ্ঠাই সব চেয়ে বড়। সূর্য্য কত বড় সে ধারণা হয়তো অনেকেরই আছে, সূর্য্যের আয়তন তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। জ্যেষ্ঠা তারার ব্যাস এই এত বড় সূর্য্যের সাড়ে চারিশত গুণ এবং ইহার উদরে ছয় কোটি সূর্য্যের স্থান হইতে পারে। আর একরকম ধারণা দেওয়া যাক, ঘণ্টায় পাঁচ সহস্র মাইল বেগে ধাবমান একটি হাউইএর পৃথিবী হইতে চন্দ্রে পেঁছিতে দুই দিন সময় লাগে। সূর্য্যের ভিতর দিয়া এই বেগে ছুটিলে উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে উক্ত গতিবেগ সম্পন্ন হাউইটির এক সপ্তাহ সময় লাগে; কিন্তু এইভাবে জ্যেষ্ঠাকে অতিক্রম করিতে নয় বৎসর সময় দরকার। বৃশ্চিক মণ্ডলের অনুরাধা এবং মূলা নামক তারা দুটিকেও চিত্রে দেখান হইয়াছে। বৃশ্চিকের পশ্চিমে তুলা মণ্ডল এবং তাহাতে অবস্থিত বিশাখা তারাকেও ঐ চিত্র সাহায্যে চিনিতে পারা যাইবে।

দীর্ঘতম এবং বৃহত্তম হাইড্রা বা জলসর্প মণ্ডল পশ্চিম আকাশে কর্কটের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রেটার এবং কার্ভাস বা কাক মণ্ডলের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্ব আকাশে চিত্রার আরও পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। হস্তা কাক মণ্ডলের একটি তারা [ ২নং চিত্র ]।

সপ্তর্ষির মরীচি এবং সিংহের উত্তর-ফল্গুনী এই দুই তারাকে একটি রেখা দ্বারা যোগ করিলে মরীচি হইতে এক-তৃতীয়াংশ দূরে একটি মাঝারি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, ইহা কেনিস ভেনাটিসি বা শিকারী কুকুর নামক মণ্ডলের তারা। এই মণ্ডলের অন্য তারাগুলি ক্ষীণপ্রভ। রেখাটির উপরে দ্বিতৃতীয়াংশ দূরে বেরিনিসের চুল নামক মণ্ডলে কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া সকালের শিশিরসিক্ত একটি মাকড়সার জালের মত দেখায়। বাইনকিউলার দিয়া ইহার নক্ষত্রগুলিকে বেশ সুন্দর দেখায়।

উত্তর আকাশে লঘুসপ্তর্ষি এবং ড্রেকো নামক মণ্ডলদ্বয়কে এখন ভালরূপে দেখা যায়। চিত্র সাহায্যে লঘুসপ্তর্ষি বা শিশুমার মণ্ডলকে চিনা কঠিন হইবে না। ইহা ধ্রুবতারা এবং আর ছয়টি তারা লইয়া কতকটা সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত দেখায়। ধ্রুবতারা এবং শেষের দুইটি নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল কিন্তু আর চারিটি নক্ষত্র ক্ষীণপ্রভ। ড্রেকো মণ্ডলেও কোনও উজ্জ্বল তারা নাই। চিত্র সাহায্যে এই মণ্ডলের তারাগুলির আঁকা বাঁকা গতি অনুধাবন করা যায় [ ১নং চিত্র]।

বৃশ্চিক মণ্ডলের উত্তরে ওপিয়াকাস নামক মণ্ডল [৪নং চিত্র] এবং তদুত্তরে হারকিউলিস মণ্ডল। বুওটিস মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বুওটিসের পূর্ব্বদিকে করোনা বা কিরীট মণ্ডলে কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া একটি মুকুটের আকৃতি করিয়াছে। তাহারই পূর্ব্বদিকে হারকিউলিস মণ্ডল [৩নং চিত্র]। এই মণ্ডলের ছয়টি তারা এরূপভাবে সজ্জিত আছে যে, মনে হয় যেন একটা বৃহৎ প্রজাপতি পশ্চিম মুখে উড়িয়া চলিয়াছে। হারকিউলিস মণ্ডলে একটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। ইহা খালি চোখের গোচর নয়, চিত্রে ইহার অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। বাইনকিউলারে এই নক্ষত্রপুঞ্জ ধরা পড়ে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বড় দূরবীন সহায়ে জানিতে পারিয়াছেন যে, এই নক্ষত্রপুঞ্জে বহু সহস্র তারা আছে। হারকিউলিসের পূর্ব্বদিকে একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা উত্তর আকাশের সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র অভিজিৎ। অভিজিৎ লাইরা বা বীণা মণ্ডলের তারা। একটি সমান্তরাল চতুর্ভুজ ও অভিজিৎকে লইয়া একটি ছোট ত্রিভুজ এই মণ্ডলের বিশেষত্ব। পাঁচটি তারা লইয়া দেখিতে একটি বড় ক্রুসের মত উত্তর ক্রুস বা হংসপুচ্ছ মণ্ডলকে সন্ধ্যার পরে আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে দেখা যাইবে। ইহাতে যে প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় তাহার নাম ডেনেব [৫নং চিত্র]। হংসপুচ্ছের দক্ষিণে দুই দিকে দুইটি তারা সহ একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায় তাহার নাম শ্রবণা, ইহারা একুইলা বা ঈগল নামক মণ্ডলের তারা। শ্রবণা এবং হংসপুচ্ছের মাঝামাঝি জায়গায় কতকগুলি নক্ষত্র এক রেখার উপর থাকিয়া একটি ধনুর তীরের মত দেখায়---ইহারা সেগিটা বা তীর মণ্ডলের তারা। অধিক রাত্রে শ্রবণার পূর্ব্বদিকে এক জায়গায় কাছাকাছি চারিটি তারাকে রুহিতনের টেক্কার মত দেখায়---ইহারা ডেলফিনাস মণ্ডলের অন্তর্গত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সান্ধ্য আকাশে পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশির মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা এই ছয়টি রাশি দৃষ্টিগোচর থাকে। এই মাসে সূর্য্য বৃষ রাশিতে থাকে। মিথুন রাশি সূর্য্যের নিকটে বলিয়া ইহার নক্ষত্রগুলি ভাল করিয়া দেখা যায় না। চন্দ্রের ভ্রমণ পথে পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা এই তারাগুলির পরিচয়ও পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির মধ্যে পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বসু, মঘা, দক্ষিণ ক্রুসের সর্ব্বনিম্ন তারা, চিত্রা, সেণ্টরাসের বিটা, স্বাতি, সেণ্টরাসের আলফা, জ্যেষ্ঠা, অভিজিৎ, শ্রবণা, ডেনেব এই এগারটিকে দেখা যায় পূর্ণিমায় চন্দ্র এই মাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে থাকে, এই জন্য মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ।

## ২৮

ঘরের মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সুশীলার পানে চেয়ে অলকা বললে,—আরও বিশেষ কি-কারণে আসিনি, বলবো?

ব্রাশ এবং ও-দ্-কলোঁর শিশি টেবিলের উপরে রেখে সুশীলা প্রশ্ন করলে,—কি কারণ, শুনি.........

অলকা বললে,—আমি ভারী অপয়া.........ক'দিন ছিলুম বলে' অসুখ কিছুতে সারছিল না, তাই ভাবলুম, দু'চারদিন যাবো না, তাহলে বোধ হয় অসুখ সেরে যাবে!.........হলো তো তাই!.........

কথার শেষে মৃদু হাসি......এবং অলকা একবার বিমলের পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টি-নিক্ষেপের প্রলোভন দমন করতে পারলো না! দেখলে, বিমলের নিমীলিত নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ-উন্মীলিত হয়েছে!

বিমলের পানে চেয়ে অলকা প্রশ্ন করলে,—ঘুম আসছে বুঝি?

বিমল কোন জবাব দিলে না।

অলকা বললে,—তাহলে চ্যাঁচামেচি করে' অন্যায় করেছি তো!.........না, আপনি ঘুমোন্......আমি বরং চলে' যাচ্ছি......

কথাটা বলে' অলকা চাইলো সুশীলার পানে, বললে,—আমার থাকবার দরকার হবে কি সুশীলাদি?

সুশীলা বললে,—থাকলেই দরকার হয়। না থাকলে দরকার পড়লেও বা কি করছি!

অলকা বললে,— না, না, তা নয়। মানে, আমরা আনাড়ী লোক কি না। রোগীর ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়ার মানে, উৎপাত সৃষ্টি করা! তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী .........নয়?

মৃদু হাস্যে সুশীলা বললে,—কিন্তু যে ক'দিন ছিলেন, রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য তাতে বেড়েছিল বৈ কমেনি! রোগী নিজে বার-বার আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, অলকার খপর পেলেন? আমি বললুম, না.........। এই একটু আগে বলছিলেন, সিধুকে একবার যদি পাঠাতে পারেন একটা খপর নিতে! বললেন, ভয় হচ্ছে, তার অসুখ হলো না তো আমার রোগের ছোঁয়াচ লেগে?

নিশ্বাসের বাষ্পে অলকার মন ভরে' উঠলো.. .সে বাষ্প এসে জমলো চোখের কোণে সরস আর্দ্র হয়ে........

এত মমতা.........এত তুমি ভাবো অলকার কথা?.........কেন ভাবো?.........দু দণ্ডের জন্য পথে দেখা.........অলকা কে.........কী-বা সে.........

অলকা চাইলো বিমলের পানে। বিমল একাগ্র দৃষ্টিতে তার পানে চেয়েছিল! সে দৃষ্টি কি করুণ-মিনতিতে ভরে আছে!

অলকার বুকের মধ্যে যে শাশ্বত-নারী বসে আছে, স্নেহে ও বাৎসল্যে সে-নারী যেন করুণায় বিগলিত হলো! সে-নারী ভুলে গেল দেশ-কাল-পাত্র......একেবারে বিমলের সামনে এসে প্রায় নতজানু হয়ে বসে বললে,—অসুখ-শরীরে এত কেন ভাবেন, বলুন তো?.........ভাববেন না! জানেন তো, গতর খাটিয়ে পরের তাঁবে চাকরি করতে হয়! মনের সব সাধ পূর্ণ করা.........আমরা কি তা পারি সব-সময়ে?.........এই যে সুশীলা-দি এখানে রোজ রাত্রে ডিউটি করতে আসে.........মন হয়তো চায় ঘরে যে আপন জনগুলি আছে, তাদের কাছে দু দণ্ড বসবে,.........পারে কি?

কথাটা বলতে বলতে অলকার মনে হচ্ছিল, মাথাটা বিমলের কোলের উপরে ঢেলে লুটিয়ে দেয়, দিয়ে বলে, তুমি বুঝবে না.........যতক্ষণ না তুমি সুস্থ-স্বচ্ছন্দ হও, ইচ্ছা করে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যতখানি পারি কথা কয়ে তোমার মনকে রোগের যাতনা থেকে ফিরিয়ে রাখি.........

প্রাপ্ত হাত দুখানা অলকার হাতে রেখে বিমল বললে,—আমি সেরে উঠেছি।......আজ সারাদিনই প্রায় এই ইজিচেয়ারে বসে কাটিয়েছি।

—ডাক্তারবাবু মানা করেন নি?

বিমল বললে,—নিজে যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করি, মানা করবার কি কারণ থাকতে পারে?.........

অলকা বললে,—ভালো বোধ করলেই ভালো।.........
অলকা সরে একখানা চেয়ারে বসলো.. ... . সুশীলা বিছানাটা ঝেড়ে দিচ্ছিল।
অলকা চাইলো সুশীলার পানে, চেয়ে বললে,—আজ তাহলে তুমি ঘুমিয়ো সুশীলাদি।
সুশীলা বললে,—আমরা রাত্রে ঘুমোই না.........। অভ্যাসে এমন হয়েছে যে রাত্রে না ঘুমোলে কোন কষ্ট বোধ করি না।
অলকা বললে,—সত্যি?
সুশীলা বললে,—প্রতি রাত্রেই তো ডিউটি থাকে না! তখন অবশ্য ঘুমোই।
বিমল বললে,—আপনি কি বরাবর রাতের ডিউটি করেন?
সুশীলা বললে,—এক-রকম তাই। সকলে রাত জাগতে পারেনা তো!
বিমল বললে,—ও.........
অলকা বললে,—দিনের বেলায় শুধু ঘুমোও?
সুশীলা বললে,—তা বুঝি মানুষে পারে? তা নয়। তবে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমোতে হয়.........বেলা চারটে নাগাদ উঠি! তা বলে' দিনের বেলায় যদি ডাক পড়ে ছেড়ে দিতে পারি না তো!.........
পাশের বাড়ীতে কাদের বেতার-যন্ত্রে গান জাগলো......... চমৎকার গান.........
সুশীলা বললে,—বেশ গলা.........না?
বিমল বললে,—হ্যাঁ।
অলকা শুনলো সে-গান.........বললে,—গানটিও বেশ......... সত্যি.........

বেতারে ভেসে গান চলেছে......

স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে
জাগার বেলা হলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বলো
ফিরিয়া চেয়ে এমন-কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরম রমণীয়........."

বিমল বললে,—রবীন্দ্রনাথের গান.........
অলকা বললে,—আপনার সেট্‌টা সুইচ্‌-অন্‌ করে দেবো?
একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালো,—দাও!
গান চলেছে.........

অলকা ভাবছিল, স্বপনের মোহ!.........তাই বটে!.........এমন-কিছু চাই.........যা পেয়ে বেদনা হবে পরম-রমণীয়!.........
বিমল ভাবছিল,—জাগার বেলা হলো! কেন হয়?......রোগের তন্দ্রাঘোর ভালো ছিল.........অলকা পাশে এসেছিল......... একেবারে পাশে! কোন কথা তাকে বলতে হয়নি......... মিনতি জানাতে হয়নি,—অলকা এসেছিল.........এখানে তার পাশে থেকেছিল.........
সুশীলা শুনছিল গান।.........সে শুনছিল গায়িকার মিষ্ট মধুর কণ্ঠ.........সুরের মাধুরী.........তার সঙ্গে নানা বাদ্যের মিশ্র-সমঞ্জস-চারুতা।
এমন সময় বেহারীবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর প্রবেশ।

বেহারীবাবু বললেন,—এই যে মা.........! অ্যাদ্দিন আমাদের ত্যাগ করেছিলে যে?
সশব্দে মৃদু হাস্যে অলকা বললে,—বড্ড কাজ পড়েছিল.........
ডাক্তারবাবু বললেন,—ভয় নেই.........যা মনে হয়েছিল, তা নয় এবার আস্তে আস্তে বল পাবেন খন। তবে, বল পেলেই একবার শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া চাই.........anywhere......... for a change.........

বেহারীবাবু বললেন,—সে বল পেতে কতদিন লাগবে?
ডাক্তারবাবু বললেন,—ক'দিন আর! ......বড় জোর দশ-বারো......না নয় পনেরো দিন!
বেহারীবাবু বললেন,—বেশ। দার্জ্জিলিং কিম্বা শিলং তাহলে......
অলকা বললে,—রাঁচি যেতে নিষেধ আছে?
ডাক্তারবাবু বললেন,—না!......রাঁচি ভালো.........তাছাড়া রাঁচি হলো চিরদিনের দেশ।
বেহারীবাবু বললেন,—কর্ত্তাও আছেন সেখানে! ......কিন্তু কর্ত্তাকে খপর পাঠালুম.........তাঁর ওখান থেকে কোনো জবাব নেই!......আমার কেমন আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে! কি হলো......
অলকা চাইলো বেহারিবাবুর পানে...বললে,—আর এক-খানা চিঠি লিখুন...খবর দিন, জ্বরটা ছেড়েছে।
বেহারীবাবু বললেন—লিখবো। ...রোজ ভাবি, আজ নিশ্চয় তাঁর চিঠি পাবো...কিন্তু রোজই ডিস্যাপয়েণ্ট হচ্ছি!
অলকা বললে—হয়তো তিনি রাঁচিতে নেই...
বেহারীবাবু বললেন,—তাহলে অফিসে সে খবর অজানা থাকতো না...

এ-কথার পর বেহারীবাবু চাইলেন অলকার পানে, বল-লেন—তুমি বাড়ী যাবে? না এখানে থাকবে আজ রাত্রে, মা?
অলকা বললে,—থাকবার আর দরকার আছে আমার?
বেহারীবাবু বললেন,—ওঁকে দেখার খুব দরকার আছে, তা নয়। তবে আপনজন কাছে থাকলে মনটা ভালো থাকবে!...
অলকা চাইলো বিমলের পানে। বিমলের মুখে কথা নেই...চোখে আবার সেই রকম করুণ দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টি অলকার মুখে নিবদ্ধ!
অলকা বললে—যতক্ষণ না উনি ঘুমোন নিশ্চয় থাকবো। তারপর যদি সুশীলাদির কিছু উপকার হয় আমি থাকলে...
ডাক্তারবাবু এবং বেহারীবাবু বিদায় নিলেন......
সুশীলা বললে বিমলকে—এবারে আর এখানে নয়। বিছানায় শোবেন চলুন...নাহলে ক্লান্ত হবেন।
শান্ত স্বরে বিমল বললে—চলুন...
বলে বিমল ওঠবার চেষ্টা করলো...মাথা ঘুরে গেল। পাশে ছিল অলকা তাড়াতাড়ি দুহাতে বিমলকে ধরে ফেলে ডাকলে,—সুশীলাদি—
ইজিচেয়ার থেকে বালিশ নিয়ে সুশীলা সে-বালিশ বিছানায় রাখছিল,—অলকার কথায় ফিরে তাকিয়ে বললে—কি?
—আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন! ...ভাগ্যিস পাশে ছিলুম......

সুশীলা বললে—এখনো এমন বল শরীরে পাননি যে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করবেন!

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—তাই দেখছি......

অলকা বিমলকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলে। শুয়ে বিমল চোখ বুজলো।

অলকা বললে,—বসো সুশীলাদি...

সুশীলা বললে—আপনি খানিকক্ষণ আছেন তো এখন?

—আছি। কেন, বলো তো?

সুশীলা বললে—আমি একবার বাথরুমে যাবো। গা-মুখ ধুয়ে আসবো। গা না ধুয়েই আজ এসেছি...আপনা আপনির ঘরে একটা ডেলিভারি কেশে গিয়েছিলুম, বেলা তিনটায়...সেখানে পোয়াতী খালাস হলো সন্ধ্যার ঠিক আলোয় তাই সেখান থেকেই একেবারে এখানে এসেছি...বেয়ারাকে বলেছিলুম আমার কাপড় শেমিজ আনতে। সে তা দিয়ে গেছে!

সুশীলা গেল বাথরুমে।

ঘরের মধ্যে দুজনেই চুপচাপ...কারো মুখে কথা নেই! টেবিলের উপর টাইম-পীস ঘড়িটায় শুধু একঘেয়ে টিক্ টিক্ রব চলেছে...

অলকা চেয়েছিল বাইরের দিকে...দেখা যাচ্ছিল ও দিককার বাড়ীর কতকগুলো ঘর...কোন ঘর অন্ধকার...কোন ঘরে আলো জ্বলছে! অলকার মনে হচ্ছিল, দিনের সংগ্রাম চুকিয়ে ও-সব ঘরের লোকজন ঘরে এসে শ্রান্ত দেহ-মনে আরাম আর শান্তি উপভোগ করছে! নিত্যকার সেই বিরোধ-দ্বন্দ্বের সুরে তার মন আবার ঝনঝনিয়ে উঠলো! মেলে না এ-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি?

হঠাৎ ছোট একটি নিশ্বাসের শব্দ...চমকে অলকা চাইলো বিমলের পানে বললে,—নিশ্বাস পড়লো কেন?

বিমল বললে—এমনি...

অলকা বললে—চেয়ে আছেন কেন? ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

বিমল বললে,—আর কত ঘুমোবো? এ কদিন যে ঘুম ঘুমিয়েছি, তাতেও আমার ঘুমের পুঁজি ফুরিয়ে যায়নি, ভাবেন?

অলকা বললে—বেশ, তাহলে জেগে থাকুন...

আর একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—জেগেই থাকবো!...

অলকার মনে আবার জাগলো মমতা! সে বললে—একখানা বই পড়বো শুনবেন?

—কি বই পড়বেন?

অলকা বললে—লাইব্রেরি থেকে বই আনা যাবে না এখন নিশ্চয়।... মানে আপনার ঘরে যেসব বই আছে, তারি একখানা...মানে, যেখানা আপনি বলবেন...

অলকার পানে ক্ষণকাল অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বিমল বললে—কথা যখন সব ফুরিয়ে গেছে...তাই করুন, বই-ই পড়ুন। শুনতে শুনতে যদি ঘুম আসে...

অলকা বললে—তাই। কথা আর নেই, সত্যি। আপনার সঙ্গে যেসব কথা হতে পারে দুজনেই তা শেষ করে ফেলেছি। নতুন কথা কি আর আছে? তাহলে হাতে যে বই ওঠে, পড়ি...আপনি শুয়ে শুয়ে শুনুন...

টেবিলের উপরে ছিল ক'খানা বই...ইংরেজী-বাঙলা! তার মধ্য থেকে অলকা নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা। বললে—রবিবাবুর কবিতা পড়ি—এ জিনিস দেহে-মনে মায়ার প্রলেপ বুলিয়ে দেবে'খন।

অলকা পড়তে লাগলো—

> দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী; বেলা দ্বিপ্রহর;
> হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর;
> জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
> মধ্যাহ্ন বাতাসে; স্নিগ্ধ অশ্বত্থের ছায়...

সুশীলা এলো,—তার হাতে একখানা চিঠি।

সুশীলা ডাকলো—দিদিমণি...

অলকা বই থেকে মুখ তুলে সুশীলার পানে তাকালো...

সুশীলা বললে—ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন আজ সত্যি! এই দ্যাখো চিঠি...চিঠিখানা সুশীলা দিল অলকার হাতে...

চিঠিতে লেখা আছে—

একবার একঘণ্টার জন্যে আসবেন। প্রসূতির নানা উপসর্গ......

সুশীলা বললে—যে ডেলিভারি কেসে গিয়েছিলুম আজ বিকেলে, তাদের চিঠি...গাড়ী পাঠিয়েছে। ডাক্তার এসেছেন—আমি যাবো আর আসবো। এক ঘণ্টার ছুটি চাইছি ভাই...

অলকা বললে,—আচ্ছা...আমি এখন আছি তো—

সুশীলা বললে—যাবো আর আসবো...

সুশীলা গেল চলে...

অলকা আবার পড়তে লাগলো.....

একটার পর আর একটা কবিতা অলকা পড়ে চলেছে... মাঝে মাঝে থামে, থেমে বিমলের পানে চায়, সাগ্রহ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—ভালো লাগছে তো?

বিমল জবাব দেয়,—লাগছে; অলকা বললে—ঘুম পেলে জানাবেন...আমি চুপ করবো...চোখের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিমল জানায় বলবো!

বিমল কবিতা শুনছে...দু'চোখে পলক পড়ে না...চেয়ে আছে অলকার পানে! অলকা তখন পড়ছিল—

> ওহে অন্তরতম,
> মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
> আসি অন্তরে মম?
> দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
> পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
> নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
> দলিত দ্রাক্ষাসম!

হঠাৎ ঘরের বাইরে জুতোর দুপ্‌দাপ্ শব্দ এবং চকিতে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন বেহারীবাবু...আর তাঁর সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি কিশোরী।

বিমল চেয়ে দেখলো তাঁদের পানে...চিনতে বিলম্ব হলো না...প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রিয়শঙ্কর রায় এবং তাঁর সঙ্গের কিশোরীটি বিভাবরী।

প্রিয়শঙ্কর এগিয়ে এলেন...

বই বন্ধ করে অলকা উঠে দাঁড়ালো...

প্রিয়শংকর বিমলের মাথায় গায়ে হাত রেখে বললেন, গা ভালো... জ্বর নেই।

বেহারীবাবু বললেন্—না। আজ ক'দিন জ্বর নেই!

প্রিয়শংকর বলেন—আমরা রাঁচিতে ছিলুম না...... গিয়েছিলুম প্রথমে শিলং,—সেখান থেকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি—আজ সকালে ফিরেছি রাঁচি। ফিরেই বেহারীর চিঠি পেলুম। চিঠি পেয়ে বিশ্রাম করতে পারলুম না। বিভা বড্ড জেদ ধরলে,—কাজেই নেয়ে-খেয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লুম!...

বিমলের পানে তিনি চাইলেন; চেয়ে বললেন—যেমন দুর্ভাবনা হয়েছিল...আঃ বাঁচলুম, ভালো আছো দেখে!...

বিভাবরী এলো এগিয়ে অলকার পানে...বললে—আপনি নার্স?

অলকার বুকে সমুদ্রের একরাশ তরঙ্গোচ্ছ্বাস...কোনমতে অলকা বললে,—না।

প্রিয়শঙ্কর চাইলেন অলকার পানে......চিনতে পারলেন। এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন বিমলের সঙ্গে রেশের মাঠে!

তিনি কোন কথা বললেন না, অলকার পানে চেয়ে রইলেন......তারপর বেহারীর পানে চাইলেন।

বেহারীবাবু বললেন—দিদিমণি!...যে সেবা উনি করেছেন...দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি! খবর পেয়ে এসে সেই যে বিমলবাবুর পাশে বসেছিলেন...সে মূর্ত্তি আমি কখনো ভুলবো না!

বিভাবরী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়শঙ্কর বললেন, —বিমলের কাছে আয় বিভা...ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বোস...! যে রকম তোর ভাবনা হয়েছিল...দেখ ভগবানের কৃপায় বিমল ভালোই আছে!

(ক্রমশ)

---

# রাত্রির প্রতি

**ব্রজেন ভট্টাচার্য্য**

১

এস রাত্রি,
পশ্চিম তরঙ্গ বাহি,
কুয়াসার পূর্ব্ব গুহা হ'তে,
যেথা বসি' সুদীর্ঘ নির্জ্জন
দিবসের আলো ধরি',
বোন জাল, ভয়ের—আলোর
হে ভীষণ, হে সুন্দর,
এস এস ত্বরা!

২

পর নক্ষত্র খচিত তব
ধূসর আবরণ।
দিবসের চক্ষু দুটি অন্ধ হোক্
কৃষ্ণ তব কেশে...........
অশ্রান্ত চুম্বনে,
দাও তারে শেষ করি—
তারপর এস তুমি
নগর, সমুদ্র, আর
স্থলভূমি বাহি'—
এস মোর বাঞ্ছিত!

৩

প্রভাতে উঠিয়া,
তব লাগি ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
আলো জাগে—
শিশিরেরা ধীরে চলি যায়—
মধ্যাহ্ন পড়িয়া থাকে,
প্রতি পুষ্পে, প্রতি বৃক্ষ মাথে—
শ্রান্ত দিন চাহিছে বিশ্রাম,
অনাদৃত অতিথির মত
ভাবিতেছে যাব কি না-যাব......
তখনো তোমার লাগি ফেলি দীর্ঘশ্বাস!

৪

ভ্রাতা মৃত্যু আসি কহে—
চাই কি আমায়?
প্রিয় কন্যা নিদ্রা আসি,
ঘুমভরা চোখে,
মধ্যাহ্নের মধুপের মত
চুপি চুপি ডাকে—
পার্শ্বে তব পাতিব শয়ন?
চাহ কি আমায়?
আমি কহি—
না, না, নহ তুমি!

৫

তোমার মৃত্যুর সাথে
আসুক মরণ—
ত্বরা, অতি ত্বরা—
নিদ্রা শুধু আসিবে যখন
যবে তুমি যাবে চলি...........
এদের কারোর কাছে নাহিক প্রার্থনা
তুমি শুধু এসো ত্বরা—
হে প্রিয় আমার! *

---

* Shelly-র To Night কবিতার অনুবাদ।

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ

ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে বলেনঃ—

**বন্ধুগণ!**

আজ অর্দ্ধেক দেশ আপোষ নিষ্পত্তি ও রফার নামে ভিন্ন পথে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের গণশক্তির উপর অবিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে এখনও দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য তৈরী হয় নাই, তাঁহারা এখনও গঠনমূলক কার্য্যের নামে তাঁত চরকাকে স্বরাজ্যসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া দেশকে অন্য পথে চালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আপনারা যাঁহারা আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গভীরভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের গণশক্তি আজ সজাগ ও উদ্বুদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিবার উপযুক্ত নেতার অধীনে তাহারা সকল সময়ে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে উৎসুক, কেবল সেই নীতিবিদ্যায় পারদর্শী ও কর্ম্মকুশল নেতার শুভ আগমনের জন্য দেশ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, ইতিমধ্যে সারা জগতে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় সংগ্রাম আরম্ভ করিবার শুভ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যে সংগ্রাম আজ আপনারা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সব দিক পর্য্যালোচনা করিয়া মন্থরগতিতে সুরু করিয়াছেন তাহাকে কি করিয়া ব্যাপকভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে, ইহাই আজ আপনাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া আমি মনে করি এবং বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে যে সমস্ত মন্তব্য গৃহীত হইবে, তাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য এবং ক্রিয়াশীল করিবার জন্য যে machinery বা organisation খাড়া করিতে হইবে তাহাকে ঠিক রূপ দিয়া অবিলম্বে কার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ করাই আপনাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা মানে আমরা বুঝি অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ফলে জাতির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য একেবারে অন্তর্হিত হয়, অভাব ও দারিদ্র্যের করাল ছায়া দেশের উপর পড়িয়া জাতিকে ঋণভারে প্রপীড়িত করিয়া তাহাকে ধনীলোকের কবলে লইয়া গিয়া একেবারে অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলে। দেশে দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, বেকার সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে এবং ইংরেজ প্রবর্ত্তিত জমি সংক্রান্ত যে স্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ফলে এক নূতন আভিজাত্য শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যাঁহারা বিনাশ্রমে চাষীর শ্রমলব্ধ অর্থের অংশ গ্রহণ করিয়া নিজেরা দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং সেই জমিদার শ্রেণীরাও দৈনন্দিন জীবনে কৃষিজীবীদের দিনগুজারণের যে একমাত্র ব্যবস্থা তাহার অংশ গ্রহণ করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজশাসনের অনুগামী হইয়া তাঁহাদের শোষণ নীতির সহায়ক হইয়া পড়েন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অলসতা ও শ্রমবিমুখতা এতই বাড়িয়া যায় যে, তাঁহারা কৃষকদের উপর ষোল আনা নির্ভর করিতে করিতে অধিকাংশই parasite শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন।

আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ সামাজিক দাসত্ব ও পরাধীনতা হইতে মুক্তি। এই দাসত্বের ফলে আমরা সমাজে যাবতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বলে এখনও জাতি ও সমাজের মধ্যে উচ্চ—নীচ বর্ণ ভেদের হাত হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে পারি নাই, এখনও আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা আশানুরূপ বিস্তার লাভ করে নাই, এখনও আমাদের সমাজে সাহচর্য্যের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয় না, এখনও সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রগতিবাদকে আমরা পুরোপুরি মানিয়া লইয়া সমাজ ও সংসারকে

গড়িয়া তুলিবার পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, এখনও সমাজে বিবাহে পণপ্রথা সমভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহার ফলে কন্যার পিতা বা অভিভাবক একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। এখনও বিবাহ পদ্ধতি ও পৌরোহিত্যবাদের আমূল রূপান্তর সাধিত হয় নাই, এখনও চিরাচরিত পুরাতন সংস্কার বলে গতানুগতিক ধারা ধরিয়া অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাদের সমাজের মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই অভ্যাস করিয়া যাইতেছেন, যাহার কোন সময়ে সময়োপযোগী সার্থকতা থাকিলেও তাহা চিরন্তন নীতি বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমাদিগকে এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে গিয়া এই সামাজিক মুক্তিলাভ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিবে না।

আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হইবেন যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ছাড়া স্বাধীনতা কোনদিনই পূর্ণাঙ্গ রূপ লইতে পারে না। আমাদের আজ ব্যষ্টি জীবনে পরাধীনতা চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তাহার হাত হইতে আমাদের মুক্তিবিধান আবশ্যক। ব্যক্তি জীবনে কাহারও ভয় না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করা, সেই মতকে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করা এবং নির্ভীকভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা ন্যায় ও সত্যের অনুকূল বলিয়া মনে করিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন এবং সর্ব্ববিধ জাগতিক ব্যাপারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে কোনরূপ খর্ব্ব না করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণপ্রদ কার্য্যে নিয়োগ করিবার পন্থা সুগম করিয়া তাহাকে সার্ব্বজনীন নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার অনুগামী করা, ইহাই হইতেছে এক কথায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রূপ।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চারিটি মূলনীতি হইল:—

(১) প্রকাশ্যভাবে সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার;

(২) প্রকাশ্য সভায় জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার।

(৩) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার অধিকার অর্থাৎ প্রেসকে কোনরূপ আইনের কবলিত করিয়া তাহার ভাব প্রচারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার বিধান।

(৪) আত্মরক্ষার অধিকার এবং সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্র রাখিবার ও তাহা ব্যবহার করিবার পূর্ণ অধিকার।

আমাদের সর্ব্বপ্রথম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। আজ নয় মাস হইল ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতের কোনই সম্পর্ক নাই এবং থাকিতেও পারে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অন্যান্য দেশের মত ভারতকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে দেখাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতের লোকমত গ্রহণ না করিয়াই ভারতকে ব্রিটিশের পক্ষভুক্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পরিচালনার গুরু দায়িত্ব-ভারও ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল নিজ ক্ষমতাবলে ভারতে Defence of India Rules জারী করিয়াছেন।

ব্রিটেন ও জার্ম্মানী পরস্পর সম্মুখীন হইলে এই যুদ্ধের গতি যে কোন দিকে যাইবে এবং ভারতের উপর তাহার ফলাফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন। হয়ত জার্ম্মানী গ্রেট ব্রিটেন আক্রমণ করিলে নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য ইংরেজ ভারত হইতে তাহার সমস্ত যুদ্ধোপকরণ লইয়া দেশ মুখে রওনা হইবে এবং ভারত যে সময় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে তখন তাহাকে বহিঃশত্রু সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে? ভারতের এই নিরস্ত্র, অসহায় এবং সম্ভবত দেশ-রক্ষায় অক্ষম এ অবস্থা কোথা হইতে হইল? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি এই অবস্থা আনয়নের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী নহে?

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা—হিন্দু-মোসলেম সমস্যা। আপনারা অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হইবেন যে, কংগ্রেস এবং গণপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দু মোসলেম বলিয়া কোন ভেদবুদ্ধিজাত সংকীর্ণতা নাই, তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, সারা দেশের মধ্যে এই সম্প্রদায়গত বিভেদ অতিশয় সুস্পষ্টরূপেই বিদ্যমান। তাহার উপর এই ভেদবুদ্ধিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য মিঃ জিন্না প্রমুখ ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারতকে হিন্দু-মুসলমান ভেদে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়াছেন আজ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে মুসলমান সমাজের মধ্যে বহু বিশিষ্ট নেতা মুসলীম লীগের মূল প্রেরণা সম্বন্ধে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা মিঃ জিন্নার 'পাকিস্থান' স্কীম সম্বন্ধে গভীর সন্দিহান হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন এবং হিন্দু মুসলমানের একতা প্রতিষ্ঠা করাই যে যাবতীয় পার্টির মূল লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় সমস্যা—হিন্দুর পক্ষ হইতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনীতি চালাইবার জন্য দল গঠন অথবা Organisation খাড়া করা। আজ কংগ্রেস অগ্রগামী দলের নেতৃত্বাধীনে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, যাবতীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন, তাঁহাদের নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া সকলেই কংগ্রেসের অগ্রগামী দলে যোগদান করিয়া সংগ্রামশীল মনোভাব অবলম্বন করিয়া এই জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন, অথবা তাহা যদি না একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহারা রাজনীতি কংগ্রেসের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সমাজ সংগঠন, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য যথাবিধি অনুশীলন, কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, হিন্দুর অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রচার স্পৃহা জাগ্রত করিবার মনোভাবের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারেন।

আমাদের চতুর্থ সমস্যা—কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্কলহ ও দলাদলি। আপনারা সকলেই জানেন, এই অন্তর্কলহ ও দলাদলির জন্য দায়ী কাহারা।

আমাদের পঞ্চম সমস্যা—দেশে বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে আদর্শগত এবং আধিপত্যপ্রিয়তামূলক হিংসা ও দলাদলি। আজকাল দেশের মধ্যে যেভাবে নীতিগত বিরোধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে আধিপত্যপ্রিয়তা বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি ও মতপার্থক্য স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়াছে। একপক্ষে ইহা প্রাণশক্তির সজীবতা ও আত্মপ্রকাশ করার বলবতী স্পৃহার নিদর্শন বলিয়া সর্ব্বত্র তাহা ক্ষতিজনক নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠান পথে অন্তরায় এবং যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা এক নেতৃত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, তখন তাহা বহু নেতৃত্ব আনিয়া ফেলে। এই সব কারণে আজ দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেশে বহু দল ও চুল চিরিয়া সুক্ষ্ম বিচার করিয়া মতপার্থক্য বজায় করিয়া চলার পক্ষপাতী নহি।

আমাদের ষষ্ঠ সমস্যা—বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতার টিকিটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা বাঙলার গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব গঠন এবং তাহার দ্বারা শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ। ইহার জন্য আমাদিগকে বাঙলায় যেভাবে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং দমননীতি দেশের মধ্যে যেরূপ অতুলভাবে ক্রীড়া-

শীল হইয়াছে, তাহা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমরা চাই জনমতের কাছে দায়িত্বমূলক শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা। তাহা স্বাধীনতা লাভের পর ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট (National Government) প্রতিষ্ঠা হইলেই কেবল সম্ভব হইতে পারে। হয়ত দেশের আন্তর্জ্জাতিক মহাযুদ্ধের ফলে যে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে ও কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র প্রবর্ত্তিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহাতে হয়ত Election-এর সময় কংগ্রেস ও মুসলমানের মধ্যে একযোগে কার্য্য করা সম্ভব হইতে পারে। যদি না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের দিক হইতে উপযুক্ত সংখ্যায় মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে অগ্রগামী কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দাঁড় করানো দরকার হইতে পারে। ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের মধ্যে যে বিভিন্ন দল গঠিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সংগে পূর্ব্বাহ্নে একটা বোঝাপড়া করা আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। সব কিছু অসম্ভব হইলে অগ্রগামী কংগ্রেসদলের পক্ষে Assemblyর ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রামনীতি চালাইবার অনুকূল ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবার জন্য হয়ত মন্ত্রিত্বের Coalition Boardও গঠন করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিন্দার তেমন কিছুই দেখিতে পাই না।

**কর্ম্মপন্থা**

কর্ম্মপদ্ধতির ধারা হিসাবে আমরা নিম্নলিখিত ক্রমপ্রণালীর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাইঃ—

(১) প্রতি জেলার মহকুমায় ও পল্লীতে আমাদের বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধীনে কংগ্রেস কমিটিসমূহ গঠন করা এবং সেই সংগে Forward Bloc-এর সভ্য সংগ্রহ করিয়া যাহাতে ফরোয়ার্ড ব্লক কমিটি গঠিত হয়, তাহার সহায়তা করা।

(২) বিভিন্ন Territorial unitএ যেখানে সংগ্রাম সুরু করিতে হইবে, সেখানে অন্য কোন সংগ্রামশীল ও সক্রিয় দল—কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও মহিলা সমিতি—কার্য্য করিয়া থাকিলে তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া বোর্ড গঠন করিয়া একযোগে সংগ্রাম সুরু করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

(৩) দেশের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য প্রতি জেলায় অন্তত একশতজন স্বেচ্ছাসেবককে wholetime কর্ম্মী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং জেলার মধ্যে দশটি কেন্দ্রে অথবা বিশটি কেন্দ্রে ভাগ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) গণ-সত্যাগ্রহ (mass-action) কোথায়, কিভাবে, কখন আরম্ভ করা যাইতে পারে, ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলে সেই কেন্দ্রে তাহা অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া তাহা পরিচালনার ভার অগ্রগামী দল নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া চালাইতে পারিলে ভাল হয়। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন ঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় অনেক স্থলে গণ-শক্তির উৎসাহ দমিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বর্দ্ধমান জেলায় ক্যানেল কর আন্দোলনে কৃষকেরা খুব বিক্ষুব্ধ হইয়া অন্যায় করের বিরুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অশেষবিধ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া লয় এবং জেলে গিয়া তাহারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া hunger-strike করিয়া অশেষবিধ দুঃখ কষ্ট বরণ করে এবং তাহাদের মেয়াদের কাল সেইজন্য আরও বাড়িয়া যায়। সেইরূপ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ী জিলাতে বর্গাদাররা তাহাদের জোতদারদের বিরুদ্ধে অন্যায় বেগার-প্রথার প্রতিরোধ করিতে গিয়া দলে দলে গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদিগকেও অন্যায়ভাবে নির্য্যাতন ও কারাবাস সহ্য করিতে হয়। তৃতীয় উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট যখন jute-ordinance জারী করেন, তখনও তাঁহারা পুঁজিবাদী মনিবশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দিকে নজর রাখিয়াই ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, মজুরদের-স্বার্থকে সেই অবস্থায় একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা এরূপ প্রবলভাবে আন্দোলন চালায় ও ধর্ম্মঘট এমন সুশৃংখলার সহিত পরিচালনা করে যে, অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া jute-ordinance প্রত্যাহার করিতে হয়। কৃষক ও শ্রমিক সমস্যার আন্দোলনে আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেভাবে অতি সহজে জমিদার পুঁজিবাদীর পক্ষভুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম, তাহা যে জাতীয় সংগ্রাম আমরা সুরু করিতে চলিয়াছি, তাহারই অংগীভূত হইয়া পড়ে।

(৫) যুদ্ধের অবস্থা যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন দেশে Defence of India Rule বলবৎ থাকিবে, ততদিন আমাদের ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে আপনারা অবহিত হইবেন বলিয়া আশা করি।

# অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ

ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত গণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ,

ইংরেজ রাজত্বে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঢাকার স্মৃতিতে 'কালা গোরার' যুদ্ধ বলিয়া আজও বিদ্যমান। সিপাহী যুদ্ধকে ভারতের অন্যত্র কালা গোরার যুদ্ধ বলে কিনা জানি না, কিন্তু ঢাকার প্রাচীন প্রাচীনারা আজও ঐ বিদ্রোহকে কালা গোরার যুদ্ধ বলে; ঢাকার সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

লর্ড কার্জ্জন বাঙলাদেশ বিভক্ত করিয়া ঢাকাকেই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী করিবেন বলিয়া ঢাকাবাসীকে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান—কিন্তু ঢাকা বাঙলার সমগ্রতা রক্ষা করিতে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে।

এখানে বলিতে চাই, আমরা যাহা জানি, এই জাতীয় আন্দোলনের তাহাই সবখানি কথা নহে। আমরা যাহা জানি না বা কোনকালে জানিতে পারিব না, সেই সকল বহু পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর অযাচিত দানে, ত্যাগে, বেদনা ও সহানুভূতিতে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস মহিমান্বিত।

জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পক্ষে ঢাকার মাটি উর্ব্বর ছিল। কংগ্রেস আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে ঢাকার গোবিন্দ রায়—'কতকাল পরে বল ভারতরে' এবং 'যমুনা লহরী' গাহিয়া—পরাধীন ভারতের বেদনাময় ছবি আঁকিলেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়া ঢাকার যুবজনের মধ্যে যে টাটকা তাজা মুক্তি প্রয়াসী চিত্তটি দেখা দিল তাহা অপূর্ব্ব। তাঁহারা যাহা মিথ্যা অন্যায় মনে করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রোহই করেন নাই, বিদ্রোহ করিতে গিয়া যে সামাজিক অর্থনীতিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা জাতির সম্পদ।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কারামুক্ত সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ঢাকা শহরে পদার্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের আগমনে ঢাকা শহরের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ তখন কংগ্রেসে উগ্রপন্থী। সুরেন্দ্রনাথের উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার এক বিশিষ্ট মুসলমান জননেতা। ঐ সভায় ৫।৬জন মুসলমান নেতা তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের নীতির আক্রমণ করেন। তদানীন্তন উগ্রপন্থী সুরেন্দ্রনাথের সভায় মুসলমান নেতাদের ঐরূপ বক্তৃতা রাজপুরুষগণ ভাল চক্ষে দেখিলেন না। কিছুদিন পরে বড়লাটও ঢাকায় আসেন—এবং ঢাকার বিখ্যাত আবদুল গণি সাহেবকে ঐ আন্দোলন হইতে মুক্ত থাকিতে এবং মুসলমানগণকে মুক্ত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলন হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোঃ সভাপতি হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন—স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন। ঐ সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন এবং সভাপতির ইংরেজী অভিভাষণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা তর্জ্জমা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। ঐ সম্মেলনে ঢাকার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর পার্শ্বনাথবাবু স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কাপ্তান হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করি—বাঙলার শরীর চর্চ্চা—আত্মসম্মান ও দুর্ব্বল রক্ষার্থ শারীরিক বলপ্রয়োগের সামর্থ্য অর্জ্জনের প্রেরণা গোটা বাঙলায় বুঝি বিখ্যাত শ্যামাকান্ত-পার্শ্বনাথই আনিয়া দেন।

সমগ্র কংগ্রেসের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক বিশেষ ও প্রচণ্ড অধ্যায়। ইতিপূর্ব্বে সরকারী কোন অপরিবর্ত্তনীয় হুকুমকে পরিবর্ত্তিত ও বাতিল করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ন্যায় ব্যাপক তীব্র জনআন্দোলন দেখা দেয় নাই। আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আন্দোলন নূতন দার্শনিক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। এইখানেই দেশাত্ম বোধের জন্য সেই দেশাত্মবোধ বঙ্গভঙ্গ রদ করাটাই আর বড় বলিয়া মনে করিতে পারিল না; বলিয়া বসিল, স্বাধীনতা ভিন্ন সকলই বৃথা—জীবন দুর্ব্বহ।

**বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঢাকা**

১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ হয়, সমগ্র ঢাকা জেলায় ঐ আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন—আনন্দচন্দ্র রায়। ঢাকা বাঙলার ঐ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। বয়কট মন্ত্রের স্রষ্টাও ছিলেন লালমোহন ঘোষ। ঢাকার নবাবের ভ্রাতা খাজে আতেকুল্লা সাহেব কলিকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে এক শ্রেণীর মুসলমানদের হাত করিয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করা হয়।

কংগ্রেসে মধ্যপন্থী উগ্রপন্থীর মতভেদ দেখা দিলে ঢাকায়ও সেই মতভেদ দেখা দেয়।

১৯২০ সাল কংগ্রেসের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়। নাগপুরের পরে ১৯২১ সালে যথারীতি অসহযোগ ঘোষিত হয়। ঢাকার সহস্র সহস্র যুবক, মহিলা এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কত ছাত্র স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বাহির হয়, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। শুধু যুবক নহে—কত অধ্যাপক, শিক্ষক, সরকারী কর্ম্মচারী, উকিল অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদলের পরিকল্পনা ঢাকাবাসী সাদরে গ্রহণ করে—যদিও নো-চেঞ্জারদেরও বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে কার্য্য চলিতে থাকে।

১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই সকল আন্দোলনেও ঢাকা তাহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আজও ঢাকার প্রাণ তেমনি টাটকা তাজা রহিয়াছে। প্রতিনিধিবর্গকে আমরা সবিনয়ে আশ্বাস দিতে পারি—মুক্তি আন্দোলনে আপনাদের পাশে আজিও ঢাকা দাঁড়াইবে—দ্বিধা করিবে না।

অন্তরের শ্রদ্ধা লইয়া ঢাকার পক্ষ হইতে আমি আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

**বন্দে মাতরম্**

# মহিলা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণের সারাংশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা রায় নিম্নোক্ত অভিভাষণ পাঠ করেন।

সমবেত সহকর্ম্মিগণ,

এক অভূতপূর্ব্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঢাকার এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়েছে। একটা বিশ্বজোড়া ভাঙ্গাগড়া, এক যুগান্তকারী বিপ্লবের মধ্যে আমরা মিলিত হয়েছি। অদূরে ইউরোপ মহাদেশে ইতিহাসের এক নূতন অঙ্ক রক্তের অক্ষরে লিখিত হচ্ছে—মানব সভ্যতা ও কৃষ্টি কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে নিশ্চিত কেউ জানে না। এই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের ঝড় ভারতের কূলেও এসে লাগবে—সেদিন দূরে নয়। নানা সমস্যা আজ অতি বাস্তবাকারে দ্বারে রূঢ় আঘাত করছে। ভারতবর্ষকে আজ এই নির্দ্দয় বাস্তবের সম্মুখীন হোতেই হবে। সমস্ত প্রশ্নের জবাব ও সমস্যার সমাধান আজ না দিলেই চলবে না। জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে যদি ভারতবর্ষ দ্বিধাকুল হয়ে ইতস্তত করে, তবে ভারতের অধীনতা আর এক যুগের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই প্রলয়ের মধ্যে আমাদের প্রবীণ বিচক্ষণ নেতাদের কাছ থেকে আমরা কোন নির্দ্দেশই পাই নাই। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আপনারা মিলিত হয়েছেন কর্ত্তব্য স্থির করতে।

প্রাদেশিক সম্মেলনের সৌষ্ঠব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়—এর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতির সমস্যা সমাধানে ও ভবিষ্যৎকে গড়বার কাজে নারীদের দায়িত্ব পুরুষের চাইতে কিছুমাত্র কম নয়, একথা বিশেষ করে নারী ও পুরুষ উভয়েরই বোঝা দরকার—সৌখিন রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবার দিন চলে গেছে। সমস্ত সমস্যাকে জানতে ও বিশ্লেষণ করতে হবে এবং পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে জাতিকে সর্বদিক দিয়ে গড়ে তোলবার গুরুভার গ্রহণ করতে হবে নারীকে। তবে মেয়েরা এখনো বহু পরিমাণে আত্মবিস্মৃত এবং পুরুষেরাও অনেক স্থানে মেয়েদের রাজনীতিকে সৌখিনতার পর্য্যায়ে ফেলে কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। ইউরোপের অবস্থা জটিল হোয়ে উঠেছে; পুরোনো ও নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেঁধেছে, পৃথিবীর ঐশ্চর্য্য কে ভোগ করবে, তা নিয়ে। এই মহাসমরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দুর্ব্বল হবেই, সে যে পক্ষেরই হারজিত হোক না কেন এবং এই সত্যের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর চাকায় বাঁধা যে দেশগুলি, তাদের ঘটবে অপূর্ব্ব মুক্তি, ভারতবর্ষের পক্ষে একথাই আজ সবচেয়ে বড় বাস্তব। কিন্তু এই মুক্তির জন্য আমরা প্রস্তুত হোচ্ছি কিভাবে সেটাই বিশেষভাবে আমাদের বিচার্য্য। পূর্ব্বে বলেছি, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নিকট নির্দ্দেশের অপেক্ষা কোরে আমরা হতাশ হোয়েছি—এই সন্ধিক্ষণে তাঁদের নির্দ্দেশ মিললো না। কাজেই পথ আমাদের নিজেদেরই স্থির করতে হবে। একথা নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করবার এত বড় সুযোগ আর এর পূর্ব্বে আসে নি, এখন আমাদের যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সেই স্বাধীনতা লাভের পথকে সুগম করতে হবে। আজ যদি আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হই, তবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস আমাদের চিরদিনের জন্য ধিক্কার দেবে। এখন আমাদের প্রয়োজন দাবীকে যথাসম্ভব উচ্চে স্থাপন করা ও সে দাবীর পেছনে ভারতের অগণিত বিপ্লবি গণ-সাধারণকে সংহত করা।

বন্ধুগণ, নতুন নেতৃত্ব কিভাবে সৃষ্টি হবে, সে পথই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। জগতের তথা ভারতের ও তার ভবিষ্যৎ গণ-সাধারণের সহিত জড়িত মুষ্টিমেয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুগ অতীত হোতে চলেছে। কাজেই সেই গণ-সাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা যাঁরা অর্জ্জন করতে পারবেন, তাঁরাই হবেন জাতির ভবিষ্যৎ নেতা। কাজেই এবারকার প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে আয়োজন হোয়েছে শ্রমিক ও কৃষক কর্ম্মীদের সম্মেলনের। এটাই নূতন যুগের ইঙ্গিত। এদের স্বার্থকে, এদের দাবীকে আমাদের রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং তার মধ্য দিয়েই নূতন যুগের সূচনা হবে। সেই যুগকে আপনারা সব দিক দিয়ে জানুন, তার অবশ্যম্ভাবী আগমনকে আপনারা সম্বর্দ্ধিত করুন—এই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন।

# বৈশাখ

(কবিতা)

**নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
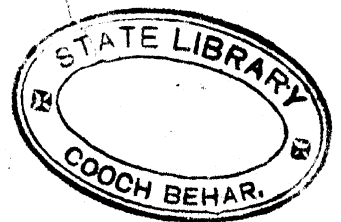
চৈত্রের অঞ্চল হ'তে খসে পড়া এক কণা আগুনের মতো,
হে রুদ্র বৈশাখ,
রুক্ষ জটা দীপ্ত ভাগে, শীর্ণ কণ্ঠে আজিকে সতত
কারে দাও ডাক?
দূরে ঘনো প্রান্তরের সবুজ ঘাসেরা কাঁপে শিহরি সভয়ে,
তব পদপাতে,
অগ্নির পতাকা বহি চলিয়াছো যেন রাজ্য জয়ে
মৃত্যুদূত সাথে।

মোরাও কাঁপিয়া উঠি বরষের প্রথম দিবসে
স্মরি তব নাম,
অগ্নিদেব ওই হৃদে নিশিদিন কেন যে নিবসে
নাহি বুঝিলাম।
আমরা পুড়েছি আগে—আরও পুড়িব স'বে
যুগ যুগান্তর,
হে বৈশাখ, হে গম্ভীর—বলো হ'বে কবে
আরো খরোতরো?

# মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীর অভিভাষণের সারাংশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

সমবেত জননী, ভগিণী ও কন্যাগণ!

পৃথিবীর পরিস্থিতিতে যতদূর মনে হইতেছে, তাহাতে কেহ কাহাকেও সাহায্য করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সকলেই নিজকে লইয়া বিব্রত। এ সময় ভারতবর্ষে একতার বিশেষ প্রয়োজন। কংগ্রেস এ বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেও নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

এখন বিবেচ্য বিষয় বাঙলার করণীয় কি? এবং নারী সমাজ কিভাবে এই অবস্থাকে জয়যুক্ত করিতে পারে?

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড জেটল্যান্ড ভারতকে স্বাধীনতা দানের সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান একত্র কাজ করিতে পারে না। ভারতবাসী নিজেকে রক্ষা (Defence) করিতে অক্ষম, এমতাবস্থায় ভারতবাসী স্বাধীনতা পাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। লর্ড জেটল্যান্ডের উক্তির প্রথম দফার উত্তর সুভাষচন্দ্র দিয়াছেন কর্পোরেশনে কংগ্রেস ও লীগের চুক্তি দ্বারা।

লর্ড জেটল্যান্ডের দ্বিতীয় প্রশ্ন আত্মরক্ষা (defence)। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। সুতরাং উহার দায়িত্ব স্বভাবত আমাদেরই তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে না থাকায় দেশরক্ষার ক্ষমতাও আমাদের হাতে নাই। তথাপি দেশরক্ষার চিন্তা না করিয়া স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষার কোনও অর্থ হয় না। কারণ ইতিহাসের স্বাভাবিক আবর্ত্তনের ফলে রোম কবল হইতে ইংলন্ডের মুক্তির ন্যায় ঘটনা পরম্পরায় হয়ত ভারত ইংরেজের কবল হইতে মুক্ত হইতেও পারে কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হইল না। সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভারত পরাধীনতা হইতে পরাধীনতায় স্বদেশের হস্তান্তর অলসভাবে বসিয়া দেখিবে মাত্র।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশের আত্মরক্ষা প্রশ্নের আলোচনায় দেখা যাইবে, আত্মরক্ষা (Defence) দুই প্রকার ঃ—

১। **অর্থনৈতিক।**
২। **রাষ্ট্রনৈতিক।**

এই উভয় প্রকার পদ্ধতিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বিশেষতঃ—যেহেতু শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই, সেইজন্য সরকারী অর্থকোষের সুযোগ গ্রহণ করিতে আমরা পারিব না। অর্থনৈতিক রক্ষার সমস্যা ও সমাধান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ও আমার পূর্ব্ব অভিভাষণে—দেশবন্ধুর সময়ে নির্দ্ধারিত গঠন পদ্ধতির বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম। এ সময়ে এ স্থানে তাহার আর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হইবে না।

আত্মরক্ষা ব্যাপারে প্রথম করণীয় বিষয় ঃ—

১। লোক সংগ্রহ।
২। তাহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া তোলা।
৩। কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করা।
৪। ইহাদের রসদের বন্দোবস্ত করা।
৫। প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৬। যে কোন পদ্ধতি ও প্রণালীতে দেশ আক্রান্ত হইলে আক্রান্ত স্থানের অসামরিক অধিবাসিগণকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। দেশের শাসকমন্ডলী তাহাদের বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরই করিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে নারী সমাজের বিশেষ করণীয় বিষয় রসদ, চিকিৎসা এবং স্থানচ্যুত লোকদের আহার ও বাসস্থানের সর্ব্ব বিষয়ের সমাধান করা। কারণ, সক্ষম পুরুষ মাত্রকেই সৈনিকের কাজের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতএব এক দিকে পরিবারের ভরণপোষণ ও অন্য দিকে সংগ্রামের সহায়তা করা নারী সমাজের বিশেষভাবে করণীয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহা যে একটা জীবনমরণ সমস্যা, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এই সমস্যার সমাধানও যে আমাদের সাধ্যায়ত্ত ইহাও অন্তরে অন্তরে বুঝিতে হইবে। আজ পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টির ধ্বংসলীলায় কিভাবে সন্তানেরা বলি পড়িতেছে—গৃহে গৃহে পুত্রহীন মায়েদের হাহাকারকে নিজেরা উপলব্ধি করিয়া নিজেদের সন্তানসন্ততিগণের রক্ষাকল্পে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই মাতৃজাতির প্রথম ও প্রধান করণীয়।

# বিচিত্র বার্ত্তা

**কাচও ভাঙ্গবে না**

সাধারণ কাচ অল্প আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তবে অপেক্ষাকৃত পুরু কাচের গ্লাসকে শক্ত মেজের উপর ঠুকে ফেরিওয়ালাদের বিক্রী করতে দেখা যায়। ঐ জাতীয় কাচ শক্ত উপাদানে তৈয়ারী। কিন্তু শার্সির সাধারণ পাতলা কাচ ক্ষণভঙ্গুর। জানালার শার্সির কাচ অল্প আঘাতে যাতে ভেঙ্গে না যায় এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে একরকম আলোকসঞ্চারী রং আবিষ্কার করেছেন। কাচের উপর এই রং লাগিয়ে দিলে কাচ আর সহজে ভাঙ্গে না। আর যদিও বেশী আঘাতে ভেঙ্গে যায় তাহলে কাচের টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে না। কতকগুলি বিচিত্র রেখার সৃষ্টি করে শার্সির কাচটি পুর্ব্বের মতনই কাজ দেবে।

ইংলণ্ডে এই রংয়ের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কাচ-ব্যবসায়ের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি।

**বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কেশবিন্যাস**

মানুষ সখ করে অনেক সময় বাজে জিনিষের পিছনে টাকা খরচা করে। আমরা যেটাকে একেবারে ছেলেমানুষি ভেবে উড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক সেটাকে নিয়েই দেখুন কয়েক শ্রেণীর লোক রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ লোককে কেশ-বিন্যাসে একটু বেশী মনোযোগী দেখা যায়; বিশেষত মেয়েদের। আজকাল আমরা আধুনিক কেশ-বিন্যাসের প্রচলন দেখে অবাক হই এবং অতি আধুনিকতার দোষ দিই। কিন্তু প্রাচীনকালে এদেশে কেশ-বিন্যাস ছিল প্রসাধনের প্রধান অঙ্গ; আর এত বিচিত্রগঠনে ও ভঙ্গিমায় বেণী রচনা করা হ'ত যে তার নাম দিতে হ'লে এক প্রকাণ্ড তালিকাই তৈয়ারী করতে হয়। একবার তাকালেই দেখতে পাবেন ঢেউয়ের মত কাহারও চুল স্তরে স্তরে সাজান আবার কাহারও সজারুর কাঁটার মত বীরবিক্রমে বলীয়ান। কুণ্ডলি আকারে মাথার উপর কাহারও কাহারও চুল সচঞ্চল গতিতে দোদুল্যমান দেখতেও পাবেন। চুলের এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এটা স্বভাবজাত। সুতরাং যেটার আপনি অধিকারী নন সেটা পেতে হ'লে আপনাকে কৃত্রিম উপায়ে পেতে হবে। পুর্ব্বেই বলেছি মানুষ সখের পিছনে বুদ্ধি ও অর্থ খরচ করতে কার্পণ্য স্বীকার করে নি।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছা মত সোজা, কোঁকড়ান, ঢেউখেলান, পাতলা আকারের চুল অতি অল্প সময়ে তৈয়ার করতে পারা যায়। যন্ত্রটি চার প্রকারের উত্তাপ তৈয়ার ক'রে যে কোন আকারে চুলকে সংযত করতে পারে। পছন্দ সই চুলের জন্য আর সুগন্ধ তৈল অথবা ঐরূপ কোন কেশ-বর্দ্ধক তৈলের প্রয়োজন লাগে না। আমরা ভাবছি এই যন্ত্রটি এখানে উপস্থিত হ'লে অবস্থা কি দাঁড়াবে!

**পাখীদের হাসপাতাল**

মানুষ কেবল নিজেদের কথাই ভাবে নি; নিকৃষ্ট জীব-জন্তুদের রোগ নিরাময়ের জন্য হাসপাতালও তৈয়ার করেছে। আমেরিকার মিঃ প্যাট্রিক ল্যাম্বার্টে নামক জনৈক ডাক্তার নিজেদের বাড়ীতেই এক হাসপাতাল খুলেছেন। সেখানে

পাখীর হৃদযন্ত্র পরীক্ষারত মিঃ ল্যাম্বার্ট
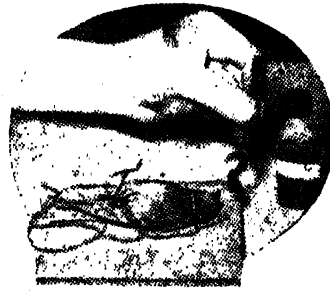
অস্ত্রোপচারের পুর্ব্বে পাখীকে ক্লোরোফর্ম্ম করা হচ্ছে

মৃতপ্রায় পাখীর ফুসফুস মধ্যে বায়ুসঞ্চারণ দ্বারা পুনরায় সুস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে

পাখীদের রোগ পরীক্ষার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। তাঁর পরিচালিত পাখীদের হাস-পাতালটি সভ্য সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

# আজ-কাল

**নতুন ভারতসচিবের বাণী**

২৩শে মে কমন্স সভায় নতুন ভারতসচিব মিঃ এমেরী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। তাতে তিনি লর্ড জেটল্যাণ্ডেরই কথার একরকম পুনরাবৃত্তি করেন, তবে ভাষাটা খুব নরম ছিল। আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাটের দায়িত্বটা তিনি ভারতীয়দের উপর চাপান এবং বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতীয়দের একটা প্রধান অংশ থাকবে। ভারতীয়রাই যে শাসনতন্ত্র রচনার একমাত্র অধিকারী সে কথা তিনি মানেন নি। বড়লাট সাম্প্রদায়িক ফয়সালা করবার যে হিতোপদেশ ইতিপূর্ব্বে দিয়েছেন, মিঃ এমেরীও তা সমর্থন করেন।

জওহরলাল নেহরু যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের সভায় অবিলম্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাবে আপত্তি করে' বলেছিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপদের সুযোগ নিয়ে ভারতীয়দের কিছু করা উচিত নয়; করলে সত্যাগ্রহের মহৎ আদর্শ কলঙ্কিত হবে। পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে ভারতসচিব কমন্স সভায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

কিন্তু মিঃ এমেরীর বাণী শোনার পর পণ্ডিতজী মর্ম্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনো অবস্থাতেই যে ভারতের দাবীতে কর্ণপাত করছেন না, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভারতীয়দের চেষ্টা করে' স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে। তবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্যে এখনো অপেক্ষা করে থাকা উচিত।

গান্ধীজী মিঃ এমেরীর বিবৃতি সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান নি; কারণ ইউরোপীয় হত্যালীলায় এখন তিনি মুহ্যমান। তবে তিনি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবেন না, এই কথা জানিয়েছেন।

তবে আর একটা বিবৃতিতে গান্ধীজী বলেছেন যে, বৃটেন ক্রমাগত ভারত সম্বন্ধে বাজে দোহাই তুলে নিজেরই ক্ষতি করছে। তিনি যদিও বৃটেনকে দুঃসময়ে বিব্রত করতে ইচ্ছুক নন, তবু সকলকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

মিঃ এমেরীর বিবৃতি সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে, ঐ বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি।

**সামরিক উদ্যম**

নিকট-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যাতে বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে সেজন্যে ভারতে পুরোদমে আধুনিক বাহিনী গঠন করতে ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন। গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের আগে 'ষ্টেটসম্যান' কাগজে 'লাল জুজুর' ভয় দেখিয়ে ভারতের সামরিক অসহায়তার কথা অনবরত উল্লেখ করা হচ্ছিল।

**ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন**

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুত গনেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সম্মেলনে হলওয়েল মনুমেণ্ট (অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি-স্তম্ভ) উঠিয়ে দেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। বি-পি-সি-সি'কে এজন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করা হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্যে আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে হয়।

আর এক প্রস্তাবে কংগ্রেসের হরিপুরা প্রস্তাব পালন করতে এবং রামগড় ও পলাশা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বদিকে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বি-পি-সি-সি'কে অনুরোধ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সঙ্গে নারী সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন ও শ্রমিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনগুলির সভানেতৃ যথাক্রমে ছিলেনঃ—শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীঅতীন্দ্রনাথ রায়, মৌলবী আব্দুল মালেক ও শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

**ফুটবল**

আই-এফ-এ'র সভাপতি এবং স্যার নাজিমুদ্দীনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে কলকাতার ফুটবল সংকটের অবসান হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ খেলায় যোগদান করেছে।

## ইওরোপ

**ইওরোপীয় সংকট**

যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির পক্ষে সংকটজনক হয়ে উঠেছে। উত্তর ফ্রান্সে ঢুকে জার্ম্মান-বাহিনী খানিকটা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে মোড় নেয়। তারপর তারা দ্রুত ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে পৌঁছে যায়। তারা আরাস ও আসিয়াঁ দখল করে; কিন্তু আরাস ফরাসীরা পুনর্দখল করে। চ্যানেল উপকূলে জার্ম্মানরা আবেভিল ও বুলোঞ দখল করে নেয় এবং কালের দিকে অগ্রসর হয়। জার্ম্মানরা কালে দখল করেছে বলে' দাবী করছে; কিন্তু মিত্রশক্তি এ দাবী ভিত্তিহীন বলেছেন। ফরাসীরা সম নদীর ধার দিয়ে এখন ব্যূহ রচনা করেছে।

বেলজিয়ামে জার্ম্মানরা আরো এগিয়ে গেছে। তারা গাণ্ট ও কুরত্রে শহর দখল করেছে।

**ফ্রান্সে নতুন অধিনায়ক**

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেন যে, ফরাসী সৈন্য সমাবেশের ত্রুটির জন্যে এবং জার্ম্মানদের নতুন ধরণের আক্রমণের জন্যে উত্তর ফ্রান্সে শত্রুরা প্রবেশ করতে পেরেছে। এর পরিণামে ফরাসী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক পদ থেকে জেনারেল গামল্যাঁকে সরিয়ে দিয়ে জেনারেল ওয়েগাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। আরো ১৫জন সেনাপতিকে পদচ্যুত করা হয়েছে। জেনারেল ওয়েগাঁই এখন সমর পরিচালনা করছেন। সহকারী প্রধান মন্ত্রীরূপে নবনিযুক্ত মার্শাল পেতাঁ তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। জার্ম্মানরা বলছে, জেনারেল গামল্যাঁ আত্মহত্যা করেছেন; কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষমহল ঐ সংবাদ অস্বীকার করেছেন।

**ইংলণ্ডের ব্যবস্থা**

সঙ্কটময় অবস্থার জন্যে ইংলণ্ড নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করা ও শ্রমিকদের কর্ম্মে নিয়োগ করার জন্যে এই নতুন ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। অনেকে এটাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছেন; কিন্তু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এটা ফাসিস্ট ব্যবস্থা, যা বহুদিন আগে জার্ম্মানী ও ইতালীতে বলবৎ হয়েছে। আর সমাজতন্ত্র হ'লে মন্ত্রী মিঃ এটলী কখনো প্রতিশ্রুতি দিতেন না যে, কারো সঞ্চিত অর্থে হাত দেওয়া হবে না।

**বৃটেন ও সোভিয়েট**

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেন এখন ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তির যে কথা হচ্ছিল সে সম্বন্ধে মলোটোভ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃটেনের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা জার্ম্মানী সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের আলোচনা করতে রাজী নন। এতে বৃটেন নিরুদ্যম হয় নি। সমাজতন্ত্রী স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে বিশেষ প্রতিনিধি করে' মস্কোতে পাঠানো হয়েছে। বর্ত্তমানে সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি নির্ভর করছে সোভিয়েটের মনোভাবের উপর।

**বল্কান**

মাঝে সোভিয়েট হাঙ্গারী ও জার্ম্মানী সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। বল্কানে ইতালীকে বাধা দেওয়াই যে এই চালের উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। এর পরই ইতালী বল্কান রাষ্ট্রগুলিকে জানিয়ে দেয় যে, বল্কানে হস্তক্ষেপ করবার মতলব তার নেই। কিন্তু মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ইতালীর পাঁয়তাড়া বেড়েই চলেছে। সে যে ভূমধ্যসাগর চায় সে কথা স্পষ্টই বলছে। ইতালীর মনোভাবের জন্যে জিব্রাল্টার, মাল্টা, এডেন, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

**আমেরিকা**

আমেরিকা মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে এবং মিত্রশক্তিকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এর চেয়েও প্রত্যক্ষ সাহায্য সে ফ্রান্স-বৃটেনকে করবে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না।

২৭।৫।৪০ —ওয়াকিবহাল

# পুস্তক পরিচয়

**ইউরোপের চিঠি**—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। বাগচী এণ্ড কোং, ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া ইটালিতে গমন করেন। তিনি তথা হইতে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানীতে গিয়াছিলেন। ইউরোপের চিঠি—তাঁহারই ভ্রমণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বাণী বহন করিতেছে। দেখে অনেকেই, কিন্তু দেখিবার মত দেখিতে জানে কম লোক। প্রথমত দেখিতে হইলে সৌন্দর্য্য সংগ্রাহিণী মনোবৃত্তির জাগরণ আবশ্যক, শুধু তাহাই নয়, সেই জাগ্রত মনোবৃত্তির অন্তর্ম্মুখিনী সংস্কৃতিও থাকা দরকার, নহিলে, বিষয়াণুপ্রবেশ ঘটে না, পাকা দেখা, ষোল আনা দেখা যায় না। ডাক্তার সরকারের দৃষ্টির এই ক্ষমতা আছে। তিনি যাহা দেখিয়াছেন শুধু উপর উপর দেখেন নাই, বাহিরের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য্যও তিনি দেখিয়াছেন। "ইউরোপের চিঠি" পাঠে ইউরোপের শুধু বাহ্য রূপ নয়, তাহার অন্তর রূপও পাঠকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ইউরোপের আশা-আকাঙ্ক্ষার, তাহার সমগ্র আধুনিকতার মূল উৎসটির পরিচয় পাঠক পাইবেন। প্রসিদ্ধ রোমা রোঁলা, দার্শনিক প্রবর বার্গশ, জার্ম্মান অধ্যাপক অটোর ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা "ইউরোপের চিঠি"কে বিশিষ্ট সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপের রাজসিক উগ্র আধুনিকতার যুগে সত্ত্ব-সংশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির স্থান কোথায় "ইউরোপের চিঠি" পড়িলে তাহা উপলব্ধি হইবে। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে, সন্দেহ নাই।

**সংক্ষিপ্ত সরল সাংখ্যদর্শন**—ডাঃ শ্রীগোকুলচন্দ্র দে প্রণীত। ৫।৬।৭নং মদনগোপাল লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সাংখ্যদর্শনের সূত্রগুলি পদ্যাকারে দিয়াছেন। ভাষা সরল বলিয়া বিষয়টি দুরূহ হইলেও সাংখ্যের সম্বন্ধে পুস্তকখানি পড়িলে সকল পাঠকেরই কিছু কিছু জ্ঞান হইবে। সাধারণের মধ্যে সাংখ্যের জ্ঞান প্রচারে গ্রন্থকারের এই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে।

**দেশপ্রাণ**:—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ পাল। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। কার্য্যালয়—১৬বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'নববর্ষের ব্রত', 'যুদ্ধোন্মুখ বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র' পঠিত বক্তৃতা [illegible] ভাল লেখা। 'কল্যাণ যজ্ঞ' লেখাটিও বেশ সুচিন্তিত। '[illegible]হিত রসধারা' অপরিস্ফুট এবং স্থানে স্থানে অমার্জ্জিত। ছাপা ও কাগজ ভাল।

**ভাগবতী বিদ্যা**:—সম্পাদক—শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী। কার্য্যালয়—৩বি, [illegible] রোড, ভবানীপুর। বার্ষিক মূল্য ৩।৵ আনা।

শ্রীমৎ দাস গোস্বামী (নাটক) লেখা ভাল হইতেছে। কালনার 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লীলামৃত' ভাষা সরল এবং মধুর। ধর্ম্ম, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সরল লেখাগুলি সারগর্ভ এবং সদুপদেশ- ধর্ম্ম, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্বরূপ লেখাগুলি সারগর্ভ এবং সদুপদেশপূর্ণ।

**পকেট হাতদেখা বিচার**—(পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) প্রফেসর কে গোস্বামী প্রণীত। কলিকাতার ৩১।২, নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের বন্ধু পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, হস্তরেখা বিচারে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। এই পুস্তিকাটি সেই অভিজ্ঞতারই ফল। যাহাতে সহজে হাতদেখা শিক্ষা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইতে পারেন।

# সাহিত্য-সংবাদ

**ঢাকুরিয়া খেয়ালী সঙ্ঘ প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা**

প্রবন্ধ—(ছাত্রছাত্রীদিগের জন্য) "সুভাষচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ।"
(প্রবেশ মূল্য নাই)

প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দুইটি রৌপ্য পদক।

প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার শেষ তারিখ ১২ই জুন, ১৯৪০।

শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়, ঢাকুরিয়া, রায়পাড়া,
২৪ পরগনা।

**গল্প প্রতিযোগিতা**

'কেয়া' পত্রিকার পক্ষ হইতে দুইটি গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১। সর্বসাধারণের জন্য। সকলেই যোগ দিতে পারিবেন। গল্প ফুলস্ক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া চাই। পুরস্কার—ক্ষেত্রকুমার স্মৃতিপদক।

২। সর্বসাধারণের জন্য। সকলেই যোগ দিতে পারিবেন। গল্পটি ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী হওয়া চাই। পুরস্কার—সূর্য্যকুমার স্মৃতিপদক।

ফলাফল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি 'কেয়া'য় প্রকাশিত হইবে। লেখাগুলি ৩০ জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছানো চাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেওড়াফুলি পোঃ,
জেলা হুগলি।

### নিউ সিনেমায় "কুমকুম"

গত শনিবার, ২৫শে মে হইতে নিউ সিনেমায় সাগর ফিল্মের হিন্দী চিত্রনিবেদন "কুমকুম" দেখান হইতেছে। মন্মথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে মধু বসু ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সাধনা বসু নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন প্রীতি মজুমদার, মহম্মদ ইশাক, কামতাপ্রসাদ, পদ্মাদেবী, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি।

এই ছবিখানির বাঙলা সংস্করণ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রূপবাণীতে দেখান হইয়াছে। দুইটি সংস্করণের মধ্যে ভাষান্তর ও মাত্র কয়েকটি ভূমিকার অভিনয় শিল্পীর পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং বাঙলাতে যে সমস্ত দোষগুণ ছিল এখানেও তাহাই থাকিয়া গিয়াছে। ছবিখানিতে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করিবার বস্তু অনেক কিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি সুকৌশলে পরিবেশিত না হওয়ায় অভিনয় কোন ক্ষেত্রেই তেমনভাবে জমাইয়া তুলিতে পারে নাই। সাধনা বসুর নৃত্য ও গীত এবং তিমিরবরণের সুর সংযোজনা উপভোগ করিবার মত। অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙলা ভাষাভাষী হইলেও হিন্দী উচ্চারণে চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

### পরলোকে হিমাংশু রায়

বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক হিমাংশু রায় গত ১৮ই মে ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্নায়ু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

চিত্র জগতে হিমাংশু রায়ের দান অপরিসীম। ভারতীয় সিনেমা শিল্পকে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছেন, কেবলমাত্র ভারতেই নহে বিদেশেও যে কয়জন প্রযোজক ভারতীয় সিনেমা-শিল্পকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন স্বর্গীয় হিমাংশু রায় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

বি এ পাশ করিয়া তিনি আইন পড়িবার জন্য বিলাতে যান কিন্তু সিনেমা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ তেরো বৎসর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সিনেমা-শিল্পের মধ্যস্থতায় ভারতের সহিত বিদেশের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন হিমাংশু রায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'ইন্ডো-ইন্টারন্যাশান্যাল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহাতে "কর্ম্ম" নামে প্রথম ইংরেজী ভাষায় চিত্র গ্রহণ করেন। এই ছবিখানি দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করে। অতঃপর রায় সাহেব চুনিলালের সহযোগীতায় তিনি বম্বে টকীজ নামক চিত্র নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া তাহাতে ষোলখানি চিত্র গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অচ্ছুৎ কন্যা, জীবন প্রভাত, ভাবী, কঙ্কণ, আজাদ প্রভৃতি কয়েকটি ছবি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া হিমাংশু রায় "কর্ম্ম" চিত্রটির ইংরেজী সংস্করণ তুলিয়াছিলেন, তাহার মহত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না এবং পরবর্ত্তী চিত্রে তিনি যে কেন তাহা অনুসরণ করেন নাই তাহা যদিও আমাদের নিকট দুরধিগম্য তথাপি "মাদার ইন্ডিয়া" অথবা "ইন্ডিয়া স্পীকস" ভারতের উপর যে কালিমা লেপন করিয়াছে তাহা দূর করিতে হইলে ইংরেজী সংস্করণের ভারতীয় চিত্রের যে প্রয়োজন আছে তাহা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা যদি ভারতের অন্যান্য প্রযোজক কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় তবেই তাঁহার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী দেবিকারাণী, বৃদ্ধ পিতা ও তিন ভগিনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

### বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ

গত ২৬শে মে, রবিবার বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সেক্রেটারী মিঃ এস এম বাগড়ে তাঁহার বিবরণীর একস্থানে বলিয়াছেন,—"একদল চিত্র-ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের বিজ্ঞাপনের লোভ দেখাইয়া সমালোচনা লিখাইয়া লন এবং যে সকল সমালোচক তাঁহাদের স্বাধীন মতামতকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই ধরণের বিজ্ঞাপনদাতাদের হুমকীকে অস্বীকার করেন তাহাদের কাগজে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়।" বাঙলা দেশে কয়েকজন চিত্র ব্যবসায়ীর এই জুলুম সম্পর্কে নানা অভিযোগ ইতিপূর্ব্বে আমাদের নিকট আসিয়াছে এবং আমরা তাহার আলোচনাও করিয়াছিলাম। চিত্রসমালোচকদের দায়িত্ব রহিয়াছে জনসাধারণের নিকট কেননা জনসাধারণ সমালোচনা পাঠ করিয়াই চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, চিত্র-ব্যবসায়ীদের জুলুমের ফলে জনসাধারণ চিত্র সমালোচনার উপর আর নির্ভর করিতে চাহেন না। জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইবার জন্য সমালোচকরা দুঃখিত হন, অথচ ব্যবসায়ীরা নিজেদের কিছুমাত্র লজ্জিত বোধ করেন না। একথা সত্য যে সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সমালোচনাই চিত্রশিল্পকে গড়িয়া তোলে —মিথ্যা স্তুতিবাদ নহে।

### দেবদত্ত ফিল্মস্-এর 'পথ ভুলে'

আগামী ১লা জুন, শনিবার দেবদত্ত ফিল্মস্-এর নূতন হাস্যরসাত্মক সামাজিক ছবি 'পথ ভুলে' উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে। হাস্যরসিক ধীরেন গাঙ্গুলী ছবিটির পরিচালনা করিয়াছেন এবং অভিনয়ও করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—প্রতিমা দাশগুপ্তা, ভুমেন রায়, বিভূতি গাঙ্গুলী, রঞ্জিৎ রায়, সত্য মুখার্জ্জি, আশু বোস, যতীন ব্যানার্জ্জি, বেচু সিংহ, মণিকা গাঙ্গুলী, পান্না, পূর্ণিমা, [illegible] প্রভৃতি।

### কলিকাতা ফুটবল বিরোধ

কলিকাতা ফুটবল বিরোধের অবসান হইয়াছে। দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা ফুটবল খেলা বিষয়টি লইয়া যে সকল অপ্রীতিকর, অর্থবিহীন, অখেলোয়াড়ী মনোভাবনিদর্শক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহারও অবসান হইল। পুলিশ কমিশনারের হুমকী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা, সরকারের সালিশী বোর্ড গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি একটির পর একটি গণ্ডগোলের মধ্যে আবির্ভাব হইয়া ক্রীড়ামোদিগণকে বাঙলার ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সেই চিন্তার আর কোন কারণ থাকিল না। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব—যাহাদের জন্যই একরূপ এই সকল ঘটনা দেখা দিয়াছিল তাহারা গত ২৮শে মে হইতে আই এফ এর পরিচালিত ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। মুসলমান ক্রীড়ামোদিগণ যাঁহারা এতদিন ফুটবল খেলা বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা পুনরায় দর্শকগণের মধ্যে ভীড় জমাইতেছেন কলিকাতা ফুটবল খেলার মাঠে পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। তবে দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিরোধ বর্ত্তমান থাকায় ক্রীড়ামোদীগণের মনে বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকগণ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা সহজে অপসারিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এখন হইতেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "বহু পূর্ব্বেই এই বিরোধের অবসান হইত কেবলমাত্র কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন, স্বার্থপর লোকের জনাই তাহা হয় নাই।" ক্রীড়ামোদীগণের এই মনোভাব দূর করিবার জন্য ফুটবল পরিচালকগণ যে ব্যবস্থা করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

### বিরোধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৩৯ সালের কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলায় রেফারীগণের ত্রুটিবিচ্যুতি এই বিরোধের সূত্রপাত করে। মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট এই তিনটি ক্লাবের পরিচালকগণ আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলীর নিকট এই মর্ম্মে প্রতিবাদ জানান। আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলী তাহার এক উত্তর দেন কিন্তু তাহা উক্ত তিনটি ক্লাবের পরিচালকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। তাঁহারা প্রতিবাদস্বরূপ আই, এফ, এর সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আই, এফ, এর পরিচালকগণ ইহাতে বিচলিত না হইয়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ও উক্ত তিনটি ক্লাবের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহাতে উক্ত তিনটি ক্লাবের পরিচালকগণ আরও অসন্তুষ্ট হন ও বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন গঠন করিয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে আই এফ এ ও বি এফ এর পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতা নৈরাশ্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল মরসুম এইভাবে শেষ হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে বিশেষ হতাশার সঞ্চার হয়। তাঁহারা এই বিরোধের অবসান দেখিবার জন্য ব্যস্ত হন। কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী উভয় এসোসিয়েশনের মধ্যে যাহাতে মিটমাট হয় তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। হঠাৎ এই বৎসরের ফুটবল মরসুমের পূর্ব্বে কালীঘাট ক্লাব ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণের খেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাব দেখা দেয় ও তাঁহারা আই, এফ, এর সহিত পুনরায় যোগদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় আই, এফ, এ ও বি, এফ, এর দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটি বিরোধ মিটমাট কমিটি গঠিত হয়। ঠিক হয় যে, উক্ত কমিটি যে সকল সর্ত্ত প্রস্তুত করিবেন তাহা তাঁহারা মানিয়া লইবেন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহাতে রাজি হন। বিরোধ মিটমাট কমিটি সর্ত্তসমূহ প্রস্তুত করিলে ও আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে কালীঘাট ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব আই, এফ, এর সহিত পুনরায় যোগদান করেন। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ যোগদান করেন না। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলী গঠনের দাবী করেন ও বি, এফ, এর যে দুইজন প্রতিনিধি আপোষের সর্ত্ত গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। ইহাতে নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলী এইরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রশ্রয় দিতে রাজি হন না। ইহার পর হঠাৎ একদিন কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে আই, এফ, এর সভাপতির নিকট এক উক্তি করিতে শোনা যায়। তিনি সভাপতি মহাশয়কে ইহা একরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, মহমেডান স্পোর্টিং দলের দাবী পূরণ না করিলে ১৯২৬ সালের ন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙলা দেশে দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তিনি নাকি শান্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না। আই, এফ, এর সভাপতি ইহাতে ভীত হন না ও তিনি আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলীর নিকট সকল বিষয় জানাইলে সভ্যগণের সমর্থন লাভ করেন। আই এফ এর মনোভাব দেখিয়া মুসলমান ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা এই বিষয় তুমুলে আন্দোলন করিবার জন্য এক সমর পরিষদ গঠন করেন। এই সমর পরিষদের আহ্বানে কলিকাতা টাউন হলে মুসলমানদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বাঙলা সরকারকে এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিতে ও একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করা হয়। বাঙলা সরকার এই প্রস্তাব শুনিয়া অনুসন্ধান কমিটি গঠন না করিয়া একটি মিটমাটের জন্য সালিশী বোর্ড গঠন করেন। আই, এফ, এর পরিচালকমণ্ডলীকে এই সালিশী বোর্ডের সাহায্য করিতে বলা হয়। সরকারের পক্ষ হইয়া বাঙলার চীফ সেক্রেটারী আই এফ এ-র সভাপতির সহিত দেখা করেন এবং মিটমাট কমিটির সহায়তা করিবার অনুরোধ করেন। কিন্তু আই এফ এ-র সভাপতি তাহাতে রাজি হন না। ইহার পর হঠাৎ কলিকাতার পুলিশ কমিশনার পুনরায় আই এফ এ-র সভাপতি মহাশয়কে সালিশী বোর্ডের সহিত কার্য্য করিতে অনুরোধ জানান। সভাপতি ও কমিশনারের মধ্যে এই সম্পর্কে কয়েকখানি পত্র লেখালেখি হয়। পুলিশ কমিশনার শেষ পত্রে এরূপ হুমকী দিয়া আই এফ এ-র সভাপতির নিকট পত্র লেখেন যে, তাঁহারা যদি সালিশী বোর্ডের সহিত মিটমাট না করেন তবে তিনি কলিকাতা ময়দানের শান্তিরক্ষক হিসাবে ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি বাঙলা সরকার হইতে এই অধিকার পাইয়াছেন। আই এফ এ-র সভাপতি ইহার কড়া জবাব দেন। ইতিমধ্যে সরকার আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর গৃহীত প্রস্তাবে সালিশী বোর্ডের সভ্যগণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহসভাপতি

খান আজিজ্জুল হকের স্থানে অপর একজন মুসলমান বিচারপতির নাম মনোনীত করিয়া নূতনভাবে সালিশী বোর্ড গঠন করেন ও আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীকে উক্ত বোর্ডের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। ঠিক এই অবস্থায় যখন ফুটবল বিরোধ উপনীত হইয়াছে তখন হঠাৎ বাঙলা সরকারের তিনজন মন্ত্রীকে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া মিটমাট করিবার জন্য ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। তাঁহারা আই এফ এ-র সভাপতির সহিত তিনদিন ধরিয়া আলোচনা করেন। এই সকল মন্ত্রীরা কেন যে হঠাৎ এরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। যাহা হউক, তিন দিন আলাপ-আলোচনার পর আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইল যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি স্যার নাজিমুদ্দিন ও আই এফ এ-র সভাপতি মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি একযোগে মিটমাটের জন্য যে সর্ত্তসমূহ প্রস্তুত করিবেন তাহা পরিচালকমণ্ডলী বিবেচনার পর গ্রহণ করিবেন। উক্ত দুই সভাপতি সেই প্রস্তাবমত সর্ত্ত প্রস্তুত করিলেন ও পরিচালকমণ্ডলীর সভায় পেশ করিলেন। তাঁহাদের সর্ত্তসমূহ গৃহীত হইল। বিরোধের অবসান হইল। বিরোধ অবসানের দিন আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী যেভাবে সর্ত্তসমূহ গ্রহণ করেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পরিচালকমণ্ডলী সভাপতিদ্বয়ের গঠিত সর্ত্তসমূহের উপর মিঃ এন আর সরকার যে সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করেন তাহাই গ্রহণ করেন।

**মিঃ এন আর সরকারের প্রস্তাব**

(১) আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর এই সভা সাম্প্রদায়িকতার স্থান অথবা সেইরূপ মনোভাবের কোন প্রশ্রয় না দিয়া আই এফ এর সভাপতি মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি স্যার নাজিমুদ্দিনের উপর ফুটবল বিরোধ অবসানের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার যে অধিকার দিয়াছিল এবং তাঁহারা সেই অধিকার অনুযায়ী যে সকল সর্ত্ত পেশ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিতেছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং স্যার নাজিমুদ্দিনের মনোনীত দুইজন সভ্যকে পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হইল। এই দুইজন প্রতিনিধি পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাইবেন যে পর্য্যন্ত না আই এফ এর নূতন আইনকানুনাদি গঠিত হইতেছে। কেবল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে আই এফ এতে যোগদান করিতে ও তাঁহাদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগ আই এফ এর নিকট পেশ করিবার অধিকার দিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

(২) আপোষের সর্ত্তের অন্যান্য ধারাগুলি অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭, ৮ ধারাগুলি গৃহীত হইল, তবে সাময়িকভাবে এই সকল সর্ত্ত মানিয়া লওয়া হইল এবং যাহাতে কার্য্যকারী হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

**সভাপতিদ্বয়ের সর্ত্তসমূহ**

(১) যত শীঘ্র সম্ভব আই এফ এর নিয়মতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(২) আই এফ এর সহিত ১৯৩৯ সালে যে দুইটি মুসলমান ক্লাব যোগদান করিয়াছে তাহাদের দুইজন প্রতিনিধি স্যার নাজিমুদ্দিন মনোনীত করিবেন। এই মনোনীত দুইজন প্রতিনিধিকে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীতে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইবে এবং তাঁহাদের ভোটদানের অধিকার থাকিবে। এমনকি ইঁহারা পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সভ্যদের ন্যায় বিভিন্ন সভায় 'প্রক্সী' বা প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবেন। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী যতদূর সম্ভব এই দুইজন প্রতিনিধিকে বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটিতে স্থান দিবেন।

(৩) যদি ক্লাবসমূহের প্রতি বা খেলোয়াড়দের প্রতি কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং ১৯৩৯ সালের প্রথমে ক্লাবসমূহ ও খেলোয়াড়গণ যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা হইবে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন যাহাতে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহার জন্য আই এফ এ অনুরোধ করিবে।

(৪) মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পুনরায় আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং ১৯৩৯ সালের প্রথমে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীতে প্রতিনিধিত্ব করিবার যে অধিকার লাভ করিয়াছিল তাহা পুনরায় দেওয়া হইবে।

(৫) মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও মহমেডান এ্যাথলেটিক ক্লাব পূর্ব্বে আই এফ এর পরিচালিত লীগে যে যে বিভাগে খেলিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল ঠিক সেই সেই বিভাগে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইবে। এই বৎসরের সকল লীগ খেলায় যাহাতে যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) যে পর্য্যন্ত আই এফ এর নূতন আইনকানুনাদি গঠিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সর্ত্তসমূহ মানিয়া লওয়া হইবে।

(৭) বেঙ্গল স্পোর্টস ফেডারেশনের পরিচালিত দুইটি লীগ প্রতিযোগিতায় যে সকল ক্লাব খেলিতেছে তাহাদের আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। উক্ত দুইটি লীগ প্রতিযোগিতা আই এফ এর পরিচালিত বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইবে। আই এফ এর পরিচালিত বেঙ্গল সসার লীগ অথবা এলেন মেমোরিয়াল লীগ প্রতিযোগিতা যে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে, উক্ত লীগ প্রতিযোগিতা দুইটিকেও সেই সুযোগ দেওয়া হইবে। এমন কি উপরোক্ত লীগ বিজয়ী দুইটি দলকে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের চতুর্থ ডিভিসনে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইবে।

(৮) গতবৎসর ব্রাবোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতায় যে সকল ক্লাব যোগদান করিয়াছিল তাহারা যদি আই এফ এর নিকট অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করে, আই এফ এ ঐ সকল আবেদন মঞ্জুর করিবে।

# সমর-বার্ত্তা

**২২শে মে—**

মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের উভয় সভায় দেশরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে জরুরী ক্ষমতা প্রদান বিলটি আলোচিত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ এটলী বলেন যে, এই আইন দ্বারা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় দেশের ধনসম্পত্তি, কলকারখানা ইত্যাদি সমগ্র-ভাবে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

প্যারিসের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ফরাসীরা আরাস পুনরাধিকার করিয়াছে।

ফুয়ারের হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হয় যে, ইংলিশ চ্যানেলের দিকে জার্ম্মান বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযান গতকল্য সেণ্টপল এবং সমুদ্র তীরবর্ত্তী মন্ত্রে শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে চালিয়াছিল। অস্টেণ্ড, ক্যালে, বলোন, ডাইপ প্রভৃতি স্থানের বন্দর এবং ডকগুলির উপর জার্ম্মান বিমানবাহিনী সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়।

**২৩শে মে—**

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, শত্রু-পক্ষের প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও ফ্ল্যাণ্ডার্সের জার্ম্মান বাহিনী শেল্ড নদীর তীর ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ভ্যালেনসিয়েনসের দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। ক্যাম্ব্রের নিকট শত্রুপক্ষীয় সাঁজোয়া বাহিনী আক্রমণ চালাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদিগকে হঠাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমে আর্টোয় রণাঙ্গনে জার্ম্মানরা উত্তর দিকে ক্যালে অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মান বেতারে জেনারেল গ্যামেলাঁ আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার জার্ম্মানীর পটসডামে পৌঁছিয়াছেন।

**২৪শে মে—**

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানরা গতকল্য রাত্রিতে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্ত্তী বলোন অধিকার করিয়াছে।

বার্লিনের একটি ইস্তাহারে এই দাবী করা হয় যে, ফ্ল্যাণ্ডার্সে জার্ম্মান বাহিনী সেল্ড-এর সুরক্ষিত দুর্গশ্রেণী ভেদ করে, টুর্নাই দখল করা হয় এবং মবিউডা দুর্গ জার্ম্মানদের করতলগত হয়। আরাসের উত্তর-পশ্চিমে আর্টোয়া রণাঙ্গনে জার্ম্মানরা লরেট শৈলশিখর অধিকার করে। আরাস ও সমুদ্রোপ-কূলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল দিয়া জার্ম্মান সাঁজোয়া গাড়ীর শক্তিশালী বাহিনী অগ্রসর হইতেছে এবং ইংলিশ চ্যানেলের ফরাসী উপকূলের সমীপবর্ত্তী হইতেছে।

**২৫শে মে—**

লণ্ডনস্থ কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে 'রয়টার' জানান যে, এক্ষণে পশ্চিম রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সম্বন্ধে সৈন্য চলাচল ও সংঘর্ষের বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যতদিন যুদ্ধের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ফলাফল না জানা যাইবে, ততদিন যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ অতি সামান্যই প্রকাশিত হইবে।

প্যারিসের সংবাদে ঘোষিত হয় যে, জেনারেল ওয়েগাঁ সর্ব্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত পনরজন ফরাসী জেনারেলকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ক্যাম্ব্রের উত্তরে এবং পশ্চিমে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। সেণ্টওমার, সোম ও সেডান রণাঙ্গনে জার্ম্মানদের গতিরোধ করা হইয়াছে। ওয়াস ও আইনে রণাঙ্গনে জার্ম্মানরা যে সব স্থান দখল করিয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে।

বৃটিশ বিমানসমূহ ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলবর্ত্তী শত্রু-পক্ষীয় সৈন্য ও যানসম্ভার সমাবেশের উপর বিভিন্ন স্থানে তীব্র আক্রমণ চালায়।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হয় যে, বেলজিয়ান বাহিনী, ফরাসী বাহিনীর প্রথম, নবম ও সপ্তম সংখ্যক সৈন্যদলের কতকাংশ এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যদল পরিবেষ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যূহ রচনার কার্য্য সুনির্দ্দিষ্টভাবে সমাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যূহের পূর্ব্বদিকে ঘেণ্ট ও কুর্ত্রে দখল করা হইয়াছে। জার্ম্মান বাহিনী ভিলামিরিজ দখল করিয়াছে। ক্যালে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। লিলার্সের পার্শ্বর্ত্তীভূমি এবং সেণ্টওমার হইতে গ্রাভেলাঁ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জার্ম্মানদের করতলগত হইয়াছে।

**২৬শে মে—**

প্যারিসের একটি ইস্তাহারে বলা হয় যে, উত্তর রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষ কয়েকবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। সোম নদীর তীরে কয়েকটি নূতন স্থান ফরাসীদের করতলগত হইয়াছে। আইনে ও মিউজ নদীর মধ্যবর্ত্তী এলাকায় উভয় পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। মণ্টমিডি এলাকায় শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত হয়। কুর্ত্রে এলাকায় জার্ম্মানদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত হয়। ফরাসীরা এখনও বলোনে যুদ্ধ করিতেছে এবং ক্যালে আক্রান্ত হয় নাই।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও আরতোয়াতে জার্ম্মানরা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলকে ঘিরিয়া ফেলি-বার পর এক্ষণে তীব্র আক্রমণ চালাইতেছে। জার্ম্মান বিমানগুলি পুনরায় জীব্রুজ, অস্টেণ্ড ও ডানকার্ক বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব ইংলণ্ডের অনেকগুলি বিমান ঘাটীর উপর জার্ম্মানরা সাফল্যের সহিত বোমা বর্ষণ করে।

স্যার এডমাণ্ড আয়রণ সাইড দেশরক্ষী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর সহকারী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা জেনারেল স্যার জন ডিল, স্যার এডমাণ্ড আয়রণ সাইডের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। দেশরক্ষী বাহিনীর বর্ত্তমান অধিনায়ক জেনারেল স্যার ওয়াল্টার কার্ক অবসর গ্রহণ করিবেন।

**২৭শে মে—**

প্যারিসের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, শত্রুবাহিনী বলোন শহর দখল করিয়াছে।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, জার্ম্মানরা ক্যালে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

উত্তর ফ্রান্সে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মানরা এই যুদ্ধে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সীগফ্রীড লাইন সুইস সীমান্ত হইতে বহু সৈন্য আমদানী করিতেছে। মোনিন ও ভ্যালেন্সিয়াস অঞ্চলে জার্ম্মানরা প্রবলভাবে আক্রমণ করিতেছে। এই আক্রমণে তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু তাহারা এই ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া বে-পরোয়াভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে। জার্ম্মানরা দাবী করিতেছে যে, জার্ম্মান বাহিনী ফ্ল্যাণ্ডার্স, আরতোয়া রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান্ যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স উইলহেলম পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে আহত হইয়া মারা গিয়াছেন। প্রিন্স উইলহেলম পদাতিক সৈন্যদলের লেফটেন্যাণ্ট ছিলেন।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হয় যে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ডানকার্ক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

**২৮শে মে—**

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড মন্ত্রীদের সর্ব্বসম্মত অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ থামাইয়া দিয়াছেন। বেলজিয়ামের মন্ত্রিগণ রাজা লিওপোল্ডের কার্য্য শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেলজিয়াম গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সে বেলজিয়ান বাহিনী পুনর্গঠনের আদেশ দিয়াছেন। রাজা লিওপোল্ড আত্ম-সমর্পণ করিলেও মিত্রশক্তি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে।

# সাপ্তাহিক-সংবাদ

**২২শে মে—**

কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় ১৯৪০-৪১ সালের জন্য কর্পোরেশনের বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্য্য পরিচালনার জন্য এ বৎসরও সর্ব্বশুদ্ধ বারটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান বৎসরের বিশেষত্ব এই যে, এইবার একটির স্থলে দুইটি সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এইবারই প্রথম দুইটি সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে লয়ালপুরের কর্ত্তার সিং প্রমুখ তিনজনকে বাঙলা হইতে বহিষ্কৃত করেন।

একটি সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু ঘটাইবার ও তাহার মৃতদেহ গোপনে সরাইয়া ফেলিবার অভিযোগে কলিকাতা ক্রীক রো'তে ডাঃ মিস সরোজিনী দত্ত ও তাহার দইজন সহকারিণীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২৫শে মে পর্য্যন্ত তাহাদের উপর হাজতবাসের আদেশ হয়।

বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ স্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

**২৩শে মে—**

কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরকালে নূতন ভারতসচিব মিঃ এল এস আমেরী জানান যে, ভারতে বর্ত্তমান অচল অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নীতি এখনও বলবৎ রহিয়াছে। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পূর্ব্ব নীতির পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক ব্রিটেন কমন ওয়েলথ-এ স্বাধীন ও সমঅংশীদারী লাভই ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনায় ভারতবাসীই প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করিবে, ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের পুনরায় পরীক্ষা ও সংশোধনের প্রতিশ্রুতিও পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব্ব বন্দী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত গত ২০শে মে হইতে নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে অনশন সুরু করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীকে তৃতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয়ান কয়েদিগণের অনুরূপ সুখ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

এডেন ও ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সমস্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয় বে-সামরিকদিগকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া জাহাজ শীঘ্রই বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিবে। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ চলাচল বন্ধ হওয়ায় এবং জিব্রাল্টার হইতে অধিবাসী স্থানান্তরিত করায়, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

**২৪শে মে—**

কমন্স সভায় ভারতসচিব মিঃ এল এস আমেরী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "বর্ত্তমান অচল অবস্থায় শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষ মীমাংসা করিবার জন্য আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিব না।" এই সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, "বর্ত্তমান আইনের সংশোধন অথবা যুদ্ধের পর কি করা হইবে, অথবা সাময়িক সমাধান, ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা ভারতসচিবের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক।" পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, "ইংলণ্ডের বর্ত্তমান দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা ভারতের আত্মসম্মান ও মর্য্যাদাবোধের বিরোধী। তবে একথাও ঠিক যে, ভারত কি পন্থা অবলম্বন করিবে বা না করিবে, তাহা যুদ্ধের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত মনোভাব এবং কার্য্যকলাপের উপর।"

মাদ্রাজে পেন্নার নদীতে রেল সেতুর নিকট একখানি খেয়া-নৌকাডুবির ফলে ৮০ জন যাত্রী মারা গিয়াছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে মাদারীপুরে ফরিদপুর জেলা কর্ম্মী সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

**২৫শে মে—**

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সমভিব্যাহারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকায় পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীযুত বসুকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাওয়া হয়। অনুমান কুড়ি হাজার লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল।

**২৫শে মে—**

মেক্সিকো সিটির এক সংবাদে প্রকাশ যে, মঃ ট্রটস্কির বাসভবনের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা হয়। প্রকাশ যে, ট্রটস্কির সেক্রেটারী অপহৃত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

**২৬শে মে—**

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর অদ্য রাত্রিতে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। রামগড় আপোষবিরোধী সম্মেলনে এবং পালামৌ কিষাণ সম্মেলনে জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সম্মেলন তাহা অনুমোদন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে যে কংগ্রেস লীগ চুক্তি হইয়াছে, সম্মেলন তাহাও অনুমোদন করেন। বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিলাভের জন্য আন্দোলন সুরু করিবার উদ্দেশ্যে সম্মেলন বঃ প্রাঃ রাঃ সমিতিকে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। আর একটি প্রস্তাবে অমৃতবাজার পত্রিকা এবং যুগান্তর বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সঙ্গে ঢাকায় মহিলা সম্মেলন, শ্রমিক সম্মেলন, কিষাণ সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এম এল এ মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার শ্রমিক সম্মেলনে, মিঃ আবদুল মালেক কিষাণ সম্মেলনে ও শ্রীযুত ত্রৈলোক্যমোহন রায় ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত ইন্দুলাল যাজ্ঞিককে আমেদাবাদ জেলার মোতাল গ্রামে গ্রেপ্তার করা হয়।

**২৭শে মে—**

নারায়ণগঞ্জ ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে আহূত এক জনসভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা বর্ণনা করেন।

পাতিয়ালা রাজ্যে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একজন সশস্ত্র ডাকাত পাঞ্জাবের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গৃহে হানা দিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

**২৮শে মে—**

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ সত্য বা মিথ্যা গুজব প্রচার করিলে, তজ্জন্য রটনাকারীকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

মাদ্রাজে ধনুস্কোটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে চারজন নিহত হইয়াছে। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই স্থান মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৭৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 8th June, 1940 [৩০শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**ভারতরক্ষার আয়োজন—**

ভারতের জঙ্গীলাট সম্প্রতি বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন—"গত ৯ মাস হইতে আমরা অবিশ্রান্ত উদ্যমে আবশ্যক হইলে যাহাতে আমাদের সৈন্যবাহিনী বাড়াইতে পারি, তাহার আয়োজন শেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভারতের জনবলের সম্বন্ধে আমি উদ্বেগ বোধ করি নাই, কিন্তু আপনাদের একথাটা স্মরণ রাখা উচিত যে, আধুনিক সমরনীতিতে জনবলই যথেষ্ট নয়, সৈন্যদিগকে শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামক্ষমভাবে সুসজ্জিত করাও আবশ্যক।"

ভারতের জনবলের অভাব নাই, বিশ্বের সকলেই জানে; কিন্তু প্রধান প্রয়োজন হইল এই জনবলকে দেশরক্ষার উপযোগী করিয়া তোলা এবং আধুনিক সমরোপকরণে তাহাদিগকে সজ্জিত করা। কেবল ৯ মাসের প্রশ্ন ইহা নয়, প্রশ্ন অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কর্তৃপক্ষ কোনদিনই ভারতবাসীদিগকে যথাযোগ্যভাবে সমর-শিক্ষার সুবিধা প্রদান করেন নাই, বরং তেমন সব প্রস্তাব বাতিল করিয়াই দিয়াছেন। গোলটেবিল বৈঠকের রক্ষী কমিটি সুপারিশ করেন যে, ভারতরক্ষার ব্যাপারে ভারতবাসীদিগকে অধিকতর সুবিধা দিতে হইবে; কিন্তু সমর বিভাগের কর্ত্তারা সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা যে হারে সেনাবিভাগে ভারতবাসীদের প্রাধান্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তাহা একেবারে অকেজো এবং অকিঞ্চিৎকর। দেশরক্ষার স্পৃহার সঙ্গে দেশপ্রেমের প্রগাঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। আজ কর্ত্তৃপক্ষের উচিত, দেশপ্রেমকে সন্দেহ এবং সংশয়ের দৃষ্টিতে না দেখিয়া দেশপ্রেমকে প্রশ্রয় দিয়া ভারতরক্ষার আয়োজনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। আজ ভারতবাসীকে বুঝাইতে হইবে যে, দেশরক্ষার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য প্রধানত হইল তাহাদের এবং ইহা বুঝাইতে হইলে এই ভাবটাও তাহাদের মনে জাগান দরকার যে, ভারতবাসীরা স্বাধীন, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। কংগ্রেসের দাবী ইহা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। মানুষের শক্তির উৎস হইল আত্মমর্য্যাদার অনুভূতি। দীর্ঘ অভিভাবকত্বের আওতা হইতে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের পায়ে সাহস করিয়া দাঁড়াইবার অবসর আজ দিতে হইবে। দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বাড়ে, ভারতবাসীদিগকে সমরবিভাগে প্রাধান্য প্রদানের নীতি প্রসার করিয়া কার্য্যত এই দায়িত্ব দিতে হইবে। অধিকারের আস্বাদ পাইলে ভারতের জনবল জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

---

**সেনাদলে বাঙালী—**

জঙ্গীলাটের বক্তৃতায় দেশরক্ষার উপর সকল দিক হইতে শক্তিকে সংহত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভাল কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতের প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহ পাইবার পক্ষে কতকগুলি কথা বিবৃতিতে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সামরিক ও অসামরিক জাতি বলিয়া যে কৃত্রিম একটা ভেদ সৈন্য-সংগ্রহে চলিয়া আসিতেছে, সে ভেদ রহিত করা হইবে, এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া উচিত। আজকাল সংগ্রামে গায়ের জোরের চেয়ে মস্তিষ্কের জোরের প্রয়োজন বেশী। বাঙালীর যোগ্যতা এ দিক হইত ভারতের অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে কম তো নহেই বরং অধিক। সুতরাং বাঙালীর সামরিক যোগ্যতাকে অস্বীকারের যুক্তি বর্ত্তমান রণনীতিতে আর চলে না। তাহা ছাড়া সৈন্য বাহিনীর সকল শ্রেণীতে ভারতবাসীদিগকে অচিরে প্রাধান্য দানের ব্যবস্থা করা হইবে কি না, দেশের লোক ইহাও জানিতে চায়। এই সম্বন্ধে অতি সাবধানী নীতি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু একটি বিবৃতিতে জঙ্গীলাটের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া এই দিককার ত্রুটিগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেনানীর পদের জন্য যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভারতবাসী মিলিবে না, শুধু সেই ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সেনানীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে, এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

শুধু তথাকথিত 'সামরিক জাতির' ভিতর হইতে সৈন্য সংগ্রহের সেকেলে নীতি তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা অনেক দিন হইতেই এ সব কথা বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু কর্ত্তারা সে সব কথা কানে তুলিয়া লন নাই। জগতের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের সমর-বিভাগের কর্ত্তা-দিগকে যদি এখনও এ সম্বন্ধে চৈতন্য দান করে, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

---

**নির্ভীকতার আবহাওয়া—**

বিপদ মানুষের সম্মুখেই আসে, কিন্তু মানুষ সে বিপদে বিপর্য্যস্ত হয় না। সেদিন বিলাতের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার বলিয়াছেন, "গুজবই আমাদের অন্যতম প্রধান শত্রু, ইহাতে কেবল যে সত্য সংবাদ বিকৃত হয় তাহা নহে, ইহা সত্য সংবাদ প্রচার অসম্ভব করিয়া তোলে এবং সত্য সংবাদের উপর লোকের আস্থা নষ্ট করিয়া দেয়। এ বিষয়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য যেমন আছে, কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যও সেইরূপ রহিয়াছে। অতিরিক্ত সাবধানী হইতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাহাতে লোকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে। সত্য ঘটনা শুনাইবার ফলে একটা বিশ্বস্ততার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়; অপরপক্ষে অজ্ঞতা অনেকক্ষেত্রে অকারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করে। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট জরুরী আইন জারী করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা নিজেরা লইয়াছেন; ইহা লক্ষ্য করিয়া কোথাও কোথাও ধারণা হইয়াছিল যে, এদেশেও ঐরূপ আইন হইতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐসব গুজব একেবারে ভিত্তিহীন। আমরা আশা করি, ইহার ফলে আস্বস্তির সঞ্চার হইবে। আতঙ্ক সৃষ্টি বর্ত্তমান অবস্থায় দেশ ও সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর, দেশবাসীকেও ইহা উপলব্ধি করিয়া চলা উচিত। কোথাও তেমন আতঙ্ককর গুজব প্রচারিত হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য ছোট ছোট দল গঠন করাও আমরা দরকার মনে করি। দেশের সর্ব্বত্র এজন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হওয়া উচিত। এইসঙ্গে সম্প্রতি কলিকাতার পুলিস কমিশনার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা আমরা অতিরিক্তরকমে বাড়াবাড়ি মনে করি। তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে, আতঙ্ককর গুজব যদি সত্যও হয়, তবে দণ্ডনীয় হইবে। এক্ষেত্রে 'গুজব' অর্থ বুঝা কঠিন। যুদ্ধ সম্বন্ধে সত্য একটি কথা—নিজেদের পক্ষের বিরোধী হইলে তেমন কথা বলাও এভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা বা আলোচনা নিষিদ্ধ হয় নাই, অথচ সত্য কথা বলাও নিরাপদ নয়, এ বড় কঠিন অবস্থা। এমন ক্ষেত্রে সোজাসুজি যুদ্ধের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। পুলিস এই আদেশের জোরে অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া নিজেরা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে, আশা করি শহরের শান্তির নিয়ামকগণ সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। দেশের মধ্যে সকল দিক হইতে বিস্বস্তির আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং শান্তি ও মৈত্রীমূলক নীতিই এক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকর।

---

**নাগরিক রক্ষী বাহিনী—**

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—"জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধন ও সংরক্ষণের জন্য এবং সঙ্কট ও পরিবর্ত্তনের সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষভাবে অবিলম্বে এক নাগরিক রক্ষী বাহিনী গঠনের একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্য এই সম্মেলন বাঙলার অধিবাসীদিগকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া যথাসম্ভব সত্বর এই নাগরিক রক্ষী বাহিনী গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

জগতের অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিপদ যে-কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে, আসুক আর না আসুক, বিপদকে বাধা দিবার শক্তি অর্জ্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পরের ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের দেখাই মর্য্যাদার পথ। রক্ষী বাহিনীর এই প্রস্তাব বাঙলার সর্ব্বত্র নূতন একটা সাড়া জাগাইবে, আমরা এই আশা করি। বাঙালীর স্বদেশপ্রেম আছে; সেদিকে উদ্দীপনারও অভাব নাই। আমরা আশা করি, রক্ষী বাহিনী গঠনের ভিতর দিয়া সেই উদ্দীপনা সার্থক হইয়া উঠিবার যে সুযোগ আজ আসিয়াছে, বাঙালী যুবক সম্প্রদায় তাহা আন্তরিকতা এবং উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। এক্ষেত্রে ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতা বা দলাদলির প্রশ্ন নাই। দেশপ্রেম বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করুক।

---

**গণশিক্ষায় আতঙ্ক—**

২৪ পরগণা ও মধ্য কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একদল ছাত্র গত ৩১শে মে তারিখে বজবজ হইতে ৪ মাইল দূরে মায়াপুর গ্রামে গণশিক্ষা প্রচারকার্য্যের জন্য গমন করেন। নূতন প্রণালীতে বয়স্কদের শিক্ষাদান ইহাদের কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহারা ১৭ দিনে প্রায় ৫০টি গ্রামে প্রচারকার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মায়াপুর গ্রামে ইহাদের উপর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এই মর্ম্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইঁহারা ২৪ পরগণার এলাকায় প্রবেশ করিতে বা জেলার কোন স্থানে কোনরূপ সভা শোভাযাত্রা, প্রচার বা অনুরূপ কোন কাজ করিতে পারিবেন না। তরুণদের লোক-সেবামূলক এবং দেশপ্রেমমূলক কাজগুলিকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখা আমলাতান্ত্রিকতার একটা ধর্ম্ম বলিয়াই আমরা বুঝিয়াছি এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে যুক্তি বা বিচারের বালাই নাই। স্বায়ত্তশাসনের উচ্চাধিকার লব্ধ মন্ত্রীদের শাসনে সুবে বাঙলায় এখনও যে আমলাতান্ত্রিকতার অবসান হয় নাই, ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্য হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়।

**আদর্শ প্রস্তাব—**

সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে মুসলীম লীগের পাকিস্থানী প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ঐ পরিকল্পনা কোন দিনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, লাভের মধ্যে ঐরূপ পরিকল্পনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিবে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র করিয়া তুলিবে। সম্মেলন এই প্রসঙ্গে যুক্ত নির্ব্বাচন-প্রথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচনই ভেদ-বিভেদ অনৈক্যের মূলে। তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মেলন বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা একমত হইয়া যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাই স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে বর্ত্তমান শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধান হইবে। ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়, ভারতের অন্যতম সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। সংখ্যা-লঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিয়া ভারতের দুর্দ্দশাকে স্থায়ী করিবার যে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, খৃষ্টান সম্প্রদায় সে ব্যবসার কারসাজীকে ধরিয়া ফেলিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই সম্মেলন আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

---

**তত্ত্বকথা ও সত্যকথা—**

মোড়লগিরি বজায় রাখিবার পক্ষে তত্ত্বকথা আওড়ানোর মত সহজ পথ আর নাই। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী আয়ার সেদিন এই রাজনীতির বিপর্য্যয়ের হুল্লোড়ের মধ্যে আমাদের কর্ণে কিঞ্চিৎ তত্ত্বামৃত বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"আমার দৃঢ় ধারণা পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়াছে, অথবা ইহার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভাবীকালের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আশ্রম এই প্রাচ্যেই। আপনার ধর্ম্মে অটল থাকিয়াও ভারত মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান ও অন্য সকল ধর্ম্মীকেই আতিথ্য গ্রহণের জন্য আহবান করিয়াছে। ভারতই একমাত্র স্থান যেখানে পরমতসহিষ্ণুতা আছে।" কথা শুনিতে ভাল; কিন্তু কাজে কি ইহা সত্য? ভারতের আজ যে অপরিসীম দারিদ্র্য, জগতে তাহার যে অতুলনীয় নিরক্ষরতা, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের এত যে সব লড়াই, আখড়াই, ইহার মূলেও কি ধর্ম্ম? যদি না হয়, তবে ভারতকে আজ এই সব বিষয়ে ভুগিতে হইতেছে কেন? ভারত আজ দুর্ব্বল, ভারত আজ অসহায়। দুর্ব্বলতা এবং অসহায়কত্ব নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে। ভারতের জন্য প্রকৃত দরদে যে দরদী, আত্মতৃপ্তিকর বচন আওড়াইয়া সে নিশ্চেষ্ট থাকে না, দুর্গতির মূল কারণ দূরে করিবার দিকেই তাহার কর্ম্মোদ্যম একান্ত হইয়া উঠে। সহিষ্ণু না হইলে চলে না, ইহার মধ্যে আছে ভীরুতা এবং দৈন্য—সেখানে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম উদার এবং অচঞ্চল স্থৈর্য্যের মধ্যে সহিষ্ণুতার যে শক্তি দান করে তাহার সঙ্গে ঐ জিনিষের তুলনা চলে না। অক্ষমতা এবং ঔদার্য্য এক জিনিষ নয়, অক্ষমতাকে ঔদার্য্য নাম দিয়া আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করি। ধর্ম্মের নামে আমরা যেন সংকীর্ণ স্বার্থপরতা এবং ত্যাগবিমুখতাকে প্রশ্রয় না দেই।

---

**শিক্ষকদের অবস্থা—**

'শিক্ষকরাই ভবিষ্যতের কর্ত্তা। তাঁহাদের কর্ত্তব্য অতি মহান্, দায়িত্ব অতি পবিত্র'—নিখিল আসাম শিক্ষক সম্মেলনের সভানেত্রীর অভিভাষণ পাঠ করিয়া স্যার সুরেন্দ্র-নাথের ঐ কথা কয়েকটি আমাদের স্মরণ হইল। দিনাজপুর শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত সমরেন্দ্রকিশোর দত্ত মহাশয়ও এদেশের শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহার অভিভাষণে বর্ণনা করিয়াছেন। শিক্ষকেরা আদর্শবাদী; কিন্তু এই আদর্শবাদ গুণ না হইয়া তাঁহাদের পক্ষে যেন দোষের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আজ সকলেরই কৃপার পাত্র। দত্ত মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, শিক্ষকদের আদর্শবাদের সুবিধা পাইয়া তাঁহাদিগকে শোষণ করা হইতেছে। জাতির মূল ভিত্তি গঠন করিবেন যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোন দেশ বা জাতি বড় হইতে পারে না। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার প্রতীকার যদি না করা হয়, তবে শিক্ষার অন্তর্নিহিত আদর্শবাদ ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। শুধু জনকয়েক রাজনীতিকের বাঁধা বুলি জাতিকে বড় করিতে পারিবে না। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"Political work is more or less useful. Educational work has in it the elements of permanent utility."

রাজনীতিক সাধনার ফলাফলের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের সাধনার মধ্যে সব সময়ই স্থায়ী ফল থাকে। জাতিকে এবং সরকারের এই সত্যকে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিতে হইবে।

---

**বিজ্ঞান মিউজিয়াম—**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম সংগঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে বিজ্ঞান কলেজে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এই প্রস্তাবে একটা কাজের মত কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্বরূপে এই ধরণের মিউজিয়াম আছে। বিজ্ঞান চর্চ্চায় কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে পরিচয় লাভ করিয়াছে। বাঙলা দেশ পৃথিবীর মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। এই চেষ্টা সার্থক হইলে জনসাধারণের বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবে এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চারও সুবিধা হইবে।

**'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'র স্পর্দ্ধা—**

কলিকতার 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক ফিরিঙ্গি পরিচালিত পত্রখানা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গ্লানিকরভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজের জঘন্য রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' লিখেছে—'মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শীরা তাহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষদের সঙ্গে 'বৃন্দাবনের উচ্ছৃংখল লম্পট' শ্রীকৃষ্ণের নাম একত্র লেখাও সহ্য করিতে পারে না।' 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' কৈফিয়ৎ স্বরূপে বলিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সে গ্লানিকর উক্তি করে নাই, হিন্দু ধর্ম্মেরও কোন অপমান করে নাই। জাপানী আঁকা ছবি দেখিয়া তাহার মনে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এরূপ কৈফিয়তের কোন মূল্য নাই। একজনে ইতরতা করিলেই সেই ইতরতা ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায় না। অবশ্য এই ধরণের গ্লানি প্রচারে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ক্ষুন্ন হইবে না; জগৎগুরু স্বরূপে বিশ্বের বন্দনা তিনি লাভ করিবেনই। কিন্তু হিন্দুর উপাস্য দেবতাকে এমনভাবে আক্রমণ করাতে হিন্দুর মনে বেদনা জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দুসমাজের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থান কোথায় এবং ঐরূপ উক্তি হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষে অবমাননাকর কি না বাঙলার আইন ও শান্তি-রক্ষকদিগকে আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। যে কয়েকজন হিন্দু এখনও মন্ত্রিত্ব করিতেছেন, বাঙলার হিন্দু সমাজ জানিতে চায় যে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে মত কি, কারণ অংশীদারীসূত্রে তাঁহারাও বাঙলা দেশের শাসন-নীতির নিয়ন্তা।

---

# মনের খেয়ানে জাগো বর্ষারাণী

শ্রীঅনিল দাস

আজি মনের ধেয়ানে জাগো বর্ষারাণী
মোর চিত্তের গানে আনো পুলক বাণী।
কোন ছন্দের তালে তালে বন্দনা গান
একি অপরূপ রূপে জাগে কুণ্ঠিত প্রাণ।
ওই আলুগোছে ধরা দেওয়া বজ্র চপল
ও কে চঞ্চল লাস্যে নৃত্য বিভোল!
কোন হর্ষের মাঝে জাগে গন্ধ বাতাস
ওই বন্ধনহারা দিগন্ত আকাশ।

যেন আকাশে বাতাসে তব ডঙ্কা বাজে
যেন দিকে দিকে অবিরল বিশ্বমাঝে।
ঘোর মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরেছে জগৎ
নব বৃষ্টির ধারা পে'ল তৃষিত কপোত
কোন উর্ব্বশী নামিল রে আসমানিয়া
কার অবিরাম মঞ্জীর চলে নাচিয়া।
কোন মেঘমালা কন্যা অলকা হতে
এই মর্ত্ত্যের বুকে নামে বন্যা স্রোতে।
কার ত্রস্ত চরণ কাঁপে রিণ্‌-ঝিন্‌-ঝিন্‌
দুই করতলে-ধরা বাজে সংগীত বীণ্‌।
কার অঞ্চল ছায়া কাঁপে বনানী শাখে
কার ছল ছল জলভরা কুম্ভ কাঁখে!
কার কণ্ঠের মাঝে দোলে বিদ্যুৎহার
কত মুসাফির মন কাঁপে শত শতবার।
কবি ধ্যানের মাঝারে দেখে মূর্ত্তি চিকণ
আঁকে প্রেমময়ী বর্ষার মসী আভরণ।
মোর চিত্তের গানে জাগো বর্ষারাণী
আনো যক্ষপ্রিয়ার লেখা লিপিকাখানি।

# যুদ্ধে জগদ্ব্যাপী চাঞ্চল্য

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ২৮শে মে প্রভাতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বেলজিয়ান সৈন্যদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। এই সংবাদে সমস্ত জগত স্তম্ভিত হয়। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী বলেন, "মাত্র আঠার দিন পূর্ব্বে বেলজিয়ান-রাজ মিত্রশক্তির নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। যিনি এই সাহায্যের আবেদন করেন, তিনিই গত ডিসেম্বর মাসে মিত্রশক্তির সহিত সামরিক বিধি-ব্যবস্থার কথাবার্ত্তা চালাইতে অস্বীকার করেন। যিনি স্বরাষ্ট্র রক্ষার জন্য মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিলেন, তিনিই আজ আক্রমণকারীর পদতলে বেলজিয়ামকে বিকাইয়া দিলেন; মিত্রশক্তির সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে একটি কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার বাণী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিলেন না।" কেবল তাহাই নহে, রাজার আদেশে বেলজিয়ান সৈন্যের অস্ত্র ত্যাগ, মিত্রশক্তির সৈন্যদলের প্রতি এই সঙ্কটের সময় চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে হয়। একই সেনাপতির অধীনে বৃটিশ ও ফ্রান্সবাহিনী বেলজিয়ানবাহিনীর সহিত মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। বেলজিয়ান সৈন্য সহসা অস্ত্র ত্যাগ করায়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি জার্ম্মান সৈন্য অল্পায়াসে দখল করিল এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রের ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্য বিপন্ন হয়; তখন জলপথে বেলজিয়াম ত্যাগ অথবা শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ মিত্রশক্তির সৈন্যদলের সম্মুখে ইহাই হয় সমস্যা।

প্যারাসুটধারী জার্ম্মানদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে স্থানীয় দেশরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইতেছে। একজন গোয়ালা এই দেশরক্ষা বাহিনীতে নাম লিখাইবার জন্য পুলিশ ষ্টেশনে আসিয়াছে

বেলজিয়ামের পতনের পর মহাযুদ্ধের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণ সৈন্যের বিস্ময়কর ও প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে সমস্যা যে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এবং বড়লাটও তাঁহাদের বক্তৃতায় এই উদ্বেগ গোপন করেন নাই। প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া শত সহস্র জার্ম্মান যুবককে বলি দিয়া নাৎসী সমর নায়কগণ যে যুদ্ধ করিতেছেন এমন ভয়াবহ ব্যাপক যুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীবক্ষে অনুষ্ঠিত হয় নাই। মিত্রশক্তিকে অনেক ঘাঁটি ছাড়িতে হইয়াছে, অনেক স্থানে হটিতে হইয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল গত ৪ঠা জুন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ৩০ হাজার হতাহত বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। শোকসন্তপ্ত সকলের প্রতিই আমি সদস্যদিগকে সমবেদনা জানাইতে বলি। বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট অদ্য উপস্থিত নাই; তাঁহার পুত্র নিহত হইয়াছেন। সদস্যদের অনেকেরই আত্মীয়নাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতি অপেক্ষা শত্রুপক্ষের ক্ষতি হইয়াছে ঢের বেশী। তবে সমরসজ্জা ও সমরোপকরণে

আমাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ১৯১৮ সালের ২১শে মার্চ্চের যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের যত লোকক্ষয় হইয়াছিল, এই যুদ্ধে তাহার এক তৃতীয়াংশ লোকক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু আমরা প্রায় এক সহস্র কামান এবং উত্তরাঞ্চলের সৈন্যদলের যতগুলি যান ও সাঁজোয়া গাড়ী ছিল, তাহার সবই হারাইয়াছি। ইহাতে আমাদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটিবে। যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাঙ্ক না থাকিলেও আমাদের সৈন্যদল সুসজ্জিত ছিল। এই ক্ষতিপূরণ করিতে সময় লাগিবে। এক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে বটে, কিন্তু কতদিনে এই ক্ষতিপূরণ হইবে তাহা বলা শক্ত। আমি আশা করি, উৎসাহ সহকারে কাজ চালাইলে, কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এই ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইব। যাহারা উদ্ধার পাইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বস্তি বোধ করিলেও, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা একটি বিরাট সামরিক বিপর্য্যয়। ফরাসী সৈন্যদল দুর্ব্বল হইয়াছে; আর বেলজিয়ান সৈন্য ত আমরা হারাইয়াছি। যে সুরক্ষিত সীমান্তের উপর আমরা একটা আস্থা রক্ষা করিয়া আসিতেছি তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। খনিজসম্পদপূর্ণ বহু অঞ্চল এবং অনেকগুলি কল-কারখানা শত্রুহস্তে চলিয়া গিয়াছে। প্রণালীর প্রান্তবর্ত্তী সমস্ত বন্দরই এক্ষণে শত্রুহস্তে। কাজেই অবিলম্বেই আমাদের অথবা ফ্রান্সের উপর পুনরায় আক্রমণ সুরু হইতে পারে এবং সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। শোনা যায় যে, হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের মতলব করিয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। একথা ঠিক যে, পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের স্বদেশে অধিক সৈন্যবল রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিলেই চলিবে না। কাজেই লর্ড গর্টের অধীনে পুনরায় একটি বাহিনী আমা-দিগকে বাহিরে পাঠাইতে হইবে, কেন না আমরা আমাদের মিত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সেজন্য যথোচিত আয়োজন হইতেছে। পক্ষান্তরে দেশরক্ষার ব্যবস্থাও আমা-দের দৃঢ়তর করিতে হইবে। নৃশংসতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়া যাহার তুলনা নাই।"

বিমান হইতে বোমাবর্ষণ বর্ত্তমান যুদ্ধের একটা আবশ্যক অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মানী যেমন প্যারিস ও সাসেক্সে বোমাবর্ষণ করিয়াছে, বৃটেনও তেমনি জার্ম্মানীর বহু স্থানে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমান যেখানে যেখানে বোমাবর্ষণ করিয়াছে, তাহা হয় একটা প্রয়োজনীয় রেলপথ, নয় রেলের ইয়ার্ড পুল, বিমানঘাঁটি অথবা এমনি একটা কিছু। কিন্তু জার্ম্মান বিমানের এ সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নাই। এ বিষয়ে জার্ম্মান বোমারু বেপরোয়া এবং নৃশংস।

সাসেক্সের বোমাবর্ষণে অবশ্য একটি হতভাগ্য মুরগী-শাবক ছাড়া আর কিছুই নিহত হয় নাই, কিন্তু প্যারিসে ৩০০ জার্ম্মান বিমান সহস্র বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। হতা-হতের সংখ্যা নয়শত। ছেলেমেয়েদের স্কুল, হাসপাতাল, গৃহস্থের বাড়ী কিছুই আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সীন নদীর উভয় তীর ইষ্টকের স্তূপে ও ভাঙ্গা কাচে বোঝাই হইয়া গিয়াছিল।

মিত্রপক্ষের সেনাদল কর্ত্তৃক নরওয়ের নার্ভিক দখল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নার্ভিক দখলের সামরিক গুরুত্ব অপেক্ষা নৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী। নার্ভিকে লৌহের খনি নাই। লৌহের খনি হইল সুইডেনের ভিতরে কিরুণা নামক স্থানে। রেলপথে কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া ঐ স্থানে যাইতে হয়। মিত্রপক্ষ নার্ভিক দখল করাতে সুইডেন হইতে লৌহ লইতে জার্ম্মানীর অসুবিধা বাড়িবে না, নার্ভিক জার্ম্মানদের হাতে থাকার অবস্থাতেও এই বন্দর দিয়া লৌহ লইবার সুবিধা জার্ম্মানীর ছিল না। মিত্রপক্ষের রণতরীর বাধা ছিল। জার্ম্মানী লৌহ লইত বাল্টিক সমুদ্রের পথে এবং এখনও তাহা লইতে পারিবে। তবে নার্ভিক মিত্রপক্ষের অধিকারে আসার পরোক্ষ ফল কতকটা ইহাই হইবে যে, সুইডেন মাথা একটু খাড়া করিয়া রাখিবার সুযোগ পাইবে। জার্ম্মানীর মুঠার মধ্যে সে গিয়া পড়িবে না। মিত্রপক্ষের পক্ষে আর একটি সুবিধার সম্ভাবনা আছে যদি নার্ভিকে তাঁহারা পাকা রকমের বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে নরওয়ের জার্ম্মান অধিকৃত স্থান হইতে ইংরেজের সেটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিমান আক্রমণ করিবার যদি মতলবে থাকে, তাহার পাল্টা ব্যবস্থা হইবে।

রুষিয়া কর্ত্তৃক ব্রিটিশ দূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে প্রত্যাখ্যান আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ইংলণ্ডে রুষিয়ার সাম্যবাদের সমর্থক যে কয়েকজন আছে, তাঁহাদের মধ্যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস একজন অগ্রণী ব্যক্তি। রুষিয়ার নীতি সমর্থন করিবার অপরাধে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন। রুষিয়া এই যুক্তি দেখাইয়াছে যে, মস্কোতে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতের মারফৎই আলোচনা চালান যাইতে পারে। প্রকৃত ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা চালানই যদি রুষিয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তবে এই যুক্তির কোন মূল্যই থাকে না। ইহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই রুষিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইংরেজ পক্ষ তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন; শুধু এই সর্ত্ত দেওয়া হয় যে, ব্রিটিশের রপ্তানী মাল রুষিয়া যেন জার্ম্মানীতে চালান না দেয়। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্যই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস রুষিয়ায় যাইতেছিলেন। তিনি এখনও আশা করিতেছেন যে, রুষিয়ার মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, সুতরাং মস্কো যাওয়া তিনি বন্ধ করিবেন না, যাহা হউক, জার্ম্মানীর পররাজ্য-গ্রাস নীতির সঙ্গে রুষিয়ার এই মতিগতির সামঞ্জস্য বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

ইটালী কি করিবে, এই প্রশ্ন অনেকের মনেই আন্দোলিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, ইটালীর ফ্যাসিষ্টরা যতই জিগীর ছাড়ুক না কেন, ইটালী আপাততঃ যুদ্ধে নামিতেছে না। জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া মধ্যস্থতার মোড়লী করিবার তালে সে আছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই

পথে ভূমধ্য সাগরের দিকে নিজেদের সুবিধা কিছু করা যায় কিনা এই দিকে হইল তাহার দৃষ্টি।

জাপান চীনের ব্যাপার লইয়াই বিব্রত। হল্যান্ড জার্ম্মানীর দ্বারা অধিকৃত হইবার পর জাপান কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করে, পৃথিবীর রাজনীতিকদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে। গত ৩রা জুন জাপানের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ওলন্দাজ ,অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রনীতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জাপান উদাসীন থাকিতে পারে না। জাপ প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়, অর্থনীতিক দিকটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। জাপ প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় আমেরিকার উপর একটু খোঁচা আছে। তিনি বলেন, আমেরিকার রণকণ্ডুয়ন আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকা যদি যুদ্ধে নামে, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্বার্থ সম্পর্কে আমেরিকার মতিগতির নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এই উক্তির মধ্যে হুমকীর ভাব কিছু পাওয়া যায়।

নাৎসীদের বোমাবর্ষণের ফলে লুভেন (বেলজিয়াম) নগরীর একটি রাজপথের দৃশ্য

আমেরিকার সুর ক্রমেই সুস্পষ্ট হইতেছে। মার্কিন রাষ্ট্রসভা দেশরক্ষার উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁহার পত্নী দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। জগতে আজ যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, এই সংগ্রামে জনবল, ধনবলেরই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নয়। আদর্শে আদর্শে আজ সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। পশুশক্তিই বড় না মানুষের স্বাধীনতা, জাতির স্বাধীনতারও কোন মূল্য আছে, আজ সেই প্রশ্নের সমাধান হইবে। এই যুদ্ধে জগতের ইতিহাসে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। কোন জাতিই এই সংগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। আমেরিকা ইহা উপলব্ধি করিয়াই গণতান্ত্রিকতার সাফল্যে শক্তিকে সংহত করিতেছে, এই প্রয়োজনে আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে বিজড়িত হইয়া পড়িতে হইবে কিনা, এ কথা এখনও বলা চলে না; তবে সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণই রহিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

### উপরের দিকে তাকান বিপদ

আমরা যদি উ'চু যায়গায় উঠে নীচের দিকে তাকাই তাহলে মাথা গুলিয়ে গিয়ে চারিদিকে অন্ধকার দেখি। উ'চু যায়গায় ওঠা যাদের অভ্যাস নেই তারা সময় সময় নীচের দিকে তাকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সংজ্ঞাশূন্যও যে হয়েছেন তা নানা ঘটনায় আরোহীর পতনের ফল থেকে জানা গেছে। খুব উপরের দিকে তাকানও আবার বিপদ। উ'চু পাহাড়ে কিম্বা সি'ড়ির সাহায্যে কোন উ'চু যায়গায় উঠতে গিয়ে আরোহীরা বেশীরভাগ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে পদ-স্খলনে মাটিতে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছে। উ'চু যায়গায় ওঠা যাদের অভ্যাস অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী, রঙেরমিস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য পেশাদার আরোহীরা প্রত্যেকেই যে দুটি নিয়ম মেনে চলে তা আমরা পালন করলে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাব। তাদের মতে কোন উ'চু যায়গায় ওঠবার সময় উপরের দিকে কিম্বা নীচের দিকে তাকান নিরাপদ নয়। সাধারণের বিশ্বাস নীচের দিকে তাকানর ফলে হতবুদ্ধি হওয়ার এবং নীচে পড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা উপরের নিয়মের প্রথমটি অর্থাৎ উপরের দিকে না তাকানর উপরই বেশী জোর দেন।' কারণ সি'ড়ির উপর ওঠবার সময় ওপরের দিকে তাকানর ফলে উপরের চলন্ত আকাশ, ধ'ুয়া, উড়ন্ত পাখী সবই নিশ্চল বলে মনে হয়; আর যে সি'ড়ি বেয়ে ওঠা যায় সেটা একটা পতনোন্মুখ গাছ মনে হওয়ায় আরোহী অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ভূতলশায়ী হয়। পেশাদার আরোহীদের মতে কোন উ'চু যায়গায় ওঠবার সময় দিক্‌চক্রবালের সমান্তরাল রেখার উপর দৃষ্টি রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা।

### আকাশে বিজ্ঞাপন

যার যত বিজ্ঞাপন তার কাট্‌তি তত বেশী। বিদেশী কোম্পানীগুলি বিজ্ঞাপনে যে প্রচুর টাকা ব্যয় করে, তা শুনে আমরা অব্যবসায়ী জাতি অবাক হতে পারি; কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা আরও কত বেশী টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করলে কাটতি বাড়াতে পারে, তার উপায় বার করতে মোটা টাকার মাহিনায় লোক লাগায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রচার দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কত অদ্ভুত উপায়ে ইউরোপের শহরগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে, সাধারণের কাছে সেগুলি বিজ্ঞাপন বলেই মনে হয় না। আকাশের গায়ে এ্যারোপ্লেন সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া এখন এমন কি আর নূতন ব্যাপার। কিছুদিন পূর্ব্বে কল্‌কাতাতেই আমরা আকাশের বুকে ধ'ুয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে বিজ্ঞাপন লিখ্‌তে দেখেছি। এ ধরণের বিজ্ঞাপনে অসুবিধা আছে; রাত্রে আর লেখা চলে না। আর দিনের কোলাহলে লোক এত ব্যস্ত থাকে যে, বিজ্ঞাপন পড়বার সময় কোথায়? তাই রাত্রে আকাশে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ্যারোপ্লেনের পাখার নীচে প্রকাণ্ড ফ্রেমের মধ্যে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তা জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ সমর্থন পেয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে বাগানে বসে আপনি হাওয়া খাচ্ছেন, এমন সময় ঐদিনের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা পরেরদিনের খবরের কাগজে বার হবার আগেই এ্যারোপ্লেনের পাখার নীচের ফ্রেমের উপর লেখা হয়ে গেল।

লেখাগুলি চলন্ত থাকায় আপনাকে অধীর আগ্রহে পরবর্ত্তী সংবাদের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। কল্‌কাতার চৌরঙ্গীতে এভাবে বিজ্ঞাপন কিছুদিন চলেছিল। তবে এ্যারোপ্লেন নয়। এভাবের সংবাদের মাঝে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় দর্শক অধীর হয়ে পড়ে না।

### আমাদের দেহের বাড় সীমাবদ্ধ কেন?

জড়দেহ অর্থাৎ যাদের প্রাণ নেই তাদের বড় হওয়ার কোন সীমা নেই, কিন্তু যাদের দেহে প্রাণ আছে, তাদের বাড়ের একটা সীমা আছে। জড়বস্তুগুলির খাবার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহটিও বেড়ে যেতে থাকে। কারণ তাদের শরীরের এই বাড়কে কমাতে পারে এমন কোন জিনিষ নেই। কিন্তু জীব-দেহে একটা আলাদা পরিচয় চিহ্ন আছে এবং বাঁচবার একটা উদ্দেশ্য আছে। তাই বিভিন্ন জীব ওজন মাফিক বাড়তে থাকে; এবং যতদিন বাঁচে ততদিন দেহটিকে সেভাবে রাখবার চেষ্টা করে ও খাবার বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের আকার জড় পদার্থের মত সীমা রেখা ছাড়িয়ে যায় না।

# শ্রীনিকেতন পল্লী স্বাস্থ্য সংগঠন

( ২ )

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

[স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শ্রীনিকেতন পল্লী স্বাস্থ্য সংগঠন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার প্রথম কিস্তি ৩০শে ডিসেম্বর ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। —সঃ দেঃ]

পল্লী স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিকল্পনা লইয়া যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম তখন দুই বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। প্রথমত সুচিকিৎসাকে সহজলভ্য করা, যাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসিগণ তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত ডাক্তারখানার চাপে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাহাতে সমবেত চেষ্টার মনোভাব জাগ্রত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারা দারিদ্র্যবোধ জন্মে না। অসুখ হইলে ডাক্তারখানায় গেলে ঔষধ পাওয়া যায়, কিন্তু অসুখ না হওয়ার জন্য বুদ্ধি বাৎলাইয়া দেওয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারদের কর্তব্য নয়।

ম্যালেরিয়া ঋতুতে সরকারী ডাক্তারখানার চিকিৎসকের আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারণ বিনা দর্শনীতে তিনি কাহারও গৃহে দর্শন দেন না এবং তাহার দর্শনী গড়ে প্রতিবারে দুই টাকা হয়। অতএব যে বৎসর গ্রামে রোগ কম সেই বৎসরই সরকারী ডাক্তারগণের পক্ষে দুর্বৎসর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতেছি যে, ব্যাধির প্রতিরোধজনক কার্যে (Preventive measure) পল্লীগ্রামের সরকারী ডাক্তারগণের মধ্যে খুব অল্পলোকেরই সহানুভূতি লাভ করা যায়। ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী। সমষ্টিগত জাতিস্বার্থের প্রতি তাহারা উদাসীন। তাহাদের দোষ দিয়া লাভ নাই। কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই যে, এদেশের অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বলিদান করিতেছে।

সরকারী ডাক্তারখানায় যেমন ব্যাধির প্রতিনিবার্য বিধি প্রবর্তনের কোন দায়িত্ব নাই তেমনি স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারেরও কোন দায়িত্ব নাই। অতএব আমরা কোন সরকারী ডাক্তারখানার অনুকরণ করিলাম না। আমরা এই নীতি অবলম্বন করিলাম যে, ডাক্তারখানার সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে এমনভাবে, যে তাহারা নিজেরা সমবেত চেষ্টায় যেন স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। সেই চেষ্টাটাই মুখ্য, ডাক্তারখানা উপায়মাত্র।

আমরা প্রথমেই বলিলাম নিজেরা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা না করিলে ডাক্তারখানার সাহায্য কেহ পাইবে না।

(১) কোনও গ্রাম যদি ডাক্তারখানার সাহায্য চায় তবে নিজেদের গ্রামে পল্লীস্বাস্থ্য সমিতি গঠন করিতে হইবে।

(২) উক্ত সমিতির সভ্যকে মাসিক চারি আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, মাসে চারি আনা চাঁদা দিতে অক্ষম তাহাদিগকে মাসে একদিন বিনা মজুরিতে পঞ্চায়েৎগণের নির্দেশমত খাটিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীনিকেতনের ডাক্তারখানা হইতে এক পয়সায় এক দাগ ঔষধ এবং অর্ধেক দর্শনীতে ডাক্তার পাইবে। প্রথমত ভিজিটের আয় ডাক্তারের প্রাপ্য ছিল দুই টাকা। সমিতির সভ্যদের নিকট ভিজিট ছিল তার অর্ধেক।

কিন্তু কিছুদিন অভিজ্ঞতার পর দেখা গেল ডাক্তারদের ব্যক্তিগত প্রাক্‌টিস্ বন্ধ না রাখিলে স্বভাবতই তাহাদের বেশী ঝোঁক হয় প্রাক্‌টিস বাড়াইবার দিকে, তাহাতে ব্যাধি প্রতিনিবারণের কার্যাদি পরিচালনার উপযুক্ত সময় থাকে না। প্রত্যেক পঞ্চায়েৎ সমিতিকে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত কার্যের নির্দেশ দেওয়া হইলঃ—

(১) গ্রামের ড্রেন কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

(২) অনাবশ্যক ডোবা ভরাট করা।

(৩) পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা।

(৪) ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলা।

(৫) বর্ষাকালে যে সকল স্থলে মশা জন্মে সে সকল স্থলে কেরোসিন দেওয়া।

এতদ্ব্যতীত শ্রীনিকেতনের কর্মিগণ স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়েই জ্ঞান প্রচার করিতে সচেষ্ট ছিল। ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছোটো ছোটো পুস্তিকা প্রচার, গ্রামে গ্রামে ছোটো-খাটো স্বাস্থ্য প্রদর্শনী করিয়া সর্বদাই তাহাদের মনকে সজাগ করিয়া তুলিত।

বীরভূমের গৃহ-প্রাচীর মাটির। ঘরের পিছনেই মাটি তুলিয়া তাহা হইতে দেওয়াল তৈয়ার করে। সেই গর্তগুলি আর বুজাইয়া ফেলা হয় না। ঘরের দেওয়ালের পিছনেই এই সকল ডোবাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয় এবং সেই গুলিই ম্যালেরিয়ার মশা এনোফিলিসের জন্মস্থান। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামেই অসংখ্য সার ডোবা আছে। গোবরের সার তৈয়ার করিবার জন্য গোবর ও গোয়ালঘরের খড় নিক্ষেপ করা হয় এবং তাহার পচা জলে কিউলেক্স নামক যে মশা হয় তাহারাই ফাইলেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে। বীরভূমে ফাইলেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী; কিন্তু এখানকার জমিতে প্রচুর সার দেওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া এই সকল সার ডোবা বিনাশ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এই সকল সার ডোবা ব্যতীত অপরাপর যে সব ডোবা রহিয়াছে তাহারও সংখ্যা প্রচুর। সেই ডোবাগুলি বুজাইয়া দেওয়া দরকার।

এই জিলার গ্রামগুলি সমতল নহে। ভূমি উচ্ছ্বাসময়। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডোবার এক কোণ দিয়া ড্রেন কাটিয়া দিলেই জল নিষ্কাশিত হইয়া যায়। গ্রামের সমিতির পঞ্চায়েৎ কমিটিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, দেওয়াল তৈয়ারী করিবার জন্য নূতন গর্ত যেন আর না হয়, দেওয়ালের জন্য পুষ্করিণীর ধার হইতে মাটি তুলিতে হইবে। অথবা যদি গর্ত করিবার

একান্ত প্রয়োজন হয় তবে দেখিতে হইবে যেন বর্ষার পূর্বেই তাহা বুজাইয়া দেওয়া হয়।

এই জিলার গ্রামগুলি উঁচু জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার চারিদিকে ধানের ক্ষেত ঢালু হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য উপযুক্ত ড্রেন কাটা হইলে দুইটি উপকার হয়। অনাবশ্যক সঞ্চিত জল দ্রুত নিষ্কাশিত হওয়াতে ম্যালেরিয়ার মশার জন্মস্থানগুলি কমিয়া যায় এবং এই সকল জল গ্রাম ধৌত করিয়া ড্রেন যোগে ধান ক্ষেতে পড়িলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামের চারিদিক ঢালু বলিয়া খুব অল্প ব্যয়েতেই ড্রেন কাটা সম্ভব। নিম্ন বঙ্গের মত এই জিলায় আগাছা বা জঙ্গল খুব বেশী নয়, সেই জন্য জঙ্গল কাটার সমস্যা ম্যালেরিয়া নিবারণের পক্ষে প্রধান সমস্যা নয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের পক্ষে পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখাও অত্যাবশ্যক।

উঁচুতে স্থাপিত গ্রামগুলির চারিদিক ঘিরিয়া বহুসংখ্যক সেচের পুষ্করিণী দেখা যায়। সেই সকল পুষ্করিণীর এক কোণে ছোটো নালা থাকে, সেইগুলির মুখ খুলিয়া দিলে পুষ্করিণীর জল স্বভাবতই নীচের দিকে গিয়া জমিগুলিকে সিক্ত করে। বীরভূমের জমি উঁচু নীচু (Terrace Land) বলিয়া ঢালুর বিভিন্নস্তরেই বহু পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। পূর্বে এই পুষ্করিণীগুলির ভালো অবস্থা ছিল, তখন বৃষ্টির জল গ্রাম হইতে দ্রুত নিষ্কাশিত হইয়া এই পুষ্করিণীগুলিকে ভর্তি করিত। সেই সময় এই জলের সাহায্যে তুলা ও রেশমের দুটি বড় শিল্পের উপাদান এই বীরভূমের জমিতে হইত। বর্তমানে প্রায় শতকরা ৯৯টি পুষ্করিণী ভরাট হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে পুষ্করিণীগুলিতে হাঁটুজল দাঁড়ায় এবং তাহাতে প্রচুর আগাছা জন্মায়, সেই আগাছার ছায়ায় সঞ্চিত ম্যালেরিয়ার মশা জন্মে। অতএব সেগুলি পরিষ্কার রাখা উচিত। আগাছা না জন্মিলে এই সকল পুষ্করিণীর জলে সূর্যের আলো পড়ে ও জলে তরঙ্গ থাকে, তাহাতে মশা বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

বীরভূমের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য উপরিউক্ত উপায় নির্দেশ করি।

সমবায় বিভাগের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার স্বর্গীয় যমিনী-মোহন মিত্র মহোদয়ের শ্রীনিকেতনের এই স্বাস্থ্য সমিতির কার্যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই নির্দেশানুযায়ী সমবায় প্রণালীতে স্বাস্থ্য কার্য পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ উপবিধি তৈয়ারী করা হয়।

১৯২৬ সালে এই উপবিধি অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী ১২টি গ্রামে পল্লীসংস্কার ও স্বাস্থ্য সমিতি রেজিষ্ট্রী করা হয়।

পল্লী-উৎসব

ফটো: সুধীন দত্ত

# মানুষের ঘর

*(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

**শ্রীহাসিরাশি দেবী**

৩

যে গ্রামে বিপিনের বসবাস তার নাম সায়মানা। সায়মানা গণ্ডগ্রাম। শুধু সায়মানা নয়, এরকম আরও খানকতক গ্রাম পার হয়ে যে শহরটায় লোকে বেশী কাজে যায় তার নাম নীলফামারি বাঁধাঘাট। কিন্তু লোকে শুধু বাঁধাঘাটই বলে থাকে।

কবে কোনও দিন এখানে কোনও নদীর অবস্থান এই নামের সৃষ্টি করেছিল কি না জানা না গেলেও আজ বাঁধাঘাট নামে যে শহরটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, সেখানে বা তার আশে পাশে নদীর চিহ্নও নেই। শুধু দেখা যায় পাশাপাশি ইটের কোঠাগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাতে বাস করছে নানা রকমের নানা লোকজন।

বিপিন আসত এই শহরে মাল মসলা সওদা করতে। গ্রামে যে ছোট মুদীখানার দোকান সে করেছিল তারই জিনিস। সেদিনও সে এসেছিল। জিনিসপত্রের বৃহৎ বোঝাটি কাঁধে ফেলে গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় সে যখন বাড়ির পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে তখন হঠাৎ নজরে পড়ল সামনের পথে একখানা চকচকে পালিশ করা প্রকাণ্ড সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি দাঁড়িয়ে, আর তার মধ্যে জরির বুটিদার শাড়ি প'রে এই দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে এক নারীমূর্ত্তি।

বিপিন বারবার তাকিয়ে দেখলে সেই মুখখানা। মুখখানা যেন পরিচিত; কিন্তু সে পরিচয় দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে। বিপিনের মনে হ'ল, কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সে মুখে যৌবনের তেজোময় দীপ্তি ছিল, আর এ মূর্ত্তি অতুল ঐশ্বর্য্যে ঢাকা, নানা আভরণে আবৃত। তবু এত রূপচর্চ্চার মধ্য থেকেও মুখে চোখে ফুটে উঠেছে প্রৌঢ়ত্বের ম্লান ছায়া। কাঁধে জিনিস নিয়েও বিপিন থমকে দাঁড়াল; নীরবে চেয়ে রইল নারীমূর্ত্তির দিকে। তারপর যখন মুখ ফিরিয়ে নিলে তখন শুনতে পেলে মেয়েটি তার কোচম্যানকে ডেকে বিপিনকেই ডেকে দিতে বলছে।

"বাবু, মাইজী আপকো বোলাতে হ্যয়।"

সন্দেহের দোলায় এতক্ষণ বিপিন দোল খাচ্ছিল, এইবার সত্যিই একটু ভয় পেলে। তাকে কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না। ওর নির্দ্দেশমত গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই রমণী ডাকলে,—"বিপিন!"

বিপিন চমকে উঠল।

সন্দেহের ছায়াও আর মনে রইল না। সে মুখ তুলে বললে,—"বড়দি, তুমি!"

"হ্যাঁ রে বিপিন আমি; আমি তোর সেই দিদি—শারদা।"

কিছুক্ষণ দুজনেই দুজনের দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, তার পরে শারদা বললে,—"উঠে আয় গাড়িতে বিপিন।"

এ সেই আগেরই মত আদেশপূর্ণ কণ্ঠস্বর, সুদীর্ঘ পনের বৎসর আগে যে কণ্ঠস্বর নিরন্তর বিপিনের কানের কাছে বাজত। অন্নদা তখনও বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে ভাইএর গলগ্রহ হয়নি; একমাত্র শারদাই তার বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু অপত্যস্নেহ, মায়া মমতা ঢেলে বিপিনকে মানুষ ক'রে তুলেছিল।

বিপিনের বিয়েও সে দিয়েছিল নিজে দেখে পছন্দ ক'রে আদুর মায়ের সঙ্গে। বড় ইচ্ছা ছিল সে তার ভাই আর ভাই-বউকে নিয়ে বড় সাধের ঘর বাঁধবে, নতুন ক'রে সাজাবে তার আশার সংসারকে। যে সংসারের স্বপ্ন মেয়েরা দেখে ছোটবেলায় পুতুল খেলার মাঝখানে, খেলাঘরের গৃহিণীপনায়।

আশা ছিল স্বামীর সংসারে গৃহিণী না হ'তে পারলেও ভাইএর সংসারে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবে, এর প্রতিদিনের ছোট বড় দুঃখ বেদনা সব নিজের বুক পেতে নিয়ে এই সংসারকেই সে ক'রে তুলবে আনন্দময়, সুধাময়। কিন্তু তা আর সফল হ'ল না।

শারদার রূপ ছিল। যৌবনও ছিল অনাঘ্রাত। বালবিধবা সে, তার অমলিন রূপ, স্বাস্থ্যপূর্ণ যৌবন আকৃষ্ট করল গ্রামের তরুণদলকে। ফলে একদিন কলঙ্কের গ্লানি মাথায় নিয়ে বাধ্য হয়ে শারদাকে গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে এসে আশ্রয় নিতে হল এই শহরে।

সেইখানে দাঁড়িয়েই বিগত দিনের এই সব স্মৃতি এক এক ক'রে বিপিনের মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু সে অনেক দিন—অনেক কাল আগেকার কথা।

বিপিনকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শারদাও যেন কেমন সঙ্কোচের মধ্যে প'ড়ে গেল। ভাবলে, ও হয়তো আসতে চায় না।

যদি নাই চায়, তবে দাবি করার অধিকার তার নেই। যে অধিকার সে স্বেচ্ছায় একদিন ত্যাগ ক'রে এসেছে, আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার জন্যে অনুশোচনা হল;—লজ্জা হল কৃতকর্ম্মের জন্যে।

একবার কেশে গলার স্বরটাকে পরিষ্কার ক'রে বললে,—"আজ নয় থাক, আর একদিন—"

বিপিন সচকিত হয়ে উঠল। এ সুযোগ সে হেলায় হারাতে রাজী হল না, বললে,—"না না, আর একদিন কেন? আজই যাব তোমার সঙ্গে।"

কাঁধের ঝোলাটা গাড়ির মধ্যে নামিয়ে রেখে সে উঠে বসল। গাড়ি চালাতে আদেশ করলে শারদা।

কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল—বিপিনের ধারণায় সেটা প্রসাদোপম অট্টালিকা।

বাড়ির দরজায় আবার তকমা আঁটা দারোয়ান! বিপিন অবাক হয়ে গেল এবং আরও বিস্ময় বোধ করল বাড়ির ভিতর প্রবেশ ক'রে। বড় বড় দরদালান, বারান্দা, জোড়া থামের ওপরে নানা রংবেরংএর ছবি আঁকা।

সিঁড়ি বয়ে শারদা তাকে একটা ওপরের ঘরে এনে বসাল। বললে,—"বস্, আমি আসছি এখনি।"

সে চ'লে গেল এবং একটু পরে রেকাবি ক'রে খাবার আর জলের গ্লাশ নিয়ে সামনে এনে একটা ছোট তেপায়ার ওপর সাজিয়ে রাখলে। বললে,—"বারান্দায় কল আছে, হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

শারদার কথামত বিপিন ওর সারা দিনের শ্রমক্লান্ত ধূলিধূসর হাত মুখ কলের ঠান্ডা জলে ধুয়ে এসে সত্যিই বিনা দ্বিধায় আহারে ব'সে গেল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে দেখতে লাগল, ঘরের চারিদিকে খাটান বড় বড় আয়না, আলমারি, চেয়ার, টেবিল এবং আরও সব ঝকঝকে জলুসদার নানান আসবাবপত্র। দেখে কি ভাবছিল কে জানে।

কিন্তু ওর সামনে ব'সে শারদার মনে পড়ছিল তার গত জীবনের একখানা জীর্ণ পুরাতন ছবি। সেই রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা, গোলপাতা ছাওয়া খানকয়েক পাশাপাশি ঘর। গোবর নিকনো পরিষ্কার ঝকঝকে উঠন, একপাশে গোয়ালঘর, তাতে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাই বাঁধা; একপাশে উঁচু ক'রে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ। ছোট সংসার! তার বড় আশার সাজানো এমনি একটি ঘরকন্নার তুচ্ছ খুটিনাটি।

"বিপিন।"

শারদার ডাকে বিপিন চমকে উঠল,—"কেন দিদি?"

শারদা জিজ্ঞাসা করলে,—"কি কাজকর্ম্ম করিস এখন? কি উপায়ে সংসার চালাস?"

"সংসার?" বিপিন হেসে উঠল,—"তুমি আসার পর থেকে সব ওলোট-পালট হয়ে গেছে দিদি; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।"

একথার উত্তর না দিয়ে শারদা মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বিপিন আবার বললে,—"আর সংসারের কথা না বললেও চলে।"

"তার মানে?"

বিপিন বললে,—"বউ তো বেঁচে নেই দিদি, মারা গেছে।"

"বউ মারা গেছে!"

অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ ক'রে শারদা অপলক দৃষ্টে চেয়ে রইল। বিপিন হাসিমুখে বললে,—"বউ বেঁচে না থাকলেও আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নি দিদি, সংসার আমার আজও আছে তবে একটি মেয়ে নিয়ে। মেয়েটি বড়ও হয়ে উঠল—প্রায় বিয়ের যুগ্যি। আর অন্নদা ফিরে এসেছে বিধবা হয়ে, সেই ঐ মেয়েটাকে মানুষ করছে ওর মা মরার পর থেকে।"

শারদা যেন কথা হারিয়ে ফেলেছিল। বিপিনের খাবার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, বাকী কয়খানাও এক সঙ্গে মুখে ফেলে খানিক চিবিয়ে সেগুলো গলাধঃকরণ ক'রে ফেললে। জলের গ্লাশটাও এক চুমুকে শূন্যগর্ভ ক'রে নামিয়ে রাখলে এক পাশে, তারপর কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসল ফরাসের ওপর। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গভীর শান্তিতে মাথাটাকে একবার এধার ওধার ক'রে বললে,—"একটা কথা দিদি।"

"কি রে?"

কুণ্ঠিত স্বরে বিপিন বললে,—"আজ আর বাড়ি যাব না ভাবছি। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর শরীরটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে।"

"যেতে কে বলেছে রে তোকে। এখানে থাক্ না তুই দিন-কতক বিপিন; অনেক দিন হল তোদের সঙ্গ ছেড়ে এলেও এখনও মাঝে মাঝে তোদের জন্যে মনটা থেকে থেকে কেমন করে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস যেন শারদা বড় কষ্টেই চেপে গেল। একটু হেসে বিপিন বললে,—"তা নয় হল দিদি, কিন্তু একটা কথা—"

"কি কথা আবার?"

"কেমন একটা বদ অভ্যাস দাঁড়িয়েছে জান দিদি,—শোবার সময় এক আধ ছিলিম তামাক নইলে মোটে ঘুম আসে না চোখে; তামাকের পাট নেই তোমার বাড়ি?"

"তামাক?"

শারদা একটু ভাবলে; বললে,—"আছে বটে। আচ্ছা একটু থাম্, আনাচ্ছি।"

শারদা উঠে গেল; একটু পরেই চাকরের মারফতে বিপিন পেলে নূতন হুঁকো কলকেয় সাজা অম্বুরী তামাক খানিকটা। মহা আরামে সে তামাক টানতে শুরু ক'রে দিলে। ঘরের এক পাশে বস্তাবন্দী স্তূপাকার করা রইল তার দোকানের জন্য নূতন কেনা জিনিসপত্র, বিপিন সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলে না।

ঘরের এক পাশে খাটে গদি পাতা উঁচু বিছানা দেখিয়ে শারদা বললে, "ঘুম এলে ঐ বিছানাটায় শুস, মশারিটা ফেলে দিতে বলিস চাকরদের, বড় মশা।"

বিপিন জানালে, "আচ্ছা।"

শারদা চ'লে গেল ঘর ছেড়ে। বিপিনও মহানন্দে গদি আঁটা বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল।

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেলা হয়েছে। শারদা এসেছিল তাকে ডাকতে। তার সদ্যস্নানসিক্ত সর্ব্বাঙ্গে শান্ত শ্রী জড়ানো, মুখে স্নেহময় কমনীয়তা। ডাক শুনে বিপিনকে সচকিতে বিছানার ওপর উঠে বসতে দেখে বললে, "চা খাস তো?"

জড়িত স্বরে বিপিন জবাব দিলে, "তা একটু একটু খাই বই কি দিদি।"

শারদা ব্যস্ত হয়ে বললে, "তা হ'লে মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে এস, সেখানে চায়ের টেবিলে তিনি এসে বসেছেন। আমিও চললুম, তুমি এস একটু তাড়াতাড়ি, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

শারদা চঞ্চল পায়ে চ'লে গেল। বিপিন কিন্তু তাড়াতাড়ি করবার বিশেষ দরকার বুঝলে না। ধীরভাবে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে তেমনি চাঞ্চল্যহীনভাবেই প্রবেশ করল পাশের ঘরে। দেখলে, ঘরের মাঝখানে পাতা প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের টেবিলের এক পাশে আরাম কেদারায় ব'সে এক বিপুল দেহ। গায়ে তার আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবি, কাঁচা-পাকা চুলগুলো ওপর দিকে তোলা, হাতে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট, সম্মুখে চায়ের কাপ।

অন্য দিকের আর একখানি চেয়ারে ব'সে শারদা নিপুণ হাতে চা পরিবেশনে ব্যাপৃত। বিপিনকে ঢুকতে দেখে বললে, "এইটি আমার ভাই, ছোট ভাই বিপিন। এতটুকু বেলায় মা-বাপ মরার পর থেকে ওকে মানুষ করেছিলাম।"

বিপিন সলজ্জ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে শুরু করেছিল। বিপুলাকায় ভদ্রলোকটি একখানি শূন্য চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "ব'স।"

বিপিন বসল। শারদারও চা পরিবেশন শেষ হয়ে এল ধীরে ধীরে। বিপুলকায় ভদ্রলোকটি চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তোমার নাম আগে শুনেছি বটে অনেকবার।"

"আজ্ঞে।" বিপিন সলজ্জে উত্তর দিলে। শারদা মুখ তুলে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক দৃষ্টি বিনিময় ক'রে বললেন, "তা এসেছ যখন, তখন দু-চারদিন থেকে যাও।"

আবার চুরুটে টান পড়ল ঘন ঘন, যেন তিনি এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে চান কথার। বিপিন কিন্তু তা চায় না; বললে, "আজ্ঞে থাকলেই বা চলে কেমন ক'রে? সেখানে সবাই ভাববে, আর শুধু তাই নয়, কাজকর্ম্মও আছে তো?—"

"কাজ? কি কাজকর্ম্ম করা হয়?"

বিপিন আবার সবিনয়ে মাথা চুলকতে আরম্ভ ক'রে দিলে; বললে, "আজ্ঞে কাজকর্ম্ম আর বিশেষ কি, তবে ঐ একখানা চালডালের দোকান আছে কিনা, তাই চালাই কোনও রকমে টুকটাক ক'রে।"

শারদা জিজ্ঞাসা করলে, "চলে রে তাতে?"

বিপিন যেন এইবার নিজের অবস্থা একটু বিশদভাবে জানাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল; বললে, "কি করব আর। ঐ কোনও রকমে ভিক্ষে-সিক্ষে, পুজো-আচ্চা ক'রে পেটটা চালাই মাত্তর; কি করব বাঁচতে হবে তো! আর তাও আবার একার পেট নয়; মেয়েটা আছে বোনটাকেও তো আর ফেলতে পারি নে। তার ওপর যত দিন যাচ্ছে মেয়েটার দিকে যেন আর চাওয়া যাচ্ছে না, বিয়ের বয়েস হচ্ছে তো। কি যে করি, ভেবে যেন কোনও দিকে কূল কিনারা দেখতে পাই নে।"

হতাশ দৃষ্টিতে সে প্রথমে শারদার পরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে হঠাৎ কথার ধারা বদলে দিলে। একটু হেসে বললে, "ঐ যা, এতক্ষণ কথা বলছি, কিন্তু আপনার নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয় নি!"

ভদ্রলোক একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু এ কথার উত্তর দিলে শারদা; বললে, "ওঁকে উকিলবাবু ব'লেই ডেকো।"

"ওকালতিই করা হয় বুঝি?"

অসংলগ্ন প্রশ্ন ক'রে বসল বিপিন। এ কথারও উত্তর দিলে শারদা; সংক্ষেপে বললে, "হুঁ।"

এর পরে বিপিন যেন আর কোনও কথা খুঁজে পেলে না। কথায় কথায় চায়ের কাপগুলো শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে শারদা কি ভাবছিল কে জানে, বিপিন কিন্তু বেলার দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বললে, "বেলা বাড়ছে দিদি, আমায় আবার অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। রোদ্দুর বেশী হ'লে বড্ড কষ্ট হবে কিন্তু, এইবার আমি রওনা হই তা হ'লে।"

"যাবি?"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের খানিকটা যেন বার হয়ে এল শারদার কথার সঙ্গে। বললে "আয় তা হ'লে। কি আর বলব, রোদও বাড়ছে খাঁ খাঁ ক'রে।"

বিপিন বললে, "আর গাঁয়ের পথ তো জান, হাঁটুখানেক ধুলো ঠেলে এগুতে হবে।"

বিপিন উঠল। অতিভক্তিতে শুধু দিদির নয়, উকিল অবিনাশবাবুরও পাদস্পর্শ ক'রে সে মাথায় হাত ছোঁয়ালে। বাধা দিতে গেলেন তিনি—"আহা, থাক, থাক।"

সহাস্যে বিপিন বললে, "থাকবে কেন? সম্বন্ধে যখন গুরুজন অপনি, তখন আপনার পায়ের ধুলো নিতে আপত্তি কিসের?"

অবিনাশবাবু হাসলেন। বিদ্রূপের হাসি কি না কে জানে।

শারদা বিপিনের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল। একখানা পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললে, "আবার আসিস।"

বিপিন নোটটা রেখে কেনা মালের বস্তা আবার আগের মত কাঁধে ফেলে রাস্তায় বার হয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে, শারদা তখনও দরজার পর্দার আড়ালে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চলতে চলতে বিপিন বললে, "আসব বই কি দিদি, এ দিকে এলেই তোমার বাড়ি আসব, ভেব না।"

মুখ ফিরিয়ে সে আবার চলা শুরু ক'রে দিলে।

(ক্রমশ)

# নিউইয়র্কের পথে

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আমেরিকা যাবার টিকিট কেনা হয়ে গেছে, দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অধিকাংশই দেখেছি, তবুও যেন মন লন্ডন ছাড়তে চায় না। আমার দোষ নেই। কতদিন বলেছি জাপানীরা খুব কঠিন প্রাণ, কতদিন বলেছি আমারও উচিত খুব কঠিন হওয়া। কিন্তু আমি হলাম গিয়ে চৈতন্যদেবের দেশের লোক, ভাবপ্রবণতা আমার স্বভাবগত, আমি কঠিন হব কি করে? গ্রীক সাথীটিকে নিয়ে বেড়াতে লাগলাম এদিক সেদিক। সৈন্যের কুচকাওয়াজ, অবশ্যাক সৈন্যসংগ্রহ (oonspiration) শুরু হবার সম্ভাবনা, ভারতবাসীর সভা-সমিতি, ইটালিয়ন এবং জার্মনদের মৌন ভাব, এসব আমার চোখ এড়াতে পারল না। দলে দলে আমেরিকান পর্যটকদের আগমন, তাদের ভারতীয় রেস্তরাঁয় গমন, ভারতীয় রেস্তরাঁয় ভারতীয় ওয়েটরদের আরদালীর পোশাক পরিতে অসম্মতি, এইসব পর্যবেক্ষণ এবং তা নিয়ে মন্তব্য করেই আমার দিন কাটতে লাগল।

বিদেশী ব্যবসায়ী মহলেও যাওয়া-আসা করেছি, এদের মধ্যে তুরুক, বুলগার, স্লাভ, মাঝারু, জার্মন, স্প্যানিস, ইটালিয়ন— এদের অনেকের সংগে কথা বলেছি। প্যালেস্টাইনের ইহুদী এবং আরবদের একই রেস্তরাঁয় বসে খেতে দেখেছি। সকলেরই মুখে এক কথা,—এমন করে জীবন আর কয়দিন কাটবে। যেন সকলেই কিছু একটা পরিবর্তন চায়। সে পরিবর্তন কোন্ দিক দিয়ে কি প্রকারে আসে, তাই দেখবার জন্যে যেন সকলেই উৎসুক। মাঝে মাঝে দৈনিক 'মজুর' পাঠ করতাম। তার সম্পাদক আমাদের দেশের লোক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ভারতবর্ষে থাকতে কোনও দিন ফিরিংগীদের প্রতি কোনও ঔৎসুক্য বোধ করতাম না, কিন্তু এখানে আপনা থেকেই তাঁর প্রতি সমবেদনা বোধ করতাম। সেই সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে কন্‌টিনেণ্টের রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা থাকত এবং ভারতের সংগে তার তুলনাও থাকত। শুনলাম, ভারতীয় ছাত্রেরা এই সংবাদপত্র পড়তে ভয় পায়। যাঁরা লেখাপড়াই শুরু করেছে গোলামী মানসিকতা নিয়ে, এক পেনি দিয়ে বিপদ কিনতে অবশ্যই তাদের ভয় পাওয়ার কথা।

আমার সংগীটি ছিলেন স্ট্যালিনের ভক্ত। সেই সংবাদ আমি রাখতাম না। একদিন পথে বড় বড় শিরনাম দিয়ে ইথিওপিয়ান সংবাদসংবলিত একটা দু পেনি দামের সংবাদপত্র বিক্রি হচ্ছে দেখে কিনলাম। সংগীটি তখন সিগারেট কিনছিলেন। আমার হাতে সেই সংবাদপত্রটা দেখেই বললেন, "এটা কিনলেন যে?" আমি বললাম, "এই দেখুন, এখনও হাবসীরা ইটালিয়নদের সংগে লড়ছে? যদি এবার ব্রিটিশ ইথিওপিয়ায় ইটালিয়নদের সংগে লড়াই আরম্ভ করে, তবে আমিও ভরতি হব, দেখব কেমন ইটালি আবিসিনিয়া দখল করেছে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "এত অবাক্ হয়ে কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে?" সংগীটি বললেন, "এই কাগজটি ট্রটস্কির দলের লোক প্রকাশ করে, এসব কাগজ হাতেও নিতে নেই।" সে দিনই বিকাল বেলা এক ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে ট্রটস্কির সমস্ত বিষয় জেনে নিলাম। দেখলাম, স্ট্যালিন ট্রটস্কিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। এদের দলেরও তাই ভাব, যেমন আমাদের দেশে ছিল, সুভাষ এবং সেনগুপ্তের দলে। আমি সাথীটিকে বুঝিয়ে বললাম, আমি কোনও পার্টি পলিটিক্সের ধার ধারি না, আমি পর্যটন ভালবাসি। সাথী আমার সন্তুষ্ট হলেন। দেশের পলিটিক্সে কোনদিন মিশি নি। কিন্তু যেদিন সুভাষের পক্ষ নিয়ে আমার ভাইপো সেনগুপ্তের দলের সংগে জোড়হাটের জেলে লড়ল, সেদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, পার্টি পলিটিক্সের মানে কি। আমার সাথী গ্রীক ভদ্রলোকটিও সেই দোষে দুষ্ট। ন্যাশনাল সোস্যালিজম এই জন্যই সোস্যালিজমের কাছে এত ঘৃণ্য।

লন্ডন ত্যাগের দিন এসে হাজির হল। আমিও পুঁটলি বেঁধে মিঃ দত্ত এবং গ্রীক সাথীটিকে সংগে নিয়ে ওআটারলু স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। প্রত্যেক গাড়ীতে যাঁরা বসবেন, তাঁদের নাম লেখা আছে। আমারও নাম লেখা ছিল। আমার গাড়িতে দুজন প্রফেসর এবং একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, আমাকে নিয়ে চারজন। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট আমাদের। বড় দুঃখ আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কথা মনে হল। শৃঙ্খলা ও নিয়ম এদেশে লেগেই আছে। গাড়িতে বসে বন্ধুদের বললাম সংবাদপত্র কিনতে। তাঁরা সেদিনের প্রায় পাঁচখানা সংবাদপত্র আমার হাতে দিয়ে বিদায় নিলেন। গাড়ি চলল সাউথামটনের দিকে। গাড়ি পথে কোথাও থামল না। আমি একাগ্রভাবে পথের দুদিকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। এ যে আমাদের দেশের মতই। ফরাসী দেশের সৌন্দর্যে এবং ব্রিটেনের সৌন্দর্যে অনেক প্রভেদ। ফরাসীরা গাছের ডাল কাটে যখন পাতা গজায়, এরা শুকনো ডালও ভাংগে না। আমাদের দেশে অভাবে পড়ে অনেকে আজকাল হয়তো শুকনো ডাল ভাংগে, কিন্তু পূর্বে তা করত না। এখানে ফরাসী নিয়ম এবং ব্রিটিশ নিয়মে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

গাড়ি সাউথামটনে গিয়ে লাগল। আমি ইচ্ছা করেই সকলের শেষে নামলাম। জানি আমি, কষ্ট আমার পথ আগলে বসে আছে। গাড়ি হতে নেমে জর্জিক জাহাজের দিকে অগ্রসর হলাম। পাশেই নরম্যানডি দাঁড়িয়ে। নরম্যানডিও আমেরিকায় যাবে। জর্জিক এবং কুইন মেরীতে মাত্র তিন হাজার টনের প্রভেদ। জর্জিকে যারা যাবে, তারা জেটির পথ বন্ধ করেছে ভিড় করে। আমার তাতে লাভই হল, আমি দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম। চীনা যুবকগণ নিজেদের দেশের সৈনিকের পোশাক পরে জাহাজে উঠছে, লড়তে চলেছে জাপানীর সংগে। তাদের সকলের মুখেই হাসি। অন্যান্য জাতের লোকও বুক উঁচু করে পথে চলছে। শুধু আমারই মুখ ম্লান। আমি বোধ হয় এত বড় ডকটাতে একমাত্র ভারতবাসী।

সকলেই পাসপোর্ট দেখিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল, কিন্তু দেখলাম, আমার মুখখানা দেখেই পাসপোর্ট অফিসারের পিলে চমকে গেল। বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবছিলাম, আজ হায়দরাবাদের নিজাম যদি আমার মত এখানে এই অবস্থায় পড়তেন, তাহলে কেমন হত। অবশ্য জাহাজ যে আমাকে ফেলে যাবে না, সে ধারণা আমার ছিল। কাস্টম অফিসার এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ টিকিট কে আপনাকে বিক্রি করেছে?"

"জাহাজ কোম্পানি।"

"আমেরিকার ভিসা আছে?"

"আছে।"

"কই দেখি?"

"এই দেখুন।"

"বহু পুরাতন।"

"তা পুরাতন বটে।"

"সংগে কত টাকা আছে?"

"এ কথা তো অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি, আমার বেলায় কেন?"

"আমার ইচ্ছা।"

যা ছিল দেখিয়ে বললাম, "এই আছে আমার সঙ্গে।"

বললেন, "এই জাহাজেই যাচ্ছেন নাকি?"

"সেইরকমই তো মনে হয়।"

"এ জাহাজে হয়তো আপনার যাওয়া হবে না।"

"আপনাদের অসীম অনুগ্রহ।"

পাসপোর্ট এবং টিকিট নিয়ে অফিসারটি আর এক অফিসারের কাছে দৌড়ুলেন। উভয়ে মিলে কোথায় টেলিফোন করলেন, তার পর ফিরে এসে বললেন, "আপনি এই জাহাজেই যেতে পারেন।" আমি তাদের বললাম, "আপনারা যে আচরণ করেছেন, তা শিষ্টাচার নয়, তবু সেজন্য আপনাদের উপর আমার রাগ হয় নি। দোষ আমারই, পরাধীন দেশের লোক।"

অফিসারটি বললেন, "পরাধীন জাতের মধ্যেও সিংহের জন্ম হয়। চলুন আপনার পিঠের ঝুলিটা এগিয়ে দিই।" বলে সত্যিই ঝোলাটা নিয়ে একজন আমার সঙ্গে জাহাজের সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

আমার ক্যাবিনের নম্বর আমার জানা ছিল; দেখতে লাগলাম কোন্ দিকে সেই ক্যাবিন। একজন লোক এসে আমাকে ক্যাবিন দেখিয়ে দিল। পিঠ-ঝোলাটা সেখানে রেখে, টুপিটা খুলে, একটু বসলাম। বেশ আরাম বোধ হল। তার পর ভাবতে লাগলাম আমার জীবনের, আমার দেশের, আমার জাতের কথা। যত ভাবছিলাম, রাগ হচ্ছিল, বাইরে যাবার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেউ আমায় বিদায় দেয় নি, কেউ আমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসেও নেই, তবে কেন এই ঘুরে ঘুরে বেড়ানো।

ক্যাবিনেই হাত মুখ ধোবার গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা রয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে ভাবলাম, চল মন গিয়ে দেখি হয়তো রাজা ষষ্ঠ জর্জ আমেরিকা থেকে ফিরে আসছেন। এই জেটিতেই তাঁর জাহাজ ভিড়বে। ক্যাবিন হতে বার হবার পরই একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম রামনাথ?" বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ, কি দরকার?" সে বললে, "এই চিঠিটা আপনার বন্ধু হোর‍্যাসিও দিয়েছে, গ্রীক ভাষায় লিখেছে বলেই পড়ে শোনাতে এসেছি।"

পত্রে ছিল, তিনি আমেরিকা যাবেন বলে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রাখতে পারলেন না। কারণ, শীঘ্রই ইউরোপে যুদ্ধারম্ভ হবে, তাই তিনি কন্‌টিনেণ্টে চলে যাচ্ছেন। যদি পারেন, তবে ভারতে গিয়ে কলকাতার ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। চিঠিতে এ কথাও ছিল যে, পত্রবাহকও গ্রীক,—লোক ভাল; তার সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারি। পত্রটা হাত থেকে নিয়ে দেখলাম, সেটা গ্রীক ভাষাতেই লেখা বটে এবং তারই সেই দস্তখত। আমরা দুজনে জাহাজের ডেকে গেলাম; দেখলাম, রাজা জর্জকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপরে বিরাট আয়োজন চলছে। জাহাজ তখনও ডক ছাড়ে নি। আমি কাস্টম অফিসারের প্রসঙ্গই শুরু করলাম। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বললাম, দোষটা আমাদের জাতেরই; আমরা পরাধীন। লোকটি বললেন, আমাদের জাতের দোষ আর থাকবে না। কথাটা আমার খুব ভাল লাগল।

জাহাজ ধীরে ধীরে একটু একটু করে নড়তে লাগল; তার পর জোরে দূরে সরে যেতে লাগল। আমি ইংল্যাণ্ডের আকাশ বাতাস, গাছ পালা, মাটি ও জলকে মনে মনে নমস্কার করলাম। ইংল্যাণ্ডের এই মাটি, এই জল, এই পাহাড়, এই পর্বত, এত বড় একটা জাতকে জন্ম দিয়েছে! হউক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু তবু সে অনেক বড়। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, কর্মে, শক্তিতে, জাতীয় চরিত্রে এত বড় জাত আর নেই। এই জাতের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখবার আছে। হতে পারে কাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে পুরনো ইটের মত খসে পড়বে, কিন্তু মানব সভ্যতায় ব্রিটিশের সর্বাঙ্গীণ দান চিরদিন পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এইসব ভাবছিলাম, আর ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করছিলাম।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কান দুটো কনকন করছিল। আকাশ মেঘে ঢাকা; মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি এসে মাথায় পড়ছিল। তবুও নাবিকের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল রাজাকে সম্মান দেখাতে। আমেরিকান, ইটালিয়ন, জার্মন, সকলেই টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিল। সকলেই বলছে, ওই বুঝি রাজার ক্রুজার আসছে। খালি চোখে দৃষ্টি বেশী দূর যায় না, এ আকাশ আমাদের দেশের আকাশ নয়। এ হল বে অফ বিসকের আকাশের এক অংশ। কখন কিরূপ থাকে, তার কোনই ঠিক নেই। কখনও শান্ত, কখনও গম্ভীর, কখনও বা পাগল হয়ে মাতামাতি শুরু করে। আকাশের নীচের সাগরও সেইরকম। দয়া মায়া নেই, শুধু মাতামাতি কর আর রণডঙ্কা বাজাও। সহিষ্ণু ব্রিটিশ জাত এই আকাশ বাতাসের আবহাওয়াতেই মানুষ।

কতক্ষণ পর একটা বড় ক্রুজার প্রবল বেগে আমাদেরই জাহাজের কাছ ঘেঁষে চলে গেল, তীর হতে কামান গর্জন করে উঠল। তার পর আর একখানা ক্রুজার, তারপর রাজার জাহাজ তারপর আর একখানা ক্রুজার তীরের মত চলে গেল। আমাদের জাহাজের মাঝীমাল্লা নাবিক সকলেই দুরন্ত কায়দায় নমস্কার জানালে। যাত্রীর দল নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দর্শক মাত্র, কাজেই আমার দিকে কেউ চেয়ে নেই বলেই আমি মনে করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম, সকলে আমারই দিকে চেয়ে আছে। ভাবলাম যদি এটা কলকাতা হত, তবে আজ এত কাছে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, হয়তো আমায় ঘরে বন্ধ করে পুলিস পাহারায় রাখা হত। আমার জীবনে এরকম ব্যাপার ঘটেছে দুবার। কিন্তু রাজার নিজের দেশে আমার সে চিন্তা নেই। আগামীকাল যে জাতের সঙ্গে শত্রুতা শুরু হবে, সেই জার্মনও যেমন সহজ-ভাবে রাজদর্শন করছে, রাজভক্ত প্রজাও সেরূপ রাজদর্শন করছে। অথচ আমাদের দেশে বড়লাট সমাগমের সময় লাল পাগড়ি, সাদা নেকটাই, সকলেই সন্ত্রস্ত; যেন একটা প্রলয়ের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। কেন এমন হয় তাই ভাবছিলাম। ভাববার বিষয় বটে।

রাজার জাহাজ চ'লে গেল; উপকূলের কামানের গর্জন অনেকক্ষণ শোনা গেল; আমরা আপন আপন ক্যাবিনে ফিরে এলাম। এবার দুপুরে খাবারের পালা। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম তাতে চারজন হাঙ্গেরিয়ন এবং দুইজন হাঙ্গেরিয়ন ইহুদী বসেছিলেন। এঁরা কেউ ইংরেজী জানেন না। তাঁরা কৃষক, আমেরিকায় বসবাস করতে যাচ্ছেন। কৃষকের আদর সর্বত্র, তাই তাঁদের সামনে নানারূপ খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেই গন্ধ আমার নাকে সুধাবর্ষণ করছিল। বোধ হয় কৃষকেরা খাদ্যসম্ভার উৎপাদন ক'রেই সুখী, খাওয়ার দিকে তাদের তেমন মন নেই। কেননা দেখলাম তাঁরা ফলমূল আমারই দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। বুঝলাম কৃষকদের মন উদার, অন্যদের মতন কালা আদমীদের উপর তাঁদের ঘৃণা নেই। শেষের দিকে মনে হল কৃষকেরা যেন খেয়ে তৃপ্ত হয় নি। একটা কথা মনে হল, ওয়েটারকে ডেকে বললাম, "এঁদের এক গ্লাস করে বিয়ার দিলে ভাল হয়," "তাই তো আমারও তাই মনে হয়; তবে বিয়ার দেবার আমার অধিকার নেই।" আমি বললাম, "কথাটা যেন পারসর (purser)* পর্যন্ত পৌঁছে।"

তৎক্ষণাৎ পারসর এসে উপস্থিত। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না। আমি তাঁকে হাঙ্গেরিয়ন কৃষকদের অসুবিধার কথা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তাঁদের দেশে আমি অনেক দিন ছিলাম; তাই তাঁদের খাবার পদ্ধতি জানি ব'লেই কথাটার উত্থাপন করছি। তৎক্ষণাৎ এ'দের জন্য বিয়ার আনা হল। বিয়ার পেয়ে ওঁরা পেট ভরে রুটি, আলু, মাখন ও সামান্য মাংস খেলেন। কাফি তারা খেলেন না এমন কি অন্যান্য সুখাদ্যের জন্য অপেক্ষাও করলেন না। *তারা সুখী হয়েছে দেখে আমিও সুখী হলাম, খুব আত্মতৃপ্তি বোধ হ'ল। কিন্তু নিজের দেশ হ'লে কি করতাম তা বলতে পারি না। হয়তো চাষা ব'লে তাড়িয়েই দিতাম। এ দেশের চাষা আর আমাদের দেশের চাষায় প্রভেদ অনেক। ওরা স্বাধীনতা বোঝে, আপনার জাতের সংবাদ রাখে, বোঝে যে, চাষা হল জাতের মেরুদন্ড। আমাদের দেশের চাষারা সে রকম নয়, তারা শুধু সেবা করতে জানে, অপরের তাঁবে খাটতে জানে আর জানে ঋণের দায়ে সর্বস্বহারা হ'তে। আমাদের দেশের চাষারা সংকটে পড়লে ভগবানকে অগতির গতি মনে করে, এদেশের চাষারা সংকটে পড়লে সংকট মুক্তির পথ নিজে খোঁজে, ভগবানকে মনে করে গতির অগতি।

জাহাজের অভিজ্ঞতার গল্প অনেক করেছি; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এই জাহাজে একটা নতুন ব্যাপার ঘটেছিল। কপূর্রতলার মহারাজার সেক্রেটারি, শুনেছি পারসর হ'তে আরম্ভ ক'রে সেলারদের পর্যন্ত নাকি অর্থ বিতরণ করেছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন আমিও বুঝি সেইরকম অর্থ বিতরণ করব। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন নি যে, আমি ভবঘুরে। গুদামে আবদ্ধ আমার দ্বিচক্র-অশ্ব কারও লক্ষ পড়ে নি। এমন কি পারসর মহাশয় পর্যন্ত সেসব সংবাদ রাখতেন না। তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে এসে শোনাতেন, অমুক তাঁকে এত দিয়েছিল, অমুকের কাছ থেকে এত পেয়েছিলেন, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য অভিপ্রায় এই যে, যেন আমিও তাঁর কথা বিস্মৃত না হই। বাগে প্রকারে একথা জানাতেও কসুর করেন নি যে, খুচরা পয়সার অভাব হবে না, ব্যাঙ্কের চেক থাকলে তাও তিনি ভাঙ্গিয়ে দিতে পারেন। আমিও কোনও মহারাজার সেক্রেটারি হব তাই ছিল বোধ হয় তাঁর ধারণা।

পূর্বোক্ত গ্রীক যাত্রীটি সময় সময় এসে আমার সঙ্গে গল্প বলতেন। তারই সামনে একদিন পারসর মহাশয়ের চেক ভাঙ্গানোর কথাটা উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় পারসর মহাশয়কে জানিয়ে দিলেন যে, আমি ভারতের সামান্য লোক, আমার কাছ থেকে লম্বা চেক পাবার আশা বৃথা। লোকটি স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা পুরো ক্যাবিনে যার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে, কাপ্তেন এসে যাকে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে যাচ্ছেন সেই লোক সামান্য হয় কি ক'রে তা বোধ হয় তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে পারসর আর আমার ত্রিসীমায় আসতেন না, কিন্তু কয়লাওয়ালা, তেলওয়ালা, বয়, কুক ওরা আমার কথা শোনবার জন্য, আমার সঙ্গলাভ করবার জন্য প্রায়ই আমার দরজায় হানা দিত। কিন্তু আমি তাতে বিরক্ত না হয়ে সব সময়েই তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার চেষ্টা করতাম। হাজার হ'ক তারা মজুর। আমি দরিদ্র দেশের লোক, আমিও দরিদ্র, আমিও দলিত, তাই মজুর ও দলিতদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'তে বেশী সময় লাগে নি। আমরা পরমানন্দে দশদিন কাটিয়ে একদিন নিউইয়র্কের দরজার কাছে এসে' পড়লাম।

সেই দরজা লোহার। সেই দরজায় আঘাত করলে সহজে ভাঙ্গে না। সেই দরজা মনরো ডকট্রিনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তার চাবি ইমিগ্রেশন অফিসারের হাতে। তাঁরই ইচ্ছার উপর সেই লৌহ পিঞ্জরে প্রবেশ নির্ভর করে। সেই লৌহদ্বার আমার সামনে আর দুদিন পরেই আসবে, দৈনিক জাহাজী সংবাদপত্র আমাকে সে কথা জানিয়ে দিল। এ সংবাদে অনেকেরই মন ভারাক্রান্ত হ'ল। কেউ কেউ দেদার মদ খেতে শুরু করে দিল। আমি এসব সুখ-দুঃখের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম মনরো ডকট্রিনের কথা। যে আদর্শের অনুরোধেই মনরো ডকট্রিনের প্রবর্ত্তন হয়ে থাক না কেন, এর দোহাই দিয়ে এই জাতটার আর্থিক স্বার্থ সাধনই আমার চোখে পড়তে লাগল। মনকে বললাম,—মন, ভাল ক'রে যদি বুঝতে চাও তো চোখ বেশ ক'রে খুলে রাখ।

(ক্রমশ)

* জাহাজের হিসাব ইত্যাদি রক্ষক পদস্থ কর্মচারী।

---

# আশাহতা

**সমীর ঘোষ**

নূতন করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
আরতি করিব কার।
দেবতা আমার দিবসের শেষে
রুদ্ধ করেছে দ্বার।
জনহীন পথে কাঁদিতেছে বায়ু,
ক্ষুব্ধ হিয়ার কাঁপিতেছে স্নায়ু
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রদীপ নিবিল
আলো নাই তারকার।
নূতন করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
আরতি করিব কার॥

তিমির কাজল জড়ায়ে গিয়াছে
সিক্ত আঁখির পাতে
পথে লুণ্ঠিত আঁচল জাগায়
শত বাধা আজ রাতে।
বলে কেবা যেন, এসো, এসো ফিরে,
মিছে শিখাহীন দীপ বহি' শিরে
কোথা যাবে তুমি, কি কাজে লাগিবে
ব্যর্থ অর্ঘ্যভার!
নূতন করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
আরতি করিবে কার॥

# সমাধান

( অনুবাদ—গল্প )

শ্রীঅনঘলাল পোদ্দার

মোড়ের ছোট্ট 'বেকারি'টার পরিচালিকা ও মালিক মিস্ মার্থা মিচাম। মার্থার বয়স চল্লিশ। ব্যাঙ্কে নগদ দুটি হাজার মুদ্রা মজুত। তাছাড়া দুটি বাঁধানো দাঁত এবং মমতায় আর্দ্র একটি অন্তঃকরণেরও অধিকারিণী তিনি।

একজন খরিদদারের সপ্তাহে দুই-তিন দিন দোকানে আসাটা মার্থা আজ দিনকয়েক ধরিয়া খানিকটা আগ্রহ সহকারেই লক্ষ্য করিতেছেন। লোকটি মাঝ বয়সী, চোখে চশমা। বাদামী রংএর ছুঁচলো একথোপ ছাঁটা দাড়ি গালে। লোকটির কথায় দারুণ বিদেশী টান। পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া, জায়গায় জায়গায় বেঢপ ঢিলে আর চোপসানো, সেলাই ও রিপুর দাগে ভরা। তথাপি উহারই মধ্যে লোকটি বেশ পরিচ্ছন্ন আর ভব্যতার দিক্ দিয়াও সে মন্দ নয়, বরং রীতিমত ভদ্র।

দুখানি বাসী পাউরুটি ছিল লোকটার ফি বারের সওদা। একখানি টাটকা পাউরুটির দাম পাঁচ পয়সা; বাসী রুটি পাঁচ পয়সায় দুইটা। মার্থার দোকানে আসিয়া খালি বাসী রুটিরই ফরমাশ করিত লোকটি।

একদিন হঠাৎ লোকটির আঙুলে একটা ছোট্ট লাল বাদামী ফোঁটায় মার্থার নজর পড়িল। তাই থেকে তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে লোকটি শিল্পী, কাজেই নেহাত গরিব। তারপর সংশয়রহিত মার্থার মন ছুটিল কোথাকার কোন্ সিঁড়ির নীচে একটা ভাঙা ঘরে শিল্পীর আস্তানায়—যেখানে শিল্পী করে তার শিল্পসাধনা, চলে তার ছবি আঁকা, শোয়া বসা, আর বাসী রুটির সাহায্যে তার আহার সম্পাদন। রুটিতে কামড় দিতে দিতে মিস মার্থার দোকানের তাকে তাকে সজ্জিত সুখাদ্যগুলিরও কথা যে শিল্পীর মনে পড়ে না তাই বা কে বলিতে পারে।

রুটি-মাখন, চা-চপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বসিয়া মার্থার নিশ্বাস প্রায়শঃ সকরুণ দীর্ঘ হইয়া ওঠে। মনে পড়িয়া যায় ভদ্র শিল্পসাধকটিকে আর কল্পনায় আসে বন্ধ ঘরের কোণে শুখনা রুটিতে একাকী তার খুন্নিবারণ। তাহার চেয়ে মার্থার ইচ্ছাকে কৃতার্থ করিয়া মার্থারই পাশে বসিয়া সে তো গ্রহণ করিতে পারে তাহারই মুখরোচক খাদ্যের অংশ।

লোকটার বৃত্তি সম্বন্ধে মার্থার অনুমানের সত্যতা যাচাই করিতে মার্থা একদিন কোনও এক 'সেল'এ কেনা একখানা ছবি নিজ কক্ষ হইতে আনিয়া রুটির কাউণ্টার-এর মুখোমুখি বিপরীত দিকের তাকে ঠেস দিয়া রাখিলেন। ছবিটা এক-খানি দৃশ্যচিত্র। মারবেল পাথরের চমৎকার একটা প্রাসাদ (অন্তত ছবির নীচে এই রকমই উল্লেখ ছিল) পটের একেবারে পুরোবর্ত্তী জমির উপরে—পুরোবর্ত্তী জমি নয় বরং পুরোবর্ত্তী জলের একেবারে ধারেই দাঁড়াইয়া। বাকী অংশটাতে ছিল আকাশ, মেঘ, আর অনেক নৌকা; সব চেয়ে বেশী ছিল প্রচুর গাঢ় রংএর ছোপ। এমন রংএর খেলা শিল্পীমাত্রেরই দৃষ্টিকে যে আকর্ষণ করিবে না তাও কি সম্ভব।

দুই দিন পরে আবার খরিদদারটির আবির্ভাব হইল।

"দুটি বাসী রুটি দিন তো।"

রুটির টুকরা দুটি মুড়িতে মুড়িতে মার্থা শুনিতে পাইলেন লোকটি বলিতেছে, "বাঃ ম্যাডাম, বেশ ছবিখানি তো আপনার!"

নিজের চতুরতায় উৎফুল্ল হইয়া মার্থা কহিলেন, "বটে, সত্যি? আর্ট ও আর্টিস্টদের—মানে—"

মার্থা বলিতে যাইতেছিলেন, আর্ট ও আর্টিস্টদের তিনি ভালবাসেন। কিন্তু না, সাত তাড়াতাড়ি আর্টিস্টদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া বসাটা সমীচীন হইবে না। তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন, "আর্ট, বিশেষত ছবি জিনিসটাকে এত ভালবাসি আমি!—ছবিটা কি সত্যিই ভাল বলে মনে হয় আপনার?"

খরিদদারটি কহিলেন, "প্রাসাদটার অঙ্কন রীতিতে আছে খুঁত আর চিত্রকরের পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞানেরও অভাব দেখা যাচ্ছে। নমস্কার, ম্যাডাম।"

রুটির মোড়কটা তুলিয়া লইয়া মার্থাকে অভিবাদন করিয়া ব্যস্ততার সহিত লোকটি বাহির হইয়া গেলেন।

হাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই উনি একজন শিল্পসাধক। মার্থা ছবিটা সাবেক জায়গায় টাঙাইয়া রাখিলেন।

চশমার কাচে ঢাকা লোকটির চোখের ভাষা কি কোমল ও সহৃদয়। কি চমৎকার প্রশস্ত কপাল! প্রতিভা সন্দেহ নাই, তবে বাসী রুটির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিভা টিকিতে পারে কি? কিন্তু প্রতিভাকে যে সংগ্রাম করিয়াই নিজের পথ করিয়া লইতে হয়। আচ্ছা, আর্ট ও শিল্পের ভবিষ্যৎটা কেমন হইত, যদি প্রতিভার পিছনে থাকিত দুইটি হাজার মুদ্রার রুটির দোকান একটা আর মমতায় সিক্ত একটি হৃদয়ের—কিন্তু মিস মার্থা, এ সবই যে দিবাস্বপ্ন!

আজকাল লোকটি দোকানে আসিলে 'শো কেসের' ওধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার্থার সঙ্গে প্রায়ই একটু আধটু গল্প করেন; দেখিলে মনে হয় মার্থার মিষ্টি মুখের কথা শোনার ইচ্ছা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিতেছে দিন কে দিন। তবুও মার্থার দোকানের সুভক্ষ্য সুস্বাদু কেক, বিস্কুট সব কিছুকেই উপেক্ষা করিয়া লোকটি বাসী রুটিই কিনিতে লাগিলেন। মার্থার বোধ হইল, দিন দিন শিল্পীকে আগের চেয়ে যেন অনেকখানিই কৃশ ও অবসন্ন দেখাইতেছে। লোকটির কম দামে কেনা বাসী রুটির সঙ্গে আরও কিছু ভক্ষ্য যোগ করিতে না পারিয়া মার্থার কি যে অস্বস্তি হইতে লাগিল। মার্থার ভরসা হয় না, মনে তিনি সাহস পান না, পাছে শিল্পীর মর্য্যাদায় ঘা লাগে। শিল্পীদের যে কি গভীর মর্য্যাদাবোধ, সে খবর মার্থা রাখে।

মার্থা আজকাল কাউণ্টারে দাঁড়ান নীল ফুটকি দেওয়া তাঁর পেয়ারের সিল্কের পোশাক পরিয়া। কি একটা ফলের বীজ ও সোহাগা একত্র মিশাইয়া অগ্নিসংস্কার করাইয়া লইয়া একটা রহস্যময় বস্তুও তিনি তৈয়ারী করিতে লাগিলেন পাশের ঘরে। গাত্রচর্ম্মের বর্ণসুষমা বাড়াইতে নাকি অনেকেই ইহার ব্যবহার করে।

অভ্যাসমত খরিদদারটি আবার একদিন দোকানে আসিলেন, নিকেলের মুদ্রাটি 'শো কেসের' উপর রাখিয়া তাঁর বরাদ্দ বাসী রুটি প্রার্থনা করিলেন। হুকুম তামিল করিতে মার্থা উঠিয়া গেলে বাইরে একটা ভয়ানক হৈ চৈ ও ঝন ঝন শব্দের সঙ্গে অগ্নিনির্ব্বাপক একটা দমকলের ভারী কাঁপানো শব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলে মানুষমাত্রেই যা করে খরিদদারটিও তাহা করিলেন। ব্যাপার জানিবার জন্য দ্রুতপদে দরজার দিকে আগাইয়া গেলেন। এই তো চমৎকার সুযোগ—মিস মার্থা হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যেন!

কাউণ্টারটার ঠিক পিছনে তাকগুলার একেবারে শেষ ধাপটিতে মিনিট দশেক আগে গোয়ালা সেরখানেক টাটকা মাখন রাখিয়া গেছে। দুই খণ্ড বাসী রুটি লইয়া মার্থা প্রত্যেকটিরই গায়ে একটা রুটি-কাটা ছুরি খুব গভীরভাবে বসাইয়া দিলেন; তার পর চেরা জায়গায় খুব খানিকটা মাখন ভরিয়া রুটি দুইখানি চাপিয়া চাপিয়া আগের মতই পরিপাটি করিয়া লইলেন। খরিদদারটিকে যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল মার্থা তখন রুটি দুইখানি কাগজে মুড়িতেছেন।

আগের চেয়ে আরও একটু সরস ও স্বল্প আলাপের পর লোকটি চলিয়া গেলে মিস মার্থা আপন মনেই একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু ভীরু হৃদয় তাঁহার একটু দুরু দুরু করিল বই কি। কাজটা কি তাঁর খুবই দুঃসাহসের হইল, লোকটি কি অপরাধ লইবেন না—অন্তত কোনরূপ ত্রুটি? না, নিশ্চয়ই নহে! খাদ্যের কি কোনও মুখর ভাষা আছে! আর গোপনে মাখন দেওয়াটা নিশ্চয়ই গোপনে প্রেমপত্র দেওয়ার শামিল নয়।

মার্থা সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়াই বারংবার ওই ঘটনাটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, সেই মন্থর সময়টির কথা; সত্যই যখন লোকটি তাঁর এই সামান্য ছলনাটুকু ধরিয়া ফেলিবেন। শিল্পী তাঁর রংএর পাত্র ও তুলি রাখিবেন নামাইয়া। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে ছবি তিনি আঁকিতেছিলেন, পরিপ্রেক্ষিত যার নিখুঁত, সমালোচনার অতীত, ইজেলের উপর থাকিবে দাঁড়াইয়া। শুখনা রুটি ও জলে আরম্ভ হইবে শিল্পীর আহারের উদ্যোগপর্ব্ব। একফালি রুটি ছিঁড়িয়া মুখে দিবেন তিনি, তার পর—তার পর মিস মার্থা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিলেন। ও বস্তুটি যোগাইয়াছে যে জন, খাইতে খাইতে তাহার কথা উনি ভাবিবেন না একটিবার?

সদরের ঘণ্টা ভীষণ জোরে বাজিয়া উঠিল। খুব সোরগোল করিয়া ওই না কে এই দিকে আসিতেছে! মার্থা সদরের দিকে ছুটিলেন। সদর দরজায় দুইজন লোক দাঁড়াইয়া। একজন যুবা, মার্থা ইঁহাকে আগে আর দেখেন নাই মুখে তাঁহার সধূম পাইপ। আর একজন তাঁহারই সেই শিল্পী।

শিল্পীর চোখ মুখ ভয়ানক রাঙা! মাথার টুপিটা ঘাড়ে, চুলগুলি জানোয়ারের মত উস্কখুস্ক, দুটি হাতই মুষ্টিবদ্ধ—ঘুসি মারার হিংস্র ভঙ্গীতে উদ্যত। হাঁ তাঁর সবখানি আক্রোশের হেতু মার্থাই। মার্থাকে লক্ষ্য করিয়াই উগ্র উত্তেজনায় শিল্পীর এই নগ্ন ও হিংস্র প্রকাশ।

"বেহায়া মেয়েমানুষ!" জোরালো গলায় চেঁচাইয়া শিল্পী আরও অপমানজনক গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। কম বয়সী লোকটি শিল্পীকে টানিয়া সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শিল্পী কাউণ্টারের উপর কিল চালাইতে চালাইতে বলিতে লাগিলেন, "কার প্ররোচনায় তুমি এমন কাজ করেছ শুনি? কার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে রুটির মধ্যে মাখন ঢুকিয়েছ শুনি? তোমার অনধিকার চর্চ্চায় আমার ক্ষতির পরিমাণটা ভেবে দেখেছ কি একবার? বেআক্কেলে মেয়েমানুষ!" বলিতে বলিতে শিল্পীর দুই চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল।

নীল ফুটকি দেওয়া সিল্কের সেই পোশাক মার্থার গায়ে; তাহারই একপ্রান্তে কোমরের উপর একখানি হাত রাখিয়া অসহায় অবসন্ন মার্থা তাকগুলির গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহার সঙ্গীর কলার ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, "আরে বাপু, যথেষ্ট হয়েছে, এখন চল ফেরা যাক।" কিছুকাল পরে যুবক ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

শিল্পীর নাম ব্লুমবার্গার, তিনি দালান ইমারতের একজন নকশা আঁকিয়ে। যুবকটি শিল্পীর সঙ্গে একই অফিসে কাজ করেন। একটা টাউন হল তৈরী হইবে, তাহারই নকশা আঁকিতে গত তিন মাস ধরিয়া পরিশ্রম করিতেছেন ব্লুমবার্গার। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ব্লুমবার্গারেরই। যুবকটি বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "নকশা আঁকিয়েরা প্রথমে পেনসিলের সাহায্য নেয়, পেনসিলের কাজ হয়ে গেলেই মুঠো মুঠো বাসী রুটি দিয়ে লাইনগুলো ঘষে সাফ করতে হয় তাদের। এ কাজে রবারের চেয়ে বাসী রুটিই কাজ দেয় ভাল।"

তাহার পর দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "ব্লুমবার্গার বাসী রুটি আজ এখান থেকেই কিনেছিলেন কিনা! মানে, দেখুন ম্যাডাম, ক্ষমা করবেন আমাকে, রুটিটার মধ্যে মাখন ছিল—সব কাজ বন্ধুর পণ্ড হয়ে গেছে।"

মার্থা পাশের ঘরে গেলেন। ফুটকি দেওয়া নীল জামাটা খুলিয়া তাঁহার আগেকার সাদাসিধা সার্জের পোশাকটা গায়ে দিলেন। তাহার পর বিষণ্ণ মনে জানালা গলাইয়া তাঁর সাধের অঙ্গরাগ ছাই-এর গাদায় বিসর্জ্জন দিলেন। *

---

* O. Henryর ছোট গল্প

# বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বিদেশে য়ুরোপে উচ্চমনা শিক্ষিতদের সমাজে ভারতবর্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছেন তার পরিচয়-সত্য তারাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যাঁরা য়ুরোপে গিয়ে সে দেশের বিশিষ্ট এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-বিষয় আলোচনা প্রসংগে মনে পড়ে প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে বলেছিলেন—"সুধাকান্তবাবু এদেশে থেকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি রকম বেশী এবং তাঁর প্রতি সে দেশের চিন্তাশীলদের শ্রদ্ধা কতটা গভীর। সেখানে গেলে বুঝতে পারা যায় তিনি বিদেশীদের দৃষ্টিতে কতটা উঁচু। তাঁর প্রতি বিদেশীদের সম্মান ভারতবাসীদের উপর সাধারণভাবে এসে পড়ে, টেগোরের দেশবাসীদের উপর তাদের অনেকের শ্রদ্ধা হয়েছে টেগোরকে দেখে"। সুভাষবাবু য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের মানসম্মান সম্বন্ধে যে পরিচয় পেয়েছেন, সেই পরিচয়ের আর একটি সংবাদ পেলাম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মাহালানবীশ মহাশয়ের সুহৃধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাণী মাহালানবীশের একটি চিঠিতে। সম্প্রতি তিনি দার্জ্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথকে, বেলজিয়ামের বর্ত্তমান দুঃসময়ের বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি পড়বার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি কবিকে এক জায়গায় লিখছেন "কাল শুনলাম ব্রাসেলস আর য়্যানটোয়ার্পেও জার্ম্মান সৈন্য এসে পড়েছে। ব্রাসেলসে বেলজিয়ামের রাজারাণীর সংগে আমরা দেখা করতে গিয়েছিলেম। এই রাজার বাবা এলবার্ট তখন রাজা। আমাদের সংগে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বসে কি রকম অন্তরংগ কথাবার্ত্তা বললেন, আপনার সব খবরবার্ত্তা নিলেন। তখন আপনি এদেশে ফিরেছেন। আপনার জন্যেই আমাদের এত খাতির। আমাদের কাছ থেকে আপনার সব খবর শুনতে পাবেন বলেই নিজেরা হোটেলে গাড়ী পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজার বোন তার এক সপ্তাহ আগে মারা গেছেন ব'লে ওরা Mourningএ ছিলেন,—সে সময় কারো সংগে সামাজিকভাবে দেখাশোনা করছিলেন না। ভিক্টর রুসো বলে একজন Artist রাণীর খুব বন্ধু, তাঁর সংগে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তাঁকে দিয়েই রাণী বলে পাঠিয়েছিলেন যে, আমরা যদি পরদিন তাঁর সংগে দেখা করতে যাই তাহলে খুসী হবেন, কারণ Tagoreএর খবরবার্ত্তা আমাদের কাছ থেকে পাবার সুযোগ হবে, তাই আমরা গিয়েছিলেম। আপনার সম্বন্ধে কী আশ্চর্য্য ভালোবাসা এবং গভীর শ্রদ্ধা তাঁদের দুজনের। তাঁদের সংগে কথা বলে এত ভালো লেগেছিল, প্রায় দেড় ঘণ্টা আমাদের বসিয়ে রেখে আপনার সম্বন্ধে সব আলোচনা করলেন খবরবার্ত্তা নিলেন। আপনার বই সমস্ত পড়ছেন বললেন—আরো কত কথা। দেখলাম শান্তিনিকেতনে কি রকম ধরণের কাজ কি রকম পড়াশুনোর রীতি সে সমস্ত খবরই ও'রা আগ্রহে সংগে রেখেছেন, খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। আমাদের কাছে আপনাকে দেবার জন্য রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো নিজেদের দুখানা Photo দিয়েছিলেন,—জোড়াসাঁকোতে সে দুখানা আছে। এই কদিন ধরে বেলজিয়ামের খবর পাচ্ছি আর সেই দিনের সেই সহৃদয় সৌজন্য ও হৃদ্যতার কথা মনে পড়ছে।"

রবীন্দ্রনাথের ৮০তম জন্ম বৎসরে দেশে সর্ব্বত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশবাসী কত খবরই জানবার জন্য উৎসুক। তাই এই পত্রের সংবাদের বিষয়টি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করলুম। তাঁর জন্ম বৎসরে এই কথাই শ্রদ্ধানত হয়ে ভাবতে বিস্ময় হয় যে একজন বাঙালী কবি একা নিজের জীবনে অসাধারণ প্রতিভার জোরে কী অসম্ভব সম্ভব করেছেন। দেশের দুর্দ্দশার অন্ধকার ললাটদেশে তিনি যেন অভাবিত এক দীপ্তোজ্জ্বল ললাটিকা—যার দীপ্তিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক এ্যামেরিকান যুবক বলেছিলেন, "আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে টেগোরে (ওদেশে কেউ কেউ Tagore-কে টেগোর না বলে টেগোরে উচ্চারণ করেন) নামের একটা মায়া আছে। সেখানকার লোকেরা ভারতীয় কাউকে দেখলেই তার কাছে আগ্রহে এগিয়ে যাবে এই ভেবে যে, এ ব্যক্তি যখন ভারতবাসী তখন নিশ্চয়ই এ টেগোরে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। কত লোকের কাছে সে দেশে খবরের কাগজের সাদা পাড়ের সামান্য চিরকুটে কোনো রকমে সংগ্রহ করা টেগোরের সামান্য নামস্বাক্ষর সযত্নে রক্ষিত মূল্যবান সামগ্রীর মত হয়ে আছে।" স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় এ্যামেরিকান বিশপ ফ্রেড্রিক বি ফিসার একবার রবীন্দ্র প্রসংগে বলেছিলেন, "In our country no good library is supposed to be complete without Tagore's books. He is a wonderful personality. Indians are held in high estimation by hundreds of best Americans only because of Tagore's tremendous influence there; every Indian should feel proud of Tagore."

# অনুবর্ত্তন

(অনুবাদ গল্প)

পঙ্কজ দত্ত
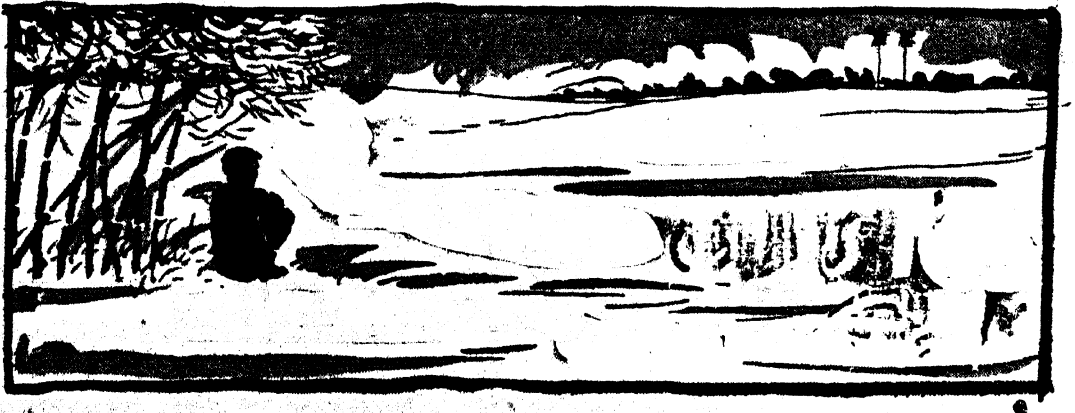
বছর কয়েক পূর্ব্বেও, গ্রামের মধ্যে নিয়মানুবর্তী লোকের কথা উঠিলেই সব প্রথমে যে নামটি শোনা যাইত তাহার সম্পর্কে দ্বিমতের আর কোন অবকাশই থাকিত না।

"ও-কি আবার জিগ্যেস করতে হয়?" সকলেই প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিত, "প্ল্যাকমায়ারের বুড়োকে চেনে না এমন কেউ আছে নাকি!" তাই বোধ হয় ঠাট্টা করিয়া লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল 'পাংচুয়াল নীল'। বাস্তবিক বলিতে কী, তাহার মত বিচিত্র ধরনের লোক অন্য কাহারও নজরে কোনদিন পড়িয়াছে কি-না জানি না, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় সে সৌভাগ্য কখনও ঘটে নাই।

নীলের বৈচিত্র্য ছিল এই যে, তাহার গৃহটিকে সে ঘড়ীতে একেবারে ঠাসিয়া ফেলিয়াছিল, সবশুদ্ধ সংখ্যায় শতাধিক ছিল বলিলেও বোধহয় কিছু কম করিয়াই বলা হয়। দেওয়ালের গায়ে ঝোলান বা দাঁড় করান অবস্থায়, গোল বা ছ'কোণা কি চৌকোণা, নানা আকারের ঘড়ী; কোনটা হইতে সাধারণ ঘণ্টার শব্দ হয়ত বাহির হইত আবার অন্য কোনটা হইতে হয়ত বা কোকিলের কূজন ধ্বনিত হইয়া উঠিত। বাড়ীর প্রতি ঘরখানিই একটা একঘেয়ে টিক্‌টিক্ শব্দে সর্ব্বক্ষণই মুখর হইয়া থাকিত। এমন কি রাস্তায় পথিকের কানেও সে শব্দ ঝালাপালা করিয়া তুলিত এবং অজানিত কেহ হঠাৎ এ পথ দিয়া যাইলে ঘড়ীর সেই শব্দে ঘাবড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না।

প্রত্যেক দিন ঠিক বেলা বারোটার সময় নীল নাকের ডগায় চশমাটিকে বসাইয়া চাবির গোছা হাতে হাজির হইত। তারপর এক পাশ হইতে আরম্ভ করিয়া একটার পর একটা ঘড়ীর তদ্বির করিয়া যাইত; ঘড়ীগুলির সামনে আগাইয়া যাইবার সময় প্রত্যেকটিকে বিশেষ এক একটা নামে সম্বোধন করিত এবং কাহারও মধ্যে কোন গোলমাল দেখিলে এক টুকরা কাগজে তাহার বিবরণ টুকিয়া রাখিত।

বারান্দার ঘড়ীটাকে ডাকিয়া হয়ত বলিয়া উঠিত, "কী খবর হে? আজ যে বেজায় দৌড় লাগিয়েছ, ব্যাপার কী বল তো? উঁহু, অমন করলে তো চলবে না বাপু! সব সময়ে এই কথাটা মনে রাখবে যে, হুড়োহুড়ি করলেই সব মাটি—সুতরাং এক কাজ করা যাক, পেণ্ডুলামটা না হয় একটু নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া যাক, কি বল?"

পরমুহূর্ত্তেই হয়ত আর একটিকে এবারে ধীরে চলিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিত, "আরে ছোঃ, অমনিধারা চললে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কেন! তেল চাই বুঝি?—কিন্তু আজ তো তেল দেবার দিন নয়—তা না হয় এক কাজ করা যাক, তোমার পেণ্ডুলামটা একটু তুলেই দেওয়া যাক!"

ঘড়ীগুলি সময়ের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতে থাকিলে, নীলের সে কী আনন্দ! উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিত, "এই তো! একেবারে কাঁটায় কাঁটায়—এ নহিলে বাহাদুরি কি? এবারে তো সমস্ত পৃথিবী তোদের মেনে চলবে রে!"

বিবাহিত হইলেও নীলের কোন সন্তান ছিল না। অর্থাৎ ঠিকভাবে ধরিতে গেলে, তাহার এই উগ্র ধরনের ঘড়ীপ্রীতির ইহাই ছিল কারণ; সে চাহিত সর্ব্বক্ষণই কাহাকেও আদর করিয়া অথবা কাহারও সহিত দুদণ্ড কথা বলিবার সুযোগ করিয়া লইতে—প্রথম ঘড়ীটি কিনিবার পিছনে ছিল ইতিহাস ইহাই। কিন্তু ক্রমশই ঘড়ী কেনাটা তাহার একটা বাতিকে দাঁড়াইয়া গেল এবং শত চেষ্টাতেও সে প্রবৃত্তি রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। শেষে এই ভাবিয়া নিজেকে প্রবোধ দিল যে, সন্তান থাকিলে তাহার জন্য একটা খরচ তো থাকিতই—তাহার খাওয়া-পরা, অসুখ হইলে ডাক্তার ও ওষুধের খরচ সবই তো থাকিত; তাছাড়া তাহাদের লইয়া হাঙ্গাম বড় কম হইত না—দিনরাত হুটোপাটি করিয়া বেড়াইবে; কে বলিতে পারে, হয়ত একদিন সমস্ত ব্যয় ব্যর্থ করিয়া জলেই ডুবিয়া মরিবে। ঘড়ী লইয়া এসব বালাই পোহাইবার দরকার হয় না, ইহাদের সব কিছুই ধরা ছোঁয়ার মধ্যে রাখা যায়। যেখানে রাখিয়া দিবে সেখানেই নিশ্চিন্তে থাকিয়া যাইবে, গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করার কথা স্বপ্নেও ইহারা কোনদিন ভাবিতে পারে না। কাহারও কোন অসুখ করিলে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হয় না, নিজেই সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা যায়। মনে মনে এই সমস্ত দিক ভাবিয়াই নীল গৃহটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘড়ীর বিরাট এক আলয়ে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল।

যে সমস্ত ভাঙ্গাচোরা ও অপদার্থ ঘড়ীর জন্য লোকে পয়সা বা শ্রম কোনটিই ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে না, বিশেষ করিয়া সেইগুলির জন্যই নীলের যেন বেশী দরদ। যে করিয়াই হউক এই সব ঘড়ী তাহার সংগ্রহ করা চাই-ই এবং, মজা এমনি, ইহারা যতই বিকল ও অপদার্থ হোক না কেন নীলের সেবায় তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিত। যথাকালে সময়ের ঘণ্টায় ঘা দিয়া এমনি সুশৃঙ্খলার সঙ্গে আবার ইহারা পরিক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিত যে কস্মিনকালেও তাহাদের কোন রোগ হইয়াছিল বলিয়া ধরিবার আর কোন উপায় থাকিত না। এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করিয়া যে সম্ভব হইত লোকে তাহা ভাবিয়া কোন কূল পাইত না এবং বিশেষ ঔৎসুক্যবশত এবিষয়ে খোঁজ-খবর লইলে প্রতিবারেই সেই একই উত্তর তাহারা পাইয়া আসিয়াছেঃ—

"মানুষের যা, ঘড়ীরও তাই!—এদেরও সঙ্গীর দরকার এবং ঠিক মানুষেরই মত সেবার দরকার—আর কোন রহস্য এতে নেই!"

এইভাবে ঘড়ীগুলিকে লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘর-সংসার করিয়া দেখিতে দেখিতে একদিন নীল নিজেই একটি ঘড়ী হইয়া দাঁড়াইল। গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম বাঁধাধরা সময়ের

মধ্যে হওয়া চাই—বিছানা ত্যাগ করিবে সকাল ঠিক ছ'টায় আর শোবার জন্য তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল রাত ন'টা। বেলা বারোটা ছিল খাওয়ার সময় এবং বৈকালিক কফি পানের সময় ছিল ঠিক সাড়ে চারটা। বেলা এগারোটায় প্রাতঃকালীন ধূমপান করিবার সময় মিনিটে একবার করিয়া থুতু ফেলিত, প্রতি তিন সেকেন্ড অন্তর ধূমে নির্গত করিয়া দিত। অবশেষে অভ্যাসগুলি তাহাকে এমনি পাইয়া বসিল যে ঘড়ী না দেখিয়াও ঠিক সময় বলিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। লোকে যে তাহাকে "পাংচুয়াল" নাম দিয়া ছিল, অক্ষরে অক্ষরে তাহা ফলিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, আকৃতি ও প্রকৃতিটাকেও সে যথাসম্ভব ঘড়ীর মতই করিয়া তুলিয়াছিল—বাঁ হাতটা একটা ভারী বোঝার মত সর্ব্বক্ষণই ঝুলাইয়া রাখিত আর ডান হাতটাকে দোল খাওয়াইত ঠিক পেন্ডুলামের ভঙ্গীতে; কথা বলিলে মনে হইত যেন ঘড়ীর মতই টিক্‌টিক্‌ শব্দ করিয়া যাইতেছে। এই সব মানুষ ঘড়ীরা আয়ুকে কতদিন ধরিয়া রাখিতে পারে বলা সহজ নয়, ইহা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপরে—ঠিক মত আদর যত্ন পাইয়াছে কি না,—ভিতরটা অত্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, না বেশী তৈলাক্ত হইয়া গিয়াছে, সময় মত পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না ইত্যাদি অনেক কিছুই তখন বিচার করিতে হয়। কেহ কেহ বেশ স্বচ্ছন্দেই শতের কোঠায় পাড়ি দেয়, আবার কেহ বা হয়তো তিরিশ পার না হইতেই একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে। নীল ষাটের কোঠায় পা অবশ্য দিয়াছিল, কিন্তু অতি পরিশ্রমে বস্তুত তাহার শক্তি এতই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল যে, বিছানায় পড়িয়া থাকা ছাড়া আর তার কোন উপায়ই ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই নীল পরিষ্কার বুঝিয়া গেল যে তাহার দিন বড় দ্রুতই ঘনাইয়া আসিতেছে।

এই সংকটাপন্ন অবস্থাতেও কিন্তু সে সময়ানুবর্ত্তিতা এতটুকুও ভোলে নাই। বিছানা ছাড়া সম্ভব নয় বুঝিয়া সমস্ত ঘড়ীগুলিকেই সে তাহার ঘরে আনাইয়া লইল। ঘড়ীতে ঘড়ীতে ঘর ভর্ত্তি হইয়া গেল, তাহার মধ্যে দিয়া চলাফেরা করার আর স্থান রহিল না। নীল বিছানা হইতেই হুকুম দিতে লাগিল, "কোণের 'মোরা'টাকে এক মিনিট এগিয়ে দাও তো!"

"ছ'কোণাটার গায়ে যেন বেশী রোদ না লাগে—তা'হলেই সব তেল গলে গিয়ে মহা কেলেঙ্কারি বাধাবে!"

"বোর্ণহোলম দু'মিনিট পিছিয়ে দাও; দম দেবার সময় মনে করে পেন্ডুলামের চাকতিটা একটু ওপরে তুলে দিলেই হবে'খন!"

"শেলফের পকেট ঘড়িটার সঙ্গে ঐ পেরেকের গায়ে টাঙানোটার জায়গা বদলাবদলি করে দেবে। পেরেকেরটা আবার বেশীক্ষণ ঝুলে থাকতে চায় না!"

নীলের পরিচর্য্যার কাজে যাহারা নিযুক্ত ছিল, ঘড়ীগুলির পরিচর্য্যাতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও একথা অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় পর্য্যন্ত নীল কোন কাজেই সময়ের এতটুকুও নড়চড় হইতে দেয় নাই।

তারপর এক সন্ধ্যায় তাহার অবর্ত্তমানে ঘড়ীগুলির তদ্বির করিয়া যাইবার জন্য স্ত্রীকে ডাকিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিল এবং সেই রাত্রেই প্রাণাধিক প্রিয় ঘড়ীগুলিতে এগারোটার সঙ্কেতধ্বনি বাজিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও বুকের স্পন্দন চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল—স্তূপীকৃত ঘড়ীর মাঝখানে শুইয়া। মুখে এক অদ্ভুত হাসি—যেন কোন্ এক স্বর্গীয় সঙ্গীতে সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্ত হইতেই প্ল্যাকমার গ্রাম হইতে সময়ানুবর্ত্তিতার রাজত্বেরও অবসান ঘটিয়া গেল। আবার ঘড়ীগুলিকে সরাইয়া যথাপূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। তারপর যাহা ঘটে, যত্নের একান্ত অভাবে একে একে সব কটি ঘড়ীই বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। নীলের মৃত্যুকালীন উপরোধকে পালন করিতে তাহার স্ত্রী যে দুটি মাত্র ঘড়ীর পরিচর্য্যা তখনও বজায় রাখিয়াছিল, তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে সময়ের মিল থাকিতে বড় একটা দেখা যাইত না। একটায় ছটা বাজিতে থাকিলে, অপরটিতে বাজিতে থাকিত হয়ত সাতটা; সুতরাং একদিন যে ইহারাও চলা বন্ধ করিয়া দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! এতদিন ধরিয়া যে সেবাযত্ন ইহারা পাইয়া আসিতেছিল, একদিন এমনি করিয়া সমস্তই অসার হইয়া গেল।

কিছুদিন পর—এক সন্ধ্যায় নীলের স্ত্রী কি একটা সেলাই লইয়া ব্যস্ত ছিল। বাড়ীটা নির্জ্জন—খা-খা করিতেছে, যাহা কিছু আওয়াজ—প্রদীপের অগ্নিশিখার মৃদু দপদপানির শব্দই মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসিতেছিল—এমনি নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল! হঠাৎ মনে হইল পাশের ঘরের একটা ঘড়ী যেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু পরে যেন আরেকটা, তারপর আরও এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়ীটাই ঘড়ীর বিকট টিকটিক শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

নীলের স্ত্রী প্রথমটায় ভারী অবাক হইয়া গেল—আওয়াজটা কি সত্যি, না এ সমস্তই তাহার মতিভ্রম, ইহা স্থির করিয়া লইতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু শব্দ যখন ক্রমশ বাড়িয়াই চলিত লাগিল, তখন আর বসিয়া থাকা গেল না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে প্রদীপ হাতে পাশের ঘরে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া দাঁড়াইল—সত্যিই ঘড়ীগুলি আবার চলিতেছে, 'মোরা', 'বোর্ণহোলমার', ছ' কোনাটা, শেলফের সেই পকেট ঘড়ীটা—সব কটিই আনন্দের কলরোল তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পেন্ডুলামগুলি স্পষ্টই দোল খাইতেছে, ইহাতে ভুল হইবার কিছুই ছিল না। ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া মাথাটা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়া সে আবার দেখিল, না, সত্যিই ঘড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত কাটাইবার পর একটু সংবিৎ ফিরিয়া আসিতেই আতঙ্কে সে প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আনিতে গেল। সে ব্যক্তি গৃহে পা বাড়াইবামাত্র একসঙ্গে সমস্ত

ঘড়ীগুলিতেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল আর সেই ধ্বনি সমস্ত বাড়ীময় মহাঝঙ্কার তুলিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং শেষ ঘা পড়িবার সঙ্গেই দালানের কোকিল-ঘড়ীটাও কলরব তুলিয়া তাহাদের সায় দিল। সমস্ত মিলিয়া এমনি এক অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি হইল যে, শুনিয়া মনে হইতে লাগিল কাহারা যেন মহা উল্লাসে মাতিয়া হাসির তুবড়ি ছুটাইয়া দিয়াছে। ব্যাপারটি প্রতিবেশী লোকটির নিকট সুবিধাজনক মনে হইল না এবং এখানে আর অধিককাল কাটান নিরাপদ হইবে না ভাবিয়া টুপিটা মাথায় দিয়াই দৌড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেল, "আমাকে মাপ করবেন! এসব ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না ; আপনি নিজেই সব ঠিক করে নিন!"

কিন্তু, ঠিক করিয়া লওয়া মুখে বলিতে যতটা সহজ, কাজে ততটা করিয়া ওঠা যায় না—বিশেষ করিয়া সময়ানুবর্ত্তিতা স্বয়ং যখন বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করিয়াও নীলের স্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। এটা ওটা অনেক কিছুই করিতে গেল, কিন্তু ব্যাপারের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটান গেল না। বাড়ীতে সে উপস্থিত থাকুক অথবা বাড়ীর বাহিরেই যাক ভূতগ্রস্ত ঘড়ীগুলির চলার আর কোন বিরাম থাকিত না। ঠাকুর দেবতাদের নামে কত প্রার্থনা, কত মানত করা হইল, কিছুই ফল পাওয়া গেল না—ঘড়ীগুলি নিজেদের সঙ্গীতে নিজেরাই মাতিয়া মহা আনন্দে পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই বিধবা মহিলাটির নাকালের আর বাকি কিছুই রহিল না। তুক্‌তাক্‌ অনেক কিছুই ইতিমধ্যে সে করাইল, প্রবেশপথের মাথায় মাথায় ক্রুশ আঁকিয়া দিল এবং আরও কত কি যে করিল তাহার আর ইয়ত্তা নেই। অবশেষে ব্যাপার এতটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল যে, সে বাড়ীতে বাস করাই একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিল—দিনে রাতে সর্ব্বক্ষণই ঘড়ীগুলি সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড করিয়া ঘণ্টায় পৌঁছাইয়া বিকট কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি তুলিয়া আপনাদের তালেই চলিয়া যাইতে লাগিল।

কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের লোকেও ব্যাপারটি বুঝিয়া লইল—নীল মারা গেলেও পূর্ব্বের মত আজিও সে তাহার ঘড়ীগুলির পরিচর্য্যা সমানভাবেই করিয়া যাইতেছে! এই রটনার জন্য নীলের স্ত্রীরও দোষ বড় কম ছিল না, কারণ এখান সেখান হইতে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়া বেড়াইবার কালে সে-ই নীলের নামে এই অপবাদ রটাইয়াছে। সে বলিয়া বেড়াইয়াছে যে, তাহার স্বামীকে সে সারা রাত হুটোপাটি করিয়া বেড়াইতে দেখে, ঘড়ীর কাঁটা লইয়া অথবা পেণ্ডুলাম লইয়া নাড়াচাড়া করিতে দেখে—দিনে রাতে কোন সময়েই তাহার উৎপাতে এতটুকু শান্তি পাইবার যো নাই। ঘরের দরজা অতর্কিতে খুলিয়া বা বন্ধ হইয়া যাওয়া, সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ, মেঝেতে অশরীরীর পদধ্বনি নিয়তই তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছে। চাবি লইয়া নীল নাকি প্রতিদিনই ঘড়ীতে দম দিতে আসে, নিজকর্ণে সে শুনিয়াছে। ভয়ে সে ঘড়ীগুলির মধ্যে মন্ত্রপূত পত্রপুষ্প রাখিয়া দিল, দরজার চৌকাঠের নীচে বাইবেল পুঁতিয়া রাখিল—কিন্তু ফল সেই যথাপূর্ব্বং।

কে একজন তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "আচ্ছা ঘড়ীগুলোতে তুমি নিজে কোনদিন দম দাওনি?"

কৈ না, সে তো কোনদিনই একাজ করে নাই।

"তাই বল! তাহলে এরকম হবে তো জানা কথাই! জানতে তো বাপু, ঘড়ীগুলোর ওপর তার টান কি রকম ছিল।"

এতদিনে নীলের স্ত্রীর হুঁস হইল, নীলের শেষ-অনুরোধের কথাটা এতদিনে তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেই রাত্রেই সে বাতি হাতে প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া সমস্ত ঘড়ীগুলিতে দম দিয়া আসিল—আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই রাত্র হইতেই গৃহে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। অবশ্য বাড়ী যে সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া গেল তা নয়, কারণ ইহার পরও "মোরা" ঘড়ীটায় একটা কিরূপ অদ্ভুত শব্দের সন্ধান পাওয়া গেল; ঘড়ীটা ঠিক করা অবশ্য বরাবরই একটু শক্ত ছিল—তাই, সেইটির উপর হইতে নীলের মায়া যে সহজে অপসারিত হইবার নয় এমনিতেই তো তাহা বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছুও ছিল না।

এতদ্ব্যতীত আর কিছুতেই নীলের কোন অস্তিত্ব তখনও বজায় ছিল বলিয়া মনে করার অবকাশ ছিল না। অনেক কাল পর বিধবাটির মৃত্যুর কয়েকটা দিন মাত্র পূর্ব্বে "মোরা" ঘড়ীটা নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। ক্রেতা সেটি হাতে পাইয়াই স্থির জানিয়াছিল যে, আসলে সে পাংচুয়াল নীলকেই কিনিয়া লইল। সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, নীল ঘড়ীটার ভিতর দাঁড়াইয়া থাকে এবং একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এবং কোথাও কোন গোলমাল হইলেই একটা হাতুড়ী ঠুকিয়া যায়; আর এমনি তাজ্জব ব্যাপার যে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গলদ আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়।

দীর্ঘকাল এইভাবে চলার পর 'মোরা' সত্যই বড় বেয়াড়া হইয়া উঠিল, সুতরাং ঘড়ীটাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা ছাড়া তাহার মালিকদের পরিত্রাণের আর কোন পথ রহিল না।

ইহার পর হইতেই, এইরূপ প্রবাদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, পাংচুয়াল নীল প্রতি রাত্রেই তাহার কবর হইতে বাহির হইয়া ঘড়ীর কবর পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, কারণ কোন্ কবরটায় সে শুইয়া কাটাইবে, ইহা ঠিক করা তাহার কাছে এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।*

*নরওয়ের লেখক গ্রেব্রিয়েল স্কটের গল্পের অনুবাদ

# আসাম অভিমুখে

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার এম এস-সি

ইং ১৯৩৮ সাল। পূজার ছুটি এলো। মনে করলাম, আসাম অভিমুখে যাত্রা করি। বাঙলা ও বাঙলার প্রতিবেশী দেশ ও প্রদেশগুলির প্রতিঅংশের সম্যক জ্ঞান বাঙলা ভাষায় লাভ ও প্রচার করা যায় কি না, ইহার প্রতি আমাদের বিশেষ ঝোঁক দেওয়া উচিত। এই সব জ্ঞান একদিকে যেমন স্থানীয় লোকের প্রয়োজন মিটাবে, অপরদিকে আবার ক্রমবর্দ্ধমান বাঙালী জীবনকেও সুগঠিত করতে সাহায্য করবে। জগত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আমাদের ও আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রাও পরিবর্ত্তিত হবে। যুগধর্ম্ম পালনে নিজেদের প্রতি আমাদের যেমন কর্ত্তব্য আছে, প্রতিবেশীদের উন্নতিতেও সহযোগিতা করা আমাদের তেমনি কর্ত্তব্য।

এই সব কর্ত্তব্য পালনের পথে ভৌগোলিক জ্ঞানের অনুশীলনই গোড়ার কথা। নিজেদের ও প্রতিবেশীদের প্রতি ভূখণ্ডের সম্যক্ পরিচয়, তার কৃষি, শিল্প, বন, জলজ ও ভূগর্ভস্থ পণ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের চাই, যদি জগতের প্রগতির সহিত চলবার দাবী আমরা রাখি। বাঙালীর একাংশ, যে অংশে বিধি আমাদের ফেলেছেন, সে অংশ ভবিষ্যতে বাঁচবে কি না, এ স্বপ্ন অনেককে আতঙ্কিত করেছে। এই আতঙ্কের সমাধান কোন পথে? আমাদের ধারণা—আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তৃত জনসমাজ তাহার প্রকৃত সেবা ও আমাদের চারিপার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে এবং অধঃস্তলে যে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, তাহার সম্যক ব্যবহারই আমাদিগকে জীবন যুদ্ধে জয়ী করবে। শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সেবা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের পথেই বুদ্ধিজীবী বাঙালী তার বাঁচবার পথ করে নেবে।

কিন্তু নিরস ভূখণ্ডের আলোচনা সরস হয়ে বাঙালীর কাছে কিভাবে উপস্থিত হবে। ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের খুটিনাটি তথ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ বিরাট বাঙলা ভূখণ্ডের অঙ্গীভূত তথ্যরূপে প্রচারিত হলে পাঠকের স্মৃতিপথে সহজেই অঙ্কিত থাকে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহলী জ্ঞান এবং আমাদের রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন এই সব নিরস তথ্যাবলীকেও আদরণীয় করবে। এত সব সাত পাঁচ ভেবে আমার ভ্রমণ কাহিনী বাঙলা দেশের কথা থেকেই আরম্ভ করবো। ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করি। সেবার বর্ষায় মধ্য-বাঙলা ভেসে গিয়েছিল। আমাদের রেল গাড়ী দুধারে জলমগ্ন মাঠের মধ্যদিয়া এসে মাজদিয়ায় থামল। আমি এখানে নেমে একটি আধুনিক কৃষিক্ষেত্র দেখতে রওনা হলাম।

প্রাচীনকালের লাট ও কঙ্কদ্বীপের গৌরবময় যুগে ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপাদিত্য" নাটকে আছে যে, ইছামতী নদী বহে এতদঅঞ্চলের বাণিজ্য ও রণপোতবাহিনী সেকালে যাতায়াত করত। সেদিন আজ চলে গিয়েছে। আজ আমরা ইছামতীতে ময়ূরপঙ্খী নৌকা দেখলাম না। পেলাম ডিঙ্গি। ডিঙ্গিতে চড়লাম। বন্যা তখনো নামে নাই। মাঠ, ঘাট, বাট, বাগবাগিচা সবার উপরে জল। আমাদের ডিঙ্গি বাঁশ ও আমবাগানের ফাঁকে ফাঁকে এরণ্ড বেড়া ভেদ করে চলতে লাগল। ক্রমে আমরা ইছামতীর উপরে এলাম। জলস্রোত মাঠের উপরে বুঝা যায় না। ইছামতীর দুপাড়ে কত কাশফুল, উলুবন, কর্ণফুল জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় কৃষকরা ভিন্ন ভিন্ন খড়জাতীয় তৃণের ঐ সব নাম বললো। সেই সব খড়ের শাদা শীষের মধ্যে স্থানে স্থানে সারি বেঁধে কত বাবলা গাছ। বাবলার ডাল জড়িয়ে কত লতাবল্লরী। জলস্রোত তাদের ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাবলার শক্ত ডালগুলি ভাঙ্গে নি বা কঠিন তন্তুর বল্লরীও ছিঁড়ে যায় নি। ওদিকে আকাশ থেকে ক্রমে সন্ধ্যা ক্রমে শারদ জ্যোৎস্না নেমে এল। ডিঙ্গি আমাদের ছুটে চলেছে অনুকূল স্রোতের ভরে। হঠাৎ ডিঙ্গির নিম্নে কি একটা আবর্ত্তের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। মাঝি বলল, ঐটা চিতল মাছের 'ঘাই'। তাই ত ঐ আবর্ত্তে, ঐ ঘাই ক্ষণে ক্ষণে দূরে ও নিকটে নদীর বুক চিরে উঠছে। তার মধ্যে গজাড়, শোল, চিতল, আড়, রুই, কাতলা পিছার বাড়ি দিয়ে চকিতে তলিয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে পাড়ে মাছ ধরবার জন্য, কত চারো, বুত্তি, বাঁওড়, খাঁচা, জিয়ানা পাতা রয়েছে। কৃষকরা সমবার প্রথায় কেহ বাঁশ দিয়ে, কেহ দড়ি, কেহবা শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সেগুলি পেতেছে। সেগুলি ঝেড়ে সকালে বিকালে পাবে ধামা, কাঠা পুরে কত কত মাছ। তখন তাদের কত আনন্দ!

ক্রমে জ্যোৎস্না নিবে গেল। আমরাও ইছামতী ছেড়ে বাবলাকুঞ্জের পাতলা অন্ধকার, তারপর অতিবৃদ্ধ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আমগাছগুলির তলার কালো জমাট অন্ধকারের ভিতর ডিঙ্গি ভিড়ালাম। অবশেষে আমরা আমাদের গন্তব্য এক চাষের খামারে উপনীত হলাম। পুরাতন লাঙ্গল গরু, মহিষ ও আধুনিক ডিসেলইঞ্জিন, পাম্প প্রভৃতির সহযোগে এই প্রতিষ্ঠান এখন কাজ চালাচ্ছে।

চা-পান, ধূম-পান, খাওয়া-দাওয়া একে একে আমাদের সারা হলো। আবার মধ্য রাত্রের প্রাক্কালে আমাদের ডিঙ্গি ভাসল বাইচ খেলতে। দুকূল ছাপিয়ে ইছামতী চলেছে সাগর-মুখে রায়মঙ্গল খাঁড়িতে। বট, বকুল, তমাল তলার অন্ধকারে শ্মশানের নিস্তব্ধতায় ইছামতী মাঝে মাঝে তার দুকূল হারিয়ে ফেলেছে। খানিক বহে গিয়ে আমরা নদী ছেড়ে এক জলমগ্ন মাঠ, তারপর এক বিলে প্রবেশ করলাম। সেই প্লাবিত মাঠ পার হবার সময় আমাদের ডিঙ্গি ভূমি স্পর্শে আটকিয়ে গেল। যেদিকে জলস্রোতের কল কল ধ্বনি নাই, সেদিকে আমরা সবাই নেমে ডিঙ্গি টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলাম। কোমর জলে পুনরায় ডিঙ্গি ভাসল। তারপর বিলের কলমীলতা, কুমুদলতার ভাসমান ভেলা ভেদ করে ডিঙ্গি চলল। মাঝি বৈঠা চালাতে চালাতে এক হাতে ডিজলণ্ঠন প্রসারিত করতে লাগল। আলো দেখে চ্যাং ও শোল মাছ ছুটে জলের উপরে এসে স্তব্ধ হয়ে ভেসে থাকতে লাগল, সেই অবসরে আর এক দাঁড়ি কুঁচ ছুঁড়ে সেগুলি গাঁথতে লাগল। এমনিভাবে খানিক রাত কাটিয়ে আমরা আবার আমাদের খামার বাড়ীতে ফিরে এলাম। মালদহ হতে ডিব্রুগড়, মেদিনীপুর হতে চট্টগ্রাম ও কাছাড় জেলা পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলে সর্ব্বত্র বর্ষার পরে শীতের প্রাক্কালে এই একই দৃশ্য, একই প্রকারে কৃষকদের জীবনযাত্রা ও আনন্দলাভ। ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয়, যাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় ভূখণ্ডগুলির ধান্যক্ষেত্র শোভিত নিম্ন নদী উপত্যকাগুলিতে এই একই দৃশ্য বর্ষার পরে হয়। কেবল উপত্যকাগুলির মাঝে মাঝে সারি সারি পাহাড় আছে। যেমন, কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যে আছে।

নূতন পুরাতন প্রথার মিলিত এই খামারে ২।৩ দিন কাটিয়ে আবার রেলে চাপলাম। ইছামতী, কুমার, পদ্মা, বড়াল, আত্রাই প্রভৃতি নদী প্লাবিত অঞ্চলে ২।১ বেলার জন্য যাত্রা স্থগিত করতে করতে অতিক্রম করলাম। এই অঞ্চল বাঙলার ভৌগোলিক কেন্দ্র। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে ইহা কৃষ্টি কেন্দ্র ছিল। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ক্ষয়িষ্ণু। এই নদীপথগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান নাই। অবৈজ্ঞানিক নীতিতে রেলপথ বিস্তারই এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আর কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টের উচ্চাভিলাষই হয়তো এজন্য কতকটা দায়ী। তাঁরা হুগলী খাঁড়িকে (যে পথে বর্ত্তমানে ভাগীরথী প্রবাহিত) বিলাতের বড় বড় বন্দর শোভিত মাথাবদ্ধ খাঁড়ি (headless estuary) রূপে পরিণত করবার জন্যই বরাবর ভারতের পূর্ত্তবিভাগকে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন দলিলপত্র ঘাঁটলে ইহার সন্ধান হয়তো মিলতে পারে।

যা হো'ক এতদঞ্চলের ম্যালেরিয়া নিবারণের একটা স্বরূপ

ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার আভাস আমরা দিতে পারি। মৎস্যের বিশেষত কই মৎস্যের এনোফিলিস ডিম ভক্ষণের পটুতা আছে। কুষ্টিয়া হতে বর্ষাকালে গড়ুই বা মধুমতী নদীতে ধৃত অসংখ্য ডিম পোনা কলকাতায় রপ্তানি হয়। লেখক ও আরও কয়েকজনের চেষ্টায় কুমার নদেও ঐ ডিম-পোনা ধরা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। গবর্ণমেণ্টের উচিত, জনসাধারণের পুকুর ও বিল হতে ডিমভরা নানাবিধ মৎস্য ক্রয়পূর্ব্বক নদীর স্রোতে উজানে ছাড়িয়া দেওয়া। তাহা হলে ঐ মৎস্যজাত কতক ডিম-পোনা নদীর সন্নিকটস্থ রেল ষ্টেশন ও মোটর রোড প্রান্তে ধৃত হয়ে মধ্য বাঙলার সর্ব্বত্র রপ্তানি হবে। আর কতক বর্ষার প্লাবনের সঙ্গে মধ্য বাঙলার খাল, বিল, ডোবা প্রভৃতিতেও ছড়িয়ে পড়বে। এই সব ডিম-পোনা দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের পুকুর, ডোবা প্রভৃতিতে মৎস্যের চাষ করবে; ঐসব বদ্ধ জলাশয়গুলি সুসংস্কৃত হবে এবং মশক ধ্বংসও হবে।

ক্রমে আমরা পার্ব্বতীপুর ছাড়িয়ে গেলাম। প্রাচীন বড় বা বোডো (Bodo) জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমাদের রেল ছুটে চলল। নেপালস্থিত প্রাচীন কিরাত খণ্ড, সিকিম, মোরঙ (দার্জ্জিলিং তরাই), ভুটান, কোচবিহার ও সমুদয় আসাম খণ্ডে এককালে নানা শাখার 'বড' জাতির প্রাধান্য ছিল। ইহারা তিব্বত, বর্ম্মীদের জ্ঞাতি। ইহাদের মধ্যে মধ্যে উত্তর ভারতীয়গণের উপনিবেশ ছিল। তারও পূর্ব্বে ছোটনাগপুর হতে বাঙলা, খাসিয়া পাহাড়, ব্রহ্ম প্রভৃতি ব্যাপী মালয় পর্য্যন্ত অষ্ট্রিক (দক্ষিণী) জাতি বিস্তৃত ছিল। মুণ্ডা, খাসি প্রভৃতি ভাষা হিসাবে এই অষ্ট্রিক জাতির শাখা-প্রশাখা। কালক্রমে এই তিন প্রধান জাতির কৃষ্টি ও রক্ত সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবীরূপেই সংশোধিত হয়েছে। মগর, লিম্বু, লেপচা, কোচ, মেচ, রাজবংশী, গারো, রাভা, কাছাড়ি, ত্রিপুরা, লুসাই, চাকমা প্রভৃতি বর্ত্তমান উপজাতিগুলি উপরোক্ত 'বড' জাতির বর্ত্তমান শাখা-প্রশাখা।

পার্ব্বতীপুর ছেড়ে আমরা একটি ক্ষীণ নালা পার হলাম। উহাই করতোয়া। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যুয়েন চঙ উহাকে বর্ত্তমানকালের পদ্মার মত এক বিশাল নদীরূপে দেখেছিলেন। ক্রমে ক্রমে আমরা তিস্তা, ধরলা, সঙ্কোশ ও দুধকুমার পার হয়ে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশে প্রবেশ করলাম। তিস্তা কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয় হতে নির্গত। চুম্বি, তোর্সা, জলঢক্কা ও ধরলা একই নদী; তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা ও ভুটান পাহাড় ভেদ করে বহে এসেছে। সঙ্কোশ ও দুধকুমার ভুটান হতে নির্গত। সপ্তম শতাব্দীতে হয়তো তিস্তা ও জলঢক্কার মিলিত ধারা করতোয়া পথে প্রবাহিত হত। ভাস্কর বর্ম্মার বিশাল নৌবাহিনী এই সব নদনদী বাহিয়াই রাজমহালে হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাতে দ্রুতগতিতে উপনীত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বামনডাঙ্গা ও চৌধুরাণীর হাটের ডাকাতে রাণীর গল্প নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "দেবী চৌধুরাণী" পরিকল্পনা করেছিলেন। দেবী চৌধুরাণীর ছিপ, বজরা এই সব নদীপথেই ছুটাছুটি করত।

বেলা দশটার সময় ধুবড়ীতে নেমে এক বিশিষ্ট রায় বাহাদুরের বাড়ীতে উপনীত হলাম। গারো পাহাড়ের প্রধান শহর "তুরা" আমার গন্তব্যস্থল শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"দার্জ্জিলিং, শিলং ছেড়ে কিসের সন্ধানে এই গারো পাহাড়ে যাচ্ছেন?" বৃহত্তর বঙ্গ সম্বন্ধে আলাপ হল। আমি অভিমত দিলাম, জবরদস্তিমূলক বৃহত্তর বঙ্গ স্থাপনের আদর্শ আমাকে উৎসাহিত করে না। বৃহত্তর পূর্ব্ব ভারতের কৃষ্টি ও অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের একটা সহযোগিতা ছিল। আবার সেই সম্বন্ধের পুনরুদ্ধারের আদর্শই আমাকে উৎসাহিত করে। নেপাল, তিব্বত, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সিকিম, ভুটান, আসাম, মণিপুর, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয়, যব, বলী ইত্যাদিই আইন আকবরী যুগে পূর্ব্বভারত বলে পরিগণিত হত। বর্ত্তমান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানমতে এই অংশের জনসাধারণ মঙ্গোলীয়, মুণ্ডা-খেমর ও উত্তর ভারতীয়গণের রক্ত সংমিশ্রণে গঠিত।

যা'ক আসামের কথাতেই ফিরে আসি। আসামের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ক্রোড়ে ভুটান, দফলা, মিরি ও আবর রাজ্য। মধ্যাংশে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও উত্তর কাছাড়ের গিরিমালা। এই গিরিমালা ফুলের মালার মত স্তবকে স্তবকে গ্রথিত। সমগ্র মালাটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। আর প্রতি স্তবক উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এক একটি গিরিশ্রেণী দ্বারা গঠিত। মধ্য আসামের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং দক্ষিণে সুরমা উপত্যকা। ঐ গিরিমালার পূর্ব্ব প্রান্ত নাগা ও মণিপুর পাহাড়ে গিয়ে মিশিয়াছে। নাগা ও মণিপুরের শৈলশ্রেণী আরাকান যোমার সগোত্র; উত্তর-দক্ষিণে শত শত মাইল ব্যাপী লম্বা এবং লম্বভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর কাছাড় ও সুরমা উপত্যকার পূর্ব্বাংশে প্রাচীররূপে বিস্তৃত। আবার সুরমা উপত্যকার দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়ের শৈলশ্রেণী সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা ধুবড়ীর কথা আরম্ভ করেছিলাম। ধুবড়ী গোয়ালপাড়া জেলার প্রধান শহর এবং সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র ইহার তিনদিকে প্রবাহিত। সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা ৮৮২০০০, তন্মধ্যে বঙ্গভাষী ৪৭৬,০০০ এবং অসমিয়া ভাষী ১৬১০০০। ময়মনসিংহ জেলা হতে দলে দলে মুসলমান চাষী ব্রহ্মপুত্রবাহী জাহাজ ও নৌকা বহিয়া এবং পার্ব্বত্য কাছাড়ের রেলপথে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের চরে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং নওগাঁ জেলায় মোট মুসলমান সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৭০০০, ২৪০০০০, ১৭৭০০০। এজন্য অসমিয়া ভাষীগণ আতঙ্কিত, ভবিষ্যতে হয়তো তাহাদের ভাষা, কৃষ্টি ও জাতি বিপন্ন ও ধ্বংস হইতে পারে।

ধুবড়ী হতে ব্রহ্মপুত্রের দুই তীর বহে দুটি মোটর রাস্তা প্রসারিত। প্রথমটি তেজপুর পর্য্যন্ত উত্তর তীর ভাগে এবং দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্রের পরপারান্ত ফকিরগঞ্জ হতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত দক্ষিণ তীর ভাগ সুবিস্তৃত। ফকিরগঞ্জ থেকে একটি কাঁচা-পাকা রাস্তা রোয়ামারি, তুরা হয়ে ময়মনসিংহ সীমানাস্থিত ডালু পর্য্যন্ত প্রসারিত। রোয়ামারিতে ব্রহ্মপুত্রবাহী ডেসপাস ষ্টীমার থামে। রোয়ামারি হতে ডালু পর্য্যন্ত দূরত্ব ৭৩ মাইল। রোয়ামারি হতে তুরা পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস নবেম্বর হতে বর্ষানামা পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। সেই সময়ে গৌহাটি হতে আরও ২।৩টি মোটর সার্ভিস খণ্ড খণ্ডভাবে গোয়ালপাড়া ও ফকিরগঞ্জ হয়ে তুরায় পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে পূজার ছুটি। বর্ষার আধিক্য হেতু আজও তুরায় যাবার মোটর সার্ভিস খুলে নাই। এখন তুরায় যেতে হলে আমাকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে করে ৩০ মাইল ব্রহ্মপুত্র বহে ভাটিপথে রোয়ামারি যেতে হবে। তারপর গো-যান, মোটর বা হাঁটা যা কপালে আছে। এই ছুটির মধ্যে আমাকে অন্তত শিলং, হাফলং হয়ে মণিপুর পর্য্যন্ত যেতে হবে। সময়ের অভাব। সুতরাং এযাত্রায় তুরায় যাবার আশা ছেড়ে দিতে হল।

অতঃপর চটপট রেলপথে গৌহাটি উপস্থিত হলাম। গৌহাটির অপর নাম গুবাহাটি। গৌহাটি প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপ রাজ্যের রাজধানী। প্রাগজ্যোতিষ ও উত্তর বাঙলা এবং ত্রিহুতের মিলিত ভূখণ্ডের দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন ভাস্কর বর্ম্মা (৭ম শতাব্দী), দেব পাল (৯ম শতাব্দী) এবং নরনারায়ণ ও চিলা রায় (১৭শ শতাব্দী)। আসামে চিলা রায়ের উৎসব পালিত হয়। বাঙলায় হয় না কেন? উত্তর বঙ্গ ও কোচবিহারের ক্ষত্রিয়গণ উহাকে দিব্য-উৎসবের মত এক নিখিল বঙ্গীয় জাতীয় উৎসবে পরিণত করবার জন্য অগ্রণী হবেন কি?

# নন্দা

(উপন্যাস)

অমিয়া সেন

(৫)

প্রবীরের বিবাহ হইয়া গেল।

বউ যামিনীর ঠিক মনোমত না হইলেও একেবারে অমনোনীতও হইল না। প্রমীলা চলনসই সুন্দরী। নন্দা অসুন্দর না হইলেও বর্ণপ্রভায় প্রমীলার কাছে ম্লান হইয়া গেল। যামিনীর এইটুকুই সান্ত্বনা যে, যাহাই হউক এ বউ তবু সুন্দরী হইয়াছে।

প্রবীরের বিবাহ হইয়া যাইতেই খবর আসিল, যামিনীর বোনঝির বিবাহ আসন্ন। যামিনীর ছোট বোন দামিনী বড় চাকরের স্ত্রী, কলিকাতায় থাকেন। কন্যার বিবাহোপলক্ষে ভাগিনীকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন। যামিনী চিরকালই পাড়াগাঁয়ে মানুষ, বিবাহের পরে ও বর্ত্তমানে পাড়াগাঁয়েই রহিয়াছেন। কাজেই অনেক দিন পরে একটু মুখ বদলাইবার সম্ভাবনায় সহসা এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে, খরচের কথাটা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া বসিলেন।

কিন্তু দেবনারায়ণ বিস্মৃত হইলেন না, যামিনীকে সে কথা বলিতেই যামিনীর জলন্ত উৎসাহ সহসা নিবিয়া আসিবার উপক্রম করিল। চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, কি করা যায়! দামিনীর এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, বোনদের মধ্যে তো এক আমিই বেঁচে, না গেলে যে নিতান্তই খারাপ দেখায়।"

দেবনারায়ণ কহিলেন, "সে তো আমিও বুঝি, কিন্তু ন্যায় বল, অন্যায় বল, সবই নির্ভর করছে আমাদের সংগতির উপর। প্রবীরের বিয়েতে পণ কিছু নিলাম বটে, কিন্তু লাভ তো তাতে হলই না, বরঞ্চ লোকসান। খরচের মাত্রা তুমি এত বাড়িয়ে দিলে যে, শেষে ছেলের বিয়েতেও কিনা ধার করতে হল!"

যামিনী কোনদিনই নিজের বুদ্ধির প্রতিকূল সমালোচনা সহিতে পারিতেন না, স্বামীর কথায় তাই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, "আমি খরচের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছি? যা ন্যায্য মাত্র তাই করেছি। তুমি কেন হিসেব করে চললে না?"

কথাটা ঠিক; দেবনারায়ণ চুপ করিয়া রহিলেন। খরচের বিষয়ে চিরদিনই বে-হিসাবী হইয়া চলিতে চলিতে আজ অভাবের দিনেও সে স্বভাব বদলাইতে পারেন নাই। তবু, তিনি নিজে যাও বা ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করেন যামিনীর জন্য সে চেষ্টা তাঁহার পণ্ড হইয়া যায়। অথচ যামিনীকে সেজন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারেন না। এইখানে তাঁর একটা ভারী দুর্ব্বলতা আছে।

যামিনী মুখ ভার করিয়া কহিলেন, "চিরকালই দেখে এলাম, তোমাদের এই হা পিত্যেশ ভাব, কোনদিন মনের সাধ মিটিয়ে টাকা পয়সা খরচ করে কিছু করতে পারলাম না। পোড়া সংসারের দিকে চেয়ে সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন দিয়েছি। কোনদিনই তো মুখফুটে কিছু বলি নি! আজ এই একমাত্র ছোট বোনটির প্রথম শুভ কাজে না গেলে হয়তো সে চোখের জল ফেলবে।"

যামিনী চুপ করিলেন, বধূ বয়স হইতে দেবনারায়ণের অংশের তহবিল তিনি নিজের ইচ্ছা মতই খরচ করিয়াছেন আজ সে তহবিল সংক্ষিপ্ত হইতে হইতে এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, জমার খাতায় শূন্য ছাড়া আজকাল আর কিছুই জমা থাকে না। সুবীর যাহা দেয়, চারিদিকের অসংখ্য প্রয়োজন আর অভাবের ছিদ্র তা দিয়া ভরানো যায় না। তা ভরানো যাক আর নাই যাক, যামিনীর কোন ইচ্ছা এখনও মনের গহনে চাপা থাকে না,যখন যে ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে, ধার কর্জ্জ করিয়া বা যেমন করিয়াই হউক তিনি তা পূর্ণ করিবেনই। এজন্য সংসারের অভাব-অভিযোগের দিকে বা নির্বাসিতপ্রায় সুবীরের দিকেও তিনি ফিরিয়া তাকান না। পুর্ব্বে তাঁর এই খেয়ালের বোঝা দেবনারায়ণ একাই বহিয়াছেন। এখন সুবীরও মুখ বুজিয়া এই বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, আনন্দ ও নন্দার যৌবনের শত আকাঙ্ক্ষাকে সে এই কারণেই বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথম হইতে দেবনারায়ণ যদি একটু হিসাব করিয়া চলিতেন, তবে হয়তো আজ সংসারের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত। হয়তো আজ সংসারের শত অভাবের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃকৃত ঋণের বোঝাও সুবীরের স্কন্ধে চাপিয়া বসিত না।

যামিনীকে মুখ ভার করিতে দেখিয়া দেবনারায়ণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তা বেশ যাও না, যেমন ক'রে হোক চ'লে যাবে। সঙ্গে কাকে কাকে নেবে?"

যামিনীর মুখ প্রফুল্ল হইল, কহিলেন, "তা কি আর আমি না বুঝেই বলছি? টাকা পয়সার জন্য তেমন ঠেকবে না, এ তুমি দেখে নিও। সুবীর তো কলকাতায় আছে, সে যেমন ক'রেই হ'ক চালিয়ে দেবেই। দামিনী অবশ্য সবাইকেই যেতে লিখেছে, কিন্তু সকলেরই তো আর যাওয়া চলে না। তুমি কি বল?"

দেবনারায়ণ কহিলেন, "আমি আর কি বলব, বড় বউমা, অমিতা আর তুমি যাও না।"

যামিনী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "উঁ হুঁ, তা হয় না, বড় বউমাকে দামিনী দেখেছে, ছোট বউমাকে বরঞ্চ দেখেনি। ছোট বউমা, অমিতা, আমি আর প্রবীর যাই।"

দেবনারায়ণ কহিলেন, " তা-ই যাও, আমি আর বড় বউমা বাড়িতে থাকি। বেশী দিনের ব্যাপার তো নয়।"

যামিনীর মুখ অতিরিক্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "না তা তো নয়ই।"

নন্দা প্রথম যখন শুনিল, যামিনী কলিকাতা যাইবেন, তখন তাহার হৃদয়েও অকস্মাৎ একটি পুলকের ঢেউ খেলিয়া গেল, মনে তার কি করিয়া জানি না বিশ্বাস হইয়াছিল যে, যামিনী তাহাকেও সঙ্গে লইবেন। দুই বৎসর সংসারের চাকায় পড়িয়া যে হতভাগ্য নবীন দম্পতি পরস্পরের দর্শন মাত্রেও বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাদের মিলনের এই মহা-সুযোগটুকু যামিনী নিশ্চয়ই তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবে।

সুবীরের বিস্মৃতপ্রায় মুখখানি মনে পড়িয়া বহু দিন পরে নন্দা আজ বড় চঞ্চল, বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া সুবীরের মুখখানা অপ্রত্যাশিত আনন্দে কি রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, কল্পনা করিতেও নন্দা আত্মহারা হইয়া গেল। যদি যাওয়া হয়, তবে মাঝে আর সাতটি দিন। দীর্ঘ দুই বৎসর কাটাইয়াও আজ নন্দার মনে হইল, সাতটি দিন বড় দীর্ঘ সময়।

নন্দা যখন আপনার হৃদয়ের সুখ দুঃখ লইয়া আপনার মনে এমনি মাতামাতি করিতেছিল, এমন সময় প্রমীলা আসিয়া হাসিমুখে কহিল, "দিদি শুনেছ?"

নন্দা মুখ তুলিয়া বলিল, "কি?"

প্রমীলা একখানা আসন টানিয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "আমরা কলকাতা যাব।"

নন্দার বুকটা ধক করিয়া উঠিল। প্রমীলা যাইবে? তবে বুঝি আর তাহার যাওয়া হইল না। ভয় ও উৎকণ্ঠাকে অতি কষ্টে বুকে চাপিয়া নন্দা কহিল, "কে কে যাবে?"

প্রমীলা হাসিমুখে বলিল, "মা, আমি, ঠাকুরঝি, আর—"

"ঠাকুরপো, নয়?"

প্রমীলা হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নন্দা আর কথা বলিতে পারিল না। প্রবীরের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া সে সর্ব্বাগ্রে নন্দাকেই তাহা দিতে আসিয়াছিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "কিন্তু দিদি, তুমি গেলে বেশ হ'ত। সব একসঙ্গে মিলে যেতে কেমন আমোদ লাগে, নয়?"

নন্দা তখন ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সমস্ত মুখে যেন তার একবিন্দু রক্ত ছিল না। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার দেহ মনের ভিতর দিয়া যেন একটি ঝড় বহিয়া গেছে। যে আশাটিকে একান্তচিত্তে সে মনের মধ্যে এই কয়দিন ধরিয়া লালন করিতেছিল, সেই আশা যে এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা করে নাই। এই কয়দিনের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনায় অকস্মাৎ গভীর অবসাদ আসিয়া তাহার সমস্ত দেহ মন ও চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

প্রমীলা নন্দার স্তব্ধভাব দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিত পরে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। এ বাড়িতে আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাহার ও নন্দার প্রতি যামিনীর ব্যবহারের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছিল।

কিভাবে এবং কখন যে নন্দা রান্না শেষ করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া সব কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল সে জ্ঞান বোধ হয় তাহার নিজেরই ছিল না। রাত্রি তখন প্রায় একটা। নিজের ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়া নন্দা দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর একবার পিতৃদত্ত ড্রেসিং টেবিলটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পরে সে আজ ভাল করিয়া নিজের সর্ব্ব অবয়বের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিল, আয়ত চোখ দুটির আগের সে সৌন্দর্য্য আর নাই। চোখের নীচে পুরু কালির দাগ, চোখ বসিয়া গিয়াছে। মুখের ঔজ্জ্বল্য নিবিয়া গিয়াছে, গলায় হাড় দুইটা স্পষ্ট প্রকাশমান।

নন্দার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল। ছি ছি, এ কী চেহারা হইয়াছে তাহার! তাহার চোখের সে সৌন্দর্য্য, সমস্ত মুখের সে কমনীয়তা কোথায় গেল আজ! শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া নন্দা অধীর আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। যাহার অফুরন্ত আদর, অক্ষয় ভালবাসা তাহার সমস্ত দেহ মনকে অনন্ত সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিতে পারিত, সে আজ কোথায়? উঃ, কতদিন! কতদিন নন্দা তাহার পরম প্রিয়কে দেখিতে পায় নাই। রোদনবিবশ অন্তর সেই অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু মেলিয়া যেন তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। —এতদিন তুমি বাঁচিয়া আছ কি করিয়া! যাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে তোমার ধরণী আঁধার হইয়া যাইত, সেই প্রাণের বঁধুকে না দেখিয়া তুমি কেমন করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আছ, ছি!

নন্দার চোখের জল শুখাইয়া উঠিল, একটা বেদনা মিশ্রিত অক্ষম ক্রোধে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল। সমস্ত সংসার তথা পরিজনদের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় তার মন নিমেষে বিমুখ হইয়া বসিল।—তার জীবনের সমস্ত শান্তি ইহারা দস্যুর মত কাড়িয়া নিতেছে, তার জীবনের সমস্ত মহৎ সম্ভাবনায় ইহারা কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে।

আর সুবীর! অভিমানে নন্দার আয়ত নয়ন দু'টি আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সব, ইহারা সবাই সমান, কেহই তাহার আপনার নয়। তার বেদনা কাহারও মনে একবিন্দুও সমবেদনার উদ্রেক করে না, অবহেলা, শুধু অবহেলা। এই জীবনব্যাপী অবহেলা সহাইতেই কি তাহাকে এখানে আনা হইয়াছিল! বিছানার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নন্দা আপনার প্রবল রোদনাবেগকে চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

# হিন্দু সমাজের ব্যাধি

(২০)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

হিন্দু সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনকল্পে আমরা যে সব উপায়ের কথা আলোচনা করিয়াছি, প্রশ্ন হইতে পারে, সেগুলি কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব? সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন প্রধানত দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথমত রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এই কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইতে পারেন। এদেশে যখন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, তখন হিন্দু রাজারা সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রেই যে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেসব ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন না, সেখানেও সমাজপতিদের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা তাঁহারা পরোক্ষভাবে অনুমোদন ও সমর্থন করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন সমাজপতি। তাঁহারা সমাজ শাসনের জন্য যে সব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, তাহা রাজার অনুমোদন ও সমর্থন বলেই সমাজে প্রচলিত হইত। রাজা নিজে যদি কোন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে এই সমাজপতি ব্রাহ্মণগণেরই সহযোগিতা প্রয়োজন হইত। বৌদ্ধ যুগের প্লাবনে হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার অনেক ওলট-পালট হইয়াছিল। যে সব রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের উপর অনেক সময় প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে তাঁহারা একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। পক্ষান্তরে সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাও এই সময়ে হাল ছাড়েন নাই। সেই বৌদ্ধ প্লাবনের মধ্যেও তাঁহারা প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কতকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র যে বৌদ্ধযুগের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ যুগের অবসানে যখন হিন্দু ধর্ম্মের পুনর্জাগরণ হইল, তখন সমাজ শাসনের জন্য আবার নূতন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইল। হিন্দু রাজারা যে এই সময়ে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে উৎসাহ সহকারে যোগ দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে।

কিন্তু হিন্দু রাজত্বের অবসানে এদেশে যখন মুসলমান শাসন আরম্ভ হইল, তখন হইতেই রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দু সমাজের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইল। মুসলমান শাসকেরা দেশ শাসন করিতেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ও প্রচলিত অনুশাসন অনুসারে সমাজ শাসন করিতেন। প্রয়োজন হইলে নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া নূতন বিধান দিয়া তাঁহারাই সমাজ সংস্কার করিতেন। মুসলমান যুগে বাঙলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সংস্কারক বা স্মৃতিকাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন। মুসলমান যুগে হিন্দু সমাজের বন্ধন যখন শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, এমন কি কোন কোন দিক দিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইল, তখন স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনই যুগোপযোগী নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়া হিন্দু সমাজ বন্ধন অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসাধারণ মনীষাপ্রভাবে তৎকালীন হিন্দু সমাজ তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধান মানিয়া লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, গত চারিশত বৎসর কাল হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের ব্যবস্থাই অল্পাবিস্তর মানিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের সমাজ বিধান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিয়াই, আজকাল অনেকে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন, এমন কি বাঙলার হিন্দু সমাজের সর্ব্বপ্রকার দোষত্রুটির দায়িত্ব তাঁহার উপরেই চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সমালোচকেরা রঘুনন্দনের উপর ঘোর অবিচারই করিয়া থাকেন। রঘুনন্দনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু সমাজের অবস্থা জানা প্রয়োজন। কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, সমাজের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রঘুনন্দনের সমাজ ব্যবস্থার বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝা হইবে। তৎকালীন সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, মুসলমান যুগে হিন্দু সমাজের রক্ষণ ও সংস্কারের জন্য স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন যে বিরাট কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি যে অভ্রান্ত ছিলেন, অথবা তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থাই সুফল প্রসব করিয়াছে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার নিকট বাঙলার হিন্দু সমাজের ঋণ যে অপরিশোধ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুত, রাষ্ট্রের কোনরূপ সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে এবং হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেভাবে হিন্দু সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব কমই মিলে।

কিন্তু রঘুনন্দনের পর, তাঁহার তুল্য শক্তিশালী আর কোন স্মৃতিকার বাঙলা দেশে আবির্ভূত হন নাই। বাঙলার হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিও হ্রাস হইয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, রঘুনন্দন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা দেশের হিন্দু সমাজের জন্য যে সব বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখনও সেইগুলিই আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি। অথচ ইংরেজ শাসনের আমলে অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আমাদের জীবন-ধারা আমূল বদলাইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। অতএব চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত সেই সব প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা আর নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের দোহাই দিয়া, সনাতনী সাজিয়া যতই আমরা চীৎকার করি না কেন, বাস্তব সত্যকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না।

হিন্দু সমাজের ব্যাধির মূল এইখানে। প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার অপরিহার্য্য—আত্মরক্ষার জন্যই অপরিহার্য্য। কিন্তু এই সমাজ সংস্কার কোন্ শক্তিবলে সম্ভবপর হইবে? ব্রাহ্মণদের সেই পুরাতন পদমর্য্যাদা ও শক্তি আর নাই। তাঁহাদের মধ্যে রঘুনন্দনের মত প্রতিভাশালী মনীষীও আর দেখা যাইতেছে না। মুসলমান শাসকদের ন্যায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও আমাদের সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে তাঁহারা সম্মত নহেন। তৎসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; যথা—সতীদাহ প্রথা ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা নিবারণ, চড়ক গাছে ঝুলিয়া আত্মনিগ্রহের প্রথা নিবারণ ইত্যাদি। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সব ক্ষেত্রেই সাধারণ নৈতিক আদর্শ ও মানবিকতার দিক হইতেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও আন্দোলন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে সংস্কারপন্থীরা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব

গবর্ণমেণ্টের দরবারে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন; যথা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন এবং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় সিভিল বিবাহ আইন বিধিবন্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ডাঃ গৌড়ের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহ আইন এবং শ্রীযুত হরবিলাস শারদার চেষ্টায় বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন প্রভৃতিও বিধিবন্ধ হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করিলেও পরোক্ষভাবে এই সব সমাজ সংস্কারমূলক আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রাচীনপন্থী সনাতনী হিন্দুরা আইন দ্বারা এইরূপ সমাজ সংস্কারের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা বলেন, আমরা পরাধীন জাতি, দেশের শাসন ব্যাপার বিদেশী শাসকদের হাতে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সমাজের দিক দিয়া এখনও আমরা অনেকটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আছি। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার করিবার অস্ত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিই, তবে আমাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। যদি সমাজ সংস্কার করিতেই হয়, আমরা নিজেরাই করিব, তাহার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইব কেন?

প্রাচীনপন্থী সনাতনীদের এই যুক্তির মধ্যে কতকটা সত্য আছে, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। দেশ শাসনের দিক দিয়া আমরা আজও স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন পাই নাই সত্য, কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যেটুকু প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থা পরিষদে প্রেরিত দেশবাসীর প্রতিনিধিদের সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদেরও এরূপ অধিকার আছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু সমাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি কোন সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেন, তবে তাহার ফলে আমাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, এরূপ কথা বলা যায় না। প্রাচীনপন্থীরা ঐরূপ সংস্কার পছন্দ না করিতে পারেন, কিন্তু সমাজের অগ্রগামী সংস্কারপন্থীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হন, তবে প্রাচীনপন্থী সনাতনীদের উহাদের মত মানিয়া লইতেই হইবে।

ভারতের উন্নত দেশীয় হিন্দু রাজ্যসমূহে যে আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। বরোদা, মহীশূর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর, গণ্ডাল প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য এ বিষয়ে অগ্রণী। এই সব রাজ্যে প্রতিনিধি পরিষদ বা আইন পরিষদ আছে এবং রাজারা সাধারণত আইন পরিষদের মধ্য দিয়া সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্ত্তন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজা প্রতিনিধিদের উদ্যোগেও এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তন, বাল্য বিবাহ নিবারণ, পণপ্রথা নিবারণ এইভাবে আইন দ্বারা ঐ সব রাজ্যে করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ সর্ব্ববর্ণের হিন্দুদের মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়া যে আইন করিয়াছেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এইসব দেশীয় রাজ্যে হিন্দু সমাজ ঐরূপ সমাজ সংস্কারমূলক আইন মানিয়া লইয়াছে। কোন কোন স্থলে গোঁড়া সনাতনীরা আপত্তি তুলিয়াছে বটে, কিন্তু জনমত তাহাদিগকে সমর্থন করে নাই।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া আমরা কতকগুলি ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। দেশ যখন স্বাধীন হইবে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের সুযোগ আরও অধিক পরিমাণে আমরা পাইব। কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, কেবলমাত্র আইন দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের সংস্কার করা সম্ভবপর নয়, সমাজদেহের সমস্ত ব্যাধিও উহার দ্বারা দূর করা যায় না। কতকগুলি ব্যাপারে আইন দ্বারা সংস্কার সাধন আদৌ সম্ভবপর নয়,—যেমন জাতিভেদ লোপ বা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। কোন আইনই এ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইতে পারে না। আরও অনেক আচার, প্রথা, লোকাচার ও দেশাচার আছে, যাহা বহু শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। যেরূপ কঠোর আইনই করা যাক না কেন, সেই সমস্তকে উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, কোন একটা আইন করিলেই চলিবে না; যদি উহার পশ্চাতে জনমত না থাকে, তবে ঐ আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বাল্য বিবাহ নিবারণ আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের সপক্ষে জনমত এখনও প্রবল না হওয়াতে, ঐ দুই সংস্কার আশানুরূপ সার্থক হইতে পারে নাই।

অতএব সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন করিতে হইলে প্রথমত একদল জ্বলন্ত বিশ্বাসী নেতা ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজে ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা যে স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাদিগকে কতকটা সেই স্থান অধিকার করিতে হইবে। ইহাদিগকে সমাজের সর্ব্বস্তরে সংগঠন ও প্রচারকার্য্যের ভার লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন। হিন্দু সমাজের কল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষী, কর্ম্মী সংস্কারপন্থীদের লইয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে এবং তাহার অধীনে দেশের সর্ব্বত্র শাখা প্রশাখা গঠিত হইবে। হিন্দু মহাসভার ন্যায় প্রতিষ্ঠান এইরূপ কার্য্য করিবার যোগ্য পাত্র। উহার মূল লক্ষ্যও ছিল ঐরূপ। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া হিন্দু সংগঠন ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে তেমন মন দিতে পারিতেছে না,—তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের শক্তি নানা অবান্তর কাজে এবং রাজনৈতিক দলাদলিতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব হয় হিন্দু মহাসভাকে তাহার মূল লক্ষ্যে ফিরিয়া গিয়া কেবলমাত্র সমাজ সংস্কার ও সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, অথবা এই সব কার্য্য সাধন করিবার জন্য অনুরূপ আর একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে হইবে।

(ক্রমশ)

# বিদ্রোহ

(গল্প)

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

যদি আসিলই, তবে এতদিন পরে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল। এ যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে আসা। অথচ সময়মত আসিলে কাহার কি এমন ক্ষতি হইত? তা নয় আজ সে আসিতেছে অর্থাৎ আসিবার ইঙ্গিত করিতেছে। যখন তার অনুপস্থিতির লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুর্নাম সবই মলয়াকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

যদিও বয়স মলয়ার এমন কিছু বেশী হয় নাই, আঠার পার হইয়া যাইবে সামনের মাসে, তবু—তবু তার শাশুড়িকে সে হতাশ করিয়াছে কেবলমাত্র শাশুড়ি কেন, সবাই-ই এমন কি বরেন, তার স্বামী, সেও হতাশ হইয়াছে।

বংশের একমাত্র ছেলে বরেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল, ছেলেকে অল্পবয়সে বিবাহ দেন, তথা নাতি-নাতনির মুখ সকলেই দেখেন। দিয়াও ছিলেন ঠিক সময়েই বিয়ে। মলয়া সুন্দরী, মধুর স্বভাবা, লাবণ্যময়ী মেয়ে, কোন দিকেই তার লক্ষ্মী-হীনতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। কাজে কর্মে, আচারে ব্যবহারে দুইদিনেই সবাই মুগ্ধ হইয়া উঠিল। যেমন হইয়া থাকে, পাড়াপড়শীরা নিজেদের ঘরের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচনান্তে হিংসাত্মক বাহবা দিল অনেক।

বরেনের ও তার মায়ের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনের মত বউ উভয়েই পাইয়াছে।

দিন কাটিতে লাগিল।

পিতৃসঞ্চিত কিছু অর্থের সৌজন্যে বরেনের হাতে আর্থিক কোন কাজ কোন কালেই ছিল না—তাই, মলয়াকে চা তৈরী করিয়া, মাসিকপত্র পড়িয়া, সেলাই করিয়া, ঘুমাইয়া দিন কাটাইতে হইত। বিভিন্ন মনোহর পোষাকে লক্ষ্মীর মত এঘর ওঘর, হাসি তামাসা করিয়াই বেড়াইত।

মলয়া আর বরেন। দুজনকে দেখিয়া মায়ের বুক জুড়াইত।

বৌমা বলিতে তিনি অজ্ঞান।

আদিপর্ব এইভাবেই শেষ হইল।

এর পরেই তিনজনেই যেন কি একটা জিনিসের অভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল। পরে সে অভাবই বাঙ্ময় হইয়া দেখা দিতে লাগিল চারিদিকে।

শাশুড়ির মুখেঃ

বাড়ীতে ছেলে পিলে না থাকলে কি আর ভাল লাগে?

পাড়াপড়শীর মুখেঃ

হ্যাঁ দিদি, (অথবা জেঠাইমা, কাকিমা, মাসিমা) বরেনের এখনও ছেলেপিলে হল না। তিন বছর হল বিয়ে হল। তা, বৌমার কি কোন—

রাত্রে বরেন কথাচ্ছলে বলে, আর ভাল লাগে না মলয়া। মানুষের মধ্যে ঘরে বাইরে তুমি আর আমি। বিচ্ছিরি!

মলয়া সঙ্কুচিত হয় বেশী; যেন সেই অপরাধী। সে শুধু বলিতে পারে, আমারও কি ভাল লাগে—একা একা কিন্তু—

এই "কিন্তু" জিনিষটা শাশুড়ির অবোধ্য। সেকি কথা! অমন অন্নপূর্ণার মত বউ ঘরে আনিলেন, তার কিনা এখনও ........। শাস্ত্রে নাকি বলে নাতি-নাতনির মুখ না দেখিলে অক্ষয় স্বর্গবাস অসম্ভব। পোড়া কপাল!

আরও দুবছর কাটিল।

শাশুড়ী বউয়ের দিকে ভালভাবে চাহিতে পর্য্যন্ত পারেন না। আগেকার মত বউগত প্রাণ আর নাই।

মলয়া তার কি করিতে পারে। তার পোড়া দেহ যদি দিনকে দিন স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে ভরিয়াই উঠিতে থাকে, সে তাহাকে থামাইবে কি প্রকারে!

পাড়াপড়শীদের নজরে কোন কালে কোন কিছুই এড়ায় নাঃ

দিনকে দিন বউটা যেন পদ্মের মত শতদল মেলছে।

পার্শ্ববর্তিনী ঠাট্টা করিয়া ওঠেঃ

ফুল বটে, তবে পদ্ম নয়, পলাশ।

রাত্রে বরেন ভাবে, তবে কি তাহাকে এমনি সন্তানহীন অখ্যাত জীবন কাটাইতে হইবে?

মলয়া শান্ত, অতি নিরীহ মেয়ে, মাঝে মাঝে কাঁদেও হয়ত এই জন্য। সঙ্কোচ লজ্জায় সে মরমে মরিয়া আছে।

অত্যন্ত অপরাধিনীর মত স্নিগ্ধ স্বরে বরেনকে বলেঃ মা বলছিলেন কি একটা মাদুলীর কথা। সেটা একবার পরে দেখলে হয় না।

বাইরে বরেন নিজেকে প্রকাশ করিতে রাজী নয়, বলেঃ না, না, ওসব যত বাজে। ওতে আমার বিশ্বাস কোন দিনই নেই। যা হবার হবেই।

মনে মনে হয়ত সে সত্যই বিশ্বাস করে এখন ওসবে। তাই কি ভাবিয়া আবার বলেঃ

মা যখন বলেছেন এবং তোমারও যখন ইচ্ছে, তখন দেখতে পার। তবে আমি জানি যে—ইত্যাদি।

কিছুদিনের মধ্যেই মলয়ার বামহস্ত ও গলা মাদুলীতে ভরিয়া উঠিল।

এ যেন অকথ্য অপমান। অক্ষমতার এত বড় বিজ্ঞাপন আর নাই। কারও সঙ্গে তো সে নিজের কোন তফাৎ দেখে না। তবে কেন সে এত নীচু, এত হীন হইয়া উঠিল।

পূজা, পার্বণ, শেকড়-বাকড়, তুকতাক সমস্ত সমাধা, সমাপ্ত।

শাশুড়ির চোখ বিরক্তিতে ঘোলাটে হইয়া আসে। তিনি যেন সত্যই আন্তরিক ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন বউকে।

মলয়া কাঁদে। গোপনে সে কাঁদে। তুলসীতলা হইতে শিবমন্দির পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতার কাছে সে করজোড়ে কাঁদেঃ

ভগবান তুমি একি বিপদে ফেললে! একি হতভাগ্য জীবন নেমে আসছে আমার সামনে।

বরেন ভাবেঃ তাইতো একি অঘটন!

পাড়াপড়শীর জিব্ চুলবুলিয়ে ওঠে।

বন্ধ্যা নারী! প্রাতঃদর্শন নিষিদ্ধ। দিন ভাল যায় না। শুভকার্যে বিঘ্ন ঘটায়।

মলয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া শোনে। অসহায়ভাবে কাঁদে। নিরুপায় সে।

ও পাড়ার ঠানদি শুভকাঙ্ক্ষিনী হইয়া উপদেশ দেয়ঃ জানিস মেজবউ বরেনের আবার বিয়ে দে। মিত্তির বংশ যে লোপ পায়। এ চিন্তা যেন মিত্তিরদের চেয়ে মুখুজ্জেদের আর ঘোষেদেরই বেশী।

মলয়া শিহরিয়া ওঠে, মিত্তিরদের নির্বংশ করাইতে সেই হইবে উপলক্ষ।

কথাটা মর্মবিদারক হইলেও, মন্দ লাগে না। তাই ভাল। আবার বিয়ে করুক। তবু তো বংশরক্ষা হইবে, তবু তো—। নিজের প্রতি তারও ঘৃণা এসে যায়। সেই চিরন্তনী কথা বলিতে তার জিব আড়ষ্ট হইয়া আসে।

বরেন সে সব বোঝে, কি করিয়া বোঝে, কে জানে। বিহ্বল হাস্যে বলেঃ পাগল! আবার বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কথার সুরটাই এমন শ্লথ যে, মলয়ার যেন মনে হয় বরেন রাজী আছে, কেবল মুখে বলিতে বাধিতেছে তার।

বরেনের ওদাসীন্য শেলের মত বাজে।

মুখ সায় দিলেও, বুক যে ফেটে যেতে চায়। আবার বিয়ে। সে হবে পরিত্যক্তা! —না, না, অবচেতন মন আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়।

বরেনের দুরাশা অসীম। সে এখনও বিশ্বাস করে, হইলে এক বিয়েতেই হইবে, না হইলে শত বিয়ে করিলেও নয়।

শাশুড়ির মনও যে আবার বিয়েতে সম্পূর্ণ সায় দেয়, এমন নয়। তার মনের একটা জায়গা বুঝি এখনও মলয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে। অবস্থা বিপর্যয়ে সেটাকে সাময়িক চাপা দিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

এখন মলয়ার সুন্দর দেহেও অনেকে নাকি অলুক্ষণে লক্ষণ দেখিতে পাইতেছে।

কেউ হয়ত বলেঃ হ্যাঁ, আমি আগেই জানি, চওড়া কপালে ওরকম একটা জড়ুল থাকলে তার.........ইত্যাদি।

কেউ বলেঃ যে গাছে ফল হবে না, তার আকৃতি দেখলেই বলে দিতে পারি।

মলয়ার মুখ বুজিয়া শোনবার পালা। শুনিয়াও যায়। এমনি করিয়া অপমান, অপযশ মাথায় লইয়া সে আটাশ বছর পার হইতে চলিল।

আজ কিনা চির আকাঙ্ক্ষিত আসিতেছে। মলয়ার ক্রোধ হইবার কথাই। হইয়াও ছিল। কেন সে এত দেরী করিয়া আসিল—তার সাত রাজার ধন, তার আ-কৈশোর কামনার বস্তু —সে কি না এত নিষ্ঠুর হইল। একি পরিহাস দেবতার।

কিন্তু রক্তে রক্তে যে তার আগমনী অনুভূত হইতেছে। তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাকে তিরস্কার করিতে গেলে বুকের মাঝখানটায় ব্যথা লাগে। সমস্ত দেহে সে আনন্দ সঞ্চারিয়া মুক্তি প্রতীক্ষা করিতেছে যে।

মলয়ার হাতজোড় হইয়া আসে। শিশু ভগবান। সমস্ত শরীর তার লাবণ্যপ্লাবিত। বরেনের মুখ জয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সে উজ্জ্বলতা মলয়াকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। কি যেন অপ্রত্যাসিত, অভাবনীয় জয় তাহারা করিয়াছে। মলয়ার বুক গর্বে ফুলিয়া উঠিল। পৃথিবীতে যেন সেই প্রথম মাতৃত্বের অধিকারিণী। পাড়াপড়শীর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়—সে অলুক্ষণে কি না। শাশুড়ির অনুতপ্ত হওয়া উচিত, মলয়া ভাবে।

খুশিতে সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া নিজে সে চমকিয়া ওঠে। এত রূপ, এত লাবণ্য, এত আনন্দ ছিল তার ভেতর। এতদিন তার চোখে পড়ে নাই।

আর কেহ তাহাকে নেপথ্যে ঠাট্টা করিতে পারিবে না। সে আর অশুভ বন্ধ্যা-নারী নয়, সে চির মঙ্গলময়ী মা। মা! হ্যাঁ মিত্তির বংশের ভাবী বংশধরের একমাত্র মা হইবে সে।

রাত্রে বরেন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া সোহাগভরে বলেঃ তুমি আমায় বাঁচিয়েছ মলয়া, তুমি আমার মুখ রেখেছ, তুমি রক্ষা করেছ আমার বংশ।

শাশুড়ি বলেঃ নরকবাস থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছ বৌমা। চির সুখী হও।

সবাই-ই নিজ নিজ কথা বলে, নিজেদের সুবিধা, মুখ-রক্ষা, মান, স্বর্গবাস। সন্তান কেউ না এদের। বউ আপন নয় এদের। কেবল নিজেদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ সুবিধায় কতটুকু সে সাহায্য করবে, সেইটুকুই বিচার্য। অকথ্য ঘৃণা আর বিরক্তি হঠাৎ আসিয়া যায় মলয়ার দেহ মনে।

সে কেউ নয়! অনাগত কেউ নয়!

আদর আপ্যায়ন চারদিক হইতেই চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। চলাফেরা, কথাবার্তা সব বিষয়েই সবার কড়া নজর।

মলয়া হাসে। মনে মনে হাসে সে। আগেকার ব্যবহার বুঝি চোখে ভাসে, আগেকার তিক্ততা, তীক্ষ্ণতা, মধুরে এবং সরলে পরিবর্তিত হইয়াছে। কি পরিবর্তন!

মলয়ার বিরক্তি ক্রমে রাগে পরিণত হয়। রক্তে রক্তে বাজিতেছিল আগমনীর রিনিঝিনি, সেখানে বুঝি প্রতিশোধের কর্কশতা প্রবেশ করিতে চায়।

বংশের ভয় যদি না থাকিত, নরকবাস যদি অধর্তব্য হইত, মান যদি মূল্যহীন হইত, তা' হইলে হয়ত আগন্তুকের কোন প্রয়োজনই এদের কাছে থাকিত না। স্বার্থপর কীট!

মলয়ার মন বিদ্রোহ করে। কেন? কেন, এ হীন মনোবৃত্তি। বিনা অপরাধে সে এতকাল মুখ বুজিয়া শাস্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। নীরবে সব সহ্য করিয়াছে। এরা যে নিরপরাধীকে বিনা দোষে শাস্তি দিল, তার তো একটা অপরাধ আছে। অপরাধ বলিয়াই শাস্তি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাস্তি

(৭১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Khaki

# খাক্‌সার আন্দোলন

রেজাউল করীম এম এ, বি এল

খাকসার আন্দোলনটা আসলে কি জিনিষ, এ বিষয়ে অনেকেই কোন সংবাদ রাখেন না। আজ কয়েক বৎসর হইতে এই যে একটা আধাসামরিক দল আইনের সমস্ত কঠোরতা পরিহার করিয়া প্রকাশ্যভাবে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে, কাহাকেও হুমকি দিতেছে, কাহারও ব্যাপারে অনাহুতভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার আগ্রহ অনেকেরই হইতে পারে। কিন্তু এমনি রহস্যময় ইহাদের কার্য্যপদ্ধতি যে, কাহারও পক্ষে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। কি ইহাদের উদ্দেশ্য, কি ইহারা চায়, কোথা হইতে ইহারা অজস্র অর্থসাহায্য পায় এবং কেমন করিয়া ইহারা লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিল, তাহা সঠিকভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, এই আন্দোলনের নেতা মৌলানা এনায়েতুল্লাহ মাশরাকী সাহেব; এককালে সরকারের অধীনে উচ্চবেতনে চাকরী করিতেন। পরে পেন্‌সেনসহ অবসর লইয়া তিনি কিছুদিন ইউরোপ ভ্রমণ করেন। জার্ম্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন দলের গঠনতন্ত্রগুলি ভালভাবে আলোচনা করেন। এই সময় কোন দলের সহিত তাঁহার গোপন আলোচনা হইয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সামরিক কায়দায় একটি দল গঠন করিলেন। এই দলের নামই খাকসার দল। খাক অর্থে মাটি, অর্থাৎ এই দলের সদস্যগণ মৃত্তিকার মত বিনীত ও সেবাপরায়ণ। মানবসেবাই ইহার প্রধান কাজ—এই কথাই খাকসার নেতা তখন ঘোষণা করিরাছিলেন। সেই সময় ইহার নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি ঠিক-ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত অঞ্চল হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য পাইয়া খাকসার নেতা এই আন্দোলনের আদর্শ, নীতি ও কর্ম্মপরিক্রমা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। এইগুলি দেখিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। ভারতে আজ দাবী উঠিতেছে স্বাধীনতার, ভারতবাসীর দ্বারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ পাইবার অধিকার। কিন্তু খাকসার নেতার আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতবর্ষে এককালে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার সেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাই হইল খাকসার দলের প্রধানতম উদ্দেশ্য। খাকসার দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি মোটামুটি এই:—(১) ভারতে আবার মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠা করা; (২) সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র মুসলিমকে একসূত্রে আবদ্ধ করা; (৩) তাহার পূর্ব্বে সামরিক কায়দায় একদল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করা। "বেলচা" ইহাদের প্রধান অস্ত্র; (৪) এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সাহায্যে বিরুদ্ধদলকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করা; (৫) এবং কংগ্রেসের অহিংসনীতি পরিত্যাগ করিয়া হিংসানীতিকে গ্রহণ করা। খাকসার নেতার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইসলামে অহিংসার স্থান নাই। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে সহিংস নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দল প্রকাশ্যভাবে এই নীতি গ্রহণ করে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকে, কেমন করিয়া তাহারা আইনের বেড়াজাল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে। এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই আমাদের জানা নাই। সুতরাং কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। খাকসার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেন। কেহ বলেন, তাহারা কোন বৈদেশিক শক্তির গুপ্তচর। আবার কেহ বলেন, ইহারা দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ-সাহায্য পায়; উদ্দেশ্য তথাকার প্রজাবিপ্লব দমনে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এসব যাহাই হউক, এই দলটি যে ভারতের বুকে একটা উৎপাত সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যতম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সহিত যে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। খাকসার দলের অন্যতম নেতা নবাব ইয়ার জঙ্গ বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ হইতেছে ভারতীয় মুসলমানের দেহ, আর খাকসারগণ হইতেছে মুসলমানের জাতীয় বাহিনী। অথচ কোন লীগ নেতা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। এমন কি অনেকেই ইহার সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত আছেন এবং ইহার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। খাকসারদের সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ কিছু জানিতাম না। যেদিন তাহারা যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল, সেইদিন হইতে সাধারণের দৃষ্টি ইহাদের উপর পতিত হইল। মুসলিম লীগ চাহিতেছিল, নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়া কংগ্রেসকে বিব্রত করিয়া তুলিতে। সেই সময় লীগেরই প্ররোচনায় সিয়া সুন্নী সমস্যাটা প্রবল হইয়া উঠিল। কংগ্রেস ইহাদের মধ্যে একটা সন্তোষজনক আপোষ করিতে চাহিতেছিল এবং সেইজন্য সকল দলকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিল। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া খাকসার দল সদলবলে যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। তাহারা সিয়া-সুন্নী নেতাদের একটা চরমপত্র দিল যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপোষ না করিলে তাহারাই স্বহস্তে আইনের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া চরমপন্থার সাহায্যে বিবাদ মিটাইয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাত আরম্ভ করিল। অবশেষে কংগ্রেস বাধ্য হইয়া ইহাদের দমন করিতে অগ্রসর হইল। এই সময় মিঃ জিন্না একদম নীরব ছিলেন। বরং প্রকারান্তরে খাকসারদের এই উৎপাতকে উস্কানি দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহারা পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দার হায়াতের গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল, তখন জিন্না-সাহেবের কি ভাবনা। তিনি গণ্ডগোল মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন কিছু করিতে পারেন নাই। তাই বাধ্য হইয়া ঘোষণা করিলেন, খাকসারদের উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু যতদিন খাকসারগণ কংগ্রেসকে বিব্রত করিতেছিল, ততদিন তাঁহার শুভবুদ্ধি হয় নাই। পাঞ্জাবে খাকসারদের কার্য্যপদ্ধতির আর এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এখানেও তাহারা আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্যার সেকেন্দার ত আর কংগ্রেসী নেতা নন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইবেন; সুতরাং তিনি কঠোরহস্তে খাকসারদিগকে দমন করিতে লাগিলেন। খাকসারগণ কিরূপ বীর ও সাহসী, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে মসজিদের অপব্যবহার করিয়া। পুলিশের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বেলচা হাতে খাকসারগণ মসজিদে আশ্রয় লইয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইল। মসজিদ পবিত্র স্থান। সুতরাং সেখানে গিয়া পুলিস তাহাদের ধরিতে পারে না। তাই তাহারা নিরাপদে মসজিদের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আর রসদ? কেন, স্থানীয় মুসলমানগণ ইসলামের এই বীর সৈন্যদের বিনাব্যয়ে জোগাইতেছেন! ধর্ম্মমন্দিরকে লইয়া এই যে ছিনিমিনি খেলা, ইহা ইসলামের কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে? বস্তুত ধর্ম্মকে পার্থিব কার্য্যে লাগাইবার প্রবৃত্তি এখনও ইহাদের অন্তর হইতে দূর হয় নাই। গীর্জ্জা, মন্দির ও মসজিদ সর্ব্বদাই সকল দলাদলির ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এখানে মানুষ আসে শান্তির আশায়। মনের গ্লানি, দলাদলি, নীচতা—সবকে পশ্চাতে ফেলিয়া

কিঞ্চিৎ সময়ের জন্য শান্তি, তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য লোকে ধর্ম্মমন্দিরের শান্তসমাহিত পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিতে চায়। এই ধর্ম্মগৃহকে বিনা দ্বিধায় খাকসারগণ কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। আর সামান্য বাদ্যের শব্দে যাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাহারা ইহা নীরবে কেমন করিয়া সহ্য করিল, তাহা বুঝিয়া উঠা মুস্কিল। সাম্প্রদায়িকতার গতিবিধি সর্ব্বদাই গভীর রহস্যাবৃত—ইহা তাহারই প্রমাণ বিশেষ।

খাকসারদলের ভক্তেরা বলিয়া থাকেন যে, এই দল রাজনৈতিক দল নহে, ইহা একটা মানবসেবক দল। কিন্তু আমরা এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। রামকৃষ্ণ মিশন, সঙ্কটত্রাণ সমিতি, খাদেমুল ইনসান সমিতি প্রমুখ সেবাদলের সহিত খাকসারদলের কোনই তুলনা হয় না। উপরোক্ত সেবাসমিতিগুলি সর্ব্ববিধ রাজনীতির উর্দ্ধে। কাহারও মতামতের সহিত উহাদের সংস্রব নাই। উহারা আইন অমান্যের হুমকী দেখায় না, অথবা জোর করিয়া কাহারও উপর কোন মতবাদ চাপাইতে যায় না। কিন্তু খাকসারগণ কোনরূপ সেবামূলক কাজ করে নাই। সিপ্পা-সুমির ব্যাপার—সৈন্যবাহিনী গঠন, বেলচা কাঁধে সামরিক কুচকাওয়াজ প্রভৃতির সহিত জনসেবার কোনই সংস্রব নাই। আশ্চর্য্য এই যে, এই আধাসামরিক দল সহিংস সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া এখনও টিকিয়া আছে। বাঙলায়ও একদল খাকসার সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছে। আমাদের ভয় হয়, ইহাদের কার্য্যপদ্ধতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে ইহারা হয়ত বাঙলার পল্লীতে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিবে। বাঙলার চারিদিকে আজ সাম্প্রদায়িকতা প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে—ইহাদের মধ্যে খাকসারগণ একবার যদি হস্তক্ষেপ করিতে পায়, তবে সারা বাঙলার শান্তি, সুখ বিনষ্ট করিয়া দিবে। বাঙলার শান্তিপ্রিয় হিন্দু মুসলমানকে এ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।

## বিদ্রোহ

(৭১৬ পৃষ্ঠার পর)

পাইতে হইবে এবং মলয়া ছাড়িবে না, সে প্রতিশোধ লইবেই। বংশরক্ষা! এখন সে ভাল করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে। তার হাতেই মিত্তির বংশ নির্ভর করিতেছে, সে এখন সর্বেসর্বা, ভগবান! রক্ত তার ক্রোধে পাক খাইতে লাগিল।

বরেন নানারকম মিষ্টিকথা বলিয়া আদর করিতে আসে। মলয়ার ঘৃণা আরও বাড়িয়া যায়। সে উপলক্ষ মাত্র, নয়!

নির্মল আকাশে উঠিল ঝড়।

হৈ চৈ পড়িয়া গেল মিত্তির বাড়ীতে।

ঃ বউমা কেমন যেন করছে।

ডাক ডাক্তারকে। ডাক্তার আসিয়া বলিলঃ বিষ খেয়েছে।

মলয়ার তখনও চেতনা লুপ্ত হয় নাই। বড় আরাম লাগিতেছে। আঃ প্রতিশোধ। বংশ সে কিছুতেই থাকিতে দিবে না। গলার তলা, পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। পুড়িয়া ছারখার হইতেছে যেন। উপরে আসিতেছে কান্না—তার রক্তে তারই পরমাত্মীয় এখনও জীবিত, কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যে সবশেষ। হ্যাঁ, তাই সে চায় একদম নির্বংশ।

ঔষধপত্র বিফল হইল। মলয়ার মৃত্যু হইল।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস!

অস্ত্রপ্রয়োগে সন্তান এবং পুত্র সন্তানই বাহির হইল এবং ইহা হইতেও আশ্চর্য যে, জীবিতই রহিল নবজাত শিশুটি।

মলয়ার আত্মা পরলোকে তখন কাঁদিতেছে।

## তুমি তো দাওনি সাড়া

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

জীবনে তোমারে অনেক ডেকেছি
পাইনিতো কভু সাড়া,
রিক্ত নয়নে নেমেছে শুধুই
বরষা-মেঘের ধারা।
দূর হ'তে তোমা বেসেছিনু ভালো,
আঁধারে দেখেছি তব রূপ-আলো,
পারিনি বলিতে তবু কথাটুকু,
কেঁদেছি পাগলপারা;
যতবার আমি ডেকেছি তোমারে
দাওনি তো কভু সাড়া।

আমার ভুবনে তোমার উদয়
কখনো কি হ'তে পারে?
লক্ষ তারকা চ'লেছে নীরবে
নিতি তব অভিসারে।
হেথা মোর পাশে ভরা বিভীষিকা,
হাসে না চাঁদিমা......বন-কুসুমিকা,
তোমারে চাহিয়া ওগো সুন্দরিকা!
শুধু হনু পথহারা;
কতবার আমি ডেকেছি তোমারে
তুমি তো দাওনি সাড়া॥

# আজ-কাল

**ভারতের রাজনীতি**

যুদ্ধের সময় ভারতে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হবার কোনো কার্য্যকরী সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। সত্যাগ্রহের ভণিতা চল্‌ছে বটে, কিন্তু আসলে গান্ধীজী তাঁর মূল সুর ছাড়েন নি। 'হরিজন'এ এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে' নাও নেন, তবু মিত্রশক্তির এই সমূহ সংকটকালে আমাদের চুপ করে' থাকাই উচিত; কারণ "আমরা বৃটেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদের স্বাধীনতা চাই না। অহিংসার পথ এ নয়।" অতএব এখন আইন অমান্য আন্দোলন চল্‌বে না। আর তাঁর মতে জেল ভর্ত্তি করাই আইন অমান্যের উদ্দেশ্য নয়, আগে চাই গঠনমূলক প্রস্তুতি এবং দুষ্কৃতিকারীর প্রতি হৃদয়ের বিমল সদ্ভাব।

পণ্ডিত জওহরলালজীও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং কাশ্মীরে একাধিক বক্তৃতায় আভাস দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ চুপ করে' বসে' থাক্‌লেও স্বাধীনতা আপনা থেকেই এসে যাবে। তাঁর মতে এখন প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে পরিবর্ত্তনকালে ভারতে শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্যে তিনি একটা সাময়িক শাসন-ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেন। হিটলারী আক্রমণে খাস ইংলণ্ড বিপর্য্যস্ত হলে এখানে কংগ্রেস শান্তিরক্ষার নামে আবার মন্ত্রিত্ব নেবে, এমন একটা সম্ভাবনার কথা এসব থেকে মনে হওয়া একেবারে অযৌক্তিক নয়। কারণ তখন হয়তো গান্ধীজী ও পণ্ডিতজীর মতে সেটাই হবে স্বরাজ।

তবে ইংলণ্ডে যদি বিপর্য্যয় হয়, তাহলে এখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা সমস্ত নেতারাই করছেন। যাতে দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রেখে আমরা ঠিক পথে অগ্রসর হতে পারি, সেজন্যে তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়বার চেষ্টা করছেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল এবং অন্যান্য নেতা ও প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের আবেদন জানিয়েছেন।

বাঙলার শ্রমিক ও কৃষক নেতা শ্রীবঙ্কিম মুখার্জ্জি এম এল এ গত ১৩ই এপ্রিল কলকাতার হাজরা পার্কে এক বক্তৃতা করার জন্যে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি এখন জামীনে মুক্ত আছেন। নানাস্থানে আরও অনেক কর্ম্মীকে ভারতরক্ষা আইনে ধরা হয়েছে, কারো কারো উপরে নিষেধাজ্ঞা বা বহিষ্কারের আদেশ জারী হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ কয়েদী ও ভারতীয় কয়েদীর মধ্যে বৈষম্যের প্রতিবাদে যুক্তপ্রদেশের নৈনী জেলে ভূতপূর্ব্ব কাকোরী বন্দী শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত ২০শে মে থেকে অনশন আরম্ভ করেছেন। ঐ জেলে আরও কয়েকজন কর্ম্মী অনশন করছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

**খাকসার আন্দোলন**

খাকসারদের গোলমাল পাঞ্জাবে আবার বেড়েছে। অবশ্য কোন সময়েই তারা একেবারে শান্ত হয় নি; লাহোরে কোর্ত্তাধারী খাকসাররা এ যাবৎ প্রয়োজন হলেই রাস্তা ছেড়ে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল, আর পুলিস তাদের অনুধাবন করে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মসজিদের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ছিল। গত ২৯শে মে লাহোরে সোনা মসজিদের কাছে তাদের সঙ্গে পুলিসের একটা প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়, পুলিসের দারোগা গুলী চালায় ফলে তিনজন খাকসার মারা যায়। এ নি[illegible] মুসলমানদের মধ্যে খুব বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এব[illegible] কর্তৃপক্ষকে শান্তিরক্ষার জন্যে পল্টন ডাকতে হয়। এ ঘটন[illegible] ছাড়াও লাহোরে বহু খাকসার সরকারী আদেশ অমান্য কর[illegible] শোভাযাত্রা করার জন্যে প্রায় প্রত্যহই দণ্ডিত হচ্ছে।

**ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী**

ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ স্যা[illegible] রবার্ট ক্যাসেল্‌স্ এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় যুদ্ধের জন[illegible] ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জা বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; মোট এক লক্ষ বেশী লোক নেওয়া হবে এবং সমস্ত সৈন্যদলে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করা হবে। তবে এ কাজ সম্পন্ন করবার সময় তিনি নির্দ্দিষ্ট করে দেন নি।

## ইওরোপ

**লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ**

এই সপ্তাহে জার্ম্মান আক্রমণে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করেছেন। জার্ম্মানরা আরাস ও আমিয়াঁর মধ্যে ফরাসী ব্যূহ ভেদ করে, ইংলিশ চ্যানেল উপকূলে পেঁছে যাওয়ায় উত্তর ফ্রান্স ও ফ্লান্দারে (বেলজিয়াম) মিত্রশক্তি বাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়। তারপর জার্ম্মানরা উত্তরভাগে অর্থাৎ বেলজিয়ামে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করে। সেই আক্রমণ-মুখে লিওপোল্ড যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। বেলজিয়ান মন্ত্রিসভা এর আগেই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে তাঁরা রাজার কাজের প্রতিবাদ করেন এবং মিত্রশক্তির পক্ষে লড়াই চালাবার সংকল্প প্রকাশ করেন। যাই হোক, রাজা লিওপোল্ডের আদেশে প্রায় তিন লক্ষ বেলজিয়ান সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করে।

এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে ফ্লান্দারে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের বাঁ পাশ অরক্ষিত হয়ে পড়ে এবং জার্ম্মানরা ক্ষিপ্রগতিতে উত্তর থেকে অগ্রসর হয়ে অস্টেণ্ড ও নিউপোর্ট-বন্দর দখল করে নেয়। ওদিকে উত্তর ফ্রান্স থেকে জার্ম্মান সৈন্যেরা উত্তর-দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা কালে বন্দরে প্রবেশ করে; কিন্তু কালের নগর-দুর্গে মিত্র সৈন্য তাদের প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকে।

**ফ্লান্দারের লড়াই**

এইভাবে দুই দিক থেকে ঘেরাও হয়ে মিত্রবাহিনীর পক্ষে ফ্লান্দার ছেড়ে চলে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু জার্ম্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ফ্লান্দার থেকে পশ্চাদ-পসরণ করাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। জার্ম্মানরা ফরাসী সেনাপতি জেনারেল প্রিউকে বন্দী করেছে বলে ঘোষণা করে। বৃটিশ সেনাপতি লর্ড গর্ট ইংলণ্ডে চলে আসতে সমর্থ হন। মিত্রবাহিনীর অনেক সৈন্য শত্রুর অবিরাম আক্রমণের মধ্যে জাহাজে করে ইংলণ্ডে ফিরে এসেছে; তবে তাদের বহু সমরোপকরণ নষ্ট হয়েছে। এখন সমস্ত যুদ্ধটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ডানকার্ক বন্দরে। মিত্রপক্ষ বন্দরটিকে জলপ্লাবিত করেছে। পাহাড়ে জায়গায় ও জলকাদার মধ্যেই তুমুল লড়াই চলছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণে বৃটিশ বিমানবাহিনী খুব তৎপর হয়েছে। তারা জার্ম্মানীর শহর, সৈন্যদল ও বিমানকে আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতি করেছে বলে জানা যায়।

**প্যারিসে বিমান আক্রমণ**

প্রায় তিন'শ জার্ম্মান বিমান ৩রা জুন প্যারিসের উপর হানা দিয়ে এক হাজার বোমা ফেলে। বোমাবর্ষণে ৪৫ জন লোকের প্রাণহানি হয়েছে। ফ্রান্স এই আক্রমণের প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা করেছে।

রোম বেতারে প্রচার করা হয়েছে যে, জার্ম্মানবাহিনী এবার প্যারিসের দিকে অগ্রসর হবে। শোনা যাচ্ছে, সুইজারল্যাণ্ডের দিক ফ্রান্স আক্রমণ করবার একটা মতলব নাকি জার্ম্মানী করেছে।

**ইতালীর অভিপ্রায়**

কিন্তু এ সংবাদ সহজে বিশ্বাস্য নয়। বরং সুইজারল্যাণ্ডের দিক থেকে গোলমাল বাধাবার অভিপ্রায় ইতালীর থাকলেও থাকতে পারে। ইতালীর মতিগতি আরো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। প্রায় সরকারীভাবেই যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে এবং ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তিকে খতম করে ইতালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হচ্ছে। ইতালী-প্রবাসী ইংরেজ ও ফরাসীদের ইতালী ছেড়ে চলে যেতে হলে 'ভিসা' দরকার বলে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতালীতে এই রকম মনোভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রিদে স্পেনীয় ছাত্রেরা আবার 'জিব্রল্টার চাই', 'জিব্রল্টার চাই' বলে চীৎকার সুরু করেছে।

অনেকে মনে করছেন যে, ইতালী কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মুসোলিনীকে প্রতিনিবৃত্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন; কিন্তু তার চেষ্টা সফল হবে বলে কেউ বিশেষ আশা করেন না।

**সোভিয়েট নীতি**

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুনভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্যে যে চেষ্টা করছিলেন তা প্রারম্ভেই ব্যর্থ হয়েছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বৃটেনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মস্কো রওনা হন; কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বৃটেনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড বা অন্য কোনো বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করতে রাজী ন'ন এবং বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েও তাঁরা আলাপ করবেন না, আর সে আলোচনাও করতে হবে মস্কোতে বৃটিশ রাজদূত মারফৎ, অন্য কারো মারফতে নয়। এর পরও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস পথ থেকে ফিরে আসেন নি, মস্কোতে গিয়ে তিনি যা হয় করবেন।

সোভিয়েটের দৃঢ়তায় ইতালী বল্কান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বল্কানে এখন সোভিয়েটের প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে। তার একটা লক্ষণ এই যে, যুগোস্লাভিয়ায় ছাত্রেরা মিছিল করে সোভিয়েটের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা স্থাপনের দাবী জানিয়েছে।

৩।৬।৪০ —ওয়াকিবহাল

# পুস্তক পরিচয়

**শ্যামা (নৃত্যনাট্য) :** শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনী' পুস্তকের 'পরিশোধ' কবিতাটিকে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে রূপ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হইল সাংগীতিক—সুতরাং কথার সহিত সুরের সংযোগে শ্যামা নৃত্যনাট্য যে মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে তাহার রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে যখন সুর বাদ দিয়া কেবল কথা পড়িয়া যাই। তাহাতে নৃত্যনাট্যের কথাগুলির মধ্যে কাব্যরস থাকা সত্ত্বেও শ্রীহীন বৈধব্যই প্রমাণিত হয়। এই কারণে আলোচ্য পুস্তকে প্রত্যেক কথোপকথন স্বরলিপি আকারে পরিশেষে সংযুক্ত হইয়াছে। সংগীতে যাঁহাদের দখল আছে এবং এই নৃত্যনাট্য কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার যাঁহারা দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তকের যথেষ্ট মূল্য আছে। এই নৃত্যনাট্যের কয়েকটি গান যথা—'মায়াবনবিহারিণী হরিণী', 'জীবনে পরম লগন', 'হায়রে হায় পরবাসী', 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে' কথার মাধুর্য্যে ও সুরের বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব হইয়াছে।

**দেবেশ :** শ্রীপ্রিয়লাল দাস প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

উপন্যাস রচনায় লেখকের বোধহয় এই প্রথম প্রচেষ্টা; তাহা ভাব, ভাষা ও কল্পনার দীনতা হইতেই প্রমাণিত হয়। উপন্যাসের মূল কাহিনী মামুলি ধরনের, একটি শিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক সমাজ ও সংসারের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্র পল্লীর এক চাষীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া সহরে সমাজের জাতির কোঠায় তুলিয়া লইল। নায়িকা 'মানি' চরিত্রটিতে কিছু বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ও ভাবের দ্বন্দ্বের অভাবে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

**আধুনিক মেয়ে :** কুমারী দীপিকা দে প্রণীত। প্রকাশক—শৈলেন্দ্র দে, ৩৫।১নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

লেখিকা অল্প বয়সে একাধিক উপন্যাস লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আলোচ্য উপন্যাস সেই সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বইখানি আগাগোড়া রোমাঞ্চকর ঘটনাবৈচিত্র্যে পাঠকদের চিত্তকে কৌতূহলী করিয়া রাখে অথচ ভাষা সহজ ও সাবলীল, রচনায় জড়তা নাই। আমরা লেখিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করি।

**ভারতের পণ্য (দ্বিতীয় খণ্ড) :** শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ২৸০ আনা।

ভারতের পণ্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিক খবরাখবর ও তথ্যসহ বাঙলা ভাষায় সহজভাবে লিখিত কোন পুস্তক ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ব্যবসাক্ষেত্রে সম্প্রতি বাঙালীর উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু ভারতের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতার দরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে সাধারণ বাঙালী ব্যবসায়ীদের উপযোগী বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ইতিহাস ও আধুনিক বিদেশী পণ্যবাজারে তাহার স্থান সম্বন্ধে নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। যে সকল বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছেন—এই পুস্তক তাঁহাদের উপকার সাধন করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

**শ্রীশ্রীবন্ধু বেদবাণী :**—সংকলয়িতা—ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস। মাধুকরী—চারি আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মোহন লাইব্রেরী, ফরিদপুর এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সংকলয়িতা ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস সুলেখক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি একজন সাধক এবং পরম ভক্ত। ভক্তি ধর্ম্মের অবতার প্রভু জগদ্বন্ধুর মধুর উপদেশাবলী চয়ন করিয়া তিনি এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। এগুলি পাঠ করিলে চিত্ত পবিত্র এবং উন্নত হয়, মননে মনে শান্তি পাওয়া যায়। অধ্যাত্মরস-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। এমন পুস্তকের যত প্রচার হয়, ততই ভাল।

**জগৎ কোন্ পথে?**—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম একটাকা।

এক বৎসর যাইতে না যাইতেই 'জগৎ কোন্ পথে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহাতেই বুঝা যায় বইখানা কতটা লোকপ্রিয় হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানির স্থানে স্থানে সময়োচিত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আধুনিক ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে। সমগ্র জগতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মোটামুটি একটা গোটা ধারণা দিবার পক্ষে এমন বই বাঙলা ভাষায় নাই বলিলেই চলে। ছেলেমেয়েরা এমন পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয় জানিতে ও বুঝিতে শিখিবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। সময়োচিত কয়েকখানা সুদৃশ্য ফটো-চিত্রে পুস্তকখানা সুশোভিত।

**উত্তরায় 'পথ ভুলে'**

পরিচালক—ডি জি; কাহিনী—প্রেমেন্দ্র মিত্র; আলোক চিত্রকর—প্রবোধ দাস; শব্দধর—সত্যেন দাসগুপ্ত; গীতিকার—প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেন রায়; সুরশিল্পী—হিমাংশু দত্ত; শিল্প নির্দ্দেশক—পাঁচু শীল।

**ভূমিকা :** ডাঃ রায়—ডি জি; রায় বাহাদুর—বিভূতি গাঙ্গুলী; গোবিন্দ—আশু বসু; থিয়েটার ম্যানেজার—রঞ্জিৎ রায়; সুজিত—ভূমেন রায়; নটবর লাহিড়ী—রতীন বন্দ্যো; ফকিরচাঁদ—সত্য মুখার্জ্জি; ফ্যালারাম—বেচু সিংহ; বিনোদ—হেম গুপ্ত; মঞ্জু—প্রতিমা দাসগুপ্তা; রমা—পূর্ণিমা; মায়া—কুমারী মণিকা; কুসুমিকা—পান্না; পিসিমা—মনোরমা।

উত্তরা ছায়াচিত্রগৃহে গত শনিবার দেবদত্ত ফিল্মস্-এর নূতন চিত্র "পথ ভুলের" শুভ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। প্রথম হইতেই বহু অদ্ভুত হাস্যকর সিচুয়েশনের সহিত অনেকগুলি টাইপ চরিত্র সমাবেশে এই চিত্রটি আগাগোড়া একটি আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের

মায়ার ভূমিকায় কুমারী মণিকা গাঙ্গুলী

সৃষ্টি করে। চরিত্রগুলি যেন নিপুণ শিল্পীর আঁকা নানারকম অদ্ভুত কার্টুন। এরা প্রত্যেকেই ভুল-ভ্রান্তি, বুদ্ধিহীন চতুরতা ও নির্ব্বোধ সারল্য দিয়া নানারকম রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গল্পের স্বচ্ছন্দ গতিকে ক্লান্ত করে নাই বা কোথাও অসঙ্গতি ঘটায় নাই। পরিচালক ডি জি এখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। "পথ ভুলে" হাসির ছবি হইলেও, হাস্যরস ছাড়া আরো বহু রসের বর্ণচ্ছটায় গল্পটি রামধনুর মতো বিচিত্র ও রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। হাসির মধ্য দিয়াই নূতন ধরণের একটি রোম্যাণ্টিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

চিত্রটির সহজ সাবলীল গতি কৌতুক ও কৌতূহল পূর্ণ ঘটনার সহিত দর্শকদের মনকে সহজেই টানিয়া লইয়া যায় শেষ পরিণতির দিকে। চিত্রটির সুরু হাসির মধ্য দিয়াই, কিন্তু সুজিত যেখানে ধরা পড়িল সেখানে কাহিনী মোড় ফিরিয়াছে একটি বেদনা-ঘন করুণ দৃশ্যে, তবে সুজিতের মুখে বেকার জীবনের থিয়েটারী ঢঙের বক্তৃতার সাহায্যে চিত্রের হাল্কা হাসির স্রোতকে আচমকা গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলার অস্বাভাবিকতা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী তাঁহার পরিচালনার গুণে সহজেই সে দোষ শুধরাইয়া লইতে পারিয়াছেন। হাসির ঘটনাগুলি মূল কাহিনী হইতে কোথাও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে নাই। নদী যেমন ছোটখাটো উপনদীর জল-স্রোত লইয়া গভীর সমুদ্রে আসিয়া মেলে তেমনি ছোট ছোট হাসি ও অশ্রুপূর্ণ ঘটনাগুলি মূলকাহিনীকে আনিয়া ফেলিয়াছে একটি গভীর রসঘন পরিসমাপ্তিতে। চিত্রটি হাস্যরস প্রধান হইলেও পরিচালক আতিশয্যকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই।

অভিনয়ের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় মঞ্জুর ভূমিকায় প্রতিমা দাশগুপ্তার সহজ স্বাভাবিক অথচ বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত অভিনয়। কোথাও জড়তা নাই অথচ বাড়াবাড়িও নাই। প্রথমদিকের নারীসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচহীন মঞ্জু ও শেষের দিকে আঘাতের বেদনায় নিজের নারী হৃদয়কে যে অকস্মাৎ আবিষ্কার করিল সেই মঞ্জু—এই দুইটি বিপরীত চরিত্রকে তিনি আশ্চর্য্য-সুন্দর রূপ দিয়াছেন। নায়কের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় মঞ্চঘেষা, বিশেষভাবে তাঁহার চলাফেরা ও বলিবার ধরণ রঙ্গমঞ্চকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

ম্যানেজারের ভূমিকায় রঞ্জিৎ রায় মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু দর্শকদের তিনি প্রচুর আনন্দ দিয়াছেন। ডাঃ রায়ের ভূমিকায় ধীরেন গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসা লাভের যোগ্য। তাঁহার শান্ত সংযত অভিনয় হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়া ডাঃ রায়ের চরিত্রের মাধুর্য্যকে কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রের শেষে তিনি দর্শকদের অন্তরে যে গভীর বেদনার ছাপ রাখিয়া যান, তাহা সহজে মুছিবার নহে। অন্যান্য ভূমিকায় বিভূতি গাঙ্গুলী, আশু বসু, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় ভালই হইয়াছে। সুজিতের বন্ধুর ভূমিকায় সত্য মুখার্জ্জি সংযত অভিনয়ের মধ্য দিয়া দর্শকদের প্রচুর হাসাইয়াছেন। পূর্ণিমার অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই; গানগুলি তিনি সুন্দর গাহিয়াছেন। তবে রেকর্ডিংএর দোষে স্থানে স্থানে তাহা শ্রুতিকটু হইয়া পড়িয়াছে। পান্নার অভিনয় চলনসই। মঞ্জুর বোন মায়ার ভূমিকায় কুমারী মণিকা গাঙ্গুলী প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেকেলে ধরণের নৃত্যটি আমাদের ভাল লাগে নাই।

সাউণ্ড ও ফটোগ্রাফীর দোষে চিত্রটির কয়েক জায়গায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ট্রেনের সট্‌গুলি অত্যধিক হইয়া পড়ায়, তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে। গানগুলি সুন্দর, ভাষা ও সুর দুইই মুগ্ধ করে। ছবির সাহিত্যরসপুষ্ট সংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সোনার সংসারে'র মত 'পথভুলেও' দর্শকদের সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

### কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা গত এক মাস যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিযোগিতার সকল বিভাগেই চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। কোন দল যে কোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইবে, তাহা এখন হইতে সঠিক করিয়া বলা যায় না। প্রত্যেক বিভাগেই তিনটি চারিটি করিয়া দল প্রায় সমানসংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে অধিকসংখ্যক দলের চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণের ফুটবল খেলা দেখিবার উৎসাহ যে বিপুলভাবে জাগিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

### ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর হয় নাই

বিভিন্ন বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হওয়ায় খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। লীগ খেলার সূচনায় খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে স্তরে ছিল, এখনও সেই স্তরে বর্ত্তমান। শীঘ্র যে কোন উন্নতি হইবে, তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কি প্রথম বিভাগে, কি দ্বিতীয় বিভাগে, কি তৃতীয় বিভাগে, এমন একটি দলের নাম উল্লেখ করা যায় না, যাহার খেলোয়াড়গণ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া খেলিতেছেন। এলোপাতাড়ি মার অথবা নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার স্পৃহাই খেলোয়াড়গণের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। ফলে দলের খেলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে ও খেলা নিম্নস্তরের হইতেছে। কোনরূপে গোল করিতে পারিলেই দলের সম্মান বজায় রহিল, ইহাই যেন সকল খেলোয়াড়গণের মনোভাব। অধিকাংশ দলের খেলায় আক্রমণভাগের সহিত রক্ষণভাগের সহযোগিতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। লীগ খেলার সূচনায় এইরূপ ক্রীড়াকৌশল অবতারণা করিতে দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল, অনুশীলনের অভাবেই খেলোয়াড়গণের এইরূপ হইয়াছে। কিছুদিন প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় যোগদান করিলেই, খেলোয়াড়গণের খেলার দোষত্রুটি দূর হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। খেলোয়াড়গণের হয়ত নিজ নিজ খেলার দোষত্রুটি বুঝিবার মত শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ক্লাবের পরিচালকগণও সেই পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

### খেলা পরিচালনা

গত বৎসর খেলা পরিচালনায় রেফারিগণের দোষত্রুটি মারাত্মকভাব ধারণ করার ফলেই ফুটবল বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বৎসর ফুটবল বিরোধ অবসান হইবার পর ইহা আশা করা কখনই অন্যায় হইবে না যে, খেলা পরিচালনায়, যাহাতে রেফারিগণ মারাত্মক ভুল না করেন, তাহার প্রতি পরিচালকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু কার্য্যত তাঁহাদের দৃষ্টি যে সেদিকে নাই, তাহার প্রমাণ প্রতিদিনের খেলাতেই পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসর পুনরায় বিভিন্ন খেলায় রেফারিগণকে মারাত্মক ত্রুটি করিতে দেখা গিয়াছে। কয়েকটি খেলায় এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ খেলা পরিচালনা করিতে দেখিয়া দর্শকগণ পর্য্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পরিচালকগণ যদি এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি না দেন ও বিহিত ব্যবস্থা না করেন, তবে শীঘ্রই গত বৎসরের ন্যায় নূতন এক গণ্ডগোল ফুটবল খেলার মাঠে সৃষ্টি যে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

### প্রথম বিভাগের খেলা

প্রথম বিভাগের খেলায় কালীঘাট দল এখনও পর্য্যন্ত লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে ইহা থাকিবে, ইহা বলা খুবই কঠিন। মোহনবাগান ক্লাব ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া এই দলের সহিত সমানসংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল নিজ অবস্থার যখন পরিবর্ত্তন করিয়া তালিকার এত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তখন চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, ইহা একরূপ নিশ্চয়ই করিয়া বলা চলে। ইহার পরেই ইষ্টবেঙ্গল ও রেঞ্জার্স দল। এই দুইটি দলও চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে ইহারা কালীঘাট ও মোহনবাগান অপেক্ষা এক পয়েণ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছে। শীঘ্রই যে সমানসংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিতে পারিবে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই দুইটি দলের কয়েকটি খেলা হইতে সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই চারিটি দল ছাড়া আর একটি দল চ্যাম্পিয়ানশিপের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, সে হইল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই দলটি মাত্র দুই সপ্তাহ খেলায় যোগদান করিয়াছে। এই দুই সপ্তাহের মধ্যেই চারটি খেলায় যোগদান করিয়া কোন খেলায় পরাজিত না হইয়া সাত পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত এই দলটিকে শক্তিশালী কালীঘাট, ইষ্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগান দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় নাই। এই সকল দলের সহিত খেলিয়া যদি পরাজিত না হয়, তবে এই দলের চ্যাম্পিয়ানশিপের অধিক সম্ভাবনা দেখা দিবে। যাহা হউক, প্রথম বিভাগীয় লীগ খেলায় কালীঘাট, ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং ও রেঞ্জার্স এই পাঁচটি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া জোর প্রতিযোগিতা হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

### দ্বিতীয় বিভাগের খেলা

দ্বিতীয় বিভাগের খেলা প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার ন্যায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হইয়া উঠিয়াছে। অরোরা, ডালহৌসী, কুমারটুলী ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এই চারিটি দল সমান সংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই চারিটি দলের মধ্যে কোন্ দলটি চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা যায় না। তবে এই সকল দলের মধ্যে অরোরার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ, এই দলটি কমসংখ্যক ম্যাচ খেলিয়া উক্ত তিনটি দলের সহিত সমান পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। সমানসংখ্যক খেলায় যোগদান করিলে এই দলের অবস্থা যে আরও ভাল হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়।

### তৃতীয় ডিভিসন

এই বিভাগের খেলায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া দ্বিতীয় বিভাগের ন্যায় তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় নাই। সালখিয়া ফ্রেন্ডস, মাড়োয়ারী ও বেনিয়াটোলা স্পোর্টিং এই তিনটি দল একরূপ সমান অবস্থায় বর্ত্তমান। এই তিনটি দলই যে শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহা নিশ্চিত।

### ফুটবল খেলোয়াড়গণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নিয়মানুসারে ভারতের কোন খেলোয়াড় স্থানীয় এসোসিয়েশনের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র খেলিতে পারে না। এই নিয়ম যাহাতে পালিত হয়, তাহার দিকে ফুটবল ফেডারেশন বর্ত্তমানে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করায়, ভারতের বিভিন্ন স্থানের কয়েকজন খেলোয়াড়কে সসপেণ্ড বা খেলোয়াড়ের খেলা রহিত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার তিনজন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কবলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নাকি স্থানীয় এসোসিয়েশনের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছেন। ইঁহাদের দুইজন ঢাকা

ফুটবল এসোসিয়েশনের ও অপরজন হুগলী স্পোর্টিং এসো-সিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড়। ঢাকা ফুটবল এসোসিয়েশন ও হুগলী স্পোর্টিং এসোসিয়েশন ইঁহাদের সম্বন্ধে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে জানাইবার ফলেই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। উক্ত দুইটি এসোসিয়েশন, ফেডারেশনের নিকট প্রতিবাদ জানাইলে, ফেডারেশন আই এফ একে সসপেণ্ড করিবার নির্দ্দেশ দেন এবং আই এফ এ সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। এই আদেশ যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যাহর করা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত তিনজন খেলোয়াড়, আই এফ এর কোন খেলায় তথা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কোন এসো-সিয়েশনের কোন খেলাতেই যোগদান করিতে পারিবেন না। নিম্নে উক্ত তিনজন খেলোয়াড়ের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

(১) গিয়াসুদ্দিন। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলিয়া থাকেন। ইনি ঢাকা ফুটবল এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়।

(২) সাজাহান। ইনিও বর্ত্তমানে কলিকাতার ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলিয়া থাকেন। ইনিও ঢাকা ফুটবল এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়।

(৩) জে মুস্তাফী। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার অরোরা স্পোর্টিং ক্লাবে খেলিয়া থাকেন। ইনি হুগলী স্পোর্টিং এসো-সিয়েশনের খেলোয়াড়।

উপরোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে দেখিবেন এই নিয়মটি গঠিত হইয়াছে কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানের ফুটবল খেলার অস্তিত্ব রাখিতে। কারণ খেলোয়াড়গণ এইরূপভাবে স্থানীয় দল ছাড়িয়া অন্যত্র খেলায় অনেক সময়েই স্থানীয় দলকে স্থানীয় প্রতিযোগিতার উৎসাহ বর্ত্তমান রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমন কি অনেক স্থানে খেলোয়াড়গণের অভাব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় দলের নাম প্রেরণ করিয়া খেলায় যোগদান করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় খেলোয়াড়গণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে নাম উঠাইয়া লইতে হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ফুটবল এসোসিয়েশন এই সকল অভিযোগ ফেডারেশনের নিকট জানাইবার ফলেই ফেডারেশনকে এই নিয়ম করিতে হইয়াছে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন খেলোয়াড়গণকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রচলন করেন নাই।

বিভিন্ন. বিভাগের লীগ তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

**প্রথম বিভাগ**

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কালীঘাট | ৯ | ৫ | ৪ | ০ | ১৩ | ৪ | ১৪ |
| মোহনবাগান | ১০ | ৭ | ০ | ৩ | ১১ | ৬ | ১৪ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ৯ | ৫ | ৩ | ১ | ৯ | ৪ | ১৩ |
| রেঞ্জার্স | ১১ | ৫ | ৩ | ৩ | ১৬ | ৯ | ১৩ |
| বর্ডার রেজিঃ | ১০ | ৫ | ২ | ৩ | ৯ | ১০ | ১২ |
| কাষ্টমস | ১১ | ৩ | ৫ | ৩ | ৫ | ৮ | ১১ |
| ই বি রেলওয়ে | ১০ | ৩ | ৪ | ৩ | ১২ | ১২ | ১০ |
| পুলিশ | ১১ | ৩ | ৩ | ৫ | ১২ | ১৪ | ৯ |
| মহঃ স্পোর্টিং | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১০ | ১ | ৭ |
| এরিয়ান্স | ১০ | ২ | ৩ | ৫ | ১০ | ১২ | ৭ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ১০ | ২ | ৩ | ৫ | ৭ | ১৪ | ৭ |
| ক্যালকাটা | ১১ | ২ | ৩ | ৬ | ১১ | ১৭ | ৭ |
| ভবানীপুর | ১০ | ১ | ০ | ৯ | ৩ | ২০ | ২ |

**দ্বিতীয় বিভাগ**

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অরোরা | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | ১০ | ২ | ১৩ |
| ডালহৌসী | ১০ | ৫ | ৩ | ২ | ১৯ | ৯ | ১৩ |
| কুমারটুলী | ৯ | ৪ | ৫ | ০ | ১৬ | ৭ | ১৩ |
| জর্জ্জ টেলিগ্রাফ | ৯ | ৫ | ৩ | ১ | ১৩ | ৬ | ১৩ |

**তৃতীয় বিভাগ**

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সালখিয়া ফ্রেণ্ডস | ৭ | ৫ | ২ | ০ | ১১ | ০ | ১২ |
| মাড়োয়ারী | ৮ | ৫ | ২ | ১ | ১৭ | ২ | ১২ |
| বেনিয়াটোলা | ৭ | ৫ | ১ | ১ | ১২ | ৭ | ১১ |

# সাহিত্য-সংবাদ

**প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা**

মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের ভূতপূর্ব্ব গণিত শিক্ষক স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থে পুরুলিয়ার "বিদ্যুৎ সঙ্ঘের" উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিষয়ঃ—"বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও ছাত্রসমাজ।" ফুলস্কেপ কাগজে পাঁচ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া চাই। নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে মন্মথনাথ স্মৃতি পদক দেওয়া হইবে। পূর্ব্বঘোষিত ৩রা জুনের পরিবর্ত্তে ২২শে জুন, শনিবার পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইল। ২২শে জুনের মধ্যে প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান চাই।

সম্পাদকগণ, বিদ্যুৎ; বিদ্যুৎসঙ্ঘ, গাড়ীখানা। পোঃ পুরুলিয়া—মানভূম।

# সমর-বার্ত্তা

**২৯শে মে—**

নরওয়েতে মিত্রশক্তি নার্ভিক পুনরধিকার করে।

উত্তর ফ্রান্সের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি ও জার্ম্মান সৈন্যদের জীবন-মরণ সংগ্রাম চলে। মিত্রবাহিনী ফরাসী উপকূলের দিকে কয়েক মাইল পশ্চাদপসরণ করে। এদিকে জার্ম্মান বাহিনী ফ্ল্যান্ডার্সের ভিতর দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া অস্টেণ্ড দখল করে। তাহারা লিলে ও আর্ম্মেণ্টিয়ারেন্স দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করে।

ফ্লাণ্ডার্স রণাঙ্গনে তুমুল সংগ্রামের পর বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী সমুদ্রোপকূলের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ সময় বৃটিশ বিমানবহরের সহিত জার্ম্মান বিমানের প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে জার্ম্মানদের ৭০টির অধিক বিমান ধ্বংস হয় এবং বহু বিমান ঘায়েল হয়। মিত্রশক্তি বাহিনীর কতক সৈন্য ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়।

জার্ম্মান হাইকমাণ্ডের একটি ইস্তাহারে বলা হয় যে, ফ্লাণ্ডার্স রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়। বৃটিশ বাহিনী সমস্ত সমরোপকরণ পশ্চাতে ফেলিয়া সমুদ্রোপকূলের দিকে পলায়ন করে। জার্ম্মান বিমানবহরের আক্রমণে ৬০টির অধিক জাহাজ ঘায়েল হয়। জার্ম্মাণরা শত্রুপক্ষীয় ৬৮টি বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করে।

জার্ম্মানরা দাবী করে যে, প্রথম সংখ্যক ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল প্রিউকে অন্যান্য বহু উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীসহ বন্দী করা হইয়াছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বা অন্য কাহাকেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ—লণ্ডনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতকে এই কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

**৩১শে মে—**

ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বৃটিশ বেতারে বলা হয় যে, গতকল্য জার্ম্মাণরা ৪০ ডিভিসন সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। মিত্রশক্তি বাহিনী তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং ইহাতে শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হয়।

ডানকার্কের দক্ষিণ পশ্চিমে সমগ্র অঞ্চল গ্রাভলিন হইতে প্রায় সেণ্টওমার পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত করা হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বে জলপ্লাবিত অঞ্চল ইজার উপত্যকা দিয়া নিউপোর্ট হইতে ইপ্রে পর্য্যন্ত দুই তিন মাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অদ্য কংগ্রেসে শতাধিক কোটি ডলারের ব্যয়বরাদ্দ সম্বলিত একটি অতিরিক্ত জরুরী পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

ফরাসী বাহিনী দুইদিন ব্যাপী যুদ্ধের পর আবিভিলির উপকণ্ঠ পুনরধিকার করে।

**১লা জুন—**

বৃটিশ সৈন্যদলকে স্থানান্তরিত করার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকায় এবং উত্তর ফ্রান্সের রণাঙ্গনস্থিত বৃটিশ বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ী জেনারেল গর্ট অবশিষ্ট ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব অপেক্ষাকৃত অধস্তন অফিসারের হস্তে অর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ফ্ল্যাণ্ডার্স হইতে এক লক্ষেরও অধিক লোককে [illegible] করা হইয়াছে।

ডানকার্কে ব্রিটিশ ও ফরাসী [illegible] জার্ম্মান অভিযান প্রতিহত করার জন্য এবং স্থানান্[illegible] সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আক্রমণ চালায়। সোম এলাকায় জার্ম্মানরা পাল্টা আক্রমণ চালায়। তাহাদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হয়। গতকল্য মিত্রশক্তির সৈন্য স্থানান্তরিত করার কার্য্যে সাহায্য করার সময় কর্ম্মতৎপরতার ফলে ৫৬ খানি জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হয়।

**২রা মে—**

প্যারিসের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ডানকার্ক অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ প্রশংসনীয়ভাবে শত্রুপক্ষের পুনঃপুন আক্রমণ ব্যর্থ করে। গোলন্দাজ বাহিনীর এবং বিমান হইতে গুলীবর্ষণ সত্ত্বেও সৈন্য অপসারণ কার্য্য চলে।

ডানকার্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে মিত্রপক্ষের সৈন্যদল কয়েকটি স্থানে প্রবলভাবে বাধা দেয়। প্লাবনের মধ্য দিয়া জার্ম্মান পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা যেমনি প্রচণ্ড তেমনি নৃশংস। যাহারা নিহত বা আহত অবস্থায় ভূপাতিত হইতেছে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে জলকাদার মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে।

ওয়াশিংটনের ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, একটি ইটালীয়-জার্ম্মান শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে; এই প্রস্তাবের সহিত এই হুমকীও দেখান হইবে যে, এই প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ইটালী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইটালী জার্ম্মানীর ও নিজ নিজ পক্ষ হইতে মিত্রশক্তির নিকট সাধারণ সর্ত্তে একটি শান্তি প্রস্তাব করিবে; পরে এক শান্তি সম্মেলনে উক্ত সর্ত্তাবলী বিস্তৃতভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। অনুমান যে, সিনর মুসোলিনী এই প্রস্তাবের সহিত তাঁহার নিজের দাবীও পেশ করিবেন এবং এই হুমকী দিবেন যে, এই উভয় সর্ত্ত মানিয়া না লইলে ইটালী যুদ্ধে নামিবে।

**৩রা জুন—**

অদ্য অপরাহ্ণে প্যারিসের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। যুদ্ধারম্ভের পর এই সর্ব্বপ্রথম রাজধানীতে বোমাবর্ষণ করা হইল। বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলাবর্ষণ করা হয়। প্যারিস অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি ৪৫ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল।

বোমাবর্ষণের ফলে দুইশতাধিক লোক হতাহত হইয়াছে। প্রায় তিনশত বিমান এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তিনখানি জার্ম্মান বিমানকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হয়।

**৪ঠা জুন—**

আজ কমন্স সভায় যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে মিঃ চার্চ্চিল জানান যে, তিন লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ফ্লাণ্ডার্স রণাঙ্গন হইতে ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী উভয় জাতির সৈনাই বিদ্যমান। তিনি বলেন, ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে হত, আহত বা নিরুদ্দিষ্ট মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের সংখ্যা ৩০ হাজার হইবে। শত্রুপক্ষের ৫০ হইতে ৬০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তির এক সহস্র কামান, যাবতীয় মালবাহী যান ও সাঁজোয়াগাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধকে মিত্রশক্তির এক বিরাট দুর্দ্দৈব বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী ক্ষীণবল ও বেলজিয়ান বাহিনী বিনষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলেন, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স দৃঢ়তার সহিত নিজেদের দেশ রক্ষা করিয়া যাইবে এবং জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবে।

# সাপ্তাহিক-সংবাদ

২৯শে মে—

লাহোরে পুনরায় খাকসারদের উপদ্রব দেখা দেয়। প্রকাশ যে, বেলচাধারী খাকসারগণ সোনা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া কুচ করিয়া যাইতে থাকিলে, পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে এবং বেলচা সমর্পণ করিবার আদেশ দেয়। খাকসারগণ বেলচা ত্যাগে অসম্মত হয়। পুলিশ দল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে খাকসারগণ পুলিশের উপর বেলচার আঘাত করে। ইহাতে পুলিশ গুলী চালনা করে, ফলে দুইজন নিহত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রীযুত বঙ্কিম মুখার্জ্জিকে কলিকাতায় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত দেবেন সেনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

ময়মনসিংহ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সুভাষচন্দ্র নাগকে হত্যা করিবার অভিযোগে সমরেশচন্দ্র সেনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে আসামী খালাস পাইয়াছে।

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে উপনির্ব্বাচন হয়, অন্যান্য প্রার্থিগণ সকলেই নির্ব্বাচন প্রার্থনা প্রত্যাহার করিয়া লওয়ায়, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

রাজদ্রোহ ও শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে রংপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মৌলবী এসানুল হক ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কলিকাতার পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে মোট ৭৮জন জার্ম্মানকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৬।

৩১শে মে—

ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার রবার্ট ক্যাসেলস এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্থায়ী সেনাদলের জন্য আরও এক লক্ষ বা ততোধিক লোক সংগ্রহ করা হইবে; আরও কয়েকটি টেরিটোরিয়াল ইউনিট গঠন করা হইবে এবং ভারতীয় বিমানবহরের আয়তন বর্ত্তমানের চতুর্গুণ করা হইবে। এই সমস্ত ব্যবস্থাই অবিলম্বে করা হইবে।

১লা জুন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের এক সভা হয়। ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলনে জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে এবং হলওয়েল মনুমেণ্টের উচ্ছেদের দাবী জানাইয়া যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ এই সভায় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন। পরিষদ হলওয়েল মনুমেণ্টের উচ্ছেদের আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে ও ঐ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে বাঙলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বি পি সি সি'র সভাপতিকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য অবিলম্বে আন্দোলন আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নির্দ্দেশ দানের ক্ষমতা অর্পণ করেন। পরিষদ আর একটি প্রস্তাবে কোন বিশেষ দল নিরপেক্ষভাবে একটি নাগরিক রক্ষীবাহিনী গঠন করিবার ভার অবিলম্বে গ্রহণ করিতে জনসাধারণের সর্ব্বশ্রেণীর নিকট আবেদন জানান।

মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে আইন অমান্য আরম্ভ না হওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়া বলেন, "আমরা বৃটেনের ধ্বংসের উপর আমাদের স্বাধীনতা চাই না। উহা অহিংসার পথ নহে।"

নারায়ণগঞ্জ ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে দাঙ্গার ফলে জ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক নামক একটি ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। এই সম্পর্কে অভিযুক্ত পাঁচজন আসামী নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক রেহাই পাইয়াছে।

ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতে প্রকাশ্যভাবে বেতারযোগে জার্ম্মানীর প্রচারকার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনগরে এক বিরাট জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, একটা বিপ্লব অবশ্যই আসিবে, ভারতকে ঐজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জগতের মানচিত্রের আকার পরিবর্ত্তনে ভারতেরও যাহাতে হাত থাকে, তাহার ব্যবস্থার জন্য ভারতের জনগণকেও প্রস্তুত হইতে হইবে।

২রা জুন—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী, বিশেষত হলওয়েল স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারণের ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী সম্পর্কে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেস সেবক সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বসু বলেন,—এক বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমানে তাহা আর নাই। স্বাধীন জাতি হিসাবে তাঁহাদের আজ সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই হিসাবেই তাঁহারা আজ পরাধীনতার নিদর্শন কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বসু আরও বলেন যে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি দৃষ্টে দেশের সর্ব্বত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য একটি রক্ষীবাহিনী গঠন করা উচিত। এইরূপ বাহিনী দলনির্ব্বিশেষে গঠন করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন ও বলেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত ঐ বাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

খানেওয়াল রেল ষ্টেশনে এক ট্রেনের কামরায় পুলিশের সহিত খাকসার দলের সংঘর্ষের ফলে একজন খাকসার নিহত ও ৮ জন কনেষ্টবলসহ আরও কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

৩রা জুন—

বাঙলা সরকার বাজারে প্রথম শ্রেণীর পাট প্রতি গাঁইট ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪ঠা জুন—

নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে আটক শ্রীযুত মন্মথনাথ গুপ্ত ও অন্যান্য অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল Saturday, 15th June, 1940 [৩১শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—**

আগামী রবিবার, ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পঞ্চদশ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় দেশবন্ধু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেশসেবা বা রাজনীতি জীবনে একটা বিশিষ্ট কর্ত্তব্য মাত্র ছিল না। দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁহার সমগ্র জীবনকে আপ্লুত করিয়া—একান্ত আত্মনিবেদনের অমোঘ-বীর্য্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ—মানুষকে নূতন জীবন দান করে, দেশবন্ধু পাইয়াছিলেন তেমনই প্রেমিকের নূতন জীবন। আত্যন্তিক ত্যাগের অমৃতময় প্রেরণা ব্যষ্টি স্বার্থের সকল বন্ধনের উর্দ্ধে তাঁহাকে সমষ্টি চেতনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং সেই হিসাবে তিনি ছিলেন দেশের সত্যকার নেতা। অপরিম্লান আত্মাবদানের মহিমার মাধুর্য্যে তিনি দেশের অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই বাহ্য যুক্তি-বিচারের সূত্রগত সকল অন্তরায় তাঁহার কাছে এলাইয়া পড়িয়াছিল। প্রেমে তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল উদ্দীপ্ত, তাই গতি ছিল তাঁহার অপ্রতিহত। প্রকৃত কোন লাভই বাহিরের আপেক্ষিকতার মধ্যে নাই, একান্ত লাভ হয় অন্তরে। দেশবন্ধু অন্তরে এই একান্ত লাভ করিয়াছিলেন সেবার উদার অনুভূতির মধ্যে এবং সেই লাভের জোরে কোন লোকসানের ভয় তিনি করেন নাই, বিভীষিকায় তিনি কম্পিত হন নাই। আজ যদি রাজনীতিক সিদ্ধির পথে অন্তরায়ের বাহুল্য আমাদিগকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়, দেশবন্ধুর জীবনের ভাবসম্পদ আমাদিগকে শক্তিদান করিবে। তাঁহার অমর জীবনের অনুধ্যান হইতে এই উপদেশ আমরা পাইব যে, অন্তরায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের বাহিরে নাই, অন্তরায় আমাদের ভিতরে এবং সে অন্তরায় হইল দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য—দেশের পরাধীনতার জন্য বেদনা বোধের অভাব, অভাব দেশপ্রেমের এবং সেই প্রেমের আগুন যদি অন্তরে একবার জ্বলে বাহিরের সকল অন্তরাই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

---

**দেশরক্ষার আয়োজন—**

ভারতরক্ষা সম্পর্কে বড়লাট সম্প্রতি আর একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে সিভিক গার্ড গঠনের প্রস্তাব আছে এবং বিভিন্ন জেলায় সমর কমিটিসমূহ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। সিভিক গার্ড পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই বাহিনী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া গঠিত হইবে। ইহাদের কার্য্য হইবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, গুপ্তচর বিশ্বাসঘাতকদের অনিষ্টকর কার্য্য নিবারণ এবং দেশরক্ষা বিষয়ক অন্যান্য আভ্যন্তরীণ কার্য্য। এমন বাহিনীর প্রয়োজন যে আছে সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু বাস্তব দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত যাহারা, যাহাদের মধ্যে সেবার ভাব সত্যকার, তেমন লোকদের লইয়া যদি এই বাহিনী গঠিত হয় তবেই সে বাহিনী প্রকৃত কাজে আসিবে। মূলনীতি হওয়া চাই দেশের লোকদের প্রতি আস্থার ভাব, যাহাদের মধ্যে দেশপ্রেম জীবন্ত তাঁহাদের সঙ্গে মনে-প্রাণে সহযোগিতার প্রবৃত্তি। যাহারা মান যশের লোভী, স্বার্থের কাঙ্গাল এবং পরপ্রত্যাশী, জেলা কমিটিসমূহে তাহারাই যদি কর্ত্তা হইয়া বসে তবে প্রকৃত কাজ না হইয়া কুকাজ হইবার ভয় আছে।

আমরা এতদিন যে কথা বলিয়াছি, এই প্রসঙ্গেও সেই কথা বলিব যে দেশের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে কর্ত্তাদের মনের ভাব বদলাইতে হইবে। দেশরক্ষার বলিষ্ঠ মানসিক প্রবৃত্তিকে ভীতির দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে মর্যাদা বৃদ্ধিতে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। অতিরিক্ত সাবধানী নীতির চেয়ে বিশ্বস্তির এই ভাবটাই আগে দরকার।

---

**স্বাধীনতাই শক্তি—**

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষার সম্পর্কে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিশ্বস্তির অভাবেরই পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ভারতবাসীদিগকে ভারতরক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার নীতি গরজের সঙ্গে কোন দিনই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। দেশের লোককে সামরিক শিক্ষা দিতে তাঁহারা ভরসা পান নাই। ইহার ফলে ভারত আজ একান্তভাবে ব্রিটিশের মুখাপেক্ষী। ব্রিটিশের বিপদে ভারতের সাহায্য করিবার শক্তির আজ অভাব। এই দৃষ্টি বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। অতিরিক্ত সাবধানী চালে তুকতাকের কর্ম্ম নয়,—আমূল সংস্কার প্রয়োজন। শুধু আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, বাহিরের আতঙ্ক ও উদ্বেগ এড়াইবার জন্য আটঘাট বাঁধিয়া ব্যবস্থা করা একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সমগ্র শক্তিকে এ জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে কিন্তু সে বস্তুটা নির্ভর করে আন্তরিকতার উপর। প্রাণের টান, মনের টান এখানে বড় কথা। মাতৃভূমির রক্ষার মহদাদর্শের প্রেরণার সঙ্গে স্বাধীনতার যে সম্পর্ক রহিয়াছে, এই সম্পর্কে সে সত্যটি অস্বীকার করিলে চলিবে না। কিন্তু কর্ত্তারা অন্য অনেক কথাই বলিতেছেন, ভারতবাসীর স্বাধীনতার কথাটি এড়াইয়া যাইতেছেন। কংগ্রেসের দাবীর সোজা উত্তর তাঁহারা এখন দিতে নারাজ। ভারত সচিব মিঃ আমেরী সেদিন যে বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও সেই সাবেকী সুরই রহিয়াছে। স্বাধীনতা-প্রিয়তা স্বাধীন জনোচিত মর্য্যাদার লালসা ভারতবাসীদের মধ্যে যে আছে এবং সেই জিনিষটার সাহায্য লওয়া যে দরকার ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এখনও তাহা বুঝিতেছেন না। তাঁহারা ইহা বুঝিতেছেন না, ভারতের ধন বল আছে, জনবল আছে, আছে সকলই এবং ভারতের যাহা আছে, অন্য কাহারও তাহা নাই, প্রয়োজন শুধু ভারতের অন্তরকে আকর্ষণ করা। মানুষের মর্য্যাদায় উদ্দীপ্ত ভারতের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে হইলে ভারতবাসীদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মনস্তাত্বিক এই একান্ত সত্যকে অন্য দশ কথায় ধামাচাপা দিবার সময় আর নাই।

---

**'সিভিক গার্ডের' সমস্যা—**

বড়লাট তাঁহার বিবৃতিতে 'সিভিক গার্ড' গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের রক্ষীদল গঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রস্তাবের একটা সাদৃশ্য আছে। কংগ্রেসের গ্রাম সংগঠন প্রস্তাবের পাল্টা হিসাবে কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারী গ্রামোন্নতি সাধক দলের আয়োজন হয়, সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বলা বাহুল্য, বড়লাটের প্রস্তাবিত ঐ 'সিভিক গার্ড' দল সরকারী প্রতিষ্ঠান হইবে এবং তাহাদের গতিবিধি, কাজ-কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে যে প্রদেশে যেরূপ শাসক দলের কর্তৃত্ব তাঁহাদেরই মতিগতির অনুযায়ী। এখানে দেশের লোকের পক্ষে একটা ভাবিবার বিষয় আসিয়া পড়ে। সেদিন টিনেভেলি জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী সে কথাটা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'বড়লাট বাহাদুর দেশের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার আগে সমাধান না করিয়া সর্ব্বত্র সমর-সভা স্থাপনের এবং শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত 'সিভিক গার্ড' গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা কংগ্রেসীরা যখন মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, তখনও আমরা অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী গঠনের সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু বিভাগীয় রেষারেষির জন্য পারি নাই। এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর এবং শাসন ব্যবস্থা হইতে মন্ত্রীদের ভিতর দিয়া নির্ব্বাচকদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা অপসারিত হইবার পর পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রস্তাবটা আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 'সিভিক গার্ডের' কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক এবং রাজনীতিক বিরোধের শঙ্কা বিজড়িত রহিয়াছে।' মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার স্থূলতত্ত্বের ভিতর দিয়া বিভাগীয় সিভিলিয়ানী শক্তি সূক্ষ্মভাবে কেমন কাজ করে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারীর ন্যায় শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনারও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। বড়লাটের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক অবস্থার সন্তোষজনক সমাধান না করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি 'সিভিক গার্ড' সংগ্রহ এবং সমর-সভা গঠনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটি অন্য কথায় স্পেশ্যাল কনেষ্টবল এবং আমান সভারই সমতুল্য হইবে। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী এবং শকসেনা মহাশয় যেরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। 'সিভিক গার্ড' বাহিনী জনানুকূল হওয়ার উপরই তাহার সার্থকতা নির্ভর করে এবং উক্ত বাহিনী জনমতানুকূল হওয়া নির্ভর করে জনমতানুকূল নীতি-নিয়ন্ত্রিত শাসকদের উপর। সুতরাং আগে দরকার জনমতের দ্বারা গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টসমূহের পত্তন।

---

**ভারতবাসীর অধিকারকে স্বীকৃতি—**

ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা নিজেদের অনুদার নীতির জন্য অতীতে অনেক ভুল করিয়াছেন, আজ বিশেষ সঙ্কটকালেও সে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। ভারতের ধনবল, জনবল সকল বলের আজ তাঁহাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং আমরা ভারতবাসী, আমাদের জন্যই শুধু নয়, তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যও ভারতবাসীদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য; ইহার দ্বারা এক সূত্রে তাঁহাদের নিজেদের সমস্যা, ভারতের সমস্যা এবং সমগ্র জগতের সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সুভাষচন্দ্র সম্প্রতি একটি

বিবৃতিতে এই কথাটা সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীরা নিজেরাই আজ একান্ত অসহায়। এই অসহায়ত্ব দূর করিতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা প্রথম প্রয়োজন; প্রয়োজন ভারতের রাজনীতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সর্ব্ববিধ ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভারতের সর্ব্বপ্রথম নিজেকে বাঁচাইতে হইবে এবং যদি হিন্দু ও মুসলমান একযোগে সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করে, শুধু তাহা হইলেই ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। ইতিহাসে যতগুলি বৈপ্লবিক সঙ্কট মুহূর্ত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই পন্থা অনুসৃত হইতেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আবশ্যকীয় সংশোধন করিলেই কেন্দ্রীয় সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের সামঞ্জস্য সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে সার্ব্বভৌম শক্তি থাকা আবশ্যক।"

ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা এ কথার উত্তরে মামুলী কথাই হয়ত শুনাইতে আসিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, হিন্দু ও মুসলমানের একযোগে দাবী কোথায়? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, হিন্দু ও মুসলমান, শুধু তাহাই কেন, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা ভারতের স্বাধীনতা না চায়। মোস্লেম লীগই ভারতের মুসলমান সমাজ নয়। প্রকৃত কথা হইল এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ স্বার্থের দোহাই তুলিয়া আজ ভারতকে দুর্ব্বল করিয়া যাহারা রাখিতে চাহিতেছে, তাহারা ব্রিটিশ জাতিরই বিপদ বাড়াইতেছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উচিত এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সকল আবদারকে উপেক্ষা করা। এখনও যদি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া তাঁহারা নিজেদের মনিবগিরির মোহটা না ছাড়েন তাহা হইলে সে ভুলের জন্য ব্রিটিশ জাতিকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

---

**বাঙলা ভাষার মর্য্যাদা—**

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর প্রকৃতিতে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রধান প্রধান সকল প্রদেশের ভাষারই চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা ভাষা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও ভারতের কোন কোন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষাকে অনুরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার প্রতীকারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চিঠি দিয়াছিলেন। আমরা জানিয়া সুখী হইয়াম যে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা ভাষাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা আশা করি, যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই, সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও তাঁহাদের ত্রুটী সংশোধন করিবেন।

---

**ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের পরমায়ু—**

ভারতীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে, দফায় দফায় পরমায়ু বাড়িতে বাড়িতে পরমায়ু ডবল হইয়া গিয়াছে। এতদিন এই পরমায়ু বাড়িয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মহা-হিড়িকে, এবার পরমায়ু বাড়িল যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ ব্যাপারে পরিষদের সদস্যদের অনবরত উপদেশ পাইবার পরম প্রয়োজনই কি এই আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির কারণ? ইহা মনে করিবার কোন হেতু নাই, কারণ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অক্টোবর মাসের আগে হইবে না; কিন্তু এতদিনে যুদ্ধের হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে এবং কর্ত্তারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই যুদ্ধ সম্পর্কে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; সুতরাং যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিষদের সদস্যদের মর্য্যাদা সাংখ্যের পুরুষেরই মত। যাহা হউক, আরও এক বৎসর কাল যে সদস্যেরা সদস্যাগিরির সুখ-সুবিধা বিনা ঝঞ্ঝাটে ভোগ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের পরম লাভ এবং এ দেশে এই লাভই পরিষদের পরিবেষ্টনের মধ্যে একান্ত লাভ বলা যাইতে পারে।

---

**জনমতের অভিব্যক্তি রোধ—**

ভারতের সম্মুখে বর্ত্তমানে জটিল সঙ্কটপূর্ণ সমস্যা-সমূহ দেখা দিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের যুক্তি এই যে, যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন আরম্ভ করা ঠিক হইবে না। আমরা এই যুক্তির ঔচিত্য স্বীকার করিতে পারি না। ব্যবস্থা পরিষদের এইভাবে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফল ইহাই হইবে যে, দেশের লোকের রাজনীতিক সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধের আমলে ভারতরক্ষা আইন প্রভৃতির প্রয়োগ সম্পর্কে যে সব নূতন নীতি খাটাইতেছেন, জনমতের প্রকাশ এইভাবে রুদ্ধ হওয়াতে সেগুলি অসংবাদিত থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেসের দাবী, মুসলিম লীগের দাবী—কোন্ দাবী দেশের জনমতের দ্বারা সমর্থিত, তাহা জানা যাইবে না এবং ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই বলিয়া দিন কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন যে, দেশের লোকে প্রকৃতপক্ষে কি চাহে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সাধারণ নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়াই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই যুক্তির সুনিশ্চিত উত্তর মিলিত; কিন্তু সেই পথ বন্ধ করা হইল এবং দেশের জনমত প্রকাশের পথ বন্ধ করিয়া জনমতের স্পষ্টতর প্রকাশের অভাবের জন্য ভারতীয় সমস্যা সমাধানের অসামর্থ্যের সনাতনী যুক্তিই আমাদিগকে শুনিতে হইবে। অদ্ভুত অবস্থা বটে!

---

**নিজ বাসভূমে পরবাসী—**

নিজ বাসভূমিতে বাঙালী কিভাবে পরবাসী হইয়া উঠিতেছে, বাঙলা সরকারের চাকুরীতে লোক নিয়োগ বিভাগের এডভাইজার ডাক্তার এন দাসের রিপোর্টে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার দাস বাঙলা দেশের বিভিন্ন মিল, অফিস, ফ্যাক্টরীতে চিঠি পাঠাইয়া কোন্ বিভাগে কত

বাঙলী চাকুরী করে, তাহার হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের পাটকলগুলিতে ২ লক্ষ লোক চাকুরী করে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন মাত্র বাঙালী। কেরানীর কাজটা বলিতে গেলে শিক্ষিত লোকের কাজ। পাটকলগুলিতে যত বাঙালী কেরানীর কাজ করে তাহার মধ্যে শতকরা ৯৪ জনই বাঙালী। পাটকলগুলিতে উপরওয়ালার কাজ করেন ৭৭১ জন, ইহাদের মধ্যে ৪৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৬ জন মাত্র বাঙালী। পাটকলের তাঁতের কাজে বাঙালী খাটে শতকরা ৭৬ জন, মিস্ত্রীর কাজ করে শতকরা ৮৩ জন বাঙালী। সুতরাং অফিসারের কাজ করেন মাত্র শতকরা ২৩ জন বাঙালী। ইলেকট্রিকের কাজের প্রসার দিন দিনই দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। পাটকলের কাজে বাঙালীর তবু একটু জায়গা আছে, কিন্তু ইলেকট্রিকের কাজে তাও নাই। বাঙালীদের সংখ্যা এ ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ৩৪ জন। মোটর ড্রাইভারের কাজ করিয়া বাঙলা দেশে অসিয়া কম লোক অন্ন-সংগ্রহ করিতেছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঞ্জাবীদেরই প্রাধান্য। মোটর বাসের মালিকেরা ব্যবসায়ে কেহ কেহ প্রতি বাসে মাসে এক শত হইতে দুই শত টাকা নীট লাভ করে। কিন্তু এই ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া যাহারা লাভবান হইতেছে বাঙলা দেশে শহরের তেমনই সব মোটর গাড়ীর মালিকদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন মাত্র বাঙালী। যাহারা মোটরের লাইসেন্স লইয়া গাড়ী চালায় তাদের মধ্যে শতকরা ২৩ জন মাত্র বাঙালী আর সকলেই অবাঙালী। মাঝির কাজে বাঙালীর সংখ্যা কিছু বেশী, নৌকার ব্যবসা করিয়া খায় তিন লক্ষ বাঙালী; অন্যত্র অবাঙালীর সংখ্যা ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাক্তার দাসের রিপোর্টে যে সব কারবারের চাকুরিয়ার হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ৫ লক্ষ চাকুরিয়ার মধ্যে মাত্র শতকরা ৩৩ জন বাঙালী। বাঙালীর এই দুরবস্থা কিসে দূর হইতে পারে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে।

---

**শিক্ষায় মেয়েদের সাফল্য—**

এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কুমারী কনক পুরকায়স্থ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সপ্তম, নবম ও দশম স্থানও ছাত্রীরা অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে মেয়েরা অধিকতর সংখ্যায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। মেয়েদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এই আগ্রহ এবং যোগ্যতার এমন পরিচয় খুবই সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

---

**আতঙ্কের কারণই আতঙ্ককর—**

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার ফলে লোকের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। তাহাদের সাহস, বল, বীর্য্য থাকে না এবং কথায় কথায় আঁতকাইয়া উঠে। পরাধীনতার ফলে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার অভাবে এমন দুর্ব্বলতা আমাদের সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমরা এই সংস্কারের চাপে হিতাহিত তলাইয়া দেখি না। ব্যাঙ্ক হইতে বেপরোয়া ভাবে টাকা তুলিবার চেষ্টা, নোট লইতে অস্বীকার করা, নোট ভাঙাইয়া কাঁচা টাকা জমাইবার চেষ্টা আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের অবিবেচনারই ফল। আতঙ্ক যদি বাস্তবেই পরিণত হয়, তাহা হইলে এই সব হিসাবী বুদ্ধি কোন কাজে আসিবে না; পক্ষান্তরে আতঙ্কের প্রকৃত কারণ আপাতত যেখানে নাই, সেখানে মানসিক দুর্ব্বলতাবশত আতঙ্কে বিকল হইয়া অবিবেচনার কাজ করিলে অনর্থই বুদ্ধি পাইবে, নিজের ক্ষতি হইবে এবং সেই সঙ্গে অপরের ক্ষতিও ঘটান হইবে—যেজন্য ভয়, সেই ভয়ের কারণ সৃষ্টি করা হইবে নিজেদেরই ভয়াতুরতার ফলে। আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এমন আতঙ্কগ্রস্ত না হন। এখন বুদ্ধি ঠিক রাখিতে হইবে, কারণ নিজেদের সকল রকম দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অনাগত ভয়ে আড়ষ্ট হইবার সময় আমাদের অন্তত এখন নয়।

---

**কৃষ্ণ নিন্দার প্রতীকার—**

ইউরোপীয় রাজনীতি, বিশেষভাবে নিটশের মতবাদের দিক হইতে ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত যাঁহারা কৃষ্ণ চরিতের বিচার করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর অন্তরের দেবতা যে কৃষ্ণ, যে কৃষ্ণ সাধনার ধন, সে কৃষ্ণ শুধু ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের একজন বিশিষ্ট পুরুষ নহেন। তিনি আর্য্য সভ্যতার আত্মা স্বরূপ, ভারতীয় সংস্কৃতির তিনি প্রাণময় পুরুষ। তাঁহাকে বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের কিছু থাকে না; সুতরাং কৃষ্ণ-নিন্দা করাতে যে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা হয় নাই, এমন যুক্তির কিছুমাত্র মূল্য নাই। গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার এলবার্ট হলে হিন্দু জনসাধারণের মহতী সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের এই দিকটার একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এই কথাটা, যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধির মধ্যে শুধু হিন্দুর ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গ্লানিকর উক্তি করিয়া নিজের প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছে, হিন্দুর অন্তরে ইহাতে আঘাত যে কতটা লাগিয়াছে, এলবার্ট হলের সভার উত্তেজনাতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কতকটা সুখের বিষয়, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট "ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার" এই গ্লানিকর কার্য্য উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহারা ঐ পত্রের উপর ভারতরক্ষাআইনের প্রয়োগ করিয়াছেন।

# পাহাড়ের দেশে

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

রৌদ্র ঝলমল করচে দূরের পাহাড়ে
ঠিক যেন সোণার রঙে আঁকা ছবি।
তারি উপরে নীল আকাশে
শাদা মেঘের দল চলেছে একটার পিছনে আর একটা,
মন্থর গতি তাদের।
দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঝির ঝির করে নেমে পড়চে
একটি ক্ষীণ ঝরণা
যেন সবুজ ওড়নায় জরির পাড়।
কালো কালো পাথর
যেন পাথুরে মহিষের বাচ্চা।
পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়িদের
শুক্‌নো ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে,
তারি মাঝে মাঝে
মাথা তুলে আছে সগর্ব অসঙ্গতি
সাহেবদের বাঙ্‌লো।
দলে দলে চলেছে পাহাড়িয়া ছেলেরা
পিঠে ঝুড়ি ঝুলিয়ে
সিনকোনার বাগানের কাজে।
তাদের কোথাও আগে কোথাও পিছে
চলেছে পাহাড়ি মেয়ের দল,
তাদের গানের সুরের সঙ্গে
ফেনিয়ে উঠ্‌চে
তাদের হাসি।
বাঁশঝাড়ের বাতাসে উঠেছে বেজে
স্বনন ধ্বনি
আর পাহাড়িয়া পাখীর শিস দেওয়া গান।
পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলেছে পথ
বাঁকে বাঁকে ঘুরে;
বস্তা বোঝাই পিঠে চলেছে সেই পথে ছোট ছোট ঘোড়া।
হঠাৎ তারা চমকে
সরে' দাঁড়ায় পথের পাশে
পাহাড়ের গা ঘেঁসে,
পিছন থেকে হরণ বাজিয়ে আসছে মোটর গাড়ী
কে জানে কার।

পাহাড়ের উঁচু নীচু পথ ঘুরে
বেড়িয়ে ফিরে এলেম বাসায়;—
দক্ষিণের ছোট্ট ঘরে ঢুকতেই দেখি
শুয়ে আছেন বিছানায়
গৃহিণী।
ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙুলে তাঁর;
তরকারী কুট্‌তে বসে বঁটিতে কেটে গেছে আঙুল।
এই ঘোরো কথাটা
কাব্যে লেখার বিষয় কি না জানিনে
এমন কি গদ্য কাব্যেও,
কিন্তু' কাব্য আপনি এসে পড়ল
যখন দেখলুম
বেদনায় কাতর মুখ
ঢল ঢল দুটি চোখ
তাতে টলমল করছে অশ্রু।
কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়,
অকাব্যেরও দরকার আছে সংসারে।
অনুরোধ করে' নিয়ে এলুম তাঁকে
চা-এর টেবিলে,
রুটি মাখনের যজ্ঞভূমিতে।
সেখানে সাজানো আছে জ্যামের কৌটো
পনিরের টিন।
টেবিলে আছে আরো
গতরাত্রের বাসি পরটা
টাট্‌কা ভাজা ডিমের বড়া।
গল্পের আসর উঠ্‌ল জমে
গল্পের গোরুও উঠ্‌ল গাছে;—
আজগুবি গল্পে আমার কণ্ঠস্বর বাজল
গম্ভীর খরজে
তাঁর উচ্চ অবিশ্বাস উঠ্‌ল
মধুর পঞ্চমে।
এমন সময় উপরে পাহাড়ে
পাখী উঠ্‌ল ডেকে
"বউ কথা কও"

**অভিনব সংবাদপত্র**

ছায়াচিত্রজগতে সবাকচিত্রের আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। বিজ্ঞানের পরবর্ত্তী কালের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ হওয়ায় আমাদের পূর্ব্বেকার বিস্মিত ভাব ক্রমশ দূর হতে আরম্ভ হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা যে ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কোন কিছুর আবিষ্কারে এতখানি আর বিস্ময় প্রকাশ করব না। সংবাদপত্র এতদিন নির্ব্বাক ছিল। অর্থাৎ সবাকচিত্রের মত কথা বলতে পারত না। সম্প্রতি জনৈক ইঞ্জিনিয়ার এক অভিনব সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। সংবাদপত্রখানির ছাপার অক্ষর সাধারণ অক্ষর নয়। কতকগুলি অদ্ভুত রেখা ও চিহ্নের সাহয্যে সংবাদপত্রের একপৃষ্ঠা ছাপা হয়। খবর শুনতে হলে কাগজটিকে একটি বিশেষভাবে তৈরী মেশিনে রেখে যন্ত্রটি চালাতে হয়। গ্রামোফোন মেশিন থেকে আমরা যেভাবে স্পষ্ট কথা শুনতে পাই ঠিক সেভাবে সংবাদগুলি শুনতে পাব। সংবাদপত্রের অপর পৃষ্ঠাটি সাধারণ অক্ষরে ছাপা থাকায় মেশিন অচল হলে অথবা অন্য কোন অসুবিধা মনে করলে পাঠক সংবাদপত্র পাঠ থেকে বঞ্চিত হবে না।

ডাক্তার যখন রোগীকে সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন সে সময় এই অভিনব সংবাদ-পত্রখানি রোগীকে দৈনন্দিন ঘটনা শুনিয়ে তার পরিশ্রম লাঘব করে। হাসপাতালের রোগীদের এই অভিনব সংবাদপত্র নিঃসঙ্গ সময়ের বিশেষ বন্ধু।

**শব্দ-প্রতিরোধক টেলিফোন ঘর**

গোপনীয় সংবাদ যাতে অপরের কানে না যায় এর জন্য যথেষ্ট সাবধান থাকা প্রয়োজন। আপনি টেলিফোনে যে কথা বলবেন তা যদি গোপনীয় হয় তা হলে আপনাকে এমন যায়গা থেকে কথা বলতে হবে যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে। মনে করুন আপনার জনৈক বন্ধু কোন কারখানা থেকে আপনাকে টেলিফোনে জরুরী কথা বলছেন। কারখানার মেশিনের কর্কশ শব্দ আপনার বন্ধুর কথা কিছুই আপনাকে শুনতে দিচ্ছে না। আপনি ও খুব জোরে জোরে কথা বলা সত্ত্বেও তিনিও কিছু বুঝতে পারছেন না। অথচ আপনারা যে বধির এ অপবাদ অতি বড় নিন্দুকও দিবে না। অনেক সময় এরকম গোলমালের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পৃথকভাবে তৈরী ঘরে ফোন করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিক যেভাবে আবদ্ধ করা হয় তাতে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। বদ্ধ বাতাসে প্রাণ বের হবার জোগাড় আর কি!

সম্প্রতি জনৈক বৈজ্ঞানিক টেলিফোনের জন্য পৃথক ঘর আবিষ্কার করেছেন। ঘরের দরজা না থাকায় এবং নীচের দিক সম্পূর্ণ খোলা থাকায় বাতাস চলাচলের কোন ব্যাঘাত হয় না। ঘরের চারিপাশের আবরণ একপ্রকার ধাতু থেকে তৈরী। এই আবরণগুলি শব্দ-প্রতিরোধক হওয়ায় বহির্ভাগের কোনরূপ শব্দ ঘরের মধ্যে একটুও প্রবেশ করে না। এমন কি ভিতরের কথাও বাহিরে পৌঁছায় না।

মিলে, বড় কলকারখানায় অথবা সিনেমায় সাধারণের জন্যে এ রকম শব্দ-প্রতিরোধক টেলিফোন ঘর বিশেষ প্রয়োজন।

**জানেন কি?...**

লিনটনের জন এল্ডি নামে জনৈক ভদ্রলোক চল্লিশ বৎসর পানীয় জল না খেয়ে বেঁচেছিলেন। ১৮৯৫ সাল থেকে তিনি জল পান করা একেবারে বন্ধ করেন। এই দীর্ঘ বৎসর চা, কফি ও দুধ খেয়ে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটাতে পেরেছিলেন।

**ফুলের পাপড়িতে নাম লেখা**

উপহারের জিনিষের উপর নিজের নামটা সবাই লিখে দেয়। ফুলের তোড়া উপহার দিতে গিয়ে একটুকরা কাগজে লেখা নামটা প্রায়ই কোথায় হারিয়ে যায়। সম্প্রতি জনৈক ফুলের দোকানের মালিক আলট্রা ভাইওলেট আলো দিয়ে ফুলের পাপড়ির উপর পছন্দসই অক্ষরে নাম লিখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

**আমেরিকায় ফোনোগ্রাফের কাজ**

কেবলমাত্র লোককে গান শুনিয়ে আনন্দ দেওয়াই ফোনোগ্রাফের কাজ নয়। আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ফোনো-গ্রাফকে কিভাবে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে সকল বিষয়ে উপযোগী করে তোলা যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন; এবং তাঁরা অনেক বিষয়ে সাফল্যলাভও করেছেন। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেই সেখানের ফোনোগ্রাফ কিভাবে জনসাধারণের কাজে লাগে তা বুঝতে পারা যায়।

ব্রাউন ইউনিভারসিটির জনৈক দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র অনেক চেষ্টা করেও ভোর সাড়ে সাতটায় ঘুম থেকে উঠতে পারত না। শেষে ফোনোগ্রাফের সাহায্য নিয়ে তাকে পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করান হয়েছিল। ভোর সাড়ে সাতটায় তার শোবার ঘরের ফোনোগ্রাফ থেকে ঐ ছাত্রেরই নিজ কণ্ঠস্বর প্রথমে বিনীতভাবে এবং শেষে কর্কশভাবে ছাত্রকে বিছানা ত্যাগ করতে উপদেশ দিত। নিদ্রিত অবস্থায় ছাত্রটি নিজের কণ্ঠস্বরকে এভাবে ধ্বনিত হতে শুনে বিছানা ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ত। ফলে ছাত্রটি কয়েকদিনের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে লাগল। পাখী, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতির স্বর অনুকরণ করতে এবং ম্যাজিকের নানারকম কৌশল শিখতে ফোনগ্রাফের এ ভাবের সাহায্য জনসাধারণ যথেষ্ট প্রয়োজন মনে করে। আমেরিকায় ফোনোগ্রাফের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৯

বিভাবরী চেয়ারে বসলো—মুখে কথা নেই; দু'চোখের দৃষ্টি বিমলের মুখে নিবদ্ধ। বিমল কখন্ এর মধ্যে দু'চোখ মুদ্রিত করেছে!

অলকা ধীরে ধীরে গিয়ে বইখানি রাখলো টেবিলের উপর। প্রিয়শঙ্কর এবং বেহারিবাবুর মুখে কথা নেই;

ঘরে এতক্ষণ যে প্রাণের হিল্লোল বইছিল, সহসা যেন তা স্তম্ভিত হয়েছে!

দু'মিনিট, চার মিনিট......প্রায় দশ মিনিট কাটলো এমনি নিঃশব্দতায়। তার পর প্রিয়শঙ্কর এ নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কথা কইলেন, বললেন,—ক'দিন ভুগলো, বেহারি?

বেহারিবাবু বললেন—তা প্রায় দশ বারো দিন হবে!...... তাই না মা? প্রশ্নটা বেহারিবাবু করলেন অলকাকে উদ্দেশ করে'......

টেবিলের উপর বই রেখে অলকা চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল যেন কাঠের পুতুল! মনে হচ্ছিল, এখানে তার আর স্থান নেই......এখনি বিদায় নেওয়া উচিত। কিন্তু চলে যেতে পা সরছিল না। ভাবছিল, যাবার আগে যেন অনেক কথা বলে' যাওয়া উচিত! ......কি সে কথা, কিছুতেই তা তার বোধগম্য হচ্ছিল না !

এখন বেহারিবাবুর প্রশ্নে সে তাঁর পানে তাকালো, তাকিয়ে বললে,—আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ......তবে দশ বারো দিনই হবে......

এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর সে-রাত্রের কথাগুলো বিদ্যুতের অক্ষরে ফুটে উঠলো......গ্রীক-চার্চ্চের কাছে ট্রাম থেকে হঠাৎ নেমে এসে অলকার জন্য সেই গভীর দুশ্চিন্তা ......তার উপর পাহারাদারীর সেই আবদার আর জুলুম!......

একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে উতল হয়ে উঠলো...... সে নিশ্বাস অলকা রোধ করতে পারলো না।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—টাইফয়েড নয়?

বেহারিবাবু দিলেন জবাব; বললেন,—না।

প্রিয়শঙ্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ফেলে বললেন— সৌভাগ্য!......এবয়সে ও রোগ কি রকম সাংঘাতিক......

তার পর তিনি চাইলেন বিভাবরীর পানে, বললেন,— বিমল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো!......তা তুমি এক কাজ করো বরং বিভা......

বিভাবরী বললে,—কি?

প্রিয়শঙ্কর বললেন—মুখ হাত ধুয়ে নাও......রাঁচি থেকে কলকাতা......মোটরে লম্বা পাড়ি......আমাদের সুটকেশটা ওপরে এনেছে তো?

বিভাবরী বললে,—আনতে বলোনি তো তুমি।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—ও......

তিনি চাইলেন বেহারিবাবুর পানে, বললেন—কি করা যায় বেহারি?......কিসের সম্বন্ধে কি করা—বেহারিবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না,—তাই তিনি প্রিয়শঙ্করের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে' রইলেন।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হোটেলে যাবো? এখানে থাকার সুবিধে হবে কি......

বেহারিবাবু বললেন,—হুঁ......তবে এ-রাতটা না হয় এইখানেই কাটিয়ে......

প্রিয়শঙ্কর বললেন— যা বলেছো! সারাদিন পথে ছুটোছুটি......তাই হবে। তাহলে তুমি বলে' দাও গাড়ী থেকে আমাদের সুটকেশটা ওপরে দিয়ে যাক। আর গাড়ী-খানা অফিশের গাড়ী যে গেরাজে থাকে, সেইখানে যেন রাখা হয়। কাল সকালে......

এই পর্য্যন্ত বলে' তিনি কি ভাবলেন,—নিমেষের জন্য,— তার পরেই বললেন—আচ্ছা চলো, আমি ড্রাইভারকে instructions দিয়ে আসি......আর সুটকেশটাও অমনি......

এই কথা বলে' বেহারিবাবুকে নিয়ে প্রিয়শঙ্কর সে ঘর থেকে বা'র হলেন। ঘরে এখন তিনটি প্রাণী......শয্যায় মুদ্রিত নেত্রে বিমল......চেয়ারে বসে' বিভাবরী......এবং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অলকা!......

অলকার অস্বস্তির সীমা নেই! কেবল মনে হচ্ছিল, সে যেন এখানে ট্রেশ্‌পাশ্ করেছে......

হঠাৎ বিভাবরীর স্বর কানে বাজলো। বিভাবরী বললেন, —আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে!......বসুন......

অলকা বললে,—আমি বাড়ী যাবো। ......নার্স আছেন......সুশীলাদি......একটু দরকারে বাইরে গেছে......

আমাকে বলে গেছে, যতক্ষণ সে ফিরে না আসে, যদি থাকি......! তাই......

বিভাবরী বললেন—ও......! তা আপনাকে এখনি ফিরতে হবে বুঝি?

অলকা বললে,—আপনারা এসেছেন......ওঁকে দেখতে পারবেন......তাছাড়া এখন আর schedule ধরে' কোনো রকম সেবা-পরিচর্য্যা তো করতে হবে না। তাই ভাবছিলুম, আমার না থাকলেও চলবে'খন!......

মৃদু হেসে বিভাবরী বললে,—যদি বলি, সারাদিন চলন্ত মোটরে দারুণ উদ্বেগ নিয়ে থাকার দরুণ আমাদের শরীর এমন যে জলের গ্লাশ এগিয়ে দিতে বললে হয়তো ভুল করে' বসবো......?

কথার মৃদু-মধুর ভঙ্গী এবং ঐ হাসিটুকু......অলকার চমৎকার লাগলো! অলকা বললে,—তাহলে একটু বসতেই হবে আমাকে......যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুশীলাদি না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তত......বসছি!

একখানা চেয়ার টেনে অলকা সে চেয়ারে বসলো!

বিভাবরী নিরীক্ষণ করলে......অলকাকে......তাকে দেখে ভালোই লাগলো! বিভাবরী বললেন,—আপনার সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক আছে?

অলকার মনের মধ্যে একরাশ সরীসৃপ নিমেষে যেন কিলবিল করে' উঠলো অলকা চাইলো সেই উন্মীলিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে' বিভাবরীর প্রশ্নের জবাব দিলে; বললে,—ঐ যে উনি চোখ মেলেছেন!......ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন......

বিভাবরী সকৌতুহলে চাইলো বিমলের পানে...... জিজ্ঞাসা করলে,—ইনি তোমার কে হন?

বিমল কোনো রকম চিন্তা না করেই জবাব দিলে,—বন্ধু!......দুর্দ্দিনের বন্ধু......

বিভাবরী অবাক! বন্ধু! শহর থেকে চিরদিন একান্ত দূরে এবং এযুগের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করবার জন্য বিভাবরীর মনে এমন বন্ধুত্বের আভাসও কোনোদিন ইঙ্গিতে জাগেনি! এক নিমেষ চুপ করে' থেকে বিভাবরী বললেন,—কৈ, এ বন্ধুত্বের কথা শুনিনি তো?

কথাটা বলবামাত্র বিভাবরীর মনে পড়লো, না-শোনায় বিস্ময়ের কিছু নেই; রাঁচি ছেড়ে বিমলের চলে' আসা-ইস্তক তাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত সব সংবাদ দীর্ঘকাল ধরে' রহিত হয়ে আছে; প্রিয়শঙ্করের কাছে বিমলের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সংবাদ সে পেয়েছে যে বিমল ভালো আছে এবং অফিশিয়াল ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে বিমলের শিক্ষা যা চলেছে, তাতে তিনি খুশী বৈ অখুশী নন! একবার শুধু প্রিয়শঙ্কর বলেছিলেন, বিমল রেশের মাঠে যাচ্ছে......সে-যাওয়ায় তিনি নিষেধ তোলেন নি বা বিরক্ত প্রকাশ করেন নি......শুধু বলেছিলেন, জীবনে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য রাশ আলগা করে' মানুষকে দিক্‌বিদিকে ছেড়ে দেওয়া দরকার! চারিদিকে নিষেধ-শাসনের প্রাচীর তুলে ছোট গণ্ডীর মধ্যে দানাপানি দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা লাভ হবে না—তার ফলে পরে মহা বিপর্য্যয় ঘটা বিচিত্র নয়! এসব হেঁয়ালি-কথা বিভাবরী সুস্পষ্ট বুঝতে পারে নি........ বোঝবার জন্য চেষ্টাও করে নি!

বিভাবরীর এ প্রশ্নের উত্তরে বিমল বললে,—না।

বিভাবরী চাইলো অলকার পানে, বললে—আপনি কোথায় থাকেন? অলকা বললে—এইখানেই......মানে, ক'খানা বাড়ীর পরে এই রাস্তার উপরেই অন্য বাড়ীতে।

বিভাবরী বললে,—কলেজে পড়াশুনা করেন?

অলকা বললে,—না!

বিভাবরী আবার চাইলো অলকার পানে......নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। দেখলো, না, অলকার সিঁথিতে সিঁদুর নেই!......ব্রাহ্ম?......হয়তো, তাই! মনে জাগলো কৌতূহল......কিন্তু সে কৌতূহল পরিতৃপ্তির উদ্দেশে এসম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন সে করতে পারলো না।......

ঘরে আবার তেমনি স্তব্ধতা......

এবং এ স্তব্ধতা ভাঙ্গলেন প্রিয়শঙ্কর রায়......সিধুর ঘাড়ে সুটকেশ চাপিয়ে এঘরে পুন প্রবেশ করে'......

প্রিয়শঙ্কর রায় বললেন,—পাশের ঘরে সুটকেশ রাখো ......ও ঘরেই আমাদের দুটো বিছানা করে' দিয়ো......গাড়ীতে দু'খানা ক্যাম্প খাট আছে......ব্যবস্থা করেই ক্যাম্প খাট সঙ্গে এনেছি। ......খাবার জন্য সমারোহের প্রয়োজন নেই...... খানকতক লুচি ভাজিয়ে নিলেই চলবে! তুমি কিন্তু যাও বিভা,......মুখ হাত ধুয়ে নাও......এঁরা আছেন, হাতাহাতি যে সাহায্য দরকার হবে......

কথাটা বলে' প্রিয়শঙ্কর চাইলেন অলকার পানে...... বললেন—লুচি ভাজতে পারবে?

মাথা নেড়ে মৃদু হেসে অলকা জানালো, পারবে !

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—তাহলে একটু কষ্ট করতে হবে। একা নয়......বিভাও সাহায্য করবে......দুজনে বসে, খানকতক লুচি ভেজে ফ্যালো!......সিধুকে আপাতত কিছুক্ষণ পাবে না কিন্তু......ওকে একবার বাজারে পাঠাবো......তাছাড়া ক্যাম্প খাট খাটিয়ে ও বিছানা পেতে ফেলুক!......তুমি তাহলে এসো বেহারি......কাল সকালেই আবার এখানে এসো ......আজকের মতো তোমার ছুটি!

বিভাবরী আর অলকা বসে লুচি ভাজছিল......বিভাবরী বেলে দিচ্ছে......অলকা ভাজছে......এ কাজ কতকাল পরে ......অলকার মনে হচ্ছিল, দীর্ঘদিন সে শুধু পথে পথে ঘুরে কাটিয়েছে......ঘর যেন ছিল না।......যে-ঘরে নিত্যদিন ফিরেছে, সে-ঘরে মুখের সামনে পেয়েছে তৈরী খাবার......সে খাবারের রচনা এবং রুচি পরের উপরেই নির্ভর করেছে! ......আজ নিজের হাতে রন্ধনশালার চার্জ্জ নিয়ে মনে হচ্ছিল, পথের পাড়ি শেষ করে' আজ যেন সত্যকার ঘরের সে দেখা পেয়েছে এবং সেই ঘরে......আশ্রয়......এ চিন্তা তার মনে যেন হাজার বাতির ঝাড় জেলে দেছে!

ও-ঘরে বিমলের সঙ্গে প্রিয়শঙ্করের কথা চলেছে......কি কথা, এ ঘরে বসে' উৎকর্ণ হয়েও অলকা তার একবিন্দু গ্রাহ্য

করতে পারলো না!......

বিভাবরী তার সংগে অনেক কথা কইছিল—বিমলের কথা, বিভাবরীর নিজের কথা......প্রিয়শংকরের কথা......রাঁচির কথা!

বিভাবরী বলছিল,- বিমল ভারী লাজুক......ছেলেবেলায় মা মারা গেছেন......বিমলের বাবা ছিলেন রাঁচির খুব পয়সাওয়ালা উকিল......মক্কেল নিয়ে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন ......তাঁর সে কর্ম্মরত মনের নাগাল পাবার জন্য বিমল আকুল হলেও সেজন্য যেটুকু কষ্টস্বীকার করা প্রয়োজন, সে কষ্ট গ্রহণ করতে চিরদিন ছিল কুণ্ঠিত! ......একবার......সে প্রায় দু'বছর আগেকার কথা দু'দিন জ্বরে ভুগে জ্বর ছাড়বামাত্র বিভাবরীদের বাড়ী এসে উপস্থিত! শুকনো মুখ......দু'চোখে অধীর করুণ মিনতি! সকলে জিজ্ঞাসা করে—কি রে? তা বিমল কোনো জবাব দেয় না......সবার পানে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকিয়ে থাকে! শেষে বিভাবরী তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলো, জ্বর ছাড়তে এখানে পালিয়ে এসেছো. ... কেন, বলো তো? এ প্রশ্নে কাঁদ কাঁদ গলায় বললে, একলাটি বিছানায় পড়ে থাকি.........কারো সংগে কথা কইতে পাই না......তার উপর বামুন চাকরের তৈরী বার্লি খেয়ে খেয়ে খাবার রুচিই গেছে উঠে; আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো? ......কাউকে না জানিয়ে......চুপি চুপি এমন কিছু খেতে চাই, যতে খাবার রুচি ফিরে পাই!......একথায় বিভাবরীর মনে ভারী মমতা জাগলো......নিঃশব্দে সে এক প্লেট সুপ আর ওভালটিন তৈরী করিয়ে এনে বিমলকে খাওয়ায়!......সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমল রয়ে গেল বিভাবরীর কাছে. ... যেন ছোট ছেলে মমতার প্রত্যাশী হয়ে......

এমনি নানা কাহিনী বিভাবরী শোনাচ্ছিল অলকার কানে ......অলকা একাগ্র মনোযোগে এসব কাহিনী শুনছিল; সে উপলব্ধি করছিল, এসব কাহিনীর সংগে মানুষটির সর্ব্বত্র চমৎকার সামঞ্জস্য। সে'ও তো এই ক'মাসের পরিচয়ে জেনেছে......

সুশীলা ফিরে এলো......এ ঘরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে বললে—আমি এসেছি দিদিমণি......ওদের যে এত ভয় হয়েছিল......

কথা শেষ হলো না......কথা বলার সংগে সংগে চোখ পড়লো বিভাবরীর দিকে; ইনি কে?

এই কিশোর বয়সেই বিভাবরীর মুখে রমণীয় কান্তির সংগে এমন মহিমাময় প্রশান্তি,—এতখানি সম্ভ্রমের আভাস যে, তার সামনে প্রগলভতার উচ্ছ্বাস চকিতে স্তম্ভিত হয়;

বিভাবরীর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এতটুকু যেন রহস্য নেই; সে দৃষ্টি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি স্বচ্ছ; বিভাবরীর মুখের পানে চাইলে তার মনের অতল-গহনতল পর্য্যন্ত চোখে পড়ে। তাকে চিনতে যেমন বিলম্ব হয় না, তেমনি নিমেষে বুঝা যায়, তার মধ্যে বিস্ময় নেই, রহস্য নেই,—খুব যেন পরিচিত-জন!

সুশীলার বিস্ময় স্তম্ভিত ভাব দেখে অলকা চাইলো বিভাবরীর পানে, বললে,—ইনিই রাতের নার্স......সুশীলাদি। সেবা করবার শক্তি অসাধারণ.........সারা রাত অক্লান্ত যত্নে-মমতায় সেবা-পরিচর্য্যা করেছেন......আমি দেখেছি তো!......

বিভাবরীর দু'চোখে প্রশংসমান দৃষ্টি. বিভাবরী চেয়ে রইলো সুশীলার পানে।

সুশীলা কোনোমতে স্তম্ভিত-ভাব কাটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে,—এ'কে তো দেখিনি দিদিমণি......

অলকা বললে,—দ্যাখোনি, এবার দ্যাখো। ইনিই সব...... মানে, মিষ্টার রায়ের মেয়ে.........শ্রীযুক্তা বিভাবরী দেবী ......তোমার পেসেণ্টের ভাবী-বধূ......

সুশীলার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো......সুশীলা বললে,—ও........তারপর দুই হাত আপনা থেকে পুটবদ্ধ হলো। কৃতাঞ্জলিপুটে সুশীলা বললে,—নমস্কার!

শান্ত মৃদু হাস্যে মিষ্টি কণ্ঠে বিভাবরী বললে,—নমস্কার।

অলকা বললে,—ও-ঘরে তোমার পেসেণ্ট ভালোই আছেন, সুশীলাদি।......বসতে চাও, ও-ঘর থেকে মোড়া এনে দরজার সামনে বসো...বসে' গল্প করো...

সুশীলা বললে,—তাই বসি।......

লুচি ভাজা হলে অলকা দিলে বিভাবরীকে তাড়া... বললে,—আপনি যান্—গা ধুয়ে নিন্......লুচি না হলে জুড়িয়ে ময়দার ড্যালা হয়ে যাবে। আমি আলু পটল ভেজে একটা তরকারী তৈরী করে' নি এর মধ্যে......

সুশীলা বললো, তুমি রান্নাবান্না জানো দিদিমণি?

অলকা বললে,—নিজের হাতে রান্নাবান্না করি না বলে' তুমি ভাবো সুশীলাদি, এ কাজে আমি একেবারে আনাড়ি?...তৈরী করি, খেয়ে দেখো...অখাদ্য বলে ফেলে দেবে না!...তাছাড়া সিধু আছে...ওকে না হয় একটু পাহারাদারি করতে বল কেমন! ...তারপরেই বিভাবরীর হাত ধরে তাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে অলকা বললে—না, আপনি আর এক মিনিট বসবেন না...গা ধুতে যান—!

মৃদু হেসে বিভাবরী বললে,—যাচ্ছি...কাপড়চোপড় বার করতে হবে তো...

অলকা বললে,—স্যুটকেশ এসে গেছে......আপনি যান কাপড়চোপড় বার করুন গে...না হলে এ'কে তো এই আনাড়ির হাতের রান্না...দেরী হলে এ আর মুখে রুচবে না! বিভাবরীর দাঁড়ানো চললো না...স্যুটকেশ থেকে শাড়ী সেমিজ বার করে' সে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে।

সুশীলা বললে,—আলু-পটল কুটে দেবো?

—দাও...কিন্তু সিধুকে না ডাকলে চলছে না! বাটনার কি ব্যবস্থা, জানি না আমি।

হেসে সুশীলা বললে,—খুব রাঁধিয়ে বটে!

অলকা বললে,—যে খেলতে জানে সুশীলাদি, সে কাণাকড়ি নিয়েও ঠিক খেলে যায়!...সারাজীবন আমি তো এই কাণাকড়ি নিয়ে খেলা করে' চলেছি ভাই!...কাজেই কোনো কাজের নামে আমার ভয় হয় না!

ছোট বঁটি নিয়ে সুশীলা কুটনো কুটতে লাগলো...অলকা ডাকলো সিধুকে।

অলকা বললে সিধ্‌কে—তুমি আমাকে বাটনাগ্‌লো শুধ্‌ বুঝিয়ে দাও সিধ্‌...নিজের হাতে তো একাজ করিনি কখনো...

সিধ্‌ বললে—তুমি বসো গে যাও দিদিমণি...আমি করছি...

প্রতিবাদ তুলে অলকা বললে,—না সিধ্‌...আজ ওঁরা এসেছেন. চার্জ্জ নিচ্ছেন...আমার এবার ছুটি মিললো। যাবার সময় নিজের হাতে সকলের সেবা করে' যাবো...তাতে তুমি বাধা দিয়ো না......

কথাগুলোর অর্থ সিধুর সম্যক উপলব্ধি হলো না...তবু ওর মধ্যে যেটুকু বুঝলে, তাতে অলকাকে বললে,—তুমি চলে যাবে দিদিমণি?

হেসে অলকা বললে,—না গেলে উপায়? তোমার বাবুর এ ছোট্ট ঘরে এত লোকের ঠাঁই হতে পারে না তো!

সিধ্‌ বললে,—ও......

তরকারী চড়িয়ে অলকা বলছিল সুশীলাকে,—নিজের রান্না নিজের মুখে কেমন লাগে, তা জানবার উপায় নেই...তবু মনে হচ্ছে সুশীলাদি, নেহাৎ অখাদ্য তৈরী হচ্ছে না...লোকের পাতে দেওয়া চলবে......

সুশীলা বললে,—খেতে কে তোমাকে বারণ করেছে?

অলকা বললে,—বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি কি না...... ভাবলুম, এখানে আসছি, কখন কত রাত্রে ফিরবো......তৈরী অন্ন যখন পাচ্ছি, তখন ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না!......

সুশীলা বললে,—তুমি আজ চলে যাবে? ওঁরা এলেন...

অলকা বললে,—ওঁরা এলেন বলেই তো আজ নিশ্চিন্ত খুসী মনে যেতে পারবো সুশীলাদি...ছুটীর আনন্দ কাকে বলে, আজ তা বুঝতে পারছি!...কি বন্ধনে যে আটকে পড়েছিলুম... জানেন তা শুধু অন্তর্যামী। কথার শেষে অলকা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো।...

বিভাবরী এলো......মুখ হাত ধুয়ে টিয়াপাখী-রঙের একখানি শাড়ী পরে......ইলেকট্রিক-আলোর ঝলকে সে শাড়ীতে তাকে দেখাচ্ছিল যেন সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী এসে উদয় হয়েছেন। অলকার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ছত্র......

অলকা বললে,—রান্না প্রায় শেষ! বাবাকে আপনি মুখহাত ধুতে বলুন গে......উনি খাবেন তো আমার হাতের তৈরী এ অখাদ্য?

বিভাবরী বললে,—খুশী হয়ে খাবেন।......বাবা সেখানে আমাকে দিয়ে মাঝে মাঝে রাঁধান্......কোথাও কিছু নেই...... হঠাৎ বাবা বললেন, ওরে কলকাতা থেকে থোড় এসেছে ..... নিজের হাতে থোড়-চচ্চড়ি রেঁধে আমাকে খাওয়াবি বিভা?

অলকা বললে,—রাঁধেন আপনি?

বিভাবরী বললে,—রাঁধি বৈ কি......বামুনদি দেখিয়ে দ্যায়......তবু সে যা হয়......খেতেন যদি, জীবনে ভুলতেন না। বাবা সেই রান্না খান......খেয়ে বলেন,—চমৎকার রে...... তোর ঐ থোড়-চচ্চড়ি দিয়েই আজকের খাওয়া শেষ করেছি!

কথাটা বলে' বিভাবরী হাসতে লাগলো।

ওই কথা, ওই হাসির অন্তরালে অলকা দেখছিল, সুন্দর সংসার...স্নেহ-মায়ায় সে-সংসার কানায়-কানায় পরিপূর্ণ...... ও-সংসার আরো দু'দিন বাদে আরো সমগ্র পরিপূর্ণতায় ভরে উঠবে...! ও সংসারের পাশেও হায়রে তার কোনদিন গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য মিলবে না!......

একটা নিশ্বাস সে কোনমতে রোধ করতে পারলো না!

খাওয়া-দাওয়া চুকতে বিলম্ব হলো না......

প্রিয়শঙ্কর বার বার বলতে লাগলেন,—তুমিও খেতে বসো মা লক্ষ্মী।

বিভাবরী বললে,—হ্যাঁ...আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই না হয় খেতে বসবো'খন......

অলকা বললে,—না। কতখানি পথ এসেছেন, বলুন তো!......আমি তো এখানকার লোক......আমার জন্য ভাববেন না!

বিভাবরী বললে,—এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে!......

অলকা বললে,—নিজের হাতে রান্না করে' আপনজনকে খাওয়াতে কতখানি আনন্দ...সে আনন্দ পেতে দিন......

বিভাবরী বললে,—কিন্তু আমি লুচি না ভাজলেও বেলেচি তো...আমারো কতখানি আনন্দ বলুন তো আপনাকে এ লুচি খাওয়াতে......

হেসে অলকা বললে,—সে শুভদিন আমার ভাগ্যে যদি উদয় হয়,......আপনি আমাকে খাওয়াবেন......

কথা শেষ হলো না...অলকা চাইলো প্রিয়শঙ্করের পানে, বললে,—লুচি দি...আগে ভেজে অন্যায় করেছি...গরম গরম ভেজে পাতে দিলে খেয়ে তৃপ্তি পেতেন......

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—এতেও অতৃপ্তি হচ্ছে না তো......

খাওয়া প্রায় শেষ...সিধুর পানে চেয়ে অলকা বললে,— মিষ্টি আর রাবড়ি দিয়ে যাও তো সিধু...আমি হাত ধুয়ে আসি।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হ্যাঁ, যাও আমাদের চুকলেই তুমি খেতে বসবে......

অলকা এ-কথার জবাব দিলে না।

খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল পাশের ঘরে।

মুখ-হাত ধুয়ে অলকা এলো বিমলের ঘরে......বিমল দু'চোখ মুদ্রিত করে শুয়ে আছে...

অলকা পা টিপে নিঃশব্দে তার কাছে এলো...বিমলের পানে তাকিয়ে রইলো...বুকের মধ্যে যেন সপ্তসিন্ধু তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো,—চারিদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বিমলের পায়ের উপর হাত রাখলো

চোখ চেয়ে বিমল ডাকলো,—অলকা দেবী...

অতি মৃদুকণ্ঠে অলকা বললে,—হ্যাঁ...

অলকা এলো বিমলের কাছে...বললে,—আমি আসি।... আর আমাকে দরকার হবে না বোধ হয়......

বিমল কোনো জবাব দিলে না......অবিচল দৃষ্টিতে অলকার পানে চেয়ে রইলো......অলকার বুকে......

অলকা বললে,—আর অমন অসহায় দৃষ্টি কেন!...এ জনারণ্যে আপনি আর একা নন্ তো!..!আমি আজ নিশ্চিন্ত হলুম। তবু যা পেয়েছি, ভোলবার নয়।...আমার শ্রীকৃষ্ণ...মনে আছে সে কথা?

(শেষাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# নিজামের রাজ্য

(ভ্রমণ কাহিনী)

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

## চার

## ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দির

ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দির অনেকেই দেখেন না। এলোরা ও অজন্তা দেখিবার জন্যই সকলে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কাজেই ঔরঙ্গাবাদের গিরিগুহা দেখিতে যান না। আমাদের মনে হয়, ইহা তাঁহারা মস্তবড় ভুল করেন, কেননা ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দিরগুলি দেখিলে তাঁহাদের তৃপ্তির কারণই ঘটিত।

পালি ভাষায় গিরিমন্দিরের নাম 'গুহা' বা 'লেনা'। পালি সাহিত্যে গুহা শব্দ বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন মাট্টিকা গুহা বা মাটির গুহা এবং গিরি গুহা (Mountain cave)। ঔরঙ্গাবাদ, এলোরা ও 'মহারাষ্ট্র দেশের যাত্রী' প্রবন্ধে আমি যে সকল গুহার কথা বলিয়াছি, সে সমুদয়ই গিরিগুহা। ঔরঙ্গাবাদের যে সমুদয় গুহা দেখিয়াছিলাম, তাহাও গিরিগুহা বা মন্দির।

বলে না। আমাদেরও ওদিকে লইয়া যাইতে আপত্তি করিয়াছিল, তবে ভাড়া অধিক দিবার প্রলোভনে সম্মত হইল।

পথ চলিয়াছে মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া—হেমন্তের রৌদ্র এদিকে তেমন প্রখর নয়, তারপর মৃদুমধুর বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় শ্রান্তি অনুভব করিতেছিলাম না। প্রত্যেকটি পাহাড়ই কোন না কোন প্রাচীন কীর্ত্তি লইয়া বিরাজিত। এদিকের পাহাড়ে কোন কোনটিতে বেশ গাছপালা আছে। তারপর মাঠের এখানে সেখানে বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষ। দূরে শহরের স্থানে স্থানে তোরণের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল—বেশ লাগিতেছিল। কোথাও কৃষকেরা মাটি কাটিতেছে, মহিষেরা চরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের দ্রুতগামী গাড়ী দেখিয়া বালকেরা লাঠি তুলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ বা দৌড়াইয়া আসিতেছে। দুই একটি পল্লীর
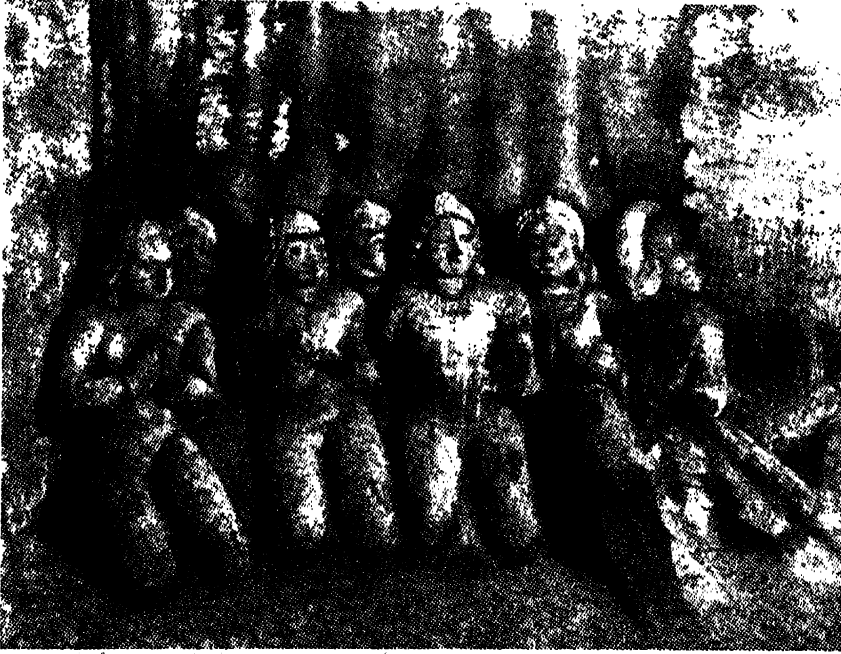
ঔরঙ্গাবাদ তিন নম্বর গুহা মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী

হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদের প্রভাবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ঔরঙ্গাবাদ যে বৌদ্ধপ্রভাবযুক্ত প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকে ঔরঙ্গাবাদ বা প্রাচীন খির্কীর চারিদিকের পর্ব্বতমালার বৌদ্ধদের গুহা ও বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ শ্রমণগণের যে প্রিয় আশ্রয় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান ঔরঙ্গাবাদ শহরের উত্তরদিকের পর্ব্বতমালার বুকে বিক্ষিপ্তভাবে ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দিরগুলি অবস্থিত। বিবিকা-মাকবারার পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে ঐ গিরিমন্দিরগুলির দিকে। পর্য্যটকগণ যাঁহারা এদিকে বেড়াইতে আসেন, তাঁহারা না বলিলে গাড়োয়ানেরা কিংবা মোটর চালকেরা এদিককার গিরিমন্দিরের কথা বড় একটা

পাশ দিয়া চলিলাম। পল্লীগ্রামের বাহিরটা দেওয়াল ঘেরা, সারি সারি মাটির ও ইটের বাড়ী—মাঝখানে মসজিদ দেখা যাইতেছে। কোন কোন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পুরুষ—বাড়ীর দরজার পাশে খাটিয়ার উপর বসিয়া নল দিয়া গড়গড়া টানিতেছে। পৃথিবীর কোন সংবাদ তাহারা রাখে কিনা কে জানে? আবার ইঁদারার পাশে গ্রাম্য-স্ত্রীলোকের জল তুলিবার জন্য ভিড় জমিয়া গিয়াছে। আকাশে সার বাঁধিয়া পাখীরা উড়িতেছে। কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেশে তাহারা চলিয়াছে, তাহা কে বলিবে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই গিরিগুহার নিম্নভাগে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দিরগুলির সন্ধান সকলের আগে দিয়াছিলেন ডক্টর ব্র্যাড্‌লি। ডক্টর ব্র্যাড্‌লি (Dr. Bradely)

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এস্থানের গিরিগুহাগুলির মাপজোপ করেন ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ডক্টর বার্জেস্ (Dr. Burges) ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দিরসমূহের স্থাপত্য পরিচয়, মূর্ত্তি পরিচয়, গুহাগুলির গঠন নৈপুণ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করেন এবং তাঁহার লিখিত সেই বিবরণ Archaeological Survey of Western India নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। কালপ্রবাহে অধিকাংশ মূর্ত্তি ও স্থাপত্য নিদর্শন ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল,—বর্ত্তমান সময়ে নিজাম রাজসরকার এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়া এখানকার গিরিগুহাগুলিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি—বামন অনুচরসহ সাত নম্বর গুহা ঔরঙ্গাবাদ

ঐখানকার গুহাগুলি প্রায় দেড় মাইল স্থান জুড়িয়া আছে। এই গুহাগুলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে আসে যে, কিরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিলে মানুষ এতদূরে আসিয়া এত ক্লেশ সহিয়া অধ্যবসায় সহকারে পাহাড়ের গা খুদিয়া এইরূপ অপূর্ব্ব গুহাগৃহ গড়িয়া তুলিতে পারে। এখানকার যে কয়টি গুহা অত্যন্ত সুন্দর এবং উল্লেখযোগ্য, তাহাদের কথাই এখানে বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে গুহাগুলি চিহ্নিত থাকায় দেখিবার ও বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। এখানকার সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় গুহা হইতেছে এক, দুই, তিন নম্বরের তিনটি গুহা। এক নম্বর গুহায় প্রবেশ করিলেই সেখানকার দুইটি বৃহদাকার থামের দিকে দৃষ্টি পড়ে। এক নম্বর গুহাটি একটি বৃহৎ বিহার। সম্মুখের বারান্দাটি প্রায় ষাট ফিট দীর্ঘ হইবে এবং আটটি বড় বড় থাম বারান্দার ছাত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই স্তম্ভগুলির পার্শ্বে দাঁড়াইলে বুঝিতে পারা যায় কত বড় দক্ষ শিল্পীরা এইসব গিরিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাহাড় কাটিয়া খুদিয়া নানারূপ শ্রীমূর্ত্তি, নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া কি সুন্দর রূপই না প্রদান করিয়াছেন! এক নম্বর গুহার স্তম্ভগুলি অপেক্ষাও তিন নম্বর গুহার স্তম্ভগুলি অধিকতর সুন্দর। আমি অপলকে এইসব স্তম্ভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কি সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্য—প্রত্যেকটি মূর্ত্তির মুখে, গঠনে অনবদ্য শিল্প সৌন্দর্য্য! বারান্দার মেজের পাথরগুলি বন্ধুর ও রুক্ষ, সেখানে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিলাম। আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু ব্যবসায়ী মানুষ, শিল্পের নৈপুণ্য বা আর্টের ধার ধারেন না, একেবারে খাঁটি পাউন্ড, শিলিং, পেন্সের মানুষ,—সেই মিঃ সুবারিডু বার বার বলিলেন—"বহুৎ আচ্ছা, আমরাপুরী হ্যায়!" বৌদ্ধ শ্রমণেরা একদিকে যেমন ত্যাগী ছিলেন, অসহ্য ক্লেশ তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা ছিলেন শিল্পানুরাগী, তাই যেখানেই থাকিতেন, সেইখানেই তাঁহারা একটা সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেন।

এই গিরিগুহায় চৈত্য গৃহটি খৃষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গিরিগুহার প্রায় সব চৈত্যের গঠনই একরূপ হইয়া থাকে, এইখানকার চৈত্যটিও অন্যান্য গিরিমন্দিরের চৈত্যের অনুরূপ। ছাতটির উপরটা গম্বুজের মত। প্রাচীন স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন করিয়া তৈরী করা হইয়াছে।

তৃতীয় নম্বর গুহাটিতে একদল ভক্ত উপাসকের মূর্ত্তি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলেই নতজানু হইয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা রত। দুই একটি মূর্ত্তির হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মত এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বৈদেশিক শিল্পীর প্রভাব রহিয়াছে। উহাদের দেশসজ্জা, মস্তকাবরণ, কিরীট ইত্যাদি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অপেক্ষা বৈদেশিক শিল্পের প্রভাবই ইহাতে বেশী।

এখানকার গিরিমন্দিরেও জাতকের গল্প খোদিত রহিয়াছে। এক স্থানে সুতসোম জাতকের গল্পটি অতি সুন্দরভাবে খোদিত করা হইয়াছে। গল্পটি এই—এক সিংহী বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুরক্তা হইয়া তাঁহার ঔরসে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। এখানে জাতকের সেই গল্পটি অতি সুন্দরভাবে খোদিত রহিয়াছে। এই গল্পটি এতদিন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল—কয়েক বৎসর হইল Monsieur Fondur উহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সারির গুহাগুলি দেখিতে আবার অনেকটা পথ যাইতে হইল, উহা নিশ্চয়ই আধ মাইলের বেশী হইবে। এ স্থানের মূর্ত্তিগুলির সহিত এবং স্থাপত্য রীতির সহিত ভারতের মূর্ত্তি ও গঠনপ্রণালীর সৌসাদৃশ্য অনুভূত হয়। নয় নম্বর গুহাতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ অবস্থার একটি বিরাট মূর্ত্তি আছে—উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোল ফিট হইবে।

আমরা সাত নম্বর গুহায় নৃত্য দৃশ্যটি দেখিলাম। এইটি অতুলনীয় বলিলেও সব কথা বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। পদবিন্যাস, রসনান্দোলন, হস্তের মুদ্রা সকলই চিত্তাকর্ষক। মনে হয় যেন, সুমধুর স্বরলহরীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, আর রূপসীবৃন্দ নৃত্যের তালে তালে ভক্তির প্রফুল্ল শতদল দেবতার চরণে নিবেদন করিতেছেন। যন্ত্রীরা কেহ বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ করতাল, কেহ বা অন্য কোনও যন্ত্র। এই সব মূর্ত্তিত ভঙ্গিমা উপভোগ্য। আমার কাছে এই সব মূর্ত্তি জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

অজন্তা ও অন্যান্য স্থানের গিরিমন্দিরে যেমন বামনের মূর্ত্তি দেখা যায়, এখানেও তেমনি বামন মূর্ত্তি রহিয়াছে। ঔরঙ্গাবাদের সাত নম্বর মন্দিরে একটি দেবীর সহচর রূপে এক বামন মূর্ত্তি দেখা যায়। বামন ভৃত্যটির মুখভঙ্গী, তাহার হাতের যষ্টি ইত্যাদি সকলেই বিচিত্র রকমের হাস্যের উদ্রেক করে। ঔরঙ্গাবাদের গিরিমন্দির ও তাহার ভিতর ও বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা যেরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সব

গিরিগুহা দেখিয়া থাকি, তাহাতে শুধু চোখের দেখাই হয়, প্রকৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছুই দেখা হয় না। তবু এইরূপ দেখায়ও অনেক আনন্দ ও শিক্ষালাভ হইয়া থাকে।

ইতিহাস আমাদিগকে যেমন অতীতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিতে শিক্ষা দেয়, তেমনি বর্ত্তমানের দিকেও আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া তোলে। একটা সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় ধর্ম্মরূপে ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া এক বিরাট জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। মিঃ পার্শি ব্রাউন (Percy Brown) এ বিষয়ে একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

"Buddhism was largely the religion of the country, and continued the creed of the majority of the people until Brahmanism again prevailed (Ceica A. D. 700). During this time India appears to have been the leading power through out the whole of the East, and all Asia looked to Buddhist India for the sources of its inspiration. The sacred sites in Kosala were the lode-star of the people, while the sayings of the Great Teacher were becoming the gospel of every country. The absorbing nature of the Buddhist religion was mainly responsible for this supremacy and signs are not wanting that this was India's Golden Age. * * * History furnishes several illustrations of the power of religion in the moulding of man's aesthetic productions, but probably none of these are more striking than the effect of Buddhism on the art of the East."

আমাদের মনে হয়, ইহা একেবারেই অত্যুক্তি নহে। যাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, একথা কত বড় সত্য।

নৃত্য দৃশ্য—সাত নম্বর গুহা ঔরঙ্গাবাদ

সন্ধ্যার পর ধরমশালায় ফিরিয়া আসিলাম। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। আমরা যখন শ্রান্তদেহে স্নান শেষ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন লাঠির ঠক ঠক শব্দ করিতে করিতে রাজারাম আসিয়া আমাদের ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য গল্প সুরু করিয়া দিল। সে তাহার কণ্ঠের স্বর উচ্চ করিয়া বলিতেছিল, তাহার অতীত জীবনের কথা। "বাবুজি। বড় দুঃখে দেশ ছেড়ে এসেছি। আমিও এক সময়ে হাতিয়ার ধরেছিলাম, কিন্তু!" এই বলিয়া সে যতই উৎসাহের সহিত তাহার জীবনের গল্প বলিয়া যাইতেছিল, ততই নিদ্রা আসিয়া প্রবলভাবে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজারামের গল্প আর শোনা হইল না।

# প্রত্যাবর্তন

(গল্প)

শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার

এমনি ভাবেই গেল আরও একটি দীর্ঘ বৎসর। অথচ অতসীর কাছে এর সবই সমান। আজ চলেছে যেভাবে, আগামী দিনেও সেইভাবেই চলবে। দু দিন পরেও হয়তো এ গতির মাঝখানে কোনও ভাঙন আসবে না। কিন্তু নিজের অবস্থাটাকে পুরোপুরি বুঝে নেবার মত বয়স তার হয়েছে। চুপ করে পড়ে থাকবার মত মেয়ে অতসী নয়। অথচ সে নিজের দিকটাকেই রেখেছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট করে; কেউ যেচে প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন উত্তর দিয়ে প্রথম কথাতেই তাকে দেয় একেবারে চুপ করিয়ে। তবে তার আড়ালে তাকে নিয়েই আলোচনা চলে নীচু গলায়। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি, চোখের জল (একতরফা), অভিমান (একতরফা), রাগারাগি প্রায়ই চলে। পূর্ণশশী মাঝে মাঝে যেন একটু অস্থির হয়ে পড়েন। সেদিন হাতে কাজ ছিল না কিছু, তাই ভোরবেলাতেই অধ্যয়নরত স্বামীকে অভ্যাসমতই বললেন, "সারাদিন টোল আর পুঁথি—এই তোমার সংসার। কিন্তু মেয়েটার কি উপায় করলে, তাও তো বলবে একটা কিছু ছাই! ওর দিকে যে চোখ ফেরানো যায় না।"

বিদ্যালংকার মশাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "না ফেরালেই হয়।"

অভিমানের সুর বেজে উঠল স্ত্রীর কণ্ঠে, বললেন, "মানলাম, তুমি একজন মস্ত বড় পণ্ডিত। কিন্তু মেয়েটি যে দিন দিন তালগাছের মত বড় হয়ে উঠল, সে কথাটা তো আর আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে চেপে দিতে পারবে না। মেয়েই বা মানবে কেন।"

"অথচ না মেনেও উপায় নেই।"

"উপায় করতে হবে। সেই হতভাগাটা যে কোথায় পালাল একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে, তার একটা খোঁজও হল না এই পাঁচ-ছ বছর।"

স্ত্রীর ভুল সংশোধন করে বিদ্যালংকার মশাই বললেন, "প্রথম তিনটি বৎসর যথেষ্ট খোঁজ করা হয়েছে, তবে শেষের চার বৎসর নয় মাসের মধ্যে তেমন কিছু করা হয় নি বটে।"

যেন ভয়ে আঁতকে উঠলেন পূর্ণশশী, বললেন, "দিন গুনে রেখেছ তুমি!"

"রাখতে হয়।"

"দিনই শুধু গুনবে, ভুলেও চোখ মেলে মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখবে না।"

"চোখ বন্ধ করে, নিশ্চয়ই দিই না!"

"সে আমি বেশ জানি! কিন্তু তার পর?"

এবার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্যালংকার মশাইয়ের উত্তরটা একটু দীর্ঘ হয়ে পড়ল, বললেন, "হিন্দু ধর্মে বলে, বার বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে হিন্দুনারীকে বিধবা বলে গণ্য করতে হয়। বার বৎসর পূর্ণ হলে, কুশপুত্তলিকা দাহ এবং তিন দিন অশৌচ ধারণ করে নিয়মমত শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করতে হয়। অবিশ্যি বার বৎসর পার হবার এখনও ঢের দেরি। এর মধ্যে হয়তো ফিরেও আসতে পারে।"

"আর এ নিয়ম না মানলে?"

"চুপ কর!"

বেশী কথার প্রয়োজন হয় না, বিদ্যালংকার মশাইয়ের এই একটি কথাই যথেষ্ট। তার পর পুনরায় তিনি সম্মুখের খোলা পুঁথির উপর চোখ নামিয়ে বললেন, "টোলের ছেলেরা এখন পড়তে আসবে, তুমি ভিতরে যাও।"

উত্তরে পূর্ণশশী বললেন, "ছেলেরা এলেও আমার দাঁড়িয়ে থাকায় কোনও বাধা নেই। ওরা আমার নিজের ছেলের মতই তো।"

"তা হ'ক, তুমি ভিতরে যাও।"

পূর্ণশশী এবার ভিতরে চলে গেলেন; কারণ, স্বামীর ওই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তিনি অনেককালের পরিচিত। বেশী অগ্রসর হলে পরিণাম যে কি দাঁড়াবে, তা তাঁর নিকট অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু যাকে নিয়ে সমস্যা সেই অতসীর দিক থেকে এর কোনওরূপ সাড়াই এল না। বিয়ে যে তার একবার কোন এক-জনের সঙ্গে হয়েছিল, তা সে জানে অবশ্য, জানতে বাধ্য হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ সিঁথিতে সিঁদুর সে রোজই পরে। ওর মূল্যও জানে, কিন্তু কারণ জানতে চায় না, সম্মানের প্রশ্নও জাগে না মনে। কারণ স্বামীকে কোনদিন দেখেছে বলেও তার আজ মনে পড়ে না—নামটা পর্যন্ত মনে থাকে না। অতসী ব্রিয়েটাকে নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে চিন্তা করে। তবে সে চিন্তা কখনও গভীর হয়ে আসে না।

কিন্তু কালের গতিতে একদিন কেমন করে যেন অতসী ধরা দিলে। দেখা গেল তার নিজের উপরই একটা কঠোর অবহেলা। ঘরের নিভৃত কোণই যেন তার কাছে হয়ে উঠতে লাগল মনোহর। সে এখন ভাবে, ভাবতে পারে অনেক নূতন কথাই। অথচ উপায় নেই পথ করে নিয়ে বাইরে ছুটে আসবার। মাঝে মাঝে যেন সে হিংস্র, বর্বর হয়ে উঠতে চায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে পিতার নিয়মের উপর। কিন্তু তবুও পারে না সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। আগুন নিবে যায়, দেহের চঞ্চল রক্ত হঠাৎ জমাট বেঁধে আসে শিরায় শিরায়।

বিদ্যালংকার মশাই দিন গুনে চললেন। ভুল তাঁর হয় না। অবশ্য গর্বটা তাঁর এ নিয়ে নয়, গর্ব তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের আর অযাচিত সম্মানের। তিনি মহাপণ্ডিত, সর্ব বিষয়ে তাঁর বিধানকেই সকলে মেনে চলে ভয়ে ভক্তিতে। টোলের ছাত্ররা তাঁকে ভয় পায় যমের চেয়েও বেশী। এতে তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে বিদ্যাভ্যাস করে অনেকেই বড় বড় পণ্ডিত হয়েছে, এবং আরও হবে।

প্রভাকরকে তিনি অন্য সব ছাত্রদের মধ্যে একটু বিশেষ চোখে দেখেন। ছেলেটি মেধাবী ও বিনয়ী। মুখ তুলে কারও দিকে চেয়ে কথা বলা তার স্বভাব নয়। প্রভাকরকে [illegible]

করতেন বলেই বিদ্যালংকার মশাই মাঝে মাঝে সময় অসময়েও তাকে ডেকে নিয়ে আসতেন নিজের বাড়ির ভিতর। প্রভাকর ভিতরে এলেও গোবেচারার মতই এসে চুপ করে বসত গুরুর সম্মুখে আসন পেতে। অন্য কোন দিকেই কখনও চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখবার সাহস হত না। অবশ্য অতসীকে সে চেনে, কিন্তু ভাল করে কোনও দিন চোখ মেলে দেখে নি।

সেদিন বিদ্যালংকার মশাই বাড়িতে ছিলেন না। পূর্ণশশীও শরীর অসুস্থ বলে শুয়েছিলেন। এমন সময় এল প্রভাকর। বাধ্য হয়েই অতসী এল কাছে। একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অতসী। মুখ তুলতে গিয়ে চোখের উপর চোখ পড়ল। অতসী সে চাহনিতে মুহূর্তের মধ্যে যেন আত্ম-বিস্মৃত হল। প্রভাকর হতভম্বের মত একদৃষ্টে চেয়ে রইল অতসীর উচ্ছৃংখল দেহভঙ্গির দিকে। কারও মুখে কথা নেই। কাটল অনেকক্ষণ। প্রভাকরের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, অতসীর বুক উঠল কেঁপে। প্রভাকর আত্মসংবরণ করে চোখ নামিয়ে নিলে। এরই মধ্যে লজ্জায়, উত্তেজনায় তার কপালে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে। কথা বলতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল, বললে, "উনি বাড়ি নেই?"

"না।"

"আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারেন?"

উত্তর না দিয়েই অতসী ঘরের ভিতর উঠে গেল, তার পর জল নিয়ে ফিরে এল অনেকক্ষণ পরে। কিন্তু প্রভাকরকে ফিরে এসে আর দেখতে পেলে না। নিজের অজ্ঞাতেই হাত থেকে জলের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে গেল। গ্লাসটা পড়েই রইল, ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর এসে পূর্ণশশীর মত সেও বিছানায় মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করলে।

পরিবর্তনটা হঠাৎ আসেনি, এসেছে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খণ্ড খণ্ড দুর্বল মুহূর্তগুলিকে একত্র করে। অতসী নিজের কাছে নিজেকে প্রথমে ধরা দেয় নি, শেষে ধরা দিলে নিজের অসংযত ব্যবহারে আর কথাবার্তার মধ্যে অহেতুক অন্যমনস্কতায়।

প্রভাকর তার পর দু দিন আসে নি। সেদিন এল সন্ধ্যায়। বস্তুত কোনও প্রয়োজনই তার ছিল না আসবার, তবুও এল।

বিদ্যালংকার মশাই তাঁর ঘরেই ছিলেন বই নিয়ে বসে। প্রভাকর তা জানতে পেরেও চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে এসে দাঁড়াল কম্পিত বক্ষে। অতসী তা টের পেল। এল কাছে, বললে "সেদিন জল আনতে বলে পালিয়ে গেলে কেন?"

প্রভাকর এবার মাথা নুইয়ে আনলে।

অতসী বললে, "তার পর আর দু দিন তোমার কোনও খোঁজই তো ছিল না। ভয় পেয়েছিলে বুঝি?"

"না, না, ভয় কেন?" প্রভাকরের গলাটাকে কে যেন টিপে ধরলে।

"তোমার মুখ বলছে, ভয় পেয়েছ, সত্যি, নয়?

"না।"

"না?" অতসীর দেহে রক্তধারা নেচে উঠল, হাত বাড়িয়ে সে প্রভাকরের হাত ধরলে। প্রভাকরের মুখ ভয়ে উত্তেজনায় সাদা হয়ে গেল। তাকে এই সংকট মুহূর্তের হাত থেকে রক্ষা করলেন স্বয়ং বিদ্যালংকার মশাই সে স্থানে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে। রীতিমত চমকে গিয়ে বললেন, "প্রভাকর, তুমি এখানে?"

"হুঁ, এদিকে এখন, মানে, দরকার ছিল একটা—"

প্রভাকর অপরাধীর মত বিব্রত হয়ে বিদ্যালংকার মশাইয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তিনি কোনওরূপ ভূমিকা না ক'রেই বললেন, "টোলটা এখান থেকে তুলে দিচ্ছি। চৌধুরী বলেছেন, ওঁর মন্দিরের বারান্দায় টোল তুলে নিয়ে যেতে। সমস্ত খরচপত্র চৌধুরীই বহন করবেন। ভেবে দেখলাম, দেবতার মন্দির, পবিত্র স্থান; বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে সব দিক থেকেই উপযুক্ত।

"তার পর টোল যখন এখান থেকে উঠেই যাচ্ছে, তখন তোমাদের আর মিছামিছি এখানে আসবার প্রয়োজন নেই। যা কিছু তোমাদের প্রয়োজন হয় জেনে নেবার তা এখন থেকে ওখানেই জিজ্ঞাসা করবে—সাধ্যমত আমি সাহায্য করব। আচ্ছা এখন তুমি এস।"

প্রভাকর নতমস্তকে বার হয়ে গেল। বিদ্যালংকার মশাই স্ত্রীকে ডাকলেন। তিনি এলে, বললেন, "হরির মাকে আজই জবাব দিয়ে দাও। ওকে ব'লে দাও আমাদের এখন আর তাকে দিয়ে কাজকর্ম করানো চলবে না।"

স্বামীর কথা বুঝতে না পেরে পূর্ণশশী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তার মানে?"

"মানে তুমি বুঝতে পারবে না।"

"মানে আমি বুঝতে পারি, পারি না শুধু তোমাকে বুঝতে। সে কথা যাক্, হরির মা না হয় বিদায় হয়ে গেল, কিন্তু কাজকর্ম করবে কে?"

"নতুন লোক আসবে। বুড়ো মানুষ, ভক্তি আছে, বিশ্বাসও আছে প্রাণে। আচ্ছা এখন তুমি ভিতরে গিয়ে অতসীকে এখানে একটু পাঠিয়ে দাও।"

অতসী কাছেই লুকিয়ে ছিল। ডেকে দেবার পূর্বেই এল পিতার সম্মুখে। বিদ্যালংকার মশাই অনেকখানি সহজ হয়ে বললেন, "কাল থেকে আমার কাছে বসে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। পণ্ডিতের সন্তান হয়ে একেবারে মূর্খ হয়ে থাকা গর্হিত। কতকটা পাপও বটে। তা ছাড়া ধর্মপুস্তকগুলি বেশ মন দিয়ে পড়লে জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনও পবিত্র থাকবে, শান্তিও পাবে। বুঝলে তো মা?"

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতসী চুপ করেই রইল শেষ পর্যন্ত। পরদিন থেকে সমস্ত ব্যবস্থাই সুন্দর আর সহজভাবে হয়ে যেতে লাগল। কোনও কিছুতেই প্রতিবাদ এল না। গোপনকথা গোপনেই পড়ল চাপা, অথবা গোপনেই বেড়ে উঠতে লাগল। বাইরের দিক থেকে সামান্য একটু টের পাবার পথ আর রইল না।

অনেক দিন গেল। অতসী পিতার সম্মুখে বসে প্রতিদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রসন্নচিত্তে। পিতার মনে এইটুকুই শান্তি ও গৌরব। গৌরব তাঁর জয়ের। এরই মধ্যে একদিন

বিদ্যালংকার মশাই স্ত্রীকে ডেকে জানালেন, বার বৎসর আজ পূর্ণ হল; আগামী দিন থেকে অতসীর জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হবে।

পরদিন নিয়মমত কুশপুত্তলিকা দাহ হল। স্নান করে অতসী পরলে সাদা থান কাপড়, হাতের শাঁখা নোয়া ভাঙলে, সিঁথির সিঁদুর মুছলে। একটুও কাঁদলে না সে, প্রতিবাদের চিহ্নও দেখা গেল না চোখে বা মুখের ভাষায়। কারণ এ তার আগেরই অবস্থার সঙ্গে সমান। নারীত্বের অনুভূতি তার ছিল না, স্তব্ধ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল মনের স্তূপীকৃত বিধিনিষেধের নীচে। শুধু একবার তার চোখের পাতা উঠে-ছিল সামান্য একটু ভিজে। দুঃখ হয়েছিল মাথার চুল-গুলিকে একেবারে মুড়িয়ে ফেলে দিতে। কিন্তু উপায় ছিল না, পিতার আদেশ। বিধবার আভরণ থাকা পাপ, বিসর্জন দিতেই হবে সব কিছু।

তার পর নূতন ব্যবস্থার মধ্যে এসে অতসী নিজেকে সহজেই নিলে মানিয়ে। অনেক ব্যাপারে তার আচার ব্যবহার যেন পিতার কঠোর বিধানকেও হার মানিয়ে দিলে। সামান্য পূজাপার্বণে অকারণেও সারাদিন উপোস করে থাকা, সময় অসময়ে শুচিতার অজুহাতে স্নান করে আসা, এ সব আজকাল অতসীর নিত্যকর্ম। অতসী মাত্র এক বৎসরের সাধনাতেই তার অবাধ্য যৌবনকে ঠেলে পিছনের অন্ধকারে ফেলে রেখে এল। কুড়ি বৎসর বয়সটাকে যেন সে বৈধব্যের তপস্যা করেই ত্রিশের কোঠায় টেনে নিয়ে এল।

এমনিভাবেই হয়তো তার জীবন যেত কেটে; কিন্তু অকস্মাৎ শাস্ত্রসম্মত জীবনে তার ভাঙন এল নেমে।

শরৎকালের বিকাল, আকাশে একখণ্ডও মেঘ ছিল না, নীল আর শুভ্র পৃথিবী। বিদ্যালংকার মশাই কিছুক্ষণ আগে মেয়েকে দৈনন্দিন পাঠ বুঝিয়ে সেইমাত্র নিজের কাজে বসেছিলেন। আশে পাশে কেউ ছিল না। এমন সময় একজন সাহবী পোশাকপরা বাঙালী ভদ্রলোক এসে একেবারে বিদ্যালংকার মশাইয়ের সামনে দাঁড়ালেন। বিদ্যালংকার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চাই আপনার?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। আপনি কি বিদ্যালংকার মশাই নন?"

বিদ্যালংকার মশাই অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ বিশ্বনাথ? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না!"

"না পারবারই কথা। সে আজ অনেক দিনের ঘটনা। বিদ্যালংকার মশাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামের একটি ছেলের বিয়ে হয়েছিল। তার পর বিশ্বনাথ গেল একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে। দীর্ঘ তের চৌদ্দটি বৎসর সে বিদেশের বহুস্থানে ঘুরে বেড়াল। বিলেতে ডাক্তারি পড়লে। তার পর দিন কয়েক হল সে দেশে ফিরে এসেছে। আমিই সেই বিশ্বনাথ। বোধ হয় আমায় চিনতে পারছেন?"

"মিথ্যে কথা, আমার মেয়ে বিধবা। বিশ্বনাথ তার স্বামীর নাম ছিল বটে কিন্তু সে বর্তমানে আমাদের কাছে মৃত। তার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত।"

বিশ্বনাথ বললেন, "তবে কি বলতে চান আমি বেঁচে নেই? আমি ভূত?"

"তোমার বেঁচে থাকার চেয়েও শাস্ত্র সত্যি, আমার মেয়ের বৈধব্য সত্যি।"

"স্বামী থাকতে বিধবা হয়, এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে?"

"হিন্দুশাস্ত্রে লেখে। সে যাই হ'ক, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।"

"দেখুন বিদেশে যখন ছিলাম তখন ইচ্ছে করলেই ওদেশের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করি নি; আমি বিবাহিত, এই বোধ সর্বদাই আমার বিবেকে জাগরূক ছিল। আমি অসাধু নই, অসৎ নই,—সেই অধিকারে আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।"

বিদ্যালংকার মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "তবে এতদিন ঘুমিয়ে ছিলে কেন? এই সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল যে আগুন তুমি আমার মেয়ের বুকে জাগিয়ে রেখেছিলে সেই আগুনেই তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তুমি এখন যাও।"

বিশ্বনাথ উত্তেজিত হলেন। বললেন, "আমি যাব না। আপনার আর আপনার শাস্ত্রের কথায় আমার প্রত্যয় নেই। আপনার মেয়ে যদি নিজে এসে বলে যে আমি মৃত, সে বিধবা, তো সেই মুহূর্তেই আমি বার হয়ে যাব। ডাকুন তাকে।"

বিদ্যালংকার মশাই উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, মূর্খ, এ হিন্দুর বাড়ি। এ তোমার বিলাত নয়, ম্লেচ্ছের দেশ নয়। আমার মেয়ে বিধবা, পরপুরুষের সামনে আসা তার নিষিদ্ধ। আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, অনাচার আমার বাড়িতে চলবে না।"

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি যাব না। আপনার মেয়ের মুখের কথা না শুনে আমি যাব না। আপনি যদি বাধা দেন তো গায়ের জোরে আমি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব, আইন আমার সহায়।"

ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। চেঁচামেচি শুনে পূর্ণশশী ছুটে এলেন। একটু পরেই অতসীও এল নেমে। অতর্কিতে দুজনের মধ্যে এসে পিতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। বিদ্যালংকার মশাই মেয়ের দিকে চেয়ে একে-বারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন; যেন একটা অজগর সাপ তাঁর পা জড়িয়ে ধরেছে। স্খলিতকণ্ঠে বললেন, "বিধবা হয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরলি তুই কোন আক্কেলে!—"

অতসী নীরবে উঠে দাঁড়াল, বিশ্বনাথ এসে তার হাত ধরলেন।

# হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

Horatio. O day and night this is wondrous strange!

Hamlet. And therefore as a stranger give it welcome.
There are more things in heaven
and earth Horatio,
Than are dreamt of in your
philosophy.

Hamlet Act I, Scene IV.

অশান্ত,

* * * *

অতঃপর হে ব্যঙ্গপ্রিয় অশান্ত সর্বশেষে তুমি রঙ্গভরে লিখেছ—"হে হসন্ত! হে স্বয়ংসিদ্ধ, Superior person! মেঘনাদের নাদ কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে পটহ যুগলে আঘাত করে নি? তোমার কাছ থেকে কোন টাঁ টুঁ শুনছি না কেন? কিম্বা তুমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে না কি? তোমার জীবাত্মা এ-জন্মে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার মতো অবস্থায় কোন কালেও পৌঁছবে তা তো কোনদিনই মনে হয় নি। তবে?"

এবং ঐ "তবে"র পরে প্রথমে একটি জিজ্ঞাসাবোধক এবং তার পরে তারই গায়ে গায়ে একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন লিখে তোমার প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের জাজ্বল্যমান নিদর্শন এঁকে তোমার চিঠি সমাপ্ত করেছ।

না, আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করি নি। বিশেষ করে আজিকার এ বসন্ত দিনে এ মলয়-শিহরিত ধরণীতে আম্র-মুকুল-সুরভিত বাতাসে অলিদল-ঝঙ্কৃত আকাশে, তৃণে, গুল্মে, বৃক্ষে, বল্লরীতে, পত্রে, পুষ্পে যে বাণী বিছিয়ে আছে সে-বাণী বৈরাগ্যের বাণী নয়। আজিকার দিনে যে বানপ্রস্থের কথা ভাবতে পারে, সে পাষণ্ড সে নরাধম, সে missing link। এ রকম মানুষ প্রথম ঊষার গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে গান ধরে দিতে পারে—

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল
পার করো আমারে—

এদের জন্যে পেনালকোডে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

না, আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করি নি এবং মেঘনাদের নাদও আমার কর্ণপটহ এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু সে-সম্বন্ধে যে আমি টাঁ টুঁ করছি নে, তার দু-একটি কারণ আছে। তোমার হৃদয়াবেগ প্রশমিত করবার জন্য তা বলছি শোনো।

সেকালের স্বর্ণলঙ্কার ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের নাদ যে কি রকমের ছিল, তা আমরা জানি নে ( তখন গ্র্যামোফোনের আবিষ্কার হয় নি, সুতরাং সে নাদ রেকর্ডে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি ), কিন্তু এ-কালের সোনার বাঙলার বিজ্ঞানবিদ্ মেঘনাদের নাদ খুব সুশ্রাব্য বলে মনে হয় নি। অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত মেঘনাদ সাহার লেখা পড়ে তেমন আরাম নেই—অন্তত আমি তেমন আরাম পাই নি। আর যাঁর লেখা কষ্ট করে পড়তে হয়, তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে মন তেমন আগ্রহবান হয় না। এই হচ্ছে ও সম্বন্ধে আমার টাঁ টুঁ না করবার প্রথম কারণ।

কিন্তু আরও একটি কারণ আছে, যার ওজন ঐ প্রথম কারণটিকে বহু গুণে ছাড়িয়ে যায়। আর সেটি হচ্ছে এই যে, যুক্তিতর্কের সম্পর্কে এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকটিকে খুব সুবিধার লোক বলে আমার মনে হয় নি। কেন তা বলছি।

অনিলবরণ লিখেছেন,—"ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হন নাই; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, এই বিশ্ব জগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্তটিই সর্বাপেক্ষা সঙ্গত।"

এর উত্তরে মেঘনাদবাবু লিখছেন,—"সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নাম ধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার কতকটা হাওয়ার সহিত লড়াই।"

এখন, তুমি আমি যারা বিজ্ঞানের সভায় একেবারে সর্ব-সাধারণের দলে, উক্ত সভায় মাটিতে চাটাইয়ের উপর যাদের বসবার জায়গা সেই আমরাও আজ জীনস্ বা এডিংটনের নাম জানি, কেবল নামই যে জানি, তাই নয়, তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা যে আজ ধীরে ধীরে তাঁদের কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এনে ফেলেছে, তারও কিছু কিছু খবর রাখি। সুতরাং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফেলো অব দি রয়াল সোসাইটি, শ্রীযুত মেঘনাদ সম্বন্ধে এঁদের নাম শোনেন নি, বা এঁদের মতামত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তা নিশ্চয় নয়। অথচ অনিলবরণ ওঁদের কারো নাম উল্লেখ না করাতেই সাহা মহাশয়ের কাছে ও ব্যাপারটা হয়ে উঠল একেবারে হাওয়ার সাথে লড়াই। এইখানে সাহা মহাশয়ের মনে যে বস্তুটি কাজ করছে, সেটা ইংরেজিতে যে একটা কথা আছে—intellectual dishonesty তারি প্রায় কাছ ঘেঁষে যায় বলে, আমার মনে হয়। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় যেন ফরাসী ভাষায় যাকে বলে louche তাই। তুমি আবার যেমন প্রচণ্ড philologist ফরাসী এই শব্দটির অর্থ লুচ্চা বলে মনে করে বসো না। ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে, equivocal, dubious প্রায় shady-র কাছাকাছি অর্থাৎ বাঙলায় যাকে আমরা বলি "যেন কেমন কেমন।" তাই বলছিলাম যে, যুক্তিতর্ক সম্পর্কে এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকটিকে খুব সুবিধার লোক বলে মনে হয় নি।

রয়াল সোসাইটির সভ্য সাহা মহাশয় এই চালাকির খেলা আরও খেলবার চেষ্টা করেছেন।

অনিলবরণ লিখেছিলেন—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোন মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই; পরন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতক-গুলি মামুলি কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।"

সাহা মহাশয় তার উত্তরে বলছেন—"আমার বক্তব্য—কোন লোক যত বড়ই হউন স্বীকার না করিয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করা আমার স্বভাব নয়। আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক। আমি কোন্ পাশ্চাত্য সমালোচকের মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। যদি তিনি তাহা না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত এই উক্তি প্রত্যাহার করা।"

সম্ভবত সারা জীবন টেস্ট্ টিউব নাড়াচাড়ি করে করে ভদ্রলোকের এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, "নাম ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ" উপস্থিত না করলে, কোন কিছুই আর তাঁর বুদ্ধিগত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু এ দেশে ইংরেজরা রাজনৈতিক প্রভু হয়ে বসবার পর তাদের কাছে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা, সাধনা সব কিছুই যে স্লেপ অবজ্ঞার বস্তু হয়ে উঠেছিল, এটা একটা এত স্পষ্ট ব্যাপার যে তার জন্যে দলিলাদি খুঁজতে যেতে হয় না। কেবল পাশ্চাত্য সমালোচক কেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক হিন্দুর কাছেও হিন্দুর যা কিছু তার ধর্ম কর্ম, শিক্ষা দীক্ষা, পরবার ধুতি, চাদর খাবার থালা, বাটি, এমন কি, গায়ের রঙটি পর্যন্ত এমনি বর্বরতা জ্ঞাপক হয়ে উঠেছিল যে, ভারতমাতার নামে তাঁরা লজ্জায় অধোবদন হতেন। যে শশধর তর্কচূড়ামণিকে নিয়ে সাহা মহাশয় ব্যঙ্গ করেছেন তাহা ঐ উপরোক্ত মনোভাবেরই দরুণ প্রতিক্রিয়া—আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার বিকট মুখভঙ্গি। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ব্য

হিন্দুর জীবনের উপর দিয়ে ভিতর বাহির দুদিক থেকেই কি রকমের ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে, তা আজকার ম্যাট্রিক পাশ ছেলেটিও জানে। অথচ এই ঢাকাই রিপভ্যান উইংকলসটি জেগে উঠে প্রচন্ড হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বলছেন—কে? কোথায়? কবে? আর কিছু না হোক সাহা মহাশয় কি তাঁর কিশোর বয়েসে ঢাকা শহরের কোন রাস্তার চৌমাথায় শ্বেতাঙ্গ পাদরীর ধর্মের বক্তৃতাও শোনেন নি! তাও যদি তিনি না শুনে থাকেন, তবে অনিলবরণই বা কি করতে পারেন, আর কে-ই বা কি করতে পারে। তবে তাঁরা শুধু সাহা মহাশয়ের দিকে প্রশংসমান নেত্রে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে খাম্বাজে গান ধরে দিতে পারেন—

"তুমি কোন্ কাননের ফুল গো
তুমি কোন্ গগনের তারা!"

আবার খুব জাঁক করেই বলা হয়েছে—"আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক।" কিন্তু আসল সত্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শান্তি-নিকেতনে মেঘনাদবাবুর ঐ বক্তৃতায় বড় বিশেষ মৌলিকতা নেই—তাঁর নিজস্ব কোন মৌলিক আইডিয়া নেই। হিন্দুর ধর্ম দর্শন ইত্যাদির প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ ব্যাপারটা যে বস্তাপচা মাল, তা তো অনিলবরণই বলেছেন। ওতে মৌলিকতা কিছু নেই। তারপর তিনি বেঁচে থাকতে চাইলে যন্ত্ররাজকে অস্বীকার করবার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর আগেও এ দেশে ও কথা কেউ কেউ বলে ফেলেছেন। সুতরাং ও বাণীও সাহা মহাশয়ের মৌলিক বাণী নয়। তারপর তিনি যে বুদ্ধিমানের মতো "সবাই গ্রামে ফিরে চল" এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেছেন, সেটাও তাঁর মৌলিক চিন্তা নয়। কেননা, ঐ মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাহা মহাশয়ের বক্তৃতার বহু পূর্বে সাময়িক পত্রে পড়েছি বলে মনে পড়ছে। সাহা মহাশয় বলেছেন,—"বর্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ আপনার হস্ত ও মস্তিষ্ক সমানভাবে খাটাইয়া আপনাকে প্রস্তুত করে।" কিন্তু ওটা বর্তমান যুগের বিশেষত্ব নয়। যে কোন যুগেই মানুষের সভ্যতা হস্ত ও মস্তিষ্ক সমানভাবে খাটিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাহা মহাশয় যদি মনে করে থাকেন যে, কোন কালে পৃথিবীর কোথাও মানুষের এমন সভ্য সমাজ গড়ে উঠেছিল, যেখানে কেবল হস্ত ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল না, কিম্বা কেবল মস্তিষ্ক ছিল, কিন্তু হস্ত ছিল না, কিম্বা হস্ত ও মস্তিষ্ক দুই-ই ছিল, কিন্তু ওর একটি ছিল সমাজের উত্তর মেরুতে, আর একটি ছিল তার দক্ষিণ মেরুতে তবে তিনি আরব্যোপন্যাস জাতীয় এক স্বপ্ন দেখছেন। আসলে মস্তিষ্ক ও হস্তের সহযোগিতায় মানবসভ্যতা গড়ে উঠবার অপরিহার্য্য নিয়ম। আগে মস্তিষ্ক, তারপর হস্ত—মস্তিষ্ক উপরে, হস্ত নীচে। কেননা, আগে জ্ঞান, তারপর কর্ম—উপরে মননশীলতা নীচে তার বাস্তব রূপ। মস্তিষ্কই কর্মকে সম্ভব করে তোলে, সফল করে তোলে। আইডিয়া ছাড়া কর্ম নেই এবং মস্তিষ্কই আইডিয়া ধরবার যন্ত্র। যদি বল মস্তিষ্ক উপরে, হস্ত নীচে কেন হবে? দুয়ের সমান আসন কেন হবে না? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তা হবে না, কেননা, তা সত্য নয়। মস্তিষ্ক উপরে, হস্ত নীচে, এইটেই সত্যের 'সিম্বল' সত্যের রূপ-প্রকাশক। কেননা, হস্ত মস্তিষ্ককে বলছে—হে মস্তিষ্ক আমি তোমার বশম্বদ কেননা আমি তোমার অনুসরণকারী। তোমার আইডিয়া বিহনে আমি অলস—তুমি ছাড়া আমি জড়। সে যা হোক —পৃথিবীতে বহুকাল থেকেই মস্তিষ্ক ও হস্তের সহযোগিতা হয়ে এসেছে। সুতরাং ওটাও সাহা মহাশয়ের গবেষণাত্মক কোন মৌলিক আইডিয়া বলে ধরা যায় না। ও সম্বন্ধে তাঁর মৌলিকতা শুধু এইটুকু যে, ভ্রান্ত দৃষ্টিবশে তিনি ওটাকে কেবল এই যুগে প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন।

তবে এযুগের মস্তিষ্ক ও হস্ত সম্বন্ধে একটা মৌলিক দান আছে বটে। মানব সভ্যতার পত্তন হবার পর থেকে সম্ভবত বর্তমান যুগে এই সর্বপ্রথম গুন্ডা প্রকৃতির একদল ষন্ডা লোক গায়ের জোরে মস্তিষ্ককে শূদ্রের কোঠায় ফেলে হাতকে ব্রাহ্মণের আসনে বসিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন এবং আরও অনেক লোক যাঁরা গুন্ডাও নন, ষন্ডাও নন, ঐ ব্যবস্থাকে প্রাণপণে অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন। যেন মানব-সমাজের পরম অর্থ এবং চরম পরমার্থ ওর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু ঐ অবস্থা যদি সত্যি সত্যি সত্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ হাত যদি মাথার উপর সত্যি সত্যি মাতব্বরী করতে থাকে, তবে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে তার শক্তি হারাতে বাধ্য এবং হস্তেরও কোন গৌরব বাড়বে না। অবশ্য এই রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা টিঁকে থাকতে পারে না। শেষাশেষি হয় মস্তিষ্ক আপনার স্বস্থান ফিরে পাবে, আর না হয় ধীরে ধীরে সমাজকে বর্বরতার পথে নেমে যেতে হবে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ বন্দী দেবতাদের আপনার ঘরগৃস্থালীর কাজে লাগিয়েছিলেন। কাউকে করেছিলেন আস্তাবলের ম্যানেজার, কাউকে বানিয়েছিলেন দেউড়ির দারোয়ান। এটা রাবণের বাহুবলের বিজয়-বৈজয়ন্তী, কিন্তু তাঁর মানসিকতার নিদারুণ পরাজয়। রাবণের মন যদি দেবতাদের আসন-তাৎপর্য কিছুমাত্র আঁচ করতে পারত, দেবতারা যে একটা উচ্চতর উন্নততর অক্ষয় আনন্দলোকের প্রমূর্ত জীবন, এই সত্যের আভাসমাত্রও যদি তাঁর মনে প্রতিফলিত হ'ত, তবে হয়তো রাবণ ঐ দেবতাদের অপকার্যে নিযুক্ত না ক'রে মন্দিরে স্থাপনা করতেন এবং তাঁদের উপাসনায় সেই উচ্চতর উন্নততর অক্ষয় আনন্দলোককে নিজের মানস-লোকে সত্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মনের এই জয় রাবণের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি মনের এক বিশিষ্ট সীমানার মাঝে শক্ত হ'য়ে উঠে উন্নততরকে উচ্চতরকে আঘাতই কেবল করতে পেরেছেন। প্রলেটেরিয়েটরা আজ মস্তিষ্ক জীবীদের বন্দী ক'রে তাঁদের দিয়ে নিজেদের ধান মাড়াই ও কলের চাকায় তেল সরবরাহের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এটা তাঁদের বাহুবলের বিজয়-বৈজন্তী, কিন্তু তাঁদের মনোরাজ্যের নিদারুণ পরাজয়। মস্তিষ্কজীবীদের বন্দী করে প্রলেটেরিয়েটরা নিজেদেরই বন্দী করেছে। মস্তিষ্কের পায়ে নিগড় বেঁধে তারা মানবতার চলার গতিকেই রুদ্ধ করেছে এবং এইটে হচ্ছে মানবতাকে সবার চাইতে বৃহত্তম আঘাত—সুতরাং বৃহত্তম পাপ।

বক্তৃতাটা ধীরে ধীরে পাদরী সাহেবের বক্তৃতার মতো হ'য়ে উঠল সুতরাং এটা এইখানেই ছেড়ে দেওয়া যাক এবং সাহা মহাশয়ের প্রতি মনোযোগ ফেরানো যাক্।

বলছি যে, সাহা মহাশয়ের বক্তৃতায় বিশেষ কিছু মৌলিক জিনিষ নেই, কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি মৌলিকতার দাবী করতে পারেন। তিনি বলেছেন—"হিন্দুর সৃষ্টিকর্ত্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ স্থাবর জঙ্গম জীব এবং ধর্ম-শাস্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন।" এইটি সাহা মহাশয়ের একেবারে সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণা। কেননা এই গবেষণাত্মক বাণীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর বলা বাহুল্য যে, মৌলিকতা ছাড়া মিথ্যার জন্ম সম্ভব নয়। এটি মিথ্যা কেননা সৃষ্টিকর্তার ধারণা হিন্দুর এ নয় যে তিনি স্বর্গত লম্বা শাদা দাড়িযুক্ত ব্রজেন শীলের মতো একজন দার্শনিক, যিনি চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছেন, আর একটি Cosmic Queen Bee-র মতো ছোট বড় নানা আকারের নানা অন্ড প্রসব ক'রে বিশ্বব্রহ্মান্ডে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। (ক্রমশ)

# চণ্ডীমণ্ডপ

(গল্প)

**শ্রীপ্রবোধ সরকার**

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপটির চারদিকে ছাদহীন বাঁধানো দালান। এই দালানটি পল্লীর মেয়ে ও পুরুষের সাধারণ বৈঠক। বৈঠকের কোনও নির্ধারিত সময় নেই; সকাল, দুপুর, বিকেল সন্ধ্যা এবং আকাশে চাঁদ থাকলে রাত্রেও এখানে বৈঠক বসে। একজন যায় দুজন আসে, দুজন যায় একজন আসে, প্রায় সব সময়েই বৈঠকটি সরগরম। সদর রাস্তার দিকে পূব ও দক্ষিণের দালানে পুরুষেরা জমে আর পিছনের দিকে পশ্চিম ও উত্তরের দালানে মেয়েরা জমায়েত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বিরাট কাঁঠাল গাছ, গাছটা ভারী উপকারী। কিছুটা পর্দা, কিছুটা আবরু এবং অধিকাংশটা ছাতা। বহুকাল ধ'রে মেয়েদের বৈঠকটিকে দুপুরের প্রবল রোদের তাপ থেকে রক্ষা করবার ভার নিয়ে শাখাপ্রশাখা মেলে ছাতার মতন দাঁড়িয়ে আছে। গাছটা প্রাচীন, বৈঠকের সভ্য সভ্যারা অধিকাংশই প্রাচীন, আর সব চেয়ে প্রাচীন ওই দেবায়তন।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। দেওয়ালের দিকে পিঠ করে আঁচল বিছিয়ে মিত্তির-গিন্নী তখনও ঘুমুচ্ছেন। কনে বউ (যদিও বয়স ষাটের কাছাকাছি) কাঁঠাল গাছের ডালে পাট ঝুলিয়ে দালানে ব'সেই দড়ি পাকাচ্ছেন। গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে হল্লা ক'রে দালানের ওপর কাঠকয়লা দিয়ে ঘর এ'কে 'বাঘবন্দী' খেলছে। ওপাশের দালানে চলছে দাবা। বামুনকাকা নির্বাপিতপ্রায় থেলো হুঁকো টানতে টানতে সুতো দিয়ে বাঁধা চশমাজোড়া কপালে তুলে নির্বাকারচিত্তে বড়ের চাল ভাবছেন।

হঠাৎ বামুনকাকা উবু হয়ে ব'সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই তোমার গিয়ে কিস্তি।"

তাঁর পক্ষের একজন দর্শক তাঁর চেয়েও বেশী চীৎকার ক'রে উঠলেন, "লাও, ঠেলাটা সামলাও এইবার—!"

গুরুমশাই গুরুচরণ বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকে মোটা রকমের এক টিপ নস্য গুঁজে দিতে দিতে বললেন, "মর্ আটকুড়ির পুত! চেচিয়ে মরিস ক্যালো?"

"আগে কিস্তি সামলাও গুরুমশাই!"

"দেখ লা সব ঠাল্ডা করে দিচ্ছি!" ব'লে গুরুচরণ টাকে হাত বুলতে লাগলেন।

অত্যধিক পরিমাণে নস্য ব্যবহারের ফলে অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ গুরুমশায়ের পক্ষে সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দন্ত্য ন তো 'ল'এ পরিবর্তিত হয়েছেই, এমন কি শব্দের মাঝের বা শেষের 'ম' কেও তিনি অধিকংশ সময় 'ব' বলে থাকেন। ছেলেবেলা থেকে ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তাঁর রুক্ষ মেজাজ বর্তমানে রুক্ষতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশ বৎসর ইনি গুরুমশাইগিরি করছেন। ছেলেরা আড়ালে বলে, "জীবন্ত যম, ধর্মরাজের দ্বিতীয় সংস্করণ।"

দালানের ও কোণে চলেছে পাশা।

"এ্যাই ছ'তিন নয়!" ব'লেই নকর্তা ঠকাস ক'রে একটা ঘুঁটির ওপর আর একটা ঘুঁটি সজোরে বসিয়ে দিলেন।

নুটবিহারী দুহাতের চেটোয় পাশার ঘুঁটি কটা নিয়ে বার কএক খটাখট খটাখট শব্দ ক'রে বনিয়াদী চালে চেলে দিলে। "দে দে, ধুতরো ফুল দেখিয়ে দে!" ব'লেই বোধ হয় আক্রোশবশে দিলে নকর্তার একটা পাকা ঘুঁটিকে মেরে।

"নুটু খেপেছে, নুটু খেপেছে" বলতে বলতে নকর্তা পাশা চাললেন। "রাম-দু-তিন-চার—এই পাঁচ—"। নকর্তার ঘুঁটি বসল।

"এ্যাই কচে বারো! দে দে, নকর্তাকে বসিয়ে দে!" ব'লেই নুটবিহারী নকর্তার আর একটা আধপাকা ঘুঁটি মেরে দিলে।

গরু সমেত দড়ি হাতে গামছা পরা অখিল গোমস্তা সামনের রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এবেলা কত হ'ল নুটু?"

খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নুটু পাশা কটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে—"তা হ'ল বই কি, পাঁচ দান হেরে পাঁচ দুকুনে দশ পয়সা আর তিন দান জিতে তিন তিরিক্কে ন'পয়সা—এই তোমার গিয়ে উনিশ পয়সা! তা নকর্তার দৌলতে.........।"

দু'তড়পা খড় মাথায় অখিল গোমস্তার ছোট ভাই বিনে অর্থাৎ বিনোদ এসে হাজির। নুটুর কথা মধ্যপথেই থামল, অখিল গোমস্তা জিজ্ঞাসা করলে, "খড় কোত্থেকে আনলি রে বিনে?"

"হাই নফরা ক্যাওরার খামার থেকে। তামাক খাবে দাদা?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই বিনে মাথার খড়ের বোঝা ধপাস করে মাটিতে ফেলে আগুন ভরা মালসাটার সামনে উবু হয়ে ব'সে গেল। প্রভুভক্ত গরুটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খড়ের আঁটি ছিঁড়ে খেতে শুরু করলে।

পথ দিয়ে একটা কাবলিওয়ালা যাচ্ছে। একটা ছেলে চীৎকার ক'রে শুরু করলে—"কাবলিওলা বেইমান, ছেঁড়া জুতো জলপান!" সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকএক ছেলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। ওদিকে কাঁঠাল গাছের মগডাল থেকে একটা ছেলে নীচের একটা ছেলেকে উদ্দেশ ক'রে বলছিল, "দুও দুও, হেরে গেলি!" নীচের ছেলেটা গাছে উঠতে না পেরে গাছের উপরের ছেলেটিকে উদ্দেশ ক'রে ঢিল ছুড়ছিল।

মিত্তির-গিন্নীর ঘুম আর মেজাজ দুটোই একসঙ্গে চটে গেল। হাই তুলতে তুলতে মুখের কাছে গোটা কএক তুড়ি দিয়ে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "আগ্‌গেল যা! রাজ্যির ছেলে এসে চেঁচিয়ে মরছে, একটু চোখে পাতায় করবার জো নেই। আবাগীর ব্যাটারা জ্বালিয়ে খেলে!"

ও পাশ থেকে কনে বউ তাঁর খনখনে গলায় মিত্তির-গিন্নীর একটু খোশামোদ ক'রেই বললেন, "যা বলেছ দিদি; ছোঁড়াগুলো সব নৈ নিত্যি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

"ঠাকমা! একটা পয়সা!"

নাতিকে উদ্দেশ ক'রে মিত্তির-গিন্নী বললেন,—"মুত্তি দ্যাখো না ছেলের, যেন শ্মশান ঝেড়ে উঠে এলেন। রোজগার আর কি! কি রাজকাযিতে গেসলেন যে পয়সা দিতে হবে?"

আবদারমাখা সুরে ছেলেটি বললে, "পাউরুটি খাব। দাও না পয়সা—চ'লে গেল যে!"

"বেরো, বে-রো, দূ চক্ষের বালাই।"

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে একবার ঠাকুরমার দিকে আরবার দূরের রুটিওলার দিকে চাইতে লাগল।

ইতিমধ্যে বিখ্যাত পাড়াবেড়ানী সাড়ে আটান্ন বছরের ছোটগিন্নী একহাত ঘোমটা টেনে বৈঠকে হাজির হলেন। লোকে বলে, এ'র বয়স বাড়ার সঙ্গে এ'র লজ্জা আর ঘোমটা দুটোই কমা দূরে থাক, সমানে বেড়ে চলেছে। ঘোমটাটা সামনের টাক বরাবর তুলে দিয়ে ছোটগিন্নী প্রশ্ন করলেন, "কতটি পাট কাটা হ'ল লো কনে বউ?"

"দেড় সের পাট নিয়ে বসেছিনু, এখনো এই এতটি বাকী। পোড়া চাকি ডুবে এল, হাড়-জ্বালানো ঢ্যারাও আবার ঘুরে মরে না।" ব'লেই কনে বউ হাতের ঢ্যারাটা একটু জোরে ঘুরিয়ে দিলেন। অদূরস্থিত নিম গাছটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনে ছোটগিন্নী আরও একটু মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নিমঝোল খাব নিমঝোল খাব ক'রে খাওয়া আর ছাই হল না, পোড়া পাতাগুলো সব পেকে গেল। অমন কচি কচি ডগডগে ডগাগুনি—আহা কাঁচা খেতে ইচ্ছে হ'ত।"

"আমারো গো দিদি ওই একই দশা; পাড়াবার অভাবে খেতে পাই নি। তা ছাড়া সিম থাকে তো বেগুন থাকে নে, আবার বেগুন থাকে তো বড়ি থাকে নে।"

মিত্তির-গিন্নী বললেন, যার যা অঙ্গ তা না পড়লে কি মজে? বেনুন অমনি রাঁধলেই হয় নে। নিমঝোলে—আ মুয়ে আগুন আমার—"

ব'লেই তিনি জিব কাটলেন। তাঁর ভাসুরঠাকুরের নাম নিমাই, 'নিম' উচ্চারণ তাই পাপজনক। কপালে হাত ঠেকিয়ে কান ও নাকটা ম'লে ভুল শোধন ক'রে আবার আরম্ভ করলেন, তেতোঝোলে শজনে ডাঁটা না দিয়ে তোয়াজ ক'রে রাঁধুক তো দেখি কোন্ ব্যাটা-বেটী আছে!"

"বটেই তো দিদি, বটেই তো দিদি" বলতে বলতে ছোটগিন্নী ঘোমটার বহর পিঠে নাবিয়ে মিত্তির-গিন্নীর কাঁচা চুল তুলে দেবার জন্য এগিয়ে গেলেন। শতকরা নিরানব্বই ভাগই চুল পেকে যাওয়ায় কাঁচা ও ডাঁশা চুলগুলি তুলিয়েই মিত্তির-গিন্নী আনন্দ বোধ করেন।

এমন সময় বৈঠকে দারোগা-গিন্নীর আবির্ভাব হ'ল।

উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় উত্তর বঙ্গের কোনও অঞ্চলে এ'র স্বামী হেড কনেস্টবল ছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, জনশ্রুতি এই যে, স্ত্রীর অত্যধিক বাক্যজ্বালায় জর্জরিত হয়ে তিনি ওই বন্যার জলেই আত্মহত্যা বা আত্মরক্ষা করেছেন। তাঁর বিধবা পত্নী বর্তমানে সাতখানা গাঁয়ে দারোগা-গিন্নী নামে পরিচিত। কারণ, একটা সিঁধেল চোরকে ইনি একবার বাঁশপেটা ক'রে তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় থানায় চালান দিয়েছিলেন। তিনি আসছিলেন, দূর থেকেই মনে হচ্ছিল যেন তিনি নিজের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আসছেন। বৈঠকে ঢুকতে ঢুকতে তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল—

"গাঁয়ে কি পোড়া মানুষ আছে! এমন কেলেঙ্কারি আমি বাপের জম্মে দেখিনি বাছা! গেল গেল সব গেল, ধম্মো গেল, কম্মো গেল, জাতজম্মো সব জাহান্নমে গেল। একেই ব'লে ঘোর কলি। বলি, হয়েছে কি এখন! আকাশ থেকে আগুন ঝরবে, ছিষ্টি থিতি নৈরেকার হবে, এই আমি ব'লে দিলুম।"

ছোটগিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে গা দারোগা-গিন্নী?" দারোগা-গিন্নী হাত নেড়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "তার চেয়ে বরং কি হতে বাকী আছে তাই জিগ্‌গেস কর। বাপ, ও কি মেয়ে? পুরুষের বাবা। কথায় বলে দুলে বাগদী। ছোট জেতের বাড় হ'ল সব্বোনেশে, বুঝলে গা? এমনি মেয়ে মন্দানি আর বেলেল্লাপনা কি চোক বুজে দেখা যায়?"

অর্থাৎ এসব ব্যাপারে আর চোখ বুজে থাকা যায় না।

মিত্তির-গিন্নী ঠোঁট উলটে বললেন, "আ গুগেল যা, চেঁচিয়ে মরছিস কেন, আসল কথাটা খুলেই বল্ না ছাই।"

"কোন মুখে আর বলব গো দিদি, নষ্ট দুষ্টু মেয়ের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে কাল হ'ল তার এ'ড়ে গরু কিনে। ইস্কুলের ঝি হ'ল কি না শেষে ভলটেয়ারী (ভলান্টিয়র)!"

মিত্তির-গিন্নী বললেন, "সে আবার কি ঢঙ?"

"ওমা, সে কথা বুঝি শোন নি? বড়ঠাকুরের নামের ওই স্বদেশী ছোঁড়াটাই তো যত কাল করলে। ছোঁড়ার ভাঁওতায় প'ড়ে আমাদের ঐ টেঁপী ছুঁড়ী গো—শেষকালে কিনা স্বদেশীর দলে নাম লেখালে। ঘেন্নার কথা বলবো কি গো দিদি, ইস্কুলের দালানে ওই ছুঁড়ী কিনা ভদ্দোরনোকের মেয়েদের চরকা কাটা শেখাচ্ছে।"

ছোটগিন্নী চোখদুটো কপালে তুলে বললেন, "বলিস কিলা দারোগাগিন্নী!"

"শুধু কি তাই। মেয়েদের সব নাটিখেলা, ছোরামারা, ডিগবাজি খাওয়া শেখাচ্ছে। শুনে এনুম,—এরপর মেয়েদের ডিরিল (ড্রিল) করা শেখাবে।"

কনে বউ তার পাটকাটা বন্ধ রেখে পা ছড়িয়ে গালে হাত দিয়ে বললে, "অবাক করলে মা! তা ছুঁড়ী ওসব বেআড়াপনা শিখলে কোথা?"

"গাঁয়ের খপর কেউ তো আর তোমরা রাখ না ভাই, এসব অনাছিষ্টি কাণ্ড কেমন ক'রে জানবে বল। ওই হাড়হাবাতে হাপাতকুড়ে স্বদেশী ছোঁড়াটাই তো ওটাকে শিখিয়েছে। এসব নটঘটে ব্যাপার কি আর একদিনেই হয় গো দিদি! রাসলীলে চলছে অনেকদিন।"

মিত্তিরগিন্নী বললেন, "মা গো কি ঘেন্নার কতা!"

"যা বলেছ দিদি! আমাদের গাঁয়ের পুরুষগুলো কি সব কাছা দিয়ে কাপড় পরে গা? এমন বেলেল্লাপনা—এতখানি বয়েস হতে গেল, সাতজন্মে শুনি নি মা! ছি, ছি, শতেক ছি! কি বলব বোন, বাইশহাত কাপড়েও মেয়েদের কাছা হয় নে তাই—নইলে একবার দেখিয়ে দিতুন বেটাবেটীদের কত ধানে কত চাল।"

ব'লে ছোটগিন্নী পাশের দিকে চোখ ঠেরে ঈষৎ চাপা

গলায় কথার খেই ধরলেন, "তাস পাশা কম্মোনাশা! যতসব অখদ্যে অবদ্যের মড়া। দিন নেই, রাত্তির নেই মিনষেগুলো খেলা নিয়েই আছে।"

সম্মানার্থে দাদার দিকে পিছন ফিরে বিনে নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাচ্ছিল। অখিল গোমস্তা গম্ভীর কণ্ঠে বিনোদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললে, "টেঁপি ছুঁড়ীর তা হ'লে সত্যিই অতিবাড় হয়েছে?"

বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতের কনুই স্পর্শ ক'রে বিনোদ দাদার দিকে হুঁকোটা এগিয়ে ধ'রে একটা সুখটান দিয়ে, মুখের উদ্গত ধুঁয়া দাদারই মুখের ওপর ছেড়ে বারকয়েক খকর্ খক্ ক'রে কেশে বললে, "তা আর বলতে?"

অনুসন্ধিৎসু চোখে বিনের দিকে চেয়ে অখিল গোমস্তা পরম উপাদেয় দা-কাটা তামাক টানতে টানতে নাক দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন।

সনাতন হিন্দু সমাজের ধর্মধ্বজী বামুনকাকা বিদ্রূপাত্মক সুরে বললেন, "গোমোস্তার পো কথাটা কি আজ শুনলেন? কি আর বলব, নেহাত ম'রে আছি তাই, নইলে—"

বামুনকাকার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুরুচরণ বললেন, "তা বুঝি শোনো নি? খবরের কাগজে পর্যন্ত ওই দু বেটাবেটীর নাম ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেছে। খবরের কাগজে নাম বেরুলে কি আর মানুষের ইজ্জত থাকে?"

হারজিতের পাওনাগণ্ডা হিসেব করতে করতে নুট-বিহারী ব'লে উঠলেন, "তার ওপর গিয়ে মেয়েছেলে! কথায় বলে—আঠার পয়সা, চার আনা দু পয়সা,—কথায় বলে—সাড়ে চার আনা। আর গিয়ে—কথায় বলে, 'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই!'"

খড়ের বোঝা মাথায় তুলতে তুলতে বিনে বললে, "এর মধ্য রহস্য আছে গো বামুনকাকা, রহস্য আছে।"

গুরুচরণ নস্য নিতে নিতে বললেন, "যোগাযোগ—যোগাযোগ! না কি বল হে গোমস্তার পো?"

"সে কথা আর কইতে! অ বিনে, এ কি তামাক সাজলি রে? ঠিকরে দিতে ভুলেছিস বুঝি? নামা তোর খড়ের বোঝা; সাজ আর এক ছিলিম। বিহিত একটা দরকার, হেস্তনেস্ত একটা না হ'লে সমাজে আগুন লেগে যাবে।"

নুটুর সঙ্গে হিসাবনিকাশ শেষ ক'রে এইবার নকর্তা আলোচনায় যোগ দেবার ফুরসত পেলেন। পর পর গোটা তিনেক বিড়ি শেষ ক'রে আস্তে আস্তে বললেন, "বয়েসকালে একটু আধটু ওরকম হয়ে—মানে দুর্বলতা হয়েই থাকে দাদা, এ নিয়ে তোমাদের এত ঘোট পাকাপাকি কেন? বয়সকালে তোমরাই বা কোন্ কর্মাত ছিলে দাদা? আজই না হয় পইতে পুড়িয়ে—কি বলে গিয়ে—বেহ্মোচারী হয়েছ। না কি বল হে নুটু?"

নুটু পয়সাগুলো ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে বললে, "তোমরা যা বল সব ঠিক দাদা, গরিব বেচারাকে রেহাই দাও।"

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। বামুনকাকা আগুন হয়ে নকর্তাকে বলতে লাগলেন, "তোমার ওইসব বাজে কথা রাখ, বুঝলে? কর্তব্য বলে একটা কথা আছে, সমাজ আছে। এমন বিতিকিচ্ছি ব্যাপার যদি সমাজের নাকের উপর বইতে থাকে তো আমরা বউ ঝি নিয়ে গাঁয়ে বাস করি কেমন ক'রে বল দিকি? একেই তো মেয়ে নাতনীগুলো ধুবড়ী হয়ে রয়েছে, আইবুড়ো নাম খণ্ডন হবার আর নামই নেই, তার উপর গাঁয়ে যদি অবাধে এইসব নেড়ানেড়ীর কাণ্ড চলে তো তাদের সামলে রাখা কত কঠিন হবে, তা একবার কেউ ভাব কি?"

গুরুচরণ বললেন, "বটেই তো।"

গোমস্তার পো আর এক ছিলিম চড়াতে চড়াতে বললে, "হক কথা বলেছ বামুনকাকা! তুমি বুঝেছ না নকর্তা ব্যাপারটা মোটেই হেসে উড়িয়ে দেবার মতন নয়, ও হারামজাদীকে সায়েস্তা করা দরকার। নইলে সমাজে টিকে থাকা কঠিন হবে এই ব'লে দিনু।"

"তার ওপর স্বদেশী ক'রে চরকা কাটার মালে জালো? কোব্পালির রাজত্বে বাস ক'রে কোব্পালিকেই লবডগ্কা দেখালোর ব্যবস্থা। ধম্বে সইবে ক্যালো বাবা!"

সুতো পর্যন্ত পুড়ে আসা বিড়িটায় বারকয়েক জোর টান দিয়ে বিনে বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, "তা বুঝি দেখ নি, ইস্কুলের মাঠে ওই ছোঁড়া আর ছুঁড়ী দুজনে হাতধরাধরি ক'রে বেতোচারী নাচন নাচে। আবার মাদল বাজাতে বাজাতে গলা ছেড়ে গানও গায়।"

গোমস্তার পো চীৎকার ক'রে উঠলেন, "বলিস কি রে অনামুখো! কই বলিস নি তো অ্যাদ্দিন?"

"মোটে কালকেই তো সন্ধ্যেবেলায় দেখনু।"

"সর্বনাশ, গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে এসব কি ছেনালী কাণ্ড, অ্যাঁ?" বিস্ময়ে তিনি খানিকক্ষণ হাঁ ক'রেই রইলেন।

বামুনকাকা একটু বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে কানে পইতে জড়াচ্ছিলেন, মধ্যপথেই থেমে গিয়ে ব'লে উঠলেন, "গাঁয়ে কি মানুষ নেই নাকি, ছি ছি।"

নকর্তা বিড়ির বাণ্ডিলটা হাতড়াতে হাতড়াতে অখিল গোমস্তার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "মুখটাকে একটু সামাল দাও গোমস্তার পো, ছেনালি মেনালি গুনো আর ব'লো না। টেঁপীকে শায়েস্তা করবার খুব তো আস্ফালন করছ, ছেলেটার নাম তো কই মুখে আনছ না? বড়লোক ব'লে বুঝি? না, এব্লা ওব্লা ওদের বাড়ির কলাটা মুলোটার কথা মনে আসছে? অনাথা গরিব বাগদীর মেয়ের উপুর বীরত্ব করতে হাত নিশপিশ করছে, না?"

গোমস্তা আগুন হয়ে উঠলেন।—"বড্ড তোমার মুখ হয়েছে নকর্তা। কথাগুলো তোমার ঠাট্টার মতন শোনাচ্ছে না মোটেই। বলি, টেঁপীর উপরই বা তোমার অত দরদ কিসের শুনি?"

(শেষাংশ ৭৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# পঞ্চমবাহিনী

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা সৃষ্টি করে। নূতন বস্তুর সঙ্গে পরিচয়, পরিবর্তিত আবেষ্টনী, অভিনব আবিষ্কার, কাল ও অবস্থার উপযোগী মনোভাব প্রকাশের অনুকূল শব্দের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে মানুষের মনে শব্দ সৃষ্টির তাগিদ আসে। কাজেই প্রত্যেক শব্দ সৃষ্টির পিছনেই থাকে অল্পবিস্তর ইতিহাস। কালক্রমে ইতিহাস মুছিয়া যায়, অথবা কেবল বিশেষজ্ঞের এলাকাভুক্ত হইয়া থাকে, আর ভাষার রাজ্যে শব্দ হইয়া পড়ে স্থায়ী ও স্বাভাবিক বাসিন্দা। কিন্তু যখনই কোন নবাগত শব্দ এই রাজ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই সকলে তাহার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায়, তাহার নামধাম, জাতি-গোত্রের খোঁজ খবর লয়, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতেও চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিছুদিন একত্র থাকিলেই আবার সে দশজনের একজন হইয়া যায়, জিজ্ঞাসুর কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে আর অহরহ বিদ্ধ হইতে হয় না। 'অজ্ঞাত কুলশীল' সম্বন্ধে মানুষ ও ভাষার আচরণ যেন অনেকটা একই রকমের।

জেনারেল মোলা

বর্তমানে এই ধরণের একটা পরিচয়হীন শব্দ সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে খুব বেশী আনাগোনা করিতেছে। শব্দটি "পঞ্চম বাহিনী" (Fifth Column) অবশ্য 'পঞ্চম' ও 'বাহিনী' পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে এই দুইটি শব্দের কোনটিই নূতন নহে। কিন্তু এই শব্দ দুইটি মিলিয়া যে যুগ্ম শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে আপাতত তাহার যে অর্থ হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহা যেন শব্দ দুইটির প্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এ যেন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে মিলিয়া জলের উৎপত্তির মত।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে। নিত্য নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার, অভিনব সমর কৌশলের প্রবর্তন প্রভৃতি নানা কারণে এখন হইতেই নানা নূতন শব্দ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এবং যুদ্ধান্তে অভিধানগুলির নূতন সংস্করণে এই সকল নূতন আমদানী শব্দের একটা দীর্ঘ তালিকাই হয়তো সংযোজিত হইবে। কিন্তু ইহার অনেকগুলি শব্দই থাকিবে এমন যাহাদের প্রয়োগ হইতেই হয়তো তাহাদের পরিচিতি এতটা পরিমাণে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, পাঠকের মনে তাহা অযথা আলোড়নের সৃষ্টি করিবে না। কিন্তু 'পঞ্চম বাহিনী' শব্দটি ঠিক সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। ইহা শুনিলেই মনে হয় যেন ইহার পিছনে খানিক কাহিনী রহিয়া গিয়াছে, যাহা আমাদের অজ্ঞাত। কাজেই ইহার সম্বন্ধে পাঠকের মনে জিজ্ঞাসাও প্রবল।

বস্তুত এই শব্দটির প্রয়োগের সামান্য একটু ইতিহাসও আছে। গত স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের সময় বিদ্রোহী দলের অন্যতম সেনাপতি জেনারেল মোলা (General Mola) (কাহারও মতে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো) ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহী দলের চারিটি বাহিনী মাদ্রিদের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তিনি শহরের বহিঃপ্রান্তে পৌঁছিলেই মাদ্রিদ শহরের মধ্যে তাঁহার যে 'পঞ্চম বাহিনী' আছে, তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবে। এই ঘোষণায় মাদ্রিদ শহরে খুব আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, গণতন্ত্রিগণ মাদ্রিদ শহরে ফাসিস্ত বিদ্রোহের আশঙ্কা করেন। রাত্রিতে ছাদের উপর হইতে, অলিন্দ হইতে ও দ্রুতগামী মোটরগাড়ী হইতে চোরাগুলী বর্ষণে এই আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল হয়। ফলত গবর্ণমেণ্ট ভ্যালেন্সিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং একটি পরিষদের হাতে (Defence Council) মাদ্রিদ শহর রক্ষার ভারার্পণ করা হয়। এই পরিষদ সকলকেই অবিলম্বে আগ্নেয় অস্ত্রাদি তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবার আদেশ দেন। অবশ্য সৈন্য, পুলিশ, গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের সমর্থক বিভিন্ন দলের ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নেতৃবর্গের উপরে এই আদেশ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু স্বদেশরক্ষী সৈন্যদের উপর আদেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন অনুমতি না লইয়া কোন খাদ্য বা কোন জিনিষের জন্য চাহিদা না করেন। তাহা ছাড়া সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিমাত্রকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়। এইরূপে জেনারেল মোলাঘোষিত মাদ্রিদ শহরের 'পঞ্চম বাহিনী'র ক্রিয়াকলাপ অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে 'পঞ্চম বাহিনী' শব্দটি লুপ্ত হইয়া যায় না। বরং সেই সময় হইতেই উহা প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

মেজর কুইসলিং

কৌশলটিও যে লোপ পাইয়াছে তাহা নহে। শত্রুপক্ষের দেশে 'পঞ্চম বাহিনী' গঠনে জার্মান নাৎসীগণ পরম উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং এদিক দিয়া এখন তাহারা পাকা খেলোয়াড়। নাৎসী 'পঞ্চম বাহিনী' পরিচালনার হেড কোয়ার্টার বার্লিনে। ইহার একটি পৃথক্ দপ্তর আছে। এই দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক রোজেনবার্গ। উইলহেলমষ্ট্রাসির একটা সুরক্ষিত গৃহ ইহার কার্যালয়। ইহার কার্যাদি এত সংগোপনে সাধিত হয় যে, জার্মানরাও অনেকেই ইহার কোন খোঁজ খবর রাখে না। এখান হইতেই নানা দেশে নাৎসী 'পঞ্চম বাহিনী' গঠনের সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিদেশ আক্রমণের

গোপন পরামর্শাদিও সাধারণত এই স্থানে হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, নাৎসী 'পঞ্চম বাহিনী'র কর্মক্ষেত্র কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই উহার শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া আছে। এজন্য নাকি জার্মানী হইতে অর্থব্যয়ও করা হয় প্রচুর।

হয় না। জনসাধারণের মধ্যে নানারূপ প্রচারকার্য করিয়া নাৎসী জার্মানীর শক্তি সম্বন্ধে সেই দেশের মধ্যে এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি করে, যাহাতে তাহারা মনে করে যে, তাহাকে বাধা দেওয়া নিরর্থক ; কারণ তাহাতে পরাজয় অনিবার্য। এইভাবে পূর্ব হইতে

লণ্ডনে ফ্যাসিস্টদের প্রধান আড্ডায় গোয়েন্দাদের হানা দিবার পর একজন মহিলা ফ্যাসিস্ট গোয়েন্দার সহিত তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন।

ইউরোপে নাৎসীদের গত কয়েক মাসের কার্যকলাপ হইতে দেখা যায় যে, 'পঞ্চম বাহিনী' জার্মান আক্রমণের লক্ষ্যীভূত দেশে কেবল গুপ্তচর বৃত্তি, সৈন্যদের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ, সেতু, কলকারখানাদি ধ্বংস অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত

তাহাদের মনকে একরূপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া রাখা হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক দেশে নাৎসীদের অভিপ্রেত প্রণালীতে 'পঞ্চম বাহিনী'র কার্য পরিচালনা করিবার জন্য বার্লিনে 'পরিচালক' সৃষ্টি করা হয়। তাহারাই জানে যে, তাহাদের কোন্ কার্যের কি উদ্দেশ্য। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে

তাহার প্রচারের বুলি হয় তো অন্য রঙে রাঙানো হয়।

বর্তমান যুদ্ধে নাৎসী পঞ্চম বাহিনীর কর্মতৎপরতা একটু বেশী দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহার পূর্বেও ইহাদের কার্যকলাপ দেখা না গিয়াছে তাহা নহে। অষ্ট্রিয়ার কথাই ধরা যাউক। যে ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় অষ্ট্রিয়া বিনা রক্তপাতে হিটলারের কবলিত হইল তাহার নাম আর্থার জাইস-ইন-কোয়ার্ট। তিনি ভিয়েনার একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ছিলেন এবং বহু ইহুদী তাঁহার মক্কেল ছিল। ৪৬ বৎসর বয়সের শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক, স্কুল মাষ্টারের ছেলে, অমায়িক ব্যবহার। তাঁহার কথাবার্তা ও চালচলনে বুঝাও যাইত না যে, রাজনীতির সঙ্গে তাঁহার কোন দিন কোন সংশ্রব আছে। তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার তদানীন্তন চ্যান্সেলার ডাঃ কুর্ত ফন সুসনিগের সঙ্গে তিনি একই কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এহেন লোকের নিকট হইতে আশঙ্কার কোন কারণ আছে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। ডাঃ সুসনিগের 'রাজনৈতিক' মস্তিষ্কেও আসে নাই। কাজেই তিনি জাইস-ইনকোয়ার্টকে বার্কটেসগাদেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মনকষাকষি যাহাতে দূর হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। জাইস-ইনকোয়ার্টও সম্মত হইয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু রাজনীতি একটা জঘন্য খেলা (ugly game), কাজেই তাহার নিয়মকানুন সবই অসাধারণ। তাহাতে নাকি 'ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে।' কয়েক সপ্তাহ পরেই দেখা গেল যে, এই শান্তশিষ্ট মানুষটির অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী যুবকদের নেতা হইয়া তিনি অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিবার আন্দোলন চালাইতেছেন। আজ জাইস-ইনকোয়ার্ট জার্মান অধিকৃত পোলাণ্ডের শাসন-কর্তা, বজ্রমুষ্টিতে তিনি সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। চেকোশ্লাভাকিয়ার কনরাড হেনলাইনও সুদেতেন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া কতকটা 'পঞ্চম বাহিনী'র পরিচালকের অনুরূপ কার্যই করিয়াছিলেন।

বর্তমান যুদ্ধের সময় নরওয়েতে মেজর ভিকডুন কুইস্‌লিং স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নরওয়েকে নাৎসীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। কুইস্‌লিং এক সময়ে নরওয়ের সমর সচিব ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী, কিন্তু পরে-'ছেড়ে দিলেন পথটা, বদলে গেল মতটা'। কাজেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (National Socialist) অনুকরণে এক দল গঠন করেন। অবস্থাপন্ন কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছাত্র আর কেরাণীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিতে থাকে। কুইস্‌লিঙের প্রধান বুলি হয়—"মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ হইতে নরওয়ে মুক্ত হউক" তিনি এই দলের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে প্রার্থীও দাঁড় করান।

শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুইস্‌লিঙের কর্মক্ষেত্রও ব্যাপকতর হয়। নূতন নূতন দিক হইতে তিনি সাহায্য লাভ করিতে থাকেন। "টাইডেন্‌স্ টেগান" নামক অসলোর একখানা প্রভাবশালী সংবাদপত্র তাঁহাকে সমর্থন করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি রক্ষণশীল দল ও সামরিক সমর্থনও লাভ করিতে থাকেন। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে, দেশের কল্যাণের জন্য ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ দমনের জন্য তিনি প্রথমে আন্দোলন চালাইলেন এবং আরও নানাভাবে হিটলারের অনুকরণে নরওয়েতে নাৎসী আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আন্দোলন সার্থক হইয়াছে এবং তাঁহার সমর্থকের আর অভাব হইবে না তখন কুইসলিং বার্লিনে যাইয়া তাঁহার কাজের বিবরণ দাখিল করিলেন। তাহার পরই জার্মানী নরওয়ে আক্রমণ করিল এবং অসলো অধিকার করিয়া এক তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিল। কুইস্‌লিং হইলেন এই গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী। তাহার কয়েকদিন পরেই কুইস্‌লিং বেতারে ঘোষণা করেন যে, জার্মান অধিকৃত নরওয়ে এক নবগঠিত শাসন কমিটির দ্বারা শাসিত হইবে। মঃ ক্রিস্টেনসেন হইবেন উহার প্রধানকর্তা। তিনি ঐ কমিটির অধীনে থাকিয়া কেহ যাহাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন, তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

ডেনমার্কে এই 'বিভীষণে'র কাজ করিয়াছেন ডেনমার্কের নাৎসী নেতা ফ্রিৎস ক্রসেন। ক্রসেন ডেনমার্কে ডাক্তারী করিতেন। ছয় ফুট লম্বা, তিন মণ ওজনের তাঁহার বিরাট বপু। তিনি বলেন যে, নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে তাঁহার দলের কোন সম্পর্ক নাই তাঁহার দল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং তাহার কর্তা তিনি নিজে। তিনি জার্মান নাৎসীদের মত কৃষ্ণবর্ণ স্বস্তিকা ধারণ না করিয়া একটি সাদা ও একটি লাল স্বস্তিকা ধারণ করিতেন। জমিদার ও শিল্পপতিদের নিকট হইতে তিনি অর্থ সাহায্য পাইতেন। বহু চেষ্টার পর ১৯৩৯ সালে তিনি ডেনমার্কের পার্লামেণ্টে নিজের তিনজন লোক ঢুকাইয়াছিলেন। ডেনমার্কের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতারা তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখেই দেখিতেন। কারণ তিনি অতি কম সংখ্যক লোকের ভোটই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার শক্তি যে উপেক্ষণীয় ছিল না, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রধানত তিনি প্রতিকূল হওয়াতেই ডেনমার্ক জার্মানীর আক্রমণে বিনা বাধায় বশ্যতা স্বীকার করে।

হল্যাণ্ড অধিকারের পিছনেও হাত ছিল ডাচ ফাসিস্ত পার্টির নেতা অ্যান্টন মুসার্টের। তিনি ইঞ্জিনীয়ার, বর্তমানে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মাতার ৪১ বৎসর বয়স্কা ধনবতী ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ডাচ ফাসিস্ত পার্টি গঠন করেন এবং তাঁহার আপিসে হিটলার ও মুসোলিনীর ছবি স্থাপিত করেন। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন—"আমরা মনে করি, আমরা স্বাধীন জাতি। কিন্তু স্বাধীন আমরা নহি। আমরা ইংলণ্ডের ক্ষমতাশূন্য গোলামমাত্র।.........ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে যাইতেছে। সে আমাদিগকে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করিতেছে—

দেখাইতেছে তাহা না করিলে ডাচ ইণ্ডিজ লইয়া যাইবে।......... আমাদের পূর্ব প্রান্তীয় প্রতিবেশীর মত আমাদেরও জার্মান অন্তঃকরণ।"

বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণকে ক্ষেপাইবার ক্ষমতা মুসার্টের আছে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ২০টা আসন পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন মাত্র ৪টা আসন। সম্প্রতি তিনি নরওয়ের ভিকডুন কুইসলিং এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বেলজিয়মের ফাসিস্ত নেতার নাম হইল লিওন ডেগ্রেল। তিনি রেক্সিষ্ট পার্টির নেতা। ৩৪ বৎসর বয়স্ক এই যুবকটিও স্বীকার করেন না যে, ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব আছে। কিন্তু তিনি বলেন, বেলজিয়াম পার্লামেণ্টের শুধু বাজেট করিবার জন্য দুই মাসের একটা অধিবেশন হইলেই হইল। অন্য কোন কাজে তাঁহার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। কম্যুনিষ্টদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন। একবার তিনি বেতারে ইতালী ও বেলজিয়মের জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"জঘন্য বলশেভিজমএর পথ বন্ধ কর।"

রোজেনবার্গ

ডেগ্রেল টাকা পয়সা কোথা হইতে পান তাহাও তিনি প্রকাশ করেন না। শিল্পপতিরা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, দলের সভ্যদের চাঁদা ছাড়া তিনি আর কোন টাকা পয়সা পান না। অথচ বহু বৎসর তিনি দুইটি ভাল সংবাদপত্র চালান, তাহাতে কম করিয়া ধরিলেও তাঁহার মাসে ৩০ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ব্যয় করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন—"হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইটালী ও জার্মানীর সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

বেলজিয়মে 'পঞ্চম বাহিনী'র কার্যকলাপের পিছনে এই রেক্সিষ্ট নেতার হাত কতখানি তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে যদি কেহ তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলেও বোধ হয় তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া সুইডেনেও 'পঞ্চম বাহিনী' ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। সুইডেনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জার্মানীর প্রচণ্ড লোভ। গোয়েরিং অনেকদিন সুইডেনে ছিলেন। তাঁহার প্রভাব এখনও সেখানে খুব কম নয়। অভিজাত ও সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার তৎকালীন ঘনিষ্ঠতা এখন খুব কাজে লাগিতেছে। তাহা ছাড়া সঙ্গতি-সম্পন্ন কৃষকদের দলে ভিড়াইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। সুইডেনের দুই একটা সংবাদপত্রও নাৎসী জার্মানীর অনুকূল প্রচারকার্য চালাইতেছে।

কানাডার সাস্কেটচোয়ান অংশের অধিবাসী জার্মানরা যুদ্ধের অল্পদিন পূর্বেই হিটলারের নিকট আবেদন করিয়াছিল যে, তিনি যেন কানাডার এই অংশ রাইখের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। মেক্সিকোতে প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস যখন নামাবিধ জাতীয় কল্যাণকর বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করেন তখন জেনারেল সেডিনো নামে এক ব্যক্তি তাহাতে প্রবলভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করেন।

এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, 'পঞ্চম বাহিনী'র কার্যক্ষেত্র পৃথিবীর নানা স্থানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্টই এ সম্বন্ধে এখন সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন এবং নানা প্রকার আইনাদি করিয়া কঠোরহস্তে সন্দেহভাজনদিগকে দমন করিতেছেন। ইংলণ্ডে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, অনেকের উপর রাখা হইয়াছে কড়া নজর। আয়র্লণ্ড, কানাডা প্রভৃতি স্থানেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই কঠোর নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে যে, আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে না পারিলে সে দেশে কোন বিদেশীকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। তাহা ছাড়া যদি গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, কোন ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতিকূল হইবে, তবে তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না। 'পঞ্চম বাহিনী'র হাত হইতে আর্জেণ্টিনা রক্ষা করিবার জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্ট একটা আইন করিয়াছেন। উহাতে বিদেশী সমিতিগুলিকে কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে।

নাৎসী 'পঞ্চম বাহিনী'র গতিবিধি যেরূপ রহস্যপূর্ণ এবং তাহাদের কার্যকলাপ যেরূপ মারাত্মক তাহাতে দেশে দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ফলত প্রায় প্রতি দেশেই যে কঠোর দমনমূলক আইন প্রবর্তিত হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু কঠোর আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে যদি বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন না করেন, তবে বহু নির্দোষেরও তাহাদের হাতে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা কম নহে। তাহাও যুদ্ধের অবস্থায় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

# নন্দা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅমিয়া সেন

(৬)

প্রীতি প্যালেস। কোন বড়লোকের শৌখিন বাড়ি নয়, ত্রিতল একটি মেস। এই মেসে সুবীর থাকে।

তিরিশ টাকা হইতে তিন শ' টাকা পর্য্যন্ত মাহিনার কেরানীর এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। তাই সুবীরও এই অতি আলোকিত পরিচ্ছন্ন মেসের এক তলায় একখানা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে থাকে। যামিনীদের আসার পূর্ব্বে সে কিছুই জানিত না। তাই সেদিন যখন অফিস হইতে ফিরিয়াই তাহাদের টেলিগ্রাম পাইল যে, আমরা যাইতেছি, স্টেশনে উপস্থিত থাকিও, তখন সত্যই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই রকম হঠাৎ যে কেন যামিনী কলিকাতায় আসিতেছেন তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। মায়ের আকস্মিক আগমনের কারণ অনুমান করিতে যখন সে বিব্রত, তখন অকস্মাৎ একটি সুমধুর চিন্তা ও অপূর্ব্ব ভাবে সমস্ত দেহ মনে যেন তাহার বসন্তের মদির স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল। যামিনী যখন আসিতেছেন, তখন নন্দা কি আর না আসিবে?

দুই বছর ছয় মাস, সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর সুবীর বাড়ি যায় নাই। ক্রমবর্দ্ধমান সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নন্দাকে সুখী করিবার জন্যই সে ছুটিতে বাড়ি না গিয়া প্রাণপণে অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুঝিয়াছে। নন্দাকে সে সত্যই বড় ভালবাসে। নন্দা, নন্দা—নন্দার মধুর নামটি বার বার তাহার মনে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। একটা অদম্য তৃষ্ণায় সুবীরের বুকের মধ্যে রক্তধারা উষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। উঃ, কতদিন যে নন্দাকে দেখিতে পায় নাই! তাহাকে একবার দেখিবার জন্য, তাহাকে একটু আদর করিবার জন্য আজ এতদিন পরে সুবীরের মন পাগল হইয়া উঠিল। যদি সে আসে, হে ভগবান।

সুবীর আজ সমস্ত অন্তর দিয়া প্রার্থনা করিল, হে ভগবান, সে যেন সত্যই আসে। সুবীরের যত অসুবিধা হউক, যত অর্থ কষ্ট হউক, একবার এক দিনের জন্যও সে নন্দাকে কাছে ধরিয়া রাখিবে। ভালবাসার কাঙ্গালিনীকে এক দিনের জন্যও সে ভালবাসায় ঐশ্বর্য্যময়ী করিবে।

* * * * *

পর দিন সুবীর যখন স্টেশনে আসিল, ট্রেন আসিতে তখনো প্রায় পঁচিশ মিনিট বাকী। কঠোর কষ্টসহিষ্ণু, অক্লান্ত কর্ম্মী সুবীরের পক্ষে এমন চঞ্চল মুহূর্ত্ত বোধ হয় এই প্রথম আসিল। ভাবাবেগের প্রাধান্য তাহার চিত্তে নাই। অন্তত এই ঊনত্রিশ বছরের জীবনে সে আজ পর্য্যন্ত কখনও ভাবাবেগে রূঢ় বাস্তবকে আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। তা যদি করিত, তাহা হইলে সে এই দু'বছর শুধু বাস্তবের দিকে চাহিয়া নন্দাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিত না। প্রেমের এই দুঃখ, এই বেদনা, আর্থিক ও নৈতিক সর্ব্বপ্রকার সংযমের নামে নিজের দেহ মনের এই অসহ দুঃখ বরণ, এ সবই তো তাহার ইচ্ছাকৃত।

এ বিষয়ে তাহার সহ্য ও সংযম সত্যই বিস্ময়জনক। গভীর মর্ম্মবেদনা ও যৌবনের সমস্ত মুকুলিত আকাঙ্ক্ষাকে সে মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কঠিন হাতে চাপিয়া রাখিয়াছে; তার মুখ দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহার মনে কোনও অশান্তি আছে। বাহিরে সে এত নির্ব্বিকার বলিয়াই নন্দা পদে পদে তাহাকে ভুল বোঝে, আর সেই ভুল বোঝার বেদনার আগুনে নিজেকেই নিজে দগ্ধ করিয়া মারে।

সুবীর চঞ্চল, দৃঢ় পদক্ষেপে স্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করিতে লাগিল। ট্রেন আসিতে এখনও দশ মিনিট দেরি। সুবীরের বুকের মধ্যে আজ যেন প্রথম পাগল জাগিয়াছে। সমস্ত দেহ মন জুড়িয়া অননুভূতপূর্ব্ব এক আনন্দ আর উৎকণ্ঠাজনিত অস্থির চাঞ্চল্যে তার দৃঢ় পদক্ষেপও বিচলিত হইতেছিল। অবশেষে ট্রেন আসিয়া পড়িল।

যামিনীরা একেবারে শেষের দিকে ছিলেন। কাজেই অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক মুখের আড়াল হইতে সুবীর প্রথমে প্রবীরকে দেখিতে পাইল। কহিল, "মা কোথায়? এ কি অমিতাও এসেছিস?"

প্রবীর নামিতে নামিতে কহিল, "মাসীমার মেয়ের বিয়ে যে।"

প্রবীর আর অমিতাই সম্মুখে ছিল। তাহারা নামিতেই যামিনী সম্মুখে আসিলেন, পিছনে অবগুণ্ঠনবতী প্রমীলা। সুবীরের উৎসুক দৃষ্টি যাত্রিবহুল কামরাটির ভিতর ঘা খাইয়া ফিরিতে লাগিল। ঈষৎ ব্যাকুল স্বরে কহিল, "তোমরা সবাই এসেছ?"

যামিনী নামিতে নামিতে কহিলেন, "না, সকলের আর আসা হ'ল কই। বড় বউমা আর উনি রয়েছেন বাড়িতে। তাকে তো তোর মাসী একবার দেখেছে, ছোট বউমাকে দেখেনি। কবে আবার দেখাটেখা হয়, এই সব ভেবেই ছোট বউমাকে নিয়ে এলাম। সুযোগ যখন পাওয়া গেছে,—এদিকে আসা তো বড় হয় না।"

সুবীরে বুকের ভিতর তখন তার অসীম প্রাণশক্তি যেন ক্লান্তিতে বিবশ হইয়া এলাইয়া পড়িতেছিল। যামিনীর কোনও কথাই তাহার কানে যায় নাই। সে শুধু শুনিয়াছিল, নন্দা আসে নাই। স্টেশনের প্রত্যেক যাত্রীর পদশব্দে, আনন্দ কলরোলে, গাড়ি ঘোড়ার চক্রঘর্ষণে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যেন বাজিতেছিল, 'নন্দা আসে নাই।'

যামিনীর ডাকে সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল, ছোট একটি নিশ্বাস চাপিয়া কহিল, "কি বলছ?"

প্রবীর ততক্ষণে একখানা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কহিল, "চল চল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

যামিনী ব্যস্তভাবে কহিলেন, "মাল পত্তর সব তোলা হয়ে গেছে? তবে সব চল।" সুবীরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তবে চল গাড়িতে বসেই সব কথা বলব।"

সুবীরের মনটা বিরস হইয়া গিয়াছিল, বিরক্ত হইয়া কহিল, "গাড়িতে আমি কোথায় যাব! তোমরা যাবে ল্যান্স-

ডাউন রোড, আমি যাব ক্লাইভ স্ট্রীট। আমার অফিস আছে না?"

যামিনী কহিলেন, "ও অফিস আছে। আমি মনে করেছিলাম বুঝি ছুটি নিশ্চয়ই নিয়েছিস।"

সুবীর ছুটি নিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু এরা যেখানে যাইতেছে, সেখানে যাইতে তাহার মন চাহিতেছিল না। তার এই মন নিয়া সে ধনীর প্রাসাদে আনন্দ উৎসবের মাঝে কিছুতেই যাইতে পারে না। যামিনী তখন তাহাকে সংক্ষেপে জানাইলেন, এই বিবাহে আসার দরুন তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে অন্ততপক্ষে একশত টাকা দরকার এবং সে টাকাটা যেন সুবীর অবিলম্বে তাঁহাকে ল্যান্সডাউন রোডে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

এক শ' টাকা! আঘাতের উপর আঘাত! সুবীর স্তম্ভিত হইয়া গেল। কহিল, "এ কথা তুমি আমকে আগে জানিয়ে তারপর এলে না কেন?"

এক শ' টাকা এ সময়ে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যে সুবীরের পক্ষে কতদূর কষ্টকর তাহা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যামিনী যে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এমন নয় এবং সেই জন্যই পূর্ব্বে চিঠি লিখিয়াও কিছু জানান নাই। কারণ, মনে আশঙ্কা ছিল খরচের বহর শুনিলে সুবীর টাকা দিতে অক্ষমতা জানাইয়া বসিবে। তবে রওনা হইয়া আসিয়াছেন এই জন্য যে, সামনে যাইয়া পড়িলে দায়ে পড়িয়া সম্মান রক্ষার দায়ে সুবীর যেমন করিয়াই হউক অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবে। তা যামিনী প্রবীণ এবং পাকা লোক, তাঁর হিসাবে ভুল হয় নাই। কহিলেন, "আগে জানাবার সময়ও তেমন পেলাম না, তা ছাড়া দূরে ব'সে লিখলে ব্যাপারটা তুই পরিষ্কার বুঝতে পারবি নি তাই ভাবলাম, সেই যেতে তো হবেই, সামনে গিয়ে মুখোমুখিই সব বলব। কি করব বল্, দামিনীর এই প্রথম কাজ। না এলে সে মনে মনে ভারী—"

সুবীর তখন প্রবীরের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল, "তোদের সবাইকারই কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? কেউ একবার আমায় জানালি না? এখন দু'দিনের মধ্যে এক শ' টাকা আমি কোত্থেকে যোগাড় করি বল্ তো?"

প্রবীর চুপ করিয়া রহিল। উপযুক্ত বয়স্ক ভাই বলিয়া সুবীরের দুঃখ-কষ্টের বা চিন্তার কোনও অংশই সে কোনদিন নিতে আসে নাই। আজও সুবীরের উদ্বেগব্যাকুল তিরস্কারে তার মনে বিশেষ কোন ভাবান্তর হইল না।

সুবীরের মুখে আসিল, 'কত কষ্ট ক'রে আমি এখানে চাকরির জন্য প'ড়ে থাকি, আর তোমরা মনে কর, বড্ড সুখে আছি,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বিপুল বিতৃষ্ণায় অবাধ্য রসনাকে সে সংযত করিয়া লইল। কাহারও কাছেই তো সে নিজের দুঃখ কষ্টময় জীবনের কথা জানায় নাই। জানাইয়া এখনই বা কি লাভ? এরা তার আপন জন, কিন্তু তার মর্ম্ম বেদনার অংশীদার এরা নয়।

ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক, এসেই যখন পড়েছ তখন আর ভেবে কি হবে। যাও গাড়িতে ওঠ গিয়ে।"

প্রবীর হাঁফ ছাড়িয়া গিয়া গাড়িতে উঠিল, যামিনীরাও পিছন পিছন গিয়া উঠিলেন। গাড়ি চলিয়া গেলে রাস্তায় চলিতে চলিতে সুবীরের মনে হইতে লাগিল, বৃথা বৃথা, সব বৃথা। এরা তাহার কেউ নয়। তার দুঃখ কষ্ট এদের অন্তরকে স্পর্শ করে না, অথচ ইহাদেরই জন্য সুবীর আপনার সব শান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু এরা কেউ তার জন্য একবিন্দু স্বার্থও ত্যাগ করিতে রাজী নয়। নিজেদের খুশির পথ ধরিয়াই ইহারা চলিয়াছে।

অথচ ইহাদেরই সেবার জন্য তাহার সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করিতে হইবে; ইহাদের অতিক্রম করিয়া নিজের যৌবনমণ্ডিত জীবনকে সাফল্যে ও আনন্দে ভরিয়া তুলিতে সে পারিবে না। সে প্রবৃত্তিও বোধ হয় তাহার নষ্ট হইয়াছে। তাহার অনেক দায়িত্ব, এই দায়িত্বের বোঝা তাহাকে চিরদিন বহিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে যেন সুবীরের পাষাণের মত দৃঢ় বক্ষের প্রাচীরটির ব্যাথার আঘাতে কোথায় না জানি ফাটল ধরিয়া গেল। কর্ম্মব্যস্ত যন্ত্রযান ও মানুষের দিকে চাহিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাহর মনে হইল, তাহার দেহটা যদি আজ ইহাদের পায়ের তলায় চূর্ণ করিয়া নিবেদন করিতে পারিত, তবে হয়তো আজ তার অশান্ত হৃদয়টা একটু শান্তি লাভ করিত।

নন্দার কথা তাহার মনে জাগিল না। হায় পাষাণ! হায় মূঢ়!

(ক্রমশ)

## রাঙ্গামাটির পথ

(৭৩৬ পৃষ্ঠার পর)

অলকার মুখে ম্লান হাসির কণা!

অলকা বললে,—আসি...

বিমলের হাত প্রসারিত...

সে-হাত নিজের হাতে অলকা চেপে ধর্‌লো...তার দু'চোখ মুদে এলো...অলকা চুপ করে রইলো...বিমলের মুখেও কথা নেই......

পাশের ঘরে অলকার...ওঁদের খাওয়া-দাওয়া চুকেছে...

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—আমি আসি—

বিমল বললে,—আর আসবেন না...?

বিমলের স্বর অতি মৃদু...সে স্বরে গভীর মিনতি...

অলকা কোনো জবাব দিলো না...তার চোখের কোণে বাষ্পভার...মুখে মলিন হাসি...বিমলের হাত ছেড়ে অলকা আর এক নিমেষ দাঁড়ালো না...ওঁরা বাথরুমে...অলকা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এলো—সামনে পথঃ একেবারে সেই পথে।

( ক্রমশ )

# রণাঙ্গনে ইটালী

ইটালী যুদ্ধে নামিয়াছে। পূর্ব্বে মনে করা গিয়াছিল, জার্ম্মানেরা প্যারিসের দিকে আর আগাইবে না, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে প্যারিসের দিকে তাহারা আক্রমণ চালাইতেছে। সিন নদীর তীরে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, জগতে তেমন ভীষণ সংগ্রাম নাকি আর হয় নাই। এই যুদ্ধে জার্ম্মানী ১৮ হইতে ২০ লক্ষ সৈন্য নামাইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। স্থলযুদ্ধে ফরাসীদের চিরদিন সুখ্যাতি আছে। ফরাসীরা প্রবল বিক্রমে জার্ম্মান বাহিনীর তরঙ্গায়িত গতিবেগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে। বুঝা যাইতেছে হিটলার এবার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সেনা নামাইয়াছেন। এই যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সমগ্রভাবে নির্ভর করিতেছে বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিতেছেন। বিমান যুদ্ধটাই চলিতেছে সর্ব্বত্র। জার্ম্মানেরা যেমন ফ্রান্সের নানাস্থানে বিমানে হানা দিতেছে, তেমনই কয়েকবার ইংলণ্ডেও তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ বিমান-বীরেরা জার্ম্মানীর নানাস্থানে হানা দিতেছে। জার্ম্মানীর নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু মিত্রপক্ষের নীতির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াই উঠিয়াছে। তাঁহারা এখন বুঝিতেছেন যে, কেবল আত্মরক্ষা করিলেই চলিবে না, আগাইয়া গিয়া আক্রমণ করিতে হইবে নতুবা শত্রুপক্ষের জোর দিন দিনই বাড়িয়া যাইবে। মার্কিনের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড লোথিয়ান তাঁহার বক্তৃতায় এ কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলও রাখিয়া ঢাকিয়া কোন কথা বলেন নাই।

কিন্তু আক্রমণ করা চাই বলিলেই আক্রমণ করা যায় না। ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে দেখা গিয়াছে মিত্রপক্ষের দুর্ব্বলতা কোথায় এবং জার্ম্মানীর রণনীতির চাতুর্য্যই বা কোনখানে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারণা লইয়া বসিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নৌ-শক্তি যখন দুদ্ধর্ষ, তখন তাঁহারা সেই নৌ-শক্তির জোরে জার্ম্মানীদিগকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারিবেন; পক্ষান্তরে ফরাসীদের মনে এই ধারণা দৃঢ় ছিল যে, তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ ম্যাজিনো লাইন রহিয়াছে, আর রহিয়াছে প্রভাবশালী গোলন্দাজ বাহিনী। জার্ম্মানী ইহা বুঝিয়াই কাজ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের উড়োজাহাজ এবং ট্যাঙ্কের জোরে মিত্রপক্ষের এই সব সুবিধা নষ্ট করিবার জন্য তোড়-জোড় বাঁধিয়াই লড়াইতে নামে। ফ্লাণ্ডার্সে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের প্রধান কারণ হইল তাহাদের আধুনিক অপ্রচুর সমর সম্ভার, বিশেষভাবে নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক এবং উড়োজাহাজের প্রাচুর্য্য না থাকা। ব্রিটিশ বিমান বীরেরা জার্ম্মান বিমান বীরদের চেয়ে সমর দক্ষতায় হীন নহে, একথা স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, জার্ম্মাণদের উড়োজাহাজের সংখ্যা ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী। প্রচুর বিমান ধ্বংস হইতেছে জার্ম্মানদের একথা আমরা দিনের পর দিন শুনিতেছি, কিন্তু তথাপি তাহাদের বিমান আক্রমণ বন্ধ হইতেছে না। মিত্রশক্তিকে যদি আগু বাড়াইয়া আক্রমণ চালাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের এই দিককার অভাব পূরণ করিতে হইবে।
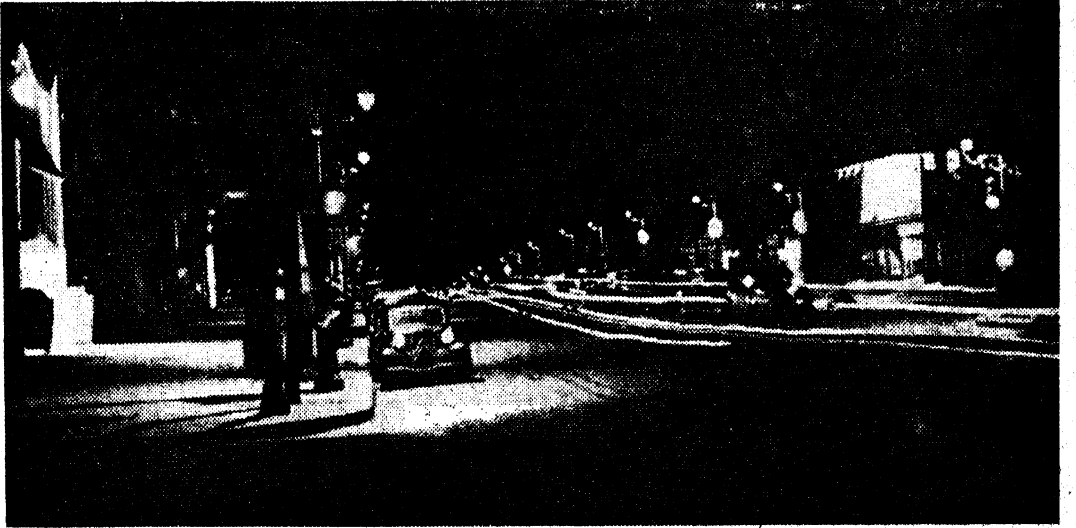
প্যারিস বিমান আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতা। নিষ্প্রদীপকালে রাস্তার মোড়গুলি পথচারীদের জন্য আলোকিত রাখিবার ব্যবস্থা।

☛ জার্ম্মান বিমান বীরদিগকে প্যারাসুটিরা কেমনভাবে সাহায্য করিয়াছিল বিলাতী পত্রের সামরিক সংবাদদাতাগণ তাহার নানারকম কাহিনী প্রদান করিতেছেন। হল্যাণ্ডে জার্ম্মান সেনা হানা দিবার পূর্ব্বেই জার্ম্মান প্যারাসুটিরা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলিতে ঘাঁটি করিয়াছিল। তাহারা পাদরী, সন্ন্যাসিনী এবং নার্সদের পোষাকে সাজিয়া ওলন্দাজদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। কেল্লার ছাদের উপর প্যারাসুটিদের নামাইয়া

দেওয়া হইয়াছিল। প্যারাস্‌টিরা ছাদের পাশে বাতাস চলাচলের ছিদ্রপথে ভিতরে বোমা ফেলিয়া গোলন্দাজদিগকে কাবু করিত। এই তো গেল জার্ম্মানীর প্যারাস্‌টিদের ব্যাপার; তাহা ছাড়া ট্যাঙ্কেও তাহারা নূতনত্ব ঘটাইয়াছে। ফরাসীরা মিউজ নদীকে নিজেদের দেশের একটি প্রাকৃতিক সুদৃঢ় পরীখাস্বরূপ মনে করিত; কিন্তু জার্ম্মানেরা এমন ট্যাঙ্ক আনিয়া হাজির করিল যেগুলি জলে ভাসিয়া আসিতে পারে। জার্ম্মানীর এই সব সাঁতারু ট্যাঙ্কগুলি নদী পার হইয়া আসিবামাত্র জার্ম্মানীর উড়োজাহাজগুলি নদীর এপার আসিয়া বোমা ফেলিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জার্ম্মানদের এই নূতন রণনীতি দেখিয়া

জার্ম্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত ফরাসী ও বেলজিয়ম অঞ্চল হইতে আশ্রয়প্রার্থী নরনারীদিগের লণ্ডন স্টেশনে আগমন।

ফরাসী সেনানায়ক বুঝিলেন যে তাঁহাদের কোথায় ভুল হইয়াছে। জার্ম্মানেরা মিউজ নদী অতিক্রম করিবার পর ফরাসী প্রধান মন্ত্রী রেনো সিনেটে বলিলেন,—এইবার নূতন ধরণের সৈন্য, নূতন ধরণের তোড়জোড় চাই।

সমরসজ্জা বাড়াইতে হইবে—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলও একথা বলিয়াছেন এবং সে জন্য চেষ্টাও হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট এখন মিত্রপক্ষকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন জার্ম্মানীর জিত হইলে তাঁহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। হিটলারের সংকল্প জগতের উপর প্রাধান্য; তিনি সুবিধা পাইলে আন্তর্জ্জাতিকতার কোন নীতিই মানিবেন না। দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁহার দলীয়দের চক্রান্ত ইতিমধ্যেই নাকি আরম্ভ হইয়াছে।

আমেরিকার জার্ম্মান বিরোধী সুর যতই স্পষ্ট হইতেছিল এদিকে সে সুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ইটালীও সুর চড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইটালীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি ইটালীকে সন্তুষ্ট করিয়া একথা একরকম বলিয়াই দেন যে, ইটালী যদি যুদ্ধে নামে, তাহা হইলে আরও কয়েকটি শক্তি যুদ্ধে যোগ দিবে এবং তাহাদের মধ্যে আমেরিকাও থাকিবে। কিন্তু দেখা গেল ইটালী ধর্ম্মের কথা শুনিয়া ঠাণ্ডা হইল না, সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পা বাড়াইয়া দিল। যে ইটালী কিছুদিন আগেই ইংরেজের সঙ্গে এই সর্ত্তে চুক্তি করিয়াছিল যে, ভূমধ্যসাগরের অবস্থার সে কোন পরিবর্ত্তন চাহে না, সেই ইটালী আজ সুর ধরিল যে, ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য সে বিধাতার নিকট হইতে পাইয়াছে। ইটালী এই সঙ্গে আবার টিউনিস, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, নাইস ও ফরাসী সোমালীল্যাণ্ডের জিবুতীর অধিকারও দাবী করিল। জিবুতী আবিসিনিয়ার উপকণ্ঠভাগে। এই জায়গাটা হাতে না থাকিলে ইটালীর আর চলিতেছে না; কারণ হাবসীরা এখনও ষোল আনা পোষ মানে নাই। তাহারা অশেষ রকমে রোমের সভ্যতা প্রচারকারীদিগকে বাধা দিতেছে।

নাইস শহরটি ইটালীর দরকার নিজের সীমান্ত আল্পস পর্ব্বতের সুদৃঢ় উপত্যকাভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে; আর কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং এদিকে আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী টিউনিস ইটালীর দরকার—ভূমধ্যসাগরের চাবিকাঠিটা নিজেদের পকেটে রাখিবার উদ্দেশ্যে।

ইটালীর মতিগতি যে সুবিধাজনক নয়, লর্ড লোথিয়ান, মার্কিন দেশে বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। এখন ইটালীর পরিস্থিতি দস্তুরমত একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সুয়েজের মধ্যে মিশর এবং ইংরেজের জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজের গতিবিধি নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকাও যে কোন সময়ে যুদ্ধে নামিয়া পড়িবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ইটালী যুদ্ধে নামিয়াছে, তুরস্কও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। ভূমধ্যসাগরে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার নিমিত্ত তাহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং সে যে এবার মিত্রপক্ষে নামিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বেই তুরস্ক ইংরেজ ও ফরাসীর সঙ্গে সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছে।

যুদ্ধের গতি ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিবে। ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মান কর্তৃক পশ্চিম-উত্তর সীমান্তে প্রবলভাবে আক্রান্ত ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক আক্রমণ করিয়াছে। ইটালীর উপকূল ভাগ সুরক্ষিত নয়। ইটালী যত গর্ব্বই করুক না কেন, আবিসিনিয়া কিংবা আলবেনিয়াকে হারাইলেও সে সমর শক্তিতে ইংরেজ কিংবা ফ্রান্সের কোন অংশেই সমকক্ষ নয়। ফরাসী ইংরেজের নৌশক্তি ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করিয়া ইটালীর উপকূলভাগ আক্রমণ করিবে। মিলান এবং মিউরিণ প্রভৃতি ইটালীর বাণিজ্য প্রধান অঞ্চলগুলির উপর ফরাসী ও ইংরেজের উড়ো-জাহাজের বোমা পড়িতে থাকিবে। ইটালী যুদ্ধে নামিয়াছে, বলকানে রুষিয়া নজর পাতিয়া থাকিবে। ইটালী যুদ্ধে নামিবার ফলে জার্ম্মানী যদি আশা করিয়া থাকে যে, যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হইবে এবং সে জয়ী হইবে, আমেরিকা যুদ্ধে নামিবার ফলে তাহার সে মতলব ব্যর্থ হইবে এবং বিগত মহাসমরের ন্যায় বর্ত্তমান যুদ্ধও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।

যুদ্ধে জয় পরাজয় কতদিনে নিশ্চিত হইবে বলিবার উপায় নাই। তবে এইকথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, এই যুদ্ধে জগতের একটা পটপরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইবে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে। সেই নূতন জগতে আমরা ভারতবাসীরা কি অবস্থায় থাকিব, এবং থাকা আমাদের উচিত, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। নিজেদের ভিতরকার ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া গিয়া গুরুত্বের সহিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে, বিলম্বের অবসর নাই।

## চণ্ডীমণ্ডপ

(৭৪৭ পৃষ্ঠার পর)

নকর্ত্তা বললেন, "তোমারই বা তাকে এত জব্দ করবার উৎসাহ কেন শুনি? আমাকে বেশী ঘাঁটিও না গোমস্তা, গোবর মাঠময় ক'রে দেব।"

বামুনকাকা, গুরুচরণ, নুটবিহারী এ'রা সব হাঁ হাঁ ক'রে প'ড়ে দুজনকে থামিয়ে দিলেন। নকর্ত্তা "হ্যাঁ, সব্বাইকার হাঁড়ির খবর আমার নখদর্পণে বাবা" প্রভৃতি বলতে বলতে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। অখিল গোমস্তা "দেখলে নকর্ত্তার আস্পদ্দাটা একবার দেখলে! তেরাত্তিরের মধ্যে যদি না ও-বেটীকে আমি জব্দ করতে পারি তো আমার নাম, কি বলে গিয়ে, বাপের বেটাই নই আমি—" বলতে বলতে রাগে ফুলতে লেগে গেলেন।

তার পর রাত্রি হয়ে এল। গ্রামের আরও কয়েকটি মাতব্বর এসে কাঁঠালতলায় জমায়েত হলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সব গম্ভীর হয়ে সমাজরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে লাগলেন। চণ্ডীমণ্ডপের একটি দিনের বৈঠক যখন শেষ হ'ল তখন রাত্রি গভীর।

* * * *

দু-চারদিন পরের কথা। গ্রামের প্রান্তে যে পাড়ায় টে'পী তার বুড়ী পিসীকে নিয়ে বাস করত একদিন গভীর রাত্রে সেই পাড়ার আকাশ লাল হয়ে উঠল। গোলমাল শুনে নকর্ত্তা ছুটতে ছুটতে এসে দেখলেন, টে'পী "পিসীমা পুড়ে ম'রে গেল গো" ব'লে একটা পিটুলি গাছের তলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে, তাদের ছোট কুঁড়েঘরটি ধু ধু ক'রে পুড়ছে, আর সেই আলোয় গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

## বিশ্রামের দুরাশা

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

শুধু পথ—
চক্ষের সম্মুখে রবে প্রসারিত চিত্রপটবৎ!
ভ্রমণের শেষ নাই; সরণীর অন্ত নাহি মেলে
কণ্টক ফুটিয়া পায় দেয় শুধু রক্তধারা ঢেলে।

বিশ্রামের তরে
এতদিন পরেও তো অবসর নাহি দান করে।
পথের কোলেতে তাই জীবনের শেষ পরিণাম;
তখন কি শ্রান্ত আত্মা লভিবে বিরাম!

# আজ-কাল

### আপোষের সম্ভাবনা ?

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের আবার একটা আপোষ-চেষ্টার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গান্ধীজীর বিবেকের পুঁজিদার রাজাজী তো বলেই দিয়েছেন যে, এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে। এ কথা কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের বিপরীত হলেও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের বর্ত্তমান অভিপ্রায়ের একটা ইঙ্গিতস্বরূপ।

মাঝে একটা খবর রটেছিল যে, অচল অবস্থার সমাধানের জন্যে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীরা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীরা একটা বৈঠকে সমবেত হবেন। কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সংবাদের প্রতিবাদ করলেও স্বীকার করেছেন যে, মৌলবী ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর আলাপের সময় এ রকম একটা কথা উঠেছিল; আজাদ সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী হন নি; তবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্যে আলোচনা করা সম্পর্কে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছে।

বড়লাট আবার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের ডাকতে পারেন এমন আভাষও পাওয়া যাচ্ছে। ভারতসচিব মিঃ এমেরী নাকি মিটমাটের একটা প্ল্যানও ঠিক করেছেন। এই প্ল্যান অনুসারে যুদ্ধ থামার এক বছরের মধ্যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে; তবে ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, আর ভারতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ২৫ বছর পর্য্যন্ত থাকবে; বড়লাট নাকি প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা "গণ-পরিষদ" ডাকবেন (কংগ্রেস নেতারা এবং বৃটিশ শাসকেরা বরাবর একটা ভুয়া অর্থে "গণ-পরিষদ" শব্দটি ব্যবহার করছেন; তাঁদের কথা থেকে দেখা যায়, "গণ-পরিষদ" বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষপুটাশ্রয়ী একটা বৈধ সর্ব্বদল সম্মেলন ছাড়া আর কিছু নয়, তার কোনো বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য নেই)। বিলাতী কাগজগুলিও এইভাবে ভারতের সঙ্গে একটা মিটমাটের জন্যে পীড়াপীড়ি করছে। অনেকে মিঃ এমেরীকে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে যেতে বলছে।

### ভারতবর্ষের রক্ষণাবেক্ষণ

যুদ্ধের সঙ্কটময় অবস্থার জন্যে বড়লাট ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে জেলায় জেলায় সমর কমিটি গঠন করা হবে। এ ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিসকে সাহায্য করার জন্যে, বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতার জন্যে এবং আভ্যন্তরীণ 'দেশরক্ষা'র জন্যে "সিভিক গার্ড" গঠন করা হবে।

ভারতরক্ষার জন্যে এখানকার ইংরেজরা খুব উদ্যোগী হয়েছে। 'ষ্টেট্‌সম্যান'-এর সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর এবং আরও ইংরেজ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পুনঃ সংগঠনের প্রস্তাব করেছেন। কলকাতায় ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাতে প্রবাসী ইংরেজরা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এক বক্তা ভারতীয় কম্যিউনিষ্ট ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

### অনশন ত্যাগ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে নৈনী জেলে শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেছেন। এখন থেকে জেলে শ্বেতকায় ও ভারতীয় বন্দীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান হয়েছে।

### উধম সিং

লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে স্যার মাইকেল ও'ডায়ারকে হত্যা করার জন্যে ধৃত উধম সিং বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

### "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া"র মন্তব্য

বাঙলা দেশে মুসলিম লীগ নেতাদের ইংরেজী মুখপত্র "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" (সম্পাদক ফিরিঙ্গি) এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে "বৃন্দাবনের ফুর্ত্তিবাজ লম্পট" বলে উল্লেখ করেছিল। এতে বাঙলার হিন্দুদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। কলকাতায় এক বিরাট হিন্দু জনসভায় "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া"র ঐ গর্হিত উক্তির প্রতিবাদ জানান হয়েছে এবং গবর্ণমেণ্টকে ঐ কাগজের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। জনসভার প্রস্তাবে নিজেদের ধর্ম্ম ও দেবতার সম্মান রক্ষার জন্যে বাঙলার হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আবেদন করা হয়েছে।

মুসলিম পত্রিকার এই রকম মন্তব্য সম্বন্ধে সকলে বলছে যে, যারা নিজেদের ধর্ম্মের কোন নীতি বা ব্যক্তি সম্বন্ধে সামান্য সমালোচনাও সহ্য করতে পারে না তা'রা অপরের ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করে কোন্ মুখে ?

## ইওরোপ

### ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

ইতালী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ইতালীয় সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্ত আক্রমণ করেছে। ইতালী যে শীঘ্রই জার্ম্মানীর পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করবে সে কথা কিছুদিন থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গত সপ্তাহে সিরিয়া, স্মার্ণা, মাল্টা ও অন্যান্য জায়গা থেকে ইতালীয়রা স্বদেশে ফিরে আসে; আমেরিকার নিকটবর্ত্তী ইতালীর জাহাজ-গুলোকে দক্ষিণ আমেরিকান বন্দরে আশ্রয় নিতে বলা হয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে পূর্ব্ব থেকে নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ইতালী এই সময়ে যুদ্ধে নেমেছে তাতে সন্দেহ নেই; কাউণ্ট সিয়ানোও সে কথা স্বীকার করেছেন।

### আমেরিকার মনোভাব

ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের তার বিনিময় হয়। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নাকি ফ্যাসিষ্ট নায়ককে জানিয়েছেন যে, ইতালী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন অবশ্য মিত্রশক্তিকে সমরোপকরণ দিয়ে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই ২৩০০ বিমান মিত্রশক্তিকে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর ৫০০ বিমান মিত্রশক্তিকে অবিলম্বে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া বহু পুরনো রাইফেল ও কামান পাঠান হচ্ছে। মার্কিন সৈন্যবাহিনীর জন্যেও ব্যয়বরাদ্দ অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে অবিলম্বে যথাসাধ্য সাহায্য তাদের দেবার জন্যে বলছেন। আমেরিকাতে জনসাধারণের মধ্যে মিত্রশক্তির পক্ষে যাবার মনোভাব আগের চেয়ে বেড়েছে। মুসোলিনীর মুখপাত্র সিনর গায়দা অবশ্য আমেরিকাকে ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন; তবে আমেরিকা তাতে নিবৃত্ত হয়নি। সোভিয়েট পত্রিকা আবার এই বলে আমেরিকাকে সতর্ক করেছে যে, সে যুদ্ধে নামলেই জাপান

ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইন নিয়ে নেবে এবং ইতালী ও জাপান দক্ষিণ আমেরিকার বাজার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। তবু ইতালী, জাপান ও আমেরিকার মনোভাব থেকে যুদ্ধ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

**জার্ম্মান অভিযান**

জার্ম্মানরা ফ্লান্দার দখল করে' আবেভিল অর্থাৎ সম্ নদীর মোহনা পর্য্যন্ত ইংলিশ চ্যানেলের সমগ্র উপকূল পদানত করার সংগে সংগে সম্-এর ধার দিয়ে পূর্ব্বে প্রায় মাজিনো লাইন পর্য্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী নতুন অভিযান সুরু করেছে।

ফ্লান্দারে মিত্রশক্তির বেশীর ভাগ সৈন্যকে অতি কষ্টে ডানকার্ক দিয়ে সরিয়ে আনা হয়। তাদের মোট ৩,৩৫০০০ সৈন্য উদ্ধার পায়; ৩০০০০ সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ সমরোপকরণ খোয়া যায়। মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, ফ্লান্দারের যুদ্ধ মিত্রশক্তির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় হয়েছে। অতি কঠিন অবস্থায় এত সৈন্যকে যে সফলভাবে সরিয়ে আনতে পারা গেছে, তাতে তিনি সামরিক পরিচালনার প্রশংসা করে বলেন, "কিন্তু সৈন্য অপসারণ করে যুদ্ধ জয় করা যায় না।" মিঃ চার্চ্চিল জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত এমন কি ইংলণ্ড অধিকৃত হলেও যুদ্ধ চালাবার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন।

**প্যারিসের আশঙ্কা**

জার্ম্মানরা ফ্রান্সের মধ্যে যে নতুন আক্রমণ করেছে, ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যেরা তা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করছে। এত বড় লড়াই পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও হয়নি। জার্ম্মান সেনাপতিমণ্ডলী ১৮ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক এই লড়াইতে নিয়োজিত করেছেন। জেনারেল ওয়েগাঁর পরিচালনায় মিত্রশক্তির প্রতিরোধ উন্নত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই; তবে ফরাসীরা জার্ম্মানদের একেবারে থামাতে পারেনি, তাদের গতি মন্থর করেছে মাত্র। জার্ম্মানরা প্যারিসের দিকে যাচ্ছে; নদীগুলো তা'রা পার হয়ে গেছে; সেন নদীর মুখে রুয়াঁ শহরের উপকণ্ঠে তা'রা পৌঁছে গেছে। এটা প্যারিসের পক্ষে বিপদের কথা; কারণ প্যারিস সেন নদীর উপরই অবস্থিত এবং পূর্ব্বে পশ্চিম দুই দিক থেকে প্যারিস এখন আক্রান্ত হবে।

**সোভিয়েট**

বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে সোভিয়েট স্বীকার করে নিতে রাজী না হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে মস্কোতে সাধারণ দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও মস্কোতে তাঁদের দূত পরিবর্ত্তন করেছেন।

লিথুয়ানিয়াতে কয়েকজন সোভিয়েট সৈন্য অপহৃত হয়েছে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই অভিযোগের ফলে সেখানে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন নাকি স্বীকার করেছে যে, সে এক বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করছিল। লিথুয়ানিয়ান প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে মঃ মলোটোভের সংগে আলাপ করবার জন্যে মস্কোতে গেছেন। লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েট ঘাঁটিগুলোর আশপাশ থেকে বাজে লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ বিদেশী রাষ্ট্রটি কে?

১০-৬-৪০ —ওয়াকিবহাল

## পুস্তক পরিচয়

**যুগান্তরের কথা**:—শ্রীনিরুপমা দেবী। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

শ্রীনিরুপমা দেবী সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিতা ও প্রাচীনা। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার লেখা একাধিক বই পাঠক সমাজে প্রশংসা ও সমাদর লাভ করিয়াছে। 'যুগান্তরের কথা' বইখানি একটি পল্লীচিত্র। পল্লীচিত্র অংকনে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার সব কিছুই লেখিকার সুনিপুণ লেখনীতে ভালভাবেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণপ্রিয়া'র চরিত্র অতি মনোরম; তাঁহার স্বামীর ততোধিক। উভয়েরই চরিত্র আদর্শস্থানীয়। বিবাহের পূর্ব্ব চিত্রটিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বইটির বিষয়বস্তু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই অথবা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ ঘটায় নাই। এমনি একখানি বই পাইয়া সকলেই যে অবসর সময় স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারিবেন তাহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

**পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক**:—শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

আজকাল উপন্যাসের অপেক্ষা ছোট গল্পের দিকেই শিক্ষিত পাঠক সমাজের ঝোঁক কিছু বেশী পড়িয়াছে। জগদীশবাবুর লেখা ছোট গল্প প্রায়ই সাময়িক পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। লেখকের লেখা বেশ ঝরঝরে; বিষয়বস্তুও চমৎকার। অনাবশ্যক কারণে তাহা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে না। আলোচ্য বইটি ছোট গল্পের সমষ্টি। 'কল্লোল', 'গুরুদয়ালের অপরাধ', 'মনোতৃপ্ত গুঞ্জরিক্স', 'আমি ও দেবরাজের স্ত্রী', 'পারাপার' ও 'ঊর্ম্মিলার মন' গল্পটি খুব চমৎকার হইয়াছে। ছোট গল্প পড়িতে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা বইখানি পড়িয়া লেখকের লেখনী-চাতুর্য্যের সভাকারের পরিচয় পাইবেন।

**ভু-সেনদেবের কথা**:—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রকালী রায় কবিরত্ন, ধন্বন্তরী প্রণীত। ১৯১।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থখানি রাজভট্ট লিখিত পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। কাশীরাজ বংশীয় ভু-সেনদেব কিরূপে পশ্চিম বঙ্গদেশ জয় করিয়া গঙ্গারাঢ় প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—কিরূপে তাঁহার সৈন্যগণ পৃথিবীর যাবতীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল ইত্যাদি কাহিনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকের ভাষায় বিদ্যাসাগরী রীতি প্রস্ফুট।

**কলিকাতা ফুটবল লীগ**

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। কোন দল যে শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হইবে এখনও সঠিক করিয়া বলা যায় না। মোহনবাগান ক্লাব ধীরে ধীরে দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার সাহায্যে লীগ তালিকার শীর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ঠিক ইহার পরেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কালীঘাট দল খেলার সূচনা হইতে লীগ তালিকার শীর্ষে অবস্থান করিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার স্থান তৃতীয় হইয়াছে। ইহার পরেই রেঞ্জার্স ক্লাব। রেঞ্জার্স ক্লাবের পরে লীগ তালিকায় যে সকল দল অবস্থান করিতেছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ব্যতীত অন্য কাহারও যে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা নাই ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। মহমেডান স্পোর্টিং এই পর্য্যন্ত ৭টি ম্যাচ খেলিয়া ১০টি পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। এই দল লীগের খেলায় যোগদান করিয়াই প্রত্যেক ম্যাচে পয়েন্ট সংগ্রহ করিতেছিল, একমাত্র মোহনবাগান দলের নিকট এই দলকে প্রথম পরাজয় বরণ করিয়া দুইটি পয়েন্ট হারাইতে হইয়াছে। মোহনবাগান দলের নিকট পরাজিত হইলে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পরবর্ত্তী কয়েকটি খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পরাজিত হইয়া সকল উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী খেলাতেই তাঁহারা দিয়াছেন। সুতরাং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট প্রভৃতি দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

লীগ তালিকার সর্ব্বনিম্নে ভবানীপুর দল অবস্থান করিতেছে। এই দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবার হাত হইতে যে রেহাই পাইবে তাহার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। লীগের সূচনায় যেরূপ খেলিতেছিল তাহা অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে সত্য, কিন্তু শেষ সামলাইতে পারিবে বলিয়া এখন পর্য্যন্ত ভরসা হয় না।

**মোহনবাগান দলের সাফল্যের কারণ**

মোহনবাগান দল লীগ খেলার সূচনায় যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে; বিশেষ করিয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে এই দল খুবই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মত দুর্দ্ধর্ষ দল এই দিন খেলার সকল সময় আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। এই একদিনের খেলা দেখিয়া অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে, মোহনবাগান এই বারে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবেই। আমরা কিন্তু ঠিক এই ধারণা পোষণ করি না। তবে মোহনবগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি এবং তাহাও বর্ত্তমানে যেরূপ ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ নৈপুণ্য রক্ষার উপর যে চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ভর করিতেছে ইহাও আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। মোহনবাগান ক্লাব লীগের সূচনায় কেন ভাল খেলিতে পারে নাই ও বর্ত্তমানে কেন ভাল খেলিতেছে ইহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, এই সাফল্যের পশ্চাতে চিন্তা করিবার কিছু আছে। তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে খেলিবার সুবিধা দিলে তাহারা যে দলের ক্রমোন্নতির সোপান গঠনে সাহায্য করিতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং তাহা অনুসরণ করিবার জন্য অনেক সময়েই ফুটবল মরসুমের সময় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। মোহনবাগান ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই পথ অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমানে দলের উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিতে আমরা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিতেছি না। লীগের সূচনায় তাঁহারা ক্লাবের অভিজ্ঞ ও পুরাতন খেলোয়াড়গণের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট পুরাতন খেলোয়াড়গণের ক্রীড়া-নৈপুণ্য চিরস্থায়ী নহে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া-নৈপুণ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। তিন চারি বৎসর খেলিবার পরই এই দোষটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ আশানুরূপ খেলিতে পারেন না। ফলে দলের শক্তি হ্রাস পায়। দলকে ক্রমোবনতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। মোহনবাগান দলেরও তাহাই হইয়াছিল। ছয় সাত বৎসর ধরিয়া যে সকল খেলোয়াড় দলের সাফল্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরই কর্ত্তৃপক্ষগণ দলের সম্মান রক্ষার ভার অর্পণ করেন। ফলে পর পর কয়েকটি খেলায় তাঁহাদের পরাজয় বরণ করিতে হয়। তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ দলের সম্মান রক্ষার জন্য হতাশ হইয়া পড়েন ও দলের তরুণ খেলোয়াড়গণের উপর নির্ভর করিলে কোন ভাল ফল হয় কি না দেখিবার জন্য সাহসী হইয়া তরুণ খেলোয়াড়গণকে একে একে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণের স্থানে খেলিতে দেন। ফল খুব উৎসাহজনক না হইলেও আশাপ্রদ হয়। দল কয়েকটি খেলায় জয়লাভ করে। তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ অধিক সংখ্যক তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিবার জন্য সাহসী হন। এইরূপে মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের যে দল গঠিত হয় তাহাতে অধিক সংখ্যক তরুণ খেলোয়াড় স্থান-পান। এইরূপভাবে দল গঠন করায় কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অন্যায় করেন নাই তাহার প্রমাণ খেলোয়াড়গণ এইদিন দিয়াছেন। মোহনবাগান ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার পর অভিজ্ঞ ও পুরাতন বিশিষ্ট খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন প্রথা যে ত্যাগ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট দলসমূহও মোহনবাগানের এই সাফল্যের পরই যদি দলের তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করেন, তবে খুবই দুঃখের কারণ হইবে। এই প্রথা অনুসরণ করায় দলের শক্তি বৃদ্ধি তো হইবেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের তরুণ খেলোয়াড়গণকেও উন্নতির নৈপুণ্য অর্জ্জনের জন্য উৎসাহিত করা হইবে।

**বাঙালী খেলোয়াড়গণ**

মোহনবাগান দলে এই বৎসর যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলিতেছেন তাঁহারা সকলেই বাঙালী। সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা দল গঠন করিলে যে সাফল্যলাভ করা যায় ইহা প্রমাণিত হইল। এই প্রমাণের পর মোহনবাগান ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণের সাহায্য গ্রহণ না করেন তবে পুনরায় বাঙলার মাঠে শীঘ্রই বাঙালী খেলোয়াড়গণকে ফুটবল খেলায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা যাইবে। একটি দল সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড়গণকে লইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলে বাঙলার অন্যান্য বিশিষ্ট ক্লাবসমূহ লজ্জায় পড়িয়া অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণকে দল হইতে বাদ দিয়া বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা দল পুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন দল বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা দলের

শক্তি বৃদ্ধি করিবার দিকে দৃষ্টি দিলে উৎসাহী বাঙালী খেলোয়াড়গণের মধ্যেও উন্নততর নৈপুণ্য লাভের প্রবল স্পৃহা জাগিবে। ফলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী খেলোয়াড়গণ ভারতীয় ফুটবল খেলার মাঠে গৌরব অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার রক্ষার উপর বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণ তথা বাঙলার গৌরব অনেকখানি নির্ভর্র করিতেছে ইহা বলাই বাহুল্য।

**দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলা**

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া এখনও পর্য্যন্ত চারিটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতেছে। কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে অরোরা ক্লাবের সম্ভাবনা যে অধিক এই বিষয় সন্দেহ নাই। এই দলটি এখনও পর্য্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে।

তৃতীয় ডিভিসনে শালকিয়া ফ্রেন্ডস, বেনিয়াটোলা ও মাড়োয়ারী এই তিনটি দল চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। শালকিয়া ও বেনিয়াটোলা দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। এই দুই দলের মধ্যে একটি দল যে চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে।

চতুর্থ ডিভিসন লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য জোর প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া মনে হয় না। জোড়াবাগান ক্লাব একরূপ সহজেই চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা। এই দলের সহিত একমাত্র রবার্ট হাডসন দলের প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা আছে। নিম্নে বিভিন্ন ডিভিসনের লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**প্রথম ডিভিসন**

| | খেঃ | জঃ | ড্র | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | ১২ | ৯ | ০ | ৩ | ১৪ | ৬ | ১৮ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১১ | ৬ | ৪ | ১ | ১০ | ৪ | ১৬ |
| কালীঘাট | ১১ | ৫ | ৫ | ১ | ১৪ | ৬ | ১৫ |
| রেঞ্জার্স | ১৩ | ৬ | ৩ | ৪ | ১৮ | ১৩ | ১৫ |
| বর্ডার রেজিঃ | ১১ | ৫ | ২ | ৪ | ১১ | ১১ | ১২ |
| ই বি আর | ১২ | ৩ | ৫ | ৪ | ১২ | ১৩ | ১১ |
| কাষ্টমস | ১৩ | ৩ | ৫ | ৫ | ৭ | ১২ | ১১ |
| মহমেডান স্পোর্টিং | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১২ | ৩ | ১০ |
| ক্যালকাটা | ১৩ | ৩ | ৩ | ৭ | ১৪ | ২০ | ৯ |
| এরিয়ান্স | ১২ | ৪ | ৩ | ৫ | ১৫ | ১৪ | ১১ |
| পুলিশ | ১৩ | ৩ | ৩ | ৭ | ১৫ | ২০ | ৯ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ১২ | ৩ | ৩ | ৬ | ৮ | ১৫ | ৬ |
| ভবানীপুর | ১২ | ৩ | ০ | ৯ | ৬ | ২১ | ৬ |

**দ্বিতীয় ডিভিসন**

| | খেঃ | জঃ | ড্র | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অরোরা | ১০ | ৬ | ৪ | ০ | ১১ | ২ | ১৬ |
| ডালহৌসী | ১১ | ৬ | ৩ | ২ | ২২ | ১০ | ১৫ |
| জর্জ্জ টেলিগ্রাফ | ১১ | ৫ | ৫ | ১ | ১৪ | ১ | ১৫ |
| কুমারটুলী | ১১ | ৪ | ৬ | ১ | ১৭ | ৯ | ১৪ |

**তৃতীয় ডিভিসন**

| | খেঃ | জঃ | ড্র | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সালকিয়া | ৮ | ৬ | ২ | ০ | ১৬ | ১ | ১৪ |
| বেণিয়াটোলা | ৯ | ৬ | ২ | ১ | ১৩ | ৭ | ১৪ |
| মারোয়াড়ী | ৯ | ৫ | ৩ | ১ | ১৭ | ২ | ১৩ |

**চতুর্থ ডিভিসন**

| | খেঃ | জঃ | ড্র | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জোড়াবাগান | ৯ | ৭ | ১ | ১ | ১৬ | ২ | ১৫ |
| রবার্ট হাডসন | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ২৫ | ৩ | ১০ |

**ফুটবল খেলোয়াড়গণের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা**

গত সপ্তাহে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন স্থানীয় এসোসিয়েশনের বিনা অনুমতিতে অন্য দলে যোগদানের অপরাধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়গণের খেলা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থায় কলিকাতার তিনজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কেও পড়িতে হইয়াছিল, ইহাও প্রকাশিত হইয়াছিল। পরের সংবাদে প্রকাশ যে, এই তিনজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় স্থানীয় এসোসিয়েশনের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া আবেদন করায় যে যে দলে খেলিতেছিলেন সে সেই দলে খেলিবার অনুমতি পাইয়াছেন। সম্প্রতি আর একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এই আইনের কবলে পড়িয়াছেন। ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণ। ইনি নাকি এই বৎসর মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের সহিত নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া ঐ এসোসিয়েশনের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতার খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের অভিযোগক্রমেই নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ই'হার খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তবে এই ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত রাখা হইবে কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ এই বৎসর মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের সহিত নাম রেজিষ্ট্রী করিলেও ঐ স্থানের কোন খেলাতেই যোগদান করেন নাই এবং স্থানীয় দলের অনুমতি লইয়াই তিনি কলিকাতায় খেলিতে আসিয়াছেন। শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে গত ছয় বৎসর ধরিয়া খেলিতেছেন এবং এই বৎসর তিনি যোগদান করিবার পর হইতেই ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ সময় হঠাৎ তাঁহার খেলা বন্ধ করিয়া দিলে ইষ্টবেঙ্গল দলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। দীর্ঘকাল একটি দলের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া মনে হয়।

**বেঙ্গল ওয়াটারপোলো লীগ**

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার-পোলো লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি ও হাটখোলা ক্লাবের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি গত দুই বৎসর এই খেলায় চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন, এই বৎসর সহজে যে তাঁহারা সেই সম্মান ছাড়িয়া দিবেন ইহা মনে হয় না। নিম্নে উক্ত লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**ওয়াটারপোলো লীগ**

**প্রথম ডিভিসন**

| | খেঃ | জঃ | ড্র | প | পক্ষে | বিঃ | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সেণ্ট্রাল | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ২৩ | ১১ | [illegible] |
| বৌবাজার | ৬ | ৫ | ০ | ১ | ২৭ | ১০ | [illegible] |
| হাটখোলা | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ৩৫ | ১৫ | [illegible] |
| কলেজ স্কোয়ার | ৬ | ৩ | ০ | ৩ | ২৭ | ১৫ | [illegible] |
| ভবানীপুর | ৬ | ১ | ০ | ৫ | ১১ | ৩৩ | [illegible] |
| সাউথ ক্যাল: | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ৩ | ২৩ | [illegible] |
| শৈলেন্দ্র মেমোঃ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ৮ | ৩৩ | [illegible] |

# সমগ্র-বার্ত্তা

**৫ই জুন—**

জার্মান হাইকমাণ্ডের দাবি—তাহারা ডানকার্ক দখল করিয়াছে এবং সোম নদীর মোহনা পর্যন্ত বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সম্মুখবর্তী চ্যানেলের সমগ্র উপকূলভাগ তাহাদের করতলগত।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা প্রত্যুষে ১২½ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপিয়া নূতন সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। ওআজ নামক স্থানের আয়লেৎ খালের সেতুর এক প্রান্ত তাহাদের অধিকারে।

গতকল্য প্যারিসে যে বোমাবর্ষণ হইয়াছে তাহার সরকারী হিসাব।—মোট হতাহত ৯০৬, তন্মধ্যে ২৫৪জন নিহত। নিহতদের মধ্যে অসামরিক ব্যক্তি ১৯৫, সামরিক ১০৭। আহতদের মধ্যে অসামরিক ব্যক্তি ৫৪৫, সামরিক ১০৭। প্যারিসের বোমা বর্ষণের প্রতিশোধ স্বরূপ মিত্রশক্তির বিমানবহর মিউনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট ও রুরের সামরিক অঞ্চলসমূহে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আপত্তি না থাকায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ মস্কোতে ব্রিটিশ রাজদূতরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

**৬ই জুন—**

গতকল্য মিত্রশক্তির গোলন্দাজবাহিনী কয়েকটি সেতুর উপর গোলা বর্ষণ করিয়া জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। সোম নদীর দক্ষিণ হইতে আরও পূর্বদিকে ফরাসীরা প্রচণ্ড বিক্রমে জার্মান আক্রমণে বাধা দিতেছে।

সোম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানবহর সারাদিন ধরিয়া টহল দেয় ও সারারাত্রি শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। তাহারা জার্মানীর পশ্চিম রুরের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটির উপরও হামলা করিয়াছে। এ ছাড়া এসেন ডুসেলডর্ফ, ডেমেল ও কলোনএও ব্রিটিশ বিমানবহর সকল আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ইতালিতে সামরিক কর্মতৎপরতা দ্রুত বাড়িতেছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে সৈন্য বোঝাই বহু লরি ও ট্রেণ চলাচল করিতেছে। রোমে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আলবেনিয়া ও ইতালীয় উপনিবেশ-গুলির ১২ মাইল পর্যন্ত দরিয়ায় মাইন পাতা হইয়াছে।

গতকল্য ফরাসী মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন হইয়াছে। পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা বিভাগে প্রধান মন্ত্রী, রাজস্বসচিব—মঃ বুর্তিলিয়ে, নাগরিক রক্ষা বিভাগ—জর্জ পের্ণো, প্রচারসচিব—মঃ জাঁ প্রুদ্হম, পূর্ত—মঃ ফ্রেন্সার, দেলাবা শিক্ষা বিভাগ—মঃ ইভ। মসিয়ে দালাদিয়েরকে নূতন মন্ত্রিসভা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

**৭ই জুন—**

আইনের উত্তরে প্রচণ্ড জার্মান আক্রমণ চলিতেছে। শত্রু-পক্ষের প্রবল চাপে মিত্রশক্তির কয়েক দল সৈন্য সোম অঞ্চলের এক পাশে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। শত্রুসৈন্য মিত্রশক্তির ব্যূহ ভেদ করিয়া ব্রেসলি নদী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের ঘোষিত সংবাদ, মিত্রশক্তির বিমান-বাহিনী জার্মানির নব অভিযানে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে। শত্রুপক্ষের মেকানাইজড সৈন্যদল, দুইটি কনভয়, সামরিক ট্রেণ হামবুর্গের সৈন্যপ্রাঙ্গণ, তেলের গুদাম, মামুর, নুরেনবর্গ কামরের শত্রু অধিকৃত বিমানঘাঁটি প্রভৃতি স্থানে মিত্রশক্তি সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়। জার্মান নিউজ এজেন্সি কর্তৃক হামবুর্গের উপর উক্ত বিমান হামলা স্বীকৃত হইয়াছে।

ইতালির সামরিক চাঞ্চল্য প্রবল। ইতালিয়গণ মাল্টা ও তুরস্ক ত্যাগ করিতেছে। পোর্ট সইদ ও সুয়েজপথ বন্ধ।

ওআশিংটনের সংবাদ—মিত্রশক্তিকে এখনই ৫০টি নৌবিভাগীয় বিমান দেওয়া যাইতে পারে, এই সংবাদে স্থানীয় সাধারণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ধাপে ধাপে যুদ্ধে নামিতেছে।

**৮ই জুন—**

ফ্রান্স রক্ষা সংগ্রামের আজ পঞ্চম দিবস। উত্তরপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। কথিত হয় ব্রেসল-র এলাকায় জার্মান সাঁজোয়া বাহিনীর একটি দল ফরাসী ব্যূহের পশ্চাদবর্তী এলাকায় ১২।১৪ মাইলব্যাপী স্থান ভেদ করিয়াছে। প্যারিসের সংবাদ, শত্রুপক্ষের কয়েকটি অগ্রগামী দল দাউদ ল ইউ এলাকায় পৌঁছিয়াছে।

ফরাসী নৌবহরের যুদ্ধ বিমানসমূহ গতরাত্রে বার্লিনের প্রান্তবর্তী কারাগারগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়াছে।

আজ পুনরায় জার্মানরা ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ার, কেণ্ট, এসেক্স ও দক্ষিণ উপকূলের বহুস্থানে হাওয়াই হামলা চালাইয়াছে। কোনওরূপ প্রাণহানির সংবাদ নাই।

তুরস্কের সহিত মৈত্রীবন্ধন সমঞ্জস করিবার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ককেসাস হইতে ইউক্রেনে ব্যাপকভাবে সৈন্য অপসারণ করিয়াছে।

আমেরিকার মিত্রশক্তিকে সাহায্যদান বোধ হয় শুরু হইল। ওআশিংটনের সংবাদ, প্রায় ১ হাজার বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে পূব দিকে উড়িয়া আসিতেছে।

**৯ই জুন—**

প্যারিসের সামরিক মহলের ধারণা, আজ সকালে জার্মানদের যে নূতন আক্রমণ শুরু হইয়াছে, তাহাতে জার্মানির পশ্চিম সীমান্তের প্রায় সব সৈন্যই নিযুক্ত। ১৮ হইতে ২০ লক্ষ সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী সমুদ্রতীর হইতে অর্গোন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়াছে।

বার্লিনের সমরপরিষদের এক ইস্তাহারে দাবি করা হইয়াছে যে, জার্মানরা সীন নদীর ভাটি অঞ্চলে শত্রুপক্ষের ব্যূহের পশ্চাদভাগ ভেদ করিয়াছে। তাহাদের বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষের নানা সমাবেশে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। আরও দাবি করা হয় যে, তাহারা ব্রিটেনের বিমানধ্বংসী কামানবাহী ২২,৫০০ টনের 'গ্লোরিয়স' নামক জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।

বৃহত্তর লণ্ডন হইতে ছয় দিনের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র অপসারণের ব্যবস্থা হইতেছে।

সোভিয়েটের সরকারী মুখপত্র 'প্রভদা' সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, আমেরিকা যুদ্ধে নামিলে দক্ষিণ আমেরিকার বাজার জাপান ও ইতালির হাতে চলিয়া যাইবে।

**১০ই জুন—**

ইতালি ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আগামী ১১ জুন হইতে ইতালী নিজকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত যুধ্যমান বলিয়া মনে করিবে; যদিও, নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, আজই বেলা সাড়ে দশটার সময় (ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম), ইতালিয়বাহিনী ইতিপূর্বে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ফরাসী এলাকা আক্রমণ করে।

ওদিকে প্যারিসের সংবাদ, রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীদের দপ্তরের স্থায়ী কর্মচারীদের অন্য প্রদেশে সরান হইতেছে। রবিবার রাত্রে প্যারির উপকণ্ঠের নানা স্থানে, বিশেষত রেলপথগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হইয়াছে। জার্মানরা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত হইয়া চাপ দিতেছে। তাহাদের এক দল রুআঁর উপকণ্ঠে সেন নদীর তীর পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে।

রোম হইতে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সিনর মুসোলিনীকে বলিয়াছেন যে, মুসোলিনী যুদ্ধে নামিলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও দ্রুত যুদ্ধে নামিবে।

রণসম্ভার ও বিমানের অভাবে নরউইজান হাইকমাণ্ড যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করিয়াছেন। রাজা হ্যাকন ও নরউইজান গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

# সাপ্তাহিক-সংবাদ

**৫ই জুন—**

স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত উধম সিং লণ্ডনের ওল্ড বেইলি আদালতের বিচারে দোষী প্রতিপন্ন হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বাঙলার গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইনের বলে বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার—১লা মে, নারীদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান, চটকল মজদুর বুলেটিন ও মার্চ সংখ্যা 'বলশেভিক' নামক বাঙলা সাময়িক পত্র বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিসের বড় কর্তা বঙ্গীয় লেবার পার্টির সদস্য শ্রীযুক্ত মনোহরলালের প্রতি ছয় মাসের জন্য এই নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, শহরতলির শ্রমিকদের উত্তেজনার কারণ ঘটিতে পারে এরূপ সংবাদ যেন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত না হয়।

ডায়মণ্ডহারবারের কিষাণ কর্মীর উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ পরগণা পরিত্যাগ করিবার আদেশ জারি হইয়াছে।

বড়লাট এক বিবৃতিতে সমর কমিটি ও সিভিক গার্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইঁহাদের কাজ হইবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় জনসাধারণকে সর্ববিষয়ে উপদেশ দান ইত্যাদি।

**৬ই জুন—**

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের একবিংশ বার্ষিক স্মৃতিপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মিঃ আমেরি ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহ্বান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধ হইবার এক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দান সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

শ্রীহট্ট জেলার নানা স্থানে ব্যাপকভাবে ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ ঘটিতেছে। কলিকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণ সভার কার্যালয়ে পুলিস হানা দিয়াছে। লাহোরে একজন, বোম্বাইয়ে আটজন, দেরাদুনে চারজন, লায়ালপুরে একজন, গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এ ছাড়া বিহারে কয়েকটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত, কোথাও কোথাও নেতাদের বহিষ্কার, ছাত্রকর্মীদের উপর নোটিস দেওয়া হইয়াছে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে খাকসার বিপত্তি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সীমান্ত সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও সীমান্ত প্রদেশের বহুস্থান হইতে বহুসংখ্যক খাকসার এখানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। পুলিস তাহাদিগকে বাধাদান করিবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে নিরত।

**৭ই জুন—**

ভারতরক্ষা আইনঃ—জামসেদপুরে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ডালটনগঞ্জের প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণবেড়ীয়ার আবদুল ওহুদ ও মকবুল আহম্মদ, ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী নেপাল নাহা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এ ছাড়া শুক্রবার প্রাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের কতিপয় কর্মচারী কলিকাতার নানা স্থানে খানাতল্লাসি করিয়াছে।

বোনাসের দাবি করিয়া শিবপুরস্থিত গ্যাঞ্জেস জুট মিলস্-এর তিন হাজারেরও অধিক শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে।

করাচির তিন শত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর এই মর্মে এক সরকারী নিষেধ জারি হইয়াছে যে, তাহারা জার্মানি বা তৎকর্তৃত্বাধীন তাহার সহিত বন্ধুতাবন্ধ দেশগুলি হইতে প্রচারিত বেতার সংবাদ ধরিতে পাইবে না। ধরিলে তাহাদের লাইসেন্স বাতিল হইবে।

**৮ই জুন—**

মেদিনীপুরের প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় জননায়ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি ২৫ জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—'বিহার প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে 'মাতৃভূমি'র সম্পাদক ও মুদ্রাকর অভিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিস কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা করিবার অভিযোগে বিপিন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রামপুরে চন্দ্রমোহন নন্দী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত লাহোর, পেশোয়ার, দেরাদুন, বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড় হইয়াছে।

হক মন্ত্রীমণ্ডলীর মুখপত্র 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কদর্য উক্তি করায় কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ এলবার্ট হলে আহূত বিরাট জনসভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

গতরাত্রে বাঙলা ও রেঙ্গুন হইতে আগত ১৫০ ও পাটনার ৩০ জন খাকসার লাহোর যাত্রা করিয়াছে।

জনৈক মুসলমান বন্ধু মহাত্মাজীকে লেখেন যে, মুসলিম লীগকেই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র কর্তৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। মহাত্মাজী আজকার 'হরিজন' পত্রে দৃঢ়তার সহিত এই দাবি পূরণে অস্বীকার করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কংগ্রেসের অনুরক্ত বলিয়া তাহাদিগকে গাল দেওয়া অনুচিত। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভিত্তিগত স্বতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষকে পরস্পর মিলিত করা, বিচ্ছিন্ন করা নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে ধর্মই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও খুনোখুনির কারণ হইয়াছে।

**৯ই জুন—**

ভারতরক্ষা আইন।—রাঁচিতে মলয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপুরে চন্দ্রমোহন নন্দী, সেওড়াফুলির কানাই দাস, চন্দননগরের কালীচরণ ঘোষ ও আনন্দ পাল, উত্তরপাড়ায় সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ, দিনাজপুরে হাজি মহম্মদ দানেস গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এ ছাড়া কলিকাতায় ট্রামওয়ে শ্রমিক সংঘের সেক্রেটারিকে কলিকাতা ত্যাগের নোটিস দেওয়া হইয়াছে।

মঙ্গলবার দিন বালি সরস্বতী পাঠাগারে অক্ষয়কুমার দত্তের চতুঃপঞ্চাশৎ মৃত্যুবার্ষিকী সম্পন্ন হইয়াছে।

লাহোরে বাবা খড়ক সিং-এর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত শিখ সম্মেলনে পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের পরমায়ু আরও এক বৎসর বাড়ানো হইয়াছে।

**১০ই জুন—**

'দেশ, ভারত, দুনিয়া' নামক পত্রিকাগুলির সম্পাদকের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইন সম্বন্ধীয় যে মামলা দায়ের আছে তাহার শুনানির দিন ২৪ জুন ধার্য হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইনঃ—কলিকাতা ট্রামওয়েজ ওআর্কস ইউনিয়নের কানাইলাল পাকরাশী ও পুনার এস এম যোশী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বেঙ্গল লেবার পার্টির ব্যারাকপুর শাখার যোগেশ সরকারের উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যারাকপুর এবং হাওড়া, হুগলী ও আসানসোল মহকুমা ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের রোহিণীকুমার ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢেউখালির অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদারিপুরের অনুকূল চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন কারণের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এ ছাড়া ভারতের নানা স্থানে ধরপাকড় খানাতল্লাসি প্রভৃতি হইয়াছে। আজ দুপুর রাত্রির পর বোম্বাই শহরের পুলিশরা ইতালীয়ানদের গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করে।
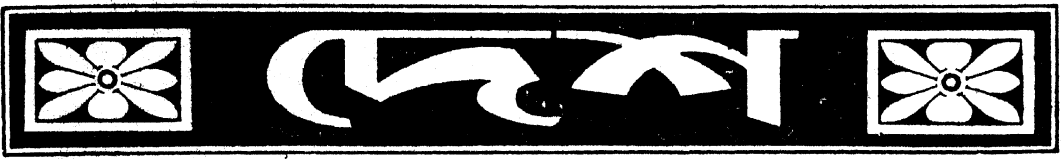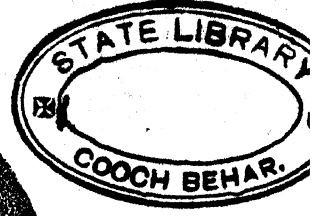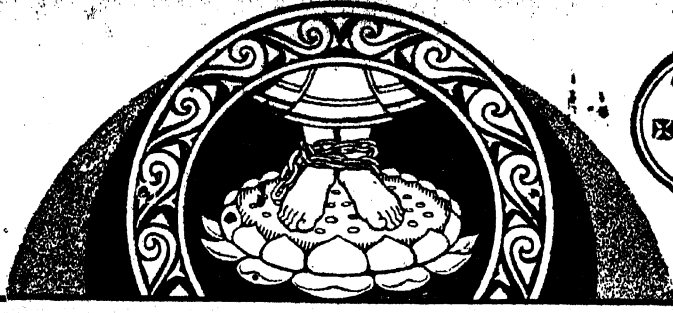
৭ম বর্ষ ] শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল Saturday, 22nd June, 1940. [ ৩২শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**মৃত্যুর চেয়ে মর্যাদা বড়—**

ফরাসী জাতির আত্মসমর্পণের কথা শুনিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে শোনা গেল, ফরাসী জাতি বিপন্ন হইলেও সে মরে নাই। সে আত্মমর্য্যাদাকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছে এবং জাতীয় মর্য্যাদার হানিকর সন্ধি-প্রস্তাবে রাজী না হইয়া সে যুদ্ধ চালাইতেই সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের মন্ত্রিমণ্ডল ঘোষণা করিয়াছেন—আমাদের সংকল্প একটুও শিথিল হয় নাই। বর্ত্তমান সংকটকালে ফরাসী জাতির স্বদেশপ্রেম অক্ষুণ্ণ আছে এবং ভবিষ্যতেও বিশ্বাস তাহাদের রহিয়াছে। যুদ্ধের পরাজয়ে জাতি মরে না, পরাজয়ের ফলেও ফরাসী জাতি মরিবে না; কারণ তাহার নৈতিক বল রহিয়াছে এবং এই নৈতিক বলেই ফরাসী জাতি অদূর ভবিষ্যতেই আত্মমর্য্যাদায় মহিয়ান হইয়া উঠিবে। পশুশক্তি সাময়িক বিজয়লাভ করিতে পারে; কিন্তু জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড যেখানে দৃঢ় থাকে, সেখানে তাহার সেই সাময়িক বিজয় অচিরেই পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান হইয়া পড়ে। স্বাধীনতার সাধনায় ফরাসী জাতির এই নৈতিক শক্তি জগতের পরাধীন জাতিসমূহের মনে নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে, সন্দেহ নাই।

---

**ভারত সচিবের দার্শনিকতা—**

যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যের মিল হয়। আমরা ভারতবাসী, আমরা দার্শনিক জাতি বলিয়া পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের প্রশস্তি লাভ করিয়া বহুদিন হইতেই পরিতৃপ্ত হইয়া আসিতেছি; এমন দার্শনিক জাতির মোড়লী করিতে হইলে যে দার্শনিক যোগ্যতা রাখিতে হয়, ভারত সচিব মিঃ আমেরী তাহা দেখাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা এক জাতি অপর জাতিকে দিতে পারে না। ভারত সচিবের এই উক্তিও অবশ্য সূক্ষ্ম দার্শনিকতার সূত্রেই জড়িত ছিল। স্থূলতত্ত্বের দিক হইতে একথা আমাদিগকে শুনাইবার সম্ভাবনা অন্তত তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু ম্যাগ্নাকার্টা বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার যে বেতার বক্তৃতা, তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পর্দ্দায় গিয়া উঠিয়াছে। সেই বক্তৃতা অতি দুরূহ, তাহাতে ম্যাগ্নাকার্টার জন্মকথা আছে, পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতিতে তাহার অদ্ভুত প্রভাবের উল্লেখ আছে, গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে, স্বাধীনতার তত্ত্বার্থ প্রকাশিকা টীকা আছে, নাই শুধু—আমরা ভারতবাসীরা, আমরা যে কথাটা তাঁহাদের নিকট হইতে জানিতে চাহিতেছি, সেই কথাটা। ভারত সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ইংরেজ জাতি নিজেদের দেশেই হউক, আর তাহার উপনিবেশ-সমূহেই হউক, যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা নূতন কিছুই নয়, নিজেরা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাই শুধু পার্লামেণ্ট হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী, তাঁহার এই ব্যঞ্জনাভঙ্গী যদি বুঝিয়া উঠিতে না পারি, সেজন্য কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ আলোক তিনি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে বর্ত্তমানে যুদ্ধের জরুরী অবস্থা ছাড়া যেসব বাধা আছে, সেগুলি তাহার আভ্যন্তরীণ, ধর্ম্মগত, সমাজ সম্পর্কিত এবং ঐতিহাসিক জটিলতা। এইগুলি ভারতবাসীদিগকে আগে দূর করিতে হইবে। ভারত সচিবের বক্তব্য এই যে, আমরা তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে এক পায়ের উপর খাড়া হইয়াই রহিয়াছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে আগে আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া লও। অবশ্য নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার ইহাই সোজা পথ। ভারতের স্বাধীনতাকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া দিবার যে কৌশলের পরিচয় বহু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সদিচ্ছাপূর্ণ সম্ভাষণ হইতে আমরা পাইয়াছি, মিঃ আমেরীর বক্তৃতা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। ভারতবাসীরা এমন তত্ত্বকথা শুনিয়া আর তুষ্ট নয়। ইংরেজ যে স্বাধীনতা, যে গণতান্ত্রিকতার বড়াই

করে, সেই স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার মর্য্যাদাকে মুরুব্বিয়ানা ছাড়িয়া ভারতবর্ষে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত কিনা ভারতবাসীরা চাহে এই নিতান্ত সোজা কথা শুনিতে। ভারতবাসীরা বুঝিবে বাস্তব সত্যকে, বচনবাগীশতার বিড়ম্বনা আর তাঁহারা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়।

---

**ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—**

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী চূড়ান্ত কথা বলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং কংগ্রেসের নীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন এই বৈঠকে প্রত্যাশা করা যায় নাই। ভারতরক্ষা আইন অনুসারে দমন-নীতির বেড়াজাল দেশের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে, এ সম্বন্ধেও মহাত্মা গান্ধী তাঁহার মনোভাব 'হরিজন' পত্রেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখেন "আমি যতদূর জানি, তাহাতে ভারতের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে, যাঁহারা স্বদেশানুরাগী ও দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহাদিগকেই গ্রেপ্তার করা হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে নাৎসীদের সাহায্যলাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। তাঁহাদের প্রধান অপরাধ হইল এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশকে এবং দেশের স্বাধীনতাকে ভালবাসে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের যদি অন্য কোন অভিযোগ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করাই ভাল।' মহাত্মাজীর মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, আমাদেরও সেই প্রশ্নই মনে জাগে এবং এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের কথা বলিয়াছি। যেভাবে ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত হইতেছে, আমরা তাহা শুধু নিরর্থক বলিয়া মনে করি না, আমাদের মতে উহা অনর্থক, উহার ফলে হিত না হইয়া বিপরীতই ঘটিতেছে। অকারণ দেশের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িতেছে এবং ভারতের স্বার্থরক্ষার পক্ষে প্রয়োজন যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা, তাহারই প্রতিকূল আবহাওয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে। মহাত্মাজীর উক্তি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রম ভাঙ্গিবে কি?

---

**সর্ব্বদল সম্মেলনের ঠাট—**

অধিকাংশের মতই গণতান্ত্রিকতার মূল সূত্র। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সত্যই যদি গণতান্ত্রিকতার প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি-সম্পন্ন হন এবং ভারতে তাঁহারা গণতান্ত্রিক শাসন-নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র পথ হইল ভারতের অধিকাংশের মতের দ্বারা সমর্থিত কংগ্রেসের দাবীকে স্বীকার করিয়া লওয়া। সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সমস্যা তাঁহাদের নয়, সে বুঝাপড়া হইবে ভারতেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ-নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের ক্রমিক সংস্কারের সূত্রে। সকল দেশে এইভাবেই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও ভিন্ন পথ নাই। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা ভারতকে ভিন্ন গোঠে না লইয়া ছাড়িবেন না। তাঁহারা দাবী করিতেছেন, সর্ব্বদল সম্মেলন আহ্বান করিয়া শাসনতন্ত্রের সর্ব্বসম্মত খসড়া তৈয়ার করিতে হইবে; বলা বাহুল্য, কাজের পথ নয়, ইহা শুধু কথার কচকচি বাড়াইবারই পথ। রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন তো দূরের কথা, কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন দেশেই সর্ব্বসম্মত কোন মত দেখা যাইবে না। যাহা সর্ব্বত্র অসম্ভব, ভারতবর্ষেও তাহা কোনদিন সম্ভব হইতে পারে না। তারপর আর এক দাবী হইল এই যে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সময় সাম্প্রদায়িক দলসমূহের পক্ষীয়গণকে মন্ত্রিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই প্রস্তাব শুধু যে স্বায়ত্তশাসনের দিক হইতে—গণতান্ত্রিকতার দিক হইতে অকেজো ইহাই নহে, ইহা ভারতের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। সাম্প্রদায়িকতার ভাবকে স্থায়ী করিয়া এই ব্যবস্থা ভারতের চিরন্তন দাসত্বের পথই প্রশস্ত করিবে। মীমাংসার পথ ইহার কোনটিই নয়। তবে মীমাংসার পথ কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কংগ্রেসের শক্তি যখন জনমতের জোরে এতটা প্রবল হইয়া উঠিবে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্য-দিকে দৃষ্টি ছাড়িয়া একান্তভাবে কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন—মীমাংসার দিন সত্যই আসিবে সেদিন, তাহার একদিনও আগে নয়। সুতরাং সমুদ্রের পরপার হইতে অনুগ্রহের উচ্ছ্বাস আসিয়া আধ্যাত্মিকতার রসে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবে, এমন আশা করা বৃথা।

---

**কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণ—**

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণের চূড়ান্ত পর্ব্ব আরম্ভ হইতে চলিল। আগামী জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিল উপস্থিত করা হইবে। বিলের মর্ম্ম পাঠকবর্গ সংবাদপত্রের মারফৎ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ পৌর-শাসনে দেশবাসীকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিঃশেষে কাড়িয়া লইয়া এই দ্বিতীয় বিলে কর্পোরেশনের কাজ বাঙলা সরকারের দপ্তরখানায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কর্পোরেশনের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি না আছে, আমরা এমন কথা বলি না, বলিলে নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ করা হইবে; কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা পৌর-শাসনে পৌরজনের অধিকারকে চাই। কারণ এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ভিতর দিয়াই গণতান্ত্রিকতার প্রসার হয়, দায়িত্ব গড়িয়া বাড়িয়া উঠে। দেশের লোক ঘুমাইয়া নাই, নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া লইবার প্রবৃত্তি কর্পোরেশনের কার্য্যনিয়ন্ত্রণে ক্রমেই জাগ্রত হইতেছিল। এই বিলে সেই পথ বন্ধ করা হইবে, জনসাধারণের ক্ষমতা লোপ পাইবে। ত্রুটি-বিচ্যুতির যে দোহাই বাঙলা সরকর দিতেছেন, সেই [illegible] ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে বাঙলা সরকারের সব বিভাগগুলি [illegible] একান্তই মুক্ত? ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিবার পক্ষে [illegible] সাধারণের শক্তি যদি জাগ্রত হয়, স্বাধীন [illegible] সার্থকতা থাকে তাহাতেই। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল [illegible]

স্বাধীনতা স্পৃহা এবং গণতান্ত্রিকতাবোধকে বিলুপ্ত করিবার এই যে উদ্যম করিয়াছেন শুধু কলিকাতার পৌরজন নহে, সমগ্র বাঙলা দেশ এই নীতির প্রতিবাদ করিবে। দেশের লোক আগাইয়া যাইতে চায়, পিছাইয়া নয়, বাঙলা সরকারের নীতি গণতান্ত্রিকতা হইতে আমলাতান্ত্রিকতার দিকেই প্রসৃত হইতেছে। দেশবাসী ইহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত নয়, সুরেন্দ্রনাথের সাধনা ব্যর্থ করিবার গ্লানিভার বাঙলা সহ্য করিবে না, মন্ত্রিমণ্ডলী এখনও ইহা বুঝুন।

---

**সেনাদলে ভারতীয় প্রাধান্য—**

ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষী বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, নব প্রস্তাবিত সেনাদল সম্প্রসারণ নীতির ফলে ভারত সরকারের বার্ষিক ২০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। সমর বিভাগের জন্য কর্ত্তাদের টাকার অভাব কোনদিনই হয় না, এখনও হইবে না, সেই ব্যয়টা যদি দেশের লোকের অসহায়ত্ব দূর করিতে সাহায্য করে, তবেই তাহা সার্থক। ইস্তাহারে দেখা যাইতেছে, সকল সেনাদলেই এখন ভারতীয় কর্ম্মচারী বা সেনানী নিযুক্ত করা হইবে এবং নূতন বাহিনী-গুলি যথাসম্ভব ভারতীয় সেনানীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। খুবই ভাল কথা; কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, দেরাদুনের সামরিক কলেজে সেনানীগিরি করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভের জন্য যে অনুপাতে ভারতবাসীদিগকে লওয়া হয়, এখনও কি তাহাই চলিবে? ভারতবাসীরা সেনানীর কাজ করিতে পারিবে ইহা শুধু কাগজে লেখা থাকিলেই দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে না। সেনানীদের কাজ শিখিবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ, অন্তত শ্বেতাঙ্গদের মত সুযোগ, ভারতবাসীদিগকে দিতে হইবে, কিন্তু সামরিক কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার বেলায় সে বিচার করা হয় না। তারপর নূতন সেনাদলসমূহে ভারতীয় সেনানী লওয়া হইবে, এই কথাটি সুস্পষ্ট নয়, কি অনুপাতে লওয়া হইবে, তাহা জানান দরকার। নূতন সৈন্য তথাকথিত সামরিক জাতি বা প্রদেশ হইতে সংগ্রহ না করিয়া সমস্ত প্রদেশ হইতেই সংগ্রহ করা হইবে, সরকারী ইস্তাহারে ইহা জানা যাইতেছে। সামরিক এবং অসামরিক এই কৃত্রিম জাতিভেদ চিরদিনের জন্য উঠিয়া গেল, না সাময়িক এই ব্যবস্থা, দেশের লোকে ইহাও জানিতে চায়। সামরিক ভাবে ভারতকে প্রকৃত শক্তিশালী করিতে হইলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সমরোপকরণ প্রস্তুতের জন্য কারখানা খোলাও দরকার। এইসব দিকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের সমর বিভাগের ব্রিটিশ কর্ত্তারা অতীতে যে ভুল করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে যদি তাঁহাদের সে ভ্রমের নিরসন হয়, সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

---

**ভারতের বেকারসংখ্যা—**

সমস্ত সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টেরই হাতে বেকারদের সংখ্যা আছে, কারণ বেকারদের জন্য তাহাদের চিন্তা ও দায়িত্ব আছে; কিন্তু ভারতের বেকারদের সংখ্যা নাই, বেকারদের জন্য চিন্তা করিবার দায়িত্ব কর্ত্তাদের নাই বলিয়াই কি? আগামী আদম সুমারিতে ভারতের বেকারদের সংখ্যা সংগ্রহ করা হইবে। খুবই ভাল কথা বলিতে হইবে; কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের বেকারদের একটু পার্থক্য আছে, অন্য দেশে যাহারা কর্ম্মহীন, তাহারাই বেকার এবং অসহায়; কিন্তু ভারতে কাজ করিয়াও দুইবেলা দুই মুষ্টি অন্ন অনেকের জুটে না। ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতের এই অবস্থা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ভারতের দারিদ্র্যের সঙ্গে ইউরোপের কোন দেশের তুলনা হয় না। ইউরোপের লোকেরা কাজ না পাইলে বেকারতালিকাভুক্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সরকারের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রেক করিয়া ছাড়ে, আর ভারতের বেকারেরা অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও নিজ্জীবের জড়বৎ শান্তিভোগ করিয়া থাকে। ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট লোক এইভাবে জীবনযাপন করিতেছে। শুধু ইহাদের সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া জগতের লোকের কৌতূহল নিবৃত্তি করা হইবে না, ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইবার কোন ব্যবস্থা করা হইবে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য।

---

**বাঙলার দাবী—**

ভাষাভাষীর অনুপাতে প্রদেশ বিভাগের নীতি যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে মানভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণার অংশবিশেষকে বাঙলার সহিত যুক্ত করিতেই হয়। বাঙালীর এই দাবী ন্যায্য দাবী, কিন্তু বাঙলা সরকার কি বিহার সরকার কেহই এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে নানা কারণে সাহসী নহেন। মানভূমের নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রচার শাখা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী এই সম্পর্কে বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি একটি আবেদনে জানাইয়াছেন,—"আগামী আদমসুমারীতে মানভূম জেলায় হিন্দী ভাষাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বঙ্গভাষাভাষীদের সংখ্যা ঠিকভাবে যাহাতে দেখান হয়, তজ্জন্য আমরা প্রত্যেক গ্রাম-বাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। নিরক্ষর মাহাতো, সরাক, বাউরী, ভূমিজ প্রভৃতি জাতীয় সরল লোক-দের নানাভাবে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। আমরা আশা করি, বঙ্গভাষাভাষী শিক্ষিত প্রবীণ ও কর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে এবং যাহাতে মানভূম, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম জেলার বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে বঙ্গভাষাবিরোধী প্রচারের সুযোগ কেহ না পায় বা অন্যায়ভাবে তাহাদের সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার প্রচেষ্টা মাথা তুলিতে না পারে, এজন্য তাহারা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকিবেন।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই আবেদন সময়োচিত হইয়াছে। ভাষার বন্ধন যদি আমরা দৃঢ় রাখিতে পারি, তাহা হইলে প্রদেশ বিভাগের কৃত্রিম ব্যবস্থাবলে বাঙলার উপর যে অবিচার হইয়াছে, তাহার একদিন প্রতিকার হইবেই। ভৌগোলিক রেখা গায়ের জোরে টানিয়া আপনাকে পর করিয়া দেওয়া চলিবে না।

**লীগের অনিষ্টকর উদ্যম—**

জাতির এমন সংকটকালেও দেখা যাইতেছে, মুশ্‌লীম লীগের চৈতন্য হয় নাই। তাঁহারা ভেদ এবং অনৈক্যের নীতি-ধরিয়াই চলিবেন। নিখিল ভারত মুশ্‌লীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে সম্প্রতি যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মোশ্লেম লীগকে আগে নিখিল ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা কংগ্রেসের সংগে কথাবার্ত্তা চালাইতে মিঃ জিন্না রাজী নহেন। লীগের কোন সদস্য যদি তেমন কুকার্য্য করেন, তাহা হইলে সে আলোচনায় লীগের সরকারী সম্পর্ক থাকিবে না, ওয়ার্কিং কমিটি এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং মিঃ জিন্না জাতীয়তা চাহেন না, মানেন না, তিনি বুঝেন সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সংহতিকে দুর্ব্বল করিবার এই যে উদ্যম, ইহার ফলে মিঃ জিন্না শুধু যে ভারতের ক্ষতি করিবেন তাহাই নয়, তিনি মুসলমান সমাজেরও ক্ষতি করিবেন এবং যে ব্রিটিশ জাতির কাছে তিনি চিরদিন আবদারে থাকিতে চাহেন, সেই ব্রিটিশ জাতিরও ক্ষতি করিবেন। ইংরেজকে যদি ভারতের সমস্যা আজ নিজের প্রয়োজনে পড়িয়া সত্যই সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে মিঃ জিন্নার মনস্তুষ্টি করিলেই সে কাজ সিদ্ধ হইবে না; কারণ কংগ্রেস তেমন প্রচেষ্টাকে সমর্থন তো করিতেই পারিবে না, যাঁহারা জাতীয়তাবাদী মুসলমান, মুসলমান-সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সত্যই চাহেন, তাঁহারাও সমর্থন করিবেন না। সুখের বিষয়, ইঁহাদের মতের বল দেশের সর্ব্বত্র ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে; দিল্লীতে আজাদ মুসলমান সম্মেলনেই দেশের লোক সে পরিচয় পাইয়াছে।

---

**বাঙালী নিজের স্বার্থ বুঝে—**

স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ ও মৌলবী ফজলুল হক কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সংগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে সম্প্রতি যে আলোচনা করেন, বাঙলা দেশের তিনজন লীগওয়ালা—মিঃ ইস্পাহানী, মিঃ সিদ্দিকি ও মিঃ নুরুদ্দীন ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। বুঝি জিন্না সাহেবের তক্তভাউস ধ্বসিয়া পড়ে এই ভয়! ইঁহাদের উত্তরে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মুখে কয়েকটি স্পষ্ট কথা শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তিনি যদি কংগ্রেসের সংগে আপোষ করা প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহা করিবেন এবং বাঙলার মুসলমানগণ নিশ্চয়ই উহার সমর্থন করিবে। বাঙালী আবার ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবে, মৌলবী ফজলুল হক তাঁহার বিবৃতিতে এমন আশাও পোষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই আশা সফল করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কাজে দৃঢ়তার পরিচয় আমরা পাইব; হীন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রচেষ্টা এবং প্ররোচনা হইতে বিমুক্ত হইয়া বাঙলার হিন্দু-মুসলমান ভারতে নূতন জীবনের স্রোত বহাইবে। জিন্না সাহেবের মর্জ্জির চেয়ে দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থই হইবে বাঙালীর কাছে যেদিন বড়, আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। বাঙালী সাম্প্রদায়িকতা বুঝে না, জিন্নাই দলের জিগির সত্ত্বেও বাঙলার বিশেষত্ব যে জাতীয়তাবাদ, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল এই সত্যকে অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করুক। এজন্য প্রয়োজন আন্তরিক আদর্শ নিষ্ঠার, শুধু মুখের কথার কোন মূল্য নাই।

---

**'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'র ত্রুটি স্বীকার—**

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গ্লানিকর মন্তব্য করিবার পর 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'র এতদিন পরেও যে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। সহযোগী ১৪ই জুনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পুরাপুরি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমতের সম্বন্ধে গ্লানিকর উক্তি করা ভদ্রোচিত কার্য্য নয়, এইটুকু বুঝিবার জন্য ভারত-রক্ষা আইনের প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহা হউক, সম্পাদক যখন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ক্ষমা না করিবে, হিন্দু সমাজ এতটা অনুদার নয়। সহযোগী মুসলমান ধর্ম্মের পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে সেই আদর্শের কথা তাঁহার স্মরণ থাকিবে।

---

**অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি—**

রেভারেণ্ড এ এম গ্রেন্সার "ষ্টেটসম্যান" পত্রে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর স্মৃতি হিসাবে ঐ স্তম্ভের মূল্য যতটা তাহার অপেক্ষা গ্লানি প্রচারই হইতেছে উহার দ্বারা বেশী এবং উহার ফলে অনিষ্টই ঘটিতেছে। মিঃ গ্রেন্সার বোধ হয়, ইহা জানেন না যে, মৃতের স্মৃতির সংগে ঐ স্তম্ভের কোন সম্পর্কই নাই এবং ঐতিহাসিক সত্যের দিক হইতে অন্ধকূপ হত্যা বলিতে কোন ব্যাপারই ঘটে নাই। তাহা জানিলে স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্য ঐ স্তম্ভের দ্বারা হইতেছে না একথা তাঁহার মনেই উঠিত না। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের চরিত্রে মিথ্যা গ্লানির আয়োজন করিয়া বিজেতার প্রতি সম্ভ্রম বৃদ্ধি জাগানই ঐ স্তম্ভের উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহার ফলে বিজেতা এবং বিজিতের মধ্যে বৈষম্যের ভাবই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভারতবাসীদের মধ্যে বিশেষত বাঙালীদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা বোধ যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহা বাড়িবে। এই দিক হইতেই ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে প্রীতির ভাব বৃদ্ধির সহায়ক উহা না হইয়া অপ্রীতির ভাবই বাড়াইবার উপচারস্বরূপে দাঁড়াইবে এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যই উহা অপসারণ করা দরকার। মিঃ গ্রেন্সার ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকুন কিংবা ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি স্বীকার করিতে না চাহেন, ইহা বড় কথা নয়। তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সমগ্র বাঙালী আজ তাহা সমর্থন করিবে এবং তাঁহার প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাই কামনা করিবে।

# হিন্দু সমাজের ব্যাধি

( ২১ )

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সমাজ সংগঠন ও সমাজ সংস্কার করিবার অন্যতম প্রধান অস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পকলা। সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া যে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, রাষ্ট্রের আইন বা সংস্কারপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য্যের চেয়ে তাহা কোন অংশেই কম নহে। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া প্রচারিত ভাব ও আদর্শ জাতির মনোরাজ্যে বিপ্লব আনয়ন করে, মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনে সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব ইতিহাস পাঠকেরা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ফরাসী বিপ্লবের, এমনকি আধুনিক রাশিয়ার রাষ্ট্র বিপ্লবের মূলে সাহিত্য যে কত বড় শক্তি যোগাইয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি। অথচ সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন ব্যাপারেও সাহিত্যকে সেইরূপ মর্য্যাদা দিতে আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিতে পারে যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচারিত যে ভাব ও আদর্শ রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে, জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে, সমাজ সংস্কার ও সংগঠনের ব্যাপারেও সেই শক্তি অশেষ কার্য্য করিতে পারে।

জাতীয় আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপর সাহিত্যের প্রভাব যে কত বেশী বাঙলাদেশেই তাহার বড় দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের উপর রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপরও তেমনিভাবে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ও সহকর্ম্মী এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষিত কয়েকজন যুবক এই আন্দোলনের ধারা বজায় রাখেন, এবং উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলাদেশে কয়েকজন শক্তিশালী রাজনৈতিক বক্তা ও লেখকের আবির্ভাব হয়। তখনও কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই। এই কংগ্রেসপূর্ব্ব যুগের নেতারা তখনকার দিনে তাঁহাদের বক্তৃতায় ও লেখায় যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তারপর ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের সৃষ্টি হইলে উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইহারা যে আদর্শে এবং যে প্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন, তাহাই বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু তাহার পরই এদেশের জাতীয় আন্দোলনে একটা যুগান্তর সৃষ্টি হয়।

জাতীয় আন্দোলনে এই নব যুগ সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যের দান কতখানি তাহাই বলিবার জন্য এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু লিখিলাম। রাজা রামমোহনের সময় হইতে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহা ইংরেজের "কনষ্টিটিউসন্যাল" আন্দোলনের ছায়ামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সব রাজনৈতিক বক্তা ও লেখকেরা ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন এবং লিখিতেন,—বিলাতী রাজনীতিকদের পার্লামেণ্টারী কায়দা-কানুন অনুসরণ করিতেন। কংগ্রেসের সৃষ্টি হইবার পর কংগ্রেসী রাজনীতিকেরাও মূলত ঐ পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তাঁহারা বিলাতী কায়দায় 'কনষ্টিটিউসন্যাল' আন্দোলন করিতেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় তাঁহারা 'আবেদন নিবেদনের থালা' লইয়া নতশিরে, রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন এবং রাজপুরুষদের দয়াদাক্ষিণ্য, বিশেষতঃ ব্রিটিশ জাতির সদাশয়তা ও হৃদয়ের মহত্বই ছিল তাঁহাদের প্রধান বল-ভরসা। এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে এই বিলাতী ছাঁচে ঢালা রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহারা নেতাদের কথা ভাল করিয়া বুঝিতও না। সুতরাং এই রাজনৈতিক আন্দোলন মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু একদিকে যখন বিলাতী কায়দায় এই আন্দোলন চলিতেছিল তখন উহারই পাশাপাশি আর এক দিক দিয়া সত্যকার জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল। বাঙলা সাহিত্যই ছিল এই জাতীয় আন্দোলনের ধাত্রী। কবি রঙ্গলালের মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট আভাষ আমরা দেখিতে পাই। কবি রঙ্গলালের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যে কয়জন মনীষী বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নানাভাবে নানা ছন্দে জাতির অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পরবশতা, পরানুকরণ প্রবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের সমকালে বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সব মনীষী জাতীয় ভাবের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদেরই উদ্যোগে ১৮৮০ সালে যে 'হিন্দুমেলার' প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা বাঙলার জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই দলের সাহিত্যিকেরাই জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান লিখিয়া, নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া, জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্দীপন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপেন্দ্রনাথ দাস লিখিত কয়েকখানি নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালী জাতির জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসকার বা নবীন বাঙলার সাহিত্যগুরু নহেন, তিনি বাঙলার জাতীয় আন্দোলনেও পথ প্রদর্শক, মন্ত্রদাতা, শিক্ষাগুরু। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশ-সেবাকে নব যুগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। একদিকে আমাদের মহান অতীতের প্রতি তিনি যেমন শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলেন, অন্যদিকে তেমনই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতিও জাতির মনে আশার সঞ্চার করেন। প্রবলের নিকট আবেদন নিবেদনের দ্বারা যে জাতীয় মুক্তি হইতে পারে না, উহার জন্য চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন—ইহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই বাণী। অপূর্ব্ব মনীষা ও প্রতিভাবলে তিনি জাতীয় জীবনে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া তাহাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ও সহকর্ম্মীরূপে যে একদল সাহিত্যিক আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলেই ঐ মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নবীন বাঙলার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার যেন একটা বন্যা আসিয়াছিল। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রজনীকান্ত গুপ্ত, চণ্ডীচরণ সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কত নাম করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের পর, তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার আর একজন মহাপুরুষ বাঙলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে "সাহিত্যিক" ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলী যে,

বাঙলা সাহিত্যে এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

যাঁহারা বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা বাঙলাদেশে হঠাৎ আসিয়াছিল, তাঁহারা উহার পশ্চাতে বাঙলা সাহিত্যের অসীম দানের কথা ভুলিয়া যান। বাঙলার সাহিত্যিকেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে আত্মশক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বদেশী যুগের নব জাতীয়তা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দিকে রবীন্দ্রনাথের দানও অসামান্য। তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাঙালীকে আত্মশক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

জাতীয় ভাবের উদ্বোধনে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের দানও যে অতুলনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" এ বিষয়ে অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুমেলার যুগে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাসের দানের কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে সমস্ত নাট্যকার বাঙলার জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার রঞ্জাবতী, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা প্রতাপ" হইতে আরম্ভ করিয়া "মেবার পতন" পর্য্যন্ত অধিকাংশ নাটকই জাতীয় ভাবের উদ্বোধনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের "সিরাজুদ্দৌল্লা", "মীর কাসিম", "ছত্রপতি শিবাজী" প্রভৃতি নাটক বাঙলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছে, একথা কে না জানে!

এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের দুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছিল এবং উহার একটি ধারায় বাঙলা সাহিত্যই প্রথমাবধি প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই দুই ধারা একত্র মিশিয়া যায়, ফলে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে নব জাতীয়তা আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং সমগ্র ভারত সেই আদর্শ গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্য কেবল যে জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নহে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপরও অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানত বাঙলা সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা—ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও প্রধানত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সংস্কার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ সমাজসংস্কার আন্দোলনে যে অগ্রণী হইয়াছিলেন; একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে সামাজিক জড়তা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁহারা অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। হিন্দু সমাজ উহাতে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি ও তেজ যে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, উহা আশানুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্ম সমাজ একটা বিষয়ে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাহির হইতে সংস্কার আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার ফলেই হিন্দু সমাজের সহানুভূতিলাভে তাহারা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই কথা বহুদিন পূর্ব্বেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার" নামক তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হইয়াছে, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আর প্রয়োজন নাই। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উহার পক্ষে বাঁচিবার একমাত্র পথ। জানি না ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ এ সত্য এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন কিনা। পাঞ্জাবের আর্য্য সমাজ এই ভুল করে নাই, তাই তাহাদের শক্তি ক্রমেই বাড়িতেছে।

বাঙলা দেশে হিন্দু সমাজের ভিতর হইতেই যাঁহারা সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। বলিতে গেলে হিন্দু সমাজে নবযুগের স্মৃতিকাররূপেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাচীন স্মৃতিকারদের চেয়ে তাঁহার গৌরব কোন অংশেই কম নহে। তাঁহার দুই প্রধান সংস্কার প্রচেষ্টা—বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহু বিবাহ নিবারণ বহুল পরিমাণে সাফল্যলাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধানত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই এই সংস্কার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক যে সব সাহিত্যিক কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, সমাজ সংস্কারের দিক দিয়া তাঁহাদের প্রভাবও কম নহে। রামনারায়ণের "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" নাটক এবং দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক ও প্রহসন এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সাও" বাঙলার সামাজিক আন্দোলনে স্থান পাইবার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দও সমাজসংস্কার আন্দোলনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই দিকে রবীন্দ্রনাথের দানও কম নহে, তাঁহার সামাজিক উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রভৃতিও হিন্দু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

তারপর আসিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ। এই যুগে হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিন্দুধর্ম্মের মহান আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এতদিন সংস্কার আন্দোলনের দৃষ্টি ছিল পাশ্চাত্যের দিকে। এখন হইতে সে ভারতীয় আদর্শের দিকে মুখ ফিরাইল। এই নূতন সমাজসংস্কার আন্দোলনেরও বাহন ছিল সাহিত্য। এই যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যাঁহারা সমাজ সংস্কার আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানত সাহিত্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাবলীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "অপরাজেয় কথাশিল্পী" শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়াই উপন্যাস লিখেন নাই বটে। কিন্তু যে সব ভাব ও আদর্শ তিনি তাঁহার সৃষ্ট কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙালী হিন্দুর সমাজ জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আমরা জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের উপর সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিলাম। আমরা দেখাইতে চাই যে, সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সাহিত্য একটা প্রধান অস্ত্র এবং বাঙলার হিন্দু সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যকে অন্যতম প্রধান উপায়রূপে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এইদিকে বাঙলার হিন্দু সমাজের মনীষী চিন্তানায়কদের মনোযোগ আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। তাঁহারা এমন সাহিত্য রচনা করুন, যাহাতে হিন্দু সমাজের তামসিক জড়তা দূরীভূত হইয়া উহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে।

# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

৬
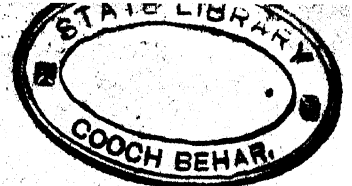
সৌদামিনী যখন বিধবা হয়, তখন পাঁচ মাসের মানিক ওর কোলে। দিব্যি গোলগাল চেহারা, সদাহাস্যময় মুখ, নধরকান্তি ছেলেটি, দেখলেই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করত। এইজন্যেই সৌদামিনী ওর নাম রেখেছিল মানিক, হৃদয়মানিক। সৌদামিনীর স্বামী, মানিকের বাপ পরান যখন সৌদামিনীকে তৃতীয়পক্ষে বিবাহ ক'রে ঘরে আনে তখন সদুর বাপকে দিয়ে এসেছিল নগদ আট গণ্ডা টাকা, আর সদুকে দিয়েছিল বাজু, নারকেল ফুল, নোলক, মাকড়ি, পায়ের মল আর গঙ্গাযমুনা (সোনা-রুপার তৈরী) গয়না। সদুও সেই গয়না প'রে, ডুরে শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে পরানের ঘর করতে এসেছিল।

সেই যে সে স্বামীর সংসারে এসেছিল তার পরে আর কোনও দিন বাপের বাড়ি না গেলেও পরানের অভিভাবিকা খুড়ী পাড়ার লোকের কাছে বলে বেড়াত—বউএর নাকি ঘর-কন্নায় মন নেই। কথা শুনে শুনে প্রথমে সদু রাগে জ্বলত, শেষে হাত মুখ নেড়ে জোর গলায় সে কথার এমন প্রতিবাদ করত যে খুড়ী গলা ছেড়ে তো কান্না জুড়ে দিতই, উপরন্তু পাড়ার লোক জুটতেও দেরি হ'ত না। খুড়ীর কথার জ্বালায় সদু একবার নাকি গলায় দড়িও দিয়েছিল ব'লে শোনা যায়; অবশ্য কথাটা আজ সদু অস্বীকার করে। কিন্তু সে সব অনেক দিনের কথা।

অনেক দিন আগেই পরান পণ্ডিত মারা গেছে। তার খুড়ীও আজ আর পৃথিবীতে নেই, আছে শুধু পরানের বউ সদু আর তার ছেলে মানিক। মারা যাওয়ার সময় পরান বিশেষ কিছু রেখে যেতে পেরেছিল কি না, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মতামত পোষণ করলেও চোখে দেখা যেত সদুর নামের শুধু ওই বাড়িখানা। সদু বলত, ছেলেটাকে মানুষ করবার জন্যেও কিছু টাকা রেখে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘাড়ে বরং সে ঋণেরই বোঝা চাপিয়ে রেখে গেছে। বলত, এ সে শোধই বা করবে কেমন ক'রে, আর মানিককে লেখাপড়াই বা শেখাবে কি দিয়ে।

মানিক কিন্তু সত্য সত্যই লেখাপড়া শিখতে লাগল, গুরুমশায়ের পাঠশালায় নয়, দেড় মাইল দূরে শহরের সীমানায় মাইনর স্কুলে। সৌদামিনী এর ওর কাছ থেকে শুনতেও লাগল যে, ছেলে তার লেখাপড়ায় স্কুলের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এমনকি মাস্টার মশায়রাও নাকি তাকে সেইজন্যে খুব ভালবাসে। এই সব শুনে একদিন নিজের ও ছেলের অবস্থাটা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করবার জন্যে ছেলের হাত ধ'রে সৌদামিনী স্কুলের হেড্ মাস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল। তার পর নিজের দুঃখ-দারিদ্রের কাহিনী বর্ণনা ক'রে বিনা পয়সায় স্কুলে পড়াবার সব ঠিক ক'রে এল।

কিছু দিন যেতে না যেতে ছেলের মাথা বেগড়াল। একদিন স্কুলে না গিয়ে সে গেল মাছ ধরতে, তার পরদিন বসল বাঁশি বাজাতে। এমনি ক'রে পর পর কয়েকদিন কাটিয়ে শেষে একদিন সে স্পষ্ট জানিয়ে দিলে সে আর স্কুলে যাবে না।

সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন, "ইস্কুলে যাবি নে কি রে? হ'ল কি তোর?"

ছেলে শুধু সংক্ষেপে জানালে, "যাব না।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষাই যেন সদুর এক নিমেষে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সে অসহায়ের মতন মানিকের দিকে চাইলে। মানিক হেসে বললে, "ভয় কি মা তোমার? লেখাপড়া আমি ঘরে ব'সেই করব, কিন্তু ইস্কুলে আর যাব না।"

থেমে থেমে সৌদামিনী বললে, "ইস্কুলে না গেলে লেখাপড়া হয় বুঝি? 'পেরাইজ' দেবে কে?"

প্রাইজ পাওয়া না পাওয়ার অর্থ বোঝবার বুদ্ধি তখন মানিকের হয়েছে। হো হো ক'রে হেসে বললে, "তাই ভাবছ বুঝি? আরে ধেৎ, তুমি দেখছি এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ রয়ে গেছ মা, বুঝলে?"

(Learning)

এসব কিন্তু অনেকদিন আগের কথা। মানিক এখন বড় হয়েছে, নিজের ভালমন্দ বিচার করবার মত বয়েসও তার যথেষ্টই হয়েছে। তাই কথায় কথায় সৌদামিনী যেদিন বিপিনের মনের ইচ্ছাটার কথা তার কাছে প্রকাশ করলে ছেলের মতামত জানবার জন্যে, সেদিন মানিক যেন কেমন একটা সঙ্কোচে জড়িয়ে পড়ল সৌদামিনীর কাছে। ছেলেকে নীরব দেখে সৌদামিনী প্রশ্ন করলে, "কিরে, কি বলব?"

খেতে খেতে অন্যমনস্কের মত মুখ তুলে মানিক জিজ্ঞাসা করলে "কাকে?"

"আদুর বাপকে?"

মানিক কথা কইলে না, মুখ নীচু ক'রে খেয়ে উঠে গেল। কারণ লজ্জা পাবার মত বয়স বা বুদ্ধি তার হয়েছিল তখন। তাই একথার পরে আবার যেদিন আদুরীকে সে দেখলে সেদিন সে দেখলে নতুন চোখ দিয়ে। এ আদুরী যেন আর সে আদুরী নয়, এ যেন নতুন হয়ে এল, বিনুনি ক'রে খোঁপা বেঁধে, মাকড়ির জায়গায় টাব আর মলের জায়গায় তোড়া পরে। তার আর ডুরে শাড়ি নেই, সস্তা দামের রঙিন শাড়ির আঁচল-খানি ওর সকালের শিউলি আর বিকেলের বকুলে ভরা। চোখে অদেখা স্বপন, অজানা সুখাবেশ।

মানিক তাকে একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার দেখলে। তার পর সোজাসুজি গিয়ে সৌদামিনীকে বললে, "তুমি সম্বন্ধ কর মা, আদুর বাপকে কথা দিও আদুকে ঘরে আনবার।"

সৌদামিনী এ কথায় খুশী হ'ল কি না ভাল বোঝা না গেলেও, বিপিন এ কথা ওর মুখে শুনে যেন আনন্দে ফেটে পড়ল। বললে, "অ্যাঁ, বল কি মানিকের মা, তা হ'লে আদুকে তুমি নেবে? সত্যি?"

হাসি মুখে সদু বললে, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? সত্যি গো সত্যি।"

বিপিন কি বলবে ভেবে না পেয়ে সৌদামিনীর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর এতদিনের মুখর বিপিন হঠাৎ যেন কথা হারিয়েই ছাতিটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, "চললে যে?"

মুখ ফিরিয়ে বিপিন বললে, "কি করব?"

"এত বড় একটা আনন্দের খবর দিলাম, তবু আনন্দ করছ না যে?"

"কে বললে আনন্দ করছি না?"

বিপিন যেন এবার বড় দুঃখেই হাসলে; বললে, "মানুষকে তুমি এখনও ঠিক বুঝতে শেখ নি মানিকের মা।"

সৌদামিনী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "তুমি শিখলেই আমাদের কাজে লাগবে আদুর বাপ, আমাদের আর নতুন ক'রে শেখবার দরকার নেই।"

বিপিন ফিরে দাঁড়াল; দু-এক পা এগিয়ে এসে বললে, "মুখে বললেই কি সব কথা বলা হয়ে যায় মানিকের মা, বলার চেয়ে যে আরও অনেক কথাই অ-বলা থেকে যায়, এ কথা কি জান না?"

মানিকের মা হঠাৎ উত্তর দিলে না এ কথার, হাতের কাজ দ্রুতগতিতে করতে করতে বললে, "যার যেমন মন, সে বোঝে সেই রকম।"

বিপিন হাসলো; স্নেহের সুরে বললে, "বোকা কি আর গাছে ফলে?"

এবার সদু তাড়াতাড়ি জবাব দিলে। অভিমানাহত সুরে বললে, গাছে ফললে তো তার জন্যে যত্ন লাগত, চেষ্টাও করতে হ'ত। কিন্তু গাছে যা ফলে না, বরঞ্চ মাড়িয়ে গেলেও মাটির বুকেই ধুলো আর আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে থাকে, তেমন মন নিয়ে যদি সে পৃথিবীতে এসেই থাকে, তা হ'লে তো তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি বিবেচনার ওপর কোনও দাবি দাওয়াই নেই। নিজের বোকামি নিয়ে নিজেই সে সুখে থাকে, শান্তি পায়। পরের এতে হস্তক্ষেপ করাই হচ্ছে পরের পক্ষে ক্ষতি।

বিপিন বুঝলে তার মনের ব্যাথা কোথায়! বললে "রাগ করলে মানিকের মা?"

"না, রাগ করব কেন?"

"তবে দুঃখ পেয়েছ নিশ্চয়! আমি কিন্তু তোমায় দুঃখ দেবার জন্যে কোনও কথা বলি নি, মাইরি বলছি।"

সদু ভারী গলায় বাধা দিলে, "থাক, থাক, ঢের হয়েছে; আর দিব্যি-দিপান্তর নাই বা করলে আদুর বাপ!"

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"অ্যাদ্দিন যে দিব্যি-দিপান্তর কর নি তা ব'লে কি দিন আটকে আছে?"

বিপিন যেন খোঁচা খেয়ে চমকে উঠল,—"না না, সে এমন কি কথা! সে এমন কি কথা!"

মানিকের মা ব্যাঙ্গোক্তি করলে—

"কথা কইতে জানলে হয়,
কথা যোল ধারে বয়।

কথা কি একরকমের? কত রকমের কথাই তো আছে পৃথিবীতে, আর তার চেয়েও বেশী আছে নানা মানুষের নানারকম মন। সাগরের তল আছে তো মানুষের মনের তল নেই।"

বিপিন এ কথার জবাব না দিয়ে মুখ তুলে তাকালে সদুর দিকে। সদু সে দৃষ্টির অর্থ কি বুঝলে কে জানে, কিন্তু এর পর সে আর কোনও কথা কইলে না, দাঁড়াবার জন্যে বিপিনকে অনুরোধও করলে না আর। হাতের কাজ ফেলে বরাবর উঠে গেল ঘরের মধ্যে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও তার দেখা না পেয়ে অগত্যা বিপিনকে উঠতে হ'ল। আবার ছাতাটা কাঁধে তুলে নিয়ে পূর্ব্বপরিত্যক্ত পথ ধ'রে অগ্রসর হ'ল সে।

বাড়ি পেঁাছে দেখলে অন্নদা আর আদুতে ঝগড়া বেঁধেছে। সে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধের এক পুনরাবৃত্তি। অন্নদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুঁটো ধ'রে চীৎকার করছে আর উঠনে দাঁড়িয়ে নানা মুখভঙ্গী সহকারে তার যথোচিত উত্তর দিচ্ছে আদুরী। বিপিনকে বাড়ি ঢুকতে দেখে দুজনেই থমকে গেল ঝগড়া ভুলে। তারপরেই অন্নদা উঠল কেঁদে। বলতে লাগল, "হয় তুমি মেয়েকে শাসন কর, নয় আমাকে এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দাও দাদা, তোমার দুখানি পায়ে পড়ি।" এরকম নালিশ করা অন্নদার পক্ষে নতুন কিছু নয়, বিপিনও এমন নালিশ শুনেছে অনেকবার। তবু জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

"মানে আবার কি, আমার ইচ্ছে, আমি এখানে থাকব না। থাকলে হয় ও মরবে নয় আমি মরবো, দুই-এর এক হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু সেটা কি ভাল?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে কথা কয়টা উচ্চারণ করতে অন্নদার সময় লাগল প্রায় পাঁচ মিনিট, কিন্তু বিপিন তার উত্তর দিল অতি সংক্ষেপে। বললে, "বেশ।"

কথাটা ব'লে ছাতাটা মাটিতে আস্তে আস্তে ঠুকতে ঠুকতে উঠে গেল পুবের ঘরের দাওয়ায়। উঠানে দাঁড়িয়ে আদুরী অপ্রস্তুতভাবে বাপের দিকে চেয়ে রইল; অন্নদাও বারান্দায় ব'সে আর একবার অনুযোগের পুনরাবৃত্তির উদ্যোগ করতে গেল, কিন্তু বিপিন বারান্দায় উঠে, আধভাঙ্গা জল-চৌকিটা টেনে নিয়ে ব'সে এমন ক্লান্তির সুরে "মা গো" ব'লে ব'সে পড়ল যে, দুজনের কেউ আর কোনও উচ্চবাচ্য করল না।

দুনিয়ায় একরকম মানুষ আছে, যারা রাগলে সে রাগ প্রকাশ না ক'রে স্থির থাকতে পারে না। আবার এমনও মানুষ আছে, যারা রাগলে সে রাগকে একান্ত যত্নে মনে চেপে গুমরে গুমরে মরে। বিপিন সেই প্রকৃতিরই মানুষ। একে একটু আগে মানিকের মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় তার মন খারাপ ছিল, তার উপর বাড়িতে এসে সেই অশান্তির পুনরাভিনয় দেখে যেন নিৰ্ব্বাহ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল নিত্যকার এই অশান্তি, এই বিপদের দমনের উপায় কি, অন্নদাকেই বা কোথায় পাঠানো যায়, আর, আদুরীর সম্বন্ধেই বা কোন্ উপায় অবলম্বনীয়।

অন্নদার এ জায়গা ছাড়া যাবার জায়গা ছিল বটে, কিন্তু সে বহুদিন আগে। আজ সে স্থানের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। আর আদু? আদুর বয়স হয়েছে, অথচ বয়সের উপযোগী বুদ্ধি আজও হয় নি; কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় আজও সে তা জানে না। এ অবস্থায় তাকে কার ভরসায় কোথায় সে পাঠাবে? নিজেও সে বড় ক্লান্ত, অন্তর্বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত। দিনকতক একটু নীরবে ও নির্জ্জনে থাকাটাই যেন তার কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল। কিন্তু কি করবে সে!

অনেক ভাবনা চিন্তার পর মনে পড়ল শারদার কথা। এই তো সেদিন তার সঙ্গে দেখা। বিপিনকে যে সে আজও আগের মতই স্নেহ করে, তার পরিচয় শারদার ব্যবহারে যে সে সেদিন স্পষ্ট পেয়ে এসেছে। বিপিনকে নিজের কাছে কিছুদিন রাখবার তরে সে কি চেষ্টা! সেদিন সে নিজের ইচ্ছাতেই চ'লে এসেছে; ব'লে এসেছে, সময় পেলে সে আবার আসবে। শারদাও সে অনুরোধ করেছে বার বার। কিন্তু সে নিজে না গিয়ে আদুকে তো তার কাছে কিছুদিনের জন্য রেখে আসতে পারে! অন্নদার মত শারদাও তো তারই বোন, আদুর পিসী! সেই ভাল। আদুকে সে কিছুদিনের মত শারদার কাছেই রেখে আসবে।

সেইদিন খাওয়া দাওয়ার পর বিপিন মেয়েকে ডেকে বললে, "তোর কাপড় চোপড় খানকতক বেঁধে রাখ্ আদু, কাল সকালে তোকে দিদির কাছে রেখে আসতে যাব।"

আদু বিস্মিত হ'ল, বললে, "তোমার আবার দিদি কে বাবা?"

"সে আছে একজন।"

"কই, এতদিন তো বল নি!"

"বলব আবার কি?" বিপিন মুখ বিকৃত করলে, "ব'লে কয়ে সম্পর্ক পাতাতে হবে নাকি? নে নে, মেলা বকিস নে. গুছিয়ে নে জিনিস পত্তর।"

আদু চুপ ক'রে গেল।

খানিক পরে এক প্রকাণ্ড বোঁচকা বেঁধে এনে হাজির— "এই যে বাবা।"

বিপিন চমকে উঠল; বললে, "অত জিনিস পত্তর কি হবে রে?"

"কেন, সঙ্গে নিয়ে যাব, সেখানে যদি না পাওয়া যায়?"

"পাওয়া যাবে না কিরে।" ব'লে বিপিন হেসেই আকুল। বলতে লাগল, "বলিস কি আদু, সে যে শহর। পথে পথে দোকান, বাজার, কত কি! আর তোর পিসী যে মস্ত বড়-লোক; গা ভরা গয়না, বাক্স ভরা শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, ঝি, চাকর—কত কি আছে তার। আমাদের মত দু-দশটা লোককে মাইনে দিয়ে চাকর রাখতে পারে সে। সেখানে সব পাবি, স—ব।"

আদু অবাক হয়ে শুনতে লাগল। বিপিন ব'লেই চলল, "কোনও জিনিস 'নেই' বলতে না বলতেই দেখবি চাকর-বাকরে এনে হাজির করবে। সে কি আর আমার মতন? হ্যাঁ, চল আগে দেখবি তখন।"

অন্নদার কানে কথাটা যেতেই অন্নদা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল হঠাৎ। সারা রাত সে কারও সঙ্গে কথা কইলে না, খেতেও দিলে না বিপিনকে। আদুর যাবার সময় শুধু বললে, "আমাকেও দূর ক'রে দিলে তো পারতে দাদা। এর চেয়ে সেই তো ভাল ছিল ঢের।"

বিপিন উত্তর দিলে না, মেয়েকে বললে, "চল্ চল্, রোদ উঠে পড়লে পথ চলতে কষ্ট হবে; অনেকটা পথ।"

ওরা বার হয়ে পড়লো পথে, আর দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে সজল চোখে চেয়ে রইল অন্নদা।
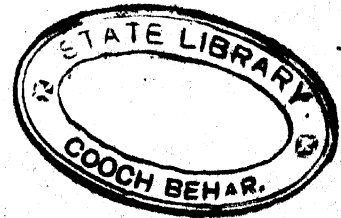
(ক্রমশ)



# সংবাদ

### আহমদ নওয়াজ

প্রকৃতির পুঞ্জীভূত পুষ্প পত্রে ফলে
রাশি রাশি লেখা আছে বাণী,
বহিছে সংবাদ সদা মুখর কল্পনা
আনন্দদায়িনী ঋতুরাণী।

মর্ম্মে আশা ভাষা হয়ে পশে
কর্ম্মে দেয় শত উদ্দীপনা,
কর্ম্মকে গড়িয়া তোলে দৃঢ় ভিত্তিপরে
নিত্য হয় নব নব জানা।

অন্তরের বাণী যত এই ধরণীর
সবই লেখে যায় অকারণে

মনের নিভৃত কোণে রহিল যে রেখা
তায় শুধু থাকে আবরণে।

গগনে পবনে চলে পরম মিতালি
প্রেম আছে কুঞ্জে ফুলে ফলে
মানুষ চলিছে কোথা সেই কথা ভাবি
তারা কি চলিল রসাতলে?

সংশয়ের সাথে নিত্য দ্বন্দ্ব চলে কত
মীমাংসার থাকে না উপায়
যুক্তিতর্ক বোঝাপড়া যায় ধুয়ে মুছে
ব্যর্থতায় আর বেদনায়।

# নিউইয়র্কের পথে

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মানুষের মনে উদ্‌বিগ্নতা থাকলে তার চিন্তাধারা সংকোচিত হয়। তাই সকল যাত্রীই ভাবছিল আমেরিকার দ্বার তাদের কাছে খুলবে কি না। দুটো দিন আমার আরামেই কেটেছিল। আমার ঠিক বিশ্বাস ছিল, অন্তত কয়েক দিন ইমিগ্রেশন বিভাগের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতেই হবে। আমি হিন্দু বলে নয়, আমার চামড়া কালো বলে। এক শ্রেণীর আমেরিকান আছে, যারা হিন্দু শব্দটার উচ্চারণেই মোহিত হয়ে পড়ে। আমি কালো, তাই ভাবছিলাম আমাকে হিন্দু ব'লে গ্রহণ করলেও বেঁচে যাই।

আমেরিকার রকফেলার কেন্দ্র। ৭০ তলা বাড়ী এবং ৮৫২ ফিট উঁচু।

কিন্তু তার সম্ভাবনা অতি অল্প। আজই বিকেলবেলা জাহাজ নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছবে। আমি জাহাজের খালাসী থেকে পারসর এবং পারসর থেকে কাপ্তেন পর্যন্ত সকলের সঙ্গে কথা কয়ে নিয়ে ডেকে গিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য, নিউইয়র্ক নগরীর সামুদ্রিক ট্রাফিক দর্শন।

অনেক জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আমরা যেমন বন্দরের দিকে যাচ্ছি তেমনি অনেক জাহাজই বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে তেত্রিশটা জাহাজ বেরিয়ে গেল। আর যতদূর দৃষ্টি যায়, গুনে দেখলাম পঁয়তাল্লিশটা জাহাজ বন্দরের দিকে চলেছে। এত জাহাজের আনাগোনা পৃথিবীর অল্প বন্দরেই হয়। সাউথাম্‌টন, ডোভর তথা লণ্ডন, সিঙ্গাপুর, ইওকোহামা, হামবর্গ এবং রিওদিজেনেরোতে প্রায় এই রকম সামুদ্রিক ট্রাফিকের নমুনা দেখা যায় বললে দোষ হবে না। তবু মনে হ'ল নিউইয়র্কের মত কোথাও নয়। যাঁরা সঠিক হিসাব নিতে চান, তাঁরা নৌবিভাগের চার্ট দেখবেন। কলকাতার পোর্ট কমিশনারের দয়া না হ'লে বোম্বাইয়ে লিখলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

জাহাজ ক্রমশই নিউইয়র্ক নগরীর কাছে আসতে লাগল। নানা দৃশ্য একটার পর একটা চোখে আসতে লাগল; কিন্তু তা'রা তেমন আমার মন ছুঁতে পারল না। বড় বড় জাহাজ কাছ দিয়ে যাচ্ছে, আর একটু পরেই আর একটা স্বাধীন দেশ এসে পড়ছে। ভাবছিলাম, দেখব আমেরিকার ডিমক্র্যাটিক গবর্ণমেণ্টের স্বরূপ কি। বোধ হয় তখন সাড়ে সাতটা, চারিদিক কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় জাহাজ স্ট্যাচু অব লিবার্টির কাছে এসে গেল। অনেকেই দেখলে, আমিও দেখলাম, কিন্তু সে মূর্ত্তি কারও মনের উপর তেমন দাগ কেটেছে বলে মনে হ'ল না।

জাহাজ ধীরে ধীরে হাডসন নদীতে গিয়ে প্রবেশ করল। আমি ডেকে ব'সে নদীর দুই তীরের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। বাস্তবিকই সে দৃশ্য উপভোগ্য। বড় বড় বাড়িগুলির উপর মেঘমালা ঝুঁকে পড়েছে। বিজলী বাতির আলো তাতে পড়ে আঁধারে আলোর সৃষ্টি করেছে। সেই আঁধারে আলো দেখবার মত। আজকের দিনটা যে আমাকে হাজতে বাস করতে হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম ব'লে নামবার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম না। একজন আমেরিকান আমাকে আকাশস্পর্শী বাড়িগুলির পরিচয় দিচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, "ওই দেখুন ওআল স্ট্রীট। এই ওআল স্ট্রীটই পৃথিবীর সমুদয় ব্যবসায় এবং আমেরিকার পলিটিক্সের ওপর প্রভুত্ব করছে।" বাঁদিকে পড়ল হারলাম, আমেরিকার প্যারি। কথা বলতে বলতেই জাহাজ কূলে এসে ভিড়ল। সিঁড়ি পাতা হ'ল, ইমিগ্রেশন অফিসার এলেন, ডাক্তার এলেন, সন্ত্রস্ত যাত্রীরা ডাক্তারের সম্মুখবর্তী হ'ল। যারা আমেরিকা প্রবেশের ছাড়পত্রে সই পেতে লাগল, তারা নিজেদের অনেক ভাগ্যবান মনে করলে।

আমাদের দুজনেরও ডাক পড়ল। আমেরিকান ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর ডাক্তারী পরীক্ষাও হ'ল না, ডাক্তার 'গুড্‌ বাই' ব'লে চলে গেলেন। আমার ডাক্তারী পরীক্ষা হল, তার পর ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে হাজির করা হ'ল। অফিসার আমার মুখ এবং পাসপোর্ট দেখেই পাসপোর্ট একদিকে রেখে দিয়ে বললেন, এখানে বসুন, পরে দেখব।" তা যে ঘটবে তা আমার জানাই ছিল। আমি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে পাশে এসে জাহাজ লাগার জায়গাটা দেখতে লাগলাম।

দুদিকে কাঠের দেওয়াল রয়েছে। এই দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পার হওয়া সাধ্যাতীত। একদিকে নদী এবং একদিকে জাহাজ থেকে নামবার গেট। এই গেটে প্রবেশ করতে সকলেরই পাসের দরকার হয়। এমন কড়া ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের খালাসীরা যে কি ক'রে জাহাজ থেকে পালিয়ে সাঁতার কেটে শহরে যায়, তা বলা শক্ত। এইসব দেখছি, এমন সময় ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে ডেকে বললেন, "একজন ইউরোপীয় মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বসুন এখানে, এখনই ফিরে আসবেন।" নূতন ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে চেয়ারে বসলাম।

মিনিট পাঁচেক পরেই সেই ইউরোপীয় মহিলা এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, একজন হিন্দু মহিলা এখনই আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি যেন এখানেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ মনে হ'ল, তিনি কমলাদেবী নন তো, উপেনবাবু যাঁর কথা লিখেছিলেন? মনে একটা আশার সঞ্চার হ'ল।

মিনিট দশেক পরেই, পরনে শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, পায়ে ভারতীয় স্যাণ্ডেল, একটি মহিলা আসতে লাগলেন। আমেরিকান, ইউরোপিয়ান সকলেই তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাতে লাগল। তাঁর পথ পরিষ্কার, তাঁকে আর লোক ঠেলতে হল না। আমার কাছে আসা মাত্র আমিও দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে তাঁকে নমস্কার করলাম। আমরা যেমন ক'রে 'বন্দেমাতরম' গান গাইবার সময় দাঁড়াই বা ইংরেজেরা যেমন করে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গায়, ইমিগ্রেশন অফিসাররা ঠিক তেমনি করে সবাই একসঙ্গে তাঁকে সম্মান দেখাতে দাঁড়ালেন।

শ্রীযুক্তা কমলা মুখার্জ্জি

মহিলার এত সম্মানের কারণ প্রথমে ঠাহর করতে পারি নি। যাই হ'ক, তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি উপেনবাবুর আর আমার চিঠি পেয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছেন। তিনি আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু একজন ইমিগ্রেশন অফিসর টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসে তাঁকে ডাকলেন এবং আমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে নিষেধ করলেন। মহিলাটি যতক্ষণ না কোনও আসন গ্রহণ করছিলেন, সব ইমিগ্রেশন অফিসরাই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কমলাদেবী আসন গ্রহণ ক'রেই অফিসারের সঙ্গে নানা কথা আরম্ভ করলেন। তার পর আমার কথা উঠল। কমলাদেবী বললেন, তিনি যে সাপ্তাহিক পত্রের লেখিকা, আমিও সেই সাপ্তাহিক পত্রে লিখে থাকি এবং সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তার পর আর কি কথা হ'ল তা আমি শুনতে পাই নি, কারণ আমাকে দূরে গিয়ে বসতে বলা হ'ল। শেষ কথা শুনলাম 'O. K.' তার পরই পাসপোর্টে শীল-মোহর পড়ল এবং অফিসাররা 'O. K.' উচ্চারণ করে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কমলাদেবী আমার হাত ধ'রে এই কুম্ভীপাক থেকে বার হয়ে পড়লেন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

আমার লাগেজ পরীক্ষা করা হ'ল, তার পর আমরা একটা বড় পথে এসে পড়লাম। পথটি দেখবার মত। ছত্রপতি শিবাজী যেমন দিল্লি প্রবেশের সময় এদিকে সেদিকে খুব তাকান নি, আমিও তেমনি কোনও দিকে না তাকিয়ে একটি ট্যাক্সি ডেকে সাইকেলটা তাতে বোঝাই ক'রে, শ্রীমতী কমলাদেবীকে ভাল ক'রে বসিয়ে ৪২নং স্ট্রীটের Y. M. C. A.এর দিকে রওনা হলাম। লণ্ডনের জাহাজের এজেণ্টও আমাকে নিতে এসেছিলেন। তিনিই Y.M.C.A.এর ম্যানেজারের কাছে আমার আগমনী নিবেদন করলেন। ম্যানেজার নীচে এসে আমার মুখ দেখেই বললেন, "বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, আমাদের এখানে একজন লোক রাখবারও স্থান নেই।" আমি বুঝলাম ব্যাপারটা কি। তৎক্ষণাৎ কমলাদেবীকে বললাম, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, এখন আমার থাকার স্থান আমিই খুঁজে বার করব। অতএব যদি অনুমতি দেন তো আপনাকে গিয়ে রেখে আসি।"

আমার অপমানে তিনিও বোধ হয় অপমান বোধ করেছিলেন। তাই অপমানের বোঝা আর বইতে না চেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন, যেখানেই থাকি না কেন কাল সকালে যেন তাঁর কাছে ফোন করি। তাঁর চ'লে যাওয়াতে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। আমরা অন্য একটা Y. M. C. A. তে গেলাম; সেখানেও সেই 'স্থানাভাব'। সাদা চামড়ার Y. M. C. A. তে স্থান লাভের আশা সুদূরপরাহত বুঝে আমরা হারলামের দিকে রওয়ানা হ'লাম এবং নিগ্রোদের Y. M. C. A. তে স্থানলাভ করলাম। সেখানে এক রাত্রি থাকার জন্য ছোট একটা কুঠুরি ভাড়া করতে পাঁচ টাকা লাগল।

রুমের ভাড়া, ট্যাক্সির মজুরি দিয়ে একটা নিগ্রো হোটেলে সামান্য খাবার খেয়ে একখানা দু সেণ্টের সংবাদপত্র কিনে বোধ হয় নবম তলায় অবস্থিত একটি রুমে এসে দরজা খুলেই সংবাদপত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। স্বাধীন মত ও আলোচনা প্রভৃতি জানতে হ'লে সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র কিনতে নেই, অথবা কোনও পার্টি-পলিটিক্স-এর সংবাদপত্রও কিনতে নেই; কিনতে হয় "ইনডিপেণ্ডেণ্ট" সংবাদপত্র। এরূপ সংবাদপত্রের সংখ্যা শুধু আমেরিকায় কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই অতি বিরল। আমি সে সংবাদপত্র একখানি কিনেছিলাম। এরূপ সংবাদপত্র রিপাবলিকান, ডিমক্র্যাট, কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ট ও ধর্ম (religion) কোন কিছুরই সম্বন্ধেই টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। এই সব কাগজকে ন্যাশন্যাল সংবাদপত্র বলা হয়। এদের কাটতি খুব বেশী, কিন্তু ছাপা হয় কম। এসব সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হ'লে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ টাকা দিতে হয়।

অনেকক্ষণ সংবাদপত্র পাঠ ক'রে রাত্রি তিনটার সময় ঘুমালাম। সকালে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে যখন বাইরের দিকে তাকালাম তখন অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। ১৩৫নং স্ট্রীটের পশ্চিম দিকটাই Y. M. C. A. অবস্থিত, দুদিকে সারি দিয়ে বড় বড় ইমারত। তবে আমাদের দেশের মত এলো মেলো নয়। ব্লক ক'রে ক'রে বাড়ীর শহর সাজান। তা সে নিগ্রো পল্লী হ'ক, আর সাদা চামড়াদের পল্লীই হ'ক। এই পৃথিবীতে এক জার্মনি আর আমেরিকা ছাড়া কোথাও এরূপ ব্লক নিয়মে বাড়ি তৈরী হয় নি। তবে হবে ব'লে মনে হয়। ব্লক সিস্টেমে বাড়ি করলে, পিচ দেওয়া বড় বড় পথকে খুঁড়তে হয় না, যেমন আমাদের কলকাতায় হয়ে থাকে। ব্লক সিস্টেমে বাড়ি করা হয় ব'লে জল, গ্যাস, বিজলী বাতি প্রভৃতি এমন সুন্দরভাবে রাখা হয় যে, তার সঙ্গে পথের সম্পর্কই থাকে না। সবই পেভমেণ্টের নীচে দিয়ে

চলেছে। কিছু মেরামত করবার দরকার হ'লে ওইসব পেভমেণ্ট ভেঙ্গে করলেই চলে, রাস্তা খুঁড়তে হয় না।

হাঁ ক'রে পথের পাশের বাড়িগুলি দেখতে লাগলাম। প্রত্যেকটি বাড়ির জানালা বন্ধ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না কে কোথায় বাস করছে। পথে স্রোতের মত মোটরকার, মোটরলরি, ট্যাক্সি, বাস চলছে। একটু দূরেই এলিভেটারে গাড়ি চলছে। আমার মনে হ'ল, এই গাড়ি চলা যদি আমাদের দেশের লোক দেখে তবে নিশ্চয়ই মাটিতে পড়ে মাথা নত করবে। কতক্ষণ এমনভাবে চেয়ে ছিলাম তার ঠিক ছিল না। শুধু চেয়ে থাকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল। আকাশে গাড়ি, মাটিতে গাড়ি, মাটির নীচে গাড়ি। এমন দেশ পৃথিবীতে মাত্র একটিই। আমেরিকা ছাড়া কোথাও আজ পর্যন্ত এলিভেটর সিস্টেমে গাড়ি চলার প্রথা প্রবর্তিত হয় নি। মস্কোতে হবে ব'লে শুনেছি মাত্র।

দেখার আশ একটু মিটলে আবার স্নান করলাম, তারপর নীচে নেমে পথের নম্বর, বাড়ীর নম্বর, মোড়ের ষ্ট্রীটের নম্বর নোট বুকে লিখে নিয়ে একটু কফি খাবার ইচ্ছায় সোজা হাঁটতে লাগলাম। একটি কফির দোকান খোলা; তাতে দু'জন নিগ্রো এবং তিনজন আমেরিকান ব'সে কফি খাচ্ছে আর নানারকম আলোচনা করছে। এদের দর্শন-ঘেঁষা কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল যেন আমি কোনও সন্ন্যাসীর আখড়ায় ব'সে আছি। কফি খেয়ে মাথা চুলকতে চুলকতে বেরিয়ে এলাম।

আমার ইচ্ছা হল এই হারলামেই অন্তত এক সপ্তাহ থাকি। তাই একজন জামাইকা ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে একটি রুম ঠিক করলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি। বাড়িওয়ালি বললেন, দেশের খাবার তিনি রেঁধে দিতে পারবেন। জামাইকাবাসী নিগ্রোরা আপনাদের নিগ্রো বলে পরিচয় দেয় না, বলে তারা West Indian। তাদের মতে ফিলিপাইন, জাভা আর ভারতবাসীরা East Indian। আমেরিকানরা আমাদের হিন্দু বলে, তা মুসলমানই হই আর হিন্দুই হই। তবে ব্রিটিশের প্রচার বিভাগের ফলে অনেক ব্রিটিশ পরিচালিত সংবাদপত্র সেই ভ্রম আজকাল সংশোধন ক'রে দিচ্ছে। মিঃ সওকত আলি এবং একজন মাদ্রাজী পাদরী সেই ভুল সংশোধন করতেই বোধ হয় সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেরে উঠেন নি। তবে হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই, বোধ হয় আর আমাদের আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান না বানিয়ে ছাড়বে না। সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় বলতে পারি না, ক্যালিফোর্ণিয়াতে আমাদের দেশের পাঠানরা আপনাদের ইণ্ডিয়ান ব'লে কখনও পরিচয় দেয় না—তারা সদাসর্বদা নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে ভালবাসে এবং এরিয়ান ব'লে গর্ব অনুভব করে। এই এরিয়ান এবং নন এরিয়ান কথা নিয়ে বাঙালী মুসলমান ও পাঠানদের মাঝে অনেক সময় পিস্তলবাজীও হয়ে থাকে। পাঠানরা বাঙালীদের, সে যে ধর্মেরই হ'ক, এরিয়ান ব'লে মানে না।

আমি যে রুম ভাড়া করেছিলাম তার সঙ্গে রান্না করবারও বন্দোবস্ত আছে। রান্না করবার বাসন চাইলেই পাওয়া যায় এবং গ্যাস যত ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়; সেজন্য অতিরিক্ত পয়সা দিতে হয় না। রুম ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাস, লাইট, বাথ, রান্নার বাসন, সপ্তাহে একবার বিছানা পরিবর্তন এবং দৈনিক একখানা ক'রে ধোয়া নূতন তোয়ালে পাওয়া যায়। এরূপ ঘরের ভাড়া আমেরিকার পূর্বদিকে সপ্তাহে সাড়ে তিন ডলার, উত্তর দিকে তিন ডলার, মধ্যে চার ডলার, পশ্চিম দিকে আড়াই ডলার থেকে পাঁচ ডলার, দক্ষিণ দিকে এক ডলার থেকে তিন ডলার পর্যন্ত। ঘরের আসবাব দু'খানা চেয়ার, দুটো টেবিল, একটা ইজিচেয়ার। পোশাক টাঙ্গিয়ে রাখবার জন্যে পাশে একটা ছোট কামরাও পাওয়া যায়। রান্নার বাসনপত্র টেবিলের ড্রয়ারে রাখবার বন্দোবস্ত আছে। এই জন্যই দুটো টেবিলের বরাদ্দ।

বিকালে সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠে একাকী বেড়াতে বেরলাম। দুটো ব্লক পার হয়েই মাউণ্ট মরিস পার্ক। তাতেই বেড়াতে লাগলাম আর এলিভেটরগুলি কেমন হুস হুস ক'রে যাওয়া আসা করছে তাই দেখতে লাগলাম। ৮নং অ্যাভিনিউএর ওপর এলিভেটর তৈরি হয়েছে এবং তারই নীচে দিয়ে আমাকে চ'লে উক্ত পার্কে আসতে হয়েছিল।

এলিভেটরগুলির দিকে আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। বড় বড় শহরে যেমন মাটির নীচে রেল পথের দরকার, উপরেও ঠিক সেই রকম দরকার; নতুবা মহানগরীর পথে চলা দায় হয়ে ওঠে। নিউইয়র্ক শহর এই দায়ে পড়েছিল ব'লেই দায়মুক্ত হবার পথ খুঁজে নিয়েছে। পৃথিবীর লোক হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছে এত টাকা লোক কি ক'রে খরচ করতে পারে। মানুষই যে টাকা তৈরি করে এ কথা মানুষ সহজেই ভুলে যায়।

# উপসংহার

(গল্প)

শ্রীশান্তি দেবী

দুঃখের চরম সীমায় পৌঁছিলেও আত্মহত্যা নাকি মহাপাপ। তাই অবিনাশ চক্রবর্ত্তী আত্মহত্যা না করিয়া ক্ষয়রোগে নিংড়ানো কাঁঠালের কোয়ার মত পাকাইয়া তবে মরিল।

না মরিয়া তো আর বাঁচা চলে না। যখন দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে ঝলকে ঝলকে মুখ দিয়া গড়াইয়া পড়ে, তখন বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় কোথায়।

স্বামীর মৃত্যুর পর সুদেবী একটুকুও কাঁদিল না। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে নীরোগ করিবার প্রার্থনা করিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সে যেন আজ পাষাণ।

গুটি তিনেক ছেলে মেয়ে। মেয়েটি বড়, বয়স বোধ হয় দশ এগার হইবে। তাহারই পিঠে দুটি ছেলে। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা বার কয়েক মার কাছে দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া আর আবেদন জানাইবার সাহস পায় নাই। তার পর হাঁড়ি কলসী খুঁজিয়া কিছু চাল আর গুড় বাহির করিয়া তাহাই পরমানন্দে বসিয়া খাইতে লাগিয়া গেছে।

সুদেবী দেখিল। অন্যদিন হইলে দিত দুই চারিটা চড় চাপড়। কিন্তু আজ তাহার সে উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। মৃতদেহ ফেলিয়া তো আর দূরে যাওয়া চলে না। শুধু মনে মনে বলিল, খাক ওই খাক, খিদে তো পায়।

এখনও মৃতদেহ ঘরে পড়িয়া আছে। প্রায়শ্চিত্ত না হইলে ক্ষয়রোগীর মড়া কে শ্মশানে লইয়া যাইবে? ওপাড়ার হরিশ চাটুজ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি, তিনি আসিয়া বলিলেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেল বউমা, এইবার মন বাঁধ, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে তো বাঁচাতে হবে।" তার পর ঢোক গিলিয়া একটু থামিয়া—বলিলেন, "আর বলছিলাম কি, অবিনাশের একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার। জানই তো এ একেবারে সাক্ষাৎ—মানে ইয়ে রোগ। তা যা আছে দাও উঠে কিছু।"

সুদেবী উঠিল না, সহজভাবেই সে তার হাতের বাঁধানো চুড়ি দুগাছি খুলিয়া চাটুজ্যের হাতে দিয়া বলিল, "আর তো কোথাও কিছু নেই, এইতেই যা হ'ক করে অন্তত ওঁর দাহর কাজটা শেষ করে দিন।"

চাটুজ্যে এইবার হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—"সে কি কথা বউমা আমরা যখন রয়েছি তখন ব্যবস্থা একটা হবে বই কি, হবে বই কি। তা ওসব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।" তার পর ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ময়না, পল্টু, পানু তোরা যা আমার বাড়ি থেকে খেয়ে আয় গিয়ে।" তার পর কি ভাবিয়া পল্টুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই এখন থাস্ নে পরে যাবি।"

বাহিরে কথা শুনিয়া পানু কান্না জুড়িয়া দিল। ময়না তাহাকে কোলে লইয়া চাটুজ্যে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল। পল্টু বড় আশায় নিরাশ হইয়া মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পর দাহ হইয়া গেল। আট বৎসরের ছেলে পল্টু মুখাগ্নি করিল। ছেলে যখন আছে তখন তাহার হাতে মুখে আগুনটুকু না দিয়া পরলোকের সদ্‌গতির বিঘ্নটা আর করা কেন। তাই নাবালক হইলেও তাহাকে দিয়া করাইতে হইল।

এদিকের সব চুকিয়া গেল। এইবার শ্রাদ্ধ! শ্রাদ্ধ হইবে কি দিয়া? অবিনাশ চক্রবর্ত্তী দুইখানি জীর্ণ খড়ের ঘর, ছেলে, মেয়ে, আর স্ত্রী ছাড়া এমন কিছুই রাখিয়া যায় নাই যাহাতে পরলোকেও অন্তত তাহার সুখে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। যাহা কিছু ঘরের জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, সুদেবী অবিনাশের খুড়তুতো ভাই পরেশের বাড়ি যাওয়াই স্থির করিল। হাজার হইলেও সে একজন গণ্যমান্য লোক। কলিকাতায় বাড়ি আছে, রোজগারও মাস গেলে কম নয়। সে কি এমন দুর্দিনে তাহাদিগকে রাস্তায় তাড়াইয়া দিবে? লোকজনও তো দরকার হয়, না হয় সেই লোকজনের কাজ করিয়া দিবে।

পাঁচ দিন পর সদ্য বিধবা সুদেবী তিনটি ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া পরেশের বালিগঞ্জের তিনতলা সৌধ "বার্ন কুটীর"-এ আসিয়া উঠিল। পরেশ তো প্রথমে চিনিতেই পারিল না। তার পর সুদেবী সব বলায় অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "তা যখন এসেছ বউদি তখন দাদার শ্রাদ্ধের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আজকাল অবশ্য কালীঘাটে বেশ সস্তায় ক'রে দেয় ওরা; আমি ব'লে দিলেই সব গুছিয়ে ক'রে দেবে এখন।"

সুদেবী শান্তভাবে বলিল, "কোন কুল না দেখতে পেয়েই তোমার কাছে এসেছি; নইলে তোমাকে বিপন্ন করবার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

পরেশ একটু সংকুচিত হইয়া বলিল, "না না এ কথা তুমি কেন বলছ বউদি! তোমাদের জন্যে কিছু করা এ আর একটা বেশী কথা কি! চল, চল, বাড়ির ভেতর চল।"

পরেশের সঙ্গে সুদেবী অন্দরের পথ ধরিল। বাহিরে বারান্দায় পরেশের পত্নী রত্নমালা তখন রান্নার তত্ত্বাবধান করিতেছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পরেশের পিছনে একজন বিধবা এবং গুটি তিনেক শিশু দেখিয়া সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিল। পরেশ সংক্ষেপে সুদেবীর পরিচয় দিয়া স্মরণ করাইবার জন্য বলিল, "বুঝতে পারছ না? ওই যে দাদা আমাকে পড়বার খরচ দিতেন? আরে, যাঁর অসুখের খবর এলে তুমি পাঁচটি টাকা পাঠিয়ে দিলে।"

"ও, সেই যাঁর থাইসিস হয়েছিল?" বলিতে গিয়া

রত্নমালার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সুদেবী আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তাঁরই অপোগণ্ড শিশুগুলি তোমার আশ্রয়ে এসেছে।"

তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে স্পষ্ট অস্বীকারে মার্জ্জিত-রুচি রত্নমালার বাধে। মুখে হাসির রেখা টানিয়া বলে, "আশ্রয় আর কি, ভালই হয়েছে এসেছেন এখানে।"

সুদেবীর আশ্রয় জুটিল। শ্রান্ত শান্তি চুকিয়া গেল নম নম করিয়া। এইবার সুদেবী সংসারের কাজে লাগিয়া গেল।

দিন রাত্রি সংসারের নানাকাজ করিয়া সুদেবীর ক্লান্তি আসিত না। তবু তো আশ্রয়, ইহাই তাহার অনেক। এক-দিক দিয়া রত্নমালা একটু খুশী হইয়া উঠিতেছিল। তাহার আর সংসারের কিছু দেখিতে হয় না, অথচ সবই বেশ পরি-পাটিরূপে হয়। সুদেবীকে রত্নমালার খুব খারাপ লাগে না, তবে যেন একটু বেশী গম্ভীর। রত্নমালার ধারণা ছিল পাড়াগাঁয়ে যাহারা থাকে তাহারা একেবারে সভ্যতা জানে না; কিন্তু সুদেবীর ছেলে-মেয়েরা তো বেশ শান্ত শিষ্ট! রত্নমালা ভাবে এবার ছুটিতে দার্জিলিং হিল্লি দিল্লি না গিয়া পাড়াগাঁয়ে গেলে কেমন হয়? পরক্ষণে মনে হয়, না থাক, সেখানে যা ম্যালেরিয়া। তার পর, তার পর যদি অন্য কোন রোগ হয়? থাক গে বাপু, তার চেয়ে পুরীই ভাল, কেমন সমুদ্র দেখিয়াই সময় কাটিয়া যায়।

সুদেবী ম্লানমুখে আসিয়া দাঁড়ায়, "মালা, পানুর বড় জ্বর এসেছে। আজ যদি তুমি একটু রান্না ঘরের দিকে যেতে—"

বেদনায় সুদেবীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

মার্জ্জিত রত্নমালা মুখের উপর বলিবে কেমন করিয়া যে, ছেলেমেয়ের প্রতি অত সোহাগ পরের বাড়ীতে থাকিতে গেলে মানায় না। তাই মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িলেও গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলে, "আচ্ছা যাচ্ছি আমি রান্না-ঘরে, আপনি যান পানুর কাছে।"

সাত দিন কাটিয়া গেল, পানুর জ্বর ছাড়িল না। বুকে পিঠে সর্দি বসিয়া গিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছে যেন এইবার আর নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে না। কাঁদিলেও গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না। মাঝে মাঝে অবুঝ শিশু মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরে, অসহায় শিশুর নীরব আকুতিতে মায়ের প্রাণ বেদনায় গুমরিয়া মরে। নিরুপায় হইয়া সে দুই দিন ডাক্তারের কথা বলিয়াছে। যদিও রত্ন-মালা স্পষ্ট না বলে নাই, তবুও ডাক্তার আসে নাই। আজ আর একবার সে বলিবে, যদি ডাক্তার একটা ওরা আনে।

সজ্জিত ড্রইং রুমে পরেশ আর রত্নমালা বসিয়াছিল। সুদেবী আসিয়া একেবারে কাঁদিয়া পড়িল—"একটা ডাক্তার তোমরা ডেকে দাও, আমি আর ওর এ যন্ত্রণা দেখতে পারছি না।"

পরেশ একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ছি বউদি, ছেলে-পিলের অসুখ অমন একটু আধটু হয়েই থাকে। তা বলে অত অধীর হলে চলে? ক'দিন দেখেই তবে ডাক্তার দেখাতে হয়।"

রত্নমালা স্বামীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "ডাক্তার বোসকে ডাক না কেন, পাশেই তো রয়েছেন। আর—"

সুদেবীর উপস্থিতিতে বাকী কথাটুকু বুদ্ধিমতী রত্নমালা চাপিয়াই গেল।

ডাক্তার আসিলেন সন্ধ্যার পর। পানুর সকল যন্ত্রণার তখন অবসান হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার নাড়ী ধরিয়া গম্ভীর-মুখ গম্ভীরতর করিলেন। তার পর "ফিনিশ" শব্দটি উচ্চারণ করিয়া তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই চলিয়া গেলেন।

সুদেবী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। স্বামীর মৃত্যুর পর যে অশ্রু তাহার ভবিষ্যতের ভাবনায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, ছেলের মৃত্যুতে তাহা একেবারে অজস্র ধারায় গলিয়া পড়িল। তবুও কাঁদিলে তাহার চলে না, আবার সংসারে তাহার ডাক আসে। স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া কার্যভার গ্রহণ করিবার তাগিদ জানায়।

প্রবহমান সময় ক্রমে শোক নাশ করে, তীব্রতা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। অবসর সময়ে সুদেবীর মনে পড়ে অবিনাশের কথা। কথায় কথায় সুদেবীকে উপদেশ দিত, "যত দুঃখই পাও না কেন বড়বউ আত্মহত্যা ক'রো না। ওটা মহাপাপ, ও পাপ থেকে মুক্তি নেই।" ভাবিতে ভাবিতে সুদেবীর হাসি পায়; ভাবে, আত্মহত্যা পাপ আর তোমার মতন আত্মত্যাগ ভাল।"

কিন্তু কেন এমন হয়? সুদেবী ভাবে অবিনাশ তো আর উপার্জন না করিবার মত অযোগ্য ছিল না, তবু সে জীবনযুদ্ধে এমন পরাজিত হইল কেমন করিয়া? ভাগ্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে সুদেবীর যেন কোথায় বাধে। সত্যই কি এই তাহাদের নিয়তি, না এমনই সমাজের ব্যবস্থা যে এখানে কতকগুলি লোকের আধপেটা বা উপবাস ছাড়া আর গতি নাই? সকলেই যদি পেট ভরিয়া খাইবে, লজ্জা নিবারণের মত ভদ্র বেশ পরিবে, তবে আর পরেশের মত সব ভাগ্যবান লোকেরা বাড়ি, গাড়ি করিবে কোথা হইতে? এদের নিশ্চিন্ত নীড়ের প্রতিটি বাঁধুনি কষিয়া বাঁধিয়াছে হয়তো কত হতভাগ্যের উদয়াস্তের শিরদাঁড়া বাঁকানো শ্রম; তার পর তাহারা ভাগ্যের খুঁটিতে ঠেস দিয়া হয়তো নিরুপায়-ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

ময়না আসিয়া বলিল, "মা কাকাবাবু আপিস থেকে এসেছেন জলখাবার দেবে না?"

ত্রস্তে সুদেবী উঠিয়া দাঁড়ায়, "তাই তো-রে, দেরী হয়ে গেল নাকি! চল্ চল্, যাই।"

জলখাবার লইয়া সুদেবী তাড়াতাড়ি খাবার ঘরে আসিল। রত্নমালাও স্বামীর পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সুদেবী খাবার আনিয়া উভয়ের সামনেই রাখিল। রত্নমালা হাসিয়া বলিল, "দিদি আপনার মাথা খারাপ হ[illegible] আমি কি মিষ্টি খাই যে আমাকে এত মিষ্টি দিয়ে ওঁর দিকে নোনতা চালিয়েছেন?"

অপ্রতিভ সুদেবী ডিশটা তাড়াতাড়ি বদলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর পরেশ বলিল, "বৌদি; একটা চাকরি করবে নাকি?"

"চাকরি!" সুদেবী যেন আকাশ হইতে পড়িল। "আমি চাকরি করব? কিন্তু আমাকে কাজ দেবে কে? আর আমার যোগ্যতাই বা কি!"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে! তুমি যা পার তাই করতে হবে। একটি মেয়েদের বোর্ডিং-এ রান্না খাবারের তত্ত্বাবধান করতে হবে। পারবে না?"

"কিন্তু ময়না পল্টু এরা কোথায় থাকবে?" হতাশভাবে সুদেবী বলিল।

—"ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়েই যাবে; তবে সেটা খালি হতে এখনও কিছুদিন দেরি আছে।"

রত্নমালা হাসিয়া বলিল, "দিদিও তাহলে স্বাধীন হলেন দেখছি। প'ড়ে রইলাম আমিই।"

সুদেবীও হাসে, বলে, "হ্যাঁ ভাই, দাঁড়াও, আগে হয়ে নি, তারপর হতাশ হয়ো।"

দিন-কয়েকের মধ্যেই সুদেবীর শরীর বড় খারাপ হইয়া পড়িল। কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে দেহটা যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতে চায়; মনে হয় যেন একটু শুইয়া পড়িলে স্বস্তি হইত। কিন্তু সুদেবীর ভয় হয়। কাজ করিতেছে বলিয়াই এ সংসারে তাহার দুটি শিশু সহ তাহার জায়গা হইয়াছে। তাহার যদি ব্যতিক্রম হয় তবে ইহাদের শিষ্টাচার বজায় থাকিবে কি? প্রাণপণে তাই সে অচল শরীরকেই টানিয়া সচল করে, মুখের পাণ্ডুরতা অকারণ উৎসাহ দিয়া চাপা দিতে চায়।

ময়না দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "মা তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি? শুয়ে পড়েছিলে যে?"

সুদেবী খানিকক্ষণ ময়নার দিকে চাহিয়া থাকে; তার পর আস্তে আস্তে বলে, "না। পল্টু কোথায় রে, তাকে দেখছি না।"

"সে তো ওদিকে খেলা করছে।" ময়না বলে। তার পর মায়ের গায়ে হাত দিয়া বলে, "গা যে তোমার গরম! সত্যি তোমার অসুখ করে নি মা?"

কষ্ট চাপিয়া, হাসিয়া সুদেবী বলে, "না রে আমার অসুখ করে নি। তুই যা ওদিকে—তোর কাকিমা যদি ডাকে?"

ময়না মায়ের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া যায় বিষণ্ণ মুখে। রত্নমালা আসিয়া সুদেবীকে বলিল, "আর কি দিদি, এবার তো চললে আমাদের ছেড়ে।"

"কবে?" সুদেবী কতকটা নির্লিপ্তভাবেই বলে। শরীরের অপটুত্বে আগ্রহ তাহার কমিয়া আসিয়াছে যেন।

"এই তো দু একদিনের মধ্যেই।" রত্নমালা বলে। তার পর রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলে, "আজ এখনও তোমার এত বাকি যে? দেরি হয়ে যাবে দেখছি যেতে। খেয়েই যাব ভেবেছিলাম।"

সুদেবী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ আজ রান্না চড়াতেই দেরি হয়েছে একটু। কই, তুমি তো আগে বল নি কোথাও যাবে ব'লে?"

রত্নমালা একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "আগে ঠিক ছিল না যাবার, এইমাত্র উনি বললেন।"

সুদেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

রত্নমালা একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিল। বিরস মুখে বলিল, "যাব একটু বেড়াতে।" তার পর পরেশের গলার আওয়াজ পাইয়া দ্রুতপদে ওদিকে চলিয়া গেল। সুদেবীও যথারীতি রান্নাঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি রান্না নামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আজ বিকালে সুদেবী যাইবে সেই ছাত্রীনিবাসে তাহার নূতন কর্মভার গ্রহণ করিতে। শরীরটা যেন বেশী অচল বোধ হইতেছে তাহার। তবুও আশ্রয়দাতার যেখানে আশ্রয় দানের অনিচ্ছা সেখানে আর জোর করিয়া থাকা যায় কেমন করিয়া? করুণাপ্রার্থীর কি দাবি থাকিতে পারে কোথাও! সুদেবী নিজের যৎসামান্য জিনিসপত্র বাঁধিয়া তৈরী হইয়া নিল। ময়না পল্টুও যাইবার জন্য তৈরী। পল্টু তো নূতন জায়গায় যাইবার আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

গাড়ি আসিয়াছে। সুদেবী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইল। পরেশ আর রত্নমালাও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে বিদায় দিতে।

হঠাৎ সুদেবী কাশিতে আরম্ভ করে, কাশিতে কাশিতে মুখ দিয়া একটু রক্ত গড়াইয়া পড়ে, বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সুদেবী বসিয়া পড়ে। মিথ্যা সন্দেহ সে করে নাই, অবিনাশের আত্মত্যাগের বীজাণু তাহার শরীরের অণু পরমাণুতেও ছড়াইয়া রহিয়াছে। অবিনাশের কথা সে রাখিয়াছে, আত্মহত্যা সে করে নাই, দু মুঠো অন্নের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন একটু একটু করিয়া সে আত্মত্যাগের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। আবার একবার জোরে কাশির বেগ আসে, নিরুপায়ভাবে সুদেবী আকাশের দিকে তাকায়।

সূর্যাস্তের লোহিত আভায় সাদা মেঘের খণ্ডগুলি তখন আকাশের গায়ে সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে।

# শ্রীনিকেতনে পল্লী-স্বাস্থ্য সংগঠন

(৩)

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

পল্লী-স্বাস্থ্য সংগঠন কার্যে যখনই আমাদের মনে সংশয় জাগিয়াছে, কর্মীরা যখনই বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে, তখনই আমরা উপস্থিত হইয়াছি রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁহার পরামর্শ লাভের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কর্মীদের অন্তরে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন তাহা নহে, কর্মের পথ সম্বন্ধেও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে' অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়। যাদের মনের তেজ আছে, তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।"—উদ্ধৃত বক্তৃতায় এই নির্দেশদান করিয়াছেন যে, গ্রামবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দ্বারাই ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। মন জাগ্রত না হইলে সমষ্টিগত সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। মোহাচ্ছন্ন হতাশ গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। পল্লীসংগঠনের কার্যে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টাকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে। কারণ "রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করিতে পারে না।"

এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই পল্লী সেবা বিভাগের কর্মিগণ স্বাস্থ্য সংগঠনের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। গত কয় বৎসরের প্রচেষ্টার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছি। যেখানে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হইয়াছে, তাহার কারণ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে। সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে আমাদের মনকে সচেতন রাখিবে।

১৯২২ হইতে ২৪ সাল পর্যন্ত এই দুই বৎসর আমরা দাতব্য চিকিৎসার পন্থা অনুসরণ করিয়া একটি বড় অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম যে ম্যালেরিয়ার গতিরোধ করার পক্ষে এই প্রণালী উপযোগী নহে।

আমাদের দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দাতা ও গ্রহিতার মনোভাব থাকায় তাহা গ্রামবাসীদের সমবায় প্রথায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। দাতব্য চিকিৎসার দ্বারা গ্রামবাসীদের উপকার সাধিত হইয়াছে, কিন্তু নিজেদের সমবেত চেষ্টায় কোন একটা সংগঠন গড়িয়া তোলার চেষ্টা ও শক্তি তাহারা পায় নাই।

উক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এই নীতি অবলম্বন করিলাম যে ডাক্তারখানার চাপে গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্যোন্নতি কাজে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। একজন সুযোগ্য মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত প্র্যাকটীশ, অনুমোদন করা হইল। তাহার ফলে সমিতির বাহিরের গ্রামে তাহার প্র্যাকটীশ যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, সমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে ততই মনোযোগ কমিয়া আসিল। তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ অনুযায়ী ডাক্তারের ব্যক্তিগত প্র্যাকটীশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে কর্মের পথে নানাপ্রকারের ভুল এবং বাধার ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিকল্পনারও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

**অরুণা-অমিতা ফন্ড**

আমরা এই সর্ত করিলাম যে গ্রামের সমিতির সভ্য হইয়া যাহারা স্বাস্থ্যোন্নতির কার্যে সাহায্য করিবে তাহারাই ডাক্তারখানা হইতে সস্তায় চিকিৎসার সুবিধা পাইবে।

নগদ অর্থ দ্বারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলে, কায়িক শ্রমের দ্বারাও চাঁদা দিতে পারিবে বলিয়া স্থির করা হইল।

কিন্তু যাহারা অক্ষম, নিরাশ্রয় বা বিধবা তাহাদের চিকিৎসার কোনও উপায় রহিল না। ডাক্তার গ্রামে গেলে সমিতির সভ্যদের অনুরোধে হয়ত বিনা দর্শনীতে তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন, কিন্তু ঔষধের মূল্য এবং পথ্যের ব্যয় তাহাদের জুটিত না। যখন আমরা এই শ্রেণীর লোকের চিকিৎসার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম, সেই সময় সাবোরের অধ্যাপক শিশিরকুমার বসু মহাশয় শ্রীনিকেতনের কর্তৃপক্ষের হস্তে দশ হাজার টাকা দান করেন। উহা তাঁহার পরলোকগতা দুই কন্যার নামে অরুণা-অমিতা তহবিল নামে অভিহিত হয়। দাতার ইচ্ছা এই যে যাহারা দরিদ্র হইলেও, আত্মসম্মান বশতঃ চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানায় নিজেরা উপস্থিত হইতে পারে না—সেই সকল গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রোগীগণের এই সাহায্য ভাণ্ডারের উপর প্রথম দাবী থাকিবে। অপরাপর শ্রেণীর নিরাশ্রয়দিগের সাহায্য দানেও কোনও বাধা নাই।

১৯২৭ সালে এই ধন ভাণ্ডারের আয় হইতে একজন পুরুষ সেবক (নার্স) নিযুক্ত করা হয়। এবং উহা হইতে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় রোগীদিগের পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, কলেরা ইত্যাদি রোগে আত্মীয়স্বজনগণ ভালরূপে সেবা করিতে জানে না। এই নার্সের কর্তব্য স্থির করিয়া দেওয়া হয় যে এই সকল কঠিন রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিজে সেবা করিয়া পরিবারের মহিলাগণকে এবং তাহাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশীনিদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে কিভাবে রোগীকে নার্স করিতে হয়।

এই ব্যবস্থার দ্বারা আমরা দেখিয়াছি অসুখের সময় রোগীর গৃহে গিয়া হাতে কলমে সেবা করিয়া দেখান শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়।

বর্তমানে এই সেবক প্রতি মাসে গড়ে ২৫টি গ্রামে ঘুরিয়া কঠিন রোগীদের সেবা করিয়া থাকেন।

# পিঁড় কাঁহা

( গল্প )

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

শেষ বসন্তের বিদায় লিপি ঝরা পাতায় পাতায় জানাইয়া গেল। গোধূলীর আকাশের প্রান্ত ঘেঁষিয়া একটুকরা মেঘ দেখা দিয়াছে বুঝি!......কাল পরশু সন্ধ্যার দিকে একটু একটু ঝড় দেখা দিয়াছিল, আজিও হয়ত তেমনি ঝড় উঠিবে? তা উঠুক!.........

দামোদরের জল শুকাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বালুস্তর জাগিয়া উঠিয়াছে! ঐ দূরে ক্ষীণ জল রেখা বিস্তৃত বালুস্তরের প্রান্ত ঘেঁষিয়া কালো সাড়ির চওড়া পাড়ের মতই প্রতীয়মান হয়।

অথচ বর্ষায় এই দামোদরই নাকি হইয়া উঠে প্রবল! তখন কী তার সে রুদ্র মূর্ত্তি!.........অশান্ত, উন্দাম!......... ঢেউয়ে ঢেউয়ে কী তার সে বাঁধন-হারা অপূর্ব্ব উল্লাস!......

বেলা পড়িবার সাথে সাথে আশে পাশের গৃহস্থ বধূরা কলসী কাঁখে নদীর ঘাটে জল ভরিতে আসে।.........

তারপর একসময় ধীরে ধীরে প্রথমে ওপাড়ে এবং ক্রমে শুকাইয়া ওঠা দামোদরের বুকে ও এপারে সাঁঝের ধূসর ছায়া ঘনাইয়া অসে!

নদীতীরের প্রকান্ড ঝাকড়া তেঁতুল গাছটার পাতায় পাতায় সারাটা রাত ধরিয়া সে কি করুণ একঘেঁয়ে সোঁ সোঁ সিপ্ সিপ্ শব্দ! মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখীদের ডানা ঝাপ্টানর অস্পষ্ট শব্দ!

আজ প্রায় দুই মাসের উপর এই জায়গায় সরকারের নজরবন্দী হইয়া আছি।

প্রথম প্রথম দেহের প্রতি রক্তবিন্দু এই বন্দী জীবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জিয়া উঠিত!.........

কিন্তু কোথায় আজ সেই বাঁধন ছিঁড়িবার উল্লাসের উন্দামতা? আজ শুধু থাকিয়া থাকিয়া কিসের এক দুর্দ্দমনীয় বেদনা বুকের মাঝে হাহাকার জাগাইয়া তোলে।

নজরবন্দী অবস্থায় একে একে কত জায়গাইত ঘুরিলাম! প্রথম প্রথম পাহারার সে কি কড়াক্কড়ি! ক্রমে সবই যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। হয়ত বা যে দুরারোগ্য ব্যাধি আজ তিল তিল করিয়া আমার জীবনের সকল কিছু শুষিয়া লইতেছে তাহারই হাতে আজ উহারা আমায় সঁপিয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চাহে!

দামোদরের কোল ঘেঁসিয়া ছোট একখানি টিনের ঘর অল্প দূরেই থানা।

নিজ হাতেই রান্না করিয়া খাই!

রাত্রে বাইরের বারান্দায় একজন বুড়ো মত কনেষ্টবল শুইয়া থাকে!

দারোগা লোকটি নেহাৎ মন্দ নন; মাঝে মাঝে আসিয়া দেখাশুনা করিয়া যান।

কত দিন আজ বাড়ী ছাড়া।

তা কম করিয়া প্রায় বৎসর আষ্টেকত' হইবেই।

পিছন পানে টানিবার মত, একমাত্র মায়ের সজল করুণ আঁখি দুটি!.......

যদিচ মরণের দুয়ারে একটী পা বাড়াইয়া দিয়া পিছন-পানে ফিরিয়া তাকাইতে আর তেমন ইচ্ছাই যায় না, তথাপি শুধু ভুলিতে পারি না মায়ের আমার সেই করুণ আঁখি দুটি!.........

একাকীত্বের সুকঠিন মৌনতায় এখনও মাঝে মাঝে সেই অদৃশ্য মায়া বন্ধন বুকের মাঝে মোচড় দিয়া উঠে। চোখের কোল দুটি বুঝি অজ্ঞাতেই ঝাপ্সা হইয়া যায়! আজিও সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকাইয়া আনমনে বুঝি সেই আঁখি দুটিই ভাবিতেছিলাম, সহসা এমন সময় একটা পুরাতন পোষ্টকার্ড পায়ের উপর আসিয়া হাওয়ায় উড়িয়া পড়িল।

অন্যমনস্কভাবে কাগজটা নীচু হইয়া তুলিয়া লইলাম।

অস্পষ্ট আলোকে চোখে পড়িল কয়েকটা লাইন, কাঁচা হাতের গোটা গোটা আঁকা বাঁকা অক্ষরে কয়েকটি কথা লেখা।

শ্রীচরণেষু!

তুমি ফিরে এসো। আমি তোমার জন্য কাঁদি। আমি কাঁদি তবু শোন না কেন? আর ঘুমাই না। ফিরে এসো। শ্রীচরণের দাসী শৈল।

ঠিকানা—রতনচন্দ্র দাস। কলিকাতা।

হয়ত কোন বিরহ বিধুরা স্বামীর কাছে পত্র দিয়াছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে দুটি সজল আঁখির দৃষ্টি চোখের কোলে ভাসিয়া উঠে।......

বহুদূর হইতে যেন অস্পষ্ট ডাক কানে ভাসিয়া আসে, ফিরে এসো। ওগো ফিরে এসো।.........

স্বামীকে ঘরে ফিরিবার জন্য পত্র দিয়া হয়ত আজিও সে প্রতিদিন নদী কিনারায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে।.........

গভীর রাতে হয়ত ঘুম ভাঙ্গিয়া কান পাতিয়া স্বামীর পায়ের শব্দ শুনিবার জন্য পায়ে পায়ে দুয়ার খুলিয়া জ্যোৎস্নালোকিত আঙ্গিনার উপরে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘরের বধূ মুখ ফুটিয়া হয়ত কিছুই বলিতে পারে না। হৃদয়ের অশ্রুঝরা নীরব কাঁকুতী হৃদয় কোণেই কাঁদিয়া মরে।.........

ওগো ফিরে এসো। তুমি ফিরে এসো।———

ক' বছরই বা বয়স?

এইত' সবে বারো পার হইয়া তেরোর পা দিয়াছে।

তা ঘর বর যখন ভালই। আর রতনকে নাকি হারুর চোখেও ধরিয়াছে খুব।

বছর আঠার কুড়ি বয়স হইবে। বলিষ্ঠ উঁচু লম্বা পেশল উন্নত চেহারা।

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

বাড়ীর অবস্থাও বেশ ভালই বলিতে হইবে।

সংসারে দুটী মাত্রই ভাই, পরাণ ও রতন।.........

বছর দুই হয় পরাণের স্ত্রী সীমা মারা গিয়াছে। বাড়ীতে একজন বৌ ঝিয়েরও দরকার।........

জমি জমা বেশ কিছু আছে; পরাণ নিজে জমিদারী সেরেস্তায় কী একটা কাজ করে।

রতন কিছুই করে না।........

দিবা রাত্র বাঁশী নিয়া হয়ত নদীর ধারে না হয় মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আজকাল আবার দলের কয়েকজন মিলিয়া একটা 'যাত্রা পার্টী' খুলিয়াছে।

ইচ্ছা আছে সামনের পূজায় নাকি প্রহ্লাদ চরিত্র পালা গান হইবে।

প্রধান ভূমিকায় নামিয়াছে রতন নিজে স্বয়ং।

শৈলর দিদি সরলা বছর দুই হইল বিধবা হইয়া পিতার কাছেই আসিয়া রহিয়াছে।

সরলা কহিল, শৈলীর এর মধ্যেই বিয়ে দেবে বাবা?...... এইত' বয়েস, এখনো আমায় জড়িয়ে না শুলে ঘুমই হয় না।

হারু কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, বয়সটা কিছুই নয় মা।.........ও দুদিনেই হু হু করে বেড়ে যায়।.........ও তুই দেখে নিস সব ঠিক হয়ে যাবে।

গভীর রাত্রে দিদির কোলের কাছটিতে সরিয়া আসিয়া শৈল দিদির গলা জড়াইয়া ধরে।

গভীর স্নেহে শৈলর এক মাথা ঝাক্‌ড়া চুলের মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে কহে, আর দু'দিন বাদে দিদিকে কোথায় পাবি রে?.........

দিদির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শৈল জবাব দেয়, হুঁ।.........বিয়ে করছে কে?......বিয়ে করতে আসলে কাম্‌ড়ে দেব না।.........

সরলা হাসিয়া ফেলে, কামড়ে দিবি কিরে? .........বিয়ে যে সবাইকেই করতে হয়।.........বিয়ে না করলে কি চলবে?

শৈল কিন্তু প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে থাকে, বিয়ে আমি করবো না; কিছুতেই না।.........

সরলার স্বামী কুলদা কোন এক পাটের গুদামে মাল বাবুর কাজ করিত, বিবাহের পর সরলা তাহার কাছ হইতে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল। কোনমতে পত্র লেখার কাজটা চালাইতে পারিত।.........একদিন সরলা শৈলকে সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, লেখা পড়াত' তুই কিছুতেই শিখ্‌লিনে শৈ।......দূরে গেলে আমরা কেমন আছি জানবি কি করে?.........

শৈল ঘাড়টা বাঁকাইয়া জবাব দিল, দূরে গেলে ত'।......

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শৈলর সকল বাধা বিপত্তি কিছুই টিকে না।.........

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নেই হইয়া যায়।

ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।........

শৈল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে ওদের সঙ্গে কিছুতেই সে যাইবে না।........

সানাইয়ের ক্লান্ত সুর বিদায় ব্যথায় বুঝি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে।

সরলা রতনকে নির্জ্জনে একটি পাশে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, বড় ছেলেমানুষ ও। বেশী বকা ঝকা করো না।...... আর একটু ঘুম কাতুরে।.........

রতন মৃদু হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া সায় দিল।........

ফুলশয্যার রাত্রি।.........

হোগলার ফাঁকে ফাঁকে রাতের চোরা হাওয়া আসিয়া ঘরের প্রদীপ শিখাটি কাঁপাইয়া যায়।

শয্যার এক পাশে গুটি সুটি দিয়া শৈল অকাতরে ঘুমাইতেছে।.........

মুখের উপর হইতে কখন হয়ত একসময় ঘোমটাখানি সরিয়া গিয়াছে; চন্দন চর্চ্চিত ঘুমন্ত মুখখানি বেড়িয়া প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো যেন মায়া স্বপ্ন রচিয়াছে।

গলায় ও সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা।.........

ঘরের বাতাস তারি গন্ধে মাতাল হইয়া ফিরে।.........

রতন কানের কাছে মুখ নিয়া ডাক দেয়, বৌ।......... অ বৌ।.........

সন্ধ্যার অন্ধকারে হয়ত প্রদীপ জ্বালাইয়া শৈল এঘর ওঘর করিতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া আচম্‌কা শৈলর পশ্চাৎ হইতে রতন 'হুম' করিয়া ওঠে।.........

শৈল ভয় পাইয়া একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া ওঠে। হাতের প্রদীপ মাটীতে পড়িয়া নিভিয়া যায়।.........

রতন তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া ভীত কম্পিত শৈলকে বুকের মাঝে টানিয়া লয়, খুব ভয়পেয়েছিলি ত'?

শৈল স্বামীর বুকের মাঝে তখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।.........

রতন হা হা করিয়া হাসিতে থাকে।.........

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে কি আর রক্ষা নাই, শৈলর দু চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিয়া থামিয়া যায়।

রতন দু একবার ডাক দেয়, এই! ঘুমালে!.........এই!

শৈল তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।.........

রতন ঘুমন্ত শৈলকে বেশ করিয়া ঝাঁকাইয়া দেয়।

কী ঘুম। আর ঘুম।.........এর মধ্যেই ঘুম কি?......

এক এক দিন রতনের অভিমানটা একটু বেশীই হয়।

চালের বাতা হইতে বাঁশীটা টানিয়া লইয়া অন্ধকারে বারান্দায় গিয়া বসে।.........

বাঁশীর সুর রাত্রির নিঃসঙ্গ মৌনতায় দূরে দূরে বহুদূরে ভাসিয়া যায়।.........

কিন্তু শৈলর ঘুম ভাঙ্গে না।.........

মাঝে মাঝে দিদির পত্র আসে। রতন পড়িয়া শোনায়। শৈলর চোখের কোল দুটি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।......

যে রতনের একটি মুহূর্তের জন্য টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না, সেই রতনই আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীর মধ্যেই থাকে।

সঙ্গী সাথীরা ডাকিয়া ডাকিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায়।...

একদিন রতন মেলা দেখিতে গিয়া এক পয়সা দিয়া একটা মুখোস কিনিয়া, সেটা মুখে আঁটিয়া চুপি চুপি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।.........

শৈল রান্নাঘরে কী কাজ করিতেছিল, রতন দরজায় গিয়া উঁকি দিতেই, শৈল 'বাবাগো', করিয়া এক চীৎকার দিয়া উঠিল। পরান সবে মাত্র কাজ হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। কি? কী হলো বৌমা.........এক লাফ দিয়া পরান রান্না ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিল।

শৈলকে ততক্ষণে রতন দু'হাতে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়াছে।.........

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পরান সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।.........

একদিনের জন্য শৈল বাপের বাড়ী গিয়াছিল।.........

গভীর রাত্রে একাকী নাও বাহিয়া রতন শ্বশুরালয়ে গিয়া হাজির।.........

শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সরলা তখনও ঘুমায় নাই।

রতন দরজার গায়ে আস্তে আস্তে টোকা দিল।

কে? ঘরের ভিতর হইতে সরলা প্রশ্ন করিল।

দিদি। আমি রতন।.........

এত রাত্রে রতন।......সরলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই রতনের লজ্জানত মুখখানির দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; এস ভাই।.........

.........পরের দিন পরান কাজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছে, এমন সময় রতনের পিছু পিছু শৈলকে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শুধাইল, এ কি বৌমা!.........

রতন তাড়াতাড়ি দাদার চোখের সম্মুখ হইতে আপনাকে সরাইবার জন্য ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল।............

পরান একদিন রতনকে ডাকিয়া কহিল, এমনি করে বসে থাকলে আর চলে না রতন।.........হয় একটা কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ; না হয় জমি জমা গুলো দেখা শুনা কর।......... আমার বয়স ত' কম হলো না।.........শরীরে যেন আর আগের মত যুত পাই না।.........

কিন্তু রতন দাদার কথাটা আদপেই গায়ে মাখিল না।...

আবার একদিন পরান রতনকে কহিল। এবারেও রতন কথাটায় কান দিল না।

সত্যই ইদানীং পরানের শরীরটা যেন ক্রমে ভাঙিয়া আসিতেছে।.........

শেষটায় পরান একদিন শৈলকে কথাটা বলিল।......... সেদিন রাত্রে শৈল রতনকে কহিল, সত্যি তুমি কাজ কর্ম্ম একটা দেখলে পার।.........বড় ঠাকুরের বয়স হয়েছে।.........

রতন কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল।......চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইলিশপুরের কাছারীতে একটা কাজ খালি হইয়াছিল, পরান জোর করিয়াই নায়েব বাবুকে ধরিয়া কহিয়া রতনকে সেই কাজে লাগাইয়া দিয়া আসিল। কিন্তু তিন দিনের দিন রতন কাহাকে না বলিয়াই পলাইয়া আসিল।

পরান শুধাইল, হঠাৎ বাড়ী চলে এলে যে, নূতন কাজ ছেড়ে দিল তারা?.........

রতন উদাসভাবে কহিল, কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম।

সে কি?.........

হাঁ। ও কাজটাজ আমার ভাল লাগে না।.........

পরান গম্ভীর হইয়া গেল। আজ সত্য সত্যই সে ভাইয়ের উপর চটিয়াছিল তীব্র কঠোর কণ্ঠে কহিল, লজ্জা করে না, বুড়ো মিনসে দাদার ঘাড়ে বসে খাস।.........বউ নিয়ে ফুর্ত্তী করলেই দিন যাবে ভাবিস? যা। আমার সামন হতে দূর হয়ে যা।.........

সেদিন জলস্পর্শ পর্য্যন্ত না করিয়াই পরান কাজে চলিয়া গেল।

সারাটা সকাল ও দুপুর আড্ডা দিয়া রতন সন্ধ্যার পরে গৃহে ফিরিল।.........

শৈল রান্নাঘরে বসিয়া রাত্রের তরকারী কুটিতেছিল।

রতন পিছন হইতে চুপি চুপি আসিয়া শৈলর চোখ দুটো চাপিয়া ধরিল।.........

শৈল একটান দিয়া স্বামীর হাত সরাইয়া দিল।

রতন একটু বিস্মিত হইয়া শুধাইল, কী হলো গো?.....

ছিঃ! লজ্জা করে না; এমনি করে বসে বসে দাদার ঘাড়ে চেপে খেতে। তুমি পুরুষ মানুষ নও।.........

সহসা যেন তীব্র কষাঘাতে রতনের সমস্ত পুরুষ চিত্ত অসাড় হইয়া যায়। সে তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইল।

কেন? কেন তুমি এমনি করে ঘরে বসে থাক?.........

অভিমানে শৈলর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল।

রতন বারেক মাত্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া ধীর পদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।.........

.........ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়িতে থাকে; কিন্তু রতনের দেখা নাই।

পরান একবার ঘর একবার বার করে, আর ব্যাকুলভাবে ডাকে, রতন এলি?.........বৌমা রতন এল!.........

ঘরের মধ্যে ভাত ঢাকিয়া শৈল বসিয়া থাকে, সামান্য একটু শব্দ পাইলেই সচকিতা হইয়া ওঠে।......ঐ বুঝি রতন আসে।

রাত কাটিয়া ভোর হইল, কিন্তু রতন ফিরিল না। চিন্তিত পরানের আর সেদিন কাজে যাওয়া হইল না। সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় রতনের আড্ডায় আড্ডায় কোথাও আর সে খুঁজিতে বাকী রাখে না। কিন্তু কোথায় রতন।.........

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে একটি একটি দিন করিয়া দুটো মাস চলিয়া গেল; কিন্তু সেই যে রতন গেল আর ফিরিয়া আসিল না।.........

পরান খবরের কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিল।.....

শৈলর আর এখানে একদণ্ড থাকিতে ইচ্ছা যায় না।.....

সাঁঝের আঁধারে চারিদিক যখন অস্পষ্ট হইয়া যায়, মনে হয় এই বুঝি কোথা হইতে চুপি চুপি আসিয়া ঝুপ করিয়া রতন তাহাকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিবে।

শৈলর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।.........

গভীর রাত্রে পত্র মর্ম্মর ওর দু'কান ভরিয়া রতনের পায়ের শব্দ ভাসাইয়া আনে।.........

বেত বনের পাতায় পাতায় যেন বাতাসে শব্দ জাগে, বৌ! বৌ! বৌ!.........

পরান শৈলকে সান্ত্বনা দেয়, তুমি দেখে নিও বৌমা, সে আসবেই; আরে আসবে না ত' যাবে কোথায়?.........ভাইয়ের আমার অভিমান হয়েছে।.........কিন্তু রতনের সে অভিমান বুঝি ভাঙ্গে না।.........

...... ...... ......

জ্যোৎস্না রাত্রে শৈল আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়......... মনে হয় কে বুঝি সদর দুয়ারে তার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছে।.........তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেয়। কিন্তু কোথায় কে? অদূরে কদম গাছের ডালে বসিয়া পাখীটা ডাকিয়া ওঠে, পি'উ কাঁহা! পি'উ কাঁহা?

একটা দীর্ঘশ্বাস শৈলর বুক খানা কাঁপাইয়া বাহির হইয়া আসে। ওগো! এসো! ফিরে এসো।......আর তোমায় আমি কোথাও কোনদিন যেতে বলব না।.........এবারের মত ফিরে এসো।.........

পরানের চিঠি পাইয়া হারু ও সরলা শৈলকে লইতে আসিল, তাহারা কহিল, চল। আমাদের ওখানে গিয়ে দুটো দিন থেকে আসবি চ।.........

শৈল ঘাড় নাড়ে, না। আমার ত যাওয়া হবে না। হয়ত সে এসে আমায় না দেখে ফিরে যাবে।.........

সেদিন রাত্রে শৈল সরলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহে, আমায় লিখতে শিখাবি দিদি।.........

অনেক দিন আগেকার আর একটা রাত্রের কথা সরলার মনে পড়ে.....সেদিন শৈল কহিয়াছিল। চাইনে আমি লেখা পড়া শিখতে। আর আজ?.........

শৈল নিজেই পাড়ার একটি ছেলেকে ধরিয়া হাট হইতে কাগজ পেনসিল ও বই কিনাইয়া আনিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া লেখা অভ্যাস সুরু করিয়া দিল।.........

ধরিয়া ধরিয়া কোন মতে এখন শৈল অক্ষরগুলি সাজাইতে পারে।.........

একজনকে ধরিয়া একটা কার্ড আনাইয়া শৈল কোনমতে অতি কষ্টে গোটা কত কথা লিখিল।.........তারপর রতনের নাম লিখিয়া, কলিকাতা লিখিয়া একটি ছেলের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

সে মাঝে মাঝে শুনিত, রতন কোথায় আর যাবে, কলকাতাতেই হয়ত কোথাও আছে।.........

একদিন দু'দিন করিয়া একটির পর একটি দিন যায় আর শৈল চিঠির প্রত্যুত্তরের আশায় ব্যাকুল হইয়া ওঠে।.........

পিওন আসিলেই সে দরজার গোড়ায় ছুটিয়া যায়, নকুলদা আমাদের কোন চিঠি নেই।

কোন দিন হয়ত নকুল কহে কই বৌদি, নাই ত তোমাদের চিঠি; আবার কোন দিন শৈলর আগ্রহপূর্ণ মুখখানির দিকে তাকাইয়া মনের মাঝে কেমন জানি একটা দুর্ব্বলতা আসে। বার কয়েক হাতের চিঠিগুলি নাড়া চাড়া করিয়া শেষটায় যেন কতকটা হতাশার সুরেই কহে, না দিদি পেলাম না ত।.....

একবার ভাল করে ব্যাগটা খুজে দেখ না নকুলদা, করুণ স্বরে শৈল অনুরোধ জানায়।.........

শৈলর অনুরোধে নকুল ব্যাগটাও একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে।

শৈল নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়, হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত আছেন,—চিঠি দেবার সময় করে উঠ্‌তে পারেন না। কোন সময় হয়ত আবার দারুণ অভিমানে চোখের কোল দুটো ভিজিয়া ওঠে;.........আচ্ছা আসুক না এবার। বলব না ত' —না কিছুতেই কথা বলব না। হাজার ডাকলেও না। ও এমনি কাজ যে ভুলেও একটিবার মনে করতে পর্য্যন্ত নেই।.........

.........ঘুমের মধ্যেই শৈল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে।

কান্নার শব্দে পরানেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ধীরে ধীরে আসিয়া শৈলর শিয়রের কাছটিতে দাঁড়ায়।

আবার কখনো হয়ত আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া কহে না বলব না কথা।.........না কিছুতেই বলবো না ত।......... উঃ বাবুর এত দিন পরে আসা হলো।.........

পরানের দুই চোখের কোল বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

ঘুমের মধ্যেই শৈল আপন মনেই তখনও বিড় বিড় করিয়া বকিয়া চলে, ওগো ফিরে এসো......ফিরে এসো।.....

......পরান আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসে।

দু'কান ভরিয়া তখনও তাহার বাজিতে থাকে নীরব সেই কাকুতি.........ওগো ফিরে এসো। ফিরে এসো।......নিশুপ্ত রাত্রির ভাষাহীন মৌনতায়, রাতের হাওয়ায় সর্ব্বত্রই যেন সেই এক সুর ফিরে এসো। ওগো ফিরে এসো।.........

# "নবজাতক" *

**শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

'নবজাতক' রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার সংগ্রহ, তাঁহার অশীতিতম জন্মোৎসবের দিন এ বই প্রকাশিত হয়েছে। 'সূচনায়' কবিগুরু জানিয়েছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁর কাব্যের নতুন এক ঋতুপরিবর্ত্তনের ফুলের মধু-সংগ্রহ। "এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়ত প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।"

এদের মধুতে তাই 'বিগলিত মাধুর্য্য' বা রাঙা 'রঙের আবেদন' নেই। কোনো কোন পাহাড়ি মধুর মত ঘনত্ব ও শুভ্রতাই এদের বৈশিষ্ট্য, হয়ত বা 'একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস' থাকতে পারে।

বয়সের অঙ্কে কবি আজ অশীতি বর্ষে প্রবেশ করলেন। জীবনের নিগূঢ় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় ক্রমপরিণতির যে দীর্ঘ পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন তাতে তাঁর কেশের ও মনের শুভ্রতা কাব্যেও চিহ্ন এঁকে দেবে বৈ কি। এই ত কাব্য-প্রেরণার পরিণতির জীবন্ত লক্ষণ। তাঁর কবি-জীবনের দীর্ঘ-কালব্যাপী সিন্ধু-মন্থনের ফলে এতদিন কেবল অমৃতরসই উৎসারিত হয়েছে ; আজ সেই মন্থনের চরমতম মুহূর্ত্তের উত্থিত প্রসাদে যদি কবির আজীবন সঞ্চিত 'মর্ম্মভেদিনী বেদনা'র রস-রিক্ত তিক্ততার কিছু আভাস থাকে তার জন্য সে কাব্যের বিশিষ্ট আকর্ষণ দেশবাসীর কাছে তিলমাত্র কম হবে না। সৃষ্টির সুবিপুল রঙ্গভূমিতে 'রূপ-বিলুপের' চির দ্বন্দ্বশীল নৃত্য চলেছে নিত্যকাল ধরে। 'যা পরুষ যা নিষ্ঠুর উৎকট' সেই 'বিরূপের', সেই রুদ্র-সঙ্গীতের 'রূঢ় পৌরুষ' ছন্দ কবির কাব্যকে আজ যে অভিনব ঐশ্বর্য্য দান করেছে সৃষ্টি-বিমুখ 'বাণী-বিলাসী'দের প্রাচীন কানে তা যতই অপ্রিয় ঠেকুক না কেন নতুন যুগের পাঠকের সজীব প্রাণকে সে ছন্দ জীবনের সমগ্রতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। 'রোম্যাণ্টিক্' 'বাস্তব' ইত্যাদি খণ্ডিত কাব্য-সংজ্ঞার সঙ্কীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করে, 'সুন্দর' ও ভৈরবে'র চির মিলন ক্ষেত্র যে অখণ্ড জীবনে কবি আজ তারি সম্মুখীন হয়েছেন পূর্ণতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

দর্পিত মানব সভ্যতার ঈর্ষা দ্বেষ জর্জ্জরিত যে হিংস্র বিভীষিকা, বিশ্বমানবতার যে দুর্ব্বিষহ অসম্মানের বিশ্ব-জোড়া গ্লানি কবির জীবনের গোধূলী-ধূসর লগ্নকে আরো ধূসর করেছে তার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বুদ্ধভক্তি', 'ভূমিকম্প', 'পক্ষী মানব' প্রভৃতি কবিতায় কখনো রূঢ় পরুষ ছন্দে, কখনো বেদনা-গম্ভীর নির্ঘোষে। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কবি তার কারণও নির্দ্দেশ করেছেন ঃ

> "যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
> সৌম্য তাহার কল্যাণরূপে বিশ্বজয়ী।"

আজ সে শক্তি ঃ

> "নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
> তাই সে এমন হিংস্রতা।" (ভূমিকম্প)

তবু ক্ষোভ করলে বা নিরাশ হলে চলবে না ঃ

> "সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
> একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।"

* * *

> "ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
> পূর্ণ করিয়া শেষে
> নূতন জীবন নূতন আলোকে
> জাগিবে নূতন দেশে।" ('প্রায়শ্চিত্ত')

সেই নবযুগ প্রভাতের, নব সৃষ্টির কবিকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করে তাই কবি 'নবজাতকে'র 'উদ্বোধন' করেছেন '

> "জাগো সকলের সাথে
> আজি এ সুপ্রভাতে
> বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান—
> তোমার জীবনে সার্থক হোক
> নিখিলের আহ্বান।" ('উদ্বোধন')

কিন্তু এই মানসিক বিক্ষোভের পারে দীর্ঘজীবন-সাধন-লব্ধ যে প্রশান্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে কবির অন্তরের অন্তস্তলে তার প্রতিধ্বনি পাই 'নবজাতকে'র 'শেষদৃষ্টি', 'শেষ হিসাব', 'মংপু পাহাড়ে', 'জয়ধ্বনি', 'শেষবেলা', 'শেষ-কথা' প্রভৃতি কবিতায়। 'কেন', 'ভাগ্যরাজ্য', 'প্রশ্ন', 'জন্মদিন' প্রভৃতি অন্তর্ম্মুখী কবিতাগুলিতে জীবনের প্রদোষ-লগ্নের যে চরম প্রশ্ন কবির মনে জেগেছে তার শেষ মীমাংসা কবির কাছে আশা করা চলে না, কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের পারের এক 'চরম আলোকে'র অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তি ঝলসিত হয়েছে পূর্ব্বোক্ত কবিতাগুলিতে। বিদায়ের বেদনা বোধে এই কবিতাগুলির সুর যে গভীরতা লাভ করেছে, তুচ্ছ কোনো অভিযোগে বা বিষাদের ব্যর্থতায় কোথাও ক্ষণেকের জন্যও তার তালভঙ্গ হয়নি।

'পূরবী'তে বিদায়ের যে সুনিশ্চিত সুর প্রথম বেজেছিল কবির কাব্যজীবনে তা বিষাদে করুণ, পাঠকের হৃদয়কে সে-সুর ব্যথায় অভিভূত করে। 'প্রান্তিকে' মৃত্যুপারের আলোকের নিগূঢ় উপলব্ধির ফলে সেই সুর এক অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। 'সেঁজুতি' এবং 'নবজাতকে'র অধিকাংশ বিদায়ের কবিতাতেই এখন দেখি একনিরাসক্ত প্রস্তুতির স্তব্ধ আয়োজন ঃ—

> "এ ঘরে ফুরাল খেলা
> এল দ্বার রুধিবার বেলা।" ('শেষ কথা')

আজ তাই এই 'শেষ বেলায়'—

"সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।" কবির প্রাণ কিন্তু তা' বলে বিকারগ্রস্ত বৈরাগ্যে নিরস হয়ে ওঠে নি। রসের ধারা সেখানে আজ অন্তঃসলীলা ঃ

> "জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
> বাহিরে প্রকাশ তার নহে।" ('শেষ বেলা')

'গোধূলীর ধূসরতা'য় বাইরে দীপ নিভে আসছে, এখন 'অন্তরে দেখা যায় আলো'। সেই ধ্যানের আলোকে কবি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ঃ

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ; ২১০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

"এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারাণোটা ত নহে তার তুল্য।" (স্ফুলিঙ্গ পাহাড়ে)

জীবন-সাধক ইংরাজ কবি ব্রাউনিঙ একদিন তাঁর পরিণত বয়সের যে গভীর অনুভূতির আবেগে পাঠকদের বৃদ্ধ হতে আহ্বান করেছিলেন জীবনের পূর্ণতার ছবি দেখার জন্যে আজ আমাদের কবির প্রাণে সেই অনুভূতিই যেন আরো গভীর হয়ে জেগেছে। সুদীর্ঘ জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্ত প্রশ্ন, সমস্ত খণ্ডতার অন্তরালের দুর্নিরীক্ষ্য সত্যকে, চিরপূর্ণকে, জীবনের সেই অন্তরতরকে আজ অশীতিতম বর্ষের 'দেহলী দুয়ারে' দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর গভীর অন্তদৃষ্টিতে দেখেছেন ঃ

"ক্ষণিক মুহূর্ত্তে তরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে।"

কারণ সীমাঘেরা খণ্ডিত এই জীবনের—

"কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই
মনে মনে ভাবি তাই
বিচ্ছেদের দূর দিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবি রশ্মির রেখায়।"

'নবজাতকে'র এই হল 'শেষ-কথা', কিন্তু এই কথার শেষে বেদনামধুর যে ব্যঞ্জনাটুকু আছে কবির বর্ত্তমান চিত্তকে বুঝতে হলে সেটুকুও পাঠকদের হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে নইলে শেষ কথা শোনা তাঁদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ঃ

"জানি না বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া॥
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।"
('শেষ কথা')

দুর্ব্বল হৃদয়ের সংশয়জাত প্রশ্ন একে মনে করলে ভুল করা হবে; ইহজীবনের খণ্ড-লীলার 'শেষ পরিচয় লগ্নে' কবি তাঁর অন্তরের 'অন্তরতর' 'শিল্পী কবি'র চির-অশেষ লীলার প্রতিই অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করতে চেয়েছেন। এই ইঙ্গিতের বেশী কবির কাছে আশা করা মূঢ়তা হবে কারণ কবি কবিই, তত্ত্বদর্শী নন।

# লক্ষ যুগের সাধনার পরে

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

ভাঙাহাট যেথা ভাঙে আর গড়ে—বন্দরে ভাঙে ঢেউ,
লতায় লতায় ফুল ভেঙে পড়ে, মন্দিরে নাই কেউ!
অবমানিতের নীরব বেদনা
এইখানে হ'ল হারা,
দেবতাবিহীন মন্দিরখানা
নির্ম্মিত যেন কারা!
হোথা বন্দর সঙ্গীন ছুটে
তরঙ্গ নত হয়,
পুষ্পিত-লতা দর্পিত 'বুটে'
মৃত্যুর গাহে জয়!
ভাঙাহাট শুধু ভাঙে আর গড়ে—এই চলে চিরকাল
লক্ষযুগের সাধনার পরে হয় বুঝি বানচাল!

ভাঙা হাট শুধু ভাঙে আর গড়ে স্বপ্নের গড়া ভাঙা
কৌশলবাদী কঠিন নিগড়ে দুইহাত হ'ল রাঙা!
নিশীথ নিশায় মানুষ এখানে
অঞ্জলি তুলে ধরে,
কাজল আকাশে অজানার পানে
ঈশ্বরে খুঁজে মরে।

বন্দরে তবু অযুত বিধাতা
নিক্তির দাঁড়ি ধরে,
রক্তের সুধা অঞ্জলি পাতা
জিহ্বায় পান করে!
ভাঙা হাট শুধু ভাঙে আর গড়ে স্বপ্নের বোনো জাল
লক্ষযুগের সাধনার পরে সৃষ্টি যে কঙ্কাল!

ভাঙা হাট শুধু ভাঙে আর গড়ে বাস্তবে দেখ ভাই
লক্ষযুগের সাধনার পরে দীপশিখা তবু নাই!
চলে গেল যারা—আকাশের পারে
রক্তের ছাপ তারা,
অমানিশীথের অন্ধ-আঁধারে
শর্ব্বরী জেগে সারা।
কোন অশিবের শিব-নয়নের
আগ্নেয় বিষ স'য়ে,
তারা কী জাগিবে মৃত মদনের
ভস্মিত রেণু হ'য়ে!
ভাঙা হাট শুধু ভাঙে আর গড়ে চোখ চেয়ে দেখ ভাই
লক্ষযুগের সাধনার পরে দীপশিখা জ্বলে নাই!

৩৬

বাড়ী ফিরে কালুর কাছে শুনলো ত্রিদিববাবু এসেছিলেন; এসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, একটু আগে তিনি চলে গেছেন ঃ যাবার সময় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

অলকা বললে,—কৈ চিঠি?

কালু চিঠি দিলে ত্রিদিবের লেখা। ত্রিদিব লিখেছে,—

অলকা দেবী

প্রায় দু'ঘণ্টা বসেছিলুম। কথা ছিল, আসবো এবং এসে ছবির জন্য নতুন যে শীন্‌গুলো আসামের জন্য লেখা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে পরামর্শ করবো।

আপনার ফেরবার প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর যখন শুনলুম, বিমলবাবুকে দেখতে গেছেন, তখন বুঝলুম, হয়তো বসে থেকে কোনো ফল হবে না! ওখানে গেলে আপনি পৃথিবীর সঙ্গে সব-সম্পর্ক ছেঁটেই যান্—জানি তো!

যাব, সেজন্য দুঃখ নেই! তবে যে-কাজে নেমেছেন, যদি এই কাজ নিয়েই থাকতে চান্, তাহলে এদিকটায় ঔদাস্য করলে তো চলবে না—এই ছবিখানিকেই তাহলে আপনার career-এর শক্ত বনিয়াদ্ করতে হবে! আর যদি বলেন, ছবির এ-কাজ একটা moment's fancy......... বিমলবাবু আছেন মস্ত সহায়—তাহলে অবশ্য আলাদা কথা!

ভালো কথা, কাল আর একবার আসবো। সকালেই "চান্স" নিতে হবে। 'এত কষ্ট করে' যে-শীন্‌গুলি নেওয়া হলো, প্রিণ্ট করে দেখা গেল, দু তিনটে 'শট্' রী-টেক্ করা দরকার! আপনার সুবিধামতো সে-ব্যবস্থা হবে—রাগ করবেন না!

ত্রিদিব

চিঠিখানা অলকা দুবার তিনবার করে পড়লো.........তার পর চিঠি হাতে চুপ করে বসে রইলো। ত্রিদিবের চিঠির কটা কথা কানের কাছে উচ্চগ্রামে বাজতে লাগলো.........

যে-কাজে নেমেছেন......ঔদাস্য করলে চলবে না!.........
আর যদি বলেন, বিমলবাবু আছেন মস্ত সহায়.........

গম্ভীর রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ.........এ নিস্তব্ধতা বুকের উপর ভারী বোঝার মতো চেপে বসলো.........! নিজেকে এ নিস্তব্ধতায় এত নিঃসহায় মনে হলো.........

সহায়.........সহায়...... পাশে কাকেও সহায় না পেলে .........যেন বাঁচা যাবে না!.........চলতে-চলতে প্রতিক্ষণে কত ভয় মনে কত সংশয় জাগে.........কত সাধ, কত আশার তরঙ্গ এসে বুকে লাগে.........মনে হয়, এমন একজন সাথী যদি পাশে পেতুম.........

কিন্তু কাকে পাবে?

বিমল!.........

একা নিঃসঙ্গ বাস করেন! নিঃসঙ্গতার বেদনা তিনি বোঝেন! তাই অলকাকে কাছে পেলে ছাড়তে চান্ না.........

বুকখানা ধ্বক্ করে' উঠলো... মনে পড়লো, আজ থেকে আর তিনি একা নন্.........নিঃসঙ্গ নন.........! আজ থেকে অলকাকে তাঁর আর দরকার হবে না! আজ তিনি পাশে পেয়েছেন............

একটা নিশ্বাস.........বুকের উপর দিয়ে ভারী রোলারের মতো যেন চলতে লাগলো......সে-রোলারের চাপে বুকখানা বুঝি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে!.........

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো.........সে-শব্দে অলকা চমকে ঘড়ির পানে চাইলো! আশ্চর্য্য.........সে ফিরেছে বারোটা আট মিনিটে.........ফেরবামাত্র কালু তার হাতে এনে দেছে ত্রিদিব ভট্‌চায্যির লেখা এই চিঠি! সেই চিঠি পড়ে .........প্রায় পঞ্চাশ-মিনিট অলকা এমন আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে আছে!.........

বিদ্রূপের তীক্ষ্ম বাণে মন তাকে বিঁধে জর্জ্জরিত করে' দিলে.........সে পাগল হয়েছে না কি! এই কঠিন পৃথিবী .........অন্নবস্ত্রের কঠিন সমস্যা দানবের মূর্ত্তি ধরে সামনে খাড়া রয়েছে অহরহ.........সেই পুরাণের শ্রীবৎস-রাজার সামনে শনির মতো রন্ধ্রান্বেষী হয়ে.........একটু অসতর্ক হলেই কি সর্ব্বনাশ না সাধন করবে............! আর অলকা সে-দানবকে ভুলে.........

কালু এসে প্রশ্ন করলে,—খাবার আনি?

আহারে রুচি ছিলনা.........অলকা বললে,—না.........

কালু বললে—ও-বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছেন?

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—হ্যাঁ।

কালু বললে,—এ সব খাবার-দাবার.........

অলকা বললে—তুই খেয়ে ফ্যাল্ কালু .........লক্ষ্মীটি......

কালু নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল......অলকা ডাকল, কালু......

কালু ফিরলো। অলকা বললে,—ও-ঘর থেকে আমার সাদা

শাড়ীখানা দিয়ে যা.........দিয়ে তুই খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্যাল্.........। আমি শুয়ে পড়ছি.........ভারী ঘুম পেয়েছে.........

আলো নিবিয়ে অলকা বিছানায় শুয়ে পড়লো..........! ঘুমোবে বলে' চোখ বুজলো!

ঘুম আসে না! মাথায় সাতশো-চিন্তা সাতশো অক্ষৌহিণীর মতো সদর্পে মার্চ্চ করে বেড়াতে লাগলো!

তারা বলছিল,—কি তুই ভেবেছিলি.........কিসের আশায়.........কিসের লোভে.........

আর্ত্ত আতুর মন বলতে লাগলো আশা নয়......... লোভ নয়.........কিছু নয়.........তারা বললে,—নয় যদি, তবে.........?

মন বললে,—না...না...না...তা নয়!.........মানুষ একা থাকতে পারে না.........সে চায় বন্ধু.........এমন বন্ধু যে দুঃখ দেবে না, অনিষ্ট করবে না.........যাত্রাপথকে মধুর করে দেবে.........

তারা বললে,—ও-সব শুধু মনের সঙ্গে ছলনা!......... ভাবো, বিমলের মন তোমাকে চায় না?.........এবং সে-চাওয়ায় তুমি তাকে প্রশ্রয় দাওনি?

যেন তীক্ষ্ম তীরে মনকে কে বিঁধেছে, তেমনি বেদনায় আর্ত্ত হয়ে মন বললে,—না, না.........এমন হীন, এমন ইতর মন নয় আমার!.........

তারা বললে,—মায়াবিনীর মায়া কোন্ দিক থেকে তরুণের মনকে বিবশ করে.........

অসহ্য!

এ-সব তর্কের মীমাংসা হবে না.........হবার নয়!......... তবু না, সে মায়াবিনী নয়.........এবং মায়াবিনী-বৃত্তি বিকাশ করে বিমলকে কোনোদিন বিভ্রান্ত করতেও চায়নি!.........

অক্ষৌহিণীরা আবার মাথা তুলে রুখে দাঁড়ালো, বললে,— তা যদি নয়, তাহলে বিমলের সেদিন সাহস হয় কি বলে' যে তোমাকে বক্ষলগ্ন করে.........

লজ্জার ভারে অলকার মন যেন নুয়ে পড়লো! মন বললে,—সেদিনের সে-ব্যাপারে এই দেহটার উপরে ঘৃণা ধরে গেছে!.........অলকার দেহখানাকে লক্ষ্য করেই যে সেদিন বিমলের সে-মোহ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, অলকার তা বুঝতে দেরী হয়নি.........এবং সেজন্য নিজের এ দেহখানাকে অলকা ভাবে, তার শত্রু!.........ঐ শত্রুর ভয়েই মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে আছে.........এবং এ-শঙ্কা.........

কিন্তু কে.........কে এ-কথা বিশ্বাস করবে?

৩১

সকালে ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য এসে উদয় হলো।

অলকা সোচ্ছ্বাসে বলে' উঠলো,—এই যে...আমি আপনার জন্য বসে' আছি!...তারপর...এনেছেন নতুন-লেখা সিকোয়েন্স-গুলো?

ত্রিদিব অবাক! যেচে সিকোয়েন্স সম্বন্ধে অলকা আলোচনা করতে চাইছে?

ত্রিদিব বললে,- এনেছি।

—তাহলে...চকিতের জন্য থেমে অলকা বললে,—চা খাবেন? না খেয়ে এসেছেন?

ত্রিদিব বললে...আটটা বেলায় চা না খেয়ে কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় না।

অলকা হাসলো, হেসে বললে—তা ঠিক...বিশেষ আপনার মতো হিসেবী লোক...এখনি পড়বেন সিকোয়েন্সগুলো?

ত্রিদিব বললে,—তার আগে একটু কথা...মানে, রী-টেকের কথা লিখে গিয়েছিলুম।

অলকা বললে—কবে রী-টেক্ হবে, বলুন...

ত্রিদিব বললে,—আপনার যেদিন সুবিধা...

অলকা বললে—আমার সুবিধা...? সে-সুবিধা always... এখনি যদি বলেন, I am ready...

ত্রিদিবের বিস্ময় সীমা ছাপিয়ে উঠলো......সে-চিহ্ন জাগলো ত্রিদিবের দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে!

ত্রিদিব বললে,—বিমলবাবু কেমন আছেন?

অলকা বললে,—ভালো। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী এসেছেন— শ্বশুর এসেছেন...কাল রাত্রে তাঁরা এসেছেন—তাই কাল ওখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আটকা পড়তে হয়েছিল...!

ত্রিদিব বললে,—ও...

তার মুখে কোনো কথা ফুটলো না। ত্রিদিব চুপ করে' বসে রইল।

অলকা বললে,—তাহলে এখন কি করতে চান?

ত্রিদিব বললে,—যদি আপনার অসুবিধা না হয়...মানে, আপনার সঙ্গে কাল রাতে দেখা হলো না বলে' জানাতে পারিনি......আজ সকালে বজরঙ্গি ফোন্ করেছে—একবার ষ্টুডিওতে যেতে বলছে......রী-টেকের ব্যবস্থার জন্য!......তা, মানে, if you do not mind...আসবেন এখন ষ্টুডিয়োয়... সেইখানে আপনার সুবিধা বুঝে রী-টেকের ব্যবস্থা এবং তারি ফাঁকে এই নতুন সিকোয়েন্সগুলো নিয়ে দুজনে যদি বসি...

সোৎসাহে অলকা বললে,—বেশ...তাহলে পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে...just to dress up...

ত্রিদিব বললে—বেশ।...

বেশভূষা করে' ত্রিদিবের সঙ্গে অলকা এলো নেমে...বাইরে পথের উপর বজরঙ্গির মোটর দাঁড়িয়ে...দুজনে উঠতে যাবে, পিছনে জাগলো কণ্ঠস্বর,—দিদিমণি......

ফিরে চেয়ে অলকা দেখে সিধু।

অলকা বললে,—কি খবর সিধু?

সিধু বললে—চিঠি আছে।

বুকখানা ধড়াশ্ করে' উঠলো! এখনো চিঠি?

অলকা চিঠি নিলে...লেফাফায় তার নাম লেখা... শ্রীমতী অলকা দেবী...

লেফাফা থেকে চিঠি বার করে' অলকা পড়লো। চিঠি লিখেছে বিভাবরী। লিখেছে—

শ্রীমতী অলকা দেবী

কাল রাত্রে যেভাবে চলে গেছেন, তাতে মর্ম্মাহত হয়ে আছি। আপনার কথা সব শুনলুম—আপনি কে, কি বলবো, জানি না। আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা,—(আমার ইচ্ছা সবচেয়ে বেশী)—আপনি এখনি আমাদের এ বাসায় আসেন এবং এইখানে আমাদের সঙ্গে গল্পস্বল্প, আলাপ-পরিচয় আর খাওয়া-দাওয়া করেন।

না এলে সকলের মনে যে-কষ্ট হবে তা কি বুঝতে পারছেন না? আপনার 'পেশেন্ট' বলছেন, আপনি না এলে আপনার সঙ্গে তিনি ভয়ঙ্কর আড়ি করে দেবেন। (এ কথাটুকু ঠিক তিনি বলেননি তবে এ আমার অনুমান; কারণ, আপনার সম্বন্ধে আপনার 'পেশেণ্ট' যে পরিচয় দেছেন, তাতে মনে হয় a ministering angel thou!))।

আশা করি নিশ্চয় এখনি আসবেন।

বিভাবরী

চিঠি পড়তে পড়তে অশ্রুর বাষ্পে অলকার চোখ ভরে এলো!... কোনোমতে নিশ্বাস রোধ করে' অলকা বললে—চিঠি পেলুম সিধু...তুমি গিয়ে বৌদিরাণীকে বলো, বড্ড দরকারে আমাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। কখন ফিরবো, ঠিক নেই! কাজেই এখন তো যাওয়া সম্ভব হবে না...

সিধু কোনো কথা না বলে' অলকার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে-দৃষ্টি অলকার মনে বিঁধলো কাঁটার মতো!... ও বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের যে-পরিচয় পেয়েছে...রেশের মাঠে দেখা সেই প্রিয়শঙ্কর রায়ও সেই সন্দেহ কণ্ঠে...তার উপর ভাড়া করা নার্শ প্রতিমা মুখার্জ্জী আর সুশীলা চক্রবর্ত্তী...সে-পরিচয়ের পর মন যেন ও-বাড়ীতে একটু ঠাঁই পেলে বর্ত্তে যাবে, মনে হয়!...

এবারে আর নিশ্বাস চাপতে পারলো না! নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—সময় পেলেই আমি যাবো সিধু......বৌদিদি-রাণীকে তুমি গিয়ে বলো...

অলকা বাড়ী ফিরলো বেলা তখন প্রায় বারোটা।

কালু বললে,—ও বাড়ীর লোক দু'বার এসে আপনার খপর নিয়ে গেছে।

এ কথা অলকাকে কণ্টক ব্যথায় জর্জ্জরিত করে তুললো!

অলকাকে নিরুত্তর দেখে কালু বললে,—আপনাকে ও বাড়ীতে যেতে বলে' গেছে...বলেছে বড্ড দরকার...। একজন দিদি-মণিও এসেছিলেন ও বাড়ীর সিধু বেয়ারার সঙ্গে......

দিদিমণিও? তার মানে, বিভাবরী!...

অলকা একটা নিশ্বাস ফেললে...

কালু চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল...অলকা বললে,—বড্ড মাথা ধরেছে...জিরিয়ে চান করে' নি...তারপর যদি মাথাধরা ছাড়ে...

চান করে' অলকা বললে,—আমার খাবারটা নিয়ে আয় কালু...

কালু আনলো খাবার...

খাওয়া দাওয়া সেরে অলকা বললে—আমি ও বাড়ী যাচ্ছি কালু...বিমলবাবু যদি আসেন, তাঁকে বসতে বলিস্।

কালু বললে—বলবো।

অলকা বললে,—বলিস, ওখানে আমার বেশী দেরী হবে না!...

বিভাবরী করলো অনুযোগ; বললে—কেন আপনি খেয়ে এলেন?

বিমল বললে—এখানে আমাদের উনি শুধু ঋণভারে বিজড়িত করে' রাখলেন...খেলে যদি সে ঋণের...

হেসে অলকা বললে—তাহলে আমার কাছে এ-ঋণ এত সামান্য যে একবেলা পেট ভরে' আমাকে খাইয়ে দিয়েই উনি ঋণমুক্ত হবেন, ভেবেছিলেন!...

বিমল বললে,—তোমাকে তো বলেছিলুম বিভা, আশ্চর্য্য কথা বলবার শক্তি এই অলকা দেবীর!...শুনলে তো ওঁর জবাব...মানে, আমার কথার জবাব?

অলকার মনের ভিতরটায় যেন দাবানল জ্বলে উঠলো! এরি মধ্যে আমার সম্বন্ধে এত কথা হয়ে গেছে! আমার পরিচয়...ঐ আমার বাকপটুতা!...চমৎকার!

বিভাবরী বললে,—বিমলদা বলছিল, আপনার সঙ্গে কি করে' আলাপ হয়...কাশানোভায় সব লোককে ছেড়ে আপনি ওর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন...

অলকার মনে তখনো সেই দাবানল সমান তেজে জ্বলছে! জোর করে' মুখে হাসি ফুটিয়ে অলকা বললে,—ও...সব কথাই বলেছেন তাহলে বিমলবাবু? আমার জন্য কিছু বাকী রাখেন নি, বুঝি? সেই উপমার কথাও বলেছেন...দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ?......তার পর সেই যেদিন নিজেকে মস্ত অপরাধী ভেবে গ্লানির ভারে বার বার মার্জ্জনা ভিক্ষা.........

এই পর্য্যন্ত বলে বিমলের পানে চেয়ে বিমলের মুখে যে ভাব প্রত্যক্ষ করল......অলকার আর বলা হ'ল না...... এ কথার পর একেবারে সে তাকাল বিভাবরীর পানে; তাকিয়ে অলকা বললে,—আমাদের তো দেখা হয়েছিল বেশ শুভক্ষণে, দুজনের অবস্থাই এক রকম প্রায়। উনি একা থাকেন......আমিও থাকি একা! .........আমাকে কত বিপদে যে উনি বাঁচিয়েছেন!.........আর কাল রাত্রে ঐ যে পরিচয় ওঁর দিলেন আপনি......দারুণ অভিমানী......দারুণ ইমোশনাল ......আমিও তার খুব পরিচয় পেয়েছি! হাড়ে হাড়ে সে পরিচয় জানিয়ে দেছেন......কি বলেন,...নয়?

কথার শেষে অলকা তাকাল বিমলের পানে......বিমল লক্ষ্য করল, অলকার সে দৃষ্টিতে কি প্রখর ধার!

বিভাবরী বললে,—বাবা বলছিলেন, রেশের মাঠে আপনাদের তিনি দেখেছিলেন...বাবাকে আমি বলেছিলুম—তুমি বকলে না কেন? তাতে বাবা বলেছিলেন,—না রে সব জিনিষ দেখা ভাল—আঙুরের বাক্সয় ভরে রাখলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না......আজ সকালেও সেই রেশের মাঠের কথা উঠেছিল......বিমলদা বললে, আপনার জন্যে শুধু সেদিন অনেক টাকা লোকসান হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল......

অলকা কোন জবাব দিলে না......জবাবের কথা মুখে এল না। এ সব কথা শুনে তার মনে জাগছিল একটিমাত্র কথা......যতক্ষণ ভিড় ছিল না, ততক্ষণ তার অবস্থান কত-খানি সহজ ছিল এখানে......আর এখন?......

মনে পড়ল পুরান দিনের কথা। তখন অলকার দাদা-মশাই ছিলেন বেঁচে......তাঁর সঙ্গে ট্রেনে চড়ে' পশ্চিম থেকে কলকাতায় আসছিল। ট্রেনের কামরায় বসে' জানলা দিয়ে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে।

মাঠের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে লোকের বসতি.........বৌঝী, ছেলেমেয়েরা তৃষিত চোখে চেয়েছিল ট্রেনের পানে...... সে দলে অলকা দেখেছিল পল্লীঘরের একটি বধূকে! সবার পিছনে ঘোমটায় ঢাকা মুখ......মুখের ঘোমটা না সরিয়ে গ্রীবাদেশ একটু তুলে দু'চোখ দিয়ে সে দেখছিল চলন্ত ট্রেনের কামরার যাত্রীদের! তার মুখ অলকা দেখে নি...... দেখতে পায় নি......দেখবার উপায় ছিল না......দেখেছিল সে বধূর দুটি চোখ শুধু! সে দুটি চোখে অলকা দেখেছিল —বিরহের কি নিবিড় বেদনা......আশার কি অধীর উচ্ছ্বাস ...স্বপ্নের কি অপরূপ মাধুর্য্য!...সে দুটি চোখের দৃষ্টি এত চমৎকার লেগেছিল......বার বার সে দুটি চোখ দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল......কিন্তু দেখবার উপায় ছিল না...জন্মেও সে উপায় মেলে নি.........মিলবে না, কখনও না!.........তেমনি এবার, এবারের কথা—গল্প, হাসি, আনন্দ......এ'ও সেই বধূর দৃষ্টির মত মনের পটে আঁকা থাকবে......প্রত্যক্ষ করবার বা উপভোগ করবার সুযোগ এ জীবনে আর মিলবে না! ......

কিন্তু বিমল......? তার সম্বন্ধে কি কথা বলেছে? কি পরিচয় দিয়েছে?......

কাল রাত্রেই বিছানায় শুয়ে রাজ্যের চিন্তা নিয়ে সে খেলা করেছে! এমন চিন্তাও তার মনে জেগেছিল যে, হয়তো বা তাকে......

গ্লানির ভারে মন চকিতে ভরে' উঠল......না...না...

অলকা বললে,—আজ কিন্তু মাপ করতে হবে। আসতে পারিনি বলে' ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম শুধু। ক্ষমা চাওয়ার উপর আর একটি কথা কইব, এমন অবসর আমার নেই! মানে, পরের তাঁবে চাকরি করতে হয়......আষ্টেপৃষ্ঠে দাস্যের বাঁধন......নিরুপায়!......সময় পেলেই আসব...এখন চললুম...

এ কথার পর অলকা আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না...... সে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি নেমে বাইরে চলে এল।

এদিকে কর্ম্মচক্রের দুর্লঙ্ঘ্য গতি! সে গতির বেগে দেহ-মন নিয়ে একদণ্ড দাঁড়ানো চলে না! অলকাও দাঁড়াতে পেলো না... একদণ্ড দাঁড়িয়ে বসে মনের তত্ত্ব নেবে,—মনের কতখানি রইল অনাহত, কতখানি ছেঁচে পিষে চূর্ণ হয়ে যাবার জো... তা দেখবার অবসর মিললো না! কর্ম্মচক্রে দেহ-মন জুতে সে চললে অনতিক্রম্য গতিবেগে......মনের একটা দিক বেদনায় কনকনিয়ে খশে যাবে যেন, এই অনুভূতিটুকু মাত্র সম্বল করে!......

এবার কাজে তার উৎসাহ দেখে ষ্টুডিও শুদ্ধ লোক উৎসাহে মত্ত হয়ে উঠল। 'রীটেকে' শটের পর শট তোলা হচ্ছে......সে সব শটে অলকা নিজেকে সঁপে দেছে নিঃশেষে ......তার বিরক্তি নেই, অনুযোগ নেই......যেন কলের পুতুল! এবং তার এতখানি আগ্রহ-উৎসাহকে ভিত্তি পেয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার আর ডাইরেক্টর ছবিকে কায়েমি করে' গড়ে তুলতে লাগল!

রীটেকের পালা চুকতে সময় লাগল তিন দিন। এ তিন দিন অলকা যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল...এবং এ পালা শেষ হলে অবসর মিললে সে যেন নুয়ে ভেঙ্গে পড়ল ......কি আশ্রয় করে দাঁড়াবে, কোন দিকে তার হদিশ মিলল না! রাত্রে বাড়ী ফেরবার পথে গাড়ীতে সে নিঃশব্দে বসে রইল এবং সচল সশব্দ শহর তার মনকে স্পর্শ করতে না পেরে পিছলে সরে যাচ্ছিল! ......মন কেবল বলছিল,— এবার......? এবার......?

গাড়ী থেকে নামবার সময় ত্রিদিবের পানে চেয়ে অলকা বললে,—আমার এখন কাজে খুব inspiration এসেছে...... আসাম যেতে চান যদি ত দেরী করবেন না...! I am sure, এ mood থাকতে থাকতে যদি ছবি তুলতে পারেন, তাহলে অভিনয় ভাল করব বলে মনে হচ্ছে!

ত্রিদিব খুশী মনে বললে,—বেশ, তাহলে দু-একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলি। ......এদিককার কাজ একরকম শেষ করে ফেলেছি তো.........

উপরে নিজের ঘরে এসে শুনলে, ও-বাড়ী থেকে এসেছিলেন—বাবু আর একজন দিদিমণি......চিঠি রেখে গেছেন!

—কখন এসেছিলেন?

কালু বললে,—বেলা তখন দশটা—

দশটা!......এখন......?

অলকা চাইল ঘড়ির পানে......ন'টা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট!......

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বসলো সোফায়......কালু তার হাতে দিল চিঠি! দুখানি চিঠি! একখানি চিঠি লিখেছে বিভাবরী......আর একখানি বিমল।

বিভাবরী লিখেছে,—

কি অপরাধ করেছি, জানি না! ভালো করে আলাপের অবকাশ দিলেন না! আজ আমরা শিলং যাচ্ছি। বেলা দুটো চল্লিশ মিনিটে ট্রেন! আমাদের পক্ষে এখানে আসা আর সম্ভব হবে না! ক'দিন কতবার করে যে এসেছি! আশা করতে পারি, সময় করে একবার আসবেন? আমাদের ফ্ল্যাটে না হয় যদি, অন্তত শেয়ালদা ষ্টেশনে! ট্রেনে বসে আপনার পথ চেয়ে থাকবো! নমস্কার আর ভালবাসা জানবেন।

বিভাবরী

চিঠি পড়ে মন কেমন উদাস হল......! কেন...... [illegible] আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাও, বিভা? ......তুমি জান না, কত বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছি! ...একটার পর [illegible] দিন আমার কি করে যে কাটে......তোমার স্নেহে [illegible] আমাকে লোলুপ কর না! আমি......আমি......

অলকার বুকের মধ্যে যেন সপ্ত সিন্ধু উত্তাল [illegible] উঠল......

.........মনকে শান্ত করে অলকা খুললে বিমলের [illegible]

বিমল লিখেছে,—

একটা কথা বিশ্বাস করবেন, অলকা দেবী,......আমার [illegible] পাথর হয়ে গেছে! এসেছিলুম একটি মাত্র আশা নিয়ে...আপনার [illegible] আঘাত পেতে......সে-আঘাতে এ পাথর যদি চূর্ণ হত্তো, [illegible]

বিভা এসেছিল সঙ্গে—ছাড়লো না! ভেবেছিলুম, একা [illegible] কিন্তু সবার মনে ভয়, দুর্ব্বল শরীর......চলার কষ্ট যদি সহ্য [illegible] না পারি!

এ'রা আমাকে ধরে নিয়ে চলেছেন—শিলং। আমার এতে [illegible] অনিচ্ছা কিছুই নেই! তবে বিশ্বাস করুন,—আপনাকে [illegible]

ভুলবো না! পরে কি করবো, না করবো, জানি না। নিজের ইচ্ছায় কিছু করবো, সে-ইচ্ছা আমার নেই...তবে যুদ্ধ করবার মতো শক্তিও আমার বিলুপ্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমার আমিত্ব আর নেই, যার জোরে নিজেকে খাড়া রাখবো।

যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবেই। আশা করি, সে-সাক্ষাতের আগে আমার বিচার করবেন না।

কি এ চিঠি! এ-সব কথার মানে?......

অলকা বহু আয়াসে প্রত্যেকটি কথার অর্থ-উদ্ধারে মনোনিবেশ করলে......নিজের দিকে অনুকূলভাবে সে-অর্থ যতখানি প্রসারিত করা যায়......

লিখেছেন, "যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবেই"...... লিখেছেন, "সে সাক্ষাতের আগে আমার বিচার করবেন না!" ......তার মানে?......'সে-সাক্ষাতে' কি বলবেন? কি চাইবেন? দুচোখের কোণে বাষ্পের সঘন উচ্ছ্বাস...সে বাষ্প-ভারে চিঠির অক্ষর অস্পষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল......

পাশের বাড়ীতে রেডিও-সেটে গান ভাসছিল,—

কী পাইনি, তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজী!
আজ, হৃদয়ের ছায়াতে-আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি......

সোফা থেকে উঠে অলকা এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে ছোট বারান্দায়......মাথার উপরে আকাশ অসংখ্য নক্ষত্র-চক্ষে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তারি পানে যেন চেয়ে আছে!......

সুরের বাণী ভেসে চলেছে সমানে—

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়ে ছিল তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার!
সুর তবু লেগেছিল বারেবার—
মনে পড়ে তাই আজি......

দুদিন পরের কথা। কোম্পানী চলেছে গ্যারো পাহাড়ে ছবির শীন্ তুলতে......

দার্জ্জিলিং মেল্। সেকেন্ড-ক্লাশ কামরা। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে বজ্‌রঙ্গি, ডাইরেক্টর আর ক্যামেরাম্যান্......জেগে আছে নীচেকার সামনাসামনি দুখানি বার্থে দুজন......অলকা এবং ত্রিদিব ভট্‌চার্য্যি। দুজনে গল্পের পরিণতির আলোচনায় মত্ত......ট্রেন পোড়াদা ষ্টেসন ছেড়েছে......রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা......

অলকা বললে,—নায়িকা আভা নায়ক সন্তোষকে গোপনে ভালোবাসে,—সন্তোষ তা জানে না...মানে, আভা সন্তোষকে তা জানতে দ্যায়নি......এই তো?

ত্রিদিব বললে,—হ্যাঁ......

অলকা বললে,—তাই যদি তো শেষের দিকে আভাকে দিয়ে সন্তোষ আর প্রতিভার বাসরে সে-কথা বলাবার মানে খুঁজে পাই না......ফুলের মালা নিয়ে আভার এসে দুজনের গলায় সে-মালা পরিয়ে চোখের জল ফেলানো......ভয়ঙ্কর silly। এ হতে পারে না!

ত্রিদিব বললে,—হতে পারে না, তার মানে?

অলকা বললে,—Absurd এ melodramatic উচ্ছ্বাসে আভা আর মানুষ থাকছে না......সে মাটী হয়ে গেছে।......

ত্রিদিব বললে,—কিন্তু আভার শেষ একটা কিছু দেখাতে হবে তো!

অলকা বললে,—তা বলে' সে-শেষ এমনি করে' দেখাবেন?......আভার শেষ এমন হতেই পারে না......

ত্রিদিব বললে,—কি রকম হবে......বলুন......Well, I invite your suggestion......

অলকা উদাস-নয়নে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো...... মুখে কথা নেই......

কৌতুকভরে ত্রিদিব বললে,—বলুন.........

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করে' অলকা বললে—আভা কোনদিন ধরা দেবে না...তার এ ভালোবাসা এ জীবনে যখন সার্থক হবে না, আজীবন নীরবে সে এ ভালো-বাসাকে বুকে লালন করবে......সন্তোষকে আভা পেয়েছে...... তাকে নিয়ে সংসার-ধর্ম্ম করবার মতো পাওয়া না পেলেও যা-নিয়ে সন্তোষের সন্তোষত্ব......মানে, তার মন......সে-মনের সঙ্গে আভার মনের সম্পর্ক নিবিড়। সংসারের কলরব-কোলাহলে প্রাণ অশান্ত হলে সন্তোষ একান্তে বসে আভাকে স্মরণ করবে, আভার সঙ্গে তার যে মুহূর্ত্তগুলি কেটেছে, সেই মুহূর্ত্তগুলিকে স্মরণ করে' সে আরাম পাবে, সান্ত্বনা পাবে—আভা সেই কথা ভেবে নিজের মনে যে-শক্তি, যে-রঙ পাবে, তার suggestion দিয়ে বই শেষ করুন......আভার ভবিষ্যৎ সেই স্মরণের রঙে রাঙা হয়ে থাকবে,—কতখানি তা ভালো লাগবে, বলুন তো......

ত্রিদিব বললে,—লোকে তা বুঝবে না। লোকে চায়, একটা প্রত্যক্ষ করবার মতো সমাপ্তি......এ climaxএর পর আভার সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু দ্বিধা থাকবে না!...... যারা triangle ভালোবাসে, তারা ভাববে, এর পরে সন্তোষ আর প্রতিভার জম্-জমাট্ ঘরকন্নার মধ্যে আভা হয়তো এসে উদয় হবে......

অলকার মন বিরক্তিতে ভরে জ্বলে উঠলো। সে বললে—আভাকে যদি এমনি cad করে' ছেড়ে দ্যান্ তাহলে আমি শেষদিককার অভিনয়ে fail করবো......ভয়ঙ্কর fail করবো, জানবেন।...এতবড় injustice......এমন psycho-logical blunder......মেয়েমানুষকে কি ভাবেন, বলুন তো? তার মনের জোর কতখানি,......হাসিমুখে কতখানি নৈরাশ্য যাতনা সে সহ্য করতে পারে......হাঁ, এই fundamental blunder করেন বলেই আপনাদের দেশী ছবির গল্প হয় ছাই। কথাটা বলে' অলকা জানলা দিয়ে বাইরের পানে তাকালো...চেয়েই রইলো বাইরের পানে......কালো আবছায়ায় মিশে ওদিকে কত ঘর-বাড়ী......লোকজন _ সে-সব লোক-জনের মনে কান্নাহাসির কতই না দোলা...... হঠাৎ ট্রেণ গেল থেমে। উপরের বার্থ থেকে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ডাইরেক্টর প্রশ্ন করলে,—কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী থামলো ত্রিদিব?

প্লাটফর্ম্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ত্রিদিব বললে,—ঈশ্বরদি......

ক্রমশঃ

# ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্য্যয়

বাঙলার কবি নবীনচন্দ্র সিডান সমরে প্রুসিয়ানদের হাতে পরাজয়ের পর ফরাসীরা অন্তরে যে বেদনা পাইয়াছিল, সে বেদনা বাঙালীকে কিছু অনুভব করাইয়াছেন, আর সে বেদনা জীবন্ত রহিয়াছে মোপাসাঁর গল্পগাথার ভিতর দিয়া। ৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই কথা। ৭০ বৎসর পরে বিজয়দর্পে জার্ম্মানবাহিনী যখন প্যারিসে প্রবেশ করিল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ফরাসী জাতি যে কি বিষম বেদনা মনে পাইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে।

ফ্রান্সের রাজধানী এই প্যারিস নগরীর ঐতিহ্য অতি

আলেকজান্দ্রিয়ায় মিত্রশক্তির নৌবহর

বিচিত্র। অতীতে অনেক আঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেক পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিয়া গিয়াছে ফরাসীদের এই প্রাচীন নগরীর বুকের উপর দিয়া। জয়-পরাজয়, বিদ্রোহ, সন্ধি নানা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে প্যারিসের প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত। ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্যারিস মরে নাই, আবার মাথা তুলিয়াছে। গলদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সময় সীজার প্যারিস নগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে জানা যায় যে, সীজার প্যারিসের দুইটি কাঠের সেতু পোড়াইয়া দিয়াছিলেন।

প্যারিসের স্মৃতির সহিত বুর্ব্বোঁ বংশের আভিজাত্য এবং নেপোলিয়নের বীরত্বের কথা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আর ফরাসী বিপ্লব রক্তাপ্লাত প্যারিসের রাজপথ্য হইতে জনশক্তির নূতন জাগরণ। আধুনিক সভ্যতায় প্যারিস নগরীর অবদান রহিয়াছে অসামান্য। ঐতিহাসিক এত গুরুত্ব, বোধ হয় অন্য কোন দেশের রাজধানীর নাই। প্যারিস ফরাসী জাতির গর্ব্ব—বর্ত্তমান সভ্যতার সে তীর্থস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্যারিসের পতন হইয়াছে। সুন্দর নগরীকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফরাসী সেনাবাহিনী শহর হইতে হটিয়া পিছনে গিয়া লড়াই চালাইয়াছে। ইহাতে নগরী ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু দালান, কোঠা, ইমারত কতকটা অক্ষত থাকিলেও প্যারিস আজ জনহীন শ্মশানতুল্য; সেই শ্মশানে পরকীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত।

প্যারিস হইতে ফ্রান্সের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইতেছে, রাজধানী কোথায় আছে নিশ্চয়তা কিছুই নাই। প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ফরাসী জাতি জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত। রাজধানী আজ এখানে, কাল সেখানে, স্থানান্তরিত হইতেছে। ইহার পর রাজধানী ফ্রান্সে থাকিবে কিনা, তাহাও বলা যায় না। ফ্রান্সে মঁসিয়ে পেঁতাকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, মঁসিয়ে রেণোর প্রধান মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিয়াছে। ইহার ফলে ফ্রান্সের রণনীতিতে নূতন কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে এখনও বলা যাইতেছে না। ফ্রান্সের অবস্থা প্রবল শত্রুর আক্রমণে যে খুবই সঙ্কটজনক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফ্রান্স আমেরিকার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, হয়ত তাহার আশা ছিল যে, এই সঙ্কটে আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগদান করিবে, কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিবে না, আপাতত এ সিদ্ধান্ত সে প্রকাশ করিয়াছে। তবে অস্ত্রশস্ত্র

ও গোলাবারুদ দিয়া মিত্রপক্ষকে আমেরিকা বিশেষ রকমে সাহায্য করিবে, এ ভরসা সে দিয়াছে। লড়াইতে দেখা দিয়াছে যে, বিমান এবং ট্যাঙ্কের শক্তিতে জার্ম্মানী মিত্রশক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আমেরিকা মিত্রপক্ষের এই অভাব কিভাবে পূরণ করে, তাহার উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনেক নির্ভর করিতেছে।

ফ্রান্সের রাজধানী পরিবর্ত্তন খুব একটা বড় কথা নয়, বিগত মহাসমরের সময়ও ফরাসীরা প্যারিস হইতে রাজধানী হেভারে স্থানান্তরিত করে; তবে বিগত মহাসমরে জার্ম্মানেরা প্যারিস শহর দখল করিতে পারে নাই; এবার তাহারা ট্যাঙ্ক ও বিমান বলে অধিকতর বলীয়ান বাহিনী লইয়া প্যারিস দখল করিয়াছে; কিন্তু প্যারিস দখল করাও বড় কথা নয়। বড় কথা হইল ফরাসীদের ন্যায় বীরের জাতির পক্ষে বিজেতা জার্ম্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ। কিছুদিন পূর্ব্বেও ফরাসী প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে মসিয়ে রেণো ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা জীবন দিয়া যুদ্ধ করিব। প্যারিস ছাড়িতে হয় ছাড়িব; কিন্তু লড়াই ছাড়িব না। আমরা যদি ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হই, আফ্রিকাতে আমাদের অধিকৃত স্থানে যাইব, নতুবা আমেরিকার ডেভিল দ্বীপে গিয়া লড়াই করিব, জনপ্রাণী থাকিতে ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করিবে না; অথচ সেই ফরাসী জাতিকে আজ জার্ম্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। মসিয়ে পেঁতের নেতৃত্বে যখন নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল তখন মনে করিয়াছিল, বড় গোছের নূতন কিছু ফ্রান্সে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, পরেই জগৎ ফ্রান্সের সন্ধির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। ফরাসীদের এই সন্ধিপ্রস্তাবের মূলে নানা কারণ আছে। ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধে ফরাসীদের শক্তি বিশেষভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার পরে প্যারিসের পতন। প্রধান মন্ত্রী রেণো আমেরিকার সাহায্য প্রার্থী হইলেন, আমেরিকা যদি যুদ্ধে যোগদান করিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব ফরাসীদের এমন ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিত না; কিন্তু আমেরিকা স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দিল, সে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেই পারে, যুদ্ধে যোগদান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমেরিকা যে যুদ্ধে যোগ দিবে না, ইহা নানা কারণেই বুঝা গিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যুদ্ধে যোগদানের কতকটা পক্ষপাতী হইলেও, সিনেটের অধিকাংশ সদস্য সে মতাবলম্বী নহেন, রিপাবলিকান দল বরাবর আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছেন, তারপর নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন আসন্ন; এমন অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ঐরূপ একটা বড় ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত থাকিবেন না, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ফরাসী আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি। ফরাসী সন্ধি চাহিলেও, আত্মমর্য্যাদাহানিকর সন্ধিতে সে রাজী হইবে না, ইহা বুঝা গিয়াছিল। হইয়াছেও তাহাই। ফরাসী সন্ধির চেয়ে আত্মমর্য্যাদাকেই শ্রেয় মনে করিয়াছে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, সম্মানজনক সর্ত্ত পাইলে আমরা সন্ধি করিতে রাজী ছিলাম, কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, এখন আমরা যুদ্ধ চালাইব। জার্ম্মানী-দের সেনাবল এবং সমরোপকরণের শক্তি ফরাসীর নৈতিক শক্তি নষ্ট করিতে পারে নাই। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের এই ঘোষণায় যুদ্ধের নতন গতি আরম্ভ হইল। ইংরেজ এবং ফরাসী এবার অধিকতর দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম চালাইতে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। ফরাসী জাতি জগতকে দেখাইবে যে, বাঁচিতে যদি হয়, মানুষের মত বাঁচাই শ্রেয়ঃস্কর, পরাধীনতার শৃঙ্খল অঙ্গে পরিয়া জীবন ধারণ করিতে ফরাসীরা চাহে না। রাষ্ট্র বিপর্যয়ের এই দারুণ সঙ্কট-কালে ফরাসী জাতির এই দেশাত্মবোধ এবং রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার অনুভূতি স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াও এমন আদর্শ অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

ইটালী যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে প্যারিসের পতনের বা ফরাসীদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের যে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই; প্রকৃত পক্ষে ইটালীর যুদ্ধে যোগদান করায় জার্ম্মানীর সুবিধা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু হয় নাই, পক্ষান্তরে অসুবিধাই কিছু বাড়িয়াছে। ইটালী হইতে স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ সহজ ব্যাপার নয়। আল্পস পর্ব্বত ফ্রান্সের সীমানা জুড়িয়া সমুদ্রের উপকূল ভাগ পর্য্যন্ত ইটালিয়ানদের গতি রোধ করিবে। গিরিসঙ্কটসমূহ এমন দুর্গম যে, বেশী সৈন্য অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই সব সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া ইটালী যদি সৈন্যদল পাঠাইতে চেষ্টা করে, মেশিন কামানের গোলায় তাহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে।

সংবাদে দেখা যাইতেছে, জার্ম্মানেরাই ইটালিয়ানদিগকে চালিত করিতেছে। ইটালিয়ান বিমান বীরদের উপদেষ্টা হইয়াছে জার্ম্মানেরা। সুতরাং হল্যান্ড, বেলজিয়ামে জার্ম্মান বিমান বীরেরা যে চাল চালিয়াছিল, ইটালিয়ান-দিগকে লইয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে প্যারাসুটী কৌশল সেইভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। ফ্রান্সের সীমান্তে নীস শহরটি অবস্থিত। এই নীস শহরের উপর মুসোলিনীর বহুদিন হইতে নজর আছে। নীস শহরের একশত মাইল পশ্চিমে মার্সাই বন্দর, এই বন্দরেও অনেক ইটালিয়ান আছে। তাহারা জার্ম্মানীর পক্ষে ৫ম কলম অর্থাৎ গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিতে পারে, এ আশঙ্কা আছে।

কিন্তু ইটালীর পক্ষে ষোল আনা নজর এদিকে দেওয়া সম্ভব নয়, আফ্রিকা লইয়াই তাহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ কেবল ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইটালী যুদ্ধে যোগ দিবার পর হইতে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ ধরিয়া আফ্রিকাতেও যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইংরেজের এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবহর ইটালীর লিবিয়া, এরেত্রিয়া এবং আবিসিনিয়ার বিমানঘাটিগুলির উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। ইটালী লিবিয়ার বিমান ঘাঁটি হইতে মিশরে হানা দিতে পারে, আবিসিনিয়া হইতে ব্রিটিশ সোমালী-ল্যান্ডে হানা দিবার প্রয়াসও সে করিবে। ইতিমধ্যেই

কয়েকবার সে মাল্টার উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এদিক হইতে সুবিধা করা কঠিন। ইংরেজের ভূমধ্যসাগরের নৌবহর আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে সমবেত রহিয়াছে; এই সঙ্গে বিমানশক্তিও যথেষ্ট আছে। ইটালী অবশ্য মাইন পাতিয়া এবং সাবমেরিনের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরে নিজের নৌশক্তি অটুট রাখিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু লিবিয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইতে পারিলে, ইটালীর পক্ষে আক্রমণাত্মক কোন কার্য্যই এদিকে চালান সম্ভব নহে। ফরাসী এবং ইংরেজ এই অবসর কিছুতেই ইটালীকে দিবে না। আবিসিনিয়াকে ইটালী বশে আনিতে পারে নাই, লিবিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় সর্দ্দারগণ ইটালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে।

ইটালী যুদ্ধে যোগদান করার ফলে যুদ্ধ কেবল আফ্রিকাতেই বিস্তৃত হয় নাই, এশিয়ার পূর্ব্বভাগেও যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইটালীর বিমান বীরেরা ইতিমধ্যেই এডেন বন্দরেও কয়েকবার হানা দিয়াছিল, কিন্তু কিছুই ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারে নাই। আফ্রিকার উপকূল ভাগে এবং এশিয়ার পশ্চিমাংশে, রণক্ষেত্রের এই সম্প্রসারণের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, আমেরিকার উপর অনেক অংশে তাহা নির্ভর করিতেছে। গণতন্ত্রের এই সংকট জগতে আর কোনদিন আসে নাই—সামরিক জয়পরাজয়ে এ সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহার প্রতিক্রিয়ায় জগতের জনশক্তি জাগ্রত হইবে এবং পাশব-শক্তির বিরুদ্ধে নতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। সেই ভাব ও সেই আদর্শ জগতের ভবিষ্যৎ গঠন করিবে—পশুবলের আপাতত জয় অপেক্ষা মানবতার সেই মহাজাগরণই অধিক সুনিশ্চিত এবং সত্য।

জার্ম্মাণ বোমায় বিধ্বস্ত ফ্রান্সের একটি সহরের করুণ দৃশ্য

# আজ-কাল

### সাম্প্রদায়িক সমস্যা

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা পৃথক মুসলিম ভারতের বুলি ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় রাজী হবেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলবেন—এই রকম একটি পরিকল্পনা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রস্তুত করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এবং বুন্দে আলি খাঁর আলাপ হয়ে গেছে। আলোচনার জন্যে মিঃ ফজলুল হকও দিল্লীতে গিয়েছিলেন। আলোচনা আরও হবে বলে মনে হয়।

কিন্তু এ চেষ্টায় মুসলিম লীগ যথারীতি বাদ সেধেছে। প্রথমে বাঙলা দেশের মিঃ আব্দুর রহমন সিদ্দিকি প্রমুখ অ-বাঙালী লীগ পাণ্ডারা মিঃ ফজলুল হককে লীগের বিনানুমোদনে এ রকম আপোষ-আলোচনা করতে নিষেধ করেন; তার উত্তরে মিঃ হক জানান যে, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে নিশ্চয়ই কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটে উদ্যোগী হবেন এবং তাঁর মতে সে মিটমাটের সময় এখন এসেছে। বাঙলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও মিঃ হকের উদ্যম সমর্থন করেন এবং বলেন যে, এখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা চূড়ান্ত সমাধান করে ফেলা উচিত। কিন্তু মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গত ১৬ই জুন বোম্বাই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, জিন্না সাহেবের অনুমতি ছাড়া লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন প্রশ্নের আলোচনা করতে পারবেন না। মুসলিম লীগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যেমন করে হোক পৃথক মিটমাট করতে ইচ্ছুক।

গান্ধীজী এক প্রবন্ধে বলেছেন, ভারতবর্ষে এখন মাত্র দুটো দল আছে—কংগ্রেস এবং যারা কংগ্রেসের বাইরে। কংগ্রেস অন্য দলভুক্ত লোকদের মনে তার নীতির প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করবে, কিন্তু একটা সর্ব্বসম্মত মিটমাটের খাতিরে কখনও তার মূল নীতি বিসর্জ্জন দেবে না।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে আবেদন জানান যে, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধী মোটামুটি একটা মিটমাট করে হিন্দু-মুসলমানের তরফ থেকে যুক্তভাবে একটা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী পেশ করুন। কিন্তু মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত এখন তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন সূচনা করে না।

১

### খাকসারদের স্বরূপ?

খাকসাররা এ যাবৎ লাহোরে মসজিদের মধ্যে ঘাঁটি করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করছিল; কিন্তু এ সপ্তাহে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট মসজিদ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ ও মুসলমান পুলিশ মসজিদে ঢুকে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িয়ে তাদের পাকড়াও করতে থাকে। খাকসাররা প্রবলভাবে বাধা দেয়। এক জায়গায় পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালায়। একজন খাকসার নিহত হয়।

স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বৃটেনের শত্রুদের সঙ্গে খাকসারদের সম্পর্ক আছে এ রকম স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেছে। সেটা কতদূর সত্যি বলা যায় না, তবে খাকসার বাহিনী যে সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সুযোগ বুঝে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবার ছদ্মবেশী আধা-সামরিক শক্তিরূপে গঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ খুব কম। এর পেছনে বড় বড় আমীর ওমরাহ নিশ্চয়ই রয়েছেন, যাঁরা প্রচুর অর্থ দিয়ে এই বাহিনী গঠনে সাহায্য করেছেন; কিন্তু আপাতত তাঁদের নাম জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে না। যেটুকু গণ্ডগোল খাকসারদের নিয়ে করা হচ্ছে তাও সম্ভবত করা হত না (বিশেষত মুসলিম লীগ প্রদেশে), যদি না তারা এই সংকট-কালে পাঞ্জাবের মত সামরিক প্রদেশে বৃটিশ সমরোদ্যম বিক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা না করত। এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা যায় যখন দেখি, যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই খাকসারী জুলুম-কেই সত্যাগ্রহ বলে জাহীর করা হয়েছিল, যখন দেখি 'পঞ্চম বাহিনী' বলে যে খাকসারদের পাঞ্জাবে দমন করা হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশে সেই খাকসাররা বর্ত্তমানে অবাধে সংগঠন ও প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে। বাস্তবিকই যদি খাকসার দলকে শত্রুপক্ষের সহযোগী মনে করা হত এবং খাকসার দলকে দিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার মতলব না থাকত তাহলে এতদিন সারা ভারতবর্ষে এই দলকে বে-আইনী করে দেওয়া হত এবং তাদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমন করে ফেলা হত।

'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গর্হিত মন্তব্য করায় বাঙলা গবর্ণমেণ্ট আদেশ জারী করেছেন যে, এখন থেকে তিন মাস পর্য্যন্ত ঐ কাগজের সমস্ত সম্পাদকীয় রচনা গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে আগে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে।

### ভারতের রাষ্ট্রনীতি

যুদ্ধের চরম সংকটেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে না। ভারত সচিব মিঃ এমেরী দুটি বিবৃতি দিয়েছেন; তাতে সেই একই কথা—স্বাধীনতা কি কেউ কাউকে দিতে পারে? নিজের যোগ্যতায় স্বাধীনতা নিতে হয়; আগে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মেটানো দরকার, তারপর ............ইত্যাদি।

বিভিন্ন কংগ্রেস প্রদেশে সত্যাগ্রহী সংগঠন চলছে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহী সংখ্যা হয়েছে মোট ৩৩১১৯। বাঙলার এড হকী কংগ্রেস এখনো নাকি কোনো সত্যাগ্রহী তালিকা পাঠাতে পারে নি।

ভারত রক্ষা আইনে ধরপাকড় সমানভাবেই চলছে। এ সপ্তাহে বাঙলার প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়দের নিয়ে আবার একটু গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। ধাঙ্গড়দের ইউনিয়নের নেতারা এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখছেন না। ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট মিটমাটের সর্ত্তাবলীর মধ্যে দুটি সর্ত্ত ছিল এই—কোনো ধর্ম্মঘটীকে কর্ম্মচ্যুত করা হবে না এবং কর্পোরেশন তদন্ত কমিটি ধর্ম্মঘট কমিটির সহ-যোগিতায় ধাঙ্গড়দের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করবেন। কিন্তু বহু ধর্ম্মঘটীকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তদন্ত কমিটি ধর্ম্মঘট কমিটির সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ করছেন না।

# ইওরোপ

**ফ্রান্সের পরাজয়**

এ সপ্তাহে মিত্রশক্তির প্রকান্ড বিপর্য্যয় হয়ে গেল। জার্ম্মান-বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে ফরাসী রাজধানী দখল করে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যায় এবং মাজিনো লাইন পিছন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; সংগে সংগে পূর্ব্ব থেকে জার্ম্মান সৈন্যেরা রাইন নদী অতিক্রম করে মাজিনো লাইন আক্রমণ করে। এ অবস্থায় ফ্রান্সের পক্ষে আর লড়াই চালানো এক রকম অসম্ভব হয়ে ওঠে। রেণো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং মার্শাল পেত্যাঁর নেতৃত্বে আধাসামরিক এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী হয়েই মার্শাল পেত্যাঁ জার্ম্মানীর সংগে সন্ধি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধ বিরতির জন্যে মধ্যস্থ হয়েছেন। ফ্রান্সের শান্তি-প্রস্তাব গ্রহণ করবার আগে হের হিটলার সিনর মুসোলিনীর সংগে পরামর্শ করবেন; তাঁদের পরামর্শ আরম্ভ হয়েছে। ইতালীও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; সুতরাং ফ্রান্সের সংগে মিটমাট হিটলার ও মুসোলিনীর যুক্ত সর্ত্তে হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন জার্ম্মানীর সংগে যুদ্ধরত থাকল একমাত্র বৃটেন ও তার সাম্রাজ্য। ফ্রান্সে মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তনের আগে মঃ রেণো আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্যে এক শেষ আবেদন জানিয়েছিলেন; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তার উত্তরে জানান যে, ফ্রান্স যতদিন লড়াই চালাবে ততদিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাকে শুধু সমরোপকরণ দিয়ে সাহায্য করবে; কিন্তু সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে অক্ষম। এর পরই ফ্রান্স লড়াই বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত করে।

ফ্রান্স সরে যাওয়ার পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করেছেন যে, বৃটেন ও তার সাম্রাজ্য একাই হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে।

**ইতালীর সংগে সংঘর্ষ**

ইতালীর সংগে মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রধানত বিমান আক্রমণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। মাল্টাতে এ পর্যন্ত মোট ২৮ বার ইতালীয় বিমানবহর বোমা বর্ষণ করেছে। বৃটিশ বিমানবহরও ইতালীয় সহর তুরিন, মিলান ও জেনোয়া আক্রমণ করে। এ ছাড়া আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়াতেও খানিকটা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালীয় রাজ্য লিবিয়া এরিত্রিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যান্ড, আবিসিনিয়া এবং ফরাসী রাজ্য টিউনিসিয়া ও বৃটিশ রাজ্য মিশর, কেনিয়া, এডেন প্রভৃতি স্থানে পারস্পরিক আক্রমণ চলতে থাকে। এক পক্ষ অপরের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে বলে দাবী করছে।

হিটলার ফ্রান্সে এক মার্কিণ সাংবাদিকের কাছে বলেছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বরং যে সব ইংরেজ সেই সাম্রাজ্য ধ্বংস করছে তাদের ধ্বংস করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এ কথার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, হিটলার বর্ত্তমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করে তার জায়গায় নিজের তাঁবেদার একটা গবর্ণমেণ্ট খাড়া করতে চান এবং সেই গবর্ণমেণ্টের মারফতে বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসন করতে চান।

**সোভিয়েট**

ফ্রান্সের পতনের সংগে সংগে সোভিয়েট তার পশ্চিম সীমান্ত শক্ত করছে। লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েট এই অভিযোগ করে যে, তারা সোভিয়েটের সংগে তাদের চুক্তি যথোচিত পালন করছে না। এই অভিযোগ করেই সোভিয়েট ঐ তিন দেশে লাল ফৌজ পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে সোভিয়েট ঘাঁটি শক্ত করার দাবী জানায়। তিন দেশই সোভিয়েটের দাবী মেনে নেয়; তবে লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়ার গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করে।

সোভিয়েট শীগ্গিরই জার্ম্মানীর সংগে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখছে কি না, এই ঘটনায় তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়। তবে জার্ম্মানী এখনো তাকে তোয়াজ করছে; একটা ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। লিথুয়ানিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোভিয়েটের দাবীর পর পদত্যাগ করে জার্ম্মানীতে চলে যান; কিন্তু জার্ম্মানীতে তাঁকে অন্তরীণ করা হয়েছে এবং সে খবর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে জানানো হয়েছে।

**জাপান**

ইউরোপীয় সংঘর্ষ চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ায় জাপান চীনে আক্রমণ তীব্রতর করেছে। তারা চুংকিংএর উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করেছে এবং আরও বোমা বর্ষণের হুমকি দেখিয়ে বিদেশী প্রতিনিধিদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেছে। তারপর চীনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর জন্যে সে ফরাসী ইন্দো-চীনকেও শায়েস্তা করবার ভয় দেখিয়েছে। এদিকে জাপ সৈন্যেরা চীনে ইচাং দখল করেছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, মিত্রশক্তির দুরবস্থায় সুযোগ নিয়ে এইবার পূর্ব্ব এশিয়ায় সমস্ত ঘাঁটি দখল করে নেবার মতলব জাপান করেছে।

জাপান ও সোভিয়েটের মধ্যে মাঞ্চুকুও ও মঙ্গোলিয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট করে চুক্তি হয়ে গেছে।

১৭।৬।৪০ —ওয়াকিবহাল
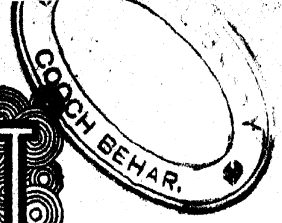
## অভিনব হার্ডল রেস

স্পোর্টসে অনেকেই হার্ডল রেস দেখেছেন। আজকাল মেয়েরা পর্য্যন্ত এই দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন। রোম সহরে কিছুদিন পূর্ব্বে ইতালী গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এক দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় হার্ডল রেস অনুষ্ঠানটি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাধারণত হার্ডল রেসে কাঠের বেড়া সাজিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় তার পরিবর্ত্তে বন্দুকের সঙ্গীন উঁচুকরে সার বেঁধে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল; আর সাহসী সৈনিকেরা সেই তীক্ষ্ম লৌহ ফলকের উপর দিয়ে লাফিয়ে নিজেদের দৈহিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। প্রকাশ, ঐ বেড়া লাফাতে গিয়ে কয়েকজন ফ্যাসীষ্ট প্রতিযোগী শোচনীয়রূপে আহত হয়। প্রতিযোগিতায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থেকে সিনিয়র মুসোলিনী প্রতিযোগিদের সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমাদের বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোনরূপ টিপ্পনিকাটা শোভা পায় না।

ইতালীয় সৈন্যরা বন্দুকের উপর দিয়ে লাফাচ্ছে

## কুমীরও দাঁত মাজে

আমরা ভাবি আমরাই কেবল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শরীরের যত্ন নিই। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন জীব যেভাবে শরীর পরিষ্কার রাখে তা আমরাও পারি না। নদীর চড়ায় কুমীর প্রায়ই হাঁ করে শুয়ে থাকে। আর শালিকের দল কুমীরের দাঁতের ফাঁকে যেসব মাংসের কুচি থাকে তা পরিষ্কার করে খায়। কুমীরকে এ সময় খুব ধার্ম্মিক বলেই মনে হয়। কথায় আছে, বালাই বড় দায়।

## অদ্ভুত উপায়ে লক্ষ্যভেদ

অনেক সময় দূরের জিনিষকে বন্দুক সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করা অসুবিধা হয়ে পড়ে। নীচের ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্দুক ছুড়লে লক্ষ্যস্থান যে নিশ্চয় ভেদ করা যায় তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

নূতন বন্দুকে জনৈক বৃটিশ সৈনিক লক্ষ্যভেদ করছে

# পুস্তক পরিচয়

এক মুঠো—শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী; প্রাপ্তিস্থান 'ভারতী ভবন', ১১, কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাঙলার বর্ত্তমান কাব্য সাহিত্যের ভরা স্রোতে নানা নূতন ঢেউএর দোলায় এক সম্পূর্ণ নূতন গতি জেগেছে। কাব্যবিলাসের স্বপনময় শূন্যলোক থেকে বর্তমান যুগের কবি নেমেছেন 'শক্ত ডাঙায়' বুকে জীবনের রূঢ় নৃত্যের তালে কবিতার তাল মেলাতে। কবিতার ভাষায় তাঁর আজ তাই সুরের মাদকতা না থাকলেও গতির আবেগ আছে; ছন্দলালিত্য ক্রমশই লুপ্ত হতে থাকলেও রুদ্ধ প্রাণশক্তির ক্ষণউৎসারিত প্রচণ্ডতার নির্দ্দেশ আছে। তাঁর কাব্যে রূপকের রূপ গিয়েছে বদলে নতুন যুগের জীবনের নতুনতর অভিজ্ঞতার কর্কশ আঘাতে; বিষয়-বস্তুর পরিধি ক্রমশই বিস্তৃতিলাভ করেছে, দৃষ্টি ও রচনাভঙ্গিতে তীক্ষ্ন বিচার ও শ্লেষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আধুনিক কাব্যের মূল লক্ষণের এই বেড়াজালে অমিয়বাবুর সব কবিতাকেই আয়ত্তিতে আনবার চেষ্টা করলে অবশ্য ভুল হবে। প্রত্যেক কবির মননশক্তি বা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা এক নয়; তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশেও তাই একটি নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকবেই। উগ্র আত্ম-সচেতনতার (self-conciousness) এই যুগে প্রত্যেক কবির কাব্যে এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশই আরো প্রকট হয়ে উঠছে। অমিয়বাবুর বহুদেশভ্রমণকরা দৃষ্টি এবং মন দেখেছে, ভেবেছে, স্পর্শ করেছে এবং অনুভব করেছে এই পৃথিবীকে তার দিগন্তবিস্তৃত বিচিত্রতায়। "ব্যথা-বরণী বোবামির স্বাক্ষর মস্ত মাটির ধরণী"র নির্ব্বাক রূপ ও বাণী তাঁর কল্পনার বিদ্যুৎ আলোকে ঝলসিত হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। গভীর বেদনাবোধের সঙ্গে তিনি এ জীবনের "সব-হারানোকে" সংগ্রহ করতে চেয়েছেন পৃথিবীর মৃন্ময় পাত্রে। দরদী পাঠকমাত্রেই অনায়াসে উপলব্ধি করবেন যে, সে-পাত্র যত্নে সঞ্চিত আছে তাঁর মনেরই গভীরে এবং যে মাটিতে সে-পাত্র গড়া হয়ত বা তা সুজলা শ্যামলা বাঙলারই মাটি। 'এক মুঠো'র প্রথম অংশের প্রায় কবিতাতেই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ' এই সুরটিই ঘুরে ফিরে কোথাও আভাসে কোথাও বা গভীর তানে বেজেছে। বলা বাহুল্য কবির ধারণার এ-ধূলিকণাতে মানুষের আনন্দ-বেদনাময় সমগ্র জীবন এমন কি দেহ পর্য্যন্ত মিশে আছে, আর তাঁর এই পৃথিবীর 'ধারিণী' বুঝিবা বাঙলারই 'চেনা-গন্ধী' মাটি। এই সূত্রে 'মাঙ্গলিক', 'উড়ন্ত', 'বিরহান্ত', 'বৃষ্টি', 'সংসার', 'আরোগ্য' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করলে কবির কাব্যের উপরিউক্ত বিশিষ্ট সুরটির সঙ্গে পরিচয় সহজ হবে। বাঙলার আধুনিক কবিদের কাব্যে এই সুরই স্বচ্ছন্দে রণিত হবার কথা, কিন্তু কৈ, এমন করে এ-সুর ত আর কোথাও ইতিপূর্ব্বে শুনতে পাই নি। কোনও এক বিশেষ অনুসঙ্গে 'বাঙলার আধুনিক কবি' বলে উল্লেখ করলেও অমিয়বাবুকে এ ধরনের সঙ্কীর্ণ কোনো সংজ্ঞার মধ্যে যে বাঁধা চলে না তা তাঁর অন্য কয়েকটি কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। পেশোয়ারী 'সবুজিমণ্ডির হিজিবিজি ভিড়ের' (chaos)—শব্দের এবং লোকের ভিড়ের—সমগ্রতার যে বুকফাটা সঙ্গীত বা 'সঙ্গৎ' (harmony) কবি অন্তরের গভীর শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে শুনেছেন তা কোনো সঙ্কীর্ণ-কল্পনার কবির পক্ষে শোনা সম্ভব হ'ত না। 'উড়ন্ত' কবিতাটিতেও বাঙলার পল্লীছবির ছোঁয়া যতই সুনির্দ্দিষ্ট হোক না কেন সে-ছবি 'ডুবন্ত মনের'ই ছবি, ভাষায়, ছন্দে, বিষয়বস্তুতে অতি আধুনিক যুগের বিশিষ্ট ছাপটুকুই এ কবিতাটির বৈশিষ্ট্য। এই অবসরে বলে নেওয়া ভাল 'রামায়ণ' কবিতাটি 'এক মুঠো'র অন্য কবিতার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান ঠেক্‌ল। ভাল হোক বা মন্দ হোক, ও-ধরনের কবিতা বিষ্ণু দে-র হাতে বেরুলেই যেন মানানসই হয়।

'এক মুঠো'র তৃতীয় বা শেষ অংশে আছে একটিমাত্র দীর্ঘ কবিতা—'যুদ্ধের খবর'। স্বচ্ছন্দ ছন্দে সম্পূর্ণ আধুনিক ভঙ্গিতে লেখা এই কবিতাটির পঙক্তিশেষে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী মিল দেওয়া হয়েছে। ছন্দের নিত্যনূতন বৈচিত্র্যে এবং অনুপ্রাস ও মিলের ইতস্ততঃ খণ্ডিত এই ধারার সাহায্যে চিন্তা ও তর্কমূলক এই কবিতাটি গতির বেগ এবং সাম্য অনেক পরিমাণে সাফল্যের সহিত সংরক্ষিত হয়েছে।

"মারচে অমুক দেশকে অমুক"—এ ধরনের শুকনো খবর দেবার আয়োজন কবি করেন নি তাঁর কবিতায়; তিনি সংবাদপত্রের ফেরিওলা নন মোটেই। 'মানুষ মারচে মানুষকে'—এইটাই মূল সংবাদ যুধ্যমান জগতের সম্বন্ধে। দেখলাম তিনি সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছেন,—

> "ঝড়, প্রবৃত্তি
> উপকরণ। ধ্বংসের নিবৃত্তি
> নয় তাদের এড়িয়ে—পৃথিবী নিয়ে
> মৈত্রেয়ী হবে অমৃতা। নয়তো ব্যর্থ।"

"প্ল্যান করা ধ্যান করা শ্রম"—সেই 'প্রাণের আশ্রমে' 'একের বা দশের চক্রান্তে সহস্রের বঞ্চিত দাবী'র মীমাংসা সুষ্ঠুভাবে করতে না পারা পর্য্যন্ত মুক্তির আশ্বাস ব্যর্থ, ব্যঙ্গ মাত্র। অতএব ঃ

> "মেনে অন্তরের উদ্দেশ
> বদলাও, বদলাও, বদলাও পরিবেশ।"

'এক মুঠো'র মাত্র ঊনিশটি কবিতার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে অমিয়বাবু তাঁর অভিজ্ঞতার, চিন্তার এবং স্বপ্নের (আধুনিক যুগের কবির পক্ষে যতটুকু স্বপ্ন দেখা সম্ভব) যে দুকূলপ্লাবী কাব্য-প্লাবন প্রবাহিত করেছেন, সাহিত্যামোদী পাঠককে তার মাধুরী মুগ্ধ করবে এবং তার প্রচণ্ডতা অভিভূত করবে।

# সাহিত্য-সংবাদ

### ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘ

চন্দননগর 'ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘের' ৪র্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে।

প্রতিযোগিতার কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই।

১। প্রবন্ধ। ফুলস্কেপ কাগজের ১ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠা।

২। গল্প। ১ পৃষ্ঠা হইতে ১২ পৃষ্ঠা।

৩। কবিতা।

৪। রঙ্গিন চিত্র। সাইজ ৭"×৫"। শেষ তারিখ ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭।

৫। ফটো (এ্যামেচার)। সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং অপ্রকাশিত হওয়া চাই। শেষ তারিখ ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৭।

উক্ত রচনাসমূহ ৩২শে আষাঢ় (ইং ১৬ই জুলাই, ১৯৪০), ১৩৪৭ সালের মধ্যে পুরা নাম ও ঠিকানা সমেত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ডাক টিকিট প্রয়োজন। নচেৎ অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। মনোনীত রচনাগুলি 'ঝরণা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষের থাকিবে।

পুরস্কার—প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থানের জন্য ১টি করিয়া রৌপ্য পদক। যথেষ্ট সংখ্যক লেখা আসিলে ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

ঠিকানা ঃ—শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার গুঁই, তেমাথা, সত্যপীরতলা, চন্দননগর।

### গল্প প্রতিযোগিতা

'পূজারিণী' পত্রিকার পরিচালকবৃন্দের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারীদের পূর্ণিমা হোসিয়ারী মিল প্রদত্ত একটি করিয়া রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। ৩রা জুলাইয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্প পাঠাইতে হইবে। প্রবেশ মূল্য নাই। —শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস, C/o পূর্ণিমা হোসিয়ারী মিল, ৯।৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

### রচনা প্রতিযোগিতার ফল

হাওড়া জেলার 'মানশ্রী তরুণ সঙ্ঘ' কর্ত্তৃক রচনা, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ—প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে [illegible] 'তরুণ' নামাঙ্কিত রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধ ঃ—১ম—"প্রগতি সাহিত্যের ধারা"—শ্রীদীনেশ বসু [illegible]
২য়—"পল্লীজীবন"—পূর্ণবিকাশ রায় চৌধুরী (হাওড়া)

গল্প ঃ—১ম—"বেকার যুবক"—শ্রীমতী নীলিমা [illegible] (কলিকাতা)
২য়—"মায়ার হাসি"—অশোক রায় (বর্দ্ধমান)

কবিতা ঃ—১ম—"ভিক্ষুক"—সুধীর মণ্ডল (হুগলী)
২য়—"আহ্বান"—প্রীতিকণা ভট্টাচার্য্য (কলকাতা)

## চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতি যে যে কারণে ব্যাহত হইতেছে তাহাদের মধ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষিত লোকের অভাব যে অন্যতম প্রধান একটি কারণ এ বিষয়ে দ্বিমত করিবার কিছু নাই। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করিবার কিংবা ইহার আয়ু বাড়াইবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্তও হয় নাই—ক্ষেত্র বিস্তার করার প্রশ্ন তবু এক্ষেত্রে আমরা বাদ দিয়াই রাখিলাম। একটা বীজ হইতে সুবিশাল ও ফলফুল সমৃদ্ধ মহীরূহ আশা করিলে, সেই বীজ বপন কাল হইতেই রীতিমত পরিচর্য্যা করিয়া যাইবার দরকার হয়, ইহার পরিপুষ্টি ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের বীজ একে মরুভূমিতে রোপিত হইয়াছে তাহার উপর উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে গাছটি আর চারা অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বীজ যাঁহারা বপন করিয়াছেন তাঁহারা ইহার পরিপুষ্টির কোন উপায়ই ঠিক করিয়া রাখেন নাই।

আজ প্রয়োজনানুযায়ী চিত্রনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান বাড়ান সম্ভব হইতেছে না; দেশের যে পরিমাণ চাহিদা, নির্ম্মিত মোট ছবির সংখ্যা সে চাহিদা মিটাইতে অক্ষম হইতেছে। ইহার কারণও উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত সংগঠন শিল্পীর অভাব বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। উপযুক্ত মূলধনের অভাব একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মোট যত ব্যবসায়ী আজ পর্য্যন্ত এই পথে পা বাড়াইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম নহে। কিন্তু তাঁহারা যে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই, ছবির অসাফল্যই তাহার একমাত্র কারণ; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আর ছবির অসাফল্য অশিক্ষিত সংগঠন শিল্পীদের জন্যই যে হইয়াছে সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ নিউ থিয়েটার্স প্রমুখ কয়েকটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল সাধনার ফলে নিজেদের সংগঠন শিল্পীদের কিছু পরিমাণ শিক্ষিত করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছেন এবং এই জন্যেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ইহাদের দ্বারা উৎকৃষ্টতর ছবি তোলা সম্ভব হইতেছে। প্রতিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠানই যখন শিক্ষিত কলাকুশলীর অভাব বোধ করিতেছে তখন স্বাধীন প্রযোজকদের পক্ষে অথবা কোন নবব্রতীর পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে অবতরণ করা মোটেই নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায় না।

এ অবস্থায় প্রশ্ন হইতেছে, শিক্ষিত সংগঠন শিল্পী পাওয়া যায় কিভাবে, অথবা এই প্রশ্নটিকেই ঘুরাইয়া বলিতে হয়, সংগঠন শিল্পীদের শিক্ষিত করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে? শিক্ষিত সংগঠন শিল্পীর অভাব দেখিয়া কোন কোন প্রযোজক বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আনাইয়া কাজ করাইয়াছেন, কিন্তু বিদেশীদের পোষা এখানকার প্রযোজকদের তহবিলের সাহায্যে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আরও একটা অসুবিধা এই হয় যে, শিল্পী যত গুণসম্পন্নই হোন না কেন, কোন বিদেশীর পক্ষে এদেশে আসিয়া ঠিক এদেশের রুচি ও মনের তৃপ্তিদায়ক কিছু করিয়া ওঠা সম্ভব নয়—অর্থাৎ পুরাদস্তুর দেশীয়ভাবাপন্ন না হইলে তাহার পক্ষে এদেশের পছন্দমত ছবি তোলা সম্ভব হইবে না।

সংগঠন শিল্পীদের শিক্ষিত করিয়া তোলারও ব্যবস্থা বর্ত্তমানে নাই। বিদেশ হইতে কয়েকজন কয়েকটি বিভাগে শিক্ষালাভ (?) করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় কিন্তু দেশীয় ভুঁইফোড় ওস্তাদদের ডিঙাইয়া আজ পর্য্যন্ত একজনও লোক চক্ষুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হন নাই। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় কিরূপ শিক্ষা তাঁহারা খরচ করিয়া বিদেশ হইতে লাভ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, বিদেশে লোক পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া আনিবার উপায়ও নাই।

এই অবস্থায় একমাত্র উপায় আমাদের নিজেদের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা। চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। ইচ্ছা থাকিলেও কোন একটি বা দু'একটি চিত্রনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও মিলিতভাবে এ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হইতে পারে। ইহার জন্য ভারতের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত হইতে হইবে। তৎসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির নিকট হইতেও সাহায্য আদায় করিয়া লইতে হইবে। এ ব্যবস্থা অচিরেই না সম্পন্ন করিতে পারিলে চিত্রশিল্পের উন্নতির কোন আশা পোষণ করা যায় না। অনুশীলন ও গবেষণা ব্যতিরেকে কোন বস্তুকেই উন্নততর করিয়া তোলা যায় না, কোন বস্তুকেই স্থায়িত্ব দান করা যায় না।

## নিউ সিনেমায় 'নেকেড ট্রুথ'

গত শনিবার হইতে নিউ সিনেমায় ভবনানী প্রডাকশন-এর নূতন চিত্র 'নেকেড ট্রুথ' অথবা 'নগ্ন সত্য' প্রদর্শিত হইতেছে। জনকল্যাণের আদর্শ লইয়াই এই হিন্দী চিত্রটি গৃহীত হইয়াছে। সভ্য মানব রুচিবিকারের আশঙ্কায় যে নগ্ন-সত্য এতদিন গোপন রাখিয়াছিল, নৈতিক অধঃপতনের পথ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার স্বরূপ এই চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮২ সালে নরওয়েজিয়ান সাহিত্যিক হেনরীক ইবসেন 'এ্যান এনিমি অব দি পিপল' নামে একটি নাটক লেখেন, সেই কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্র-কাহিনী রচিত। বিমলার ভূমিকায় শেরিফা সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নবীন যাজ্ঞিক, বিমলকুমারী, ত্রিলোক কাপুর, নয়াজপল্লী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

### কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ খেলা আরম্ভ হইবার দুই সপ্তাহ পরে খেলায় যোগদান করায় এখনও পর্য্যন্ত প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ করিতে পারে নাই। তবে আলোচ্য সপ্তাহে এই দলের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হইবে। মোহনবাগান ক্লাব দল এখনও পর্য্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে। অপরাপর দলের সহিত এই দলের পূর্ব্বাপেক্ষা পয়েন্টের ব্যবধানও বৃদ্ধি পাইয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার এই দলের যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ইহা বলাই বাহুল্য। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই দল এই গৌরব অর্জ্জনে সফল হইবে কি না ইহা দৃঢ়তার সহিত বর্ত্তমানে বলা যায় না। প্রথমার্দ্ধের শেষের দিকে কয়েকটি খেলায় মোহনবাগান দল খুবই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের খেলা প্রদর্শন করিতেছে। সেইজন্য উপরোক্তরূপ আশংকা করিবার কারণ হইয়াছে। এই দলের আক্রমণ বিভাগের খেলা মোটেই চ্যাম্পিয়ান দলের ন্যায় হইতেছে না। অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এই দলের আক্রমণভাগের সকল খেলোয়াড়গণের মধ্যে দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পর পর দুইটি খেলায় এই ব্যাধি খেলোয়াড়গণের মধ্যে এইরূপ মারাত্মকভাবে দেখা দিয়াছিল যে, মোহনবাগান দলের অতি বড় সমর্থনকারীর পক্ষেও ধৈর্য্য ধরিয়া খেলা দেখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। খেলার শেষে অনেককে বলিতে শোনা গিয়াছিল "এঁদের বাদ দিয়ে নূতন খেলোয়াড়দের নিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন গঠন না করলে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ান হবার আশা নেই।"

খেলা দেখিয়া অত্যন্ত হতাশ হইবার ফলেই এইরূপ উক্তি তাঁহারা করিয়াছেন। মোহনবাগান ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণের উচিত এই সকল সমর্থনকারীদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার মত ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেইজন্য তাঁহাদের বর্ত্তমানে আক্রমণভাগের সকল খেলোয়াড়দের বাদ দিয়া নূতন করিয়া আক্রমণভাগ গঠন করিতে আমরা বলি না। ঐরূপ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই বিভাগের দুই একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া যদি সম্ভব হয় দিতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়াছে এই বিভাগের খেলোয়াড়গণকে ধীর স্থির মস্তিষ্কে খেলিবার নির্দ্দেশ দেওয়া। গোলের সম্মুখে গিয়া খেলোয়াড়গণ গোল করিবার জন্য যদি অতিরিক্ত চঞ্চল না হন ও অবস্থা বুঝিবার মত ধৈর্য্য রাখেন তবে আমাদের বিশ্বাস আছে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেরূপ নৈরাশ্যজনক খেলার অবতারণা করিতেছেন তাহা বিদূরিত হইবে। চঞ্চলতাই তাঁহাদের ব্যর্থতার কারণ। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের চ্যাম্পিয়ানশিপের আশা এখনও আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ খেলায় যোগদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই এই দল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে শীঘ্রই লক্ষ্মীনারায়ণ খেলিবার অনুমতি পাইবেন। তখন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে চ্যাম্পিয়ান হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ইহা ধারণা করা অন্যায় হইবে না। রেঞ্জার্স ও কালীঘাট দলের চ্যাম্পিয়ানসিপের আশা আর নাই। অঘটন না ঘটিলে এই দুইটি দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে যে দেখা যাইবে না ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দল পূর্ব্বাপেক্ষা খেলায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। মোহনবাগান দলের নিকট পরাজিত হইবার পর এই দলের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা অপসারিত হইয়াছে। এই দল চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলকে যে বেশ বেগ দিবে ইহা অনেকেই আশা করিতেছেন। ভবানীপুর দল পর পর কয়েকটি খেলায় পয়েন্ট সংগ্রহ করায় মনে হইয়াছিল এই দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবার হাত হইতে রেহাই পাইবে। বর্ত্তমানে কিন্তু সেইরূপ সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যাইতেছে না। প্রতি খেলায় নূতন নূতন খেলোয়াড় দলভুক্ত করিয়া খেলায় সাফল্যলাভ করিবার প্রচেষ্টাই এই দলকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রথা ত্যাগ করিলে বোধ হয় ভাল করিবেন।

### খেলা পরিচালনায় ত্রুটি

খেলা পরিচালনায় রেফারিগণের ত্রুটি ক্রমশই মারাত্মকভাব ধারণ করিতেছে। হঠাৎ যদি কোনদিন কোন খেলার মাঠে ভীষণ গোলমাল হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় তবে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। রেফারী পরিচালকমণ্ডলী এই দিকে কেন যে দৃষ্টি দিতেছেন না, বুঝিতে পারা যায় না। রেফারীর অভাবই যদি বিহিত ব্যবস্থার অন্তরায় হইয়া থাকে তবে সেই অভাব যাহাতে বিদূরিত হয় তাহার ব্যবস্থা কি এখন হইতেই তাঁহাদের করা উচিত নহে? ফুটবল খেলা বাঙলার জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে সুতরাং চেষ্টা করিলে বহুসংখ্যক ভাল রেফারী বাঙলা দেশে পাওয়া যাইবে না, ইহা বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইতিপূর্ব্বে রেফারী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেই পরীক্ষা বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত হইতেছে কি? এখনও যদি প্রতি বৎসর সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহা সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে প্রচার করা হয় না কেন? ইহাই কি রেফারী পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয়?

### অন্যান্য ডিভিসনের খেলা

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগের খেলায় অরোরা ক্লাব দলের চ্যাম্পিয়ানসিপের আশা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ডালহৌসী দল এই দলের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বর্ত্তমান আছে। কুমারটুলী ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

তৃতীয় ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় বেনিয়াটোলা দল সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে। শীঘ্র কোন দল এই দলকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থ ডিভিসনে জোড়াবাগানের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে। নিম্নে প্রথম ডিভিসনের লীগের ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

### লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

| প্রথম ডিভিসন | | খেঃ | জঃ | ড্র | পরাঃ | স্বঃ | বিঃ | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | ... | ১৫ | ১১ | ১ | ৩ | ১৬ | ৬ | ২৩ |
| ইষ্ট বেঙ্গল | ... | ১৪ | ৭ | ৫ | ২ | ১৩ | ৭ | [illegible] |
| রেঞ্জার্স | ... | ১৫ | ৭ | ৪ | ৪ | ২০ | ১৩ | [illegible] |
| কালীঘাট | ... | ১৪ | ৫ | ৬ | ৩ | ১৬ | ১১ | [illegible] |
| ই বি আর | ... | ১৫ | ৫ | ৬ | ৪ | ১৭ | ১৬ | [illegible] |
| মহঃ স্পোর্টিং | ... | ১০ | ৬ | ৩ | ১ | ১৮ | ৫ | [illegible] |
| বর্ডার রেজিঃ | ... | ১৪ | ৬ | ৩ | ৫ | ১৫ | ১৫ | [illegible] |
| এরিয়ান্স | ... | ১৫ | ৫ | ৪ | ৬ | ১১ | ১৮ | [illegible] |
| কাষ্টমস | ... | ১৫ | ৩ | ৫ | ৭ | ৮ | ১৫ | [illegible] |
| কাল্যকাটা | ... | ১৫ | ৩ | ৫ | ৭ | ১৪ | ২০ | [illegible] |
| পুলিশ | ... | ১৫ | ৩ | ৪ | ৮ | ১৮ | ২৪ | [illegible] |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ... | ১৪ | ৩ | ৪ | ৭ | ১০ | ১৯ | [illegible] |
| ভবানীপুর | ... | ১৫ | ৩ | ২ | ১০ | ৭ | ২২ | [illegible] |

# সমর বার্ত্তা

১১ জুন।—

প্যারিস হইতে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্যারিসের জনসাধারণ দলে দলে শহর ত্যাগ করিতেছে। এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মনরা সীন নদী অতিক্রম করিয়াছে।

ইতালির সৈন্যরা কয়েক স্থান আক্রমণ করিয়াছে, সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মুসোলিনী ইতালীয়বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। রোমের সংবাদ, সামরিক দপ্তর ও সামরিক মন্ত্রীদের প্রধান দপ্তর রোম হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ড ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

মার্কিন প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতায় মিত্রশক্তিকে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে।

১২ জুন।—

ফ্রান্সে জার্মন অভিযানের আজ ৮ম দিবস। তাহাদের সাঁজোয়াবাহিনী রণাঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে রোঁআ ও ভের্নোর মধ্যবর্তী ৪০ মাইল ব্যাপী স্থানে প্রবেশ করায় প্যারিসের প্রায় ৩০।৪০ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। প্যারিসের বহু দোকানপাট বন্ধ বা পরিত্যক্ত।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) ও ব্রিটেনের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৩ জুন।—

জার্মনরা প্যারিস হইতে ২০ মাইল দূরে রহিয়াছে।

সমুদ্রতীর হইতে আরগ' পর্যন্ত সমগ্র রণক্ষেত্রে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। সীন ও মার্নে নদীর তীরে প্যারিসের উভয় পার্শ্বে জার্মন আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়াছে। মিত্রশক্তির সৈন্যরা অসীম বীরত্বের সহিত বাধা দিতেছে। প্যারিসের সংবাদ—প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও জার্মনির ১২০ ডিভিসন সৈন্য একসঙ্গে নিযুক্ত থাকিয়া পশ্চিম ও পূর্বদিক হইতে প্যারিস বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্যারিস অরক্ষিত বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাংক অব ফ্রান্স প্যারিস হইতে বহু দূরবর্তী সাইমুর নামক স্থানে অন্তরিত হইয়াছে।

গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে এডেন বন্দরে ইতালীয়রা বোমাবর্ষণ করিয়াছে। আফ্রিকার উপকূলে নৌ ও বিমান যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের বিমানবহর ইটালির টোবরাক ও ইতালীয় আফ্রিকার নানা বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে।

রাজকীয় বিমানবাহিনী ইতালির প্রসিদ্ধ শহর মিলানে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

১৪ জুন।—

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার লীলাভূমি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্যারিস নগরীর পতন হইয়াছে।

জার্মনরা প্রাতঃকালে প্যারিসে প্রবেশ করিতে থাকে। সমগ্র নগরী জনহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। রাজধানীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফরাসী হাইকমাণ্ডের নির্দেশানুযায়ী ফরাসী সৈন্যেরা ইতিপূর্বেই প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

প্রকাশ, সোভিয়েটের দাবি, তুরস্ক এখন যুদ্ধের বাহিরেই থাকুক। কেবল বলকান আক্রান্ত হইলেই সোভিয়েট তুরস্ককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন।

ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবেরার উপর ইতালি কর্তৃক বিমান হামলা ঘটিয়াছে।

আন্তর্জাতিক এলাকার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য বেলা আটটার সময় ফ্রান্সের সম্মতিক্রমে স্পেন ১২০০ মুর সৈন্য পাঠাইয়া তাঞ্জিয়ার দখল করিয়াছে।

যুদ্ধপীড়িতদের সাহায্যার্থে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রেড ক্রসকে পাঁচ কোটি ডলার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৫ জুন।—

ফরাসী গভর্ণমেণ্ট [illegible] হইতেও অন্তরিত হইয়াছে। [illegible] রণাঙ্গনে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে। বার্লিনের দাবি, তাহারা ভার্দুন দখল করিয়াছে।

মিশর-লিবিয়া সীমান্তে ব্রিটিশ ও ইতালীয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিয়াছে। ব্রিটিশ বাহিনী লিবিয়ার সীমান্তবর্তী ইতালির ক্যাপুজো দুর্গ দখল করিয়াছে। এ ছাড়া ইতালির ম্যাডোলিনা দুর্গ আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পোলিশ সীমান্তে ব্যাপকভাবে সোভিয়েট ও জার্মন সৈন্য-সমাবেশ ঘটিতেছে।

১৬ জুন।—

ফরাসী বেতারের সংবাদ, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রামের প্রচণ্ডতা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত।

বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় মঃ লেব্রার সভাপতিত্বে বৈঠক আরম্ভ হয়। উদ্দেশ্য—মঃ রেনোর আবেদনে রুজভেল্ট যে উত্তর দিয়াছেন তাহার আলোচনা। বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ রক্ষার্থ যুদ্ধ চালানো আর কতদিন সম্ভবপর, উক্ত উত্তরের আলোচনার উপর তাহা নির্ভরশীল।

আজ ব্রিটিশরা ইতালির তিনটা সাবমেরিন ডুবাইয়া দেয়। ইতালিয়ন নৌ ও বিমানবহরের এক অংশ গতকল্য মিশর-লিবিয়ার সীমান্তবর্তী সোল্লাম আক্রমণ করে। ব্রিটিশ বিমানবহর আবিসিনিয়া ও অন্যান্য স্থানে হানা দিয়াছে। মাল্টায় আবার হাওয়াই হামলা চলিয়াছিল।

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট লিথুনিয়ার নিকট চরম দাবি পেশ করার ফলে লিথুনিয়ার প্রেসিডেণ্ট স্মেটোনা পদত্যাগ করিয়াছেন।

১৭ জুন।—

ফরাসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় মার্শাল পেত্যাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বে এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। জেনারেল ওয়েগাঁ দেশরক্ষা সচিব ও মঃ শোতাঁ প্রধান মন্ত্রীর সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নূতন গভর্নমেণ্ট জার্মনির সহিত সন্ধি শর্তের আলোচনা চালাইয়াছেন। পেত্যাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনারেল ফ্রাঙ্কো মধ্যস্থতা করিতেছেন। বার্লিনের সংবাদ, মার্শাল পেত্যাঁর বিবৃতি সম্বন্ধে জার্মনির মনোভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য মুসোলিনি হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

প্রধানত লাল ফৌজ মোতায়েন করিবার দাবি জানাইয়া সোভিয়েট লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার নিকট চরম পত্র দেয়। উভয় রাষ্ট্র দাবি স্বীকার করিয়াছে এবং উভয় গভর্নমেণ্ট পদত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড, বারদেরা ও তোব্রুক বিমানঘাঁটি, এলডেন, এলগুবি, ডায়ারদাওয়া প্রভৃতি ইতালি অধিকৃত নানা স্থানে ব্রিটিশ বিমানবহর হাওয়াই হামলা চালায়। রোমের সংবাদ, মাল্টা, কর্সিকা ও টিউনিসে ইতালীয়রাও হাওয়াই হামলা চালাইয়াছে।

১৮ জুন।—

রোমের পূর্বদিনের সংবাদে প্রকাশ, জার্মন হাই কম্যাণ্ড ফরাসীর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে রাজী হয় নাই।

ফ্রান্সে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। বর্দো হইতে নূতন ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ বোঁদুআঁ বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, স্বাধীনতা বিলোপের সম্ভাবনাযুক্ত অপমানজনক শর্তে আমরা কখনই অস্ত্র ত্যাগ করিব না।

এস্তোনিয়া লাটভিয়া, তালিন, তারতু প্রভৃতি বল্টিকের বিভিন্ন দেশে বিনা বাধায় সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশ করিতেছে। লিথুয়ানিয়ার পদত্যাগী প্রেসিডেণ্ট স্মেটোনাকে কোনিসবার্গে অন্তরিত করা হইয়াছে।

হিটলার-মুসোলিনী আলোচনা শেষ হওয়ায় উভয়েই মিউনিক ত্যাগ করিয়াছেন। ফ্রান্সের যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ সম্পর্কে অবলম্বনীয় মনোভাব সম্বন্ধে উভয়ে একমত হইয়াছেন।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ জুন।—

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী সার্ সেকেন্দার হায়াত খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাকসার আন্দোলনের সহিত নাৎসী গভর্নমেণ্টের যোগাযোগের সঠিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পুলিস গত সোমবারের শেষ রাত্রে লাহোরের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিয়া প্রায় তিন শত খাকসারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কদর্য উক্তির অপরাধে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক পত্রের উপর বাঙলার গভর্নমেণ্ট এই আদেশ জারি করিয়াছেন যে, তিন মাস কাল পর্যন্ত উহার সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্বে পরীক্ষার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিতে হইবে।

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, পাটনা, কাঁথি, পটাসপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড় চলিয়াছে।

১২ জুন—

রাজকোটের ঠাকুরসাহেব ধর্মেন্দ্রসিংহজী শিকার করিতে গিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ফরোআর্ড ব্লক' পত্রের ১৮ মে সংখ্যায় 'হিসাবনিকাশের দিন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে উক্ত পত্র কর্তৃক গচ্ছিত ৫০০ টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন—ছাপরা, রাঁচি, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির নানাস্থানে ধরপাকড়, বিচার, শাস্তিবিধান প্রভৃতি হইয়াছে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ মৌলানা আজাদ কর্তৃক কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। এই পদটি এতদিন শূন্য ছিল।

১৩ জুন—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাহোরের এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছেন, বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশের বিজয় বা পরাজয় যাহাই হউক না কেন, এক নূতন রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইবে। সুতরাং ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে সামান্য কারণে ঝগড়াঝাঁটি ত্যাগ করিয়া সংঘবদ্ধ হইতে উপদেশ দান করেন।

লাহোরের গোয়েন্দা পুলিস কয়েক বাড়িতে হানা দিয়া পাঁচজন খাকসার নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এছাড়া খাকসার দলের সহিত সমবেদনা সম্পন্ন বহু ব্যক্তিকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৪ জুন—

ভারত রক্ষা আইন। 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'বামপন্থিগণ' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে যথাক্রমে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বসুমতী' অভিযুক্ত হইয়াছিল। শুক্রবার সকালে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের বিরুদ্ধে চাজ্জ গঠন করিয়া শুনানী ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত মুলতবী রাখিয়াছেন। 'ফরোআর্ড ব্লক'এর গচ্ছিত ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় পুনরায় ২০০০ টাকা জামিন তলব করা হইয়াছে। এ ছাড়া কলিকাতা, কোয়েম্বাটুর, শিলং, আসাম, ২৪-পরগণা, ঢাকা শেখপুরা, পুরী, বেরেলি, পেশোয়ার, আগরতলা প্রভৃতি নানাস্থানে ধরপাকড় হইয়াছে।

ইরাক, প্যালেস্টাইন, মিশর ব্যতীত ভারতের বাহিরে আর কোনও স্থানে বিমানে পত্রপ্রেরণ সিমলার এক ইস্তাহার দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় বিমানের প্রসারকল্পে প্রথম দফায় ৯০জন লোক লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ জুন—

কালিম্পং হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া বিশ্বগ্রাসী সর্বনাশ হইতে সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে পাপ আজ সভ্যতার অস্তিত্ব লোপ করিতে উদ্যত তাহার গতি রোধ করিবার ক্ষমতা ভারতবাসীর যে কত কম তাহা ভাবিয়া প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার আক্ষেপ হইতেছে।

ভারত রক্ষা আইন। খুলনা, বিহার, বোলপুর ও রংপুর জেলার নানাস্থানে সমানে ধরপাকড় চলিয়াছে।

দমননীতি সম্পর্কে সরকারের প্রতি সতর্কতার ইঙ্গিত করিয়া মহাত্মাজী হরিজন পত্রে লিখিয়াছেন, প্রতিটি গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তাঁহার মন হইতে স্বতঃই প্রতিবাদ উৎসারিত হয়। দমননীতি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকার যত লোককে গ্রেপ্তার করিতে পারেন তাহার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার বরণ করিতে দিয়া সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্বাহক পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত পরিষদের এক অধিবেশনে অবাধ্য জেলা কংগ্রেস কমিটিদের সম্বন্ধে আলোচনা, নাগরিক রক্ষিবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা, পাট অর্ডিন্যান্স কমিটি ও ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে।

১৬ জুন—

কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বলেন, 'এই সংকটকালে দেশবন্ধু জীবিত থাকিলে হিন্দু মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করিয়া স্বরাজের এমন এক দাবি তিনি উপস্থিত করিতেন, যাহা অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইত।' সকালে সাহানগর শ্মশানঘাটে দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির প্রাঙ্গণেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তিনি বলেন, 'একটা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ৩৫ কোটি লোকের একটা এতবড় জাতিকে ২০০ শত বৎসর নিরস্ত্র রাখিয়া আজ এতবড় সংকটের মুখে ইংরেজ ছাড়িয়া দিতেছে। কোনও 'সেফগার্ড'এর প্রশ্ন না তুলিয়া আমাদের হাতে আমাদের দেশকে তাহারা ছাড়িয়া দিক, তাহাদের এই দুর্দিনেও ইতিহাস তাহাদের জয় ঘোষণা করিবে।'

ভারতসচিব মিঃ আমেরি বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনে ন্যায্য অধিকার অনুযায়ী ভারতবাসীরা যাহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা করাই তাঁহাদের (মিঃ আমেরিদের) ইচ্ছা। তবে গুরু দায়িত্বের কথা এই যে, শাসনক্ষমতা হস্তান্তরকালে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়, তাহা দেখা।

ভারতরক্ষা আইন—কালিকট, কুড়িগ্রাম, বহরমপুর, মাদ্রাজ, পাটনা, বর্ধমান প্রভৃতি নানাস্থানে যথারীতি ধরপাকড় ইত্যাদি হইয়াছে।

১৭ জুন—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন [illegible] হইয়াছে। প্রধানত আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং ভারতসচিব, বড়লাট ও জঙ্গীলাটের বিবৃতির আলোচনা চলিতেছে। ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির সংবাদে গান্ধীজী নাকি অভিভূত হইয়া পড়েন।

১৮ জুন—

নাগপুরে নিখিল ভারত ফরওআর্ড ব্লক সম্মেলনের [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অভিভাষণে বলিয়াছেন, এই ভীষণ সংকটকালে ভারতবর্ষকে প্রধানত [illegible] নিজের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এখন স্বাধীনতা [illegible] করিতে পারিলেই সে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে মানবজাতির [illegible] করিতে পারিবে।

এলাহাবাদের রেলকুলীদের ধর্মঘট আজ ৩৩ দিন [illegible] চলিয়াছে।

বোম্বাইএ প্রায় ৩০ জন জার্মানকে গ্রেপ্তার করা [illegible]

৭ম বর্ষ ] শনিবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল Saturday, 29th June, 1940 [ ৩৩শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার—**

গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের আবার সাক্ষাৎ এবং তৎসঙ্গে আলোচনাও হইল। ভারতের বিপন্ন মোস্লেম সমাজের স্বয়ংসিদ্ধ মাতব্বর জিন্না সাহেবও বাদ যান নাই। এই দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনার ফল কি হইবে, আমাদের অনুমানের বাহিরে, কারণ ভারতসচিব মিঃ আমেরী বড়লাটের হাতে ভারত এবং ব্রহ্মের সনন্দপত্র সঁপিয়া দিলেও ভারতবাসীদের দাবীকে মানিয়া লইবার কোন আভাষই আমরা তাঁহার মুখ হইতে পাই নাই। শুনা যাইতেছে, লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ভারতের বিশেষভাবে কলিকাতার বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের চাপে বড়লাট গান্ধীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং অতঃপর শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত হইতেই এমন সম্ভাবনার আঁচ কতকটা পাওয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, দেশের বাস্তব অবস্থায় মহাত্মাজীর সূক্ষ্ম অহিংস আধ্যাত্মিকতার নীতি পরিশুদ্ধভাবে মানিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বোধ হয়, এই বিবেচনারই ফল মহাত্মাজীকে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সম্পর্ক হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা। এই সব আলাপ-আলোচনা কিম্বা দেখা-সাক্ষাৎ ভদ্রতার হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু ভারতের সমস্যার সমাধানের পক্ষে এ সব বাস্তব সাহায্য এ পর্য্যন্ত করে নাই, কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল বলিতেছেন—ইউরোপের যুদ্ধের গতিবেগের চাপে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, স্বাধীনতার সঙ্কোচক ব্যবস্থাগুলি অন্তর্হিত হইতেছে, এখন আর কংগ্রেসের পক্ষে দাবীর কথা তোলা কিম্বা সঙ্ঘর্ষের কথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। পথ আপনা আপনিই [illegible]। গান্ধী-বড়লাট আলোচনায় এই মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেদের যুক্তি, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে চাপা দিয়াও আমরা অপেক্ষায় থাকিলাম।

---

**ভারতীয় সমস্যায় বড়লাট—**

সম্প্রতি বড়লাট ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আর একটি বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় নূতন কথা কিছুই নাই, ভারতের বিভিন্ন দলের ভেদ-বিরোধের কথা এবং বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সাময়িকভাবেও সেগুলি মিটাইয়া ফেলিবার জন্য মামুলী অনুরোধ আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কথা এই যে, ভারতের রাজনীতিক লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে মূলত মত-বিরোধ ভারতেও নাই এবং যাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের ভিন্ন ভিন্ন ধুয়া ধরিতেছে, তাহাদের সঙ্গে ভারতের বিপুল জনসাধারণের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। অধিকাংশের আদর্শ এবং লক্ষ্যের উপর জোর না দিয়া বারংবার মত-বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার উপর জোর দেওয়াতে পরোক্ষভাবে বিরোধিতাই প্রশ্রয় পাইতেছে এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধান অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় সমস্যার প্রকৃত সমাধানের ফল হইল ঐ সব স্বার্থবাদী বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই পূর্ণ করা। ভারতের স্বাধীনতাকে সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লওয়া। কিন্তু বড়লাট তাহা করেন নাই। বিলাতের 'টাইমস' পত্র বড়লাটের বেতার বক্তৃতার উপর যে মন্তব্য করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহাতেও প্রকারান্তরে ভারতের প্রগতিবিরোধী দলই প্রশ্রয় পাইবে। 'টাইমস' লিখিয়াছেন,—দলগতভাবে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। কোন দল যতই

শক্তিশালী হউক না কেন, অথবা কোন সম্প্রদায়, সে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যত বেশী হউক না কেন, তাঁহাদের দ্বারা এ কাজ চলিবে না। বুঝি, ঐক্য এবং মিলনের সদিচ্ছার আবরণ একটা এই সব কথার ভিতর আছে, কিন্তু সে জিনিষটা মুখ্য নয়। ঐ উক্তির ভিতর দিয়া 'টাইমসের' মনোভাব সকলের কাছেই স্পষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাহা এই যে, কংগ্রেসের পিছনের জনমতের জোর যতই থাকুক না কেন, কংগ্রেস যখন দলবিশেষ, তখন ভারতীয় সমস্যার সমাধান কংগ্রেসের দ্বারা হইবে না। আমরা বিলাতী রাজনীতিকদের এই প্রকার মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, কংগ্রেস দলবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ নয়, কংগ্রেস ভারতের সকল দল এবং সকল সম্প্রদায়ের সম্মেলন ভূমি। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সমস্যার সমাধান যদি করিতে হয়, তবে কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ করিয়াই তাহা সম্ভব হইবে, অন্য কোন পথে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন দলের মতবিরোধের মামুলী কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতের বৃহত্তর আদর্শের প্রতীক কংগ্রেসের দাবী পূরণ করিবার পথেই প্রকৃত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সোজা সত্য কথাটা ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যত সত্বর বুঝেন, ততই মঙ্গল।

---

**কলিকাতা যুদ্ধ কমিটি—**

গত ২০শে জুন বাঙলার গবর্ণরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যুদ্ধ কমিটি গঠনের জন্য সভা হইয়া গিয়াছে।

গত ২০শে জুন বাঙলার গবর্ণরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যুদ্ধ কমিটি গঠনের জন্য সভা হইয়া গিয়াছে। দেশরক্ষার জন্য, শক্তি অর্জ্জনের জন্য কার্য্যত যোগ্য যাহাতে হইতে পারা যায়, সেজন্য সকল রকমের সুবিধা গ্রহণ করিয়াই আমরা পক্ষপাতী। সুতরাং আমরা যুদ্ধ কমিটি এবং সঙ্কল্পিত সমরায়োজনের বিরোধী নহি। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, জাতির প্রাণধারাতে বলিষ্ঠ প্রেরণার স্পর্শ দিয়া যদি উজ্জীবিত করিয়া তোলা যায়, তবেই এই চেষ্টা সর্ব্বার্থে সার্থক হইতে পারে। দেশের তরুণ এবং যুবক সম্প্রদায়ের উপরই এই চেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করে এবং দেশের যুবক এবং তরুণ সম্প্রদায় সব দেশেই আদর্শবাদী। বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা তাহাদিগকে কর্ম্মসাধনায় উদ্যোগী করিয়া তোলে। বাঙলার সমরায়োজন সফল করিতে হইলে এই বৃহদাদর্শকে স্বদেশ প্রেম দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে হইবে। এ পক্ষে প্রথম প্রয়োজন যুবক ও তরুণদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ সংশয়ের মনোভাব দূর করিয়া একটা উদার বলিষ্ঠ দেশ প্রেমে বিশ্বস্তির আবহাওয়াকে সৃষ্টি করা এবং তাহা করিতে হইলে, ভারতরক্ষা আইনের যেভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করা। আমাদের মতে পথটি রাজনীতিক আন্দোলনকে এড়াইয়া চলিবার পথ নয়, রাজনীতিক মনোবৃত্তি উচ্চ আদর্শ অবাধে পরিস্ফূর্ত্ত হইতে দিবার পথই হইল এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পন্থা। রাজনীতিক আদর্শকে গৌণ করিয়া অন্য যে কাজই হউক না কেন, দেশরক্ষার কাজ হয় না। গবর্ণর রাজনীতিকে বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ কমিটি চালাইবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, আমরা এই কথার কোন মূল্য বুঝি না। 'সিভিক গার্ড' গঠনের সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের মত, যাঁহারা জননায়ক, তাঁহাদের উপরই এ ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এ দেশের আমলাতন্ত্র বাঙলার যুবকদিগকে কোন দিন বিশ্বাস করেন নাই, রাজনীতির সম্পর্কে তাঁহাদের সকল রকম বলিষ্ঠ প্রেরণাকে পিষ্ট করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। সমরায়োজনে বাঙলাকে আজ সত্যই যদি শক্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে আমলাতান্ত্রিক সেই সন্দেহ-সংশয়ের মনোভাব দূর করিয়া দেশ প্রেমের প্রেরণায় যুবকদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। দেশপ্রেমের পথ যে রাজনীতিরই পথ, এ কথা ভাবের ঘরে চাপা দিবার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না এবং তেমন চাপা দেওয়ার ফলে প্রকৃত কাজ হইবে না।

---

**গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—**

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্দ্ধার বিগত অধিবেশনে সুনির্দ্দিষ্ট নূতন কোন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু বাস্তবের দিক হইতে অকেজো আধ্যাত্মিকতার মোহকে কাটাইয়া কাজের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। এই দিক হইতে এই অধিবেশনকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বলিতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের মূল প্রস্তাবে বলিয়াছেন,— "যে সকল লোক লইয়া কংগ্রেসের কাজ করিতে হয়, তাহাদের বর্ত্তমান অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা এবং যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস জনসাধারণের উপর উপযুক্ত পরিমাণে অহিংস কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে না পারিতেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে সঙ্ঘবদ্ধ অহিংসার শিক্ষা আয়ত্ত করিতে না পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনের যুগ-কালীন বিপদের সম্ভাবনাকে ওয়ার্কিং কমিটি উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই অবস্থায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কমিটি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমানতালে অগ্রসর হইতে পারেন না; কিন্তু কমিটি স্বীকার করেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার নিজের পন্থায় তাঁহার মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিতে দেওয়া উচিত; সুতরাং আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধকল্পরূপে কংগ্রেস যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবে, ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতেছেন। এই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে সকল সমস্যার বিবেচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত উহাদের অনেকগুলিরই সম্পর্ক নাই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ঐ সকল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মূল অহিংস নীতি ও কার্য্যপন্থা পূর্ব্ববৎ অনুসৃত

হইবে। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে ঐ রীতি ও কর্ম্মপন্থা প্রয়োগে অসামর্থ্যবশত মুক্তি-সংগ্রামে ঐ নীতির অনুমাত্রও ব্যত্যয় ঘটিবে না।"

মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিকতার যে সূক্ষ্ম গ্রামে গিয়া উঠিতেছেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহা অবাস্তব; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি যে, জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের উপযুক্ত প্রভাব নাই। আমাদের মতে সে প্রস্তাব আছে এবং ষোল আনাই আছে; কিন্তু সে প্রভাব কর্ম্মকাণ্ডহীন চরকার নিরিখে মাপা যাইবে না। পরিস্থিতির অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য্যকর কর্ম্মপন্থাকে অবলম্বন করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মহাত্মার নির্দ্দেশিত অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বাস্তব রাজনীতি বিচারের দিক হইতে উহা ছিল দুর্ব্বোধ্য। এক্ষেত্রে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি দেশরক্ষা সম্পর্কিত কার্য্যে বাস্তব নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের গৃহীত এই প্রস্তাবের মধ্যে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকটও একটা ইঙ্গিত রহিয়াছে। সে ইঙ্গিত এই যে, কংগ্রেস দেশরক্ষায় উদাসীন নয়, কার্য্যকর যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সে প্রস্তুত, ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহারা সেদিকে সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্যোগী হইবেন। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কংগ্রেসের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমানের বিষম সংকট ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কংগ্রেসের এই দাবীকে স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের দূরদর্শিতার অভাব এবং নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচারক বলিতে হইবে।

---

### জাতীয় রক্ষিবাহিনী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব জাতীয় রক্ষিবাহিনী সংগঠনে উদ্যোগী হইবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায় এবং সকল দলের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইউরোপের মহাসমর সমগ্র জগতের আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এই বিভীষিকা বাড়াইয়া কিম্বা জগতের কল্যাণ কামনার স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া আধ্যাত্মিকতা জাহির করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। এই পরিস্থিতির ভিতর দিয়া নিজেদের ভিতরকার দুর্ব্বলতা দূর করিবার যে সুযোগ আমরা পাইয়াছি, তাহাকে বাস্তব সত্যের বিবেচনায় গ্রহণ করিলেই প্রকৃত কাজ হইবে। আজ বাঙালী যদি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দেশের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার বৃহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং বাঙলার সকল সম্প্রদায় বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানের প্রতীয়মান অশুভও ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইবে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী গঠনের উদ্যম আমাদের অন্তরে এই আশা অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে।

---

### সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি তর্পণ—

সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি সমিতি আগামী ৩রা জুলাই বাঙলা ও আসামের সর্ব্বত্র, বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। এ আবেদনে দেশবাসী সাড়া দিবেন, আমরা এই আশা করি। বিদেশী ঐতিহাসিকদের কল্পিত মিথ্যার কুহকজাল কাটিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের মহিমা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সত্য চিরদিন চাপা থাকে না। আমরা আশা করি, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতি তর্পণের ভিতর দিয়া বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুদৃঢ় হইবে এবং বিপন্ন ইসলামী জিগীর তুলিয়া যাহারা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের অপচেষ্টার স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। বাঙলার স্বার্থ, বাঙলার স্বাধীনতা—এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-বিভেদ নাই। যাহারা বিপন্ন ইসলামী জিগীর তুলিয়া সেই ভেদ বাড়াইতেছেন, আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিব, নবাব সিরাজদ্দৌলার পবিত্র স্মৃতি তর্পণে তাঁহাদের অধিকার নাই। সিরাজদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান, আর সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা তুলিয়া নিজের কাজ বাগান, এই দুই এক সঙ্গে যে চলে না, —তাঁহাদের ঘটে যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও থাকে তবে ইহা বুঝিবেন। তাঁহারা ইহা জানেন না এমন নয় যে, বাঙলার হিন্দু সিরাজদ্দৌলার উপর আরোপিত কলঙ্ক অপনোদনের জন্য সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করিয়াছে। মহাকবি গিরিশচন্দ্র, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের যে মহিমাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিকট বিদেশী ঐতি-হাসিকদের মিথ্যামূলক প্রচেষ্টা সব ম্লান হইয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি তর্পণের ভিতর দিয়া বাঙলার জাতীয়তার ভাব জাগুক এবং আত্মমর্য্যাদায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক এবং দূর হউক স্বার্থ সঙ্কীর্ণতাগত যত ভেদ-বিভেদ। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের চরিত্রের মিথ্যা কলঙ্কের স্তম্ভ কলিকাতা শহরের বুকের উপর এখনও খাড়া আছে। এ কথাও যেন বাঙালী এ উপলক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ রাখে এবং অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি স্তম্ভ যাহাতে অপসারিত করিয়া ফেলিয়া জাতির মর্য্যাদা, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, সেজন্যও যেন চেষ্টা চলে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সমগ্র জাতির দাবী গ্রাহ্য করিয়া এজন্য কি ব্যবস্থা করেন, জাতি তাহাই দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যাহারা এই যুক্তি দেখাইতেছেন যে, অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি স্তম্ভটির সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা বাঙলা সরকারের নাই, উহা ভারত সরকারের হাতে। তাঁহাদের কথার উত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যদি ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর এজন্য কোন রকম চাপ দেন, তবে ভারত সরকার

তাঁহাদের প্রস্তাব উল্টাইয়া ফেলিবেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি স্তম্ভের মূলে সত্যের কোন মর্য্যাদা নাই এবং এ দেশের লোকের মনে উহা তিক্ততারই যে সৃষ্টি করে, ভারত সরকারের এ তথ্য এখনও অবিদিত নাই।

---

**রাজনীতি বিষ—**

ভাগীরথীর তীর ভাগ যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে সে রক্ষার ভারটা বাঙলা দেশের ছেলেদের হাতেই থাকা উচিত—বঙ্গীয় উপকূল রক্ষিবাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সি এ হেডম্যানের এই উক্তি আমরা সর্ব্বতোভাবেই সমর্থন করি। এই দিক হইতে যে ৮০ জন বাঙালী যুবক সেদিন গোলন্দাজি শিখিবার জন্য আম্বালাতে রওনা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু মেজর জেনারেল মহাশয়ের একটি উপদেশের ঔচিত্য আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন যে, যুবকদিগকে রাজনীতি বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। এ দেশে ৩৩ বৎসরকাল থাকিয়া তিনি নাকি ইহাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এ দেশের যুবকের একটা বড় দোষ এই যে তাহারা রাজনীতির সংস্রবে থাকে। সেনা বিভাগে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ঐ দোষ তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মেজর জেনারেল মহাশয় এই রাজনীতি বলিতে কি বুঝিয়াছেন জানি না, রাজনীতি বলিতে যদি তিনি সাম্প্রদায়িকতার মতই নিজেদের মধ্যে দলাদলি বুঝিয়া থাকেন এবং বাঙলার যুবকদের উপর সেই দোষ সমগ্রভাবে চাপাইয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা তাঁহাকে এই কথাই বলিব যে, দেশের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য দলাদলি বিস্মৃত হইবার উদ্দীপনা ভারতের কোন স্থানের যুবকেরা যদি জাগাইয়া থাকে, জাগাইয়াছে এই বাঙলার যুবকেরা। সাম্প্রদায়িকতা এবং দলাদলির জন্য দোষী অন্য কেহ হইতে পারে, বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় নিশ্চয়ই নয়, অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের অনুপ্রেরণা তাহারাই এ দেশে আনিয়াছে। রাজনীতি বলিতে মেজর জেনারেল মহাশয় যদি স্বদেশপ্রেম বুঝিয়া থাকেন, এবং আজিকার দিনেও আমলাতন্ত্র সুলভ মনোবৃত্তি সহকারে বাঙালী যুবকদের সেই স্বদেশ প্রেমেরই নিন্দা করিয়া থাকেন, এবং আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বাঙালী যুবকদের গুণকে দোষ দেখিয়া থাকেন আমরা প্রতিবাদ করিবই। এবং আমরা তাঁহাকে বলিব যে ঐ স্বদেশ প্রেমই দেশরক্ষার প্রবৃত্তির মূল শক্তি। স্বদেশ প্রেমই বল দেয় বাহুতে এবং সেই স্বদেশ প্রেমের প্রেরণাই দেশরক্ষা সার্থক করিয়া থাকে। বাঙালী যুবকরা স্বদেশ প্রেমিক, ইহা সত্য এবং এ কথাও সত্য যে, বাঙালী যুবকদের সেই স্বদেশ প্রেম অনিষ্টকর রাজনীতির নামে এ দেশের শাসকদের কাছে এতকাল নিন্দিত হইয়াই আসিয়াছে। বাঙালী যুবকদিগকে দেশরক্ষায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইলে তাহাদের স্বদেশ প্রেমকে এমন শঙ্কার চক্ষে দেখিবার সংস্কারকে ছাড়িতে হইবে এবং স্বদেশ প্রেমকে যুবকদের অন্তরে দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। যুবকদের অন্তরে স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনার সঞ্চারের অর্থই দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সজাগ করা, দেশরক্ষায় শক্তিতে তাহাদিগকে জীবন্ত করা—প্রাণবন্ত করিয়া তোলা। যেখানে স্বদেশ প্রেম নাই, সেখানে দেশরক্ষার মধ্যে প্রাণশক্তি থাকিতে পারে না। বাঙালী চিরকালই অন্য বিবেচনার চেয়ে এই প্রাণশক্তিকে বড় বলিয়া বুঝে এবং ইহা তাহাদের দোষ নয়, সমর সাধনায় সর্ব্বত্রই ইহা গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানেও ইহাকে সেই মূল্য প্রদান করিতে শঙ্কিত হইবার দিন চলিয়া গিয়াছে।

---

**জাপানের পররাজ্যলিপ্সা—**

ইউরোপীয় যুদ্ধের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে ইটালী যখন সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে, তখন জাপানই-বা ছাড়িবে কেন? জাপান চীনের বন্দরগুলি দখল করিয়া লইবার পর এক রুশিয়া ব্যতীত বাহির হইতে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্য পথে চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিংয়ে সমরোপকরণ পেঁৗছিবার উপায় নাই। ফরাসীরা জাপানীদের চাপে পড়িয়া ইহার পূর্ব্বেই ইন্দো-চীনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এখন ফরাসীদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সে পথ খোলার সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাইল। ব্রহ্মদেশের পথ বন্ধ করিবার জন্য জাপান ইংরেজের উপর চাপ দিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার বিবৃতিতে এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি জাপানীদের এই দাবী স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে চীনের স্বাধীনতাকামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে এবং এমন ব্যবস্থা ভারতবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। ডাক্তার অটল কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের নেতাস্বরূপে চীনে [illegible] করেন, তিনি চিকিৎসিত হইবার জন্য সম্প্রতি [illegible] আসিয়াছেন। তিনি চীনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় সত্ত্বেও চীন একেবারে অসহায় থাকিবে না। রুশিয়া বরাবরই চীনের জাতীয়তাবাদীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র, উড়োজাহাজ এবং বিমানচালক দিয়া সাহায্য করিতেছে, ভবিষ্যতেও [illegible] থাকিবে এবং রুশিয়ার সহায়তায় চীন আরও [illegible] জাপানীদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে। [illegible] চীনের স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে [illegible] সম্পন্ন। জাপানের পররাজ্যলিপ্সার প্রশ্রয়মূলক [illegible] যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করেন, তাহা হইলে [illegible]রাসীদের মধ্যে তাহা তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করি[illegible] বিষয়ে সন্দেহ নাই।

# ফ্রান্সের পরাজয়ের পর

মহাত্মা গান্ধী ২২শে জুন 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন—"হিটলারবাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। উহা ফ্রান্সকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্ভবত এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় ব্রিটেন তাহার কার্য্যক্রম স্থির করিয়া ফেলিবে। ফ্রান্সের পতন আমার যুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। আমি মনে করি, ফরাসী রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ অবশ্যম্ভাবী ঘটনার নিকট নতি স্বীকার করিয়া নিরর্থক পরস্পরের হত্যায় যোগ দিতে অসম্মত হইয়া বিশেষ সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাধীনতা যাহাদের ভোগ্য, তাহাদের সকলের ধ্বংস যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়, তাহা হইলে উহা উপহাসের বস্তু হইবে।"

অতীত ইতিহাস সে প্রমাণ দিবে। সেই ফরাসী জাতি আজ বিজেতার নিকট সন্ধি প্রার্থী হইতে বাধ্য হইয়াছে, এই অবনতির মধ্যে গ্লানি আছে, বেদনা আছে এবং কোন আধ্যাত্মিক যুক্তিই ফরাসী জাতির অন্তর হইতে সে বেদনা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। লোকক্ষয় এড়াইবার আধ্যাত্মিকতার ভাব কিংবা নিজদিগকে বাঁচাইবার বুঝ বীর ফরাসী জাতির চিত্তকে শীতল রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীনতা বেদনা তহাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবে। ফ্রান্সের বাহিরের ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশগুলি ব্রিটেনের সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে। আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভে বর্দ্দো গবর্ণমেণ্টের পতনও হইতে পারে। ফ্রান্সের
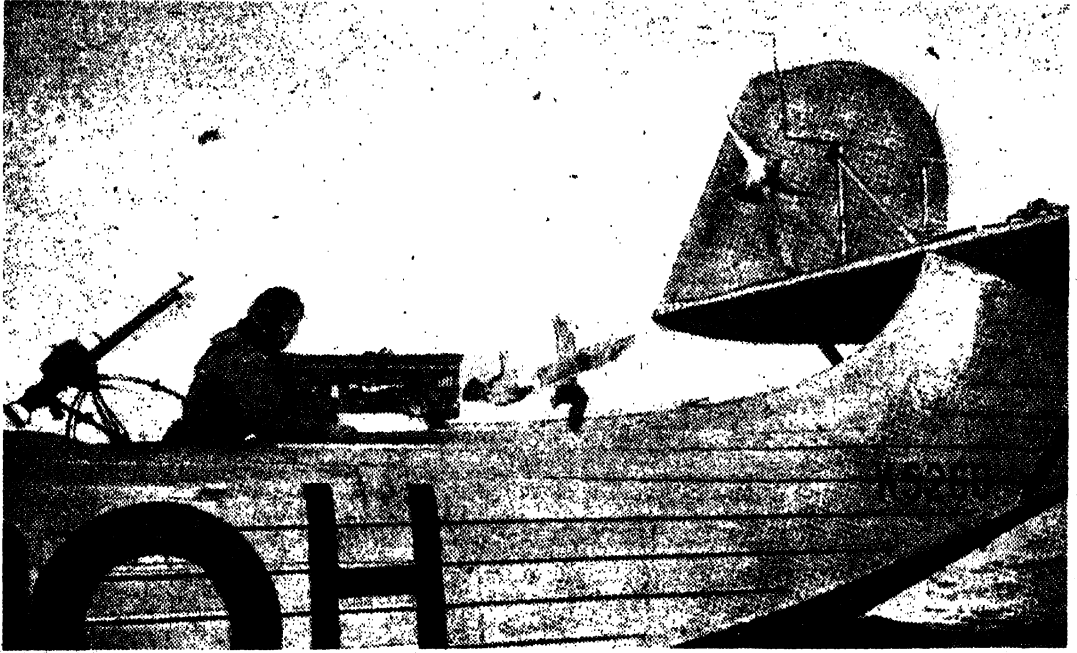
রাজকীয় বিমান হইতে কয়েকটি সুশিক্ষিত পায়রা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধের সময় যখন সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত পন্থা অচল হইয়া পড়ে, তখন এই শিক্ষিত পায়রাই একমাত্র সংবাদ বাহকরূপে কার্য্য করে।

মহাত্মাজীর এই যুক্তি সকলে সমর্থন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কোনরূপে বাঁচিয়া থাকাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকা, বীরের মত বাঁচিয়া থাকা। এই মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জগতের বীরগণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যাহাকে উপহাসের বস্তু বলিয়াছেন, জাতিকে সেই মরণের মুখে লইয়া গিয়া স্বাধীনতার মূল্য দিয়াছেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতি মৃত্যুকে বরণ করিয়া আদর্শ নিষ্ঠার মধ্যে অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। নিজেরা মরিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়াছে, নৈতিক শক্তিতে মর্য্যাদাশীল মহাজাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ফরাসী জাতি বীরের জাতি। ফরাসীরা মরিতে জানে।

নৌবহরের অধিকাংশই ভূমধ্যসাগরে আছে। অবস্থা বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বেই সেগুলি উত্তর আফ্রিকার দিকে চলিয়া যায়। সেগুলি আত্মসমর্পণ করিবে কি না সন্দেহ আছে।

বেলজিয়ামের জেনারেল কোরাপের বাহিনীর বিপর্য্যয়, তারপর মিউজ নদীর ধারে জেনারেল ওয়েগাঁর বাহিনীর পরাজয়, ফরাসীদের সেনাশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জার্ম্মানী ঝটিকার মত এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় যে, ফরাসীদের পক্ষে নিজেদের শক্তি পুনরায় সংহত করিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল। জার্ম্মানী উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ঘোরিয়া আসিয়া ম্যাজিনো লাইনের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ফরাসী সেনাদল বাঁচিতে গেলে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সম্বন্ধ নীতি দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়। ফরাসী রাষ্ট্রনীতিকগণ বার বারই একথা বলিয়াছেন যে,

সেনাবলের অভাব, সমরোপকরণের অভাবই তাহাদের যুদ্ধের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। জার্ম্মানীকে বিগত মহাসমরে পরাজিত করিবার পর ফরাসী জাতির মধ্যে নিরুদ্বেগতার একটা ভাব আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে দেশরক্ষার সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কিছু শিথিলতা আসিয়াছিল এবং নৈতিক দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পেঁত্যা সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নীতির দিক দিয়া কুড়ি বা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জাতির যে সমগ্রভাবে পতন ঘটে, আমরা ইহা মনে করি না, সেজন্য আরও কিছু বেশী সময়ের দরকার হয়। তবে একথা সত্য যে, জার্ম্মানী আর মাথা তুলিতে পারিবে না, এই কল্পনায় বিভোর থাকিয়া ফরাসী রাষ্ট্র-

রণতরী আছে, সেগুলি আনিয়াও নিরস্ত্র করা হইবে। (৩) প্যারিস সমেত ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম জায়গা ফরাসীদের হাতে থাকিবে। চূড়ান্ত সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যসম্পর্কিত স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না।"

বলা বাহুল্য, এই সর্ত্তে ফরাসীকে সর্ব্বতোভাবে জার্ম্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। ফরাসী-দের উপর অবমাননাকর সর্ত্ত আরোপ করা হইবে না বলিয়া জার্ম্মান কর্ত্তারা পূর্ব্বে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হয় নাই এবং হিটলার কোন অবমাননাকর সর্ত্ত আরোপ না করিয়া অনির্ম্মমভাবে সন্ধি করিবেন এমন আশা সফল হয় নাই। ফরাসী জাতিকে, চূড়ান্ত

পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলার নাৎসী বাহিনীর প্রধান এডজুটেণ্ট কর্ণেল ই জি স্মিডটের সহিত আলোচনা করিতেছেন। পার্শ্বে মার্শাল গোয়েরিংকে দেখা যাইতেছে।

নীতিকগণ দেশরক্ষার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুধু এক ম্যাজিনো লাইন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। জার্ম্মানদের আধুনিক তোড়জোড় এবং সমরসজ্জার সঙ্গে সমানতালে তাহারা জাতিকে আগাইয়া লইয়া যান নাই। যদি তাহা যাইতেন, তাহা হইলে বিপর্য্যয় এতটা সহজে ঘটিত না, আকস্মিক আঘাতে ফরাসীরা এমন করিয়া এলাইয়া পড়িত না।

ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানীর যুদ্ধবিরতির যে সর্ত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, (১) জার্ম্মানী ফ্রান্সের ইংলিশ প্রণালীর উপকূল ভাগ দখল করিয়া থাকিবে এবং আটল্যাণ্টিক সমুদ্রে ফরাসীদের উপকূল ভাগও সে দখলে রাখিবে। ইটালীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগস্থ ফরাসীদের স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে। (২) ফরাসী নৌবহরের সকল রণতরী নিরস্ত্র করা হইবে, বাহিরে যে সব

অবমাননার গ্লানিই আজ মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে।

ফরাসী যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে। যুদ্ধ চালু থাকিলেও, অবস্থা বিপর্য্যয়ের পর ফরাসীরা ইংরেজকে বিশেষ যে কিছু সাহায্য করিতে পারিত, তাহা মনে হয় না। যুদ্ধের ষোল আনা ঝক্কি ইংরেজের উপর এখন যেমন আসিয়া পড়িয়াছে, ফরাসীরা যুদ্ধ চালাইতে থাকিলেও তাহা আসিয়া পড়িত, বরং এক হিসাবে বিপর্য্যস্ত ফরাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজের দায়িত্ব বাড়িত, রণাঙ্গন বিস্তৃত থাকিত এবং লড়াইও অধিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিতভাবে চালাইতে হইত।

ফরাসীদের নৌশক্তি ইংরেজের সহায়ক হইত, ইহা সত্য কথা। এবং ফরাসীদের এই নৌশক্তির জন্যই ইংরেজের অধিক উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। যুদ্ধ স্থগিতের সর্ত্তের ৮ম ধারায় এই নির্দ্দেশ আছে যে,—"ফরাসী সাম্রাজ্যের ফ্রান্সের

স্বার্থ রক্ষার জন্য ফরাসী নৌবহরের যে সব রণতরী প্রয়োজন হইবে, তাহা তথায় নিয়োজিত করা চলিবে। তাহা ব্যতীত নৌবহরের আরও সমস্ত জাহাজই নির্দ্ধারিত কোন বন্দরে আনিয়া সমবেত করিতে হইবে। জার্ম্মানীর ও ইতালীর নিয়ন্ত্রণাধীনে সে সবগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ভরসা দিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বহরে সে সব ফরাসী রণতরী থাকিবে, সেগুলির মধ্যে উপকূল পাহারা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় রণতরী ব্যতীত আর কোন রণতরীই তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বাহির করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই।" বলাবাহুল্য এই সর্ত্তের মূলে অংশ বাধ্যতামূলক নহে। জার্ম্মানরা ফরাসীদের ঘাড়ে করিয়া যতটা সম্ভব সুবিধা করিয়া লইতে ছাড়িবে না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ফরাসী নৌবহর যতটাই তাহাদের হাতে পড়ে তাহাতে ইংরেজের অসুবিধা বাড়িবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফরাসী ইউরোপের দ্বিতীয় নৌশক্তি। ফরাসীদের নৌবহরে আটখানা বৃহৎ রণতরী আছে, তিনখানা আধুনিক তোড়জোড়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত। এই নৌবহরে সাতখানা বড় ক্রুজার আছে, এগারখানা আছে দ্রুতগামী ক্রুজার, ষাটখানার অধিক ডেষ্ট্রয়ার আছে এবং সাবমেরিন আছে ৮০ খানার বেশী। কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রান্সের নৌসচিব ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স ১২৬ খানা যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চারখানা অতিকায় রণতরী। 'র‍্যাসেলো' নামক যুদ্ধ জাহাজখানা ইহাদের মধ্যে প্রধান। 'ডানকার্ক' এবং 'ট্রাসবুর্গ' রণতরী দুইখানা আধুনিক ধরণে তৈয়ার করা হয়। ফরাসীদের সারকফ নামক সাবমেরিনখানা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাবমেরিন। এখানা ৩৬১ ফুট লম্বা।

১৯৩৫ সালে ফরাসীদের ৭ খানা রণতরী, ৭৭ খানা সাবমেরিন, ১৯ খানা, ক্রুজার, ৬০ খানা ফ্লোটিলালিডার এবং ৩৯ খানা প্রহরী জাহাজ ছিল। এগুলির সংখ্যা পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে আরও বাড়িয়াছিল।

ফরাসীরা যদি ফ্রান্স ছাড়িয়া এই নৌবহর লইয়া উত্তর আফ্রিকায় গিয়াও সংগ্রাম চালাইত, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের তীরভাগে ইংরেজের সুবিধা হইত এবং ইটালী সহজে কাবু হইয়া পড়িত। ইটালীর আফ্রিকার রাজ্যগুলি সে নিজের হাতে বেশীদিন সে অবস্থায় রাখিতে পারিত কিনা সন্দেহস্থল হইয়া পড়িত। কিন্তু ফরাসীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। ফরাসীদের নৌবহরের এই সাহায্য না পাওয়ার জন্য ইংরেজের অসুবিধা ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

কম্পিয়ানের যে বনভূমিতে বিগত মহাযুদ্ধের স্থগিত সর্ত্ত ঘোষিত হয়, সেখানেই এবারও ফরাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে জার্ম্মান প্রতিনিধিদের যুদ্ধ স্থগিতের বৈঠক হইয়াছিল। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারেল হাণ্ট জিগার ও জার্ম্মানীর পক্ষ হইতে জেনারেল ফন কাইটেল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইহার পর ইটালী এবং ফ্রান্সের মধ্যেও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সর্ত্তগুলি হিটলার ও মুসোলিনী দুইজনে মিউনিকে মিলিত হইয়াই ঠিক করিয়াছিলেন। সুতরাং ইটালীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোন পক্ষের গোলযোগের কোন কারণ ছিল না।

এখন ইংরেজকেই একা জার্ম্মানীর সঙ্গে সংগ্রাম চালাইতে হইবে; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝিবার কোন কারণ নাই যে, যুদ্ধ অল্পদিনের মধ্যে শেষ হইবে। ইংলণ্ড ফ্রান্স নয়—একটানা স্থলপথে জার্ম্মানী হইতে ট্যাঙ্কবাহী সৈন্য ইংলণ্ডের উপকূলে আনা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডে আসিতে হইলে ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া আসিতে হইবে। ইহা সত্য যে, শুধু উড়োজাহাজের জোরে কোন দেশ দখল করা যায় না। জার্ম্মানদের উড়োজাহাজের জোর যতই থাকুক না কেন, শুধু উড়োজাহাজের সেই জোরে তাহারা পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম কি ফ্রান্স কোন দেশই দখল করিতে পারে নাই। উড়োজাহাজের শক্তিতে জার্ম্মানী ফরাসীদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও উড়োজাহাজের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ফ্রান্স দখল করিবার জন্য ১৮ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ সৈন্য নামাইতে হইয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ড দখল করিতে হইলেও ইংলণ্ডে সৈন্য নামাইতে হইবে, শুধু উড়োজাহাজে দেশ দখল করিতে সে পারিবে না। ইংলণ্ডে সৈন্য লইতে হইলে প্রয়োজন রণতরীর। জার্ম্মানীর নৌবল এমন নাই যে, ইংরেজের নৌবলকে ছাড়াইয়া এবং মাইনের বেড়াজাল ডিঙ্গাইয়া যুদ্ধজাহাজে সে ইংলণ্ডের উপকূলে সেনা নামাইতে পারে।

সুতরাং যুদ্ধ সহজে মিটিবে, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। জার্ম্মানী যদি নিজে ধ্বংস-যজ্ঞ হইতে বিরত হয়, তবেই ইহা মিটিতে পারে, নতুবা ইংরেজকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই চালাইতেই হইবে। সুদীর্ঘ এই সংগ্রামে ভারতের উপর ইংরেজকে অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতে হইবে। ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিকেরা যদি এখন ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লন, তবেই তাঁহাদের দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা হইবে। হুকুমে ফেলিয়া কাজ আদায় করা এক কথা, আর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় কাজ করা অন্য কথা। স্বাধীন ভারতই এই হিসাবে ইংরেজকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারে।

# ধর্ম্মনিন্দা

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

আমরা ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ধর্ম্মনিন্দা মহাপাপ। প্রাচ্য দেশের প্রকৃতি এরূপ যে, সেখানে মানুষের অন্তরে ধর্ম্মভাব গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া থাকে। তাহাদের চালচলন, আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ—সব কিছুরই উপর ধর্ম্মের প্রভাব সুগভীর। তাই তাহারা সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু ধর্ম্মনিন্দা সহ্য করিতে পারে না। ধর্ম্মের নামে এই যে এত মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা—এসবের একটি প্রধান কারণ সাধারণের ধর্ম্মপ্রীতি। সুতরাং কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করিলে, সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণ যে তাহাতে মর্ম্মাহত হইবে তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন মানুষের অন্তর উদারভাবসম্পন্ন হইবে তখন সে নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হইবে না। কিন্তু যাবৎ এই উদারভাব ব্যাপকভাবে অবলম্বিত না হয় তাবৎ কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। ধর্ম্মপ্রীতি বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া মনোভাব নহে। পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে এবং তাহার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না। আমি যদি অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা করি, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মের প্রতি অপরের সেইরূপ আচরণ সহ্য করিবার মত উদারতা থাকা দরকার। তাহা না হইলে ন্যায় বিচারের মুণ্ডপাত করা হইবে। আমি পরধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া যাইব, আর অপরে তাহা সহ্য করিয়া যাইবে, কথাটিমাত্র বলিতে পারিবে না, এরূপ আশা করা নিতান্ত ভুল। ভারতের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ বিনা সঙ্কোচে পরধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে। অন্য ক্ষেত্র হইতে তাহার পাল্টা আক্রমণও হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংক্রান্ত বহু পুস্তক এইরূপ পরধর্ম্ম নিন্দায় পূর্ণ থাকে। সত্য তথ্য জানিবার জন্য কোন ধর্ম্মমূলক পুস্তক পাঠ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পরধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া কেহ নিজধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহে না। তর্কশাস্ত্রে যাহাকে বলে "গায়ের জোরে প্রমাণ করা", একদল ধর্ম্ম প্রচারক সেই পথে স্ব স্ব ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে ভালবাসে। তাহাদের যুক্তির ধারা এইরূপ—অমুক অমুক ধর্ম্মের মধ্যে এই গলদ আছে, আর আমার ধর্ম্মে ইহা নাই অতএব আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর। এই যে যুক্তি—ইহাকে বলিব কুযুক্তি। অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারক এইভাবে পরনিন্দার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। বিশেষত প্রচারমূলক ধর্ম্মগুলির প্রধান কাজ হইতেছে পরধর্ম্মের নিন্দা করা। এদেশে পরধর্ম্ম নিন্দার প্রথম পথ দেখান খৃষ্টান মিশনারী প্রচারকগণ। তার পর ইহা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে, লোকে আনন্দের সঙ্গে পরধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে। মনে প্রাণে কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করে না। এই সেদিন "Star of India"র সম্পাদক হিন্দু সমাজের পরমারাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এমন একটি উক্তি করিয়া বসিয়াছে যাহাকে পরধর্ম্ম নিন্দা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উক্ত পত্রিকাটি যদি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পত্রিকা হইত তাহা হইলে তাহার আক্রমণ কতকটা সহনীয় হইত। কিন্তু রাজনৈতিক পত্রিকার পক্ষে পরধর্ম্মের নিন্দা করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ঠিক এইভাবে কোন হিন্দু পত্রিকা যদি ইসলামের মহাপুরুষদেরকে নিন্দা করে তবে তাহাতে মুসলমানের প্রাণ নিশ্চয় ব্যথিত হইবে। অপরের ব্যথা যে বুঝিতে পারে না এবং যে অপরকে অকারণে ব্যথা দিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহার কার্য্যকলাপ অসহনীয়।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে—ধর্ম্ম নিন্দা মহাপাপ, না হয় মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনওরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে পাইব না? মনে রাখিতে হইবে ধর্ম্মনিন্দা ও ধর্ম্ম সমালোচনা এক কথা নহে। আমার ধর্ম্ম আমার নিকট খুব প্রিয়, তাহা অপরের নিকট প্রিয় না হইতে পারে। সে হয়ত আমার ধর্ম্মকে উচ্চাঙ্গের মনে না করিতে পারে। সেরূপ মনে না করিবার এবং তাহা প্রকাশ করিবার তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। ধর্ম্মের নীতি কার্য্যপদ্ধতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা করা দোষাবহ নহে, সে আলোচনা আমার ধর্ম্মের যতই বিরোধী হউক না কেন। ইহাতে ক্ষতি অপেক্ষা উপকারই বেশী হয়। কারণ এইরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা হইতে ধর্ম্মের সকল দিক পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ধর্ম্ম নিন্দা আলাদা বস্তু। কোন্‌টা নিন্দা আর কোন্‌টা সমালোচনা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? বুঝা যাইবে লেখকের ভাষা হইতে, লিখিবার ভঙ্গী হইতে এবং আক্রমণের ধরনধারণ হইতে। ধর্ম্ম নিন্দা সাধারণত ধর্ম্মের মহাপুরুষদেরকে লইয়া হইয়া থাকে। আমরা মুসলমান হজরত মহম্মদ(দঃ)কে ভক্তি করি। খৃষ্টানগণ অথবা হিন্দুগণ তাঁহাকে সেরূপ ভক্তি না করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে গালাগালি পূর্ণ ইঙ্গিত ব্যবহার করিতে পারে না। এই প্রকার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাব অথবা উপমাপূর্ণ শব্দবিন্যাস হইতে বুঝা যাইবে যে, আলোচনাটি নিন্দাপূর্ণ অথবা সমালোচনাপূর্ণ। খৃষ্টান লেখক ও প্রচারকগণ হজরত সম্বন্ধে এমন সব উক্তি করিয়াছেন যাহাকে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে নিন্দাপূর্ণ। "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিদ্বেষপূর্ণ ও ক্ষমার অযোগ্য। কোরআনে আছে অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা করিও না। ইহার কারণ কি? দুইটি কারণে কোরআন পরধর্ম্ম নিন্দা নিষেধ করিয়াছে; প্রথমত ইহাতে নিজের মনের ক্ষুদ্রতা প্রমাণিত করে, দ্বিতীয়ত ইহার পালটা আক্রমণে অপরেও ত ইসলামকে নিন্দা করিতে পারে। যদি অধিকাংশ সময় এইভাবে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে ধর্ম্মের সার্থকতা থাকিল কোথায়? মন ত ক্ষুদ্র হইয়া যাইবেই, তাহাছাড়া দেশে শান্তি থাকিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইসলামের বাহক ও ধারক হইয়া আমাদেরই একদল লোক আজ পরধর্ম্ম নিন্দায় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

রাজনৈতিক কারণে ভারতের বুকে আজ সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। ইহার উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মত যদি ধর্ম্ম নিন্দা চলিতে থাকে তবে দেশে কোন দিন শান্তি আসিবে না। সেই জন্য দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর নেতাকে সাবধানে চলিতে হইবে, যেন কেহ পরধর্ম্ম নিন্দার প্রশ্রয় না দেন। পরধর্ম্ম নিন্দাকারীকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। এজন্য জনমত গঠন করিতে হইবে। একথা প্রত্যেককে জানাইয়া দিতে চাই যে কোন ধর্ম্মের মহাপুরুষ সামান্য লোক নহেন। তাঁহারা অবশ্য নিন্দা প্রশংসার অতীত। কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ ত মহাপুরুষ নহেন যে, নিজেদের গুরুস্থানীয় মহাপুরুষদের নিন্দা অম্লানে ও নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিবেন। অপরের অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি থাকা দরকার। যাঁহারা অন্ধকার যুগে আলোকবর্ত্তিকা হাতে লইয়া মানুষকে পরিচালিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সকল যুগের নমস্য। আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, যীশু খৃষ্টকে প্রণাম করি, হজরত মুহম্মদকে প্রণাম করি, হজরত মুসাকে, বুদ্ধদেবকে প্রণাম করি—পৃথিবীর প্রত্যেক মহাপুরুষকে প্রণাম করি। তৃণাদপি ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দায় তাঁহাদের অন্তর জ্যোতি নির্ব্বাপিত হইবে না, তাঁহাদের যশঃসৌরভ একদিন যেমন জগতকে মোহিত করিয়াছিল, আজিও তাহাই করিবে।

# নন্দা

( উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীঅমিয়া সেন

( ৭ )

বিবাহের পর যামিনীরা দেশে ফিরিলেন, কিন্তু অমিতা রহিয়া গেল। সে নিজেই যামিনীকে বলিল, "মা আমি মাসীমার কাছে দু দিন থাকি, তোমরা যাও।"

যামিনীর কিন্তু বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; এত বড় বয়স্থা মেয়েকে সম্পূর্ণ অন্যের কাছে রাখিয়া যাইতে বড়ই বাধিতে-ছিল। কিন্তু অমিতার ইচ্ছার আভাস পাইয়া দামিনী স্বয়ং যামিনীকে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তা দু দিন থাক না, দিদি, আমারও তো মেয়েটা গিয়ে ঘর একেবারে খালি। আমি তো আর অমুর পর নই! তোমার ভয় নেই দিদি, মেয়ে তোমার ভালই থাকবে, কিছু অযত্ন হবে না।"

বড়লোক বোনের এ হেন বিনয়ে যামিনী একেবারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "না না, সে কি একটা কথা! তোমার কাছে অমুর অযত্ন হবে কেন, তবে ওকে ছেড়ে থাকা এখন আমার পক্ষে কষ্টের, ওই এখন কোলেরটি কিনা।" বলিয়াই দুই চক্ষে স্নেহ বিকীর্ণ করিয়া তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চাহিলেন। প্রমীলা দামিনীর জন্য জরদা আনিতে পাশের ঘরে গিয়াছিল, সেখান হইতে যামিনীর শেষের কথাটা শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্তের জন্য তার দুই চক্ষে একটা বিদ্রূপের উত্তাপ বহিল, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কহিল "মেয়ে ত নয় রত্ন।" তারপরেই স্বাভাবিক হাস্য-চঞ্চল মুখে জরদার কৌটা হাতে করিয়া এ ঘরে আসিয়া ঢুকিল যামিনী তখন কহিতেছিলেন, "তা তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন থাক দুদিন। আমার তবু দুটি বউ আছে, তোমার তো তাও নেই।"

দামিনীর বড় ছেলে বি-এ পড়ে, মেজো ও ছোট যথা-ক্রমে আই-এ ও ম্যাট্রিক।

দামিনী কহিলেন, "হ্যা দিদি, আমার ঘর যেন একেবারেই খালি লাগছে। খোকা তো বলছে এম-এ পাশ করে বিলেত যাবে। তার আগে যেন তার সামনে বিয়ের নামও করি নে। খোকার বাবারও তাই ইচ্ছা। একা আমার ইচ্ছায় আর কি হবে, তাই চুপ করে আছি।" সুতরাং দামিনীর শূন্য গৃহ আলো করিবার জন্য যামিনী শেষ পর্য্যন্ত অমিতাকে রাখিয়া আসিতেই বাধ্য হইলেন। কিন্তু অমিতার এই থাকিতে চাওয়াটায় তাহার জীবনে কোনও নূতন ঘটনার ছায়াপাত হইল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; প্রমীলা কিন্তু মনের মধ্যে ইতিহাস লইয়া ফিরিল।

যামিনীরা বাড়িতে পৌঁছিলে নন্দার বেদনাতুর হৃদয় আর একবার আশাভঙ্গের আঘাতে মুষড়িয়া পড়িল। বুকের ভিতরের অনির্ব্বাণ হাহাকার তার মর্ম্মমূলে নাড়া দিয়া তাহাকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল, যে সুযোগ আসিয়াছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে, যে আশা জাগিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তৃষিত দুই চক্ষের আকুল দৃষ্টি দিয়া সে যামিনী প্রবীর প্রমীলা প্রত্যেকের চক্ষের দিকে এক একবার চোখ বুলাইয়া লইল। এরা প্রত্যেকে তাহার প্রিয়কে তার জীবনানন্দকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁর হাসি, তাঁর বাণী এদের কানের কাছে নিত্য ঝংকৃত হইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু—নিদারুণ বেদনায় নন্দার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এরা কেহই তা তার মত আকুল আগ্রহে কাঙ্গালের মত কান পাতিয়া শোনে নাই। তাঁর চোখের মোহন দৃষ্টি, তাঁর সর্ব্ব শরীরের মধুর সৌন্দর্য্য এরা কেহ প্রাণ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হইয়া দেখে নাই। অথচ নন্দার সেই অরূপ রতনকে দেখিবার সৌভাগ্য ইহারাই পাইল, নন্দা পাইল না। যে তাঁহাকে দেখিলে জগতে সব চেয়ে বেশী সুখী, বেশী আনন্দিত হইত, সেই নন্দাই বঞ্চিত রহিয়া গেল।

এ ঘরে সুবীরের একখানা ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত নাই। যাহার সাহায্যে নন্দা বিস্মৃতপ্রায় স্বামীর মুখখানাও একটু স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবে। তাহার প্রাণের নিবিড় ব্যাকুলতা চোখের বেদনাঘন আকুল দৃষ্টি শুধু শূন্যে শূন্যেই আহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। অবিশ্রাম কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার প্রাণটা আজ একটি অব্যক্ত যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া রহিল। আয়ত চোখদুটির আসন্ন বাষ্পকে অবিরাম বাধা দিতে দিতে সে ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

সকলের খাওয়ার শেষে নন্দা যখন তাহার ও প্রমীলার ভাত বাড়িয়া লইয়া প্রমীলাকে খাইতে ডাকিল, তখন প্রমীলা আসিয়া আসনে বসিয়াই হঠাৎ তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দিদি তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

মনে মনে একটু কৃতজ্ঞ হইয়া অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া নতমুখে থালার ভাতগুলো নাড়াচাড়া করিতে করিতে নন্দা কহিল, "না, শরীর খারাপ হবে কেন, আজ কাঠ দিয়ে রান্না করতে হল কিনা, ভিজে কাঠ, তাই মাথাটি একটু ধরেছে।" বলিতে বলিতে নন্দা থালায় জল ঢালিয়া দিল। প্রমীলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওকি, তুমি যে কিছুই খেলে না"

"ভাল লাগছে না। তুমি খেয়ে নাও।"

প্রমীলা আর কিছু না বলিয়া খাইতে লাগিল। সে যে একেবারেই কিছু বুঝিতে পারে নাই, এমন নয়; তবে বুঝিতে পারিলেও তো তাহার করিবার কিছু নাই, তাই চুপ করিয়াই ছিল। এবার কলিকাতায় গিয়া কোনও কারণে শাশুড়ীর উপর তাহার কেমন যেন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই নন্দার গোপন মর্ম্মবেদনা এখন তাহার অন্তরকেও স্পর্শ করিল। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া কহিল, "এতেই ভাল লাগছে না, পরে আরও রত আছে।"

নন্দা চমকিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল। প্রমীলা ঘটি হইতে উঁচু করিয়া ঢক ঢক করিয়া খানিকটা জল খাইয়া কহিল, "মানে গরিবের ঘোড়া রোগ। অমিতারানী

প্রেমে পড়েছেন, আমাকে বলে দিয়েছেন 'বউদিকে ব'লো মহীতোষকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না।' এই সামনের ফালগুনের মধ্যে যদি তোমরা তার ব্যবস্থা কিছু না কর, তবে তাকে আর বোধ হয় পেতে হবে না।" নন্দার বিস্মিত অবোধ চাহনি তবু ঘুচিল না। সংশয়ের সুরে কহিল, "খুলে বল তো, কিছু যেন বুঝতে পারছি না।" অতঃপর প্রমীলা যে কাহিনী খুলিয়া বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই—দামিনীর বড় ছেলে দিলীপের বন্ধু মহীতোষ। দীপ্তির (দিলীপের বোন) বিবাহে বন্ধুর সঙ্গে দামিনীর বাড়িতে আসিয়া খুব কাজকর্ম্ম—অর্থাৎ হই হই রই রই করিয়াছে। সেই সূত্রে অমিতার সহিত মহীতোষের পরিচয়। এখন তার পরিণতি দাঁড়াইয়াছে প্রেমে।

নন্দা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। অমিতা, সেই অমিতা, সেই লাজুক লতার মত নম্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ের এই কান্ড! আবার বলিয়া দিয়াছে, 'এ বিবাহ না হইলে সে বাঁচিবে না!" একি প্রেম, না মোহ? কি আছে ইহার অন্তরালে, কল্যাণ, না অমঙ্গল?

প্রমীলা বলিল, "আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম সব, তবে বলতে পারিনি কিছু, অতবড় মেয়ে! আর পাড়াগাঁর মেয়ের যে এতবড় দুঃসাহস হতে পারে, এও আমার জানা ছিল না। কিন্তু জান দিদি, এটা এত দূর গড়াত না, যদি মা অত আশকারা না দিতেন। মা মনে করেন, তাঁর মেয়ে এখনও দুদ্ধপোষ্য। মেয়ে বায়না ধরল কলকাতায় থাকব, অমনি 'থাক'। কি বলব দিদি, আমার তখন যা রাগ ধরেছিল"—

নন্দা তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল; কহিল, "কিন্তু বিয়ে তো অমনি ইচ্ছে করলেই করা যায় না। তারা আমাদের পাল্টা ঘর তো।"

"হ্যাঁ দিদি, সে সব ঠিক আছে। মেয়ে আমাদের অশেষ বুদ্ধিমতী।"

"অবস্থা কেমন?"

"মস্ত বড়লোক। বুঝতে পারছ না, দিলীপের বন্ধু। এক গোত্রের না হলে কি বন্ধুত্ব হয় কখনও?"

নন্দা শিহরিয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল। নিজের যে অসহ দুঃখ এতক্ষণ তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছিল, নূতন একটি বেদনা আসিয়া সে বেদনাকে যেন ছাপাইয়া উঠিল। অমিতা ছোট নয়, সতের বছর বয়স হইয়াছে। নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থা সে ভালই বুঝিতে পারে। এ অবস্থা যে মহীতোষের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া সুবীরের পক্ষে কতদূর কষ্টসাধ্য, তা যদি অমিতা সামান্যও একটু ভাবিয়া দেখিত তো সহজেই বুঝিতে পারিত।

কিন্তু এখন আর চিন্তা করিয়া লাভ নাই, যা হইয়া গিয়াছে তা আর ফিরাইবার নয়। নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দা কহিল, "আমি লিখব ওঁর কাছে। তবে এ কি পারা এখন সোজা? এত বড়লোকের ছেলে, কম করেও হাজার দেড়েক টাকা নইলে যে কিছুই হবে না।"

প্রমীলা অপ্রসন্ন মুখে কহিল, "কি জানি বাপু, তোমরা সবাই দেখছি একই ধাতের। ও নিজের খেয়াল মেটাতে যা ইচ্ছে তাই বলবে, আর তোমরাও অমনি তাই মেনে নেবে? এ সব নাটুকে ব্যাপার, বাবা, আমি তো দু চক্ষে দেখতে পারি নে।"

নন্দা নীরবে আপনার উচ্ছিষ্ট বাসন উঠাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৮

অনেক দিন পরে নন্দা স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিল। কলম হাতে করিতেই এত দিনের সঞ্চিত অব্যক্ত অবরুদ্ধ বেদনা আর অভিমান বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর স্রোতের মত মনের দুয়ারে ভিড় করিয়া আসিল। প্রথমেই মনে আসিল, 'আমি বড় আশা করিয়াছিলাম এবার তোমাকে দেখিব, মা আমাকে লইয়া যাইবেন।' কথাটি মনে হইতেই বড় দুঃখে নন্দার চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, ছি ছি, কার উপর আমার এ অভিযোগ আর অভিমান। শাশুড়ীর আর দোষ কি। স্বামী যদি করে অবহেলা, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে স্বামী যদি দেখায় ঔদাসীন্য, তবে যে সারা জগতই তাহাকে অবহেলায় আচ্ছন্ন করিয়া দিবে। এই তো সংসারের নিয়ম। নন্দা চোখ মুছিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। নিজের কথা একটিও কিছু লিখিল না, শুধু লিখিল অমিতার সব কথা। কিন্তু সে চিঠির কোনও উত্তর আসিল না। প্রমীলা দিন কয়েক জিজ্ঞাসা করিয়া একই উত্তর পাইয়া একদিন চিন্তিত মুখে কহিল, "তাইতো চিঠির জবাব দিচ্ছেন না কেন? বোধ হয় মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন, না দিদি?" নন্দা উদ্যত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া কহিল, "দুঃখ কি!"

"দুঃখ নয়? এযে এখন ওঁর ক্ষমতার বাইরে। তা জেনেও তো তোমরা তাঁকেই পীড়ন করছ।"

"কি আর করব বল।"

সুবীর জবাব দিল, তবে অনেক দিন পরে। সব কথার শেষে লিখিল, 'অতবড় ঘরে এগোবার ক্ষমতা আমার নেই, তুমি অমিতাকে ফেরাবার চেষ্টা কর।"

প্রমীলা চিঠি দেখিয়া কহিল, "উনি ঠিকই লিখেছেন। তবে, সে আর ফিরবে না।"

সে যে আর ফিরিবে না, সে কথা নন্দাও মনে মনে জানিত। যৌবনের আগুন যখন মানুষের মনে উদ্দাম হইয়া জ্বলিয়া ওঠে, তখন তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টা না করিলে যে, তা পরে স্বজন তথা সমাজ ধ্বংশী হইয়া ওঠে, সে কথা নন্দা জানে। এখন আর অমিতাকে নীতির দোহাই দিয়া ফিরাইবার উপায় নাই; তাহার সুকুমার হৃদয়ে একবার যে রেখা পড়িয়াছে তাহা কি এত সহজেই মিলাইবে?

অথচ নন্দা তাহার প্রতি যত সহানুভূতিসম্পন্নই হউক কিছুই করার ক্ষমতা তো নাই। এবং ক্ষমতা নাই বুঝিয়াই নন্দা সকল বিষয়ে সকল দিকে একেবারে নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু চঞ্চল প্রমীলা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এই নূতন ঘটনায় তাহার মন সংসারের সকলের উপর বিমুখ হইয়া একমাত্র নন্দাকে, নন্দার শুভ কামনাকেই

হৃদয় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে যামিনীকে বার বার তাগাদা দিতে লাগিল, অমিতাকে বাড়ি আনাইবার জন্য। কিন্তু আজ নয়, কাল নয় করিয়া যামিনী কেবলই দেরি করিতে লাগিল।

ওদিকে দামিনী আরও ছ মাস পরে অমিতাকে তার প্রিয় কলিকাতা হইতে তার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকার পল্লী-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে ডাকে দিলেন এক দীর্ঘ লিপিকা। এতদিন যে কথা শুধু প্রমীলা আর নন্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবার লিপির কল্যাণে তাহা সারা সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। দামিনী যামিনীর কাছে সব কথা লিখিয়া, মানে, মায়ের কাছে মেয়ের কথা যতটুকু লেখা যায় ততটুকুই লিখিয়া সর্ব্বশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "তোমার দুটি হাতে ধরি দিদি, এ বিয়েতে অমত ক'রো না। অন্তত মেয়ের মঙ্গলের দিক চেয়েও তুমি তাড়াতাড়ি শুভ কাজটি সেরে ফেল, নইলে মেয়ে তোমার থাকবে না। ওর চেহারা দেখে আমার বড় ভাবনা হয়েছে।" বাস্তবিকই অমিতার অমন সতেজ প্রফুল্ল শরীর শুকাইয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে। যামিনী চিঠি পড়িয়াই দেবনারায়ণের কাছে ছুটিলেন, কহিলেন, "শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"এখন কি করা যায় বল তো?"

"কি বলব আমি। টাকা কোথায়?"

যামিনী সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "সে আমি বুঝি না, মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে।"

দেবনারায়ণের এবার সত্যই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি যে দেখছি, নেহাত উড়োপড়শীর মত কথা কইতে শুরু করলে! দিতেই হবে বললেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়?"

"তবে এখন উপায় কি?"

"উপায় তুমি ভাব। যেমন কলকাতা গিয়েছিলে।"

যামিনীর চিন্তাধারা অন্য পথ ধরিয়া ছুটিতেছিল, অমিতার উপর তাঁর কোনরূপ বিরক্তি আসিবার সুযোগই পায় নাই। কারণ মেয়ের চেহারা দেখিয়াই মায়ের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁর মাতৃহৃদয় সহসা সমস্ত সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্নকে দাবাইয়া রাখিয়া একমাত্র মেয়ের সুখ এবং মঙ্গল কামনায়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, "সুবোর কাছে আজই একখানা চিঠি লিখে দাও।"

দেবনারায়ণ বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া কহিলেন, "সে কি করবে?"

"বিয়ের চেষ্টা করবে।"

"এই বিয়ে?"

"নইলে আবার কোন বিয়ে?"

দেবনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "লিখতে হয় তুমি লেখ, আমি পারবো না।"

যামিনী স্থির নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "তার মানে? তুমি লিখতে পারবে না কেন?"

"কি করে একথা লিখি বলো ত? এত টাকা সে কোত্থেকে এখন যোগাড় করবে?"

"বিয়ে ত দিতেই হবে একদিন, তবে এখন এ ভাল সম্বন্ধটি হাতছাড়া কেন করি? মা লক্ষ্মী আর কোনও দিনই তোমাদের দোরে এসে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে দাঁড়াবেন না। বিয়ে যখনই দেবে তখনই টাকা লাগবে। তা ধারই কর, আর ভিক্ষেই মাগ।"

দেবনারায়ণ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "সে চিন্তা আমরাও করি। কিন্তু তুমি যে একেবারে ধনুকভাঙ্গা জিদ ধরে বসেছ, সামনের দু' মাসের মধ্যে বিয়ে দিতেই হবে। তা কি ক'রে হয়? সুবীর যদি রাজী হয়ও, তা হলেও ত তাকে একটু সময় দিতে হবে। এত তাড়াতাড়ি সে পারবে কেন?"

যামিনী চোখে মুখে দৃঢ় বিশ্বাস ফুটাইয়া তুলিয়া কহিলেন, "তা সে চেষ্টা করলে পারবে। ৬।৭ বছর ধরে চাকরি করছে, কিছুই কি জমায় নি!"

দেবনারায়ণের পুরুষের মাথা হইলেও কথাটার অসম্ভাব্যতা বিচার করিয়া দেখিবার শক্তি তাঁর হইল না। ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কি জানি!"

কিন্তু প্রমীলা সেই ঘরের নিকট দিয়া নন্দার ঘরে কি একটি কাজে যেন যাইতেছিল, যামিনীর শেষের কথাটা কানে যাইতেই সে মনে মনে একেবারে জ্বলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই তর্কের সুরে কহিল, "ঠাকুরঝির বিয়ের কথা বলছেন বুঝি মা? দাদার কাছে লিখেছেন?"

যামিনী কহিলেন, "সেই কথাই তো ওঁকে বলছি লিখতে। তা উনি কেবলই বলছেন, সে কি পারবে, সে কি পারবে। আমি বলি, এতদিন ধরে চাকরি করছে, সে কি কিছুই জমায় নি।"

প্রমীলা ঠিক এই কথাটিই উঠাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, যামিনীই উঠাইলেন দেখিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইল। কহিল, "আচ্ছা মা, আপনি কি ভেবে বলছেন, না, না ভেবেই বলছেন?"

"কেন বল তো?"

যামিনী ভয়ানক বিস্মিত হইয়া গেলেন। প্রমীলার বিবাহের পর এখনো বৎসর ঘোরে নাই। ইহার মধ্যেই সে এমনি স্পষ্ট মুখোমুখি তর্ক করিতে আসিয়াছে, ইহা যেন তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। প্রমীলা তেমনি সুরে কহিল, "সত্তর টাকা মাইনে পেয়ে বাড়িতে সংসার খরচ আর কলকাতায় নিজের সব খরচ চালিয়ে কেউ আর কি এর থেকে কিছু জমাতে পারে?"

যামিনী ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরে সে ভাব সংযত করিয়া গম্ভীর মুখে শুধু কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবে না, সব কথায় আর এস না, যাও, কাজে যাও।"

প্রমীলার হঠাৎ খেয়াল হইল, রাগের বশে সে কথাগুলো মোটেই মোলায়েম করিয়া বলে নাই, যা তার মত প্রায় নব-বধূর পক্ষে একেবারেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাহাকে যে এজন্য যামিনী বেশী কিছু বলিলেন না, এ শুধু সর্ব্বদা

( শেষাংশ ৮৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# নিউইয়র্ক

(ভ্রমণ কাহিনী)

**শ্রীরামনাথ বিশ্বাস**

পার্ক হইতে ফেরবার সময় বিকালের কয়েকখানা সংবাদপত্র কিনে নিয়ে এলাম। নিউ ইয়র্ক নগরীতে দৈনিক সংবাদপত্রের দাম দুই সেণ্ট এবং তিন সেণ্ট। ভারতবাসীর জ্ঞাতার্থে লিখছি, আমেরিকাতে সংবাদপত্রের "ক্লিক" আছে। এই "ক্লিক" শব্দটা আবার 'চেন'রূপেও ব্যবহার হয়। ক্লিক এবং চেন এই শব্দের প্রভেদ আছে। কতকগুলি সংবাদপত্র আছে যারা নিজের সরকার হতে এবং বৈদেশিক সরকার হতে সাহায্য পায়, তাদের দলকে বলে 'ক্লিক'। আবার কতকগুলি সংবাদপত্র আছে তাদের মালিক এক কিন্তু বিভিন্ন সম্পাদকের সাহায্যে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়। গত মহাযুদ্ধের পর হতে এরূপ সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকগণ মালিকের মন রক্ষা না করতে
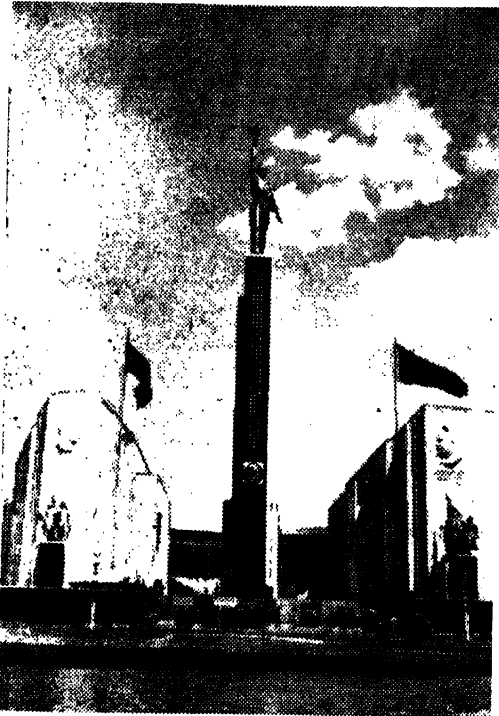
নিউইয়র্কে ১৯৩৯ সালের 'বিশ্ব-মেলা'য় সোভিয়েট রাশিয়ার প্যাভিলিয়ন

পেরে অনেকেই কাজ হতে বরখাস্ত হন। এই কর্মচ্যুত সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকগণ মিলে একচেটিয়া মালিকদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেন তাকে বলা হয় a case against the chainer। সর্বসাধারণ এ সকল টেকনিকেল শব্দের সকল সময় সংবাদ রাখে না তাই তারা বলে click and chain just the same। বর্তমানে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকের এক সভা আছে, তাতে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকগণ নাম রেজিস্টারী করেন এবং যখনই যার সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকদের দরকার হয় তখনই সেই সভাকে জানালে, তারা নামের ফর্দ পাঠিয়ে দেয় এবং ধনীর ইচ্ছা অনুযায়ী মজুরের নিযুক্তি হয়ে থাকে। এই মজুর সংঘটি C I O (সি-আই-ও) নামক মজুর প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত।

সাপ্তাহিক, মাসিক, এসকল পত্রিকা ছাড়াও অনেক সংবাদপত্র আছে, যাতে বিজ্ঞাপন থাকে না, যেমন আমাদের দেশের "হরিজন"। হরিজন পত্রিকা চালাবার টাকা আছে বলেই তা চলছে, কিন্তু আমেরিকায় এই ধরনের কতকগুলি দৈনিক পত্রিকা আছে, যেমন Daily Worker, People World, তাতে পয়সা দিয়ে কেউ বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। তাদের বিষয় নিয়েই বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন থাকে এবং এই সকল দৈনিক কিনতে হলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই দৈনিক সংবাদপত্র চালাবার জন্য প্রত্যেক দিন চাঁদা উঠছে এবং কোন্ জেলায় কত চাঁদা প্রত্যেকে দেবে তাও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে আছে। আমেরিকার প্রগতিশীল যুবক যুবতী সেই পত্রিকাগুলির গ্রাহক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও ঐ সংবাদপত্রগুলির প্রবেশ নিষেধ, তবুও ঐ সংবাদপত্রগুলিই যুবক যুবতীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতীক। তাই তারা বলে, Who are we, what for we to fight, against whom we to fight. We want economical equality and then we will consider what is peace and what is war। আমেরিকার অধিকাংশ লোকই যে যুদ্ধ চায় না, উপরের উদ্ধৃত অংশই তার সাক্ষ্য দেয়। এরা স্পষ্টই বলে যে তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও সম্বন্ধ নেই। আমেরিকার লিন্‌চিং সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান সংবাদপত্র যেমন কিছুই ছাপে না, তেমনি নিজের ঘরের কথাও অনেক চেপে রাখবার চেষ্টা করে থাকে। ভারতের কয়জনা লোক আমেরিকার Hen and Egg সংঘের সংবাদ রাখে? আমরা জানি আমেরিকার মজদুর শ্রেণীর একজন খ্যাতনামা নেতা সম্প্রতি জেলে গিয়েছেন, কিন্তু যে সংবাদপত্র তাদের মুখপত্র তার খরচ কি করে চলে তার সংবাদ রাখি না। যারা এসব সংবাদ আমেরিকায় রাখে তাদের বলা হয় "Percentage"। আমেরিকায় এই "পারসেনটেজ" পার্টির লোক চার কোটী, তাই আজ রুজভেল্ট চিৎকার করেও সাড়া পাচ্ছেন না এবং পাবেন বলে বোধও হয় না।

ভাবছিলাম আজ রাত্রে বাইরে যাব না। পকেটে একতাড়া নোট রয়েছে। ভয় হ'ল, যদি নিউ ইয়র্কের গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি; তবে পথে বসতে হবে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল অতীত দিনের স্মৃতি, যেদিন পৃথিবী পর্যটনে বের হয়েছিলাম পকেটে একটিও পয়সা না নিয়ে। আজ টাকা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; চুলোয় যাক টাকা, কিন্তু দেশটাকে আমার দেখতে হবেই। আমি দেশে ফকির, বিদেশে ফকির হলে অভিজ্ঞতাটা মন্দ হবে না। তখন রাত প্রায় এগারটা। বের হয়ে পড়লাম পথে।

বিজলী বাতির আলোয় হারলামের প্রশস্ত রাস্তাগুলি আলোকিত। ব্রডওয়েতে বেড়াতে হলে এই শীতেও ঘাম বের হয় বিজলী বাতির উত্তাপে। দূর হতে মনে হয় যেন আগুন লেগেছে। ফিফথ্ অ্যাভিনিউ এবং টেনথ্ স্ট্রীট ঈস্ট যেখানে মিলেছে সেখানে দাঁড়ালাম সেণ্ট্রাল পার্কের কাছে। এই আলোকোজ্জ্বল সুন্দর পথ, তারই উপর অগণিত মোটরগাড়ি ও বাস চলছে। যারা 'জয় রাইড' করতে বার হয়েছে দোতালা বাসে, তাদের হাসির ফোয়ারার উচ্চ কলরবে আকাশ মুখরিত। কাছেই বড় বড় হোটেলে মদের বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ। সুন্দরী তরুণীর কলহাস্য আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করেছে। যুবক যুবতী আপন মনে পথ চলেছে, সারাদিনের পরিশ্রমের অবসাদ দূর করতে। তারা কখনও কখনও ছোট ছোট রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে লাইট রিফ্রেশমেণ্ট খেয়েই বের হয়ে পড়ছে, প্রতি মুহূর্তটিকে যেন তারা আনন্দে ভরিয়ে তুলতে চায়। কাছেই একটা সিনেমা গৃহে নাচ চলছে। আমেরিকার একদিকে চলেছে

ঐশ্বর্যভোগের আয়োজন তার এক দিকে রয়েছে নিরন্ন, বেকার ও ক্ষুধিতের ব্যর্থ জীবনের করুণ দৃশ্য। কিন্তু ঐ যে দৃশ্য আমার সামনে, তা দেখে মনে হয় না আমি আমেরিকায়, মনে হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে আছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চারিদিকে সর্বহারার দল বাস করে তার সংবাদ কেউ রাখেন কি? যদি সে সংবাদ রাখেন ত আসুন আমেরিকার আমার বর্ণিত স্থানে। দেখবেন এখানেও সর্বহারার দল নতমুখে বসে আছে। কেউ সারাদিনে এক টুকরো রুটি খেয়েছে, আর কেউ অভুক্ত অবস্থায় বসে আছে পথের দিকে চেয়ে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা আছে, বাগানে ফল আছে, মাঠে প্রচুর গম আছে, নদীতে জল আছে, কারখানায় কাপড়, জুতা সবই তৈরী হয়, দোকানী তা দোকানে এমন সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু ঐ ভিখারীর দল দোকানের কাছে যেতে পারে না, পরনে ছেঁড়া ট্রাউজার, গায়ে ছেঁড়া কোট, কারও গায়ে শার্ট আছে, কারও গায়ে নেই। কিন্তু নেকটাই তবুও ঝুলছে।

একজনের কাছে গিয়ে বসলাম, দু'চারটা বাজে কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম আজ খাওয়া হয়েছে কি না। উত্তরে লোকটি বললে, "আজ কেন, কাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি, খেতে দেবে নাকি, দাও তো দশ সেন্ট?" তার হাতে দশ সেন্ট ধরে দিলাম। সে দৌড়ালো রুটির দোকানে, একটা বড় রুটি নিয়ে এসে ধীরে চিবিয়ে খেতে লাগল, আমি তাই দেখতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, এই ত সেই আমেরিকা যার বিপুল ঐশ্বর্য সমগ্র পৃথিবীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। শুনেছি আমেরিকা ডেমক্রেসির আদর্শ, কিন্তু এটা ডেমক্রেসি না হিপক্রেসি তা তুমিই জান। একটা খোট্টা স্কচ বয় বলেছিল, "It is very hard to find out a job than to do it"।

আনন্দের লীলাভূমি, টাকার আড়ত নিউ ইয়র্কএ এসেছি। রাত্রি দুটো পর্যন্ত পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়ালাম। কেউ আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। তাতে আমি আনন্দিত হলাম। আমার আকৃতি অনেকটা নিগ্রোদের মতই। নিজের পরিচয় কারও কাছে দিলাম না; আর দেবার প্রয়োজনই বা কি! হাতে টাকা আছে, পেট ভরে খেতে পারব আর আমেরিকার সুখ-দুঃখের সংবাদ নিতে সক্ষম হব। এমন সুন্দর সুযোগ ছাড়া কি উচিত? একটি পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। আমার গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে একবার কলকাতায় দেখা হয়। তার পরনে মাত্র একখানা ধুতি, গায়ে একটা গেঞ্জি আর ট্যাঁকে কতকগুলি পয়সা। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এভাবে ঘুরে বেড়াবার কারণ কি? গ্রামে ত কখনো এভাবে থাকতে দেখিনি? লোকটি বলল, "কলকাতা দেখতে এসেছি, দেখে চলে যাব। জাঁকজমক করে চোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ কি? আমি নিউ ইয়র্কে প্রায় দু'সপ্তাহ লোক সমাজে অপরিচিত ছিলাম, তাতে দিন কেটেছিল ভালই। তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

হারলামে নিগ্রোই থাকে বেশী, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য World's Fairএর তরফ থেকে নানারূপ প্রচার চলছে, তাতে রাশিয়ান প্যাভেলিয়নেরও নাম বিশেষ করে প্রচারিত হচ্ছে। রাশিয়ায় লিন্চিং নেই, কালায় বার নেই, সকলেই কাজ পায় ইত্যাদি। যে সকল খাদ্য আমেরিকানদের কাছে পঞ্চাশ সেন্টে বিক্রী হয়, নিগ্রোদের কাছে সেই খাদ্যই পনের সেন্টে বিক্রী হয়। আমি সেই সুযোগ ছাড়লাম না। রাশিয়ান প্যাভেলিয়নে গিয়ে সর্বপ্রথমই বেশ করে খেয়ে নিলাম। এমন সুন্দর দই, ঘোল, ক্রিম, সবজি, স্যাণ্ড আর ছাড়া আর কেউ তৈরী করতে পারে না। রাশিয়ান যুবতীরা তা যোগান করে নির্বাচিত লোকের সামনে হাসিমুখে এনে রাখছে, ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলছে, আর কাজ করছে যেন কলের পুতুলের মতই। তাদের নেকটাই স্থানভ্রষ্ট হয়েছে তাদের নেকটাই ভাল করে এঁটে দিচ্ছে, কোটটা পাৎলুনটা ঝেড়ে দিচ্ছে, যেন আপনজন। যে খাচ্ছে রাশিয়ান প্যাভেলিয়নে সেই হাসিমুখে বার হয়ে আসছে, আর ভাবছে নানা কথা। বোধ হয় ভাবে, আমাদের ভাগ্যে কি এমন দিন হবে? রাশিয়ান প্যাভেলিয়ন দেখে রাশিয়ার কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম। নূতন শক্তির সমাজকে নূতন পথে নূতনভাবে গড়ে তোলার উদ্যম ও প্রচেষ্টা সত্যই প্রসংশার্হ। এই কারণেই রাশিয়ান প্যাভেলিয়নে লোকের এত ভিড়। গরীব আমেরিকানরা সেখানে গিয়ে যখন হাঁ করে থাকে তখন গাইড বলে, "Not to see, but to act. Don't wait here"।

রাশিয়ান প্যাভেলিয়নে চিত্রপট এবং কিউরিও নিয়ে কোন রকম জাঁক-জমক নেই। বাড়িটা যেন দূর হতে যক্ষপুরী বলেই মনে হয়। বাড়িটার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। তার এক হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। লোকটির মুখের ভাব দেখলেই মনে হয়, যেন সে বলছে, গরীব, সর্বহারা, আর ভুলে থাকিস না, আর ভিক্ষা করিস না, এবার কেড়ে নে যা তোদের প্রাপ্য। বাড়িটাতে প্রবেশ করলেই "পারসেনটেজ" বলে একটা জ্ঞান আপনি আসে। যেমন রাশিয়া ও আমেরিকার উৎপন্ন দ্রব্য ও তার লাভ ক্ষতির তুলনামূলক একটি চার্ট টাঙ্গানো রয়েছে।

শ্বেতকায় বেকারের দল, রাশিয়ার সিনেমা বসে বসে দেখছে। রাশিয়ার সিনেমার সঙ্গে আমাদের সিনেমার মিল মোটেই নেই। আমাদের সিনেমা হয় ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস এসব নিয়েই। রাশিয়ায় ধর্ম এবং ইতিহাস বলে কিছু নেই। বর্তমান রাশিয়া ভবিষ্যতের ইতিহাস গড়ে তুলছে। পূর্বের ইতিহাসকে কাট-ছাঁট করে যা বর্তমান সমাজের কাছে ধরা হয়েছে, তারও নমুনা দেখান হচ্ছে। বাস্তবিকই রাশিয়ার পুরাতন ইতিহাস ভয়াবহ। রুটি নাই, কাজ নাই, রুটির জন্যে, চাকরির জন্যে লোকে আপন স্ত্রীর সতীত্ব পর্যন্ত বিক্রয় করছে। ভবিষ্যতে কি হবে তাই ভেবে লোকের অকালে কেশ পেকে সাদা হয়ে গেছে। আর বর্তমান, অন্য ধরনের। বর্তমান রাশিয়ানরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এইটাই হ'ল প্রকৃত শান্তির একমাত্র কারণ। লোকে চায় শান্তি।

কাছেই ইটালিয়ানদের প্যাভেলিয়ন। নিগ্রোরা সেখানেই বেশী যায়। তারা দেখতে চায় কোন শক্তির প্রতাপে হাইলে সেলাসি যুদ্ধে অপদস্থ হলেন, রাজ্য ত্যাগ করে, পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ইটালিয়ান প্যাভেলিয়নে সে রকম কিছু নেই, যাতে করে লোক তৃপ্ত হতে পারে। তাতে আছে ঠকাবার বেড়াজাল। নিচের তলায় প্রবেশ দ্বারে লেখা রয়েছে "বিনা মূল্যে সামগ্রী বিতরণ"। সেই লোভে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য দ্বিগুণ দামের ব্যবস্থা রয়েছে। তা দেখে অনেক নিগ্রো বিক্রেতার সামনেই মুখ হতে থুথু ফেলছে এবং ক্রোধোন্মত্ত হয়ে চলে যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে এক দেবীর মূর্তি, তারই কাছ দিয়ে একটা কৃত্রিম ঝরনা উপর থেকে পড়ছে। দৃশ্য সুন্দর বটে, কিন্তু সকলেই সে দৃশ্য বিষ চক্ষে দেখছে আর বাইরে চলে আসছে।

দক্ষিণ আমেরিকার যে সকল জীব ব্রিটিশ এবং আমেরিকার তত তারাও ইটালীয়ান প্যাভেলিয়নকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। দক্ষিণ আমেরিকার ইটালিয়ন মিশনারীরা আর বাইবেলের ধার ধারে না, একদিকে মুসলিনী এবং অন্যদিকে বাইবেল; তারপর জমিদারি তো রয়েছেই। দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান যদিও অসভ্য যদিও তত, তবুও বোঝে জমিদারের ধর্ম আর চাকরের ধর্ম এক হতে পারে না। এটা জিজ্ঞাস্য বিষয়, দক্ষিণ আমেরিকার লোক স্বাধীন হয়েও ইটালিয়ন এবং স্প্যানিশদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ

( শেষাংশ ৮২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# জীবনের ছন্দ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বাড়ি ভাড়া করিতেই হইল। কলিকাতার মত ব্যয়বহুল শহরে কখনও যে বাড়ি ভাড়া করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বাস করিব, এ কথা কেহ কখনও ভাবে নাই, আমি নিজে কখনও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই।

দুই তিন বছরের কথা নয়, সেই কবে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ১৭ বছর বয়সে মেসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ বাইশ তেইশ বছর অতীত হইল, মেসেই আছি। নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকগণ যেমন করিয়া মেসেই জীবনপাত করে আমিও তেমনভাবেই চলিয়াছিলাম—কিন্তু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে ৪০ বৎসর বয়সে আমার ছন্দ পতন ঘটিল।

মেসের প্রতি আমার কোন আসক্তি নাই, যৌবনে কখনও ভাবিও নাই যে, মেসেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কালটা অতিবাহিত হইবে। দারিদ্র্যকে যেমন সহিতে হয় অর্থাৎ সহ্য করাইয়া লয়, তেমনই মেসের জীবন আমাদের সহ্য হইয়া যায়।

ষাট টাকা মাহিয়ানার কেরাণী আমি। কলিকাতায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বাস করিবার দুরাশা করিতাম না এবং কেরাণীর স্ত্রী অর্থাৎ আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীও কখনও এত বড় আশা করেন নাই। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই ছিলাম।

ইদানিং এক বছর যাবৎ সুনীতি দেবীর সুর বদলাইয়াছে। দূর হইতে এইটুকু অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার বড় মেয়ে অনীতা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, শীঘ্রই পাত্রস্থ করিতে হইবে। আজকাল মেয়েকে গান, বাজনা ও নাচ না শিখালে বিবাহ দেওয়া কঠিন। কাজেই শহরে আনিয়া লেখাপড়ার সংগে গান বাজনা শিখান নিতান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে গেলে কমপক্ষে কত টাকা ব্যয় পড়িবে, তাহার যতবার হিসাব করিয়াছি, ততবারই হতাশ হইয়াছি। কাজেই সুনীতি দেবী পরোক্ষভাবে বাড়ি ভাড়া করিবার যে ইংগিত করিয়াছেন আমি তাহা সভয়ে এড়াইয়া গিয়াছি। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে যে চিঠি পাইয়াছি তাহার পর আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলাম না। বন্ধুদের সংগে অনেক পরামর্শ করিয়া এ দুঃসাহস করিয়াছি।

সুনীতি দেবী লিখিয়াছেন, কলকাতায় বাস করবার জন্য বুড়ো বয়সে ক্ষেপে গেচি বলে মনে কর না। যখন বয়স ছিল এবং যখন স্বপ্ন দেখে আনন্দ পেতুম, তখন কখনও এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করিনি।......আমার কর্তব্য আমি করেছি। এবার তোমার দায়িত্ব। অনী তের বছর পেরিয়ে চৌদ্দর কোঠায় পড়েচে। আমার যতটুকু বিদ্যে ছিল তা কবেই শেষ করেচে। গ্রামের যে ধারা তাই ত পাবে। বকে বকে বই নিয়ে বসাতে পারিনে। মোটেই উৎসাহ নেই। অথচ নাটক নভেল পড়ার প্রতি একটু নিরুৎসাহ বা ক্লান্তি পাবে না। মালু, প্রিয়, রেবা হ'ল তার বন্ধু—এরা কি যে না জানে ভগবান জানেন। এরা এমন সব কথা নিয়ে আলোচনা করে যে, শুনে অবাক হতে হয়। তারপর গ্রামের ছেলেগুলো ভাল নয়। আমার ত ভীষণ ভয়ই করে। সারাক্ষণ আগলিয়ে রাখা যায় না এবং কড়া শাসন করে মনটা ছোট ও চরিত্রকে ক্ষণভংগুর করে তুলতে আমি চাইনে, পারিনেও। তোমাদের যে গাঁ, কখন যে কি দুর্ণাম রটিয়ে দেয়, কোন বিশ্বাস নেই।.........সেদিন জান মন্টু কি করেচে, বিড়ি খাচ্চে। আচ্ছা করে মার লাগিয়েচি, সর্বদা ছোটলোকদের সংগে মিশে ভাষাটিও করেচে চাষাড়ে।.........

চিঠির বিবরণ আর উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ, পুঁই গাছে খুব লতা-পাতা হইয়াছে, আমগাছে বোল ধরিয়াছে, আলু বেশী হয় নাই, পুকুরে ভাল জল না থাকায় মাছগুলি মরিয়া যাইতেছে প্রভৃতি সংবাদ আমার নিকট যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবেই।

চিঠিটি পাইয়া মহা ফাঁপড়ে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা, বিশেষ করিয়া যাহারা সপরিবারে এখানে বাস করিতেছেন, তাহাদের সুপরামর্শে ও সাহায্যে বাড়ি ভাড়া করিলাম। আয় ব্যয়েরও হিসাব হইয়াছে। অথৈ জলে পড়িব না বলিয়া ভরসা।

আমার জনৈক বন্ধু প্রভাতকুমার সান্ন্যালের সহ ভাড়াটে হিসাবে বাড়ি ভাড়া করিলাম।

বাড়িটি মন্দ নয়। বহু পুরাতন হইলেও দালান। বাড়ি তৈয়ারী হইবার সময়ই বাহিরে চুণকালি দেওয়া হয় নাই, কাজেই শেওলা পড়া ইটগুলি দেখা যায়। গাঁথুনির চুণসুরকিগুলি কিছু খসিয়া পড়িয়াছে। বাড়িটির চারিপাশেই বাড়ি আছে। কর্পোরেশনের গলি হইতে একটি উপগলি বাহির হইয়াছে। উপ-গলিটি বাড়িওয়ালাদের। এই অন্ধকার, স্যাঁতসেতে ও নোংরা সরু পথ দিয়াই আমাদের যাতায়াত করিতে হইবে।

বাড়িটি ফ্ল্যাট হিসাবে তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন পরিবার বাস করিয়া ফ্ল্যাট-বাড়ি করিয়া লইয়াছেন। আমি দুই-তলাতেই ঘর পাইয়াছি। একটি বড় ঘর। কাঠের বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছে। বারান্দায় রাঁধিবার ব্যবস্থা আছে। উপরে জলের ব্যবস্থা নাই, তবে একটি পায়খানা আছে।

যদিও বাড়িটিতে আলো বাতাসের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে তথাপি বাড়িটি নিতেই হইল। কারণ অপিসে যাইতে বাসভাড়া লাগিবে না, নিকটেই স্কুল ও বাজার রহিয়াছে। শহরের মধ্য স্থলে ২০ টাকায় এমন বাড়ি পাওয়া দুষ্কর।

বাড়িটি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাহারও পছন্দ হয় নাই। এত ছোট বাড়িতে যেন তাহাদের নড়িবার চড়িবার মত স্থান নাই। মন প্রাণকে সংকুচিত করিয়া রাখে, পঙ্গু করিয়া ফেলে। চিরকাল তাহারা গ্রামে বাস করিয়াছে, সেখানে ছিল বৃহৎ প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়ি, বড় পুকুর, বাগান, সেখানে ছিল মুক্ত আকাশ, সুদূরপ্রসারী প্রান্তর, সেখানে হইত অজস্র আলো বাতাসের বন্যা। উন্মুক্ত প্রান্তর হইতে যাহারা বন্দী হইল প্রচীরের সংকীর্ণ পরিসরে তাহাদের অন্তর দেবতার ক্রন্দন আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু ব্যষ্টিগত বিদ্রোহে আছে আত্মদহের জ্বালা, সমষ্টিগত বিদ্রোহে নাই মুক্তির সাধনা।

সংসারটা বেশ গুছাইয়া ফেলিয়াছি। নবাগতরাও শহরের নূতন আবহাওয়ায় আপনাদের মিশ খাওয়াইয়া লইয়াছে। নব্য সভ্যতা নূতন জীবনযাত্রার কৃত্রিম ছন্দে জাগিয়াছে মোহ। অদ্ভুত, আমি অবাক হইয়া ভাবি, এত সহজে এরা কি করিয়া পুরাতনকে বিস্মৃত হইল, কি করিয়াই বা এত সহজে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত জীবনধারাকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতে পারিল। আর্থিক টানাটানি, নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও এরা শহরের মোহে আত্ম-সমর্পণ করিল।

আয় ব্যয়ের যে হিসাব করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমশ উলট-পালট হইয়া যাইতে লাগিল। অনীতাকে নিজে পড়াই, বছর দুইএর মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। অনীতা ছাড়া আর সকলকেই স্কুলে দিয়াছি। হিসাবে তাহাদের বেতন ও খাতাপত্রের খরচ ধরিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল বেতনের চেয়ে চাঁদা ও অন্যান্য খরচ কম নয়। তারপরও আজ ব্রোচ চাই, কাল দুল চাই, পরশু ফাউণ্টেন পেন, শাড়ি প্রভৃতির তাগিদা ত লাগিয়াই আছে।

ছেলে-মেয়েদের নিত্যি নূতন দাবী ভিন্ন সংসারের বাজে খরচ কম নয়। প্রায় সপ্তাহেই সপরিবারে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে প্রতিদর্শন দিতে হয়। অতিথিরা আসিলে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে চা ও জলখাবার খাওয়াইয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে হয়।

এসব ছাড়াও বিবাহ অথবা জন্ম দিনের উপহার, সিনেমা ও সার্কাস প্রভৃতির একটা না একটা খরচ লাগিয়াই রহিয়াছে। সমাজে যখন বাস করি তখন আমাকে সামাজিকতা রক্ষা করিতেই হইবে, পাল-পার্বণ পালন করিতেই হইবে—ষাট টাকার কেরাণী বলিয়া কোন ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

তবু সুখেই ছিলাম। যাহারা আমার মত এমনি প্রবাসে মেসে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং বছরে মাত্র কয়েক দিনের জন্য আপনজনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছে, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, প্রিয়জনের সঙ্গে বাস করা কত সুখের।

সকালবেলা টিউসানী করিয়া সারাদিন অপিসে কলম পিষিয়া যখন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরি তখন আনন্দে মনটা ভরিয়া ওঠে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা যখন হাসিমুখে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমি ভুলিয়া যাই আর্থিক অনটনের কথা, ঋণের কথা।

এতদিন মেসে বাস করিয়াছি। সুখে দুঃখে একাই ছিলাম, রোগে শোকে কোন আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। যখন প্রিয়জনের সান্নিধ্য কামনা করিয়াছি, তখন ক্লান্ত একাকীত্বে হাঁপাইয়া উঠিয়াছি, আর যখন নির্জ্জনতার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন অবাঞ্ছিতদের অন্তরঙ্গতায় মরণ যন্ত্রণা বোধ করিয়াছি।

জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মাঝে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সুখীই হইয়া ছিলাম, কিন্তু বেশি দিন সুখ ও স্বস্তিতে রহিতে পারিলাম না।

যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইতে সুরু করিল। আমার দূর সম্পর্কীয় মামাত ভাইএর পুত্র হরিসাধন চাকুরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্বে কোন মাত্র সংবাদ না দিয়া সরাসরি আমার বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ষাট টাকার কেরাণী আমি, সেজন্য যত অসন্তুষ্টই হই না কেন এবং যত অসুবিধাই হউক না কেন, কোন কিছু বলিবার উপায় নাই, কারণ চক্ষুলজ্জাটাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

তারপর বিদেশে আসিয়াছে, কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় চায়, এ অবস্থায় প্রথম দিনই নিষেধ করি কি করিয়া? আর নিষেধ করিলেই বা শোনে কে—যাইবেই বা কোথায়?

সুনীতি দেবী বলিলেন, এখন কিছু বলো না। আত্মীয়তার কথা নয় নাই ধরলাম, অতিথি ত। অতিথি নারায়ণ। পয়সা-কড়ি চায় না, রাত্রে মাথা গুজবে আর দুমুঠি খাবে। দুমুঠি ভাত খেয়ে আর তোমায় ফতুর করে দেবে না। পাঁচজন যেখানে খায়, সেখানে আর একজনের এমনি কুলিয়ে যায়।

আমি বলিলাম, তোমাদের সোজা হিসাব আমার মাথায় ঢোকে না। পাঁচজন খেতে পারলে ছ'জনের হয়, ছ'জনের হলে সাত-জন, সাতজনের হলে আটজন। সে নয় পাঁচজনের ভাত শত শত লোক খেল কিন্তু পরের বাড়িতে থাকতে গেলে একবার অনুমতি নেবে না। তারপর থাকবেই বা কোথায়? আমরাই বা থাকব কোথায়, অনী ও নিবু বা থাকবে কোথায়? এদের ত আমি চিনি, দু'চার দিনের ব্যাপার নয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

সুনীতি দেবী একটু ভাবিয়া বলিলেন, সে পরে ভাবা যাবে।

ঃ একে ত' আশ্রয় দেওয়া গেল, কিন্তু এখন মহিমবাবুর ছেলেকে রাখতে পারব না বলি কি করে, আর জয়নারায়ণ সেনকেই মানা করি কি করে।

ঃ তাইত'!

ঃ বাড়ি যখন করেচি তখন অত্যাচার সইতে হবে জানি, কিন্তু তারও ত' একটা সীমা আছে। শুধু খরচের কথা নয় এটুকু বাড়িতে এত লোক থাকবেই বা কি করে, আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াই বা হয় কি করে। ইনি এসেচেন চাকুরির চেষ্টায়, উনি পড়তে, তিনি চিকিৎসা করাতে, অমুক কার্যোপলক্ষে, ওরা বেড়াতে—এরা অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান করতে।

ঃ আঃ, চুপ কর না, ঠাকুরপো সব শুনতে পাচ্চে।

ঃ এই ত' আমাদের জীবন যে, স্বামী-স্ত্রীর privacy (গোপনতা) রাখবার উপায় নেই। বাড়িটি যদি সর্বদা ধর্মশালা হয়ে থাকে, তবে ছেলেমেয়েগুলির লেখাপড়া হবে বলতে চাও? এরা ভাবেন কি—আমার কি জমিদারী আছে! সেদিন তোমার পিসিমা একদল পাড়াপড়শী নিয়ে এসে হাজির। আমাদের ঘর-দোর ছেড়ে পরের বাড়িতে রাত্রি কাটাতে হল। ছানুর অসুখ—কত যে অসুবিধা হয়েছিল, তা' তাঁরা বুঝেও বোঝেন নি।

ঃ তুমি কি রায় সাহেবের মত সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে চাও!

ঃ আত্মীয়তার বন্ধনে আমি ফাঁসি ঝুলতে রাজি নই। তোমার পিসিমা বলে তুমি ক্ষুণ্ণ হচ্চ, কিন্তু তোমার পিসিমা তোমার প্রতি কি সুবিচার করেচেন! রায় সাহেব তোমার পিসিমার দেওর, তিনি তাঁকে আত্মীয় বলে স্বীকার করেন না, অথচ তোমার পিসিমা বিনা আমন্ত্রণে গায়ে পড়ে সেখানে গেলেন, পরম তৃপ্তিতে খেয়ে এলেন আর আত্মীয়ের ঐশ্বর্য, মান খ্যাতির গল্পে সারা পাড়াটা মুখরিত করে গেচেন।

ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। স্ত্রীর আত্মীয়া সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করাতে স্ত্রী ক্রমশ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কাজেই আমি হঠাৎ যবনিকা টানিয়া প্রভাতের ঘরে চলিয়া গেলাম।

হরিসাধন রহিয়াই গেল। হরিসাধন নিতান্তই অসহায়, কাজেই অন্যত্র যাইবার জন্য বলিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম আমাদের অসুবিধা, আর্থিক টানাটানি দেখিয়া নিজেই সরিয়া পড়িবে, আর যদি না চলিয়াই যায় তবে পরে এক সময় বুঝাইয়া বলা যাইবে। হরিসাধন আমার দুরবস্থা ও অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে নিশ্চয় কিন্তু নড়িবার কোন নাম গন্ধ করিল না—আমরাও বলি বলি করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে এত বড় অসুবিধাটা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে জড়াইয়া গেল।

সুনীতি দেবী ভাবিয়াছিলেন, হরিসাধন থাকিলে অনেক সাহায্য পাইবেন। বেকার বসিয়া যখন আছে তখন ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা দেখিবে, বাজার করা প্রভৃতি ছোটখাট কাজ করিয়া একটু সাহায্য করিবে। সাহায্য করা ত' দূরের কথা তাহার দেখা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল এবং দুই বেলাতেই ভাত চাপা দিয়া রাখিতে হয়।

জয়নারায়ণ সেন বিবাহ করিয়াছে এবং অল্প বয়সেই বেশ বড় সংসার। জয়নারায়ণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় সেজনাই সে এখনও আসিতে পারে নাই। জয়নারায়ণ আসিলে অসুবিধা খুব বেশিই হইত কিন্তু তাহার দুরবস্থার জন্য খুব বেশি অসন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। কিন্তু মহিমবাবুর পুত্র যখন বন্ধু সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন আর সহ্য করিতে পারিলাম না।

সুনীতি দেবী বহু চেষ্টা করিলেন আমায় সংযত হইবার জন্য। আমি এক তরফা রাগারাগি করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলাম, একবার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলাম না।

হাজার হউক গাঁয়ের ছেলে, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে চুপ করিয়াই যাইতে হইল। মহিমবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া চিঠি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীমান প্রখর এবারও ম্যাট্রিক পাশ দিতে পারেনি। একুশ বছর বয়স হল, কি যে করি ভেবে পাচ্চিনে। দেশের যা' দুরবস্থা তার ওপর নতুন আইন হয়ে যা অবস্থা দাঁড়িয়েচে তা' তোমরা শহরে থেকে বুঝতে পারবে না। নতুন ধরণের ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েচে, সে খবর সম্ভবত জান। এমন একটি পরিবার পাবে না যেখানে দু'একটি লোক মারা যায়নি।

শুনে আশ্চর্য হবে যে, ছোবান, জাফর, হরনাথ, দেবু, চৈতা বছর-খানেক পূর্বেও আসর জমিয়ে কুস্তি করেচে, আর আজ তারা লাঠি ভর করে চলে। .........আমাদের গ্রামে তুমিই শুধু মানুষ হয়েচ, তুমিই আমাদের ভরসা.........

মানুষ কতদূর হইয়াছি তাহা আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি শুধু মনে মনে বলিলাম, ভগবান, মানুষ না করিয়া তুলিলে ত' আজ আমাদের এমন অমানুষের মত থাকিতে হইত না।

দুইটি ত' ছোট ছোট ঘর। অধিবাসী আমরা দশজন। ঘুমাইবার উদ্দেশে আমরা শুইতে পারি না। রেলযাত্রী কিংবা যাত্রাদলের লোকদের মত কোনভাবে মাথা গুজিয়া পড়িয়া থাকি। সকাল ছয়টা সাড়ে ছয়টায় গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর রাত্রি বারটা সাড়ে বারটার পূর্বে সে গোলযোগ থামে না।

ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করিবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখাপড়া করিবার উপায় নাই। লেখাপড়ার সময় কেহ না কেহ বেড়াইতে কিংবা কোন কাজে আসেন। বাঙালী মেয়েদের হাতে যত কাজই থাক গল্প না করিয়া পারে না। তারপর কেহ না আসিলেও গল্প করিবার মত যথেষ্ট লোক এখানে রহিয়াছে। গান্ধীজী-সুভাষ বসু হইতে আরম্ভ করিয়া মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল পর্য্যন্ত একটা না একটা বিষয়ে বিতর্ক লাগিয়াই আছে।

কয়েকদিন পরে প্রখরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করবি! বি-এ, এম-এ পাশ করে বহু লোক বেকার বসে আছে। মিলে কাজ করবি ত' বল চেষ্টা করি।

ঃ মিলে কি কাজ করতে হবে?

ঃ তাঁত বুনবি। তোর স্বাস্থ্য ভাল আছে, খাটতেও পারিস, মিলেই ঢোক, উন্নতি হবে।

ঃ কুলিদের সঙ্গে আমি কাজ করতে পারব না।

ঃ তবে কি জজিয়তি করবি। আমি কথাগুলি একটু বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিলাম।

প্রখরের সঙ্গী মহেশ একটু ভয় পাইয়া গেল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল, কাকাবাবু আমার জন্য চেষ্টা করুন। আমি যে-কোন কাজ করতে রাজি আছি।

প্রখর মিলে ছোটলোকদের সঙ্গে শ্রমিকের কাজ করিতে রাজি হইল না। তাহার পনের কি কুড়ি টাকার কেরাণীগিরি চাই।

এদের নিষ্ক্রিয় অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। কোন কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারিলাম না।

আমি শুধু নই, কয়েকদিনের মধ্যে দেখিলাম সকল ভাড়াটেই প্রখরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন সুনীতি দেবী স্পষ্ট বলিয়া ফেলিলেন, মহিমবাবু অসন্তুষ্টই হোন আর যাই হোন না কেন প্রখরকে এখানে রাখা চলে না।

আমি কৃত্রিম বিস্ময়ে বলিলাম, কেন? অতিথি, একেবারে সাক্ষাৎ নারায়ণ, দেখলে পুণ্যি হয়। হঠাৎ দেবতাকে তাড়াতে চাও কেন?

ঃ ঠাট্টা নয়। লক্ষ্মীছাড়াটা যে কেবল দিনরাত পড়ে ঘুমোয় আর বিড়ি খায় তা' নয়, এক নম্বরের পাজী। ও যদি আর কিছুকাল থাকে তবে সব ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাগুলি না খেয়ে যাবে না।

ঃ হল কি বল না?

ঃ মুখ্খুর নানা গুণ। প্রতিমাকে প্রেমপত্র লিখেচে।

হঠাৎ প্রতিমার মা মালতী দেবীকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অবকাশ পাইলাম না।

মালতী দেবী বলিলেন, চৌধুরী মশাই দাঁড়ান, কথা আছে।

কথা যে কি অনুমান করিতে পারিলাম, কাজেই বোকার মত চাহিয়া থাকা ভিন্ন কোন কথা বলিবার নাই।

মালতী দেবী একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, পড়ুন। অনেক বকা ছেলে দেখিচি, কিন্তু প্রখরের মত আর দেখিনি মশাই। প্রথমই ওর হাবভাবে, কথাবার্তায় সন্দেহ হয়েছিল যে, ছেলেটি ভাল নয়।

চিঠিটি পড়িলাম, কোন জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম এদের অত্যাচারে সুখশান্তি গেচে, ঋণগ্রস্ত হইয়াছি—শেষ পর্য্যন্ত কলঙ্কের ভাগী হইব।

মালতী দেবী বলিলেন, আমার মেয়ে যথেষ্ট বড় হয়েচে, টাকাকড়ি নেই যে পাত্রস্থ করে বিপদ মুক্ত হই। বয়স্কা মেয়ের পিছনে যদি এমনি লাগে তবে খারাপ হতে কতক্ষণ।

আমি বললাম, আপনারা পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করুন, আমি আর বলব কি!

সুনীতি দেবী বলিলেন, এর মধ্যে ঠিক করবার কিছু নেই। বাড়িতে এতগুলি বয়স্কা মেয়ে আছে, এর মধ্যে এমন অসচ্চরিত্রের যুবককে আর একদণ্ড রাখা নিরাপদ নয়। যা দেশের হালচাল কখন কোন্ ফাঁকে কি সর্ব্বনাশ হয় কোন নিশ্চয়তা নেই।

মালতী দেবী বলিলেন, ও হারামজাদা শুধু অসচ্চরিত্র নয়, গুণ্ডা! কোন কথা বলতে ত' রীতিমত ভয়ই করে মশাই।

সুনীতি দেবী বলিলেন, আজই দেশে পাঠিয়ে দাও। অসৎ ছেলের প্রতি কোন মায়া দয়া নেই। ঋণ করে, নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করে আমি অসৎ ছেলেকে পুষতে পারব না।

আমি বলিলাম, গাড়ি ভাড়া ত' দিতে হবে।

ঃ তা' ত' দিতেই হবে নইলে ও এক পা নড়বে না। বসে বসে অন্ন ধ্বংশ করবে আর যত নোংরামি করবে—বিপদে যখন পড়েচি কিছু অর্থ দণ্ড দিয়ে আপদ বিদায় কর।

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, আজ ত' পাঠান সম্ভবপর নয়। সামনের মাসে মাইনে পেয়ে পাঠিয়ে দেব।

মালতী দেবী বলিলেন, ছোঁড়াকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দেবেন। পাজী, নচ্ছার, এদেরকে পুলিশে দিতে হয়।

দেখিতে দেখিতে দেড় বছর কাটিয়া গেল।

প্রখরকে বাড়ি যাইবার জন্য রেল ভাড়া দিয়াছিলাম, সে বাড়ি যায় নাই। কয়েকদিন থাকিবার নাম করিয়া সে কোন এক বন্ধুর মেসে উঠিয়াছিল এবং বন্ধুকে মহাবিপদে ফেলিয়া মাস তিনেক পর অন্যত্র কোথায় যে গিয়াছে, সে সংবাদ পাই নাই।

হরিসাধনকে একটা চাকুরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলাম। দুই মাস কাজ ছিল, পুনরায় বেকার বসিয়া আছে।

জয়নারায়ণ সেন আসিয়াছেন। তাহাকে বেশিদিন বেকার থাকিতে হয় নাই। তিন মাসের চেষ্টায় ২৫৲ টাকা মাহিনার একটি কাজ জুটিয়াছে। তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। খরচ বাবদ তিনি মাসে দশ টাকা দিবেন বলিয়া নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু গত পাঁচ মাসে মাত্র পনের টাকা পাইয়াছি।

আমার এক মামাত ভাই আসিয়াছে। সে ল' কলেজে পড়ে। মহেশ কাপড়ের কলে কাজ পাইয়াছে। মিল অঞ্চলেই থাকে। প্রতি রবিবার একবার দেখা করিতে আসে। মাঝে মাঝে সে আমার ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য খেলনা, লজেঞ্চুস বিস্কুট কিনিয়া আনে। আমাদের এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের সস্তায় কাপড় চোপড় মিল হইতে কিনিয়া আনিয়া দেয়।

সর্বক্ষণ অভাব অভিযোগ ও অসুবিধায় থাকিতে থাকিতে মনটা হাঁপাইয়া উঠিল। বাড়ি ভাড়ার তাগিদা, মুদীওয়ালার পাওনা, ছাত্রছাত্রীদের মাহিনা ও চাঁদা, জীবনবীমার টাকা—কত কি

যে একটি মানুষকে ঘিরিয়া রাখে, আমি ভাবিয়া কূল পাইনা। দারিদ্র্যের পীড়নে মনটা হইয়া পড়িয়াছে সঙ্কীর্ণ ও রুক্ষ—সর্বদা শুধু অপরের দোষ ও ত্রুটিই আমার চোখে পড়ে। প্রাণ খুলিয়া কাহার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা কহিতে পারি না, স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে ছন্দহীন ও অসামাজিক।

ভদ্রতার মুখোস ভেদ করিয়া যেন আদিম যুগের বর্বরতা প্রকাশ পাইতে চায়। মনে হয় ব্যর্থ এই সমাজ জীবন ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া যাই দিক্‌দিগন্তে।

যে বন্ধনের প্যাঁচে পড়িয়াছি তাহা হইতে বিদ্রোহী মন মুক্তি পাইল না, জড় পঙ্গু মন রেখা পথেই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। উত্তেজনার মুখে শুধু কিছু টাকা ধার করিয়া পূজার ছুটিতে দেশে আসিলাম।

দেশে আসিয়া প্রথম বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের প্রাণের বন্ধন শহরের ইট পাথরের সঙ্গে নয়, শহরের সভ্যতার সঙ্গেও নয়—তাহার নিবিড় অন্তরঙ্গতা রহিয়াছে পল্লীর ধূলোবালির সঙ্গে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে। যে অন্তরদেবতা মৃত্যু পথে চলিয়াছিল তা যেন নবজীবন লাভ করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

আমি একদিন স্ত্রীকে বলিলাম, তোমরা দেশেই থেকে যাও।

সুনীতি দেবী একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা' হলে চলবে কি করে? এবার অনী পরীক্ষা দেবে, আসচেবার মণ্টু পরীক্ষা দেবে।

আমি বলিলাম, অনীতা নয় কয়েক মাস প্রভাতের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেবে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ত' আর বেশি দেরী নেই। আমার মনে হয় শহরের বাড়ি তুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমাদের মত সামান্য আয়ের লোকদের কলকাতার মত শহরে বাস করা উচিত নয়।

সুনীতি দেবী কোন জবাব দিলেন না। আমি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, কলকাতায় বাড়ি করে হাতের সব টাকা খরচ করে ফেলেছি এবং বেশ ঋণও হয়েচে। পূজোয় দেশে এলুম ঋণ করে আর আমাদের চাকর রাম দেশে গেল নগদ ৭০ টাকা নিয়ে। আমি রামের মনিব অথচ রামের অবস্থা আমার চেয়ে বেশ সচ্ছল। ছেলে মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, সর্বদা অভাব অভিযোগের মধ্যে থেকে থেকে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েচে, এ বয়সেই কেমন জড় ও পঙ্গু হয়ে যাচ্চে। না পায় ভাল খাওয়া, না পায় আলো বাতাস, না পায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করবার মত বিস্তির্ণ স্থান।

সুনীতি দেবী আমার যুক্তির প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না সত্য কিন্তু নাগরিক সভ্যতা তাহাকে এত প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে, আমার যুক্তিগুলি তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল না।

শহর হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম আমার ছেলে মেয়েদের বেশ একটু অসুবিধা হইয়াছিল কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যে সে সকল অসুবিধা দূর হইয়া গেল। সেই চিরপরিচিত পল্লীর সরল মানুষ, গাছ গাছালি, মাঠ বন, পুকুর খাল বিল, ফলমূল, লতা-পাতা-ফুল, সবুজ ধরণী ও সুনীল আকাশ দুই দিনে যেন তাহাদের মধ্যে টানিয়া লইল।

যাহারা মাটির ধরণীতে নামিয়া আসিয়া দিকদিগন্তে আপনাদের নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিল, সভ্যতার সঙ্কীর্ণ গতি ভেদ করিয়া বৃহত্তরের মাঝে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস লইয়াছিল তাহারা কি আবার ওই বন্দীনিবাসে ফিরিয়া যাইতে চায়? আমি ত' জড় ও পঙ্গু, আমি ত' জীবনব্যাপী দাসখত লিখিয়া দিয়াছি কিন্তু এরা—যাহারা মুক্তির অগ্রদূত, স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, অসীমের প্রাণশক্তি, তাহার কিসের প্রভাবে আত্মাহুতি দিতে চায়?

আমি ছেলে মেয়েদের অনেক বুঝাইলাম। আর্থিক অসুবিধার কথা বলিয়া, দেশে যে সস্তায় প্রচুর পরিমাণ টাটকা তরিতরকারি, দুধ, ফল পাওয়া যায় তাহা বুঝাইয়া বলিলাম কিন্তু কেহই আমার যুক্তি শুনিল না। গ্রামে থাকিতে বলায় শেষ পর্যন্ত কেহ অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিল, কেহ পাশের বাড়িতে গেল, আর ছানু ও নীলু ত কাঁদিয়াই ফেলিল।

শেষ পর্যন্ত আমারই পরাজয় হইল। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা বিবেচনা করিয়া ও অনীতার বিবাহের কথা মনে করিয়া পুনরায় শহরে যাওয়াই স্থির করিলাম। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করিয়া এত জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, এ বয়সে আর বিরহ সহ্য করিবার শক্তি নাই। অবশ্যম্ভাবী ধারা মানিয়া লইতে বাধ্য হলাম।

বাড়ি ঘর অপরের হাতে বুঝাইয়া দিয়া কলিকাতায় রওয়ানা হইলাম। বারবার মন বলিতে লাগিল ভুল করিতেছি। কিন্তু সভ্যতার যে আবর্তে পড়িয়াছি তাহা হইতে আমাদের মুক্তি নাই। এ জীবনধারা যত সর্ব্বনাশাই হউক না কেন—এই আমাদের প্রয়োজন এবং এর হইতে আমাদের মুক্তি নাই।

চলিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই মনকে বাঁধিতে পারিতেছি না। আমার মনে পড়িতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসায় দুই তিনটি গরীব পরিবার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল আমাদের বাড়ির সম্মুখের বড় পুকুরটা। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ওর জল। বাতাসে জলগুলি টলমল করিতে থাকে, মাছগুলি খেলিয়া বেড়ায়। পুকুরের পাড়েই ফলমূলের বাগান। আসন্ন শীতে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু ফাল্গুন হাওয়ায় শ্যামল বনশ্রীতে দিগন্ত আলোকিত করিয়া তুলিবে। বাগানের পর খোলা মাঠ। মাঠের ওই প্রান্তে দিকচক্রবাল রেখা আসিয়া মিশিয়াছে।

গাড়ি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সুনীতি দেবী, অনীতা, মণ্টু ওরা সকলেই বন্ধুবান্ধবদের ছাড়িয়া আসায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল এবং এতক্ষণ পর্যন্ত বিমর্ষ হইয়াই বসিয়াছিল।

গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিমর্ষতা কাটাইয়া উঠিতে লাগিল। আমি শুধু জানালায় মাথা গলাইয়া গ্রামের দিকে চাহিয়া রহিলাম। চোখ ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না, তাহাদের সঙ্গে আলোচনায়ও যোগ দিতে পারিলাম না।

ধীরে ধীরে গ্রামের চিহ্ন দৃষ্টির সীমান্তে মিলাইয়া গেল। এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকায় হয়ত চোখ ঝাপসা হইয়া গেল এবং দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমার চোখের জল কাহারও চোখে পড়িল না। মনটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, হাত তুলিয়া চোখ দুইটি মুছিতে পারিলাম না।

# বিজ্ঞানে ঘড়ি নির্ম্মাতাদের দান

শ্রীসুধীরকুমার বসু

যে সমস্ত বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী শক্তি আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রবর্তনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে তাঁহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে দেখা যায়, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রথম জীবনে ঘড়ি নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে কোনও না কোনওভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঘড়ি নির্মাতাদের কাজে যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়, তাহাই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠনে ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি উদ্ভাবনে সহায়তা করিয়াছে কি না জানি না, তবে যন্ত্রযুগের প্রথম প্রবর্তনে ও প্রসারকল্পে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের দান অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের জেম্‌স্ ওআটের নাম মনে পড়ে। ষ্টীম এঞ্জিনের প্রচলন হইতেই বলিতে গেলে যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তন হয়। এই বাষ্পীয় শক্তি আহরণের মূলে ছিলেন জেম্‌স্ ওআট্। ওআট্ প্রথম জীবনে ঘড়ি নির্মাণের কাজ শিখিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়া ওআচ মেকার্স গিল্ডের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশি গ্রহণ করেন। দুই বৎসর তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রের কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তৎপর তিনি গ্লাসগোতে ফিরিয়া গিয়া যন্ত্রাদি নির্মাণ ও মেরামতের একটি ছোট দোকান খুলিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই সময় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও মেরামতের জন্য তাঁহার নিকট আসিত। বিজ্ঞানী নিউকোমেন উদ্ভাবিত একটি স্টীম এঞ্জিন এক সময়ে তাঁহার নিকট মেরামত করিতে দেওয়া হয়। উহা নিয়া কাজ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পান যে, নিউকোমেন এঞ্জিনের কাজ তত আশাপ্রদ নহে। যদি একটি পৃথক 'কনডেনসার' ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এঞ্জিনটির কার্যদক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ওআটের এই পরিকল্পনা বিজ্ঞানে এক নবযুগের সূচনা করিল। সাধারণ একজন ঘড়ি ও যন্ত্রনির্মাতা ওআটের নাম জনসমাজে একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকরূপে প্রচারিত হইল। তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করিলেন তাহা সমস্ত জগতকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জগৎ নূতন একটা পরিবর্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে কাজ ছিল একান্ত শ্রমসাধ্য ওআটের আবিষ্কারের ফলে তাহা সহজ হইয়া উঠিল। বিশ পঁচিশ জন বা পঞ্চাশ জন লোকে যাহা করিয়া উঠিতে পারিত না, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। মানুষের শ্রমের যেমন লাঘব হইল, অল্প সময়ে অধিকতর পরিমাণ জিনিস উৎপাদনের পথও সুগম হইল। ফলে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইল। যন্ত্র সাহায্যে অল্প সময়ে এত অধিক পরিমাণ শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল যে, স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতে লাগিল। কিভাবে অল্প সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এ সমস্ত দ্রব্যাদি ও বিবিধ কাঁচা মাল চালান দেওয়া যাইতে পারে তাহাই তখন সমস্যা হইয়া উঠিল।

ওআট পরিকল্পিত স্টীম এঞ্জিনের সহায়তায় চাকাযুক্ত গাড়ী চালানো সম্ভবপর কি না ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে তাহার পরীক্ষা চলিল। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে জর্জ স্টীফেনসন এই পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বাষ্পীয় শকটের বা রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইল। স্টীফেনসন ইংলণ্ডের উত্তরাংশে অবস্থিত ছোট একটি কয়লা খনির পাম্পিং এঞ্জিনম্যান হিসাবে প্রথমে কাজ করিতেন। তাঁহার আয় খুব বেশী ছিল না। তিনি নিজে তেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই একমাত্র পুত্রকে যাহাতে সুশিক্ষা দিতে পারেন তজ্জন্য তিনি নিজে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানাভাবে অর্থাগমের চেষ্টা দেখিতেন। খনির কাজের সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে এইজন্য তিনি ঘড়ি মেরামতের বিবিধ কাজ করিতেন। নিউকোমেন ও ওআট পাম্পিং এঞ্জিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘড়ি নির্ম্মাণের কাজের ভিতর দিয়া যে অভিনব শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তাহাই মনে হয় তাঁহার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ ১৮২৫ সালে বস্তুতই তিনি আধুনিক রেলগাড়ীর গোড়াপত্তন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হইলেন।

ওটমার মার্গেনথেলার

জর্জ ষ্টিফেনসন্

ম্যাথিয়স্ বলড্‌উইন

ওআট ও স্টীফেনসনের আবিষ্কার যে আধুনিক যুগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ওআট মানুষকে দিয়াছেন শক্তির সন্ধান, স্টীফেনসন আবার সেই শক্তির সাহায্যে এমন এক যন্ত্রদানবের সৃষ্টি করিলেন, যাহার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে বহু দূরের পথ অতিক্রম করিবার সুবিধা হইল। বিজ্ঞানের অতি আধুনিক জয়যাত্রার ইতিহাসে উহাদের

এই দুইটি আবিষ্কারের মহিমা আজ অনেকটা ম্লান হইয়া আসিলেও, বৈজ্ঞানিক যুগের গোড়াপত্তনে ইহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিক্ষাদীক্ষায় তেমন অগ্রসর না হইয়াও ইঁহারা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে যুগান্তকারী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমাদের মন স্বতঃই তাঁহাদের প্রতিভার নিকট শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে।

ওআট এবং স্টীফেনসন ব্যতীত বিজ্ঞানক্ষেত্রে আমরা আরও কয়েকজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সন্ধান পাই; তাঁহারাও ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসায়ে বিশেষভাবে সংশিলষ্ট ছিলেন। ইংলণ্ডে স্টীফেনসন কর্তৃক বাষ্পীয় শকট আবিষ্কৃত হইলে পর আমেরিকা মহাদেশে উহা প্রচলন করার জন্য যে কয়জন কর্মী বিশেষভাবে
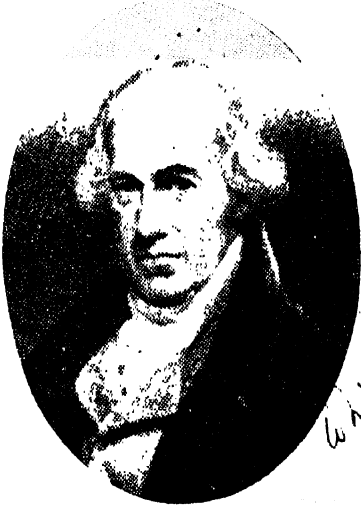
জেমস্ ওয়াট্

চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ম্যাথিয়স ডব্লিউ বল্ডউইনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ সালে তিনি ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়মের জন্য একটি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় শকটের যে মডেল প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাতে জনসাধারণ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। ফলে পেন্সিলভানিয়া ষ্টেটে লোক চলাচলের উপযোগী গাড়ী প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপরেই প্রথমত অর্পিত হয়। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত এই কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বলডুইন লোকোমোটিভ ওআর্কস'-এর নাম আজ সুপরিচিত। বলডুইন প্রথম জীবনে সামান্য একজন ঘড়ি নির্মাতা ছিলেন মাত্র। ঘড়ি নির্মাণের কাজের নিপুণতা হইতেই হয়তো তিনি যন্ত্র-বিজ্ঞানে অভিনব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে এরূপ বৃহত্তর কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জন ফিচ্ (Fitch) নামক অপর একজন মার্কিন বিজ্ঞানী স্টীমবোট প্রচলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনও কনেক্‌টিকাটের এক ঘড়ি নির্মাতার নিকট শিক্ষানবিশিতেই অতিবাহিত হয়। এরূপ কথিত আছে, এই ঘড়ি-নির্মাতা পাছে নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয় এই আশঙ্কায় ফিচকে বিশেষ কিছু শিখাইতে চাহিতেন না। এমন কি, ফিচ যাহাতে তাহার নিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি ঐ সমস্ত তালাবন্ধ করিয়া রাখিতেন। ফিচ্ তাহার অনুপস্থিতিতে ঐ যন্ত্রপাতি কৌশলে বাহির করিয়া নিজের চেষ্টায় ও যত্নে অনেক কিছু শিখিয়া লইতে সমর্থ হন। ফিচ ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। একমাত্র নিজের উদ্যমেই তিনি যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় আয়ত্ত করেন এবং বহুকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ১৭৮৬ সালে স্টীমবোট প্রস্তুত করেন। ফিলাডেলফিয়া ও ট্রেনটনের মধ্যস্থিত ডেলাওয়েয়ার নদীর মধ্যে তাঁহার নির্ম্মিত স্টীমবোট বহুদিন পারাপারের কার্যে ব্যাপৃত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উপরোক্ত বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে যে যন্ত্রযুগের প্রচলন হয়, বলাবাহুল্যে তাহাতে প্রতিভাবান কর্মীদের পক্ষে এক নূতন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ উপস্থিত হইল। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কর্মক্ষেত্রে ঘড়ি নির্মাতাদের তরফ হইতে আমরা এমন বহু বিশিষ্ট কর্মীকে পাইয়াছি, যাঁহারা তাঁহাদের উদ্ভাবন দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রভৃতি পরিমাপ করিবার জন্য নানাপ্রকার মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়। যাহাতে আপনা হইতে মাপ মত উহাদের মধ্যে দাগ কাটা (graduate) যাইতে পারে, তাহার একটি যন্ত্র ১৮৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়। জোসেফ রোজার্স ব্রাউন নামে নিউ ইংলণ্ড নিবাসী একজন ঘড়ি নির্মাতাই কিন্তু ইহার উদ্ভাবক। সূক্ষ্ম পরিমাপের নিমিত্ত Vernier caliper নামে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারও উদ্ভাবন করেন উপরোক্ত রোজার্স ব্রাউন। ঘড়ি নির্মাণের কাজে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাই হয়তো তাঁহাকে এরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি নির্মাণের পথ নির্দেশ করিয়াছে।

সেলাইয়ের কল আবিষ্কর্তা এলিয়স হাউও (Elias Howe) ছিলেন বোস্টনের এক ঘড়িনির্মাতার শিক্ষানবিশ। সেখানে কাজ করিবার সময়ে একদিন কোন এক ক্রেতাকে তিনি এইরূপ মন্তব্য করিতে শুনিতে পান যে, সেলাই করিবার যন্ত্র যে আবিষ্কার করিতে পারিবে, তিনি যে বড়লোক হইবেন সন্দেহ নাই। এই মন্তব্য শুনিবার পর হইতে হাউ এইরূপ একটি যন্ত্র উদ্ভাবনে বিশেষ মনোযোগী হন এবং নিজ প্রতিভার গুণে চার বৎসরের মধ্যেই ১৮৪৬ সনে তিনি সেলাই কলের পেটেণ্ট লইতে সমর্থ হন।

'লাইনো টাইপ' যন্ত্রের উদ্ভাবনে মুদ্রণ জগতে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। যিনি এই যন্ত্রের উদ্ভাবক তিনিও প্রথম জীবনে ঘড়ি নির্মাণের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭২ সালে ওটমার মারগেনথেলার (Ottmar Mergenthaler) ঘড়ির কাজের অভিজ্ঞতা ও ৩০ ডলার মুদ্রা মাত্র সম্বল করিয়া জার্মানি হইতে যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া উপস্থিত হন। বিভিন্নভাবে টাইপ সাজাইয়া বার বৎসরকাল তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে নানারূপ পরীক্ষা করেন এবং তাহারই ফলে 'লাইনো টাইপ' যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন।

ঘড়িনির্মাতাগণের মধ্য হইতে এরূপ আরও বহু কর্মীর নাম করা যাইতে পারে যাহারা বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আধুনিক এক এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে এরূপ একটি মন্তব্য করা হইয়াছিল যে,

More basic inventions except those in electricity and industrial chemistry are the results of efforts of watch and clock-makers than of any other professional group."

বিজ্ঞানের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বস্তুত দেখা যাইবে, এ মন্তব্য মিথ্যা নহে।

# চলচ্চিত্র

( গল্প )

শ্রীঅনিল সেন

মহানগরীর অখ্যাত এক পল্লী। একদিন ইহা পতিত জাতির বস্তিরূপে গণ্য ছিল, জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরীর আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ায় বস্তির খোলার ঘর ভাঙিয়া দিনের পর দিন নূতন নূতন ইমারত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দুইতলা, তিনতলা, চারতলা করিয়া সব বাড়ি। অধিকাংশই 'ফ্ল্যাট'—মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের আবরু ও ভদ্রতা বাঁচাইয়া বাস করিবার উপযোগী করিয়া তৈরী। অনেকের মত আমরাও একদিন ইহারই একটির নীচের তলায় দুই কামরার এক 'ফ্ল্যাটে' আসিয়া বাসা বাঁধিলাম।

বাড়ির সদর দরজার পাশের ঘরটিই আমার জন্য নির্বাচিত হইল। কারণ, আমার ঘরের আবরু না থাকিলেও চলে; পাঁচ জনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে সযত্নে এবং সভয়ে আবৃত করিয়া রাখিবার মত দুর্লভ রত্ন এখনও আমার ঘরে আসে নাই। টেবিল, চেয়ার, সেল্‌ফ, ছবি ইত্যাদিতে দুই চার দিনেই ঘর সাজাইয়া ফেলিলাম। ব্যায়াম চর্চার সরঞ্জাম স্বরূপ একটা বড় আয়না কিনিয়াছিলাম। ব্যায়াম চর্চার উৎসাহ ফুরাইয়াছে, ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন এবং বেশবিন্যাসের সহায়রূপেই আজকাল তাহার ব্যবহার। শোভন ও কায়দাদুরস্ত হইবে বুঝিয়া সেটাকে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিলাম।

আমার ঘরের গা ঘেঁষিয়া ছোট্ট একটু গলি, উহাই আমাদের বাড়ির প্রবেশপথ, অপর পাশে মানুষ প্রমাণ উঁচু দেওয়াল তুলিয়া বাড়ির সীমানা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হইয়াছে। দেওয়ালের ওপাশে তিন-চার কাঠা জমি এখনও ফাঁকা পড়িয়া আছে। কেবল এক কোণের ভাঙা দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটা আমড়া গাছ এখানকার পূর্বতন অধিবাসীদের স্মৃতিধর ও সাক্ষীরূপে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। জানালা দিয়া আমার দৃষ্টি একমাত্র ওই স্থানটিতেই মুক্তি খুঁজিয়া পায়। জানালার ঠিক সামনের দেওয়ালে সেই আয়না; আকাশ, আমড়া গাছ, আকাশের নিয়ত অপসারী মেঘমালা সব সময়েই তাহার বুকে নিজেদের ছবি ফলাইয়া রাখে। বাহিরে চাহিবার অবকাশ না পাইলেও বাহিরের রূপ আমাকে ফাঁকি দিতে পারে না, আমার আয়নার বুকে সব সময়েই তাহা ধরা পড়ে।

ফাল্গুন আসিয়াছে। মানুষের দেহে বা মনে তাহার ছোঁয়াচ লাগিতেছে কিনা খোঁজ লইবার অবসর ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমড়া গাছটার দিকে চোখ পড়িতেই দেখিলাম, কচি পল্লব মেলিয়া ন্যাড়া গাছটা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই এক ডালে এক বায়স-দম্পতি খড়-কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় বাঁধিতে লাগিয়া গেছে।

দেখিতে দেখিতে তাহাদের গৃহনির্মাণ শেষ হইল এবং দিন কয়েক পরে একটির নিরন্তর গৃহে উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম সে প্রসূতা। ক্রমে ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইল, ক্রমে তাহারা একটু বাড়িয়াও উঠিল। এখন মা আর তাহাদের সর্বক্ষণ পাহারা দেয় না, মাঝে মাঝে কোথায় যেন উড়িয়া যায়। কখনও দেখি আহার সংগ্রহ করিয়া সে বাসায় ফেরে, লাল লাল মুখ বাহির করিয়া বাচ্চাগুলো চিঁ চিঁ করিয়া ডাকে। মানুষের আয়নায় তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমি কাজ ভুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকি।

সেদিন বিকালে বাড়ি ঢুকিবার সময় মাঠটার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল। একটু ঠাহর করিয়া দেখিতেই বুঝিলাম, আমড়া গাছটা যথাস্থানে নাই, শুধু তাহার অতীত অস্তিত্বের স্থানটাকে কেন্দ্র করিয়া কতগুলো কাক চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সকালবেলা বাহিরে যাইবার সময় মাঠটাতে কতকগুলো লোকের শোরগোল শুনিয়াছিলাম বটে; কৌতূহলী হইয়া সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের ওপাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, ছিন্নমূল আমড়া গাছটা ভাঙা দেওয়ালের কোল ঘেঁষিয়া পড়িয়া আছে, চার-পাঁচটা মৃত কাকের ছানা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; রৌদ্রে শুকাইয়া কচি দেহগুলি তাহাদের কাঠ হইয়া গিয়াছে, খোলা ঠোঁটের ফাঁকে মুখের রক্তিমাভা গাঢ়তর। ঊর্ধ্বমুখে ক্ষীণ শুষ্ক বাহু মেলিয়া তাহারা কাহার কাছে কি অভিযোগ বা প্রার্থনা জানাইতেছে কে জানে।

দেখিলাম জমির এক দিকে ইট-সুরকি স্তূপীকৃত হইয়াছে আর এক দিকে চুনের রাশি। এবং আরও নানাপ্রকার চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম জমিটার উপর ইমারতের ভিত্তি স্থাপন হইয়া গেছে। দুর্বলের ঘর ভাঙিয়াছে, প্রবলের অভ্যুত্থান আসন্ন। অর্থের আনুকূল্য থাকিলে শূন্য মাঠে সৌধ নির্মাণ করিতে আর কয় দিন! ইঞ্জিনিয়ার আর রাজমজুর, লরি আর গরুর গাড়ির হট্টগোলের মধ্যে দেখিতে দেখিতে একতলা দুইতলা করিয়া চারতলা অট্টালিকা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধ মুক্ত আকাশের মাঝে আমার নিরালা মনের মুক্তিপথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। আয়নার বুকে আকাশের চলচ্চিত্র চলিতে চলিতে মিলাইয়া গেল, শুধু ঐ বাড়ির একতলার ঊর্ধ্বাংশের আর দোতলার অধিকাংশের প্রতিচ্ছায়া তাহার বুকে অচল হইয়া বসিল।

দিন কয়েক পরে অচল চিত্র আবার চলনশীল হইল, বাড়িতে বাসিন্দা আসিতে লাগিল। বাড়ির আনাচ-কানাচ মানুষে আর লট-বহরে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আসবাব দেখিয়া বুঝিলাম আমার জানালার পাশের দোতলা ঘরে যাহারা বাস করিতে আসিতেছে তাহারা শৌখিন। জানালা দিয়া সরাসরি চাহিয়া অশিষ্টাচার করি নাই, ওবাড়ির জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যের যেসব চলমান মূর্তির ছায়া আমার জানালা দিয়া একান্ত অজ্ঞাতে ঢুকিয়া পড়িয়া আয়নার বুকে প্রতিফলিত হইতেছিল, বসিয়া বসিয়া চুরি করিয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলাম।

—এক যুবক আর এক যুবতী। বয়স এবং ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিলাম, নব পরিণীতা পতি-পত্নী। তাহাদের ঘর গুছাইবার ব্যস্ততা দেখিয়া বুঝিলাম তাহারাই ঐ ঘরের অধিবাসী, আমার পড়শী।

দিন কাটিতে থাকে, তাহাদের জীবনের আলোছায়া নানা

বৈচিত্র্যে মোহ বিস্তার করিয়া দিনের পর দিন আয়নায় চলচ্চিত্রিত হয়। কখনও বিস্ময়ে কখনও কৌতুকে কখনও বা ঈর্ষান্বিত সানন্দ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া সব দেখি। আকাশের লীলা সাঙ্গ হইল, বায়সের খেলাঘর ভাঙিয়া গেল, এখন আমার আয়নার বুকে মানুষ আসিয়া সংসার রচনা করিয়াছে।

বছর ঘুরিয়া গেল। আয়নার সংসারে অবশেষে এক শিশু-রূপী দেবদূতের আবির্ভাব হইল। সারাদিন তাহাকে লইয়া মায়ের সে কত কৌতুক, কত অনাবশ্যক ব্যস্ততা; মাতা-পিতায় তাহাকে লইয়া কত কাড়াকাড়ি কত মান অভিমান! প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাদের উচ্ছল হাসির দুই-এক টুকরা কানে আসিয়া সংগীতও রচনা করে। এমনি করিয়া হাসি ও প্রগল্‌ভতার মধ্য দিয়া সংসার অনন্তকালের যাত্রাপথে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গেল।

সহসা একদিন আয়নার আনন্দের সংসারে নিরানন্দের ছায়াপাত হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মাতা-পিতার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার কালিমা। শিশুটি অসুস্থ।

সেদিন একটু রাত করিয়া বাড়ি ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কাহার গগণভেদী আর্তনাদে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ত্রস্তে উঠিয়া বসিলাম। কে কাঁদে? কোথায়? পাশের বাড়ির আলো আয়নায় ঠিকরাইয়া চোখে লাগিতেই ঘোর কাটিয়া গেল। আয়নাতেই দেখিতে পাইলাম, প্রতিবেশীর ঘরে অনেক লোক জড় হইয়াছে, খাটের উপরে দেবদূত শায়িত। আর দেখিলাম, তাহারই বুকের উপর মাতা-পিতা আকুল ক্রন্দনে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

* * * *

ভোর হইতেই আয়নাটাকে ঢাকিয়া দিতে গেলাম। হঠাৎ পিছনের পেরেক খুলিয়া মেঝেয় পড়িয়া আয়নাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

---

# প্রাচীন ও আধুনিক

**উমানাথ ভট্টাচার্য্য**

(১)

পূর্ব্বদিকে শস্যশষ্পে শ্যাম পল্লীনীড়
উদার গগন মাঠ ভরা স্নিগ্ধচ্ছায়া,
পশ্চিমেতে প্রবাহিত পূত পুণ্যনীর
কল্লোলিনী ভাগীরথী বিথারিয়া মায়া;
উত্তরে বঙ্কিমতীর্থে দেশমাতৃকার
বন্দন-সঙ্গীত উঠে মহাকাশ ছোঁয়া—
সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে হোথা কালিকার
মন্দির প্রাঙ্গণ ছায় আরতির ধোঁয়া।

মধ্যে হেথা ভট্টপল্লী পুণ্য জনপদ
দিকে দিকে অধ্যাপনা, নিষ্ঠা, সদাচার—
বিদ্যাপীঠ, চতুষ্পাঠী, জ্ঞান নদীনদ
শ্যামলিয়া মনোভূমি বহে চারিধার;
একখন্ড তপোবন পুরাকাল হ'তে
হেথা ভাসি আসিয়াছে যেন কালস্রোতে।

(২)

পূর্ব্বদিকে লোহবর্ত্মে দীর্ণবক্ষ তব
অহোরাত্র হুহুঙ্কারে যন্ত্রযান ছুটে,
পশ্চিমেতে সুরধনী জল কলরব
ডুবাইয়া বাষ্পতরী চলে শান্তি টুটে;
যন্ত্রদৈত্য আর্ত্তনাদে দক্ষিণ উত্তর
প্রকম্পিত মুহুর্মুহু ধূলিধূম্রময়—
তিরোহিত বিপ্রনিষ্ঠা, কল্মষ জর্জ্জর
নাহি জপ, নাহি তপ, সর্ব্বপুণ্য ক্ষয়;

বিদ্যাপীঠে প্রতীচীর অবিদ্যা-রাক্ষসী
যাবনিক কলভাষে মজায়েছে মন,
ডুবে গেছে মাতঃ তব গৌরবের শশী
খদ্যোতিকা কি করিবে? তমসা গহন!
তর্করত্ন কাশীবাসী প্রমথ প্রবাসী
আজি তুমি মৌন ম্লান, নাহি মুখে হাসি।

# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

( ৫ )

শারদা অবাক হয়ে গেল ওদের দেখে।

বেশী দিন নয়, এই সেদিন মাত্র গেছে বিপিন এখান থেকে, এখনও পনর দিনও হয় নি, এরই মধ্যে যে সে আবার মেয়ে নিয়ে এসে এখানে হাজির হ'তে পারে, এ ধারণা সে করতে পারে নি। তাই ওদের এসে দাঁড়াতে দেখে কথা কইতে পারলে না অনেকক্ষণ। তার পরে তরকারি কোটা বঁটিটা একবার কাত ক'রে রেখে, থালায় কোটা তরকারিগুলা জলে ধুয়ে তুলতে তুলতে প্রশ্ন করলে, "কি রকম? তুই যে আবার?"

একমুখ হেসে সপ্রতিভভাবে বিপিন বললে, "আবার তোমার কাছেই ফিরে এলাম দিদি।"

মেয়ের হাত ধ'রে সে বারান্দার একধারে ব'সে পড়ল। বললে, "দেখছিস্ আদু, এই তোর বড় পিসীমা, আমায় হাতে ক'রে মানুষ করেছে; পেন্নাম কর্।"

আদু দুই হাতে পায়ের ধুলো নিতে যেতেই শারদা বাধা দিলে।—"আহা, থাক থাক।"

আদুরী দেখলে এ পিসীমার সঙ্গে অন্নদার কোনও সাদৃশ্যই কোথাও নেই। এ কেমন মোটাসোটা, গায়ে গহনা, পায়ে আলতা, পরনে লালপাড় মটকার শাড়ি। বাঃ! বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় আদুরী শারদার পায়ের ধুলো না নিতে পারলেও সেই মেঝের ওপরেই মাথা ঠেকালে। শারদা হাসলে। বললে, "এই বুঝি তোর মেয়ে বিপিন? সেই বউএর পেটের মেয়ে? আর বে-থা করলি নে, ঘর সংসারও করলি নে? একটা ছেলেও হ'ল না যে বংশের পূর্বপুরুষরা এক গণ্ডূষ জল পায়!"

বিপিনও হাসল। বললে, "বাদ দাও দিদি, বাদ দাও। বলে না—জ্যান্তে দিলে না ভাত কাপড়, মরলে করবে দান সাগর? আমারও তাই। বেঁচে থাকতে মা-বাপের তো কোনও সেবাই করলাম না, তার আবার ম'রে! আর ঘর সংসারের কথা বলছ? তা বেশ তো আছি দিদি এদের নিয়ে। এই দেখ না মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, এখনও বে-থা দিতে পারছি নেতো শুধু পয়সারই অভাবে। নইলে এরকম বয়সে কি আর আমাদের ঘরের কোনও মেয়ে থুবড়ো হয়ে থেকেছে কখনও? "তোমরাই কি ছিলে? এরকম বয়সে কবে তোমাদের বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেছে, তোমরা শ্বশুর-ঘর করতে গেছ।"

হাসিমুখে শারদা উত্তর দিলে, "কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই এখন বিপিন, তবে সে চিন্তাই বা কেন?"

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে,—"কি রকম?"

শারদা বললে—বলব এখন পরে সে সমস্ত কথা। এখন এতটা পথ তেতে পুড়ে এলি, মুখ হাত পা ধো, মুখে একটু মিষ্টি—জল দে, তার পরে থিতিয়ে জিরিয়ে সব কথাবার্ত্তা হবে এখন; তাড়াতাড়ি কিসের।"

তরকারি কোটা ফেলে শারদা নিজে উঠল, রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে কোনও কোনও বিষয়ে উপদেশ দিয়ে, ভাই আর ভাই-ঝিকে নিয়ে গিয়ে ঢুকল নিজের শোবার সেই ঘরে।

বিপিন'এর মধ্যে হাত পা ধোওয়া শেষ করেছিল, বাকী ছিল আদুরী। শারদা ওর হাতে একখানা সাবান আর একখানা তোয়ালে দিয়ে তাকে কলঘরে পাঠিয়ে দিলে। বললে, "এখানে তো তোমার সেই পাড়াগাঁয়ের গেঁয়ো চাল চলবে না মা,—এটা শহর, এখানে সব শহুরে চালচলনে অভ্যস্থ। সকলেই ওজন বুঝে কথা বলে, ওজন ক'রে চলেফেরে, চালচলনও তাদের তাই হাল ফ্যাশান দুরস্ত। এখানে একটু সাজগোছ চাই, নইলে লোকে নিন্দে করে।"

আদুরী এ কথার তাৎপর্য্য প্রথমে ধরতে পারলে না, তার পরে মনে মনে কি আন্দাজ করলে কে জানে। কলঘর থেকে হাত মুখ ধুয়ে বার হয়ে আসবার পর শারদারই একখানা পুরোণো ডুরে শাড়ি প'রে এসে বসল জল খেতে। সম্মুখের থালায় সাজানো নানারকম খাবার; পাশে ব'সে শারদা। আদু একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে শারদার দিকে তাকিয়ে খেতে বসল। কিন্তু খাবার আশা সে যতটা করেছিল, ততটা পারলে না, কেমন একটা লজ্জায় ও ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগল। শারদা জিজ্ঞাসা করলে "তোমার নাম কি মা?"

"আদুরি।"

"আদুরি!"

শারদা কি ভেবে একটু হেসে বললে, "আদুরী নামটা বড় সেকেলে নাম বাপু, এখানে শুনলে সবাই হাসবে। তার চেয়ে আমি তোমার একটা নতুন নাম দিই, কি বল!"

মাথা নেড়ে আদু বললে, "আচ্ছা।"

শারদা বললে, "তোমার নাম থাক পুষ্প। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ঐ নামই ব'লো বুঝেছ?"

আদুরী আবার মাথা নাড়লে। শারদা বললে, "আজ আমার বাড়ি কয়েকজনের নেমন্তন্ন আছে, ওঁর জন্মদিন কিনা। প্রত্যেক বছর এইদিনে উনি দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ান-দাওয়ান, আমোদ-আহ্লাদ করেন; সেইজন্যে আজ আমিও বড় ব্যস্ত।"

শারদা নিজে থেকেই যখন এত কথা বলছে, তখন একটা কথাও না বললে ভাল দেখায় না ব'লে আদুরী অনেক ভেবে প্রশ্ন ক'রে বসল, "তারা কখন আসবে পিসীমা?"

"তারা?"—

শারদা হাসলো। মানুষের মনের দুর্বলতাটুকু যেন ওর পরিচিত, এমনি সে হাসির অর্থ।

বললে, "আসবে সন্ধ্যার সময়। কিন্তু তাদের সামনে যেন এই অবস্থায় বার হয়ো না, লোকে পাড়াগেঁয়ে বলবে।"

আদু যেন এ কথায় মনের কোথায় একটু আঘাত পেলে, কিন্তু উত্তর দিলে না, খাবারের থালা থেকে হাত উঠিয়ে নিলে। শারদা প্রশ্ন করলে, "ও কি?"

"আর খাব না।"

"পেট ভ'রে গেল বুঝি দু'খানা খেয়েই?"

"হ্যাঁ।"

"তবে থাক, ভরা পেটের ওপর আর জোর ক'রে খেয়ে দরকার

নেই। ও জায়গা ঝি এসে পরিষ্কার ক'রে নেবে এখন, তুমি ওঠ মা,—জোর ক'রে খাবার দরকার নেই।"

আদ্দু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। হাত মুখ ধুয়ে আবার এসে সেই ঘরেই বসল খাটের ওপর। খাটের একপাশে বড় আয়না, অন্য ধারে শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর রাখা নানা রংএর বই, খাতা, পেনসিল। আদ্দু বেছে বেছে ওর ভেতর থেকে একখানা ছবির বই নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। শারদা প্রশ্ন করলে, "পড়তে জান?"

ঘাড় নেড়ে আদ্দু বললে, "সামান্য।"

গম্ভীর মুখে শারদা বললে, "সামান্য জানায় তো কোনও কাজ হবে না মা, আজকাল আর সে যুগ নেই। বিশেষ মেয়েছেলে হয়ে যখন জন্মেছ, তখন সব শিখতে হবে; আর শিখতে হবে একটু এ যুগের চলনসই ক'রে। যাতে যে ঘরেই পড়—যেন বেমানান না হও!"

আদ্দু চুপ করে রইল। শারদা ওর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে যেন সাহস দিতেই ভরসাপূর্ণ হাসি হেসে বললে; "ভয় তার জন্যে? এখানে যখন এসেছ, তখন সে ব্যবস্থাও যাহক একটা করা যাবে। আচ্ছা, এখন তুমি বসে বসে ছবি দেখ বইএর, আমি উঠি। আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে চারিদিকে। শারদা উঠে গেল, একা বসে রইল আদুরী। তার কোলের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে' সেই ছবির বইখানা। কিন্তু ওর দৃষ্টি সেদিকে আবদ্ধ হয়ে রইল না, খাট, আলমারী, দেরাজ, এমন কি দেওয়াল ডিঙিয়ে খোলা জানালা পেরিয়ে গেল আকাশের দিকে।

দুপুরের আকাশ, আকাশের বর্ণ নীল, তার বুকে ভেসে চলেছে অসংখ্য সাদা মেঘ। আদ্দু চেয়ে রইল ওই দিকে। ভুলে গেল শারদা বিপিন আর অন্নদার কথা; ভুলে গেল তার নিজের অবস্থার কথা। সে কে—কেন এখানে এসেছে একথা তার মনেই রইল না একেবারে।

ঠিক সেই সময়ে বিপিন শারদাকে লক্ষ্য করে বলছিল, "লক্ষ্মীঠাকুরণ তোমার আঁচলে বাঁধা পড়েছেন দিদি, নইলে তুমি যেই আমাদের ছেড়ে এলে সেই আমাদের হাঁড়ি উঠল শিকেয়, আর যেখানে তুমি এলে সেখানে নিয়ে এলে ঘর ওথলানো জিনিসপত্তর পয়সা কড়ি। তোমার আবার কষ্ট, হুঁ!" শারদার সমস্ত মুখখানা যেন মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে উঠল, হেসে বললে, ঠিক বলেছিস বিপিন। যা'র যোয়ান বেটা মরে তাকেও মুখে ভাত তুলতে হয় বাঁচবার জন্যে! এই পেটটাই দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় রে, আর সব ছোট, সব মিথ্যে হয়ে গেছে এরকাছে। তাই, মনে আমার যাই থাক, পয়সার মুখোসে আমার সব দৈন্য ঢাকা পড়ে গেছে। কেউ আর কিছু বুঝতে পারে না, কিংবা হয়তো সে চেষ্টাও করে না। ভাবে—সবই যখন মিথ্যে, তখন যা চলে গেছে কিংবা ঢাকা আছে তাকে উদ্ধার করতে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, ও ঢাকাই থাক, যে কয়টা দিন থাকে। আমরাও তাই ভাবি, যা চলে গেছে, যাক; যা আসতে চায় আসুক; আর সব চেয়ে সত্য হয়ে, শ্রেষ্ঠ হয়ে থাক, যা এসেছে।"

বিপিন কথাটাকে ঠিক বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল শারদার মুখের দিকে। ওর এ মনের অবস্থা বুঝে শারদা হেসে ফেললে। বললেঃ বুঝতে পারলি নে কথাটা?"

বিপিন জানালে, পেরেছে; কিন্তু সে অতি সামান্য। শারদা বললেঃ "দেখ বিপিন, ছোটবেলায় তোকে ঘুমপাড়াতাম কি বলে জানিস?

নিমগাছে নিমুখোর নানি কলাগাছে কুল্‌কে
ঘুমপাড়ানী গান তারা গায়, যা তোরা যা শুনে্‌ গে।
ঘুমবি তো ঘুমো, নইলে ডেকে হুমো
ধরিয়ে দেব ফের,
যত দুষ্টু ছেলেদের।

ব্যস্‌ আর কিছু বলবার দরকার হ'ত না তুই চোখ বুজে থাকতিস অনেকক্ষণ। তার পর যে কখন আপনাআপনি ঘুমিয়ে পড়তিস তা আমি জানতেও পারতাম না। আজ তাই দেখছি যে বুদ্ধিটা তোর অনেকটা সেই রকমই আছে এখনও।"

বিপিন হেসে উঠলো, "হ্যাঃ, হ্যাঃ, কি যে বল দিদি!"

শারদা উত্তর দিলে না। অদূরে দণ্ডায়মান ঠাকুরকে চিংড়ির কাটলেট তৈরির প্রণালীটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগল। পরে এই দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলে বিপিন বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে?" বিপিন বললে, "তোমার রান্নার ব্যবস্থা শুনছি। আচ্ছা, আমাদের জন্যে আবার এত কেন দিদি! আমরা তো তোমার ঘরের মানুষ।" শারদা বললে, "তোদের জন্যে করতে যাব কেন,—আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" "তবে?" "আজ যে ওঁর জন্মদিন, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে খেতে বলা হয়েছে, এসব তাদের জন্যে।" বিপিনের সমস্ত মুখখানা যেন মুহূর্তের জন্য মলিন হয়ে গেল। চেষ্টা করে উৎফুল্লস্বরে বলে উঠল, "বেশ বেশ তাই বল যে জামাইবাবুর বন্ধুলোকদের জন্যে এত আয়োজন! এ তো খুব ভাল কথা, বেশ কথা!—"

বিপিন আরও কি সব প্রশংসার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শোনবার জন্যে শারদা আর সেখানে দাঁড়াল না, ঘর ছেড়ে দালানে গিয়ে উপস্থিত হল। বিপিন শুনলে সে তীব্রস্বরে কাকে বলছে, "ফুলদানিগুলো কি এখনও পরিষ্কার করা হয়নি? কেন, কি এত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যার জন্যে এসব কাজ ঠিক সময়মত হয়ে ওঠে না?" কে মৃদুস্বরে কি একটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধমক খেলে। শারদা বললে, "চুপ করে থাক, মুখের ওপর উত্তর করবি তো টের পাবি মজা।"

এমন সময়ে একটি মৃদু অথচ মিষ্টি কণ্ঠস্বর বিপিনের কানে এল,—"মামীমা!" সঙ্গে সঙ্গে শারদার কণ্ঠস্বর কড়ি থেকে কোমলে নেমে এলো; "কে সরোজ? ও, এস বাবা এস।" বিপিন উঠে খোলা জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলে, শারদার সঙ্গে কথা বলছে, একটি পাতলা ছিপ্‌ছিপে সুন্দরকান্তি তরুণ। গায়ে তার মটকার পাঞ্জাবি, বাবরি চুল, চোখে চশমা! বিপিনের মনে পড়ল শহরের কলেজে পড়া দু-দশজন এমনি চেহারার ছেলে ছোকরাকে দেখেছে বটে সে। কিন্তু এ এখানে কেমন করে এল, আর শারদাকে মামীমাই বা বললে কেমন করে? শারদার মুখে সেই প্রশান্ত হাসিটুকু ভেসে উঠল। বললে,

"এস বাবা এই ঘরে।" বসবার বড় ঘরটায় প্রবেশ করে এক-খানা গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজে পাশের চেয়ারখানায় বসল। বললে, "তার পরে? এত দিন পরে কি মামীমাকে মনে পড়ল বাবা, তাই একবার দেখে যেতে এলে?" সরোজ হাসলে। উচ্ছ্বসিত হাসি। বললে, "ঠিক তা নয় মামীমা। কিন্তু তুমিও তো কই খোঁজ করনি—এতদিন যে অসুখে পড়েছিলাম সে খবরটাও তো অন্ততঃ একবার নেওয়া উচিত ছিল!

শারদা লজ্জা পেল এ কথায়। বললে, "তাই তো তোমার রোগা চেহারা দেখে সে কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কত রোগা হয়ে গেছ তুমি; আহা!"

কেমন একটু বেদনায় যেন শারদার চোখ দুটো ছল ছলিয়ে উঠল; বললে, "আমার কপাল খারাপ, বুঝলে সরোজ? নিজের লোক যার নিজের নয়, পরের ওপর তার দাবী কিসের? আমি যে কাঙাল, ভিক্ষে চাওয়াই আমার ভাগ্য; আমার তো দাবী করা সাজে না যে তোমাদের সম্বন্ধে দাবী করে কোনও কথা বলবো? তবে তুমি যে আমায় কি মনে করে মামীমা বলে ডাক, আমি যা নই, সেই উঁচু আসনও আমায় অক্লেশে দাও সে কি আর আমি বুঝিনে বাবা? সবই বুঝি। তবুও মানুষের এমনি মন যে দয়া পেলে সে মনে করে এই আমার দাবী। আমিও যে সেই মানুষই, এতে তো ভুল নেই।" শারদার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল। সরোজ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিল কেমন একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে; কথার শেষে মুখের ওপর একটু হাসি টেনে এনে বেদনাকাতর কণ্ঠে বললে, "ভুল বুঝেছো মামীমা। মানুষকে মানুষের শ্রদ্ধা করতে শেখাতে হয় না, সে আপনিই শেখে। আর দাবীর কথা যা বলছ, সে দাবীর সৃষ্টিও মানুষ নিজেই করে নিজের ব্যক্তিত্বে। তবে মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন, মতও তাই আলাদা। তুমি নিজেকে যাই ভাব বা অপরে যাই ভাবুক, আমি তা কোনও দিন ভাবতে পারব না।" একটু থেমে বললে, "আর একটা কথা এই যে, এই সব ভাবনার হাত থেকে চিরদিনই আমি মুক্তি পেতে চাই মামীমা। কি জানি কেন কোনও একটা ভাবনার বোঝা ঘাড়ে চাপবার ভয়ে চিরদিনই আমি অস্থির। ও আমার ভাল লাগে না।"

শারদা হঠাৎ কোনও উত্তর দিল না; হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলে অনুরোধের সুরে বললে, "আজ এখানে থেকে যাও না সরোজ।" "আজ?" একটু ভেবে সরোজ বললে, "বেশ তো! কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে মামীমা, নইলে মা ভাববে!" সহজ স্বরে শারদা বললে, "যেও, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করে।" সে উঠে পড়লো। দরজার পর্দ্দা সরিয়ে বাইরে এসে দেখলে বিপিন সামনে দাঁড়িয়ে। শারদা প্রশ্ন করলে, "কি রে?—" স্মিতমুখে বিপিন উত্তর দিলে, "কিছু নয়, এমনি।" শারদা হাসিল। বললে, "দেখলি বিপিন, কেমন ছেলে! রূপে গুণে যেন ময়ূরছাড়া কার্ত্তিক, এমন একটি ছেলে যদি তোর জামাই হত।" বিপিনের চিন্তাসূত্র এই আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছোট ছোট চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোন্ একটা অজানা আশায় আনন্দে। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হল না, কিন্তু নিঃশব্দ ভাষায় চোখদুটো যেন বলে উঠল, "বামন হয়ে চাঁদে হাত?" ভরসার সুরে শারদা বললে, "অসম্ভব কিছু ভাবিস নে বিপিন, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই, সবই সম্ভব। তবে সেটাকে মানিয়ে নিতে হয় নিজের সঙ্গে। এই মানিয়ে নেওয়াতেই বুদ্ধির পরিচয়।" বিপিন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শারদার দিকে। শারদা বললে, "বেলা বাড়ছে বিপিন, স্নান করিস তো করে ফেলগে যা, কলের জল চলে যাবে এক্ষুণি।" বিপিন বললে, "যাই।"

( ক্রমশ )

---

## নন্দা

( ৮১৩ পৃষ্ঠার পর )

তাহার দিকে ঝুঁকিয়া চলার জন্যই, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল। একটা নিরুপায় ক্রোধ মিশ্রিত লজ্জার সহিত সে মাথা নত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রমীলা প্রতিবাদ করিয়া গেল, কিন্তু প্রবীর আসিয়া মহোৎসাহে মায়ের পক্ষ সমর্থন করিল। ফলে যামিনী আরও জোর পাইলেন। মাতা পুত্রের পাল্লায় পড়িয়া দীননারায়ণের মনে যেটুকু বা আপত্তি ছিল, তাও ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি সুবীরকে আদেশজ্ঞাপক এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

(ক্রমশ)

---

## নিউইয়র্ক

( ৮১৫ পৃষ্ঠার পর )

রাখে। স্প্যানিশ সম্প্রদায় দক্ষিণ আমেরিকাতে আপন প্রতিভা বিস্তার করার পর মিশনারীদের সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। কোনও প্রচেষ্টাই মিশনারীকে সেখানে যেতে দেয়নি। নিজের দেশের মিশনারীর অভাব হওয়ায় ভ্যাটিকানের সাহায্যে ইটালিয়ান মিশনারীদের নিযুক্ত করে দক্ষিণ আমেরিকাতে পাঠাতে থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান দক্ষিণ আমেরিকা আর পূর্ব্বের মত নেই। আজ অর্থনীতি, নব সমাজের সমতা সর্ব্বত্র চর্চা হয়ে থাকে। তাই আজ মিশনারীদের এই দুর্দশা। ইটালীয়ানরাও সেই দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

(ক্রমশ)

# মাদ্রাজে মাদাম মন্তেসরি

(১)

শ্রীপ্রতিমা সেন

মাদাম মন্তেসরি গত নবেম্বর মাসে আদেয়ারে থিওসফিক্যাল স্কুলে শিশুশিক্ষা প্রণালীর যে শিবির স্থাপনা করেছিলেন, তাতে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৩৯ সনের ৮ই নবেম্বর মাদ্রাজ মেলে হাওড়া থেকে মাদ্রাজে এসে দেখি থিওসফিক্যাল সোসাইটির লোক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। ট্যাক্সি করে গেলাম আমরা আদেয়ার নদীর উপকূলে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে। নানান দেশ থেকে সবশুদ্ধ ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রী এসেছেন এই একটি মহিলার কাছে তাঁর আবিষ্কৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার হতে কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে যাবার জন্য। গুজরাটী, পার্শী, মারহাট্টী, মালয়ালী, সিলোনী, বার্মিজ, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, হায়দ্রাবাদী, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী ইত্যাদি কত ভাষাভাষী লোকের মাঝে এসে পড়েছি। ইংরেজী ছিল বলতে গেলে রাষ্ট্রভাষা (medium) নইলে আর ভাষা জোগাত না, ভাবের আদান প্রদানেই কাজ সারতে হ'ত। হরেক রকমের ভাষা হরেক রকমের সাজ Geoffrey Chaucer-এর Canterbury Tales-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এও যেন তীর্থ দর্শনে যেমন কত দেশ থেকে লোক আসে, তেমনি এই ৩৫০ জন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা এসেছেন মাতৃরূপী মাদাম মন্তেসরির কাছ হতে শিশু শিক্ষার অপূর্ব কৌশলটুকু শিখে নিতে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী—আমার মতন অল্প কয়েকজনই ছিলেন যাঁরা এখনও ছাত্রী নাম ঘোচান নি।

ইটালিতে একটি মন্তেসরি স্কুল

১২ই নবেম্বর প্রথম আমরা Head Quarter's Hall-এ মাদাম মন্তেসরির বক্তৃতা শুনতে যাই। সবাই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হেড্‌কোয়ার্টার হলে গেলাম—সবাই চায় সামনে বস্‌তে তাই যে যার আগে বস্‌তে পারলো তারই হ'ল লাভ। সবাই যার যার পরিচিতের সঙ্গে এই আলোচনাই করছিল। ৩৫০ জন লোকের কলকণ্ঠ হঠাৎ সব চুপ। নির্দিষ্ট সময়ে ডাঃ মন্তেসরি, মারিয়ো-মন্তেসরিকে সঙ্গে নিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন। সবাই দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ওখানকার থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ এ্যারাণ্ডেল ও তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা রুক্মিণী দেবী, সেক্রেটারী মিঃ শঙ্করামেনান মন্তেসরি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মিস্ পিন্‌চিন্ প্রভৃতি মাদাম মন্তেসরি ও মারিয়ো মন্তেসরিকে অভিনন্দন জানালেন। মাদাম মন্তেসরির সুমধুর কণ্ঠস্বর সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুনতে লাগলেন। তিনি ইটালীয় ভাষায় বল্‌তে লাগলেন আর মারিয়ো মন্তেসরি সুন্দরভাবে তা আমাদের কাছে ইংরেজীতে অনুবাদ করে বলতে লাগলেন।

কত অন্যায় অত্যাচার করি আমরা এই শিশুদের প্রতি। তাদের নিজত্ব ব্যক্তিত্বের দিকে আমরা তাকাই না, করে তুলতে চাই তাদের আমাদের হাতে গড়া পুতুল, আমাদের অত্যাচারের বেদীমূলে তারা তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের নিজত্বের বলি দিতে বাধ্য হয়, তাই সংগ্রাম বাধে শিশুর সঙ্গে প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে। শিশু শিক্ষার জন্যই আমরা যত কার্পণ্য করি, অথচ আমাদের বিলাসিতা দিন দিনই বেড়ে চল্‌ছে। মানুষের ভবিষ্যৎ এই শিশুরা—এদের যদি না বেড়ে উঠতে সাহায্য করি, আরও চেপে রাখি, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির আশা করা বাতুলতা।

**ডাঃ মন্তেসরির জীবন-পরিচয়**

ডাঃ মন্তেসরিই প্রথম শিশুদের প্রবীণদের হাত হতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন। পিতা Alessauslro Montessori এবং মাতা Renilde Stoppaniর একমাত্র সন্তান তিনি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট রোমনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রোমের বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি সসম্মানে এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি কালা, বোবা, পাগল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের প্রতিষ্ঠানে সহকারী ডাক্তারের কাজ করতে থাকেন। ঐ সময় তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শিশুদের পরীক্ষা করতেন।

তারপর Dr. Guido Bacelli অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য যে Training College প্রতিষ্ঠা করেন, ডাঃ মন্তেসরি তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর চিকিৎসার সুখ্যাতি দেশের সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন এবং State Orthophermic Schoolএ ডিরেক্টারের পদ গ্রহণ করেন।

এইভাবে নানা স্থানে কাজ করে তাঁর এই সকল দুর্বল মস্তিষ্ক শিশুদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ ঘটে। এই সময় তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাবেন নি যে, তাঁর সাধনার গাছ এত শীঘ্রই ফুল ও ফলে সুশোভিত হয়ে তার সৌরভে দেশবিদেশ ভরিয়ে তুলবে। প্রথম দুর্বল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হ'লেন, তাতে পরীক্ষা করে দেখা গেল—এভাবে শিক্ষা দিলে শিশুরা সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অনেক অল্প শ্রমে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষালাভ করতে পারে। তাঁর এই প্রথাটি তিনি সাধারণ শিশুদের উপযোগী করে করার জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হতে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। যতগুলি শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক ছিল, তিনি সবগুলিই যত্নসহকারে পাঠ করেন এবং রোমের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ভাল করে পরিদর্শন করেন। রোমের স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণ সমিতির পরিচালক Eldoardo Talomo ডাঃ মন্তেসরিকে শিশু শিক্ষালয়গুলির সংস্কার সাধনের জন্য

আহ্বান করেন। ডাঃ মন্তেসরিও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত Talomoর সঙ্গে এই কাজে যোগদান করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী রোমের সান্‌লরেন্স গ্রামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতেই ডাঃ মন্তেসরি শিশু শিক্ষার মধ্যে নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করলেন। সকলেই তাঁর এই অপূর্ব শিক্ষাপ্রণালী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শিশুদের পিতামাতাও নিশ্চিন্ত মনে তাঁর হাতে শিশুদের সমর্পণ করলেন। এখানে কেবল তিন হতে চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা হ'ত। এই শিশু নিকেতনটি এক অভিনব ধারায় চল্‌তে থাকে এবং দেশ বিদেশ হতে লোক এর কার্যধারা, গঠনপ্রণালী দেখতে আসে।

অষ্ট্রেলিয়া এবং স্পেনে কিণ্ডার-গার্টেন বিভাগ মন্তেসরি প্রথায় চলে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ডাঃ মন্তেসরি ইংলণ্ডে আসেন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হল্যাণ্ড পরিদর্শন করতে যান, সেখানে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। সরকার হ'তে এই নীতি অনুমোদন করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ মারিয়ো মন্তেসরি কোপেনহেগেন শহরে আন্তর্জাতিক মন্তেসরি সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন সভাপতি ডাঃ মন্তেসরি নিজেই।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মন্তেসরি মিঃ মারিয়ো মন্তেসরির সঙ্গে মাদ্রাজে আসেন, সেখানে ট্রেনিং কলেজ খোলেন এবং মাদ্রাজ শহরে মন্তেসরি সঙ্ঘের একটি শাখা এবং Examination Board খুলে রেখে যাবার বন্দোবস্ত করছেন।

**মন্তেসরি শিক্ষার মূলনীতি**

শিশুই মানব-পিতা এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। শিশুর উন্নতিতেই জাতীয় জীবনের উন্নতি, তা থেকে সমস্ত দেশের উন্নতিসাধন করা যায়। অথচ এই শিশুকে আমরা আমলই দিই না—আমাদের বিলাসিতায় কত টাকা ব্যয় হয় অথচ শিশু-শিক্ষার দিকে কারও দৃষ্টি নেই।

ডাঃ মন্তেসরির নীতির প্রথম উপাদান সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিকে সুবিকশিত করা, শৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে শেখা। তাই শিশুর প্রতিবেশ সুশিক্ষার উপযোগীভাবে গঠন করা কর্তব্য। এই পরিবেষ্টন বলতে গৃহজীবন এবং শিক্ষালয়—উভয়ই মনে করি। সেইজন্যই শিশু শিক্ষালয়গুলিকে শিক্ষালয় না বলে শিশু নিকেতন Casedei Bambini (The Children's homes) বলা হয়। শিশু নিকেতনগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিশুর উপযোগীভাবে গড়ে নেওয়া দরকার, যাতে শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজেরাই সম্পন্ন করতে পারে। প্রথমত শিশুনিকেতনের সমস্ত আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, পুস্তক রাখার আলমারী, হাতমুখ ধোবার জলের বেসিন প্রভৃতি শিশুদের মাপে অর্থাৎ ছোট ছোট হবে। গৃহ পরিষ্কারের, নিজের দেহ পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই এরূপ হবে যাতে শিশুরাই নিজেরা এ সকল কাজ করতে পারে, আর তা হতে সর্ববিষয়ে সুশিক্ষা সম্পন্ন হ'তে পারে।

শিশুরা স্বভাবতই সকল কাজ নিজেরা করতে চায়, কিন্তু আমরা তাদের উপযোগী জিনিষ তাদের দিই না আর ভাবি—শিশু সে কি করে এসব কাজ করবে—আমরা তার হয়ে সব করে দিই। এভাবে শিশুর ক্ষমতা চেপে রেখে তাদের আমাদের হাতে বন্দী করে রাখি। শিশুকে তার উপযোগী জিনিষ দিয়ে দেখা গেছে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের চাইতে কোন অংশে খারাপ ভাবে কাজ করে না। বরং খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি জিনিষ তাদের নজরে পড়ে।

শিশু যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে, বড়রা সেরূপ পারে না। শিশুর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ডাঃ মন্তেসরির এরূপ অনেক অভিজ্ঞতা আছে তারই একটি বলিঃ—

রোমের এক পরিবারে একটী মেয়ে তার নৃত্যশিক্ষকের কাছে 'নাচ' শিখতো। তার আড়াই বছরের ছোট একটী ভাই ছিল, সেও তার দিদির সঙ্গে নাচ শিখবে এই বায়না ধরলো। তাদের বসবার ঘরেই এই শিক্ষা দেওয়া হত। নৃত্যশিক্ষক এত ছোট শিশুকে প্রথম নিতে রাজী হলেন না। অনেক বলার পর তিনি রাজী হলেন, কিন্তু শিশুটি সে ঘরে ঢুকেই কাঁদতে লাগল—অনেক প্রশ্নের পর শিশুটি বললো, 'The Coat is on the Sofa.' সেই শিক্ষক তাঁর কোট ঐ সোফার উপর রেখেছেন,—আলনায় না রেখে এই বিশৃঙ্খলতা তাকে ব্যথিত করে তুলেছিল। কোটটি ঠিক জায়গায় রাখা হলে শিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো এবং সে তার

মাদাম মন্তেসরি

দিদির পশ্চাতে নৃত্য করতে লাগলো। এই বিশৃঙ্খলতা কারও দৃষ্টিতে পড়ে নি, কিন্তু অত ছোট শিশু তা সহ্য করতে পারলো না!

শিশু পারবে না একথা ভুল। ডাঃ মন্তেসরির শিশু-নিকেতনগুলিতে শিশুরাই সব কাজ করে। নিজেরা নিজেদের হাতমুখ ধোয়, নিজেদের চুল আঁচড়ায়, কাপড় জামা পরে, ঘর ঝাঁট দেয়, মোছে, নিজেদের টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে, জানালার সার্সি দরজা সবই তারা তাদের ছোট্ট হাত দিয়ে এবং সেই হাতের অনুপাতে তৈয়ারী জিনিষ দিয়ে পরিষ্কার করে।

শিশু কাজের ভিতর হতেই বিশ্রাম লাভ করে। ছোট শিশুরা কখনই চুপচাপ বসে থাকতে পারে না—সারাদিন তারা কাজে ব্যস্ত থাকে। আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করে না, কাজের আনন্দেই কাজ করে চলে—তাই তো, কাজ করে বড়রা হয় ক্লান্ত, মলিন মুখ, আর শিশুর মুখ হয় উজ্জ্বল, শিশু পায় গভীর তৃপ্তি। মনে হয়, সে যেন বিশ্রাম করে উঠ্‌লো।

শুধু কি এই শিশুনিকেতনের পরিবেশ তার উপযোগী

করা উচিত—সেই শিশুনিকেতনের সঙ্গে থাকবে বাগান,—বাগানে শিশুরা নিজেরাই কাজ করবে, ফুল ফোটাবে, আর তাদের মুখে দেখবো আমরা সেই ফুল ফোটান মধুর হাসি। ছোট্ট ছোট্ট ঝাঁজরি নিয়ে বাগানে জল দেওয়া তাদের অত্যন্ত আনন্দের কাজ।

গৃহের জীবনও যেন তাদের উপযোগী করে করা হয়। থালা, গ্লাস ইত্যাদি তাদের জন্য ছোট্ট ছোট্ট করা হবে। খাট হবে নীচু ছোট যাতে তারা নিজেরাই ইচ্ছামত ঘুম ভাঙলে খাট থেকে নেমে যেতে পারে।

কোন রকম বাঁধাবাঁধি যেন না থাকে—যেন তারা স্বাধীনভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়ে উঠতে পারে। তাই স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা শিশুর বিকাশের আর একটী পথ অর্থাৎ 'Liberation of the Soul of the child।' আমরা নিজেরাই পরাধীনতা সহ্য করতে পারি না, 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করে সত্যাগ্রহ, বিপ্লব সর্বত্র করি—কিন্তু শিশুদের বেলা তো আমাদের একথা মনে থাকে না। শিশুরা এই নিয়ে বিপ্লব করতে পারে না, সত্যাগ্রহ করতে পারে না, এই তাদের অপরাধ, বড়রা তাদের নানাভাবে নির্যাতন করে চলে। হয়ত ঘুম পায়নি, তবু তাকে জোর করে ঠাকুরমা, দিদিমা ভুলিয়ে বা 'জুজুবুড়ির' ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াবেন। একজন বড়কে তার ঘুম না পেলেও যদি জোর করে ঘুম পাড়ান হয়, খিদে না পেলে জোর করে খাওয়ান হয়, তাহলে কি সেটা তিনি সহ্য করেন? তাকে কি আমরা অত্যাচার বলি না? তবে এই শিশুদের বেলা যা করা হয়, তাকে কেন অত্যাচার বলবো না?

স্বাধীনতা দিলেই তা থেকে নিয়মানুবর্তিতা আসে। কারণ স্বাধীনতা অর্থে বোঝায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেবে, তা নাহ'লে তো 'জোর যার মুল্লুক তার' এই অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াবে। স্বাধীনতা মানতে হলে কতগুলি নিয়ম মানতেই হবে। আর শিশুরা সে বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান্। তারা ঠিক নিয়ম মেনে চলতে ভালোবাসে। শিশুদের যদি আমরা প্রয়োজন বিনা সাহায্য করি, তা তাদের কাছে সাহায্য না হয়ে বাধাস্বরূপ হয়। যেমন অনেক সময় মায়েরা খাইয়ে দেন এবং তাঁদের সময়ের সংকীর্ণতার জন্যে তাড়াতাড়ি খেতে বলেন এবং সময় সময় বকুনিও দেন বা বেশী বেশী খাবার একসঙ্গে শিশুর মুখে ঢুকিয়ে দেন—তা তাদের কাছে সাহায্য না হয়ে অত্যাচারে পরিণত হয়।

ডাঃ মন্তেসরির নীতিতে সব কিছুই শিশুর স্বভাব এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। শিশুরা স্বভাবত'ই কাজ ভাল বাসে, একথা আগেই বলেছি—তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যেমন একদিন একজন ভদ্রলোক কোটে বোতাম না লাগিয়ে বেড়াতে আসেন, সে বাসার একটি শিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে গিয়ে সব বোতাম লাগিয়ে দিল, ভদ্রলোকটি ভাবলেন, শিশুটি বেশ কাজের। কিছুক্ষণ পর আবার সে সব বোতাম খুলে দিল, আবার লাগাল, আবার খুললো, এমনিভাবে বার বার খুলতে লাগাতে লাগলো। তখন ভদ্রলোকটি বুঝলেন, শিশুটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে নি, সে কেবল কাজের আনন্দেই কাজ করে চলেছে। অনেক সময় দেখা যায়, ছোট শিশুরা কোন থালা কলের নীচে ধুচ্ছে; তারা আর থামতে চায় না, কেবল ধুয়েই চলে। ইহা হতেই বোঝা যায় যে, তারা সর্বদা একটা কাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। শিশুর আকর্ষণ তার এক এক বয়সে এক একটি জিনিষের প্রতি থাকে—যেমন খুব ছোটবেলা এক বছর হতে দেড় বছর কোন একটা জিনিষ নির্দিষ্ট স্থানে দেখতে ভালোবাসে। তারপর আর একটু বড় হলে ছোটখাট জিনিষের প্রতি তাদের নজর হয়—বড় জিনিষের প্রতি আর তাদের কোন আকর্ষণ থাকে না। তারা জিনিষের খুঁটিনাটি দেখতেই যেন ভালোবাসে।

সেই সমস্ত নীতির মূলেই হচ্ছে আগ্রহ অর্থাৎ (interest)। শিশুর আগ্রহ ডাঃ মন্তেসরির নীতিতে বৈজ্ঞানিক খেলনার ভিতর দিয়েই বজায় রাখা হয়। আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে বই দিয়ে, না বুঝে মুখস্থ করাবার চেষ্টা, মার, বকা, শাস্তি এ সবে পড়াটাকে তেঁতো করে দেওয়া হয়। এই বৈজ্ঞানিক খেলনার ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা পড়াকে আরও আনন্দজনক, আরামদায়ক বলে বোধ হয়। শিশু মনে করে, সে খেলাই করছে। এই খেলনার ভিতর দিয়েই সে 'ক', 'খ', 'গ' 'ঘ'......ইত্যাদি বর্ণমালা, অঙ্ক, জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শিক্ষাই লাভ করে।

তাই প্রত্যেকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আগে বিকসিত করাই কর্তব্য। তাও এই খেলনার সাহায্যে করা হয়—যেমন স্পর্শবোধ উন্মান হয়, স্পর্শবোধক কাষ্ঠ ফলকের দ্বারা,—এরূপে স্পর্শবোধ (Sense of touch), রঙ নির্ণয় (Chromatic sense), শ্রবণ শক্তি (Sense of hearing), স্বাদবোধ (Sense of taste), গন্ধবোধ (Sense of Smell), ওজনের জ্ঞান (Barric sense), তাপবোধ (Thermic sense) প্রভৃতি নির্ণয় করতে শেখান হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সূক্ষ্ম করে নিলে শিক্ষালাভ করতে অনেক সহজ হয়। প্রথমেই সমস্ত জিনিষটার পরিচয় মোটামুটিভাবে দিয়ে আস্তে আস্তে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা দরকার।

মন্তেসরি শিক্ষা নীতিতে প্রত্যেক পাঠ ঠিকভাবে দেওয়া উচিত। এখানে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হচ্ছে পরিচালক বা পরিচালিকা। কোন জিনিষের তাঁরা শিক্ষা দেবেন না, তাঁরা কেবল দেখবেন। তাঁরা শিশুদের ভিতর আগ্রহ জাগিয়ে দেবেন। তাঁরা ভুল কখনও সংশোধন করবেন না। ঐ খেলনাগুলি এমনভাবে তৈয়ারী যে, কয়েকবার নাড়াচাড়া করার পর তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারবে। আমরা ভুল সংশোধন করতে গেলেই শিশুরা তাদের স্বাধীনতায় বাধা পায়, তাতেই তাদের ইচ্ছাশক্তি মরে যায়। শিশুরা এক কাজ একাধিকবার, এমন-কি দেখা যায় ৪০।৫০ বারও করে—এই বারে বারে করার ফলেই তারা পারদর্শী হয়।

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কোন হুকুম করবেন না; পরিবেশ থেকেই তারা আজ্ঞা পাবে। সব জিনিষই Concrete বা Abstract—এইভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন প্রথমে একটা সত্যির গাছ দেখিয়ে বলা হল এটা গাছ, তারপর তার 'মডেল' দেখিয়ে, তারপর ছবি দেখিয়ে, শেষে লিখে। এভাবে শিশুর ধারণাকে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। মন্তেসরির নীতির মূলেই হচ্ছে—প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া। তা যদি আমরা পারি—ইচ্ছা, কাজের উৎসাহ, আগ্রহ সব আপনা হতেই এসে যাবে। ডাঃ মন্তেসরি বলেছেন,—'Putting the motor in the automobile is the aim of the Montessori method।' এইভাবে কাজ করে গেলে একদিন এই ভারতের বুকেই স্বর্গরাজ্য দেখতে পাব। তাই ডাঃ মন্তেসরি বলেছেন,—I will follow you, to enter with you into the kingdom of Heaven which will be founded by the child।

# ইসন্তের পত্র

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি

সে যা হোক, তারপর সাহা মহাশয় দোষারোপের সুরে বলেছেন—"সেইজন্যে যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে।"

কিন্তু ঐটেই হিন্দুদের পক্ষে সবার চাইতে গৌরবের কথা যে, তারা যারা মাথা খাটায় তাদের খুব বড় স্থান দিয়েছিল। কারণ এই সত্যটা তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, মানুষের যা কিছু গতি উন্নতি তার অন্তর্লোকের জ্ঞান বহির্জগতের ঐশ্বর্য সবার পিছনে আছে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সেটি হচ্ছে চিন্তা অর্থাৎ মাথা। এই মাথাকে বাতিল ক'রে দিতে যদি সত্যি সত্যি কেউ কৃতকার্য হয়, তবে দেখবে যে মানবজাতি আবার ধীরে ধীরে মিসিং লিংকে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এমন যে মাথা—চিন্তারাশির উদ্ভবক্ষেত্র মাথা, কল্পনা রাজ্যের উর্বর ক্ষেত্র মাথা, সরস স্বপ্নের রহস্যকুঞ্জ মাথা—এই মাথাকে সমাজে যারা বড় স্থান দিয়েছে তাদের নিন্দা বা কুৎসা বাক্য রয়াল সোসাইটির সভ্যের কাছ থেকেও সত্য হয়ে উঠবে না। কারণ তাঁর হিসেবে বিলকুল গরমিল। মেঘনাদবাবু যে আজ দেশবাসীর কাছ থেকে সম্মান ও সমাদর লাভ করছেন, শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন, তা তাঁর ঐ মাথা খাটাবার জন্যে।

"অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করা"র কথা বৈজ্ঞানিক মহাশয় বলেছেন। সম্ভবত শান্তিনিকেতন বলেই সাহা মহাশয় "অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করা"র সঙ্গে বিলাসীকাব্য রচনায় জীবন ভ্রষ্ট করার কথাটা জুড়ে দেবার মতো যথেষ্ট নৈতিক সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। সে যা হোক, সাহা মহাশয় বিজ্ঞানসৃষ্ট air-conditioned বাসগৃহ দেখে এমনই আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছেন যে মানুষের জীবনে কোন্ বস্তুর মূল্য কি তা ঠিক করতে পারেন নি। সে সব গভীর তত্ত্বকথার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। শুধু সাহা মহাশয় যে কথাটা সহজেই স্বীকার করবেন, এখানে শুধু সেই কথাটাই বলি। কথাটা হচ্ছে এই যে, মানুষের মনের মধ্যে একটা দারুণ তাগিদ আছে—জ্ঞানার্জনের তাগিদ। এই তাগিদের জোরে সে দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে আকাশে ধূমকেতু খোঁজে, আবার অন্তরলোকে দৃষ্টি নামিয়ে হিরণ্ময় লোকের সন্ধান করে। এ সবকে যদি সময় নষ্ট করা বলেই সাহা মহাশয়ের মনে হয়, তবুও এই সময় নষ্ট করার স্বাধীনতাও মানুষের মনকে দিতে হবে। কেননা মানুষের মনের এই স্বাধীনতার উপরই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতার বৃহৎ বনিয়াদ্। যদি কোন একটা বিশেষ যুগে একটা মানুষ বা একদল মানুষ সর্বকালের জন্যে ঠিক করে রেখে যেত, কোন্ কর্ম সময়ের সদ্ব্যবহার আর কোন্ কর্ম সময়ের অপব্যয়, তবে মানুষের মনের স্বাধীনতাকেই চিরকালের তরে জখম করে রাখা হত। মানুষের মনের স্বাধীনতাকে জখম করার অর্থ সমস্ত মানুষটাকেই পঙ্গু করা। এই পঙ্গু মানুষের পৃথিবীতে সম্ভবত air-conditioned বাসগৃহও কোনকালেই গড়ে উঠত না, যা সাহা মহাশয়ের এমন করে মন হরণ করেছে। সুতরাং মানুষকে ঐ সময় নষ্ট করার স্বাধীনতাও দিতে হবে। এই স্বাধীনতাই হচ্ছে মানব-সভ্যতার কামধেনু।

(২)

সে যা হোক্, অনিলবরণ বিংশ শতাব্দীর চৈতন্যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের নাম না দিন শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয় চৈত্র ১৩৪৬-এর "ভারতবর্ষে" তা দিয়েছেন। কেবল চৈতন্যে বিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের নামই কেবল নয় মোহিনীবাবু মেঘনাদবাবুর আরও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। মোহিনীবাবুর এই সব উত্তরে মেঘনাদবাবুর অন্তরাত্মা অর্থাৎ তাঁর রেডিও-ম্যাগ্নেটিক্ অ্যাক্টিভিটি কতকটা কাবু হয়ে পড়েছে বলে আন্দাজ হয়। কেননা মোহিনীবাবুর ঐ সব উত্তরে বৈজ্ঞানিক মহাশয় যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তা হচ্ছে এই—

"উক্ত সমালোচকের (মোহিনীবাবুর) সমালোচনার উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবিকই নিদ্রিত তাহাকে জাগান সহজ ব্যাপার। কিন্তু যে লোক ঘুমাইবার ভান করিয়া বাস্তবিক পক্ষে জাগ্রত আছে তাহাকে ঠেলিয়া তোলার চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। সমালোচক সেই শ্রেণীর লোক। তিনি আমার প্রবন্ধের যে সমস্ত তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহার উত্তর আমার প্রবন্ধেই দেওয়া আছে, একটু ধৈর্য সহকারে পাঠ করিলেই উহা পাইবেন।"

কিন্তু মোহিনীবাবু যে সব কথা বলেছেন তার অনেক কথারই উত্তর সাহা মহাশয়ের পূর্বের প্রবন্ধ শুধু একটু কেন বহু বহু ধৈর্য সহকারে পাঠ করলেও পাওয়া যায় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে এইটি—সাহা মহাশয় বিজ্ঞানের বকযন্ত্রের নানা কসরতের সঙ্গে মানব মনের নৈতিকতা যুক্ত করে মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি,মঙ্গলকে কায়েমী করতে চান। মোহিনীবাবু এ সম্পর্কে বলছেন,—"ডক্টর সাহা এরূপ কোন চৈতন্য স্বীকার করেন না। তিনি যে নৈতিকতার কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেছে মন বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারিত কয়েকটি নীতি বা আদর্শ পালন। শুধু ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন ধর্ম্মই জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং আজ পর্যান্ত কোন সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে নাই। নৈতিকতা যখন ধর্ম্মের সহায় হয় এবং ধর্ম্মের দ্বারা সমর্থিত হয় তখনই তাহার দ্বারা সমাজের উপকার হয়। ধর্ম্মের মূলকথা হইল সাধারণ চৈতন্য অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর একটা চৈতন্য স্বীকার করা—তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক—এবং সেই চৈতন্য স্থূলে দৃষ্টান্ত বা প্রতীক বা প্রতিভূ স্বরূপে কোন দেবতা, অবতার বা নবীর পূজা করা। বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ ভগবানের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। * * * এই শরণাগতিই সকল ধর্ম্মের মূলকথা। ডক্টর মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবিত নৈতিকতার মধ্যে তাহা নাই—অতএব শুধু তাহার দ্বারা মানবের কোন উচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। ভগবদ্-বিশ্বাস এবং সাধনা ব্যতীত মেঘনাদবাবুর প্রস্তাবিত মৈত্রী, প্রীতি ও নৈতিকতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা জীবনে হইতে পারে না।"

বলা বাহুল্য মোহিনীবাবুর এই সব কথার উত্তর মেঘনাদবাবুর পুরানো প্রবন্ধের পুরাতন কথা ধৈর্য সহকারে পুনর্বার পাঠ করলেই যে কি করে পাওয়া যাবে তা বহু ধৈর্য সহকারে গবেষণা করেও মালুম করতে পারা যাবে না। তাই বলছিলাম যে মোহিনীবাবুর উত্তরে সম্ভবত সাহা মহাশয় নিজেকে কিঞ্চিৎ কাবু বোধ করেছেন বলে আন্দাজ হয়।

কিন্তু সে যা হোক্, বলছিলাম যে অনিলবরণ বিংশ শতাব্দীর চৈতন্য বিশ্বাসী ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের নাম না দিলেও মোহিনীবাবু তা দিয়েছেন। এ'দের নাম শুনে সাহা মহাশয় যেন স্মিতহাস্যে বলেছেন—ও, এ'রা? এ'দের বিলক্ষণ চিনি। এবং আমাদের বিশেষ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ'দের কারো কারো সঙ্গে সাহা মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিন্তু একথা আমরা জানি যে Familiarity breeds contempt। সম্ভবত সেই জন্যে সাহা মহাশয় এ'দের এক এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সাহা মহাশয় লিখেছেন,—"অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে Sir Arthur Eddington কোয়েকার (Quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত এবং খৃষ্টের বাণীতে প্রকৃত বিশ্বাসী। বিগত যুদ্ধে তিনি Conscientious objector ছিলেন বলিয়া প্রায় • জেলে যাইতে বসিয়াছিলেন—"

তুমি আবার প্রশ্ন করে বসতে পার, Conscientious objector ছিলেন বা সে জন্যে প্রায় জেলে যেতে বসেছিলেন এর সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কি সম্বন্ধ? কিন্তু সাহা মহাশয় ওর দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিতে এই কথা বলতে চান—এডিংটন লোকটার conscience আছে হে—সুতরাং লোকটি বড় সুবিধার নয়—কাজেই ওর বিশ্বাস আশ্বাস প্রশ্বাস সব কিছু দু এক মাষা লবণ সহযোগে গ্রহণ করো।

সে যা হোক্, এডিংটন সম্বন্ধে সাহা মহাশয় শেষাশেষি লিখেছেন—"তাঁহার (এডিংটনের) Idea of Universal Mind Logos তাঁহার কোয়েকার হৃদয়ের বিশ্বাসের কথা, বৈজ্ঞানিকের যুক্তি উহাতে অল্পই আছে।"

বাক্যটির অর্থ বোঝা গেল, কিন্তু এডিংটন যে কোয়েকার ছিলেন এ সংবাদটি প্রদানের তাৎপর্য কি? এডিংটনের ওটা বিশ্বাস মাত্র, ওতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশেষ কিছু নেই এইকথা বললেই কি যথেষ্ট হত না? কিন্তু চার কি পাঁচ লাইনে সাহা মহাশয় দু-দুবার উল্লেখ করেছেন যে এডিংটন কোয়েকার। ওর তাৎপর্য কি এই যে, সাহা মহাশয় বলতে চান এই কথা যে এডিংটন কোয়েকার বলেই তাঁর এই রকম গাঁজাখুরি বিশ্বাস হওয়া সম্ভব হয়েছিল। তা যদি হয় তবে ওটা প্রায় জাত তুলে গালাগালির পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কোন জাত বিশেষের একটা বিশেষ সামর্থ্য বা সবিশেষ অসামর্থ্য আছে এ তত্ত্ব আজ নাৎসী জার্মানিতে খুব চলে জানি—ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলীতেও ঐ তত্ত্বের প্রসার অবিসংবাদিত, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডক্টর সাহার কাছ থেকেও ঐ রকমের ইঙ্গিত শুনতে হবে সেটা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কিংবা ও কথার তাৎপর্য কি এই যে সাহা মহাশয় বলতে চান কোয়েকার না হলে এডিংটনের ঐ বিশ্বাসের কিছু একটু তা যত কমই হোক্ না কেন মূল্য দিলেও দেওয়া যেতে পারত। তাই যদি হয় তবে এমন বৈজ্ঞানিকের নাম করা যায় যিনি কোয়েকার নন অথচ যিনি ঐ চৈতন্যে বা আত্মায় বিশ্বাসবান। যেমন স্যার অলিভার লজ। কিন্তু অলিভার লজকে সাহা মহাশয় উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলে যে তিনি spiritualist, সাহা মহাশয়ের ভাষায় "ভুতুড়ে।"

কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিকের নাম করাও কঠিন নয় যিনি কোয়েকারও নন "ভুতুড়ে"ও নন অথচ ঐ চৈতন্যে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে বিশেষ যে কোন লাভ হবে তা মনে হয় না। কেন না সাহা মহাশয় হয়তো তাঁরও অন্য একটি চারিত্রিক খুঁত বের করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সাহা মহাশয়ের সঙ্গে এডিংটনের মতের কোন অমিল হয় নি ততক্ষণ এডিংটনের কোয়েকারত্ব তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটায় নি। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে সাহা মহাশয়ের বিশ্বাসের সঙ্গে এডিংটন সাহেবের বিশ্বাসের অমিল দাঁড়াল সেই মুহূর্ত থেকে এডিংটনের কোয়েকারত্ব—সাহা মহাশয়ের মতে—হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে একটা বিরাট বিঘ্ন। সে যা হোক্, শেষাশেষি এই ব্যাপারে সাহা মহাশয়ের যুক্তিটা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই—সাহা মহাশয় বলছেন,—

এডিংটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস—চৈতন্য আছে।
আমার বিশ্বাস—চৈতন্য নাই।
কিন্তু এডিংটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কেউ কোয়েকার কেউ "ভুতুড়ে", সুতরাং তাঁদের ঐ বিশ্বাস যে চৈতন্য আছে তা স্রেফ্ ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু আমি মেঘনাদ সাহা আমি কোয়েকারও নই "ভুতুড়ে"ও নই, সুতরাং আমার ঐ যে বিশ্বাস চৈতন্য নাই সেটা একেবারে অকাট্য সত্য।

সাহা মহাশয়ের ঐ ধরণের যুক্তিই যদি বিজ্ঞানে সত্য নির্ধারণের পদ্ধতি হ'ত, তবে বহু পূর্বেই বিজ্ঞানকে গণেশ উলটে লাল বাতি জ্বালতে হ'ত।

দু'পক্ষেই যদি কেবলমাত্র বিশ্বাসের কথাই হয় (একদিকে আস্তিকতায় বিশ্বাস অন্যদিকে নাস্তিকতায় বিশ্বাস) তবে একপক্ষ যে কেন নাসিকা আকাশে তুলে superior air গ্রহণ করবে তা বোঝা মুস্কিল।

বিজ্ঞানের রাজ্যে কোন কোন সত্য যে আগে বিশ্বাসের রূপে অর্থাৎ আইডিয়ার বেশে বৈজ্ঞানিকের মনে উদিত হয়েছিল, সে কথাটা আর এখানে তুললাম না। একেই বলে intuitive knowledge। কিন্তু এই intuition দ্রব্যটিকে কোন ল্যাবরেটারিতে বকযন্ত্রে পুরে স্পিরিট ল্যাম্পে জ্বাল দেওয়া গিয়েছিল কি না, তা আমার জানা নেই—সুতরাং এক্ষেত্রে সাহা মহাশয়ের চোখের সামনে কথাটাকে উত্থাপন করা গেল না।

তারপর শ্রীঅরবিন্দের এই যে কথা "Faith is the soul's witness to something not ye realised" একথাটাও এখানে তোমাকে বলতে সাহস করলাম না। কেননা ঐ দশটি শব্দের বাক্যের দু'দুটি শব্দেরই—একটি faith আর একটি soul—সত্যতা সম্বন্ধে কোন সার্টিফিকেট সাহা মহাশয়ের বকযন্ত্র আজ পর্যন্ত দেয় নি।

ভাল কথা, এইখানে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট ক'রে রাখি। উপরে বরাবর চৈতন্যে বিশ্বাসী ও চৈতন্যে অবিশ্বাসীর কথা বলেছি বটে, কিন্তু ওর অর্থ এ নয় যে, একদল চৈতন্য আছে বলে বিশ্বাস করে এবং অন্যদল চৈতন্য নেই বলে মনে করে। আসল তর্কটা হচ্ছে এই যে, চৈতন্য ব'লে সৃষ্টির মধ্যে আলাদা স্বতন্ত্র আপন সত্তাতেই অধিষ্ঠিত কোন সজীব সক্রিয় ইচ্ছাময় বস্তু আছে, না, ওটা বস্তু-বিশ্বের একটা নতুন রঙ্গবিশেষ। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন ও একটি স্বতন্ত্র সত্তা আর বেশীরভাগ বৈজ্ঞানিক আজ বিশ্বাস করেন, ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রনরাই কোন রকমে হাসতে হাসতে বা নাচতে নাচতে বা কাঁদতে কাঁদতে চৈতন্যরূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞান এটা এ পর্যন্ত প্রমাণই করতে পারে নি। এডিংটন বলছেন—

"How can this collection of ordinary atoms be a thinking machine? But what knowledge have we of the nature of atoms renders it all incongruous that they should constitute a thinking object."

আবার—

"Just where the final leap into the consciousness occurs is not clear. We do not know the last stage of the message in the physical world before it becomes a sensation in consciousness."

বিনয়াবনত হৃদয়ে নম্রতা-বঙ্কিম চিত্তে আশা করা যাক যে, ঐ ইংরেজী বাক্যগুলির মধ্যে mystic এমন কিছু নেই যে, সাহা মহাশয় ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না সাহা মহাশয় তাঁর ল্যাবরেটারিতে বকযন্ত্র ও স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বা অন্য কোন যন্ত্রের মহীয়ান শক্তিতে প্রমাণ করতে পারছেন যে, বস্তু-বিশ্বে

জাজ্ ব্যাণ্ড বাজিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন ও নিউট্রন ইত্যাদিরা বল্‌ড্যান্স সুরু ক'রে দিলেই তাদের পায়ের দাপাদাপিতেই চৈতন্যের জন্ম হয়, ততদিন বিপক্ষ দলের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে "ওহে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ মনুষ্যবৃন্দ" এই সম্বোধন তাঁর না করাই উচিত। অন্তত সেইটেই হবে আসল বৈজ্ঞানিকের মনোভাব। কিন্তু সাহা মহাশয়ের ধরনধারণ কথাবার্তা দেখলে ও শুনলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগের ইউরোপের কোন ক্রীশ্চান পুরোহিত এ-যুগে বাঙলায় বৈজ্ঞানিকরূপে জন্ম নিয়েছেন। ইউরোপে মধ্যযুগে যখন নব বিজ্ঞানের জন্ম হ'ল, তখন এই পুরোহিত বলেছেন—যা আমার বাইবেলে নেই, তা মিথ্যা। আজ বাঙলাদেশের এই বৈজ্ঞানিক বলছেন—যা আমার ল্যাবরেটারিতে ধরা পড়ছে না, তা মিথ্যা। সেদিনকার ইউরোপের ক্রীশ্চান পুরোহিতরা ছিলেন তাঁদের বাইবেলের বাইরে অন্ধ—আজকার এই বাঙলার বৈজ্ঞানিকটি হ'য়ে আছেন তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে অন্ধ। সেদিনের ক্রীশ্চান পুরোহিতের হাতে ছিল অসীম ক্ষমতা। তাই তাঁরা কোন কোন বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে মেরেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজকার এই বৈজ্ঞানিকদের হাতে তেমন কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং আজ "God-drunk" অনিলবরণরা Science-blind সাহাদের কাছ থেকে নিরাপদ। নইলে অনিলবরণদের ললাট-লিপি যে কি হ'ত তা কে জানে!

সে যা হোক, এই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে সর্বশেষে একটা কথা বলি তোমাকে। পারো তো এই কথাটি কাগজে লিখে মাদুলি করে হৃদয়ের উপর ধারণ ক'রো—মনের মুক্তির কিছু সহায়তা হ'তে পারবে। কথাটা হচ্ছে এই যে, আজকার এই বিজ্ঞানের মধ্যে একটা মহাহাস্যকর ব্যাপার আছে। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকরা এমনি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ যে, সেটা তাঁদের চোখে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। সকল সভ্য সমাজের দণ্ডনীতিতেই এই একটা নিয়ম আছে যে, দোষী যে, সে নিজেই নিজের বিচারক হতে পারে না। চোর যদি নিজের চুরির বিচার করতে ব'সে যায় তবে সেটা হাস্যকর ব্যাপারই হ'য়ে দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকরা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সত্য খুঁজতে বেরিয়েছেন এবং সেই সত্য সত্য কিনা, তা মাপবার জন্য নিজেরাই একটা মাপকাঠি, একটা পদ্ধতি নির্ধারণ করে খাড়া করেছেন আর সবার সামনে তাই আস্ফালন করছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডটা ভগবান নামে কোন রসিক ভদ্রলোকেরই সৃষ্টি হোক্ বা আপনা আপনিই গড়ে উঠুক, একথা সুনিশ্চিত যে, এটা বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করেন নি। এখন, যে জিনিস তাঁরা তৈরী করেন নি, যার সমগ্র জ্ঞান এখনও তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে আসে নি, তাই মাপবার জন্যে একটা পদ্ধতি খাড়া করে বলা যে, আমাদের এই পদ্ধতির মধ্যে যা প্রবেশ না করবে, তার অস্তিত্ব নেই এটা যে কতদূর হাস্যকর ব্যাপার, অস্বাভাবিক গম্ভীর না হলে তা মন এড়িয়ে যায় না।

উপরে যা বলা গেল, তা যদি ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারেন, তবে চাই কি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রয়াল সোসাইটির সভ্য শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের ঠোঁটের রেখাতেও একটা বিনয়াভাস জেগে উঠে কায়েমী হ'য়ে গেলেও যেতে পারে।

( ক্রমশ )

---

# অভিসার

**শ্রীকৃষ্ণ সরকার**

শ্রীরাধা তোমার চঞ্চল পদ পাতে,
অভিসার পথে, শুনি বাজে মঞ্জীর।
নিশ্বাস রুধি চেয়ে আছি অপলক
পাছে টুটে তব প্রগাঢ় তন্ময়তা।

জানি, তব আঁখি, জানি, তব হিয়া আজ
দেখে না, শোনে না, মানে না বারণ কিছু।
অঞ্চল তলে জ্বলিছে একটি দীপ।
শুধু অভিসার, অভিসার আর প্রেম।

প্রিয়া আছে মোর বক্ষে বেপথুমান।
আমিও আজিকে চলিয়াছি তব সাথে।
জানি না কোথায় কালো কালিন্দী নাচে;
কোথায় যমুনা বাঁশী রবে উচ্ছল।

চলেছি চলেছি—অভিসার পথ বাহি—
চিরবিরহের বেদনা গোপন রাখি।
যুগ যুগান্ত চলেছে শ্রীরাধা কাঁদি,
কার সন্ধানে মোরা চলি তার সাথে!

যে প্রিয়া রয়েছে বক্ষে বিলীয়মান,
তারে কি জানি না, তারে কি চিনি না আজও!
তাহারে কি খুঁজি দূরে আকাশের কোলে।
প্রিয় সাথে বাকী আরও কত পরিচয়।

হে অভিসারিকা, শুভ হোক তব পথ।
রূপ হতে রূপে, পথ হতে পথে যাক।
নব অনুরাগে হোক পরিণতি নব
অভিসার পথ দীর্ঘ সুদূরে অতি।

# শ্যামারূপার গড় গোপরাষ্ট্র

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেদিন তাঁহার স্বজাতিকে পাষাণের কোলে পাষাণেরই মত কাঠিন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সেদিন তিনি দেশের বিগত ইতিহাস ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধা বিগলিত কণ্ঠে নিবেদন করিয়াছিলেন ঃ—

কথা কও, কথা কও;
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?

কিন্তু অতীত অনাদি শাশ্বত পুরুষ যাঁহাদের কণ্ঠ দিয়া কথা কহিবেন, তাঁহারা মূক মৌনভাবে কাল কাটাইয়াছেন বলিয়া আমাদের দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজের, ইতিহাসের অনেক কীর্ত্তিকথা অকথিতই রহিয়া গিয়াছে।

ইতিহাস আমাদের কাছে এক বিগত বস্তু, উহা কঙ্কাল, উহা পরিসমাপ্ত ঘটনা পারম্পর্য্য মাত্র। তাই ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, ইতিহাস রচনায় আমাদের উৎসাহ উদ্দীপিত হয় না। ইতিহাস কিন্তু মৃতের কঙ্কাল মাত্র নহে, জাতীয় জীবনের চলন্ত ও বহন্ত দিনে উহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। ইতিহাস স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপক, মহিমা গরিমার স্মারক, বীর্য্যবিভূতির প্রেরণাদায়ক। রাণা প্রতাপ বা গুরু-গোবিন্দের জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া আমাদের কেবল কৌতূহল নিবৃত্তিই হয় না, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা অর্জ্জনে ও সংরক্ষণে আত্মোৎসর্গ করিবার বাসনাও উদ্দীপিত হয়।

বাঙলার এক মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দিনে কবি খেদ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

রেখেছো বাঙালী করে
মানুষ করনি!

বাঙালী কিন্তু একদিন মানুষ ছিল। শুধু ধর্ম্মে ও সভ্যতায় তাহার সেই মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম অভিব্যঞ্জিত হয় নাই, কাঠিন্য ধর্ম্মেও প্রাচীন বাঙলার অভ্যুদয় অপরিসীম হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার "জর্জ্জিকস" কাব্যে লিখিয়াছিলেন ঃ—

On the doors I represent in gold and ivory the battle of the Ganga-radie, and the arms of our victorious Quriuius.

গঙ্গারাঢ় ও গঙ্গারাঢ়ী বলিতে কোন্ স্থান এবং কাহাদিগকে বুঝায়, তাহা বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বস্তু নহে, তবে গঙ্গারাঢ়ী বলিয়া যাহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা এই রাঢ় বঙ্গেরই যোদ্ধপুরুষ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাঢ় দেশে আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তাহাকে গোপরাষ্ট্র বলিতে পারা যায়। রাঢ় দেশের যে অংশকে গোপভূমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহাকেই গোপরাষ্ট্র বলা হইত। দামোদরের উত্তর তীরবর্ত্তী গৌরাঙ্গপুরের অরণ্য—যেখানে রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, সেই স্থান হইতে অমরার গড় পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগকে গোপভূমি বলা হইত। ইছাই ঘোষ এই গোপভূমির স্বাধীন নরপতি ছিলেন।

ইছাই ঘোষের যেখানে রাজধানী ছিল, তাহার নাম শ্যামারূপার গড়। কালের করালকবলে পতিত হইয়া শ্যামারূপার গড় আজ ধ্বংসস্তূপে পতিত হইয়াছে। এখন সেই ধ্বংসস্তূপই অতীত কীর্ত্তির পরিচয় ঘোষণা করিতেছে। উহার অন্যতম নাম সেন পাহাড়ী।

রাঢ়েশ্বর শিবমন্দিরের উত্তরে এবং অজয় নদের দক্ষিণ তীরে এই গড়ের অবস্থান ভূমি ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ রাজা লাউসেন ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার পর ইহার নাম হইয়াছিল—সেন পাহাড়ী। লাউসেন শ্যামারূপার গড় অধিকারের বিজয়-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে দেউল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও লোকে তাহাকে ইছাই ঘোষের দেউল বলিয়া থাকে। ঐ দেউল শক্তিপূজক ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক লাউসেনেরই প্রতিষ্ঠিত।

ইছাই ঘোষের সম্পূজিতা দেবী—শ্যামারূপা আজও গড়ের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গড়ের শীর্ষদেশে শ্যামারূপার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হইলে দেবীকে গড়ের উত্তরাংশে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

শ্যামারূপার গড়ের আর একটি নাম ছিল—ঢেকুর। এই ঢেকুর নামটি প্রধানত "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা দ্বিজ মাণিক্য গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন ঃ—

ঢেকুরের যোগ্য রাজা যেন যুধিষ্ঠির।

ইছাই ঘোষ যে গোপজাতিসম্ভূত ছিলেন, লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের উক্তি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্ব্বে কালু ডোম ইছাইকে বলিতেছেন ঃ—

বলে বেটা ঠেটা ঠোটকাটা বর্ব্বর নিগূঢ়।
গোয়ালা জেতের ধর্ম্ম হয় বড় হুড়॥

এই গোপজাতি মধ্য ও পশ্চিম রাঢ়ে বহু দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কেবল শ্যামারূপার গড় নহে, অমরার গড় প্রভৃতি নগর ও নগর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গোপ রাষ্ট্রের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছে। দশম শতাব্দীতে লাউসেন কর্ত্তৃক শ্যামারূপার গড় অধিকৃত হইবার পরও অমরার গড়ে আর একটা স্বাধীন গোপরাষ্ট্র বর্ত্তমান ছিল। এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন—মহারাজা মহেন্দ্র।

শ্যামারূপার গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষ কিরূপ শক্তিশালী ছিলেন, তাহা 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের বিবরণ হইতে অবগত হইতে পারা যায় ঃ—

লয়ে অস্ত্রজাল সহস্র গুয়াল
সাজিয়া চলিল বেগে।
হাঁকিছে মার্ম্মার যেন অবিসার
প্রলয় পবন মেঘে॥
যুকার নিশান সারিল কামান
হাতির উপরে ডঙ্কা।
ইছা ঘোষ যেন হইল রাবণ
ঢেকুর হইল লঙ্কা॥

এই ঢেকুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে যে সকল গোপজাতি বাস করিত, তাহারা সকলেই যুদ্ধকুশলী ছিল। কৃষি ও গোপালন ব্যতীত যাহারা যুদ্ধকার্য্যকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়া শ্যামা-রূপা বা অমরার গড়ের অভ্যন্তরে বাস করিত, তাহারা গোড়ো-গোয়ালারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আজও গোড়ো-গোয়ালা বলিতে এক শক্তিশালী গোপজাতিকে বুঝাইয়া থাকে। গোড়ো-গোয়ালারা রণদুর্ম্মদ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। পশ্চিম রাঢ়ে যখন বর্গীর উপদ্রব তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই গোপ-জাতি অপূর্ব্ব বিক্রমবলে অত্যাচারী বর্গীকে তাড়াইয়া দিয়া মধ্য ও পশ্চিম রাঢ়কে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন।

এই গোপজাতি ও গোপরাষ্ট্রের কথা বর্ত্তমানে জনপ্রবাদের কোঠায় পড়িয়াছে। শ্যামারূপার গড় এখন অতীত কীর্ত্তির কঙ্কালমালা মাত্র। ইছাই ঘোষের প্রাসাদ, দুর্গ, দেবমন্দির প্রভৃতির অবশেষ চিহ্ন এখনও সমগ্র সেন পাহাড়ীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সকল ধ্বংসস্তূপ এত অধিক যে, শ্যামারূপার গড়কে একটি পাহাড়ের মত উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে। তবে গড়ের সিংহদ্বার, মন্দির ভিত্তি এখনও কিছু কিছু বর্ত্তাইয়া আছে। আর আছেন—দেবী শ্যামারূপা! এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেবী-মূর্ত্তি প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলার এক অপূর্ব্ব অবদান।

শ্যামারূপা গড়ের এক মাইল উত্তরে অজয় নদের তীরে প্রাচীন বঙ্গের আর এক কীর্ত্তি বিদ্যমান, উহা ইছাই ঘোষের দেউল। এই সমুচ্চ দেউল কালের ধ্বংসশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আজও অক্ষতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

## ফড়িংয়ের দোকান

মানুষ সামান্য ব্যবসায় নেমে পরে বড়লোক হয়। একেবারে ধনী হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম লোকের কপালে জোটে। খই, মুড়ী বিক্রী করেও যে লোকে ধনী হতে পেরেছে এ ঘটনা আমাদের কাছে নতুন নয়। হলি উডের জনৈক ব্যবসায়ীর কথা বলছিলাম। তাঁর ভাগ্যের কথা শুনলে তুচ্ছ ব্যবসায়ীদের ঘৃণা করতে আর আমাদের মন সরবে না। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম মিঃ ক্লিফ জনস্। তাঁর ব্যবসা ছিল মাছ ধরবার চারের জন্যে ফড়িং জোগাড় করে বিক্রী করা। জনসের বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখত তাঁর এই বিদঘুটে ব্যবসায় নামার জন্য। জনস্ কিন্তু বন্ধুদের বিদ্রূপে কোন দিন হতাশ হয়ে পড়ে নি। সত্যি সত্যিই এক-দিন জনসের কপাল ফিরলো। এক ফিল্ম কোম্পানি কোন ছবি তুলতে গিয়ে ফড়িংয়ের দৃশ্য তুলবার জন্যে জনসকে ৭,০০০,০০০ জীবিত ফড়িং পাঠাতে লিখলে। জনস্ দু'দিনের মধ্যেই পঁয়ত্রিশ ব্যারেল ফড়িং যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন। এতগুলি ফড়িং যোগাড় করতে কিন্তু জনসকে মোটেই অসুবিধায় পড়তে হয় নি। প্রকাশ, ছবি তোলা শেষ হলে ফড়িংগুলিকে মেরে ফেলা হয়েছিল। এতগুলি ফড়িং যাদের সমাবেশে দর্শকেরা বিস্মিত হয়েছিল, তাদের যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হবে তা বোধ হয় কেউ ভাবতেও পারেন নি!

যুদ্ধের ছবি তোলবার জন্য পায়রার বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে তোলা ছবি সাধারণ ছবির মতই স্পষ্ট হয়।

## রোগের জীবাণু থেকে আত্মরক্ষা

মানুষের শরীরে নানা রোগের জীবাণু নানা দিক থেকে প্রবেশ করতে পারে।

শত সাবধান থেকেও মানুষ সকল সময় রোগের জীবাণুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। কোন ভদ্রলোক সত্যিই খুব সাবধানী, বাজারের কোন খাবার পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। কিন্তু রোগের জীবাণু কখন যে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছে এ তিনি ভেবে উঠতে পারেন না। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল তিনি যে সব টাকা পয়সা ব্যবহার করেছিলেন তা কোন রোগগ্রস্ত লোকের হাত থেকে তাঁর কাছে আসায় সেই রোগের জীবাণু তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছে। অপরের ব্যবহৃত জিনিষ ব্যবহার করলে এভাবে রোগের জীবাণু যে অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে তা বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ লোক যে সব জিনিষ বিশেষভাবে ব্যবহার করে আমরা সে সমস্ত জিনিষ কোনরূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ব্যবহার করি বলেই বহু-রোগের জীবাণু নির্ব্বিবাদে আমাদের শরীর আক্রমণ করে। ছোট ছেলে কতই বা বুঝে! বাবার কাছ থেকে পয়সা পেয়ে মহা-আনন্দে মুখের মধ্যে পুরে দিলে; আর বহুরোগগ্রস্ত লোকের ব্যবহৃত পয়সায় যে জীবাণু ছিল, তা ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করায় ফল হয়ত সব সময় তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না, তবে শরীরের পক্ষে যে মারাত্মক তা সময়ে ধরা দেয়।

এই সব সাধারণ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একপ্রকার প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। ওষুধটি এক আধারের মধ্যে রক্ষিত এবং আধারটি পকেটের মধ্যে রেখে দিলে তার মধ্যে থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বার হয়ে পকেটের মধ্যস্থিত টাকা পয়সা, নোট প্রভৃতি বহু ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিষের মধ্যে যে রোগের জীবাণু থাকে, তা নষ্ট করে। বিশেষ করে জনবহুল শহরে জনসাধারণের কাছে এই ওষুধটির বিশেষ মূল্য আছে।

## সাংবাদিকের খেয়াল

সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহ যেন আমাদের দেশের লোককে সংক্রামক ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। তাদের আবির্ভাবও যেমন হঠাৎ তিরোধানও সেইরূপ। প্রথম দিকে যতখানি উৎসাহ দেখা যায় তার বিন্দুমাত্রও যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকত তা'হলে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙলা সাময়িক পত্রের একটা নূতন রেকর্ডই স্থাপিত হয়ে যেত। কিন্তু এমন পোড়া দেশ যে, তাদের অন্তরের কথা বুঝে বিনাস্বার্থে নয়, পত্রিকার বিনিময়ে আর্থিক সাহায্যটুকুও করবে না। মানুষের উৎসাহ, পরিশ্রম, সখ ও ভবিষ্যতের আশারও ত একটা সীমা আছে! বাঙলার মাটি উর্ব্বর, অসময়ে অনেক ফলকেও ফলতে দেখা যায়। এহেন দেশে অসময়ে হলেও বৈশাখের আগমন যে পৌষ মাসে হবে তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা একজন বিদেশী সাংবাদিকের উৎসাহ, পরিশ্রম ও সখের কথা ভাবছি। ভদ্রলোকের নাম চার্লস ই ক্যাশওয়েল, ফ্রেন্ডলি চিয়ার নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। মিঃ ক্যাশওয়েলের এক অদ্ভুত সখ—তিনি তাঁর বইয়ের সম্পাদনা থেকে আরম্ভ করে কম্পোজ, ছাপা প্রভৃতি যাবতীয় কাজই নিজের হাতে করেন। তাঁর কাগজখানি পৃথিবীর বিভিন্ন ১৪টি দেশীয় রাজ্যে, সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র এবং বহু সাধারণ পাঠকদের নিকট বিনামূল্যে নিয়মিত প্রেরিত হয়। এই কাগজখানি পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে অনেক ধনী তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে আর্থিক সাহায্যদানে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবে মিঃ ক্যাশওয়েল প্রভাবান্বিত হন নি। সাংবাদিক জীবনে এরূপ আদর্শ বিরল।

# আজ-কাল

### ভারতবর্ষ

ইওরোপীয় যুদ্ধের দ্রুত গতি ও নিকট পরিণতি এখন ভারতের সমগ্র রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষ এখন এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন; রাজনৈতিক তৎপরতাও এখন সেইভাবে চলেছে।

বড়লাট গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছেন; সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধায় গিয়ে গান্ধীজী, বল্লভভাই প্রভৃতির সঙ্গে এবং বোম্বাইতে জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন; "ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান"-সম্পাদক গোঁড়া ইংরেজ মিঃ আর্থার মুর অবিলম্বে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দিতে আবেদন জানিয়েছেন।

সব চেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে এই যে, ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক গুরুতর সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বহিরাক্রমণের ব্যাপারে কংগ্রেস যে পন্থা অবলম্বন করবে তার সঙ্গে মহাত্মার অহিংসা-নীতি খাপ খাবে না; সুতরাং কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের দায়িত্ব থেকে মহাত্মাকে রেহাই দেওয়া হ'ল; কারণ মহাত্মার পথে পুরোপুরি যেতে কংগ্রেস অসমর্থ; তিনি স্বাধীন-ভাবে নিজের মনোমত চল্‌বেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নেওয়া এবং অবাঞ্ছিত শক্তির বিরুদ্ধে তাকে কায়েম রাখাই যে কংগ্রেস নেতাদের এই নতুন নীতির উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই, এবং একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, মহাত্মাজীর পরামর্শে না হোক অনুমোদনে এই নীতি অবলম্বিত হয়েছে। জওহরলালজী ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের যে ভাষ্য করেছেন তাতে বলেছেন যে, বহিরাক্রমণ অস্ত্রবলে বা হিংসভাবে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অবশ্য ভারতবর্ষের নেই, আর বহিরাক্রমণের সম্ভাবনাও এখন নেই; সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্ভাবনাও তিনি দেখ্‌ছেন না, সে দিক দিয়ে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আস্‌বে না; কংগ্রেসের নতুন নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে অন্য ক্ষেত্রে—ভারতবর্ষে এমন সব ক্ষমতান্বেষী লোক (adventurers) এবং সমাজ-বিরোধী শক্তি রয়েছে যারা পরিবর্ত্তনকালে মাথা চাড়া দিতে পারে এবং তাদেরই দমন করবার দরকার হবে। এই 'অবাঞ্ছিত' লোক ও শক্তি যে কারা তা পণ্ডিতজী স্পষ্ট করে' বলেন নি। তিনি কোন বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না।

শীগ্‌গিরই ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও ইংরেজদের সঙ্গে এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিটমাট হয়ে যেতে পারে। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সঙ্কটকালে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার একটা সাধারণ স্বার্থ তিন পক্ষেরই রয়েছে। গান্ধী-জিন্না-বড়লাট মোলাকাতের পরই অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার হবে বলে' আশা করা যায়। এ রকম একটা মিটমাট হয়ে গেলে কংগ্রেসের আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের স্বিধা থাকবে না। ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মানীর আক্রমণ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেলেই ভারতে এই রকম একটা ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষও সমীচীন বোধ করবেন, কংগ্রেসও সুবিধাজনক মনে করবে। অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে বাঙলাতেও একটা কংগ্রেস-মুসলিম মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সুভাষচন্দ্র ও ফজলুল হকের মধ্যে মিটমাটে তা সম্ভব-পর হ'তে পারে।

এই পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে দেশীয় নৃপতিদের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ সংস্থানের খবর বিশেষ কিছু বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

## ইওরোপ

### ফ্রান্সে যুদ্ধবিরতি

ফ্রান্সে পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানী ও ইতালীর যুদ্ধবিরতির সমস্ত সর্ত্ত মেনে নিয়েছেন। যদিও পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্ট বলেছিলেন যে, ফ্রান্সের পক্ষে অপমানকর কোনো সর্ত্ত তাঁরা মান্‌বেন না তা হলেও দেখা যাচ্ছে যে, জার্ম্মানীর ভালো-মন্দ কোনো সর্ত্তই তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। করবার সম্ভাবনাও ছিল না। যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবার মনোভাব একবার দেখা দিলে কোনো গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষে আবার নতুন করে' মন তৈরী করে' যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয় না। যে মানসিক দৃঢ়তা ও আদর্শের ভিত্তি থাক্‌লে বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে স্পেনীয় গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের মতো অদ্ভুত সাহসে প্রতিরোধ চালানো যায় সে দৃঢ়তা ও সততা ফরাসী শাসকশ্রেণীর ছিল না। প্যারিস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ফ্রান্সের একপঞ্চমাংশ জার্ম্মানরা দখল করে নেওয়ার আগে থেকেই ফরাসী নায়কেরা আত্মসমর্পণের কথা ভাবছিলেন। অনেকে বল্‌ছেন যে, এত দ্রুত দেশকে শত্রু-পদানত হতে দেওয়ার একটা কারণ নাকি ফরাসী শাসক শ্রেণীর কমিউনিজ্‌ম্‌-ভীতি; তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, যুদ্ধ আর কিছুদিন চল্‌লেই ফ্রান্সে সমাজ-বিপ্লব দেখা দেবে। দেশী কমিউনিষ্টদের চেয়ে বিদেশী নাৎসীরা তাঁদের কাছে বেশী বরণীয় মনে হয়েছে।

জার্ম্মান যুদ্ধবিরতি সর্ত্তগুলি প্রকাশ পেয়েছে। মোটা-মুটি তা এই—জেনেভা-দল্‌-শাল্‌-পারে-মুল্যাঁ-বুর্জ্যাঁ-ভিয়েরজ-তুর-আঁগুলেম্‌-মদমারসাঁ-স্যাঁ জাঁ—এই ভৌগোলিক রেখার উত্তরে ও পশ্চিমে সমস্ত জায়গা অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল ও অট্‌লাণ্টিক উপকূল সমেত ফ্রান্সের অর্দ্ধেকেরও বেশী অংশ এখন জার্ম্মানদের দখলে থাকবে এবং ফ্রান্সে জার্ম্মান সৈন্যের খরচা ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে দিতে হবে; আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্যে কিছু সৈন্য ছাড়া বাকী ফরাসী নৌ, বিমান ও সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র করে' ভেঙে দিতে হবে; দাবী করলে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জার্ম্মানীকে সমর্পণ করতে হবে; অধিকৃত অঞ্চলে দুর্গাদি অক্ষত অবস্থায় জার্ম্মানদের ছেড়ে দিতে হবে এবং সমস্ত সামরিক প্ল্যানও জার্ম্মানদের দিতে হবে; ফরাসী এলাকায় সমস্ত বেতার থামিয়ে দিতে হবে; সমস্ত জার্ম্মান বন্দী সৈন্যদের ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু ফরাসী বন্দী সৈন্যেরা এখন ছাড়া পাবে না। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ফরাসী নৌবহর কাজে লাগাবেন না।

ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তি হওয়ার পর এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলবৎ হয়েছে। বোর্দ্দো গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর সর্ত্ত মেনে নেওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করেছেন। রেনো গবর্ণমেণ্টের সমর-পরিষদের কর্ত্তা জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে লণ্ডনে এক ফরাসী জাতীয় পরিষদ গঠিত হচ্ছে। জেনারেল দ্য গল পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীরুতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার অপবাদ দিয়ে শত্রুর আয়ত্তির বাইরে সমস্ত ফরাসী

দের, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের পরিচালকদের ঐ জাতীয় পরিষদের সংগে যুক্ত হয়ে লড়াই চালাতে আবেদন করেছেন। সিরিয়ার ফরাসী অধিনায়ক জেনারেল মিতেলহাউজার এবং টিউনিসের ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেল মঃ পেরুত' পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অমান্য করে লড়াই চালাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

**বৃটেনের ঘোষণা**

ফ্রান্স যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করার পর গত ১৮ই জুন পার্লামেণ্টে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, মিত্র ফ্রান্স সরে' গেলেও বৃটেন একা লড়াই চালাবে। তিনি আর এক বিবৃতিতে স্বাধীনতাকামী ফরাসীদের বৃটেনের লড়াইকে সমর্থন করতে আবেদন জানিয়েছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে ফরাসী জাতীয় পরিষদকে ফরাসী গবর্ণমেণ্টরূপে স্বীকার করতে মনস্থ করেছেন। মিঃ চেম্বারলেন এবং তাঁর নীতির সমর্থক যে সব লোক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টে রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এখন বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠেছে; শোনা যাচ্ছে, তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মান আক্রমণ এখনো ঠিক আরম্ভ হয় নি। যদিও এখন জার্ম্মানরা ইংলণ্ডকে ঘেরাও করে ধরেছে, তবু মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের ব্যবধান। এই ব্যবধান তারা অতিক্রম করতে না পারলে ইংলণ্ডে স্থল আক্রমণ বা মেকানাইজড বাহিনীর আক্রমণ হবে না। আপাতত জার্ম্মানী কিছু কিছু বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। একদিন একশো বিমান ইংলণ্ডে বোমা বর্ষণ করেছে। বৃটিশ বিমান বহরও জার্ম্মান শহর ও ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করেছে।

ইতালীর সংগে সংঘর্ষ ঢিমে তালে চলেছে। মাঝে মাঝে দুই পক্ষ থেকে বিমান আক্রমণ এবং সীমান্ত-ঘাঁটিতে হানা চল্‌ছে।

**অগ্র প্রাচ্য ও বল্কান**

মিশরের প্রধান মন্ত্রী আলি মাহের পাশা পদত্যাগ করেছেন। যুদ্ধ সম্পর্কেই কোনো একটা ব্যাপার সেখানে ঘটেছে বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি এখনো দেওয়া হয় নি। রাজা ফুয়াদ ও রাজা জর্জ্জের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়েছে এবং বৃটিশ দূত মিশর রাজার সংগে দেখা করে' আলোচনা করেছেন।

তুরস্কের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না—মিত্রশক্তির সংগে তার সাহায্য-চুক্তি কার্যে পরিণত হবার কোনো লক্ষণ নেই। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের পতনের পর সিরিয়া সম্পর্কে একটা নতুন ব্যবস্থায় তার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে একটা সলাপরামর্শ চলেছে; ইরাকের পররাষ্ট্র-সচিব আলোচনার জন্যে আনকারায় গেছেন। বলা হয়েছে, সাদাবাদ আঁতাঁত (তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান) সম্বন্ধেই আলোচনা চল্‌ছে। খবর পাওয়া যাক্ না যাক্, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মিত্রশক্তির দ্রুত বিপর্যয়ে নিকট প্রাচ্যে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। অনেকে অনুমান করছেন, পশ্চিম এশিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এবার সোভিয়েটের আওতায় চলে' যাবে।

রুমানিয়ায় ফাসিস্ট রাষ্ট্র-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। মাত্র একটি দল সেখানে থাক্‌বে—ন্যাশনাল রিবার্থ ফ্রণ্ট; রাজা ক্যারোল তার নেতা। সকলকে নেতার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য নিয়ে চল্‌তে হবে। রুমানিয়ান গবর্ণমেণ্ট জার্মানি ও ইটালীর পক্ষে থাক্‌বার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। এই রুমনিয়াকে বৃটেন ও ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

**দক্ষিণ আফ্রিকা**

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফ্রান্সের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়াও বেশ তীব্র হয়েছে। জেনারেল হার্টজগ ও ডাঃ মালান দাবী করেছেন যে, যেহেতু যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের আশা নেই এবং যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ চালানোর কোনো অর্থ হয় না সেইহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা এখন যুদ্ধ থেকে সরে' আসুক। তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস ভর্ৎসনার সুরে ঐ বিবৃতির এক উত্তর দিয়েছেন।

**সোভিয়েট**

বল্টিকে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের সংগে সংগে এস্তোনিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব হয়ে গেছে। সেখানকার প্রোলেটারিয়াট শাসনক্ষমতা অধিকার করে নিয়েছে। ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়াতেও আগেকার ধনিক গবর্ণমেণ্টের জায়গায় জন-সমর্থিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বল্টিকে জার্ম্মানীর সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্য-সমাবেশ করছে, এই খবর মস্কোতে এক সরকারী বিবৃতিতে অস্বীকার করে' বলা হয়েছে যে, জার্ম্মানীর সংগে সোভিয়েটের সৌহার্দ্দ্য অক্ষুন্ন রয়েছে। এদিকে জার্ম্মানী থেকে এক মার্কিন সাংবাদিক খবর দিয়েছিলেন যে, বল্টিকে সোভিয়েটের আচরণে হিটলার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তিনি সোভিয়েটকে এজন্যে কখনো ক্ষমা করবেন না। এই রকম খবর প্রচারের জন্যে ঐ সাংবাদিককে জার্ম্মানী থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

২৪-৬-৪০

—ওয়াকিবহাল

# আষাঢ় পূর্ণিমায়

**শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী**

এ নহে তুষারশুভ্র পৌর্ণমাসী শারদ আকাশে,
কিম্বা চৈত্রনিশীথের অপরূপ পূর্ণিমা রূপসী;
অশ্রুধারা অবকাশে স্নিগ্ধনেত্রে মৃদুমন্দ হাসে
আষাঢ় পূর্ণিমা এ যে—হের ঐ মেঘস্তরে বসি'!
এই তো ধরার লক্ষ্মী চিরন্তন মানবের ঘরে,
মাতৃসম স্নেহাতুর দৃষ্টি যাঁর সন্তানের লাগি';
প্রসন্ন নয়ন হ'তে অশ্রুমাখা আশীর্বাদ ঝরে,
অতন্দ্রিত বেদনায় দীর্ঘরাত্রি কাটে যাঁর জাগি'।

ধরা নহে স্বর্গপুরী, দুঃখ হেথা দহে মর্মতল;
ক্ষণিক সুখের স্বপ্ন দ্বিগুণ ঝরায় শুধু আঁখি;
তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে দু'দণ্ডে করি' কোলাহল
আনন্দের অভিনয়ে, দুঃখে মোরা দিতে চাই ফাঁকি।
আজি সেই আষাঢ়ের মন্দজ্যোৎস্না পূর্ণিমা-শর্বরী;
তারই চন্দ্রাতপতলে, এস বন্ধু, অভিনয় করি। *

* পূর্ণিমা সম্মিলনীর উদ্বোধন সভায় পঠিত।

গঠনমূলক কার্য্যে সিনেমা

আমাদের দেশের সিনেমা-শিল্পের উপর একটি মস্ত অভিযোগ এই যে, গঠনমূলক কার্য্য প্রচারের প্রতি তাহার চেষ্টা নাই। যে দেশে অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট ভাষার অক্ষরের কোন মূল্য নাই সে দেশে সিনেমার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এবং সেই কারণেই সিনেমার প্রয়োজনও সে দেশে সকলের চেয়ে বেশী। আমাদের 'দেশকে' গঠন করিবার পথে বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। কৃষিকার্য্য, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়াছে এবং এই অন্ধকারে আলোকদানে সিনেমা-শিল্প যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার জাতি গঠনে সিনেমার দান অপরিমেয়। তাহারা বলে—'সিনেমা আমাদের সকল আর্টের সেরা', কিন্তু আমাদের দেশে গঠনমূলক কার্য্য সিনেমা কতটুকু সহায়তা করিয়াছে, এ প্রশ্ন উঠিলে নীরব থাকিতে হয়। এদেশে সিনেমা-শিল্প চলিয়াছে গতানুগতিক ধারায় আনন্দ বিলাসের উপকরণ লইয়া। সেই নাটকীয় পদ্ধতি, মঞ্চঘেষা অভিনয় সেই সস্তা মনস্তাত্ত্বিক হইতে গল্প সংগ্রহ—এ সবই আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পের অপরিহার্য্য অংগ। চিত্র ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের ব্যবসার প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়ায় গঠনমূলক প্রচার-কার্য্যে তাহাদের কোন চেষ্টাই নাই। তাহাদের ধারণা, দর্শকগণ কর্ম্মক্লান্ত দেহ মনকে তাজা করিবার জন্যই বিশেষ সিনেমা-ছবি দেখিতে যান। সেই জন্য ছবিতে চিত্তবিনোদনের আয়োজন না রাখিয়া চিত্ত উদ্বোধনের আয়োজন রাখিলে দর্শক সে ছবিতে আনন্দ লাভ করিবে না।

কোন পথে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে, সেই পথের ইঙ্গিত আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে থাকা প্রয়োজন। ইহার কিছু চেষ্টা যে একেবারে হয় নাই, তাহা নহে তবে তাহা অনুল্লেখযোগ্য। 'জীবন সাধন' চিত্রে দেশহিতব্রতর প্রয়াস প্রশংসনীয়, কিন্তু 'পরাজয়ের' বিলাতিয়ানা ততোধিক নিন্দনীয়। পরাজয় চিত্রে বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের অস্বাভাবিক দৃশ্যটি মূল কাহিনীর সহিত কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই, তাহা দর্শকদের মনে কোন প্রভাব বিস্তার ত করেই নাই উপরন্তু উপহাসের বস্তু হইয়াছে। দেশকে বড় করিতে সাহিত্যিকের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি দায়িত্ব আছে সিনেমা প্রযোজকদের সামাজিক অগ্রগতির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চিত্রশিল্পের সাহায্যে দেশকে কিভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়, সে বিষয়ে তাঁহাদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। অবশ্য একথাও বলিনা যে চিত্তবিনোদনের দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সিনেমাকে প্রপাগাণ্ডা ছবি করিয়া তুলিতে হইবে।

"শুকতারা" চিত্রের প্রধান ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

প্রপাগাণ্ডা আর্ট নহে, সুতরাং তাহা ক্ষণকালের দাবী মিটাইলেও তাহাতে চিরকালের স্বাক্ষর থাকে না। চিত্তবিনোদনকেই সিনেমার একমাত্র উদ্দেশ্য না করিয়া গঠনমূলক উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করাই সিনেমার আদর্শ হওয়া উচিত।

**কৃষ্ণ মুভীটোন—**

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় 'শাপমুক্তি'র কাজ সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। পরিচালক মহাশয় নিজেই নায়ক 'রমেশের' ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন এবং নায়িকা প্রতিমার চরিত্রকে রূপ দিতেছেন পদ্মা দেবী। সঙ্গে আছেন মাষ্টার মুকুল রায় চৌধুরী, নিভাননী, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন বসু, সরযূ-বালা, রবীন মজুমদার, গায়ত্রী রায় এবং বদ্রী প্রসাদ।

**নিউ থিয়েটার্স**

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁহার অভি-নেত্রীর কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। বহুকাল পরে কাননবালা ও পাহাড়ী সান্ন্যালকে একত্রে প্রধান দুইটি চরিত্রে দেখা যাইবে।

তরুণ পরিচালক ফণী মজুমদার তাঁহার 'ডাক্তার' চিত্র শেষ করিয়া আনিয়াছেন। ডাক্তার চিত্রটিকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। কারণ, সিনেমা যে কেবল আনন্দ বিলাসের বস্তু নহে, সিনেমার মধ্য দিয়া দেশের কল্যাণজনক কাজও যে হইতে পারে, এই সত্যকে কাজে পরিণত করিয়াছেন ফনী মজুমদার। 'ডাক্তার' চিত্রে পল্লী পুনর্গঠনের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা দেশের কল্যাণ সাধন করিবে। এই চিত্রে প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—পঙ্কজ মল্লিক, ভারতী ও জ্যোতিপ্রকাশ। শৈলেন চৌধুরীকেও বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে।

*    *    *    *    *

পরিচালক দেবকী বসুর দ্বিভাষী 'নর্ত্তকী' চিত্রের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমতী লীলা দেশাই, ভানু ও নাজাম এই চিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

**ফিল্ম কর্পোরেশন—**

একসঙ্গে অনেকগুলি চিত্র গ্রহণ সুরু করায় একটি ষ্টুডিওতে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া ইহারা কালি ফিল্মস্ ষ্টুডিও দীর্ঘকালের চুক্তিতে ভাড়া লইয়া হিন্দী 'কয়েদী' ও বাংলায় 'সমরগীতি' ছবি দুইটির কাজ চালাইতেছে। নিজেদের ষ্টুডিওতে 'সদ্‌গুরু কবীর' ও 'চিত্রলেখার' কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

**শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স—**

পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের 'ঠিকাদার' চিত্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। এই মাসের মধ্যে ইহা শেষ হইবে। 'অবতার' চিত্র-সমাপ্তির পথে। 'মাতওয়ালী' মীরা গণেশ টকীজে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

**ফিল্ম প্রডিউসার্স—**

'শুকতারা' চিত্রটি শীঘ্রই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও চন্দ্রাবতীকে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাইবে এবং ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন নিরঞ্জন পাল।

**মতিমহল থিয়েটার্স—**

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টুডিওতে 'ব্যবধান' চিত্রের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, প্রতিমা দাশগুপ্তা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

ইহাদের পরবর্ত্তী চিত্র 'নিমাই সন্ন্যাসে'র কাহিনী রচনা করিয়াছেন কবি অজয় ভট্টাচার্য্য এবং ফণি বর্ম্মা ছবিখানি পরিচালনা করিবেন।

**কমলা টকীজ—**

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের 'রাজকুমারের নির্ব্বাসন' চিত্রের কাজ যথারীতি চলিতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা দাশগুপ্তা প্রভৃতিকেও বিশিষ্ট চি[illegible] দেখা যাইবে।

শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা

**এ্যাসোসিয়েটেড প্রডাকসান্স—**

আগামী ৬ই জুলাই 'চিত্রা' ও 'পূর্ণ থিয়েটারে' একযোগে সামাজিক চিত্র 'আলোছায়া' মুক্তিলাভ করিবে। এসোসিয়েটেড প্রডাকসান্স-এর কর্ম্মসচীব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরিচালনায় ছবিখানি গৃহীত হইয়াছে। এই চিত্রের সংগীতাংশ পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীসুধী[illegible] মজুমদার ও শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায়।

এই চিত্রের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি দুইটি বিভিন্ন টাইপের নারী চরিত্র। দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির তরুণী বিপরীত পরিবেশ [illegible] আবহাওয়াতে তাহারা মানুষ। একজনের অফুরন্ত প্রেম, আর একজনের প্রাণঢালা সেবা—উভয়ের মধ্য দিয়া নারীত্বের স্বাভাবিক মাধুর্য্য আপনাদের মুগ্ধ করিবে।

এই চিত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ মল্লিকের গান বিশেষ আকর্ষণ[illegible] মলিনাও কয়েকটি সুন্দর গান গাহিয়াছেন।

শ্যাম লাহা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ, মলিনা, শ্রীলেখা প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছেন।

**ওয়াদিয়া মুভিটোন—**

বোম্বাইয়ের ওয়াদিয়া মুভিটোনে "রাজ-নর্ত্তকী" চিত্রের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। "রাজ-নর্ত্তকীর" কাহিনী রচনা করিয়াছেন যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়। এই চিত্রের ইংরাজী সংস্করণ গ্রহণ করা হইতেছে। তিমিরবরণ সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্প নির্দ্দেশ দিবেন শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী 'রাজ-নর্ত্তকীর' বিভিন্ন সংস্করণের অভিনয়াংশে আত্মপ্রকাশ করিবেন, শ্রীমতী সাধনা বোস, অহীন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ জ্যোতিপ্রকাশ, প্রতিমা দাশগুপ্তা প্রীতি মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রভাত সিংহ, বিনীতা গুপ্তা, মৃণাল ঘোষ, [illegible] চ্যাটার্জ্জি বেচু সিংহ প্রভৃতি।

## কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সকল বিভাগের খেলা শেষ হইবে। কোন্ বিভাগে কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে, তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। সকল বিভাগেই দুইটি অথবা তিনটি ক্লাবের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগিতা হওয়ায় লীগ খেলা খুবই জমিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনের খেলার ফলাফল জানিবার জন্য ক্রীড়ামোদীদের বিপুল উৎসাহ জাগিয়াছে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা বিভিন্ন দলের সমর্থনকারী, তাঁহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। কেমন করিয়া নিজ নিজ সমর্থিত দল চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে, এই চিন্তাই তাঁহাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রতযোগিতার মীমাংসা হইয়া যাইবে। তখন এই সকল ক্রীড়ামোদিগণ এই অসহনীয় উৎকণ্ঠা হইতে রেহাই পাইবেন।

### প্রথম ডিভিসনের খেলা

প্রথম ডিভিসন বা বিভাগের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট লাভ করিয়া লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করিতেছে। গত সপ্তাহে এই দলের খেলা নৈরাশ্যজনক হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণ এই দলের সাফল্য সম্বন্ধে ভরসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনরায় এই দলের খেলা উন্নততর হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণ মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। এই দলের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শীঘ্রই যে দেখা যাইবে, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। মহমেডান স্পোর্টিং দল এই পর্য্যন্ত একমাত্র মোহনবাগান ক্লাব ব্যতীত কোন দলের নিকটেই পরাজয় স্বীকার করে নাই। অন্য কোন দলের নিকট পরাজিত যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ করিয়া এই দল ক্রমশই খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। এই দলের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার হাফ নুরমহম্মদ আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, দলের শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দল যেরূপ খেলিতেছে, তাহাতে সেইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। এই দলের খেলোয়াড়গণের খেলার দৃঢ়তা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব অর্জ্জিত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যেন ইঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হঠাৎ অঘটন না ঘটিলে, এই দল চ্যাম্পিয়ান হইবেই বলিয়া অনেকের ধারণা।

ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা এখনও বর্ত্তমান। লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই দলের খেলোয়াড়গণ প্রথমে যেরূপ নিরুৎসাহপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দলের সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই খেলোয়াড়গণের মধ্যে নবোৎসাহ দেখা দিয়াছে। এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বর্ত্তমান থাকিলে এই দল চ্যাম্পিয়নসিপের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলকে সহজে সম্মান লাভ করিতে যে দিবে না ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে।

কালীঘাট দলের খেলা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নততর হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই দল যে চ্যাম্পিয়ন হইতে পারিবে না ইহা একরূপ নিশ্চিত। ভবানীপুর ক্লাব দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবার হাত হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও পুলিশ দল এই বিষয় ভবানীপুর দলের ভরসার কারণ হইয়াছে। কারণ এই দুইটি দল বর্ত্তমানে লীগ তালিকার সর্ব্বনিম্নে অবস্থান করিতেছে। হঠাৎ যে এই অবস্থা হইতে রেহাই পাইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম।

### দ্বিতীয় ডিভিসন

দ্বিতীয় ডিভিসনে অরোরা দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা এখনও আছে। ডালহৌসী দল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়া যে আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলও চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। হঠাৎ অবস্থার উন্নতি করিলেও অরোরা দলের সমকক্ষতা করিতে কখনই পারিবে না।

### তৃতীয় ডিভিসন

তৃতীয় ডিভিসনে বেনিয়াটোলা লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিলেও চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। ট্রপিক্যাল স্কুল দল দ্রুত অগ্রসর হইয়া এই দলের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই দল যে ভাবে প্রতি খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে এই দলই চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

### চতুর্থ ডিভিসন

চতুর্থ ডিভিসনে জোড়াবাগান ক্লাব দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা এতদিন বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে না হইবার কারণ দেখা দিয়াছে। রবার্ট হাডসন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের লীগের ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

#### প্রথম ডিভিসন

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোহনবাগান | ১৭ | ১২ | ২ | ৩ | ১৮ | ৬ | ২৬ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১৬ | ৮ | ৬ | ২ | ১৫ | ৮ | ২২ |
| কালীঘাট | ১৭ | ৮ | ৬ | ৩ | ২৪ | ১৯ | ২২ |
| মহঃ স্পোর্টিং | ১৪ | ৮ | ৫ | ১ | ২২ | ৬ | ২১ |
| রেঞ্জার্স | ১৭ | ৮ | ৪ | ৫ | ২১ | ১৫ | ২০ |
| এরিয়ান্স | ১৭ | ৬ | ৫ | ৬ | ২২ | ১৯ | ১৭ |
| ই বি আর | ১৮ | ৫ | ৭ | ৬ | ১৮ | ২০ | ১৭ |
| বর্ডার রেজিঃ | ১৭ | ৬ | ৫ | ৬ | ১৬ | ১৮ | ১৭ |
| ক্যালকাটা | ১৮ | ৩ | ৭ | ৮ | ১৬ | ২৪ | ১৩ |
| কাষ্টমস | ১৮ | ৩ | ৮ | ৭ | ১০ | ১৭ | ১৩ |
| ভবানীপুর | ১৮ | ৪ | ৩ | ১১ | ১০ | ২৬ | ১১ |
| পুলিশ | ১৭ | ৩ | ৪ | ১০ | ১৯ | ২৮ | ১০ |
| স্পোর্টিং ইউঃ | ১৬ | ৩ | ৪ | ৯ | ১০ | ২১ | ১০ |

#### দ্বিতীয় ডিভিসন

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অরোরা | ১৪ | ৯ | ৫ | ০ | ১৮ | ৪ | ২৩ |
| ডালহৌসী | ১৬ | ৮ | ৬ | ২ | ৩১ | ১৪ | ২২ |
| জর্জ্জ টেলিগ্রাফ | ১৫ | ৬ | ৮ | ১ | ১৭ | ৮ | ২০ |
| কুমারটুলী | ১৫ | ৫ | ৭ | ৩ | ২২ | ১৫ | ১৭ |

### তৃতীয় ডিভিসন

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বেনিয়াটোলা | ১২ | ৮ | ২ | ২ | ১৯ | ১১ | ১৮ |
| ট্রপিক্যাল্স | ৯ | ৮ | ১ | ০ | ১৪ | ৩ | ১৭ |
| মারোয়াড়ী | ১১ | ৬ | ৩ | ২ | ২০ | ৪ | ১৫ |

### চতুর্থ ডিভিসন

| | খে | জ | ড্র | পরা | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জোড়াবাগান | ১৩ | ১০ | ১ | ২ | ২২ | ৫ | ২১ |
| রবার্ট হাডসন | ১০ | ৯ | ১ | ০ | ৪০ | ৩ | ১৯ |

### বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলা

আগামী ২৯শে জুন ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় ফুটবল খেলোয়াড়গণের এক বিশেষ প্রদর্শনী খেলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রতি বৎসর লীগ খেলার সময় এইরূপ খেলার ব্যবস্থা হইয়া থাকে সুতরাং এই অনুষ্ঠানে নূতনত্ব কিছুই নাই। আই এফ এর খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটি এই খেলার জন্য উভয় দলের খেলোয়াড়গণ মনোনীত করিয়াছেন। মনোনয়ন কার্য্য যে খুব ভাল হইয়াছে ইহা কোনরূপেই বলা চলে না। উভয় দল যেভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক ভালভাবেই যে গঠন করা যাইত ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যগণ নির্ব্বাচন সময়ে বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল না। তাঁহারা নির্ব্বাচনের সময় কেবল সকল দলের খেলোয়াড়কে কিরূপে নির্ব্বাচিত দলে স্থান দেওয়া যায়, ইহাই চিন্তা করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্ব্বাচনকার্য্য করিলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। নির্ব্বাচিত দলে এই-রূপ সকল খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছেন, যাঁহারা কোনদিন বিশিষ্ট বাছাই দলে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহেন। ইহার উপর কোন দলের কোন খেলোয়াড় কোন স্থানে নিয়মিতভাবে খেলিয়া থাকেন ইহাও তাঁহারা জানেন না। যদি জানিয়াই থাকেন, তবে কেমন করিয়া নিয়মিত স্থানে খেলিতে না দিয়া নূতন স্থানে খেলিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন, ইহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। স্থান পরিবর্ত্তন খেলোয়াড়গণের খেলার স্বাভাবিকত্বে যে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে ইহা কি তাঁহাদের জানা নাই? তাহা ছাড়া উভয় দলেই কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে মনোনীত না করায় খেলাটির বৈশিষ্ট্য অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় দলে ব্যাকে পি চক্রবর্ত্তী, রাইট হাফে কাইজার, রাইট ইন কে ভট্টাচার্য্য ও সেণ্টারে ডি ব্যানার্জ্জিকে নির্ব্বাচিত না করিয়া খুবই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ পর্য্যন্ত উক্ত খেলোয়াড়গণ বাছাই ভারতীয় দলে স্থান পাইবেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় ছিলেন। ইউরোপীয় দলের ব্যাকে স্কফিল্ড অথবা মানরো, আক্রমণভাগে বারোজকে লওয়া খুবই উচিত ছিল। নির্ব্বাচন কমিটি যে দল দুইটি গঠন করিয়াছেন, তাহার খেলা যে খুব উচ্চাঙ্গের হইবে না ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে এই খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য যে কোনরূপেরই সফল হইবে না ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। নিম্নে ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

**ভারতীয় দলঃ—গোল**—কে দত্ত (মোহনবাগান) (অধিনায়ক); ব্যাকদ্বয়—বাচ্চি খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং আর মজুমদার (ইষ্ট বেঙ্গল); হাফ ব্যাকগণ—অনিল দে (মোহনবাগান), মোহিনী ব্যানার্জ্জি (কালীঘাট) এবং ডি মিত্র (এরিয়ান্স); ফরোয়ার্ডগণ—এস গুই (মোহনবাগান), সোমনা (ইষ্ট বেঙ্গল), সাবু (মহমেডান স্পোর্টিং), জোসেফ (কালীঘাট) এবং এস নন্দী (ই বি আর)।

অতিরিক্ত—ডি সেন (ইষ্ট বেঙ্গল), সিরাজুদ্দীন (মহমেডান স্পোর্টিং), এ দত্ত (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), এ নন্দী (ইষ্ট বেঙ্গল), জুম্মান (ভবানীপুর), নূর মহম্মদ (ছোট) (মহমেডান স্পোর্টিং), ডি ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স) এবং আপ্পারাও (কালীঘাট)।

ইউরোপীয় দলঃ—গোল—জার্ডিন (কাষ্টমস); ব্যাকদ্বয়—র‍্যানসন (বর্ডার রেজিমেণ্ট) এবং হজেস (কাষ্টমস); হাফ ব্যাকগণ—মার্স (ক্যালকাটা), জে লামসডেন (রেঞ্জার্স) (ক্যাপ্টেন) এবং কক্স (বর্ডার রেজিমেণ্ট); ফরোয়ার্ডগণ—ব্যাটার্সবি (বর্ডার রেজিমেণ্ট), গ্রেভস (বর্ডার রেজিমেণ্ট), আর লামসডেন (রেঞ্জার্স), পি ডিমেলো (পুলিশ) এবং হুইটবার্ণ (রেঞ্জার্স)।

অতিরিক্ত—মিলস (বর্ডার রেজিমেণ্ট), আর্ল (রেঞ্জার্স), ফলস (পুলিশ) এবং জে মিলস (পুলিশ)।

### ওয়াটার পোলো খেলায় গণ্ডগোল

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার-পোলো লীগ খেলা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম ফলত তাহাই হইয়াছে। বিভিন্ন খেলার রেফারিগণের মারাত্মক ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া যোগদানকারী বিভিন্ন দল প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে বলিয়া এসোসিয়েশনের পরিচালকগণকে জানাইয়া দিয়াছে। ফলে এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বাধ্য হইয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকটি খেলা যাহাতে সুপরিচালিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা একটি রেফারী বোর্ড গঠন করিতেছেন। এই বোর্ডই বিভিন্ন খেলার রেফারী নির্ব্বাচন করিবেন। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের এতদিন পরে যে সুবুদ্ধি জন্মিয়াছে ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

# সমর বার্ত্তা

১৯ জুন।—

কাউনস-এর সংবাদ—পূর্ব প্রুসিয়াতে জার্মান সৈন্য চলাচল করিতেছে। চারদিন ধরিয়া লিথুয়ানিয়ায় মোটরাইজড দল সহ অতিরিক্ত সোভিয়েট সৈন্য আসিতেছে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট লিথুয়ানিয়ান জার্মান সীমান্তে ২০০০ ট্যাঙ্ক সমবেত করিয়াছেন।

২০ জুন।—

জার্মান বেতারের সংবাদ—ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছে, ফরাসী মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য অস্ত্রত্যাগের শর্ত সম্বন্ধে একমত হন নাই।

শত্রুপক্ষের ধ্বংসের কবল হইতে শহর রক্ষার জন্য ফরাসী গভর্নমেণ্ট বর্দো ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। গত রাত্রে বর্দোর উপর জার্মানদের প্রবল হাওয়াই হামলা চলিয়াছিল। ফরাসী বেতার—জার্মান সৈন্যরা লিঅঁ অধিকার করিয়াছে।

গত রাত্রে পুনরায় জার্মান বিমান বাহিনী ইংলণ্ডে হামলা শুরু করে। এই হামলায় বিমান আক্রমণ নিরোধ ব্যবস্থার ১ম ওআর্ডেন নিহত হইয়াছেন। ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানও আমিআঁ ও রুয়েঁর নিকটবর্তী শত্রুদের বিমানঘাঁটি এবং সারা রাত্রি রুর, রাইনল্যাণ্ড প্রভৃতি সামরিক স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

জিবুতির সংবাদ—আবিসিনিয়ার সর্বত্র ইতালীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে।

সাংহাই-এর সংবাদ—ইন্দো-চীন রক্ষার দ্বিগুণিত ব্যবস্থায় হাইনান দ্বীপে জাপ সৈন্য সমাবেশ ঘটিতেছে। ইন্দো-চীনের পথে পণ্য চলাচল বন্ধ করিতে ফরাসী গভর্নমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন।

২১ জুন।—

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পেত্যাঁ বেতার বক্তৃতায় জার্মানকে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করেন।

সকালে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের এক শহরে জার্মান ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর লড়াই চলে। ব্রিটিশ বিমান বিভাগের ঘোষণা—তাহারা ফ্রান্সের কয়েকটি শত্রুপক্ষীয় বিমানঘাঁটি, জার্মানির লুপেন, হাম, বিয়েলফেল্ড, সুপস্টেনডুরেন, সোয়েরটি, এসকারসেন, মুসেনগ্লাডব্যাক, হামবর্ন, এমারিক, হামবর্গ, ব্রুনসবুটেল, নর্ডেনি, এজমুইডেন, শেভেনিনজেনের সামরিক গুদাম ও বর্কুনের বিমান-ঘাঁটিতে হামলা করিয়াছে।

২২ জুন।—

নিউ ইয়র্কের সংবাদ—আজ বেলা সাড়ে চারটার সময় ফ্রান্স জার্মানির সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিপত্রে সাক্ষর করিয়াছে। ইটালি ও ফ্রান্সের মধ্যেও যুদ্ধবিরতি চুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছে। শেষোক্ত সাক্ষরের সংবাদ জার্মানির গোচরে আসিবার ছয় ঘণ্টা পরে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হইবে। কোনও ক্ষেত্রেই সন্ধির শর্ত জানা যায় নাই।

জার্মান নিউজ এসেন্সির সংবাদ—১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে রেলের যে 'ডাইনিং কার'এ যুদ্ধবিরতির চুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা এবং ফরাসীদের বিজয়লাভের স্মৃতি-ফলক ও স্তম্ভ সমূহ হিটলার বার্লিনে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। শুধু ফরাসী জেনারেল মার্শাল ফসের স্মৃতি-স্তম্ভ যথাস্থানে থাকিতে পাইবে, কিন্তু তাহার চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে।

ব্রিটিশ সমর পরিষদের সামান্য অদলবদল হইয়াছে। গত কাল সম্ভবত ১০০ জার্মান বিমান ব্রিটেনে হামলা করিয়া গিয়াছে। ইংরেজদের বিমানবহর ও আমস্টারডমের নিকটবর্তী সিপোল বিমানঘাঁটি ও উত্তর-পশ্চিম জার্মানির এথেন, ফিনট্রন, অস্টারফিল্ড, হাম, লুডউইগসুহ্যাফনো পার্ড প্রভৃতি নানা স্থানে হাওয়াই হামলা চালাইয়াছিল।

আবিসিনিয়ার সীমান্তে ইটালির সহিত ব্রিটেনের সংঘর্ষ বিমান বহরের ৭০টি এয়ারোপ্লেন লেকো ও ব্যালেডের শিল্প-কারখানাগুলির উপর সাফল্যের সহিত হামলা করিয়াছে। ভেনিসের বড় পেট্রল গুদাম ধ্বংস করিয়াছে। মালটাতেও হাওয়াই হামলা চলিয়াছিল।

২৩ জুন।—

ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির শর্তের মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জার্মানির নিকট ফ্রান্সের পূর্ণ আত্মসমর্পণই সূচিত। ইংলিশ চ্যানেল ও আটলাণ্টিক উপকূলের সমস্ত বন্দর যুদ্ধকালে জার্মানির অধিকারে থাকিবে। ফ্রান্স দখলের ব্যয়ভার ফ্রান্সকে বহন করিতে হইবে। ফরাসী নৌবাহিনীর সমস্ত জাহাজ নিরস্ত্র করিতে হইবে। সমস্ত সমর-সরঞ্জাম, বন্দর, দুর্গশ্রেণী, রণ-তরী নির্মাণের কারখানা, রেলপথ, রাস্তাঘাট জার্মানিকে সমর্পণ করিতে হইবে। মাত্র প্যারিস ও প্যারিসের চতুষ্পার্শ্বস্থিত অঞ্চল জার্মান দখল হইতে মুক্ত থাকিবে। এখানে ফরাসীদের যে সৈন্য থাকিবে তাহার সংখ্যা ইটালি ও জার্মানি ঠিক করিয়া দিবে।

লণ্ডনের ২২ জুনের সংবাদ—গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবাহিনী ব্রিমেন, কাসেল, রোখেনবেরি, গটিলেন প্রভৃতি শহরে এবং উত্তর-পশ্চিম জার্মানির নানা স্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছিল। হল্যাণ্ডের জার্মান অধিকৃত বন্দরে তিনটি শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৪ জুন।—

ফ্রান্স ও ইটালি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত করিয়াছে। ২৪ জুনের শেষরাত্রি হইতে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে। উক্ত স্বাক্ষরের কথা যথাকালে জার্মান গভর্নমেণ্টকে জানানো হইয়াছে।

২৩ জুনের এক বেতারে প্রকাশ—ফরাসী জার্মান চুক্তি দ্বারা বর্দো গভর্নমেণ্ট শত্রুর অধীন হইবে; কাজেই তাহা স্বাধীন ফরাসী নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করার অনুপযোগী মনে করায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট উক্ত গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করিবে না।

বর্দোর সংবাদ—রেনোর গভর্নমেণ্টের সমর অফিসের জেনা-রেল দ গল লণ্ডন হইতে বেতার বক্তৃতা করায় বর্তমান ফরাসী গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

ব্রিটিশ নৌবহরের ইস্তাহার—সুয়েজের পূর্বদিকে আর একটি ইটালীয় সাবমেরিন ধ্বংস হইয়াছে। সব সুদ্ধ সাতটি ইতালীয় সাবমেরিন ধ্বংস করা হইল।

মালটার সংবাদ—গতকল্য বৈকালে ১৯টি ইতালীয় বিমান মালটায় হামলা চালাইয়াছিল।

জাপ গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ব্রহ্মের পথে চুংকিংএ পণ্য আমদানি বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

২৫ জুন।—

জার্মান হাই কমাণ্ড কর্তৃক আজ রাত্রি ১১-৩৫ মিনিট (গ্রীনউইচ সময়) হইতে ফ্রান্সের সহিত জার্মানির যুদ্ধাবসান ঘোষিত হইয়াছে।

সিমলার সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারতীয় নৌবহরের 'পাঠান' নামক জাহাজ ২৩ জুন তারিখে ভারতের উপকূল পাহারা দিবার সময় শত্রুপক্ষের টর্পেডো বা মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

ভোরে ও মধ্যরাত্রির কিছু পরে ব্রিটেনের নানা স্থানে জার্মানরা হাওয়াই হামলা চালাইয়াছিল। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, এই হামলায় ৫ জন নিহত ও ২০ জন আহত হইয়াছে। আজ ভোরবেলা এই প্রথম লণ্ডনে বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি শোনা যায়।

ফরাসী ইন্দো-চীনের ভিতর দিয়া চীনে রণসম্ভার আমদানি বন্ধ করিবার জন্য হাইপংএ জাপ রণতরী প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাউনস-এর সংবাদ জার্মানি ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্তে

১৯ জুন।—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশনে খসড়া প্রস্তাবের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। কাল অধিবেশন সমাপ্ত হইবে আশা করা যায়। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য ওআর্কিং কমিটির পাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা হইতেছে। ৮ই জুলাইএ ওয়ার্ধায় ওআর্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে।

লাহোরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট সার সেকেন্দার হায়াত খাঁ বলিয়াছেন, সম্মুখবর্তী বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আজ পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন—লখনৌ ও কলিকাতার কয়েক স্থানে গ্রেপ্তার ইত্যাদি হইয়াছে। 'মাতৃভূমি' বিহার প্রভিন্সিঅ্যাল স্টুডেন্টস কনভেনশনের বিবরণী প্রকাশের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

২০শে জুন—

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আজও শেষ হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল রচিত ভারতের স্বাধীনতা এবং গণপরিষদের সাহায্যে আত্মশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত না হইলে বর্তমান যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবই আজ প্রধানত আলোচিত হইয়াছে।

নাগপুরে ফরওআর্ড ব্লক সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্রধানত মুক্তি আন্দোলন তীব্রতর করণ ও জাতীয় ঐক্য সাধনের নির্দেশ গৃহীত হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন—দেরাদুন, নবদ্বীপ, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, কলিকাতা, ভাগলপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে ধরপাকড়, কারাদণ্ড প্রভৃতি ঘটিয়াছে।

মহাত্মাজীর নিমন্ত্রণক্রমে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

বাঙলার গভর্নরের সভাপতিত্বে কলিকাতা নাগরিকদের এক সভায় একটি যুদ্ধকমিটি গঠিত হইয়াছে।

২১শে জুন—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতের বর্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তর বিশৃংখলার সময় কংগ্রেস যে কার্যক্রম অবলম্বন করিবে তাহার দায়িত্ব হইতে গান্ধীজীকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। কারণ, তাঁহাকে অহিংসা নীতির মহান আদর্শ পালনের সুযোগ দেওয়া উচিত। চারিদিকে যে যুদ্ধ কমিটি গঠিত হইতেছে সে সম্বন্ধে ওআর্কিং কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন— কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী ওঅর কমিটি অসমর্থনীয়। কোনও কংগ্রেসী তাহাতে যোগ দিবেন না বা ওঅর ফাণ্ডে টাকা দিবেন না। সরকার নিয়ন্ত্রিত নাগরিক রক্ষিবাহিনীতেও যোগ দেওয়া চলিবে না।

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতার নানা স্থানে এবং হাওড়া, ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, শিলং, পাটনা, কোয়েটা প্রভৃতি স্থানে খানাতল্লাসি, গ্রেপ্তার, আদেশ-জারি, কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে।

২২ জুন।—

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতার নানা স্থান, বর্ধমান, সোদপুর, বাঁকুড়া, সরিষাবাড়ি, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, কাশী প্রভৃতি স্থানে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসি, নিষেধ জারি, কারাদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছে।

বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র মিস্টার জিন্নার সহিত দুই ঘণ্টা কাল কথাবার্তা করিয়াছেন। ব্যাপক ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও ফরওআর্ড ব্লকের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব কি না তাহাই আলোচ্য ছিল।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন গুপ্তের ৫০ বৎসর বয়স্কা পত্নী শ্রীমতী বনলতা গুপ্ত ঘরে লেখাপড়া করিয়া বি. এ. পাস করিয়াছেন।

২৩ জুন।—

ভারতরক্ষা আইন।—আগরতলা, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কাশী, কটক, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পূর্ণোদ্যমে ধরপাকড়, কারাদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বোম্বাইএ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'অতীতের মনোভাব ছাড়িয়া বর্তমানের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই বলিয়াই ফ্রান্স ও ব্রিটেন বস্তুত বিপন্ন হইয়াছে। পুরাতন সাম্রাজ্য ও দীর্ঘকালের আধিপত্যের নিশ্চয় সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস বশত পরিবর্তনশীল যুগের প্রতি তাহারা অন্ধ হইয়া ছিল। রক্তক্ষয় ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নবযুগের অভ্যুত্থান আসন্ন। আমাদিগকে অবিচলিত চিত্তে দেখিয়া বুঝিয়া এই নব অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আজ হিংসার যে বীভৎস লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা নিজেরই আগুনে ভস্মীভূত হইবে, অথবা পৃথিবী দ্রুতগতিতে বর্বর যুগে ফিরিয়া যাইবে।'

২৪ জুন।—

'লীডার' পত্রের নিউ দিল্লির সংবাদদাতা এলাহাবাদে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতাকে জানাইয়াছেন, মঙ্গলবার দিন ভারতসচিব পার্লামেন্টে ভারতশাসন আইন সম্পর্কে একটা বিল উত্থাপন করিবেন। এই বিলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার অবসানের সম্ভাবনা আছে।

বড়লাট মহাত্মাজী ও মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোম্বাইএ সর্দার বল্লভভাইএর সঙ্গে দেখা করিয়া দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছেন। প্রধানত হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধেই আলোচনা ঘটিয়াছিল।

ভারতরক্ষা আইন।—'দেশ' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনিত 'জাতীয় সপ্তাহ' সম্পর্কিত যে মামলা প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের ছিল তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। রায় দান ২ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত।

২৫ জুন—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোবাইএ সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন, স্বাধীনতা যখন হাতের কাছে আসিয়াছে, তখন তাহা হস্তগত করিলে ব্রিটেন বিব্রত হইবে মনে করিয়া যদি নিরস্ত হই, তো তাহা নির্বোধের কাজ হইবে। আরও বলিয়াছেন, নাৎসীবাদ আধুনিক হইলেও অসহ্য, তিনি উহার বিরোধী। লুঠের কড়ি ভোগ করিতে বসিবার পূর্বে জার্মানিকে রাশিয়া ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই ত্যাগের পূর্বে পুনরায় মিঃ জিন্না ও সর্দার বল্লভভাইএর সঙ্গে দেখা করিয়াছেন।

**ভারতরক্ষা আইন**—কলিকাতার বহু স্থানে, কালিকটে, নিলফামারির নানা স্থানে, পাটনার নানা স্থানে, রংপুর, সৈয়দপুর, লাহোর, মুঙ্গের, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা, গয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসি, কারাদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছে।

৭ম বর্ষ ] শনিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল Saturday, 6th July, 1940 [ ৩৪শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার—**

গত ২রা জুলাই, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সুভাষচন্দ্রকে ভারত রক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি প্রবীণ জননায়ক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

দেব মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহার পরেই সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া শুনিতেছি, শুধু প্রয়োজন হিন্দু মুসলমানের ঐক্য এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই ভারতের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কংগ্রেস এবং মুশ্লিম লীগের সঙ্গে এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দেশবাসী সেই আলোচনার ফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব, এমন সময় সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার ভারতের সর্ব্বত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের যে সমস্যা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় বলিতেছেন, সুভাষচন্দ্র সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সমস্যার সমাধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার গতিকে রুদ্ধ করিয়া জাতীয় সংহতিকে তিনি দৃঢ় করিতে-ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে ইতিমধ্যেই দেশের সর্ব্বত্র সংহতির উদ্দীপনা সঞ্চার হইতেছে, যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে কোন দিন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মপদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছেন। সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি দিবসের পূর্ব্ব দিনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের জনমত অবগত আছেন এবং তিনি ইহাও জানেন যে, শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এ সম্বধে বাঙলার জনমতের সমর্থক। জনমতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চেষ্টিত হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ভরসা দেশবাসী এখনও পাইল না, পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হইলেন! বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের উপর অন্ধকূপ হত্যার যে মিথ্যা গ্লানিকর অপবাদ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া ঐতিহাসিকেরা আরোপ করিয়াছে, তাহা হইতে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র ব্রতী হইয়া-ছিলেন। তিনি অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ করিবার জন্য বাঙলার মন্ত্রীদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতের এখন প্রধান প্রয়োজন ঐক্য এবং সংহতির। ভারতের সেই ঐক্য এবং সংহতির একনিষ্ঠ সাধক দেশগৌরব সন্তানকে এ সময় বন্দী করার ফলে ভারতের ঐক্য এবং সংহতিই বাধা প্রাপ্ত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ কি তাহাই চাহেন? যদি না চাহেন তবে এ সময় সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার কোন অর্থই হয় না। এই গ্রেপ্তার যে ধারায় করা হইয়াছে, তাহা আটক রাখিবারই ব্যবস্থা দেখা

যায়। এই আটক কতদিনের জন্য এখনও নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে না। ভারতের সর্ব্বজনমান্য অন্যতম রাষ্ট্রনেতাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করিয়া দেশব্যাপী এমন সময়ে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে চূড়ান্ত অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইয়াছে।

---

**সিমলার আলোচনা—**

গত ২৯শে জুন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের তিন ঘণ্টাকাল সিমলা শহরে কথাবার্ত্তা হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মাজীর এই ষষ্ঠবার সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা। ইহার পর শ্রীযুত আনে এবং বীর সাভারকর ইহাদের সঙ্গেও বড়লাটের আলোচনা হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে আলোচনা হইয়াছিল, আলোচনা-কালের সুদীর্ঘতা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়; কিন্তু ফল হইল কি! অনুমানে অন্তত এটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, কংগ্রেসের যে দাবী বড়লাট বাহাদুর তাহা পরিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। যদি তাহা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে মহাত্মাজী সেদিনই সিমলা ছাড়িয়া আসিতেন না; অন্তত জিন্না সাহেবের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা করিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। মহাত্মাজী সম্ভবত বড়লাটকে কোন কথা দিতে পারেন নাই। ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্য তিনি বড়লাটের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া আসেন। মোটের উপর বুঝা-পড়া এবং বিচার-বিবেচনার মধ্যেই আলোচনার সূত্র এখনও ঝুলিতেছে, স্থায়ী এবং শক্ত ভিত্তি পর্য্যন্ত এখনও পেঁাছে নাই। ভারত সচিব মিঃ আমেরী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নূতন সংশোধন উপস্থিত করিয়া সেদিন পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতেই বুঝা গিয়াছিল যে, কর্ত্তাদের মতিগতি এখনও সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত সোজা পথে না আসিয়া নানারকম মারপেচের মধ্যেই ঘুরিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, কথার মারপেচে এখন আর কাজ হইবে না। বিলাতের 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' পত্র সেদিন যে কথা বলিয়াছেন, সেই কথারই সমর্থন করিয়া আমরা বলিব, এখন প্রয়োজন ভারতবর্ষকে সরাসরি শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করা এবং ভারত-বাসীদের নির্দ্ধারিত শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মান্য করিয়া লইবেন আন্তরিকভাবে—ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া। কর্ত্তারা এখনও যুক্তিতর্কের মারপেচে এই আসল সত্যটি এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছেন এবং ভারতবাসীদের ভেদ-বিরোধ, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ প্রভৃতি এখনও তাঁহাদের কাছে ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতালাভের অন্তরায় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মহাত্মাজীকে আহ্বানের সঙ্গে জিন্না সাহেবের দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ হইতেই কর্ত্তাদের মনস্তত্ত্বের এমন হদিস পাওয়া গিয়াছিল। এই সব কারণেই দেখা সাক্ষাতের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা আশাশীল হইতে পারি নাই। 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' বলিতেছেন, বড়লাটের দ্বারা আপোষ-নিষ্পত্তির কাজটা হইবে না। কারণ এমন সূক্ষ্ম আলোচনা চালাইতে হইলে চিত্তবৃত্তির যতটা নমনীয়তা আবশ্যক, বড়লাটের নাকি তাহা নাই। সুতরাং ভারত সচিবের উচিত উড়োজাহাজযোগে ভারতবর্ষে যাওয়া এবং নিজের এ আলোচনা চালানো। ভারত সচিবের যে মহিমার কথা "নিউ স্টেটসম্যান" আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, আমরা অবশ্য সে মহিমার এ পর্য্যন্ত কোন পরিচয় পাই নাই এবং বড়লাটের চেয়ে তাঁহার কথায় বা কার্য্যে কোন বৈশিষ্ট্য আমাদের বুদ্ধিগম্য হয় নাই; এবং হইতে পারে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস নাই; কারণ, তাঁহাদের কাহারও ব্যক্তিগত মতের কোন মূল্য নাই। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের মতেই তাঁহাদিগকে মত দিয়া চলিতে হয় এবং অতীতের ইতিহাস এই সত্যকে প্রতিপন্ন করিয়াছে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল আগে ঠেকেন, পরে শিখেন। আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ডই এক্ষেত্রে বড় প্রমাণ। বর্ত্তমানের এই বিষম সঙ্কটকালেও যদি অতীতের সেই অভিজ্ঞতা তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন না করে, তাহা হইলে শুধু তাঁহাদের নিজেদের দেশ এবং নিজেদের জাতির কাছেই নয়, সমগ্র মানব সমাজের নিকট তাঁহাদিগকে জবাব-দিহি থাকিতে হইবে।

---

**কংগ্রেস কি করিবে—**

গত ৩রা জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ও বড়লাটের মধ্যে কথা-বার্ত্তার মর্ম্ম কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করেন। ওয়ার্কিং কমিটির যাঁহারা সদস্য নহেন, শ্রীযুত অচ্যুত পট-বর্দ্ধন, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজনও এই বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। বড়লাটের শাসনপরিষদের সম্প্রসারণ এবং তাহাতে কয়েকজন নেতা ব্যক্তিকে লওয়ার প্রস্তাবে কংগ্রেস রাজী হইতে পারে না। একথা বলাই বাহুল্য, কংগ্রেস গোটাকত মোটা বেতনের চাকুরীর কাঙ্গাল নয়, কংগ্রেস চায়—দেশের লোকদের শাসনাধিকার নিয়ন্ত্রণে ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব। ইহার আধা-আধি কোন ব্যবস্থায় কংগ্রেসের রাজী হওয়া সম্ভব নহে। বড়লাট কংগ্রেসের এই দাবী সম্বন্ধে কোন্ নীতি অবলম্বন করেন, ইহা এখনও দেখিবার বিষয়। কংগ্রেস পক্ষ তাঁহাদের কথা বলিয়াই দিয়াছেন, এখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে বড়লাটের উপর। দেখা সাক্ষাতের কমতি বাড়তির উপর এখন আর কিছুই নির্ভর করে না, নির্ভর করে ব্রিটিশ শাসন-নীতির কর্ণধার পুরুষদের মনের গতির পরিবর্ত্তনের উপর। ভারতবর্ষের উপর মুরুব্বীয়ানার মতিগতির পরিবর্ত্তন সাধন করিবার পরিস্থিতিতে তাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিলে মঙ্গল তাঁহাদেরই। আমাদের কথা—এ সঙ্কটে তাঁহাদিগকে ভাবাইয়া বিব্রত করিতে আমরা চাহি না।

---

**বড়লাটের হাতে ক্ষমতা দান—**

ভারত সচিব মিঃ আমেরীর মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, ভারতীয় শাসন আইনের যে সংশোধন প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টে পাশ হইয়াছে, তাহার কোন শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব নাই এবং

তাঁহার কথার ভঙ্গী হইতে ইহাই বুঝা গিয়াছিল যে, ভারতস্থ শ্বেতাঙ্গদিগের উপর সেনাদলে যোগদানের বাধ্যতামূলক বিধি প্রয়োগের ক্ষমতা বড়লাটের হাতে ছিল না, প্রস্তাবিত সংশোধনের উদ্দেশ্য শুধু বড়লাটের হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়া। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত সংশোধনের শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব শুধু যে আছে ইহাই নহে, বিশেষ রকমে আছে। পূর্ব্বে যে সব পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা শুধু সম্রাটেরই ছিল অতঃপর বড়লাট সেই সব পদে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া পূর্ব্বে সম্রাট অথবা ভারত সচিবের হাতেই যে সব বিশেষ বিধান প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল, সংশোধিত বিধানে বড়লাটের হাতে সে সব ক্ষমতা আসিয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত অধিকার সম্রাট, ভারত সচিব এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে ছিল এখন বড়লাট—একা সে সব অধিকার লাভ করিয়াছেন। অতঃপর বড়লাট যখন প্রয়োজন বোধ করিবেন, যখনই যে কোন বিষয়ে যতদিনের জন্য আবশ্যক মনে করিবেন অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। আগে তাঁহার এ অধিকার ছিল না, বড়লাট কেবল অর্ডিন্যান্স জারী রাখিতে পারিতেন মাত্র ৬ মাসের জন্য। এই সব সংশোধনের বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্বে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন সপারিষদ বড়লাট, এখন আর পারিষদবর্গের অপেক্ষা রাখিতে হইবে না, বড়লাট নিজেই সব ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, ভারতীয় আইনসভাসমূহ এবং বড়লাটের শাসনপরিষদের পর্য্যন্ত ক্ষমতা অন্তর্হিত হইল, একক প্রভুত্ব পাইলেন বড়লাট। তাঁহার হাতে অধিকার এখন অবাধ হইল। ভারতের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বা ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব আমরা চাহি না, সুতরাং এ জন্য আমাদের আপশোষ কিছুই নাই; কিন্তু আমরা যে জিনিষ চাহিয়াছিলাম, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে তাহা পাওয়া যায় নাই, ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করা হয় নাই বরং ক্ষুণ্ণই করা হইয়াছে, নূতন সংশোধনে এই দিক হইতেই আমাদের আপত্তি। শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব সংশোধন প্রস্তাবের যথেষ্টই আছে, কিন্তু ভারতবাসীদের দাবী প্রতিপালনের অনুকূল মনোবৃত্তির দিক হইতে এই পরিবর্ত্তন কোন আশারই উদ্রেক করে না।

**মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস—**

মহাত্মা গান্ধী ২৯শে জুন তারিখে 'হরিজন' পত্রে "একসঙ্গে সুখী ও অসুখী" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মতদ্বৈধ কোথায় কিংবা কিভাবে ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মহাত্মাজী বলিয়াছেন,—"তাঁহাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে মূলগত মতভেদ ধরা পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় আমি আর কংগ্রেসের নীতি নির্দ্দেশ করিতে পারি না।" মহাত্মাজীর সহিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এই যে বিচ্ছেদ এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে বেদনার কারণ আছে, মহাত্মাজী নিজেই সে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"তাঁহাদের সহিত বিচ্ছেদের যে আঘাত, সে আঘাত সহ্য করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি, এবং ইহা আমাকে একাকী দণ্ডায়মান হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছে।" মহাত্মাজীর এই সব উক্তি হইতেই বুঝা যাইবে যে, মহাত্মাজীর সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই যে মতদ্বৈধ ইহা কেবল তত্ত্বগত ব্যাপার নয়, স্থূল কর্ম্মতন্ত্রগত, ইহা বাস্তব সত্য। মহাত্মাজীর নিজের দিক হইতে যেমন ইহা তাঁহাকে একসঙ্গে সুখী ও অসুখী করিয়াছে, দেশের লোকের সঙ্গে ইহা কতকটা তেমন ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইবে। দেশের এমন একটা সংকট সন্ধিক্ষণে মহাত্মাজীর কংগ্রেসের সহিত এই সম্পর্ক ছেদন অনেকের পক্ষেই কষ্টের কারণ হইবে। কংগ্রেসের, বলিতে গেলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি। মহাত্মাজীর অক্লান্ত অবদান, কংগ্রেসকে মহনীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে ভারত অনেক-কিছু পাইয়াছে, অন্য কোন নেতা ভারতকে এত জিনিষ দিতে পারেন নাই। কিন্তু নেতার চেয়েও দেশ বড়, জাতি বড়, এই যে আদর্শ, এই আদর্শের প্রয়োজনীয়তাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে অতীতেও ব্যক্তি জাগিয়াছেন; কিন্তু জাতির দ্বারা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের আদর্শ এখানে ফুটিয়া উঠে নাই। ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার আবরণে ব্যক্তি দেবতা হইয়াছেন, পক্ষান্তরে অন্ধ আনুগত্যে জাতির চেতনা অভিভূত হইয়াছে। মহাত্মাজীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে কংগ্রেস ক্রমেই জাতিকে সেই অন্ধ অভিভবের দিকেই লইয়া যাইতেছিল। কঠোর বাস্তবের আঘাত পুনরায় যদি আত্মচৈতন্যের পথে গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আধ্যাত্মিকতার মোহ কাটাইয়া বাস্তব রাজনীতিকে বিচার করিয়া চলিবার বুদ্ধিতে জাতি যদি জাগ্রত হয়, তবে নিরাশার কারণ নাই—নিশ্চয়ই।

**ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি—**

আসাম ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"আমি সকল সময়েই এই মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি যে, দেশের স্বার্থের জন্য ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতেই ছাত্রদিগের কার্য্যত রাজনীতিতে যোগদান শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, পরন্তু উহা অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের রাজনীতি চর্চ্চা এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন লোকের বিলাসের বিষয় ছিল। অবসর সময়ে তাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চা করিতেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ভারতীয় রাজনীতি রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে রাজনীতির প্রতি অনুরাগের অভাব ঘটিলে ছাত্রদের নিজেদের মনোবৃত্তির বিকাশ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।" আমরা অধ্যাপক কবীরের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ছাত্রজীবনকে যদি বলিষ্ঠ আদর্শের সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়, তাহা হইলে পরিণত বয়সে তথাকথিত বিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্র শুধু কূপমণ্ডুকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

ছাত্রজীবনকে রাজনীতি হইতে বঞ্চিত করিবার নীতি জাতির অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে, জাতিকে নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জাতিকে চাপিয়া রাখিবার, দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার পক্ষে, ছাত্রদিগকে রাজনীতির সম্পর্ক মাড়াইতে না দেওয়াই যেমন সব চেয়ে কার্য্যকর পথ, সেইরূপ দেশের ত্বরিত উন্নতি সাধন করিবার পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক উদ্দীপনা সঞ্চার করাই হইল একমাত্র উপায়। অন্য দেশকে যাহারা অধীন রাখিতে চায়, এই জন্যই চিরকালই তাহারা ছাত্রসমাজের পক্ষে রাজনীতিকে বিভীষিকা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং যাঁহারা পরাধীনতার বন্ধন ছেদন করিতে প্রয়াসী, ছাত্র সমাজই তাঁহাদিগকে সকল দেশে সর্ব্বোত্তম শক্তি যোগাইয়াছে।

---

**মন্ত্রীদের প্রগতিবিরোধী প্রচেষ্টা—**

আগামী ১৫ই জুলাই হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে মন্ত্রীরা দুইটি বীর ব্রতে ব্রতী হইবেন দেখা যাইতেছে। একটি হইল কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণের দ্বিতীয় দফা বা চূড়ান্ত উদ্যম, আর একটি হইল মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলটির সম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের কথা বহুবার বলিয়াছি। সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী, হিন্দুসভাপন্থী কাউন্সিলারেরা সকলেই এই বিলের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বিলের ধারাসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য কর্পোরেশন হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, ইহার ফলে এই বিলটি যে কতটা অনিষ্টকর তাহাই অধিকভাবে এবং অভ্রান্তরকমে উন্মুক্ত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনে কলিকাতার পৌরজন নিজেদের পৌরকার্য্য পরিচালনে যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, সে অধিকার কিছুতেই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। বাঙলার মন্ত্রীদের গণতান্ত্রিকতার প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি যদি বিন্দুমাত্রও থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা এইরূপ অনিষ্টকর উদ্যমে কিছুতেই ব্রতী হইতেন না। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি কিছুদিন চাপা পড়িয়াছিল, এবার নূতন খসড়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে ৩৬ জন বে-সরকারী এবং নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিবেন; ইঁহাদের মধ্যে ১৬ জন মুসলমান, ৬ জন শ্বেতাঙ্গ এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ১৪ জন হইবে হিন্দু। এই ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার, মুসলমান শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টার, শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর, ব্যায়াম শিক্ষার ডিরেক্টার এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, ইঁহারা মনোনীত সদস্য না হইলেও সরকারী সদস্য যে সন্দেহ নাই। ইহার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন আধাসরকারী সদস্য থাকিবেন, তাহাতে মোট সরকার পক্ষের সদস্য দাঁড়ায় ৮ জন। সরকারী মনোনীত ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ছাড়া অন্য সকলেই মুসলমান হইতে পারেন; সুতরাং সরকারী বে-সরকারী মোট ৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন হইবেন মুসলমান। বাঙলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে আমদানী করিবার এই দুর্ব্বুদ্ধি দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি না আছে এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু অন্য কোন ত্রুটি দেশের পক্ষে এতটা অনিষ্টকর হয় নাই কিংবা হইতে পারে না, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার অবতারণা করিলে তাহার ফলে যতটা অনিষ্ট ঘটিবে। বর্ত্তমানের এই সংকটকালে এমন উদ্যমে অবতীর্ণ হওয়া বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশী কাজের চাপ হইতে রেহাই দিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়াও অন্যভাবে তাঁহাদের মহিমা দেশের লোককে উপলব্ধি করাইবার প্রচুর ক্ষেত্র তাঁহাদের নিকট পতিত ছিল।

---

**মৈত্রীই শক্তি—**

মৈত্রীই শক্তি—অবিশ্বাসী, সন্দেহ এবং সংশয় দুর্ব্বলতাই বাড়াইয়া দেয়। ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিকতারই জয় কামনা করে, হিটলারী নীতিকে ঘৃণা করে ভারতবাসী। হিটলারীবাদের অন্তর্নিহিত পররাজ্য-গ্রাস এবং পরপীড়ন নীতির পরাজয় ভারতবাসীরা মনে-প্রাণেই কামনা করে। কিন্তু ভারতবাসীদের এই আদর্শবাদে সমগ্রভাবে সুযোগ লাভ করিবার পক্ষে প্রয়োজন ভারতবাসীদের স্বাধীনতা আগে স্বীকার করা। দেশরক্ষার আয়োজনের গোড়ায় এই দিক হইতে যে ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে তাহা দূর করা সম্ভব নহে; পক্ষান্তরে দেশের সর্ব্বত্র তাহার ফলে একটা অস্বস্তির আবহাওয়ারই সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের মতে ভারতরক্ষা আইনের এই-ভাবে যে ব্যাপক প্রয়োগ তাহা অনর্থক, এবং অনিষ্টকর। কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করুন, স্বদেশপ্রেমকে মর্য্যাদা দিতে শিখুন, আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশের লোকের বলিষ্ঠ আদর্শ নিষ্ঠাকে বিশ্বাস করুন, তবেই নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি "ষ্টেটসম্যান" পত্রে এই কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের নীতি দেশবাসীর প্রতি বিশ্বস্তির সে পরিচয় আমরা পাইতেছি না, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ-ভাবে পাঞ্জাবে এবং বাঙলা দেশে ভারতরক্ষা আইনের যেভাবে প্রয়োগ চলিতেছে, তাহাতে বিশ্বস্তির পরিবর্ত্তে অস্বস্তির ভাবই বিস্তার লাভ করিতেছে। পুরাপুরি আমলাতান্ত্রিক অবিশ্বাসের আবহাওয়া দেশকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে বিশ্বাস এবং মৈত্রীমূলক নীতিই যে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অধিক কার্য্যকর হইতে পারে, দেশের লোকের প্রতিনিধি বলিয়া নিজদিগকে যাঁহারা জাহির করিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রীদিগকেও ইহা বুঝাইতে হয়, ইহাই দুঃখের কথা।

# ইংলণ্ড আক্রমণে জার্ম্মাণীর উদ্যম

ফরাসী জাতির পরাজয় বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে এক মর্ম্মান্তিক অধ্যায়। জার্ম্মানী এবং ইটালী উভয়েরই হাতের মুঠার মধ্যে আজ ফরাসীকে গিয়া পড়িতে হইয়াছে। ফরাসীর উপনিবেশগুলি এখনও ফরাসীর হাতেই আছে; কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের পর জার্ম্মানী যদি জয়ী হয়, তখন নিরস্ত্র ও দুর্ব্বল ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের ইচ্ছা মত সর্ত্ত মানিয়া লইতে ইটালী ও জার্ম্মানী উভয়েই বাধ্য করিবে। বর্ত্তমানে ফরাসীর সাম্রাজ্যগুলির ভার হাতে লওয়া কি জার্ম্মানী কি ইটালী কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়া তাহারা সে চেষ্টা করে নাই, তবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সব স্থান সামরিক দিক হইতে কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি তাহারা দখল করিতে চেষ্টা করিবে। এই প্রসঙ্গে জিবুতি এবং জিবুতি হইতে আদিসআবাবার রেল লাইনের কথা বলা যাইতে পারে। টিউনিসের বিজর্ত্তা নামক স্থানে ফরাসীদের বিখ্যাত নৌঘাঁটি আছে, সেটি নিরস্ত্র করিতে হইবে, আলজিরিয়ার ওরান এবং কর্সিকা আজাসিওর নৌঘাঁটি নিরস্ত্র করিতে হইবে, ইহার উপর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের টুলোঁর নৌঘাঁটিও নিরস্ত্র করিবার সর্ত্ত চাপান হইয়াছে। ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির উপর বর্ত্তমান পেতাঁ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কতখানি পরিচালিত হইবে, এখনও কিছুই বলা যাইতেছে না। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ভারতের ফরাসী অধিকার চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হইতেছিল। সম্প্রতি ফরাসী-ভারতের রাষ্ট্রশাসক মুসোলুট বোনভিন এ সম্বন্ধে একটি ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি ভারতের ফরাসী প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধে যে পর্য্যন্ত বিজিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ফরাসীর উপনিবেশসমূহ মিত্র-শক্তির পক্ষ সমর্থন করিবে।

ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধবিরতি হইবার পর ভূমধ্যাসাগরের দিকে ইটালীর যুদ্ধ তৎপরতা কিছু বাড়ে। ইটালীর সিসিলি হইতে মালটা মাত্র ৬৫ মাইল দক্ষিণে সুতরাং মালটাতে বিমান বহর লইয়া হানা দিবার সুবিধা ইটালীর আছে। ইটালীর উড়োজাহাজ মাঝে মাঝে মালটাতে হানা দিয়াছে; কিন্তু বিশেষ রকম ক্ষতি করিতে পারে নাই। ইটালীর ডুবোজাহাজের জোর আছে বলিয়া শোনা যায়; কিন্তু ইটালীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধিবার পর

বুখারেষ্টের একটি প্রধান রাস্তা

হইতে ৩০শে জুনের মধ্যে ইংরেজের হাতে ইটালীর তেরখানা ডুবোজাহাজ নষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনখানা নষ্ট হইয়াছে, সুয়েজ খালের পূর্ব্বদিকে, অর্থাৎ আরব সাগরের মধ্যে। "পাঠান" নামক ভারতীয় যে প্রহরী-জাহাজখানা কিছুদিন হইল ভারতের উপকূল ভাগ পাহারা দিবার সময় বোম্বাইয়ের কাছে বিনষ্ট হয়, সেখানা ইটালীর টর্পেডো কিংবা মাইনের আঘাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইটালীর সামরিক শক্তির সুখ্যাতি কোন দিনই নাই।

আবিসিনিয়া এবং আলবেনিয়ার ন্যায় নিরস্ত্রপ্রায় দেশ অধিকার করিতেই ইটালীকে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীর জোরে জোর পাইয়া ইটালী আজ তাহার অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। ইটালীর পরাধীনতার বন্ধন ছেদন করিতে ফরাসীরা কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল মুসোলিনী তাহা বিবেচনা করিবার সময় পান নাই। ১৮৫৯ সালে কাভুর যখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তখন তৃতীয় নেপোলিয়ানের অধিনায়কত্বে ফরাসীরা সার্ডিনিয়ার পক্ষ লইয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান ইটালীর পক্ষে যোগ দেন। প্রধানত ফরাসী সেনাদের আক্রমণের ফলেই অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই যুদ্ধে সাহায্য করিবার বিনিময়ে ফরাসীরা নীস শহরটির অধিকার লাভ করে। আজ মুসোলিনী ফ্রান্সের অতীত অবদানের যথাযোগ্যভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছেন। তিনি সেই নীস শহরের অধিকার চাহিয়া সংকটাপন্ন ফরাসীদের গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। ইউরোপীয় রণনীতিতে ন্যায়-ধর্ম্মের স্থান এমনই। ইটালীর যত জোর জার্ম্মানীরই আশ্রয়ে, সে নিজে জার্ম্মাণীকে বিশেষ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিবে, এমন সামর্থ্য তাহার নাই। ফরাসীদের পরাজয় সত্ত্বেও ইটালীর আফ্রিকাস্থ অধিকারসমূহ নিরাপদ হয় নাই। লিবিয়া, সোমালীল্যান্ড এবং আবিসিনিয়ার ইটালীয় বিমান-ঘাঁটিসমূহের উপর ব্রিটিশ বিমান বহরের ক্রমাগত আক্রমণ চলিতেছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইটালীয় অধিকৃত কোন অঞ্চলই সুশাসিত নয়। আফ্রিকার মুর, বেদুইন প্রভৃতি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিসমূহ এই অবসরে নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে।

ডানকার্ক, ক্যালে, বোলন প্রভৃতি ফ্রান্সের উত্তর উপকূল-ভাগের স্থানগুলি জার্ম্মানীর অধিকারে যাওয়াতে ইংলণ্ডের উপকূলভাগ বিপন্ন হইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু প্রধান প্রধান সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, জার্ম্মানী ফ্রান্সের যুদ্ধে যে সমরনীতি এবং যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক বল প্রয়োগ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে শুধু তাহার জোরে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইংলণ্ড যদি সত্যই আক্রমণ করিতে হয়, নূতন প্রয়োগ কৌশলের প্রয়োজন। সম্ভবত এই জন্যই

বুখারেষ্ট-এর পার্লামেণ্ট গৃহ

জার্ম্মানী এদিকে আপাতত তেমন জোর দিতেছে না; কিন্তু দীর্ঘ দিন বিলম্ব করিয়া উপযুক্তভাবে সজ্জিত হইবার সময় তাহার নাই। ত্বরিতভাবে শত্রুকে আক্রমণই জার্ম্মানীর যুদ্ধ-নীতির বৈশিষ্ট্য। জার্ম্মানী যতই বিলম্ব করিবে, ততই নিজের অসুবিধা চারি দিক হইতে তাহার বাড়িয়া উঠিবে। জার্ম্মানী নিজে এ ক্ষেত্রে প্রধানত ভরসা করিতেছে বিমান শক্তির উপরে, এবং তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও তাহার নাই; কারণ স্থলপথে ট্যাঙ্ক চালাইবার সুবিধা এখানে খাটিবে না; অথচ সে যতই দেরী করিবে, ততই ইংরেজের বিমান শক্তি প্রবল হইয়া পড়িবে এবং এখনও ইংরেজের বিমান শক্তি কম প্রবল নয়। জার্ম্মানী ফ্রান্সের উত্তর উপকূলস্থ বন্দর হইতে ইংলণ্ডের উপকূলে কামান দাগিতে পারে, কিন্তু কামান দাগিয়া দেশ দখ[illegible]ত করা যায় না; ব্রিটিশ পক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের কতক[illegible] স্থান হইতে অসামরিক অধিবাসীদিগকে সরাইয়া

লইতে ইহার ফলে বাধ্য হইবেন। পশ্চিম ফ্রান্সের উপকূল ভাগ ঘেঁসিয়া ইংলিশ প্রণালীর মধ্যে জার্সি এবং গুইরনসি ইংরেজের এই দুইটি দ্বীপ পূর্ব্বেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল, এখন জার্ম্মানী এই দুইটি দ্বীপে সৈন্য নামাইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই দুইটি দ্বীপ দখল করায় ইংলণ্ড আক্রমণের দিক হইতে জার্ম্মানীর সুবিধা বাড়িবে না; কারণ ওয়েলসের ঐ অঞ্চল দিয়া ইংলিশ প্রণালী আটল্যাণ্টিক সমুদ্রের মুখে খানিক সম্প্রসারিত। ইংরেজের নৌ-যানের গতিবিধির ব্যাঘাতও হইতে হইবে না। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যত সৈন্য সমবেত হইয়াছে, ইংলণ্ডে এত ব্যাপক এবং বৃহৎ সৈন্য-সমাবেশ ইতিহাসে কোন দিন ঘটে নাই; এই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া ইংলণ্ডে অবতরণের চেষ্টা সহজ নহে। জার্ম্মানী এ পর্য্যন্ত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কৌশল যতগুলি দেখাইয়াছে, কেবল সেগুলির সাহায্যে এদিকে সুবিধা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। দেশ দখল করিবার উপযুক্ত প্রচুর সৈন্য ইংলণ্ডে নামান জার্ম্মাণীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব। প্যারাসুট বা গ্লাইডার কোন যন্ত্রের সাহায্যেই ইংলণ্ডে সন্নিবিষ্ট বিপুল সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামের উপযুক্ত সৈন্য ইংলণ্ডে অবতরণ করান যায় না। প্যারাসুটিরা অবতীর্ণ সৈন্যদিগকেই গুপ্তভাবে সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু সৈন্য অবতরণ করাইতে না পারিলে প্যারাসুটিদের অবতরণ শুধু প্রাণক্ষয়ের জন্যই বলিতে হইবে। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থান নানা দিক হইতে এইভাবে ইংরেজকে এই সংকটে সাহায্য করিবে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের সম্মুখে সংকট অতি ভীষণ। শত্রুপক্ষ আজ তাহার দ্বারে বলিতে হয়। নরওয়ে হইতে ফ্রান্সের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সম্মুখ সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী সমগ্র উপকূলভাগ আজ শত্রু হস্তগত—কোন কোন স্থানে ইংলণ্ডের উপকূল হইতে শত্রুদের ঘাঁটির দূরত্ব কুড়ি বাইশ মাইলের অধিক নহে এবং সেই সব ঘাঁটি শত্রুর সম্পূর্ণ অধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে। দক্ষিণ, বাম এবং পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের ভয় শত্রুপক্ষের নাই, শুধু ইংরেজের বিমান আক্রমণের আশংকা ছাড়া, অন্য দিক হইতে তাহারা নিঃশংক। প্রকৃত পক্ষে এমন ক্ষেত্রে শান্তি এবং নিরুদ্বিগ্নতা ফিরিয়া পাইতে হইলে ইংরেজকে দীর্ঘ সংগ্রাম করিতে হইবে। শুধু কোন রকমে আত্মরক্ষা করাই এ ক্ষেত্রে সব কথা নয়, শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে; নহিলে সংকটের অবসান হইবার নহে।

হইবার নহে। আমেরিকা ইংরেজকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিবে এতদিন এ কথা শুনিতেছিলাম; কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তোড়ের মুখে অন্য রকম কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন যাহাতে মার্কিন নৌ বাহিনী এবং সেনা বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষ যে সমরোপকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে বলিবেন শুধু তেমন সমরোপকরণই বিদেশীর কাছে বিক্রী করা চলিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য হইলে ইংরেজের সংকট সমধিক হইয়া উঠিবে। কিন্তু সংকটের সম্মুখীন হইয়া দেশ রক্ষা করিতে ইংরেজ জানে।

বলকানের ব্যাপার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বাস্তবিকপক্ষে আজ যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি, তাহার পরিচয় রুশিয়ার পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড এবং বাল্টিকের তীরভাগবর্ত্তী লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসরে রুষিয়ার নিরাপদে আত্মসম্প্রসারণের নীতিরই ইহা অভিব্যক্তি। কৌশলক্রমে রুষিয়া বাল্টিকে জার্ম্মানীকে যেমন কোণঠাসা করিয়াছে, তেমনই বলকানেও এবার তাহাকে কোণঠাসা করিল। জার্ম্মানী এ সত্য না বুঝিতেছে এমন নয়; কিন্তু কায়দায় পড়িয়া প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। যুদ্ধের আগে বেসারেবিয়া রুষিয়ার হাতে ছিল এবং বুকোভোনিয়া ছিল হাঙ্গারীর হাতে। রুমেনিয়া বিগত যুদ্ধে যোগদান করিয়া ফরাসী সেনানায়কদের সৈন্যাপত্য কৌশলে জয়লাভ করিয়া এই দুইটি স্থান নিজের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। রুষিয়া কর্ত্তৃক বেসারেবিয়া অধিকার স্থূল দৃষ্টিতে তুরস্কের পক্ষে আতঙ্ককর বলিয়া মনে হইবে। কৃষ্ণসাগর এবং ইস্তাম্বুলের দিকে রুষিয়ার অগ্রগতি ইহাতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মধ্য ইউরোপের পরিস্থিতি জার্ম্মানীর আধিপত্যের দিক হইতে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে রুষিয়া এ অঞ্চল অধিকার না করিয়া পারে না; কারণ রুমেনিয়ার ন্যায় দুর্ব্বল এবং অন্তর্ব্বিদ্রোহে বিচ্ছিন্ন দেশকে মুঠার মধ্যে লইতে জার্ম্মানীর মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। রুমেনিয়া জার্ম্মানীর দখলে যাওয়ার অর্থ রুমেনিয়ার তেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদে জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধি। বাস্তব সত্যের দিক হইতে এই বিচার রুষিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। তুরস্কের পক্ষে এই পরিস্থিতি বিশেষ সমস্যামূলক হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তুরস্ককে যদি ইটালী-জার্ম্মানীর আতঙ্ক এড়াইয়া নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে হয়, তাহা হইলে রুষিয়ার সঙ্গে মৈত্রী তাহার বজায় রাখিতে হইবে। একদিকে রুষিয়া অপরদিকে ইংরেজ এই দুইয়ের সমভাবে মিত্রশক্তি স্বরূপ তুরস্কের ইটালী জার্ম্মানীর আতঙ্ক খর্ব্ব করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। রুষিয়া এবং ইংরেজ এমন সম্পর্কের মধ্যে আসিয়া পড়িবে কি না বলা কিছুই যায় না; কারণ যুদ্ধের ব্যাপারে যে আজ মিত্র কাল সে শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে কিছুই আটকায় না। বলকানের চাঞ্চল্যের আন্তর্জ্জাতিক দিক হইতে বড় একটা গুরুত্ব রহিয়াছে। ফ্রান্সের পরাজয় এই সমস্যাকে ভূমধ্যসাগর এবং বলকানের দিক হইতে অনিবার্য্যভাবে জটিলত্ব দানে সাহায্য করিয়াছে।

# প্রতিধ্বনি

**কমল ঘোষ**

'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'—কথাটা কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। প্রতিধ্বনিকে শুধু ব্যঙ্গবিলাসী বললে তার ওপর অহেতুক অপবাদ আরোপ করা হয়। কবির কথা কেড়ে নিয়ে প্রতিধ্বনি বরং সগর্বে বলতে পারে—'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান, আমি গাই গান।'

গ্রীক পুরাণে প্রতিধ্বনির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সুন্দর দুটি উপাখ্যান আছে। এক তরুণী তার প্রেমাস্পদ নার্সিসাসের (Narcisus) বিরহে দিন দিন তণুক্ষীণ হয়ে অবশেষে কর্পূরের মত উবে যায়—পৃথিবীতে পড়ে থাকে সমস্ত আকুলতা নিয়ে শুধু তার কণ্ঠস্বর (Ovid)। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এই।—তরুণীটি (Echo) প্যানের প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করে, ফলে রাখালেরা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে দেয়; কিন্তু ধরিত্রী (Earth) তাকে তার গান গাইবার ক্ষমতাটুকু ফিরিয়ে দেয় (Longus)। তাই সে অশরীরী কিন্তু অস্বরী নয়।

আধুনিক যুগের দুই-একটি রচনা ছাড়া বাঙলা কাব্যে প্রতিধ্বনির উল্লেখ বিরল। বাঙলা কাব্যে পাই নদীর উজান, ভাঙ্গন, ঈশানী মেঘ, কালবৈশাখী, গোধূলি আর শুকতারা; কিন্তু প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। এর কারণ স্বরূপ বলতে পারা যায় বাঙলার মাটির গঠন বা ভৌগোলিক চরিত্র। বাঙলার অবারিত মাঠে শুধু ডাঙ্গা আর আলবাঁধা সুসমতল ধানের খেতে প্রতিধ্বনির সে সুযোগ নেই যে সে বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠতে পারে। শুধু পদ্মার মাঝীরাই কিছু কিছু জানে তার ভাটিয়ালির শেষ কলিটিকে প্রতিধ্বনি কেমন করে অপূর্ব মূর্ছনায় বাতাসে বাতাসে জাগিয়ে রাখে।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রতিধ্বনিকে প্রকৃতির রেডিও স্টেশন নামে অভিহিত করেছেন। আমাদের কবি মাইকেল প্রতিধ্বনির বন্দনায় বলেছেন—

> বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ
> আকাশ নন্দিনী
> পর্বত গহন বনে বাস তব বরাননে
> সদা রঙ্গ রসে তুমি রত হে রঙ্গিণী।

এখানে কবির সঙ্গে সায় দিয়ে বলতে দ্বিধা নেই যে প্রতিধ্বনির কীর্তি ব্যঙ্গ নয়; রসই প্রতিধ্বনির প্রাণতন্ত্রী, আর এতে বিজ্ঞানেরও পূর্ণ অনুমোদন আছে।

সুপ্রাচীন দিনের অরণ্যচারী বর্বর মানুষ প্রতিধ্বনির ভিতর মূঢ় বিস্ময়ে শুনেত অজ্ঞাত লোকের আহ্বান, কখনও বা শঙ্কাতুর হয়ে উঠত তাদের অত্যাস্থাপরায়ণ মন; বিবিধ পূজার্চনায় ও যাদু মন্ত্রে তাকে প্রসন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

চিরদিনের কবি ও কোবিদ সমাজের চিন্তা ও কল্পনাকে প্রতিধ্বনি চিরকাল উজ্জীবিত করে এসেছে, কখনও বা করেছে অভিভূত। প্রতিধ্বনির মধ্যে সত্যই এমন একটা দূর রহস্যের বার্তা নিহিত আছে যা স্বভাবতঃ প্রত্যেককেই বিমুগ্ধ করে। কে যেন আমাদের গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক কলিটিই সুরে মিড় মূর্ছনা সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে একে একে। কবি মাইকেল এই কারণে প্রতিধ্বনিকে 'নিরাকারা ভারতী' বলে সম্বোধন করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানী কিন্তু আলোক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে সাদা কথায় প্রতিধ্বনির এমন সুন্দর রহস্যের মুখোসটি খসিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা প্রতিধ্বনির হেতু ধরে ফেলেছেন। আলোক বিজ্ঞানের সূত্রগুলি অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় বস্তুর প্রতিবিম্ব ও আলোকরশ্মির প্রতিফলন বিভিন্ন আধারে কত বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। যে সূর্যরশ্মি আপাতদৃষ্টিতে অনাবিল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, তাই একটা ত্রিশিরা কাচ খণ্ডে (Prism) বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মত সপ্তবর্ণবিভঙ্গ বা বর্ণালী সৃষ্টি করে। প্রতিধ্বনি সম্বন্ধে ঠিক এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। ধ্বনি তরঙ্গ বায়ু-সমুদ্রে আলোড়িত করে দিকে দিকে প্রসারিত হল, প্রতিহত হল গিয়ে একটি আধারে—কোনও গিরিদরি বন বা মেঘান্তরণে; তার ফলে ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে। কিন্তু সেটি ঠিক আদিধ্বনির অবিকল প্রতিরূপ নয়; আধারের গুণাগুণে ইতিমধ্যে তার অনেকখানি উপকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়ে গেছে।

আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের ঈগল হারবারের সন্নিকটে তটের ওপর দাঁড়ালে গির্জার প্রার্থনা স্তোত্রের মত ছন্দায়িত সঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কারণ কি? এখানে দেখতে হবে কোন্ আধারে গিয়ে মূল ধ্বনিটি প্রতিহত হচ্ছে। হ্রদের তটে দাঁড়িয়ে আছে দূর বিসর্পী সুচারু বিন্যস্ত বনরাজি। হ্রদের জলকলোচ্ছ্বাস এমন আধারে প্রতিহত হলে যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করবে তা সুছন্দায়িত হতে বাধ্য। স্যাডল বাক (Saddle buck) শৈলের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রেড ইণ্ডিয়ানরা যখন তাদের বর্বর গলায় যুদ্ধ হাঁক ছাড়ে তা এমনিতে যতই শ্রুতিকঠোর হোক না কেন প্রতিধ্বনিটি ফিরে আসে বিচিত্র সুর ধরে—মিষ্টি গানের কলির মত। এর মূলেও রয়েছে সেই সুচারু বন সমাবেশ। স্বর্ণলঙ্কার রাক্ষসের রাজসভার বর্ণনায় আমরা পড়েছি যে সেখানে—

> অনন্ত বসন্ত বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
> সাগর লহরী মরি! মনোহর যথা
> বাঁশরী স্বর লহরী গোকুল বিপিনে।

ইউরোপে আলপাইন রেলপথ স্থাপনের সময় একটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করার প্রয়োজন হয়। নিযুক্ত ডিনামাইটের বিস্ফোরণের সঙ্গে ভীষণ শব্দে প্রস্তর স্তূপ বিদীর্ণ হতে থাকে। এই শব্দ বিশ মাইল দূরবর্তী গ্রামগুলিতে পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী আশি মাইল পথ অশ্রুত থেকে আবার একেবারে জার্মান সীমান্তে একশত মাইল দূরে অবস্থিত জনপদগুলিতে স্পষ্ট শোনা যায়। শব্দটা যেন মধ্যের আশি মাইল পথ এক লাফে ডিঙিয়ে গিয়েছিল। তবু এটা প্রকৃতির খামখেয়াল নয়, এর বিজ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। সুইস জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালান ও এর কারণ আবিষ্কৃত হয়। শব্দের এই ডিঙিয়ে যাওয়া ব্যাপারটি আলোক বিজ্ঞানের নিয়মের মত, বস্তুর প্রতিফলন ব্যাপারে যা দেখা যায়।

আধারে বৈচিত্র্যের দরুন কত গর্জন ক্রন্দন হয়ে, হাসি অট্টহাসি হয়ে কত দর্পিত আদেশ নিবেদনের মত মোলায়েম হয়ে ফিরে আসে। এই কারণে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাসিত যুগেও এমন লক্ষ লক্ষ নর-নারী আছে যারা আজও প্রতিধ্বনির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। অনেকের মুখেই শোনা গেছে পুরীর স্বর্গদ্বারে দাঁড়ালে নিকটের সাগর গর্জন অনেকের কানে পৌঁছয় না। যদি সত্যই এমন হয়ে থাকে তবে অনুসন্ধান করলে এর রহস্য ভেদ করাও অসম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় এও একটা প্রতিধ্বনির ছল। হয়তো স্বর্গদ্বারের সন্নিকটে এমন কোনও একটা আধার আছে যাতে সমুদ্র গর্জন প্রতিহত হয়ে তার গতি ভিন্ন পথে অন্তরিত হয়ে যায়।

খ্যাতনামা আমেরিকান পর্যটক ও সুসাহিত্যিক মার্কটোয়েনের (Marktwain) লিখিত বৃত্তান্তে একটি প্রতিধ্বনির উল্লেখ আছে। এর বৈশিষ্ট্য হল, একে যে ভাষাতেই প্রশ্ন করুন না কেন উত্তর দেবে জার্মান ভাষায়। কথাটার মধ্যে বোধ হয় কিছু রসিকতা জড়িত অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে সত্যই এমন একটি রসিক প্রতিধ্বনি আছে যে পুরুষ কণ্ঠের কোনও প্রশ্ন বা সম্ভাষণকে আদৌ উত্তর দানে বাধিত করে না। এর কারবার যত বামাস্বর

নিয়ে। নারী কণ্ঠের যে কোনও প্রশ্নকে সে যথোচিত প্রত্যুত্তরে আপ্যায়িত করে। আপাত বিচারে এই কথাটাও অলৌকিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। আলোক বিজ্ঞানের তুলনা এনে এরও খুব সরল ব্যাখ্যা সম্ভব।

লালরঙা দর্পণে যখন কোনও বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে, তখন সেই প্রতিচ্ছবিটি কি 'বর্ণে বর্ণে' হুবহু মূল বস্তুটির অনুরূপ হয়? হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায়, এ হেন আধারে নীল বর্ণবিশিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব বিবর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ নীল বর্ণটি আধারে শোষিত (absorved) হয় ও অপরাপর বর্ণগুলি অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়। ঠিক এইভাবে বিশেষ বিশেষ আধারের পদার্থ-ধর্মের দরুন কতকগুলো বিশেষ ধ্বনি শোষিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ স্বরগুলি আধারে শোষিত হয়েছে তাই প্রতিধ্বনিত হতে পারে নি। শুধু স্ত্রীকণ্ঠসুলভ কোমল স্বরগুলি অনাহতভাবে যথাযথ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ছেলেবেলায় অনেকে হয়তো পাতকুয়োর ভূতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছেন। ওপর থেকে প্রশ্ন করা হয় কে রে? কুয়োর ভেতর থেকে জবাব এল উচ্চতর গুরুগম্ভীর নাদে—কে রে? প্রতিধ্বনি এখানে মূল ধ্বনির চেয়ে উচ্চগ্রামে উন্নীত হয়েছে। অবতল (concave) দর্পণে প্রতিফলিত বস্তুর ছবি বিবর্ধিত (magnified) হয়ে দেখা দেয়, এ কথা সকলেই জানেন। কুয়োর বেষ্টনীর গঠনও অবতল দর্পণের অনুরূপ, সুতরাং প্রতিধ্বনিত শব্দের গুরুত্ব এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্যের শ্বেত রশ্মি ত্রিশিরা কাচ ফলকে বিচ্ছুরিত হলে তা বিশ্লিষ্ট হয়ে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। ধ্বনি তরঙ্গও এইভাবে বিশিষ্ট আধারে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিবিধ স্বরগ্রামে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। দক্ষিণ মণ্টানার (South Montana) একটি গিরি প্রপাতের শব্দ দূর থেকে শোনায় ঠিক সাইরেন বাঁশীর ধ্বনির মত—স্বর তরঙ্গগুলি পর্দায় পর্দায় নেমে ধীরে মিলিয়ে যায়। শিখরাকার (pyramidal) একটি গিরিচূড়াই এই কবিত্বটি করে থাকে। স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানরা আজও এই স্থানটিকে ভীতির চক্ষে দেখে ও পুজো করে। কিলার্নি হ্রদের (Lake Killerny) উপকূলটি এর চেয়েও অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতিধ্বনির নীড়। কেউ হয়তো সামান্য একটা বিউগলের আওয়াজ করল, কিছুক্ষণ পরে প্রতিধ্বনিটি ফিরে এল প্রত্যেকটি স্বরকে এক পরদা ওপরে চড়িয়ে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এখানে কোনও মৃত সুরসাধকের প্রেতাত্মা বাস করে— সেই এই কীর্তি করে বেড়ায়।

বাঙলাদেশে সুন্দরবন ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলের 'বরিশাল গান'এর মেঘের মত গুরু গুরু আরাব অনেকে শুনেছেন, যাকে বলতে পারা যায় বিনামেঘে বজ্রধ্বনি। নিসর্গের এই খেয়ালটির নিঃসংশয় সমাধান কোনও বিজ্ঞানী করেছেন কি না জানি না। এও যতদূর মনে হয়, প্রতিধ্বনিরই একটি কূটলীলা।

সুবিখ্যাত সেণ্টপলস্‌ ক্যাথিড্রালের বিরাট গম্বুজশীর্ষ কক্ষের দেওয়ালগ্রথিত গ্যালারির একাংশে ব'সে অতি অস্ফুট ফিস ফিস শব্দ করলে তা অপর পার্শ্বের অর্থাৎ ১০২ ফুট দূরে অবস্থিত কোনও ভদ্রলোকের কানে সুস্পষ্ট ধরা প'ড়ে যায়, অবতল গঠন মুকুরে বস্তুর আলোকের (rays) প্রতিফলন যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয় সেই নিয়মে।

অতি নগণ্য কর্কশ গদ্যময় শব্দও প্রতিধ্বনির মায়ায় কত শ্রুতিসুখকর ও ছন্দোময় হয়ে ওঠে তা যারা পলায়নপর ঝড়ের আর্তক্রন্দন শুনেছে তারাই বুঝতে পারবে। অমন যে গাঁয়ের হাট বাজারের 'আলু দাও বেগুন দাও' রবে কান ঝালাপালা হয়, সেই হট্টরোলও দূর থেকে সমুদ্রস্তননের মত পথিকের কানে মধুর ধ্বনির সৃষ্টি করে।

ইটালিতে রোমের উপকণ্ঠে একটি প্রাচীন সমাধি স্তম্ভ আছে। এখানে দাঁড়িয়ে একটি চতুর্দশপদী সনেট সম্পূর্ণ আবৃত্তির কিছুক্ষণ পরে শোনা যাবে কবিতাটি তেমনি অখণ্ডভাবে আদ্যোপান্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। যেন কোনও অদৃশ্য শ্রুতিধর উৎকর্ণ হয়ে ব'সে আছে; আপনার শেষ কথাটি পর্যন্ত গভীর মানোযোগ দিয়ে শুনে নিয়ে তার পর সে তার আলাপ শুরু করে। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এর মীমাংসা পাওয়া কঠিন নয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনির আধারের অবস্থান কিছু দূরে ব্যবহিত। শব্দের গতিবেগ হ'ল ৫ সেকেণ্ডে এক মাইল। সুতরাং যদি শব্দ ও তার প্রতিধ্বনির মধ্যবর্তী সময় দশ সেকেণ্ড পরিমিত হয় তবে বুঝতে হবে, প্রতিধ্বনির আধারটি মাইলখানেক দূরে অবস্থিত।

মার্ক টোয়েন-এ আর একটি প্রতিধ্বনির বর্ণনা আছে, এটি একটি বাচাল প্রতিধ্বনি। তাকে একবার গালি দিলে সে পুরোপুরি পনের বার সেই গালিটি ফিরে শুনিয়ে দেবে। আলোক বিজ্ঞানে বস্তুর পৌনঃপুনিক প্রতিফলনের (multiple reflection) ব্যাপারটি যা এও তাই।

এক শ্রেণীর প্রতিধ্বনিকে 'মেগাফোন প্রতিধ্বনি' বলা হয়। এর বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আতসী আয়নায় (magnifying glass) বস্তুর প্রতিচ্ছবির বিবর্ধনের মত এই সব আধার মূল ধ্বনিকে উচ্চতর নিনাদে সমৃদ্ধ করে তোলে। পৃথিবীর মধ্যে মেগাফোন প্রতিধ্বনির প্রকৃষ্টতম আধার হল সিসিলি দ্বীপের সুবিখ্যাত গহ্বর 'ডিওনিসিয়াসের কান' (Ear of Dionysius)। সিরাকিউসের কুখ্যাত অত্যাচারী শাসক ডিওনিসিয়াসের নামেই এর নামকরণ হয়েছে; এর রচয়িতা সেই স্বয়ং। এটি ছিল তার বন্দী-আবাস; পাছে বন্দীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কোনও ষড়যন্ত্র পাকিয়ে না তোলে সেই উদ্দেশ্যে এই গহ্বরটি বিশেষ রীতিতে গঠিত। নীচের অতি ক্ষীণ একটি শব্দ ওপরে চীৎকারের মত শোনা যায়। এ বন্দী-আবাসের তলায় ব'সে এক পাতা মসৃণ কাগজ ছিঁড়ে ফেললে যে সামান্য শব্দালোড়ন সৃষ্টি করে তাই ওপরের প্রহরীর কানে শোনায় জীমূতমন্দ্রের মত।

অক্সফোর্ড সায়ারের একটি উপত্যকায় একটি পিস্তলের আওয়াজ করলে তা পর পর বিশ বার প্রতিধ্বনিত হয়। এও আলোকের আধারের অবস্থান বিশেষে পৌনঃপুনিক প্রতিফলনের মত। মিনাইয়ের সেতুর (Minai bridge) প্রতিধ্বনির ক্রিয়াকলাপ আরও কৌতুকপ্রদ। সেতুর লোহার কড়িটায় হাতুড়ির আঘাতে একটা শব্দ করলে তার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি বরগা থেকে একে একে উত্থিত হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতায় আমরা পড়েছি— 'শচীমাতা ডাকে নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই'। বিচিত্র-কীর্তি প্রতিধ্বনি সত্যই সময় সময় এমনি অঘটন ঘটিয়ে ছাড়ে; 'নিমাই'কে 'নাই' ক'রে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'ক্ষুধিত পাষাণের' নায়কের মুখে আমরা শুনেছি—'আমি সেই দ্বীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না; কোথাও বা স্বর্ণ ভূষণের শিঞ্জন, কোথাও বা নূপুরের নিক্কন, কখনও বা বৃহৎ তাম্র ঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ; অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন ঠুন ধ্বনি, বারান্দা

( শেষাংশ ৮৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

**( গল্প )**

**শ্রীশঙ্কর বাগচে**

শহরের ঠিক মাঝখানেই মার্কেট। সকাল তখন ছয়টা কি সাতটা হইবে। ব্যাপারী ও সব্জিওয়ালারা সবেমাত্র জল ছিটাইয়া ফলমূল শাকসবজিকে তাজা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। জলের ছিটায় সত্যই তাহারা টাটকা হইয়া না উঠিলেও তাহাদের রূপ যে অনেকগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দু-এক জন করিয়া তখন হইতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকজন আধুনিকা তরুণী গৃহিণী জনতা বাড়িয়া উঠিবার আগেই বাজার সারিয়া লইতে আসিয়াছে; কয়েকজন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"নিন না, তিন আনা ক'রে পটল, দু আনা সের আলু, আর বেগুনের সের এক আনা—একেবারে তাজা।" দেখিতে দেখিতেই নানা লোকের চীৎকার বাজারটিকে মাতাইয়া দিল।

বাজারের মধ্যে সন্তোষ মান্নার খ্যাতিই সব চেয়ে বেশী, তাহারই দোকানে হয় সব চেয়ে ভিড়। অনেকগুলি জিনিস একসঙ্গে তাহার কাছে পাওয়া যাইত বলিয়াও বটে আবার তাহার বাক্‌চাতুরীর আকর্ষণেও বটে, লোকে তাহারই দোকানে আসিতে বেশী পছন্দ করিত। সুতরাং টাটকার সহিত বাসী মাল গোঁজামিল দিয়া নির্বিচারে বিক্রয় করিবার সুবিধাও তাহার মত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না।

"মোহন, এদিকে শোন তো!" পিছন ফিরিয়া সন্তোষ হাঁকিয়া উঠিল। তাহার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে দশ-বার বছরের একটি ছেলে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ডাকছিলি কেন রে বুড়ো?"

"বটে! আমি বুড়ো, না?" সন্তোষ রাগিয়া উঠিল, "বড় ফাজিল হয়েছিস তো!"

মোহন তাহাকে খেপাইতে পারার খুশিতে হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন প্রায় তাহারই সমবয়স্কা একটি বালিকাও কোলে একটি কুকুরছানা লইয়া হাজির হইয়া গেছে।

"বংশী," মোহনের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্তোষ বালিকাটিকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "যাও তো মা, এই আনাজগুলো রায়সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস তো মা! এ হতভাগার দেখছি ভারী গুমোর হয়েছে!"

"দিয়ে এলে আমায় কি দেবে বল আগে?"

"তুই যা চাইবি তাই দেব। নে, হ'ল তো এবার? যা ঝপ ক'রে দিয়ে আয়, লক্ষ্মী মা আমার!" সন্তোষ সব্জিগুলো আগাইয়া দিল, "না, এসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না, একটা কাজ বলেছি কি—"

"ওঃ, নিজে ভারী সাধুপুরুষ, না? কাল যে টাটকা আনাজের সঙ্গে বাসী মিশিয়ে বেচছিলে, তার বেলা?"

সন্তোষ রাগিয়া লাল হইয়া উঠিল। "ফের কোনদিন ওকথা বলবি তো—"

"বলব না তো কি! বেশ করব, বলব, আলবৎ বলব। ঐ সাহেব আসছে, ওকেও ব'লে দেব।"

মোহনের কথা শেষ হইতে না হইতেই বছর তিরিশ বয়সের এক যুবককে আসিতে দেখা গেল। চলনভঙ্গী হইতে তাহাকে একজন পদস্থ ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছিল। সাহেবী পোশাক পরা; মাথায় টুপিটা সামনের দিকে একটু বেশী বাঁকাইয়া বসানো হইয়াছে। হাতের ছড়ি দিয়া হাওয়ায় আঘাত করিতে করিতে সিগারেটের ধূঁয়া ছাড়িয়া মার্কেট ইনস্পেক্টর রায়সাহেব প্রাত্যহিক পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়াছেন। পদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সহকারী ও চাপরাসীতে মিলিয়া আরও পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি তাঁহার সামনে পিছনে খবরদারি করিয়া আসিতেছিল।

সুযোগ বুঝিয়া মোহন ও বংশী চম্পট দিল। পালাইবার সময় ঝুড়ি হইতে কয়েকটি আম খামচাইয়া লইয়া গেল। রাগিয়া সন্তোষ হাতের বাটখারাটাই মোহনকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। মোহনের বরাত জোর বলিতে হইবে, সেযাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। রায়সাহেব সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোনওক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিয়া সন্তোষ জোর করিয়া মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া বলিল, "আসুন, রায়সাহেব, আজ কি নেবেন বলুন। এইগুলো নিয়ে যান, এইমাত্র টাটকা এয়েছে, আপনার জন্যেই আলাদা ক'রে রেখে ছিলুম এগুলো।"

উচ্চপদস্থতার সম্মান ভাঙাইয়া যতটা সম্ভব সুযোগ বাগাইয়া লওয়ার অভ্যাস রায়সাহেবের পুরোদস্তুরই ছিল। তবুও সন্তোষের কথায় কর্ণপাত না করার ভান করিয়া পাশের দোকানদার কানাইকে ডাকিলেন। কানাই হাজির হইয়াই সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া খুব জোরেই বলিয়া উঠিল, "আনাজগুলোর আছে কি বল তো?—গন্ধ বেরিয়েছে যে। আর তুমি তো দেখছি দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছ!"

সন্তোষ রায় সাহেবকে ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল। কানাইয়ের কথায় বিন্দুমাত্র না ঘাবড়াইয়া জবাব দিল, "থাক, তোমাকে জহুরীগিরি ফলাতে হবে না।"

মোহন তখনও দূরে হইতে "জোচ্চোর বুড়ো!" বলিয়া সন্তোষকে খেপাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

রায় সাহেব আশপাশের আরও দু চারজন দোকানদারকে ডাকিয়া জড় করিলেন। এবারে কিন্তু সন্তোষ না ঘাবড়াইয়া পারিল না। উপর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া চট্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচ ছয়টা বড় বড় আম লইয়া রায় সাহেবের সামনে ধরিয়া দিল।

"কত দামে বিক্রি করছ?" বেশ মেজাজের সঙ্গেই প্রশ্নটা করিলেন। "ইব্রাহিম, একবার কাদেরকে ডাক তো।"

চাপরাসী ইব্রাহিম কাদেরের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। রায়সাহেব একটি বড় গোছের আম তুলিয়া বলিলেন, "কই, দাম বললে না যে সন্তোষ?"

"গরিবকে আর লজ্জা দেন কেন হুজুর!" সন্তোষ হাত জোড় করিয়া বলিল, "আপনার কাছ থেকে দাম আবার কি নেব বলুন। হুকুম করুন, কত দরকার আপনার?"

"বেশী ব'কো না।" মনে হইল রায়সাহেব সত্যই চটিয়াছেন। তার পরই কিন্তু অদ্ভুত রকমে মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া বলিলেন, "যাক গে, ও দামটাম পরে ঠিক করা যাবে'খন, উপস্থিত তুমি এক টুকরি পাঠিয়ে দিও তো!" বলিয়াই মুখের ভাবটা ঢাকিবার জন্য ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট চাপিয়া আগাইয়া গেলেন।

কয়েক পা যাইতেই রামলাল সামনে পড়িয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই রায়সাহেব রুষ্টভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শুনলুম তোরা সব পচা আনাজ বেচছিস? শহরে তাই ব্যামো বেড়ে গেছে—ডাক্তার সাহেব বলছিলেন।"

"কিন্তু হুজুর, দোষ শুধু আমাদের ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন বলুন। গাঁটের কড়ি বাবুরা কেউ বের করবেন না, বিনা তেল ঘিএই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন আজকাল; তাতে আমাদের দোষ হ'ল কোথায় বলুন।" রামলাল অত্যন্ত বিনয় সহকারেই কথাগুলি বলিল, "মুদীরা বলে, বাবুরা আজকাল তেল ঘি ছেড়ে সাহেবী খানা পাকাচ্ছেন!"

জবাবটা রায়সাহেবকে খুশীই করিয়াছে মনে হইল। স্বরটা একটু নামাইয়া রামলালের কাছে ঘেঁষিয়া বলিলেন, "আম বেচছ না?" বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়াই পা বাড়াইলেন। রামলালও চোখ টিপিয়া চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে কাদের আসিয়া পেঁৗছিল। "আম" শব্দটা তাহার কানে যাইতেই বলিয়া উঠিল, "আম যদি বলেন তো হুজুর, আমার দোকানের—আর সবাইএর তো আমড়া!"

কাদেরের টিপ্পনীটি রায়সাহেব উপভোগ করিলেন। একটু হাসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূরে আসিয়াই মোহন ও বংশীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। অনেক দিন ধরিয়াই ইহাদের তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এমনি তো কত ছেলেমেয়েই আসে তাই ইহাদের লইয়া তাঁহার মনে কোনও কৌতূহল জাগে নাই। আজ হঠাৎ কি জানি কেন ইব্রাহিমকে ডাকিয়া ইহাদের বিষয় জানিতে চাহিলেন।

"এরা?" ইব্রাহিম উত্তরে জানাইল, "এদের তো হুজুর কত বছর ধ'রেই এখেনে দেখছি।"

"এখেনে দেখছি মানে? কার ছেলে ওরা?"

"কি জানি হুজুর, সে খবর তো কেউ বলতে পারে না। দেখি বটে এখেনেই খায়, এখেনেই কোথাও প'ড়ে প'ড়ে রাত কাটায়। কোত্থেকে এসে যে দুটিতে জুটেছে কেউই তা জানে না!"

"খাওয়া জোটে কি ক'রে এদের?"

"এর তার ফাইফরমাশটা খেটে দেয়, যা দুচার পয়সা পায় তাতেই চালিয়ে নেয়।"

* * * * *

"দেখ্ বংশী, আমি যখন রায়সাহেব হব না, দেখবি কি রকম ঝুড়ি ঝুড়ি আম আদায় করব!" রায়সাহেবের বাড়িতে আমের ঝুড়ি পেঁৗছাইয়া মোহন বংশীর হাত ধরিয়া বলিল।

"দূর," বংশী হাত ছাড়াইয়া বলিল, "ওরকম করা বুঝি ভাল। ভগবান না ওতে রাগ করেন?"

"তোকে বলেছে রাগ করেন!" মোহন একটু গম্ভীর হইয়া গেল, "কে বলেছে রাগ করে?"

"বা, মনে নেই বুঝি, রায়সাহেবের আগের সেই বুড়ো সাহেব বলত না?"

"হুঁ, এবারে মনে পড়েছে, সেই যে তোর খেঁদী নাম বদলে বংশী নাম রেখেছিল, না?"

"আচ্ছা সেই বুড়ো এখন কোথায় বল্ তো?"

"কে যেন বলছিল ম'রে গেছে।"

কথাটায় দুজনেই কেমন যেন মনমরা হইয়া গেল। অকস্মাৎ আদরের টেঁপীর আর্তস্বর কানে আসিয়া পেঁৗছিল। সামনের দিকে চাহিতেই বংশীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। ভীতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রঘু আসছে! কাল টেঁপীকে ধ'রে নিয়ে গিসলো, আবার আসছে ধরতে!"

রঘু সরকারী চাকর, বেওয়ারিস কুকুর ধরিয়া লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ। টেঁপীকে কাল ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, শেষে বংশীর অনেক কান্নাকাটিতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

রঘুকে দেখিয়া মোহন সামনে আগাইয়া গেল। ইব্রাহিম কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া রঘুকে হুকুম করিল, "হতচ্ছাড়াদের ঐ খেঁকী কুকুরটাকে নিয়ে যা তো, বড় জ্বালাতন করে।"

মোহন ও বংশী পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল। মনিবদের দেখিয়া টেঁপীর সাহস বাড়িয়া গেল, লাফাইয়া সে রঘুকেই তাড়া করিয়া গেল।

"ধর্ ওটাকে, ভারী বদমাশ!" ইব্রাহিম রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

রঘু খপ্ করিয়া টেঁপীর মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং অত্যন্ত ঘৃণাভরে টুঁটি ধরিয়া ঝুলাইয়া ধরিল। মোহন ও বংশী কত অনুনয় করিল, "ওকে ছেড়ে দাও রঘু। আর কক্ষনো বদমাইশি করবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ওকে ছেড়ে দাও!"

"বড় দরদ যে দেখছি! তোদের কথামত আমাকে কাজ করতে হবে, না?"

এরূপ ঘটনা রঘুর জীবনে নূতন নয়। দশ-বার বৎসর সে এই কাজই করিয়া আসিতেছে, কত মোহন ও কত বংশী তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিয়াছে। ইহার জন্য নূতন করিয়া তাহার অন্তরে কোনও কোমলতার সৃষ্টি হয় না।

রাস্তার একজন বলিয়া উঠিল, "না না, ছেড়ো না ওটাকে।" অপর একজন তাহাতে সায় দিয়া বলিল, "ভাল ক'রে ধর, আবার পালিয়ে না যায়।"

অস্পষ্ট করুণ স্বরে কি একটা কথা মোহন বলিল, কিন্তু সেই হট্টগোলের মাঝে সেই ক্ষীণ আর্তনাদ কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। মোহনের পক্ষে আর নিশ্চল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না, একটা পাথর কুড়াইয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল; পাথরটা টেঁপীর গায়ে লাগিল। আঘাত পাইয়া টেঁপীর চীৎকার বীভৎস হইয়া উঠিল। বংশী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। রঘু যতই টানিয়া হিঁচড়াইয়া, লাথি মারিয়া অনেক কষ্টে টেঁপীকে লইয়া যাইতে লাগিল, বংশী ততই যেন মুষড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মোহন কিছুদূর পর্যন্ত তাহার পিছু পিছু ছুটিল। গাড়িখানা যখন একেবারেই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, বংশী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পথেই লুটাইয়া পড়িল।

* * * * *

সারারাত মোহন ও বংশীর চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। পরদিন তাহাদের সে চাপল্য ও উল্লাস কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। কোনও কিছুতেই আর তাহারা মন বসাইতে পারে না। টেঁপী নাই, কাহাকে লইয়াই বা খেলিবে। সারাদিন ইহাদের সহিত হুটোপাটি করিয়া রাত্রে ইহাদের পাহারা দিত, আজ রাত্রে কে তাহাদের পাহারা দিবে?

সকাল হইতেই মোহন টেঁপীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। বংশী ইহার তাহার ফাইফরমাশ খাটিয়া আনা দুই পয়সা রোজগার করিয়া রাখিয়াছে, মোহন আসিলেই কিছু কিনিয়া খাইবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই মোহন ফিরিয়া আসিল, তাহাকে বেশ খুশী বলিয়াই মনে হইল। বংশীর উৎসুক দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, "কাল কিন্তু একলা তোকে থাকতে হবে, পারবি তো?" তার পর আরও কাছে আসিয়া বলিল, "বুঝলি, কালকে খাঁচাটি রাস্তায় বের করবে, বোধ হয় গাঁয়ের বাইরে কোথাও নিয়ে যাবে, আমি তার পিছুনে পিছুনে যাব, টেঁপী বেরুলেই ধরে নেব।"

"আমি গেলে বুঝি আর ধরা যায় না?"

"দূর! কোথায় না কোথায় নিয়ে যাবে, তুই হাঁটতে পারবি কেন?"

"ও আচ্ছা, তা হলে তুমি যেও একলা। এখনও কিছু খাও নি বুঝি?"

"না তো!"

বংশী আঁচলে বাঁধা চিঁড়া ও এক ডেলা গুড় বাহির করিয়া সামনে ধরিল। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া দুজনেই পেট পুরিয়া জল খাইল, তাহার পর রাস্তার পাশেই বটগাছতলায় একটু ছায়া দেখিয়া শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সেই দুইটি নিষ্পাপ জীবন পরস্পরের উষ্ণসান্নিধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল।

পরদিন খুব ভোরেই তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মোহন

উঠিয়া টেঁপীর খোঁজে বাহির হইয়া গেল আর বংশীও বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

সারাদিন খাটিয়া বংশী আজ কিছু বেশী উপাৰ্জন করিয়াছে; মোহন ফিরিলে আজ একটু ভাল করিয়াই খাওয়া দাওয়া করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিয়া গেল কিন্তু মোহন বা টেঁপীর সাড়াটি পাওয়া গেল না। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি ঘনীভূত হইয়া উঠিল কিন্তু তখনও মোহনের কোন পাত্তা নাই। একা বংশীর বড় ভয় হইল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল—তার পর একসময় সেইভাবেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইল, মোহন ফিরিয়া আসিল না। বংশী উন্মুখ হইয়া পথ চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোথায় মোহন। সারাদিন গেল, রাত্রিও কাটিয়া গেল, মোহনের ফিরিয়া আসার নামটিও নাই। ঠিক তেমনি করিয়াই বংশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। একটি একটি করিয়া কত দিন কত রাত কাটিয়া গেল, টেঁপীও একদিন কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, মোহনের আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। বংশীকে প্রতীক্ষায় রাখিয়া রাতারাতি কোথায় যে সে অন্তৰ্হিত হইয়া গেল, সে খবর কেহ আর জানাইতে পারিল না। বংশী একইভাবে মোহনের প্রতীক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল।

* * * * *

কত বৎসর কাটিয়া গেল।

বংশীর বয়েস অনেক হইয়া গিয়াছে। শৈশবের সেই চঞ্চলা মেয়েটিকে দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই; যৌবনের করস্পর্শে তাহার দেহলতায় এক নবদ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতেছে। মোহন চলিয়া যাইবার পর এক বৃদ্ধ দোকানদার তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে।

আজিও সে মোহনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। সন্ধ্যায় ফিরিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই যে কবে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, আজিও কি তাহার ফিরিবার কথা মনে নাই? কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে, একবার যদি বংশীকে কেহ বলিয়া দিত।

বাজারে বৃদ্ধের দোকানে সেও গিয়া বসিত। অল্পদিনেই দোকানটি বেশ বাড়িয়া উঠিল। তাহার দোকান হইতে জিনিস কিনিতে লোকে কেন জানি না বড় বেশী আগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করিল। আশপাশের দোকানীরা ইহা দেখিয়া চোখ টিপিয়া বলিত—"হবে না? দুনিয়া যে অন্ধ বাবা! আমাদের দিকে দেখবে কে বল।"

অপর কেহ হয়তো উত্তর দিয়া বলিত, "ও চার দিনের চাঁদনি রে ভাই, দেখা যাক কত দূর গড়ায়!"

ইনসপেক্টর রায় সাহেব দুই হাতে লুটিয়া খাইতেছিলেন, কিন্তু ভাগ্যে তাহা আর বেশী দিন সহিল না। তাহার বিরুদ্ধে অনবরতই অভিযোগ হইতে থাকায় তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন একজনকে আনান হইল।

নূতন ইনসপেক্টর এই প্রথম দিন মার্কেট পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন; আগ্রহভরে সকলেই তাহার প্রতীক্ষা করিয়া আছে। দোকানদারদের মধ্যে তাহাকে লইয়া নানারূপ চর্চা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইনসপেক্টর সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। একের পর একটি দোকান ঘুরিয়া ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছেন; পিছনে সেই বৃদ্ধ চাপরাসী ইব্রাহিম। ইনসপেক্টরের কোলে ফুটফুটে একটি শিশু।

দেখিতে দেখিতে বংশীর দোকান আসিয়া গেল। ইনসপেক্টর দাঁড়াইতেই দোকানের কুকুরটা তাহাকে দেখিবামাত্র লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর আনন্দের আতিশয্যে প্রচণ্ডবেগে লেজ নাড়িতে লাগিল।

"টাইগার!" বংশী কুকুরটাকে শাসন করিয়া দিল। টেঁপীর নাম বদলাইয়া টাইগার রাখা হইয়াছে। টাইগার কিন্তু সে শাসন একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বংশীর চপেটাঘাত না খাওয়া পর্যন্ত সে মোটেই শান্ত হইল না।

হঠাৎ বংশী শুনিতে পাইল, দূর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "আরে! এ আমাদের মোহন না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মোহনই তো দেখছি। বেটার বরাত খুব তো! টেঁপীকে খুঁজতে বেরিয়ে নিজেই বেটা কার নজরে পড়ে আজ একেবারে আমাদের সাহেব বনে এসেছে।"

"শুনলুম, পাস-টাসও নাকি করেছে অনেকগুলো!"

বংশীর সংবিৎ ফিরিতে শুনিতে পাইল মোহন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, "তোমার দোকানে তো দেখছি সব রকমের সব্জিই রয়েছে!"

বংশী এই প্রথমবার মুখ তুলিয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেমন যেন হইয়া গেল। অনেক কষ্টে ধরা গলায় সে উত্তরে মাত্র বলিল, "হ্যাঁ, সাহেব।" টাইগার আবার ভীষণ লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিল।

"আমাকে চিনতে পার?" মোহনের স্বরটাও ভারী বলিয়া মনে হইল।

বংশীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। ভারী করুণ ভাঙা ভাঙা কথায় জবাব দিল, "আপনাকে না চিনলে আর চিনব কাকে বলুন?"

হঠাৎ কি ভাবিয়া মোহন আর দাঁড়াইল না, মুখ ফিরাইয়া আগাইয়া গেল। এতক্ষণ বংশীর মনে যে আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল এই এক ঝটিকায় সমস্তই যেন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। এতদিন মনে মনে যে স্বপ্ন সে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, এত আশা, এত প্রতীক্ষা—সবই মিথ্যা! বড় ভুল, বড় ভুল! নিজেকে আর বংশী সামলাইতে পারিল না, মুখে আঁচল চাপিয়া প্রচণ্ড কান্নায় একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল।

কয়েক মুহূর্তেই নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া বংশী একটা বড় গোছের আনারস হাতে লইয়া ইব্রাহিমকে ডাকিল। বলিল, "ঐ বুঝি নতুন সাহেব?"

"সে কি রে বংশী!" আশ্চর্য হইয়া ইব্রাহিম বলিয়া উঠিল, "মোহনকে তোর মনে নেই?"

"ওর বিয়ে হয়ে গেছে, না?"

"সঙ্গের খোকা সাহেবকে দেখেও বুঝতে পারলি না?"

"এই আনারসটা—আচ্ছা, সাহেবের ছেলের জন্য দিলুম, নিয়ে যাও।"

ইব্রাহিম চলিয়া গেলে বংশী আবার মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। টাইগার আনন্দে তখনও দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। বংশীর চোখের সামনে মোহন ও তাহার কোলের শিশুটি তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

* * * * *

পরদিন সকাল হইতেই মার্কেটে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। দোকান ছাড়িয়া বংশী নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ইব্রাহিম খবরটি মোহনের কানে পৌঁছাইয়া দিতে দেরি করিল না। মোহন চমকাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

"বংশী চলে গেছে মানে? কোথায় গেছে?"

( শেষাংশ ৮৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# মধ্য আসামে

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার এম এস্-সি

গোহাটিতে থাকবার সময় গরিব মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক অসমিয়ার বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণে গেলাম। তাঁর বাড়ীটির চাল কাঁচা শন বা খড় দিয়ে ছাওয়া, মেজে কাঁচা। বাঁশের বেড়াঘেরা লম্বা দোচালা ঘর ব্যারাক আকারের। তাতে ২।৩টি কামরা, বাঙলার পল্লীগ্রামের খড়ের ঘর থেকে এটুকু পার্থক্য। বাড়ীর আঙিনায় তুলসী, গাঁদা, তুঁতে, শজিনা, সুপারি প্রভৃতি গাছ। একপাশে তাঁত খাটানো। বাড়ীর একটি ঘরে কুশাসনে আমরা কয়েকজন বসলাম। গৃহিণী একে একে হালুয়া, চালের গুঁড়োর তৈরী সরা পিঠা, চিনি, কলা ও চা পরিবেশন করলেন। আসনে বসেই হাত মুখ ধোবার জন্য একটি পিতলের গামলা পেলাম। গৃহিণীর হাতে শাঁখা; সোনার গহনা অঙ্গে কিছু ছিল না।

এই পরিবারের চেহারা, মুখ, চোখ ইত্যাদি উত্তর ভারতীয় ঢঙের। এরূপ চেহারার অসমিয়াভাষিগণের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কৈবর্ত্ত, নাদিয়াল, যোগী, কেওঁট প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত। এঁরা প্রাচীন কাল থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাস করছেন। প্রমাণ আছে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে সদিয়ার নিকট এই শ্রেণীর এক আর্য্য-বংশ রাজত্ব করতেন। অবশ্য এই শ্রেণীর ভিতরেও তিব্বত-বর্ম্মী এবং মুণ্ডাখাসি (মনখেমর) চেহারার আভাস কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এই শ্রেণী ব্যতীত মোট ২০ লক্ষ অসমিয়া-ভাষীদের মধ্যে বাকী ১২ লক্ষ 'বড়' (Bodo) শ্রেণীর। চুটিয়া, কছাড়ী (হৈড়ম্ব), কোঁচ, মেচ, ত্রিপুরা, ভরো, রাগা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

একদিন 'কামাখ্যা' দেবীর মন্দির দর্শনে গেলাম। মন্দিরে প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্য নিদর্শন অনেক। পাথর ও টালির মত ইট দিয়ে মন্দিরের অনেকাংশ গাঁথা। দেবদেবী ও পুরাণের গল্প স্ফীতভাবে টালির গায়ে ছাপমারা। সেগুলি ভিত্তির উপরে মন্দিরের বহির্গাত্রে সাজান। মন্দিরের ছাউনিতে বাঙলার বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী চারচালা ও আটচালা। মন্দির মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কোঁচ সম্রাট নরনারায়ণ ও তদীয় সেনাপতি ও ভ্রাতা দিগ্বিজয়ী মহাবীর চিলারারের (শুক্লধ্বজ) মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পরনে কোঁচা দেওয়া ধুতি, হাতে খড়্গ। কোঁচ জাতির যেন কৈবর্ত্তশাখার এক গ্রাম্য মণ্ডল বংশ দুই পুরুষে বেড়ে উঠে ক্রমে কামরূপ রাজ্য জয় করে। তিন পুরুষে নরনারায়ণ একেবারে উত্তর বিহার, বরেন্দ্র, আসাম উপত্যকা, কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং অধুনা অজ্ঞাত খৈরাম ও ডিমুরিয়া জয় করেন। এ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। কোঁচ রাজাদের পূর্ব্বে আসাম উপত্যকা কাছাড়ী রাজাদের অধীন ছিল। তৎপূর্ব্বের মালিক চুটিয়া বিহার, বরেন্দ্র, আসাম উপত্যকা, কাছাড়, ত্রিপুরা, মনিপুর এবং উপত্যকা অধিকার করেন। তার পূর্ব্বে হর্ষবর্ধনের মিত্র ভাস্কর-বর্ম্মা বাঙলার শশাঙ্ককে পরাস্ত করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা বর্ত্তমান গৌহাটি বা কামাখ্যা তাঁর রাজধানী ছিল। এসবের পূর্ব্বে মহাভারতের যুগে ঘটক, নরক, ভগদত্ত ও বাণরাজাদের কথা পাই। ত্রিপুরার রাজারাও এককালে দক্ষিণ আসাম, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আরাকান পর্য্যন্ত জয় করেছিলেন। 'বড়' জাতির মধ্যে চুটিয়া, কাছাড়ী, কোঁচ, ত্রিপুরা প্রভৃতি শাখা আসাম অঞ্চলে বড় বড় রাজ্য স্থাপনা ক'রে রাজার জাতি হয়েছিল। এরা মহাভারতের যুগে ক্ষত্রিয় ব'লে পরিগণিত হ'ত। এরা ছোট ছোট সর্দ্দারদের অধীনে বাস করত। কখনও কখনও সর্দ্দাররা সাধারণ-তন্ত্র প্রথায় সর্দ্দার ও রাজা নির্ব্বাচন করত। এই প্রথা পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বত্র এককালে প্রচলিত ছিল। গোপাল, দিব্য, ত্রিপুরার কোন কোন রাজা এইভাবে প্রাচীনকালে নির্ব্বাচিত হয়েছিল, এখনও খাসি সর্দ্দার বা সায়েমরা এই প্রথায় নির্ব্বাচিত হয়। এই গেল আসামের প্রাচীন অধিবাসী উত্তর ভারতীয় (আর্য্য?), মনখেমর ও তিব্বত-বর্ম্মীদের কথা। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শানদেশাগত আহোমগণ পাতকোই গিরিমালা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আসামের পূর্ব্ব সীমান্তে উপনীত হয়। তার পর ক্রমশ চুটিয়া, কাছাড়ি ও কোঁচ রাজাদের পরাজিত ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করে। বর্ম্মীদের আক্রমণের ও মোয়ামারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের বিদ্রোহে আহোম রাজবংশ দুর্ব্বল হ'লে ইংরেজগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আসাম অধিকার করে।

৯ম শতাব্দীর সদিয়ার আর্য্য রাজবংশ, মণিপুরী ব্রাহ্মণ, বর্ম্মার পেদণ্ড ব্রাহ্মণ ইত্যাদি আর্যরক্তবহুল জনসঙ্ঘ দেখে মনে হয় তিব্বত, আসাম, ব্রহ্ম, শানদেশ, শ্যাম, হিন্দু চীন প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরভারতীয় আর্য্যগণ বন্ধুভাবে নিমন্ত্রিত হয়েই হ'ক আর দিগ্বিজয়ী বেশেই হ'ক বহু খণ্ড খণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির এবং প্রাকৃতিক কঠোরতা (যেমন তিব্বত) হেতু এই সব অঞ্চলে গঙ্গা যমুনা উপত্যকার অধিবাসীদের মত কৃষ্টি ও জীবনযাত্রা স্থায়ীভাবে অবিকল ছাপ রেখে যেতে পারে নি। তথাপি ওদের সমাজবিন্যাস ও কৃষ্টি বৌদ্ধযুগের ভারতীয় অবস্থার সংস্করণ মাত্র। বর্ত্তমান যুগেও এতদঞ্চলের অনেক স্থানে বাঙালীর আহার, পোশাক ও মনোভাব একটা ছাপ রেখে যাচ্ছে এবং চেষ্টার দ্বারা আরও অধিকমাত্রায় প্রভাব রেখে যেতে পারে।

বর্ত্তমান আসামে ৯২ লক্ষ অধিবাসী। উত্তর ও মধ্য আসামে ৬০ লক্ষ। সুরমার সমতল উপত্যকায় বাকী ৩২ লক্ষ লোক বাস করে; তাহাদের অধিকাংশই বঙ্গভাষী। তন্মধ্যে ১৪ লক্ষ হিন্দু ও ১৮ লক্ষ মুসলমান। আসাম প্রদেশ পুনর্গঠিত হলে এই সুরমা উপত্যকা বাঙলায় ফিরে আসবে। পার্ব্বত্য কাছাড় (Hill Cachar বা North Cachar) বা হাফলং মহকুমা কেন আসামেই থাকা উচিত, তার কারণ যথাসময়ে বর্ণিত হবে। নবগঠিত আসাম প্রদেশ তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং মধ্য আসামের পার্ব্বত্য বিভাগ নিয়ে গঠিত হবে। এই অংশে বর্ত্তমানে ৬০ লক্ষ অধিবাসী আছে। তার মধ্যে ২০ লক্ষ অসমিয়া ভাষী ও ১১ লক্ষ বঙ্গভাষী। বহুভাষাভাষী পাহাড়িয়াদের সংখ্যা ১২ লক্ষ। আর চাকামানের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন শ্রমিকদের (garden and ex-garden) সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। তারা সাধারণত ছোটনাগপুর ও মাদ্রাজ হ'তে আগত। বাকী ৩ লক্ষের মাতৃভাষা নেপালী, মাড়োয়াড়ী, উড়িয়া প্রভৃতি। উক্ত ১১ লক্ষ বঙ্গভাষীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমান। মণিপুর, লুসাই পাহাড়, মিকির পাহাড় বা নওগাঁ জেলা এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়গুলির সঙ্গে মধ্য খাসিয়া এবং গারো পাহাড়ের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নিকট। এদের মধ্য দিয়ে একটা সরু ফালির আকারে হাফলং মহকুমা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং সুরমা উপত্যকাকে যুক্ত করেছে। এ অবস্থায় এই মহকুমার বঙ্গভাষী কাছাড়িদের প্রাথমিক শিক্ষার বাহনরূপে বাঙলা ভাষাকে রেখে একে আসামের সঙ্গে যুক্ত রাখাই উচিত। গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি মহকুমাতে বঙ্গভাষীদের সংখ্যাধিক্য এবং এই মহকুমা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম-তীরে অবস্থিত। সুতরাং একেও বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই অংশের জনসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। তাহ'লে নবগঠিত খাঁটি আসামে ৫৪ লক্ষ অধিবাসী থাকবে। তখন সমগ্র প্রদেশে অসমিয়া ভাষারই প্রাধান্য স্থাপিত হবে। বর্ত্তমানে সমগ্র আসামে ২০ লক্ষ অসমিয়াভাষী এবং ৪০ লক্ষ বঙ্গভাষী।

সেই নব আকারের আসামের ৫৪ লক্ষ লোক মধ্যে ৩০ লক্ষ লোক হবে উত্তর ভারতীয় রক্তসঞ্জাত। এতন্মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ

অসমিয়া মুসলমান। বাকী ২৪ লক্ষ মূলত তিব্বতী-বর্ম্মী রক্ত-সঞ্জাত এবং অল্প কিছু মনখেমর (খাসি, মুন্ডাশ্রেণীর) রক্তসম্ভূত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ভদ্র ও উচ্চতর সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন হয়। পাহাড়িয়া ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্যে বলিসহ শাক্তপূজা প্রচলিত আছে। আসামে বৈষ্ণব গুরুকে সত্রাধিকারী বলে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা প্রভৃতি সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোক সত্রাধিকারী হতে পারে। অস্পৃশ্যতা বা জলাচরণীয়তা সমতলভূমিতে নেই বললেই চলে। নিম্নতর জন-সমাজে সহজিয়া ভজন প্রচলিত আছে।

৮ই—১৪ই অক্টোবর—বেলা ৩টায় শিলংগামী বাসে চাপলাম। গৌহাটি থেকে দক্ষিণে যাচ্ছি। পাহাড়ের সানুদেশে প্রাক্তন চাকমানের কুলীরা ধান চাষ করেছে। দেড় হাজার ফুট পর্য্যন্ত গিরিগাত্রে কাছাড়িরা হলকর্ষণ দ্বারা ধান্যের আবাদ করে। পাহাড়ের গায়ে ডালা (Terrace) কেটে চাষ করে না। তার উপরে খাসিয়া বস্তি দেখা গেল। গৌহাটি থেকে শিলং পর্য্যন্ত পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম। বৎসরে প্রায় ৮২" ইঞ্চি। আমাদের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থাকল। তা প্রায় ৪৫০ মাইল পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা এবং ৫০ মাইল প্রশস্ত। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মধ্য আসামের গিরিমালা, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর থেকে যার আরম্ভ। যথাক্রমে গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড়, জয়ন্তিয়া এবং মিকির পাহাড়রূপে পূর্ব্বে প্রসারিত হয়ে হাফলং গিরিসংকটে এই গিরিমালা নেমে গিয়েছে। গারো-পাহাড়ের গিরিশ্রেণীগুলি সাধারণত ৩০০০ ফুট, খাসিয়া পাহাড়ের ৫০০ ফুট এবং জয়ন্তিয়া ও মিকির পাহাড়ের শৃঙ্গ-গুলি ৩০০ ফুট উদ্ধে্র্ব উঠেছে। তুরার (১৩০০ ফুট) নিকটস্থ নকরেক শৃঙ্গ (৪৬৫২ ফুট) এবং শিলং শৃঙ্গ (৬৫০০ ফুট উচ্চ) এই গিরিমালার মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত বায়ু সমান্তরাল গিরিসংকটগুলির মধ্য দিয়ে রেল ও মোটর রোড বিস্তারিত হ'তে পারে। ওরা সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে সংযুক্ত করবে। এদের মধ্যে মধ্যে বাঁধ দ্বারা জল আবদ্ধ করে তড়িৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

খাসিয়ারা পাহাড়ের গায়ে ডালা কেটে কদাচিৎ চাষ করে। উপত্যকার নিম্নাংশে অল্পবিস্তর ধান চাষ করে। কিন্তু মাল-ভূমির উপরে বা পাহাড়ের ঢালু গায়ে আলুর বিস্তৃত চাষ করে। খাসিয়া মালভূমির উপরে তৃণাচ্ছাদিত বড় বড় প্রান্তর আছে। কোথায়ও বা পাইন এবং রডোডেনড্রন গাছের কুঞ্জ আছে। মেঘ-মালা তাদের স্পর্শ করে যায়। নেপালীরা তার মধ্যে গোচারণ করে। ডালা কেটে ধান্যের আবাদ করবার অনুমতি নেপালীদের নেই।

শিলং শহরের কথা বিশেষভাবে লেখবার স্থানাভাব। শহরের জমিগুলি কতক খাস ব্রিটিশরাজের অধীন, কতক বা খাসিয়া সর্দ্দার সায়েমদের অধীন। খাসি পাহাড়ে এইরূপ বহু সায়েম আছে। শিলং শহর মালভূমির উপর স্থাপিত, সুতরাং খুব বিস্তৃত। এখানকার পোলো খেলবার মাঠ খুব প্রসিদ্ধ।

একদিন শিলং থেকে বাসে চেপে সকালবেলায় চেরাপুঞ্জি অভিমুখে রওনা হলাম। শিলং পাহাড়ের মিলিটারিপাড়া পার হয়ে দক্ষিণে শিলংএর সর্ব্বোচ্চ গিরিরেখা অতিক্রম করবার পর ক্রমে নীচে নামতে লাগলাম। আমাদের ডান পাশে তুরায় যাবার একটি পথ (Pony Road) ছেড়ে গেলাম। এ পথে ২।৩ দিনে তুরায় যাওয়া যায় শুনলাম। অতঃপর বাম ধারে শ্রীহট্ট যাবার পথ রেখে ডানধারেই আমাদের বাস ছুটতে লাগল। দু'একটি কয়লার খনি পার হয়ে শিলং থেকে প্রায় হাজার ফুট নীচে নেমে একটি মালভূমির উপরে চেরায় উপনীত হলাম। এটা খাসিদের একটা প্রাচীন রাজধানী ছিল এবং ইংরেজরা কিছুকাল একে রাজধানী করে রেখেছিল। তার পর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হবার পর শিলংএ রাজধানী স্থানান্তরিত করেছে। চেরাপুঞ্জি থেকে আরও ৩ মাইল নীচে যাবার পর সুরমা উপত্যকার উপরে বিখ্যাত মিকামাই জলপ্রপাত, দেখলাম। এটা উচ্চতায় বোধ হয় ১৮০০ ফুট হবে। এটা নাকি পৃথিবীতে উচ্চতায় তৃতীয়। এই জলপ্রপাত দেখেই এযাত্রার ভ্রমণ ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করলাম। এখানে শীতকালে এলে ২।৩টি বড় বড় ভীষণ গহ্বরও দেখা যায়। এখান থেকে মাঝে মাঝে মেঘের পর্দ্দা কেটে গেলে ৪০০০ ফুট নীচে ছবির মত সুরমা উপত্যকা দেখা যায়।

চেরাতে বৎসরে প্রায় ৬০০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। এখানে যে ২ দিন ছিলাম, তাতে তা বেশ টের পেলাম। এখানে ১০।১৫ ঘর বাঙালী কেরানী, ডাক্তার, মুদী, স্বর্ণকার আছে। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে একটি হাইস্কুল চালাচ্ছে। তাছাড়া তাঁরা শেলাতে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল ও বিভিন্ন পুঞ্জিতে (বস্তী) ১০।১২টি প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করছেন। এখানে শুনলাম খাসিপাহাড়ের বিভিন্ন পুঞ্জিতে প্রায় ২০টি বাঙালী খাসিয়ানী বিবাহ করে খাসিয়া সমাজে মিশে গিয়েছে। তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ বাঙালীদের প্রতি খুব আত্মীয়ভাবাপন্ন। কলিকাতার কেহ কি এঁদের ২।১টি সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারেন না? অদূরে ছাতকের অল্প একটু উত্তরে সবারপুঞ্জি নামে এক গ্রাম আছে। তথায় প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক বৈষ্ণব বৈরাগী এসে তুলসী পূজা, মালাধারণ ও কীর্ত্তন প্রচলন করেন। গ্রামের প্রধানদিগকে গয়া, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। বর্ত্তমানে তাঁর তিরোধানে ঐসব প্রাচীন স্মৃতিমাত্রই সবারপুঞ্জিবাসীদের মধ্যে আছে।

চেরার নিম্নে মহাদেবপুঞ্জি নামে আর একটি খাসিয়া গ্রাম আছে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসিদিগকে সিনটেঙ বলে। তাহাদের প্রধান শহর জোয়াইতে বসন্তকালে বিরাট নৃত্যসহ কালীপূজা খুব ধুমধামে সম্পাদিত হয়। একদা তারা খাসি-পাহাড় অধিকার করবার পর একটি সন্ধি করে ও খাসি সিনেটং শাখার সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাদেবপুঞ্জিতে একটি মহাদেবের মন্দির স্থাপনা করে। খাসিদের প্রধান উপাস্য হবে মহাদেব আর সিঙনটদের প্রধান উপাস্য মহাদেবের শক্তি কালিকাদেবী। উভয় শাখাই কালী ও মহাদেবের মন্দিরে উৎসবের সময় বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে জাতীয় একতা দৃঢ়ীকৃত করবে। ইতিমধ্যে ইংরেজ-আধিপত্য স্থাপিত হবার পর খাসিদের মহাদেবের প্রতি ভক্তি শিথিল ও বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে।

সিনটেঙ ও প্রাচীনপন্থী খাসিয়া মাথায় এণ্ডির পাগড়ি, গায়ে কোট ও পরনে ধুতি ব্যবহার করে। মেয়েরা দুইটি চাদর সেলাই না করে ঝুলিয়ে ব্যবহার করে। তারমধ্যে একটি ঘাগ্‌রা ও অপরটি জামার আকারে ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টান খাসিয়ারা ইউরোপীয় পোশাক পরে। মধ্য আসামে প্রতি ১০০০ পুরুষে ১০৬১জন স্ত্রীলোক আছে। খাসিপাহাড়ের সর্ব্বত্র খাড়াভাবে পাথরের চাঙাড় মাটিতে প্রোথিত দেখা যায়। তার সামনে আর একখানি পাথর পাটাতন আকারে মাটিতে পাতা থাকে। মৃতদেহ প্রাচীন পন্থায় পুড়িয়ে তার উপরে তারা এইরূপ স্মৃতিচিহ্ন রাখত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড় অধিকার করে।

১৫ই—আজ দুপুরে শ্রীহট্টগামী বাসে চেপে শিলং ছাড়লাম। দক্ষিণে পাহাড়ের প্রায় খাড়া ঢালু বয়ে বাস নামতে লাগল। ঢালুর নিম্নে ১২৫ মাইল লম্বা ও ৬০ মাইল প্রশস্ত সুরমা বা বরাক উপত্যকা। তার দক্ষিণে পুনরায় পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়ের গিরিরাজি। এতদঞ্চলে সর্ব্বত্র অতিবৃষ্টি হয়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু নির্ঝর, জলপ্রপাত ও সোপানময় জলবর্ত্ম (cascade) আর উপত্যকাগর্ভে নির্ঝরিণী।

বাঁধ দ্বারা বহু প্রপাত সৃষ্টি ক'রে এতদঞ্চলে বহুস্থলে তড়িৎ উৎপাদিত হ'তে পারে। এজন্য সস্তায় ডাইনামো, টার্বাইন ও মিটার আমাদের তৈরি করতে হবে। তবে এগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারব। খুব ঢালুতে একরূপ টার্ব্বাইন ও অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে গয়েরকাটার ন্যায় অন্যরূপ টার্ব্বাইন বসাতে হবে। এইরূপে আহৃত তড়িৎ রোপওয়ে (Rope way), কাগজের কারখানা, এঞ্জিন চালাবার উপযোগী কাঠ গ্যাস প্রভৃতি কারখানায় ব্যবহৃত হ'তে পারে। কয়লা, চুন, পেট্রোল, প্লাটিনাম, লৌহ, স্বর্ণ অল্পাবিস্তর এতদঞ্চলে পাওয়া যায়। প্রধানত কাঠ, আলু ও কয়লা এ অঞ্চলের বন ও কৃষিসম্পদ। এই সব শিল্প চালাবার জন্য যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তার অধিকাংশ ডিজাইন দিলে কলিকাতাস্থ বাঙালীদের কারখানায় তৈরি করে নেওয়া যায়; তবে নূতন নূতন জিনিস কতটা ঘাতসহ হবে তা বিশেষ বিবেচনা ক'রে নিতে হবে। বর্ত্তমান লেখকদের পরিচালিত চাষের খামারে ভারতীয় দ্বারা প্রস্তুত ডিসেল এঞ্জিনই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মধ্যপথে জোয়াইগামী পথটি বামে রেখে গেলাম। জোয়াই খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত একটি মহকুমা, জয়ন্তিয়ার প্রধান শহর। মেঘের আড়াল ও বৃষ্টিহেতু চতুর্দ্দিকের অতুলনীয় দৃশ্যাদি প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল না। খাসিয়া পাহাড়ের পরে জয়ন্তিয়ার পাহাড়গুলি খুব নীচু (৩০০০ ফুট) হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা ডাউকি অতিক্রম ক'রে সমতলভূমির উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। অল্প পরে জয়ন্তিয়াপুর নামে একটি থানা পার হলাম। এর অদূরে জয়ন্তিয়া রাজাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এই রাজধানীতেই এক সভাপণ্ডিত দ্বারা খুব সম্ভবত কালিকাপুরাণ লিখিত হয়। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বরাক বা সুরমার দুই (?) তীরে অবস্থিত শ্রীহট্টে এসে রেলগাড়ীতে চাপলাম। কুলাউড়ায় গাড়ী বদল ক'রে রাত্রি প্রায় ১টার সময় বদরপুরে অবতরণ করলাম। যেমন গরম, তেমনি মশা। কোনরকমে রাত কাটিয়ে সকালে লুমডিং (Lumding) অভিমুখী গাড়ীতে পুনরায় আরোহণ করলাম।

১৬ই—গাড়ী একটু পরেই সেতুর উপর দিয়ে বরাক পার হ'ল। জল ঘোলা, নদী স্রোতস্বিনী। পুল পার হবার সময় শেষ কাছাড় রাজাদের একটি ভাঙ্গা কেল্লা দেখলাম। এখনও শেষ কাছাড় রাজার এক কন্যামাত্র জীবিত আছে শুনলাম। ২।৩টি স্টেশন পার হবার পর উত্তর বা পার্ব্বত্য কাছাড়ে প্রবেশ করলাম।

কাছাড় জেলার সমতলভূমিতে মুসলমান চাষী বেশী। পাহাড়ের পাদমূলে কাছাড়ী ও চাকামানের প্রাক্তন কুলী চাষী বেশী। কিছু কিছু মণিপুরী কৃষকও আছে। ব্রিটিশ বা সুরমা উপত্যকায় ৮৪ হাজার মণিপুরী কৃষক আছে। তন্মধ্যে ১৩ হাজার মুসলমান এবং ৭১ হাজার হিন্দু। কিছু পরে বরখোলা স্টেশন পার হলাম। এর অদূরে শেষ কাছাড় রাজধানী ছিল। তারপর জাটিংগ কল্লোলিনীর উপত্যকা বয়ে গাড়ী চলতে লাগল। জলস্রোত প্রায় ৫০ ফুট প্রশস্ত ও ৩।৪ ফুট গভীর। বর্ষায় এই জলস্রোত প্রায় ৪ গুণ প্রশস্ত হয়। জলস্রোতের তীর ভাগে ২০০।৩০০ গজ প্রশস্ত হলকর্ষিত ধানের ক্ষেত; বোধ হয় বলিয়া জেলা থেকে আগত রেলের কুলীরা ওর উপর হল কর্ষণ প্রবর্ত্তন করে, তারপর কাছাড়ীরা ধীরে ধীরে তা সুবিধা মত স্থানে অবলম্বন করছে। আর দু'ধারের পাহাড়ের মাথায় মাথায় কাছাড়ীদের জুম ক্ষেত্র। এই হাবলং খাদে কালাজ্বর, ব্লাক ও আটার এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী।

**হাফলং (প্রায় ২৫০০ ফুট)—সকাল বেলা ১০টায় হাফলং হিল নামক স্টেশনে অবতরণ করলাম।** পুলিস খাতা এনে নাম, ধাম ও কদিন থাকব লিখে নিলে। এক মাসের বেশী থাকতে হ'লে বাৎসরিক ৫, টাকা হিসাবে মুণ্ড কর দিতে হয়। এই নিয়ম বোধ হয় আসামের সমুদয় excluded areaতে পরিপালিত হয়।

স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে প্রায় ৫০০ ফুট উপরে হাফলং শহর। শহরের মধ্যদিয়ে নানা শাখা বিশিষ্ট একটি ঝিল। কয়েকটি টিলার মধ্যস্থ খাদে বাঁধ দিয়ে সেটি তৈরী হয়েছে। হাফলং শহর ঐ নামের বা উত্তর (পার্ব্বত্য) কাছাড় মহকুমার প্রধান শহর। এখানে মহকুমার কাছারী পুলিস অফিস এবং এ বি রেলের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস বিদ্যমান। সেজন্য প্রায় ৫০ ঘর কেরানীর মধ্যে প্রায় ৩০।৩৫ ঘর বাঙালী পরিবার আছে। বাকী ১০।১৫ ঘর বাঙালী মুসলেমান। বাজারটি বেশ বড়। ৩০।৪০খানি দোকান আছে। তার মধ্যে মারোয়াড়ী ২ ঘর, পাঞ্জাবী ২ ঘর, হিন্দুস্থানী ও বাঙালী মুসলমান ৫।৭ ঘর। একজন কাবুলীওয়ালা কাপড় বেচতে এসে রেলের ও সরকারী কনট্রাকটারি ক'রে ২।৪ লাখ টাকার মালিক হয়েছেন। এদেশেই সিলেটী ও কাছাড়িনী বিবাহ ক'রে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। তাঁর কৃত মসজিদটি বেশ বড়। এখানকার Grove-land হোটেলটির মালিক তিনি। খাবার সমেত চার্জ্জ ৪, টাকা থেকে ৮, টাকা। নিজে রাঁধবার ব্যবস্থা করলে দৈনিক ২,।১, টাকাতেও শয়ন ঘর ও রান্নার জায়গা পাওয়া যেতে পারে। এখানে বাজারে ২০।২৫ ঘর বাঙালী দোকানদার আছে। তার মধ্যে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ নেতৃস্থানীয়। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যের উপদেশ মত এতদঞ্চলে বসবাস ও শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বয়স বর্ত্তমানে প্রায় ৭৫ বৎসর। এখানে তিনি ৩।৪টি সর্ব্বজনীন মন্দির, একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল, এবং ১টি বাঙলা প্রাইমারী স্কুল স্থাপনা ক'রে চালাচ্ছেন। মধ্য ইংরেজী স্কুলে একজন বঙ্গভাষী কাছাড়ী গ্র্যাজুয়েট হেড মাষ্টার। মাঝে স্কুলে কয়েকটি হাই স্কুলের ক্লাসও স্থাপনা হয়েছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উৎসাহ দেন না। এর বোর্ডিংএ ১০।১২জন গরিব কাছাড়ী ও কুকী ছাত্র বাড়ী হ'তে চাল ডাল নিয়ে এসে নিজেদের ব্যয় সংকুলান করে। এতদঞ্চলের হাফলং, ডিটকছড়া, হারাংজাও, মাহুর, মাইবং, লাংটিনে সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা তার ৪৫ বৎসর ব্যাপী প্রচারের ফলে হচ্ছে শুনলাম।

এখানে কাছাড়ী, কুকী ও নাগারা জুম প্রথায় ধান, তুলা, আলু প্রভৃতি আবাদ করে। তারা ঘর পিছু ২, টাকা ট্যাক্স দেয়। জমির খাজনা নেই। নেপালীরা গো-পালন করে। শহরে কয়েকজন বাঙালী চাপরাসীও বাড়ী বাড়ী গো-দুগ্ধের যোগান দেয়। একজন পাঞ্জাবী শিলং হ'তে হাফলং পর্যন্ত স্থানে স্থানে গোষ্ঠ স্থাপনা ক'রে প্রায় ৫০০০ হাজার গাভী পালন করে। অতিরিক্ত পুং বৎস তাঁর আর্থিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এগুলি দামড়া ক'রে সমতল ভূমিতে শকট ও চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি কোনও গভর্নমেণ্ট-ফার্ম্ম এগুলি কিনে নিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। নেপালীরা হল কর্ষণ বা ডালা কেটে অথবা জুম ইত্যাদি দ্বারা ধান বা কার্পাস চাষের অনুমতি পায় না। কাছাড় জেলায় প্রায় ২০ হাজার কাছাড়ী বাস করে, তার অধিকাংশই এই হাফলংএর অধিবাসী। পাহাড়ী কাছাড়ীদের গ্রামে গ্রামের মণ্ডল একদিন চাউল ইত্যাদি থালায় সাজিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে নারায়ণ পূজা করে। এখানকার সার্কিট হাউস বা সরকারী বাঙ্গলোর উপরে উঠলাম। সেখান থেকে দূরদূরান্তের পাহাড়ের মাথায় পাহাড়িয়াদের জুম শোভিত বহু বস্তি দেখলাম। রেল গাড়ী থেকে খাদের গায়ে এত দেখা যায় না। এক এক বস্তিতে ২০।২৫খানি খড়ের ছাউনি; এক একটি পাহাড়ের মাথার উপরে অবস্থিত। এক বস্তি অপর বস্তি থেকে বহুদূরে অবস্থিত। মাঝে বিরাট বন, খাদ ও পাহাড় ব্যবধান। আমাদের পূর্ব্বদিকে বরাইল গিরিমালা। তার সর্ব্বোচ্চ শিখরের

নাম মহাদেব টিলা, সেখানে মহাদেবের এক মন্দির আছে। কেউ কেউ বলেন, রেলপথ প্রস্তুতের সময় বা তার পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তা স্থাপনা করেছে। কিন্তু অত দুর্গম ও মেঘচুম্বী শিখরে উঠে সেখানে শিব পূজায় যাতায়াত করা তাহাদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই বরাইল গিরিমালার নানা শিখরের উপর দিয়ে মৃৎ-নির্ম্মিত বহু দুর্গের একটি শৃংখলা অবস্থিত আছে। ইহা জয়ন্তিয়া, মণিপুর বা কাছাড় রাজাদের সন্ধি স্থাপন ও দেশরক্ষার নিশান হতে পারে। মহাদেব টিলা সেই সময়ে নির্ম্মিত কোন মন্দির হওয়াই খুব সম্ভব, যেমন খাসিয়া পাহাড়ের মহাদেব পুঞ্জি এক যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপনের সর্ত্তমত নির্ম্মিত হয়েছিল।

হাফলংএ মিশনারীদের একটি কনভেন্ট স্কুল আছে। সেখানে মেয়েরা ম্যাট্রিক ও আই এ পর্য্যন্ত পড়তে পারে।

হাফলং হ'তে বরাইল গিরিমালা ভেদ ক'রে নাগা পাহাড়ের প্রধান শহর কোহিমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বগামী একটি পায়ে চলা পথ আছে। আর পশ্চিমে শিলংগামী ঐরূপ আর একটি পথ আছে। এই পথের ১৬ মাইল দূরে গঞ্জুর, সেখানে সরকারী বাংগলো আছে। সেখান থেকে ৪৪ মাইল দূরে মিকির হিল বা নওগাঁ জেলাস্থিত গরম পানি। এই স্থানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তার ব্যাধি উপশম করবার খ্যাতি আছে। সেখান থেকে জোয়াই, তারপর শিলং।

১৯শে—বেলা ১২টার সময় পুনরায় রেল ধরলাম। লোয়ার হাফলং বা হাফলং টাউন স্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী থামল। খুব সকালে গাড়ীখানি বদরপুর ছেড়েছে। রাত্রিতে লুমডিং পৌঁছাবে। সারাদিনের মধ্যে এখানেই খাবার সেরে নিতে হয়। এখানকার বাঙালী হোটেলে ভাত, লুচি, চা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এ লাইনে স্টেশনে স্টেশনে বড় বড় পেঁপে কলা আনারস ও টক কমলানেবু পাওয়া যায়।

মাইবং ষ্টেশনে প্রবেশ পথে ইটের গাঁথুনী ভাঙ্গা দেওয়াল দেখা যায়। তা বরখোলার পূর্ব্বে কাছাড় রাজাদের রাজধানী ছিল। উহাদের ধ্বংশাবশেষ হ'তে সংগৃহীত দুইটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্টেশনের বারান্দায় দেখলাম। হাফলংএর ইঞ্জিনিয়ারিং কাছারি বাড়ীর বারান্দায় এরূপ দুইটি মূর্ত্তি অবস্থিত। এখন কোনও মিউজিয়ামে তাদের বোধ হয় স্থানাভাব। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ ও ঢাকা বা কলিকাতার কোন মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের এগুলি সংগ্রহ করা উচিত। কারণ কাছাড়ীরা বঙ্গভাষী এবং বাঙলার প্রতি আত্মীয়ভাবাপন্ন। মূর্ত্তির হাতের মুঠো থেকে আভূমিলম্বিত একটি কৃপাণ। হাতে বালা, বাহুতে বাজু, গলায় মালা, মাথায় চুলের ঝুঁটি আর পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা মাল কোঁচা মারা ধুতি। একটি বোধ হয় ৪ ফুট ও অপরটি বোধ হয় ৫½ ফুট লম্বা। মাইবং স্টেশন ছাড়বার অনতিকাল পরে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কালী মন্দির দেখা গেল। প্রস্তর নির্ম্মিত হলেও উহার ছাদ বাঙলার চার চালা আকারে ঢালু। এও কাছাড় রাজাদের কীর্ত্তি।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। আমরা হাতিখালি স্টেশন পার হলাম। এখানে কাছাড় জেলা শেষ হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নওগাঁ জেলার আরম্ভ। সুরমা উপত্যকার বদরপুর হ'তে লুমডিং পর্য্যন্ত ১১৫ মাইল। এ পথের দু'ধারে শ্যাম বনানী শোভিত গিরি-রাজি। সর্ব্বোচ্চ শিখরগুলি অভ্রচুম্বী। তার মধ্য দিয়ে সারা-দিন ছুটে গাড়ী ৩০।৩৫টি সুড়ঙ্গ (টানেল) পার হ'ল। রাত্রি সাড়ে আটটায় আমরা লুমডিংএ এলাম। আমাদের গাড়ীতে চ'ড়ে একদল মুসলমান কৃষক তাঁদের শ্রীহট্টের প্রাচীন বাসস্থান ও আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা ক'রে যমুনার দিকে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধের সেখানে দরজীর দোকান আছে; নিকটেই দুটি ছেলে সেখানে জমি চাষ করে; আর ছোট দুটি ছেলেও তার স্ত্রী দোকানেই তার সংগে থাকে। এই পথে প্রতি গাড়ীতেই এইরূপ বহু পরিবার আসামের নওগাঁ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যাচ্ছে। এদের মধ্যে শতকরা ৫জন বোধ হয় দাশ ও নমঃশ্রেণীর হিন্দু কৃষক।

লুমডিংএ খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা গাড়ীতে চেপে রাত্রি ১০টার সময় মণিপুর রোড স্টেশনে নামলাম। উদ্দেশ্য পরদিন মণিপুর যাত্রা। এই স্টেশনের পূর্ব্ব নাম ডিমাপুর। এখানে মণিপুর রোডের মাইল খানেকের মধ্যেই কাছাড়ী রাজাদের প্রাচীন রাজধানীর দেওয়াল ও গেট দেখা যায়। মহাস্থান গড়, পাহাড়পুর প্রভৃতিতে যেমন টালি ইট দেখা যায়, এখানেও তাই ব্যবহৃত হয়েছে। কোঁচ রাজাদের অভ্যুত্থানে কাছাড় রাজারা তাঁদের রাজ-ধানী কামরূপ হ'তে পূর্ব্ব আসামে এই ডিমাপুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তার পর আহোম আক্রমণে এখান থেকে যথাক্রমে মাইবং তার-পর বারখোলা। তারপর খাসপুরে (শিলচরের নিকট) তাদের রাজ্য অপসারিত করে। আমরা যে পথে এলাম সেই পথে বিপরীত গতিতে তারা তাহাদের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তার পর অবশেষে খাসপুরের শেষ কাছাড়ী রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নিকট থেকে ইংরেজেরা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কাছাড় জেলা অধিকার করে।

## প্রতীক্ষা

( ৮৫৬ পৃষ্ঠার পর )

"তা তো জানি না সাহেব। আহা মেয়েটি বড় ভাল ছিল। কাল খোকা সাহেবের জন্যে একটি আনারস দিলে, বলতেও হ'ল না।"

"খোকা সাহেব? সে কে?"

"কাল সাহেব যাকে কোলে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিলেন; তাকে দেখেই তো বংশী আমায় ডেকে বললে, 'সাহেবের ছেলে বুঝি?' আমি হ্যাঁ বলতে তখন বললে, 'বেশ তো! এই আনারসটা নিয়ে যাও ওকে খেতে দিলুম'।"

মোহনের মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল। মুহূর্তেই তাহার চেহারা অদ্ভুতভাবে বদলাইয়া গেল। পাগলের মত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "এত বোকা তুই, ইব্রাহিম। ও যে পাশের বাড়ীর ছেলে। বংশী আর কি বললে?"

"আপনি বিয়ে করেছেন কি না, কটি ছেলে মেয়ে, জানতে চাইলে।"

মোহন বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। "বড় ভুল করেছিস ইব্রাহিম, বড় ভুল।" মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়, কিন্তু বংশীর আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। মোহন যথারীতি রোজই মার্কেটে যায় তার পর কর্ম্মান্তে সেই পুরাতন বটগাছের তলাটিতে বসিয়া সারা সন্ধ্যা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আপন মনেই অশ্রু বিসর্জন করিয়া যায়, কত দিন ভোর হইলে তবে সে বাড়িতে ফিরিয়াছে। বংশী কি এতই নিষ্ঠুর? সে কি আর ফিরিয়া আসিবে না?

# নন্দা

( উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি )

**শ্রীঅমিয়া সেন**

( ৯ )

সুবীর লিখিল, 'চেষ্টা করিব, তবে এত শীঘ্র পারিব না'।

নন্দার কাছে কিছুই লিখিল না; কিন্তু না লিখিলেও নন্দা স্বামীর চিন্তাক্ষুব্ধ নিরুপায় মনের গভীর মর্ম্ম-বেদনার অলিখিত লিপি আপনার মনের অনুভূতি দিয়াই পাঠ করিতে পারিল। ভাগ্যহত স্বামীর জন্য তাহার অন্তরের চিরন্তন হাহাকার তাহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। সে-ই একটিমাত্র লোক, যে এতগুলি লোকের ভাবনা ভাবিয়া সারা হইতেছে। কিন্তু তাহার কথা কেহ ভাবে না। সেও যে অন্য পাঁচজনের মত রক্ত মাংসের মানুষ, তারও জীবনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্য সকলের মতই আছে, একথা কাহারও মনে জাগে না।

নন্দার মন বিদ্রোহী হইতে চায়। ক্ষণেকের জন্য একটা অভিশপ্ত প্রার্থনা তার ঠোঁটের সংঘাতে কাঁপিতে থাকে, "হে ভগবান, তার এ কেরানীগিরিটুকু তুমি কাড়িয়া লও, সকল দিক দিয়াই সে কর্ম্মহীন হইয়া এইখানে ফিরিয়া আসুক। মাত্র তাহা হইলেই সংসারের শত প্রয়োজনের জ্বালায় তাহার জীবনটি আর জ্বলিয়া যাইবে না। নন্দা একবেলা শাকান্ন খাইয়া তার সেবা করিয়া ধন্য হইবে। সেই জীবনানন্দকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলে নন্দার দুঃখের পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিবে। নন্দার জীবনে আর কোনও উচ্চকাঙ্ক্ষা নাই। এ অন্তঃসার শূন্য বনেদী ঠাট ধ্বংস হউক, নন্দা সমস্ত জগতের সম্মুখে তাহার স্বামীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিবে, তাহার স্বামী দরিদ্র।

কিন্তু উদ্যত রসনাকে নন্দা পরমুহূর্ত্তেই সংযত করিয়া আনে; ছি ছি, নিজের সুখের লোভে যে এতগুলি লোকের দুঃখ ডাকিয়া আনিতে চায়, কি স্বার্থপর সে!

নন্দার চোখ পড়ে অমিতার দিকে। অমিতা আরও শুকাইয়া যাইতেছে। নন্দার হতাশ বুকের ভিতর নানা চিন্তা তরঙ্গায়িত হইয়া ওঠে। এ মেয়েকে সে কি করিয়া বাঁচাইবে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে থাকে। কিন্তু উপায় নাই; অথচ নন্দাও না ভাবিয়া পারে না। নিজের বুভুক্ষিত অন্তরের দিকে চাহিয়া অমিতার প্রতি সমবেদনায় তার মন ভরিয়া ওঠে। অমিতার প্রেম সার্থক হউক, অমিতার জীবন ধন্য হউক, সমস্ত অন্তর ভরিয়া তার এই প্রার্থনাই অনুরণিত হইয়া ফিরিতে থাকে। যামিনী তো মেয়ের অবস্থা দেখিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠিলেন যে, দেবনারায়ণ আর থাকিতে না পারিয়া অবশেষে নিজেই একদিন সুবীরের নিকট রওনা হইয়া গেলেন।

এবার নন্দা বিবাহ সবন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই যামিনীর নিকট আসিয়া কহিল, "মা, বাবা আমাকে যে বাড়তি গয়নার সেটটি দিয়েছিলেন, সেটা আমি সম্পূর্ণই অমিতার জন্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি কলকাতায় লিখুন, মাত্র বিয়ের খরচটা যেমন করে হোক যোগাড় করতে। বরের বোতাম আর আংটির জন্যেও আমার হাতের দুই গাছা চুড়ি খুলে দিচ্ছি, আপনি সেকরা ডেকে গড়াতে দিন।"

যামিনী মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এই ভাবনাটি মনে মনে তাঁহাকেও অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল। গয়নার খরচও আজকাল দুর্ম্মূল্যের বাজারে বড় কম নয়। এই খরচটা যদি এমনি বিনা খরচে চলিয়া যায়, সেটাও বড় কম লাভ নয়। তা ছাড়া সুবীরকে যদি গয়নার ভারও নিতে হইত, তাহা হইলে ওদিকে খরচ সংক্ষেপ হইয়া বিবাহের সৌষ্ঠবের হানি হইত এবং গয়নাও অত্যন্ত ঠুনকো হইত সন্দেহ নাই। নন্দার গয়নাগুলি বেশ ভারী ও টেঁকসই। নন্দার বাবা মেয়েকে যা দিয়াছেন, সাচ্চা জিনিসই দিয়াছেন, মেকী দিয়া ঠকান নাই।

আজ সর্ব্বপ্রথম যামিনী বৈবাহিক তথা বৈবাহিক কন্যার প্রতি মনে প্রাণে প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুখে তাহা সরাসরি স্বীকার করিতে তাঁর বনেদী ঠাটে বাধিল। ঈষৎ গম্ভীর মুখে কহিলেন, "না না, তা কি হয়! তোমার গায়ের গয়না খুলে নিয়ে আমি মেয়ের বিয়ে দেব, ছি!"

নন্দার বড় দুঃখেও হাসি পাইল। হায় রে, এখনও সেই আভিজাত্যের অহঙ্কার। নন্দার জিনিস নিতে বাধিবে, কিন্তু নন্দার স্বামীকে পেষণ করিতে বাধিবে না। নন্দার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে, ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, তাঁকে তোমরা একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও। নন্দা কি করিবে এই গহনা দিয়া, তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারই যদি তোমাদের পায়ের চাপে ধুলায় ধুলা হইয়া লুটাইতে থাকে! নন্দার সর্ব্বস্ব লও, শুধু তাঁকে একটু শান্তি পাইতে, একটু স্বস্তি পাইতে দাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "না মা, এ আপনাকে নিতেই হবে। নইলে হয়তো বেশী টাকার দায়ে পড়লে এ বিয়েই বন্ধ হয়ে যাবে।"

যামিনী কহিলেন, "তা তো বুঝি বাছা, তবে তোমার গায়ের গয়না নিয়ে মেয়ে বিয়ে দিলে লোকেই বা বলবে কি, আর সুবোই বা কি মনে করবে। আর থাক, পাঁচ শরিকের গুষ্ঠিরাই তো দেখে শুনে আনন্দে হাততালি দিতে থাকবে, তাই বা কি করে সইব?"

নন্দা তেমনি দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার গয়না আমি স্বেচ্ছায় দিচ্ছি, এতে কারুর কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করি নে।"

যামিনী কোনও কাজে গলদ রাখিতে চান না। কহিলেন, "কিন্তু সুবো,—"

নন্দা অবিচলিত ধৈর্য্যে কহিল, "তাঁকে না জানালেই হবে।"

যামিনী বোধ হয় এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিলেন। প্রসন্ন মুখে কহিলেন, "কিন্তু তোমার গায়ের গয়না আমার যেন মোটেই ইচ্ছে করছে না।"

"কিন্তু ঠেকা হলে লোকে করে কি।"

একটু ভাবিয়া নন্দা আবার কহিল, "তা ছাড়া আমার তো অনেক আছে।"

"তা বটে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আরও হোক।"

নন্দা নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া আসিল, মনে মনে কহিল, ভগবান তো কালা।

প্রমীলা কহিল, "দিদি, কি ভাবছ?"

নন্দা হাসিল; কহিল, "ভাবছি ভগবানের কি কান আছে।"

প্রমীলার কষ্ট হইল। মনে মনে কহিল, বোধ হয় নেই, বেটা কালা। মুখে কহিল, "তোমার সন্দেহ আছে?"

প্রমীলা সহসা দু হাত বাড়াইয়া নন্দার গলা জড়াইয়া ধরিল। মিনতি করুণ স্বরে কহিল, "দিদি, কেন এমন করে তোমরা নিজেদের কষ্ট দিচ্ছ?"

নন্দার চোখের পাতা নিমীলিত হইয়া আসিল। কহিল, "কি করব বোন!"

প্রমীলা নন্দার কানের কাছে মুখ নিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "করবে? আমি যা বলব, করবে?"

নন্দা চুপ করিয়া রহিল। প্রমীলা কিন্তু নিরুৎসাহ হইল না, তেমনি স্বরে কহিল, "চলে যাও; এ সমস্ত ভূতের বোঝা, দায়িত্বের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাও তোমরা। তোমাদের জীবনকে সুন্দর কর, সার্থক কর।"

নন্দা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ছি, ছি, এমন চিন্তাতেও যে পাপ। ওরে পাগলী, তা হলে যে তুইও মরবি!"

প্রমীলা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তুড়ি দিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ফুর-র-র, তাই মনে করছ নাকি? আমি তোমার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বধূ কোনও কালে হব না। তুমি যদি যাও, সঙ্গে সঙ্গে আমিও এখান থেকে পিটটান। এ ভূতের গোষ্ঠী মরুক আর বাঁচুক।"

নন্দা তার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "এমন কথা বলতে নেই প্রমীলা, এমন ভবিষ্যৎ একদিন তোমার আমারও আসবে।"

প্রমীলা সজোরে নন্দার হাতখানা সরাইয়া দিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তা আসতে পারে, কিন্তু তাই বলে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে দুর্গতির দোহাই দিয়ে আমরা কখনও এমনভাবে সন্তানের আশা আনন্দকে, যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করব না। তাদের জীবনকে সার্থক হবার, সফল হবার সুযোগ দেব আমরা। প্রত্যেক বাপ মার কর্ত্তব্যই তাই। জন্মদানের দোহাই দিয়ে সন্তানের আনন্দিত জীবনটাকে বেঁধে রাখবার অধিকার কোনও বাপ মারই নেই।"

নন্দা স্থির চক্ষে তার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি পারতে?"

প্রমীলা তেমনি জোরের সঙ্গে কহিল, "হ্যাঁ, পারতাম, নিজের কথা ভেবে না হক, অন্তত স্বামীর দিকটা চিন্তা করেও আমি পারতাম।"

"তা হলে এই যে তুমি খানিক আগে বলেছিলে, আমি চলে গেলে তুমিও আর থাকবে না, তখন তুমি স্বামীর কথা ভেবেছিল?"

প্রমীলা এক মুহূর্ত্তে শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নন্দার চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপরই অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে কহিল, "তুমি ভুল বুঝেছ দিদি, আমার স্বামী আর তোমার স্বামীর সম্বন্ধে এক কথা তো খাটে না।"

নন্দা বিস্মিত হইয়া কহিল, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, তোমার স্বামীর তোমাকে প্রয়োজন তাঁর দুঃখ-দুর্দ্দশার অংশ নিতে, তাঁর শ্রমকাতর মুখে একটু হাসি ফোটাতে, তাঁর অন্ধকার জীবনের হতাশায় নির্ভর হয়ে পাশে দাঁড়াতে, তোমার বুকের ভালবাসায় তাঁর দেহ মনের শক্তি অটুট রাখতে। আমার স্বামীর তো এর কোনটারই প্রয়োজন নেই। আমার স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তার বালাই নেই, শ্রম তো নেই-ই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলেও সেদিকে তাকাবার তাঁর চোখ নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে হতাশাও নেই। আর তার কাছে আমার প্রয়োজন শুধু স্ত্রীত্বের খাতিরে সহধর্ম্মিণীর গৌরবে নয়।"

প্রমীলা মুখর রসনা নীরব হইয়া আসিল দীপ্ত আঁখি-তারকা জলের ভারে আপনাতে আপনি নত হইয়া আসিল। নন্দা এতদিনে বুঝিল, তাহার উপর কেন প্রমীলার এত সমবেদনা। তাহার মনের বেগ কেন এমন উচ্ছ্বল, নির্ম্মম। প্রমীলার প্রথম কথাগুলোও তার কানে বাজিতেছিল। সুবীরের কষ্ট সে নিজেও এতদিন এমন করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। আজ প্রমীলা যেন তাহার চোখে আঙ্গুল দিয়া তার চোখের সম্মুখে ছবির মত সব দেখাইয়া দিল।

প্রমীলার বেদনা নন্দার বুকের মধ্যে একটা নূতন ক্ষতের সৃষ্টি করিল, নিজের দুঃখের সহিত প্রমীলার দুঃখ আসিয়া মিলিল। নীরবে প্রমীলার হাত দুইখানা ধরিয়া সে বেদনা-কাতর মনে চোখ বন্ধ করিল।

( ১০ )

অমিতার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার অভীপ্সিত পাত্রেরই সহিত।

কি ভাবে হইল, অর্থ এবং সামর্থ্যই বা সুবীর কোথা হইতে সংগ্রহ করিল, সেসব কথা এখন থাক। অমিতার প্রেম সংসারে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার সুন্দর সমাপ্তি ঘটিল, সে সুখী হইল। সুবীর এবং নন্দা নিজেদের জীবনব্যাপী বিফলতার বেদীর উপর দিয়া অমিতার জীবনকে আনন্দ এবং সফলতার তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। সংসারে এমনিই হয়। একজনের জীবনের মূল্যে আর এক-জনের জীবন মূল্যবান হয়, একজনের চোখে অশ্রু ঝরাইয়া আর একজনের মুখে হাসি ফোটে।

শত নিরাশার অন্তরালেও নন্দার মনে যে আশার দীপটি এতদিন মৃদু তেজে জ্বলিতেছিল, এবার এই বিবাহে সুবীরের দেনার পরিমাণ আন্দাজ করিয়া তাহার সে আশার দীপটি একেবারেই নিবিয়া গেল। মনের অপরিসীম বেদনা আর হতাশা তাহার এত দিনের তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত দেহটাকে এবার একেবারেই ভাঙ্গিয়া আনিল। কিন্তু তবুও নন্দা সংসারকে তাহার দেহ মনের এত বড় বিপ্লবের ইতিহাস জানিতে দিল না, রোগ এবং চিন্তাক্লিষ্ট তনু মন লইয়াই সে নীরবে যন্ত্রের মত সংসারের প্রয়োজন মিটাইয়া চলিল।

প্রমীলা সন্তানসম্ভবা হইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছে, সুতরাং তাহার দিক হইতেও কোনও অনুযোগের বালাই নাই। অথচ নন্দা সত্যই আর পারে না। শ্রান্তিতে তার দেহ অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িতে চায়, মন চায় একটু সমবেদনা-পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু তা কি আর নন্দা এ জীবনে পাইবে।

মাঝে মাঝে তাহার মন সহসা ব্যাকুল হইয়া ওঠে। বাবা—আমার বাবা! নন্দার কান্না পাইয়া যাইত। বাবা, একবার যদি এখন বাবার কাছে যাইতে পাইতাম। শরীর যত দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার মনে ওই একটি মাত্র চিন্তাই পিপাসার্ত্তের পানীয় চিন্তার মত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্বর তাহার প্রায় প্রত্যহই হয়, বুকেও একটু একটু বেদনা আছে।

সংসারের এই কোলাহল, এই বহুজনের ভিড়, এ সব তার আর ভাল লাগে না, তার মানস দৃষ্টির সম্মুখে কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া ওঠে। বাবার সেই ছবির মত সুন্দর আর শান্তি-ময় ভবনখানি, বাড়ির সামনেই দু ধারে রেলিং ঘেরা ফুল-বাগান, সেই বাগানের সামনের বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া তাহারা পিতাপুত্রী কত নীরব সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছে। সেই বাড়ি, বাড়ির সেই নীরব শান্তির জন্য নন্দার মনটি হাহাকার করিয়া মরিতে লাগিল। এত দিনের তিলে তিলে সঞ্চিত বেদনা অবশেষে একদিন নন্দাকে একেবারেই শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। আর্থিক ও দৈহিক সকল প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনায় এইবার যামিনী বিপদ গনিলেন।

দেবনারায়ণ গ্রামের একমাত্র ডাক্তার হরিবাবুকে একদিন ডাকিয়া আনিয়া নন্দাকে দেখাইলেন। কোনও রকম ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করা না হইলেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে হরিবাবু এইটুকু বুঝিলেন যে, রোগ সহজ নহে এবং নূতন নহে। বহুদিনের প্রচ্ছন্ন ব্যাধি এবার শক্তিশালী এবং প্রবল হইয়াই রোগিণীর দেহ আক্রমণ করিয়াছে।

দেবনারায়ণ ও যামিনী সমস্ত শুনিয়া শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের হাতে এমন অর্থ নাই, যাহা দ্বারা নন্দার বিধিমত চিকিৎসা হইতে পারে। আবার সময়ে চিকিৎসা না হইলে রোগিণীর অবস্থা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা অনুমান করাও কঠিন নহে। যামিনী পরামর্শ দিলেন, নন্দার পিতাকে লিখিয়া দেওয়া হউক, তাঁহারা মেয়ে লইয়া যান! কিন্তু গৃহিণীর চিরদিনের আজ্ঞাবহ দেবনারায়ণের মন আজ এ যুক্তিটাকে মানিয়া লইতে পারিল না। দীর্ঘদিন নিজেদের প্রয়োজনের অজুহাতে যে বধূকে তাঁহারা তাহার পিতৃগৃহে যাইতে দেন নাই, আজ তার জীবনের এই সংকটাপন্ন মুহূর্ত্তে শুধু অর্থব্যয় ও শুশ্রূষা করার ভয়ে তাহাকে ঠেলিয়া দেওয়া অত্যন্ত হৃদয়হীনের কাজ।

তা ছাড়া এত দিন পরে দেবনারায়ণের মনে একটি নূতন চিন্তা জাগিল। সুবীর, তাঁহাদের ছেলে, নন্দার স্বামীই বা কি ভাবিবে। নন্দার পিতার কাছে লেখার চেয়ে বরং সুবীরের কাছে সংবাদ পাঠানো হউক। তিন বৎসর হইল সে বাড়ি আসে নাই, কোনও সূত্রেই কেহ তাহাকে আনিতে পারে নাই। এবার স্ত্রীর অসুখ শুনিলে যদি আসে। যামিনী এবার কি ভাবিয়া স্বামীর কথায় বেশী প্রতিবাদ করিলেন না, হয়তো বহুদিন পরে প্রবাসী পুত্রকে দেখিবার আশাতেই করিলেন না।

রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া নন্দার দুঃখপূর্ণ দিন রজনী যেন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। এবার এই যে সে শয্যা লইল, এ শয্যা ছাড়িয়া ওঠার শক্তি যে তাহার শীঘ্র হইবে না, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল। এবং ইহাও বুঝিতেছিল যে, সেইজন্যই সে এই গৃহবাসীদের অনাবশ্যক বিরক্তিকর বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বুঝিলেও সে আজ সকল দিক দিয়া নিরুপায়, আর তো তাহার শক্তি নাই। কিন্তু মনটি যেন পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে সে কেবলই ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, 'আর আমি সইতে পারি না ঠাকুর, পায়ে যদি লইবেই একটু তাড়াতাড়ি করিয়া নিও।'

সুবীরকে দেখার ইচ্ছা প্রবল রোগযন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে সহসা মনটিকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কিন্তু অভিমান আর বিতৃষ্ণায় নন্দা মনকে চোখ ঠারে। দুর্ব্বল, অসহায় দেহ মন হাহাকার করিয়া তার কানে কানে কয় তুমি তার কে, কেউ তো নও। তবে কেন । দুই চোখ দিয়া ধারা নামে, মনে মনে ভাবে, সত্যই যদি মরিয়া যাই, আর তো তাহকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু এত বড় অঘটন কি সত্যই ঘটিতে পারে! সমস্ত প্রাণ মন দিয়া এই যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাহার দর্শন প্রার্থনায় তপস্যা করিয়া আসিতেছে, এ কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

দেবনারায়ণ বলেন, "বউমা, খুবই কি কষ্ট হচ্ছে?"

নন্দা অশ্রুধৌত প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে তাকায়, বলে, "না।"

আজ এই মরণ মুহূর্ত্তে কাহারও প্রতিই তার কোনও বিদ্বেষ নাই। কিন্তু তাহাকে লইয়া এদের পদে পদে অস্বস্তি, তাহাকে পদে পদে বেঁধে। দেবনারায়ণ তার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াই সুবীরকে চিঠি লিখিতেছিলেন। লেখা হইয়া গেলে দোয়াত কলম প্যাড সব সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া চিঠিখানা চাকরের হাতে ডাকে পাঠাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

সম্মুখেই সমস্ত সরঞ্জাম দেখিয়া নন্দার মনটি বহু-দিন বিস্মৃত পিতৃগৃহের সেই শান্তি ও স্নেহের জন্য আবার সহসা ব্যাকুল হয়া উঠিল। কাগজ কলম টানিয়া লইয়া সে রোগশীর্ণ কম্পিত হস্তে লিখিল,—

বাবা, আমার অসুখ, বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবার এসে আমাকে দেখে যাও। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।

তোমার স্নেহের নন্দা।

ভৃত্য উপরে আসিয়াছিল, দেনারায়ণের চিঠি নিতে। নন্দাকে দেখিবার জন্য তাহার ঘরে ঢুকিতেই নন্দা একখানা সাদা খামে ভরিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিল। মিনতি করিয়া কহিল, "কাউকে যেন দেখিও না।"

ভৃত্য বষীয়ান। খামখানা উল্টাইয়া দেখিয়া কহিল, "এতে টিকিস কই বউমা?"

"টিকিট?" নন্দা বিপন্ন হইয়া কহিল, "টিকিট তো আমার নেই ভোলাদা, তুমি অমনিই দিও। আমার হাতের লেখা দেখলেই বাবা রাখবে।"

ভোলানাথ করুণাপূর্ণ চোখে চাহিয়া কহিল, "আহা, তোমার বাবার কাছে লিখেছ বুঝি বউমা?"

"হ্যাঁ, ভোলাদা, বাবাকে কতদিন দেখি নি, এবার না দেখলে আর বোধ হয় দেখা হবে না। আর কি বাঁচব?"

"ষাট, ষাট, ও কথা বল না, তোমার মরবার কি হয়েছে। এখনও দুটিতে এক হয়ে ঘর বাঁধলে না, একটি ছেলেপুলে হল না, এখনই মরবে কি। ভগবান তোমাকে শিগগিরই সারিয়ে দেবেন।"

নন্দা পাশ ফিরিয়া শুইল, মনে মনে কহিল, 'ঘর বাঁধা আর এ জন্মে হল না। যদি এ জন্মে জ্ঞানত কোনও পাপ না করে থাকি, তবে পরজন্মে যেন ঘর বাঁধবার সৌভাগ্য আমার হয়।'

ভৃত্য চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, নন্দা জানিল না, তাহার প্রিয়তমের আহ্বান লিপিও সে বহিয়া লইয়া গেল। নন্দা জানিল না, দূর সুদূরে তাহারই মত এমনি একজন তাহাকে দেখিবার আশায় নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে তনু দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

অমিতা কয়েক দিনের জন্য পিতৃগৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিল, নন্দা অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সুখ এবং সমৃদ্ধির লাবণ্যে তাহার দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে। এক বছর আগেকার সেই অমিতা আর এই অমিতায় কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেদিনের সেই স্বল্পভাষিণী ম্লানমুখী শীর্ণা মেয়েটির সঙ্গে আজিকার এই প্রগল্‌ভ হাস্যচঞ্চলা, স্বাস্থ্যদীপ্ত মেয়েটির তুলনা হয় না। জীবনের সার্থকতা তার দেহ মনে আনন্দ আর স্বাস্থ্যের জোয়ার আনিয়া দিয়াছে।

নন্দার রোগজীর্ণ বক্ষপঞ্জর কাঁপাইয়া একটি নিশ্বাস উঠিল। অমিতা তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কহিল, "কেমন আছ বউদি?"

নন্দা ম্লান হাসিয়া কহিল, " এই একরকম আছি।"

অমিতা তাহার শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ইস্‌ একেবারে যে কাঠিটি হয়ে গেছ। দাদা যে কি মানুষ, একবার খোঁজও নেয় না। যাই বল বাপু, এখন বুঝতে পারছি, দাদার মত নিষ্ঠুর ভুভারতে দুটি নেই।"

নন্দার মনে হইল, নিষ্ঠুর, সত্যই নিষ্ঠুর। এই রকম লাবণ্য আজ তাহার দেহেও উপছাইয়া উঠিতে পারিত। তাহারও প্রাণ মন আজ এমনই সতেজ সজীব হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সে নিষ্ঠুর। নন্দার প্রতিটি শিরা-উপশিরা, দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুও যেন দুঃখ আর অভিমানে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। অমিতা আবার কহিল, "আমার যদি এমনি অসুখ হত বউদি, তা হলে তোমাদের মহীতোষবাবু নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত। বাপরে বাপ, যা করে! যদি বলি একটু মাথা ধরেছে, অমনি কি যে করবে তার দিশে খুঁজে পায় না। পাগল আর কি!" বলিয়া অমিতা একটু মধুর হাসিল।

নন্দা পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার দুই কান যেন ঝাঁ ঝাঁ করিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল, মনে হইতেছিল, তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি কাড়িয়া লইয়া এই মেয়েটি আজ তাহাকেই নিজের সৌভাগ্য দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে। কেন, কেন ইহারা সবাই মিলিয়া এমনিভাবে নন্দাকে কেবলই বিঁধিতে আসে! কি করিয়াছে নন্দা এদের?

— (ক্রমশ)

## প্রতিধ্বনি

( ৮৫৩ পৃষ্ঠার পর )

হইতে খাঁচায় বুলবুলির গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল'।

পরিত্যক্ত নির্জন পাষাণপুরীর হর্ম্যোদরে এই ধরনের একটা মায়াবী প্রতিধ্বনি লুকিয়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ব্রজাঙ্গনার বিলাপ, প্রতিধ্বনিকে মিনতি ক'রে লিখেছে—

কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যাম চাঁদে
রাধার রোদন ধ্বনি দিও তাঁর গায়ে।

মানুষের কল্পনার ও প্রতিধ্বনির এই মিতালি আজকের নয়, এ বহু যুগের বন্ধন।

# অব্যাহত

( গল্প )

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

"পৃথিবীব্যাপী মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে—পশ্চিম খণ্ডে প্রলয়কাণ্ড—আর রক্ষা নাই, সৃষ্টি রসাতলে যায় যায়—" প্রভৃতি হাঁকিয়া হাঁকিয়া হকার ছোকরার গলারও প্রায় যায় যায় অবস্থা। খবরের জন্য ততটা নয়, জীবে দয়া রূপ ধর্মের বশবর্তী হইয়া জানলার ভিতর হইতে হাত গলাইয়া নগদ চার পয়সা ব্যয়ে একখানি কাগজ লইলাম।

'রয়টার' ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাজা ও টাটকা খবর যোগান দিতেছে। যাহা ঘটিতেছে, যাহা ঘটিবে, যাহা ঘটিতে পারে, সকল সংবাদই তারে ও বেতারে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া হাজির হইতেছে এবং মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শহরের রাস্তায় আজকাল "তরল আলতা, চীনার সিঁদুরে"র রং ফিকা মারিয়া গিয়াছে, আসর জমকাইয়া রাখিয়াছে একমাত্র "টেলিগিরাপ"। দিনে রাত্রে সকালে সন্ধ্যায় যখন-তখন—"বাবু টেলিগিরা—প্" "ভারী গোলমাল" প্রভৃতি শব্দ। যুদ্ধের বাজারে প্রত্যহ যত লক্ষ লোক কমিতেছে, কলিকাতার বাজারে কাগজ-ওয়ালারা প্রত্যহ তত লক্ষ পয়সা কামাইতেছে। পথে ঘাটে, সদরে অন্দরে, রান্নাঘরে ড্রইংরুমে, একই আলোচনা। একই আতঙ্ক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও মুখে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ নাই।

বিনা নোটিসে সহসা যে পশ্চিম প্রান্ত হইতে দুই চারিটা গোলা গুলি আসিয়া ধাঁ করিয়া রগে লাগিবে, এ আশংকা অবশ্য তত নয়, আতঙ্কের কারণ ভিন্ন। মহাসমর রূপ অনলের যে যৎকিঞ্চিৎ হলকা মহাসমুদ্র পার হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে সোনার ভারতের দুঃখী বাসিন্দাদের পক্ষে সেই টুকুই যথেষ্ট মারাত্মক।

যুদ্ধের বাজার, বাজার আগুন!

যাহারা অর্ধাশনে কাটায়, তাহারা অনশনের ভয়ে কাতর; যাহারা মোটর চড়িয়া বেড়ায় তাহারা পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধিতে ম্রিয়মান। গুলি সুতা হইতে বেনারসী শাড়ি পর্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর চড়িয়া বসিয়া আছে, অদূর ভবিষ্যতে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে কে বলিতে পারে?

আপাতত আমি কোনও শ্রেণীভুক্তই নই তাই ধীরভাবে বসিয়া আছি চাকরি যাইবার প্রতীক্ষায়।

ছুটির সকাল। ভাবিয়াছিলাম চা পর্ব সারিয়া একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসিব, না বলা কওয়া নাই মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া গেল। অথচ চা অথবা চা-দারী কাহারও পাত্তা নাই, রবিবারের সুযোগে সকলেরই কেমন মৃদু অলসতা। অগত্যা কাগজখানা মেলিয়া ধরিয়া গুছাইয়া বসিলাম। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের অরুন্তুদ কাহিনী, শত্রুপক্ষের বীভৎস নৃশংসতা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিবাত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড, অর্থাৎ মানুষ আর ভগবানে মিলিয়া নিদারুণ ষড়যন্ত্র।

রবিবারের কাগজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা মন্দ নহে। উল্টাইয়া চলিয়াছি, সহসা "শিক্ষিত বেকার যুবকের শোচনীয় আত্মহত্যা"য় চোখ পড়িতে থমকিয়া থামিয়া গেলাম। করুণ কাহিনী। আদ্যোপান্ত পড়িয়া মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। ভাবিলাম, যে কোনও সময় এরূপ অবস্থা আমারও হইতে পারে। সঞ্চয় বলিয়া তো কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে ঐ চাকরিটুকু। তা সেও তো পদ্মপত্রে জল মাত্র। যে কোনও মুহূর্তে পশ্চাদভাগে পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিতাড়িত হইতে পারি।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা গোছের একটা গভীর চিন্তার সহিত শীঘ্রই আর একটা ইনসিওর করিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ—ইত্যাদি চিন্তাসূত্র জট পাকাইতেছিল। সে সূত্র পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া, চা ও জলখাবার হস্তে অন্দর আসিয়া সদরে উদিত হইলেন।

হাত বাড়াইয়া চায়ের পেয়ালাটা লইয়া কহিলাম—আচ্ছা সকালবেলা আর অত সব লুচি-ফুচি কেন?

বামহাতে টেবিলের পঙ্কোদ্ধার করিয়া রেকাবি নামাইতে নামাইতে কণ্ঠে মধু ঢালিয়া দীপ্তিময়ী কহিলেন—খাও না, আজ তো আর সহজে ভাতে বসছ না! চান করতেই যার নাম বেলা বারটা।

কথাটা মিথ্যা নহে। বলিতে গেলে ছুটির দিনে আমাদের মত লোকের একমাত্র বিলাস এইটুকুই; ইচ্ছামত স্নানাহারের সুখ। ঘড়ির কাঁটা প্রতি মুহূর্তে কাঁটা ফুটাইয়া ফুটাইয়া দাসত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না।

হঠাৎ ভারী হাসি পাইল। ভাবিলাম মজা মন্দ নহে, কেহ অনশনের জ্বালায় আত্মহত্যা করে, কাহারও বাড়া ভাতের আগে গরম লুচি আসিয়া যায়! যাক, বিধাতা যতক্ষণ আলুভাজা সহযোগে গরম লুচি জোগাইতেছেন, সদ্ব্যবহার না করি কেন? রেকাবিখানা টানিয়া লইয়া মৌখিক ভদ্রতা করিয়া কহিলাম—তোমরা খেয়েছ?

সহাস্য ভ্রূকুটির সহিত উত্তর আসিল—কখো—ন। খেয়ে টেয়েই আনলাম যে, পাতের প্রসাদ।

বিবাহিত জীবনের সুবিধাই এই, ভারগ্রস্ত মন হালকা হইয়া উঠিতে দেরি করে না। একটু হাসির বিদ্যুতে, পরিহাসের মাধুর্যে সরসতার হাওয়া বয়। চা-এর পেয়ালায় চুমুকের সহিত একটি মৃদু উষ্ণ "আঃ" যোগ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলাম—খাও নি তো? আচ্ছা এস ভাগ ক'রে খাওয়া যাক।

বাক্-ব্যবহার অনাবশ্যক বোধে ক্ষুদ্রকায় একটি ঘুষি প্রয়োগের ইঙ্গিত করিয়া দীপ্তিময়ী সারা ঘরে দীপ্তি ছড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। রূপকথায় নাকুর বদলে নরুন লাভের বিবরণ শুনিয়াছি, কিন্তু লুচির বদলে ঘুষি? যাক যা জোটে। 'প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে' কথাটি মিথ্যা নয়!

দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সারিতে সারিতে বাম হস্তে কাগজের পাতা উলটাইয়া চলিলাম।

যেন রঙ্গমঞ্চে পট পরিবর্তন ঘটিল।

কে বলিবে এ দেশে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ মহামারী, বন্যা বিভীষিকা আছে? কে বলিবে আছে ভাবী দুর্দশার করাল ছায়া, নিরুপায় ব্যর্থতার শোচনীয় পরিণাম? আছে সুধুই আনন্দ, সুধুই স্ফূর্তি। অফুরন্ত, আর অগাধ।

চিত্রায় অপরাজেয় চিত্র 'পরাজয়'। সগৌরবে সপ্তম সপ্তাহ। রূপবাণীতে চলিতেছে 'কুমকুম'। অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে কুমারী অমুকের নৃত্যাভিনয়। —'মেঘমল্লার, সুরঝঙ্কার, কমলকলি' প্রভৃতি নৃত্য।

"অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন। টিকিটের মূল্য পাঁচ টাকা হইতে—" ইত্যাদি।

অসংখ্য সিনেমা হাউস, শহরের কথা ছাড়িয়াই দিই, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে আর অদৃশ্য হইতেছে। ইহারই ভিতর কোন ফাঁকে কাহারও আবার 'রজত-জয়ন্তী' কাহারও আরও কিছু। প্রত্যেকেরই একান্ত ও বিনীত অনুরোধ, "পূর্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন"। কারণ প্রত্যহ নাকি সহস্র সহস্র লোক হতাশ হইয়া ফিরিতেছেন।

মনে মনে ঠিক করিলাম, রবিবারের সন্ধ্যাটা না হয় কোনও একটায় ঘুরিয়াই আসা যাক। বৃষ্টি ছাড়িলে 'আসন সংগ্রহের'

চেষ্টায় বাহির হইব মনস্থ করিলাম বটে, কিন্তু অভদ্র বৃষ্টির ছাড়িবার কোনও লক্ষণই নাই।

গলা ছাড়িয়া "এমন দিনে তারে বলা যায়" গাহিবার বয়স আর নাই, কিন্তু শুনিয়া না হাসেন তো বলি, ইচ্ছা হইতেছিল এমন দিনে শ্রীমতী আসিয়া একটু কাছে বসিলে মন্দ হইত না। অথচ আকাঙ্ক্ষিতার আর টিকিটি দেখাইবার লক্ষণ নাই। আশা করিতেছি, বৃষ্টি এবং ছুটি এই উভয় ব্যাপারের যোগাযোগে রন্ধনশালায় কোনও নূতন বস্তুর প্রস্তুতি ঘটিতেছে হয়তো। এদিকে কর্মখালি, পাত্রপাত্রী, নিলামী ইস্তাহার, বাজার দর পর্যন্ত ফুরাইয়া আসিল। ধান চাল উঠিতেছে পড়িতেছে, পাটের বাজার আগুন, স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ, সোনার ভরি সাতচল্লিশ টাকা!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাক এ বৎসরে একটা খরচ তবু বাঁচিবে, বিবাহের লৌকিকতা। বৈশাখ মাস পড়িলে তো আর রক্ষা নাই? শতকরা পঁচাত্তরখানা বাড়ির ছাদ লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, বিবাহ-উৎসবের প্রতীক হোগলার ছাউনি। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে দুই চারিটা নিমন্ত্রণ আসিলেই তো সারা মাসের বাজারখরচ বাহির হইয়া গেল। যাই হ'ক এবারের মত নিশ্চিন্ত। যা সাংঘাতিক দিনকাল পড়িয়াছে, কে কয় দিন আছি তাহারই নিশ্চয়তা নাই। এ বাজারে নিশ্চয়ই কাহারও বিবাহের শখ চাপিবে না। তা ছাড়া বেকার সমস্যা তো আছেই। বরং বাড়িতেছে।

চিন্তাজাল আবার ছিঁড়িল, ভাল করিয়াই ছিঁড়িয়া গেল। ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন মাতৃদেবী। বাহিরের দিকের ঘরে আসিবার প্রয়োজন মায়ের কস্মিনকালেও হয় না, আসা সমীচীনও বোধ করেন না। একেই তো তাঁহার ভাষায়—চা বিস্কুট চটকানো এলাহি কেত্তন ঘর, তা ছাড়া জানালা দরজার পর্দাগুলা আবার সাতজন্মের আকাচা। অশুদ্ধ শরীর লইয়া তাহারা যে তাঁহার গায়ে লাগিয়া শত্রুতা সাধিতে চাহিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

বুঝিলাম আসিয়াছেন কোনও বিশেষ কার্যোদ্ধারে। ক্ষণপূর্বে যে আশা করিতেছিলাম তাহাতে ছাই পড়িল। মায়ের হাতে একখানি চৌকা খাম, গোলাপী ও 'শুভবিবাহ' অঙ্কিত।

কহিলেন—কাল যে রাত করে এলি, চিঠিখানা তাই দেওয়া হয় নি। তোর ছোট পিসীর ছেলের যে বিয়ে রে! দুই ভাই-এর এক সঙ্গেই লেগেছে।

ইচ্ছা করিয়া নেকা সাজি নাই, অতর্কিত আঘাতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—দুই ভাই-এর? কার কার?

—নেকা ছেলের কথা শোন! ভোঁদার ভোনার, আবার কার! বিয়ের যুগ্যি ছেলে আবার কে আছে!

—ও, হ্যাঁ—তাই বটে।

—তা তো হল—মা চিন্তিত মুখে কহিলেন, এখন রাণাঘাটে যাওয়ার কি হয় বল্ দিকিন? ছোট ঠাকুরঝি তো আজকালের মধ্যেই যেতে বলেছে, তা তুই দুদিন ছুটি পাবি না?

—আমি? খেপেছ?

—জানি তোর দ্বারা হবে না, দেখি কেষ্টোর খোশামোদ ক'রে। ওটা আবার যা গোঁয়ার, নিয়ে পথে বেরতে ভয় করে। আচ্ছা আজ রবিবার আছে, আইবুড়োভাতের ধুতি চাদর দুজোড়া দেখে শুনে এনে রাখ্। মুখ দেখানি দু টুকরো সোনাও তো চাই, কি বলিস? তা যে-সব দর চড়েছে বলছিস সোনার—কানের দুল-টুল ছাড়া আর কি দেওয়া যাবে?

দু জোড়া দুল যেন কিছুই নহে, যেন তাহার দাম নাই। গম্ভীরভাবে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা লইয়া কহিলাম—দুজনের বিয়ে বলছ—তা কই আর চিঠি?

—শোন কথা ছেলের—মা অবাক হইয়া যান; এক দিনের আগে পিছে বিয়ে, এক তারিখে বউভাত; আলাদা চিঠি ছাপতে যাবে কেন?

কথা সত্য বটে, পেট তো কাহারও একটা বই দুইটা নয়। দেখিলাম পিসেমশাই লোকটি দেখিতে হাবাগোবা গোছের হইলে কি হয়, বুদ্ধি আছে। বাছিয়া বাছিয়া এমন তারিখ ফেলিয়াছেন যাহাতে দুইবার না খাওয়াইতে হয়। অথচ মজাটি এই, লৌকিকতার বেলায় দুই প্রস্থ আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমার মতে এ ক্ষেত্রে এক জোড়া কানবালার দুইটা দুই বৌকে দিয়া মুখ দেখা উচিত। কেন নয়?

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলাম—বেশ, কাপড় চাদর এনে রাখব, একেবারে ভাল মিলের এক জোড়া—

মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—বিয়ের বরকে আবার মিলের কাপড় কি? অরুচির কথা কস নি বাছা। জরি-পাড় ধুতি চাদর না দিলে কখনো ভাল দেখায়? জমিটা বেশ খাপি আর মিহি দেখে নিস, ছোট ঠাকুরঝির এই প্রথম কাজ।

প্রথম কাজ, অতএব আত্মীয়স্বজনের মাথা কেনা হইয়াছে। হায়, আমার যে এরূপ কাজ এই প্রথম নয় এ দুঃখ জানাইবার কে আছে?

ভোঁদা ও ভোনার ভাবী বধূদিগের জন্য হাল ফ্যাশানের দুই জোড়া হালকা ধরনের কানের দুল আনিয়াছিলাম; দেখিয়া গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়াছেন, মা নাক সিঁটকাইয়াছেন, তাই বদলাইতে চলিয়াছি। মনের ভাব ভুক্তভোগী মাত্রেরই অনুমেয়। এমনি বিরসমুহূর্তে কন্যা রানু আসিয়া অতি পরিচিত আবদারের সুরে ডাকিল—বাবা।

ভঙ্গীটা সুবিধার নহে, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া উত্তর দিলাম—কি চাই?

—এই, ইয়ে, আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের বিয়ে—

—বিয়ে? তা বেশ, ভাল কথা।

—ও নেমন্তন্নর কার্ড দিয়েছে ক্লাসের মেয়েদের।

ভাবিলাম, উঃ মেয়েগুলো এই বয়সেই কী ডেঁপো আর লায়েক হইয়া উঠিয়াছে! মুখে বলিলাম—কার্ড দিয়েছে, যাস।

—বা রে, অমনি যায় না কি মানুষ? চাঁদা দিতে হবে না?

—চাঁদা! বিয়ের আবার চাঁদা কি রে?

অতঃপর রানু তাহার স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতায় যাহা নিবেদন করে তাহার তাৎপর্য এই;—উক্ত বান্ধবীটি নিতান্তই ধনীদুহিতা, অতএব বাজেমার্কা জিনিস প্রেজেণ্ট করিয়া তাহার প্রেস্টিজের হানি করা চলে না। কাজে কাজেই চাঁদা উঠাইয়া একটি রুপার ফুলদানি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের ভাগে মাত্র পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা দিবার বরাত পড়িয়াছে।

ভারী তো এক ফোঁটা মেয়ে রানু, তাহার আবার বন্ধুর বিবাহ, উপহারের চাঁদা! এসব নিতান্ত অসঙ্গত ঠেকিল। আরও গম্ভীর হইয়া কহিলাম—আমার অত পয়সা নেই।

আমার পয়সা না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া রানুর অশ্রুর উৎস তো আর শুখাইয়া যাইতে পারে না। দেখিলাম অভিমানিনী কন্যা বসিয়া বসিয়া টেবিল ক্লথের একটা কোণ লইয়া অযথা টানাটানি করিতেছে এবং দুই গাল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। ইহার পর কি করিতে বলেন আপনারা?

পথে বাহির হইয়া দেখি কী ভুল ধারণাই পোষণ করিতেছিলাম! বাড়ির দুয়ার হইতে 'বাসে' উঠি এবং দুয়ার গোড়ায় আসিয়া নামি, পাড়ার লোকে কী কাণ্ড করিতেছে অত নজরে পড়ে না। দেখিলাম, একটিমাত্র লগ্নের সুযোগেই বিবাহের একেবারে মরসুম পড়িয়া গিয়াছে।

লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই—আধুনিক ছেলেদের ভিতর বিবাহের ইচ্ছাটা নাকি উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। সকলেই ঝামেলা

অশান্তির হাত এড়াইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে থাকিতে চায়। কিন্তু কই! এত বিবাহ তবে করিতেছে কাহারা! ভয়ভাঙা বুড়োর দল? একা আমাদের পাড়াটুকুতেই তো ছয়খানা বাড়িতে ওই কাণ্ড! কাহাদেরও ছাদ জুড়িয়া ম্যারাপ বাঁধা হইয়াছে, কাহারও দুয়ার গোড়ায় লম্বা লম্বা বাঁশের গোছা বাঁধা পড়িবার অপেক্ষায় আড় হইয়া পড়িয়া আছে। সামনের লাল বাড়িটার লম্বা বারান্দায় ভারী আনন্দের বিজয়-নিশান উড়াইয়া রাশীকৃত হলুদ মাখা ফরসা শাড়ি বাতাসে দুলিতেছে। গলির মোড়ের হলদে বাড়ির সামনে সকল শুভকর্মের অন্তিম নিদর্শন এঁটো কলার পাত ও ভাঙা মাটির গেলাসের সমারোহ। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, প্রজাপতি অফিসে গুদাম সাবাড়ি সেল শুরু হইয়াছে বোধ হয়।

তা ছাড়া আর কি? বাড়ি আসিয়া চৌকাঠে পা দিতেই শ্রীমতী দীপ্তি ফুটিফাটা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সংবাদ দিলেন—ওগো শুনছ, এত দিনে অলকের বিয়ের ঠিক হল।

কথাটা শ্রবণবিবর হইতে মস্তিস্ক কোটরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কার বিয়ের ঠিক হল?

—দিদির ছেলে, আমাদের অলকের। কানেও আজকাল কম শুনছ নাকি?

অপ্রতিভ মনে বলিলাম, মানে, আর কি, কি বলিতে কি বলিয়া বসিলাম—ও, অলক? তাই নাকি? তা ছোকরাকে তো বেশ চালাক চতুর বলে জানতাম, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বসে গেল?

স্থিরভাবে কথাটা শুনিয়া লইয়া প্রেয়সী, কালো চোখে বিদ্যুত হানিয়া, টানা ভুরু আরও টানিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—এ কথার মানে? বিয়ে করাটা কি এতই বোকামি?

সজোরে জিহ্বা দংশন করিয়া সশব্দে বলিলাম—আরে না—না বলছি এই যুদ্ধের বাজার, সাতচল্লিশ টাকা সোনার ভরি, মানে—

ম'রে যাই আর কি, সোনার দর চড়েছে ব'লে লোকের বিয়ে বন্ধ থাকবে!

তাই বটে। ভাবিলাম, বোকামি আমারই, পৃথিবী যদি সহসা মেরুদণ্ডে পাক খাওয়ার পরিবর্তে উলটা ডিগবাজি খাইতে থাকে তথাপি বিবাহ বন্ধ থাকার কথা নয়।

এদিকে দীপ্তি একেবারে প্রদীপ্ত; বলিলেন—হুঁ এতদিনে মনের কথাটা প্রকাশ করলে কি ভাগ্যি। বোকামির জন্যে খুব পস্তাচ্ছ তা হলে! তা বেশী দুর্ভোগ আর নাই বা ভুগলে, দাওনা বিদেয় ক'রে। দাদারা একটু জায়গা আমায় নিশ্চয় দিতে পারবে।

অর্থাৎ দুর্ভোগ এড়াইতে তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, সাতটি সন্তান সন্ততি লইয়া আমি আরামে সুখবোধ করিতে থাকিব।

রুদ্ধশ্বর, রাঙা মুখ, জ্বলন্ত চাহনি।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলাম—নাঃ, তুমি দেখছি পনের বছর বয়সটা আর ছাড়তে পারলে না। ঠাট্টা করবার জো নেই একটু, কী মুশকিল! অলক যে বড় রাজী হল? তাই বলছি।

গৃহিণী কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হইয়া বলিলেন—রাজী কি আর সহজে হয়েছে? অনেক দুঃখে হয়েছে। দিদি তো এদানি ছেলের বিয়ে বিয়ে ক'রে পাগল হতে বসেছিল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা, ছেলের কাছে কান্নাকাটি, অনুরোধ উপরোধ রাগ ঝগড়া; শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে করে কি?

একটা দুঃখসূচক 'আহা' বাহির হইতেছিল, সন্তর্পণে চাপিয়া গেলাম। ভাবিলাম, উঃ সংসার জায়গাটা কী ভীষণ! পেটের ছেলের উপর পর্যন্ত মানুষের এত হিংসা? উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাওয়ার অভাবে তাড়াতাড়ি বলিলাম—আহা, আগে যদি জানতাম। সেই দত্ত চ্যাটার্জ্জির ওখানে গেলাম কানবালার জন্যে, জানলে অমনি আর—

তিনি পূর্ব অপরাধ ভুলিয়া হাত বাড়াইয়া কহিলেন—কই দেখি এবারে কি অপরূপ আনলে!

এত সহজে রোষ শান্তি হইল দেখিয়া গদগদ চিত্তে যাহাকে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা বলে তাহাই করিয়া বসিলাম। বলিলাম—তা অলকের বউকেও কিছু দেবে তো? একটা ময়ূর সেফ্‌টিপিন দেখছিলাম ওদের দোকানে, বেশ জিনিসটা। যদি বল তো—

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া গৃহিণী কহিলেন অলকের বউকে সেফ্‌টিপিন দেওয়া হবে?

হিসাবের একটু ভুল হইল। ভাবিলাম, সোনার দর দেখিয়া বোধ করি অলকের মাসী এই খরচের শ্রাদ্ধে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া করুণাপরবশ হইয়া রুপার সিন্দুর কৌটাতেই লৌকিকতা সারিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কিন্তু আমারও তো একটা কর্তব্য আছে! উদারকণ্ঠে কহিলাম—তা হোক, দিদির এই প্রথম কাজ, না দিলে ভাল দেখাবে না।

হাসি গোপনের ব্যর্থ চেষ্টায় রঞ্জিত মুখে দীপ্তিময়ী উত্তর করিলেন—দিদির বউকে একটা বাজারে কেনা পাতলা পটপটে সেফ্‌টিপিন দিলেই খুব ভাল দেখাবে, কেমন? ধন্যি ধন্যি প'ড়ে যাবে একেবারে! খুব পরামর্শ দিয়েছ, আর থাক। একবার বিরিঞ্চিকে ডেকে দিও দিকিন, তা হ'লেই হবে। যা করবার আমিই করতে পারব।

অনুমান করিতে পারেন বিরিঞ্চি কে, বিরিঞ্চি নাম কাহাকে মানায়? সাধারণ বুদ্ধির অভাব না থাকিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, বিরিঞ্চি নাম স্যাকরা সমাজ ছাড়া অচল।

তা দীপ্তিময়ী মিথ্যা গৌরব করেন নাই, আগাগোড়া সবই করিতে পারেন তিনি, মাত্র বিলটি মিটাইয়া দেওয়া ছাড়া।

ছোট পিসীর ছেলেদের বিবাহে বাড়িসুদ্ধ সকলকে রাণাঘাটে চালান করিয়া দিয়া শূন্য বাড়িতে একা গ্যাঁট হইয়া বসিয়া আছি। আর আছে অগতির গতি জগবন্ধু। জুতা ঝাড়া হইতে ভাত রাঁধা পর্যন্ত সব কাজেই তাহার ভরসা।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি আসিয়া তোফা আরামে একখানি 'শোণিত পায়ী রক্ত মোটর' অথবা 'বন্ধুবাড়ির অন্ধতিয়াস' লইয়া বসি, কোথা দিয়া সময় কাটিয়া যায় টেরও পাই না। রাত্রের রান্নার হাঙ্গামা জগবন্ধু করে না। বলা-কওয়াই আছে। মোড়ের দোকান হইতে গরম লুচি ভাজাইয়া আনে, আলুর দম আনে, 'ভাজি' তাহারা আপনিই দেয়। দুধ জ্বাল দেওয়ার সুবিধার অভাবে কিছু রাবড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হয়, উপায় কি।

আজ আর নূতন বই জোগাড় করিতে পারি নাই, লাইব্রেরি বন্ধ। ভাবিতেছি গৃহিণীকে একখানা চিঠি লিখিলে হইত। বুড়া বয়সে চিঠি লেখালিখি—বিবাহ বাড়িতে ধরা পড়িলে হাসির কথা হইবে কি না সেই চিন্তা। কিন্তু তাঁহার অভাবে যে দারুণ অসুবিধা ও কষ্টে পড়িয়াছি তাহা একবার না জানানোই বা কেমন করিয়া চলে।

কাগজ ও কলম যোগাড় করিয়া বসিয়াছি, চা-টা খাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। 'চা-এর দেরি দেখিয়া আশা যখন প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন চা লইয়া জগবন্ধু হাজির।

তাহারই নিজস্ব গামছাখানির অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট চায়ের পেয়ালাটি সাবধানে টেবিলে বসাইয়া জগবন্ধু সক্ষোভে বলে—বাবু মা বসুমতী তো আর টেঁকেন না।

চমকিয়া বলিলাম—কেন রে কি হ'ল হঠাৎ?

—হঠাৎ কি বাবু, যুদ্ধ? কলিকাল শেষ হয়ে এল, দেখেছেন কি! ভগবানের ছিষ্টিটা লোপ পেতে বসেছে।

অদ্ভুত আর বাজে গুজবের জন্মদাতা ইহারাই। তাহার মিথ্যা ভয়টা ভাঙাইয়া দিবার ইচ্ছায় কি একটা বলিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময় বাহিরে পরিচিত মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। শ্যালক প্রবরের গাড়ি। চা ফেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া নামিয়া আসিলাম।

শ্যালক নহেন, শ্যালকজায়া। একটি চাপদাড়ি বিশিষ্ট শিখ কাণ্ডারী সঙ্গে করিয়া অবলা বঙ্গললনা একাই আসিয়াছেন।

বাড়ি ঢুকিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—কই এদের সব দেখছি না? ঠাকুরঝি, মেয়েরা—সখেদে আপনার অবস্থা জানাইলাম।

সম্পর্কটা মধুর, তাই বেশ একচোট পরিহাস করিয়া লইয়া কহিলেন—তাই তো, দেখা হ'ল না, মুশকিল। আমি একটু নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম, কবে আসবে এরা?

—সোমবার সকালে তো আসার কথা আছে।

—ও তবে আর কি?' রাত্রে সব যাবে ওখানে। আর তো আসতে পারব না ভাই, নিশ্চয় পাঠিয়ে দিও। গাড়ি আসবে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময়। ঠিক যায় যেন।

—তা তো যাবে—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো? এ অভাগাকে বাদ দিয়ে—

ভদ্রমহিলা কিঞ্চিৎ লজ্জার ভান করিয়া কহিলেন—মানে আর কি, বিশেষ কিছু নয়। অরুণার তো এই 'ন-মাস' হ'ল কিনা তাই সবাই মিলে একটু আমোদ আহ্লাদ করা।

অর্থাৎ সোজা কথায়—অরুণার "সাধের" নিমন্ত্রণ। 'বিশেষ কিছু নয়' মানেই বেশ কিছু ঘটা। না করিবে কেন? পয়সা আছে। এই তো গেল শ্রাবণেই বুঝি, কম ঘটা করিয়া কি বিবাহ দিয়াছে মেয়েটার?

ঘরে আসিয়া দেখি অনাথের বন্ধু জগবন্ধু কাটিয়া পড়িয়াছেন। বোধ হয় আমার কাছে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া সৃষ্টি লোপ পাইবার আর কয়দিন বিলম্ব আছে সে বিষয়ে গভীর গবেষণা করিতে তাহার বন্ধুবর্গের বাসায় গিয়া হাজির হইয়াছে।

ভাবিয়াছিলাম, বেটাকে বুঝাইয়া দিব সৃষ্টি লোপ পাওয়া বড় চারটিখানি কথা নয়।

বাঁচিয়া থাক সুজলা সুফলা ভারতভূমি। সোনার দেশ। শ্রীযুক্ত বিধাতাপুরুষ মহাশয়ের খাস তালুক। বাকী সারা জগতের জমিদারির আদায় ঘুচিয়া গেলেও লাটের কিস্তির জোগান ও একাই দিতে পারিবে।

বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, "তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ—," বর্তমানে শুনিতে পাই মোরা নাকি চল্লিশ কোটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছি! অনুরূপ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িতে থাকিলে ভবিষ্যতে আরও যে কি হয় বলা যায় না।

কিন্তু এ সব উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা বেটা মুখ্যু চাষা বুঝিলে তো!

---

# বর্ষারাতে

**কুমারী বাণী দে**

বিরহিণী যক্ষবালার ব্যথার আঁখিজলে
পড়ছে ঝরে জলের ধারা নীল গগনের তলে।
কোথায় আছে প্রিয় তাহার
কোন্ দেশে কোন্ নদীর ওপার;
কোন্ পাহাড়ের গভীর গুহায় কাঁদছে বিরলে
পড়ছে ঝরে ঝরণা ধারা তাহার আঁখিজলে।

পাঠিয়ে দেছে কাজলমেঘে ব্যথার লিপিকা
পড়তে তাহা কোন্ সে বালা জ্বাল্ছে দীপিকা
আঁধার রাতের আকাশতলে
প্রদীপ কাহার উঠ্ছে জ্বলে
পড়তে লিপি কোন্ সে মেয়ে জ্বালায় তড়িৎশিখা
প্রিয়ের দেওয়া কাজল মেঘে ব্যথার লিপিকা।

আঁধার রাতের চক্ষু বেয়ে ঝরছে অবিরল
হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ের তরে ব্যথার আঁখিজল।
তাহার বুকের দীর্ঘশ্বাসে
ফেটে পড়ে হাহুতাশে
বাদলা রাতের ক্ষ্যাপা বায়ু ঝরায় আঁখিজল
গুমরে ওঠে নিঝুম রাতে কাঁদছে অবিরল॥

# শিখাস্তুতি

**শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত**

যে শিখায় আজ পশ্চিম জ্বলজ্বল,
পুড়িছে গির্জা, পাঠাগার গৃহতল,
হিংস্র নরের হৃদয়ের শিখা তাই
অপর নরের হিংসারে করে ছাই।

ভারতে এ শিখা পাণ্ডবে-কৌরবে
রচেনি কেবল রক্তের রৌরবে,
দগ্ধ করিল পাপ ও অহঙ্কার;
জাগিল ভারত নব উজ্জ্বলাকার।

পাবক অগ্নি, তোমারে নমস্কার;
তোমার পরশে গ্লানি সে ভস্মসার;
ভস্মের মাঝে নবীন জীবন জাগে,
তোমার জীবন অতি বিচিত্র লাগে!

ধর্ম্মে, সমাজে, শাসন-চক্র মাঝে
আজি শতপাপ লুকায়ে লুকায়ে রাজে।
প্রাণের শিখা ও যৌবনশিখা তারে
পুড়ায়ে জাগাক্ জীবন সৌম্যাকারে।

# সোভিয়েট রাশিয়ার সিনেমা

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

"সিনেমা হ'ল আমাদের সকল আর্টের সেরা"—এই হ'চ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার চিত্রশিল্পের সবচেয়ে বড় কথা। এর জন্য ওদেশের বিশিষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মাথা ঘামায় কী ক'রে সামাজিক অগ্রগতির সাথে যোগাযোগ রেখে, চিত্রশিল্পের সাহায্যে ওরা সারা দেশকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারবে, সেকথা গভীরভাবে চিন্তা করে। লেনিনের মত মানুষও ছায়ার মায়ার কথা ভুলতে না পেরে রাশিয়ার চাষীমজুরকে দেখে বলেছিলেন—"film them—for they are making history." তাঁর এই কথার পর শিল্পীরা দেশের চারিদিক-কার সাম্যবাদী ও তাদের শত্রুদের মধ্যে যেসব সঙ্ঘাত, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নবগঠিত সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারের জীবন্ত ছবিগুলি তুলতে আরম্ভ করে। বাস্তবিকপক্ষে এই সময় থেকেই রাশিয়ার চিত্রশিল্প এক নূতন পদ্ধতি ও নূতন আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে।

বিপ্লবের আগে রাশিয়ার চিত্রশিল্প সম্পূর্ণরূপে গতানু-গতিকতার খাদে ব'হে চলত। সেই নাটকীয় পদ্ধতি, সেই মঞ্চঘেঁষা অভিনয়, সেই সস্তা মনস্তাত্ত্বিক আবেদন, সেই চলতি উপন্যাস হ'তে গল্প সংগ্রহ—এ সবই ছিল রাশিয়ার চিত্রশিল্পের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ সবকে বাদ দিয়ে যে চিত্রশিল্প চলতে পারে, একথা কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু বিপ্লব এসে রাশিয়ার জীবনধারাকে এমনই বদলে দিল যে, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত চিত্রশিল্পেও তার অসম্ভব প্রভাব দেখা গেল। পুরাতন রাশিয়ায় ছিল অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ঠিকিয়ে ব্যবসা চালানো, কিন্তু নবীন রাশিয়ায় এল জনগণের প্রাণের স্ফুরণ পর্দ্দায় প্রতিফলিত করবার তাগিদ এবং এর জন্যই পুরাতন প্রথার হ'ল অবসান।

পেট্রভ পরিচালিত ছবি 'পিটার দি ফার্স্ট'

প্রথমে পরিচালক লিও কুলেসভ্ মঞ্চাভিনেতাদের চিত্রশিল্প থেকে নির্ব্বাসন দেন। এই ভদ্রলোক বিপ্লবের সময় থেকেই কাজ সুরু করেন। কুলেসভ্ খুব বিখ্যাত পরিচালক না হ'লেও উত্তরকালে রাশিয়ার চিত্রশিল্পীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পৃথক্ পৃথক্ কতকগুলি সুটিং একত্রিত ক'রে প্রয়োজনমত আবেষ্টনী গড়ে তোলবার জন্য ইনি কতকগুলি বিস্ময়কর পদ্ধতিও আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছেন। এঁর পর পরিচালক জিগা ভার্টভ রাশিয়ার চিত্র-

শিল্পকে আরও একধাপ এগিয়ে দেন। জীবন্ত জনতার ছবি ছিল এ'র প্রিয়। আড়াল থেকে উ'কি দিয়ে দেখার মত ভদ্রলোক মানুষের জীবনকে দেখেছিলেন। ইনি 'কিনো-প্রাভ্দা' (ছায়ার সত্য) নামক এক নূতন ধরণের নিউজ রীল এবং 'এনথুসিয়াজ্‌ম্' নামক একটি শব্দমুখর চিত্র তোলেন। এ'র বিশেষত্ব এই যে, ইনি দৃশ্যবিহীন, অভিনেতাবিহীন এবং ষ্টুডিওবিহীন অবস্থাতেই ছবি তোলার পক্ষপাতী। এ'র পর রাশিয়ার চিত্রজগতে যাঁর নাম শুনতে পাওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন পরিচালক আইসেনষ্টেইন। বিখ্যাত ছবি "পোটেমকিন" এ'রই তোলা। পরিচালক হবার আগে ইনি এক থিয়েটারে মঞ্চশিল্পীর কাজ করতেন। এরও আগে ইনি স্থাপত্যশিল্পী ও ইঞ্জিনীয়ার বলে পরিচিত ছিলেন। এ'র প্রথম ছবি 'ষ্ট্রাইক'—তারপরই 'পোটেমকিন' তোলা হয়। রাশিয়ার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই 'পোটেমকিনের' স্থান আছে। বলিষ্ঠ কল্পনা ও রসপরিবেশনের এমন সতেজ প্রেরণা বড় একটা দেখা যায় না। সমস্ত ছবিটিই মুক্ত আকাশের নীচে ও পুরানো ক্যামেরায় তোল হয়। আইসেনষ্টেইন রাশিয়ার একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী। এ'র প্রভাব রাশিয়ার বাইরেও পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য পরিচালকদের চেয়ে এ'র প্রভাব দেশের মধ্যে অনন্যসাধারণ, কারণ ইনি হচ্ছেন মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ ফিল্ম-একাডেমী "জি-আই-কে"র প্রধান পরিচালক। সেই হিসেবে এ'র সুবিধাও প্রচুর। বর্ত্তমান রাশিয়ায় যদিও এ'কে সবচেয়ে বড় ফিল্ম-থিওরিটিসিয়ান বলে অভিহিত করা হয়, তবুও এখনও ইনি ভয়ানক খেয়ালী, স্বতঃস্ফূর্ত্ততা ও নাটকীয় কৌশলের উপর বেশী নির্ভরশীল। ইনি কখনও সম্পূর্ণভাবে গল্পের খসড়া রচনা করতে ভালবাসেন না।

আইসেনষ্টেইনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন পরিচালককে দেখতে পাওয়া যায়, যিনি কুলেসভপন্থীদের প্রতিবেশী অনুরক্ত এবং আইসেনষ্টেইনপন্থীদের প্রায় বিপরীতপন্থী; এ'র নাম হ'চ্ছে পুডভকিন। পুডভকিন সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে বাস্তবপন্থী। আইসেনষ্টেইন যেখানে "পোটেমকিন", "অক্টোবর" প্রভৃতি চিত্রগুলি তুলে গণ-সাধারণকে চিত্রিত করেছেন, সেখানে পুডভকিনকে আমরা দেখতে পাই, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে নবীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে গড়ে উঠেছে, তারই মনস্তত্ত্ব নিয়ে ইনি এ'র শিল্পভবনে রূপ দিচ্ছেন। আরও আইসেনষ্টেইন যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কারকারবার করেন, পুডভকিন সেখানে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর চিত্রগুলি রচনা করতে ভালবাসেন। এককথায় পুডভকিন চান সত্যিকারের সামাজিক নায়ক সৃষ্টি করতে। "মাদার", "দি এণ্ড অফ সেণ্ট পিটার্সবুর্গ", "ষ্টর্ম ওভার এশিয়া" প্রভৃতি ছবিগুলি তুলে ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।

"রিটার্ণ অব দি ইয়ং ম্যাক্সিম"—পরিচালক কাজিনেফ্

চিত্রজগতের সমালোচকদের মতে এ'র ছবিগুলি চিত্রজগতের এক অমূল্য সম্পদ।

পুডভকিনের মতে পরিচালক ও অভিনেতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক একটু বিশেষ ধরণের হওয়া উচিত। ইনি নিজে অভিনেতাদের সাথে যেভাবে ব্যবহার করেন এবং সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ'র কথাই হচ্ছে—The rehearsals will be intimate." কারণ ইনি মনে করেন—"অভিনেতাকে কোন ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলে সঠিক মুহূর্ত্তটিতেই তা করতে হবে এবং সেইজন্যই তা হচ্ছে গবেষণার ও মহড়ার বিষয়। কিন্তু অনির্দ্দিষ্টকাল ষ্টুডিওতে বসে বসে মহড়া দিয়েই এটুকু করা যায় না.........সুতরাং পরিচালক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে তাকে জানবার জন্য এবং প্রত্যেকটি কথা তার সাথে আলোচনা করবার জন্য। কেননা ষ্টুডিওর গোলমেলে আবহাওয়ায় বেশীরভাগ মহড়াই চলতে পারে না।" পুডভকিন আরও বলেন—

"After much experimental and theoretical work I am convinced that it is possible to get

excellent material for a picture from the ordinary man, taken straight from the street, who, never having acted before, is yet sensitive to the meaning of the experienced producer."

তাছাড়া ইনি নিজের জীবনে যেভাবে চিত্র-পরিচালনা করেন, তা এঁর নিজের ভাষায় এই রকম—"সত্যকার মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হবার জন্য আমি যাদের নিয়ে কাজ করি, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন আমার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। আমি আমার কাজের বাইরে সাধারণক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করি এবং তাদের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করি, কারণ আমি জানি, এইভাবে লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে আমি আরও বেশী কাজের উপকরণ পাব। পুডভকিন তাঁর "দি সিম্পল ম্যাটার" শীর্ষক সর্ব্বশেষ নির্ব্বাক ছবিখানিতে একদল ঘুমন্ত লালরক্ষীবাহিনীর একটা দৃশ্য তোলবার জন্য সোজা মস্কো থেকে পনের মাইল দূরবর্ত্তী একটা জায়গায় লালরক্ষী-বাহিনীর একটা স্কোয়াডকে মার্চ্চ করালেন। তারপর তাদের ট্রেঞ্চের মধ্যে শোয়ালেন। সেখানে যখন স্বাভাবিকভাবে তারা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন তাদের ছবি তোলা হল। এ দৃশ্যটি যে অভিনয় করা দৃশ্য অপেক্ষা খুবই স্বাভাবিক এবং হৃদয়গ্রাহী, সেকথা বলা বাহুল্য।

রাশিয়ার আর একজন নামজাদা পরিচালকের নাম করা প্রয়োজন। এঁর নাম হচ্ছে ডভজেঙ্কো। আইসেনষ্টাইন ও পুডভকিন সম্প্রদায়ের ইনি হ'চ্ছেন এক ক্রমপরিণতি। সামাজিক চিন্তাধারাপ্রযুক্ত চিত্রশিল্পের বিকাশের জন্য ইনি সত্যকার পরিশ্রম করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইনি এঁর ছবি-গুলিতে গীতিকাব্যের ঝঙ্কার ও হৃদয়াবেগের প্রবাহ দেখাতে পেরেছেন। এঁর সৃষ্ট জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছবিগুলি এক সামাজিক বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটে উঠতে পেরেছে। শিল্পী-জীবনের মধ্যে আসবার আগে ইনি ছিলেন একজন চিত্রকর। তাই এঁর ছবিগুলির মধ্যে চিত্রকরী বিদ্যার স্পর্শ পাওয়া যায় এবং তাই ইনি ইউক্রেনিয়ানদের জীবনস্রোত অতি বাস্তবভাবে "আর্থ" ও "আর্সেনালের" মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এঁদের পর একদল তরুণ ও উদীয়মান পরিচালকের হাতে রাশিয়ার বর্ত্তমান চিত্রশিল্প সত্যসত্যই উঁচুধরণের হ'চ্ছে। "বার্ণেট", "এর্মলাম", "উডকেভিচ", "আলেক্সান্ড্রভ" "পেট্রোভ" প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভ্যাসিলিয়েভ ব্রাদার্সের অন্যতম অবদান "চাপায়েভ" রাশিয়ার বিপ্লব-মুহূর্ত্তের এক অধ্যায় নিয়ে তোলা এবং এতে একদিকে "মাদার", "পোটেম্‌কিন" ও "আর্থের" সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখা হ'য়েছে, আর একদিকে সেই সৌন্দর্য্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা হ'য়েছে। এঁদের কার্য্যধারা আইসেনষ্টেইন, পুডভকিন ও ডভজেঙ্কোর কর্ম্মপ্রচেষ্টার আর এক নূতন ক্রমপরিণতির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান রাশিয়ায় "চাপায়েভই" চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ অবদান নয়—এছাড়াও "পেজাণ্ট", "ইয়ুথ অফ ম্যাক্সিম", "লেনিন ইন্ অক্টোবর", "উই ফ্রম ক্রনষ্ট্যাড্ট্", "পিটার আই" প্রভৃতি ছবিগুলিও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। "উই ফ্রম ক্রনষ্ট্যাড্ট্" ছবিখানি সম্পর্কে "জি-আই-কে"র প্রধান পরিচালক আইসেনষ্টেইন বলেছেন—"The sailors of the Kronstadt continued the revolutionary work of the sailors of Potemkin." বাস্তবিক রাশিয়ার দুঃসাহসপ্রবণ চিত্রজগতে এই ছবিখানি এক নূতনতর অবদান।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই চিত্রজগত শুধুমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদী জনসাধারণের উপরই প্রভাব বিস্তার করে নি—রাশিয়ার বাইরে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকেও প্রভাবান্বিত ক'রেছে এবং সেজন্য ওসব দেশেও এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। "অল কোয়াইট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট", "ক্যামেরাডশ্যায়াট্", "এমিল জোলা", "কনফেসান অফ নাজী স্পাই", "গুড আর্থ" প্রভৃতি ছবিগুলি একেবারে সোজাসুজি সোভিয়েট সিনেমার আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবান্বিত। এমন কি আজ জীবন্ত জনতার রূপ দেওয়ার জন্য "গ্রীয়ারসন", "পলরোথা", "আইভর মণ্টেগু", "বেসিল রাইট", "ক্যাভাল-ক্যাণ্টি" প্রমুখ পরিচালকদের নেতৃত্বাধীনে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলছে, তাও সোভিয়েট সিনেমার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই হ'চ্ছে।

সোভিয়েট সিনেমার বর্ত্তমান অবস্থা যদিও "জি-আই-কে"র প্রধান পরিচালক আইসেনষ্টেইনের ভাষায়—

"The Soviet Cinema is now passing through a new phase—a phase historically logical, natural and rich in fertilising possibilities."

তবুও আজ সোভিয়েট রাশিয়ার সিনেমা দেখে সুপ্রসিদ্ধ সিনেমা সমালোচক C. A. Leujeune এই কথাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে—

"The vitality of the Soviet Cinema is one of the seven wonders of the modern world."*

---

* ডি জি টেণ্ডালকর সিনেমাটোগ্রাফী শিক্ষার্থী হিসাবে ভারতবর্ষ হ'তে মস্কো যান। এঁরই লেখার সাহায্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হ'য়েছে।—লেখক।

# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

**শ্রীহাসিরাশি দেবী**

( ৬ )

দিন যায় আবার আসেও আগের মত, কিন্তু বিপিন আর মেয়ে নিয়ে ফিরে আসে না। একজন লোকের মুখে জানিয়ে পাঠিয়েছে যে, সে আসতে পারছে না নানা কারণে; কিন্তু তার জন্য ভাবনার কিছু নেই, শিগ্‌গিরই ফিরবে।

অন্নদা ভাবে। বলেও "ঘটি বাটি পাঁচটা কাছাকাছি থাকলেই এতে ওতে ঠোকাঠুকি বাধে, শব্দও হয়; কিন্তু তাই ব'লে সেইটেকেই বড় করে সেগুলো আলাদা জায়গায় সরিয়ে সরিয়ে রাখলে তো সংসার চলে না, শোভাও বৃদ্ধি পায় না তাতে। বরং ঠোকাঠুকিই হ'ক কি শব্দই হ'ক, যার যে জায়গা সেইখানেই তাকে সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়, নইলে সংসার ভাঙে।"

কথাটা প্রথমে গায়ে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে সৌদামিনী। পুকুর পাড়ে গরু বেঁধে ফিরতে ফিরতে দরজায় অন্নদাকে দেখে প্রশ্ন করলে, "গেল কে, আদু আর আদুর বাপ নয়? কোথায় গেল ঠাকুরঝি?"

কোথায় যে গেল, অন্নদা তা ভালোরকম জানলেও—চুপ ক'রে গেল সে কথায়; বললে, "হ্যাঁ ওরাই বটে। কোথায় যে গেল তা জানি নে, কিন্তু কেন গেল তা জানি।"

সদু মুখে কোনও কথা না ব'লে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অন্নদার দিকে। বললে, "কথা কাটাকাটি হয় না কার ঘরে? কোন সংসারে ঝগড়াঝাঁটি হয় না শুনি?"

সৌদামিনীর চোখে ক্ষণিকের জন্য চিন্তার ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল; বললে, "সে কথা একবার! আমি এর সব হাড়ে হাড়ে জানি ঠাকুরঝি, আমাকে আর নতুন ক'রে বোঝাতে হবে না। ওই এক ছেলের একগুঁয়ে স্বভাব নিয়ে আমি দিন রাত জ্বলে পুড়ে মরছি, আমি এর মর্ম্ম বুঝি নে? আমি তবু মা, তাই চোখ কান বুজে ঘর করি, কাক পক্ষীটি পর্য্যন্ত টের পায় না সংসারের কথা।"

অন্নদা এ কথার উত্তর দিলে না, নীরবে অন্য দিকে চেয়ে রইল। সৌদামিনী বললে, "বেলা বেড়ে উঠছে ঠাকুরঝি, ঘরের বাসী কাজেও তো এখনও হাত দিলে না! যা হো'ক দুটো খাওয়া দাওয়া করতে হবে তো।"

অন্নদা দুঃখ ক'রে বললে, "কিসের জন্যে বউ? কার জন্যে রান্না, কে বা খায়। ছিলাম তিনটে প্রাণী, তাই খাওয়া-দাওয়ার পাট, রান্নার পাট ছিল যা হ'ক কিছু। কিন্তু এখন একটা পেট, একমুঠো ছাই দিলেও ভ'রে যায়, তার আবার ভাবনা!"

সৌদামিনী বিস্মিত হ'ল। বললে, "তা হ'লে আজ রাঁধবে না?"

অন্নদা বললে "সে ভেবে চিন্তে দেখা যাবে এখন সে ভাবনা তোর নেই। বেলা বাড়ল এখন নিজের ঘরের কাজ দেখ গে যা।"

সৌদামিনী হাসলে, বললে, "আমায় ভুলিয়ে দিয়ে বাড়ি পাঠাতে চাও ঠাকুরঝি, তা বেশ, আমি চললুম, কিন্তু আমার মাথার দিব্যি, যদি না খাওয়া-দাওয়া কর।"

সৌদামিনী চ'লে গেল, অন্নদা কিন্তু বাড়ির ভিতর গেল না, সেইখানেই, দাঁড়িয়ে রইল তেমনি স্তম্ভিতভাবে।

দুপুর বেলা একছড়া পাকা মর্ত্তমান কলা, আর এক আঁচল চিঁড়ে নতুন গামছায় বেঁধে এনে দেখা দিল মানিক। অন্নদা তখন রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে সদ্যস্নানে ভেজা চুলগুলো শুকোচ্ছিল। মানিককে দেখে ফিরে বসতে সে এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, "চিঁড়ে আর এই পাকা কলা কয়টা মা পাঠিয়ে দিলে পিসীমা।"

অকারণে অন্নদার দুই চোখ জলে ছলছলিয়ে উঠল। "আ আমার পোড়া কপাল! আমার খাবার জন্যে আবার চিঁড়ে কলা যত্ন করে পাঠানো? ওরে বাবা, আমার খাবার কপাল যদি ক'রেই আসব, তবে ভাতার পুতের মাথা খেয়ে এ বাড়িতে ঢুকব কেন?"

অন্নদা চোখে আঁচল চাপা দিলে। মানিক কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল; হাতের কলা আর চিঁড়ে নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। উঠনের এক পাশে নিদ্রিত একটা কঙ্কালসার কুকুর এই সময় অন্নদার কান্নার শব্দে চমকে উঠে একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে, একটু তফাতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। দুঃখের বোঝা বুক থেকে একটু হালকা ক'রে অন্নদা মুখে চোখে আঁচল ঘ'ষে লাল ক'রে ফেললে। ঘর থেকে একটা ছোট জায়গা বার ক'রে এনে নামিয়ে দিয়ে বললে, "ব'স বাবা, উঠে বস।"

বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিসগুলি জায়গাটিতে তুলে রেখে মানিক উঠে বসল, কিন্তু হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারলে না। না পারার কারণও ছিল। অন্নদাকে সে অনেকবার দেখেছে, পিসীমা ব'লে ডেকেছে এবং কথাও বলেছে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য। শুধু অন্নদাই নয়, তার নিজের গুটি কয়েক বন্ধুবান্ধব এবং বাক্যালাপের দুই একটি জায়গা ছাড়া সে কথাই বলে অল্প। তার ওপর চিরদিন সৌদামিনীর অঞ্চলের আওতায় বর্দ্ধিতহৃদয় মানিকের মনে দুঃখ শোক দুর্দ্দশা ইত্যাদি দেখলেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

ওর বিস্ফারিত চোখ আর বিপন্ন মুখের অবস্থা দেখে অন্নদাও বোধ হয় ওর মনের খবর অনুমানে বুঝলে। দুঃখ কান্নার ছায়াচ্ছন্ন মুখটা নিমেষে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা, করলে "বউ কি করছে এখন বাবা মানিক?"

"মা?" একটা ঢোক গিলে মানিক বললে, "মা রাঁধছে।"

নিজের মনেই অন্নদা বললে, "তা বেলাও তো হয়েছে কম নয়! দেড়টার গাড়ি কখন চ'লে গেছে। খাওয়া-দাওয়াও তো করতে হবে।"

এতক্ষণের পর মানিক যেন বলবার মত একটা কথা খুঁজে পেলে। বললে, "তুমি না কি 'রাঁধবে' না বলেছিলে? তাই"—

আর বলতে হ'ল না, অন্নদা মনের যে জায়গাটায় অতি কষ্টে আবরণ টেনে এনেছিল তার ওপর আঘাত পড়তেই আবার তার দুচোখ জলে ভ'রে এল। বললে, "ও, হ্যাঁ। কি জান বাবা মানিক, একা বিধবা মানুষ আমি, আমার রান্নাবান্না ঘর

ক'রে করা কাদের জন্যে? যারা আনন্দ ক'রে খাবে তাদেরই জন্যে তো? তারাই যখন রইল না, সামান্য কথার যা না সইতে পেরে বাড়ি ঘর ছেড়ে চ'লে গেল, তখন আবার হাঁড়ি চড়ান!"
মানিক ব'ললে "কিন্তু পেট তো বুঝবে না পিসীমা, খিদে যে মানা মানে না।"
অন্নদা ব'ললে, "জানি ব'লেই মনে করছি যে এ বাড়িতে আর নিজের একমুঠো ভাতের জন্যে হাঁড়ি চড়াব না, যে ভিটে ছেড়ে এসেছি, সেই ভিটেতেই ফিরে যাব আবার। তার পরে আবার ভাত খাব, আবার হাঁড়ি উনুনে চড়াব বাবা, এখানে আর নয়।"
মানিক প্রবোধ দিলে, "যারা ভুল ক'রে গেছে পিসীমা, তারা আবার ফিরে আসবেই ভুল শোধরাতে। তাই ব'লে তুমি আর ভুল ক'রো না, তাতে মনে কেউই শান্তি পাবে না—না তুমি, না তারা।"
অন্নদা চুপ ক'রে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল। মানিকের কথা বলাটা একেবারে মিথ্যা ব'লে তার মনে হ'ল না, বরঞ্চ ভালই লাগল শুনতে। তবু মুখে বললে, "তাই কি হয় বাবা, তাদের ভুল তারা ভুল বলে স্বীকার করবে কেন। বরঞ্চ মুখে না বললেও মনে ভাববে, চিরকালটা যে গলগ্রহ বয়ে এলাম, তার দ্বারা শান্তি পাওয়া দূরে থাক অশান্তিতেই জ্ব'লে পুড়ে সমস্ত জীবন শুখিয়ে উঠল। তারা বাড়ির মালিক, আমি কোথাকার কে? হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর খুইয়ে সেই যে এসে এ বাড়িতে ঢুকেছি, তার পর আজ পর্য্যন্ত এর চৌকাঠ ডিঙইনি, হাঁড়ি হেঁসেলও ছাড়ি নি এক দিনের তরে।"

একটু নীরব থেকে আবার বললে, "আর ওই যে থুবড়ো মেয়ে, ওর জন্যেই তো এত গণ্ডগোল, এত অশান্তি। কিন্তু সে কথা বুঝবে ওর বাপ? না লোকেই বুঝবে সে কথা? ভাববে সব দোষই বুঝি আমার একার, আমিই বুঝি দিন রাত ওর সঙ্গে কারণে অকারণে খ্যাচ খ্যাচ করি!"
মানিক এইবার ওই থুবড়ো বুড়ো মেয়ের কথার প্রসঙ্গে একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল। একদিন সৌদামিনী ঐ থুবড়ো বুড়ী মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাকে যতখানি সচেতন ক'রে তুলেছিল সেই চেতনাই আজ হঠাৎ যেন তাকে বিমনা ক'রে ফেললে শুনলে, অন্নদা বলছে, "এত বড় মেয়ে হয়েছে, এখনও গুরুজনের মান রেখে কথা কাইতে জানে ও! শুধু চোপা আর ঝগড়া! হয়েছে কি, যে সংসারে ও যাবে সেই সংসার ছারেখারে দেবে ব'লে দিলাম।"

মানিক অন্যমনস্ক থেকে শিউরে উঠল, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ আসি পিসীমা, বেলা যাচ্ছে।"
অন্নদা নিজের দুঃখের চিন্তাতেই আবার অন্যমনা হয়ে পড়েছিল হয়তো, হঠাৎ মানিকের কথায় চকিতে উঠনে এসে পড়া পড়ন্ত রোদের দিকে চেয়ে বললে, "হ্যাঁ, বেলা হ'ল বই কি।"
মানিক পা বাড়াল বাইরের দিকে। উঠনের পরেই মাটির প্রাচীর, তার পরে দরজা পার হ'লেই বড় রাস্তা।
সে রাস্তা লাল ধুলোয় ঢাকা। সেই রাস্তা ধ'রে মানিক যখন বাড়ি এসে পেঁছুল, সৌদামিনী তখন রান্নার হাঙ্গামা শেষ ক'রে উত্তরের দাওয়ায় ব'সে ছেঁড়া ছাতাটায় এক জায়গায় ছুঁচ সুতোর সাহায্যে তালি দিচ্ছিল। ছেলেকে আসতে দেখে হাতের কাজ করতে করতেই প্রশ্ন করলে, "দিয়ে এলি?"
"হ্যাঁ।" ব'লে মানিক ব'সে পড়ল দাওয়ায়। বললে, "তা যাই বল মা, কাজটা কিন্তু বিপিন খুড়োর মোটেই ভাল হয় নি।"
"কি কাজ রে?"
"এই সামান্য কথায় রাগ ক'রে মেয়ে নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পরের বাড়ি গিয়ে থাকা।"
"পরের বাড়ি কোথায়?"
"কেন, আদুর বড় পিসীর বাড়ি।"
"ও মা, বলিস কি?" ব'লে সদু গভীর বিস্ময়ে গালে হাত দিলে। বললে, "মেয়ে শুনেছি রাইউলী! ঘর ছেড়ে কবে বেরিয়ে গেছে।"

মানিকও যেন এ কথা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, কোনও উত্তরই খুঁজে পেলে না। নীরবে সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। এ যেন তার কাছে একেবারে নূতন, একবারে অদ্ভুত রকমের কথা। সেই আদু,—গ্রাম্য, কলহ নিপুণা আদু, শুধু গ্রামেরই উপযোগী সেই অসভ্য মেয়েটি কেমন ক'রে যে সেই শহরের সভ্যতা, শহরের চাল-চলনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে! তার পর বিপিন। সেই বা বাপ হয়ে কেমন ক'রে মেয়েকে সেখানে নিয়ে গেল?

মানিকের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনীরও চিন্তাধারা একই খাতে বইছিল। সে ভাবছিল, হ'তে পারে পিসী ভাইঝিতে ঝগড়া, অমন ঝগড়া তো নিত্যি হয়। তাই ব'লে বিপিন বাপ হয়ে অতবড় মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তুলল কি না সেই বাইউলী বোনের বাড়ি? যে বোন কর্ম্মদোষে সমাজ ছাড়া, গ্রাম ছাড়া, যার নাম মুখে আনতেও লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরায়, তারই বাড়িতে! বিপিন কি শেষে রাগের ঝোঁকে পাগল হ'ল না কি? না, মেয়েটাকে—

না, আর ভাবতেও বিপিনের ওপর সদুর ঘৃণা হয়। ছেলেকে হতাশ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সদু জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে মানিক?"
মানিক মলিন হাসি হাসল।—"কই, কিছু নয় তো!"
চকিতের জন্য সদুর মনে হ'ল মানিকের উজ্জ্বল মুখখানা যেন উদাস। আরও মনে হ'ল, বিপিন প্রস্তাব করেছিল মানিকের সঙ্গে আদুর বিয়ে দেবার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল কে জানে, এ প্রস্তাবের মধ্যেও বিপিনের কোনও চালাকি লুকোন ছিল কি না। অনায়াসে যে নিজের সন্তানের এমন সর্ব্বনাশ সাধন করতে পারে সে মানুষ দুনিয়ায় পারে না কি। সদু একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। বললে, "থাকগে পরের আলোচনা, আমি তোর ভাল দেখে বিয়ে দেব। রাঙা টুকটুকে বউ আনব, দেখিস তখন! সে বউ হবে আদুর চেয়েও ঢের ফরসা, ঢের সুন্দর।"

মানিক উত্তর দিলে না, কেমন যেন একটু উন্মনাভাবে চেয়ে রইল সামনের দিকে। সদু বললে "বেলা হ'ল মানিক, চান করতে যা।"

মানিক বললে, "যাই।"

( ক্রমশ )

# হিন্দু সমাজের ব্যাধি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(২২)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাঙলা সাহিত্য বাঙালী হিন্দুর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী বাঙলা সাহিত্য অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে কি সেই কথা বলা যাইতে পারে? তরুণেরা এই সাহিত্যের নানা বিচিত্র মনোহর নাম দিয়া থাকেন, যথা—অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্য, যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্য, সাম্প্রতিক সাহিত্য ইত্যাদি। কিন্তু নামগুলি যতই গালভরা বা শ্রুতিমধুর হউক না কেন, জিনিষটা আসলে কি? এই সাহিত্য কি জাতিকে কোন মৌলিক বলিষ্ঠ চিন্তার সন্ধান দিতে পারিয়াছে, অথবা সমাজকে কোন উন্নততর আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের সংঘর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন বাঙলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শক্তি ছিল, তেজ ছিল—চিন্তার মৌলিকতা ও সজীবতা ছিল, একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের ভাব তাহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য কেবল চিন্তার মৌলিকতা বা সজীবতার দিক হইতেই নিকৃষ্ট নহে,—একটা অবসাদগ্রস্ত, অতৃপ্ত ভোগবিলাসকামী, পৌরুষহীন নিস্তেজ মনের শোচনীয় বিকাশ ইহার মধ্যে দেখিয়া জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা হতাশ হইয়া উঠি। এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা নিজেদের বাস্তববাদী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত অত্যধিক আদর্শবাদী ভাববিলাসী বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু দেশ ও জাতির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এমন কি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এই নূতন সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আলোকলতার যেমন মূল নাই, শূন্যে ঝুলিয়া থাকে, এই অতি আধুনিক সাহিত্যও তেমনি সমসাময়িক জীবন হইতে যেন কোন রস সংগ্রহ করিতে পারে না। পরাধীনতার জ্বালা, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অগণিত নরনারীর দারিদ্র্যপূর্ণ দুর্ব্বহ জীবনভার, প্রাণহীন সমাজের অশেষ গ্লানি ও নৈরাশ্য—অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে এই সমস্তের কোন প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই কি? এই সাহিত্যে যে সমস্ত নরনারীর চিত্র অঙ্কিত হয় তাহারা এ দেশের বা সমাজের নয়, তাহাদের চিন্তা, ভাবনা, চরিত্রের সঙ্গে আমাদের চারিদিককার পরিচিত নরনারীর কোন মিল নাই। ইহাদের পরিকল্পিত "বালিগঞ্জ সমাজ" বৈষ্ণবদের "মানস বৃন্দাবনের" মত কল্পনা ও ভাববিলাসের রাজ্যেই বর্ত্তমান। একথা কেহ অস্বীকার করে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজ যেখানে ছিল, এখন আর সেখানে নাই, কালচক্রের আবর্ত্তনে আমরা বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি। আমাদের সম্মুখে আজ জীবন সংগ্রাম কঠোরতর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, পৃথিবীর চারিদিক হইতে নানা বিচিত্র চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত করিতেছে। যদি অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে এই সমস্ত সমস্যার ছায়াপাত দেখিতাম, ঐ গুলির সম্মুখীন হইবার একটা প্রচেষ্টা এইসব নবীন লেখকদের রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহারও কোন লক্ষণ আমরা এই সাহিত্যে দেখিতে পাই না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে এইসব অতি আধুনিক লেখকদের উদ্ভট ও অস্বাভাবিক কল্পনার মূল উৎস কোথায়, এই সব কৃত্রিম ও অবাস্তব নরনারীর চিত্র কোথায় ইহারা পাইল? ইহার সন্ধান করিতে হইলে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সমাজ ও সভ্যতার একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যে সত্য ও নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কঠোর নির্ম্মম আঘাতে তাহার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে মানুষের পশু প্রকৃতির আবরণ খুলিয়া গিয়া উহা একেবারে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে যে আদিম যৌন প্রবৃত্তি এতকাল কতকটা সুপ্ত ও সংযত ছিল, নীতির বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা উচ্ছৃঙ্খল বীভৎস মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। ইউরোপীয় যুদ্ধোত্তর সাহিত্য এই উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, কামসর্ব্বস্ব সমাজেরই চিত্র অঙ্কনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ঐরূপ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এই নূতন সাহিত্যে তাহারই ছায়াপাত হইয়াছিল। যে সব নরনারী এই নূতন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে তাহারাই প্রধান অভিনেতা। আমাদের দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা ইউরোপের এই যুদ্ধোত্তর সাহিত্যেরই নকল করিয়া বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে ও নকলে যে প্রভেদ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্য যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজের বাস্তব চিত্রই আঁকিয়াছিল,—ঐ সাহিত্যের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নরনারীরা নিছক কল্পনা রাজ্যের প্রাণী নহে, সত্যকার জীবন ও চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এ দেশের সাহিত্যে যখন ঐ সব নরনারীর চিন্তা, চরিত্র ও জীবন সমস্যার আমদানী করা হইল, তখন উহা উদ্ভট অস্বাভাবিক কাল্পনিক চিত্র মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। ঐ সব নরনারীও আমাদের সমাজে নাই, তাহাদের সমস্যাও আমাদের নহে। তাই যে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম নগ্ন পশুপ্রবৃত্তির চিত্র আমরা অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে দেখি, তাহাতে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠি, নিজের অন্তরেই লজ্জায় সংকুচিত হইয়া পড়ি। যদি মিথ্যা ও অবাস্তব বলিয়া একেবারে ফুৎকারে হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর এই সাহিত্য লইয়া এমন উদ্বেগের কারণ ঘটিত না। কিন্তু মিথ্যা ও অবাস্তবেরও একটা মোহিনী শক্তি আছে, মানুষের আদিম পশু প্রকৃতিকে উহা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ফলে সমাজ ও পরিবারের উপর উহার অনিষ্টকর প্রভাব ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচির বিকৃতি ঘটে। অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তাই আমাদের নিকট আশঙ্কার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সাহিত্য সমাজকে উন্নততর আদর্শ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, উহাকে নীচের দিকে টানিয়া লইবারই চেষ্টা করিতেছে। বাঙলার হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা নহে।

বাঙলার নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ এই শতাব্দীর প্রথম পাদেও একদিকে জাতীয় ভাবের উদ্দীপন এবং অন্যদিকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙলার নাট্যসাহিত্য প্রাণহীন, রঙ্গমঞ্চের অবস্থাও শোচনীয়; জাতীয় জীবন বা সামাজিক জীবনের উপর তাহার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর। "অপরাজেয় নাট্যশিল্পী" শ্রীযুত শিশির-কুমার ভাদুড়ী অভিনয়কলার নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে কয়েক বৎসর সজীব রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রধানত 'পুরাতন যুগের' নাট্য সাহিত্যের উপরই নির্ভর করিতেন। কিন্তু ইদানীং বাঙলায় কোন প্রথম শ্রেণীর নাটক রচিত হয় নাই। শিশিরবাবু কার্য্যত রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন নাট্যশিল্পীও তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চকে আচ্ছন্ন করিয়া সিনেমা বা ছায়াচিত্র এদেশে প্রসারলাভ করিতেছে। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও

এদেশে সিনেমার বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু এখন আর ইহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে, বিশষত বোম্বাই ও বাঙলায় একটা বৃহৎ সিনেমা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং এই নূতন শক্তিকে উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। বরং কিভাবে এই নূতন শক্তিকে দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহে সিনেমা কেবল আমোদপ্রদ নহে, উহা শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের সহায়ও বটে। আমাদের দেশেও যদি আমরা সিনেমা শিল্পকে ঐরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি, তবেই উহার সার্থকতা হইবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে সিনেমার মধ্য দিয়া যে সব ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হইতেছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশ ও সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। বাঙলা দেশে সিনেমার বিষয়বস্তু দেখিয়া মনে হয়, যাহারা এই সব বিষয়ের পরিকল্পনা করিয়াছে, দেশের সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে তাহাদের কোন পরিচয়ই নাই। এইসব ছবির নায়ক নায়িকারা কিম্ভূতকিমাকার জীব, তাহাদের রুচি বিকৃত, জীবন ও চরিত্র অস্বাভাবিক, এ দেশের বিরাট প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে তাহাদের কোনই যোগ নাই। বরং হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে বাস্তবজীবনের কিছু স্পর্শ থাকে, কিন্তু বাঙলা ছবিতে তাহার একান্ত অভাব। ইহারা বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করে, কোথায়ও তাহার অস্তিত্ব নাই। বিগত শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সমাজের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত প্রায়, সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট উহা এখন উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রগুলি সেই বিস্মৃতপ্রায় কিম্ভূতকিমাকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজকেই অতীতের গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া যেন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু সমাজ যে স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, আধুনিক বাঙলা সিনেমা তাহাকেই জীয়াইয়া তুলিবার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে কেন? আমাদের মনে হয়, ইহার কারণ, বাঙালী সিনেমা শিল্পী ও প্রয়োগ-কর্ত্তারা স্বদেশ ও স্বজাতির মর্ম্মস্থলের সন্ধান পান নাই। তাঁহাদের নিজস্ব কোন ভাব ও আদর্শ নাই, পাশ্চাত্য সিনেমার নিকৃষ্ট অনুকরণই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। বিশেষত সিনেমা নাট্য যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের না আছে সাহিত্যিক প্রতিভা, না আছে, নাট্যরস বোধ। সুতরাং ইঁহারা সকলে মিলিয়া শিব গড়িবার বদলে যে বানর গড়িবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

ফলে সিনেমা শিল্প আমাদের সমাজ জীবনের উপর ঘোর অনিষ্টকর প্রভাবই বিস্তার করিতেছে। ইহা ভাব ও আদর্শের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে, রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করিতেছে। একটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক জীবনের মোহ বিষের ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে। এই সর্ব্বনাশা মোহের প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সিনেমা শিল্পের ন্যায় আধুনিক সগীত ও নৃত্যকলাও হিন্দুর সমাজ জীবনের উপর কম অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় বাঙালীর কৃতিত্ব দেখিয়া পরম পুলকিত। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বভারতীয় সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় বাঙালীর ছেলেমেয়েরা শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে, এ কি কম গৌরবের কথা? কিন্তু হায়, অন্য দিকে বাঙ্গালীরা যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহা তাঁহাদের খেয়াল নাই! সঙ্গীত ও নৃত্যকলা জাতীয় বা সামাজিক মনের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইহা আমরা স্বীকার করি, কলাশিল্প হিসাবেও উহাদের স্থান উচ্চ সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গীত ও নৃত্যকেলার নেশা বাঙালী হিন্দুর ছেলেমেয়েদের যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা আমরা কখনই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করিতে পারি না। বরং অতিরিক্ত সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রবণতা বাঙালী হিন্দুর চরিত্র-দৌর্ব্বল্য এবং অধোগতিরই সূচনা করিতেছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়। তারপর বাঙালী হিন্দুর আধুনিক সঙ্গীতে যে তথাকথিত "নূতন সুরের" কথা আমরা শুনিতে পাই, সে জিনিষটা আসলে সাঁওতালী সুর ও গ্রাম্য মেঠো সুরের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা সঙ্গীতের উন্নতির পরিচয় নহে, অবনতিরই পরিচয়। বাঙালী হিন্দুরা যে তথাকথিত আধুনিক নৃত্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া জাঁক করা হয়, তাহার মধ্যে বীর্য্য ও সবল প্রাণের ছন্দের একান্ত অভাব। বরং জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি ও অবসাদের লক্ষণই উহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই শ্রেণীর সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কোন জাতির মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে না, একটা ক্লৈব্য ও অবসাদের ভাবই আনিয়া দেয়।

চিত্র শিল্প ও ভাস্কর্য্যও জাতীয় জীবনে ও সামাজিক জীবনে খুব বড় শক্তি সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, ঐ দুই শিল্পকলায় আধুনিক বাঙালীর দান সামান্য। বাঙ্গলার চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যের প্রাচীন ধারা বিলুপ্ত, কোন নূতন বিশিষ্ট রীতিও বাঙালী হিন্দু গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। যদি এই দুই ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর মন আরও সক্রিয় হইয়া উঠে, তবে উহার মধ্য দিয়াও আমরা জাতীয় অগ্রগতি এবং সামাজিক সমুন্নতির উপর নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিব।

আমরা আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্য লইয়া একটু স্পষ্টভাবেই কতকগুলি অপ্রিয় সত্য বলিলাম। তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা জাতীয় জীবন তথা সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যদি আমরা ঐ সব শক্তিকে সুপরিচালিত করিতে পারি, তবে জাতি গঠন এবং সামাজিক সমুন্নতির ধারাকেও উহার ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য ও শিল্পকলার আমূল সংস্কার করিতে হইবে।

(ক্রমশ)

**কোন্ দেশের সূর্য্যের আলো স্বাস্থ্যকর**

কোন্ দোকানের মিষ্টি ভাল এ না হয় খেয়ে সহজে বলা যায়; কিন্তু ফ্লোরিডা ও কালিফোরনিয়া এই দুই স্থানের মধ্যে কোন্ জায়গার সূর্য্যরশ্মি স্বাস্থ্যকর এ প্রশ্নের উত্তর

ভদ্রলোক অর্দ্ধাবৃত অবস্থায় সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করছেন

দিতে হ'লে অনেকখানি মুস্কিলে পড়তে হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত অনেকে এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। শেষে এক ভদ্রলোক দেহের অর্দ্ধেকটা আবৃত করে অনাবৃত অংশে ফ্লোরিডার সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করেন; বাকি আবৃত অংশটুকু কালিফোরনিয়ায় গিয়ে সেখানের সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করবার পর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন।

ছবিতে ভদ্রলোক অর্দ্ধাবৃত অবস্থায় সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করছেন। বহু অজানা বস্তুর সন্ধান করতে গিয়ে মানুষকে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়তে হয়। অদ্ভুত বেশভূষা পরিহিত এই ভদ্রলোককে দেখে জনসাধারণের কাছ থেকে কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা এসেছিল কিনা আমরা তার কোন খোঁজ পাইনি।

**ইলেকট্রিক মেশিনে দাড়ি কামান**

বড় বড় শহরে জনসাধারণের জন্যে হেয়ার কাটিং সেলুনের ব্যবস্থা আছে, ফলে নাপিতের জন্যে আর রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে হয় না। সম্প্রতি ইউরোপের কয়েকটি প্রধান প্রধান শহরে, রেল ষ্টেশনে, বাসে এবং সাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত বিশ্রামাগারে দাড়ি কামাবার এক ইলেকট্রিক যন্ত্র রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক'লকাতার সিনেমাতে, রেল-ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে এক আনি ফেলে যেমন করে শরীরের ওজন জানা যায়, ঠিক সেইভাবে এই যন্ত্রে দাড়ি কামাবার মূল্যস্বরূপ উপযুক্ত মুদ্রা ফেলে দিয়ে বেশ আরামে ইলেকট্রিক ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামান যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে

ইলেকট্রিক মেশিনে দাড়ি কামান

দাড়ি কামান খুব দ্রুত হয় এবং কোনরূপ রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে না। বাস বা ট্রেনের মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে এই ক্ষুর চালিয়ে দাড়ি কামান যায়। ক্ষুরের ধার কমে গেলে তার পরিবর্ত্তে নতুন ক্ষুর পাবার ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের দেশে এরূপ যন্ত্রের আবির্ভাব হ'লে দাড়ি কামান সমস্যা থেকে না হয় উদ্ধার পাওয়া যাবে, কিন্তু চুল ছাঁটিতে গিয়ে নাপিতের সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মঘট সংক্রামক ব্যাধির মতই চারিদিক সংক্রামিত করেছে। তার কথাই ভাবছি।

# আজ-কাল

### ভারতীয় রাজনৈতিক আবর্ত্ত

সিমলায় বড়লাটের সংগে গান্ধীজী ও জিন্না সাহেবের আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু ফলাফল এখনো কিছু জানা যায় নি। অবশ্য এ আলোচনা থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশার কারণ ছিল না। পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কে নতুন জরুরী আইনের আলোচনায় সেটা স্পষ্ট করে' বোঝা যায়।

কমন্স সভায় ভারত শাসন আইনের যে সংশোধন বিল গৃহীত হয়েছে তাতে দুটো ব্যবস্থা আছেঃ—(১) ভারতে ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজাদের উপর বড়লাটের কর্ত্তৃত্ব এবং তাদের সামরিক কাজে নিযুক্ত করার ক্ষমতা; (২) শত্রুর আক্রমণের ফলে ইংলণ্ড ও ভারতের যোগাযোগ ছিন্ন হলে সেই জরুরী অবস্থায় ভারত সচিব ও পার্লামেণ্টের অনুমোদন না নিয়েই বড়লাটের পক্ষে ভারতের শাসন চালাবার সর্ব্বময় ক্ষমতা।

এই বিলের ব্যাখ্যা প্রসংগে মিঃ এমেরী পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এ বিধান শুধু জরুরী অবস্থার জন্যে একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র; ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির কোনো প্রশ্ন এতে নেই। বড়লাটকে যে সর্ব্বময় ক্ষমতা দেওয়া হ'ল, সে ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন সাধারণ বৃটিশ নীতির সংগে সামঞ্জস্য করে'। যদি তিনি এমন কিছু করেন যা বৃটিশ নীতির সংগে খাপ খায় না, তাহলে পরে পার্লামেণ্ট তাঁর সে কাজ পাল্টে দেবে।

এর পরে নতুন করে' বড়লাটের সংগে ভারতীয় নেতাদের সাক্ষাতে কি লাভ তা তাঁরাই জানেন। গান্ধীজীর সংগে বড়লাটের তিন ঘণ্টা যে কথাবার্ত্তা হয়েছে তা গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করবেন। এজন্যে ৩রা জুলাই কমিটির একটা জরুরী বৈঠক হচ্ছে। জিন্না সাহেবও বড়লাটের সংগে আলাপে সন্তুষ্ট হন নি বলেই মনে হয়। কারণ তিনি তারপরই এক ফতোয়া দিয়ে লীগওয়ালাদের সরকারী যুদ্ধ কমিটিতে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন। হয় তো বড়লাট মুসলিম লীগকে ক্ষমতা অর্পণের চুক্তি করতে রাজী না হওয়াতে জিন্না সাহেবের গোঁসা হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে তাঁর ফতোয়া নিয়ে। বাঙলা ও পাঞ্জাবে লীগের মন্ত্রিসভা। কিন্তু সেই দুই মন্ত্রিমণ্ডলীর উদ্যোগে ঐ দুই প্রদেশে স্বভাবতই সরকারী যুদ্ধ কমিটি গঠিত হচ্ছে (অবশ্য অন্যত্রও লীগপন্থী মুসলমানেরা যুদ্ধ কমিটিতে যোগ দিচ্ছে)। এক্ষেত্রে জিন্না সাহেবের নির্দ্দেশ অরণ্যে রোদন নয় কি?

বড়লাট যে কি প্রস্তাব করেছেন তা জানা যায় নি; তবে শোনা যাচ্ছে, তিনি সব দলের লোক নিয়ে তাঁর শাসন পরিষদ বাড়াবার এবং বিভিন্ন প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পুরানো প্রস্তাবই আবার দিয়েছেন।

### সামরিক ও অসামরিক

ভারত শাসন আইন অনুসারেই বড়লাট ভারতীয়দের যুদ্ধের যে কোনো কাজে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারেন; তবে তাদের এখন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বলা হবে না বলে' মিঃ এমেরী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন।

সমরোপকরণ তৈয়ারীর কারখানায় চার সহস্রাধিক কারিগর নিযুক্ত করবার জন্যে বড়লাট এক অর্ডিনান্স জারী করেছেন। যে সব দক্ষ শ্রমিক বে-সরকারী কারখানায় কাজ করছে, তাদের এখন সেসব কারখানার কাজ ছেড়ে সরকারী কারখানায় কাজ করতে হবে। ভারতে সমরোপকরণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ৭ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বোম্বাই থেকে কয়েকদিন আগে খবর আসে যে, ভারতের উপকূলের কাছে "পাঠান" নামক জাহাজ টর্পেডো বা মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হয়েছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন বোম্বাই বন্দর বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

ভারত রক্ষা আইনের প্রয়োগ আরও তীব্র হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ত্তমান সংকটকালে 'জাতীয় বাহিনী' গঠনের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেওয়ার জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। পাঞ্জাবে বহু বামপন্থী কর্ম্মীকে ধরা হয়েছে; পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের পাঁচজন সদস্য তাঁদের মধ্যে আছেন। অন্যান্য স্থানেও বহু লোককে ধরপাকড় করা হয়েছে।

কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে "অন্ধকূপ হত্যা"র স্মৃতিস্তম্ভ উঠিয়ে দেবার জন্যে বি-পি-সি-সি'র তরফ থেকে শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের কাছে এক পত্র দেন; তাতে তিনি হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভের সংকল্পের কথা জানান। প্রধান মন্ত্রী জবাবে জানিয়েছেন যে, তিনি জুলাই মাসের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত করবেন; তার আগে কোনো গোলমাল না করতে তিনি আবেদন জানিয়েছেন। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকাতে কয়েকজন ইংরেজও চিঠি লিখে ঐ স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে ফেলতে বলেছেন।

## ইওরোপ

### পশ্চিমের যুদ্ধ

ফ্রান্সের সংগে জার্ম্মানী ও ইতালীর যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। ইতালীর সর্ত্ত সাধারণভাবে জার্ম্মান সর্ত্তেরই অনুরূপ হয়েছে; তবে ভূভাগ সম্পর্কে জার্ম্মান দাবী ছিল খাস ফ্রান্সের উপরে, আর ইতালীর দাবী ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী ফরাসী রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উপর। দক্ষিণ ফ্রান্সে ও ফরাসী আফ্রিকায় বিভিন্ন এলাকা ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে নিরস্ত্র করতে হবে। সিরিয়ার ফরাসী অধিনায়ক জেনারেল মিতেলহাউজার তাঁর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করে ঘোষণা করেছেন যে, সিরিয়া আর যুদ্ধ চালাবে না। লণ্ডনে জেনারেল দ্য গলকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন ফরাসীদের নেতা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

### কৃষ্ণসাগর

ফরাসী যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর পশ্চিমের যুদ্ধ আপাতত ঢিলে পড়েছে; কিন্তু রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে পূবে। এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে পূর্ণ আয়ত্তে এনে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে নজর দেন। তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেসারেবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা প্রদেশ সমর্পণের জন্যে রুমেনিয়াকে চরমপত্র দেন। রুমেনিয়া সে দাবী মেনে নেওয়ায় লাল ফৌজ ঐ দুই অঞ্চল দখল ক'রে নেয়। হাঙ্গারীও এই সুযোগে ট্রান্সিলভেনিয়া দাবী করবে ব'লে রুমেনিয়া মনে করে; কিন্তু হাঙ্গারীর প্রভু জার্ম্মানী সম্ভবত অনুমোদন না করায় হাঙ্গারী এখন কোনো গোলমাল করে নি।

সুযোগ বুঝে কৃষ্ণসাগর উপকূল নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসাই যে সোভিয়েটের এই অভিযানের উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। জার্ম্মানী এখন ইংলণ্ড আক্রমণোন্মুখ। বল্কানে তার ফিরবার উপায় নেই। রুমেনিয়াও নাৎসী হয়ে যাওয়ায় বৃটিশ সাহায্য প্রতিশ্রুতি বাতিল হয়ে গেছে। ইতালীও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সোভিয়েটকে বাধা দেবার কেউ নেই। মনে হয়, এর পর বুলগেরিয়াও তার কৃষ্ণসাগর উপকূল সোভিয়েটকে ছেড়ে দেবে। সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। বুলগেরিয়া এখন সোভিয়েটকে নানাভাবে তোয়াজ করতে আরম্ভ করেছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ শেষ হবার আগেই দার্দ্দানেলস্‌ও সোভিয়েট তার কর্ত্তৃত্বে নিয়ে আসবে বলে মনে হয়। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই সে দার্দ্দানেলস্‌এর যুক্ত কর্ত্তৃত্বের জন্যে তুরস্কের কাছে দাবী জানিয়েছে। বৃটেন এ সময় সোভিয়েটকে বিরূপ করবে, এ সম্ভাবনা কম; সুতরাং একা তুরস্কের পক্ষে সোভিয়েট দাবী প্রতিরোধ করা কঠিন হবে।

কৃষ্ণসাগর তীর হাতে এলে সোভিয়েটের সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত হবে। তখন সে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে—সে-সংগ্রামে শত্রু জার্ম্মানীই হোক বা আর কেউ হোক।

## জাপান

জাপান হংকং ও ইন্দো-চীনকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। জাপ মনোভাবের জন্যে হংকং ও ইন্দো-চীন থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাপান অবশ্য মুখে বলেছে যে, সে শুধু চীনে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু জাপ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আরিতা ঘোষণা করেছেন যে, সুদূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে সরে যেতে হবে। আর জাপ বাহিনী সিদ্ধান্ত করেছে যে, বর্ত্তমান ইওরোপীয় যুদ্ধের সুবর্ণ সুযোগে জাপানের উদ্দেশ্য অবিলম্বে সিদ্ধ করা হবে; এবং জাপ নৌ-বাহিনী বলেছে যে, আমেরিকা ও বৃটেনের সঙ্গে সংঘর্ষ জাপান পরিহার করতে চায়, এ খবর যে ভুল তা দেখিয়ে দেওয়া হবে। ফরাসী ইন্দো-চীন কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, ইন্দো-চীন আক্রমণ তাঁরা প্রতিরোধ করবেন।

## আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে পানামা খাল রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করে এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে যুদ্ধ জাহাজ আটলাণ্টিকে নিয়ে আসে; কিন্তু মার্কিন নৌবহর আবার প্রশান্ত মহাসাগরে ফিরে গেছে।

মিঃ হেনরী ফোর্ড বলে দিয়েছেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কারো জন্যে বিমান-ইঞ্জিন তৈরী করবেন না; অতএব বৃটেনের জন্যে আর ফোর্ড কারখানায় রোলস রয়েস বিমান-ইঞ্জিন নির্ম্মিত হবে না।

১।৭।৪০

—ওয়াকিবহাল

# পুস্তক পরিচয়

**পাতালপুরীর আংটি:**—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্টার্ণ ল হাউস; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

লেখক শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত। পাতালপুরীর আংটি বইখানি দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্ম্মান মহাকাব্য Nibulengen-এর অনুসরণে লিখিত। বিদেশী রূপকথা, লেখকের স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ ভাষায় সত্য সত্যই ছেলেমেয়েদের লোভনীয় হইয়াছে। বইটিতে বীরত্ব কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি চিত্রেরও সমাবেশ আছে। একবার পড়িতে বসিলে শেষ পর্য্যন্ত পেঁছাইতে না পারিলে মনের অপরিসীম উদ্বেগ, আনন্দ ও অশ্রু সংবরণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। রূপকথার বই সে দিক দিয়াও প্রকাশকের দৃষ্টি-কার্পণ্যের প্রকাশ পায়নি। রঙিন ভাল কাগজ ও প্রচ্ছদ পট রূপকথার বইয়ের উপযোগী হইয়াছে।

উপহারের এমনি একখানি বই সত্য সত্যই যে লোভনীয় হইবে তাহা বলিয়া না দিলেও সমাদর লাভ করিবে।

**শ্রীনিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী:**—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীহরিবোল কুটীর, রাধারমণ বাগ, নবদ্বীপ। মূল্য আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে পরম প্রীতিপ্রদ বস্তু। ভক্ত গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু'তে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী যে রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্তা চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—'শ্রীমদ্রূপ পদাঙ্ক ধূলি মস্তকে নিত্যং দধে'—সেই রূপ গোস্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি বিরুদাবলীর বিস্তার করিয়াছেন। রসিক ভক্ত মাত্রেই এই রস আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। বঙ্গানুবাদ সুন্দর, সরল এবং সরস হইয়াছে।

**পুরাতন রোগের জল-চিকিৎসা**—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডবল ক্রাউন ২১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জল-চিকিৎসা কোন নূতন জিনিস নয়। বহুকাল পূর্ব্বে হইতেই সমাজে ইহা নানাভাবে প্রচলিত ছিল। তবে পূর্ব্বে যাহা বিশৃঙ্খল-ভাবে করা হইত, বর্ত্তমানে তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই চিকিৎসায় কোন অর্থ ব্যয় নাই এবং কোন ঔষধও ব্যবহার করিতে হয় না। সাধারণত জল, বাষ্প, মাটি, ব্যায়াম ও বিশ্রাম এবং পথ্য প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত রোগ আরোগ্য করা হইয়া থাকে। এই সকল নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন পুরাতন রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি গ্রন্থকার এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। অত্যন্ত সহজ এবং গৃহচিকিৎসার উপযোগী করিয়াই বইখানি লেখা হইয়াছে।

**"পোল্যাণ্ডের কবি-পরিচিতি"**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস; জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৩১। মূল্য আট আনা।

পুস্তিকাটিতে তেইশটি পোলিশ কবিতার ইংরেজি অনুবাদের বাঙলা তর্জ্জমা এবং কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। পোল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি (Leopold Staff) 'লিয়োপোল্ড ষ্টাফ'এর পাঁচটি কবিতা এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালের আরও পাঁচজন খ্যাতনামা কবির কবিতার সরল বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। তিনজন নারী কবিরও—মার্জা কোনপ্নিকা, কাজিমিরা জাউইল টোস্কা, মির্জা পলিকাউসকা—কয়েকটি কবিতার অনুবাদ পুস্তিকাটিকে সংক্ষেপের মধ্যে পূর্ণতা দান করিয়াছে। কাব্য-তর্জ্জমায় সাহসিকতার প্রামাণ্য পরিচয় মৈত্রমহাশয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার 'ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকা'য় দিয়াছেন। তবে সেখানেও যেমন তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাউনিঙকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং তরল করিয়া পাঠকের কাছে পরিবেশন করিয়াছিলেন এখানেও তেমন কিছু করিয়াছেন কি না নিশ্চয়তার সঙ্গে বলিতে পারলাম না। কারণ এই অনুবাদের মূলে পোলিশ কবিতাগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের নাই। অবশ্য এইটুকু বলা চলে যে, এক্ষেত্রেও অনুবাদগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে।

এগারো পৃষ্ঠায় 'কোখানোউস্কি'র (Kochanowski) 'নিদ্রা' কবিতার উপরে যে চার লাইন কবি-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সে অংশটুকু তের পৃষ্ঠার শীর্ষে থাকিবার কথা নয় কি? মুদ্রাকরের আর উল্লেখ-যোগ্য কোন কৃতিত্ব নজরে পড়ে না।

**মৈত্র মহাশয়ের এ "পুস্তিকা"খানিরও 'আট আনা' দাম মধ্যবিত্ত পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ বেশী বলিয়াই মনে হইল।**

**চিত্রা ও পূর্ণতে 'আলোছায়া'**

শনিবার ৬ই জুলাই হইতে চিত্রা ও পূর্ণ চিত্রগৃহে এসো-সিয়েটেড প্রোডাকশনের প্রথম বাঙলা চিত্রার্ঘ্য আলো-ছায়ার শুভ উদ্বোধন হইবে।

কাহিনী কাহার রচিত জানান হয় নাই, তবে শ্রীযুক্ত দীনেশ দাশ ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। পংকজ মল্লিক ও শ্রীলেখা নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অন্যান্য ভূমিকায় নামিয়াছেন রতীন বন্দ্যোঃ, শ্যাম লাহা, শৈলেন চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মলিনা, মনোরমা, কুমারী মঞ্জরী প্রভৃতি।

রঞ্জন ও অশোক—সুলতার সংগে দুজনেরই অনেকদিনের পরিচয়—দুজনে আবার পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অশোক আভাষে সুলতার অন্তরের কথা বুঝিয়া বন্ধুর পথ হইতে নিঃশব্দে আত্মগোপন করে। কিন্তু বিদেশে চাকুরী পাইয়া রঞ্জনকে তখন তাহার কর্মস্থলে যাইতে হইতেছে এবং মাস ছয়েক বাদে ফিরিলেই সুলতার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে নদীতে ঝড়ে রঞ্জনের নৌকা (সংলাপে ষ্টীমারের কথা ছিল) ডুবিয়া গেল; এবং সহযাত্রী ভৃত্য তাহার মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিল। কিন্তু রঞ্জনকে পরদিন একটি বৈষ্ণবী যুবতী উদ্ধার করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। প্রাণ বাঁচিলেও রঞ্জনের মাথাটা বাঁচিল না। ঝড়ের প্রচণ্ড হাওয়ায় ও নদীর ঘোলাটে জল পান করিয়া এবং সর্বশেষে পাড়ের কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়া 'ভাগ্যচক্র' চিত্রের দীপকের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আর বন্ধু অশোকের অবস্থা 'জীবন মরণ' চিত্রের ডাক্তারবন্ধুর সংগে হুবহু মিলিয়া গেল। দুজনেই ডাক্তার পরিণতিও এক। শুধু একটু 'এদিক-ওদিক' করিয়া ঘটনাগুলিকে স্থানে অস্থানে জুড়িয়া দেওয়ার চেষ্টা মাত্র হইয়াছে।

প্রথমেই বলিতে হয় গল্পাংশ চিত্রখানিকে সর্বদিক হইতে ব্যর্থ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নায়ক ও নায়িকার বাচনভঙ্গিতে এবং ঝড়ের দৃশ্যটির দুর্বল চিত্র গ্রহণে ছবিটির মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছে। কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক ও উদ্ভট বলিয়া মনে হওয়ায় বারে-বারেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। একমাত্র তুলসীর চলিয়া যাই-বার সামান্য মুহূর্তখানি ছাড়া কোন সময়েই ছবিটি জামিয়া উঠে নাই। ইহার উপর নায়কবেশী পংকজ মল্লিকের প্রাণহীন আড়ষ্ট অভিনয় আগাগোড়া চিত্রটিকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি গানের পৃষ্ঠে গান জুড়িয়া দিয়া ছোট ছোট ফাঁক ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সুগভীর গহ্বর দৃষ্ট হইয়াছে। নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা শ্রীলেখার অভিনয় চলনসই তবে ভবিষ্যৎ তাহার উজ্জ্বল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু অন্ধকার ঢাকিবার মত প্রতিভা ইহার আছে বলিয়াই মনে হয়। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় ভাল লাগিল। শ্যাম লাহা দর্শকবৃন্দকে খুব হাসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তবে সেটুকু খুব সহজভাবে হয় নাই। তাহার গান গাহিবার দৃশ্যটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। মলিনা ও কৃষ্ণচন্দ্রের অভিনয় পূর্ববৎ। শৈলেন চৌধুরীর খুব সুযোগ না মিলিলেও তিনি নিজের পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। মনোরমার অভিনয় মন্দ নয়, কুমারী মঞ্জরীর আড়ষ্টতা ও ভয় দূর হয় নাই।

পংকজ মল্লিক ও কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলি সুগীত হইয়াছে, তবে রবীন্দ্রনাথের 'ভুবন ত আজ হোলো কাঙাল' গানটি গাহিবার সময়ে পংকজ মল্লিক মাঝে মাঝে নিজস্ব ঢং চালাইবার চেষ্টা করায় শ্রুতিকটু ঠেকিয়াছে। চিত্রটির রসমধুর সংলাপ উপভোগ্য।

'আলো-ছায়া' চিত্রের একটি দৃশ্য

শেষের দিকে অপারেশন থিয়েটারে শ্যাম লাহাকে হঠাৎ ডাক্তারের পোষাকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া আমাদের খটকা লাগিল। যাহার চরিত্রটি আগাগোড়া একটি নিরেট বোকা ভাঁড়রূপে অংকিত হইয়াছে, যে সামান্য একটা হিসাব কষিতে বারবার মাথা চুলকায় আর গুলাইয়া ফেলে, যে কথা বলতে গেলে অনবরত ঢোক গেলে ও 'মানে'র মধ্যে তলাইয়া যায় তাহাকে অমন একটি কঠিন অস্ত্র চিকিৎসার ডাক্তাররূপে দেখিয়া ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছিল। নায়িকার সখি লীলা চরিত্রটির অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না—একমাত্র সাজপোষাকে 'স্টাইল' দেখানো ও পিয়ানো বাজাইয়া গান গওয়ানো ছাড়া এই চরিত্রটির আর কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হইল না। নায়িকার চরিত্র স্ফুটনে সখি সাধারণত সহায়তা করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে তাহার উল্টাই দেখিলাম।

**মিনার্ভা:**

দস্যু প্রণেতা শ্রীযুক্ত আশু সান্যালের 'বন্দিনী' নামক দেশাত্ম-বোধক নাটক অভিনীত হইতেছে। শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও সরযু-বালা হরিমতী, বঙ্কিম দত্ত, প্রফুল্ল দাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

## নিউ সিনেমায় 'ইণ্ডিয়া ইন আফ্রিকা'

গত শনিবার হইতে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের জঙ্গলের ছবি 'ইণ্ডিয়া ইন আফ্রিকা' প্রদর্শিত হইতেছে। আফ্রিকার গহণ অরণ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিকানদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী লইয়া এই সর্বপ্রথম ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রটির কতকাংশ আফ্রিকার গহণ অরণ্যে গৃহীত এবং কতকাংশ কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে তোলা। গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া চিত্র আগ্রহোদ্দীপক হইতে পারে নাই, পরিচালনা ও আলোক চিত্র গ্রহণ আশানুরূপ হয় নাই। বন্য জন্তুদের দৃশ্য ও কাফ্রী নরনারী নৃত্য এই চিত্রের বিশেষ আকর্ষণ রণমলের ভূমিকায় নান্দ্রেকার সুঅভিনয় করিয়াছেন দিওয়ালীর ভূমিকায় উর্মিলা গুপ্তের অভিনয় চলন সই।

**নাট্য নিকেতনঃ**

এ সপ্তাহে এখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, প্রভা, নীহারবালা, নীরদা সুন্দরী, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে কয়েকটি বিখ্যাত নাটক অভিনীত হইবে।

আমরা জানিতে পারিলাম এখানে শীঘ্রই শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত একখানি নূতন নাটক অভিনীত হইবে। ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা ভিত্তি করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। সৌরীনবাবু শ্রমিক লইয়া বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন, আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় নাটকটি নূতন ধরণের ও ঘন রসবহুল হইবে।

**রঙমহলঃ**

শ্রীযুক্ত বিধয়াক ভট্টাচার্যের নূতন নাটক 'আঁধার পথে' ৭ই জুলাই মঞ্চস্থ হইবে। নাটকখানি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালনা করিতেছেন।

**নাট্য ভারতীঃ**

এখানে প্রতি শনি ও রবিবার শ্রীযুক্ত শচীনন্দনাথ সেন গুপ্ত বিরচিত নূতন নাটক 'নার্সিং হোম' সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, বিজয়কার্ত্তিক, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য্য, রাণীবালা, নিরুপমা, সুহাসিনী, সাবিত্রী প্রভৃতি অভিনেতৃগণ প্রধান চরিত্রগুলিকে রূপদান করিয়াছেন।

**ষ্টারঃ**

এখানে বর্তমানে পৌরাণিক নাটক 'উত্তরা' অভিনীত হইতেছে। শীঘ্রই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত নূতন নাটক পাঞ্জাব কেশরী রাণা রণজিৎ সিংহ মঞ্চস্থ হইবে।

ফিল্ম প্রাডিউসার্সের সামাজিক চিত্র 'শুকতারা'য় সন্তোষ সিংহ ও চিত্রা দেবী। ৬ই জুলাই রূপবাণীতে ছবিটি প্রদর্শিত হইবে।

## খেলা-ধূলা

( ৮৮২ পৃষ্ঠার পর )

**ওয়াটার পোলো খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা**

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার-পোলো লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় রেফারী মারাত্মক ত্রুটি করায় বিভিন্ন দল প্রতিবাদ করে। ফলে এসোসিয়েশন খেলা স্থগিত রাখিয়া সুব্যবস্থা করিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করে। এই আলোচনার ফলে এসোসিয়েশন রেফারীগণের খেলা পরিচালনা যাহাতে ঠিক মত হয় তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তিনজন বিশিষ্ট ওয়াটারপোলো রেফারীর উপর ভার দিয়াছে। এই তিন রেফারী বিভিন্ন খেলার জন্য রেফারী নিযুক্ত করিবেন ও কোনরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করিলে সেই রেফারীকে খেলা পরিচালনা হইতে বিরত করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া ওয়াটার-পোলো লীগ খেলায় যোগদানকারী দলসমূহ পুনরায় খেলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের খেলা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল গণ্ডগোলের অবসান করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহাতে আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আশা করি তাঁহারা এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

# সমর বার্তা

৬ জুন।—

ফ্রান্স ও ইটালির যুদ্ধবিরতির শর্ত প্রকাশিত হইয়াছে।— দক্ষিণ ফ্রান্স, টিউনিস, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ও অ্যালজিরিয়ার নির্দিষ্ট এলাকা নিরস্ত্র করিতে হইবে। ইটালি জিবুতি বন্দর ও জিবুতি আদ্দিসআবাবা রেলপথের ফরাসী অংশ ব্যবহার করিবার অধিকার পাইবে। ফরাসী জঙ্গী জাহাজ, সমরোপকরণ ও বিমানপোত ইতালি ও জর্মনির খবরদারিতে থাকিবে। ফরাসী বেতার বন্ধ করিতে হইবে। ফরাসীরা বাহিরে গিয়া ইতালির বিরুদ্ধে লড়িতে পাইবে না। ইতালীয় সৈন্যরা সর্বত্র যত দূর অগ্রসর হইয়াছে সেইখানেই অবস্থান করিবে। ইতালীয় বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

গত রাত্রে জার্মনরা নানা স্থানে বিমান হামলা করিয়াছে। ইংরেজরাও জার্মন অধিকৃত বহু স্থানে বা শহরে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল।

নিউ ইয়র্কের সংবাদ, রাশিয়ার দাবি মানিয়া জার্মনি নাকি রুমানিয়াকে বিনা যুদ্ধে রাশিয়ার হাতে বেসারেবিয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার জন্য রাজী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পানামার সংবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামাখালের উভয় প্রান্তে মাইন পাতিয়াছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে বড় বড় জাহাজ আটলাণ্টিক উপকূলে লইয়া আসিতেছে।

২৭ জুন।—

বুখারেস্টএর সংবাদ—সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট রুমানিয়ার নিকট বেসারেবিয়া ও বুকোভিনার উত্তরাঞ্চল প্রত্যার্পণের দাবি জানাইয়া চরমপত্র দিয়াছেন।

জিব্রালটারের সংবাদ—মঃ দালাদিয়ের ক্যাসাব্ল্যাঙ্কায় বন্দী অবস্থায় আছেন।

ব্রিটেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে গত রাত্রে জার্মন বিমানবাহিনী হামলা করিয়া গিয়াছে। তিনটি বিমান ভূপাতিত এবং ২।৩টি জখম করা হইয়াছে।

বর্দো হইতে প্রাপ্ত এক হাভাস এজেন্সির তারে ফরাসী অধিকৃত ইন্দো-চীন ও ম্যাডাগাস্করের গভর্নর জেনারেল পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হইয়াছে।

হংকংএর সংবাদ—হংকং সীমান্তে জাপবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা বাড়িতেছে।

২৮ জুন।—

সোভিয়েট সৈন্যেরা বেসারেবিয়া ও বুকোভিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুই প্রদেশের প্রধান শহর এখন সোভিয়েটদের হাতে। মস্কো বেতারের সংবাদ—সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের দাবি অনুসারে রুমানিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে বেসারেবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা প্রত্যর্পণ করিয়াছে। রুমানিয়ার গভর্নমেণ্ট পদত্যাগ করিয়াছেন; নূতন গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে।

গত রাত্রে জার্মন বিমানবাহিনী ওয়েল্স্এর একটি শহরে হামলা করিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীও কাল প্রকাশ্য দিবালোকে জার্মনির নানা স্থানে আক্রমণ চালাইয়াছে। বার্লিনের সরকারী নিউজ এজেন্সির সংবাদ—ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান হানোভা তেলের গুদামে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

কায়রোর সংবাদ—ব্রিটিশ বিমানবাহিনী ইটালির পূর্ব আফ্রিকায় গুড়া ও মাকাকার বিমানঘাঁটির উপর সফল আক্রমণ চালাইয়াছে। মালটাতেও পাঁচবার বিমান হামলা ঘটে।

২৯ জুন।—

ইতালীয় বিমান বাহিনীর স্রষ্টা, লিবিয়ার বর্তমান গভর্নর জেনারেল মার্শাল বালবো ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে সঙ্গিগণ সহ নিহত হইয়াছেন।

বুখারেস্টের সংবাদ—হাঙ্গারি ও বুলগেরিয়া রুমানিয়ার নিকট হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাওয়ার দাবি জানাইলে রুমানিয়া সসৈন্যে বাধা দিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

গত রাত্রে ব্রিটিশ উপকূলের নানা স্থানে জার্মনরা বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইংলিশ চ্যানেলের দ্বীপগুলিতেও জার্মনরা বোমা বর্ষণ করিয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগ ইংল্যাণ্ডের সমগ্র পূর্ব উপকূলকে সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জাপ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতা বেতারে সুদূর প্রাচ্যের ব্যাপারে জার্মন, ইতালি ও অন্যান্য জাতির হস্তক্ষেপ নিষেধ জ্ঞাপক সাবধান বাণী প্রচার করিয়াছেন।

নানকিংএর সংবাদ—চীনের জাপ হাইকমাণ্ড ব্রিটিশের নিকট দাবি করিয়াছেন, কুলুন হইতে চুংকিং সরকারের নিকট পণ্যপ্রেরণের সকল পথ বন্ধ করিতে হইবে।

৩০ জুন।—

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন, ব্রিটিশ বিমান আক্রমণের ফলে ইতালির মার্শাল বালবোর মৃত্যু হয় নাই। ইতালিকে জার্মনির যুদ্ধরথের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার অবিরাম প্রতিবাদের ফলে মুসোলিনির বিরাগভাজন বালবোকে লিবিয়ার গভর্নর করিয়া ইটালি হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। ঘোষণায় এই ঘটনায় জোর দিয়া মৃত্যুর আসল কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বুখারেস্টের ২৯ জুনের সংবাদ—সোভিয়েট লাল ফৌজ বেসারেবিয়া ও বুকোভিনা দখল সমাপ্ত করিয়াছে। রুমানিয়ার সৈন্যাপসারণ যথাপরিকল্পনা চলিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবমেরিন আটক করিবার জন্য পানামা খালের দুই মুখে জাল পাতিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১ জুলাই।—

সোভিয়েট বাহিনী রুমানিয়ার বেসারেবিয়া ও বুকোভিনা ছাড়াইয়া মোলদাভিয়া ও আলাশিয়ার ভিতর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে কোথাও কোথাও নাকি সংঘর্ষও হইয়াছে।

জার্মন বিমান বাহিনী ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্স্ ও স্কটল্যাণ্ডের কয়েক স্থানে হামলা করিয়া গিয়াছে। সামুদ্রিক ব্রিটিশ বিমান বাহিনীও শত্রুরাজ্যের বহু স্থানে হামলা করিয়া আসিয়াছে।

টোকিওর সংবাদ—এক জাপ সেনানায়ক সম্মেলনে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধের সুবর্ণসুযোগ কঠোর চিত্তে গ্রহণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত।

করাচির সংবাদ—একটা ব্রিটিশ ট্রলার তাড়া করিয়া ডেপথ্ চার্জের সাহায্যে একটা ইতালীয় সাবমেরিন পাকড়াও করিয়াছে। রোম বেতারের ঘোষণা—উত্তর আফ্রিকার ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্য মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি লিবিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

২ জুলাই।—

রুমানিয়া ১৯৩৪ সালের ১৩ এপ্রিলের ইঙ্গ-ফরাসী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাতিল করিয়াছে। বুখারেস্টের সংবাদ—তাহাদের পররাষ্ট্র নীতি রাশিয়া ও জার্মনির প্রতি সমভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন স্পষ্টত জার্মনির দিকেই ঝুঁকিয়াছে।

লণ্ডনের ১ জুলাইএর সংবাদ—ব্রিটিশ বিমানবহর হামবুর্গ ডার্মস্টাড, অসনব্রুক, হ্যাম, নরডার্নি, হান্টলোসেন, ডর্টমুণ্ড প্রভৃতি শত্রুস্থানের নানা সামরিক অঞ্চলে সাফল্যের সহিত হামলা চালাইয়াছে। জার্মনরাও গত কাল উত্তর স্কটল্যাণ্ডের এক শহরে বিমান হামলা করিয়াছে।

লণ্ডনের এক ইস্তাহারে প্রকাশ ইতালির সহিত যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত ইতালির ১৩টি সাবমেরিন নষ্ট করা হইয়াছে। নিউ-ইয়র্কের সংবাদ—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ব্রিটেনে মার্কিন সৈনা-বাহিনী ও নৌবাহিনীর সমরোপকরণ সরবরাহ নিষেধাত্মক এক বিলে সাক্ষর করিয়াছেন।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

**২৬ জুন।—**

যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান বাধাযুক্ত হইলে ব্রহ্ম ও ভারত গভর্নমেণ্ট যাহাতে পার্লামেণ্টের সহিত ছিন্নযোগ হইয়া কোনও আইনগত অসুবিধায় না পড়েন, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিল কমন্স সভায় পেশ করিতে গিয়া (যাহা গৃহীত হইয়াছে) মিঃ আমেরি বলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতের সমস্ত ইওরোপীয় প্রজাবর্গের পক্ষে অবশ্যক সৈনিকবৃত্তি (conscription) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন সভায় বাঙলা গভর্নমেণ্টের মিউ-নিসিপ্যাল সংশোধন বিলটি বিবেচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা দল তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—ঢাকা ও কলিকাতার নানা স্থানে, বজবজ, টিটাগড়, চন্দননগর, লখনউ, জামালপুর, ফরিদপুর, মহীসার, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, শিলং ও যোধপুরের নানা স্থানে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, নিষেধজারি প্রভৃতি হইয়াছে।

**২৭ জুন।—**

মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য দিল্লি যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। প্রধানত জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তর শান্তিরক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন—২৬ জুন তারিখের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এ ভারতরক্ষার বাধাজনক বিবৃতি প্রকাশের অপরাধে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দিল্লিতেও ব্যাপক ধরপাকড় হইয়াছে। এ ছাড়া কলিকাতার নানা স্থানে, চট্টগ্রামে, দিনাজপুরে, লাহোরের বহু স্থানে, অমৃতসরে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস প্রভৃতি হইয়াছে।

**২৮ জুন।—**

বড়লাট ভারতে সমরোপকরণ নির্মাণের কারখানাগুলিতে চার হাজার দক্ষ ও অর্ধদক্ষ কারিগরের অবশ্যক নিয়োগের বিধি সংবলিত এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন।

আগামী সপ্তাহে পুনরায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধি-বেশনের সম্ভাবনা।

ভারতরক্ষা আইন—পঞ্জাবের বহুস্থানে, বিশেষত লাহোরে এবং কলিকাতা, শ্রীহট্ট, চন্দননগর, সরিষাবাড়ি, দুবরাজপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতির নানা স্থানে ধরপাকড়, খানাতল্লাসি, নিষেধ-জারি, কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে।

লণ্ডনে সংবাদপত্রের কাগজের মূল্য টন প্রতি ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং বাড়িয়া যাওয়ায় সেখানকার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ-গুলির আয়তন হ্রাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

**২৯ জুন।—**

আজ বিকাল তিনটার সময় সিমলায় মহাত্মাজী ও বড়লাটের সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন পাঠাগারের উদ্যোগে বাঙালার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অষ্টষষ্ঠিতম মৃত্যুবার্ষিকী তাঁহার সমাধিস্থলে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আহূত এক সভায় সার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে অমর কবির স্মৃতিতর্পণ উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

সার আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ইন্সটিটিউট হলে তাঁহার বার্ষিক জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

**৩০ জুন।—**

আগামী ৩ জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে বলিবেন। প্রধানত হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই কমিটির আলোচনার বিষয় হইবে।

ভারতরক্ষা আইন।—ইম্ফল, ঢাকা, লখনৌ, ২৪ পরগনা, ঢেনকানল, রংপুর, মালদহ, কুমিল্লা, মোগা, বেতিয়া, জলন্ধর, এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে পূর্ণ উদ্যমে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসি, কারাদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছে।

**১ জুলাই।—**

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সভারকর ও মিঃ এম এস আনে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

কলিকাতার হলোয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবি জানাইবার জন্য এলবার্ট হলে চৌধুরী মোআজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীমতী লীলা রায়, মিঃ এ এম এ জামান প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

**২ জুলাই।—**

আজ বেলা দুইটার সময় ভারত রক্ষা আইনের বলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার এলগিন রোডের বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি বর্তমানে প্রেসিডেন্সী জেলে আছেন। মঙ্গলবার হইতে তিন দিন পর্যন্ত কাহাকেও তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে না। সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট জনসভায় এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা হয়। ভারতের নানা স্থানে ভারত রক্ষা আইনের প্রয়োগ প্রবল প্রতাপে চলিতেছে। কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির জরুরী অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ভারতের নেতৃবৃন্দ নিউ দিল্লিতে আসিয়া পৌঁছিতেছেন।

অতিশয় বৃষ্টিপাতের ফলে উড়িষ্যার নানা স্থানে প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে।
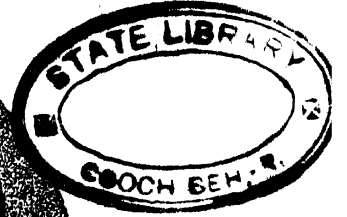
দেশ

৭ম বর্ষ ] শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৭ সাল Saturday, 13th July, 1940 [ ৩৫শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**মহাত্মাজীর অভিমত—**

গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের সাক্ষাতের পর দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির দীর্ঘ অধিবেশন হইয়া গেল। গান্ধীজী এই অধিবেশনে বড়লাটের সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা উপস্থিত করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত না হইলেও বড়লাট কংগ্রেসকে কি দিতে রাজী হইয়াছিলেন, সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে গান্ধীজী যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বেশই বুঝা যায়। বুঝা যায় যে, বড়লাট তাঁহার শাসন-পরিষদে অধিকসংখ্যক সদস্য নিয়োগ এবং প্রাদেশিক মন্ত্রি-মণ্ডলীর পুনর্গঠন ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করেন নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন,—"আমি কংগ্রেসকে এই প্রলোভন প্রতিরোধ করিতে বলিব এবং যাহারা গতানুগতিক উপায়ে ঐ সকল পদে কাজ করিতে অভিলাষী, তাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু আমরা, যাহারা স্বাধীনতা এবং উহা অর্জ্জনের একমাত্র উপায়ে বিশ্বাস করি, তাহাদের পক্ষে উদ্দেশ্য, উপায় সম্পর্কে দৃঢ় থাকা আবশ্যক। এইভাবে কর্ত্তব্য পৃথক করিয়া লইবার ফল ভাল হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।" মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—ভারতের আশু লক্ষ্য নিশ্চয়ই পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে আমাদের মনোভাব গোপন করিয়া কোন লাভ নাই। গান্ধীজীর এই সুস্পষ্ট এবং নির্ভীক বিশ্লেষণে ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির জটিলতা বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে।

---

**দেশরক্ষা ও অহিংসা—**

মহাত্মাজী 'হরিজনে' লিখেন,—ভারতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাক্রমণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাবলম্বন একটি বিবেচ্য বিষয়। বে-সরকারীভাবে বাহিনী গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। বৈদেশিক অথবা স্বদেশী কোন শক্তিই বে-সরকারীভাবে বাহিনী গঠন বরদাস্ত করিতে পারেন না। সুতরাং যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী থাকা আবশ্যক, বিলম্বেই হউক, অবিলম্বেই হউক, তাঁহারা ব্রিটিশ পতাকাতলে সৈন্যদলভুক্ত হইতে বাধ্য হইবেন। ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা সেই সিদ্ধান্তেই অবিচলিত থাকেন, তবে স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদিগকে শীঘ্রই কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সৈন্যদলভুক্ত হইতে পরামর্শ দিতে হইবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ফলে অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভের ধ্বনি নীরব হইবে এবং সেই সঙ্গে সত্যিকারের অহিংসারও অবসান হইবে।" এ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, বে-সরকারীভাবেই যে বাহিনী গঠন করিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই এবং কংগ্রেসকর্ম্মী যাঁহারা সরকারী সৈন্যদলভুক্ত হইতেও তাঁহাদের আপত্তির কারণ নাই। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী থাকার আবশ্যকতাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রথম প্রয়োজন হইল ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার। স্বাধীন ভারত নিজেদের স্বাধীনতার জন্য এবং আবশ্যক হইলে পরের স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ লইয়া সংগ্রাম করিতে পারে। কিন্তু স্বাধীন জাতির অধিকার ও মর্য্যাদা ভারতবাসীদিগকে দিয়া ভারতবাসীদের সাহায্য লাভের প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না। এমন অবস্থায় কংগ্রেস তাহার আদর্শকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি যদি আমাদের নাও থাকে, তবু আমরা যাহাতে আদর্শকে কোন তুচ্ছ প্রলোভনে ক্ষুণ্ণ না করি, ভগবান অন্তত এমন শক্তি আমাদিগকে দান করুন।

---

**ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ—**

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়া গ্রেট ব্রিটেন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা প্রচার করুক এবং ইহার প্রাথমিক স্তরস্বরূপে সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের

দ্বারা সমর্থিত একটি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করুক। ইহার দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সব বিষয় ভারতের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, সেগুলি উদ্ভবের সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা লাভ করিবার ব্যগ্রতা যদি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কিছুমাত্র থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেসের এই দাবী পুরোপুরি মানিয়া লইবার পথে বাধা এখন আর তাঁহাদের কিছুই রহিল না। শুধু কথার মারপেঁচের মধ্যে না থাকিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কাজের পথে নামিতে কতটা ইচ্ছুক—কংগ্রেসের এই দাবীর প্রতি তাঁহাদের মনোভাব হইতে অচিরেই তাহা অভ্রান্তভাবে বুঝা যাইবে।

---

**ব্রিটিশ জাতির কর্ত্তব্য—**

স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে, মহাত্মা গান্ধী কার্য্যকরী সমিতিকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সমিতি তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধীর কথা ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস অহিংস-নিষ্ঠ থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নৈতিকভাবে সমর্থন করিবে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করেন এবং তাহা ঘোষণা করেন, আর কেন্দ্রীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ওয়ার্কিং কমিটি যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য, আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মতামতের আলোচনা করিয়া এমন সিদ্ধান্ত করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, ওয়ার্দ্ধার অধিবেশনে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়াতেই তাহা বুঝা গিয়াছিল। এতদিন পরে ওয়ার্কিং কমিটি এই বাস্তব রাজনীতিক বোধ এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। স্থূল জগতের ব্যবস্থা বিচার করিতে গিয়া অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার কল্পলোকে বিলাস চলে না। মহাত্মাজীর নিজের মতের যৌক্তিকতা তিনি সম্প্রতি ব্রিটিশ জাতিকে নিরুপদ্রব অহিংসার পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের পর তিনি তাঁহার সেই নিজস্ব মত এবং ওয়ার্কিং কমিটির মত—এই উভয় মত ব্রিটিশ জাতির নিকট উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন—"আমার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ব্রিটিশ জাতির বীরত্বের গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে নিঃস্বার্থ অথচ বিশ্বস্ত বন্ধুস্বরূপে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, কংগ্রেস আজ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হইবে না।"

**সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ—**

শুধু বাঙলা নহে, ভারতের সর্ব্বত্র সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে কিরূপ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, কলিকাতার হরতাল এবং নিখিল ভারত সুভাষ দিবসের বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। কলিকাতার মেয়র কোয়ালিশনী দলের একজন মাতব্বর ব্যক্তি, তিনি এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেদিন নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মামুদাবাদের রাজা সাহেব সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'আমাদের দেশে জনসেবার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্র। আমলাতন্ত্র যে তাঁহার ন্যায় এক ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। যে হলওয়েল মনুমেণ্টকে কেন্দ্র করিয়া সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্ম্মী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যের এই গ্রেপ্তার, সেই হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের পক্ষে দেশের সকল সম্প্রদায়েরই মত দেখা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আজও কেন দাঁড়াইয়া আছে, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বহু নেতা ও কর্ম্মী কেন কারাগারে আছেন, ইহা রহস্যবিশেষ। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিব হলওয়েল মনুমেণ্ট সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতাও আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

---

**অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ—**

অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ ই জে গ্রিফিথস্ হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক সত্য মিথ্যা লইয়া চুলচেরা তর্ক করা এক্ষেত্রে অবান্তর। ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ভারতবাসী এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ভেদভাব সৃষ্টির যখন একটা উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন উহাকে রাজপথ হইত সরাইয়া শ্বেতাঙ্গদের গোরস্থানে রাখা হউক। ইতিপূর্ব্বেও শ্বেতাঙ্গ সমাজের পক্ষ হইতে এমন পরামর্শ সরকারকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে জনমতের সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে প্রধানত এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া সুভাষচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে—অবশেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রবীণ সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেব মহাশয়কে পর্য্যন্ত জেলে লইয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এদিকে সত্যাগ্রহও চলিতেছে। সরকারী মর্য্যাদার সঙ্গে যে ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই—অন্তত সে ক্ষেত্রেও জনমতের মর্য্যাদা দমন করিতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের এই দ্বিধা কিজন্য আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের অবিলম্বে ঐ স্তম্ভটি সরাইয়া ফেলিয়া অকারণ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে অস্বস্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহা মিটাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

**ভারতের জন্য মায়াকান্না—**

ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড সেদিন লণ্ডনের বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া আয়র্লণ্ড, ভারতবর্ষ এবং প্যালেষ্টাইনের জন্য কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আয়র্লণ্ড, প্যালেষ্টাইন এবং ভারতবর্ষে এখনও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া রাজনীতিক দাবী-দাওয়া চলিতেছে। এই বিরোধে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট কোন পক্ষে, ক্যাথলিক কোন পক্ষে, আরব কোন পক্ষে, ইহুদী কোন পক্ষে কিংবা মুসলমান কোন পক্ষে কিংবা হিন্দু কোন পক্ষে সকলেই জানেন। কিন্তু এ বিষয়টিই এখনও ইঁহাদের ভাল করিয়া বোধগম্য হইতেছে না যে, যাহাকে ধর্ম্ম বলে, এই সব বিরোধে নিষ্ঠুরভাবে তাহার উপরই আঘাত পড়িতেছে এবং এই সব সাম্প্রদায়িক বিরোধ আত্মরক্ষার শক্তিকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে; সকলের স্বার্থের জন্য সেই শক্তিকে দৃঢ় করা দরকার। আয়র্লণ্ড এবং ভারতবর্ষ বর্ত্তমানের পরিস্থিতিতে ইহাদের অবস্থা কি শোচনীয়! তাহারা কেবল তর্কবিতর্ক করিতেছে, বিবাদ করিতেছে, বচসা চালাইতেছে। সকলের সম্মুখে যে বিপদ আসন্ন সেদিকে দৃষ্টি তাহাদের নাই।" লর্ড মহোদয় যখন এত জানেন, তখন আয়র্লণ্ড কিংবা প্যালেষ্টাইনের আধুনিক ইতিহাস নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই। আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকদিগকে দমিত রাখিবার জন্য উত্তর আয়র্লণ্ডে আরেঞ্জম্যানদিগকে লইয়া বসান, আর প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের নিবাসভূমি করিবার জন্য আরবদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নীতির প্রয়োগ এবং তাহার ফলেই আয়র্লণ্ডে এবং প্যালেষ্টইনের জটিল সমস্যার সৃষ্টি—এ সত্যকে লর্ড মহোদয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আয়র্লণ্ড কিংবা প্যালেষ্টাইনের সম্বন্ধে লর্ড মহোদয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথার প্রভাব "ধর্ম্মের নামে রাজনীতি"র উপর কতখানি, লর্ড মহোদয় নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন। ভারতসচিবের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, ভারতসচিব হইবার পর তাঁহার সে মত সম্পূর্ণ ঘুরিয়া যায়—বিশ্ব ধর্ম্মসভার আধ্যাত্মিক আবহাওয়াতেও দেখিতেছি ভাবের ঘরের চুরির সেই কৌশলটির প্রয়োগপটুতা তাঁহার তেমনই রহিয়াছে। ব্রিটিশ রাজনীতির বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে!

---

**স্বাধীনতার জন্য পঞ্চতত্ত্ব—**

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বাধীনতার পঞ্চতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সাংবাদিকদের এক সভায় তিনি বলেন, জগতে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে আগে পাঁচটি বিষয় প্রয়োজন। বিষয়গুলি এই—(১) ভয় হইতে স্বাধীনতা; (২) সংবাদ পাইবার স্বাধীনতা; (৩) ধর্ম্ম সম্পর্কিত স্বাধীনতা; (৪) অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এবং (৫) অভাব হইতে স্বাধীনতা। ব্যবস্থা এমন সুলভ থাকিতেও জগতে শান্তির অভাব যে কেন, ইহাই চিন্তার বিষয়। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট যদি কৃপা করিয়া যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে এই পঞ্চতত্ত্ব প্রচার করিতেন, তবে জগৎ প্রলয়ের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইত। আমাদের মতে ঐ পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে অপরকে, বিশেষভাবে দুর্ব্বল জাতিকে লুণ্ঠণের স্বাধীনতা এই একটি জিনিষ যদি জুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্বপ্রেমিক মনীষিবর্গকে আর শান্তির জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না।

---

**ভারতে জাহাজ তৈয়ারী—**

কথায় আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমাদের কর্ত্তাদের অবস্থাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে কতকটা তেমনই। এতদিন পরে ভারত সরকারের জ্ঞান হইয়াছে যে, এদেশে জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবসাকে সাহায্য করা দরকার। ১৫ বৎসর আগে এই প্রশ্নটি উঠে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জাহাজ শিল্পের বড় একজন উপদেষ্টা পর্য্যন্ত আসিয়া সুপারিশ করিয়া যান যে, এদেশে জাহাজ তৈয়ারীর কারবারকে সরকার হইতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উপদেশ কথা পর্য্যন্তই থাকিয়া যায়, ভারত সরকার এদিকে কোন ব্যবস্থাই এতদিনের মধ্যে অবলম্বন করা দরকার বোধ করেন নাই, অধিকন্তু ভারতে জাহাজী ব্যবসার কথা তুলিলে কর্ত্তৃপক্ষের উপেক্ষা এবং পরিহাসই এদেশের লোক পাইয়া আসিয়াছে। এখন ভারতীয় নৌবহরে ৫০খানা জাহাজ তৈয়ারীর একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপারে বাঙলারই নাকি অধিক লাভবান হইবার কথা; কারণ জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইলে যেসব সুবিধা থাকা দরকার, তাহা নাকি বাঙলাদেশে সবচেয়ে বেশী আছে। বাঙলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশী এবং তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার, মিস্ত্রী, রাসায়নিক, ওভারসিয়ার ইত্যাদি গুণী লোকের অভাব নাই। এসবই আমাদের জানা ছিল, কিন্তু আমাদের কোন কথাই এ পর্য্যন্ত টিকে নাই, এখন যুদ্ধের চাপে কর্ত্তাদের টনক যদি নড়িয়া থাকে, আমরা তাহাতেই কৃতার্থ হইব। আমরাও চাই, বাঙলাদেশেই এদিকে উদ্যোগ আয়োজনটা আরম্ভ হয়। কিন্তু কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের মতিগতি দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা শুনিলাম, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কলিকাতাতে একটি জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা খুলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতির জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া ভিজাগাপট্টমে তাঁহারা সেই কারখানা খুলিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের যদি বাঙলাদেশের স্বার্থের প্রতি কোন বিবেচনা থাকিত, তবে তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। আমরা এখনও আশা করি যে, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে চৈতন্য হইবে।

---

**পুলিশ সাহেবের উৎসাহ—**

রাজনীতির গন্ধ পাইলে এ দেশের অনেক হাকিম এবং পুলিশ প্রভুর অতিরিক্ত উৎসাহ জাগিয়া উঠে। সম্প্রতি

ভারতরক্ষা আইনের মামলায় মফঃস্বলের কোন হাকিম আসামীকে সাড়ে চার বৎসরের জন্য জেলে ঠেলিয়াছিলেন, মামলার আপীলে ঊর্দ্ধতন আদালতের বিচারক এই মন্তব্য করেন যে, নিম্ন আদালতের হাকিম উৎসাহের চোটে বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন বরিশালের ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সাহেব মিঃ ডব্লিউ জে কোটামের নামে দেওয়ানী আদালতে একটি খেসারতের মামলা আনয়ন করেন। মামলায় সুধীরবাবুর জয় হয়। মিঃ কোটাম রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ হাতিয়াঙ্গদী আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু রায়ে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে—এই সমস্ত উৎসাহী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাদের অবিমৃষ্য-কারিতার দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা কঠোর করিয়া তুলেন। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরিশালের বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে বাহির হইলে সুধীরবাবু এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেস-কর্ম্মী কৃষিঋণের জন্য একদল কৃষককে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে গমন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট দেখা করিতে অসম্মত হন এবং সুধীরবাবু প্রভৃতিকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। চলিয়া যাইবার হুকুমের কথা শুনিবামাত্র পুলিশ সাহেবের উৎসাহের অনল জ্বলিয়া উঠে। তিনি সুধীরবাবুকে বেটন ও বুট দ্বারা এমন গুরুতররূপে জখম করেন যে, সুধীরবাবুকে দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতে হয়। জেলা জজের মন্তব্যের পর আমাদের আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, বাঙলার স্বরাষ্ট্র সচিব পুলিশের সৌজন্য এবং ভদ্রতার বাণী আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন। তাঁহার সেই সব উপদেশকে কার্য্যত মূল্য দিতে হইলে কোটাম সাহেবের মত পুলিশ প্রভুকে পুলিশের চাকুরী হইতে সরাইয়া অন্যত্র তাঁহার এমন উৎসাহ প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত।

---

**ভারতীয় সেনানী সংখ্যা বৃদ্ধি—**

ভারতীয় সেনা বিভাগে অফিসার বা সেনানী পদের জন্য একশত জন ভারতবাসীকে অবিলম্বে ১৫ই আগষ্ট হইতে স্পেশ্যাল কমিশনের জন্য শিক্ষার্থীস্বরূপে গ্রহণ করা হইবে। আগষ্ট মাসে এই যে একশত জনকে লওয়া হইবে, ইহা ছাড়া অক্টোবরে আরও দুইশত জন এবং ডিসেম্বরে আরও দুই-শত জনকে লওয়া হইবে। ডেরাদুনের সামরিক কলেজ এবং মধ্যপ্রদেশের মৌ নামক স্থানের শিক্ষাকেন্দ্রে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে বার্ষিক ১১ শত জন ভারতবাসী কমিশনড্ অফিসার বাহির হইতে পারিবে। সামরিক বিভাগে এতদিন পরে ভারতের সব সেনা বাহিনীতে ভারতীয় সেনানী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র যুবকদের মধ্যে নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যত লোক লওয়া হইবে, তাহার ৫ গুণ দরখাস্ত ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। যুদ্ধের ফলে ভারতের দিক হইতে ইহা একটা শুভ অবসর আসিয়াছে বলা যাইতে পারে। কর্ত্তাদের যে এখনও চৈতন্য হইয়াছে ইহা আশার কথা। সামরিক এবং অসামরিক জাতি বলিয়া সমর বিভাগে কৃত্রিম একটা জাতিভেদ এখনও রহিয়াছে। ইহার ফলে বাঙালীকে এই নূতন সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে ভারতের সেনা বিভাগ হইতে এই কৃত্রিম জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া উচিত।

---

**বঙ্গীয় মহাকোষ—**

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর পর 'বঙ্গীয় মহাকোষ' গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না বলিয়া অনেকে চিন্তিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, মহাকোষ যথারীতি সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হইতে থাকিবে। আমরা অধুনা প্রকাশিত ২য় খণ্ড ১৫শ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংখ্যায় "অনুপলব্ধি" হইতে আরম্ভ করিয়া "অনুভব" শব্দ পর্য্যন্ত আছে। আমরা জানিলাম, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সংখ্যার প্রায় সবই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিরও মোটামুটি কাজ তিনি অনেক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে লইয়া গঠিত সম্পাদক-গোষ্ঠী অতঃপর অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিবেন। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' বঙ্গভাষার একটি অমূল্য সম্পদস্বরূপে পরিগণিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, বিদ্যাভূষণের স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিবে বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার এই অপূর্ব্ব অবদান। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘকাল সাধনা-লব্ধ উপকরণের সাহায্যেই ইহা পূর্ণাঙ্গ হইবে। দেশের সমগ্র শিক্ষিত সমাজ এবং সাহিত্যানুরাগীরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিবেন, এমন আশা আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি।

---

**আবার ১৲ টাকার নোট—**

এক টাকার নোট পুনরায় চলিবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। টাকার জন্য টান বাজারে যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা চলতি হওয়া দরকার। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, পাঁচ টাকার একখানা নোট ভাঙ্গাইতে হইলে কলিকাতার মত শহরেও হিম সিম খাইতে হয়। পল্লীগ্রামে এ সমস্যা তো আরও কঠিন। তবে এই ধরণের অল্পদামের নোট সদা সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিতে হয় এবং এ দেশের কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা যেভাবে এই সব নোট ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে কাগজ যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে এই ধরণের নোটে নূতন ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। গতবার যুদ্ধের সময় এক টাকার নোট সম্বন্ধে আমাদের ঐরূপ অভিজ্ঞতা আছে। এক টাকার নোট যদি চালাইতে হয়, তাহা হইলে কাগজটা যাহাতে একটু টেঁকসই হয়, কর্ত্তৃপক্ষ যেন সে দিকে দৃষ্টি রাখেন।

# ফরাসী নৌবহর ও ইংরেজ

মার্শাল পেঁতা জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ফ্রান্সে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভের ভাব ছিল। তখন তাঁহার বক্তৃতার সেই ঝাঁজটা তেমন করিয়া ধরা পড়ে নাই। ক্রমেই তাহা সুপরিস্ফুট হইতে থাকে এবং মার্শাল পেঁতা ফ্যাসিষ্টপন্থী বলিয়া পূর্ব্বে যে কথাটা শুনা যাইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পেঁতা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী লাভাল আগাগোড়াই ফ্যাসিষ্টপন্থী। ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানীর যুদ্ধস্থগিতের সর্ত্ত অনুসারে ফরাসীদের সমগ্র নৌবহর জার্ম্মানী এবং ইটালীর নিয়ন্ত্রণাধীনে দিবার প্রস্তাব ছিল। ফরাসীদের নৌবহর শক্তিশালী কম নয়। নৌশক্তির দিক হইতে ফরাসীরা ইউরোপে দ্বিতীয় স্থানীয়। জার্ম্মানরা যদি ফরাসীদের নৌবহর হাতে পায় তাহা হইলে নৌশক্তিতে তাহারা প্রায় ইংরেজের সমান সমান হইয়া উঠে, এমন অবস্থায় ইংরেজেরা কিছুতেই ফরাসী নৌবহর জার্ম্মানীদের হাতে যাইতে দিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্রান্সের সংকটাপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ফরাসীদের নৌবহরের অধিকাংশ জাহাজই ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। নৌবহরের বেশীর ভাগ এবং বড় বড় রণতরীগুলি যায় উত্তর আফ্রিকার উপকূলের দিকে। গত ৩রা জুলাই উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ ফরাসী অধিকারের নৌঘাঁটি ওরানে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে তাহা একটি শোচনীয় অধ্যায়। ঐ দিবস একটি ব্রিটিশ নৌবহর আলজিয়ার্সের উপকূলভাগে গিয়া ফরাসী নৌবহরের অধ্যক্ষকে তিনটি সর্ত্ত প্রদান করে। সর্ত্তগুলি এই যে, তাহাদিগকে হয় ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়া জার্ম্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, অথবা কোন ব্রিটিশ বন্দরে আশ্রয় লইতে হইবে, অথবা আমেরিকার ন্যায় কোন নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে যাইতে হইবে এবং এই সব সর্ত্তে যদি তাহারা রাজী না হয়, তাহা হইলে জার্ম্মান নৌবহরের অধ্যক্ষগণ ভার্সাইয়ের সন্ধির পর যেমন শত্রুপক্ষ জাহাজগুলি যাহাতে না পায় সেজন্য নিজেরাই নিজেদের জাহাজগুলি ডুবাইয়া দিয়াছিল, সেইভাবে ফরাসীদিগকেও তাহাদের রণতরীগুলি ডুবাইয়া দিতে হইবে। ফরাসী নৌসেনাধ্যক্ষ ব্রিটিশ পক্ষের এই সব সর্ত্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই এবং না মানিয়া লওয়ার জন্য তাঁহার দোষও দেওয়া যায় না। যাহারা যোদ্ধা তাহাদের কর্ত্তব্য হইল গবর্ণমেণ্টের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। মার্শাল পেঁতা যে অবস্থায় এবং যেমনভাবেই হউক, বর্ত্তমানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের যখন কর্ত্তা তখন যোদ্ধার কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহার আদেশের দোষ গুণ বিচার না করিয়া প্রতিপালন করা এক্ষেত্রে ফরাসী নৌসেনাধ্যক্ষের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ফরাসী নৌসেনাধ্যক্ষ বীরের ন্যায় তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই নাই, বরং শৃঙ্খলা-নিষ্ঠার দিক হইতে এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া শৌর্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু ইংরেজের পক্ষেও এক্ষেত্রে সমস্যা অতি কঠোর। ফরাসীদের নৌবহর বিশেষ শক্তিশালী; শুধু শক্তিশালীই নয়, কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজের নৌবহরের চেয়ে ফরাসী নৌবহর শ্রেষ্ঠতা পর্য্যন্ত দাবী করিতে পারে। ১৯৩৬ সালের পর লণ্ডন-ওয়াশিংটন চুক্তির জন্য ইংরেজের পক্ষে সমরসম্ভার বাড়াইবার সুবিধা বিশেষ হয় নাই; কিন্তু ঐরূপ প্রতিবন্ধক ফরাসীদের ছিল না। তাহারা ইহার পর কতকগুলি শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে 'ডানকার্ক' এবং 'ষ্ট্রেসবুর্গের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী নৌবহরের

ফ্রান্সের আতলান্তিক উপকূল রক্ষার্থে লা রচেল বন্দরে নৌঘাঁটি

সম্প্রতি যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ফরাসী নৌবহরে বর্ত্তমানে ১৮০খানার অধিক বড় জাহাজ আছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে ফরাসী নৌবাহিনীতে 'ডানকার্ক' ষ্ট্রাসবুর্গ সমেত ৫খানা বড় যুদ্ধজাহাজ ছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে যে ৩৫ হাজার টনের নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে তাহা বাদ দিলে এ কয়েকটি জাহাজ জগতে সব চেয়ে দ্রুত গতিশীল। এগুলি ছাড়া ফরাসীদের ৭টি দশ হাজার টনের আট ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট 'এ' ক্রুজার, ১২টি ছয় হইতে আট হাজার টনের ৬ ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট 'বি' ক্রুজার, ৩২খানা ছোট ক্রুজার, ৩৭খানা ছোট জাহাজ, ৭৭টি সাব-

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর

মেরিন, ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ১টি উড়োজাহাজবাহী জাহাজ এবং অনেকগুলি প্রহরী জাহাজ আছে। এইগুলির মধ্যে দুইখানা রণতরী, দুইখানি ছোট ক্রুজার, কয়েকটি ডুবোজাহাজ, আটখানা ডেষ্ট্রয়ার, দুইখানা ছোট মাইন তুলিবার জাহাজ, কয়েকখানা ডুবোজাহাজধ্বংসী জাহাজ ইংরেজের এলাকায় থাকাতে ইংরেজের হাতে আসিয়াছে। ২খানা ক্রুজার ওরানের লড়াইতে অকেজো হইয়াছে এবং ১খানা জলমগ্ন হইয়াছে এবং 'ডানকার্ক' ধ্বংস হইয়াছে এবং 'ষ্ট্রাসবুর্গ' ও 'রিসিলিই' ঘায়েল হইয়া টুলো বন্দরে আছে। 'ব্রেতানি', 'প্রভাস' এবং 'মোগাদোর' বিনষ্ট হইয়াছে। ফরাসীদের ডুবোজাহাজের জোর বেশী আছে। ডুবোজাহাজের সংখ্যা তাহাদের ৭৭খানা; এই ডুবোজাহাজ যদি জার্ম্মানদের হাতে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের জোর খুবই বাড়িবে। ইটালীর ১ শত খানা ডুবোজাহাজ ইতিমধ্যেই তাহারা তাহাদের পক্ষে পাইয়াছে।

ইংরেজ আজ যেরূপ সংকট সন্ধিক্ষণে পতিত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে কোনদিন তাহার এমন সংকট ঘটে নাই। স্পেনীশ নৌবহর কিংবা নেপোলিয়ানের ইংলণ্ড আক্রমণের হুমকীও ইংরেজের এমন বাস্তব বিপদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। ফরাসী দেশের উপকূল ভাগ আজ জার্ম্মানীর দখলে। শুধু তাহাই নহে, জগতের ইতিহাসে বহুদিন যাহা ঘটে নাই, সেই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইংরেজের অধিকারে জার্ম্মান সেনাদের পদার্পণ করা সম্ভব হইয়াছে। ইংলিশ প্রণালীর দুইটি দ্বীপ জার্ম্মানরা অধিকার করিয়াছে, অবশ্য রাজনীতিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব কিছু নাই বলিলেই চলে, তবু উল্লেখযোগ্য বিপর্য্যয় তো বটে। এমন অবস্থায় জার্ম্মানীর জলপথে দুর্ব্বলতাই হইল ইংরেজের প্রধান আশ্বস্তি এবং নিরাপত্তা। ইংরেজ কোন বিবেচনাতেই এই নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন হইতে দিতে পারে না। ওরানের ফরাসী নৌবহর যদি সময় পাইত, তবে নিশ্চয়ই পেঁতা গবর্ণমেণ্টের হুকুম মানিয়া ফ্রান্সে চলিয়া যাইত এবং তাহার ফল অনিবার্য্য হইত এই যে, সেগুলি জার্ম্মানদের হাতে গিয়া পড়িত। জার্ম্মানরা অবশ্য নিতান্ত ভালমানুষী দেখাইয়া বলিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ফরাসীদের কোন রণতরী ব্যবহার করিবে না; কিন্তু যুদ্ধের জন্য জীবন মরণ সমস্যা যেখানে সেখানে

সদিচ্ছা বা নীতিগত কোন প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই কাহারও কাছে নাই। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে ফরাসী নৌবহর যদি ইংরেজের সর্ত্তে রাজী না হয়, তাহা হইলে সেগুলি যাহাতে জার্ম্মানীর হাতে না পড়িতে পারে, এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া ইংরেজের পক্ষে অন্য উপায় আর থাকে না। এমন অবস্থায় পড়িয়াই ওরানস্থ ফরাসী নৌবহরের উপর ইংরেজকে গোলা চালাইতে হয়। হিটলারের হাতে ফরাসী নৌবহর সমর্পণ করিবার সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ইংরেজ ইহা করিয়াছে, সুতরাং এজন্য ফরাসীকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল। এই গোলাবৃষ্টির ফলে কতলোক হতাহত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু চার্চ্চিল সাহেবের বিবৃতি হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজের এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ফরাসীপক্ষে অনেক লোক হতাহত হইয়াছে। যাহারা মিত্রস্বরূপে কয়েকদিন আগেই একই রণক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, উভয়ের সম শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উপর গোলা চালান অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার; কিন্তু ইংরেজের পক্ষে ইহা না করিয়া অন্য উপায় ছিল না। ফরাসীরা আজ যে অবস্থায় পড়িয়াছে, যে কোন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষেই তাহা অসহ্য এবং ইংরেজ জয়ী হইলে বর্ত্তমান ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মতিগতি যাহাই হউক, জার্ম্মানীর পতনে ফ্রান্সের পূর্ব্ব মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফরাসীদের মধ্যে একদল ইহা না বুঝিতেছে এমন নয়, এবং তাহা বুঝিয়াই ফরাসীদের নৌবহরের কতক অংশ স্বেচ্ছায় ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। মার্শাল পেঁতা জার্ম্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করিবার দুই দিন পরে ফরাসী নৌবহরের কতকগুলি জাহাজ প্লাইমাউথ বন্দরে আসিয়া ইংরেজের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ওরানের ব্যাপারের পর ফ্রান্সের একদল লোকের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইবে, এমন সম্ভাবনা না আছে এমন নয়। চার্চ্চিল সাহেব সে আশঙ্কা তাঁহার বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই কার্য্যে ফ্রান্সে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, ফরাসী নৌবহর, নৌসেনা এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এবং ফরাসী জাতির মনে ইহার ফলে মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইবে কল্পনা করা কঠিন নহে, কিন্তু উপায়ও অন্য কিছুই ছিল না। পেঁতা গবর্ণমেণ্ট ওরানের এই ব্যাপারের পর এই হুকুম জারী করিয়াছেন যে, ইংরেজের হাতে ধরা পড়িবার যদি সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা হইলে ফরাসী নৌসেনাধ্যক্ষগণ তাহাদের রণতরীগুলি যেন ডুবাইয়া দেন। যদি এইরূপে আদেশ তাঁহারা পূর্ব্বে জারী করিতেন, তাহা হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িবার সম্ভাবনা দূর হইত না বটে; কিন্তু ফরাসী সেনাধ্যক্ষ এডমিরাল জেনশুল এবং ব্রিটিশ নৌবহরকে যেমন কঠোর সমস্যায় পতিত হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে, তেমন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইত না।

আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে একখানা ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ, চারখানা ফরাসী ক্রুজার ও কতকগুলি ছোট জাহাজ ছিল, এগুলিকে বন্দর ত্যাগ না করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে নাই। অন্যান্য স্থানে যে সব ফরাসী জাহাজ আছে, সেগুলি কি করিবে, এখনও বলা যাইতেছে না। এই ব্যাপারের পর ইংরেজের সঙ্গে পেঁতা গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। বহুদিনের মধ্যে অন্তত সরকারীভাবেও ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে এমন সম্পর্কের সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজ এবং ফরাসী এক হইয়াই কাজ করিতেছিল। ফরাসী-ইংরেজের শত্রুতা অতীতের ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, আজ পুনরায় ইংরেজ ও ফরাসীতে সেইরূপ সংকট গড়িয়া উঠিল। সাময়িকভাবে হইলেও ইহার মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিকতা রহিয়াছে। যে ফরাসী সেদিনও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জার্ম্মানদের সঙ্গে প্রাণপাতী সংগ্রাম করিয়াছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সেই ফরাসীদেরই সুযোগ সুবিধা জার্ম্মানরা গ্রহণ করিবার জন্য কৌশল প্রয়োগ করিতেছে। তাহাদের এমন মতলব যে ছিল, পূর্ব্ব হইতে এমন অনুমান অনেকে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কল্পনা যে এমনভাবে বাস্তবে পরিণত হইবে, এতটা কেহ মনে করে নাই।

জার্ম্মানীর কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমানে এই নৌশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মানী ঘন ঘন ইংলণ্ডের নানাস্থানে, ওয়েলসে উড়োজাহাজ লইয়া হানা দিতেছে এবং তাহার ফলে নির্দ্দোষ নরনারী ও শিশুদের প্রাণহানি কিছু কিছু ঘটাইতেছে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, এই উপায়ে সে ইংলণ্ডকে কাবু করিতে পারিবে না। ইংরেজকে কাবু করিতে হইলে ইংলণ্ডে সেনা নামানো দরকার। ফরাসীদের নৌবহরটাকে হাতে পাইলে হিটলারের পক্ষে সে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে সুবিধা হইত নিশ্চয়ই। কিন্তু ইংরেজ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং সমরনীতির দিক হইতে অন্য বিবেচনার আগে ছিল এই বিবেচনা। ইহার ফলে যেমন সমস্যারই সৃষ্টি হউক না কেন, সে ভয়ে ইংরেজ এদিকের গুরুত্বকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইটালীকে দলে টানিয়া জার্ম্মানীর বিশেষ সুবিধা হয় নাই; ফরাসীকে কব্জির মধ্যে ফেলিয়া সে সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। ফরাসী নৌবহর যাহাতে সে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাইতে না পারে, ইংরেজ তেমন ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার নূতন কি কৌশল অবলম্বন করেন বুঝা যাইতেছে না, যদি নূতন কোন অস্ত্র তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত যত কৌশল তিনি খাটাইয়াছেন, তাহা দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করা হয়ত সম্ভব হইবে না।

# হাস্যশিল্পী শরৎচন্দ্র

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

কোনও সাহিত্যিকের হাস্যরস বিচার করতে গেলে প্রথমেই একটা শ্রেণী বিচারের সমস্যা আলোচনা ক'রে নেওয়া উচিত। সকল দেশেই এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন তাঁরা হাস্যরসকেই কেন্দ্র ক'রে প্রধানত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বাঙলা কথা-সাহিত্যে যেমন বলা যায়, পরশুরাম ও কেদারনাথ। কবি সুকুমারের প্রতিভা সৃষ্টি করেছে আবোলতাবোল কবিতাগুচ্ছ। রসরাজ যেমন প্রহসনের পর প্রহসন লিখেছেন। আর একদল সাহিত্যিক আছেন, তাঁরা মূলত কবি বা ঔপন্যাসিক। তাঁদের লেখায় হাস্যরস রূপায়িত হয়েছে আরও বিভিন্ন রসের পাশাপাশি। তাঁদের শিল্পপ্রতিভার মূল সুর হাস্যরস নয়। যদিও এ'রা কখনও কখনও হাস্যরসকেই লক্ষ্য রেখে প্রহসন বা হাসির কবিতা বা গল্প লেখেন তবু হাস্যরসাত্মক রচনাই তাঁদের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রধান হয়ে থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, তিনি কমলা-কান্তের দপ্তর' এবং 'লোকরহস্য' লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটককার ও কবি, তিনি হাসির কবিতা এবং প্রহসনও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস বিচার করতে গেলে তাঁর সাধারণ গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে যে কৌতুকের মধুর স্পর্শ আছে তাও বিচার করতে হবে, আবার তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রঙ্গপ্রধান গল্প বা প্রহসন, তাদের হাস্যরসও বিচার করতে হবে। শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরস কিন্তু কোথাও মূল প্রেরণা হিসাবে রূপায়িত হয় নি। তাঁর কোনও ব্যঙ্গ বা রঙ্গ প্রধান গল্প, উপন্যাস কিম্বা প্রহসন নেই। সেই হিসাবে শরৎচন্দ্রকে হাস্যরসাত্মক রচনার শিল্পী বলা যায় না, অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর উপন্যাসে গভীর রসাত্মক কাহিনীর এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত হাস্যরস বাঙলা হাস্যশিল্পের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে।

'শ্রীকান্ত' বইখানা ছাড়া শরৎচন্দ্রের সব বইএ-ই হাসির দৃষ্টান্ত খুব কম। মানুষের মনে হাস্যরসের অনুভূতি বার্ধক্যের চিহ্ন। কিশোর শিশুদের মত অলঘু প্রকৃতি আর কার আছে? সব সময়ে সব বিষয়ে তারা সিরিয়াস। জীবনের স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা যতই জমা হয়ে ওঠে, ততই সংসারের সম্বন্ধে মানুষের মোহ ভেঙে যায়, ততই সে জীবনকে দেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। তার চোখে অনায়াসে ধরা পড়ে জীবনের দিকে দিকে জমে ওঠা যত অসংগতি। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের লেখা। হয়তো সেইজন্যেই তাঁর অন্যান্য বইএর চেয়ে এই বইখানিতে অপেক্ষাকৃত বেশী হাস্যরস ফুটে উঠেছে।

শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ শরৎচন্দ্র খুব রসিক লোক ছিলেন। মেজাজে থাকলে এবং মনের মত লোকের বৈঠক পেলে তিনি মন খুলে হাসাতেন। তাঁকে সেইরকম মেজাজে পাবার সৌভাগ্য আমাদের জীবনে একবার ঘটেছিল। তখন শরৎচন্দ্র শিরঃপীড়ায় ভুগছেন। চোখ দেখাবার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন। পথিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন 'বিচিত্রা' অফিসে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। মনে পড়ে, তিনি গম্ভীরভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসির গল্প ক'রে গিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, অফুরন্ত সেই গল্পের ভাণ্ডার। হঠাৎ যখন ঘড়ির খবর হ'ল, তখন দেখা গেল ডাক্তারের নির্দিষ্ট সময় অনেক ক্ষণ আগে পার হয়ে গেছে। তিনি অট্টহাসি হাসাতেন, কিন্তু নিজে খুব হাসতেন না। সব সময়ে তাঁর ভাষা শ্লীলতাবায়ুগ্রস্ত লোকদের রুচিসম্মত হ'ত না। কিন্তু শিল্পী শরৎচন্দ্রের হাস্যরস ঠিক মানুষ শরৎচন্দ্রের হাস্যরসের প্রতিচ্ছবি ছিল না। শিল্পপ্রেরণার মুহূর্তে মানুষের সাধারণ জীবনের পরম মুহূর্তে। তখন তার মনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই স্ফুরণ হয়। শরৎসাহিত্যের টুকরো টুকরো হাসিগুলি সুবিকশিত শিল্পের কণা। তার মধ্যে কোথাও অপূর্ণতা নেই। তাঁর সাহিত্যে হাস্যরসের মধ্যে কোথাও হাস্য-রসাত্মক গল্প বলার কৃত্রিম চেষ্টা নেই, প্রচলিত রীতিঅনুযায়ী হাসিকে প্রখর দীপ্তিতে ফুটিয়ে তোলবার জন্য হাস্যরসের পৃথক্ ভাষার আশ্রয় তিনি নেন নি। শরৎসাহিত্যে জীবনের বিচিত্র কাহিনীর খণ্ড খণ্ড ছবির সঙ্গে অপরিহার্যরূপে অসংগতির ছবিও এসে পড়েছে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় তিনি সেই অসংগতি হাসির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং প্রকাশের অসামান্য শক্তি না থাকলে এ কাজে এমনভাবে তিনি সফল হ'তে পারতেন না।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর নিখুঁত হিউমার। হাসির শাস্ত্রে হিউমারের জাত আলাদা, লঘু রঙ্গ তার প্রাণ নয়। লঘু রঙ্গ ও ফাঁকা হাসি আমাদের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না, সে হাসির ঢেউ কোনও গভীর দেশে পেঁছয় না। তার মূল থাকে নিতান্ত জৈব প্রাণের স্ফূর্তির মধ্যে। সংসারে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে অসংগতি, দুর্বলতা, উদ্‌ভ্রমের পরিসীমা নেই। সেই সব মালমসলা নিয়েই হিউমার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তার প্রাণ লঘুছন্দে বয় না। ব্যঙ্গের লক্ষ্য আঘাত দেওয়া। যত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, তত মর্মান্তিক তার আঘাত। হিউমার যত উঁচু জাতের হবে ততই তার আঘাত হবে মধুর। ব্যঙ্গশিল্পীর লেখনিতে শুধু হুল থাকে, হিউমার শিল্পীর তুলিতে থাকে হুলের সঙ্গে মধু। সাহিত্যিকের হৃদয়ে অসংগতিবোধের সঙ্গে যখন দরদ এসে মেশে তখনই সৃষ্ট হয় হিউমার। কোনও মানুষের দুর্বলতা নিয়ে যখন কেউ হাসে, রঙ্গ করে, ব্যঙ্গ করে শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত ক'রে তোলে, সেই মুহূর্তে যদি তার চোখে ভ'রে আসে জল, মনে জাগে দুর্বল মানুষটির জন্য সমবেদনা, তা হ'লে আবির্ভূত হয় হিউমার সৃষ্টির উৎস। দরদী শরৎচন্দ্র মানুষের দুর্বলতা ও অসংগতি নিয়ে কোথাও নির্মম ভাবে ব্যঙ্গ করতে পারেন নি। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে মেজদার প্রচণ্ড শাসনের ইতিহাস তিনি একটি মধুর ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।—

"আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার 'পাসের' পড়ায় বিঘ্ন না করি এইজন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া ২০।৩০খানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনওটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনওটাতে 'থুথু ফেলা', কোনওটাতে 'নাক ঝাড়া,' কোনওটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাক ঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন, হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত', অর্থাৎ, এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথু ফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন, হুঁ, আটটা একচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত।' পরোয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুদ থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের [illegible] ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা যাইত।"

পাশের পড়ার বিঘ্ন যাতে না ঘটে সে সম্বন্ধে অতি-সাবধান মেজদার বোকামি নিয়ে শরৎচন্দ্র ক্রুর ব্যঙ্গ করতে পারেন নি। তিনি হেসেছেন কিন্তু সে হাসির মধ্যে জ্বালা নেই। কোথায় যেন এক কণা দরদ আপনা থেকে শিল্পীর মনে উপচে উঠেছে। তাই ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল মানুষটির সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য এই ছবির মাধুর্যকে কঠিন ক'রে তোলে নি।

মানুষ, শরৎচন্দ্রের মনের গড়ন ছিল আবেগপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ নয়। সংসারকে তিনি বিচার করতেন হৃদয়ের স্পর্শে, বুদ্ধির

দীপ্তিতে নয়। সূক্ষ্ম বিচার তাঁর কোথাও লক্ষ্য থাকত না, তীব্র অনুভূতিই ছিল কাম্য। তাই খর থেকে খরতর ব্যঙ্গ তাঁর রচনায় দেখা যায় না। সংসারে অসংগতি দেখে তিনি হাসতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও পেতেন। বুদ্ধিপ্রধান মানুষের মত নির্লিপ্ত হয়ে হাসির আঘাতে কাউকে জর্জর করতে পারতেন না। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়েছিলেন, তাই মানুষ অত সহজে তাঁর হৃদয়ে আশ্রয় পেত।

উপন্যাসশিল্পে শরৎচন্দ্র সুদক্ষ শিল্পী। তিনি হাসির ভিত্তিতে অসংগতির ছবি এঁকেছেন একটির পর একটি। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাষা অনাড়ম্বর, সাধারণ জীবনের অকৃত্রিম ভাষার মত, অলংকারের বাহুল্য মোটেই নেই। এবং শিল্পী কোথাও নিজেকে ধরা দিতে চান নি, একান্ত গম্ভীর হয়ে তিনি যেন পাথরের ওপর ঘটনার পর ঘটনা খোদাই ক'রে গেছেন। ঘটনার অন্তর্নিহিত হাসিই পাঠকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে। মনে হয়, শিল্পী যেন হাসি জাগাবার কোথাও বিশেষ চেষ্টা করেন নি। মধু ডোমের কন্যার বিবাহ-আসরের ছবিখানা সামান্য রেখায় অপরূপ হয়ে উঠেছে, তাতে রঙের ঔজ্জ্বল্য, সরঞ্জামের প্রাচুর্য নেই। শিল্পী যেন নিঃশব্দে কাজ ক'রে গেছেন।

শরৎচন্দ্র কোথাও এমন কোনও চরিত্র সৃষ্টি করেন নি যার কথাবার্তা উইটের দীপ্তিতে রমণীয়। শিল্পী নিজের জবানিতেও কোথাও চমৎকার ভাবদ্যোতক, অলংকারে উজ্জ্বল উইট সৃষ্টি করেন নি। রবীন্দ্রনাথের উইটে আছে মণিমুক্তার জড়োয়া অলংকার, কেদারনাথের উইটে আছে ভাষার তাল তাল সোনা, পরশুরামের উইটে আছে হাতির দাঁতের শাঁখার বাহুল্য-বর্জিত সুদক্ষ কারুকার্য। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা উইট-সৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট হয় নি। যে ভাষায় তিনি হাসির ছবি এঁকেছেন তা স্বাভাবিক এবং সংকেতময়। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

দু-একটি জায়গায় শরৎচন্দ্র নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বেশী নেই। তা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে সুর তাঁর হৃদয়ে মূল সুর হিসাবে কোনও দিন প্রতিষ্ঠা পায় নি। তা ছাড়া, সেই চিত্রগুলি নির্মম হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে নয়, নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্রূরতায়। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে বর্মী স্ত্রীর স্বামী চট্টগ্রামবাসী বাবুটির দাদা যখন বলতে থাকেন, "আপনি যে অবাক করলেন মশাই! পুরুষ-বাচ্চা, বিদেশ বিভুঁয়ে এসে বয়েসের দোষে না হয় একটা শখ ক'রেই ফেলেছে। কোন্ মানুষটাই বা না করেন বলুন? আমার তো আর জানতে বাকি নেই, এর না হয় একটু জানাজানি হয়েই পড়েছে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে? ভাল হয়ে সংসার ধর্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হতে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়েসে কত লোকে হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে?" তখন বোঝা যায়, শিল্পীর গোপন মনে বিদেশী নারীর উপর অকারণ অত্যাচারের ক্ষোভে কি কঠিন হাসি ভেসে উঠেছে। শরৎসাহিত্যে আর একটি হাস্যাস্পদ চরিত্র লেখকের কাছে বিশেষ দরদ পায় নি, সে হচ্ছে "ঠুন ঠুন পেয়ালা"র গায়ক দরজীপাড়ার মাসতুতো ভাই।

কোনও সমালোচক শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই হাসির নমুনা খুঁজেছেন 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর গোকুল 'পণ্ডিত মশাই'এর কুঞ্জ, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশের চরিত্রে। মনে হয়, উক্ত সমালোচক হাস্যরস সম্বন্ধে সূক্ষ্মবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বোঝা যায়, হাস্যরস রূপায়িত করার জন্য শিল্পী কোথাও এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন নি। উপরের প্রত্যেকটি চরিত্রই কাহিনীর এক একটি মূল স্তম্ভ। তা হ'লে উপন্যাসগুলিও কমবেশী হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠত। আপাত দৃষ্টিতে খেপা মানুষের দুর্বলতা ও মহত্ত্বের মালমসলা দিয়ে সাহিত্যে অনেকেই হিউমার সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা বা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ এই শ্রেণীর চরিত্র। কিন্তু শিল্পী সেখানে এদের সৃষ্টি করেছেন হাসিকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যেই। রচনার পঙক্তিতে পঙক্তিতে তাঁর এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যের সন্ধান ঠিক পাওয়া যায় না। এই চরিত্রগুলির স্রষ্টা হিসাবে যে শরৎচন্দ্রকে পাওয়া যায় তিনি হাস্যরস শিল্পী নন, তিনি মানুষের প্রেমে পাগল ঔপন্যাসিক। মানুষের হৃদয়ে তিনি পেয়েছিলেন অপরূপের সন্ধান। সাধারণ সংসারী যাদের পাঁকের জীব ব'লে ঘৃণা করেছে, উদ্‌ভ্রান্ত বলে হেসেছে, অকেজো ব'লে যাদের দূর থেকে অনুকম্পা করেছে তাদেরই মধ্যে তিনি দেখেছিলেন মহত্ত্বের উৎস। তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর আঁকা খেপার অন্তরে ঝলসে ওঠে স্পর্শমণির দীপ্তি।

শরৎচন্দ্রের হিউমারের একটি বিশেষ গুণ অপরিমেয় সমবেদনা। হিউমারের সৃষ্টি অবশ্য সমবেদনার সংস্পর্শেই। শরৎচন্দ্রের দরদ অনন্যসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের আর কোনও লেখকের হিউমারে এমন গভীর দরদের সোনার কাঠি নেই। এ বিষয়ে ইংরেজ লেখক চার্লস ল্যামের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয়। ল্যামের মত কোনও চরিত্রকে শরৎচন্দ্র পুরোপুরি হাস্যাস্পদ হ'তে দেন নি। কাউকে নিয়ে যখনই হেসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রের এমন এক গোপন প্রান্ত আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন যে হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ ঝাপসা না হয়ে পারে নি। 'অরক্ষণীয়া'র 'পোড়াকাঠে'র বাইরেটা ছিল তাড়কার মত, তার সংস্পর্শে এলেই আমাদের মুখে কঠিন হাসি ঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু কে জানত তার মনের গভীর তলে লুকিয়ে ছিল মহত্ত্বের বিপুল সম্পদ্! সেই মহত্ত্ব প্রকাশ পায় অবশ্য হাস্যকর চালচলন, কথাবার্তার ভিতর দিয়েই। শম্ভু যখন ভাগনীর বিয়ের জন্য জোর ক'রে দুর্গাকে রাজী করবার চেষ্টা করছিল তখন হঠাৎ রঙ্গস্থলে পোড়াকাঠ দেখা দিলেন। "দুই হাত গোবর-মাখা, বোধ করি তখনও গোয়ালঘরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙা কাঁসির মত খন খন করিয়া বাজিয়া উঠিলেন, বলি সুপাত্তরটি কে গা ঠাকুর? একবার শুনতে পাই নে?"

"শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্বে চক্রবর্তী গৃহিণীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ছবিটি মনে পড়ে।—"হুঁকাটি হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ম কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, হ্যাঁগা কে মানুষটি এল?

"অনুমান করিলাম ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীর শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

"তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি ব্রাহ্মণ—নারায়ণ। পথ ভুলে এসে পড়েছেন, শুধু রাত্তিটা,—ভোর না হ'তেই আবার সক্কালেই চ'লে যাবেন।

"ভিতর হইতে জবাব আসিল, হ্যাঁ, সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে এক মুঠো চাল, খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই চক্রবর্তী গৃহিণীর অন্তরে চিরন্তন মাতৃমূর্তির পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। এই অপরিসীম সমবেদনা থেকেই শরৎচন্দ্রের হিউমারের প্রধান গুণ উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর হিউমারের মধ্যে অনেক সময় হাসি ও অশ্রুর আলোছায়া এক সঙ্গে অপরূপ রসে মিলিত হয়ে থাকে। সংসারে হাসিকে তিনি দেখেছেন প্রধানত দুঃখের পটভূমিতে।

(শেষাংশ ৮৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# মানুষের ঘর

( উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি )

শ্রীহাসিরাশি দেবী

( ৭ )

অন্নদার রাগ হয়েছিল খুবই সত্যি কথা, কিন্তু বেশী দিন সে থাকতে পারলে না রাগ করে। যখন দেখলে দিনের পর দিন বিপিনের দোকান পাট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তার আসবার কোনও চাড় নেই, চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করে দিয়েছে, তখন একদিন উপায়ন্তর না দেখে কেঁদেকেটে মানিকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "বাবা মানিক তুমি যদি একটি কাজ কর—"

মানিক ইদানীং যেন একটু পরোপকারী হয়ে উঠেছিল বেশী রকম। অন্নদার হাটবাজার করে দেওয়া, এটা ওটা কাজ সে বেশ হাসিমুখেই করত এ ছাড়াও করত গল্প-গুজব, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি। এই সংসারের বিভিন্নমুখী দুইটি জীবনের সুরে প্রতিদিনের খুটিনাটি নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও কেমন করে যেন একদিন সন্ধিসূত্র রচনা করে ফেলেছিল; যে রচনার মধ্যে ওদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ছোট খাট আলাপ আলোচনার ধারা হয়ে উঠেছিল বেশ স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। এমনি একদিন সেই আলোচনার মধ্যেই বিপিনের এই রাগ করে মেয়ে নিয়ে যাওয়া ও শারদারই বাড়ীতে ওঠার প্রসঙ্গে অন্নদা চোখের জল মুছে এক সময়ে মানিকের দুই হাত জড়িয়ে ধরলে। ব্যস্ত হয়ে মানিক বললে, "কি কাজ তোমার করি নে পিসীমা, যার জন্যে তুমি বলতে কাতর হচ্ছ?"

অন্নদা বললে, "কিন্তু এবারের কাজ যে একটু কঠিন কাজ বাবা।"

"তবু,—কি কাজ শুনি আগে।"

"আমার নাম করে আদুকে লুকিয়ে আনতে হবে, যেন তারা জানতে না পারে।"

মানিক চমকে উঠল,—"আদুকে আনব আমি! এ তুমি কি বলছ পিসিমা?"

অন্নদা চোখের জল মুছল, বললে, "ঠিকই বলছি মানিক। তুমি জান না, সে আমার হাতে মানুষ। ঝগড়াই করুক আর গালিগালাজই করুক, আমার বুক থেকে যে তাকে তার বাপ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তা সে বুঝতে পারছে এত দিনে। নিশ্চয়, এতদিন আমার কাছে ফিরে আসবার জন্যে তার মন কাঁদছে।"

মানিক অবাক হয়ে চেয়েছিল অন্নদার মুখের দিকে। ওর বার্দ্ধক্যশীর্ণ মুখের প্রত্যেক রেখার কুঞ্চন, দৃষ্টিপাতের সজল আকুলতা যেন মানিকেরও মনের কোথায় রেখাপাত করছিল।

নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "কিন্তু সে কি সম্ভব পিসীমা?"

"কি অসম্ভব মানিক, তাকে আনা?"

একটু হাঁপ নিয়ে অন্নদা আবার বললে, "বেশী কষ্টের নয় রে বাবা, বেশী কষ্টের নয়। একবার যদি তাকে কেউ গিয়ে বলিস যে তার জন্যে আমার দিনে খাওয়া রাতে ঘুম নেই, তা হলে আর দেখতে হবে না; সে যে পথে গেছে, সেই পথেই পালিয়ে আসবে ওদের ফেলে। নেহাত একা বলেই আসতে পারছে না।"

অন্নদা চোখ মুছল।

মানিক মুখ তুলে বললে, "ধর, আমি নয় তোমার কথা শুনে সেখানে গেলাম, কিন্তু তারা যদি না দেখা করতে দেয় আদুর সঙ্গে? কিংবা যদি তাদের মেয়ে ফুসলিয়ে বার করে আনছি বলে আমাকে পুলিশে দেয়!"

অন্নদা এতটা ভেবে এ প্রস্তাব করে নি, তাই মানিকের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলে না; একটু অপ্রস্তুত ভাবে মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "কিন্তু সেখানে ত বিপিন আছে, সে তো তোকে চেনে মানিক।"

বিপিন যে মানিককে চেনে, একথা মানিকও জানে, কিন্তু জানলেই যে সে স্বীকার করবে, সে ভরসা মানিকের ছিল না।

তবু অন্নদাকে সাহস দেবার জন্য বললে, "কি বলতে হবে আদুকে?"

"বলতে হবে?"—একটু ভেবে নিয়ে অন্নদা বললে, "বলবে, বাড়ি চল্, নইলে তোর পিসী রাগ করে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, আর আসবে না।"

কথা বলতে বলতে অন্নদার গালার স্বর ভারী হয়ে উঠল চোখের জলে। কিন্তু সে কান্না অন্নদা প্রাণপণে চেপে গেল; বললে, "এতেও যদি সে না আসে, না আসবে। কিন্তু সত্যিই যদি যাস মানিক, তবে ওই কথাই বলিস তাকে।"

অন্নদার কাছ থেকে মানিক বিদায় নিলে শহরে যাবার জন্যে, বাড়ি এসে সৌদামিনীর কাছে কথাটা ভাঙ্গলে না। বললে, "একটা বিশেষ কাজে শহরে যেতে হচ্ছে।"

সদু প্রশ্ন করলে, "ফিরবি কখন?"

একটু ভেবে মানিক উত্তর দিলে, "তা সন্ধ্যে লাগালাগি হতে পারে বই কি। আসা যাওয়ার পথটা তো আর কমখানি নয়, কম সে কম কোশ পাঁচেক হবে।" একটু থেমে বললে, "এখন একটু তেল দাও দিকি, চট করে একটা ডুব দিয়ে আসি।"

সদু বাটি করে তেল এনে দিলে খানিকটা; মানিক তা থেকে খানিকটা হাতে ঢেলে মাথায় আর গায়ে রগড়ে বার হয়ে পড়ল ঘাটের পথে।

নদী বেশী দূরে নয়, রশি কয়েক তফাত হবে। বাবলা বনের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, আসশ্যাওড়া শেয়ালকাঁটার ঝোপ, আর পড়ন্ত ভিটের উইএর ঢিপি পাশে রেখে যেতে হয়।

মানিক সেই পথে জোর পায়ে এগিয়ে চলল। অন্যদিন তার ঘাটে পেঁৗছে স্নান সেরে আসতে যেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগত, আজ সেখানে লাগল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মানিককে ফিরতে দেখে সদু তাড়াতাড়ি ঠাঁই করে ভাত দিলে। ভাবলে হয়তো শহরে মানিকের কোনও জরুরী কাজ পড়েছে। খাওয়া দাওয়া সেরে ছাতা হাতে নিয়ে মানিক যখন পথে বার হয়ে পড়ল তখন সূর্য্যদেব মাথার ওপরে, রোদে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।

লাল মাটীর পথ। পল্লীর শ্যামল অঞ্চল ছেড়ে ক্রমে পেঁৗছেছে শহরের বুকে, ইট সুরকির গাদায়। মাণিক শহরে পেঁৗছাল ঘণ্টা দুএক পরে। শারদার বাড়ি খুঁজে বার

করতেও তার বিশেষ কষ্ট পেতে হলো না, কিন্তু মুশকিল হল বাড়িতে ঢোকা নিয়ে। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি, মস্ত বাড়ি। তারই দরজায় দাঁড়িয়ে একটা খোট্টা দারোয়ান ভজনের সুর ভাঁজছে।

মানিক কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করল, যদি বিপিন কি আদুর চোখে পড়ে, এই আশায়। কিন্তু দুজনের একজনকেও সে বাইরে আসতে দেখল না।

অগত্যা এগিয়ে এসে দারোয়ানকে প্রশ্ন করল, "এই বাড়িতে বিপিনবাবু বলে কোনও বাবু এসেছে?"

দারোয়ান বললে, সে তা বলতে পারে না।

একটু বিরক্ত হয়েই মানিক আবার বললে, "আরে বাপু সে বাবু একা আসে নি, সংগে করে এত বড় এক লেড়কী এনেছে। লেড়কীর রং ফরসা, চোখদুটো বড় বড়, এসেছে জানিস?"

দারোয়ান এবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আকারে ইংগিতে বোঝালে, ও, এই কথা? হ্যাঁ, এসেছে বই কি। সুন্দর মত এক লেড়কী নিয়ে কালোমত এক ষণ্ডাবাবু এ বাড়িতে এসেছে বটে।

খুশী হয়ে মানিক বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি এতক্ষণ ধরে। তা তাদের সংগে দেখা হয় না?

দারোয়ান জানালে, "কেন হবে না! আপনি অপেক্ষা করুন এখানে।"

কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোনও ফল হল না, তখন মানিক বললে, "আর ত আমার এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবার সময় নেই; সন্ধে নাগাত বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি আমার একটা উপকার করতে পার ভাই? করবে একটা উপকার?"

"কি?"

"বেশী কিছু নয়, বাড়ির ভিতরে গিয়ে তাদের একবার জানাতে পার যে, তাদের গাঁ থেকে একজন আত্মীয় এসেছে বিশেষ দরকারে তাদের সংগে দেখা করতে!"

মানিক আদুর নামও করলে না। দারোয়ান সম্মতি জানিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল, একটু পরে ফিরে এল বিপিনকে সংগে নিয়ে। মানিককে সেখানে দেখে বিপিনের মুখখানা যেন মুহূর্তের জন্য কেমন একরকম হয়ে উঠল। বললে, "আরে, তুমি যে! কি মনে করে হঠাৎ?"

"আমি—" একটা ঢোক গিলে মানিক উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, আমিই। এসেছিলাম এই শহরে একবার একটু দরকারে, মনে করলাম তাই যে একবার সবার সংগে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। তারপর? সব ভাল ত?"

মাথা নেড়ে বিপিন জানালে ভালই। কিন্তু সে আর তেমন সোজাসুজি প্রতিপক্ষের কুশল প্রশ্ন করতে পারলে না। কয়েকটা ঢোক গিলে, বার দুই কেশে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা?"

"আমরা আছি বটে একরকম, তবে অন্নদা পিসীমা—"

সে একটু থামল। বিপিনের মুখের ওপর ভেসে উঠল একটা দুশ্চিন্তার ছায়া;—বললে, "কি হয়েছে তার? কেমন আছে সে?"

মানিক মলিন মুখে বললে, "অম্বলের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে কদিন ধরে।"

"সেত ওর চিরদিনের অসুখ।"

"আর, হাঁপানির মত হয়েছে সর্দি বুকে বসে।"

"জ্বর হয়?"

"হয় বোধ হয় একটু একটু, কিন্তু বলে না কিছুই।"

বিপিন ভাবতে লাগল;—"তাই ত, কি করা যায়।"

মানিককে ঠাঁই দেখিয়ে দিয়ে বললে, "বস, আমি একবার বাড়ির ভিতরে খবরটা দিয়ে আসি।"

সে চলে গেল। মানিক তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসে দেখতে লাগল বাড়ির দেওয়ালে খাটানো সব ছবি, জায়গায় জায়গায় রাখা শৌখিন জিনিসপত্র, ইত্যাদি—।

শুনল পাশের ঘরে কোন একটি ছেলের কাছে একটি মেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শিখছে।—

সবার দেবতা তুমি, আমার প্রিয়,<br>
এই শুধু জেনেছি মনে;<br>
তাই আমার মাটির ঘরে তোমারে ডাকি<br>
তুমি আমি রব দুজনে।<br>
দেবতা হে মন্দির মাঝে,<br>
কহিতে না পারি কোন লাজে,<br>
আমার মনের কথা শোনাব তোমায়—<br>
নিরালায়—প্রেমকুঞ্জনে।

কণ্ঠস্বরটা যেন চেনা; আদুর নয় তো! কে জানে। আদুর কথা সে শুনেছে বটে, কিন্তু গান শোনে নি কোনও দিন।

আদু তো গাঁয়ে কখনও গান গাইত না! খেলে আর ঝগড়া করেই তার সময় কাটত সেখানে। সে কি আজ আর একজনের গলার সুরে সুর মিলিয়ে গান শিখছে? এও কি সম্ভব?

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিপিন ফিরল, সংগে এল শারদা। শারদার মাথায় কাপড়, গায়ে শেমিজ, সাধারণ গৃহিণীর মত সাজ।

মায়ের মতই তার শান্ত মুখশ্রী। যেন বঞ্চিত জীবনের সব কিছু আজ ফিরে পেয়ে জীবনের কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; স্নেহে, প্রেমে, মমতায়।

শারদা বললে, "ও, তুমি আমাদের পরান দাদার ছেলে মানিক? মনে নেই বাছা, কবে সেই ছোটটি দেখেছি, তখন তুমি এতটুকু!"

মানিক উঠে এসে শারদার পদধূলি নিতে শারদা বাধা দিলে। 'আহা কি কর বাবা, বস বস, ঠাণ্ডা হও। পথ তো আর কমখানি নয়! ওরে বিপিন—'

মুখ তুলতেই বিপিন বলে উঠল; "অন্নদার বড় অসুখ করেছে দিদি।

"কার অন্নদার? কি অসুখ? নিশ্চয় বারমেসে অসুখ?"

"না, অম্বলের ব্যথা, সর্দ্দির টান।"

"ও তো তার নিত্যি লেগে আছে।"

শারদা যেন কথাটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে চাইলে, কিন্তু বিপিন তা পারলে না। বললে, শরীরটাকে অবহেলা করে একেবারে মাটি করে ফেলেছে দিদি, বুঝলে? অথচ এটুকু বোঝে না যে, আজ যদি আমি না থাকি, তা হলে কাল ওর দুর্গতিতে শেয়াল কুকুরও কাঁদবে না, গলা শুকিয়ে মলেও কেউ একরত্তি জল দেবে না ওর মুখে, বুঝেছ!"

শারদা হাসলে। বললে, "বুঝি সবই রে বিপিন, বুঝি সবই। হাজার হ'ক বয়েসটা তো হয়েছে যাক, তোর এখন কি ইচ্ছেটা বলদিকিন্ শুনি? বাড়ি যাবি?

বিপিন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, "তাই তো ভাবছি।"

মনের কোন্‌খান থেকে যে কিসের একটা দুর্ব্বলতা নিরন্তন খোঁচা দিচ্ছিল, সেটা এতদিন না বুঝলেও আজ যেন বুঝতে তার দেরি হল না। খোঁচার অর্থ ঐ পোড়াকপালী অন্নদা! অন্নদার প্রতি তার টান। আর ছোট বোন সে।

বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত সিঁথির সিঁদুর মুছে সে যে বাপের ভিটেয় এসে উঠেছে, তার পরে কত সুখের দিন, বর্ষায় দুঃখময় রাত কাটিয়েছে ওই ভিটেয়। ওই পড়ন্ত ঘরের পোতায়, বেগুন গাছ আর লঙ্কার চারা রুয়ে, সযত্নে পুইয়ের মাচা, কুমড়ো গাছ তৈরী করে, আর তার ফসল কুটে বেছে রেঁধে এই ভাই ভাইঝিকে খাইয়ে যত আনন্দ সে পেয়েছে, এত আনন্দ সে তার এই দীর্ঘ দুঃখময় জীবন ইষ্টদেবতার নামে উৎসর্গ করেও পায় নি।

বিপিন লক্ষ্য করেছে, বিপিনের মেজাজ চটা বলে পাছে তার খাওয়ার কি কোনও কাজের কিছু ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় অন্নদা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে যেন এ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ। যেদিন যেদিন বিপিনের খাওয়া হয় নি, সেদিন তার সে কি গভীর দুঃখ। ভাইঝি পিসির ঝগড়ায় পাছে বিপিন ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এজন্য আদুর দোষ লুকাবার তার কি প্রাণান্ত চেষ্টা। সেই অন্ন। বিপিনের চোখের সামনে চকিতের জন্য ভেসে উঠল অন্নদার সেই রোগ, শোক, দারিদ্র্যক্লিষ্ট শুষ্ক মুখখানা, সেই চোখ দুটি, সেই শিরাবহুল শীর্ণ হাত দুখানা।

বিপিন মুখ তুলে তাকাল শারদার দিকে। বললে, বাড়িই যাই না হয় দিদি, আর দোকানপাটও ত বন্ধ রয়েছে অনেক দিন! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেতে তো হবেই!"

শারদা বললে, "কিন্তু মেয়েটার লেখাপড়া, গান বাজনা শেখার এমন একটা সুযোগ যদি ভগবানের দয়ায় মিলল, তা বন্ধ হয়ে যাবে? একবার এ সুবিধে হারালে কিন্তু আর কোনও দিন মিলবে না, নিশ্চয় জেনো।"

"ও না হয় থাক্ এখানে।"

মানিক এর মধ্যে বলবার মত কোনও কথাই খুঁজে পেলে না, অথচ নীরবে থাকাও যেন তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল।

শারদার চোখে তার চোখ পড়তেই শারদা বললে, "তুমি উঠে এস মানিক, হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে আগে একটু জল খাও বাবা, কাল সকালে যা হয় হবে এখন।"

মানিক অস্থির হয়ে উঠল।—"না পিসীমা, আমায় আজকের মধ্যেই ফিরতে হবে।"

কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এসেছে যে, যেতে যেতে রাত হয় যাবে যে বাবা, একা এতখানি পথ!

মানিক না হেসে থাকতে পারলে না। বললে, "ও, সে আমার খুব অভ্যাস আছে; আর তা ছাড়া ভূতের ভয় আমার করে না মোটেই!"

শারদা তাড়া দিয়ে বললে, "তবে উঠে এস, হাতমুখ ধুয়ে নাও, আর দেরি করো না।"

শারদার অনুসরণ করে জল খাবার পরে মানিক এসে উপস্থিত হলো সেই ঘরে, যে ঘরে আদু সরোজের কাছে মুখোমুখি বসে গান শিখছিল।

শারদা বললে, "ও, পুষ্প, কে এসেছে তোদের গাঁয়ের লোক, চিনতে পারিস?"

আদু চমকে উঠল। মুখের সলজ্জ হাসি ওর মিলিয়ে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য মুখটি তার পাণ্ডুর হয়ে উঠল। মানিককে দেখে সে এক নিমিষেই চিনেছিল, মনেও পড়েছিল যে এরই সঙ্গে একদিন ওর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। হয়তো হয়েও আছে, ভবিষ্যতে ওরই জীবনের সঙ্গে একসূত্রে জীবনকে গাঁথতে হবে হয়তো। অজানতে সে একবার শিউরে উঠে জানালে, "চিনেছি।"

মানিকের পরনে মোটা আধময়লা ধুতি, গায়ে গলাবন্ধ কোট, হাতে ছাতি। সমস্ত মিলে তাকে যেন কঠোর বাস্তবের এক বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে হচ্ছিল। আদুর সামনে হারমোনিয়ম, সমস্ত মুখে গম্ভীর থমথমে ভাব, আর তার পাশে যে লোকটি বসেছিল সে সরোজ। সরোজের গায়ে ঢিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি, দীর্ঘ কেশ সুসংযত।

শারদা বললে, "তোমার পিসীমার অসুখ করেছে পুষ্প, তাই মানিক নিতে এসেছে।"

আদু নীরব। শারদা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন কোন পরীক্ষক তার পরীক্ষার্থীকে লক্ষ্য করছে! আদু যেন নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তি! শ্বাস গ্রহণ করছে মাত্র, প্রাণের কোন সাড়া তার মধ্যে নেই! তারপর শারদা আর কিছু না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মানিককেও ফিরতে হ'ল তার সঙ্গে, অন্নদার একটা কথাও সে জানাতে পারল না আদুকে। কিংবা আদুর মুখ দেখে তার জানবার প্রবৃত্তি হ'ল না কোনও কথা।

মানিক এসে দাঁড়াল সেই ঘরে, যে ঘর থেকে সে প্রথম ভিতরে গিয়েছিল। তারপরে শুনল আবার ভেতর থেকে আদুর কণ্ঠের সুরলহরী ভেসে আসছেঃ

"মোর পূজার থালিকা হ'তে নিয়েছ পূজা
ভুলে গেছ পূজারিণীরে,
তব দেউল দুয়ার হ'তে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।
বল মোর প্রিয় ভালবেসে
আবার চাহিবে কবে হেসে,
কবে, তোমার নয়ন দুটি মিলাবে
ভালবেসে মোর নয়নে।" (ক্রমশ)

# নিউ ইয়র্ক

( ভ্রমণ কাহিনী—পূর্বানুবৃত্তি )

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পরদিন দুপুরে বাড়ীওয়ালীর মেয়েকে নিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলাম। ব্যাঙ্কটি ফরটিএইটথ এবং ফিফথ অ্যাভিনিউএর সংযোগস্থলে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমাকে নিগ্রোদুহিতা সমভিব্যবহারে দেখে একটু চিন্তিত হলেন। আমি আর ম্যানেজার মহাশয়কে রহস্যে ডুবিয়ে রাখলাম না। শ্বেতকায়দেরই ওয়াই এম সি এ-তে স্থান পাই নি বলে নিগ্রো সেজে হারলামে আছি, এসব কথা জানিয়ে আরও দু সপ্তাহ নিগ্রো সেজে থাকবার বাসনা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে দিয়ে বললাম, "একবার মনের আনন্দে নিউইয়র্ক দেখতে চাই। বেশী টাকা হাতে রেখে বেড়াতে ভয় হয়।"

এদিকে ম্যানেজার মহাশয় সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন রিপোর্টার এসে হাজির। তারা আমাকে নিগ্রোকন্যার কাছে উপবিষ্ট দেখে নাক সিটকতে লাগল। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে বোধ হয় তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল না; আমিও তাদের সঙ্গে কথা না বলতে পারলে বাঁচি। যাই হ'ক একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি হিন্দু?"

"হাঁ মশায়, আমি হিন্দু।"

"এদেশ সাইকেলে বেড়িয়ে কি দেখবেন?"

"দেখব আপনারা কি করছেন।"

"দেখে ফল?"

"দেশে গিয়ে বলব।"

"এ কদিনে কি দেখলেন?"

"দেখলাম আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তা সত্য নয়।"

"কোন্ ধারণা ?"

"ডিমক্র্যাসি সম্বন্ধে।"

"আপনি কি বলতে চান এখানে ডিমক্র্যাসি নেই?"

"নিশ্চয়ই নেই; ঐ দেখুন পথে কত লোক অভুক্ত। এদেশে যদি ডিমক্র্যাসি থাকত তবে ওরা খেতে পায় না কেন? আপনারা বলেন,—'By the people, for the people, of the people'; এসব মোটেই সত্য নয়। এদেশে যা দেখছি তা ডাহা ক্যাপিটালিজম। এখানে শান্তি থাকতে পারে না।"

"আপনি, আশা করি ইউরোপের সবগুলি দেশই বেড়িয়ে আসছেন, কোথাও ডিমক্র্যাসি দেখে এলেন কি?"

"দেখেছি বই কি, বুলগেরিয়ায় ও তুরস্কে।"

"আপনি এদেশে কত দিন থাকবেন?"

"যত দিন ইচ্ছা।"

"এর মধ্যে কোনও দলে ভিড়েছেন নাকি?"

"আমি কোনও দলের ধার ধারি না। আমি দেখতে চাই এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষের মত বসবাস করে। আপনি যে দলেই আমাকে টেনে নিন তাতে আসে যায় না।"

"আপনার দেশে মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন?"

"যা করেছেন অনেক করেছেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায় যা হবার তা হয়েছে; তাঁর পিছনে যদি রাজশক্তি থাকত, তবে আর ভারতে হরিজন থাকত না। কিন্তু জানবেন, আপনারা যে পুঁজিবাদ পোষণ করছেন, ওই পুঁজিবাদ যেখানে বিদ্যমান সেখানে মানুষ মানুষের অধিকার পেতে পারে না। এই দেখুন না নিগ্রো মেয়েটি আমার কাছে বসে আছে বলে আপনারা আমাকে ঘৃণা করছেন। কালকের Daily Worker-এ দেখেছি, আপনাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ার মস্কো থেকে নির্বাসিত হয়ে এসে মস্কোর বিরুদ্ধে বই লিখছে। তার কারণ ঐ সংবাদপত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। মস্কো গিয়েও নিগ্রোর সঙ্গে না খেতে চাওয়ার জন্যই ইঞ্জিনিয়াররা তাড়িত হয়েছেন। এই তো আপনাদের 'By the people, for the people, of the people'! নিগ্রো বুঝি মানুষ নয়?"

টাকাগুলো রেখে দিয়ে অনেক শান্তি পেলাম। নিগ্রো মেয়েটির হাত ধরে আবার পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একলা ঘরে যেতে পারবে তো মেরী?"

"নিশ্চয়ই পারব পাপা। আপনার সঙ্গে থাকলে দেখছি আপনার ভয়ানক অসুবিধা হয়। আচ্ছা বলতে পারেন আমরা কেন কালো হই?"

"ঘরে গিয়ে বলব" বলে মেরীকে বিদায় দিলাম। মেরী Medison Avenueএর বাস ধরে ঘরের দিকে চলে গেল। এবার আমি মুক্ত। সঙ্গে টাকা নেই, নিগ্রো মেয়ে নেই, এবার আমি হিন্দু হয়ে গেছি। তবে আমি যে হিন্দু এখন এ কথা প্রকাশ করব না।

টুয়েন্‌টিসেকেণ্ড স্ট্রীটের কাছে এসেই একটা ছোট পার্ক পেলুম। সেখানে বসতে ইচ্ছা হল। পার্কের এক কোণে বসে Hen and Eggs সমিতি নিয়ে নানাজনের আলোচনা শুনছিলাম। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক অনবরত চলছে, কিন্তু আমাদের দেশের অধিবাসীদের মত গলা ফাটিয়ে নয়। বোধ হয় এক হাজার লোক বসে পরস্পর কথা বলছে, কিন্তু দূর থেকে তার কোন শব্দ শোনা যায় না।

কমিউনিষ্ট যে এদের মাঝে দু-একজন নেই, তা নয়। তারা গিয়ে যেখানে বসে সেখান থেকে ভগবানের ধর্মভীরু ভক্তের দল সরে পড়ে। লোকমুখে শুনেছি এখনও রাশিয়ায় নাকি মন্দির আছে; কিন্তু আমার মনে হয় রাশিয়ার বাইরে যদি কোথাও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র হয় তো সেখানে মন্দির থাকা দূরের কথা, মন্দির শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত বোধ হয় উচ্ছিন্ন হবে; কারণ কমিউনিষ্ট-দের উপর অন্যান্য দেশে যেভাবে পীড়ন চলেছে, সুযোগ পেলে তার প্রতিশোধ নিতে ওরা ছাড়বে না। আমেরিকাতে যারা কমিউনিষ্ট দলের সভ্য তাদের বেকার ভাতা দেওয়া হয় না। অবশ্য সেজন্য এরা গ্রাহ্যও করে না। বলে, ভাতা থেকে যত দূরে থাকবে ততই কর্ম-তৎপরতা বাড়বে। এরা শুকিয়ে মরে তবু পথভ্রষ্ট হয় না। এরা পার্কের, পথের, প্রমোদ ভবনের, সিনেমা গৃহের, ধনীদের, ডিমক্র্যাটদের, রিপাবলিকানদের, ফ্যাসিস্টদের, নাৎসীদের, ধর্ম-যাজকদের সকলের শত্রু। যদিও এরা সংখ্যায় কম কিন্তু এদের সকলে ভয় করে, কারণ এদের যুক্তির সামনে কোনও যুক্তি খাটে না। রূঢ় সত্যকে পৃথিবীর সকলেই ভয় করে।

বিকালে সেন্ট্রাল পার্কে ফিরে এলাম। অনেক লোক ফিরে আসছে। এদের মধ্যে একটা লোককে দেখে মনে হল এ লোকটা নিশ্চয়ই বাঙালী, তাকে ডাকলাম, সে এল। পরিচয় হল। পরিচয়ে জানলাম তাঁর বাড়ী আমার গ্রাম হতে বার মাইল দূরে। দেশে তিনি মোল্লার কাজ করতেন, এখন তিনি একজন পাকা কমিউনিস্ট; ভগবান তাঁর মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি আমাকে পেয়ে যত আনন্দ পেলেন, আমি তার চেয়ে বেশী পেয়ে-ছিলাম। তিনি যখন আমার পরিচয় পেলেন তখন তাঁর চোখ-দুটো লাল হয়ে উঠল। কি কতকগুলো কথা বললেন তার একটাও বুঝলাম না, বোধ হয় রাশিয়ান বলছিলেন। তার পর একটা রেস্তারাঁয় নিয়ে গেলেন। রেস্তারাঁয় খাবারের যা অর্ডার করলেন তা শুনে অবাক হলাম। খাবার এলে বললেন, "গরু গরুই, দেবতা নয়, শুকর শুকরই দেবতা নয়; খেয়ে হজম করতে পারবে তো ঠাকুর?" আমি নীরবে সবই গলাধঃকরণ করলাম। কথায় কথায় বললেন, "মিঃ প্যাটেল এসেছিলেন। লোকটি ভাল, কিন্তু পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী বুদ্ধি আর স্বভাব, যতদিন সুযোগ ও সুবিধা থাকে, সহজে যায় না।"

আমাকে তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন, নিয়ে গেলেন 'ইন্টর

ন্যাশনাল' নামের একটা হোটেলে। যত রাজ্যের কমিউনিস্ট ওই হোটেলটাতে এসে থাকে। কয়েকজন লোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েই হল ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "কমরেড, এই লোকটা আমার দেশ থেকে দুদিন পূর্বে এসেছে, একদম তাজা; এর সংগে কথা বলে দেখ আমাদের অবস্থা কি! যদি পার তো কয়েক দিনের মধ্যে এটাকে মানুষ তৈরি ক'রে ফেল।" পংগপালের মত অনেক লোক নীচে নেমে এল; তাদের মধ্যে দুজন ভারতীয় ছাত্র। কপুরতলার মহারাজা আমেরিকায় এসেছেন, তাঁরই কথা অনেকক্ষণ ধরে চলল। তার পর জিজ্ঞাসা করল আমি তাঁরই অগ্রদূত কি না। মোল্লা মশায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "না হে, লোকটি 'পেটি বুরজোআ' আমাদের বাড়ীর কাছেই বাড়ী। আমার জন্ম হয়েছে কৃষকদের মাঝে, আর ওর জন্ম হয়েছে প্রকৃত পরশ্রমজীবিদের মাঝে। আমাদের রক্ত খেয়ে ওরা বাঁচে; তাই দেখাতে এনেছি এদের আকৃতি প্রকৃতি কেমন। এদেশে যেমন এরূপ জীবের অভাব নেই, আমাদের দেশেও তেমনি এরূপ জীবের অভাব নেই।"

কমিউনিজ্মের প্রতি সমবেদনা থাকলেও এরূপ ক্ষেত্রে মন বিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আমারও মনের পরিবর্তন হ'ল, কিছুই ভাল লাগছিল না। কখনও ভাবছিলাম চলে যাই, কখনও ভাবছিলাম বসি। এমন যখন মনের অবস্থা তখন আমাদেরই জাহাজের একজন অফিসর এসে হাজির। তাঁকে দেখেই চিনতে পারলাম; তিনিও আমাকে চিনতে পারলেন। দুজনায় একটু কথা হল, তার পর তিনি আমাকে 'কমরেড' রূপে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলের মুখের ভাব সংগে সংগে বদলে গেল। এইবার আমার পালা। মোল্লা মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললাম, "অমন অশিষ্টাচার করে মানুষকে দলে টানা যায় না। লোককে রাগাতে নেই, বুঝতে হবে। লোক বুঝুক তার পর আপনিই আসবে। যারা বুঝেও আসবে না, আজ আমার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেই ব্যবস্থা তাদের জন্য না হয় করতে পারেন। আপনি ধর্মপ্রচার করতেন; ধর্মপ্রচার আর কমিউনিজম প্রচার এক নিয়মে হয় না। মনে রাখবেন, ধর্মপ্রচারের পিছনে রাজশক্তি থাকে, কিন্তু কমিউনিজ্ম প্রচারের পিছনে রাজশক্তি নাই, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সফল হতে হলে ধৈর্যের দরকার, সাহসের দরকার, সহিষ্ণুতার দরকার। মোল্লা সাহেব যাকে দলে টানবেন তাকে বন্ধু বলে পরিচয় দেবেন, শত্রু বলে নয়।"

অনেক কথা বলে গভীর রাত্রে যখন ফিরছি, মোল্লা সাহেব আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের লোক কি এখনও বোঝে না যে, তাদের সুখ-শান্তি নেই, সুযোগ-সুবিধা নেই, ধর্ম তাদের অন্ধ করে রেখেছে?" আমার বলার মত কিছু ছিল না; চুপ করে রইলাম; মিঃ জিন্নার মিশনের বাণী, কংগ্রেসের সংগে বিদ্রোহ প্রভৃতির কথা বিদেশে 'ষ্টার অব ইন্ডিয়া' মারফত প্রচার হয়। ঘরে গিয়ে তারই এক কপি আর 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর এক কপি তাঁকে দিয়ে দুটোয় মিলিয়ে পড়তে বললাম।

ডারবান এবং কেপটাউনে কয়েকখানা ভারতীয় ইংরেজী দৈনিকের প্রচলন আছে বটে কিন্তু সে সব সংবাদপত্র আমেরিকায় যেতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' অবাধে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক ও সানফ্রানসিস্কোতে গিয়ে হাজির হয়। এক পেনি দামের কাগজ, সেখানে এক শিলিং দামে বিক্রি হয়। আমিও অনেকদিন তাই কিনেছি। সানফ্রাসিসকোর ব্রিটিশ কনসালের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' গিয়ে হাজির হয় এবং সাদরে গৃহীত হয়। মোল্লা সাহেবও এক পেনির 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' এক শিলিং দিয়ে কিনতেন। তবে তাতে তাঁর মনমত কথা থাকে না বলে অনেক দুঃখ আর অনুযোগ প্রকাশ করতেন।

রাত্রে সাড়ে নয়টার সময় ফরটিসেকেণ্ড স্ট্রীটে রাশিয়ান ফিলম দেখতে গেলাম। সেখানে দামের তারতম্য নেই, সকলের জন্যই এক দাম। শ্রেণী বিভাগ নেই, সর্বত্রই এক শ্রেণী টিকিটের দাম পঁচিশ সেণ্ট। যার কাছে পঁচিশ সেণ্টও নেই তাকে বলতে হয় 'আমার কাছে পঁচিশ সেণ্ট নেই'। বললেই দারওয়ান দ্বার ছেড়ে দেয় এবং সসম্মানে বসবার স্থান দেখিয়ে দেয়।

ছবি সুরু হল, কমিউনিজম সম্বন্ধে ছবি। ছবি দেখার সংগে সংগে লোকে কি মনোভাব নিয়ে এই ছবি দেখে তাও লক্ষ্য করতে লাগলাম। এক সময় দেখলাম লেনিন দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছেন, পিছন থেকে একটি রমণী তাঁর দিকে গুলি ছুড়ল। লেনিন পড়ে গেলেন, মজুররা মজুরদের হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে উত্তেজনায় লোকদের মুখ সাদা হয়ে গেল। যেন লেনিন তাদের সামনেই হত হয়েছেন। তারা যে কি রকম উত্তেজিত হয়েছিল তা বাইরে টের পেলাম। ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে বহু লোক 'আমেরিকার পুঁজিবাদ ধ্বংস হক' বলে চীৎকার সুরু করলে। পুলিস এসে সবিনয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে লাগল।

আমেরিকার পুলিসের কার্যকলাপ সত্যই আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। তাদের মতন কর্তব্যপরায়ণ শিষ্টাচারসম্পন্ন পুলিস বোধ হয় আর কোথাও নেই।

## হাস্যশিল্পী-শরৎচন্দ্র

( ৮৯৩ পৃষ্ঠার পর )

নিছক হাসি, নির্জলা রঙ্গ চোখে হয়তো পড়ে নি। তাঁর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ হাস্যরস রূপায়িত হয়েছে হাসিকান্নার অবিচ্ছেদ্য মিলনে। যেখানে সাধারণত শুধুই হাসি প্রত্যাশা করা যায় সেখানে হঠাৎ জমে ওঠে গভীর অশ্রু। আবার যেখানে অশ্রুই স্বাভাবিক, সেখানে অকস্মাৎ ঝলসে ওঠে নির্মল হাসির জ্যোতি। তাঁর প্রতিভা এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিল—আমাদের হাসিকান্না একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। তাদের মধ্যে ব্যবধান শুধু আলোছায়ার একটি সূক্ষ্ম রেখা। তাই তাঁর হাস্যচিত্রে বারবার হাসিকান্নার পৃথক সত্তা হারিয়ে গেছে। ব্যাঙ সাহেবের মৃত্যুদৃশ্যের সকরুণ বিভীষিকার মধ্যে স্নিগ্ধ হাসির সন্ধান কে কল্পনা করতে পারে!—

"আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী, জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

"কালী কহিল, না।

"কহিলাম, দুটি খড়টড় যোগাড় ক'রে আনতে পার?

"কালী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ যে এখানে কি গরু আছে?

"কহিলাম, বাবুকে তা হ'লে শোয়াই কোথায়?

"কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচবেক।

"তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনলে আর মোহমুদ্গর পাঠের আবশ্যকতা থাকে না।..."

শরৎচন্দ্র অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন—ব্যথাকে রাঙিয়ে তুলেছেন হাসির রঙে, হাসির বিদ্যুৎ ফুটিয়ে দিয়েছেন ব্যথার কাজল মেঘে। অনির্বচনীয়কে তিনি রূপ দিয়েছেন সর্বজনের উপভোগ্য ক'রে। বাঙলা সাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ হিউমার শিল্পী।

# বিপর্য্যয়

( অনুবাদ গল্প )

**শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

অসংবৃত কেশপাশ সংযত ক'রে নিয়ে মেরিয়া রিপোল যখন উঠে দাঁড়াল, হাত দুটোতে তখন তার প্রবল কাঁপুনি। সঙ্গে সঙ্গে টোনিয়ো পিজোলও একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

গাঢ়, নিঝুম অন্ধকার। বাতাসে ভর ক'রে ঠাণ্ডার আমেজ ছিটকে এসে তাদের গায়ে লাগছে। পাহাড়ের ওপরে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে পড়া জলের হিস হিস শব্দ, তাদের দুজনের ভয়কম্পিত নিঃশ্বাস, মেরিয়ার পাঁজরার ওপর যেন নির্দয়ভাবে আঘাত দিতে থাকে।

টোনিয়ো দেশলাই জ্বালে। সেই আলোয় তার রুগ্ণ কাল মুখখানা একবার স্বস্তিতে ঝলসে ওঠে। পরক্ষণেই চোখের কোণে ও কপোলদেশে দেখা দেয় গম্ভীর চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা। চারপাশের কঠিন সাদা রঙের প্রাচীরগুলোও এই আলোয় চকচক করে।

"তৈরী?" হঠাৎ প্রশ্ন এল টোনিয়োর মুখ থেকে।

মেরিয়া ঘাড় নাড়ল। বুঝতে পারলে, এইবার কথা কওয়া দরকার। তাই আস্তে আস্তে এক কথায় সায় দিলে। দিয়ে আবার ইলেকট্রিক টর্চটা জ্বাললে। সাদা আলোয় তাদের পায়ের তলাকার গর্তটা আর পাশের সুড়ঙ্গটাও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

মেরিয়ার নিশ্বাসে একটা ভয় পাওয়ার শব্দ, মুখ শীর্ণ পাণ্ডুর, চোখে হতাশার বিষণ্ণতা। বুকের ভিতরে প্রবল শব্দ, দেহের উত্তেজনা যেন সব নির্বাপিত। এই পরিবেশের ভিতরে থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া কত অসম্ভব! কোথায় আকাশ-ভরা তারার নীচে ছোট ছোট অ-দেখা গর্ত, ওই পাহাড়ের বিভীষিকা, আর কোথায় পারিবারিক প্রতিবেশের প্রশান্ত নিশ্চিন্ততার সুখ।

টোনিয়ো দাঁত বার ক'রে হাসে। মেরিয়ার গা জ্বলে যায়, ভাবে, ও লোকটা কি রকমের, ওর কি কোনও কিছুতেই পরোয়া নেই? জগতে পুরুষগুলোই বুঝি এইরকম? ওদের মধ্যে বোধ হয় মনের ভাঙাগড়া ব'লে কিছুই নেই।

টোনিয়ো বিরক্ত হয়। বলে, "এস না।"

মুক্ত আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে মেরিয়ার প্রকাশ পায়। নিত্যকার জীবনের গতিকে ফিরিয়ে আনতে চায় সে। মেরিয়া মুখ ভার করে। ওর রুগ্ণ দেহটাকে আশ্রয় ক'রে—গহন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে যাওয়া, সে ভাবতে পারে না। কিন্তু যা করতে এসেছে সে ব্যাপারে তা না ক'রেও তার উপায় নেই।

জায়গায় জায়গায় হামাগুড়ি দিতে হয়। কখনও খাড়া উঠতে হয়, কখনও নামতে হয়, কখনও আবার থেমে সতর্ক হয়ে নিতে হয় সামনে এগবার জন্যে। দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে মেরিয়ার মোজাজোড়া জবাব দেয়, পরনের পোশাক কাদায় ময়লা হয়ে যায়। বহুক্ষণ পর তার কানে আসে বড় পুকুরটার বয়ে যাওয়ার শব্দ।

দেখতে দেখতে পুকুরের উপর এসে পড়ে ওরা। আজ দুটি হপ্তা ধ'রে কতবারই না সে এখানে আসছে কিন্তু তবু তার বিস্ময় ঘোচে না। সব কথা যেন অর গুলিয়ে যায় এখানে এসে। মনেই থাকে না বড় পুকুরের ভয়ংকর ভয়ের কথা, আর একটু ওদিকেই পায়ের তলার হাঁ করা গর্তটা; দৃঢ়শক্তিতে নিজেকে সংযত ক'রে তুলতে হয়।

টোনিয়ো আবার টর্চের আলো ফেলে; প্রকাণ্ড গর্তটার ভিতরে অন্ধকার ভয়ে মুখ লুকায়। জীবনের প্রচ্ছদপটে পড়ে একটা ম্লান গভীর সমারোহের ছায়া। ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ অবিশ্রান্ত রশ্মি সাড়া দিয়ে ওঠে। নির্বাক্ ভয়ে মেরিয়া থরথর ক'রে কাঁপে। অতল গভীরে পুকুরের সাদা-কালো জল বিরামবিহীন গতিতে ছুটে চলে।

তারা দাঁড়িয়ে একটা কাঠের তক্তার ওপর, দশ ফুট তার দৈর্ঘ্য। ওটা দিয়ে গর্তটার উপর সেতু তৈরী হয়েছে। গর্তটার মুখের একটা দিকে কাঠখানা একেবারে সরু।

মেরিয়ার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ক্ষণেক অপেক্ষার পর টোনিয়ো আস্তে আস্তে এক পা এক পা ক'রে তক্তাখানার উপর দিয়ে হেঁটে চ'লে এল। তার পর মেরিয়াও তাকে ভর ক'রে ভয়ে ভয়ে পেরিয়ে এল।

একটুখানি হেসে আবেগ ভরে টোনিয়ো বললে, "এঃ, ভয় পেয়েছিলে মেরিয়া? ভয় কি, তোমার টোনিয়ো যতক্ষণ কাছে আছে?—"

কথা ফুরবার আগেই উত্তপ্ত আকুল ওষ্ঠাধরস্পর্শে মেরিয়া চমকে উঠে আবার পথ চলতে লাগল। ভিতরে আবার সেই বিভীষিকার আলোড়ন।

টোনিয়োর এখন শুধু বাড়ী ফেরার মতলব। মেরিয়া এখনও বিভ্রান্ত। কি যে তার ইচ্ছা সে বিষয়ে নিজেই সে অবহিত নয়; সে জানে না কি সে এখন করতে চায়। তাই কোনও কাজ না পেয়ে ব্যগ্রভাবে দুই হাত বাড়িয়ে সে টোনিয়োর গলাটা জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সব বৃথা। উৎসাহ এখন জুড়িয়ে গেছে, রাতও হয়েছে অনেক। তাদের যাবার পথ আলাদা। মেরিয়ার মুখ চুম্বন ক'রে সেদিনের মত টোনিয়ো বিদায় নিলে।

ভয়ে ভরা মেরিয়া ঘরে ঢুকল।

তার স্বামী মার্টিন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত দশটার আগেই শোওয়া তার রোজকার অভ্যাস; কেননা সারাদিন মাঠের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর নিদারুণ ক্লান্তিতে আপনা হ'তেই তার চোখ বুজে আসে। তার এই কাজ করা দেখে মেরিয়া নাক সিঁটকায়। কাজের মধ্যে কি?—দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই খালি গাধার খাটুনি। আর তার মজুরী?—কিছু শাকসবজি, গরুর খাবারের জন্যে এক মুঠো ঘাস, এই! এর উপর আর কোনও বড় কিছুর প্রত্যাশাটুকু নেই।

তার মনে হয় সেও যেন গরুর মতই একটা পোষমানা

জীব। মনিবের কাজে আসা, তার মন জুগিয়ে চলাটাই তার জীবজীবনের চরম সার্থকতা।

মার্টিনের ওপর চিরদিনই তার ঘৃণা। তার ছন্নছাড়া দারিদ্র্য আর বৃথা একঘেয়ে, উদয়াস্ত পরিশ্রম এসব সে বরদাস্ত করতে পারে না। এত যে পরিশ্রম, কই তাতে তো নিঃস্বতার বোঝা এতটুকুও কম হয় না। আর সব চেয়ে মেরিয়াকে বিষিয়ে তোলে মার্টিনের ওই সবেতেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকাটা, তার ঐ নিরবচ্ছিন্ন আত্মতৃপ্তির ভাবটা। ভাগ্যের বিরুদ্ধে অদৃষ্টের বিপক্ষে অভিযান করা, কি বিন্দুমাত্র অভিযোগের সুর ধ্বনিয়ে তোলা, তাও তার স্বামীর কোষ্ঠীতে লেখে নি। একান্ত সামান্য জমিজমাটুকু অলিভগাছে ঘেরা ছোট্ট কুটীরখানি আর গবাদি পশুর সম্বল নিয়েই জীবনে সে কতই সুখী, কতই না গর্বিত!

মেরিয়ার জন্যও সে কম গর্ব অনুভব করে নি। কিন্তু সে দিন আর নেই, এখন মেরিয়ার দিকে নজর দেবার অবসর বা অবকাশেরই তার অভাব। মেরিয়া দুঃখ জানায়। হ'লে কি হবে, যা খিটখিটে তার মেজাজ। রাফেলার নতুন ফ্রক এসেছে, কি জোয়ানিতার তাকে হপ্তায় একবার ক'রে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছে, অমনি তার মুখ ভার হ'য়ে উঠেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে, তার বরাতে ভগবান একটা নতুন ফ্রকও লেখেন নি আর জোয়ানিতার মতন কপাল তো সে করেই নি। তারা যে বছরে একটিবার ক'রে সিনেমা দেখতে যায়, তা ওই মেরিয়ারই একান্ত জিদে।

সাড়া না দিয়ে মার্টিনের পাশে বিছানায় সে এলিয়ে দিলে নিজেকে। ইচ্ছে করল, চীৎকার ক'রে ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে বলে, সে টোনিয়োর সঙ্গে এত রাত্তির পর্যন্ত বাইরে ছিল আর টোনিয়ো পিজোল একজন সত্যিকার পুরুষ মানুষ। কিছু একটা সে করতে চায় যাতে মার্টিন তার এই নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়তার ঘুমঘোর থেকে জেগে ওঠে।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। যতই হোক না কেন মার্টিন সবল, তার গায়ে জোর আছে। এইসব কথা বললে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সে তাকে দু ঘা বসিয়ে দেবে। সে অপমান মেরিয়া সহ্য করতে পারবে না। টোনিয়োর কাছ থেকে ওরকম ব্যবহার অবাঞ্ছিত নয়, এমন কি তাতে একটা আনন্দের অনুভূতি আছে। টোনিয়োর প্রভুত্ব আনন্দের সঙ্গে সহ্য করা যায়, কিন্তু মার্টিনের—না, না, কখনও নয়। সে চোখ বুজল। কিন্তু তার মতলব, তার ষড়যন্ত্র রইল ভবিষ্যের পানে চেয়ে। সকালে উঠেই আবার তার মনে পড়ে গেল সে গুরুতর দায়িত্বের কথা।

অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। হঠাৎ মেরিয়া নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বলে, "টোনিয়ো পিজোল বিনা শুল্কে চোরাই মাল রপ্তানি করে, তুমি জান? আমি কিন্তু জানি কোথায় সেইসব মাল সে মজুত ক'রে রাখে।"

তার এই আকস্মিক কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হ'লেও মার্টিন শান্ত হয়ে থাকে, কোনও জবাব দেয় না। তাকে চটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই আগের কথাটার জের টেনে চলে মেরিয়া; বলে, "আমি তার গুপ্ত ভাণ্ডারের অনেক খবরই জানি।"

একটা উদাস চাহনি মেলে মার্টিন পূর্ববৎ চেয়ে থাকে; মেরিয়ার মেজাজ যায় বিগড়ে। সে লাফিয়ে ওঠে;—"কথাটা কানে যাচ্ছে না নাকি? বলছি, এই সেদিন হাজার হাজার বস্তা মাল বোঝাই হয়ে তার জাহাজ ছেড়ে দিল আমি নিজের চোখে দেখেছি—"

"সত্যিই?" তাকে শেষ করতে না দিয়েই সশব্দ নিঃশ্বাসে মার্টিন চেঁচিয়ে উঠল।

"হাঁ সত্যি। সেগুলোতে অনায়াসেই তোমার বিস্তর আয় হ'তে পারত। সারা বছরে এখন তোমার যা রোজগার তার চেয়ে অনেকগুণ—"

"মানে? তুমি বলছ কি?"

"নিশ্চয়ই; এটুকু আর তোমার সহজ বুদ্ধিতে আসে না? আমার ওপর বুঝি বিশ্বাস নেই তোমার? চল আমার সঙ্গে, আমিই দেখিয়ে দেব। তুমি ভেতরে ঢুকে সব দেখবে। তা' হ'লে সহজেই তাকে বেফাঁস ক'রে দিয়ে পুরস্কারের মোটা টাকাটা বাগিয়ে নিতে পারবে।"

"কিন্তু টোনিয়ো? টোনিয়োর—" মার্টিন আমতা আমতা করে।

মেরিয়া আঙুল মটকায়। বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, "টোনিয়োই বা তোমার জন্যে কি করেছে শুনি?"

"আচ্ছা বেশ, তুমি আমায় দেখিয়ে দিও খন।"

চোখ পাকিয়ে মেরিয়া ঘাড় নাড়ে। বলে, "আজ রাত্তিরেই তা হ'লে। দশটার সময়, কেমন? আমি একটা টর্চ নিয়ে আসব তা হ'লে।"

আর কথা না ব'লে মাথায় একটা শাল চড়িয়ে মেরিয়া বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের এক প্রান্তে টোনিয়োর কুটীর। সকলের নজর এড়িয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল সে। টোনিয়ো কাছে এলে চুপিচুপি ফিসফিস ক'রে সে বললে, "টোনিয়ো, মার্টিন তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের খবর টের পেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আজ রাত্তিরে সে সেখানে খোঁজ খবর করতে যাবে বলেছে। তার পর তোমায় ধরিয়ে দিয়ে—"

কথা আর শেষ হ'ল না। অন্ধকারে তার দিকে কুটিল চাহনি হেনে সে চীৎকার ক'রে উঠল প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে।—"না, না, তা' আমি হ'তে দেব না। আমি, আমি তাকে—"

"হ্যাঁ, তুমি তাকে খুন ক'রো টোনিয়ো। সেইই তার সমুচিত শাস্তি। সে নিজে খুব যে সন্দেহ করেছে তা নয়। তবু তারা সকলে—মানে—হয়তো তোমায় সব কিছু হারাতে হবে। নয়তো—"

"তুমি, তুমি কিছু করতে পার না?"

"সে সবল, তাকে আমি ঠেকাই কি ক'রে?"

"শেষকালে বন্ধুই আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে?"

চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে সে অধর দংশন করে। তার পর আঙুলের গাঁট কামড়ে সে ফস্ ক'রে ব'লে ফেলে, "না, সে

গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে আর সে ফিরে আসতে পারবে না। বাঁচোয়া তার নেই।"

তার কাছ থেকে একটা টর্চ চেয়ে নিয়ে মেরিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। তাড়াতাড়িতে টোনিয়োর পাওনা মেটাতেও ভুল হয়ে যায়।

বুকে তার আশার বাণী। চোখেমুখে জয়গৌরবের ঔজ্জ্বল্য। মার্টিনের হাত থেকে আজ সে একেবারেই রেহাই পাবে। টোনিয়োও আর তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না; সে আজ লুকিয়ে দেখবে মার্টিনকে খুন করা। টোনিয়োকে তার পর বলবে, 'শাবাশ, আমি সমস্তই দেখেছি।' তখন আর সে কোনও ক্রমেই তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তা হ'লে পুলিশের কাছে সে সব কথা ফাঁসিয়ে দেবে না। নিজের সূক্ষ্ম ও কূট কৌশলের কথা মনে ক'রে নিজেই সে আমোদে উছলে ওঠে।

টোনিয়ো তার স্বামীর মত অত কৃপণ নয়, সে খরচে। খরচে সে ভয় পায় না, পায় আমোদে। মেরিয়ার সৌভাগ্য! কত টাকা টোনিয়োর, তার টাকারই বা অভাব কিসের!

কিছুদিন থেকে মার্টিন তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। কেননা টোনিয়ো দু মাস আগে অবধি তাকে সমানে ঘৃণা ক'রে উপেক্ষা ক'রে চলত। তার বিষয়ে আজ মেরিয়া সব কিছু খুঁটিনাটি জেনে নিয়েছে। টোনিয়ো খামখেয়ালী, তাকে বিশ্বাস করাও তো চলে না কিনা!

মার্টিনের মরার পর টোনিয়োকে সে আপন ক'রে পাবে। এই পাপের বাঁধন দিয়ে তাকে সে নিজের সঙ্গে এক ক'রে বাঁধবে।

পাহাড়ের পথে মার্টিন আর মেরিয়া। সুরঙ্গের কাছে এসে মার্টিনকে পেছনে নিয়ে মেরিয়া হাঁটু গুটিয়ে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে চলল। ঝোপ ঝাড় সরিয়ে প্রবেশ পথের গর্তটা দেখিয়ে দিল সে আঙুল দিয়ে। মার্টিন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান পেতে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। বেশ কিছু দূরে থেকে মেরিয়া তাকে অনুসরণ করল। কথা ছিল, সে বাইরে থেকে পাহারা দেবে টোনিয়ো যেন না এসে পড়ে। যদিও সে জানত টোনিয়ো আগে থেকেই সেখানে হাজির। ইচ্ছে করলে সে মার্টিনের টর্চের আলোয় পিছনে পিছনে এগতে পারত। পথ জানা, হোঁচট খেয়ে পড়বার আশঙ্কাও কম।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। মেরিয়া মুখ নীচু ক'রে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে দেখল। তার মনে হ'ল ওইখানে কোথাও হয়তো একধারে টোনিও অপেক্ষা করছে।

এদিকে ওদিকে আলো ফেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মার্টিন উৎসুক দৃষ্টিতে গর্তটার এক কোণ ঢাকা সরু কাঠটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তক্তাটার উপর পা বাড়িয়ে দিয়ে শেষকালে সে সতর্কভাবে সেটা পেরিয়ে গেল। কাঠটা তখন ভিজে গিয়ে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে।

সে ওদিকে গিয়ে পেঁছিল, মেরিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তা দেখলে। হঠাৎ হোঁচট খাওয়ার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা গেল নিভে। জলস্রোতের শব্দ ছাপিয়ে একটা গলার শব্দ মেরিয়ার কানে এল। আবার আলো জ্বলে উঠলো, আবার সে তাকে দেখতে পেল সুড়ঙ্গের পথে এগিয়ে যেতে। টোনিয়ো হয়ত ওকে আরো ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ওর আর উদ্ধার নেই!

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থাকবার পর মেরিয়া চঞ্চল হয়ে উঠলো। আলো নিভে আসছে। দেখতে দেখতে মোড় ফিরে মার্টিন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আগের মতই সন্তর্পণে মেরিয়া এগিয়ে চলল, সিঁড়ি বেয়ে এসে পেঁছিল সে সুড়ঙ্গ পথের এক প্রান্তে। মনে তার ঝড় উঠেছে। তবে কি তার দৃষ্টির অন্তরালে মার্টিনকে মেরে টোনিয়ো তাকে ঠকাতে চায়? দেখতে হচ্ছে। এতদূর এগিয়ে এসে সে কিছুতেই সব পণ্ড হ'তে দেবে না।

তক্তার উপর পা দিয়ে সে এগতে লাগল। চারিদিকে বিভীষিকার ভয়াল মূর্তি। সারা শরীর শিউরে উঠল তার। এত শীতেও মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। হাঁটুতে কাঁপুনি লেগেছে; তবু তাকে এগিয়ে চলতে হবে। সে ঠকবে না, সে হঠবে না, সে ফিরবে না।

হঠাৎ একবার কাঠটা দুলে উঠল। তার পর একটু স'রে গেল। ধাক্কাটা লাগল তার সারা শরীরে, মাথাটা উঠল ঝনঝনিয়ে; হৃৎস্পন্দ বুঝি বা তার থেমেই গেল।

আর এক পা; আবার কাঠটা খানিকটা স'রে গেল। শুধু সরা নয়, এবারে সহসা কাত হয়ে পায়ের তলা থেকে হুস করে সরে গেল। সে বুঝি বা বাতাসে দুলছে, পায়ের নীচ থেকে ভিত্তি গেছে সরে, পৃথিবীর সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক নেই।

মেরিয়া দুলছে; তক্তাটা শেষবার দুলে উঠে একদিকে হেলে নীচের সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল।

শূন্যে তার ব্যাকুল চীৎকার প্রতিধ্বনিত হল। সে প্রতিধ্বনি বাতাসে ভেসে ছুটে চলল সুড়ঙ্গপথ থেকে সুড়ঙ্গের দুর্ভেদ্য অন্তরে। সশব্দে জলটা উথলে উঠল সুড়ঙ্গের সীমা পর্যন্ত।

টোনিয়ো আর মার্টিন। গর্তের দুই দিকে ওরা ছিল আত্মগোপন করে। দু দিক থেকে দুখানা হাত এসে মিলল। চোখ দুজোড়া পরস্পরের দিকে কি একটা ইঙ্গিত জ্ঞাপন করলে।*

*লেখক—D. Wilson Macarthur.

# বাউল সাধনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

'বাউল' কথায় কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বুঝায় না। বাউল-সাধনা হইতেছে আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের একটি পন্থা বিশেষ। বাউল সাধনা শিষ্যপরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। শিষ্যদের মধ্য দিয়াই বাউলের ক্রিয়াকান্ড, শিক্ষানীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। উত্তরাধিকারলব্ধ ধন হিসাবেই বাউল সাধনার ধারা প্রবাহিত হইত। উত্তরাধিকারসূত্রে অনুসৃত হইলেও বাউল সাধনার যে ধারা এখনও জীবন্ত আছে, তন্মধ্যে অনেক পরিমাণে মৌলিকত্ব ও স্বত্ব সংরক্ষিত রহিয়াছে। বাউল সাধনার উপর যাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাসপর ও শ্রদ্ধাশীল হইতেন তাঁহারাই বাউল সাধনার অন্তগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারিতেন।
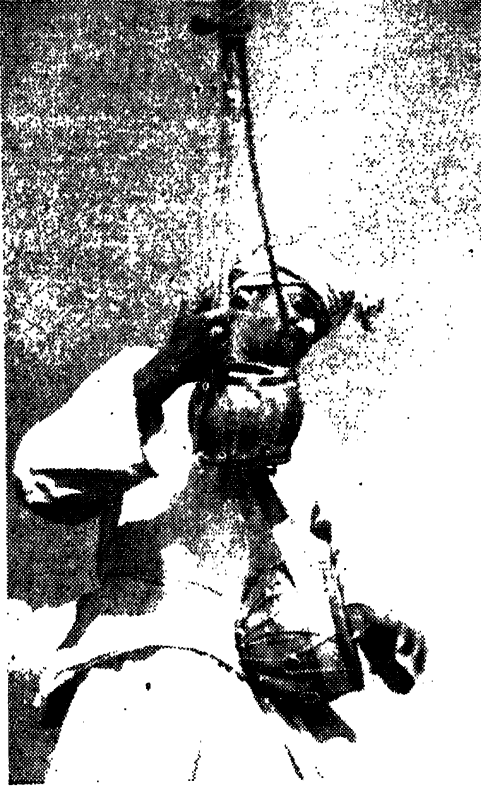
বাউল ফটোঃ শ্রীসুধীন দত্ত

খাঁটি বাউল সত্যকার শিষ্যকে সাধনার পন্থা শিখাইতেন। শিষ্যরা বাউল-গুরুর নিকট হইতে প্রত্যহ কয়েক পঙ্‌ক্তি করিয়া শিখিত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার আবৃত্তি করিত। এইরূপে তাহাদের স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইত এবং যখন ইহাদের শিক্ষানবিসি সমাপ্ত হইত তখন ইহাদিগকে পুস্তকের মত ব্যবহার করা চলিত। এই জন্য এইরূপে শিষ্যপরম্পরা অনুসৃত বাউল সাধনায় যে সত্য ও স্ব-রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিজ্ঞানসম্মত রূপেও গ্রহণ-যোগ্য বটে।

বাউল সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে স্ব-আত্মার স্ব-রূপত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা। এই জন্য বাউলরা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অন্বেষণে পাগল। বাউল সর্ব প্রথমে আপন দেহ সম্বন্ধে জানিতে চান। বাউল জানেন, মানবীয় দেহই বাস্তবত অখিল বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ, এ দেহের ভিতরই স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম রহিয়াছে, এমন কি, এই দেহের ভিতর স্বয়ং গুরুর সত্তা বর্তমান। বাউল মতে গুরুই হইতেছেন এই পার্থিব জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং গুরুই আধ্যাত্মিক গুপ্তবিজ্ঞানের আধার। বাউলদের মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে, গুরুকে ভজনা করা এবং গুরুর নিকট হইতে পরম তত্ত্ব অর্জন করিয়া আত্মাকে ক্রমান্তরে ঊর্ধ্ব-গামী করিয়া চরম মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করা। বাউল মতে গুরুর শক্তি অসীম। গুরু মানুষকে সিদ্ধি ও মুক্তি দিতে পারেন। পার্থিব জগতে গুরুই হইতেছেন ধর্ম ও মোক্ষের পথপ্রদর্শক। বাউলরা মনে করেন, মানুষের দেহের মধ্যেই গুরু অবস্থান করেন। তাঁহাদের মতে সর্বশক্তিমান গুরু প্রেমময়, এবং পরমাত্মা হইতে মানুষের উৎপত্তি বলিয়া জীবাত্মাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রেমরস প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং যদি আত্মোপলব্ধি দ্বারা দেহের অন্তর্নিহিত প্রেমপদ্মকে প্রস্ফুটিত করা যায়, তাহা হইলে পরমাত্মার অসীম ব্যাপ্তির ফলে পরম পুরুষার্থ প্রত্যক্ষত অভিজ্ঞাত হয়। এই জন্যই বাউলরা সাধনার দ্বারা প্রীতি ও প্রেমধর্মের অনুশীলন করেন। মোটামুটি ইহাই বাউল সাধনার অন্তগূঢ় তত্ত্ব।

বাউলগণ যে সব ভজন গাহিয়া থাকেন, সেগুলি বাউল সাধনার বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। খাঁটি বাউল সঙ্গীত এখন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পল্লী অঞ্চলে যে দুই-চারিটি বাউল গান নামে প্রচলিত আছে, সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই বিকৃত ও পাঁচমিশালী হইয়া গিয়াছে। রাজসাহি, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু প্রচেষ্টায় কতকগুলি খাঁটি বাউল সংগীত আবিষ্কার করা গিয়াছে। ইহাদের কয়টির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বাউল সাধনার সারমর্ম কতখানি পাওয়া যায় দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১)

গুরু ভব পারের কান্ডারী।
গুরু কয় ওরে মন,
সাবধানে করিও গমন,
তরঙ্গ আসিবে যখন হইও হুঁসিয়ারী।
সদাই লক্ষ্য রাখিও ঢেউ-এর দিকে,
ঢেউ কাটিয়া চালাও তরী,
গুরু ভব পারের কান্ডারী।

পার্থিব জগৎ হইতে নির্বাণ জগতে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্তা হইতেছেন গুরু। গুরুর মতে এই সংসার সমুদ্রের মত। সংসার-সমুদ্রে শত বাধা বিঘ্ন, ঝড় ঝঞ্ঝা আসিবেই; সেগুলিকে খুব সাবধানে অতিক্রম করিতে হইবে।

গুরু ভব পারের কান্ডারী।
গুরু কি পার করিতে পারে—
হয় যদি তোর জীর্ণ তরী?
নব ছিদ্র তরী পারে,
জল উঠে তার নব দ্বারে;
যাবি যদি ভব পারে,
তরী ছাড় শীঘ্র করে।
জলে ডুবে প্রাণ হারাবি,
গুরু শিষ্যতে দুজনায়,
গুরু ভব পারের কান্ডারী।

[ নব ছিদ্র বা নবদ্বার=কর্ণ ২+নাসিকা ২+চক্ষু ২+মুখ ১+লিঙ্গ ১+গুহ্যদ্বার ১=৯ ছিদ্র ]

সংসার সমুদ্রের বিপৎসংকুল তরঙ্গ অতিক্রম করিতে হইলে মানুষের দেহ-তরী শক্ত ও সংযত হওয়া প্রয়োজন। দেহ যদি দুর্বল ও অসংযত হয়, তাহা হইলে গুরু কিরূপে মানুষকে অধ্যাত্মপথ দেখাইতে পারিবেন? এইজন্য প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত করিয়া দেহকে স্ব-স্থ ও পবিত্র করা, যাহাতে গুরু সেই দেহে শক্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন। গুরু যদি মানুষের অপবিত্র দেহে অবস্থান করেন, তাহাতে গুরু শিষ্য উভয়েরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞান লগি দিয়া ঠেলা,
কামাদি ছয় দাঁড় ফেলা।
অনুরাগ পালেতে চালাও,

গুরু ভব পারের কাণ্ডারী।
গুরু পাছে ভয় কি আছে,
হালটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে,
গুরু ভব পারের কাণ্ডারী।

[ ছয় দাঁড়=কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। ]

সংসার সমুদ্রে দেহ-তরী চালাইতে হইবে জ্ঞানবিবেকের সাহায্যে। গুরু দেহের মধ্যে বসিয়া সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন। ছয় রিপুকে বশীভূত করিয়া অসীম অনুরাগের সহিত গুরুকে ভজনা করিলে গুরুর সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব হইবে।

(২)

সময় ছাড়্যা দিয়া কেন কর ভাবনা।
দেহ জমিন রইল পতিত*
চাষ কৈরা বীজ বুনলে না॥
সৎ গুরু আমিন ধর্যা
জমিন জরিপ করলে না।
কহে বাউল হিংসা ঘাসে
ভক্তি ফসল হৈল না॥
আছে ছয়টা বলদ তোর
তারে জ্ঞান লাঙ্গলে জোড়্।
পাঁচ ভুঁই এ পাঁচ শস্য দিয়া
কৃষক নামটি ধর।
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বাতাল চিনা
বুনলে বিছন মরবে না।
আছে সাত বিঘত মাটি,
বাস্তুবাড়ী বা কটি?
কোথা শুকান কোথা বাগান
খুঁজ্যা দেখলে না।
অনুরাগের খুঁট পুঁতে,
ভক্তি ডুরি দ্যাও তাতে।
গুরু নামের বাতা বাঁধলে
সেথা শমন ভয় দূরে।
সৎগুরু আমিন ধর্যা
জমিন জরিপ করলে না॥"

[ শব্দার্থ :—ছয়টা বলদ=ছয় রিপু=কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। বাতাল=বীজ বপন করিবার উপযোগী সময় অর্থাৎ ভূমির ঋতুকাল। বিছন=বীজ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ=ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী অথবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সাত বিঘত=ষট্ চক্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রদল। ডুরি=সুতা। বাতা=আবেষ্টনী। পাঁচ শস্য=পাঁচ ইন্দ্রিয়=চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্। পাঁচ ভুঁই=মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি। ]

মানুষের দেহ চাষের জমি বিশেষ। সৎগুরুর উপদেশমত দেহতত্ত্বের অনুশীলন করিলে সুফল লাভ হয়। দেহের মধ্যে হিংসা থাকিলে কখনও গুরু ভক্তি সম্ভব হয় না। গুরুই মুক্তি লাভের একমাত্র পথপ্রদর্শক একথা এখানে স্পষ্টত বলা হইয়াছে।

এই গানটি হইতে জানা যাইতেছে যে, হিংসায় কখনও ভক্তি লাভ হয় না। ইহা বুদ্ধের "অহিংসা পরমো ধর্ম" শ্রেষ্ঠ বাক্যটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বাউল সাধনার তত্ত্ব আবিষ্কারের ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

( ৩ )

এক ঘর বাঁধ্যাছে নিরঞ্জন
মুক্তি কথার মুক্তারণ,
কারণ তার বুঝতে পারলাম না।
আমার সহস্র দল পৃথিবীর মধ্যে
এমন শ্রীমতী ঘর আর হইবে না॥
আমি বলব কারে বলব তারে
ধন্য ঘরের আট কোণা।
এক ঘরেতে চার জেলা
আর বার থানা॥
সি ঘরের মধ্যে কি উদ্দিশ পালাম না।
ঘরের উত্তরেতে গৃহবাস দক্ষিণেতে নৈরাকার,
পূবেতে ভানু হয় উদয়॥
আর পচ্ছিমেতে আট কৌশলে—
দেখ বইসা আছে এক মহাশয়॥

[ সহস্র দল=ষট্চক্রের 'সহস্র দল' পদ্ম। উত্তরেতে=দেহের উপর দিকে 'সহস্র দল' পদ্ম। দক্ষিণেতে=দেহের নিম্ন দিকে 'মূলাধার' কেন্দ্র। পূবেতে=দেহের সম্মুখ ভাগে=ভ্রূদ্বয়ের মধ্য ভাগে অবস্থিত 'আজ্ঞা' পদ্ম। পচ্ছিমেতে=দেহের পশ্চাৎ ভাগে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধে অবস্থিত 'আজ্ঞা' কেন্দ্রের উপরিভাগে 'সহস্র দলে' ব্রহ্মার অধিষ্ঠান।

চার জেলা=মূলাধার' কেন্দ্রে যে পদ্মটি রহিয়াছে, তাহাতে চারিটি দল আছে, ইহাতে 'চারি কোণ' যুক্ত 'পৃথ্বী চক্র' শোভা পায়। আট কোণা=এই 'পৃথ্বী চক্র' আটটি 'শূল' দ্বারা সংরক্ষিত ও সমাবৃত। বার থানা=হৃদয়ের দ্বাদশ দল যুক্ত পদ্ম। সি=সেই। ]

এই গানটিতে তন্ত্রের ষট্চক্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে। গানটি সহজ গ্রাম্য ভাষায় রচিত হইলেও, বাউল সংক্ষেপে ষট্চক্রের সার কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তন্ত্রমতে ষট্চক্রের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহার সহিত ইহার হুবহু মিল রহিয়াছে। তন্ত্রের 'ষট্চক্র' নিম্নে দেওয়া হইল।

ষট্চক্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। যৌগিক ক্রিয়া বলে দেহের মধ্যস্থ শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী নাড়ীকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইলে অনাবিল আনন্দ অর্জন করা যায় এবং আত্মশক্তিকেও উদ্বোধিত করা সম্ভব হয়। দেহের মধ্যে ছয়টি অধিষ্ঠান বা কেন্দ্র রহিয়াছে, ইহাদের নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। তান্ত্রিক সাধনায় মেরু দণ্ডের একটা উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের উপরই ছয়টি কেন্দ্র অবস্থিত। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা নাড়ীত্রয় মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পর সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে—নাড়ীগুলি মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

মূলাধার—মেরুদণ্ডের অধোভাগে মূলাধার কেন্দ্র অবস্থিত। এখানে চতুর্দলযুক্ত একটি পদ্ম অধোমুখে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। এই পদ্মে চারিটি কোণ যুক্ত পৃথ্বীচক্র উজ্জ্বলভাবে বিভাসিত হইয়াছে। এই পৃথ্বীচক্র আবার আটটি শূল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

স্বাধিষ্ঠান—ধ্বজমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। ইহা ষড়দল সমন্বিত পদ্ম, শুভ্রবর্ণ ও অর্ধচন্দ্রাকারে বিদ্যুতের ন্যায় উদ্ভাসিত।

মণিপুর—নাভিমূলে মণিপুর কেন্দ্র। এখানে দশ দল সমন্বিত পদ্ম নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তিমান্।

---

* এই স্থানে রামপ্রসাদ সেনের এই গানটি বিশেষভাবে তুলনীয়—

"এমন মানব জন্ম রইল প'ড়ে।
আবাদ করলে ফলত সোনা॥"

বাউলদের প্রভাবে রামপ্রসাদ এই গানটি লিখিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে।

অনাহত—নাভি মূলের উর্ধ্বদিকে হৃদয় প্রদেশে অনাহত কেন্দ্র। এখানে দ্বাদশ দলযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

বিশুদ্ধ—কণ্ঠমূলে ষোড়শ দলযুক্ত পদ্ম সমুদ্ভাসিত। ইহা লোহিতবর্ণ।

আজ্ঞা—ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যভাগে আজ্ঞা কেন্দ্র অবস্থিত। এখানে দুইটি শ্বেতবর্ণ দলযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। আজ্ঞা কেন্দ্রে অবস্থিত দ্বিদল বিশিষ্ট পদ্মে শিব অবস্থান করেন। তাঁহার দুই হাতে অভয় ও বরমুদ্রা শোভা পাইতেছে।

আজ্ঞাপদ্মের উপরিভাগে সহস্র দল বিশিষ্ট একটি কমল অধোমুখে রহিয়াছে, ইহাই সহস্র দল। ইহা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ; ইহার কেশর সমূহ প্রাতঃসূর্য্যের মত সমুদ্ভাসিত। এই নিম্নমুখ সহস্রদল পদ্ম গুরু নিম্নদিকে মস্তক দিয়া অবস্থান করিতেছেন।

বাউল এই সব সংগীতের সাধনায় তন্ময় হইয়া যান। বাউল একতারা বা আনন্দলহরীর তানে সুর মিলাইয়া পারমার্থিক গান-গুলি ভাবের আবেশে গাহিতে থাকেন। তাঁহার প্রকৃতি (সহ-ধর্মিণী) আনন্দলহরীর তালে তালে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। তখন বাউল-নৃত্যে অধ্যাত্মসাধনা রূপায়িত হইয়া উঠে। বাউল মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতে গাহিতে গুরুর সত্তা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন।

বাউল ব্যাকুল, মুক্তিপাগল। বাউল মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল, তাই তিনি আত্মহারা হইয়া গুরুর ভজনা করেন। তিনি সদা 'গুরু ভব পারের কাণ্ডারী'র অন্বেষণে অতিষ্ঠ। 'ব্যাকুল' শব্দ হইতে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।* রাজকুমার গৌতমও একদিন জন্ম মৃত্যু, রোগ শোকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, মুক্তিলাভের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরম গুরুর সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু সাধনা ও তপস্যার পর মুক্তি পাগল গৌতম নির্বাণ পথের আলোক প্রাপ্ত হন। "অহিংসা পরমো ধর্মে"র পরোপকার ব্রতের অনুসন্ধান পাইয়াই মুক্তিপাগল গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বাউলদের সাধনার ভিতরে মুক্তিপাগল গৌতমের সাধন-মার্গের অনেকটা পরিচয় পাই। বাউলের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই বাউলের চরিত্র সংযত, সরল, পরহিতব্রতে, অহিংসা-নীতিতে দীক্ষিত।

বাউল সাধনার মৌলিকত্ব (originality) আবিষ্কার করিবার পূর্বে তন্ত্রসাধনা এবং বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের মতে হিন্দু তান্ত্রিক গুরুবাদ বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তন্ত্র-সাধনায় ষট্‌চক্রই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, বুদ্ধবচনগুলির উপর ভিত্তি সংস্থাপনেই যাবতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রথমত কতকগুলি স্থবিরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তার পর এই ধর্মের অধিক প্রসারের জন্য একটি প্রগতিশীল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্মের পুরাতন মত যাঁহারা আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন তাঁহারা 'হীনযান' এবং প্রগতিশীল দল 'মহাযান' নামে পরিচিত হইলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়াই ইহাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। হীনযানবাদীরা ব্যক্তিগত মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেন, আর মহাযানবাদীরা ব্যক্তিগত মুক্তির পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বের মুক্তি চাহিতেন। এমন কি, মহাযানবাদীরা শীল, আচার প্রভৃতি প্রতিপালন করিয়া নির্বাণ লাভ করিবার উপযুক্ততা লাভ করিলেও নির্বাণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের নির্বাণ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। হীনযানবাদীরা ছিলেন শূন্যতাবাদী। মহাযান-বাদীদের মতে শুধু শূন্যতা দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হয় না, তাহার সঙ্গে করুণা (universal compassion) আবশ্যক। মূলত ইহাই হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য।

বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা বাঙলা দেশ শাসন করেন। এই সময়ে বাঙলা দেশ বৌদ্ধ প্রভাবের অধীন ছিল। এইজন্য হিন্দু তান্ত্রিকগণের সাধন ভজন অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একাদশ শতাব্দীতে রাজা মহীপালের অধঃপতনে বাঙলা দেশ অল্পকালের জন্য হিন্দুদের করতলগত হয়। রাজা দিব্য ও তৎপরে রাজা ভীমের রাজত্বকালে হিন্দু শক্তির পুনরভ্যুত্থান হয় এবং বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় হিন্দু তান্ত্রিকগণ আবার মাথা তুলিতে লাগিলেন, আর মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সন্যাসীদের প্রভাব দেশে হ্রাস পাইতে লাগিল। ইহার পর বাঙলা দেশ পুনরায় পালবংশীয় রামপালের অধীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্পকালের জন্য। তার পরই দ্বাদশ শতকে বাঙলা দেশ সেনবংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেন রাজারা শৈব ছিলেন, কাজেই ইহা তান্ত্রিক সাধনার পক্ষে অনুকূল হইল। বৌদ্ধ রাজশক্তির ধ্বংসে মহাযানপন্থী সন্ন্যাসীদের পক্ষে হিন্দু ও শৈব রাজশক্তির নিকট হইতে পৃষ্ঠপোষকতা পাইবার আশা খুব কমই ছিল। দেশে তখন হিন্দুদের প্রভাব খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এরূপ অবস্থায় মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গেলেন কোথায়? খুব সম্ভব, এই সব সন্ন্যাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সমাজে অধিকতর প্রভাব-শালী তান্ত্রিকগণের নিকট হইতে তন্ত্রসাধনার ষট্‌চক্র গ্রহণ করিয়া নিজেদের সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন এবং আপনাদিগকে 'বাউল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে মনে হয়, বাউলসাধনার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে বাঙলা দেশে কিছু পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বাউল ও তান্ত্রিক-গণের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, বাউলরা ষড়রিপুর বশীভূত হওয়ার এবং জীবহত্যার ঘোর বিরোধী, কিন্তু তান্ত্রিকরা পঞ্চমকারের সাধনায় ব্রতী, এমন কি, জীবন্ত মানুষ হত্যা করিয়া দুশ্চর শবসাধনা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ত্রয়োদশ শতকে বাঙলা দেশ বিদেশী মুসলমান তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয় এবং মুসলমান প্রভাব দেশে দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। তখন মুসলমান রাজাদের আমলে মুসলমানদের মধ্যে 'মুর্সিদ' শ্রেণীর একদল ফকির বা দরবেশ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাউলদের ধর্মসাধনায় আবার বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব সাধনার স্রোতে সমগ্র বাঙলা প্লাবিত। বাউলরা দেখিলেন, নিজেদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা এখন সুকঠিন। মহাযানপন্থী বৌদ্ধ-সাধনা-জাত বাউলরা প্রগতিশীল হইবেনই। কাজেই এই সময়েও বাউলরা সংরক্ষণশীল না হইয়া আরও প্রগতি-শীল হইলেন। তাঁহারা সমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, স্বয়ং চৈতন্যদেবই তাঁহাদের ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু ইহার পর হইতে তাঁহারা খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া নিজের ভজনপ্রণালী কাহাকেও বলা বন্ধ করিলেন। তাঁহাদের কথায়—

"আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা
আপনাতে হইবে আপনি সাবধান॥"

ইঁহাদের মতে পরমদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানব হৃদয়ে বিরাজিত আছেন; সুতরাং মানুষের মধ্যেই তাঁহাদের অন্বেষণ মিলিবে। ইঁহাদের মতে বিগ্রহসেবা বা উপবাসাদি আবশ্যক নহে।

আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বাউল সাধনা সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে

(শেষাংশ ৯০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

*'চলন্তিকা'র মতে 'বাতুল' শব্দ হইতে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব। —'দেশ' সঃ

# শেষরাতে

(গল্প)

শ্রীসুবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মিষ্টি হাসিটি যখন স্বভাব-লাজুক আনন্দের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, সেই সময়টায় আনন্দের আসল মাধুর্য অতি নিবিড় হয়ে প্রকাশ পায়। "জয় হরি" বলে ঢুকতেই সবাই একযোগে ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। একটি ছোট্ট খুকী এসে হয়তো বলে—আজকে তোমার কিন্তু একটা ভাল দেখে গান শোনাতে হবে।

—আচ্ছা খুকী, বলেই তারের গায়ে আনন্দ আঙ্গুলের চাপ দেয়।

গান শেষ হলে একজন বুড়ী জিজ্ঞেস করে—আনন্দ, তোকে যে এ ক'দিন দেখতে পাই নি?

—কত জায়গায় যেতে হয়, ক'দিন পুব পাড়ায় ঘুরে এলাম।

—আর একটা ভাল দেখে গান শোনাও, এই একটা শ্যামা গোছের।

খুকীটি ওর ছোট্ট মাথা দুলিয়ে বলে—ভাল হওয়া চাই কিন্তু।

—আচ্ছা খুকী, তোমার মত মতই গাইব। আনন্দ হেসে গান ধরে।

এমনি ওর যাওয়া-আসা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়। ওর গানের মাধুরী দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছে তাদের। গান গাওয়াটা এখন একটা পেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

—কি গো, আমি যে একলা বসে রইলুম। বলেই দাওয়ায় আনন্দ বসলে।

অন্নদা ঘর থেকে বেরিয়ে এল—আজকে যে এত সকাল সকাল?

ওগো এটা বুঝলে না, "তোমারি রূপের বানে আমায় যে ডেকে আনে"—গেয়েই একটা মিষ্টি কটাক্ষ ছড়িয়ে দিলে অন্নদার গায়।

—যতই তোমার বয়স বাড়ছে, ঢংএর নৌকো যেন উছলে উঠছে।

—কেন, বয়সের সাথে সাথে রসের ডালা ভেঙ্গে যায় না কি। অনেক কথা তো বললে, এখন তেল টেল দেও দেখি। বলেই একতারাটা অন্নদার দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

অন্নদা ঘরে ঢুকে যায়, আর আনন্দ একটা গানের কলির সুর টানতে থাকে।

বসন্তের বান এসেছে প্রকৃতির গায়ে, গাছের পাতায় পাতায় সবুজের নাচন। এবার কিন্তু বেশ আমের মুকুল এসেছে, আনন্দ ভাবলে। অন্নদা তেল গামছা এনে রাখলে।

তোমাকে দেখলেই আমার পুরনো কথাটা মনে পড়ে। আনন্দ বললে।

—যাক পুরনো কথার আর জের টানতে হবে না, এখন যাও। অন্নদার কুঞ্চিত চুলের ঢেউ ওর গালের উপর এসে পড়ে। আনন্দ গামছাখানা হাতে করে উঠে যায়।

ছোট্ট গ্রামের ধারে ওরা থাকে—যেন দুটো হাসির টুকরো। আনন্দের মাঝে ওদের দিনগুলো কেটে যায়। আনন্দ গান গেয়ে যোগায় অনেক কিছু, আর অন্নদা তার ভিতরে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চালিয়ে যায়।

আনন্দের বাবা হেমন্ত বাউল নাম করা গাইয়ে। আশপাশের গ্রামের ভিতর ওর নাম করলে সবাই এক ডাকে চিনত। হেমন্ত আনন্দকে তৈরী করেছে তেমনি করে। আনন্দের অল্প বয়স থাকতেই হেমন্ত বলত—বড় হলে নন্দ আমার চেয়ে অনেক নাম কিনতে পারবে। হেমন্তের আশানুযায়ী না হক, অন্তত অনেকটা নাম সে কিনেছে।

আনন্দের ছিল ছোটবেলায় দুরন্ত স্বভাব। একটা প্রকাণ্ড নেশা ছিল গ্রামের বিলে ঘুরে বেড়ানো এবং মাছ ধরা। ওর বাবা মাঝে মাঝে এতটা বিরক্ত হত যে, ওকে ঘরে আটক করে রাখত। আর আনন্দ বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখত দূরের জলাশয়ের উপর রোদের চিকিমিকি আর অসাড়ে পড়ে থাকা বিলের উপর দিয়ে বকের উড়ে যাওয়া।

এই অশান্ততা শান্ত করবার জন্য আনন্দ একটু বড় হতেই হেমন্ত ওর জন্য একটি টুকটুকে মেয়ে ঘরে আনলে। আনন্দের প্রবৃত্তি তাতে একটুও প্রশমিত হয় নি, বরঞ্চ অন্নদার সহায়তায় ওর তেমনি করে বেড়ানোর পক্ষে সুবিধাই হত। আর রাত্রির নীরব নির্জনতায় দিনের সমস্ত কাহিনী আনন্দ অন্নদার কাছে বলত, অন্নদা ছোট্ট খুকীর মত আনন্দের গা ঘেঁষে বসে তা শুনত।

ঠিক এমনি শৈশবের কাঁচা সবুজ দিনে হঠাৎ একদিন হেমন্ত মারা গেল। সেদিন থেকে আনন্দের রূপ গেল বদলে, চেষ্টা গেল গানের দিকে। সুরের ভিতর দিয়ে আনন্দ সুখের নূতন জগৎ খুঁজে পেলে।

রাত্রিবেলায় আনন্দ গুনগুনিয়ে একটা গান গাইতে গাইতে উঠানে ঢুকতেই অন্নদা ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বললে—তুমি যে কি রাত্তির করে বাড়ি আস, সত্যি আমার ভীষণ ভয় লাগে।

—একটু সাবধানে থেকো, তোমার জন্যে আশেপাশে অনেক লোক ওত পেতে আছে। আনন্দের মুখে বিমল হাসির টুকরো।

—তোমার তো সব সময় ওই একটি কথা। বলেই ঘর থেকে এনে একটা আসন পাতলে আনন্দের জন্য।

বাইরে অন্ধকার এত গাঢ়, সামনের পলাশ গাছের মাথাটা পর্যন্ত আবছা দেখায়।

তোমার দেশের কাছ থেকে একটা কীর্তনের দল এয়েছে।

—তাই বুঝি এতক্ষণ বসে বসে শুনলে?

—তোমার কথা পেলেই আমি যে চিটের মত লেগে থাকি। আমি যে ভোমরা-দলের বধু, ফুলের গন্ধ পেলে পরেই খেতে ছুটি মধু। সুর করে বললে আনন্দ।

—তুমি বাড়ি বাড়ি না ঘুরে একটা যাত্রার দল খোল।

—তুমি তার ভিতর রানী সাজবে।

—তুমি থাকলে আমার থাকতে দোষ আছে না কি! এই কথা কটি বলতেই অন্নদার মুখ লাল হয়ে উঠল।

—বেশ এই তো কথার মত কথা হয়েছে। অন্নদার গাল টিপে দিলে আনন্দ।

—আমার লাগে না বুঝি।

—লাগবার জন্যেই তো দিয়েছি, আমি কি সোহাগ করবার জন্যে মারলাম?

—বেশ তা হলে। অন্নদা কৃত্রিম রাগে গম্ভীর হয়ে গেল।

—আমি কিন্তু উঠলাম। এতক্ষণ পর গাঁ থেকে এসে ওরকম ছাই মাখা মুখ দেখতে পারব না।

অন্নদা আড়চোখে একবার তাকাল।

আনন্দ হেসে ওঠে, অন্নদার মুখের কাছে মুখ এনে শুধায়—দেখেছ কথা বলতে বলতে কতখানি রাত্তির হয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়ার পাট কি তুলে দিলে?

অন্নদা ফিক করে হেসে উঠল। যেরকম গানের বান এয়েছে, ওসব কি আর খেয়ালে আছে? আজকের রাতে উপোস দিয়েই দ্যাখো।

—কেন, কি পর্ব?

—উপোস দিলেই পর্ব থাকতে হবে নাকি।

—সত্যি কি রান্না কর নি?

—হ্যাঁ, আমার ঐ ভাঙ্গা রান্নাঘরে একা একা রাঁধতে ভয় করে না বুঝি। তুমি তো টো টো করেই বেড়াও।

—এই টো টো করে না বেড়ালে ভাত আসবে কোত্থেকে শুনি।

—কেন বৃন্দাবন যাবে।

—তুমি তো আর টুমটুমি বাজাতে পারবে না, পারলে যেতাম।

অন্নদা হাসল। আনন্দ ভাবে, অন্নদা বাইরে কি লাজুক যেন ভিজে বেড়ালটি। চালের গা বরাবর আকাশটার গায়ে একটা তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আনন্দ তাকাল একবার তারাটার দিকে।

—আচ্ছা তোমার মনে আছে আমাদের ছোটবেলার কথা? এমনি রাতের মাঝে তুমি দোর খুলে দিতে, আর আমি কালনী দিঘির পাড়ে চলে যেতাম। আমার না ফেরা পর্যন্ত তুমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে।

অন্নদা চুপ করে আছে।

—আজকে আসবার সময় দেখে এলাম দিঘিতে এত সাপলা ফুটেছে যে সাদা করে ফেলেছে। তোমার জন্যে একটা সাপলা তুলতে গিয়েই দেখি একটা কেউটে ছলছলিয়ে চলে গেল।

—না না, তুমি ওসব করতে যেয়ো না। দেখছি এমনি করে বাইরে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে! একটা অশুভ আশঙ্কায় অন্নদার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

তার পর একটু চুপচাপ।

অন্নদা উঠে গেল। একটু পরে এক থালা মুড়ি, মিষ্টি, নাড়ু এনে সামনে ধরল। জলের গ্লাসটার উপর কি ভাসতে দেখে জলটা বদলে এনে দিলে।

—আমার একটুও খিদে নেই।

—এইমাত্রই তো বললে খাবার কথা।

—সত্যি আমি রাত্রে কিছু খাব না।

—কোত্থেকে বুঝি এক পেট চালিয়ে এয়েছ।

আনন্দ খিলখিল করে হেসে উঠে থালা থেকে দুটো নাড়ু আর একটা ক্ষীরের সন্দেশ মুখে দিয়ে বললে—হল তো?

—এগুলো খাবে কে?

—কেন, তুমি।

—আমায় মিষ্টি খেতে দেখেছ কোনও দিন?

—রাতে উপোস দিয়ে থাকবে?

—মেয়েদের কিছু হয় না।

—না না, খেতে হবে কিছু। বলেই অন্নদাকে জোর করে বসিয়ে দিলে।

—তোমার সবটাতেই ছেলেমানুষি।

তার পরে দুপুর রাত পর্যন্ত কথার স্রোত নানা দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে কোন্ সময় ঘুমের কোলে অজানতেই সমাপ্তি টানলে।

মানুষের একটানা গতি বোধ হয় থাকে না। থাকে না বলেই অশান্তি আসে। আনন্দ আর অন্নদার ভিতর তাই ঘটল। ওদের চিরউচ্ছল জীবনের ভিতর একদিন ভাটা পড়ল। ভাটা পড়ল রঙিন নেশায়, মেদুর কল্পনায়। এল সংঘাত।

একদিন আনন্দ ভিজতে ভিজতে এল দূর গাঁ থেকে। পায়ের হাঁটু অবধি কাদা, শরীর কাঁপছে থেকে থেকে। বললে—শিগগির একটা কাপড় দাও।

—এই দেখ কি রকম ভিজে এয়েছ, বললাম এই বৃষ্টিতে বেরুতে হবে না।

—বোধ হয় জ্বর এল। আনন্দ কাঁপছে, আপাদমস্তকে কাঁপুনির মন্থর গতি।

—খুব জ্বর? অন্নদার দৃষ্টি বিহ্বল।

—বোধ হয়।

আনন্দ কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুলে। অন্নদা হাত দিয়ে পরীক্ষা করল শরীরের উত্তাপ। উঃ, কি গরম যেন হাত পুড়ে যায়। আনন্দের গায়ের ওপর একটা পুরনো তোশক চাপা দিলে। অন্নদা টুকিটাকি কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিলে। বাইরে সেই একটানা বর্ষা, ঝম ঝম ঝম।

ঘরে ঢুকে দেখলে আনন্দের তন্দ্রা এসেছে। ফুলো ফুলো মুখের ওপর রোগ কাতরতা। অন্নদা আস্তে আস্তে কপালের দুদিক টিপে দেয়। আনন্দ চোখ মেলতেই জিজ্ঞাসা করলে—খুব কষ্ট হচ্ছে? আজকে ভিজে বড্ড খারাপ করেছ।

—কিছু ভেব না, সেরে যাবে। তুমি আস্তে আস্তে কপালটা একটু টিপে দাও।

—মাথাটা ধুয়ে দিই?

ওসব কিছু করতে হবে না।

দিনটা কোন রকমে কেটে গেল। রাত্রের স্তব্ধতার ভিতর শুধু অন্নদা জেগে। বাইরের আকাশ এখন শান্ত। ঝিরঝিরে জলীয় হাওয়া। অন্নদা ধীরে ধীরে হাওয়া করছে।

হঠাৎ আনন্দ জেগে উঠল।—তুমি এখনও বসে আছ? শুয়ে পড়। খেয়েছ তো?

—আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, তুমি চুপ করে ঘুমও। মাথাটা আবার ধুয়ে দিই?

—না দরকার নেই।

অন্নদা আস্তে একটা হাত কপালের উপর রাখলে, এখনও কি তীব্র গরম।

—খুব কষ্ট হচ্ছে?

আনন্দ চোখ মেলে তাকাল। —কিছু বললে না কি?

—না; জিগগেস করছিলাম, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

আনন্দ একটু হাসল, অন্নদার মুখটা হাতের কাছে আনলে।

কটি দিন চলে যায় অন্নদার বুকের উপর দিয়ে, যেন বৈশাখের রুদ্রলীলা। অন্নদার চেহারায় এসেছে ক্লান্তির স্পর্শ —যেন চৈত্রের পাংশু গোলাপ।

একদিন আনন্দ বললে—তোমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বুঝেছি কি কষ্ট হচ্ছে তোমার।

—কিচ্ছু না, তোমার জ্বর সেরে গেলেই, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

আনন্দের চোখ ঢুলে আসতে চায় জ্বরের চাপে।

—এখন কিছু খাও।

আনন্দ চোখ মেলে তাকাল।—খাব, এখন থাক।

—অল্প একটু। একবাটি সাবু ধরলে আনন্দের কাছে।

সত্যি, কি বিশ্রী লাগে, বমি আসতে চায়।

—না হলে থাকবে কি ভাবে।

—বেশ পারব। আনন্দ ফিরে শুল।

অন্নদার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। বলে—নেবু দিয়ে দেব?

—না তুমি এখন ওসব রেখে দাও, দেখ তো আজকে বোধ হয় একটু জ্বর কম।

অন্নদা হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে। কোনও পরিবর্তন নেই, এক ধারা। বলে,—ও সেরে যাবে, আচ্ছা আমি বাতাস করছি। সাবুর বাটিটা মেঝের এক কোণে ঢেকে রাখল। মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলে—আমার এক দূর আত্মীয় ভাই আছে, তাকে আসতে লিখে দিই।

—সে এসে কি করবে?

—ডাক্তার ডাকিয়ে দেখাতে হয়, একরকম ভাবেই তো চলছে।

আনন্দ নির্লিপ্তের মত বললে—আচ্ছা দাও।

বাইরে মেঘ আবার কালো হয়ে এসেছে। অন্নদা বাইরে থেকে কাপড়গুলো ঘরে এনে রাখলে।

অন্নদা সেদিন তার বাঁকাচোরা হাতের লেখায় ওর ভাইকে আসতে লিখে দিলে।

দিন পনের পরের কথা। আনন্দের জ্বর সেরেছে, কিন্তু মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠেছে। শুকনো পাতার মত চেহারা, চোখের জ্যোতি ম্লান, গায়ের চামড়া পাংশু—যেন একটা প্রেতের দৃষ্টি। আনন্দ শুয়ে শুয়ে ভাবে গত দিনের কথা, দেখে বাইরের নীল আকাশ, ঘন সবুজ মাঠ। এ যেন ওর কাছে এক ঘেয়ে হয়ে উঠেছে,—সব পুরাতন। বিরক্ত হয়ে আনন্দ চীৎকার করে অন্নদাকে ডাকলে। অন্নদা ঘরে ঢুকল।

—আমায় তোমরা একলা ফেলে রাখবে না কি, কতক্ষণ থাকা যায় এমনি? এই কথা কটি বলতেই আনন্দ হাঁপিয়ে ওঠে।

—এই তো তোমার ভাত তৈরী হচ্ছে।

—এতক্ষণ কি করছিলে? আনন্দ ভীষণ রুক্ষ হয়ে ওঠে।

—বাঃ, আমি বুঝি বসে রয়েছি?

—না, একটু বস। গলার স্বর নেমে আসে—আমায় একটু উঠিয়ে বসাও, পিঠ একেবারে ধরে গেছে। তোমার ভাই কোথা গেল।

—বাজারে।

আনন্দ চুপ করলে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস যেন বুক চিরে বেরচ্ছে।

—দাঁড়াও আমি একটু পরেই আসছি। অন্নদা বেরিয়ে গেল।

আবার সেই একলা। যেন যুগযুগান্ত ধরে পড়ে আছে এমনি নিঃসঙ্গ হয়ে। বিরাট ক্লান্তি। সময় যেন ফুরতে চায় না। বাইরে থেকে অন্নদার এক ঝলক হাসি ওর কাছে ভেসে এল। আনন্দ উঠে, হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল।

—এ কি, তুমি উঠে বসেছ! অন্নদা তাড়াতাড়ি এসে ধরলে।

—যাও; ওখানে খুব হাসি ঠাট্টা চলেছে আর এখানে আমি—অস্বাভাবিকভাবে দম আটকে যায় যেন।

—একটু দেরি হয়েছে কি একেবারে সব গোলমাল।

—তুমি কি বুঝবে? হাঁপাতে হাঁপাতে আনন্দ বললে।

অন্নদা ভাতের থালা সামনে রাখলে। মাগুরের গরম ঝোল থেকে ধুঁয়া উঠছে।

—মাথাটা ধুইয়ে দিই, তার পরে খেতে ব'সো।

—না তুমি একটু বস। বলে অন্নদার হাতটা উঠিয়ে নাড়তে লাগল। তোমার ভাই আবার কোথা গেল!

—তোমার মাছ ধরবার জন্য জাল নিয়ে বেরিয়েছে।

আনন্দ চুপ করল। অনেক ভাল লাগে ওর অন্নদার এই উপস্থিতি। বাইরে রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে।

—ভাতটা জুড়িয়ে যাচ্ছে, তুমি একটু উবুড় হয়ে শোও মাথাটা ধুয়ে দিই।

—না মাথা ধোবার দরকার হবে না, এমনি খেতে বসি।

—তা হলে কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

অন্নদা কাপড় দিল, আনন্দ কাপড়টা বদলে নিল। তার পর অন্নদা আনন্দকে খাইয়ে দিতে লাগল।

—না আর কিচ্ছু না, কি বিশ্রী লাগছে।

—এ না খেলে চলবে কেন।

—জোর ক'রে খাওয়া যায় নাকি?

—তাহ'লে দুধটুকু খেয়ে ফেল।

আনন্দ দুধে চুমুক দিলে।

অন্নদা সব সময় আনন্দের কাছে থাকতে পারে না, এদিককার খুটিনাটি কাজ করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে আসে। তার পর রোগীর ঘরে কাজ যেন একটু বেশীই হয়। কিন্তু আনন্দ চায় সঙ্গী, যার সান্নিধ্য ও সবসময় পাবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আনন্দ শুয়ে আছে সেই দুপুর থেকে। এক রত্তিও ঘুম নেই, তবু জোর ক'রে পড়ে থাকা। সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ তাল হারিয়ে ফেলে। আনন্দ ভাবে, বাইরে অন্নদা এতক্ষণ কি করে। সেই দুপুর থেকে বাইরে ওর এত কি কাজ। মাঝে মাঝে শুনছে ওদের ভাইবোনের পাতলা হাসির গুঞ্জন, চাপা কথার আওয়াজ।

না, কোথায় যেন খটকা লাগে আনন্দের—এত কি কথা ওরা বলে, আর ওতো আপন ভাইও নয়। আনন্দের মুখ আরক্ত হল, ও ফিরে শুলে। দিগন্তের এক টুকরো জলীয় মেঘ চোখে এসে ঠেকল। কে যেন ঘরে এসে ঢুকল, ফিরে তাকিয়ে দেখল—অন্নদা। হাত ছাই মাখা, মুখে ঘামের চিহ্ন। আনন্দ তীব্র দৃষ্টি দিয়ে কি যেন পরীক্ষা ক'রে, অন্নদার অরুণ শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

—এতক্ষণ কি হচ্ছিল? দুপুর থেকে সমস্তক্ষণ ছাড়া পেয়ে ফুর্তির ফোয়ারা এয়েছে নয়?

—কি বলছ তুমি। অন্নদা আশ্চর্য হয়ে যায়, স্বামীর মুখ রুক্ষ। অন্নদা বেরিয়ে গেল, চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অন্নদা ব্যথা পায় স্বামীর এই রুক্ষ ব্যবহারে, ক্ষুব্ধ হয়। এই দুঃখের আবেগে সমস্ত দিনটা আড়ালে আড়ালেই রইল।

আনন্দ প'ড়ে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এই সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়ি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা সব গেল কোথায়? বাইরে নীলাভ জ্যোৎস্নার আলো, ঝিঁঝির শব্দ, ঘরে তেলের প্রদীপ। ওরা কি সব চ'লে গেল? আনন্দের শরীর কেঁপে ওঠে, উঠে একটু দেখতে চেষ্টা করে। বাইরে সব চুপচাপ, কেউ নেই। আনন্দকে একলা ফেলে রেখে ওরা চ'লে গেছে। আনন্দের তাই মনে হ'ল। এমনি অবস্থায় একলা! অসহায়ের মত আনন্দ শব্দ ক'রে উঠল। মানুষের শব্দ নেই!

ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হ'ল না? আনন্দ চট ক'রে মুখটা জানলার কাছে আনলে। অন্নদা রাঁধছে, উননের আলোয় ও স্পষ্ট এখান থেকে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে। আনন্দ খুশী হ'ল, অন্নদাকে ডাকলে।

অন্নদা ঘরে ঢুকল, আঙ্গুলের মাথায় হলুদের দাগ।

—এত নিরিবিলি লাগছিলো! একটু ব'স।

—রান্না চাপিয়ে এয়েছি যে। অন্নদার মুখ এখনও পর্যন্ত থমথমে।

—যাও, নামিয়ে এস।

—কি এমন বলবে যে, ঘণ্টাখানেক ব'সে শুনতে হবে?

—যাও, যাও, তোমার শুনতে হবে না, সব বুঝেছি।

আনন্দ খেঁকিয়ে উঠল। সব শয়তানি! হাতের মুঠোর উপর চকচকে নীল্ল শিরাগুলো ফুলে উঠল।

মাঝ রাতে আনন্দ ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখল অন্নদা কাছে আছে কি না। দেখলে পাশে শুয়ে আছে, ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নার আলো তার মুখের উপর। আনন্দ যেন কেমন নরম হয়ে এল। এর ভিতর অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। কি সুন্দর! আনন্দ ওর কানের কাছে মুখ এনে ডাকল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত অন্নদা নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন।

আনন্দ তার একটা হাত টেনে নিলে। অন্নদা জেগে উঠল। তুমি ঘুমাও নি?

—জাগিয়ে তুললাম। ব'লে মিষ্টি ক'রে তাকায় অন্নদার দিকে। অন্নদা একটু হাসল।

—তোমার ভাই চলে গেছে?

—হ্যাঁ, আজকে সন্ধ্যেবেলায় গেছে।

—কই দেখা ক'রে গেল না তো!

—তুমি ঘুমচ্ছিলে তাই জাগালাম না।

আনন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

—আজকে তোমায় আমি ভীষণ বকেছি। আনন্দ অন্নদার বাদামি গালের উপর হাত বুলতে বুলতে বলে। আমাকে যেন জ্বরে কি রকম খিটখিটে ক'রে রেখেছে। তুমি আমাকে একটু উঠিয়ে বসাও তো।

অন্নদা বললে—এই তো, শুয়ে শুয়েই বেশ লাগছে।

আনন্দ চুপ করল। হু হু করে বাতাস ঢুকছে ঘরের ভিতর, অন্নদার কানের কাছের চুলে যেন ঢেউএর নাচন জেগেছে।

আনন্দ একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়, তবু কিরকম সংকোচ। অতি কুণ্ঠিত হয়ে বললে—তুমি আমাকে আগের মত ভালবাস? কথাটা যেন একটু তাড়াতাড়িই বলল।

অন্নদা চমকে চাইলে, চোখে যেন একটা সলজ্জ দৃষ্টি।

—তুমি কিছু মনে ক'র না, কিরকম জানি—

অন্নদার চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল বালিশের উপর গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি যেন কিরকম হয়ে গেছ, কেন তুমি এরকম ভাব? অন্নদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আজকে বিকেল বেলাতেও তুমি—অন্নদার কথা থেমে যায়।

—না সত্যিই, জ্বরে আমার সব নষ্ট করে গেছে, তুমি কিচ্ছু মনে ক'র না। আনন্দ তার বিবর্ণ হাতটা অন্নদার কপালের উপর বুলায়। এবার অসুখটা ছাড়লে চল বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তুমি দোতারাটা একবার দাও, অনেক দিন পর বাজাতে ইচ্ছে করছে।

—একে উঠতেই পার না, তার ওপর আবার বাজাবে। অন্নদার কথায় ঠাণ্ডা আমেজ।

আনন্দ হাসল। তুমি কি আমায় খেলো মনে কর? পাণ্ডুর হাতটা রাখলে অন্নদার মুখের উপর। তার পরে কিছুটা সময় নীরবেই কেটে যায়। চাঁদের নীলাভ আলো বিছানার উপর ঝরে পড়ে।

শিগগির একটা লোক বাড়ছে, অন্নদা অনেক কষ্টে বললে থানিক পরে।

—তার মানে?

অন্নদা নুয়ে প'ড়ে একেবারে যেন ওর বুকের সাথে মিশে গেল।—মানে আবার কি।

আনন্দ অবোধ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে।

অন্নদা ধীরে ধীরে বললে—তোমায় বাবা ডাকতে আসছে।

আনন্দ চমকে উঠে চাইলে ওর দেহের দিকে, বললে—সত্যি?

—সত্যি।

একটা দোয়েল শিস দিচ্ছে, আচমকা ঢেকে ফেললে চাঁদকে এক টুকরো মেঘ।

—তোমার খারাপ লাগছে?

—কে বললে। ব'লে ওর শীর্ণ হাত দিয়ে অন্নদার আঙ্গুলে চাপ দিতে থাকে।

—বদলে গেল তোমার বৃন্দাবন যাওয়া।

—সময় তো আর ফুরিয়ে যায় না। আনন্দের মুখ অপূর্ব খুশিতে ভরে ওঠে, হাসির স্নিগ্ধ রেখা পড়ে ওর চিবুকের ধারে।

ও বধূ আজ ঘোমটা খোল নূতন প্রিয় আসছে যে
দূরের গাঁয়ের পুরন কথা নূতন ক'রে বাঁধবে সে।

আনন্দ যতই গুনগুন করে গাইতে চায়, অন্নদা ততই মুখ আনন্দের বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে।

## বাউল সাধনা

(৯০৪ পৃষ্ঠার পর)

পারিয়াছি, তাহা শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত করিলাম। সামাজিক, রাজনৈতিক আবর্তন-বিবর্তনে সমস্ত বিষয়ের ভিতরই ওলট-পালট হওয়া সম্ভব। এই প্রকার আবর্তন-বিবর্তনে বাউল সাধনার ভিতরেও অনেক স্থলে বিকৃতি আসিতে পারে। তাই বলিয়া আমরা ইহাকে ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারি না। ইহার মধ্যে যেটুকু সারবস্তু পাওয়া যায়, তাহা আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি। স্থানাভাবে এখানে বাউলদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না; সময় ও সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাউলদের জীবনে পবিত্রতা, সরলতা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশ্বের যেকোনও ধর্ম-সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। বাউলের কাছে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ ভেদ প্রভৃতি কোনও প্রকার সংকীর্ণতা বা নীচতার স্থান নাই। বাউলের মতে পার্থিব জগতে এই ধরনের ভেদাভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসার। তাই মুক্তি-পাগল বাউলের কণ্ঠের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়—

( ৪ )

কত আশা করে রে মানব
দুই দিনের তরে আসিয়া।
কাঁচা মাটির দেহটি লইয়া
অহংকারে মাতিয়া॥
কিসেরই বা বুক ফুলান
কিসেরই বা চোখ রাঙ্গান!
যে যার পথে চলে যাবে ভাই
ভাবের খেলা ভাঙ্গিয়া।
কেউ বা দেখে জেগে স্বপন
আপন হারা হইয়া॥
কেউ বা করে কার সর্বনাশ
আপন স্বার্থ ভাবিয়া।
নাড়ী যখন অবশ হইবে
কবে রুদ্ধ হইবে গলা।
দেখবি আঁধার সোনার সংসার
নয়ন দুটি মুদিয়া॥

## ঊষর

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

ঊষর পৃথিবী ধূসর হয়েছে ধূমের ইন্দ্রজালে
রুদ্র দেবতা হাসে
অন্ধ আবেগে প্রেতগুলি সব তামাটে সন্ধ্যাকালে
আকাশ ঘিরিয়া আসে।
শ্বেত শকুনের তন্দ্রায় ভরা অতি ভয়াবহ মুখ
হিংসা কালিমা মাখা।
সহসা কখন শান্তিরাণীর চৌচির হল বুক
চলিছে কালের চাকা।
যন্ত্রের দাপে অন্ত্র কাঁপিছে শান্ত কুটির মাঝে
মৃত্যু হানিছে বাজ।
নিশিথ গগন ভেদ করি ঐ দামামার ধ্বনি বাজে
সমাপ্ত সব কাজ।
কারাঁভাঁর পিছে উটের পায়েতে উড়িছে তপ্ত বালি
শ্রান্ত পথিকজন।
ওয়েসিসে বসি জিপ্সী মেয়ের কানেতে আসিছে খ
কামানের গর্জন।
বরফের মাঝে কঠিন ভূমিতে নদীর শীতল জলে
উষ্ণ রক্ত মেশে—
টর্পেডো আজ ছুটিছে কেবলি সাগরের তলে তলে
ধ্বংসের উদ্দেশে।
ট্যাঙ্কের সারি চলিছে পাথারে ছন্দের তালে তালে
ম্যাগ্নেট্ মাইন ভাসে
ঊষর পৃথিবী ধূসর হয়েছে ধূমের ইন্দ্রজালে
রুদ্র দেবতা হাসে।

# হসন্তের পত্র

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)

( শেষাংশ )

ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে রসিকতা নামক অশরীরী বস্তুটির কোন যোগাযোগ আমি কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মেঘনাদবাবু রসিকতার পরিচয় সত্যি সত্যিই দিয়েছেন গেল চৈত্রের "ভারতবর্ষে।" মোহিনীবাবুর প্রবন্ধের উত্তরে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, যে উত্তরে তিনি মোহিনীবাবুর প্রায় কোন কথারই উত্তর দেন নি—ব্যবস্থাপক সভার মুখস্থ-কিলে-পড়া মন্ত্রীদের মতো কেবল বলেছেন যে, পূর্বে তিনি যা বলেছেন তার বেশি আর কোন কথা তাঁর বলবার নেই—সেই উত্তরে চৈতন্যে বিশ্বাসবান বৈজ্ঞানিকদের এক এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে প্রত্ন-তাত্ত্বিক এক বক্তৃতা দিবার পর (অনিলবরণের বেলায় তিনি দিয়েছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বেদ বা হিন্দু সভ্যতার জন্মস্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা) বোধ হয় মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসেবে সর্বশেষে তিনি রসিকতাপূর্ণ একটি গল্প ব'লে তাঁর প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেছেন।

মেঘনাদবাবুর গল্পের এই আইডিয়াটিও তাঁর নিজস্ব মৌলিক নয়। কেননা ঐ আইডিয়াটি বার্নার্ড শ'র নাটক থেকে আহরিত—ইংরেজী ভাষায় plagiarism ব'লে অবশ্য ওর একটা ভদ্রগোছের নাম আছে।

সে যা হোক্, বার্নার্ড শ'র নাটকটিতে একটি চরিত্র স্বর্গ থেকে নরকে এলেন কিন্তু আর স্বর্গে ফিরলেন না, নরকেই র'য়ে গেলেন। কেননা স্বর্গ লেগেছিল তাঁর কাছে অতি একঘেয়ে একটা জায়গা কিন্তু নরকে পেয়েছিলেন তিনি দেদার মজা—বার্নার্ড শ' সব ব্যাপারটা দেখিয়েছেন কয়েকজন কুশীলবের স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে। সাহা মহাশয়ের গল্পেও গল্পের নায়ক স্বর্গেই গিয়েছিলেন সেখান থেকে রিটার্ন টিকিট কেটে একবার নরক দর্শনে তিনি যাত্রা করলেন। কিন্তু নরকে গিয়ে আর স্বর্গে ফিরলেন না। কেননা স্বর্গে তিনি কোন মজা পান নি। কিন্তু নরকে গিয়ে পেলেন প্রচুর রংতামাশা। সাহা মহাশয়ও এই নরকে যাবার জন্যে টিকেট কেটে বসে আছেন। তবে সাহা মহাশয়ের এই নরক আমাদের অতি প্রাচীন যমরাজের নরক নয়। তাঁর এ নরক হচ্ছে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের নরক। এখানে air-conditioned হোটেলে বসে আইস্-ক্রীম খেতে খেতে লাউড স্পীকারে "K-K-K Katie, beautiful Katie—the only only only girl that I adore" জাতীয় বিখ্যাত rag-time শোনা যায়, বা টেলিভেশানে গ্রেটা গার্বোর—দশ হাজার লোক শুনতে পায় এমন সাধাকণ্ঠে প্রচণ্ড ফিস্ ফিস্ স্বরে প্রণয় নিবেদন দেখা যায়। বার্নার্ড শ'র সেই নরকও সেই অতি পুরাতন brimstone and sulpher-এর নরক নয়। তাঁর এ নরক হচ্ছে আর্টিস্টের নরক—চারিদিক এখানে কাব্যে সঙ্গীতে মুখর, নৃত্যে বাদ্যে উচ্ছল, যুবক যুবতীর প্রণয়ের রসালাপে বিহ্বল।

কিন্তু সাহা মহাশয়ের বা তাঁর গল্পের নায়কের বার্নার্ড শ'র নাটকের সেই চরিত্রটির স্বর্গের প্রতি এমন বিমুখতা বা বিরূপতা কেন? কেন স্বর্গরাজ্য তাঁদের কাছে রসহীন এক-ঘেয়ে মনে হয়? ঐ প্রশ্নের যা প্রকৃত উত্তর তা সাহা মহাশয়ের পক্ষে খুব flattering হবে না। কেননা ওর প্রকৃত উত্তর হচ্ছে এই যে যতখানি মনের পরিণতি হলে স্বর্গ উপভোগ করবার সামর্থ্য জন্মে সাহা মহাশয়ের বা তাঁর গল্পের নায়কের মনই বল আর আত্মাই বল কিম্বা রেডিও-ম্যাগনেটিক আক্টিভিটিই বল তা সেই পরিণতিতে এসে পৌঁছয় নি।

সে যা হোক্, সাহা মহাশয়ের গল্পের নায়কটি বৈজ্ঞানিকের নরকে air-conditioned হোটেলে বসে আইস-ক্রীম খেতে খেতে রেডিওতে মন প্রাণ কান ঢেলে দিয়ে সুখী হ'ন—আমাদের শুভ ইচ্ছাই তাঁকে জ্ঞাপন করি। কিন্তু সাহা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তাঁর গল্পের নায়কটি যখন স্বর্গ ছেড়ে বৈজ্ঞানিকের নরকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্টীল হেল্মেট্ একটা মাথায় দিয়ে গিয়েছিলেন তো? এবং যা পরলে চমৎকার জাম্বুবানের মতো চেহারা হয় (How significant by Jove!) সেই গ্যাস্-মুখোস্ একটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন তো? এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয় সাহা মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত এই নরকের ভৌগোলিক সংস্থিতিটা কোথায়? বল্টিক উপসাগরের কূলে কূলে? না, বল্কান্ পর্বতমালার পাদমূলে-মূলে? কোথায়?

সর্বশেষ তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে নরককে আমরা এমন স্থান বলেই জানি যেখানে মানুষ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাই পায় কিন্তু সাহা মহাশয় বা তাঁর গল্পের নায়ক সেখানে—তা সে হোক্ বৈজ্ঞানিকেরই নরক—এমন সুখী হন কি ক'রে? এর উত্তরে বার্নার্ড শ' তাঁর নাটকেই কৌশলে পাত্র পাত্রীর মুখ দিয়ে দিয়েছেন। নাটকের সেই কয়েকটি লাইন তোমার জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্যে এখানে তুলে দিচ্ছি।

The old woman. I tell you, wretch, I know I am not in hell.

Don Juan. How do you know?

The old woman. Because I feel no pain.

Don Juan. Oh, then there is no mistake you are intentionally damned.

The old woman. Why do you say that?

Don Juan. Because hell, Senora, is a place for the wicked. The wicked are quite comfortable in it: it was made for them, you tell me you feel no pain. I conclude you are one of those for whom Hell exists.

এটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়—literature অর্থাৎ সাহিত্য মাত্র। কিন্তু ইংরাজরা কথায় বলে—Even a cat may look at a king। তেমনি বলতে পারা যায়—Even literature may contain an occasional truth or two।

* * * *

হিরণ্যকশিপু ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিল। সাহা মহাশয়ের মতো বৈজ্ঞানিকেরা চৈতন্যকে স্বীকার করেন না। এ'রা দুয়েই সিম্বলিক্। এ'রা দুয়েই মানুষের প্রাপ্তব্য যে একটা ঊর্ধ্বতর আলোর রাজ্য আছে একটা গভীরতর আনন্দের সাম্রাজ্য আছে এই কথাটা অস্বীকার করতে চান। আইস-ক্রীম ও বেতার যন্ত্র দিয়ে এ'রা মানব-জীবনের গভীরতম অনুভূতিকে ঠেকিয়ে রাখতে চান।

তাই এ'রা বলেন—এই আমার ভালো—এই পার্থিব জীবন—এই air-conditioned রেলগাড়ী হোটেল-গৃহ সিনেমা-ঘর—এই আইসক্রীম বেতার যন্ত্র এরোপ্লান—এর চাইতে সত্য আর কী আছে? এ-সবের অতিরিক্ত যা, এই জীবনকে অতিক্রম ক'রে যা—তা নিছক মায়া স্রেফ মরীচিকা একেবারেই অলীক। এই পৃথিবীর অধিবাসী আমরা আমাদের মধ্যে যদি কেউ অপার্থিব কোন কিছুর স্বপ্ন দেখে তবে সে নিশ্চিতরূপে অন্ধ, আর যদি কেউ সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলে তবে সে অনিবার্যরূপে ভণ্ড। সত্যি সত্যিই থাক্‌ত যদি তেমন কিছু অপার্থিব, তবে তা আমাদের এই বকযন্ত্রে সুবোধ বালকের মতো সুড়্ সুড়্ করে প্রবেশ করে নিজের সত্যতা প্রমাণ করত এবং আমাদের কাছ থেকে

সার্টিফিকেট আদায় করত। কিন্তু তা যখন করে নি—তখন নেই—নেই—নেই! নেই কোন অপার্থিব—ভগবান ব'লে কেউ—চৈতন্য ব'লে কিছু। আছে শুধু আমাদের বকযন্ত্র যা মেপেছে—আমাদের পরমাণুবিধ্বস্তকারী যন্ত্র যা জেনেছে। এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মহাশয়দের শেষ কথা— চরম যুক্তি (?)।

তাই এই রকমের একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যে যখন এ'রা হিন্দুর ধর্ম ও দর্শন সাহিত্য পড়েন, তখন তার মধ্যেকার কোন কিছুই এ'দের মনে লাগে না, কোন কিছুই এ'দের প্রাণ স্পর্শ করে না, কোন কিছুই এমন কি এ'দের বুদ্ধিকেও নাড়া দেয় না। এ'রা সেই সাহিত্য-সাগর মন্থন করে কেবল মাত্র একটি রত্ন আবিষ্কার করেন যার দীপ্তিতে এ'দের চিত্ত মন প্রাণ আত্মা একেবারে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে—হিন্দুর ধর্ম-সাহিত্য-সমুদ্রের এই একমাত্র রত্নটি হচ্ছে—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। অতি অদ্ভুত এই ঘটনা!

কিন্তু আমরা জানি অর্থাৎ ভারতবর্ষ জানে অর্থাৎ জনক যাজ্ঞবল্ক্য থেকে আরম্ভ ক'রে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্যন্ত সহস্র সহস্র জীবন জেনেছে, উপলব্ধি করেছে যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে এক বিরাট অখণ্ড সত্তা যার সাযুজ্যে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে এক অপূর্ব অবর্ণনীয় অনির্বচনীয় আনন্দ-রস, উপলব্ধি করতে পারে একটা peace that passeth understanding—যার সঙ্গে সারূপ্য উপলব্ধি ক'রে মানুষ বল্‌তে পেরেছে "সোঽহং" "তত্ত্বমসি", মানুষ বলেছে my Father and I are one। এই যে সহস্র সহস্র বর্ষের মানুষের অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের অন্ধতায় বা সাম্যবাদের লুব্ধতায় উড়িয়ে দিতে চাইলে সেটা মানব-জাতির উপর বড় বেশি রকম জবরদস্তি করা হবে—ইংরেজীতে যাকে বলে rather a tall order। উদাত্তকণ্ঠে মানুষ একদিন বলেছিল—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> না ন্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥

অন্ধকার-মহাসমুদ্রের পরপারে সেই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি। তাঁকেই জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নেই—

ভবিষ্যতেও মানুষ বল্‌বে এ-কথা নিসংশয়িত চিত্তে প্রজ্ঞা-দীপ্ত-কণ্ঠে—বিজ্ঞানের কোন গোঁড়ামীতেই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

মানুষের মন থেকে ততঃ কিম্? এই প্রশ্ন লুপ্ত হ'য়ে যাবে না। এবং ঐ প্রশ্নেরই পিছনে পিছনে সে একদিন গিয়ে পৌঁছিবে সেইখানে যেখানে আর এই air conditioned রেলগাড়ী বা ভ্যানিলা-গন্ধী আইস্-ক্রীম দিয়ে তার চিত্ত ভ'রে উঠ্‌বে না—যেখানে দাঁড়িয়ে সে আকুল কণ্ঠে বলবে—অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। এই আকুলতা জন্ম দেবে তপস্যার এবং এই তপস্যাই তাকে নিয়ে যাবে সেইখানে যেখানকার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলছেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নে মা বিদ্যুতো কুতোহয়মগ্নি'।
> তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভা সা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

যেখানে সূর্য নেই চন্দ্র তারকা নেই সেখানে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, অগ্নিই বা সেখানে কোথায়? যেখানে আছে কেবল এক দীপ্যমান যার দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা বিশ্বচরাচর দীপ্তি পাচ্ছে।

এই হচ্ছে চরম সত্য; ultimate reality—যে চরম সত্যকে জানা যায় ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন—এবং সাহা মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনবার পর আমরা প্রসন্ন মনে ওর সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে পারি—ন বকযন্ত্রেন চ।

* * * * *

আন্দাজ করছি যে, এই সুদীর্ঘ পত্র পড়ে তুমি নিশ্চয়ই বলবে যে সাহা মহাশয় যে এমন গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে বেদ পুরাণ বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম চ জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে কত সব কথা বললেন, আমি তো সে সবের সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করলাম না। ঐ সব ব্যাপার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নি কারণ তার দরকার পড়ে নি। কেননা অনিলবরণ ও মেঘনাদবাবুর মধ্যে আসল তর্কটা হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় জীবনকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, না, সে জীবন সাহা মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক নরকের মাপে মাপে গড়ে তুলতে হবে। এবং এই তর্কের সঙ্গে হিন্দুরা তাদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বেদের কাছ থেকে পেয়েছিল না বাবিলোন থেকে পেয়েছিল, শিবঠাকুর তাদের কৈলাশ পর্বত থেকে এসেছিলেন না মহেঞ্জোদারোর কুমোরবাড়ী থেকে এসেছিলেন, জ্যোতিষের জ্ঞান তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছিল না গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করেছিল এ সব তর্কের কোন প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ নেই। আসলে আমার তো মনে হয়েছিল যে মেঘনাদবাবু যে ঐ সব ব্যাপার সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন তা নিজের বিদ্যা দেখাবার জন্যে। কেননা তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে, দেশবাসীরা মনে করে যে, তিনি এক বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাঁর নিজের কথা—"বর্ত্তমান সমালোচকের মতো অনেক সমালোচকই বোধ হয় কল্পনা করিয়াছেন যে, আমি হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্ব্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত।"

ইতি

**হসন্ত**

পুনশ্চঃ কিশোরী মেয়ের মাথার বেণী যেমন শোভা, পত্রের শোভা তেমনি "পুনশ্চ"। তাই এ পত্রের শোভা বর্ধনার্থে একটা "পুনশ্চ" জুড়ে দিলাম, যাতে তুমি উল্লসিত চিত্তে আরও বেশী তারিফ করতে পারো।

মেঘনাদবাবু এমনি ধরণের একটা কথা বলেছেন যে ঈশ্বরকে নানা দেশের নানা লোক নানা যুগে নানা রূপে আবিষ্কার করেছে তাতেই বোঝা যায় যে, ঐ ভদ্রলোকটির কোন অস্তিত্ব নেই। তর্কের খাতিরে ধরাই যাক্ যে হয়তো ঈশ্বর আছেন কিম্বা হয় তো নেই। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতার এই যুক্তিটি অতি অপরূপ। ঐ যুক্তি অনুসারে দাঁড়ায় এই যে, সাহা মহাশয়কে যদি কোন ব্যক্তি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব'লে সম্বর্ধিত করে এবং অন্য এক ব্যক্তি যদি সাহা মহাশয়ের বেদ উপনিষৎ ইত্যাদির সাগরবৎ গভীর জ্ঞান দর্শনে ভাবাবেগে দশাপ্রাপ্ত হয় এবং তৃতীয় অন্য এক ব্যক্তি যদি তাঁর বাবিলোনীয়, আসিরীয়, সুমেরীয়, মিশরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি দেখে আনন্দের আতিশয্যে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম করে, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হ'য়ে যাবে সাহা মহাশয় একটি অস্তিত্বহীন মরীচিকা—একটি প্রকাণ্ড আকাশ-কুসুম।

সে যা হোক একটা শেষ কথা বলে এই পত্রের উপসংহার করি। সাহা মহাশয় মহাসমারোহ ক'রে আমাদের জানিয়েছেন

(শেষাংশ ৯১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# নন্দা

( উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি )

**শ্রীঅমিয়া সেন**

(১১)

আসিবার জন্য লিখিলেও সুবীর সত্যই আসিবে কি না, এ বিষয়ে সকলের মনেই রীতিমত সংশয় ছিল। তাই যখন কোনও সংবাদ না দিয়া, একটি সুটকেস মাত্র লইয়া সুবীর সাড়ে তিন বৎসর পরে আজ সত্যই বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মায়ের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও দেবনারায়ণের মুখ নিজের পূর্ব অবিবেচনার লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। সুবীর পিতাকে প্রণাম করিয়া মায়ের কাছে গেল। প্রণাম করিয়া কহিল, "নন্দা কেমন আছে?"

গৃহিণীর মুখের হাসি চকিতে মিলাইয়া গেল; কহিলেন, "তাকে কাল তার ভাই এসে নিয়ে গেছে। অবস্থা একরকমই।"

মুহূর্তে সুবীরের উদ্বেগব্যাকুল মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, এইমাত্র ঘরে আসিয়া সে যেন দেখিতে পাইল, তাহার যথাসর্বস্ব খোয়া গিয়াছে। এত দিন পরে নন্দার অসুখের সংবাদ শুনিয়া অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে সে ছুটিয়া আসিতেছিল; তাহার দুঃখ দুশ্চিন্তা, ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা তার ব্যাকুলতার তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে ব্যাকুলতাকে উপহাস করিয়াই যেন ভগবান নন্দাকে এখান হইতে সরাইয়া দিয়াছেন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটি নিশ্বাস চাপিয়া সে নন্দার ছোট ঘরখানির ভিতরে আসিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। বিছানাপত্র নন্দা কিছুই লইয়া যায় নাই, আজও সব তেমনি পাতা রহিয়াছে। নন্দার ভাই দারুণ বিতৃষ্ণায় এখানকার তৃণখণ্ডটুকুও তাহাকে লইতে দেয় নাই, জীবন্ত মানুষটাকেই যাহারা মারিয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়াছে, তাহাদের কোনও জিনিষ স্পর্শ করাও পাপ।

নন্দার পিতৃগৃহে এখনও নন্দার অখণ্ড প্রতিষ্ঠা, সেখানে তাহার কোনও কিছুরই অভাব হইবে না। নন্দার শয্যায় শুইয়া, নন্দার উপাধানে মাথা রাখিয়া সুবীর বহুদিন-বিস্মৃত পত্নীর মুখখানা মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিগত জীবনের অল্পায়ু ক্ষীণ স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে মনে জাগিতেছিল।

শিশুর মত সরল, ভীরু একখানি মুখ, শীর্ণাঙ্গী সেই কিশোরী ছোট মেয়েটি। কিন্তু সেই ছোট বুকে কি অপ্রমেয় ভালবাসা! সুবীর শেষবারে যখন যায়, তখন তার সে কী বুকভাঙ্গা কান্না, সে কী অস্থির ব্যাকুলতা! তাহার হৃৎপিণ্ড যেন সুবীর ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। সুবীরের চোখে জল আসিয়া পড়িল। নন্দার উপাধানে মুখ গুঁজিয়া চোখের জলে সুবীর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নন্দা যদি আজ থাকিত।

ভোলানাথ সুবীরকে স্নান করার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিল; দেবনারায়ণ ও যামিনী উভয়েই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া আর ছেলের কাছে যেন মুখ দেখাইতে পারিতেছিলেন না। নিজেরাই তাহাকে আসিতে লিখিলেন, আবার নিজেরাই বিনা আপত্তিতে বধূকে পাঠাইয়া দিলেন। দুটো দিনও যদি তাঁহারা দেরি করিতেন, সুবীর আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইত।

ভোলানাথ মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "দাদাবাবু।"

সুবীর চকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল; অশ্রুসিক্ত মুখ লজ্জাহীন দ্বিধাহীনভাবে তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ ব্যাকুলভাবে কহিল, "ভোলাদা, তুমি তো তাকে দেখেছ?"

ভোলানাথ মাথা নাড়িয়া বিষণ্ণভাবে কহিল, "তা আর দেখি নি দাদাবাবু!"

"খুব শুকিয়ে গেছে, না?"

"বড্ড; শরীরে আর কিছু নেই, দেখলে ভয় হয়।"

"কিছু বললে না যাবার সময়?"

"না দাদাবাবু, কিছু বলতে শুনি নি, শুধু কেঁদেছে।"

"কেঁদেছে? কেন?"

"তা তো আমি জানি না দাদাবাবু।"

সুবীর চুপ করিয়া রহিল। যাবার সময়ে নন্দা কাঁদিয়াছে, সুবীর যেন কান পাতিয়া তাহারই কান্না শুনিতে লাগিল। নন্দার ঘর কাঁদিতেছে, শয্যা কাঁদিতেছে, তাহার চোখের জলে পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে। সুবীরের চোখের কোণ বহিয়া টপ্‌টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভোলানাথ বেদনা পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ভয় কি দাদাবাবু, বউমা ভাল হয়ে ফিরে আসবেন।"

সুবীর সে কথায় কান না দিয়া কহিল, "আচ্ছা ভোলাদা, সে জানত না যে আমি আসব?"

"তা আমি ঠিক জানি না; তবে বোধ হয় জানতেন না, তা হ'লে কি তিনি আর যান?

* * * * *

ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হোটেলের একটি কামরায় নন্দার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার ভাই কমল বলিতেছিল, "কই, সে মেসে তো সুবীরবাবু নেই!"

নন্দা বিবর্ণ মুখে কহিল, "নেই? কোথায় গেছেন তিনি?"

"তা কেউ বলতে পারলে না, একজন ভদ্রলোক শুধু বললেন, তিনি কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছেন, কোথায় গেছেন বা কবে ফিরবেন, তা তিনি জানেন না।"

"হয়তো অফিসের কোনও কাজে কোথাও গেছেন।" মৃদুস্বরে এই কথা কয়টি বলিয়া নন্দা চুপ করিয়া রহিল।

সেই কলিকাতা। নন্দার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই নগরী, নন্দার তীর্থ। কিন্তু তীর্থে আসিয়াও তপস্বিনীর দেবদর্শন ঘটিল না, প্রিয়কে একবার চোখের দেখা, তাহাও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। নন্দার বুকের মধ্যে আজ বড় বেশী যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। কমল বাহির হইয়া গেলে সে একেবারে আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"আর কত সইব, ভগবান!"

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মনে হইল, কাহার জন্য তাহার এত দুঃখ! এই যে রাত্রি দিন সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়রাণ হইয়া গেল, এ কাহার জন্য? সুবীর যদি জানিতই, তাহার

জীবনের এই পরিণতি, তবে সে কেন বিবাহ করিল? পূর্ব জন্মের কোন শত্রুতা ছিল তাহার নন্দার সঙ্গে? নন্দার সমস্ত জীবনটাকে সে পায়ের তলায় দলিয়া পিষিয়া কেন সে এমনভাবে চূর্ণ করিয়া দিল?

কোনও দিন নন্দা স্বামীকে কোনও দোষ দেয় নাই, কোনও অনুযোগ করে নাই, কিন্তু আজ আর তাহার মন বাধা মানিল না; রোদনরুদ্ধকণ্ঠে নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় সে বুকের উপর দুই হাত চাপিয়া সুবীরের উদ্দেশ্যে কহিতে লাগিল, তোমাকে সমস্ত তনু মন দিয়ে যদি সত্যই ভালবেসে থাকি, তবে একদিন যেন তোমাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হয়, আমার জন্যে এমনি কান্না যেন একদিন তোমাকেও কাঁদতে হয়।"

(১২)

দিল্লি, বিশ্বপতিবাবুর বাড়ী।

বিশ্বপতিবাবু মেয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কমলা, নন্দার মা, তো কাঁদিয়াই ফেলিলেন। "ওগো, মেয়েটাকে একেবারে মেরে ফেলেছে।" নন্দা নিজের শীর্ণ বাহু দুইখানি দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁর বুকে তার মাথাটি এলাইয়া দিল। অনেকদিন পরে তাহার দগ্ধ বুকখানা যেন অনেকটাই জুড়াইয়া গেল।

বিশ্বপতিবাবু নিজের সমস্ত মনোযোগ মেয়ের দিকে ঢালিয়া দিলেন। নন্দাও এখানে আসিয়া কিছুদিন পরেই শরীর একটু সবল বোধ করিতে লাগিল।

বিকালে নন্দা প্রত্যহ সামনের বাগানে বাঁধানো বেদীর উপর গিয়া বসে। বাগানের বাঁ দিকে টেনিস লন; কত তরুণ তরুণী ও প্রৌঢ় প্রত্যহ আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে খেলিতে আসে। নন্দা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। একদিন সেও টেনিস খেলিতে ভালবাসিত, সেও এমনি ছুটিয়া লাফাইয়া উচ্চহাস্যে টেনিস লন মুখরিত করিয়া তুলিত। কিন্তু নন্দার মনে হয় সে যেন গত জন্মের কথা এখন আর ও সমস্তের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই।

নন্দার পূর্ব সঙ্গিনীরা অনেকে আসে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে, গল্প বলিতে। লীনা বলে, "ইশ, বড্ড তো শুকিয়ে গেছিস ভাই! হ্যাঁ, মজার কথা শোন্ সেবার পূজোর আগে আমি বললাম মিঃ রায়কে, 'চল এবার কাশ্মীর যাই।' অতে সে বললে, 'উহুঁ, এবার আমার ছুটি বেশী নেই, সব ছুটি আগে নেওয়া হয়ে গেছে।' আমি চুপ করে গেলাম, আর কথাটি কইলাম না। দিন কয়েক পরে একটু সর্দি হল, চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে বেশী লাল হল, অফিস থেকে এসে আমার চোখের দিকে তাকিয়েই রায় বললে, 'ও কি, কি হয়েছে তোমার?'

"আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওপারের ডাক পড়েছে গো, শরীর ভয়ানক অসুস্থ, আর বোধ হয় বাঁচব না।'

"ওর দিকে চেয়ে দেখি ওর অবস্থা প্রায় কেঁদে ফেলবার মত। আমি মজা পেয়ে আবার বললাম, 'মরব সে জন্য আমার এক তিল দুঃখ নেই; তবে আমার কথাটা যে তুমি রাখলে না, এজন্য পরে নিজেই পস্তাবে।' আর যায় কোথা, পরদিনই সাহেবের হাতে পায়ে ধরে পনের দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এক হপ্তা পরে একেবারে কাশ্মীর। পাগল তো একেই বলে।"

বলিয়াই লীনা অপরিসীম স্বামী গর্বে একটু হাসিল। ওদের প্রত্যেকের গল্পের ধারাই এই রকম। অবশেষে একদিন একজন অকস্মাৎ নন্দাকে প্রশ্ন করিয়া বসে. "তুমি তো কলকাতাতেই থাক, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে না?"

নন্দা ক্ষীণ হাসিয়া মাথা নাড়ে। পরম বিস্ময়ে সকলে প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া ওঠে, "সে কি তবে থাক কোথা?"

"দেশে," আস্তে আস্তে নন্দা বলে।

"বিয়ে হতে আজ পর্যন্ত?"

"হ্যাঁ"।

"উঃ, কি সাংঘাতিক! ঢাকার পাড়াগাঁ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্বশুর শাশুড়ী পরিজন, তার মধ্যে? বাপ রে!"

প্রবল বিস্ময়ে সকলে খানিক চুপ হইয়া যায়, পরে আবার একজন প্রশ্ন করে, "এখানে মিঃ চৌধুরী তোমার সঙ্গে আসেন নি?"

"না।"

"সে কি, তোমার এই রকম অসুখ, কাছে থাকা তাঁর উচিত নয়?"

"ছুটি পান নি।" নন্দা মিথ্যা কথা বলে।

মেয়েরা প্রবল স্বরে বলে, ছুটি পাই নি, বললেই বা তুমি ছেড়ে দিলে কেন? স্বামীর অসুখের সময় স্ত্রী যেমন খাটবে, স্ত্রীর অসুখের সময়ে স্বামীও সেই রকম খাটতে বাধ্য। এতে কোনও ওজর চলে না। স্ত্রীর সুখ অসুখের জন্য সে আইনত দায়ী।"

নন্দার হাসি পায়; এরা শুধু আইনই চিনিয়াছে। হৃদয়ের দাবী এদের কাছে গৌণ, এদের প্রাপ্য এরা আদায় করে আইনের দোহাই দিয়া, নন্দা শিহরিয়া ওঠে, আইনের নামে হৃদয় নিয়া ছিনিমিনি! ভগবান রক্ষা করুন, এমন দুর্মতি যেন তার কোনদিন না হয়। যেখানে হৃদয়াবেগ তুচ্ছ, প্রাণের আকর্ষণ অবান্তর, সেখানে আইনের দোহাই দিয়া নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া নেওয়ায় কতটুকু শান্তি? হায় হায়, সে যে নেহাত ছেলেখেলা, মনকে নেহাত চোখঠারা। নন্দার মুখে ক্লিষ্ট মনের ছায়া পড়ে, সে জোর করিয়া সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া হাসে।

এদের মধ্যে হেনা মেয়েটি একটু অন্য ধরণের। অন্যের কোনও গোপন দুঃখ জানিবার জন্য তার আগ্রহ যেমন বেশী, সে দুঃখের প্রতি সমবেদনা জানাইতেও সে তেমনি জানে। সকলে চলিয়া গেলে সে ইচ্ছা করিয়াই সেদিন একটু দেরি করিল। তার পর মিনিট কয়েক চুপচাপ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা নন্দা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবে না তো?"

মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া নন্দা কহিল, "কি কথা?"

"একটু ইতস্তত করিয়া হেনা কহিল, "দেখ, আমার মনে হয়, তোমার মনে কোথাও একটা খুব বড় অশান্তি আছে।"

নন্দার মর্মমূল ধরিয়া কে যেন সজোরে নাড়া দিল।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন বলতো?"

হেনা তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বল লক্ষ্মীটি, গোপন করো না, আমার মনে হয়, কথাটি খুব কষ্টের, আর সেটা প্রকাশ করতে না পেরে তুমি আরও কষ্ট পাচ্ছ।"

নন্দার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতে সে তাহার পূর্বের অপূর্ব সংযম, কঠোর আত্ম-নিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আজ সামান্য কথাতেই তার দুর্বল মন ধৈর্য হারাইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কি লাভ তোমার তা শুনে?"

হেনা ব্যগ্রকন্ঠে কহিল; "লাভ হয়তো কিছুই নেই, তবে তোমার মুখ দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। ওরা এসে তোমাকে আরও জ্বালাতন করে যায়।"

নন্দা চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল, হেনা তার এক-খানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে নন্দা চোখ মেলিয়া তাকায়। সে চোখে অপরিসীম ক্ষমা আর তিতিক্ষা। সজল চোখে মৃদু হাসিয়া বলে, "আমাকে ক্ষমা কর হেনা, আমার জীবনের কোনও কিছুর জন্য আমি আজ পর্যন্ত কারুর ওপর কোনও অনুযোগ করি নি। তবে মনের অশান্তি।"

একটু থামিয়া বলে, "মনের অশান্তি মিথ্যে নয়, কিন্তু সেও আমার একলার। এ নিয়েও আমার কিছু বলবার নেই।"

"হেনা এবার মরিয়া হইয়া বলে, "আমার মনে হয় তুমি অসুখী শুধু স্বামীর জন্যে।"

নন্দা চুপ করিয়া রহিল, স্বামীর বিপক্ষে না হউক, স্বপক্ষেও কিছু বলিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। স্বামী তাহার দেহ মনের মালিক সে কথা নন্দা ভোলে নাই, তাহারই কারণে দেহমন জ্বালাইয়া দিয়া নন্দা আজ মুক্তি পথের পথিক। কি কাজ তাহার মিথ্যা কথার জালে নিজের জীবনের দৈন্য ঢাকিয়া? তাহার জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ—লাভ-লোকসানের দুর্ভাবনা তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

হেনা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "যে স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে পারছ না, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ কেন?"

নন্দা শিহরিয়া উঠিয়া তাহার মুখপানে চাহিল, কথা কহিল না। হেনা আবার কহিল ডাইভোর্স কর না কেন?"

সর্বনাশ, নন্দার মুহূর্তকাল পূর্বের বিরাগী মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা হইলে থাকিব কি নিয়া, তাঁর স্মৃতিটুকু ছাড়া যে আমার আর কিছুই নাই! হউক সে নিষ্ঠুর, তবু হৃদয়সিংহাসনে তাহার নিঃসংশয় অধিকার নন্দা কি অস্বীকার করিতে পারে?

হেনা বোধ হয় আরও কিছু বলিত—কিন্তু বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেল। নন্দার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, কহিল, "যে মেয়ে একবার তাকে পেয়েছে, সে তার আশা এ জীবনে কেন পর জীবনেও ছাড়তে পারবে না। কিন্তু হেনা, এ সব কথা তোমরা বুঝবে না, তোমাদের ভালও লাগবে না। এ সব আলোচনা না হওয়াই ভাল।

হেনা ব্যথিত সুরে কহিল, "নন্দা, তুমি একেবারে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছ।"

নন্দা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। হেনা উঠিয়া দাঁড়াইল, নন্দার কাঁধে হাত দিয়া কহিল, "সব সওয়া যায় নন্দা, কিন্তু প্রেমের অসম্মান, এ আমি জীবন গেলেও সইতে পারি না।"

হেনা চলিয়া গেল। পৃথিবীর বুকে তখন গোধূলি আলোর সমারোহ। অনেকদিন পরে আজ নন্দা পরিপূর্ণ শান্তির মাঝে বসিয়া পৃথিবীর গোধূলি বেলার শান্ত রূপ দেখিল। সে রূপ তাহার হৃদয়েও শান্তি বর্ষণ করিল, তাহার দুই চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। নন্দা আপনার মনেই আশ্চর্য হইয়া গেল, তাহার মনে এত শান্তি—এত নির্লিপ্ততা আসিল কোথা হইতে! যে সুবীরের চিন্তা তাহাকে অহরহ অশান্তিতে পুড়াইয়া মারিতেছিল, সে হৃদয়ব্যাপী অশান্তি, বুক জোড়া বুভুক্ষা তাহার কোথায় গেল। নন্দা চোখ বুজিয়া আপনার অন্তস্থল পর্যন্ত পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহার জীবন যে ক্রমশ সমাপ্তির পথেই চলিয়াছে, বাহিরের চিকিৎসায় তাহা না বুঝা গেলেও আভ্যন্তর দুর্বলতায় তা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল। যৌবনের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, জীবনের অবাঞ্ছনীয় পরিবেশ, আর এই দুইএর অবশ্যম্ভাবী ফল ভিতরের দুর্নিবার ক্ষয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে নন্দা আজ দৈহিক মানসিক সকল দিক দিয়াই হৃৎসর্বস্ব।

জীবনের এই শান্ত সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া তার আজ মনে হইতে লাগিল, বৃথাই সে এতকাল কাঁদিয়াছে। মানুষ সমস্ত প্রাণমন দিয়া যাহা কামনা করে, তাহা না পাওয়াটাকেই সে জীবনের চরম দুঃখ মনে করিয়া কাঁদিয়া সারা হয়। কিন্তু সে কান্নাটা কত বড় ভুল! আজ আর নন্দার মনে সেই চিরন্তন চাওয়া-পাওয়া লইয়া কোনও ক্ষোভ নাই। সে ভালবাসিয়াছে, সেই ভালবাসার আনন্দেই তাহার বুক কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে এর চেয়ে শান্তির আর কি আছে?

গোধূলি বেলায় এই পৃথিবীর পথে পথে, ওই পথের ধূলিতে ধূলিতে আজ শান্তির অস্ফুট রাগিণী, রক্তাভনীল আকাশ জুড়িয়া শান্তির কি বিরাট রূপ। বাতাসে শান্তির স্পর্শ, গাছের পত্র শিহরণে শান্তির সুর। উর্ধলোকে আকাশের বুকে উদিত সন্ধ্যার প্রথম তারাটির দিকে চাহিয়া বোধ হয় অসহ্য শান্তিতেই নন্দার চোখ মুখ অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

## বিচিত্র বার্ত্তা

### চোখের ভুল

জীবনে কোন দিন ভুল করেনি এ রকম লোক পৃথিবীতে দুর্লভ মানুষের জীবনে ভ্রান্তির আবর্ত্তে পড়বার সম্ভাবনা পদে পদে। অতি সাবধানী মানুষ হয়ত তুচ্ছ ভ্রান্তির ফাঁদে পড়বার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর জীবনের এমন একটি দিনও বাদ যাবে না, যেদিন সে কোন না কোন কাজে ভুল করে বসেছে। চোখের ভুল এবং বুদ্ধির ভুল সমপরিমাণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চতুর্দ্দিকে যেন রাজ্য বিস্তার করে রয়েছে। বিচারের একটুখানি ত্রুটী হলেই আমরা ভুলের রাজ্যে যেয়ে পড়ব। হয়ত সামান্য ভুল সংশোধন করতে মানুষকে বেশী বেগ পেতে হয় না, কিন্তু ভুলের পরিমাণ যেখানে বৃহত্তর সেখানে ফলপ্রাপ্তি মারাত্মক। বুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিত সারা জীবনব্যাপী গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের রাজ্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করে গেলেন, তা পরবর্ত্তী কালের কোন প্রতিভাবান মানুষের যুক্তিতে একান্ত ভুল প্রমাণিত হলে আশ্চর্য্যের কিছু থাকবে না।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা হেতু আমরা অনেক সময় প্রকৃত বস্তুকে বিকৃতভাবে দেখি, অথবা সময়ে সময়ে বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্যের মধ্যেই আনতে সক্ষম হই না। এ সব মার্জ্জনীয়। কিন্তু আমরা সাধারণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়েও ঘটনাক্ষেত্রে যদি 'সর্পে রজ্জু ভ্রম' করি, তা হলে তা যেমন মারাত্মক তেমন বোধ হয় আর কিছু নয় এবং এ ধরণের ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। প্রমাণের জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে না, সংলগ্ন ছবিটি নিয়েই পরীক্ষা করা যাক। ছবিতে প্রকৃতপক্ষে কয়জন লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন—এ প্রশ্নের উত্তরে আপনারা প্রায় সকলেই উত্তর দিবেন—দু'জনের; আর ঐ দু'জনের পিছনে যে আরও দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, তারা আর কেউ নয়—আর্সি'র উপর প্রতিফলিত এ দু'জনেরই প্রতিচ্ছবি। এ সব প্রশ্ন ছোট ছেলে মেয়েদেরই চোখে ধাঁধাঁ সৃষ্টি করবার জন্যে যেন তৈরী। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের জীবনে এরূপ ভুল অবশ্যম্ভাবী। যা বহুজনের নিকট অতি পুরাতন, সেই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেকেই ভুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে দু'জন নয়, চারজনকে নিয়ে ফটো তোলা হয়েছে। প্রথম সারিতে একজন মহিলা ও পুরুষ, তারপরে আর্সি'র একটা ফ্রেম রেখে আরও দু'জনকে বসান হয়েছে। এখানে আর্সি'র কোন অস্তিত্বই নেই। সকলের চোখে ধাঁধাঁ লাগাবার জন্যে দু'জোড়া যমজ বোন ও ভাই খুঁজে এনে ফটোগ্রাফার এমন কৌশলে এদের বসিয়ে ছবি তুলেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত বলে না দিলে সকলেই বলবেন ছবিটি দু'জন লোক নিয়ে তোলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘটনাটি অন্যরূপ হওয়ায় সকলেই ভুল উত্তর দিবেন। তবে মানুষের জীবনে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক।

ছবিতে কতজন লোক আছে

### আবর্জ্জনা ফেলায় বিপদ

বড় বড় শহরে রাস্তার যেখানে সেখানে আবর্জ্জনা ফেলা নিষেধ। ফেললে আইন করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। সম্প্রতি ব্রিস্টল শহরে জনৈক ভদ্রলোক সিগারেটের বাক্স ফেলার অপরাধে ৫ পাউন্ড অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

### বহু বিবাহ প্রথা

ঈজিপ্টে এখনও পর্য্যন্ত বহু বিবাহ প্রথা যে বহুল

প্রচলিত তা সেখানের সরকারী বিবরণ পাঠে জানা যায়। গত বৎসর ৭৪,০০০ হাজারের বেশী পুরুষের দু'জন করে ও ১১৮ জন পুরুষের তিনজন করে স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল। এ ছাড়া প্রায় ১৫,০০০ পুরুষ তিনবার, ১,৫০০ পুরুষ পাঁচবার এবং ৮০ জন পুরুষ নয়বার পাণিগ্রহণ করেছিল।

**আমেরিকার আবিষ্কারক কে?**

ব্রিটিশ কলোম্বিয়া ঐতিহাসিক সমিতির মিঃ বি এ ম্যাক-কেলভি সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন, চীনারা কলোম্বাসের জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করে। চীনের এক পুরাতন দপ্তরখানায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, চীনারা আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সুন্দর করে বর্ণনা করেছে। আলাস্কাকে ওয়ান সাং, ব্রিটিশ কলোম্বিয়াকে তা হান এবং মেক্সিকোকে ফুসাং নামে তারা অভিহিত করত।

**ঘড়ি পরার সখ**

নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কাজ করবার জন্যে ঘড়ির প্রয়োজন; এবং তা যদি কেউ যথাযথভাবে পালন না ক'রে কাজ করে তা হলে বুঝতে হবে ঘড়ি ব্যবহারটা তাদের সখের জন্যে। আমরা ঘড়ি ব্যবহার করি, কিন্তু আমাদের নামে একটা বহুদিনের অপবাদ চলে আসছে যে, আমরা না যথাযথ সময়ে কোন কাজ করতে অভ্যস্ত নই; সময় সম্ব আমাদের ধারণা খুবই অল্প। ছোট ছেলেরা সময়ের ধার ধা না, সখ করে খেলবার নকল ঘড়ি হাতে লাগিয়ে আনন্দ পা কিন্তু চার্লস ব্রাউন নামক জনৈক ভদ্রলোকের সখের তুল নেই। একটা দু'টা নয়, একেবারে ত্রিশটা ঘড়ি লাগিয়ে ব্রা সখের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর ঘড়ি ব্যবহারকার দের মধ্যে তাঁকেই চ্যাম্পিয়ান বলা চলে। নানা আকারের হ ঘড়ি, পকেট ঘড়ি ছাড়া আঙ্গুলে, গলার বোতামে এবং নেব টাইয়েতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ঘড়ি লাগিয়ে থাকেন। ঘ গুলিতে ঠিক সময়ে দম দেওয়া এবং তাদের উপর সর্ব্বপ্র ব্যবস্থা লওয়ার ত্রুটি কোন দিনই মিঃ ব্রাউনের দিক থে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরী ঘড়ি ব্যব ক'রে ঘড়ির কলকব্জা এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের ঘ বিশ্বাসী সময়রক্ষক তার সম্বন্ধে ব্রাউন যে অভিজ্ঞতা সং করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। শরীরের চারি পাশে বিভি আকারের ঘড়ি ঝুলিয়ে ক'লকাতার রাস্তায় ব্রাউনকে চলাফে করতে হ'লে আগে থেকেই মগজের কলকব্জা সারাবার ব্যব করে রাখতে হবে। সখের মূল্যস্বরূপ তিনি যা পা তাতে ঘড়ি দেখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যবস্থা না কর তাঁকে পরে আপশোষে পড়তে হবে।

## হসন্তের পত্র

(৯১১ পৃষ্ঠার পর)

যে, ক্রুক্‌স্ সাহেব একদিন আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক তাঁর অভিজ্ঞতার সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ও-সম্বন্ধে কোন কথাই মুখে আনেন নি। কিন্তু সাহা মহাশয় আমাদের চুপি চুপিও জানান নি যে, ক্রুক্‌স্ সাহেব রয়াল সোসাইটির সভ্যদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর ঐ ব্যাপারের গবেষণা পরীক্ষা করতে। কিন্তু তাঁরা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। সম্ভবত বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন সাহা মহাশয়ের মতে নিজ মতের অনুকূলে যে তথ্য তাই ঢাক পিটিয়ে প্রকাশ করা আর তার প্রতিকূলে যা কিছু তা নিঃশব্দে ধামাচাপা দেওয়াই হচ্ছে সত্য নির্ধারণের উত্তকৃষ্টতম উপায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও থাকতে পারে।

আসলে অতীন্দ্রিয় বা supra physical—সাহা মহাশয় যার "ভূতুড়ে কান্ড" নাম দিয়েছেন—সে সম্বন্ধে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত রকমের shyness আছে যেমন shyness আছে ব্রিটিশ টমি ও মাঝি মাল্লাদের ভূত সম্পর্কে। Henry Slade বৈজ্ঞানিকদের আহ্বান করেছিলেন তাঁর অতি প্রাকৃত ব্যাপারগুলি পরীক্ষা ক'রতে সে-সব সম্বন্ধে আসল সত্য নির্ণয় করতে। কিন্তু Duboris—Reymond Helmholtz এবং Virchow পরীক্ষা তো দূরের কথা Sladeএর সঙ্গে দেখা ক'রতেই অস্বীকার করেন। এমন কি আইনষ্টাইনকে এই প্রশ্ন করা হ'য়েছিল—

Allow me to ask a direct question, Professor. Supposing another such agent of miracles should appear would you yourself feel impelled to test him experimentally?

মহাবৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাতে উত্তর দেন—

Your question misdirected. I explained above that I share the point of view taken up Dubois-Reymond and his colleagues.

বাস্ একেবারে তর্কচ্ছেদ হ'য়ে গেল। ইংরাজী উধৃত Einstein the Searcher নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এ'দের এই রকম ব্যবহারের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দে যায়। সম্ভবত আসলে এ'দের মগ্নচৈতন্যে এই রকম একটা ভ আছে যে, ঐ সব ব্যাপার পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে যদি অতী একটা কিছু ব্যাপার আছে এটা বিশ্বাস ক'রতে তাঁরা বাধ্য তবে তাঁদের এতদিনের এত সাধের জড়বাদী বিজ্ঞানের প্র তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে—তখন আর তাঁদের দাঁড়া স্থান থাকবে না—অন্তত সে স্থান বড়ই সংকীর্ণ হ'য়ে পড়বে

উপরে নাম ক'রেছি যে গ্রন্থের সেই গ্রন্থের Of d ferent worlds নামক অধ্যায়টি পড়লে বোঝা যায় বৈজ্ঞা দের কী রকম গোঁড়ামি হ'তে পারে—সে গোঁড়ামি ভট্টপল্ল পণ্ডিতদের গোঁড়ামির চাইতে কিছু মাত্র কম নয়। এবং বে যায় যে, বিজ্ঞানের কুসংস্কার ধর্ম্মের কুসংস্কারের চাইতে অন্ধতার জন্ম দেয় না। ইতি

হস্

পুন পুনশ্চ ঃ সর্বশেষে খুব একটা নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা Sublime pose নিয়ে সাহা মহাশয়ের দিকে শেক্সপীয়া রচিত ও হ্যামলেটের কথিত বিখ্যাত সেই বাণীটি এ পরিবর্তিত আকারে ছুঁড়ে দেবার লোভ হয়—বলতে ইচ্ছা হ

There are more things in heaven and ea Dr. Shaha than are dreamt of in your science

তুমি অবশ্য এর পিঠ পিঠ প্রশ্ন ক'রবে—কিন্তু Subli pose কেন? তার উত্তর—

Because India knows and Europe does I

ইতি হ

# আজ-কাল

### গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রকাশ্যে পূর্ণ অহিংসার নীতি বর্জ্জন করায় ভিতরে ভিতরে গান্ধীজীর সঙ্গে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতার একটা মত পার্থক্যের আভাষ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু দুই তরফের বড় বড় কথার আড়ালে পার্থক্যটা ঠিক কি নিয়ে তা প্রথমে বোঝা যায় না। গত কয়েক দিনের মধ্যে গান্ধীজীর কয়েকটি বিবৃতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকের হাবভাব ও সিদ্ধান্ত থেকে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। গত ৬ই জুলাই-এর বিবৃতিতে গান্ধীজী সোজাসুজি বলেন যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস এখন একটা অর্থহীন কথা; ভারতবর্ষ অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা চায়; বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগ দিলে কংগ্রেসকে প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব আবার নিতে হবে, যা অত্যন্ত অনুচিত; কারণ তা হলে কংগ্রেস বৃটিশ সমর-যন্ত্রের একটা অঙ্গ হয়ে পড়বে, আর ভারত গবর্ণমেণ্টের চিন্তা হচ্ছে ভারতকে বৃটেনের রক্ষার জন্যে প্রস্তুত করা, ভারতের আত্মরক্ষার জন্যে নয়। তিনি আরো বলেন যে, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্যে অহিংসা বর্জ্জন করার মানে বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটিশ পতাকাতলে সমবেত হয়ে সৈন্য বাহিনী গড়া; তিনি কংগ্রেস কর্ম্মীদের এ পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন, কারণ এতে স্বাধীনতা ও অহিংসার আদর্শের অবসান হয়।

এ সময়ে গান্ধীজীর এ বিবৃতি থেকে আসল কথা এই ধরা পড়ে যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রাপ্তির নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেলে ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দিতে এবং অস্ত্র, লোক ও সম্পদ দিয়ে বৃটিশ সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে মনস্থ করেছেন। গান্ধীজী এর বিরোধী। স্বাধীনতা পেলে তিনি বৃটেনকে অবশ্য সমর্থন করতে পারেন; কিন্তু সে সমর্থন নিছক নৈতিক, অস্ত্রশস্ত্রের কারবার তাতে নেই (এক বিবৃতিতে তিনি ইংরেজকেও অস্ত্র ত্যাগ করে' জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করতে বলেছেন)।

কংগ্রেসের এই নতুন সহিংস সহযোগ নীতির পাণ্ডা হচ্ছেন এতদিন গান্ধীজীর বিবেকের পাজিদার বলে' যিনি পরিচিত ছিলেন সেই শ্রীরাজগোপালাচারী। গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত সর্দ্দার বল্লভভাইও রাজাজীর দলে ভিড়েছেন। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাজাজীর এই নতুন নীতির প্রতিবাদ জানালে রাজাজী তাঁকে সাফ বলে' দিয়েছিলেন যে, তাঁর (গান্ধীজীর) রাজনৈতিক দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে; অতএব তাঁর কথা গ্রাহ্য নয়। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য এই "রাজ-নীতি" সমর্থন করেছেন। কংগ্রেসের এই সব গুহ্য কথা মহাত্মাজীই পরবর্ত্তী এক বিবৃতিতে প্রকাশ করে' দিয়েছেন।

গান্ধীজীর উপরোক্ত প্রথম বিবৃতির পর ওয়ার্কিং কমিটি পাঁচ দিনের বৈঠকের শেষে এক সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তার মর্ম্ম এই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে' নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশ্বাসভাজন একটা 'জাতীয়' গবর্ণমেণ্ট এখন কেন্দ্রে প্রবর্ত্তন করুন; তাহলে কংগ্রেস 'দেশ-রক্ষার' জন্যে পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী বিবৃতি দেওয়ার পর ভারতকে রাতারাতি ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দানের হঠাৎ-সমর্থক 'ষ্টেটসম্যান' গান্ধীজীর উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ গান্ধী নীতির পক্ষাবলম্বন করে' কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

### সুভাষচন্দ্র ও হলওয়েল সত্যাগ্রহ

৩রা জুলাই থেকে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। ঠিক তার পূর্ব্ব দিন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ৫ই তারিখে কলকাতায় ব্যাপক হরতাল হয় এবং জনসভায় সুভাষচন্দ্রের মুক্তি দাবী করা হয়। বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বৈঠকেও তাঁর মুক্তি চাওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের সংবাদে কর্পোরেশনের সভা স্থগিত করা হয়।

হলওয়েল সত্যাগ্রহে প্রত্যেক দিন কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হচ্ছেন। আজ পর্য্যন্ত মোট ৬৪ জন ধৃত হয়েছেন। ৮ই জুলাই ৯ জন শিখ, ১ জন বিহারী ও ১ জন মুসলমান সত্যাগ্রহে যোগদান করেন।

গ্রেপ্তার হওয়ার দিন সুভাষচন্দ্র প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের বিবৃতির জবাবে বলেন যে, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্তের জন্যে এত বেশী সময় লাগবার কোন কারণ নেই। তিনি অবিলম্বে ঐ স্মৃতিস্তম্ভ সরাবার দাবী জানান। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পর প্রাক্তন আই-সি-এস ইংরেজদের অন্যতম প্রতিনিধি মিঃ গ্রিফিথস্ এক বিবৃতিতে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসৃত করে গোলমাল মিটিয়ে ফেলবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। এই দুই বিবৃতিতে ক্রুদ্ধ হয়ে হক সাহেব এক পাল্টা বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেন যে, সত্যাগ্রহ অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কিছু করবেন না; সত্যাগ্রহ বা ইংরেজদের সহযোগিতা—কোন কিছুতেই তাঁদের ভীত বা প্রলুব্ধ করে ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না।

কলকাতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেবকে ঐ আইনে দ্বিতীয় দফা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারত রক্ষা আইনে আরো ধরপাকড় চলছে।

### নাগপুরে ধর্ম্মঘট

নাগপুরে কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট সুরু হয়েছে। মোট ১৭০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করেছে। মডেল ও এম্প্রেস মিল লক-আউট ঘোষণা করে' শ্রমিকদের শাসিয়েছে, তারা যদি যথাক্রমে ১২ই ও ১৫ই জুলাই-এর মধ্যে কাজে না আসে তা হলে মিলে তাদের চাকরী থাকবে না। শ্রমিকদের দাবী হচ্ছে এই যে, মালিকরা তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অন্তত টেক্সটাইল এনকোয়ারী কমিটির সুপারিশগুলি মেনে নিক।

* * * * *

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বর্ষায় নদীর জল বেড়ে প্লাবন দেখা দিয়েছে; ফলে প্রায় ২০ হাজার বাড়ী ধ্বংস হয়েছে এবং এক লক্ষ গ্রামবাসী গৃহহীন হয়েছে।

## ইওরোপ

### ফরাসী নৌবহর

ফরাসী নৌবহর যাতে জার্ম্মাণী বা ইতালীর হাতে না পড়ে সে জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ২রা জুলাই কঠোর ও অতর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বৃটিশ বন্দরে যে ফরাসী যুদ্ধ জাহাজগুলি ছিল, সেগুলি বৃটিশ নৌ-সৈনিকেরা দখল করে। এই দখলের সময় সংঘর্ষে একজন ফরাসী অফিসার ও একজন বৃটিশ নাবিকের প্রাণহানি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী মরক্কোর ওরান বন্দরে যে নৌবহর ছিল, তার অধিনায়ককে বৃটিশ নৌবহরের কমাণ্ডার অল্প সময়ের নোটিসে বৃটিশ প্রস্তাব মেনে নিতে বলেন। কিন্তু ফরাসী অধিনায়ক তা মানতে রাজী না হওয়ায় বৃটিশ নৌবহর গোলা চালায়। প্রচণ্ড আক্রমণে ফরাসী নৌবহরের প্রায় সমস্ত জাহাজই ঘায়েল হয়; শুধু একটি ক্যাপিটালশিপ জখম অবস্থায় ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গত ৪ঠা জুলাই মিঃ চার্চ্চিল পার্লামেণ্টে এই সংঘর্ষের বিবরণ দেন। ওরানে একটা ফরাসী ব্যাটলশিপের উপর বৃটিশ বিমানবহর আবার বোমা বর্ষণ করে।

এই ঘটনার পর ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যে, বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের সম্মুখীন হলে ফরাসী জাহাজ হয় লড়াই করবে, নয় আত্মনিমজ্জন করবে। তাঁরা আরও আদেশ দিয়েছেন যে, বৃটিশ জাহাজ বা বিমান ফ্রান্সের সীমার ২০ মাইলের মধ্যে এলেই গোলা চালানো হবে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় ফরাসী নৌবহর ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং ফরাসী ইন্দো-চীনে ফরাসী নৌবহর পূর্ব্বের অবস্থাতেই অর্থাৎ বৃটেনের মিত্র হিসেবে থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সমস্ত জড়িয়ে যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বৃটেন ফরাসী নৌবাহিনীর অধিকাংশকে আয়ত্তে এনেছে। ফরাসী নৌবহর পুরোপুরি জার্ম্মাণী বা ইতালীর হাতে পড়লে যে বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হত, তাতে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে মিঃ চার্চ্চিল নাৎসী জার্ম্মাণীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অতি দুঃসাহসিক ও গুরুতর এক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাফল্য লাভ করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হয়।

### ফরাসী গবর্ণমেণ্ট

ফ্রান্সে সমগ্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বোর্দো থেকে ভিশিতে গেছেন; সেখানে শীগ্গিরই ফরাসী চেম্বার ও সেনেটের যুক্ত অধিবেশন হবে; সেই অধিবেশনে ফ্রান্সের নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হবে। যে -রকম আভাষ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ফ্রান্সে পূর্ণ ফাশিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাই স্থাপিত হবে; ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণরা নাকি মার্শাল পেতাঁকে ফরাসী 'ফুরার' বলে উল্লেখ করছে।

### রুমেনিয়ার রাজনীতি

নব্য ফাসিষ্টপন্থী রুমেনিয়া জার্ম্মাণীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল; কিন্তু জার্ম্মাণী তাতে রাজী হয়নি। অনেকের ধারণা সোভিয়েটের সঙ্গে পাছে বিরোধ হয় এই আশঙ্কায় জার্ম্মাণী ঐ সিদ্ধান্ত করেছে। আরো কারণ থাকতে পারে; হাঙ্গারী এখন জার্ম্মাণীর আশ্রিত; রুমেনিয়ার বিরুদ্ধে তার রাজ্য দাবী রয়েছে। হাঙ্গারী এখন ঐ ভূখণ্ড (ট্রান্সসিলভেনিয়া) ফেরৎ পাবার জন্যে হৈ চৈ করছে। এ দিকটা বিবেচনা করেও জার্ম্মাণী রুমেনিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

হাঙ্গামা করার জন্যে রুমেনিয়ান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বেসারেবিয়াগামী ২৫০ জন শ্রমিককে গুলী করে হত্যা করেছেন। রুমেনিয়ায় আবার গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন হয়ে ইহুদী-বিরোধী ও ফাসিষ্ট দলের লোকদের নিয়ে এক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে।

### জার্ম্মানী-সোভিয়েট-সুইডেন

জার্ম্মাণীর সঙ্গে সোভিয়েটের আর একটা বাণিজ্য-চুক্তি হয়েছে এবং জার্ম্মাণী ও সোভিয়েটের প্রধান প্রধান শহরে পরস্পরের কন্সালেট স্থাপিত হয়েছে।

সুইডেনের সঙ্গে জার্ম্মাণীর এক চুক্তি হয়েছে। তাতে সুইডেন জার্ম্মাণ সৈন্যদের নরওয়ে যাতায়াতের পথ দেবার ব্যবস্থা করেছে।

### নাৎসী-ফাসিষ্ট পরামর্শ

হের হিটলার পশ্চিম সীমান্ত থেকে বার্লিনে ফিরেছেন।

ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট চানো বার্লিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রকাশ, ইংলণ্ড আক্রমণ, বল্কান অঞ্চল এবং ভবিষ্যৎ সন্ধি-সর্ত্ত সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, কাউণ্ট চানো ও হের ফন রিবেন্ট্রপ একত্রে মস্কোতে যাবেন।

### মার্কিন সিদ্ধান্ত

মার্কিন গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মার্কিন সমর বিভাগের কোন সমরোপকরণ আর ইংলণ্ডকে দেওয়া হবে না।

### চীনের সংকল্প

চীন যুদ্ধের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করেছেন যে, জাপান যতদিন না চীনের ভূমি ছেড়ে চলে যাবে ততদিন চীন যুদ্ধ চালাবে। চীনে এতদিন যুদ্ধের ফলে জাপানের অবসাদের উল্লেখ করে চিয়াং কাই-শেক সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অব্যাহত সাহায্যের আবেদন জানান।

৮।৭।৪০ —ওয়াকিবহাল

---

# সাহিত্য-সংবাদ

### নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

হাওড়া জেলার ঝোড়হাট তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতার যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে আষাঢ়, রবিবার। প্রবন্ধের বিষয়—"পড়াশুনো ছাড়াও ছাত্রদের কর্ত্তব্য" (ফুলস্কেপ সাইজের ৪ পাতার মধ্যে)। চিত্রের বিষয়—"যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য" (পেন্সিল্ স্কেচ্ চলিবে)। কবিতার বিষয়—"যে কোন প্রগতিমূলক কবিতা" (২০ লাইনের বেশী নহে)। গল্পের বিষয়—"যে কোন প্রগতিমূলক গল্প" (ফুলস্কেপ সাইজের ৪ পাতার মধ্যে)। পুরস্কার—গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে দুইটি স্মৃতি পদক দেওয়া হইবে। চিত্রে ১ম পুরস্কার ১টি পদক। নিম্ন ঠিকানায় পাঠান। সম্পাদক তরুণ সঙ্ঘ (ঝোড়হাট), ৬।২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা।

### পাইকপাড়া লাইব্রেরী

**দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল:—**

পুরুষ বিভাগঃ—প্রথম—শ্রীশান্তিপদ মুখোপাধ্যায় (কোন্নগর)।

মহিলা বিভাগঃ—শ্রীমতী শান্তা দেবী (শিবপুর)

**রূপবাণীতে—'শুকতারা'**

**কাহিনী ও পরিচালনা**—নিরঞ্জন পাল, চিত্র-শিল্পী—বিদ্যাপতি ঘোষ, শব্দধর—জগদীশ বসু, সুরশিল্পী—দুর্গা সেন, সংলাপ ও সংগীত—শৈলেন রায় ও বিজয় গুপ্ত।

**প্রধান ভূমিকায়ঃ** কামাখ্যা—অহীন্দ্র চৌধুরী, সুধীন—শৈলেন পাল, মথুর—সন্তোষ সিংহ, গোবরা—বোকেন চট্টো, মিঃ চৌধুরী—জিতেন গাঙ্গুলী, ঘটক—ফণী রায়, অন্নপূর্ণা—চন্দ্রাবতী, শোভনা—প্রতিমা দাশগুপ্তা, আরতি—চিত্রা দেবী, সুলেখা—লাবণ্য দাস, মিসেস্ চৌধুরী —রমা ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি।

গত ৬ই জুলাই, শনিবার হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেড-এর সামাজিক চিত্রকাহিনী "শুকতারা" প্রদর্শিত হইতেছে। পরিচালক নিরঞ্জন পাল নিজেই এই চিত্রের কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং ছবিখানি যাহাতে সর্বসাধারণের ও সর্বশ্রেণীর রসপিপাসু দর্শকদের মনে আনন্দদান করিতে পারে, সেইদিকে পরিচালক মহাশয় সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে একটি মামুলী গল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় যে, এই গল্পে একটি মানবিক ও সর্বকালীন আবেদন আছে বলিয়াই তাহা মামুলী হইলেও মনকে সহজেই ব্যথা ও আনন্দে অভিভূত করিয়া ফেলে।

'শুকতারা' চিত্রের মূল বিষয়বস্তু হইতেছে পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা এবং এই মাতৃমূর্তিকে আশ্চর্য সুন্দর রূপ দিয়াছেন চন্দ্রাবতী। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করিয়াছেন, যৌবনউচ্ছলিতা যুবতী হইতে শোকজর্জরিতা বৃদ্ধারূপে—মাতৃমূর্তির এক মহিমময়ীরূপে। অন্নপূর্ণা চরিত্রটি চন্দ্রাবতীর একটি অপূর্ব সৃষ্টি—যাহা ছায়াচিত্র ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

চন্দ্রাবতীর স্বামীরূপে কামাখ্যা কবিরাজের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এক বৃদ্ধের মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা-বেদনার চিত্র যেভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, রঙ্গ-জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আজও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার অভিনয়ে নূতনত্ব যদিও খুব বেশি নাই, কারণ এই ধরণের অভিনয় আগেও অনেক চিত্রেই আমরা দেখিয়াছি, তথাপি দু-একটি স্থানে তাঁহার অভিনয় তাঁহাকে নূতনরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—একমাত্র পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার জন্য তিনি তাঁহার ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করিতেছেন,—মনে আশা আছে, ছেলে বিলাত হইতে আই-সি-এস পাশ করিয়া আসিলেই তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু ছেলে পাশ করিতে পারিল না, সে সংবাদ যখন তাঁহাকে দেওয়া হইল, তখন তাঁহার সকল আশা, সকল গর্ব, সকল আনন্দ চুরমার হইয়া গেল; স্ত্রীর কাছে এই দুঃসংবাদ কিরূপে জানাইবেন—এই দৃশ্যে অহীন্দ্রের অভিনয় অভিনয় বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রাণস্পর্শী কথা ও ব্যঞ্জনায় অহীন্দ্রকে যেন নূতনরূপে দেখিলাম। নায়কের ভূমিকায় শৈলেন পাল আমাদের নিরাশ করিয়াছেন। চন্দ্রাবতী ও অহীন্দ্রের প্রাণবন্ত অভিয়ের নিকট তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষভাবে শেষের দিকে কাহিনী যেখানে গভীর রসঘন ক্লাইম্যাক্সের দিকে মোড় ফিরিয়াছে, সেখানে তাঁহার অভিনয় ব্যর্থ হইয়াছে। নায়িকারূপে প্রতিমা দাশগুপ্তার শান্ত সংযত অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আরতির ভূমিকায় চিত্রা দেবীও অভিনয়ে উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। একটি সরলচিত্ত পল্লীবালিকার কোমল করুণ চরিত্রকে তিনি কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুযোগ্য পরিচালকের পরিচালনার গুণে এই দুইটি অভিনেত্রী তাঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। আরতির আত্মহত্যার দৃশ্যটিকে আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। অবশ্য আরতি চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিণতি আত্মহত্যার মধ্যেই তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু বাঙলাদেশের পল্লীসমাজের অত্যাচারে যে ট্রাজেডী নিত্যনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তাহারই পুনরাবৃত্তি অন্তত ছায়াচিত্রে করাটা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আত্মহত্যা করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা দুর্বল মনের পরিচায়ক। লেখক আরতিকে আত্মহত্যা না করাইয়া অন্য কোনোভাবে যদি কাহিনী হইতে সরাইয়া লইতেন, যেমন-ভাবে শোভনাকে তিনি সরাইয়া লইয়াছেন শেষের দিকে, তাহা হইলে দর্শকদের মন ততখানি অভিভূত হইয়া না পড়িলেও অসোয়াস্তি বোধ করিত না।

চৌধুরী দম্পতির ভূমিকায় জিতেন গাঙ্গুলী ও রমা ব্যানার্জি'র অভিনয় কাহিনীর লঘু রসের দিকটি সুন্দর-ভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু ফুল ও ময়দা লইয়া বিলাতী ঝি'র সহিত রসিকতার দৃশ্যটি নিতান্তই ছেলেমানুষী হইয়াছে।

অন্যান্য ভূমিকায় লাবণ্য দাশ, বোকেন চট্টো, ফণি রায় ও রেবা বসুর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের দৃশ্যটির মধ্যে কোন বিশেষত্ব পাইলাম না। কোনরূপ বিলাতী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহা মনের উপর কোন ছাপ রাখিতে পারে নাই। আলোকচিত্র গ্রহণ নিন্দণীয় নহে, হাত ভাল, কিন্তু শিল্পীমনের অভাব আছে। শব্দগ্রহণ ভালই হইয়াছে। গানগুলির রচনায় সুরের বৈচিত্র্য খুব বেশী নাই, তবে সুগীত হইয়াছে।

পরিশেষে একথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি যে, 'শুকতারা' দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি এবং বাঙলার অগণিত রসপিপাসুর চিত্তে যে এই ছবি আনন্দ দান করিবে, এ ধারণা করা কিছুমাত্র অসমীচীন নহে।

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের সকল উত্তেজনার অবসান হইল। "কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে", "কাহার বা সম্ভাবনা আছে"—এ সকল চিন্তা লইয়া ক্রীড়ামোদীগণকে উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতে হইবে না। মহমেডান স্পোর্টিং দল যে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বর্ত্তমানে কোনই কারণ রহিল না। লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়া এতদিন মোহনবাগান দল সমর্থনকারীদের মনে চ্যাম্পিয়ানসিপের যে স্বপ্নলোক রচনা করিয়াছিল তাহাও বিদূরিত হইয়াছে। মোহনবাগান দল লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মহমেডান স্পোর্টিং দল অপেক্ষা তিন পয়েন্ট পশ্চাতে পড়িয়াছে। এই দুইটি দলের যে তিনটি করিয়া খেলা বাকী আছে তাহার ফলাফল এই দুইটী দলের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মোহনবাগান ক্লাব অবশিষ্ট তিনটি খেলায় বিজয়ী হইলেও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব অবশিষ্ট দুইটি খেলায় যে বিজয়ী হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং একটি খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দল পরাজিত হইলেও মোহনবাগান অপেক্ষা এক পয়েন্ট অগ্রগামী থাকিয়া চ্যাম্পিয়ান হইবেই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পর পর পাঁচ বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা অক্ষুন্ন রহিল। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব দল গত বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া এই বৎসর সেই সম্মান রক্ষা করিতে পারিল না। খেলোয়াড়গণের দৃঢ়তার অভাবই মোহনবাগান দলের এই শোচনীয় পরিণামের কারণ। চ্যাম্পিয়ান দল হিসাবে এই দলের খেলোয়াড়গণের প্রত্যেক খেলায় যেরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করা উচিত ছিল, দুই তিনটি খেলা ছাড়া, অপর সকল খেলাতে সেইরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণের সম্বন্ধে সেইরূপ উক্তি করা চলে না। তাঁহারা প্রতিযোগিতার সূচনা হইতেই আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক খেলায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব হইল।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। এই অবস্থা হইতে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল যে উন্নতি করিবে তাহার সম্ভাবনাও খুবই কম। ক্যালকাটা দলের অবস্থাও ইহাদের অপেক্ষা বিশেষ ভাল নয় এই যা ভরসা। এই দুইটি দলের মধ্যে একটিকে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইতে হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।

### দ্বিতীয় ডিভিসন

দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলায় অরোরা দল এতদিন লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং ইহাতে সকলের আশা হইয়াছিল যে, অরোরা দল এই ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হইয়া আগামী বৎসরে প্রথম ডিভিসনে খেলিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইতেছে। ডালহৌসী দল তালিকার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অরোরা তৃতীয় স্থানে নামিয়া গিয়াছে। কুমারটুলী দলও অরোরার সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করিয়া চতুর্থ স্থানে উঠিয়াছে। এই চারিটী দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কোন দল যে চ্যাম্পিয়ান হইবে পুনরায় বলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অরোরা দল সহজে যে চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিবে না ইহা জোর করিয়াই বর্ত্তমানে বলা চলে।

### তৃতীয় ডিভিসন

তৃতীয় ডিভিসনে ট্রপিক্যাল স্কুল দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সালখিয়া ফ্রেন্ডস দল তালিকার দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করিলেও এই দলের সহিত শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

### চতুর্থ ডিভিসন

চতুর্থ ডিভিসনের খেলায় জোড়াবাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা নষ্ট হয় নাই। তবে রবার্ট হাডসন দল যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে জোড়াবাগান দল শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে বিভিন্ন ডিভিসনের ফলাফলের প্রদত্ত হইল :—

**প্রথম ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **মহমেডান স্পোর্টিং** | ২১ | ১৪ | ৬ | ১ | ৩৫ | ৭ | ৩৪ |
| **মোহনবাগান** | ২১ | ১৪ | ৩ | ৪ | ২২ | ১০ | ৩১ |
| **ইষ্টবেঙ্গল** | ২১ | ১০ | ৯ | ২ | ২১ | ১০ | ২৯ |
| **রেঞ্জার্স** | ২২ | ১১ | ৬ | ৫ | ৩৩ | ১৯ | ২৮ |
| **কালীঘাট** | ২২ | ৯ | ৭ | ৬ | ২৮ | ২২ | ২৫ |
| ই বি আর | ২২ | ৬ | ৯ | ৭ | ২২ | ২৪ | ২১ |
| **বর্ডার রেজিমেণ্ট** | ২২ | ৭ | ৫ | ১০ | ২০ | ২৫ | ১৯ |
| **এরিয়ান্স** | ২১ | ৬ | ৬ | ৯ | ২৩ | ২৫ | ১৮ |
| **পুলিশ** | ২২ | ৬ | ৫ | ১১ | ২৫ | ৩০ | ১৭ |
| **কাষ্টমস** | ২১ | ৪ | ৮ | ৯ | ১২ | ২০ | ১৬ |
| **ভবানীপুর** | ২২ | ৬ | ৪ | ১২ | ১২ | ২৪ | ১৬ |
| **ক্যালকাটা** | ২২ | ৩ | ৭ | ১২ | ১৬ | ৩০ | ১৩ |
| **স্পোর্টিং ইউনিয়ন** | ২১ | ৪ | ৫ | ১২ | ১২ | ৩১ | ১৩ |

**দ্বিতীয় ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ডালহৌসী** | ২০ | ১১ | ৭ | ২ | ৪০ | ১৭ | ২৯ |
| **জর্জ্জ টেলিগ্রাফ** | ২০ | ৮ | ১১ | ১ | ২১ | ১০ | ২৭ |
| **অরোরা** | ১৮ | ১০ | ৬ | ২ | ২২ | ৯ | ২৬ |
| **কুমারটুলী** | ২০ | ৯ | ৮ | ৩ | ২৯ | ১৬ | ২৬ |

**তৃতীয় ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ট্রপিক্যাল স্কুল** | ১৩ | ১১ | ২ | ০ | ২৪ | ৪ | ২৪ |
| **সালখিয়া ফ্রেন্ডস** | ১২ | ৮ | ৩ | ১ | ২৭ | ৪ | ১৯ |
| **বেনিয়াটোলা** | ১৩ | ৮ | ২ | ৩ | ২০ | ১৩ | ১৮ |

**চতুর্থ ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **জোড়াবাগান** | ১৪ | ১১ | ১ | ২ | ২৫ | ৫ | ২৩ |
| **রবার্ট হাডসন** | ১১ | ১০ | ১ | ০ | ৪৪ | ৩ | ২১ |

### ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলা

বাঙলা দেশে সম্প্রতি ছোট ছেলেদের মধ্যে ফুটবল খেলার উৎসাহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর গ্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত ছোট ছেলেদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বড়দের ন্যায় ছোট

ছেলেদের দলসমূহও বাঙলার এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে গিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানে বড়দের অপেক্ষা দর্শক সমাগম কোন অংশে কম হয় না। ছোট ছেলেদের মধ্যে এইরূপ ফুটবল খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়া বাঙলার অনেক শহরের ফুটবল পরিচালকগণ ছোটদের প্রতিযোগিতাসমূহ যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য এসোসিয়েশন বা ফেডারেশন গঠন করিয়াছেন। এই সকল ফেডারেশন বা এসোসিয়েশন বড়দের ন্যায় ছোটদের দলসমূহের মধ্যে দল রেজিষ্ট্রিকরণ, খেলোয়াড়দের ছাড়পত্র গ্রহণ, রেফারী বোর্ড গঠন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বড়দের ফুটবল খেলার অনুরূপ সকল ব্যবস্থাই ছোটদের জন্য হইয়াছে। ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলার এই উৎসাহ বৃদ্ধি ও পরিচালনার ব্যবস্থা সাধারণ ক্রীড়ামোদীকে যতই আনন্দ ও উৎসাহ দান করুক না কেন আমাদের বিশেষ-ভাবে চিন্তিত করিয়াছে। ছোটদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করিয়াই আমাদের চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ফুটবল খেলা খুব পরিশ্রমসাধ্য খেলা। এই খেলার জন্য বিশেষ দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয় তাঁহারা ফুটবল খেলায় উন্নতি করিতে বা অধিক দিন খেলিতে পারেন না। এইজন্যই বাঙালী ফুটবল খেলাকে জাতীয় খেলায় পরিণত করিয়াও বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যবান পাঞ্জাবী ও পেশোয়ারী খেলোয়াড়দের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বাঙলার ফুটবল মাঠে স্বাস্থ্যবান অ-বাঙালী খেলোয়াড়দের প্রাধান্য দান করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বাল্যকাল স্বাস্থ্যলাভের প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে নিয়মিত-ভাবে ব্যায়াম করিয়া যেরূপ অল্পসময়ে অটুট স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, যৌবনে বা প্রাপ্তবয়সে তাহা সম্ভব হয় না। অথচ এই সময়ে স্বাস্থ্যলাভের কথা ভুলিয়া বাঙলার ছোট ছোট ছেলেরা কঠিন শ্রমসাধ্য ব্যায়াম ফুটবল খেলায় মত্ত হইতেছে। যাঁহারা এই ছোট ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলায় উৎসাহ দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, "ছোট বেলা থেকে না খেল্‌লে উন্নতি কর্ব্বে কি করে, খেল্‌তে খেল্‌তেই শক্ত হবে।" ইঁহাদের উক্তির প্রথমাংশ মানিয়া লইলেও শেষাংশ শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তাঁহাদের হাস্যোদ্রেকের কারণ হইবে। কারণ তাঁহারা জানেন, ছোটবেলায় কঠিন শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা অর্থে স্বাস্থ্যোন্নতির ভগবানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার গতিরোধ করা হয়। উন্নতির পথে যদি বাধা সৃষ্টিই করা হইল, তবে উন্নতি হইবে কি করিয়া? যাহা হউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সাধারণের বুঝিতে বাকী নাই যে, ছোট বেলায় অতিরিক্ত ফুটবল খেলায় স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা আছে। ফুটবল খেলায় যোগদান করিলেই ছোট ছেলেদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবে এই ধারণা যাহাতে কেহ না করেন এই জন্য 'অতিরিক্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হইল। পরিমিত ফুটবল খেলায় স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা স্বাস্থ্য-লাভের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে সকল ব্যায়াম ব্যবস্থা আছে তাহা যাহাতে অনুসরণ করে তাহার দিকে পরিচালকগণকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রতিযোগিতার সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে অথবা প্রতি সপ্তাহে দুইটির বেশী প্রতিযোগিতায় যোগদান না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই ফুটবল খেলার যে বিষময় ফলাফলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রোধ করিতে পারা যাইবে। ইংল্যাণ্ড—যে দেশ হইতে আমরা ফুটবল খেলা গ্রহণ করিয়াছি সেখানে ছোটদের ফুটবল খেলা কিরূপভাবে পরিচালনা করা হয় অনুসন্ধান করিলেই আমাদের উক্তির অনেক কিছুই জানিতে পারা যাইবে।

# পুস্তক পরিচয়

**আমার ধর্ম্ম:**—শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ, ৭৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার আনা, উত্তম সং ছয় আনা।

বইখানি প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। সুকুমারমতি বালকবালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষা দানই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে নিত্যকর্ম্ম, ধর্ম্মের স্বরূপ হইতে সুরু করিয়া আত্মার অমরত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। নীরস ধর্ম্মালোচনা, ভাষা ছোটদের উপযোগী সরল হইলে ভাল হইত।

**কে বলে স্ত্রী-শূদ্রের বেদে ও বেদমন্ত্রে অধিকার নাই?**—শ্রীভোলা-নাথ প্রামাণিক, বাণীকণ্ঠ প্রণীত। মূল্য দুই আনা। বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত।

স্ত্রী ও শূদ্রেরও যে বেদমন্ত্রে অধিকার আছে, গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি-বিচার দৃঢ়। প্রয়োগ-কৌশলে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

**শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী**—শ্রীল কবি কর্ণপূর গোস্বামীপাদ বিরচিত। শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২, দুই টাকা।

বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে কবি কর্ণপূরের লেখার পরিচয় প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন নামান্তরে কবি কর্ণপূর—'শ্রীচৈতন্যপাদার্পিত বাগ্‌বিভূতি' আখ্যায় বৈষ্ণব সমাজে বন্দিত হইয়া আসিতেছেন। কবি কর্ণপূরের 'শ্রীআনন্দ চম্পূ', 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক', 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', 'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য' বৈষ্ণব সমাজের আদরের বস্তু। বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রগাঢ় পারদর্শী শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস মহাশয়ের প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের তিনি মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের লেখার রস-মাধুর্য্যের পরিচয় যাঁহারা পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পদলালিত্য, অলঙ্করণের উৎকর্ষ, ভাবের বিগাঢ়তা, সাধনার অন্তর্নিহিত গূঢ় অনুভূতির আলোকে কবি কর্ণপূরের লেখনী উদ্দীপ্ত। এই গ্রন্থের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে ইহার মাধুর্য্য উপভোগ করান কঠিন, তাঁহারা নিজেরা এই গ্রন্থ পড়ুন, তবেই প্রতি পদে ইহার আস্বাদন পাইবেন। টীকা অতি সুন্দর এবং প্রাঞ্জল। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, বাঙলা অনুবাদ এত সুন্দর হইয়াছে যে, সেই অনুবাদের সাহায্যেই তাঁহারা মূলের রস আস্বাদ করিতে পারিবেন। প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সে শ্রম সার্থক হইয়াছে। বাঙলার রসিক ভক্তসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ সুন্দর। ভক্ত জনসমাজে এমন গ্রন্থের যে বহুল প্রচার হইবে—একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যাইতে পারে।

**শতাব্দীর স্বপ্ন**—শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত। র‍্যাডিক্যাল ইনস্টিটিউট, গৌহাটি। মূল্য আট আনা।

কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলিতে social protest-এর ভাব প্রকাশের চেষ্টা আছে; কিন্তু সবগুলিতে নয়। 'একটি স্পেন দেশীয় গল্প'টির নাম পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়; কারণ প্রকাশক বলিয়াছেন, গল্পগুলির কোনওটিই অনুবাদ বা ছায়াবলম্বিত নহে। 'একটি স্পেন দেশীয় গল্প' ও 'সৈনিক' যুদ্ধের বাজারে পাঠকদের ভাল লাগিবে। বইটিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি বড্ড চোখে পড়ে। মুসলমান 'নবী'কে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিতে সম্বোধনে 'নবি' হইতে দেখিয়া দুঃখ বোধ করিয়াছি। মলাটে প্রকাশক বলিয়াছেন, 'আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে "শতাব্দীর স্বপ্ন" যুগান্তর আনয়ন করিবে'। বই-এ প্রকাশকের প্রশংসাপত্র জুড়িয়া দিলে বই-এর গুরুত্বনাশ ও অমর্য্যাদাই হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**৩ জুলাই।—**

বেলা দুই ঘটিকা হইতে দিল্লীতে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর যে কথাবার্তা হইয়াছে, মহাত্মাজী কমিটির নিকট তাহার বিবরণ দিয়াছেন। শুনা যায়, তাহাতে নূতন কিছুই নাই।

ভারতরক্ষা আইন—উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এ ছাড়া কলিকাতা, হাওড়া, কালিকট প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে ধরপাকড় ইত্যাদি হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি' নামক ভাষণে বাঙ্গলার দলাদলিকে উদ্দেশ করিয়া যে কয়েকটি বিরুদ্ধ-বান প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার কয়েকটি সংবাদপত্র তাহা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে এক বিবৃতি দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, এইরূপ মিথ্যাপ্রচার 'আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি-বিশেষকে এরকম গঞ্জনা দেওয়া আমার স্বভাবসংগত নয়'! পরিশেষে আশা ও দাবি জানাইয়া বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র 'দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার অনৈক্য গহ্বরের উপর সেতু বন্ধন করবেন......। চারিদিকের দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।'

অপরাহ্ণে সিরাজ স্মৃতিদিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির চারজন স্বেচ্ছাসেবক হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণে উদ্যত হইতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে।

**৪ জুলাই।—**

দিল্লিতে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন এখনও চলিতেছে।

ভারতরক্ষা আইন।—'যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, তাহার শুনানি শেষ হইয়াছে। রায় দান স্থগিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে পুনরায় খানাতল্লাশ হইয়াছে।

'প্রত্যেক ব্রিটেনের প্রতি' শিরনামা দিয়া মাহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বলিয়াছেন, নাৎসীবাদের ধ্বংসের জন্য তিনি ব্রিটনদের নিকট অহিংস অসহযোগ রূপ মহত্তর ও বীরত্বপূর্ণ পন্থা উপস্থিত করিতেছেন। পাশব শক্তির চেয়ে ইহা বহুগুণ শক্তিশালী। বলিয়াছেন, 'আপনারা হিটলার ও মুসোলিনীকে ডাকিয়া আপনাদের অধিকারগত দেশগুলি যথেচ্ছ গ্রহণ করিতে দিন। আপনাদের সুরম্য প্রাসাদ সহিত আপনাদের সুন্দর দ্বীপটিও দখল করিতে দিন। ভদ্রলোকদ্বয় যদি চান তো আপনাদের আবাসবাটীও খালি করিয়া দিবেন, কিন্তু আপনার আত্মা ও মন তাঁহাদিগকে দিবেন না। তাঁহারা যদি নির্বিঘ্নে আপনাকে গৃহত্যাগ করিতে না দেন, তো আপনারা স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে নিহত হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করিবেন না।'

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের চেষ্টা করিতে গিয়া আজ বারজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

**৫ জুলাই।—**

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি গান্ধী-লাট সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পনের ঘণ্টা আলোচনা করিয়া এখনও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

আজ কলিকাতা ও শহরতলীতে ব্যাপকভাবে সুভাষ দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সর্বত্র হরতাল হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এবং শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের সভাপতিত্বে দেশপ্রিয় পার্কে বিরাট জনসভায় তাঁহার সত্বর মুক্তির দাবী গৃহীত হইয়াছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও কর্ণওআলিস স্কোয়ারে ছাত্রদের সভায় সুভাষ-চন্দ্রের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও মুক্তির দাবির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলাদেরও শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

নোয়াখালির কাচিয়াখালির ও কাঁদিরঘাটের মধ্যে কোথাও তিন শত যাত্রী সহ এক নৌকা মেঘনায় ডুবিয়া গিয়াছে।

অদ্য বৈকালে সিমলায় লাট-সাভারকর সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে।

**৬ই জুলাই—**

হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহে তিন দলে আজ বারজন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। চার দিনে আজ ৩৯জন গ্রেপ্তার হইলেন। নিউদিল্লির সংবাদ, মিঃ ফজলুল হক বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহ অবিলম্বে স্থগিত না হইলে ওই বিষয়ে তাঁহার গভর্ণ-মেণ্ট আদৌ বিচার করিবেন না।

ভারতরক্ষা আইন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরওআর্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী ও অন্যান্য কয়েকজনের উপর নিষেধ জারি হইয়াছে। এ ছাড়া পুনা, চট্টগ্রাম, করাচি, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে ধরপাকড় ইত্যাদি হইয়াছে।

**৭ জুলাই—**

আজ বৈকালে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। প্রধানতঃ এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গ্রেট ব্রিটেন অবিলম্বে সুস্পষ্ট ভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করুক। এবং উহার প্রথম ধারা স্বরূপ সাময়িক ভাবে এমন একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত করুক যাহা কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের আস্থাভাজন ও দায়িত্বশীল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়।

নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলবার্ট হলে আজ মহতী জনসভার অধিবেশন হইয়াছে।

সীমান্তে উপজাতীয় দস্যুদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত রাত্রে পুলিসের সহিত এক বিখ্যাত দস্যুদলের সংগ্রাম হয়। দস্যুদলের একজন এবং পুলিসদের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ও একজন কনস্টেবল নিহত হইয়াছে।

উড়িষ্যার বালেশ্বরে প্রবল বন্যার ফলে প্রায় এক লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে।

**৮ জুলাই—**

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র দেব গ্রেপ্তার হওয়ায় অস্থায়ী সভাপতির পদে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

'দেশ' ও 'দুনিয়া' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের ছিল, আজ তাহার রায় বাহির হইয়াছে। উভয় পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের আজ ষষ্ঠ দিবস। আর চার দলে ১৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ১০ জন শিখ ও ১ জন মুসলমান ছিল।

ঢাকা, লখনৌ ও লাহোরের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

৭ম বর্ষ ] শনিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 20th July, 1940. [ ৩৬শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি—**

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এই মন্ত্রে একদিন ফরাসী জাতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ১৫১ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আভিজাত্য এবং স্বৈরাচারের অন্ধ কারাকক্ষ বিচূর্ণ করিয়া সেদিন মহামানবতার একটা প্রচন্ড উচ্ছ্বাস ফরাসী জাতির মর্ম্মদেশ মন্থন করিয়া উঠে এবং সেই উচ্ছ্বাস সমগ্র মানব-সভ্যতায় এক সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করে। স্বাধীনতা—মানুষের স্বাধীনতা, মনীষী রুশোর এই মহামন্ত্র প্রলয় অনলে সেদিন যে নব সৃষ্টির উদ্বোধন করিয়াছিল, সেই সৃষ্টির ভাঙ্গাগড়ার খেলা জগত বহুদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছে। গত ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি উৎসব গিয়াছে। কিন্তু ফরাসী জাতি আজ জার্ম্মানীর পদানত, ফরাসী দেশের শাসক সম্প্রদায় জার্ম্মানীর প্রেরণায় স্বৈরতন্ত্রকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৪ই জুলাইয়ের এই তারিখে ফ্রান্সের জাগ্রত গণশক্তি প্রাচীন স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক ব্যাষ্টিলের কারাগার যখন ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন রাজা তাঁহার একজন মন্ত্রীকে জিজ্ঞসা করেন,—তা হলে এটা বিদ্রোহ, মন্ত্রী উত্তরে বলেন,—না হুজুর বিপ্লব। সেদিন অঘটন ঘটিয়াছিল। নির্য্যাতিত ফ্রান্সে আবার কতদিনে সে অঘটন ঘটিবে কে জানে? তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, পশুশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, মানবতার শক্তিকে সে পিষ্ট করিতে পারে না। ফ্রান্সও আবার জাগিবে, আদর্শনিষ্ঠ আত্মদাতা বীরবৃন্দের শোণিত কোন দিন বৃথা যায় নাই, ফ্রান্সেও তাহা যাইবে না। ফ্রান্সের বীর এবং সাধক সন্তানগণ মরণকে বরণ করিয়া ফরাসী জাতিকে যে মহাশক্তি দান করিয়া গিয়াছেন, সে শক্তি পশুবলে নির্জ্জিত হইবার নহে। ফরাসীর এই পরাভব মানবতার মহাজাগরণকেই সুনিশ্চিত করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতিতে আমরা এই আশা পোষণ করিতেছি।

**অতীত ও বর্ত্তমান—**

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—ফরাসী বিপ্লবের বাণী ছিল ইহাই। মার্শাল পেতাঁ ফ্রান্সের একনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ বাণীকে ঘুরাইয়া দিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—কর্ম্ম, পরিবার এবং জন্মভূমি—ফরাসী জাতির নূতন বাণী হইবে ইহাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পেতাঁ তাঁহার এই ত্রয়ী বা ত্রিতত্ত্ব বর্ত্তমান গুরু নাৎসীদের নিকট হইতে পাইয়াছেন। 'সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা'র মধ্যে মহামানবতার যে আদর্শ ছিল, পেতাঁ তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন, আদর্শকে তিনি মলিন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পেতাঁর ত্রিতত্ত্বের মধ্যে জগৎ মহামানবতার উদ্দীপনা অনুভব করিবে না। কর্ম্মের মধ্যে, পরিবার প্রতিপালন বা পরিপোষণের মধ্যে, জন্মভূমির সেবার মধ্যে মহৎ আদর্শ না আছে এমন কথা বলি না, কিন্তু সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিপন্থিতাকে প্রস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে যখন ঐগুলির উপর জোর দেওয়া হয়, তখন সংকীর্ণতাই আসিয়া পড়ে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে তাহাই। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ যেখানে, কর্ম্ম, গোষ্ঠী এবং জন্মভূমির সেবাকে নিয়ন্ত্রিত করে, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হয় সেখানে এবং ফরাসী জাতি মনুষ্যত্বের সেই মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়াই মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া মানুষ যেখানে কর্ম্ম করে, সেখানে কর্ম্ম হয় পশুত্ব, পরিবার প্রতিপালন গিয়া দাঁড়ায় ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় এবং জন্মভূমির সেবা

পরিণত হয় ভীরুর সুবিধাবাদমূলক রাজনীতিতে। ফরাসী জাতি এই ত্রিবর্গের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কবে আবার বীরের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, কে জানে? পরাধীন ভারতের পক্ষে ফরাসীর এই বিপর্য্যয় বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক।

**জাপানের মতিগতি—**

জাপানে য়োনাই মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। যতদূর জানা যাইতেছে, সমর বিভাগের সহিত মতভেদের ফলেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। জাপানের সমর বিভাগ বরাবরই সাম্রাজ্যবাদমূলক আক্রমণাত্মক নীতির পক্ষপাতী এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এই দলের এখনও জোর রহিয়াছে। যখন এই দলের মতে কোন মন্ত্রিসভা উপযুক্ত আক্রমণাত্মক নীতির সমর্থক বিবেচিত না হন, তখনই তাঁহাদের পতন খাড়া থাকে। জাপানের নূতন গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদমূলক আক্রমণাত্মক নীতির অধিকতর সমর্থক হইবেন এমনই মনে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জাপানকে তুষ্ট করিবার নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। ইহার ফলে ব্রহ্মের পথ সাময়িকভাবে চীনের পক্ষে রুদ্ধ করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইংরেজের এই নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"ইংলণ্ডের এইরূপ কার্য্যের ফল সুদূরপ্রসারী হইবে এবং আমেরিকা ও ভারতের জনসাধারণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবে। আক্রমণকারীকে তুষ্ট করিবার নীতি গ্রহণ করায় অতীতে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এক্ষেত্রেও কার্য্যোদ্ধার হইবে না।" জাপানের এই দাবী মিটাইলেই যে সমস্যার সমাধান হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। ইহার ফলে তাহার লোভ এবং লালসাই বৃদ্ধি পাইবে। মিউনিকের চুক্তির ফল যেমন অনিষ্টকর হইয়াছিল, পূর্ব্ব এশিয়ায় মিউনিকের নীতির পুনরভিনয়ও সেই মারাত্মক ভ্রমের পথেই লইয়া যাইবে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

**ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র—**

যুদ্ধের দরুণ যে সকল ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন ক্ষান্ত করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা যাহাতে সেই স্তরেই শিক্ষালাভ করিতে পারে, তজ্জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, কলিকাতা, ঢাকা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। এই কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ছাত্রগণ শিক্ষার যে স্তর হইতে ছাড়িয়া আসিবে, এখানে ফিরিয়া এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেই স্তরেই ভর্ত্তি হইতে পারিবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও অবিলম্বে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যুদ্ধের দরুণ স্থানান্তর হওয়ায় ছাত্রদিগের ঠিকানা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় হাই কমিশনার মহাশয় এই অনিশ্চয়তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রগণ যে যেখানেই স্থানান্তরিত হউক, হাই কমিশনারের অফিসের শিক্ষা বিভাগে তাহাদের ঠিকানা রাখা হইবে। সুতরাং উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন হাই কমিশনারের মারফতেও খবরাখবর করিতে পারিবেন।

**কাঁচা টাকার সমস্যা—**

যুদ্ধের সূচনা হইতে কাঁচা টাকা জমানোর দিকে এক শ্রেণীর পুঁজিবাদীর মধ্যে ঝোঁক বাড়িয়া গিয়াছে। গত মে মাসের শেষের দিক হইতে ইহা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ৪৩ কোটি টাকার অধিক মুদ্রা এইভাবে রৌপ্য সঞ্চয়ের ফলে আটক পড়িয়াছে। ইহার ফলে বাজারে নোটের ভাঙ্গানী দুর্ল্লভ হইয়াছে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে, এই সমস্যা মিটাইবার জন্য ১ টাকা ও ২।৷০ টাকার নোট বাহির করা হইবে; তারপরে শুনা যাইতেছে যে, ঐ রকম নোট দুই তিন সপ্তাহের অধিককাল থাকে না। নূতন নোট মুদ্রণ করিতে হয়, ইহাতে খরচ অধিক পড়ে। কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন,—দশ কোটি নোট প্রচলনের জন্য যে বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন, তাহা বর্ত্তমানে ভারতে একরূপ অসম্ভব। কারণ ইহার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ মিলিবে কি না ও উহা ছাপাইবার উপযোগী যন্ত্রপাতিও বর্ত্তমানে ভারতে মিলিবে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। এ সব অসুবিধা বুঝা যায়; কিন্তু নোটের ভাঙ্গানীও সাধারণ লোকের পাওয়া দরকার, নহিলে কাজ কর্ম্ম অচল হইয়া পড়িবে। যাহারা টাকা জমাইতেছে, তাহারা অকারণ ভয়ে পড়িয়া স্বার্থের দায়ে এই কাজ করিতেছে। জনসাধারণের বুঝা উচিত যে, ঐ রকম ভয়ের আদৌ কোন কারণ নাই এবং নিজের স্বার্থের দায়ে টাকা জমাইতে গেলে সমাজের ক্ষতি করা হয়। দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের স্বার্থের বিষয়ে যাহারা এইভাবে টাকা জমাইতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা যে বিশেষ অযৌক্তিক হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে একটা বিশ্বস্তির ভাব দৃঢ় থাকে, কর্ত্তৃপক্ষের তাহা করা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োজন আতঙ্ক দূর করিয়া সেই বিশ্বস্তির ভাব আনয়ন করিবার জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এই মূল নীতিকে বিস্মৃত হইতেছেন। শান্তিরক্ষার আগ্রহাতিশয্যে পড়িয়া তাঁহারা যেভাবে আইন প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিতেছে। তাঁহাদের এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এই সব ব্যাপারে জননায়কদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন।

**জিন্নার স্বরূপ—**

সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে মোশ্লেম লীগের অভিমত জানাইবার জন্য জিন্না সাহেবের নিকট তার করেন। জিন্না সাহেব এই তারের উত্তরে নিতান্ত অবান্তরভাবে যে

উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে চূড়ান্ত অভদ্রতা এবং অসৌজন্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ভদ্রলোক অপর একজন ভদ্রলোকের প্রতি ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। অভদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, মধ্যযুগীয় অন্ধতা এবং ঔদ্ধত্য জিন্না সাহেবের এই কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া তাঁহার মনের কোণ হইতে এই সব সদ্‌গুণ একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জিন্না সাহেব মৌলানাকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি হিন্দু নেতাদের হাতের পুতুল হইয়া চলিতেছেন। প্রমাণ কি? প্রমাণ তো এই যে, কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চায়, মৌলানা সাহেব তাহার নিয়ন্তা! আর জিন্না সাহেব কাহাদের হাতের পুতুল হইয়া চলিতেছেন, তাহা কি তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না? তিনি কার্য্যত ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা সকল রকমে করিতেছেন এবং তাহার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলস্বরূপেই চলিতেছেন। তাঁহার বয়স বাহাত্তর পার হইয়াছে কি না জানি না। তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করিতেন, আপত্তির কিছুই ছিল না; কারণ সব দেশেই সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃহত্তর স্বার্থের হানি করে, এমন লোক থাকে। কিন্তু জিন্না সাহেব ভারতের মুসলমান সমাজের স্বয়ংসিদ্ধ নেতা সাজিয়া এ কাজটা করিতেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সুবিধার জন্য নানা কৌশলে তাঁহার নেতৃত্ব-মহিমা ফলাইয়া তুলিতেছে। জগতের লোকে দেখিতেছে, ভারতের মুসলমানেরা স্বাধীনতা চাহে না, তাহারা মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধতার মধ্যে আজও পড়িয়া রহিয়াছে। তুরস্ক, মিশর, পারস্যের অনেক পিছনে তাহারা। জিন্না সাহেব কি বুঝিতেছেন না, এইভাবে ভারতের মুসলমান সমাজকে তিনি জগতের কাছে অপমানিতই করিতেছেন? সে কথা তিনি বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, তাঁহার নেতৃত্বের প্রভাব যে ক্রমেই খর্ব্ব হইতেছে, তাহা তিনি বেশই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মৌলানা আজাদের উপর আক্রমণের ভিতর দিয়া মাত্রাহীন অসৌজন্যে তাঁহার মনের যে তিক্ততার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সেই উপলব্ধি। হামবড়াইয়ের উপর আঘাত পড়াতেই এই চিত্তজ্বালা।

---

**মাইকেলের স্মৃতি—**

অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খিদিরপুরে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, কলিকাতা কর্পোরেশন সেই বাড়ীর সংস্কার করিয়া বর্ত্তমানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের নাম 'মাইকেল মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়' রাখা উচিত। শ্রীযুত ঘোষ বলেন যে, অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হয়, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার কথা। আমরা ঘোষের এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মধুসূদনের মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া বাঙলা দেশের অন্যতম মহাকবি লিখিয়াছিলেন,—"হা অদৃষ্ট কবিবর, এই কি আছিল তোমার কপালে হায় শুনে বুক ফেটে যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ!' আমরা আশা করি, কলিকাতা কর্পোরেশন ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়টি যাহাতে মহাকবির স্মৃতিরক্ষার উপযোগীভাবে পরিচালিত হয়, তৎপ্রতিও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন। বাঙলা দেশের রাজধানী কলিকাতা নানা কারণে বাঙলা দেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ছাপ হারাইতে বসিয়াছে। বাঙলা দেশের সংস্কৃতিতে মাইকেলের অবদানের তুলনা নাই, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার এই ব্যবস্থা কলিকাতা শহরে বাঙলার সংস্কৃতির দীপ্তি সঞ্চার করিবে।

---

**কথা ও কাজ—**

ব্রহ্মদেশের পথে চীনে যাহাতে অস্ত্রশস্ত্র, সমরোপকরণ না যাইতে পারে, সেজন্য জাপানীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করিয়াছিল, জাপানী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিলাতী খবরে এ সম্বন্ধে একটু কারচুপি খাটাইয়া বলা হইয়াছে যে, তিন মাসের জন্য সাময়িকভাবে ব্রহ্মদেশের পথ বন্ধ করা হইতে পারে, ঐ তিন মাস পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। এ জগতে সকলেই শক্তের ভক্ত। জাপানীদের অন্য শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, মুসোলিনীর চেলাগিরি ফলাইয়া তাহারা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এই অবসরে রাজনীতিক ভক্তি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সের পতনের পর ইন্দো-চীনের ভিতর দিয়া চীনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। ইন্দো-চীনের ফরাসী শাসনকর্ত্তা পেতাঁ গবর্ণমেণ্টকে মানেন নাই; কিন্তু জাপানীদের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। আদর্শে এবং কাজে এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পাওয়া অসম্ভব; তেমনই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সম্পর্কিত নীতিতেও আদর্শ ও কাজে সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে না।

---

**ভারত কি চায়—**

শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনে সম্প্রতি বড়লাটের নিকট একখানা খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন,—ভারতবাসীরা যদি নিশ্চতভাবে বুঝিতে পারে যে, শুধু পরহিতৈষণার প্রেরণা—যেমন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বা তেমন কিছুর জন্য তাহারা লড়াই করিতেছে না, নিজেদের দেশের স্বাধীনতার পবিত্র কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতেছে তাহা হইলে ভারতের লক্ষ লক্ষ সন্তান আগাইয়া আসিবে এবং যুদ্ধের সাফল্যের জন্য মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবে। ভারতের যুবকেরা যদি স্পষ্টভাবে ইহা বুঝিতে পারে, তাহা

হইলে কেমন দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করিতে হয়, তাহা তাহারা দেখাইতে জানে। মহাত্মা গান্ধীর সত্য, অহিংসা এবং বিশ্ব-প্রেম কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের যুগ এখনও আসে নাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া সম্প্রতি তিনি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা কালোচিত হয় নাই।' শ্রীযুত আনে যে কথা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও এতদিনে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। হিংসা বা অহিংসার তত্ত্বার্থ প্রকাশ ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে প্রথম প্রয়োজন নয়, প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতার। ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তবে শুধু তেমন ক্ষেত্রেই জগতের কাছে তাহার কথার মূল্য থাকিবে, এখন ভারতের মুখে অহিংসা, সত্য প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতার যত কথা সব অযোগ্য এবং অসহায়ের অরণ্যে রোদনমাত্র।

---

**পূর্ব্ব ময়মনসিংহে উপনির্ব্বাচন—**

আগামী ২৪শে জুলাই পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদের জন্য উপনির্ব্বাচন হইবে। এই উপ-নির্ব্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। এড হকী দলের পক্ষ হইতে দাঁড়াইয়াছেন শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। এই দুই-জনের মধ্যে কাহাকে সমর্থন করা উচিত, দেশের বর্ত্তমান সমস্যায় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কংগ্রেসের সম্মুখে অদূর ভবিষ্যতে কঠোর পরীক্ষার সময় আসিতেছে। আজ প্রয়োজন ধনীর নহে, অন্য কাজের সঙ্গে অবসর মত স্বদেশ-সেবা করিয়া নেতা বনিবার বাহবা লইতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের নয়, প্রয়োজন ত্যাগীর, প্রয়োজন দেশের সেবার জন্য সকল রকম দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া লইবার মত বুকের বল যাঁহাদের আছে, তেমন কর্ম্মীর। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জীবন স্বদেশ-সেবার অগ্নিময় সাধনায় সমুজ্জ্বল। বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ এবং অসম্মানের মাঝে বাঙলা দেশ ময়মন-সিংহের এই স্বদেশসেবক সন্তানের দেশপ্রেমে পরনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহবাসীরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে যে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে জ্ঞানেন্দ্রবাবু জয়লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দ্বিধা-সঙ্কোচ সকল রকমে কাটাইয়া অচল নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা আজ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োজন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এমন নিষ্ঠার শত অগ্নিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ—যাঁহার সমগ্র জীবনেই দেশ-সেবার এমন পরিচয় রহিয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

**পরিষদের গুপ্ত বৈঠক—**

যুদ্ধ বাধিবার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকবার গুপ্ত বৈঠক হইয়াছে। ঘরের দুয়ারে শত্রু, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের সমরনীতি সংগোপনে রাখা দরকার। ভারত ততটা বিপন্ন নয়, শত্রুপক্ষের সম্পর্ক হইতে সে এখনও বহু দূরে; কিন্তু অতিরিক্ত উৎসাহীর অভাব নাই। পাঞ্জাবের লাট স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান এমন একজন অতিরিক্ত উৎসাহী পুরুষ, তাই তাঁহার ইচ্ছায় পাঞ্জাবে সম্প্রতি ব্যবস্থা-পরিষদের একটি গুপ্ত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দল এই গুপ্ত বৈঠকের সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এই গুপ্ত বৈঠকের সরকারী রিপোর্টে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাই প্রধানত দেওয়া হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিরোধী পক্ষ যে সব বক্তৃতা করেন, সে সব বক্তৃতার এক অক্ষরও সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। আমাদের মতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাটা বিবৃতির আকারে প্রকাশ করিলেই চলিত, পরিষদের অধিবেশনের এমন প্রহসনের প্রয়োজন কি ছিল? এই সব গুপ্ত নীতির ফলে সাধারণের মনে যে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর মনে করি। ইহার ফলে যেখানে আতঙ্কের কারণ নাই, সেখানেও সাধারণ লোকে আতঙ্কের কারণ কল্পনা করিয়া লয়। প্রকাশ্যভাবে সরকারী নীতির আলোচনায় সাধারণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান জাগে এবং দেশের লোকে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়। বিশ্বাসেই বিশ্বাস বাড়ে। সাধারণের সমালোচনা এবং মুখ বন্ধ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আমলাতান্ত্রিক মোহে এ দেশের মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত গণ-তান্ত্রিকতার মূল নীতিকে পদদলিত করিতেছেন। তাঁহাদের এমন নীতি নিতান্ত অনাবশ্যক, অনর্থক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার বহ্বাড়ম্বর হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে।

---

**নৃশংস হত্যা—**

সিন্ধু প্রদেশের শক্কর জেলার হিন্দু নির্য্যাতনের সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ স্তম্ভিত হইয়াছিল, শক্কর হইতে সদ্য প্রাপ্ত একটি সংবাদেও লোকে তেমনি মর্ম্মাহত হইবে। শক্কর জেলা হইতে আইন সভায় নির্ব্বাচিত প্রতি-নিধি শ্রীযুত পামনানি গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ষ্টেশন হইতে যাইবার পথে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ঘোটকি নামক স্থানে জনৈক কংগ্রেসপন্থীর হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পামনানি মহাশয় তথায় গিয়াছিলেন এবং তদন্ত শেষ করিয়া তিনি ফিরিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে হত্যা করায় লোকের মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইবে যে, পূর্ব্ব হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীদিগের এই ঘটনার সহিত যোগ আছে। এই শোচনীয় ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীদিগের সন্ধান ও দণ্ড বিধানের জন্য সিন্ধু মন্ত্রি-মণ্ডল কি ব্যবস্থা করেন, সমগ্র দেশের লোক ক্ষুব্ধচিত্তে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

# জার্ম্মানীর পরবর্ত্তী উদ্যম

জার্ম্মানীর ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যম কতদূর কি দাঁড়ায়, সকলের দৃষ্টি এই একদিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে। এদিকে নূতন কিছু দেখা যাইতেছে না উড়োজাহাজের আক্রমণ ছাড়া। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুধু এইভাবে উড়োজাহাজ লইয়া হানা দিয়া জার্ম্মানী ইংরেজকে কাবু করিতে পারিবে না। তাহাকে নূতন ধরণের কিছু করিতে হইবে। সে সম্ভবত তেমন মতলবে আছে। এ সম্বন্ধে মিঃ লয়েড জর্জ্জ গত ১১ই জুলাই তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমাদের নৌবহরের গতিবিধি রুদ্ধ করিবার জন্য জার্ম্মানী চেষ্টা করিবে; আমার মনে হয় না, এদিক দিয়া তাহার যত কিছু শক্তি প্রয়োগ করার আছে, সে তাহা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের আক্রমণ অতি প্রচণ্ড হইবে, সে যে শুধু আমাদের সমুদ্রপথে জাহাজগুলিকে আক্রমণ করিবে, ইহাই নয়, আমাদের বন্দরসমূহ এবং আমাদের সংবাদ আদান প্রদানের সূত্রগুলির উপরও তাহার আক্রমণ আরম্ভ হইবে। সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, সে যাহাতে আমাদিগকে অনাহারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে না পারে, আমাদিগকে তেমনভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সব সময়ই আমার এই মত যে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সুবিধা হইবে আমাদের এবং অনতিদীর্ঘ সংগ্রামে শত্রুপক্ষের সুবিধা।" ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলও সেদিন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"হিটলার দুইমাস পূর্ব্বে ব্রিটেন আক্রমণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আমাদের নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে তাহা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ছাকিতে হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ইহা যে আরও কতদূর বিস্তৃত হইবে, কেহই বলিতে পারে না। নির্ভীকভাবে এই সাগরবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি। হয়ত আমাদিগকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে।"

যুদ্ধ যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, জার্ম্মানী প্রথম হইতেই এইরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ফরাসীর রণতরীগুলিকে যদি সব হাত করিতে পারিত, তাহা হইলে ইংলণ্ড আক্রমণে কিম্বা ইংলণ্ডের গতিবিধির পথ বিপন্ন করিতে তাহার অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু ফ্রান্সের বৃহৎ রণতরীগুলির মধ্যে কয়েকখানা ইংরেজেরা হাত করিয়াছে এবং কয়েকখানা ধ্বংস করিয়াছে। 'ডানকার্ক' নষ্ট হইয়াছে, 'রিসিলিউ' নামক নবনির্ম্মিত বৃহৎ রণতরীখানাকে যেদিন ইংরেজের নৌবহর ফরাসী উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার সিনেগালের ডাকার বন্দরে হানা দিয়া ডেপথ্ চার্জ্জের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিয়া আসিয়াছে। 'জিয়ান বার্ট' নামক ফরাসীদের আর একখানা বৃহৎ রণতরীও নাকি এখনও কাজের অনুপযোগী অবস্থায় মরক্কোর কোন বন্দরে আছে। ইহা সত্ত্বেও ফরাসীদের কতকগুলি কব্জার এখনও আছে, কিন্তু সেগুলি তেমন বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারিবে না, ব্রিটিশ পক্ষ এইরূপ আশ্বস্তি প্রকাশ করিতেছেন।
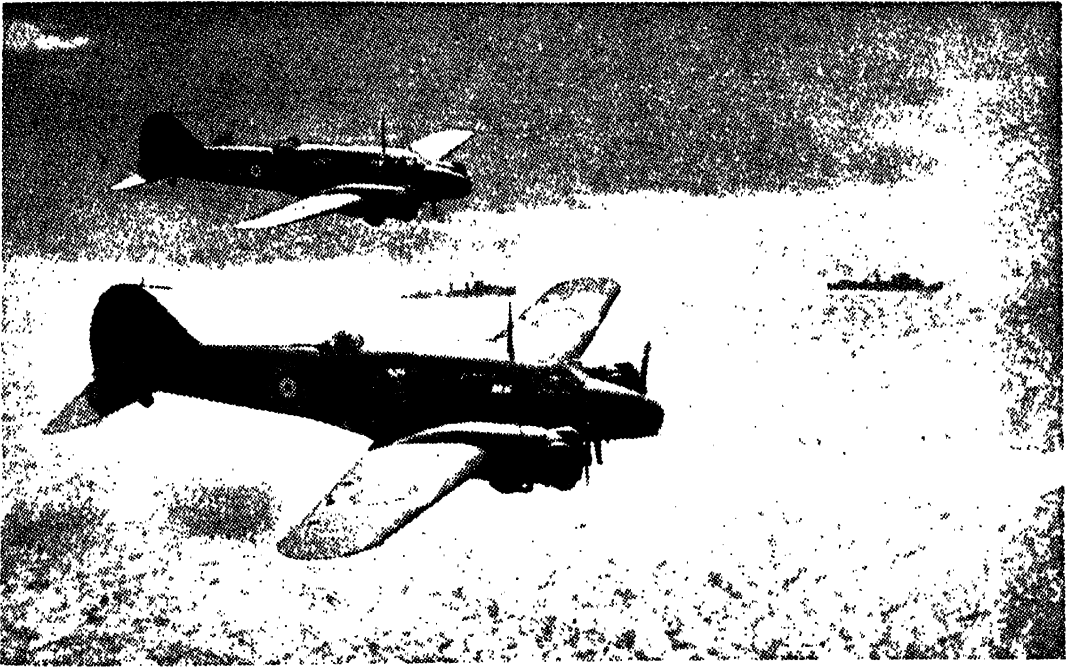
বৃটিশ বিমানবহর বৃটেনের উপকূল পাহারা দিতেছে

ফরাসী রণতরীর সাহায্যে তাড়াতাড়ি জলপথে ইংরেজকে দুর্ব্বল করিবার যে মতলব জার্ম্মানীর ছিল, এখন একথা বলা চলে যে, ইংরেজ তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে!

মুখো হবে না, ওখানেই আবার স্থায়ী সংসার পাতবে।"
বিপিন কৌতুক অনুভব করছিল, জিজ্ঞাসা করলে, "বটে! ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কি মনে করেছিলে শুনি?"
সদুর মুখে আসছিল, ভেবেছিলাম অন্নদা তোমার গলগ্রহ ব'লে তাকে ফেলে যাওয়া তোমার পক্ষে সহজ হ'লেও শারদা তো গলগ্রহ নয়! বরঞ্চ সে তোমার মত অনেক গলগ্রহ বইতে পারে বলেই তোমাকে মেয়ে সমেত চিরদিনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কিছু লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে।' কথাটা মুখে এলেও সে তা প্রকাশ করলে না, বললে, "ভেবেছিলাম সেখানেই বুঝি কাউকে সাতপাকে বেঁধে এনে নতুন ক'রে ঘর-সংসার পাতবে।" সে হেসে উঠল,—উচ্চহাসি। বিপিনও হাসলে। বললে "না, ঘর-সংসারী হওয়া আর আমার কপালে নেই মানিকের মা, থাকলে আদুর মা মরত না। সে মরেছে ব'লেই তো আজ মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে পরের দরজায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। না হলে কে যেত বল দিকিন "

"কেন, তুমিই যেতে! যার যাবার ঝোঁক থাকে, সে কি কখনও কারণের ধার ধারে?" ব'লে বসল হঠাৎ সদু।
বিপিন সচকিতে মুখ তুলে তাকাল।—"এ কথার মানে?"
"মানে খুবই সোজা; বোনের টানে না যাও, বোনের পয়সার টান তোমাকে টানতই।"
বিপিন চমকে উঠলো।—"কি বললে?"
সদু তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলে, "বললাম ঠিকই,—পয়সাই মায়া মমতা বাড়ায় কিনা। কিন্তু সেটা উচিত কাজ নয়; ভগবান তো আছেন এখনও, ধর্ম্মও আছে; এখনও চন্দ্রসূর্য্য লোপ পায় নি!"

বিপিনের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বুঝল, সৌদামিনীর এ অনেকদিন আগের চাপা রোষের স্ফুরণ। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে সে হয়তো এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু আজ তা পারলে না। বললে, "তাই যদি সত্যি জেনে থাক মানিকের মা, তবে এও জানা উচিত যে, এ কথা তোমার মুখে মানায় না।"

"বটে! মানায় না আমার মুখে?—কিন্তু দেখ আদুর বাপ, তোমাদের ঘর-সংসারের খবর,—নাড়ী নক্ষত্রের খবর আমি যত জানি, এত আর কেউ জানবে না। তাই বলছি, আমার মুখে এ কথা না মানালে, তোমার কি মনে হয় মানায় তোমার সেই বোনের মুখে, যে বোন কুলে কালি দিয়ে গেছে?'

"মুখ সামলে কথা বল সৌদামিনী।" বিপিন উঠে দাঁড়ালো চৌকি ছেড়ে। সদুর চাপা রোষও যেন আজ শতমুখে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, বিপিনের ভ্রূকুটি তাকে চুপ করাতে পারলে না। মুখের ওপর ব্যঙ্গের হাসি টেনে এনে ব'লে উঠল, "মুখ সামলাব আমি? নাচুনীর দোষ নেই, দেখুনীর দোষ! তুমি একা নও, বিয়ের যুগ্যি আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে উঠেছ সেই বোনের বাড়ি। আবার মেয়েকে গান বাজনা শেখাচ্ছ! এ শেখানোর মানে?"

বিপিন এ কথার জবাব দিলে না; অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার সদুর মুখের দিকে তাকিয়ে নেমে পড়ল উঠনে, তারপর হনহন করে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।
"আমি আজই চ'লে যাব শহরে, তাড়াতাড়ি চারটি ভাতে ভাত চড়িয়ে দে অন্ন, খেয়ে দেয়ে যাব।"
"আজ?"
অন্নদা বিস্মিত হল। যে লোক এই খানিক আগে শহর থেকে এই দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, সেই লোক একটা দিনও বাড়ি থাকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে চায়, এর অর্থ? অন্ন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল বিপিনের গম্ভীর মুখের দিকে, কিন্তু বিপিন সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, দাওয়ায় উঠে তামাক সাজতে বসল। অন্ন জিজ্ঞাসা করলে, "কেউ কিছু বলেছে কি দাদা?"
একটা বিপিন যেন তিনটে হয়ে উঠল।—"বলবে! আমায়! কেন? আমি কার কি করেছি যে আমায় কথা বলবে? কথা বলা ওমনি সোজা, নয়? বললেই হ'ল।"
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বুকের বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা ক'রে আনলে; বললে, "সবাই তো আর মানিকের মা নয় যে মুখে যা আসবে তাই বলে যাবে! বুঝলি অন্ন, ঐ তোদের মানিকের মা—বড় তেল হয়েছে। যা মুখে আসে, তাই ফড়-ফড়িয়ে ব'লে যায়, জানে না এই বিপিনকে। কত ধানে কত চাল, এ সে এক নিশ্বাসে দেখিয়ে দিতে পারে।"
অন্ন সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "মানিকের মা বুঝি কিছু বলেছে?"
মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বিপিন বললে, "বলেছে ব'লেই তো বলছি।"
"কি বলেছে দাদা?"
"ওঃ, সে সব অনেক কথা; সে সব শুনে তোর কাজ নেই। ওরকম মেয়ে মানুষ—যেমন নিজে কিনা—তেমনি সবাইকে দেখে।"
ইঙ্গিতটা বুঝতে অন্নদার বিলম্ব হ'ল না, আর প্রশ্নও সে তাই করলে না। সে যেমন নিজের মনে সংসারের কাজ ক'রে যাচ্ছিল তেমনি ক'রে যেতে লাগল।

বেলা হ'ল, রোদও চ'ড়ে উঠল খাঁ খাঁ ক'রে। তেমনিভাবে ব'সেই তামাক টানতে টানতে বিপিন প্রশ্ন করলে, "কই, রান্না চড়ালি নে?"
ম্লান হেসে অন্নদা বললে, "পাগল নাকি! পরের ওপর রাগ ক'রে কেউ নিজের ঘরের ভাত বেশী খায় দাদা? যেমন কথা তোমার!"
বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, "পরের ওপর রাগ, মানে?"
"পর বই কি। আঁতে যার ভাল মন্দের ঘা লাগে না, সেই তো পর। নইলে অ্যাদ্দিন পরে, বাড়ির মানুষ তুমি বাড়ি ফিরলে, আর দোকানপাট খোলা নেই, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, পরের কথা শুনে ধুলো পায়েই বাড়ি ঘর ছেড়ে পালাবে? এ কি পুরুষ মানুষের কাজ? আর আজ শুধু তুমি একা নও, মেয়ে তোমার বড় হয়েছে, আজ বাদে তার বিয়ে দিয়ে তাকে

(শেষাংশ ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ছবি দেখা

**শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত**

আজকাল চিত্র প্রদর্শনীতে ভিড় দেখিয়া মনে হয়, জনসাধারণের ছবি দেখিবার আগ্রহ বাড়িয়াছে। নানা প্রদর্শনীতে ঘুরিলে নানা শৈলীর ছবি চোখে পড়ে। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রাচ্য চিত্রকলাসংসদের (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট) প্রদর্শনীই ছিল একমাত্র প্রদর্শনী এবং প্রাচ্য চিত্রকলাই ছিল সাধারণের সম্মুখে একমাত্র চিত্র। মাসিকপত্রে আলোচনা, নিন্দা বা প্রশংসা ঐ এক শৈলীর চিত্র লইয়াই হইত। একদল করিত তাহার অবিমিশ্র প্রশংসা, একদল করিত অবিমিশ্র নিন্দা। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক হাতড়াইলে প্রায়ই আজকাল চিত্রপ্রদর্শনী এবং চিত্রকরদের সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এ সকল সাময়িক পত্রে খুব কম লেখাই চোখে পড়ে, যাহাতে ছবির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার কারণ যাঁহারা ছবি সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন, তাঁহারাই হয়ত ছবি সম্বন্ধে বোঝেন কম, অথবা বোঝেন না। অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ লিখিয়া থাকেন, চিত্র সম্বন্ধে লিখিতে গেলে সাধারণত দেখা যায়, কাহারো বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না; যে কোন ব্যক্তি চিত্র সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। আমাদের দেশে চিত্রের বিশেষজ্ঞ আছেন কম, আর তাঁহারা হয়ত লিখিয়া থাকেন ইংরেজী ভাষায়। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনা বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। Essayist বা গদ্য-লেখক একদল দেখা যায়, তাঁহারা নানা চিন্তার খোরাক বাঙলা ভাষায় জুটাইয়া থাকেন, কিন্তু সে রকম মাতৃ ভাষায় চিত্র সমালোচনা গড়িয়া ওঠে না। অমুক ছবিখানা ভাল লাগে, বা ভাল লাগে না, এরূপ বলা যথেষ্ট নহে। কেন ভাল বা মন্দ, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের চিত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। ছবিটা কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, কি বস্তুর সাহায্যে শিল্পী অঙ্কন সম্পাদন করিলেন, জানিতে পারিলে ছবি দেখার আনন্দ আরও বাড়িয়া যাইবে। অধিকাংশ লেখক দেখা যায়, এ বিষয়ে থাকেন অজ্ঞ।

বিলাতে এক সময় একথা প্রবাদ বাক্যের মত চল ছিল যে, যে সব শিল্পী নিজেদের কাজে হন অকৃতকার্য্য, তাঁহারা হন চিত্র সমালোচক। বিখ্যাত ইংরেজী চিত্র সমালোচক এবং চিত্রকর স্যার চার্লস হোমস সে মত খণ্ডন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, সমালোচক যদি ছোটখাটো চিত্রকর না হন, চিত্রের টেকনিক বা অঙ্কন রীতির সঙ্গে পরিচিত না হন, তবে ছবির কথা অপরকে বুঝাইবেন কি করিয়া? সে কারণেই বিলাতের আর্ট-ক্রিটিক স্যার চার্লস হোমস এবং রোজার ফ্রাইর লেখার মূল্য আছে। রোজার ফ্রাই অধুনা ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচক এবং সৌন্দর্য্য তত্ত্ববিদ (aesthete); তিনি একজন চিত্রকরও বটেন। ফ্রান্সের আঁদ্রেলোট-এর লেখক এবং চিত্রকর দুই হিসাবেই খ্যাতি আছে।

ছবি দেখার একটা ভুল আছে, আমরা অনেক সময় পূর্ব্ব ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছবি দেখি এবং নিজ মত অনুযায়ী চিত্র না হইলে তাহা পরিত্যাগ করি। ব্যঞ্জনের বিভিন্ন স্বাদ—বিভিন্ন মাল মশলার সংমিশ্রণে তার 'তার' যে কত রকম হইতে পারে, তাহা চাখিয়া দেখিলে বুঝা যায়। শুধু বিশেষ এক স্বাদ দ্বারা ব্যঞ্জনকে বিচার করিলে চলে না; মিষ্ট, তিক্ত, কষায়, অম্ল ইত্যাদি কত প্রকারের রস আছে। সেই রকম বিভিন্ন প্রথায় অঙ্কিত চিত্রের স্বাদ বিভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে ইউরোপে সকলে সব কিছু দেখিত গ্রীক চশমা লইয়া। যা কিছু ছিল গ্রীক আদর্শের বহির্ভূত, সে সব ছিল বর্ব্বর এবং রাক্ষুসে (Barbarous and Monstrous)। এখন আফ্রিকার আদিম জাতির হাতীর দাঁতের খোদাই নিগ্রো রমণীর মুখও ইউরোপের বিশেষজ্ঞের নিকট পরম রমণীয়। এই বর্ব্বর শিল্পই যেন ভেনাস ডা-মিলো বা মোনালিসাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছে।

পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পকে এক ছাঁচে ঢালিয়া তাহার উৎকর্ষ বিচার করা যায় না। বিভিন্ন শিল্পনীতিকে বিভিন্ন শিল্পাদর্শ দিয়াই দেখিতে হইবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "চতুষ্কোণ জিনিষকে গোল গর্ত্তে ভরতি করা।"—এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার; শিল্প সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। ভারতীয় আদর্শ দিয়া ইউরোপীয় শিল্পকে বিচার করা যাইবে না; আর ইউরোপীয় আদর্শ দিয়া চীন বা ভারতীয় শিল্প দেখিলে চলিবে না। আবার এক দেশের শিল্পও ক্রমবিবর্ত্তনে ভিন্নরূপ ধারণ করে। রাফাএল, রুবেন্স, সেজান, ভ্যান গঘ, গগ্যাঁ, সকলেই ইউরোপীয় শিল্পী হইলেও এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়; তাঁহারা এক ভাষায় কথা বলেন না। ইউরোপীয় চিত্রকলা বলিতে আমরা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম, বিংশ শতাব্দীতে সেই ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

যে সকল বস্তুর সাহায্যে ছবি আঁকা হয়, তাহা অনেক সময় বাধা দান করে; শিল্পী এই বাধাকে অতিক্রম করিয়া নিজের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেন; এই চেষ্টার মধ্যে শিল্পীর আনন্দ নিহিত আছে। বাধা অতিক্রমের মধ্যেই সৃষ্টির ব্যঞ্জনা। ভিন্ন প্রকারের চিত্র মনে ভিন্ন প্রকারের রসনাভূতি জাগায়। কাজেই শিল্প সৃষ্টির এই প্রাচুর্য্যের সার্থকতা আছে। বিভিন্ন প্রকারের চিত্রের পদ্ধতির (টেকনিকের) বর্ণনা এই প্রবন্ধে দিতে ইচ্ছা করি।

### জল রং (ওয়াটার কালার)

(প্রাচ্য বা ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি—অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত)

আমাদের আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা প্রধানত মোগল রাজপুত চিত্রকলা হইতে অনুপ্রাণিত হইলেও ইহার অঙ্কনরীতিতে কতকটা বিলাতী জল রংয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে; তবে আচার্য্য অবনীন্দ্র-

**ক্ষুধিত ব্যাঘ্র (জল রং)—জেন ফু কাউ অঙ্কিত, আধুনিক চীন**

নাথ ইহাতে অভিনবত্ব আনিয়াছেন। প্রাচীন চিত্র হইতে টেম্পারা পেইণ্টিংএ। আধুনিক চিত্রে অনেক টেম্পারা পেইণ্টিং থাকিলেও, ভারতীয় চিত্রকলার অধিকাংশই জল রংএ আঁকা। ইহার অভিনবত্ব হইল,—ছবিখানি বার বার জলে ডুবাইয়া এবং বার বার নানা রংয়ের ওয়াশ দিয়া রংয়ের effect বা মাধুর্য্য আনা হয়; সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা তারপর ছবি ফিনিশ করা হয়। আমাদের বিষয় নির্ব্বাচনে প্রাচীন প্রভাব থাকিলেও বর্ণসমাবেশ বিলাতী-জাপানী ঘেষা।

**জল রং (বিলাতী)**

ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডেই জল রংয়ের চর্চ্চা হইয়াছে বেশী। তৈলচিত্রে বা অয়েল পেইণ্টিংএ রং যেমন তেলে গুলিয়া লইতে হয়, জল রংএ তেমনি জলে গুলিয়া লয়। গার্টিন, কটম্যান, ডেভিডকক্স্ টার্নার প্রমুখ শিল্পী জল রংয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বিলাতে পুস্তক চিত্রাঙ্কনে জল রংয়ের ব্যবহার খুব হইয়া থাকে। পুস্তক চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ এডমণ্ড ডুলাক; ওমরখায়াম এবং আরব্য উপন্যাসের চিত্রাঙ্কনের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাসেল ফ্লিণ্টের জল রংয়ের চিত্র ইংলণ্ডে অধুনা খুব জনপ্রিয়।

**জল রং (চীনা—জাপানী)**

জল রংয়ের কাজ সুদূর প্রাচ্যে যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, পৃথিবীর অন্যত্র তেমন করে নাই। কি কাগজ, কাপড়, সিল্ক—সবটাতেই সুদূর প্রাচ্যের শিল্পীরা দক্ষতার সঙ্গে ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহাদের তুলি চালনার নিজস্ব এক ভাষা আছে। এই তুলি চালনা লেখার সামিল। চীনা জাপানী শিল্পী ছবি আঁকে অপেক্ষা ছবি লেখে বলা বেশী ঠিক। তুলির এই কৌশলকে বলা হয় "ক্যালিগ্রাফী" বা লিপিকুশলতা। পারস্যের শিল্পে এই "ক্যালিগ্রাফী" বা লিপিকুশলতা রহিয়াছে। চীনা জাপানী ও পারস্যের চিত্রকরেরা অনেক সময় ছবির উপর কবিতা লিখিয়া থাকে। ওস্তাদ শিল্পীর হাতের লেখা ঐসব দেশে, ছবির ন্যায় আদর পাইয়া থাকে। চীনা জাপানী চিত্র ইউরোপীয়ের ন্যায় ফ্রেমে বাঁধান থাকে না, পটের ন্যায় গুটান যায়। সিন্দুকে এগুলি তোলা থাকে, কেবল সময় সময় দেওয়ালে ঝুলান হয়।

**ব্যানার পেইণ্টিং (Banner Painting—তিব্বতের পতাকা চিত্র)**

তিব্বতে এবং নেপালে বৌদ্ধ মন্দিরে একপ্রকার চিত্র টানান থাকে; ক্ষুদ্র আকার হইতে খুব বৃহৎ আকারের এগুলি হইয়া থাকে। বিষয়, বৌদ্ধ চিত্র—বুদ্ধের জীবনী, অথবা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর চিত্র, বৌদ্ধ সাধু বা লামাদের চিত্র। মূর্ত্তির পিছনে থাকে সুন্দর আলঙ্কারিক (decorative) দৃশ্য চিত্র। লাল, নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি উজ্জ্বল রংয়ের সমাবেশ। সুনির্দ্দিষ্ট রেখা দ্বারা মূর্ত্তির ডৌল দেখান। এ সকল চিত্রকে বলা হয় Banner Painting. তিব্বতের বিহারের লামারা এসব চিত্র আঁকিয়া থাকেন; সিল্কের উপর টেম্পারা পেইণ্টিং—চীনা জাপানীর ন্যায় জল রংয়ের চিত্র নহে। এই চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল, ছবি যদিও গুটান থাকে, ছবিতে Crease বা ভাঁজ পড়ে না, বা রং চটিয়া উঠিয়া যায় না। এগ টেম্পারায় প্রথম শাদা রংএ ছবির ground বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; শাদা ক্ষেত্রের উপরে পরে হয় অন্য কাজ।

**টেম্পারা পেইণ্টিং**

টেম্পারা পেইণ্টিং-এর রং জল রংয়ের ন্যায়, জলেই গুলিয়া লইতে হয়। পার্থক্য জল রং হয় স্বচ্ছ, অর্থাৎ রংয়ের ভিতর দিয়া কাগজের শাদাটা দেখা যায়; যেখানে শাদা রংয়ের প্রয়োজন সেখানে শাদা রং ব্যবহার করার রীতি নাই; শাদা অংশে কোনো রং না লাগাইলেই হয়, কাগজের শাদা রংয়েই সে কাজ সাধিত হয়। টেম্পারা পেইণ্টিং অসচ্ছ (Opaque)। ইহার রং ঘন বলিয়া কাগজের শাদা একেবারে ঢাকা পড়ে। অন্যান্য রংয়ের সঙ্গে শাদা রং মিশাইয়া রং ঘন করার রীতি আছে; ইহাতে রংয়ের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। অংকনে কোনো কোনো বিষয়ে টেম্পারা পেইণ্টিং তৈল চিত্রের সমধর্ম্মী, তফাৎ হইল তৈল চিত্র তেলের জন্য চক্ চক্ করে, টেম্পারা পেইণ্টিং করে না। আমাদের দেশী চিত্রে প্রথমে একটা শাদা রংয়ের (খড়ির) আস্তর লাগান হয়, তারপর শাদা ক্ষেত্রের উপর অন্য কাজ করা হয়। পীড়ি চিত্র প্রতিমার চাল চিত্র, পট চিত্র প্রভৃতিতেও অনুরূপ রীতি। মোগল রাজপুত চিত্র এই প্রথায় অঙ্কিত। এই শাদা রংয়ের প্রলেপ ছবির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। গুঁড়া রংয়ের সঙ্গে আঠা মিশাইয়া রং প্রস্তুত করা হয়। বেলের আঠা, তেঁতুল বীচির আঠা, গঁদের আঠা (Arabic gum), শিরীষের আঠা ব্যবহার করার বিধি আছে। গঁদের আঠারই ব্যবহার বেশী।

বুদ্ধ (টেম্পারা)—নিকোলাস রোয়েরিক অঙ্কিত, আধুনিক রাশিয়ান

**এগ টেম্পারা (Egg Tempera)**

এগ টেম্পারা আর কিছু না, সাধারণ টেম্পারার মতই কাজ, পার্থক্য হইল, রংটা অন্য আঠায় না গুলিয়া ডিমের আঠায় গুলিতে হয়। ডিমের হলদে অংশটা জলে ফেটাইলে আঠা প্রস্তুত হয়, তাহাই গুঁড়া রংয়ের সঙ্গে মিশাইতে হয়। অধুনা ইউরোপে এবং আমাদের দেশেও এগ টেম্পারার খুব চল হইয়াছে। প্রাচীর চিত্রে (Mural Painting)—প্রেক্ষা গৃহের সাজ-সজ্জায় এগ টেম্পারার চল। সোজাসুজি দেওয়ালের উপর এগ টেম্পারা করা চলে; অথবা ক্যানভাস বা বোর্ডের উপর আঁকিয়া দেওয়ালে ফ্রেম করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। সাধারণের কাছে এগুলি ফ্রেস্কো বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহা ভুল। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পিগণ যে চিত্র করিয়াছেন, তাহা দেওয়ালের উপর এগ টেম্পারা। প্রাচীন ইটালীতে এগ টেম্পারার খুব চল ছিল।

বত্তিচেলী, টিশিয়ান, প্রভৃতির অনেক বিখ্যাত চিত্র আঁকা এগ টেম্পারায়। অনেক সময় মিশ্রিত চিত্রও ইটালীতে হইয়াছে; এগ টেম্পারায় ছবি আঁকিয়া তৈল চিত্রে ফিনিশ করা। এগ টেম্পারার চিত্র খুব স্থায়ী হয়।

কলিকাতার কয়েকটি সিনেমা হাউসে এগ টেম্পারার চিত্র আছে; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় বরোদার চিত্র করার জন্য যে কমিশন পাইয়াছেন, তাহা হইতেছে দেওয়ালের উপর এগ টেম্পারা।

## ফ্রেস্কো পেইণ্টিং (Fresco Painting)

ভারতের বৌদ্ধ চিত্রে এবং ইটালীর খৃষ্টীয় চিত্রে ফ্রেস্কো পেইণ্টিং-এর অধিক চল দেখা যায়। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম এশিয়ায় যেখানে যেখানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সেখানে

অজন্তার চিত্র (ফ্রেস্কো—প্রাচীন ভারতীয়)

সেখানে ভারতীয় ফ্রেস্কো চিত্রের প্রসার হইয়াছে। প্রাচীন মিশর এবং গ্রীসেও ফ্রেস্কো চিত্রের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। অধুনা ফ্রেস্কো চিত্রের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ।

প্রাচীনকালে ফ্রেস্কো পেইণ্টিং স্থাপত্যের একটা অংশ-বিশেষ ছিল। মানুষ যেরকম অলঙ্কার বস্ত্রে দেহ সুশোভিত করে, তেমনি মন্দির, বাসগৃহ চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে সুশোভিত করা হইত। এ সকল সাজসজ্জা ছিল গৃহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত। অধুনা স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্য্য বা চিত্রের সেই সম্বন্ধ নাই। ঘরের দেওয়াল হইতে ফ্রেমে বাঁধান ছবি খুলিয়া লইলে ঘরের কোনো অঙ্গহানি হয় না। কিন্তু অজন্তা গুহার দেওয়াল হইতে, অথবা খৃষ্টীয় গির্জ্জা হইতে ফ্রেস্কোচিত্র তুলিয়া লওয়া যায় না, কারণ দেওয়ালের সঙ্গে এই চিত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। খাঁটি ফ্রেস্কো চিত্রকে ইটালী ভাষায় বলে Fresco Buono অর্থাৎ Fresco Painting on wet surface. দেওয়ালের আস্তর ভিজা থাকিতে থাকিতেই আঁকিতে হয়, এজন্য এই নাম। সংস্কৃত ভাষায়, শিল্পশাস্ত্রে, কাব্য নাটকাদিতে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে; এক সময় ভারতবর্ষে ইহার খুবই প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বলে "ভিত্তি চিত্র।" দেওয়ালে বিশেষ প্রলেপ বা আস্তর দেওয়ার রীতি ছিল; এই প্রলেপের নাম হইল "বজ্র লেপ"; এই বজ্র লেপের গুণে চিত্র বহু বৎসর স্থায়ী হয়। অজন্তার চিত্র দুই হাজার বৎসর টিকিয়া আছে, মলিন হয় নাই। অজন্তার পাথরের দেওয়ালের উপর গোবর মাটি, তুষ, প্রভৃতি দিয়া বজ্রলেপ তৈয়ার করা হইয়াছে। অজন্তার চিত্র যে সবই ফ্রেস্কো পেইণ্টিং তাহা নহে; তিন প্রকার চিত্র আছে। (১) ফ্রেস্কো পেইণ্টিং, (২) টেম্পারা পেইণ্টিং, (৩) ফ্রেস্কো পেইণ্টিং টেম্পারায় ফিনিশ করা। রাজপুতানায় এখনও ফ্রেস্কো পেইণ্টিং-এর চল আছে; জয়পুরে কারিগর পাওয়া যায়, যাহারা ফ্রেস্কো পেইণ্টিং জানে। জয়পুর প্রথায় মার্বেল পাথরের গুঁড়া, চূণ প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়ালের আস্তর তৈয়ার করা হয়; মসৃণ পাথর ঘষিয়া এই আস্তর পালিশ করা হয়। আস্তর ভিজা থাকিতেই ছবি আঁকিয়া ফেলিতে হয়। ইটালীর ফ্রেস্কো পেইণ্টিএ আস্তর হইল বালী ও চূণের।

## তৈল চিত্র (অয়েল পেইণ্টিং)

জল রংএ যেমন রং জলে গুলিয়া লইতে হয়, তৈল চিত্রে তেমনি রং তেলে মাড়িয়া লইতে হয়। সাধারণত তিলের তেল
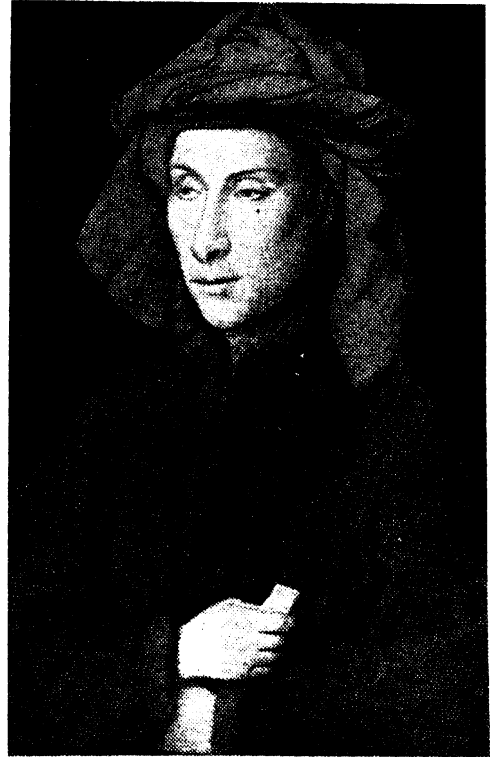
প্রতিকৃতি (তৈলচিত্র) ভ্যান আইক অঙ্কিত, ফ্লেমিশ চিত্র—পঞ্চদশ শতাব্দী

বা Linseed oil তৈল চিত্রে ব্যবহার করা হয়। তেলের সঙ্গে তারপিনের স্পিরিট ব্যবহারের বিধি আছে; শীঘ্র রং শুকাইবার জন্য তারপিনের ব্যবহার। ইউরোপের চিত্রের আরম্ভ টেম্পারা এবং ফ্রেস্কো চিত্র হইতে। বেলজিয়ামের দুই ভ্রাতা হুবার্ট ভ্যান আইক (১৩৬৬?—১৪২৬) ও জ্যান ভ্যান আইক (১৩৯০?—১৪৪১) প্রথম তৈল চিত্র আবিষ্কার করেন। তৈল চিত্র আবি-

ষ্কারের ফলে ইউরোপীয় চিত্র দ্রুত সাদৃশ্যবাদের (Realism) দিকে অগ্রসর হয়; কারণ তৈল চিত্রে আলোছায়ার খেলা (chiaroscuro), পরিপ্রেক্ষণ (perspective) প্রভৃতি বাস্তব-ধর্ম্মী গুণ সকল দেখান সহজ হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া প্রতিকৃতি অঙ্কন তৈল চিত্রে ঠিক ভাষা খুঁজিয়া পায়। প্রাচ্যে তৈল চিত্রের চর্চ্চা সামান্য কিছু যাহা হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

### ড্রয়িং (Drawing)

অধুনা ছবি আঁকিবার নানাবিধ বস্তু (materials) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে আঁকিবার বস্তু এবং রং ছিল খুব সীমাবদ্ধ। রঙীন ছবি আঁকা ছাড়া শিল্পীর চিত্র অভ্যাসের জন্য নানাবিধ কাজের বিশেষ মূল্য না থাকিলেও চিত্র সমজদার বোঝেন এ সকল চিত্রের রস। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এ সকল কাজে প্রকাশিত হইয়াছে। তার কারিগরির পরিচয় (draftsmanship) একাজে পাওয়া যায়। শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ একাজে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এ সকল কাজকে বলে স্টাডি (study) অর্থাৎ অনুশীলন। আমাদের দেশীয় চিত্র কল্পনা প্রধান হওয়াতে এ জাতীয় অনুশীলন বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপে সকল শিল্পীই যথেষ্ট পরিমাণে প্রকৃতি এবং জীবনের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। পেনসিল ড্রয়িং হইল, এ কাজের মধ্যে প্রধান; তা ছাড়া আছে কালী কলমের কাজ (pen and ink drawing), কাঠ কয়লার কাজ, (charcoal drawing), ক্রেয়ন ড্রয়িং (crayon drawing) ইত্যাদি। সোজাসুজি তুলি দ্বারা কালো রংএ যে ড্রয়িং করা হয়, এ সব কাজকে বলে brush drawing.

### ছাপা চিত্র (Graphic arts)

হাতে আঁকা ছবি ছাড়া ছাপা চিত্র ইউরোপে খুব প্রচলিত; এ সব চিত্র হাতে আঁকা মূল চিত্রের মতই সম্মান পাইয়া থাকে। এচিং, উডকাট, উড এনগ্রেভিং, রঙীন উডকাট, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি ছাপা চিত্রের অন্তর্গত। ইংরেজীতে এ শ্রেণীর কাজকে বলে graphic arts. পূর্ব্বে এ শ্রেণীর কাজ আমাদের দেশে চল ছিল না, অধুনা ইউরোপ হইতে আমদানী হইয়া চল হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ভিন্ন প্রবন্ধে করিব।

---

## মানুষের ঘর

(৯৩৪ পৃষ্ঠার পর)

ঘর-বসত করাতে হবে। তার একটা ভবিষ্যৎ আছে, হেসে খেলে পরের বাড়িতে দিন কাটালেই তো চলবে না, মেয়ে যে এদিকে বড় হয়ে উঠল, এর পর যে লোকে জাতে পতিত করবে।”

ঠিক। এ কথাটা তো এতক্ষণ বিপিন ভাবতে পারে নি। এখন শুধু সে একা নয়, আদুর ভবিষ্যৎ আছে। সে বড় হচ্ছে, তাকে বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে হবে। এ একটা নূতন, সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা। চোখের সামনে তার বর্ত্তমান মুছে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য ভেসে উঠল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।—

লাল চেলী পরা আদু যেন শ্বশুর বাড়ি চলেছে পাল্কি চ'ড়ে; সঙ্গে চলেছে বাজি বাজনা। আর সে? নিজে সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সজল দৃষ্টি আদুর বিদায় পথের ওপর মেলে ধ'রে। আদু যাচ্ছে, ওই যাচ্ছে! দূর থেকে দূরান্তরে ওই তার যাত্রার দৃশ্য মিলিয়ে গেল, শুধু ভেসে আসতে লাগল সানাইএর মধুর সুরটুকু করুণ থেকে আরও করুণ হয়ে। বিপিন চমকে উঠল।

দুপুর বেলায় খেতে বসে বললে, “দিদির কি ইচ্ছে জানিস অন্ন?”

“কি?”

“আদুকে লেখাপড়া, গানবাজনা শিখিয়ে বিয়ে দেবে।”

অন্ন চমকে উঠল।—“বিয়ে দেবে! কার সঙ্গে?”

“ও, সে প্রায় ঠিক ক'রেই ফেলেছে দিদি; সে একটি লেখা-পড়া, গানবাজনা জানা খু—ব সুন্দর ছেলের সঙ্গে। দিদির কিরকম ভাগনে হয় ছেলেটি। সেই ছেলেই তো নিজে ইচ্ছে ক'রে আদুকে গানবাজনা শেখাচ্ছে।”

অন্নর শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়ে যেন সে এ কথার হাত এড়াতেই ব'লে উঠল, “তোমার আসবার কথা শুনে আদু কিছু বললে না?”

“খেতে খেতে অন্যমনস্কভাবে বিপিন বললে, “কই, কিছুই তো বলে নি!”

অন্নদা আর কথা কইলে না। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল অন্যমনস্কভবে। হয়তো দেখতে লাগল, দূরে, অনেক দূর দিয়ে দু-চারটে চিল, কাক কি শকুন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় উলটে উলটে যাচ্ছে উঠনের কাঁঠাল গাছের পাতাগুলো।

বিপিন বললে, “বেলা যে প'ড়ে এল অন্ন, ভাত খাবি কখন?”

“এই যে, এইবার নেব।”

অন্ন উঠে পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

(ক্রমশ)

# চুম্বক

(গল্প)

শ্রীহিমাংশু রায়

সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বাড়ীর কর্ত্রীর নিষেধ বলিয়া, তাহা না হইলে সুশান্ত হয়ত ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিত। নিষেধ ভঙ্গ করিবার দুঃসাহস যে তাহার মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া না উঠে এমন নহে, তবে কোন মতে সামলাইয়া নেয়। বস্তুত, 'শিক্ষা' দান গ্রহণ করাইবার জন্য প্রহারের প্রয়োজনীয়তা সে মানে না এবং মানে না বলিয়াই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত একদিনও সে মনীষের গায় হাত তোলে নাই।

ছাত্র মনীষ মনীষার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত!

সুশান্ত কহিল, পরীক্ষা যে এসে পড়ল সে খেয়াল আছে?

মনীষ ঈষৎ অন্যমনস্ক ছিল। ভাল করিয়া কথাগুলি শুনিতে পায় নাই। কহিল, কি এসে পড়ল মাষ্টারমশাই?

তোমার মাথা! সুশান্ত জ্বলিয়া উঠিল। পরীক্ষা, আর কি!

ওঃ! তা আসবেই তো।

দিনের পর রাত আসে, ইহাতে যেমন চিন্তিত বা বিস্মিত হইবার কোন কিছু নাই মনীষের বলিবার ধরণটি অবিকল তেমনি।

সুশান্ত কহিল, বড় তো বলে ফেললে; এর জন্যে তৈরী হতে হবে তো?

হতে হবে বইকি। আপনি তো সেদিন বললেন, রীতিমত তৈরী না হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কোন মানে হয় না।

এ কথা তো দেখছি দিব্যি মনে আছে। কিন্তু এর কোন লক্ষণ তো দেখছি না।

কেন, এই দেখুন না, আপনি আসবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে থেকে ইতিহাস পড়ছি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও জানাইয়া দিল, ভয়ানক কঠিন সব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, নইলে এক্ষুণি পড়া দিয়া ফেলিত।

স্বীকার করিতেই হইবে, এদিক দিয়া মনীষের মনীষার পরিপূর্ণ বিকাশ।

সুশান্ত চুপ করিয়া রহিল। মনীষ কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিয়া কহিল, রাণা প্রতাপের ঘোড়াটা দেখেছেন মাষ্টারমশাই? এই দেখুন। বলিয়া সে একটা ছবির দিকে সুশান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাকসাই ঘোড়া!......আচ্ছা মাষ্টারমশাই আকবরের ঘোড়া ছিল না?

প্রশ্নটা মৌলিক। সুশান্ত গম্ভীরভাবে কহিল, ইংরেজী পড়াটা শিখেছ?

কে যেন নিমেষে মনীষের মুখের রক্তটুকু নিঃশেষে চুষিয়া লইল। গোটা কয়েক ঢোক গিলিয়া কহিল, এ কথাই বলব ভাবছিলাম।...দুষ্টু মিনু যে বইটা কোথায় ফেলেছে কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।

চালাকিটা ধরিতে সুশান্তের বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় না।

জিওমেট্রি বইটা আছে না সেটাও মিনু ফেলে দিয়েছে? তাহার কণ্ঠস্বর অস্বাভিক ঠেকে মনীষের কাছে।

সুশান্ত বইটা হাতে লইয়া কহিল, সেদিন সাত থিওরমটা বুঝিয়ে দিয়েছি, বুঝেছ?

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মনীষ কহিল, একটু একটু বুঝেছি।

তাই বুঝবে চিরকাল! অনেকটা স্বগত উক্তি করিল সুশান্ত। তারপর সে আপন মনে একটার পর একটা পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

পাঁচ থিওরমটার দুর্দ্দশা দেখিয়া সুশান্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, লাল নীল পেন্সিলের শ্রাদ্ধ করবার আর জায়গা পেলে না?

তা নয় মাষ্টারমশাই। ভেরী ভেরী ইমপর্টেণ্ট লিখে রেখেছি। আজ অঙ্কের মাষ্টার বার বার করে বলছিলেন, ওটা ভাল করে শিখে রেখ সবাই।

শিখে রাখতে বলার অর্থ বুঝি গোটা পাতাটায় ভেরী আর মোষ্ট ইমপর্টেণ্ট লিখে রাখা?

মনীষ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, ইমপর্টেণ্ট যে! তার উপর অঙ্কের মাষ্টার নিজেই এবার প্রশ্ন করবেন।

এসব খবর দেখছি বেশ রাখ!

মনীষ নির্লজ্জের মত হাসিল।

সুশান্ত পুনরপি কহিল, এ থিওরমটা বুঝেছ?

হাঁ। এটা তো খুব সোজা!

হুঁম!...সাত থিওরমটা আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, যাতে সবটুকু বুঝতে পার তার চেষ্টা কোর।

সাত থিওরম বুঝাইতে সুরু করিল সুশান্ত।

মিনিট কুড়ির পর প্রায় গলদঘর্ম্ম হইয়া সুশান্ত থিওরমটা শেষ করিল। কহিল, এখন আর কোন গোল নেই নিশ্চয়ই?

না।

আমায় বুঝাতে পারবে?

হাঁ।

বেশ, বুঝাও দেখি।

মনীষ তাচ্ছিল্যভরে খাতাটা টানিয়া লইয়া তাহার উপর ফিগারটা আঁকিল। পরে পেন্সিল দিয়া ত্রিভুজের বাহুগুলির উপর চিন্তান্বিত মনে পুন পুন রেখা টানিতে লাগিল। মহড়া দিতেছে হয়ত। কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হইবার পর সে মস্ত এক হাই তুলিয়া কহিল, কি যেন প্রমাণ করতে হবে মাষ্টারমশাই?

সুশান্তের উদ্গত রাগটা অত্যুগ্রভাবে প্রকাশ পাইতে চায় বুঝি! দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।...

নাঃ, আর পারা যায় না! পথ চলিতে চলিতে সুশান্ত ভাবে টিউশনিটি সে ছাড়িয়া দিবে নাকি? অনেক ছেলে দেখিয়াছে কিন্তু এ রকমটি তাহার চোখে পড়ে নাই। যেন, মূর্ত্তিমান চতুষ্পদী। শিখিবার না আছে সাধ; না সাধনা। বিরক্তিতে সুশান্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। এ হেন ছাত্রকে

অপাঙ্গদৃষ্টিতে মাষ্টারমশাইর মুখভাবটা চকিতে দেখিয়া লইয়া সবিনয়ে জানাইল, সে আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই।

পড়ান মানে নিজের শক্তির অপব্যবহার করা। ঘণ্টাখানেক থাকে হয়ত কিন্তু ইহার মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠে সে। ইহার আর কোন গুণ না থাক দুষ্টামী বুদ্ধিটুকু পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। হইতে পারে ছেলেমানুষ, সেজন্য এতটা বাড়াবাড়ি উপেক্ষা করা যায় না। তিন চার মাস ধরিয়া পড়াইতেছে, এক দিনের জন্যও তাহার আচরণে কোন প্রকার ইতরবিশেষ দেখিতে পাইল না। স্কুলে বা তাহার কাছে মনীষ কোনদিন পড়া প্যারিয়াছে এমন অপবাদ শ্রীমানের অতিবড় শত্রুও দিতে পারিবে না। ভবিষ্যতে যে ইহার কি উপায় হইবে...। যাক, ইহাতে তাহার কি প্রয়োজন? এমন ছেলের জন্য তাহার কণামাত্র সহানুভূতি নাই—সত্যি নাই। উষ্ণ সুশান্ত। কালই সে জানাইয়া দিবে, ইহাকে পড়ান তাহার সাধ্যের অতীত। নিঃসন্দেহে সে জানাইয়া দিবে। সঙ্কল্পটা প্রায় স্থির সঙ্কল্প করিয়া লইল সে।...

পরদিন বেশ একটু দেরী করিয়াই সুশান্ত পড়াইতে গেল। শেষদিন; দরকার মত একটু আধটু দেখাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবে।

বাড়ীর বাহির হইতেই সুশান্ত শুনিতে পাইল, মনীষ চীৎকার করিয়া পড়িতেছে। ইহা কিন্তু কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। সুযোগ্য ছাত্রটি কি তাহার রাতারাতি 'ফাষ্ট বয়' হইয়া গেল?

নিঃশব্দে সুশান্ত ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মনীষ টের পাইল না।

সুশান্ত দেখিল, মনীষের সুমুখে ভূগোল বইটা খোলা পড়িয়া আছে। আর ইহার পাশেই একটা কাগজে এক অসমাপ্ত বিকৃত গো-মূর্ত্তি। মনীষ নিবিষ্ট মনে ছবিটিকে দ্রুত সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। সময় সময় সে ভুল বা অনাবশ্যক রেখাগুলি রাবার দিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে এবং এই অবকাশে অথবা অকেন্দ্রীভূত মনের সুযোগ লইয়া সে মাঝে মাঝে বইয়ের সঙ্গে তাহার সুনিবিড় সম্পর্ক তারস্বরে প্রচার করিতেছে। মনীষ জানাইতেছিল, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর...এা'...এা'...তাহার পুত্র শের শাহ রাজা হইলেন...রাজা হইলেন।...

হঠাৎ হয়ত তাহার মনে পড়িয়াছে, সুমুখের খোলা বইটা ইতিহাস নহে, ভূগোল। অমনি সে সচেতন হইয়া গলার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া সুরু করিল, ভারতবর্ষের উত্তরে বঙ্গদেশ...।

সুশান্তর রাগ হইবে কি, সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মনীষ ভীষণ চমকাইয়া মাথা তুলিল।

ওঃ, মাষ্টারমশাই! চমকের ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে সে পুনরায় কহিল, হাসছিলেন কেন মাষ্টারমশাই?

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে সে তাহার চিত্রবিদ্যার সাজসরঞ্জাম বস্ত্রান্তরে লুকাইয়াছে।

সুশান্ত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিতে বসিতে কহিল, খুব ভাল ছেলের মত মন দিয়ে পড়ছিলে দেখে আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে হাসি চেপে রাখতে পারিনি।

আনন্দ মাত্রই যে হাসি দিয়া প্রকাশ পায় না, ইহা মনীষ জানে কি না জানা গেল না। তবে সে যে খুব খুসী হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাড়াতাড়ি সে একটা খাতা সুশান্তর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, ট্রেনশ্লেসন করেছি মাষ্টারমশাই।

বেশ বেশ! পিঠ চাপড়াইয়া দিল সুশান্ত। দেখি। বলিয়া সে নিজেই খাতাটা টানিয়া আনিয়া খুলিয়া ফেলিল।

মনীষ ততক্ষণে ট্রেনশ্লেসন বইটা খুলিয়া বলিতে সুরু করিয়াছে, আমরা গতকল্য ফুটবল খেলিয়াছিলাম।

সুশান্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও একটা অক্ষরও পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া কহিল, কি লিখেছ তুমিই পড়।

মনীষ পড়িল, উই আর ফুটবল প্লে ইয়েষ্টারডে

সুশান্ত কহিল, বাঃ, চমৎকার!

প্রশংসায় মনীষের বুক দস্তুরমত ফুলিয়া উঠিল। সগর্ব্বে কহিল, সবগুলো নিজে করেছি। বাবাকে আজ একটাও জিজ্ঞেস করিনি।

তার আর প্রয়োজন কি। তুমি নিজেই তো সুন্দর লিখতে পার।

খুসীতে মনীষের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, এর পরেরটা বলছি মাষ্টারমশাই।

থাক, আর কাজ নেই। সুশান্ত বাধা দিল।

মনীষ ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

সুশান্ত আগের কথার জের টানিয়া কহিল, কারণ, কাল থেকে তোমায় আমি আর পড়াতে আসব না।

মনীষ শুনিল বটে, কিন্তু মাষ্টারমশাইর মনভাবটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশও হইল না। সুশান্ত তাড়া দিয়া কহিল, দেখে আসতো তোমার বাবা বাড়ী আছেন নাকি।

মনীষ মস্ত এক জটিল রহস্য ভেদ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে মাষ্টারমশাইর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর মনীষ ফিরিয়া আসিল।

না মাষ্টারমশাই, বাবা বাসায় নেই। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। বলিয়া মনীষ হাতের মুঠি হইতে তিনটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া সুশান্তর দিকে আগাইয়া দিতে দিতে পুন কহিল, মার কাছে তিনি আপনার মাহিনার টাকা রেখে গেছলেন, মা আমায় আপনাকে দেবার জন্যে দিয়ে দিলেন।

...আজকে পহেলা? সুশান্ত ভুলিয়াই গিয়াছিল! নোটগুলি হাতে লইতেই কেমন একটা আবেশে যেন সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র আবিষ্ট হইয়া আসে। আনকোরা নূতন নোট কয়টি!

মনীষ বলিয়া উঠিল, সত্যি কাল থেকে আর আমায় পড়াতে আসবেন না মাষ্টারমশাই?

সুশান্ত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, পাগল, কেন আসব না? ওটা একটা কথার কথা মাত্র!

# শিশুর খেলনা

শ্রীপ্রতিমা সেন

শিশুদের খেলনা বলতে আমরা নানারূপ বিদেশী খেলনাই বুঝি। আজকালকার বাজারে জাপানী জার্মানী নানারূপ খেলনার আমদানি দেখা যায়। প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক এই সব দু আনা চার আনা দামের খেলনা কিনে নিয়ে শিশুকে উপহার দেন। এমন কি দরিদ্র ব্যক্তিও তার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সেলিউলয়েডের ডল কি একটা বাঁশি, কি মোটর গাড়ি বা এয়ারোপ্লেন ইত্যাদি খেলনা হ'তে বঞ্চিত করেন না। এই সব খেলনা ছোট শিশুর হাতে দিলে সে কিছুক্ষণ খেলা করে, তারপরই দেখা যায় হয়তো খেলনাটি ভেঙ্গে গেছে। এতে অল্পে অল্পে অনেক অর্থই ব্যয় হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না। ওইসব খেলনার প্রতি আগ্রহ সাময়িক, কিছুক্ষণ পর শিশু আর ঐ খেলনায় আমোদ পায় না। এমনি ক'রেই মানুষের জীবনের শিক্ষা গ্রহণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সময় আমরা অযথা পুতুল খেলায় নষ্ট করি। এই সময় শিশুদের ভিতর সর্ববিষয় জানার যে স্পৃহা হয় অভিভাবকরা তা ধ্বংস ক'রে ফেলেন। এর কারণ অভিভাবকদের সে দৃষ্টিশক্তি নেই, যে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে শিশুর দেহ-মনের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

ডাঃ মন্তেসরি পেয়েছেন সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তাই তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন যে শিশুর এইটেই হ'ল শিক্ষা গ্রহণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সময়। জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ, ডাঃ মন্তেসরি বলেন, কোনও এক বিশেষ সময়ে হয়। এক এক সময় তা এক এক ভাবে দেখা দেয়। প্রত্যেক শিশুর ২ বছর বয়স হ'তে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয় জানার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে শিশু যত বেশী এবং যত সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সারা জীবনেও সে আর তা পারে না। এই সময় শিশুর দেহ মন বর্ধিষ্ণু। এক একটি সময়ে এক এক বোধ শক্তির বিকাশ হয়। এই আগ্রহ যদিও ক্ষণস্থায়ী, তবু এই সময়ে শিক্ষা দেওয়া চরিত্র গঠনের দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক দিকের প্রেরণা কিছুদিন পর অন্য দিকের প্রেরণায় পরিণত হয়—এইভাবে শিশু ক্রমে বিকশিত হ'তে থাকে। এই সময় শিশু কেবল গ্রহণ করে মাত্র, বড় হয়ে তবে সে বিদ্যা কাজে খাটায়। যেমন দেখা যায় রোমন্থক জন্তু গাভী ইত্যাদি, প্রথমে কেবল খেয়েই অনেক খাবার সঞ্চয় ক'রে রাখে, তার পর অবসর সময়ে সেই খাদ্য উদ্গিরণ ক'রে একটু একটু ক'রে চর্বণ করে। শিশুও সেইরূপ এই সময় কেবল জ্ঞানলাভ করে যায়, পরে বড় হয়ে তাকে আস্তে আস্তে কার্যে পরিণত করে।

একটি উদাহরণ দ্বারা এই জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির বিকাশের (sensitive period) কথা বলা যেতে পারে। Devries জীব-বিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দেখা যায় প্রজাপতি শৈশবে গাছের অগ্রভাগের কচি পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে, কিন্তু গাছের নীচে গুঁড়ির কাছে অন্ধকার লুকানো কোটরে ডিম পাড়ে। এই ছোট বাচ্চাদের কেই বা দেখিয়ে দেবে যে তাদের খাবার গাছের আগায় রয়েছে? আলো এই প্রজাপতির বাচ্চাদের আকর্ষণ করে, আলো এদের ডেকে নিয়ে যায়। সেই আলোর অনুসন্ধানে অন্ধকার কোটর হ'তে বেরিয়ে এসে তারা চলতে থাকে, এমনি করেই গাছের অগ্রভাগে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানেই তারা তাদের খাবার সুরক্ষিত দেখতে পায়। আশ্চর্য, যখন এরা বড় হয় এবং অন্য খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করার উপযোগী হয়, তখন আর আলোয় তারা আকৃষ্ট হয় না; তাদের সেই বোধ, সেই আকর্ষণ লয় প্রাপ্ত হয়। তখন তারা জীবন-ধারণের অন্য উপায় খুঁজে বেড়ায়।

ডাঃ মন্তেসরি মানবতত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রত্যেক শিশুর এই মৌমাছির ন্যায় বিশেষ কোনও সময়ে বিশেষ কোনও অনুভূতি জন্মে। তখন শিশু সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। শিশুর মনের ভিতর সব সময় কাজ হ'তে থাকে, আর ক্রমে শিশুর মন বিকশিত হয়। যখন শিশু কোনও বিশেষ কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তার অবস্থাটা হয় এমনি। হঠাৎ অন্ধকারের মাঝে আলো এসে পড়লে সে স্থানটা যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, তেমনি শিশুও হঠাৎ জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে; আলো দেখে যেন তার মন সেদিকে ছুটে চলে। এইভাবেই শিশুর বোধ শক্তি জন্মাতে থাকে।

অনেক জিনিসের ভিতর হ'তে কোন একটা বিশেষ কিছু বেছে নেবার শক্তি তাদের আছে তাই তারা বিশেষ কিছুর প্রতি কোনও বিশেষ সময়ে আকৃষ্ট হয়। যেমন প্রথমে শব্দ শিশুর কাছে এক গোলমাল বলে মনে হয়। আমাদের চারদিকে প্রতিদিন নানারূপ শব্দ হচ্ছে; সেই শব্দের ভিতর থেকে ভাষাকে আলাদা ক'রে বোঝা বেশ শক্ত। কিন্তু প্রথমে কোনও তফাত বুঝতে পারে না, যখন তার ভিতর কথা বলার বোধ শক্তি জন্মায় তখন সে এই-সকল নানারূপ শব্দ থেকে নিজেদের ভাষা বেশ বেছে নিতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই শিশুর মাঝে বেছে নেবার শক্তি আছে। সমষ্টির ভিতর থেকে কোনও জিনিস সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে বেশ গ্রহণ করতে পারে।

শিশুদের ভিতর order এক লক্ষ্য করার বিষয়। খুব ছোট শিশু, এই প্রায় ৬ মাস বয়স পর্যন্ত কোনও একটা জিনিস নির্দিষ্ট স্থানে দেখতে ভালবাসে। এর একটি উদাহরণ দিই। একটি ছোট শিশুকে তার নার্স রোজ বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেত। সেখানে একটি ধূসর রংএর বাঁধানো পাথর ছিল; শিশুটি বাগানের অত জিনিসের মধ্যে এইটিই দেখতে খুব ভালবাসত। ওই পাথরের দিকে তাকিয়ে হাত পা ছুঁড়ে খুব খেলত। আমাদের দেশেও আমরা দেখি, ছোট শিশুর দোলনা বা খাটের উপর মায়েরা খেলনা ঝুলিয়ে দেন, শিশু সেইটে দেখে হাসে আর খেলে।

তার পর আরও দেখা যায় শিশু যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানেই দেখতে ভালবাসে। একদিন এক মহিলা এক ভদ্র-পরিবারে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি একটি ঘরে গিয়ে একটা টেবিলের উপর তাঁর ছাতাটা রাখেন। সেই টেবিলের নিকটে খাটের উপর একটি শিশু শুয়েছিল। সে ভীষণ চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। সেই মহিলা মনে করলেন শিশুটি তাঁর কোলে আসতে চায়; তাই তিনি শিশুটিকে কোলে ক'রে অনেক চেষ্টা করলেন কান্না থামাবার, কিন্তু তার কান্না কিছুতেই থামল না। তখন তিনি ভাবলেন শিশুটি হয়তো ছাতাটি নিতে চায় তাই তার হাতে ছাতাটি দিলেন। তার কান্না আরও বেড়ে গেল। তখন তার মা এসে ছাতাটি ছাতা রাখবার জায়গায় সরিয়ে রাখতে, শিশুটি শান্ত হ'ল। শিশুরা কখনও বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারে না। এ বিষয়ে তারা বড়দের অপেক্ষা অনেক বেশী সজ্ঞান। শিশু যত বড় হ'তে থাকে তার এই বোধশক্তি ক্রমে কমে যেতে থাকে। তার পর শিশুর অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি জন্মে। সে আর কোনও জিনিস মোটামুটি সমস্তটা দেখে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় তার অংশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে। ছোট ও সামান্য জিনিস তাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করে। একদিন এক শিক্ষক যীশু খৃষ্টের একখানা ছবি নিয়ে কয়েকটি শিশুর মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর একটি শিশুকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'কি বললাম বল তো?' শিশুটি বললে, 'ঐ দেখুন একটা খরগোশ।'

ছবির নীচের অংশে বনের মধ্যে একটা ছোট্ট খরগোশ ছিল

শিক্ষকের দৃষ্টি তা আকর্ষণ করেনি। কিন্তু তা ওই ছোট ছেলেটির দৃষ্টি এড়ায় নি। শিক্ষক খুব চ'টে গেলেন ভাবলেন তিনি এত ক'রে এই মহাপুরুষের জীবনী বল্লেন, তাঁর এত সুন্দর বক্তৃতার পর সে কিনা বলে সে একটা খরগোশ দেখেছে! তিনি ভাবলেন শিশুটি বোকা। এইভাবেই আমরা শিশুদের ভুল বুঝি, আমরা ভাবি তারা কিছুই পারবে না।

এই জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির বিকাশের সময় তারা প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। আমরা বকুনি দিয়ে তাদের আগ্রহ কমিয়ে ফেলি, এইভাবে আমরা তাদের অন্যপথে ঠেলে দিই।

ছোট শিশুরা প্রতিবেশ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি বিকাশের সময় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম থাকে। তাই শিশুরা প্রত্যেক জিনিসের ভিতর বুদ্ধি দ্বারা প্রবেশ করতে চায়।

শিশু তার বুদ্ধির বিকাশের জন্য যত্নবান। ডাঃ মন্তেসরি কর্তৃক আবিষ্কৃত শিশুর কতকগুলি খেলনা শিশুকে জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি বিকাশের পথে সাহায্য করে। শিশু এই খেলনা থেকেই কাজের নির্দেশ পায়। এই খেলনাগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী এবং এগুলি স্বতই ভুল সংশোধন করতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের প্রধান পাঁচটি বোধ শক্তি আছে। যেমন (১) স্পর্শ বোধ (sense of touch), (২) গন্ধবোধ (sense of smell), (৩) স্বাদ বোধ (sense of taste), (৪) শ্রবণ-শক্তি (sense of hearing), (৫) দৃষ্টিশক্তি (sense of sight)। এই বোধশক্তিগুলিকে প্রত্যেক বিশেষ অঙ্গের নাম অনুসারে অভিহিত করা হয়েছে।

দৃষ্টিশক্তি।—শিশু তার বোধশক্তি দ্বারা বহির্জগত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। দৃষ্টিশক্তি হচ্ছে যা কিছু আমরা এই বহির্জগত থেকে গ্রহণ করি তার সহায়। দর্শন শক্তি দ্বারা আমাদের মধ্যে রং নির্ণয় করবার শক্তি জন্মে। এই শক্তিকে বর্ণ বোধ বা Chromatic sense বলা হয়। প্রত্যেক জিনিসের আয়তন, আকার, অনুপাত ইত্যাদি বুঝতে হ'লে দৃষ্টিশক্তিরই প্রয়োজন। কতকগুলি এমন খেলনা আছে যার সাহায্যে শিশু খেলার ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি লাভ করবে।

রঙিন কাষ্ঠফলক দিয়ে শিশুকে রং চেনবার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমে লাল, নীল, হলদে এই বিশেষ তিনটি রং দেওয়া হয়, তার পর আস্তে আস্তে এই প্রধান তিনটি রং হ'তে যত রং হ'য়েছে সব দেওয়া হয়। এইভাবে শিশুর জ্ঞান বেড়ে যায়।

**শ্রবণশক্তি।**—এই শক্তির বিকাশ শব্দবোধক একরকম চোঙ দ্বারা নির্ণয় করা হয়। প্রথমে শব্দ হ'তে গোলমালের পার্থক্য বোঝানো হয়। এই চোঙগুলির এক একটিতে এক এক রকম শব্দ হয়। শিশুরা এই শব্দের স্তর অনুসারে পর পর চোঙ-গুলিকে জোড়া দিয়ে সাজায়। এইভাবে তারা শব্দ, গোলমাল এবং ভাষার পার্থক্য উপলব্ধি করে, তাদের শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

**স্পর্শবোধ শক্তি।**—এই বোধের অনুশীলন স্পর্শবোধক কাষ্ঠফলক দ্বারা আরম্ভ করা হয়। এই কাষ্ঠ ফলকের এক অংশ মসৃণ ও অপর অংশ খসখসে। তাই শিশুরা মসৃণ এবং খসখসের উপর পর পর হাত বুলিয়ে পার্থক্য উপলব্ধি করে। এইভাবে তাদের যখন স্পর্শবোধ শক্তির বিকাশ হ'তে থাকে তখন তাদের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। তার পর কতকগুলি নানারকম কাপড়, যেমন ভেলভেট, সাটিন, খদ্দর, নেট ইত্যাদির দুটো ক'রে টুকরো নিয়ে সব একত্র ক'রে দেওয়া হয়। তারা স্পর্শ দ্বারা যার যার দুটো ক'রে টুকরো নিয়ে ঠিকমত সাজায়। যখন তারা ভুল না ক'রে ঠিক সাজাতে পারে অর্থাৎ ভেলভেটের সঙ্গে সাটিনকে মিলিয়ে না ফেলে, তখন বোঝা যায় তাদের স্পর্শবোধ শক্তির বিকাশ হয়েছে।

স্পর্শ এবং চাপ এই দুইটির মধ্যে যে পার্থক্য শিশুদের তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই চাপ বোধকে Barric sense বলা হয়। অন্ধ ব্যক্তিদের স্পর্শবোধ এবং চাপ বোধ অত্যন্ত বেশী। তিন রকম ওজনের ছয়খানা ক'রে ফলক মিলিয়ে দিয়ে চোখ বেঁধে ভার উপলব্ধি ক'রে ছেলেরা এক এক ওজনের কাষ্ঠফলক এক এক দিকে পর পর সাজাবে। এইভাবে ক্রমে তাদের ওজনের জ্ঞান সূক্ষ্মতর হয়।

তাপবোধ শক্তি (tharmic sense)।—কতকগুলি এলু-মিনিয়মের ৬টি ৬টি ১২টি কৌটায় ১০° ডিগ্রি থেকে ৬০° সেনটিগ্রেড পর্যন্ত (১০°, ২০°, ৩০°, ৪০°, ৫০°, ৬০°) এই-ভাবে গরম জল ভরে দেওয়া হয়। হাতে নিয়ে উত্তাপ বুঝে তারা জোড়া জোড়া ক'রে ক্রমিক নিয়মে পর পর সাজায়। এইভাবে তাদের তাপবোধ শক্তি বিকশিত করা হয়।

আর একটি বোধ শক্তি আছে তাকে বলা হয় Steneognostic sense। যে শক্তির ব'লে অন্ধ ব্যক্তিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। খেলনার সাহায্যে এই শক্তিটিরও অনুশীলন হয়।

শিশুদের গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির বোধগুলিও বর্দ্ধিত করা হয়। গন্ধ বলতে সুগন্ধি দ্রব্য এবং পচা গন্ধ দুটোই বোঝায়। ভাল গন্ধ আমরা সমস্ত নাসিকা দিয়ে গ্রহণ করি, খারাপ গন্ধ নাসিকার অগ্রভাগ দিয়ে গ্রহণ করি। স্বাদ বলতে অম্ল, লবণ, মিষ্টি এবং তিক্ত এই প্রধানকয়টিকে বোঝায়। খাবার সময় আমরা ঘ্রাণটাই খাই। নানা রকম জিনিস শিশিতে ভ'রে গন্ধ নিয়ে কোনটা কি দ্রব্য তা বলতে শেখানো হয়।

এইভাবে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির শক্তি আগে বিকশিত ক'রে তবে অন্য লেখাপড়া শেখানো দরকার। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ভালভাবে শক্তিসম্পন্ন হ'লে খুব অল্প দিনেই শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারে। শিশুরা ভাবে তারা খেলা করছে। এইভাবে, খেলারই ভিতর দিয়ে তারা লেখাপড়ার জন্য তৈরী হ'তে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই তারা অনেক শক্ত ব্যাকরণ, জ্যামিতি, অঙ্ক প্রভৃতি শিখে ফেলে। তাই দেখা যায় এই সময়টিতে যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সময় তারা যে যেভাবে গঠিত হবে পরে কর্মক্ষেত্রে এসে তারা সেই রকম ফল লাভ করবে। তাই ভিত্তি ভালরূপে তৈরী করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

# নন্দা*

( উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি )

**শ্রীঅমিয়া সেন**

( ১৩ )

সুবীর কলিকাতার মেসে ফিরিয়া আসিল। মনটা বাড়ি হইতেই খারাপ করিয়া আনিয়াছিল, ঠিক হইতে কিছু সময় লাগিল। মোহ্যমান ভাবটা কাটাইয়া উঠিতে তাহার মনে হইল, নন্দাকে একখানা চিঠি লিখি, কিন্তু তার পরেই তাহার পুরুষের মন কঠিন হইয়া বলিল, না, দরকার নাই। তার এই অসুখে সামান্য পাঁচ দশটি টাকা তাকে ফল খাইতে দিবারও সামর্থ্য তার নাই, চিকিৎসার খরচ তো দূরের কথা। তবে কোন্ মুখে সে বিনাইয়া বিনাইয়া চিঠি লিখিবে? তার চেয়ে থাক, যত দিন না সুবীর উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, নন্দার চোখের জল নিঃশেষে মুছাইয়া দিতে পারে, তত দিন সে নন্দাকে কোনও চিঠি লিখিবে না। নন্দা তাহাকে নিষ্ঠুর মনে করিবে; কিন্তু যেদিন সুবীরের বুকে মাথা রাখিয়া সে তাহার জন্য সুবীরের কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস শুনিবে, সেদিন আর সে স্বামীকে নিষ্ঠুর ভাবিতে পারিবে না। সুবীর আর্থিক উন্নতির জন্য এবার মরিয়া হইয়া কঠিন কর্মসমুদ্রের তরঙ্গে আপনাকে নিক্ষেপ করিল।

দেখিতে দেখিতে আট মাস কাটিয়া গেল। এতদিনে সুবীরের ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইলেন, তাহার অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সেই অফিসেই সুবীরের কল্পনাতীত পদোন্নতি ঘটিল। সত্তর টাকা মাহিনা হইতে তাহার মাহিনা হইল পৌনে দুই শ। পদোন্নতি হইতেই সুবীর বাসা বাঁধিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহা ছাড়া বাহিরের আয়ও তাহার কিছু ছিল। অমিতার বিবাহের ঋণ সে অনেকটা শোধ করিয়া আনিয়াছে, বাকী যা আছে, এখন তা আস্তে আস্তে শোধ করিলেই চলিবে। নন্দার সংবাদ সে মাঝে মাঝে যামিনীর চিঠিতে পাইত। সে নাকি ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

সুবীরের পদোন্নতির সংবাদ পাইবামাত্র যামিনী সুবীরকে লিখিলেন, বাসা ঠিক করিতে। ভগবান দয়া করিয়া যখন সুবিধা করিয়া দিয়াছেনই তখন আর কেন তাঁরা পাড়াগাঁয়ে পচিয়া মরেন। সুবীরেরও তাই ইচ্ছা; বাসা ঠিক করিয়া সুবীর সকলকে চলিয়া আসিতে লিখিল। যামিনী আসিলেন, দেবনারায়ণ আসিলেন, প্রবীর আসিল, প্রমীলাও তার নবজাত শিশু কন্যাকে লইয়া আসিল।

সুবীরের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল হইল, এবার সে নন্দাকে চিরদিনের মত কাছে পাইবে। আর হারাইবার ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কাও আর নাই। নন্দাকে আনিতে যাইবার জন্য ছুটির দরখাস্ত করিয়া সুবীর রওনা হইবার পূর্বে নন্দাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিল।

× * × * ×

অনেক দিন পরে সেদিন নন্দার চাপিয়া জ্বর আসিয়াছিল। সারা দিন পরে সন্ধ্যার দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেলে সে ক্লান্ত দুটি চক্ষু মেলিয়া স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দিন জ্বর যন্ত্রণার পর তখনকার দেহমনের সেই মধুর অবসাদটুকু সে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিল।

সন্ধ্যার প্রশান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া নন্দার মনটাও সহসা উদাস হইয়া গেল। চকিতে মনে হইল, এই পৃথিবীর ওপারেও আর এক পৃথিবী আছে। সে পৃথিবী হিমশীতল, চন্দ্রসূর্যের আলোকহারা, মৃত্যুর পৃথিবী। সে পৃথিবীর যাত্রাপথে মানুষ সঙ্গীহারা, কোনও কালে সেখানে কাহারও একাকিত্ব ঘোচে না। সেখানে মানুষ চিরনিঃসঙ্গ।

নন্দা উদাস মনে ভাবিতে লাগিল, তাহাকেও সেখানে যাইতে হইবে। এখানে যাহারা আছে, তাহাদের কেহই সঙ্গী হইবে না। স্বামী? সেও তো সেখানে তার কেহ নয়! তবে, তবে, তবে কি সেখানেও নন্দা এ জন্মের মত এমন করিয়া কাঁদিবে? হয়তো কাঁদিবে না, এই রক্তমাংসের গড়া শরীরের সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়তো সেখানে নাই। আঃ, তাহা হইলে তো নন্দা বাঁচিয়াই যায়।

নন্দার মা একটি পেয়ালায় করিয়া এক পেয়ালা বেদানার রস লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। নন্দার কাছে বসিয়া কহিলেন, "এইটুকু খা তো মা।"

নন্দা বিতৃষ্ণভাবে চোখ বুজিয়া কহিল, "ওতে অরুচি ধ'রে গেছে মা, আর ভাল লাগে না।"

"তা তো বুঝি, তবু না খেলে শরীরে বল পাবি কি ক'রে?"

"বল?" নন্দা ক্ষীণ হাসিয়া শয্যালীন দেহটার দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, "আর কত বল হবে।"

মার বুক কাঁপাইয়া একটি নিঃশ্বাস উঠিল; কষ্টে সেটাকে চাপিয়া ভর্ৎসনার সুরে কহিলেন, "কি ক'রে বল হবে, ওষুধ খাবি নে, পথ্য খাবি নে—"

নন্দা তেমনিভাবেই শ্রান্তির হাসি হাসিয়া কহিল, "আমি ওষুধ খাই নে? তবে—"

সেল্ফের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "তবে অতগুলো শিশিকে খালি কে করলে? মিছে কথা ব'লো না মা, দাও কি দেবে।"

এক নিঃশ্বাসে পেয়ালাটা অর্ধেক করিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া কহিল, "আর পারি নে।"

"আর একটু, লক্ষ্মীটি।"

"না মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

অগত্যা মা পেয়ালা সরাইয়া নিলেন। কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "শরীর এখন কেমন লাগছে?"

বেশী কথা বলিতে নন্দার ইচ্ছা হইতেছিল না, সংক্ষেপে কহিল, "ভাল।"

খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া মা সন্তর্পণে কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া কহিলেন, "দেখ্ তো কে লিখেছে তোর কাছে। সকালে এসেছে, তখন তোর জ্বর, তাই দিতে পারিনি।"

নন্দা ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা টানিয়া লইল। এখানে আসিয়া অবধি সে কতকটা রোগজনিত দুর্বলতার জন্য ও কতকটা মনের অপরিসীম বৈরাগ্যের জন্য কাহারও কাছেই চিঠিপত্র দিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহার কাছেও কেহ পত্র আজকাল বড় একটা দেয় না। মাঝে মাঝে বিশ্বপতিবাবুর কাছে দেবনারায়ণের চিঠি আসে বটে, তাও পোস্টকার্ডেই আসে। নন্দার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া সে পত্রে অন্য বিষয় কিছু থাকে না। তাই হঠাৎ একখানা মোটা খামের চিঠি পাইয়া নন্দা যত না আশ্চর্য হইল, তাহার চেয়েও বেশী হইল তার উল্লাস।

খামের উপরের ঠিকানায় সুবীরের হস্তাক্ষর। নন্দার সর্বশরীর সহসা এক বিপুল উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি খামের মুখ ছিঁড়িয়া সে চিঠিখানা বাহির করিতেই চোখে পড়িল—"স্নেহের নন্দা, নন্দরানী আমার!"

নন্দার হাত কাঁপিতে লাগিল, বুক কাঁপিতে লাগিল। কত দিন, কত দিন পরে সুবীর তাহাকে আদর করিয়া চিঠি লিখিয়াছে! এক বছর, ঠিক এক বছর পরে। সে এখানে আসিয়াছে এই আট মাস, তার চার মাস আগে হইতেই সুবীর আর তাহাকে আদর করিয়া চিঠি লেখে নাই। অমিতার বিবাহের পর হইতে স্বামিস্ত্রীর দুঃখময় প্রেমের বন্ধনও যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। একজনের মন ব্যাপৃত থাকিত ঋণের চিন্তায়, আর একজনের মন তাহারই দুঃখের চিন্তায় অভিভূত হইয়া।

কিন্তু এত দিন পরে সুবীর এত কি লিখিয়াছে? নন্দা পড়িতে লাগিল। একে একে সবই সে পড়িল। সুবীরের কর্মোন্নতি, গৃহরচনা, সে গৃহকে লক্ষ্মীর পদার্পণে সার্থক করিবার জন্য নন্দাকে লইতে শীঘ্রই তাহার দিল্লি আগমন, সব। নন্দার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে।

মা কহিলেন, "কে লিখেছে রে?"

সহসা মেয়ের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "ও কি অমন করছিস কেন?"

নন্দার শিথিল মুষ্টি হইতে চিঠিখানা খাটের নীচে পড়িয়া গেল। নন্দা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্বপতিবাবুর ভবনে শহরের সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের একত্র সম্মিলন ঘটিল। তবু তার পরদিন বেলা চারটা পর্যন্ত নন্দা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়াই পড়িয়া রহিল। বিশ্বপতিবাবু পাগলের মত ছট্‌ফট করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আর ডাক্তারদের হাত ধরিয়া নন্দার জীবন রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছিলেন।

বিমলার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানিতেছিল না। দারুণ আশঙ্কায় তাঁর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে নন্দার চৈতন্য ফিরিতে লাগিল।

ডাক্তারদের মুখে সাফল্যের তৃপ্তি ফুটিল।

বিশ্বপতিবাবু ও বিমলা দুজনে দুদিক হইতে নন্দার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে নন্দা শ্রান্তিসূচক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, আঃ—

নন্দার শয়ন কক্ষের অনতিদূরে বাগানে পাইন ও ঝাউগাছের শীর্ষ কাঁপাইয়া চৈত্র বাসন্তীর মৃদু মধুর হাওয়া শন্ শন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, ছোট বড় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কত গাছের পাতায় পাতায় তখন গোধূলি বেলার সূর্যালোক পড়িয়া গভীর বৈরাগ্যে যেন যাই যাই করিতেছিল। ঝাউগাছের ঝির ঝির বাতাসে সেই শব্দের গম্ভীর প্রতিধ্বনি কাঁপিতেছিল, যাই যাই—নন্দার চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা তাহাকে কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি দিয়া গেল। ক্ষীণস্বরে কহিল, কি সুন্দর!

বিমলা মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহ ব্যাকুল স্বরে ডাকিলেন, নন্দা।

নন্দা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া থামিয়া থামিয়া মৃদুস্বরে কহিল, মা, এখন ত বিকেল, নয়? বিমলা অশ্রুধোয়া উৎফুল্ল মুখে কহিলেন, হ্যাঁ, মা, একটু ভালো লাগছে?

ডাক্তারেরা ইঙ্গিতে তাঁহাকে থামিতে বলিলেন, রোগিণীর অত্যধিক দুর্বলতা এখনও তাঁহাদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছিল।

নন্দা তাঁহাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্বের ন্যায় ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সন্ধ্যে আসার আর কত দেরী মা? আবার একটু পরে কহিল, আজকের বিকেলটি কি সুন্দর বাবা! আমার আর ঘরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঐ বাগানে, বাবা, ঐ বাগানে একবার আমাকে নিয়ে যেতে পার? বাইরে কিসের একটি অস্ফুট কলরোল উঠিল, সেটা ভালো করিয়া কানে আসিতে না আসিতেই যে আগন্তুক যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তার দিকে চাহিয়া বিশ্বপতিবাবু বিস্ময়ে সহসা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

ডাক্তারেরা রোগিণীর ঘরে আগন্তুকের এই রকম অনধিকার প্রবেশে রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যুবকের কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না। ভীড় ঠেলিয়া ততক্ষণে সে নন্দার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বহুদূর হইতে সে আসিয়াছে। সর্বাঙ্গে পথশ্রমের সুস্পষ্ট চিহ্ন। দুটি চক্ষে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা.........অপরিসীম আনন্দে নন্দার শ্বাস রোধ হইয়া আসিল। শেষ আরতির স্তিমিত প্রদীপ শিখার মত নিস্প্রভ চোখ দুটি স্বামীর মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে কহিল, তুমি—এলে!

নন্দা চোখ বুজিল। মৃত্যু আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। মৃত্যু-বিকৃত অধরের মধ্য দিয়া, গভীর বেদনাময় হতাশ দেহ-সঞ্চালনের মধ্য দিয়া তার মূক প্রাণ যেন আর্তনাদ করিয়া কহিতে চাহিতেছিল, যাবনা—যাবনা, আজ আমি যাবনা। কিন্তু মহাকালের বধির শ্রবণে তার সে কাকুতি পৌঁছিল না। ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু সমাপ্তির রূঢ় আকর্ষণে অবসন্ন দেহ ছাড়িয়া নির্মল জীবন প্রবাহে মিলাইয়া গেল।

এত আনন্দ সে সহিতে পারিল না।

গৃহব্যাপী শোক কোলাহলের মধ্যে ধীরে ধীরে সুবীর জানু পাতিয়া নন্দার শয্যাপার্শ্বে বসিল।

(শেষাংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# শ্রীনিকেতনে পল্লী-স্বাস্থ্যসংগঠন

(৪)

কালীমোহন ঘোষ

বীরভূম জেলা এক ফসলের দেশ। ধানই একমাত্র চাষ। কোন বৎসরে বৃষ্টির তারতম্য হইলে ধান নষ্ট হইয়া যায় এবং সমগ্র জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

তিন চার বৎসর পর পর প্রায় শস্যহানি ঘটে। নিম্ন বঙ্গে সুপারী, নারিকেল, বেত ইত্যাদির যেমন আয় আছে, এ জেলায় তেমন নাই। দো-ফসলের জমি অতি নগন্য, তাহার আয় ধর্তব্যের মধ্যে নহে। বীরভূমের উঁচু ডাঙ্গা জমিতে ধান খুব কম হয়। জেলার নীচু জমিতে ধানের চাষ ভাল হয়।

সত্তর বৎসর পূর্বে এতটা দুরবস্থা ছিল না। এই জেলায় ষোল হাজার সিঁচের পুষ্করিণী আছে। পল্লীর পঞ্চায়েৎগণের তত্ত্বাবধানে সেই পুষ্করিণীগুলিকে ভাল অবস্থায় রক্ষিত হইত। এবং তাহার সঞ্চিত জলে তুলা এবং তুঁতের চাষ হইত। সেইজন্য এ জেলা হইতে রেশম ও সুতার কাপড় বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোঃ আমলে কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট মিঃ চীপ এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র ও রেশম বিদেশে রপ্তানি করিতেন। পরলোকগত লর্ড সিংহের পূর্বপুরুষগণ চীপ সাহেবের তাঁত বিভাগের দেওয়ান ছিলেন এবং তাহার দ্বারা তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছেন। ঐ সকল সিঁচের পুষ্করিণী এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সিঁচের পদ্ধতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে শীতকালে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না এবং ধানের উপরেই অধিবাসীদিগকে নির্ভর করিতে হয়। ধানের জন্য যেটুকু জলের প্রয়োজন, তাহা তাহারা সকল বৎসর পায় না। যে বৎসর শস্যহানি হয়, সে বৎসর কর্জ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। সেই কর্জ শোধ দিতে তিন চার বৎসর সময় লাগে। তাহা সম্পূর্ণ শোধ হইতে না হইতেই বৃষ্টির তারতম্যবশত আবার শস্যহানি ঘটে। সেজন্য কৃষকগণ আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন। এ জেলায় কৃষকদের বাগানের কোন আয় নাই। তাহারা তরিতরকারী ফলের চাষে অনভ্যস্ত। গরুর অবস্থাও খুব শোচনীয়। গরুর প্রধান খাদ্য খড়। সেই খড় হইতেই ঘরের চালা ছাওয়ান হয়। সেইজন্য খড়ের দাম খুব বেশী এবং গরুগুলি অর্দ্ধাহারে শীর্ণকায়। পূর্বে চাষের ধান ঢেঁকিতে ছাঁটা হইত এবং তাহার খুদ, কুঁড়োতে গরুর আহার্য হইত। বর্তমানে এই জেলায় ধানের কলের সংখ্যা ৭২টি। অধিকাংশ কৃষকই কলেতে ধান বিক্রয় করে বলিয়া গ্রামে খুদ, কুঁড়ো পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য গরুর খাদ্যের অভাব পড়িয়াছে।

নিম্নবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ হইতে বীরভূম জেলায় চাষের ব্যয় অধিক, জমির উর্বরতা খুব কম। সেজন্য প্রচুর সার দিতে হয়। জলসেচনের জন্যও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া শিক্ষায়ও ইহারা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। স্কুল, পাঠশালার বেতন ইহারা যোগাইতে পারে না। গ্রামে শতকরা ৭৫ জনের পাঠশালার বেতন দিবার শক্তি নাই।

১৯২৫ সালে আমরা বল্লভপুর গ্রামে তথ্যসংগ্রহ করি। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত গ্রামে ২৪ ঘর লোকের মধ্যে আট ঘরের জায়গা জমি কিছুই নাই। তিন ঘর লোকের ৩০ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে। এই ২৪ ঘরের মধ্যে এই তিনটি পরিবার মাত্র চাষের আয় হইতে বৎসরের খরচ নির্বাহ করিতে সক্ষম। তাহারাও মাঝে মাঝে শস্যহানির জন্য ঋণগ্রস্ত। বাকী ২১টি পরিবারের অবস্থা অতি শোচনীয়।

এই জেলায় ধানের চাষ হইতে আয় খুব কম হয়। বল্লভপুরে বিঘা প্রতি গড়ে পাঁচ মণ ধান হয়। নিখুঁত হিসাব সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে, এক বিঘা জমিতে চাষের মোট ব্যয় ১৮৶১০ আনা। তাহা হইতে মোট আয়, ধানের মণ দুই টাকা হিসাবে ধরিলে, পাঁচ মণের মূল্য দশ টাকা এবং আধ কাহন খড়ের মূল্য তিন টাকা মোট তের টাকা। জমির খাজনা দিয়া তাহার কিছুই থাকে না। তবে তাহার নিজের বাড়ির সার এবং নিজের ক্ষেতের খড় থাকাতে গরুর খাদ্যের মূল্য ধরা হয় না এবং নিজের কায়িক শ্রমের মূল্য দিতে হয় না বলিয়া চার পাঁচ টাকা লাভ হয়। এইরূপ আর্থিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে কার্য করিতে হইয়াছে।

সেইজন্য বাঙলার যে সকল জেলার আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় নহে, সেখানে সংগঠন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা আরও অধিক সফলতা লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু নানা কারণে এই জেলায় আমাদের কর্মক্ষেত্র হওয়াতে আমাদের প্রচণ্ড উদ্যম সত্ত্বেও আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই।

প্রথমে আমরা যে গ্রামে স্বাস্থ্য সংগঠন আরম্ভ করি, নিম্নে তাহার একটি বর্ণনা দিতেছি। তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা কিরূপ প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

### বল্লভপুর

১৯২২ সালে আমরা এই গ্রামে সংগঠন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় গ্রামে ২৪টি পরিবার ছিল এবং লোক সংখ্যা ছিল ৮৪। গ্রামের প্রান্তে ২৪টি পরিবার ছড়াইয়া ছিল। মাঝখানে অসংখ্য বাস্তুভিটা খেজুরের ঝোপ ও কাঁটাবনে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ সকল গ্রামের অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়ায় প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামের মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত রাস্তা ছিল, তাহাও কাঁটা-বনে ঢাকিয়া গিয়াছে। মাঝখানে একটা সরু গো-পথ বর্তমান। তাহারই একপাশে একটা ভগ্ন দেউল অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই দেউলের দরজা ভগ্ন। উহার ভিতরে শেয়াল, কুকুর বাস করিত। তাহার গায়ে চারিদিক দিয়া বট, অশ্বত্থের গাছ ডাল পালা বিস্তার করিতেছিল। অধিবাসীদিগের প্রত্যেকেই প্লীহাগ্রস্ত, গায়ে রক্ত নাই। গ্রামের চেহারা দেখিলেই মন আতঙ্ক ও বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

আমরা এই গ্রামে একটি ব্রত-বালক দল গঠন করিতে সক্ষম হই নি। কারণ ২৪টি পরিবারের মধ্যে বারটি বালক ছিল না, যাহাদিগকে লইয়া ব্রতী বালক দল গঠন করা যায়। ইহার দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শিশু মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ।

গ্রামের চারটি সিঁচের পুকুর রহিয়াছে। সেগুলিতে বর্ষাকালে এক হাঁটু জল জমে ও তাহা আগাছায় পরিপূর্ণ থাকে। এবং তাহাই ম্যালেরিয়ার মশা এনাফেলিসের আদর্শ জন্মস্থান। নিকটেই কোপাই নদী। ড্রেনের ব্যবস্থা থাকিলে, গ্রামের আবদ্ধ জল সহজে নিষ্কাশিত হইয়া নদীতে পড়িতে পারে। বর্ষাকালে রাস্তায় জল জমিয়া এত কাদা হয় যে, বোঝা লইয়া গরুর গাড়ীর যাতায়াত দুঃসাধ্য।

১৯২৫ সালে ডাক্তারখানার রেকর্ড হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ৮৪ জন অধিবাসীদের মধ্যে ৭১ জনই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে যখন আমরা কার্য আম্ভ করি, তখন অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। আমরা প্রথমেই জঙ্গল নির্মূলে করিতে চেষ্টা করি। শ্রীনিকেতনের কর্মিগণ নিজেরাই কোদাল ধরিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে ব্রাহ্মণ, মুচি সকলেই আসিয়া যোগদান করে এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় বাহিরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও অধিবাসী-দিগকে অবসর সময়ে খাটাইয়া ক্রমে তিন বৎসরে গ্রামের ভিতরকার যাবতীয় জঙ্গল নির্মূল করা হয়।

(শেষাংশ ৯৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# রাখাল ও রাজকন্যা

( গল্প )

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দেখিলেই চিনিতে পারিবে। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। আপন মনে যখন তখন যাহা তাহা বকিয়া যায় আর গান গায়। লোক দেখিলে কুশল প্রশ্ন করে তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যায়। নাম তাহার নন্দ কিন্তু গ্রামে সে নন্দ পাগলা বলিয়া পরিচিত।

ভোর তখনও ভাল করিয়া হয় নাই, একটু একটু ফরসা হইতে আরম্ভ করিয়াছে কেবল। নন্দ বাহিরে আসিয়া বসিল। এখনও মালতী আসিতেছে না কেন! সে তো খুব সকালেই আসে। এই গ্রামেরই মেয়ে মালতী। নন্দর উপর মালতীর কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। আপন-ভোলা লোক নন্দ, মালতী না দেখিলে হয়তো না খাইয়াই কাটাইয়া দিবে। জানে শুধু হি হি করিয়া হাসিতে। মাঝে মাঝে মালতীর বড় রাগ হয় নন্দর উপর। একটু দেখিয়া শুনিয়া চলিতে কি দোষটা হয় বাপু!

"একি, খুব সকালেই জেগেছ যে নন্দদা।"

"আরে!" নন্দ পিছন ফিরিয়া বলিল, "মালতী যে, এত দেরী হল কেন? আমি কখন থেকে জেগে বসে আছি।"

"ওমা, দেরী আবার কই করলাম? আমি তো রোজই এই সময় আসি।"

"তাই না কি? হি হি হি—"

মালতী রান্নাঘরের দিকে যায়।

"আজ আমি তোর কাজ করা দেখব চল্," নন্দও যায় মালতীর পিছন পিছন।

মালতী প্রত্যহ উনুন ধরাইয়া রান্না চড়ায়। সংসারের নানা কাজ করে। তারপর ঘুমন্ত নন্দকে জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

* * * *

এবার পুজো একটু দেরীতে। শরৎ শেষ হইয়া গেছে। প্রথম হেমন্তের স্পর্শে আকাশে বাতাসে চারপাশে যেন সাড়া পড়িয়া গেছে। সমস্ত গ্রামে একটা নূতন সৌন্দর্য দেখা দিয়াছে। সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে পুজোর আনন্দে। প্রকৃতির সজীব স্পর্শ রঙ্ ধরাইয়া দিয়াছে হৃদয়ের ধারে ধারে। আজ সপ্তমী।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। নন্দ কাপড় বাহির করিয়া পরিল, চুড়িদার পাঞ্জাবী চড়াইল অঙ্গে তারপর একখানি ভাঙা আয়না হাতে করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল। আজ গ্রামে যাত্রা হইবে—মালতী বলিয়া গিয়াছে যথাসময়ে নন্দকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে—তাই নন্দ প্রস্তুত হইতেছিল। খাওয়া তাহার হইয়া গিয়াছে। আজ মালতী তাহাকে খাওয়াইয়াছে কাছে বসাইয়া। এমনি কাছে বসাইয়া মালতী মাঝে মাঝে নন্দকে খাওয়ায়—নানা রাজ্যের গল্প করিতে করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা আহার করে। কিন্তু আজ খুব তাড়াতাড়ি তাহারা খাওয়া সারিয়া লইয়াছে আর আজ মালতীর মুখে যাত্রা দেখার এক অপরূপ ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হইয়াছিল। নন্দ সেই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দ। নন্দ বুঝিল মালতী আসিয়াছে। পিছন না ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস যে ছুঁড়ি?"

"কি সেজেছ নন্দদা মরে যাই!"

"হুঁ", মালতীর দিকে ফিরিয়া নন্দ বলিল, "আরে! তুইও যে খুব ভাল কাপড় পরেছিস—" নন্দর চুল আঁচড়ানো ততক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছিল।

"যাত্রা কখন হবে নন্দদা?"

"দেরী আছে রে।"

তাহারা দুইজনে বসিয়া পড়িল। একটু চুপচাপ।

"হ্যাঁরে মালতী," নন্দ সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কেমন দেখাচ্ছে রে?"

হাসিতে হাসিতে মালতী বলিল, "ঠিক যেন সং"।

কথা শুনিয়া অকস্মাৎ নন্দ রাগিয়া উঠিল, "বলি বসে বসে রূপচর্চা করবি, না যাত্রা শুনতে যাবি ছুঁড়ি? শেষে যায়গা না পেলে—"

নন্দ এমন কড়া করিয়া মালতীর সহিত কখনও কথা বলে নাই। তাই সে অবাক হইল, দুঃখও হইল তাহার। সে শুধু নন্দকে বাধা দিয়া বলিল, "ওমা আমি আবার কই দেরী করলাম, তুমিই তো—"

"থাম্ থাম্," নন্দ উঠিয়া পড়িল, "চল্ তাড়াতাড়ি।"

মালতী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনা দোষে বকুনি খাইয়া তাহার রাগ যে হয় নাই এমন নহে। পথ চলিতে চলিতে একটি কথাও সে বলিল না।

"চুপ করে কেন রে?" নন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি কেন আমায় বকলে শুধু শুধু?" মালতীর চোখে জল জমিয়া উঠিল।

"কই বকলাম?" নন্দ আশ্চর্য হইয়া চোখ বড় করিল।

"বাড়ী থেকে বেরুবার আগে?"

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া নন্দ কহিল, "তামাসা করিস না, তোকে আমি বকতে পারি কখনও!"

তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

* * * *

যাত্রায় যে ছেলেটি রাজকুমার সাজিয়াছিল, তাহার যেমন চেহারা তেমনি কণ্ঠস্বর; নাম কিশোর। ছেলেটি সত্যই ভাল যাত্রা করিতে পারে। সমস্ত গ্রাম তাহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

যাত্রার দলে কিশোরের খাতির আছে বেশ কেননা সে বড় লোকের ছেলে। পাশের গ্রামে তাহাদের মস্ত বড় ব্যবসা—সখ করিয়া সে যাত্রা করে। কিশোরকে পাইয়া যাত্রার দল ধন্য হইয়া গিয়াছে—তাহারই জন্য দলের সব যায়গায় অত খাতির। পুজো শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যাত্রার দল থাকিয়া যাইবে এখানে আর কিছুদিন। বড়লোকেরা বায়না দিয়া গিয়াছে আর করিয়াছে কিশোরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কিশোর ছেলেটির কিন্তু এজন্য মোটেও অহংকার নাই—যেমন রূপ তেমন গুণ। মালতীর পিতা গোলক স্ত্রীকে ঠিক সেই কথাটাই বলিতেছিল, 'আহা, ঠিক যেন রাজপুত্র গো।'

'কার কথা বলছ?' সারদা জিজ্ঞাসা করিল।

'যে ছেলেটা রাজপুত্র সেজেছিল গো।'

'যা বলেছ কিন্তু, ওকে আননা একদিন গান শুনি।'

'হ্যাঁ আনব নিশ্চয়ই।'

'কালই আন নয়তো ওরা আবার চলে যাবে।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা আনব', গোলক হুঁকাতে একটা দীর্ঘ টান দিল।

গোলক যথাসময়ে কিশোরকে সত্যই লইয়া আসিল। চেহারা তাহার সত্যই রাজকুমারের মত সেকথা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার দিকে চাহিয়া সারদা ভাবিতে লাগিল অমন চাঁদের মত একটি ছেলে-যদি তাহার থাকিত! সারদা কিশোরের কাছে আসিয়া বসিল।

'তোমার বাড়িতে কে কে আছে বাবা?'

'কেউ না মা,' কিশোর হাসিল।

'বউমা?'

আবার কিশোর হাসিল, 'আমার তো বিয়ে হয়নি মা।'

এমন সময় নন্দকে সঙ্গে লইয়া মালতী প্রবেশ করিল, কিশোরের গান শুনাইবার জন্য মালতী তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিল।

মালতী কিশোরের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। কিশোরও দেখিল মালতীকে, সহসা সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে নন্দ আসিয়া কিশোরের পাশে বসিল।

'কি ভাই কখন এলে?'

'এই তো কিছুক্ষণ।'

'এবার তাহলে গান আরম্ভ হোক', গোলক বলিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,' নন্দ হাসিল, হি হি হি—'

কিশোর একবার চারদিকে চাহিল—মালতী দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছে—সেদিকে চাহিয়া কিশোরের গান গাহিবার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল। সে আরম্ভ করিল গাহিতে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। অমন গান এ বাড়ীর কেহ কখনও শুনে নাই।

গান থামিবার পর নন্দ বলিল, 'আহা!'

গোলক বলিল, 'শিখেছিলে বটে তুমি!' সারদা অবাক হইয়া শুধু কিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আর একজন আড়াল হইতে গায়কের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহা লক্ষ্য করিয়া কিশোর খুসী হইল।

* * * *

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিশোর প্রত্যহ মালতীদের বাড়ী আসে, গান গায়। মালতীর সহিত তাহার কয়েকটা কথাও হইয়াছে। বলিতে গেলে আপনার গুণের জন্য কিশোর একেবারে গোলকের ঘরের ছেলের মত হইয়া গেল। কিন্তু ঘরের ছেলের মত হইলে কি হয়, এবার তাহাকে যাইতে হইবে—যাত্রার দল এবার এ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবে। মালতী একথা শুনিয়াছে। কিশোরও চলিয়া যাইবে শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। মালতীর কাছে বিদেশী রাজকুমারের মত অকস্মাৎ কোথা হইতে কিশোর আসিয়া পড়িয়াছে—তাই আজ মালতীর নিজেকে মনে হইতেছে রাজকন্যার মত; সেই কিশোর চলিয়া যাইবে। কিশোরী গ্রাম্য বালিকার বুকে উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া উঠে।

এক দিনকার কথা বলি।

সন্ধ্যা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই—একটু একটু আলো আছে চারধারে—মৃতপ্রায় গোধূলির ম্লান আলো। মালতী পুকুর হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল।

'শোন।'

মালতী চমকিয়া দেখিল পিছনে কিশোর। তাহার সমস্ত শরীর শির শির করিতে লাগিল। মাথা নীচু করিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিশোরের দিকে আর চাহিবার সাধ্য তাহার নাই।

'আমরা কাল যাচ্ছি,' আস্তে আস্তে কিশোর বলিল।

মালতী কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার চোখে জল ভরিয়া উঠিল।

'মালতী কথা বলনা কেন? আমরা কাল যাচ্ছি।'

'কি বলব আমি?'

'তোমার মন খারাপ করবে না আমি চলে গেলে?'

মালতীর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল। মন তাহার খারাপ করিবে সে-কথা সত্য কিন্তু কিশোরের সামনে সে তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিবে!

'বল মালতী, তোমার মন খারাপ করবে না?'

তবু মালতী উত্তর দিল না।

'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

'হ্যাঁ তুমি চলে গেলে আমার মন খারাপ করবে,' মালতীর গাল বাহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এইবার কিশোরের মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

মালতী কিছু বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে বলিল, 'যাব।'

'সত্যি যাবে মালতী?'

'হ্যাঁ সত্যি যাব।'

'বেশ আমি তোমায় নিয়ে যাব', কিশোর আর দাঁড়াইল না। নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * *

তারপর আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। যাত্রার দল এ গ্রাম হইতে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু নন্দ শুনিয়াছিল কিশোরের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া মালতীকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছে—তাহার বিবাহের আর দেরী নাই।

আজকাল আর মালতী আসে না, নন্দ পাগলার বড় কষ্টে কাটে প্রত্যহ। সে কিছুই বুঝিতে পারে না—বিবাহ হইবে তো হইয়াছে কি, নন্দ পাগলার কাজগুলি এক সময় যদি মালতী করিয়া দিয়া যায় তাহা হইলে কি ক্ষতিটা হয় বাপু! নন্দ কিছুই ভাবিয়া পায় না।

অনেক দিন মালতী আসে না দেখিয়া নন্দ একদিন গিয়াছিল তাহাদের বাড়ী। কিন্তু সেখানে অনেক লোকজন, সকলে বড় ব্যস্ত, নন্দর সহিত কথা বলিবার কাহারও সময় নাই।

পাগলা সেদিন বড় দুঃখ পাইয়াছিল। মালতী যে এমনি পর হইয়া যাইবে তাহা সে একদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

অকস্মাৎ এক সময় গোলকের দেখা পাইয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'মালতী কই?'

গম্ভীরভাবে গোলক বলিয়াছিল, 'পরশু তার বিয়ে।'

নন্দ পাগলা গোলকের উত্তর শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। খানিকক্ষণ বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাড়ীর দিকে আস্তে আস্তে পা চালাইল। এরপর নন্দ আর মালতীদের বাড়ী যায় নাই।

পাগলার খাওয়া-দাওয়া আজকাল আর ভাল করিয়া হয় না, কোন কোনদিন সে একেবারে না খাইয়াই কাটাইয়া দেয়—খাওয়ার কথা তাহার মনেই থাকে না। সকাল হইতে রাত অবধি সে ঘরের বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

লোকে প্রশ্ন করে, 'কি নন্দদা কি খবর?'

'ভাল ভাই,' সে উত্তর দেয়, কিন্তু তাহার মুখে সে হাসি আর নাই। লোকে ভাবে কি হইল পাগলার!

সন্ধ্যাবেলা মালতী পুকুরঘাট হইতে ফিরিতেছিল। নন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকিল, 'মালতী শুনে যা।'

মালতী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু 'কি নন্দদা?' বলিয়া আগের মত আর আসিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল। নন্দর চোখে সেদিন জল আসিয়াছিল। পাগলা ভাবিতে লাগিল এমন হইল কেমন করিয়া।

খুব সকালে সানাইএর করুণ সুর শুনিয়া নন্দর ঘুম ভাঙিয়া গেল। আজ মালতীর বিবাহ সেকথা পাগলার মনে আছে। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কেন কেহ তাহাকে একটা খবর দিল না! কি অপরাধ করিয়াছে সে যাহার জন্য মালতী তাহাকে এমন করিয়া কষ্ট দিল! মালতী কি জানে না যে, সে না আসিলে, সে কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে নন্দর খাওয়া হয় না, তাহাকে না দেখিয়া নন্দ একদিনও থাকিতে পারে না—তবে কেন সে এমনি করিল! একথা পাগলাকে কে বুঝাইয়া দিবে! অভিমানে নন্দর বুকের ভিতর জ্বালা করিতে লাগিল।

কিন্তু আজ এই অলস ম্লান প্রভাতে নন্দর মনে হইতেছে মালতী আসিবে, তাহার জন্য রান্না চড়াইবে, তাহাকে আবার আগের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইবে। চিরদিনের মত মালতী নন্দকে ছাড়িয়া যাইবে এমন হইতে পারে না। কোনমতেই। কিন্তু কেহ আসিল না। খস্ খস্ করিয়া শব্দ হয়, নন্দ চমকাইয়া উঠে—ওই বুঝি মালতী আসিল—বাতাস নন্দকে ঠাট্টা করিয়া যায়—কেহ আসিল না। বেলা বাড়িতে লাগিল। এমনি সময় মালতী আসিত, ওই-খানে বসিয়া তরকারী কুটিত, নন্দর সঙ্গে কথা বলিত। আজ একের পর এক বিগত মুহূর্তগুলি পাগলার চোখের সামনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইতেছে, আর আসিতেছে চোখে জল। নন্দ বিছানা ছাড়িল না, পাশ ফিরিয়া শুইল। মালতী আসিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ভরিয়া গেল। নন্দ আস্তে আস্তে আসিয়া সিঁড়ির উপর বসিল। আজ সমস্ত দিনটি কেমন করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল নন্দ বুঝিতে পারিল না। রান্না আজ সে চড়ায় নাই—ক্ষুধাও নাই তাহার। আকাশের দিকে চাহিয়া নন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সানাই যেন হঠাৎ অত্যন্ত জোরে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত লোকজন সেখানে! নন্দ ভাবিতে আরম্ভ করিল—বিবাহের বেশে আজ কেমন দেখাইতেছে মালতীকে—নন্দর বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। তাহার একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া যাইতে মালতীর কাছে। কিন্তু ছুটিয়া সে গেল না, চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। আজ শুধু একবার এক মুহূর্তের জন্যও সে যদি মালতীর দেখা পাইত!

সহসা ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি শোনা গেল আর গোলমাল। পাগলা বুঝিল মালতীর বর আসিয়াছে। আস্তে আস্তে সে বাড়ীর বাহিরে আসিল। মালতীদের বাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়।—কত লোকজন সেখানে!

পাগলা হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিল। সে-আকাশ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নন্দ এবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল বার বার। তাহার দুই ক্লান্ত চঞ্চল চোখে যেন কাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ব্যর্থ হইয়া সে আবার আকাশের দিকে দুর্বল চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিল, ঈশ্বর, তাহাদের সুখী কর। তারপর হাসিতে চেষ্টা করিল সেই সরল হাসি। কিন্তু আজ পারিল না। বিবাহ-বাড়ীর গোলমালে, আনন্দ কোলাহলে কয়েক মুহূর্তের জন্য পাগলা কেমন এক রকম হইয়া গেল।

---

## নন্দা

(৯৪৪ পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বেদনা, প্রিয়াকে না দেখার দুঃখ, কত সঞ্চিত অকথিত বাণীর দুঃখ আজ সে নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য এই সুদূরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা না শুনিয়াই নন্দা তার অচেনা জগতে চলিয়া গেল।

সুবীর অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এত সহিবার ক্ষমতা তার নাই। নন্দার মৃত্যু-শীতল বুকের উপর এতদিনের পরিশ্রান্ত মাথাটি লুটাইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে রুদ্ধস্বরে কাঁদিল, নন্দা ঘর বাঁধতে দিলে না আমাকে, এত অভিমান! উঃ—

—শেষ—

# হিন্দু সমাজের ব্যাধি

**শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার**

( ২৩ )

একটা জাতি যে-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তাহা তাহার সামাজিক জীবনের উপর বহুল প্রভাব বিস্তার করে, এই ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবসর নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুজাতিকে গত তিন হাজার বৎসরে বহু বিচিত্র রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রবল বিদেশীর আক্রমণ, রাজা ও রাজ্যের পরিবর্ত্তন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি বহুবারই হইয়াছে। আর এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দু-জাতির সামাজিক জীবনেও বহু ওলটপালট হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতের কোন সুসংবদ্ধ ইতিহাস নাই। নতুবা এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধারা সুস্পষ্টরূপে অনুসরণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলেও, উহার বহু নিদর্শন এখনও অনুসন্ধান করিলে সমাজদেহে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর রাষ্ট্র-নৈতিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় পাঠান বিজয়ের সময় হইতে। একদিনে এই বৈদেশিক বিজয় সম্ভব হয় নাই, উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে পাঠান বিজয় সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৪ শত বৎসর লাগিয়া-ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উত্তর ভারতে তথা বাঙলা দেশে হিন্দুজাতির রীতিমত পরাধীনতা আরম্ভ হইল, মোটামুটি এরূপ কথা বলা যাইতে পারে। পাঠান বিজয়ের পর মোগল বিজয়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিল ইংরেজ। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ আট শত বৎসরকাল হিন্দুজাতি বিশেষত উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের হিন্দুরা পরাধীন হইয়াই আছে। রাজপুত, মারাঠা ও শিখেরা এই কালের মধ্যে অনেক সময় স্বাধীন ছিল, দক্ষিণ ভারত মোগল রাজত্বের শেষ যুগেও কিয়দংশে স্বাধীন ছিল। কিন্তু বাঙলা দেশ প্রায় একটানাভাবেই এই আট শত বৎসরকাল পরাধীনতা সহ্য করিয়া আসিতেছে।

এই রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা যে হিন্দুর সমাজজীবনের উপর নানাদিক দিয়া ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথে নানা প্রবল বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত, মনুষ্যত্ব নিপীড়িত হইয়াছে, তেজ ও বীর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধোগতি হইয়াছে। এমন দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিলে একটা জাতি ও সমাজের পক্ষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ যে আজও লুপ্ত হয় নাই, সে কেবল তাহার পিতৃপুরুষের পুণ্যের ফলে, অর্থাৎ তাহার বনিয়াদ শক্ত ছিল বলিয়া। কিন্তু অতবড় শক্ত বনিয়াদও বাহিরের প্রবল আঘাতে ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে থাকে এবং অবশেষে তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ সেই পরিণতির দিকে চলিয়াছে কি না, তাহা বিশেষভাবে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরেজ আমলে আইনের বলে ভারতবাসীরা নিরস্ত্র। দেশরক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ ও অধিকার তাহারা পায় নাই। জাতির যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। সরকারী প্রয়োজনে স্বল্পসংখ্যক ভারতবাসী সৈন্যদলভুক্ত হয় বটে, কিন্তু সকল প্রদেশের লোক, এমন কি সকল সম্প্রদায়ের লোক সেই সুযোগও সমানভাবে পায় না। উহার মধ্যেও 'সামরিক' ও 'অ-সামরিক' শ্রেণীভেদ আছে। যেমন বাঙালীরা 'অ-সামরিক' জাতি। ফলে যে বাঙালীরা দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যুদ্ধনিপুণ জাতি ছিল, তাহারাই আজ যুদ্ধবিমুখ, ভীরু জাতি বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। বাঙালী হিন্দুর প্রতি এই লজ্জাকর বিশেষণগুলি বিশেষভাবেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার ফলে একটা জাতি বা সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্রের যে আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা তো আমরা চোখের উপরই দেখিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও করিতেছি। জাতির রাজনৈতিক পরাধীনতা যে তাহার সাহিত্য ও শিল্পকলার অবনতির কারণ সৃষ্টি করে, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। সাহিত্য ও শিল্পকলা স্বাধীন ও সবল মনের ভিতর দিয়াই পূর্ণ-বিকাশের সুযোগ পায়। স্বাধীন গ্রীস, রোম, স্বাধীন হিন্দু ভারত সর্ব্বত্রই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। আধুনিককালেও পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যেই সাহিত্য ও শিল্পকলা পূর্ণ-বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়াছে। এই সাহিত্য ও শিল্পকলা যে আবার সমাজজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাহার জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক সমুন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা একথাও বলিবেন যে, জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা জাতির রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একটা জাতির চরিত্র যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার সাহিত্য ও শিল্পকলার অধোগতি হয়, সমাজ ব্যবস্থা নিৰ্জ্জীব ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে, তখন ঐ সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-স্বরূপ রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘটিয়া থাকে। গ্রীস ও রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইউরোপের অতি আধুনিক ইতিহাসেও আমরা তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। সেদিন জার্ম্মানীর হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মার্শাল পেতাঁ বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রের অবনতিই যুদ্ধে তাহার পরাজয়ের কারণ। আমাদের এই ভারতবর্ষেও এবিষয়ে প্রভূত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় রহিয়া গিয়াছে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ভারতের যে সর্বদিক দিয়াই অধোগতি হইয়াছিল, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? রাজারা তখন মদনোৎসবে ব্যস্ত, যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা তখন অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন; কালিদাস 'রঘুবংশে' অগ্নিবর্ণ রাজার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, উহাই তখনকার হিন্দু রাজাদের আসল চিত্র। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তখন ভারত বিভক্ত। কাহারও একক আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না, আবার উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার মত মনোবৃত্তিও ছিল না। ফলে পাঠান আক্রমণে একে একে সকলেই বিধ্বস্ত হইল। গজনীর মামুদ অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইতিহাসে যখন সেই বিবরণ পড়ি, তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়, হিন্দুজাতিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে! হিন্দুজাতি যদি সজীব থাকিত, তবে সুদূর আফগানিস্থান হইতে পেশোয়ারের গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া মুষ্টিমেয় পাঠান সৈন্য লইয়া গজনীর মামুদের পক্ষে পুন পুন ভারত লুণ্ঠন করা কখনই সম্ভবপর হইত না। সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠন কাহিনী পড়িয়া মনে হয়, এদেশে তখন মানুষ ছিল না। তারপর মহম্মদ ঘোরীর ভারত বিজয়। একটা জাতির চরিত্রহীনতা ও সামাজিক অধঃপতন না ঘটিলে ঐরূপ রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। বিশেষভাবে বাঙলার ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ দৃষ্টান্তই দেখা যায়। বাঙালীজাতির চারিত্রিক অবনতি এবং সামাজিক অধঃপতন না হইলে বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র ইক্তিয়ার উদ্দীন আহম্মদ কখন বাঙলা জয় করিতে পারিত না। পলাশীর

যুদ্ধের সময়ে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি এবং সামাজিক দুর্গতি চরমে উঠিয়াছিল, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

সুতরাং একদিকে রাজনৈতিক পরাধীনতা যেমন জাতীয় চরিত্র, শিল্প ও সাহিত্যের অবনতি, সামাজিক অধঃপতন প্রভৃতির কারণ সৃষ্টি করে,—অন্যদিকে তেমনি জাতীয় চরিত্র, শিল্প ও সাহিত্যের অবনতি, সামাজিক অধঃপতনও আবার রাজনৈতিক পরাধীনতাকে ডাকিয়া আনে। এগুলির কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে? কোন্‌টি কারণ কোন্‌টি কার্য্য? ইহার সঠিক উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, এসবগুলি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ, পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিলে জাতি তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তাহার সামাজিক দুর্গতি ঘটে,—আবার জাতীয় পরাধীনতার ফলে জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, সামাজিক অধোগতিও হয়।

তাহা হইলে এই গোলকধাঁধা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? সমাজ ও সভ্যতার মূল শক্তি কি? মানুষ, না তাহার পারিপার্শ্বিক (environment) কাহার প্রভাব বেশী? একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষই মূল শক্তি। সেই সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করে, পারিপার্শ্বিক তাহাকে সহায়তা করে মাত্র। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সামান্য নয় বটে, কিন্তু মানুষ তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন কি তাহাকে অতিক্রমও করিতে পারে। আর একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই বেশী। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাই মানুষের প্রকৃতিকে গঠিত করে, তাহার কার্য্যকলাপ উহার দ্বারাই নিয়মিত হয়। ইচ্ছা করিলেই মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করিতে পারে না, বরং অনেক সময় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আধুনিক আর একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মতে—এই উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য নহে। মানুষ পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং উহারই সাহায্যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করে বটে; কিন্তু মানুষের সৃষ্ট সেই সমাজ ও সভ্যতাই আবার নূতন পারিপার্শ্বিকরূপে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ মানুষ যেমন সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার সৃষ্ট সেই সমাজ ও সভ্যতাও তেমনি একদিক দিয়া মানুষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। এইভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সৃষ্ট সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র সর্পিলগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই শেষোক্ত মতই যে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্য হইতেও একটা সত্য সুস্পষ্টই অনুভব করা যায়। যতই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটুক না কেন, শক্তির প্রধান কেন্দ্র মানুষই। নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাহারই আছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তাহার কর্ম্মশক্তির দ্বারাই চালিত হয়। সভ্যতার ধারাকে সেই পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কোন জাতির মধ্যে যদি অধিক সংখ্যায় প্রতিভাবান, শক্তিশালী, কর্ম্মী মানুষের আবির্ভাব হয়, তবে সে জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে কোন জাতির মধ্যে যদি প্রতিভাশালী, কর্ম্মী, চরিত্রবান লোকের অভাব ঘটে, তবে সে জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মূল অনুসন্ধানে এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদ ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটা প্রধান কারণ। সমাজের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও চরিত্রবান ব্যক্তিরা যখন সংসার ত্যাগ করিয়া দলে দলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ভার পড়িল নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের হাতে। তাহার অনিবার্য্য পরিণাম রাষ্ট্র ও সমাজের অধঃপতন। মানবসমাজের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে, মাত্র একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী নেতা বা মহাপুরুষের প্রতিভা ও কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সমগ্র জাতি শক্তিশালী ও উন্নত হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মহাপুরুষ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই বিরল।

আজ যে হিন্দু সমাজের এই দুর্গতি হইয়াছে, আমাদের মতে তাহারও প্রধান কারণ, যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিভাবান কর্ম্মী, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব। আধুনিককালে বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘর্ষের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার হিন্দুসমাজে একদল প্রতিভাশালী, কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রভাবে হিন্দুসমাজে একটা নব জাগরণের ধারাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু আশংকা হয়, ঐ ধারা শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙলার হিন্দুসমাজে প্রতিভা, মেধা ও চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান-কালে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মেধাবী, চরিত্রবান, বীর্য্যবান মানুষ গড়িয়া তোলা। ইহা একটা অসম্ভব কল্পনা নহে। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, এই শ্রেণীর মানুষ তৈরী হইতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাশালী বা মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্য আকস্মিক ঘটনা, কোন সমাজই ফরমাইজ দিয়া সেরূপ মানুষ তৈরী করিতে পারে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সাধারণ বীর্য্যবান, চরিত্রবান, কর্ম্মী মানুষ তৈরী করা সম্ভবপর এবং সেই শ্রেণীর মানুষই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, হিন্দুসমাজের আজ যে শোচনীয় দুর্গতি, তাহাতে আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে বর্ত্তমান যুগে এই প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব। এবং তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে সমাজ বৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে এমন একদল নেতা ও কর্ম্মীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা এই সমাজ বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে এবং তাহারই ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করিতে পারে। কোথায় সেই নেতা ও কর্ম্মীর দল? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদিগকেই আজ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

(সমাপ্ত)

# ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

রেজাউল করীম এম এ বি এল

মধ্যযুগে ইউরোপ ও এসিয়ার বহু অঞ্চলে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইত। রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক ধর্ম্ম ও রাজ্য উভয়বিধ বিষয়ের নেতা ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসন করিতেন, প্রজাপালন করিতেন এবং জনসাধারণের ধর্ম্মরক্ষা • করিতেন।• মোটের উপর নিয়ন্ত্রণের সকল ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি যে ধর্ম্ম পছন্দ করিতেন, তাঁহার প্রজারাও সেই ধর্ম্ম পালন করিত। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মব্যাপারে কাহারও কোন স্বাধীনতা ছিল না। সেইজন্য রাজ্যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিশেষ সুবিধা হইত না। নাগরিক অধিকারও তাহারা পাইত না। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের মতবাদ আর স্থায়ী হইল না। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিল। ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক রহিল না। ইহার ফলে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে এমন একটা শক্তিশালী জাতি গঠিত হইল যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিতে লাগিল। রাষ্ট্র আর একটি মাত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বস্তু রহিল না। দেশের প্রত্যেকের নিকট উহা আদরের আষ্পদ হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই দেশের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল। আর পূর্ব্বের মত গোপনে গোপনে পরামর্শ করিয়া কোন বিদেশী শক্তির নিকট স্বদেশকে বিক্রয় করিবার জন্য কেহই ব্যস্ত হইল না। দেশ ত আর একজনের নয় যে, অপরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। দেশ সকলের, দেশের স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা, দেশের উন্নতি সকলের উন্নতি। সুতরাং দেশদ্রোহিতা করিবার সুযোগই উপস্থিত হইল না। এই বোধ সকলেরই হইল যে, স্বদেশ যদি পরাধীন হয়, তবে দেশস্থ প্রত্যেক অধিবাসীও পরাধীন হইবে। দেশের সুখ সুবিধা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। প্রত্যেক প্রকার সুবিধার পথ সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত। নিজ নিজ গুণানুসারে তাহা সকলেই উপভোগ করিতে পাইবে। কোন বিদেশী শক্তি কি সকলকে এই সুবিধা প্রদান করিবে। এইভাবে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দেশের মধ্যে এক জাতীয়তা ও একপ্রাণতার ভাব জাগাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

যে সব দেশ রাষ্ট্রকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করিতে পারে নাই, সেই সব দেশের উন্নতি আশানুরূপভাবে হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ খলিফাশাসিত তুরস্কের কথা বলা যাইতে পারে। "ইসলামে ধর্ম্ম ও রাজনীতি একই পর্য্যায়ভুক্ত"—এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া তুরস্কের খলিফাগণ তাঁহাদের সমস্ত নীতি পরিচালনা করিতেন। সেইজন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও রূপ সখ্যভাব জাগে নাই। অমুসলমান প্রজাগণ রাষ্ট্রকে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই। সুখ সুবিধা বণ্টনেও তারতম্য ছিল। তাহারা ভাবিত যে, মুসলিম রাজার অধীনে তাহারা পরাধীন প্রজামাত্র। রাজ্যে তাহাদের অধিকার নাই, সুতরাং রাজ্যের প্রতি তাহাদের কোন দায়িত্ব নাই। সেইজন্য সেখানে কোনও-রূপ জাতীয়তার ভাব জাগিতে পারে নাই। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া তুরস্ক এইভাবে চলিয়াছিল। সেইজন্য স্থানে স্থানে প্রজা বিদ্রোহ হইত। অমুসলমানকে রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থ ইউরোপীয় শক্তি তুরস্কের উপর হানা দিতে কসুর করিত না। ঘন ঘন প্রজা বিদ্রোহের ফলে কয়েক শতাব্দীর বিপুল সাধনার দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পরিশেষে কামাল আতাতুর্ক আসিয়া তুরস্ককে সুপথ দেখাইয়া দিলেন। ক্ষমতা পাইয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া দিলেন। আজ তুরস্কে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই তুরস্কের অধিবাসীরা মুসলিম জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় না। তাহারা "তুর্কি" এই বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। তুরস্কের এই জাতীয়তার ভাব সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। "We are not Muslims, we are Turks" এই বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলিবার সাহস যদি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে আজ তুরস্ক ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানীর মতই প্রবল জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তুরস্কের কথা ছাড়িয়া এবার ঘরের কথা আলোচনা করা যাক। ভারতে এই প্রকার ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাহা না হইলে এদেশে জাতীয়তা-বোধ জাগিবে না। মুসলিম জাতি, হিন্দু জাতি প্রভৃতি সর্ব্বনাশকর মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতে হইবে, আমরা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষে ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নহি। ভারতের জন্য চাই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এতদ্ব্যতীত ভারতের উন্নতি অসম্ভব, ভারতের স্বাধীনতা অবান্তর কথা মাত্র। প্রশ্ন হইতেছে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায়? অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ইহার অর্থ দেশ হইতে ধর্ম্মকে একেবারেই বিসর্জ্জন দেওয়া। দেশে কোন ধর্ম্ম থাকিবে না, অথবা আইন করিয়া ধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এরূপ আদর্শ নহে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের গঠন হইতে পারে না। ধর্ম্মীয় আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রতিপালন করা চলিবে না। কেহ ধর্ম্ম পালন করিল, অথবা না করিল তাহা লক্ষ্য করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মীয় আইন ব্যক্তিগত ভাবে প্রযোজ্য হইবে। সর্ব্বসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয় ধর্ম্মীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পাইবে না। সেখানে ধর্ম্মীয় আইনকে অচল করিয়া দিতে হইবে। একই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য যদি কোন শাস্ত্রীয় বিধান থাকে তবে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের কালোপযোগী করিয়া নূতনভাবে আইন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাতে ধর্ম্মের দোহাই দিলে চলিবে না। স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নরনারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং ধর্ম্মপালন, গ্রহণ ও বর্জ্জন বিষয়ে কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার রাষ্ট্রের কোন অধিকার থাকিবে না। রাষ্ট্রের আইন কানুন, বিধি নিষেধ এরূপভাবে রচিত হওয়া উচিত যাহা প্রত্যেক ধর্ম্মানুশীলনকারীকে সমভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের জন্য এক আইনও অন্য সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন হইতে পারে না। তাহাতে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে পারে না। জাতীয়তা গঠনের পথেও তাহা সতত বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। যে রাষ্ট্রে ঐক্য, সংহতি ও জাতীয়তাবোধ থাকে না, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শক্তিশালী বিজেতার পদানত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশের আইন রচিত হইলে সে আইন সকলকে যুগপৎভাবে স্পর্শ করিবে না। ইহার দ্বারা সকলের মনে ও প্রাণে একত্ববোধের ভাব জাগিবে না। একত্ববোধের ভাব না জাগিলে দেশের নিরাপত্তা স্থায়ী হইতে পারে না। এই দোষেই তুর্কি সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর এই দোষেই ভারতের জাতীয়তা গঠিত হইতে পারিতেছে না। ভারতের মত সুবিস্তৃত দেশে বহু ধর্ম্মের প্রচলন আছে। এখানে ধর্ম্মকে রাষ্ট্রিক ও নাগরিক জীবনের ভিত্তি ও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, দেশের নিরাপত্তা থাকিবে না। দেশের বিভিন্ন স্তরে দেশদ্রোহিতা প্রকাশ পাইবে। এবং কোথাও শান্তিসুখ থাকিবে না। এই গণতান্ত্রিকতার দিনে রাষ্ট্রীয় আইন রচনা

করিতে হইবে সমস্ত জনসাধারণের ভোটের সাহায্যে। আইন সভায় ধর্ম্মনিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। তাহাদের ধর্ম্ম সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে। দক্ষতা, সততা ও স্বদেশ-প্রেমই হইবে প্রকৃত নাগরিক সদস্যের যোগ্যতার মানদণ্ড। হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান হিসাবে কেহ আইন রচনা করিতে পাইবে না,—করিতে হইবে ভারতের অধিবাসী হিসাবে। যদি ইঁহাদের প্রত্যেকে ধর্ম্মের আইন বলবৎ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন তাহা হইলে কোথাও আইনগত সংহতি থাকিবে না। আর আইনগত সংহতি না থাকিলে জাতীয়তাবোধ জাগিবে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকা উচিত নহে। একজন ধর্ম্মপরায়ণ লোকের দেশসেবার যে অধিকার আছে, ঘোরতর নাস্তিকেরও সে অধিকার আছে। দেশের কাজ হইতে নাস্তিককে বাদ দিলে চলিবে কেন? কোন ব্যক্তি ঘোরতর নাস্তিক হইতে পারেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি একজন স্বদেশপ্রাণ ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত হইতে পারেন। আবার হয়ত একজন অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বাস্তবিকতার দিক হইতে রাজনীতি বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইতে পারেন। এরূপস্থলে প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তি নাস্তিককেই অধিক বিশ্বাস করিয়া নিঃসঙ্কোচ চিত্তে তাঁহারই হাতে রাষ্ট্রের ভার ছাড়িয়া দিবে। যেদিক দিয়া আলোচনা করা যাক না কেন বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের দুর্দ্দশার একটা প্রধান কারণ এই যে, আমরা এখনও ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি নাই। যেদিন আমরা ইহা বুঝিব সেই দিনই আমাদের মধ্য হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া যাইবে। দেশে জাতীয়তা গঠিত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

## শ্রীনিকেতনে পল্লী স্বাস্থ্য সংগঠন

(৯৪৫ পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের মধ্যস্থলে রাস্তাটিকে চওড়া করিয়া দুপাশে ড্রেন কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যে রাস্তার এত উন্নতি করা হয় যে, বর্ষাকালে এর উপর দিয়া মোটরগাড়ী যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের যাবতীয় বিধি প্রবর্তনের ফলে ১৯২৭-২৮ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা শতকরা পনের-জন কমিয়াছিল। গ্রামের চেহারা পরিবর্তন হওয়ায় গ্রামবাসীরা আনন্দিত হয়। ইতিমধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়ায় আমরা গ্রামবাসীদের উপরেই স্বাস্থ্যসঙ্ঘ পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিই। তাহাদের মধ্যে উদাসীনতা দেখা দেয়। তাহারা মনে করে, আর বেশী কিছু করিতে হইবে না। এই শিথিলতার ফলে ম্যালেরিয়া আবার বৃদ্ধি পায়।

১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই, অধিবাসীদের মধ্যে ৪২ জন আক্রান্ত হইয়াছে। প্রথমে কোনও গ্রাম নির্ণয় করিবার পূর্বেই যে সকল বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত, তাহা না করিয়া আমরা এই গ্রাম নির্বাচন করিয়াছিলাম। যে গ্রামে অন্তত পঞ্চাশ ঘরের বসতি নাই, এরূপ গ্রাম নির্বাচন করা ভুল হইবে। বল্লভপুরের অধিবাসী এত কম যে, গ্রামের ভিতরের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেও, গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সামর্থ নাই। ইহারা বড় বড় সিঁচের পুকুরগুলি বর্ষা-কালে পরিষ্কার করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে অসমর্থ। এই সমস্ত কাজ শুধু কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা করাইতে হইলে, তদনুরূপ জনবলও ইহাদের নাই। এই সময়ে আমাদের নির্বাচনের ভুল বুঝিতে পারি। এই গ্রামের কার্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ-রূপে গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত করিয়া আমাদের কর্মক্ষেত্র ওখান হইতে অপসারিত করি। কিন্তু সুখের বিষয়, এই গ্রামবাসিগণ এখনও গ্রামটাকে সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। রাস্তাঘাটের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। নিজেদের চেষ্টায়ই গ্রামের অবনতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রামের লোক সংখ্যা এই কয় বৎসর ৮৪ স্থলে ১০৩ হইয়াছে।

এই গ্রামের কার্যারম্ভের সময় মিঃ এলম্‌হার্স্ট আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ইহার পরিবর্তন দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া-ছিলেন, যাহারা আগে এই গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে, তোমরা কী পরিবর্তন ঘটাইয়াছ, ইহাই আমার দুঃখ। এবং তিনি ঐ গ্রামের পরিদর্শন বইতে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

## অন্তর হ'তে বল?

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

'ললাট-লিখন'—নবীন সাধক
অন্তর হ'তে বলো?
কোন চেতনায় ললাট-নাটক
নির্ভয়ে তবে দলো?
ফাঁক আছে তাই ফাঁকি দিয়ে নাও
সস্তায় পূজো বাঁধা,
দিনমানে হায় পথ ভুলে যাও
চক্ষের কোণে ধাঁধা।
কত মনীষীর তপ-তপস্যা
বিশ্বের ভালো হোক্।
তোমাদের ঘরে নাই সমস্যা
—মৎস্যের তরে শোক!

## স্মৃতির সৌরভ

অমিতাভ সাহা

আমি যবে চলে যাব এই ধরা হ'তে
খোঁপা থেকে খসে-পড়া ফুলের সমান;
তুমি মোরে হারাবে না জানি সখি জানি,
হাসি-কান্না নিয়ে তব খেলিবে পরাণ।
বরষার কালো মেঘে খেলিবে বিজলী,
এলোচুলে দোলা দিবে বাদল বাতাস।
মনের গগনে—আমি রামধনু ছবি
ফুটিব ফুলের মত ছড়াতে সুবাস॥
বন্ধ করি' ধীরে রাঙা সিঁদুরের ঝাঁপি
চাবে ফিরে ফিরে—দূর অতীতের তীরে।
অতল আকাশতলে আঁখি দিবে মেলি—
সবার আড়ালে আমি রব তোমা ঘিরে॥

# নিউ ইয়র্ক

( ভ্রমণ কাহিনী—পূর্বানুবৃত্তি )

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ওআল্‌স্‌ স্ট্রীট আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। এখানে ব'সেই আমেরিকার ধনীরা পৃথিবীর বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ, আমেরিকার ভাগ্যনির্ণয় ও মনরো নীতির ভাষ্য ক'রে থাকেন। ইচ্ছা ছিল অন্ততপক্ষে স্ট্রীটটা দেখে আসব; তাই বেড়াতে বেড়াতে যখন ওআল্‌স্‌ স্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত হলাম, মনে হ'ল স্থানটা নিউইয়র্কের সীমানার বাইরে। ছোট গলির দু দিকে উচ্চ প্রাসাদ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেসব লোক পথে চলছে, তাদের মুখে হাসি নেই; যেন চিন্তিত এবং অতর্কিতে পথ চলছে। অনেকে আবার পাগলের মত আপনার সংগে আপনি কথা বলছে। লেডি টাইপিস্টরাও তাদের ঠোঁটে ঠোঁটের সিঁদুর' না লাগিয়েই চলেছে। মাঝে মাঝে একের সংগে অন্যের ধাক্কা লাগছে, কিন্তু শিষ্টতাসূচক 'sorry' না ব'লেই সব চলে যাচ্ছে। আমি অপরিচিত, তাই অনেকের দৃষ্টি আমার উপর পড়ছে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

আমার সংগে তিনটি আমেরিকান ছিল। তারা আমার পিছনে পিছনে চলেছিল, যখনই কিছু জানবার দরকার হচ্ছিল, ইশারা ক'রে ডাকতেই তাদের একজন কাছে এসে জ্ঞাতব্য বিষয়টা গাইডের মত বলে দিয়ে আবার পিছনে পিছনে চলছিল। তিনটি লোক আমার সংগে চলছে এবং আমি যা জিজ্ঞাসা করছি ক্রমাগত তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে দেখে দু-একজন লোকের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল এবং মনে হল তারা আমার সংগে কথা বলতে চায়। অমনি পিছন থেকে একজন এসে বললে, "মশায় এই ভদ্রলোককে বিরক্ত করবেন না, ইনি নিগ্রো নন; ইনি যা জানতে চান তা আমরাই জানাব।"

এই তিনজন আমেরিকানের সংগে কি ক'রে আমার দেখাশোনা হল তা বলি। লণ্ডন থেকে বিদায়ের বেলা খাকী শার্ট নিয়ে আসি নি। নিউইয়র্কএ বেশ গরম পড়েছে, প্যাণ্টের সংগে খাকী শার্টের দরকার, কিন্তু তা নেই ব'লে মাথায় পাগড়ি বেঁধে অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর বেশে পথে বার হয়েছিলাম সেদিন। পাগড়ি বাঁধবার কথা কয়েকজন হিন্দু আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন। একটা শার্টের অর্ডার দিতে যাব মনে করেছিলাম। কিন্তু গায়ে শার্ট না দিয়ে গেলে যদি কেউ তুইতোকারি করে, তবে তা সহ্য হবে না বলেই পাগড়ি বেঁধেছিলাম। নিগ্রোরা সওদা করবার সময়েও সাদা চামড়ার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পায় না।

নিউইয়র্ক-এর দ্বিপ্রহর অনুভব করবার মতই। দুপুর-বেলা পথে চলাচল অনেক কম। আমি এইট্‌থ অ্যাভিনিউ দিয়ে চললাম। এই পথটার উপর দিয়ে এলিভেটর ক্রমাগত চলেছে। পথটা ছায়াময় এবং একটু সেঁতসেঁতে। তাপমান যন্ত্রে দেখলাম, উত্তাপ ৮২ ডিগ্রী। এরূপ তাপমান যন্ত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডার ও অনেক বিজ্ঞাপনের সংগেও তাপমান যন্ত্র, কম্পাস ইত্যাদি থাকে। এক-শ আট, নয়, দশ, এগার স্ট্রীট পর্যন্ত বেশ নির্বিবাদেই চলেছিলাম। মাঝে মাঝে দু-একজন আরববাসী এবং ইহুদী 'প্রীস্ট, প্রীস্ট' ব'লে চীৎকার করেছিল মাত্র। এক-শ বার নম্বর স্ট্রীটের মোড়ে যেই পেঁছেছি, অমনি তিনটি যুবতী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তাদের অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চললাম। একটি যুবতী আমার হাত ধ'রে বললে, "Hindu, you must tell my fortune" এবং বলার সংগে সংগে আমার হাতে একটি ডলার (আমাদের দেশের প্রায় তিন টাকা চার আনার সমান) গুঁজে দিলে। ডলার ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যুবতীটি আমেরিকান না ইউরোপিয়ান। যুবতীটি বললে, সে আমেরিকান এবং হিন্দু অকালটিস্ট, স্পিরিচুঅ্যালিস্ট, পামিস্টদের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। পথে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে বললাম, "যদি বলি আমি এ সকল বিশ্বাস করি না, তবে আমাকে রেহাই দিতে পারবেন কি?"

"হিন্দুরা এসব ক'রেই দু-পয়সা পায় এবং এসব বিষয়ে বেশ পারদর্শী; আপনি কেন তাতে বাদ পড়ছেন? হয়তো আপনি হিন্দু নন।"

"আপনাদের কি ধারণা যে আমরা এইসব ক'রেই দিন কাটাই? মহাত্মা গান্ধীর নাম শোনেন নি?"

"হাঁ শুনেছি, তিনি একজন ফকির বটেন।"

মেয়ে তিনটিকে কাছে ডেকে বললাম, "আপনারা হিন্দুদের সম্বন্ধে যে ধারণা ক'রে রেখেছেন তা মিথ্যা, হিন্দুদের মধ্যে আপনাদের মত সভ্য, শিক্ষিত অনেক আছে। আজ থেকে আর আমি পাগড়ি ব্যবহার করব না। সেজন্যে হয়তো আপনারা আমাকে নিগ্রো ভাবতে পারেন, কিন্তু তাতে সুফলই হবে; নিগ্রোদের উপর আপনাদের ব্যবহার কেমন, তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারব।" এই ব'লে কাছের Pawn Shopএ পাগড়িটি সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি ক'রে দিলাম। আমার কথা ও কার্য-কলাপ কয়েকজন ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা আমাকে নানা প্রতিষ্ঠানের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার তখনই গ্রহণ করেন এবং যতদিন আমি সেগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, ততদিন তাঁরা আমার সংগে ছিলেন। যখন ওআল্‌স্‌ স্ট্রীট দেখতে যাই, তাঁদের তিনজন আমার সংগে যান এবং কি ক'রে ওআল্‌স্‌ স্ট্রীট কারবার থেকে শুরু করে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে তা ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

আমেরিকায় বর্তমানে দুটি পলিটিক্যাল পার্টি বর্তমান,—রিপাবলিকান ও ডিমক্র্যাট। এই দুই দলের মধ্যে সর্বদা বিরোধিতা চ'লে আসছে ব'লেই সকলে জানেন; আমারও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু নূতন দেখলাম, এই দুই দলকে কতকগুলি বিশেষ লোক শাসিয়ে রাখছে এবং তাদের সমস্ত কার্যপরিচালনের নির্দেশ দিচ্ছে। হুভারই বল, আর রুজভেল্টই বল, সকলকেই এই মুষ্টিমেয় লোকের তাঁবেদারি করতে হয়। এদের আড্ডা হ'ল ওআল্‌স্‌ স্ট্রীট। অতএব ওআশিংটন ডি সি প্রভৃতিতে না গিয়ে ওআল্‌স্‌ স্ট্রীটের গতিবিধি পর্যালোচনা করলেই সমুদয় আমেরিকার কর্মপদ্ধতির একটা হিসাব পাওয়া যায়। আমি বিশেষ ক'রে সেদিকে ঝুঁকি নি, কারণ এসব দিকে ঝুঁকলে অনেক অর্থের অপব্যয় হয় এবং সময়েরও সদ্ব্যবহার হয় না।

আমেরিকা কেন, পৃথিবীর সকল জাতের সমবেদনা অর্জন করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আর্ল বলডুইন যখন আমেরিকাতে বক্তৃতা-ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং ডিমোক্র্যাসির সর্বনাশ হ'তে বসেছে বলে পাড়া মাথায় উঠিয়েছিলেন, তখন মোবারক আলি এবং হরিদাস আর্লের পিছনে পিছনে থেকে সদাসর্বদা চল্লিশ কোটি হিন্দুর দুঃখকাহিনী আমেরিকার সর্বসাধারণকে শুনিয়েছে। আমার সে ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ ও সংগতি ছিল না। আমার পিছনে সেরূপ অর্থবল এবং আমার মধ্যে সেরূপ বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা ছিল না। অতএব আমাকে নীরবে চলাফেরা ক'রেই সময় কাটাতে হ'ত। আমার মনে হয় হরিদাস এবং মোবারক আলী আমেরিকাতে যেরূপভাবে ভারতের কথা প্রচার করেছেন, কোন বিশেষ শিক্ষিত লোক সেরূপ পেরে উঠবেন না।

শুনেছি শ্রীযুক্ত জহরলালকে আমেরিকায় পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু তাতে বিপরীত ফল ফলবারই বেশী সম্ভাবনা।

জহরলাল আমেরিকাতে বামপন্থী এবং সুভাষচন্দ্র আমেরিকাতে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট ব'লে সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত। তার পর, যদি এ'রা স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের যথার্থ পরিচয় দেন তো আমার মনে হয়, সেখানকার লোকের মনোভাব প্রতিকূল হবে। নিউইয়র্ক টাইমস্ ও হেরাল্ড পত্রিকা, মাঝে মাঝে যেমন ভারতের কথা ব'লে লোকের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেইটি তখন লোপ পাবে। পুঁজিবাদী আমেরিকান সংবাদপত্র তখন বুক ফুলিয়ে বলবে, 'যা বলেছি তা সত্য কি না দেখে নাও; এরা সব বাজে লোক মাত্র।'

আজ আমেরিকাতে ভারতের জন্য এক দরিদ্র এবং ছাত্র ছাড়া আর কারও মনে সমবেদনা নেই। এখানকার দরিদ্র এবং ছাত্ররা কোন্ দলের লোক, তা জানি না। যে দলেরই হ'ক, তারা জহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে পূর্ববর্ণিত মত পোষণ করে এবং শ্রদ্ধা করে। কোনও সংবাদপত্র তাদের সেই মত বদলাতে পারবে না, যদি না তাঁরা নিজেরা গিয়ে বলেন যে, তাঁরা কমিউনিস্ট নন।

ওআল্‌স্ স্ট্রীট নিউইয়র্ক'এর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানকার শেয়ার ও এক্সচেঞ্জ মার্কেট পৃথিবীর বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একদিন দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, এইমাত্র তিন ডলার প'চানব্বই সেণ্ট এক পাউণ্ডে বিক্রি হ'ল, তার ঠিক দুই মিনিট পরেই চার ডলার চার সেণ্ট হয়ে গেল। যারা কিনলে তারা দাঁও মারলে, যারা বেচলে তারা পথে বসল। ইউরোপের টাকারও টানা-হেঁচড়া এইখান থেকে হয়। পৃথিবীর অধিরাষ্ট্রীয় (international) রাজনীতির উপরেও ওআল্‌স্ স্ট্রীটের প্রভাব কম নয়।

সত্য কথা বলতে কি, আমি রাষ্ট্রনীতি বুঝি না এবং সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সংবাদও রাখি না। অনেক পাকা ধড়িবাজ পলিটিশনের সঙ্গে কথা হয়েছে, যাঁদের ভাষা সরল, হেসেই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, তবু তাঁদের কথার অর্থ বুঝি নি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে এইরকম একজন বিদ্বান্ লোকের উল্লেখ করতে পারি, তাঁর নাম দান্তে। শ্রীযুক্ত দান্তে আমাকে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা মামুলী কথা তাঁর নিজের ভাষায় গুছিয়ে নিয়ে অনেককে আমার হয়ে শুনিয়েছেন। এতে আমি বুঝতে পেরেছি, যুবক দান্তের এবং তাঁর স্ত্রীর সমবেদনা আমাদের দেশের লোকের উপর প্রচুর। যখনই কেউ আমাদের দোষের বোঝার ডালা খুলে সভার লোককে দেখাতে চেয়েছে, তখনই তিনি উঠে আমেরিকার দোষের ডালা উজাড় ক'রে ধ'রে ভারতের পক্ষে ওকালতি করেছেন। আমার সন্দেহ নেই, আমেরিকায় ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক আছেন।

একদিন এক ভদ্রলোক এসে আমাকে এক সভায় গিয়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য অনুরোধ ক'রে গেলেন। যথাসময়ে সভায় গেলাম। সভা বসেছিল হিল স্ট্রীট আর সিক্সথ্ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এক প্রকাণ্ড কাফির দোকানে। হাজার লোক সেখানে আরামে ব'সে কাফি খেতে পারে। গিয়ে দেখলাম এক হাজারের জায়গায় সেখানে ন্যূনপক্ষে দেড় হাজার লোক হাজির হয়েছে। আমার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাইক্রোফোনের সাহায্যে 'হিন্দু পর্যটকে'র আগমন ঘোষিত হ'ল। বলা হ'ল, যার যা প্রশ্ন দয়া করে লিখে যেন সবাই তা হাতে রেখে দেন, ওয়েটাররা গিয়ে তা সংগ্রহ ক'রে নেবে। প্রশ্ন লিখতে আর সংগ্রহ করতে বেশী সময় লাগল না। নানা বিষয়ে সব প্রশ্ন। তার মধ্যে একটি ছিল, মুসলিম লীগের কেউ আজ পর্যন্ত ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য জেলে গিয়েছেন কি না। অনেকক্ষণ ভেবে জবাব দিতে হয়েছিল। এককালে মুসলমানরা জেলে গিয়েছিল; সে খিলাফতের জন্য। কিন্তু মুসলিম লীগের কাউকে কখনও জেলে যেতে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। বললাম, "মুসলিম লীগের কেউ কখনও জেলে যেতে পারে না, মুসলিম লীগ সরকারের অনুরাগভাজন।"

একটা কথা সেখানে স্পষ্ট বুঝলাম যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রচারিত মাইনরিটি, মেজরিটি অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম লড়াই বা দাঙ্গার সংবাদ বিদেশের লোকের কাছে ভাল লাগে না। এমন কি ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের লোকও এ সকল বাজে কথায় আর কান দেয় না। কিন্তু আজ বোধ হয় সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের সংবাদে ভারতের বাইরের লোক স্তম্ভিত হয়েছে। যারা কাজের লোক তারা জানে আর বোঝে যে, মাইনরিটি, মেজরিটি বা ধর্মের লড়াইএর গাওনা তুলে ভারতের প্রগতি আর কেউ রোধ করতে পারবে না।

---

# কয়লা খনির শ্রমিক

**শ্রীভোলানাথ ঘোষ**

ভগবান, মোরা নালিশ করি না, করিতে ভাল না বাসি—
জানি মোরা খনি নয়কো সে ছেলেখেলা—
কিন্তু—তবুও, খানাগুলো দেখ, বৃষ্টি ভরেছে আসি,
আর—কী যে শীত! কী যে আঁধারের মেলা!

ভগবান, তুমি জান না কখনো কোন্ সে জিনিস খনি!
আলোভরা ওই সুখের স্বর্গে থেকে,
দিব্যি গরমে ব'সে ব'সে দেখ উল্কার শনশনি,
সদাসর্বদা সূর্যকে পাশে রেখে।

থাক তার কথা মোদের মাথায় জ্বলে যে প্রদীপখান—
চাঁদকেও যদি মুকুটে আঁটিয়া নিতে,
তথাপি এখানে অচিরে তোমার হাঁপায়ে উঠিত প্রাণ
পাতালপুরীর গাঢ় আঁধারে ও শীতে।

মোদের আকাশে কিছু নাই, শুধু নিবিড় অন্ধকার;
সচল যা এক, কয়লার গাড়ি তাও—
ভগবান, যদি ভালবাসা তুমি চাও আমা-সবাকার,
শুধু একমুঠো তারা ছুঁড়ে ফেলে দাও। *

* শ্রীযুক্ত Luis Untermeyer রচিত Caliban in the Coal Mines-এর অনুবাদ।

### ভৌতিক কাণ্ড

অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিক দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়। সহস্র সহস্র দর্শকের চোখের সামনে যাদুকর নিজের জিবটা কেটে ফেলে কি ক'রে যে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়, এ জানবার আগ্রহ সকলেরই হয়। সাধারণ লোক কল্পনা ক'রত সাহস পায় না। তাদের একেবারে ধ্রুব বিশ্বাস

যাদুকর শাণিত তলোয়ার মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়েছে

যাদুকর যাদুবিদ্যা জানে;—যাদুবিদ্যার প্রভাবেই এ ধরণের অনেক অলৌকিক কাণ্ড তারা ক'রতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বহু প্রাচীনকাল থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন আছে। যাদুবিদ্যার মধ্যে যতখানি অলৌকিক কাণ্ড আমরা ভাবি, ততখানি মোটেই থাকে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, হাতের কসরৎ এবং বাক্‌পটুতার মধ্যেই ম্যাজিকের সব কিছু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমের আঁঠি পুঁতে কি' কৌশলে যাদুকর গাছে আম ফলায়, তা জানবার পর আর আম খাওয়ার লোভ কারও থাকে না। মন্ত্রের জোরে টাকা যদি দ্বিগুণ আকারে নিতে পারত, তাহ'লে জগতের লোকের অনেকখানি পরিশ্রম লাঘব হ'ত বই কি? কিন্তু হয় কোথায়? কয়েক ঘণ্টার আমোদপ্রমোদের মধ্যে যে বস্তুর চটক এতখানি আমাদের মনে ধরে, তা বাস্তবক্ষেত্রে কতটুকুই বা কাজে লাগে? তাহলেই দেখুন আসলে ফাঁকি।

কিন্তু সব বিষয়েই যে যাদুকর দর্শকদের চোখের উপর মিথ্যার জাল বুনে ধাঁধাঁ লাগায়, তা নয়। বৈজ্ঞানিকেরা বহু ঘটনা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। সাবাস্তিয়ান মণ্টোনিরো নামে একজন খ্যাতনামা যাদুকর অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কেবল দর্শকদেরই মুগ্ধ করেন নি, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদেরও রীতিমত ঘাবড়ে দিয়েছেন। প্রকাশ্যভাবে সহস্র সহস্র দর্শকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির মধ্যে যাদুকর সাবাস্তিয়ান মণ্টোনিরো দীর্ঘ শাণিত তলোয়ার মুখের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঢুকিয়ে দেন। সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হ'য় উঠে। নিমেষের মধ্যে যাদুকর নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মন্ত্রমুগ্ধ জনতার চেতনা ফিরিয়ে আনেন। জনতা আনন্দে করতালি দিয়ে উঠে, চারিদিক থেকে যাদুকরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয়!

বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে মোটেই আশ্চর্য্য হয়ে পড়েন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, সাধারণত যাদুকরেরা দর্শকদের আমোদ দেবার জন্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে ম্যাজিক দেখান, এ ব্যাপারটা সেই ধরণেরই—নতুন কিছু নয়। কিন্তু তলোয়ার গলাধঃকরণ করা অবস্থায় যাদুকর সাবাস্তিয়ান মণ্টোনিরোকে এক্স-রে ক'রে দেখা গেল সত্য-সত্যই তাঁর শরীরের মধ্যে দীর্ঘ তলোয়ারটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ পরীক্ষার পর মত দিলেন—যাদুকর সত্যই তলোয়ারটি গলাধঃকরণ করেছেন। তলোয়ার ছাড়া

এক্স-রে ফটোতে যাদুকরের শরীরের মধ্যে তলোয়ারটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

যাদুকর ধারাল ব্লেড্, পেরেক এমন আরও কত মারাত্মক জিনিষ স্বচ্ছন্দে খেয়েছেন, কিন্তু কিছুই ক্ষতি হয় নি এবং এক্স-রে ফটোতে ঐ সব জিনিষের প্রতিচ্ছবি বৈজ্ঞানিকরা সত্যই পেয়েছেন। যাঁরা যাদুবিদ্যাটা এতদিন মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁরা বিস্মিত হবেন। আমরা ভাবছি, যুদ্ধের বাজারে জিনিষের দাম চতুর্গুণ চড়ে বসেছে, আবার দাম মিললে জিনিষ মিলা ভার, এ অবস্থায় যাঁরা সর্ব্বভুক যাদুকর—তাঁদের অবস্থা কি?

## কিভাবে শক্তিশালী খেলোয়াড় তৈরী করা যায়

দৌড় প্রতিযোগিতায় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, লক্ষ্যস্থলে পেঁছিবার সময় দৌড়বীরদের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তা শেষ পর্য্যন্ত সকলে সমানভাবে বজায় রাখতে পারে না। একজন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতিক্রম ক'রে প্রথম হয়; অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আর অপর দৌড়বীর লক্ষ্যস্থলে পেঁছিবার পূর্ব্বেই দৌড়বার সমস্ত শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলে দেহের মাংসপেশীর সঙ্কুচনে প্রতিযোগিতা থেকে নিরস্ত হ'তে বাধ্য হয়। ফলে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের কার্য্য অতি দ্রুত চলতে থাকে—অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। একজন প্রতিযোগী বহু দূরবর্ত্তী পথ খুব স্বাভাবিকভাবে অতিক্রম করে, এমন কি একাধিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেও দেহের বিশেষ ক্লান্তি বোধ করে না, আবার অপর একজন কিছুক্ষণের পরিশ্রমে এরূপভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ে কেন—এ প্রশ্ন দর্শকদের মনে আসা স্বাভাবিক।

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। পরীক্ষায় জানা যায়, ভিটামিন এবং অপর দুই রাসায়নিক দ্রব্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব যে কোন লোকের পক্ষে দীর্ঘকাল পরিশ্রম অথবা প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল।

বৈজ্ঞানিকদের বর্ত্তমান আবিষ্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, তাঁরা বিজ্ঞানের রন্ধনশালায় টেষ্ট টিউবের মধ্যে যে শক্তিশালী অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, তা পৃথিবীর ক্রীড়াজগতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করতে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। ধারাবাহিকভাবে গবেষণা করে জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, ক্যালসিয়ামের ভাগ যার দেহে যত পরিমাণ বেশী, তার কঠোর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ঠিক সেই পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। শিশুদের অপুষ্ট দাঁতের আবির্ভাব হয় উপযুক্ত ক্যালসিয়ামের অভাবে। সেইজন্য সময়ে সময়ে ডাক্তারদের ক্যালসিয়াম সেবনের ব্যবস্থাপত্র দিতে দেখা যায়। পরীক্ষার জন্য জনৈক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক কয়েকজন খেলোয়াড়কে কয়েক মাত্রা ক্যালসিয়াম সেবন করতে উপদেশ দেন। পাঁচ মাস ক্যালসিয়াম সেবনের পর ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দেখা গেল, ক্যালসিয়াম ব্যবহারকারী প্রতিযোগিরা অন্যান্য প্রতিযোগী অপেক্ষা খুব কম ক্লান্ত হয়েছে এবং দৌড় শেষ হবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে। ডাঃ রয়েল সি পারকিনস নামে জনৈক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে বহুদিন গবেষণা করেছিলেন। তিনি একবার একটি প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবের জন্যই ঘোড়াটি ক্রমশ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, নিম্ন শ্রেণীর ঘোড়দৌড়েতেও তাকে নামান বিপদজনক।

ডাঃ পারকিনস গবেষণা করে দেখেছিলেন, যে সব অঞ্চলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও সূর্য্যকিরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিবাসীরা ভোগ করতে পায়, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রচুর দৈহিক শক্তি লাভ করে। আমাদের শরীরে 'ডি' ভিটামিন সরবরাহের জন্য সূর্য্যকিরণ আবশ্যক এবং ইহার সাহায্য ব্যতীত দেহে ভিটামিন আসতে পারে না।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, দক্ষিণ কালিফোরনিয়া ইউনিভারসিটি এবং ষ্টানফোর্ড ইউনিভারসিটির ছাত্ররা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ দৈহিক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল। ইহার একমাত্র কারণ ছিল তারা সকলেই সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দেহের মধ্যে সঞ্চয় করেছিল এবং একই কারণের জন্য ওয়াশিংটন ও কালিফোরনিয়ায় রেগেটা ক্রুরা যতখানি শক্তিশালী, পরিশ্রম ও ধৈর্যশীল হয়, ততখানি অন্য কোন দেশের অধিবাসীরা হয় না।

ফিন্‌ল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ের অধিবাসীরা বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিজেদের পারদর্শিতা দেখিয়েছে। ডাঃ পারকিনস বলেন, ঐ সব শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। সেই কারণে তাদের শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় অন্য কোন দেশের খেলোয়াড়রা তাদের সহজে পরাস্ত করতে পারে না।

কালিফোরনিয়া ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ডাঃ লরেন্স গবেষণা করে বলেছেন, ক্লান্তি উপশমের জন্য ভিটামিন 'সি'রও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিশ্বের ক্রীড়াজগতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করতে হলে খেলোয়াড়দের দৈহিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করতে হবে।

জল বায়ুর পার্থক্য হেতু সকল দেশের খেলোয়াড়রা সমানভাবে দৈহিক শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না। বিজ্ঞান বর্ত্তমানের সে সমস্যার সমাধান ক'রেছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণা গৃহে টেষ্ট টিউবের মধ্যে যে তরল পদার্থের আবিষ্কার করেছেন, তা ক্রীড়া জগতে যে আশার সঞ্চার করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

# আজ-কাল

## উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা

উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের আয়োজন চলেছে। পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র এতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসী ছিলেন, তিনিও এই আয়োজনে ভিড়েছেন। সেদিন তিনি কৈফিয়ৎস্বরূপে বলেছেন যে, ৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেশ যেরূপ অবস্থায় ছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের ফলে পুনরায় দেশ সেই অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে সে আবার পেছিয়ে যাচ্ছে। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস এখন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী কোরছে, সুতরাং এখন প্রদেশে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নেওয়াতে কোন ব্যাঘাত নেই। তিনি এই আশা পোষণ করেছেন যে, অন্যান্য প্রদেশেও উড়িষ্যার পন্থা অনুকরণ কোরে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকের প্রস্তাবের কি ইহা ক্রমপরিণতি?

## মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব লোভীর দল

মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। মিঃ জি এস পাগে সরাসরি ভারত সচিবের কাছে এই মর্ম্মে এক আরজি পেশ কোরেছেন যে, তাঁদের যদি এবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ছয়মাসের মধ্যেই তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কোরে কায়েমী রকমে মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত কোরতে সক্ষম হবেন। উড়িষ্যার কংগ্রেসীদের একদল কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের বিরুদ্ধতা ক'রে বিবৃতি জারী ক'রেছেন, তাঁরা এ পর্য্যন্ত বলেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে এইরূপভাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের চেষ্টা অত্যন্ত ঘৃণ্য। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসীদের ভিতরও এই রকম মতবিরোধ হয়ত দেখা দেবে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সমর্থন ক'রে সুস্পষ্ট বিবৃতি না দেওয়া পর্য্যন্ত ইহাই স্বাভাবিক।

গান্ধীজী ইংরেজদের অস্ত্রত্যাগ করবার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটা তাঁর অনুরোধে বড়লাট মারফৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে যায়। কিন্তু বড়লাট জানিয়েছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজী নন।

## জনাবী কীর্ত্তি

জিন্না সাহেব আর এক আজব ভেল্কি দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর কাছে এক ব্যক্তিগত টেলিগ্রামে বলেছিলেন যে, কংগ্রেস জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলতে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা বোঝে; সুতরাং তিনি জানতে চান, মুসলিম লীগ হিন্দু মুসলিম দুই জাতি পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতে পারে কিনা। এর উত্তরে জনাব জানান যে, তিনি মৌলানা আজাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে সম্মত নন; মৌলানা আজাদ হিন্দু কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুকূল হারিয়েছেন; আত্মসম্মান থাকলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত...... ইত্যাদি চোস্ত চোস্ত কথা।

জনাব জিন্নার এই অসভ্যতায় অনেক মুসলমান অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা যেন চালানো না হয় এই মনোভাব সকলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ লোকই অনুমান করছেন যে, জিন্না সাহেবের প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমশ চলে যাচ্ছে বলেই তিনি আজকাল মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছেন না।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে শ্রীসভরকার বলেছেন যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টে ভারতের অধিবাসী-সংখ্যানুপাতে হিন্দুদের মন্ত্রিপদ দিতে হবে।

## পাঞ্জাবে দমননীতি

পাঞ্জাবে যে দমননীতি চালানো হচ্ছে এবং সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদের পাঁচ জন সদস্যকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের এক গোপন অধিবেশন হয়েছে। ভারতে আইন সভার গোপন অধিবেশন এই প্রথম। এই গোপন বৈঠকের এক সরকারী বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ দমন করবার জন্যে বিশেষত পাঞ্জাব থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় বলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্যে দমননীতি অবলম্বন সমর্থন করে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাতে কমিউনিজমের মামুলী ভয়ই দেখান এবং কমিউনিষ্টদের গুপ্ত কর্ম্মতৎপরতার এক রোমহর্ষণ বিবরণ দেন।

বিরুদ্ধবাদী দলের তরফ থেকে যে সব বক্তৃতা করা হয় সেগুলি প্রকাশ করা হয়নি। প্রস্তাবটি শেষ পর্য্যন্ত ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

ব্যবস্থা পরিষদের যে সকল সদস্যকে আটক করা হয়েছে, এই বিতর্কে তাঁদের উপস্থিত থাক্‌তে দিতে বিরুদ্ধবাদী দল অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। বিতর্কের আগে ঐ বন্দী সদস্যদের সঙ্গে পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা দেখা করতে চান, যাতে বিতর্কের সময় যথোচিত তাঁদের পক্ষ সমর্থন করা যায়। কিন্তু স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর টালবাহানার ফলে শেষ পর্য্যন্ত সে সুযোগ তিনি পাননি। বিরুদ্ধবাদী দল সরকারী প্রস্তাবের সংশোধন প্রস্তাব আন্‌তে চেয়েছিলেন; কিন্তু স্পীকার তার অনুমতি দেন নি।

# বৃটেন-চীন-জাপান

## চীনকে সাহায্যদান বন্ধ

ইওরোপের যুদ্ধের সুযোগে জাপান দাবী করছিল যে, বর্ম্মা এবং ফরাসী ইন্দোচীনের মধ্যে দিয়ে চীনে অস্ত্রশস্ত্র যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোক। ইন্দোচীন সে দাবী কিছুকাল আগেই মেনে নেয়; এখন জাপ সংবাদপত্র থেকে জানা গেল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও বর্ম্মা সম্পর্কে জাপানের দাবী মেনে নিয়েছেন। এখন থেকে বর্ম্মার রাস্তা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামরত চীনের কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা সমরোপকরণ যাবে না। কোনরকম সমরোপকরণ যাচ্ছে কিনা তার উপর আবার রেঙ্গুনের জাপানী অধিবাসীরা লক্ষ্য রাখবে।

ফরাসী ইন্দোচীনের গবর্ণর জেনারেল চীনের পথ বন্ধ করা ছাড়াও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি জাপ বাহিনীকে সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

এই সঙ্গে আবার মালয়ের গবর্ণর মিঃ জোন্স প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন চীন ও জাপানের মধ্যে একটা মিটমাটের জন্যে চেষ্টা করছেন। জাপান চীন সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব দিয়েছিল তাই নিয়ে টোকিওতে বৃটিশ রাজদূত আলোচনা করছেন।

প্রাচ্যের যুদ্ধ মিটিয়ে জাপানকে তুষ্ট করতে পারলে বৃটেনের যে কিছু সুরাহা হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ম্মার পথ বন্ধ করার অব্যবহিত পরেই এই বাহ্যত সাধু শান্তি-চেষ্টা বড় বিসদৃশ দেখায়। মিঃ জোন্সের বিবৃতি সম্বন্ধে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহল বলেছেন যে, তাঁকে এ রকম কোনো খবর প্রকাশ করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

## ইওরোপ

### ফ্রান্সের অবস্থা

এ সপ্তাহে ইওরোপে বড় কোন ঘটনা ঘটে নি। ফ্রান্সে পূর্ব্বে অনুমান মতো ফাসিস্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৭০ বছর পর তৃতীয় সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হল। মার্শাল পেত্যাঁ জার্ম্মান মুষ্টিগত ফ্রান্সের ডিক্টেক্টর হয়েছেন। জরুরী অবস্থায় আইন প্রবর্ত্তন, মন্ত্রিদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি, অবরোধের অবস্থা ঘোষণা—এই সব নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ফরাসী জাতীয় পরিষদ তাঁকে দিয়েছে। তাঁর পরেই ফরাসী রাষ্ট্রে প্রধান ব্যক্তি হয়েছেন মঃ লাভাল। মার্শাল পেত্যাঁ ১২ জনকে নিয়ে এক মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

কিন্তু ফরাসী শাসকশ্রেণী ফাসিস্ট গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করেও জার্ম্মানী বা ইতালীকে তুষ্ট করতে পারে নি। জার্ম্মান ও ইতালীয় সরকারী নিউজ এজেন্সী জানিয়ে দিয়েছে যে, ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহ নেই; তাদের পাওনা ফ্রান্সকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিতে হবে। শুধু ফ্রান্সের জীবনধারণের জন্যে যেটুকু জায়গার দরকার তা ছাড়া আর সব রাজ্যপাট তাকে ছাড়তে হবে।

### বিমান আক্রমণ

ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মানীর বিমান আক্রমণের তীব্রতা একটু বেড়েছে। প্রত্যহই উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে বিমানহানা চলছে। আক্রান্ত শহরের নাম বা ক্ষতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না; সামরিক কারণেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সংযম অবলম্বন করেছেন। একদিন জার্ম্মানরা ৪০০ থেকে ৫০০ বোমা ফেলেছিল। বৃটিশ বিমানবহরও জার্ম্মান অধিকৃত নানাস্থানে হানা দিয়ে প্রভূত ক্ষতি করছে বলে দাবী করেছে।

মিঃ চার্চ্চিল এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন যে, জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে বৃটেন এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত; যুদ্ধ সহজে মিটবে না, আগামী শীতকাল, ১৯৪১ সাল ভর, এমন কি ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলবে। নৌসচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার ঐ দিন এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, জার্ম্মানী যদি ইংল্যাণ্ড দখল করেও নেয়, তবু ইংরেজরা তাদের ডোমিনিয়ন থেকেই লড়াই চালাবে।

### আফ্রিকায় লড়াই

লিবিয়া, এরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়া সীমান্তে অনবরত সংঘর্ষ চলছে। ইতালীয়রা কেনিয়া আবিসিনিয়া সীমান্তে বৃটিশ মোয়েল দখল করে নিয়েছে। লিবিয়াতে বৃটিশ সৈন্যেরা ৬০ মাইল ভিতরে চলে গিয়েছিল; অবশেষে আরো ইতালীয় সৈন্য এসে হৃত ঘাঁটিগুলি পুনরধিকার করে। উভয়পক্ষের বিমান আক্রমণ চলছে।

বৃটেন ও ইতালীর কয়েকটা সাবমেরিণ ও ডেস্ট্রয়ার ডুবির খবর পাওয়া গেছে।

### আয়র্ল্যাণ্ড

আয়ারির পক্ষ থেকে মিঃ ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করেছেন যে, আয়ারি সর্ব্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকবে; বৃটেন বা জার্ম্মানী যেই তাকে আক্রমণ করুক সে প্রতিরোধ করবে। তিনি এই সঙ্কটকালে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডকে পৃথক করে না রাখবার আবেদন জানান। কিন্তু উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড ক্রেগাভন আয়ারির সঙ্গে মিলতে রাজী নন, কারণ তাহলে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের পক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করা আর সম্ভব হবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন এবং আয়ারির উপর নজর রেখেছেন, যাতে জার্ম্মানী আগেভাগে এসে আয়ারিতে ঘাঁটি করতে না পারে।

### সোভিয়েট-তুরস্ক

সোভিয়েট তুরস্ককে দার্দ্দানেলস-এর কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কে এক চরমপত্র দিয়েছে, এই সংবাদ দুই পক্ষই অস্বীকার করেছে। তবে তুরস্ক নতুন সৈন্য আহ্বান করেছে। তুর্কী প্রধান মন্ত্রী প্রতিনিধি সভায় এক বক্তৃতায় গুপ্ত জার্ম্মান কর্ম্মতৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন যে, জার্ম্মানী তুরস্কের ভিতর থেকে গোলমাল সৃষ্টির জন্যে এবং সোভিয়েটের সঙ্গে তুরস্কের একটা বিভেদ ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি সম্প্রতি প্রকাশিত জার্ম্মান হোয়াইট বুকের উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছিল যে, তুরস্ক ইংরেজের যোগসাজসে সোভিয়েটের তৈলকেন্দ্র বাকু আক্রমণের এক পরিকল্পনা করেছে।

একটা খবর পাওয়া গেছে যে, জার্ম্মানীর সঙ্গে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার টেলিফোন যোগাযোগ কয়েকদিন ধরে বন্ধ হয়েছে।

১৫।৭।৪০ —ওয়াকিবহাল

# জার্ম্মানীর পরবর্ত্তী উদ্যম

(৯৩২ পৃষ্ঠার পর)

হয়, সেইজন্যই চেষ্টা করিবে এবং তুরস্কেরও স্বার্থ হইবে রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা। ইংরেজের পক্ষেও তুরস্ক ও রুশিয়ার মধ্যে মৈত্রী দৃঢ় থাকে, তাহাই হইবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তুরস্কের স্বাতন্ত্র্য-মর্য্যাদা এবং অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহা সম্ভব হইয়া উঠিবে কি না, ইহাই হইতেছে সমস্যা। বলা বাহুল্য, দার্দ্দেনেলিসের কর্ত্তৃত্ব তুরস্কের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা। অতীতে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অনেক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। রুশিয়ার দৃষ্টিও বহুদিন হইতেই ছিল এই দার্দ্দেনেলিস প্রণালীর ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরে তাহার অধিকার সম্প্রসারণের দিকে। রুশিয়া বল্টিকে যেরূপভাবে বর্ত্তমান সুযোগে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সেইরূপ-ভাবে রাজনীতিক চাতুর্য্য প্রয়োগ করিয়া এশিয়ার পশ্চিমাংশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার অবসর খুঁজিবে কি না এবং সেই সুযোগ লাভ করিবার জন্য তুরস্কের উপর চাপ দিবে বল্কানের এই সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। জার্ম্মানী যত সহজে ইংরেজকে কাবু করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহা সে পারে নাই। ইহার পর কূট রাজনীতিক কৌশল-প্রয়োগে সে বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল করিয়া লইবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিবে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের বিস্তার তাহার পক্ষে সুবিধাজনক, বিশেষভাবে রুশিয়াকে সে যদি সঙ্গে পায়। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তুর্কী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের রাজনীতিজ্ঞতার পরীক্ষা হইবে। তুরস্ক রাষ্ট্র হিসাবে জগতের অন্যতম প্রধান শক্তি না হইলেও তাহার অবস্থানের গুরুত্ব অনেক বেশী। পশ্চিম এশিয়ার ইরাক, ইরাণ এবং আফগানিস্থানের উপরও তুরস্কের প্রভাব রহিয়াছে। পশ্চিম এশিয়ার দিকে জার্ম্মান ও ফ্যাসিষ্টদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার পক্ষে তুরস্ক প্রাকারস্বরূপে কাজ করিতে পারে।

বল্কানের সমস্যা প্রধানত নির্ভর করিতেছে রুশিয়ার

বৃটেনের চলমান কামান

কি না, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। শুধু তাহাই নহে, রুশিয়া যদি তুরস্কের উপর সেইরূপ চাপ দেয়, তাহা হইলে ইংরেজের পক্ষে কি কর্ত্তব্য হইবে। ইংরেজ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের বিস্তার এড়াইবার জন্য রুশিয়ার প্রস্তাবে তুরস্ককে রাজী হইতে বলিবে কি না এবং যদি বলে তখন তুরস্ক কি করিবে, ইহাও দেখিবার বিষয়। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, রুশ-ফিনিশ সংগ্রাম শেষ হইবার কিছুকাল পরে তুরস্ক যাহাতে জার্ম্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, রুশিয়া সেইরূপ চেষ্টা করে; কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে নিজেদের সন্ধি-সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া তুরস্ক সে প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে নাই। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় এখনও বল্কানের সমস্যাকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, এইসব বিবৃতি হইতেই বুঝা যায়। জার্ম্মানীর ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যমের পরিণতি কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য যাঁহারা উদ্গ্রীব আছেন, বল্কানের বর্ত্তমান এই সমস্যার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি হয়ত তেমন পড়িতেছে না; কিন্তু মতিগতির উপর। মোটামুটি রাশিয়ার নীতি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, রুশিয়া এই অবসরে নিজের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। বল্টিকের ব্যাপারে কার্য্যত জার্ম্মাণীর শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করা সত্ত্বেও জার্ম্মাণী যেমন তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই, বল্কানের ব্যাপারেও রুশিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি-তেছে যে, তাহার মতবাদের সম্প্রসারণ এতকাল যাঁহারা বিভী-ষিকার মত দেখিয়াছে, বর্ত্তমানে বল্কানেও অবস্থা এমন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারাও তাহাকে আজ বাধা দিতে পারিবে না। এমন অবস্থায় যদি শুধু চাপ দিয়া নিজের কাজ হাসিল হয়, তবে সে তাহা করিতে ইতঃস্তত করিবে না। বল্কানের পরিস্থিতি এবং পশ্চিম এশিয়ার উপর সেই পরিস্থিতির প্রভাব সম্বন্ধে ইংরেজ, ইটালী এবং জার্ম্মাণীর সম্পর্কে রুশিয়া এইরূপ মনোভাবই পোষণ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ষ্ট্যালিন এ পর্য্যন্ত যেরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইবার কারণ রহিয়াছে।

**নিউ সিনেমায়—'ঘরকী রাণী'**

হংস পিকচারের নূতন ছবি 'ঘরকী রাণী' গত ১২ই লাই শুক্রবার হইতে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে। এই ত্রে অভিনয় করিয়াছেন লীলা চিৎনীশ, মীনাক্ষী, কুসুম ণপাণ্ডে, বিমলা বশিষ্ঠ, বিনায়ক, বাবুরাও পেণ্ডারকার, ন্না মালভাঙ্কার এবং সালভী। ছবিখানি পরিচালনা করিয়া-ন বিনায়ক। কিন্তু টেক্‌নিশিয়ানদের নাম কোথাও উল্লেখ া হয় নাই কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে নো ছবির ভালো মন্দ অভিনেতৃমণ্ডলীর উপর যতখানি র্ভর করে, ঠিক ততখানিই নির্ভর করে যাঁহারা আলোকচিত্র ও দ গ্রহণ করেন, যাঁহারা সংলাপ রচনা করেন, যাঁহারা সংগীত রচালনা করেন।

'ঘরকী রাণী'র কাহিনী সামাজিক, ইংরেজী শিক্ষালাভে য়েদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হয়, ছবিটিতে ইহাই শ্লেষ ও দ্রুপের মধ্যে দেখানো হইয়াছে।

হংসরাজ পিতামাতার নির্দেশানুসারে বিবাহ করিয়াছে কটি সুন্দরী যুবতী পল্লীবালিকাকে, নাম মুক্তা। মুক্তা তীসাধ্বী, পতিপরায়ণা, কিন্তু হংসরাজ তাহাতে সুখী নয়; চাহিয়াছিল ইংরেজী শিক্ষিতা ও বিলিতি আদবকায়দা দুরস্ত কটি বিদুষীকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করিতে। হংসরাজের ধু হীরা দেবী সুন্দরী বিদুষী; হংসরাজ সর্বদাই ভাবে ক্তাকে যদি হীরা দেবীর মত গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে নের আশা পূর্ণ হয়। হংসরাজ একটি মাস্টার রাখিয়া মুক্তাকে রেজী শিখাইতে লাগিল এবং মুক্তাও স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য ধুনিকা হইবার যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছে।

এদিকে হীরা দেবী বিবাহ করিয়াছেন, ডাঃ অমৃতকে। তিনি ণ্ডিত এবং বড়লোক; তিনি বই লইয়াই সর্বক্ষণ কাটান বলিয়া ী হীরা দেবী নিসঙ্গ বোধ করেন। ইতিমধ্যে হংসরাজ তাহার ীকে বন্ধুমহলে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য একটি চায়ের জলিশের ব্যবস্থা করিয়া হীরা দেবী ও তাঁহার স্বামী ও অন্যান্য ধুদের নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু সেখানে মুক্তা তাহার স্বল্প ইংরেজি দ্যা লইয়া যে কাণ্ড করিয়া বসিল তাহাতে আমন্ত্রিতরা প্রচুর াসিলেন, হংসরাজ লজ্জায় দুঃখে রাগে অধীর হইয়া উঠিল, বশেষে গৃহত্যাগ করিয়া হীরা দেবীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত ইল। ঠিক সেই সময়েই ডাঃ অমৃত যাইতেছেন দিল্লীতে বক্তৃতা তে, কিন্তু স্ত্রী হীরা দেবী যাইতে দিতে নারাজ। তবুও ইতে দিতে হইল, কিন্তু স্বামীর প্রতি তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া ঠিল। এই শুভ মুহূর্তেই আবির্ভাব হংসরাজের। হীরা দেবী াহাকে লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। হংসরাজের দিনগুলি হীরা বীকে লইয়া হাসি ও আনন্দে বহিয়া চলিয়াছে। ওদিকে শোক-হবলা মুক্তা দেবী সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু র্শিদিন নয় হীরা দেবীর পুরাতন বন্ধু জিন্দাদীল পুনরায় াসিয়া উপস্থিত এবং হীরা দেবী আবার তাহাকে লইয়া গা াসাইয়া দিলেন। একদিন জিন্দাদীলের সম্মান উপলক্ষে এক মজলিসে হীরা দেবী হংসরাজকে কুকুরের ন্যায় অপমান করিল। হংসরাজের চোখ ফুটিল বিদুষী নারীর সংসর্গের মোহে সে তাহার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া কতবড় অবিচার করিয়াছে। অনুতাপদগ্ধ চিত্ত লইয়া সে পুনরায় তাহার স্ত্রী ও মাতার নিকট ফিরিয়া গিয়া গৃহকে আনন্দে ভরিয়া তুলিল।

ইংরেজি শিক্ষা যে বাঞ্ছনীয় নহে হীরা দেবী চরিত্রে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বিদুষী হইলেই যে মেয়েরা বিগড়াইয়া যায় তাহা সবক্ষেত্রে সত্য নহে। ইংরেজি শিক্ষা লাভের ভালও আছে মন্দও আছে, তবে এ ক্ষেত্রে কেবল মন্দ দিকটি দেখান হইয়াছে। হীরা দেবীর ভূমিকায় লীলা চিৎনীশের অভিনয় ভাল লাগিয়াছে, মুক্তার ভূমিকায় মীনাক্ষীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সুরেলা কণ্ঠের গানগুলি মনকে মুগ্ধ করে। তাঁহার মাধুর্যমণ্ডিত অভিনয়গুণে পতিপরায়ণা সরলা বালিকার চরিত্রটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন পরিচালক নিজেই। তাঁহার অভিনয়ে জড়তা নাই, প্রাণ আছে, কিন্তু এক এক জায়গায় অতিরিক্ত অতিরঞ্জনের ফলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। জিন্দাদীলের ভূমিকায় বাবুরাও প্রসংশনীয় অভিনয় করিয়াছেন। ছবিটির ক্যামেরার কাজ ভাল, গানগুলি শ্রুতিমধুর, শব্দগ্রহণ মন্দ নয়।

**নাট্যমঞ্চের কথা**

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নাট্যনিকেতন ও রঙমহলে নাট্য-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বাঙলার কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হইতেছে। কিন্তু যে সকল নাটক একদিন শত শত রজনী বিপুল দর্শক সমাগমে অভিনীত হইয়া সাফল্য গৌরব লাভ করিয়াছিল আজ সেখানে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয় না, দর্শকদের মধ্যে সে উৎসাহ ও আগ্রহ নাই। সে শিশির ভাদুড়ীও রহিয়াছেন, সে প্রভাও রহিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁহারা নিষ্প্রভ। ইহার আরোও একটি কারণ আছে, প্রাচীন তাহা যত গৌরবেরই হউক তাহার পুনরাবৃত্তিতে গর্ব করিবার কিছুই নাই তাহা দৈন্যের পরিচায়ক। মানুষের গতিশীল মন সর্বদাই চায় নূতনের সৃষ্টি। যে শিল্প নব নব সৃষ্টির পথে চলিতে পারে না বুঝিতে হইবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বাঙলার নাট্যমঞ্চের কি আজ সেই দশা?

**রঙমহল**

আগামী ২০শে জুলাই, শনিবার ও ২১শে জুলাই, রবিবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে 'মহানিশা' ও 'গোরা' অভিনীত হইবে। বাঙলা সাহিত্যে 'গোরা' উপন্যাস যেমন জনপ্রিয় নাট্যজগতে 'গোরা' অভিনয় তেমনই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। পানুবাবুর ভূমিকায় নরেশ মিত্রর অভিনয় নূতন সৃষ্টি; সঙ্গে আছেন ভূমেন রায়, রবিরায়, যোগেশ চৌধুরী, সিধু গাঙ্গুলী, ধীরেন দাস, শান্তি গুপ্তা, পদ্মাবতী, ঊষা দেবী, ছায়া দেবী, আঙ্গুরবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

### কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে এই বিষয় লইয়া ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যে জল্পনাকল্পনা হইত, তাহারও অবসান হইয়াছে। প্রথম বিভাগে অর্থাৎ প্রথম ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এইবার লইয়া মহমেডান স্পোর্টিং উক্ত বিভাগে ছয়বার চ্যাম্পিয়ান হইল। ভারতীয় দলের মধ্যে কোন দলেরই ভাগ্যে এত অধিকবার চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই বিষয় মহমেডান স্পোর্টিং দলের কৃতিত্ব অতুলনীয়। ১৯৩৪ সালে সর্ব্বপ্রথম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলিবার অধিকার লাভ করে। সেই বৎসর উক্ত দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। তাহার পর পর পর পাঁচ বৎসর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ পায়। কলিকাতার বিভিন্ন বিশিষ্ট দলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মহমেডান স্পোর্টিং দল ঐ সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে রেফারীর ক্রীড়া পরিচালনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিবাদস্বরূপ লীগ খেলার শেষের দিকে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট দলও ইহাদের সহিত যোগদান করে। এই সময় লীগ তালিকায় উক্ত তিনটি দল যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে চ্যাম্পিয়ান হওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহা হইলেও এইরূপ তিনটি বিশিষ্ট দল প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করায় লীগ প্রতিযোগিতার সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনা কমিয়া যায়। তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী মোহনবাগান ক্লাব দল অনায়াসে চ্যাম্পিয়ান হয়।

### ১৯৪০ সালের প্রতিযোগিতা

১৯৪০ সালের লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যোগদান করে না। ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট দল যোগদান করে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দাবী লইয়া নানারূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। শেষে আই এফ এর সভাপতি শ্রীযুত এস এন ব্যানার্জ্জি ও স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রচেষ্টায় গণ্ডগোলের অবসান হয়। লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভের দুই সপ্তাহ পরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যোগদান করে। এক বৎসর বিশিষ্ট খেলা হইতে অবসর গ্রহণের জন্যই হউক বা গণ্ডগোলজনিত মানষিক অশান্তির জন্যই হউক, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতার সূচনায় খুবই নৈরাশ্যজনক খেলা প্রদর্শন করেন। এই সময় মোহনবাগানের খেলাও নৈরাশাজনক হয়। কালীঘাট ও রেঞ্জার্স দল সকলের মনে উৎসাহ দান করিতে থাকে। এক মাস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং, এই দুইটি দলের খেলা বিশেষ উন্নত হয়। মোহনবাগান লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং মহমেডান দল পরে প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় মোহনবাগানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু খেলার ক্রমোন্নতি দেখিয়া অনেকেই চিন্তা করিতে বাধ্য হন যে, মোহনবাগান দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে মহমেডান সহজে দিবে না। লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্দ্ধের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগান দলের নিকট পরাজয় বরণ করিলে ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া স্থির করিয়া ফেলেন। মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ মোহনবাগান দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় নিরুৎসাহ হন না। তাঁহারা দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হইতে বিপুল উদ্যমে খেলিতে আরম্ভ করেন। ফলে অধিকাংশ খেলাতেই মহমেডান স্পোর্টিং দল জয়লাভ করিয়া পয়েণ্ট সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও ক্রীড়ামোদিগণের মন হইতে মোহনবাগান দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ অপসারিত হয় না। মোহনবাগান ক্লাবের নিকট দ্বিতীয়বার মহমেডান পরাজিত হইয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ হারাইবে এই স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। লীগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান দল যখন মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিকট পরাজিত হইল, তখন সকলেই হতাশ হইলেন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যে চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। ফলেও তাহাই হইল। মহমেডান স্পোর্টিং লীগ চ্যাম্পিয়ান হইল। মোহনবাগান দল লীগ তালিকায় উক্ত দলের তিন পয়েণ্ট পশ্চাতে পড়িয়া রাণার্স আপ হইল। রেঞ্জার্স ক্লাব তৃতীয় স্থান ও ইষ্টবেঙ্গল চতুর্থ স্থান লাভ করিল।

ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল লীগ প্রতিযোগিতায় যেরূপ নৈরাশ্যজনক খেলার অবতারণা করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই আশংকা করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে একটি দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবে। কিন্তু লীগ প্রতিযোগিতার শেষ কয়েকটি খেলায় এই দুইটি দল পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়া নামিয়া যাইবার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে। ক্যালকাটা দল লীগ তালিকার সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দলকেই দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইতে হইবে। ক্যালকাটা দল ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সাহায্যে রেহাই পাইয়াছে। কিন্তু এই বৎসর তাহারা পুনরায় সেই সৌভাগ্য যে লাভ করিবে না, সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

### দ্বিতীয় ডিভিসন

দ্বিতীয় ডিভিসনের যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, সেইরূপ ফল হইয়াছে। ডালহৌসী দল এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। অরোরা ক্লাব প্রতিযোগিতার প্রথম হইতে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শেষপর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। ডালহৌসী দল উক্ত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪১ সালে প্রথম ডিভিসনে খেলিবার অধিকার লাভ করিল। ১৯৩৭ সালে ডালহৌসী দল প্রথম ডিভিসন হইতে নামিয়া গিয়াছিল। তিন বৎসর পর তাহারা পুনরায় প্রথম ডিভিসনে খেলিবার সৌভাগ্য পাইল।

### তৃতীয় ডিভিসন

তৃতীয় ডিভিসনে ট্রপিক্যাল স্কুল দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। সালখিয়া ফ্রেণ্ডস অথবা মাড়োয়ারী দল শেষ পর্য্যন্ত এই দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠে নাই। ১৯৪১ সালে ট্রপিক্যাল স্কুল দল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিবে।

### চতুর্থ ডিভিসন

চতুর্থ ডিভিসনে রবার্ট হাডসন দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এই দল যে চ্যাম্পিয়ান হইবে প্রতিযোগিতার সূচনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। প্রতিযোগিতার প্রত্যেক খেলাতেই এই দল প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অধিক গোলে পরাজিত করিয়াছে। এই দলের পক্ষে এই পর্য্যন্ত মোট ৫৭টি গোল হইয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতায় কোন ডিভিসনেই কোন দলের পক্ষে এত অধিক

গোল দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সেই হিসাবে এই দলের কৃতিত্ব অসাধারণ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নিম্নে বিভিন্ন ডিভিসনের লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান**
চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত

**প্রথম ডিভিসন লীগ**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মহঃ স্পোর্টিং | ২৪ | ১৭ | ৬ | ১ | ৪২ | ৭ | ৪০ |
| মোহনবাগান | ২৪ | ১৭ | ৩ | ৪ | ২৬ | ১১ | ৩৭ |
| রেঞ্জার্স | ২৪ | ১৩ | ৬ | ৫ | ৩৯ | ২১ | ৩২ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ২৪ | ১০ | ১০ | ৪ | ২২ | ১৫ | ৩০ |
| কালীঘাট | ২৪ | ৯ | ৯ | ৬ | ২৯ | ২৩ | ২৭ |
| ই বি আর | ২৪ | ৬ | ৯ | ৯ | ২২ | ২৫ | ২১ |
| এরিয়ান্স | ২৪ | ৬ | ৮ | ১০ | ২৭ | ৩১ | ২০ |
| পুলিশ | ২৪ | ৭ | ৫ | ১২ | ৩০ | ৩৪ | ১৯ |
| বর্ডার রেজিঃ | ২৪ | ৭ | ৫ | ১২ | ২০ | ২৮ | ১৯ |
| কাষ্টমস্ | ২৪ | ৫ | ৯ | ১০ | ১৯ | ২৮ | ১৯ |
| ভবানীপুর | ২৪ | ৭ | ৪ | ১৩ | ১৩ | ২৯ | ১৮ |
| স্পোর্টিং ইউঃ | ২৪ | ৫ | ৬ | ১৩ | ১৫ | ৩৩ | ১৬ |
| ক্যালকাটা | ২৪ | ৩ | ৮ | ১৩ | ১৮ | ৩৪ | ১৪ |

**দ্বিতীয় ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডালহৌসী | ২২ | ১৩ | ৭ | ২ | ৪৭ | ১৭ | ৩৩ |
| অরোরা | ২১ | ১১ | ৭ | ৩ | ২৪ | ১১ | ২৯ |
| কুমারটুলী | ২২ | ১০ | ৯ | ৩ | ৩২ | ১৮ | ২৯ |
| জর্জ্জ টেলিগ্রাফ | ২১ | ৮ | ১২ | ১ | ২৩ | ১১ | ২৮ |

**তৃতীয় ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ট্রপিক্যাল স্কুল | ১৫ | ১৩ | ২ | ০ | ২৭ | ৫ | ২৮ |
| সালখিয়া | ১৪ | ১০ | ৩ | ১ | ৩৪ | ৬ | ২৩ |
| মাড়োয়ারী | ১৫ | ৯ | ৩ | ৩ | ৩১ | ১০ | ২১ |

**চতুর্থ ডিভিসন**

| | খে | জ | ড্র | প | স্ব | বি | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবার্ট হাডসন | ১৩ | ১২ | ১ | ০ | ৫৯ | ৭ | ২৫ |
| জোড়াবাগান | ১৪ | ১১ | ১ | ২ | ২৩ | ৫ | ২৩ |
| মহমেডান এ্যাথঃ | ১৩ | ৮ | ৩ | ২ | ২৭ | ৯ | ১৯ |

**লীগ প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক গোলদাতাদের নাম**

১৯৪০ সালের আই এফ এ'র পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের খেলায় যে সকল খেলোয়াড়গণ অধিকসংখ্যক গোল দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

| | |
|---|---|
| আর লামসডেন (রেঞ্জার্স) | ২৩ |
| সাবু (মহমেডান স্পোর্টিং | ১৬ |
| ডি ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স) | ১৩ |
| জোসেফ (কালীঘাট) | ১১ |
| রসিদ (মহমেডান স্পোর্টিং) | ১১ |
| সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল) | ১০ |
| এ রায় চৌধুরী (মোহনবাগান) | ৯ |
| পি ডি মেলো (পুলিশ) | ৮ |
| এন মজুমদার (ই বি আর) | ৭ |
| ল্যাং (বর্ডার রেজিমেণ্ট) | ৬ |

**আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা**

ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর ৪৪টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের প্রতিযোগিতা বিশেষ আকর্ষণীয় হয় নাই। যোগদানকারী গোরা সৈনিক দলের সংখ্যা অধিক না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। একমাত্র লিনকন রেজিমেণ্ট দল ছাড়া অন্য কোন বাহিরের গোরা দল যোগদান করে নাই। বাঙলার বাহির হইতে যে সকল দল যোগদান করিয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালোর মুসলীম, দিল্লী প্রাদেশিক দল, পেশোয়ার জিমখানা, কানপুরের গোল্ডেন স্পোর্টস ক্লাব, ভিজাগাপট্টমের অন্ধ্র একাদশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শীল্ড তালিকা যেভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে মোহনবাগান ও মহমেডান তালিকার উভয়ার্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছে। ফাইনাল খেলার পূর্ব্বে এই দুইটি দলের মিলিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তালিকার উপরিভাগে মোহনবাগান দল অবস্থিত। এই দলকে ফাইনালে পৌঁছিতে হইলে কালীঘাট, ইষ্টবেঙ্গল, দিল্লী, পেশোয়ার ও লিনকন রেজিমেণ্ট প্রভৃতি দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতে পারে। নিম্নভাগে মহমেডান স্পোর্টিং দলকেও বাঙ্গালোর মুসলীম, অন্ধ্র একাদশ, বি এন আর, বর্ডার রেজিমেণ্ট, ঢাকা ওয়ারী প্রভৃতি দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। খেলার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে হইতে কিছুই বলা যায় না। তবে অনেকের মতে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দল ফাইনালে মিলিত হইবে এবং এই দুইটি দলের মধ্যে একটি দল শীল্ড বিজয়ী হইবে। এই ধারণা কতদূর সত্য, তাহার প্রমাণ দুই সপ্তাদের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

**ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা**

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের খেলা শেষ হইয়াছে। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট পাইয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এইবার লইয়া বৌবাজার দল পর পর তিনবার উক্ত লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিল। বৌবাজার দলের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। হাটখোলা দল রাণার্স আপ হইয়াছে।

# সমর বার্তা

৯ জুলাই।—

গত ৫ই জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস্‌এর সংবাদদাতার নিকট মিঃ ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন, আক্রমণের সুবিধার জন্য জার্মানিই আয়ার চড়াও করুক অথবা প্রতিরোধের সুবিধার জন্য ব্রিটেনই চড়াও করুক, উভয়ক্ষেত্রেই আয়ার বাধা দিবে।

বুখারেস্টের সংবাদ—রুমানিয়ার মন্ত্রিসভার তিনজন 'আয়রন গার্ড' সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। হাঙ্গারির দাবি লইয়াই এই সংকট দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

লণ্ডনে বিমানবিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, রবিবার রাত্রে ব্রিটিশ জঙ্গীবিমান লুডুইগস্‌, হ্যাফেন, ফ্র্যাংকফোর্ট, অসনুব্রয়েক, সোয়েস্ট, হাম, রুরঅর্থাদেন, প্রেমবুর্গ, উইহেলম্‌-স্যাভেন, হেড, ওয়েস্টারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু শত্রুস্থানে হামলা করিয়াছে। আজ স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে জার্মান বিমানরাও হামলা করিয়া গিয়াছে।

১০ জুলাই।—

ব্রিটেনের দক্ষিণ উপকূলে ঘোর আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। অনুমান ১৫০টি এয়ারোপ্লেন এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১০টি এয়ারোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লণ্ডনের ৯ জুলাইএর সংবাদ, ব্রিটিশ বিমানবাহিনী জোলে, হাতেল ও ওয়েস্টএর ডাচ খালসমূহ, সালবোর্গ, সোঁআস' দোভে, উইলহেল্‌ম্‌স হ্যাভেন, বার্গেন, স্ট্যাভাঙ্গার প্রভৃতি বহু শত্রুস্থানে ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছিল। জার্মানরাও চ্যানেল উপকূলের কয়েক স্থানে বিমান হামলা করিয়াছে।

লণ্ডনের ৯ই জুলাইএর সংবাদে প্রকাশ, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর পাল্লায় পড়িয়া ইতালীয় নৌবহরের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। একটা ডেস্ট্রয়ার ও একটা সাবমেরিন সম্পূর্ণ বিনষ্ট। এ ছাড়া ইটালির ৪টি বিমানের ধ্বংস ও ৭টির জখম হওয়ারও সংবাদ আসিয়াছে।

সাংহাইএর সংবাদ—"ব্রিটিশ উচ্ছেদ লীগ" নামক এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, চীন পরিত্যাগ না করিলে ব্রিটিশ সৈন্যদের তাড়াইবার জন্য "আমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য হইতে পারি"।

১১ জুলাই।—

কাল ইংলিশ চ্যানেলে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সময় জার্মান বিমানসমূহ চার হইতে পাঁচশত বোমা বর্ষণ করিয়াছে। চ্যানেলের উপর সারাদিনব্যাপী আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। বহুসংখ্যক জার্মান বিমান বিনষ্ট ও জখম করা হইয়াছে। ইংরেজদের বিমানও বহু শত্রুস্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

ব্রিটিশ নৌবিভাগের ঘোষণা—কাল আগাস্টার একটি ইতালীয় বন্দরে হামলা করিয়া ইংরেজদের নৌবিভাগের একটা বিমান একটা ডেস্ট্রয়ার ও একটা রসদবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। ইংরেজদের 'পার্থিয়ান' নামক একটা সাবমেরিন ইটালির একটা ইউবোটকে ডুবাইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। মালটায় পুনরায় ইটালির বিমানসমূহ হামলা করিয়াছিল।

বুখারেস্টের সংবাদ—রুমানিয়া রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিয়াছে।

ব্রেসেন রেডিওর সংবাদ—ড্যানিশ সরকার সরকারী কর্ম হইতে সমস্ত ইহুদীদের তাড়াইবার সংকল্প করিয়াছেন।

১২ জুলাই।—

ফ্রান্সে ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। মার্শাল পেত্যাঁ প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ একাধারে রাষ্ট্রের ও গভর্নমেণ্টের কর্তা হইলেন। নূতন ব্যবস্থায় আইনসভা থাকিলেও তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। তিনি রাষ্ট্র-সচিবদের পদচ্যুত করিতে, সন্ধির আলোচনা ও তাহা বলবৎ করিতে এবং অবরোধ ঘোষণা করিতে পারিবেন। বারজন সচিবের সাহায্যে দেশের শাসন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ব্রিটেন ও জার্মানি পূর্ববৎ পরস্পরের দেশে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। ইংরেজদের নৌবিভাগ হইতে আদেশ জারি হইয়াছে—ব্রিটেনের উপকূলভাগের সর্বত্র সাধারণ জাহাজগুলিকে বিকল ও ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া ফেলিতে হইবে।

১৩ জুলাই।—

টোকিওর সংবাদ—ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীন গভর্নমেণ্টকে মাল সরবরাহ বন্ধের জাপান কৃত দাবি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাধারণ ভিত্তিতে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডনের সংবাদ—জার্মানরা স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বিমান আক্রমণ করিয়াছে। ইংরেজরাও জার্মান অধিকৃত বহু সামরিক অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

টোকিওর সংবাদ—ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীন গভর্নমেণ্টকে মাল সরবরাহ বন্ধের জাপান কৃত দাবি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাধারণ ভিত্তিতে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৪ জুলাই।—

আজ বৈকালে ইংলিশ চ্যানেলে ও ডোভারে প্রবল আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। কতগুলি জার্মান জঙ্গীবিমান উপকূলভাগের নিকট একটি নৌবহরের উপর হামলা চালাইবার ফলেই নাকি এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। প্রায় ১৬টি জার্মান বিমান নষ্ট হইয়াছে। কাল জার্মানিতেও ইংরেজদের বিমানবহর ব্যাপক হামলা চালাইয়াছিল। কীল ডক ক্ষতিগ্রস্ত।

কায়রোর সংবাদ—সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী একটি ক্ষুদ্র ঘাঁটি সংখ্যাধিক্যবশত ইতালীয় সৈন্যেরা দখল করিয়াছে। ১৩ তারিখের সংবাদ—ময়ালে প্রবল যুদ্ধ চলিয়াছে। ইতালীয় বিমান-বহর এডেন-এ হামলা করিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ায় হামলা করিতে গিয়া বিতাড়িত হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদ—ওআশিংটনের রাষ্ট্রবিভাগে এই মর্মে এক জার্মান নির্দেশ আসিয়াছে যে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের দূতাবাস ও কনসাল অফিসের লোকজনকে আগামীকালের মধ্যে দেশত্যাগ করিতে হইবে।

১৫ জুলাই।—

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানিতে উভয়পক্ষের হাওয়াই হামলা পূর্ববৎ চলিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ও আক্রান্ত স্থানের সংখ্যা জার্মানিরই বেশী।

যুদ্ধারম্ভের পর হইতে আজ প্রথম ইতালীয় বিমানসমূহ প্যালেস্টাইনে হামলা করিয়াছে। ব্রিটিশ নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন টর্পেডোর আঘাতে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'এসকর্ট' ডুবিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীও ওলরুক আসার নাইরোবি প্রভৃতি স্থানে সফল আক্রমণ চালাইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের সংবাদ—মালয়ের অস্থায়ী গভর্নর মিঃ জোন্স বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চীন ও জাপানের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

**১৬ই জুলাই—**

অনধিকৃত চীন বন্দরগুলিকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য জাপ যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানসমূহ আজ প্রাতে হ্যাংচাও উপসাগরে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। জাপানের নূতন রাজনৈতিক সংগঠন প্রচেষ্টায় উদাসীন বলিয়া বর্তমান জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইংরেজ ও জার্মানদের পারস্পরিক বিমান আক্রমণ পূর্ববৎ। ইংরেজদের নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, ফরাসী উপকূল দখলে জার্মানদের সুবিধা হওয়ায় জার্মান বিমান ও সাবমেরিনের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫ই জুলাইএর মধ্যরাত্রে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে ব্রিটিশ মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষদের মোট ২২টি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

## সাপ্তাহিক সংবাদ

৯ জুলাই।—

উড়িষ্যার বন্যা প্রবল। ব্রাহ্মণী ও বৈতরিণীর জল বাড়িয়াছে। ভদ্রকের নিকট রেল লাইন ভাঙ্গায় পুরী ও কলিকাতার মধ্যে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বি এম বিরলা এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ, বন্যায় পূর্ত্ত বিভাগের ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত।

কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ১১ জুলাই হইতে সমগ্রভাবে খোলা হইবে।

সিমলার সংবাদ—সর্ব্বত্র টাকা হাতছাড়া করিতে না চাওয়ার ফলে নোটের টাকা পাইবার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সরকার এক টাকার নোট প্রচলনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

১০ জুলাই।—

গতরাত্রি নয়টার সময় লখনৌএর ভরতপুর ও খালিসপুর স্টেশনের মধ্যে লখনৌ-মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের অ্যালার্ম বেল টানিয়া গাড়ি থামাইয়া প্রায় ৪০ জন রিভলভার লইয়া মেলভ্যান, ইঞ্জিন ও গার্ডের গাড়িতে হানা দিয়া প্রায় দুই হাজার টাকার ইনসিওর লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

ডিউক অব উইন্ডসর বাহামা দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর ও কমাণ্ডার ইন চীফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা গেজেটে ফিনান্স বিভাগের এক প্রস্তাবে প্রকাশ, বাঙলা গভর্নমেণ্ট মাসিক ত্রিশ টাকা বা তাহা অপেক্ষা কম বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে মাসিক এক টাকা মাগ্‌গী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১১ জুলাই।—

ভারতরক্ষা আইন।—আনন্দবাজার পত্রিকার মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট দোষী ঠিক করিয়া সম্পাদক ও মুদ্রাকর মহাশয়দ্বয়কে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, হাওড়া, পাটনা প্রভৃতি বহু স্থানে পূর্ব্ববৎ খানাতল্লাশ, ধরপাকড় ইত্যাদি চলিতেছে।

১২ জুলাই।—

নিউদিল্লির সংবাদে প্রকাশ—নিখিল ভারত আজাদ মুসলিম সম্মেলনের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে ওআর্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এবং পাকিস্থান পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩ জুলাই।—

এক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, উড়িষ্যার বন্যায় বালেশ্বর ও ভদ্রক মহকুমায় যথাক্রমে ১৫০০ ও ৩৫০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

১৪ জুলাই।—

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, ব্যারাকপুর, লখনৌ, নৈহাটি, কোয়েটা প্রভৃতি বহুস্থানে খানাতল্লাশ ধরপাকড় প্রভৃতি হইয়াছে।

১৫ জুলাই।—

কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে ফরাসী বিপ্লবের ১৫১ স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

## সাহিত্য-সংবাদ

**প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা**

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য এ বৎসর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে—(ক) ভ্রমণ কাহিনী (বাঙলা দেশের মধ্যে); (খ) নারী প্রগতি; (গ) যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের অর্থনীতি।

(ক) চিহ্নিত প্রবন্ধটির জন্য কেবলমাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। (খ) চিহ্নিত প্রবন্ধটির জন্য কেবলমাত্র মহিলারাই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। (গ) চিহ্নিত প্রবন্ধটির জন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একখানি করিয়া রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে।

প্রবন্ধগুলি ৩০শে আগষ্ট ১৯৪০ এর মধ্যে ৭১।১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সাধারণ সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ তারিখে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে ও যাঁহাদের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে পত্র দ্বারা জানান হইবে।

**গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা**

'অভিযান' মাসিক পত্রিকার তরফ হইতে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। মহিলা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখিকাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী ১৫ই শ্রাবণ ১৩৪৭ সালের মধ্যে লেখা নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান চাই।

(প্রাপ্ত গল্প ও প্রবন্ধাদি 'অভিযান' পত্রিকায় প্রকাশের ক্ষমতা সম্পাদকের থাকিবে)।

বিষয়ঃ—(১) গল্প (সামাজিক); (২) প্রবন্ধ (বর্ত্তমান নারী প্রগতি)। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় ৪।৫ পাতার মধ্যে লিখিতে হইবে।

সম্পাদক, "অভিযান", ৫।২এফ, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

শতাধিক বর্ষেরও
উপর ডাক্তারগণ
অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন
রবিনসনের
"পেটেন্ট"
বার্লি
ROBINSON'S
"PATENT"
BARLEY
for Infants & Inval
শতাধিক
বর্ষেরও উপর
ব্যবহৃত
হইতেছে
B.2/39

# জ্বরের পথ্য নির্দ্দেশ

## রোগ নিরাময়ে বিখ্যাত পথ্য পানীয়ের সহায়তা

জ্বরের মধ্যে ও জ্বরের অব্যবহিত পরের অবস্থার উপযুক্ত পথ্য নির্ব্বাচন এতদিন চিকিৎসা ব্যবসায়ে একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে সাধারণ কঠিন খাদ্য রোগীর পাকস্থলী স্বভাবতঃ সহ্য করিতে পারে না, অথচ রোগজনিত দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যেরও একান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দেহমধ্যে জ্বর বিষের ক্রিয়ার ফলেই জ্বরের উদ্ভব ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতার আবির্ভাব হয়।

এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্নায়ুমণ্ডলীর অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ করা উচিত এবং তাহার জন্য রোগদুর্ব্বল পাকযন্ত্রের সামর্থ্যানুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্যেরই একান্ত প্রয়োজন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হরলিক্সই হইতেছে এই অবস্থার উপযোগী খাদ্য। কারণ ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং এত সহজপাচ্য যে, রোগদুর্ব্বল পাকস্থলীর পক্ষেও ইহাকে জীর্ণ করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। হরলিক্স ক্ষয়প্রাপ্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পুনর্গঠন করে, শীঘ্র শক্তি ফিরাইয়া আনে ও অবিলম্বে রোগজনিত দুর্ব্বলতা অপসারণ করে। এই সকল কারণে বহু বিখ্যাত হাসপাতালে আজকাল জ্বরের পথ্য চিকিৎসায় হরলিক্স ব্যবহৃত হইতেছে।

H. 468 A.

# ভারতীয় চিকিৎসা জগতে যুগান্তর!

দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত।
চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত।

**চিরতরে গনোরিয়া** হইতে আরোগ্য লাভের ইচ্ছা থাকিলে সত্বর **গনোসাইড** ব্যবহার করুন।

এক নিমিষে জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি সকল উপসর্গ দূর হইবেই। যাবতীয় দুঃসাধ্য গণোরিয়া রোগের একমাত্র অমোঘ কার্য্যকরী অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। মূত্রাশয়ে ক্ষত হইয়া পুঁজ ও রক্তস্রাব অতি কষ্টে অল্প অল্প মূত্র নির্গম এবং অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি একমাত্রা সেবনে সকল উপসর্গ দূরীভূত হইবেই। মূল্য বড় শিশি ৩৲ টাকা। ছোট শিশি ১৸৹ মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

**জন্ম-নিরোধ** সেফটিক নং ১, স্থায়ী গর্ভরোধের নির্ঘাত কার্য্যকারী। মূল্য—৪৲ টাকা। অস্থায়ী গর্ভরোধের জন্য সেপটিক নং ২, মূল্য—১৷৹ টাকা। সেপটিক নং ৩, রজঃকৃচ্ছ্র বা ঋতু বন্ধে নিশ্চিত রজঃনিঃসারক কখনও ব্যর্থ হয় না। রজঃকষ্ট বা ঋতু দোষ যে কারণে ৫।৬ মাস ঋতু বন্ধ পরিষ্কার করিতে ইহা অদ্বিতীয় মূল্য—২৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

**সকল পত্রাদি গোপন রাখা হয়।**
**ওরিয়েণ্টাল লেবরেটারিস (এ) পোঃ—বালী, জেলা—হাওড়া।** (D)

## মাত্র একমাসের জন্য—প্রত্যেকটি ঘড়ির মূল্য ৪৷৹ টাকা
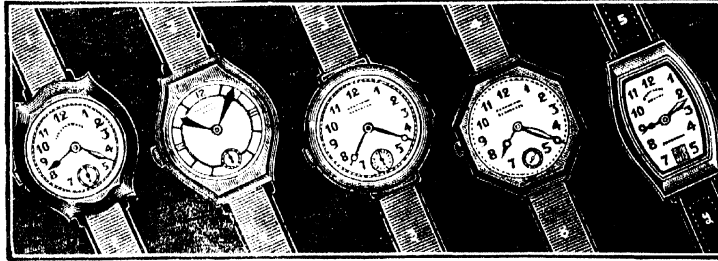
নূতন ডিজাইনের, মনোরম আকৃতি। প্রত্যেকটি রিষ্ট ওয়াচের জন্য ৫ বৎসরের গ্যারাণ্টী। নির্ভুল সময় দেয়। উৎকৃষ্ট ক্রোমিয়াম কেসযুক্ত যে কোন ঘড়ির দাম ৪৷৹। রোল্ড গোল্ড— দশ বৎসরের গ্যারাণ্টীযুক্ত ৪ জুয়েলসহ ৬৷৹। মাশুল ৷৵৹ আনা। তিনটি একত্রে লইলে ডাক খরচ লাগে না এবং ছয়টির একত্রে অর্ডার দিলে যে কোন একটি রিষ্ট ওয়াচ ফ্রী। যে ঘড়িটি অর্ডার দিবেন তাহার নম্বর লিখিয়া দিন। অপছন্দে এক সপ্তাহের মধ্যে মূল্য ফেরৎ। **ন্যাশনাল ট্রেডিং কোং, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

জীবন-বীমা বর্ত্তমানের নিয়মিত সঞ্চয়, ভবিষ্যতের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য

## ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা-প্রতিষ্ঠান

# ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল

## এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

**মোট চলতি বীমা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা**

**কলিকাতা অফিস** **১২, ডালহৌসী স্কোয়ার**

## নাইট্রিক এ্যাসিড প্রুভড

সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য চিরস্থায়ী গ্যারাণ্টি-যুক্ত সিমপ্যাথি গোল্ডের গহনা ব্যবহার করিয়া এ দুর্দ্দিনে ও অর্থসঙ্কটের দিনে মান সম্ভ্রম রক্ষা করুন। ইহার কারুকার্য্য, রং ও হাই পলিশ খাঁটী গিনিস্বর্ণের সমকক্ষ। অথচ তেলে, জলে এমনকি আগুনের তাপেও রং ও উজ্জ্বলতা সমভাবে ঠিক থাকে। বিস্তারিত ক্যাটালগ ফ্রি।

**দি নিউ ক্যালকাটা রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিণ্ডিকেট**

৮/৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫০০৲ পুরস্কার

মহাত্মা প্রদত্ত শ্বেতকুষ্ঠের অদ্ভুত বনৌষধি। একদিনে অর্দ্ধেক ও অল্প দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হেকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও এই দৈব ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। গুণহীন প্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য ২৲ টাকা।

বৈদ্যরাজ— **শ্রীঅখিলকিশোর রাম**

নং ১০, কাটারীসরাই (গয়া)

## সন্তান নিরোধ

মাত্র ৭ দিন সেবনে **চিরতরে** বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য ৫৲। এক বছরের ২।।০।

সর্ব্বপ্রকার **প্রদরের** ঔষধ, মূল্য ৩৲।

## ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠিয়ে থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই। ঠিকানাঃ—

**DR. S. C. BHADURI, M.B.,**
Ghiamandi, Muttra, U.P.

## হাকিম এম এস জামানের রফিক খাতুন ঋতু

পরিস্কারে অব্যর্থ—৪।।০; **ভামা ১ বৎসর গর্ভরোধে অদ্বিতীয়—১।।০; যতই পুরাতন যন্ত্রণাদায়ক হাঁপানী হউক না কেন "হাব্বে সোয়াল"** ব্যবহারে আরোগ্য হইবেই হইবে। মূল্য ১৲। পেট জোড়া প্লীহা, **পাথরের মত শক্ত প্লীহা মাত্র এক শিশিতে আরোগ্য করে "দাফে তেহাল" ইহার গুণে আজ সারা বঙ্গদেশ মুগ্ধ। মূল্য ১৲০। ৪২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

## জন্ম নিরোধ

Govt. Regd. অব্যর্থ ও নির্দ্দোষ স্থায়ী ৪।০, অস্থায়ী ১।০, ঋতু ও গর্ভসঙ্কটে সদ্যস্রাবকারী 'রেচনী' ২।৵০, বিফলে ৫০০৲ পুরস্কার। কবিরাজ—এম কাব্যতীর্থ, জলপাইগুড়ি।

## সাবধান হউন
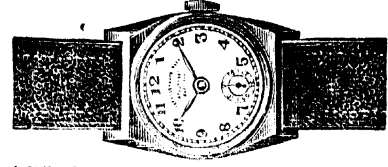
**NEW FANCY SHAPE Rs. 3-8.**

অন্যত্র যে ঘড়ি ৯৲ টাকা মূল্যে কিনিবেন, সেই আসল **সুইস ঘড়ি আমাদের নিকট মাত্র ৩।।০ টাকায় পাইবেন। নকল হইতেছে, আমাদের** নাম ঠিকানা দেখিয়া লইবেন। ৩ বৎসর গ্যারাণ্টি। **৩টি একত্র** নিলে মাশুল ফ্রি।

ঘড়ি বিক্রেতাগণ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

**MIDLAND WATCH CO.,**

**9|1A, Chintamoni Das Lane, Calcutta. 15.**

## বর্ষাতি কপি বীজ

ফুলকপি তোলা ।।০, আউন্স ১৷৵০
বাঁধাকপি তোলা ৷৵০, আউন্স ১।।৵০,
আউসে মূলা ছটাক ।৵০, সের ৪৲।

অন্যান্য বীজের তালিকার জন্য লিখুন

## বালী সীড ষ্টোর

পোষ্ট—বালী জেলা—হাওড়া

## বিনা অস্ত্রে চক্ষু ছানি

**ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ)ঃ—**বিনা অস্ত্রে **চক্ষুছানি আরোগ্য** করিতে অদ্বিতীয় আবিষ্কার। ইহা চক্ষুছানি, দৃষ্টিহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। ঘরে বসিয়া নিরাময় **হইবার সুবর্ণসুযোগ হেলায় নষ্ট করিবেন না। সম্পূর্ণ নিরাপদ,** নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য, আরোগ্যের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া **হয়। সস্তার কুহকে বাজে নকল ঔষধ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে DEGON'S "EYE-CURE"** ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করুন। **মূল্য শিশি ২৲,** ডাকমাশুল ।।৵০ স্বতন্ত্র।

**কমলা ওয়ার্কস্ (আ), পাঁচপোতা, বেঙ্গল।**

**স্থানীয় এজেণ্ট এবং ষ্টকিষ্টঃ—**বি কে পাল এণ্ড কোং, এম্ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

**ভ্রষ্ট লগ্ন—১৷৵০** **অনাগত—১।।০**
বিদ্যুৎলেখা—২৲ **লোকারণ্য—২।।০**
**শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী)—১।।০**

**কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।**

৭ম বর্ষ] শনিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 27th July, 1940 [৩৭শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—**

২৫শে জুলাই হইতে পুণা শহরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে; ২৭শে হইতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। দিল্লীতে অধিবেশনের যে সিদ্ধান্ত করা হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর দেন নাই। কংগ্রেস অভ্রান্তভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে কংগ্রেস প্রস্তুত আছেন। এজন্য গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির মতভেদ ঘটিয়াছে; নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি এই সমস্যায় মহাত্মাজীর মতে মত দিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান দাবীকে যে প্রতিপক্ষের দিক হইতে পূরণের পক্ষে জটিল করিয়া তুলিবেন আমাদের এরূপ মনে হয় না। এখন কথা হইল এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হইবেন কি না। এ সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঘটনাচক্রের গতির উপর ইহা অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অন্তরে ঔদার্য্য-রস উদ্রেকের মূলে রহিয়াছে অবস্থার সেই চাপ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি বলিয়াছেন—'ব্রিটিশ সরকার যদি যুদ্ধের সূচনায় সাহস ও সুবিবেচনার শক্তি লইয়া ভারতের দাবী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এতদিন যুদ্ধের ফলাফল বহুলাংশে তাঁহাদের অনুকূল হইত। আমরা ব্রিটিশ সরকারের সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিতে পারি ভারতের দাবী স্বীকারের উপরই তাহা সর্ব্বপ্রকারে নির্ভর করিতেছে।' 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও লণ্ডনকে ধ্বংস করিব' হিটলারের এই দম্ভপূর্ণ ঘোষণার পরে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ উপলব্ধি করিবেন কি না, ইহাই দেখিবার বিষয়। ভারতের উপর মুরুব্বিয়ানার মনোবৃত্তি যদি তাঁহারা এখনও না ছাড়েন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে একদিন অনুশোচনা করিতে হইবে।

**অহিংসার ক্ষেত্র—**

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন—"আমরা এখন যদি আরও অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কোন কর্ত্তৃপক্ষকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করিবার কল্পনা অন্তত কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে। যদি পারিবারিক ক্ষেত্রে অহিংসা সাফল্যের সহিত অর্পিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিব যে, আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কোন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অহিংসা বিশুদ্ধ আকারে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। তাহা হইলে উহা অদম্য হইবে।" মহাত্মাজী যে অহিংসার কথা বলিতেছেন সেই অহিংসা সমগ্র জীবনে সুদীর্ঘ সাধনায় লব্ধ একটি অবস্থা। সে ক্ষেত্রে অহিংসা আর সাময়িক নীতি থাকে না, উহা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন অহিংসার স্তরে যিনি জীবনকে উন্নীত করিয়াছেন, বাহিরে তিনি আর কোন অন্তরায় দেখেন না। 'তিনি অন্তর্জ্যোতি এবং অন্তরেই তাঁহার আরাম। এ অবস্থায় সঙ্ঘর্ষ নাই, আছে শুধু আত্মনিবেদন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে এমন অহিংসা প্রযুক্ত হইতে পারে, তেমন অবস্থা জগতে আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অপরকে পশু শক্তির আঘাত না দেওয়ার নীতিকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমানে রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসা

প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মহাত্মাজী সে জিনিষ চাহেন না। তিনি চাহেন আদর্শ অহিংসা। মহাত্মাজীর এই আদর্শে কংগ্রেসের পক্ষে বর্ত্তমানে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর একটি বক্তৃতাতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় রাজাজী বলিয়াছেন—"কংগ্রেস যদি তাহার দলীয় সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া এবং সঙ্ঘ হিসাবে দেশরক্ষা ও দেশশাসনের পূরা দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া শুধু নিজকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি নূতন আলোক ও নূতন সংস্কৃতির আবাহক ঋষি-সঙ্ঘ বলিয়া মনে করিত, তবে মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যাত অহিংসা নীতিকে সমর্থন করিতে আমরা কেহই অস্বীকার করিতাম না।"

মহাত্মাজীর অন্যতম অনুগামী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদের বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে বলেন—'ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, জগৎ যে সঙ্কট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং যে অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা রহিয়াছে, অহিংসা নীতির সাহায্যে ওয়ার্কিং কমিটি সেই অবস্থার সম্মুখীন হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। বর্ত্তমানে দেশ ইহার জন্য প্রস্তুত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নহে যে, কংগ্রেস এতাবৎকাল যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, সে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে।' কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং কর্ত্তব্য দেশশাসন ও দেশরক্ষা করা। ঋষিগিরি ফলাইবার প্রলোভন যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে এই বাস্তব দায়িত্ব বিস্মৃত করে নাই, ইহাও সুখের বিষয়।

---

**ছাত্রদের উপর লাঠি চালনা—**

গত সোমবার দিন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় পুলিশ ও গুর্খা মিলিটারী পুলিশ ইসলামিয়া কলেজে প্রবেশ করিয়া লাঠি চালাইয়া কলেজ অঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের একটি সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। সম্প্রতি সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া বাঙলা সরকার একটি আদেশ জারী করেন। ঐ আদেশের প্রতিবাদের জন্য সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, একদল বাহিরের লোক কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোলমাল করিতেছিল এবং উহাদিগকে বহিস্কৃত করিবার জন্য পুলিশ চার্জ্জ করার দরুণ দুর্ঘটনা ঘটে। শোভাযাত্রা বা ধর্ম্মঘট বে-আইনী কোন ব্যাপার নয়, নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিবার উহা উপায়-মাত্র। শান্তি এবং শৃঙ্খলার হানি না হইলে ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। মত প্রকাশ এবং মতের স্বাধীন অভিব্যক্তি গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতির একটা প্রধান ভিত্তি। বাঙলার মন্ত্রীরা ছাত্রদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ করিয়া ছাত্র আন্দোলন দমনে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিক্ষোভ তাহারই পরিণতি। এবং তাহার ফলে এমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। বিশ্বাস, প্রত্যয় এবং জনমতের অনুবর্ত্তনমূলক নীতির অবলম্বনে যে কাজ 'সরলভাবে' সম্ভব হয়, তাহাকে এমনভাবে জটিল করিয়া তুলি-বার কি সার্থকতা থাকিতে পারে, আমাদের বুদ্ধির অগোচর। বাঙলার ছাত্রসমাজে অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শ এবং জাতীয় মর্য্যাদাবুদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কালের এ গতিকে রুদ্ধ করা যাইবে না। মধ্যযুগীয় আদর্শ তরুণেরা স্বীকার করিতেছে না; ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ইশ্লামিয়া কলেজের ব্যাপারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ছাত্র-আন্দোলনের সম্বন্ধে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ছাত্র-সমাজের নব জাগরণকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিবেন। 'শান্তিভঙ্গ হইলে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে'—বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ প্রথমত তিনি 'শান্তিভঙ্গ' কাহাকে বলেন, ইহা বুঝা দরকার। দেশের অবস্থা এমন হইয়া পড়িয়াছে যে, কিসে যে শান্তিভঙ্গ হয় না, ইহাই বুঝা দুষ্কর। ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ করিয়া দিয়া জড়ের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার মতিগতি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের গৌরব বাড়াইবে না।

---

**চিত্রশিল্পী সারদাচরণ—**

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীল গত রবিবার তাঁহার দিল্লীস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। সারদাচরণ ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-রীতির উদ্বোধন করিয়া ভারতের চিত্র-শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সারদাচরণ প্রাচ্য রীতির চিত্রাঙ্কণে প্রতিভার পরিচয় দিয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকখানা পৌরাণিক চিত্র শুধু ভারতেই নহে বিদেশী গুনিগণ-সমাজেও যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সারদাচরণের অকাল মৃত্যুতে বাঙলা-দেশ একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তিকে হারাইল। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

---

**অবাঙালীও ভাল—**

বাঙলার মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খাঁ সরাকারী চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, বাঁটোয়ারার অনুপাতে যদি যোগ্য বাঙালী মুসলমান না জুটে, তাহা হইলে অবাঙালীকে বাহির হইতে আনিয়া তাঁহারা চাকুরীতে বসাইবেন, তবু যোগ্য বাঙালী হিন্দুকে চাকুরী দিবেন না। শুনিতেছি এই নীতি অনুসারে

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শারীর বিদ্যার অধ্যাপকের পদের জন্য নাগপুরের একজন মুসলমানকে আনা হইতেছে। গত ১৯৩৯ সালে এই পদটি শূন্য হয়, এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রার্থী আহ্বান করেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিশন তিনজন বাঙালী হিন্দু প্রার্থীকে মনোনীত করেন। কোন বাঙালী মুসলমান ঐ পদের জন্য দরখাস্ত করেন নাই। কিন্তু একজন মুসলমানকে যেরূপেই হউক ঐ পদ দিতে হইবে। তখন খোঁজ চলিল এবং খুঁজিতে খুঁজিতে নাগপুরে একজন মুসলমান প্রার্থীর সন্ধান মিলিল।। বাঙালী হিন্দু যোগ্য হইলেও তাহাকে চাকুরী দিব না, যদি বাঙালী মুসলমান না পাওয়া যায়, যেখানে মুসলমান মিলে সেখান হইতে যেমন করিয়া হউক আনিতে হইবে, মধ্যযুগীয় এমন সাম্প্রদায়িক নির্লজ্জ মনোবৃত্তির দ্বারা যাঁহারা চালিত হন, আজ তাঁহারাই বনিয়াছেন সুবে বাঙলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। বাঙালীর এমন দুর্দ্দিন আর কখনও দেখা দেয় নাই।

---

**লীগওয়ালাদের মনোবৃত্তি—**

গত ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার দাবী লইয়া একটি আলোচনা হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয় আলোচনাকালে এই অনুরোধ করেন যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময় উপস্থিত হইলে মুসলমানগণ যেন হিন্দুদিগকে ভারতের সন্তান বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কথা বলিবামাত্র কোয়ালিশনী দল হইতে 'না' 'না' ধ্বনি উঠে। কোয়ালিশনী দলের ঐ ধ্বনিকে যদি মর্য্যাদা দান করিতে হয়, তাহা হইলে সেই দলভুক্ত মুসলমানদের ভারতে অন্যান্য বিদেশীদের চেয়ে বেশী কোন অধিকার লাভ করার দাবীর যৌক্তিকতা থাকে না। ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় যোগদানের অধিকার শুধু যাহারা ভারতবাসী, ভারতবর্ষকে যাহারা নিজেদের জন্মভূমি বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই আছে। স্বাধীনতার দাবী একটা কাগজে নথীপত্রের ব্যাপার নয়; তাহার পিছনে থাকা দরকার প্রাণের টান; সে প্রাণের টান বুঝিব না, এবং তেমন প্রাণের টানে কোন ত্যাগস্বীকারও করিব না, অথচ যাহারা প্রাণের টানে পড়িয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব বলি দিবে, তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইব এমন প্রবৃত্তি শিক্ষা এবং সংস্কৃতিসম্মত নহে। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত সংস্কৃতি বর্ত্তমান ভারতকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই ভারতের সংহতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহারা পরকীয় প্রভুত্বকে প্রকারান্তরে পাকা করিতে চায়, জাতির ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাহাদের অধিকারকে স্বীকার করিলে দেশের প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধিকে ক্ষুন্ন করাই হয়।

**যুদ্ধ ও ইংরেজ—**

লর্ড হ্যালিফাক্স হিটলারের জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন,—"শেষ বিচারের দিন আসিবে এবং সেদিন হিটলারের উন্মাদোচিত পরিকল্পনা ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।" লর্ড হ্যালিফাক্স খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী; তিনি শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন। আমরা স্থূল জগতের মানুষ, আমরা জানিতে চাই, সেদিন যখন আসিবে তখন তো আসিবে; কিন্তু এখন আমাদের কি হইতেছে? এ সম্বন্ধে লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন,—"ব্রিটিশ জাতি এক নূতন এবং উচ্চ জাগতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী; এই ব্যবস্থায় ক্রীতদাসের স্থান থাকিবে না, সকলেই স্বাধীন হইবে এবং সকল জাতিই স্বাধীন সত্তার অধিকারী হইবে— কেহই জার্ম্মানীর অধীন হইবে না।" জার্ম্মানীর অধীন না হওয়াই সকলের পক্ষে স্বাধীনতা নয়। জার্ম্মানীর অধীনতার বিরুদ্ধতা করা এক কথা আর সকল জাতির স্বাধীনতাকে স্বীকার করা অন্য কথা। তবে একথা অবশ্য সত্য যে, জার্ম্মানীর অধীনতা এড়াইতে হইলে সকল জাতির স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়াতে নীতির দিক হইতে সুবিধা আছে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কি এই সত্য মনেপ্রাণে স্বীকার করেন? যদি তাহাই করেন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতাকে তাঁহারা এতদিন স্বীকার করিয়া লইতেন। বড় বড় কথা শুধু মুখে না বলিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। অবশ্য রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাজনীতিকদের পক্ষে অনেক সময় শুধু মুখে বড় বড় কথা বলিলেই চলে, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক হয় না এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকরা সে বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্যা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মুখের কথা কাজে পরিণত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সকল দেশের এবং সকল জাতির স্বাধীনতা যদি ব্রিটিশের কাম্য হয়, তবে নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে ঐ আদর্শকে তাঁহাদের কার্য্যে পরিণত করা উচিত। সকল দেশ এবং সকল জাতির স্বাধীনতার আদর্শের বড় বড় কথা বলিয়া ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে সঙ্কোচের মূলে কোন যুক্তি থাকে না।

---

**জনমতের জয়—**

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত মঙ্গলবার বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী অন্তত এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, মন্ত্রীরা আমলাতান্ত্রিক প্রেষ্টিজের মোহটা অন্তত এতদিনে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। ইশ্‌লামিয়া কলেজের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিটি নিয়োগের কথা হইয়াছে। কমিটি কমিশনের উপর আমাদের কোন দিন বিশ্বাস নাই। আমরা আশা করি বে-সরকারী নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে এবং ব্যাপারটি ধামা চাপা দেওয়াই কমিটির উদ্দেশ্য হইবে না, ইশ্‌লামিয়া কলেজের ব্যাপারের পুনরাভিনয় যাহাতে না হয়, অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা হইবে।

**কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা—**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যারাকপুরে একটি কৃষি শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। এই শিক্ষালয়ে কৃষি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দুধের ব্যবস্থা, মাছের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কুটীর শিল্প প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ গবেষণা চালাইবার জন্যও বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই উদ্যম সফল করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বাঙলার মন্ত্রীরা নিজদিগকে কৃষক-দরদী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যমে আবশ্যক অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহারা কার্য্যত সে দরদের পরিচয় দিবেন।

---

**বাঙলা ভাষার প্রসার—**

বাঙলার বাহিরে যাহাতে বাঙলা ভাষার প্রসার হয়, প্রত্যেক বাঙালীর তাহা করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, হিন্দী ভাষার পক্ষ হইতে এ জন্য যেমন চেষ্টা চলিতেছে, তাহার তুলনায় বাঙলা ভাষার দিক হইতে বলিতে গেলে কিছুই হইতেছে না। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া থাকে। ঐরূপ অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে, একথা আমরা স্বীকার করি, উহার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব বঙ্গ সন্তান বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক সুনিবিড় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙলাদেশের বাহিরে বাঙলা ভাষার যাহাতে প্রসার বৃদ্ধি পায় সেজন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মে-লনের শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর দিয়া চেষ্টা হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বর্ত্তমান বৎসরে এইরূপ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা বাঙলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংয়ে সম্প্রতি এতৎ-সংশিলষ্ট পরীক্ষা বোর্ডের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নয়টি বিভিন্ন বিষয় পঠিতব্যরূপে স্থির হইয়াছে; পরীক্ষার্থী-দিগকে তন্মধ্যে দুইটি পরীক্ষা দিতে হইবে, বাঙলা ব্যাকরণ এবং বাঙলা রচনা হইবে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই প্রচেষ্টার ফলে বাঙলাদেশের বাহিরে বাঙলা ভাষার প্রচার হইবে, আমরা ইহাই কামনা করি।

---

**সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মতৎপরতা—**

গত ২৩শে জুলাই মঙ্গলবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষটচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকার পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতে গিয়া স্যার যদুনাথ বলেন,—"হীরেন্দ্র-নাথ বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিন বৎসর পরিষদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি অসংখ্য সভা, কমিটি প্রভৃতির চালনা করিয়া, লিখিত উপদেশ দিয়া পরিষদকে সম্পূর্ণ এবং কর্ম্মবহুল করিয়া রাখিয়াছেন। গত বৎসর তাঁহার দেহ অবশেষে অস্বীকার করে; তখন তিনি তৃতীয় বৎসরও সভা-পতি থাকিতে সম্মত হন; কিন্তু এই সর্ত্ত করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে তিনি নিজে সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেনই। অগত্যা আমি তাহাই মানিয়া লই এবং আজ তাঁহারই আদেশে আমি তাঁহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে সাহস করিতেছি। তাঁহার উপদেশ এবং সময় সময় দৈহিক উপস্থিতি পরেও আমরা হারাইব না—এই আশ্বাস আমাকে সাহস দিতেছে।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের বিষয়। পরিষদের কর্ম্মতৎপরতা এখন নানাদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে। বাঙলাদেশের যে সব মনীষী সন্তানের অক্লান্ত সাধনার প্রভাবে সাহিত্য পরিষদের এই সমুন্নতি, তাঁহাদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ অন্যতম। তিনি সভাপতির কর্ম্মভার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও অন্যতম সহকারী সভাপতিস্বরূপে পরিষদের পরি-চালনাকার্য্যে সংশিলষ্ট রহিয়াছেন। স্যার যদুনাথের উপর সাহিত্য পরিষদের ভার ন্যস্ত হওয়াতে বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। স্যার যদুনাথ বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান সাধক, তাঁহার সাধনার অমূল্য অবদানে বঙ্গ সংস্কৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্না। আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পরিচালনাধীনে সাহিত্য পরিষদ যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

---

**শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য্য**

সুন্দর এ পৃথিবীরে আজি মোর লাগিয়াছে ভালো,
ভালো লাগিয়াছে মোর আজি এর প্রতি ধূলিকণা;
প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি গোধূলির রক্ত রাঙ্গা আলো—
বিস্ময় জাগালো চোখে চিত্তে দিলো রঙিন কল্পনা!
ভাল তাই বাসিয়াছি এ বিশ্বের যাহা কিছু দান
সাগর তরঙ্গলীলা ঝরণার চঞ্চল সঙ্গীত;
বিহঙ্গের কলগীতি, তটিনীর মৃদু কলতান—
মুগ্ধ এই চিত্তে মোর সেই সুর হলো তরঙ্গিত।
আজি সেই ধরণীরে চোখে তাই লেগেছে সুন্দর,
সুন্দর লেগেছে চোখে আজি তার বিচিত্র সম্পদ;
পুষ্পিত শ্যামল ধরা, সুশোভিত পর্ব্বত প্রান্তর—
ঘিরিয়া রয়েছে আজি শত গিরি নদ উপনদ।
প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, বাসি ভালো এই পৃথিবীরে
সে কথা নাচিয়া ফিরে আজি মোর চিত্তখানি ঘিরে।

# ইংলণ্ড আক্রমণে জার্ম্মানীর উদ্যম

হিটলারের পরবর্ত্তী চাল কি হইবে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে। গত ১৯শে জুলাই হিটলার রাইখষ্ট্যাগে যে বক্তৃতা করেন, এই বক্তৃতার গুরুত্ব সেই দিক হইতে বিশেষভাবে ছিল। এই বক্তৃতায় তিনি ইংরেজকে শাসাইয়া বলিয়াছেন—"ব্রিটিশ রাজনীতিকদের একটি আশা এই যে, রুষিয়া এবং জার্ম্মানীর মধ্যে তাঁহারা পুনরায় বিবাদ ঘটাইতে পারিবেন। রুষিয়ার সহিত খাতির করিয়া নিজেদের অবস্থা শোধরাইয়া লইবার আশা ব্রিটনের পক্ষে দুরাশামাত্র। পরিণামে যাহা ঘটিবে তাহা অবগত হইয়াও আমি ব্রিটন ও ফ্রান্সের দিকে বন্ধুর ন্যায় হাত বাড়াইয়া দেই। যুদ্ধের ফলে কোন লাভই হইবে না বরং পদে পদে লোকসান হইবে—আমার এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস ফরাসী রাজনীতিকগণ তখন আমার কথার তাৎপর্য্য না বুঝিলেও ফরাসী জাতি এখন অন্যরূপ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিটনের নিকট হইতে কিন্তু একটি ধ্বনিই শোনা যাইতেছে—'শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালান হইবে।' কিন্তু এ কথা জনসাধারণের নহে রাজনীতিকদের। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে. তিনি যুদ্ধ চাহেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা নিক্ষেপের অছিলায় ইংরেজ অসামরিক অধিবাসীদের উপর বোমা আরম্ভ করিয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসা গ্রহণের আদেশ দেই নাই; কিন্তু একথা যেন মনে করা হয় যে, ইহাই আমার একমাত্র উত্তর হইবে। আমরা সকলেই জানি যে, একদিন এ সবের উত্তর আমরা দিব এবং সেদিন লোকের চরম দুর্ভোগ এবং দুরবস্থা ঘটিবে। তবে মিঃ চার্চ্চিলের কোন ক্ষতি হইবে না, কেন না তিনি কানাডায় চলিয়া যাইবেন। আমি মিঃ চার্চ্চিলকে আমার একটি কথা বিশ্বাস করিতে বলি। সে কথা হইতেছে এই যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে। এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার বা উহা ক্ষতি করিবার কোন অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। আমি বেশ বুঝিতেছি যে, এই যুদ্ধ চলিলে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে একপক্ষের ধ্বংস অনিবার্য্য। মিঃ চার্চ্চিল মনে করেন যে, জার্ম্মানীরই ধ্বংস হইবে। কিন্তু আমি জানি ব্রিটনই ধ্বংস হইবে।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য হিটলারের এই দরদের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে কি না জানি না, কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা যদি মানুষ হইতে চায়, তাহা হইলে বহুদিন ইংরেজের অধীন হইয়া তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। অধীন জাতিগুলার কর্ত্তব্য হইল সভ্যতায় সমুন্নত বিজেতা জাতির সেবা করা। একথা বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ হিটলারে সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে না, হিটলারের দাম্ভিক উক্তিতে ব্রিটিশ জাতির মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। হিটলারের সর্ত্ত মানিয়া ইংরেজের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার অর্থ জার্ম্মানীর নিকট ফ্রান্সের ন্যায়ই তাহার আত্মসমর্পণ।
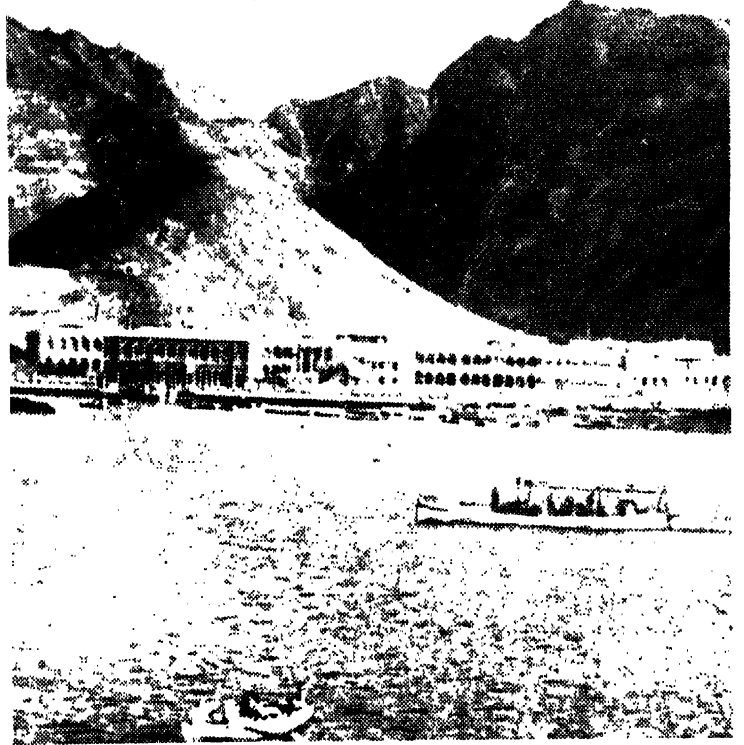
এডেন বন্দর : সম্প্রতি সহরের উপর ইটালী বিমান আক্রমণ করিয়াছে।

হিটলার নিজেই বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিশোধ ব্যবস্থা এখনও অবলম্বন করেন নাই, তবে সত্বরই করিবেন। এই প্রতিশোধ ব্যবস্থা কি আকার ধারণ করিবে ইহাই হইবে বিবেচ্য। শুনা যাইতেছে ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য হিটলার ফ্রান্সের উপকূলভাগে ৬ লক্ষ সৈন্য মজুত করিয়াছেন এবং জাহাজ ডুবোজাহাজ সব প্রস্তুত করিয়াছেন। উড়োজাহাজ এবং জাহাজ, ডুবোজাহাজের যোগে ইংলণ্ড আক্রমণের এই কল্পনায় নূতনত্ব নাই। এই উপায়ে হিটলারের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম

মনে হয়। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ২০ লক্ষের অধিক সৈন্য দেশ-রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। উড়োজাহাজের সংখ্যাও ইংরেজ অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। ৫ লক্ষের অধিক দেশরক্ষী স্বেচ্ছাসেবক সেনা বিমান আক্রমণের আতঙ্ক প্রতিহত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে এবং স্কটল্যাণ্ডে জার্ম্মান উড়োজাহাজের আক্রমণ চলিতেছে। জার্ম্মানরা এই সব আক্রমণে প্রধানত এই কয়েক রকমের উড়োজাহাজ ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের যেগুলি সব চেয়ে বড় জাহাজ সেগুলির নাম 'ডোরনিয়ার ২৪' এবং 'জাঙ্কার ৮৯', এই শ্রেণীর উড়োজাহাজে ৬ জন হইতে ৭ জন লোক থাকে: জার্ম্মানীর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমানপোতের নাম 'জাঙ্কার জিউ ৮৮' এইগুলির সাহায্যে নীচে নামা এবং মেসিন কামানের গুলী চালানোতে সুবিধা বেশী। ইহা ছাড়া 'হেনশেল ১২৩' এবং 'হিনকেল ১১২', এইগুলিতে একজন করিয়া আরোহী থাকে। এই ছোট জাহাজগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং মারাত্মক বোমাবর্ষী। 'মেসার সেমডিট' শ্রেণীর দুই ধরণের উড়োজাহাজও তাহারা খুব ব্যবহার করিতেছে। এই দুই শ্রেণীর একটির নাম 'এম-ই ১০৯' এবং 'এম-ই ১১০', এই ধরণের উড়োজাহাজে তিনজন করিয়া আরোহী থাকে। এইগুলিতে তোপ ও মেসিন কামান দুইই থাকে। জার্ম্মানীর এই সব উড়োজাহাজ আক্রমণ চালাইতেছে সত্য, তেমনি ইংরেজের উড়োজাহাজও যে জার্ম্মানীতে আক্রমণ চালাইতেছে হিটলারের বক্তৃতায় তজ্জনিত ক্ষতির স্বীকৃতি রহিয়াছে।

হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় ইটালীর বিশেষ গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু ইটালী যে ইংলণ্ড আক্রমণে তাঁহাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবে, এরূপ লক্ষণ এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফরাসীদের আত্মসমর্পণ অনিবার্য্য হয়ত হইয়াছিল, তাহার নানা কারণ আছে; কিন্তু ইংরেজের তাহাতে এমন কিছু সঙ্কট বৃদ্ধি হয় নাই। আফ্রিকার সুদান হইতে আবিসিনিয়া এবং এরিত্রিয়ার সীমান্তভাগের এক হাজার মাইল জুড়িয়া নানা স্থানে ইটালীর সেনাদল ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। ইহার পশ্চিমদিকে কেনিয়া এবং ইটালীয় সোমালীল্যাণ্ডের সীমানাতেও লড়াই চলিতেছে। সুদানের ক্যাসালা, গাল্লাবাট এবং কারমুদ—এই কয়েকটি ঘাঁটি ইটালীর সেনাদল দখল করিয়াছে। কেনিয়ার সীমান্তের মধ্যে ময়াল নামক স্থানের কেল্লাটিও ইংরেজ সেনারা ছাড়িয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সব স্থানের সামরিক গুরুত্ব বিশেষ কিছুই নয়। এই সব স্থানের জয়-পরাজয় মুখ্য সংগ্রামাংশের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে ইটালীর অধিকৃত লিবিয়ায় ইংরেজের আক্রমণে ইটালীর সেনাদলকে হটিয়া যাইতে হইয়াছে। ইংরেজ সেনাদল লিবিয়ার মধ্যে ৬০ মাইল পর্য্যন্ত দূরে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজের উড়োজাহাজ ইটালীর অধিকৃত নানা স্থানে বোমা বৃষ্টি করিতেছে। মালটা, জিব্রালটার এবং আলেকজেন্দ্রিয়া—ইহার কোন স্থানই ইটালীর কেরামতির ফলে এ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয় নাই।

জার্ম্মানীর ট্যাঙ্কযুদ্ধ
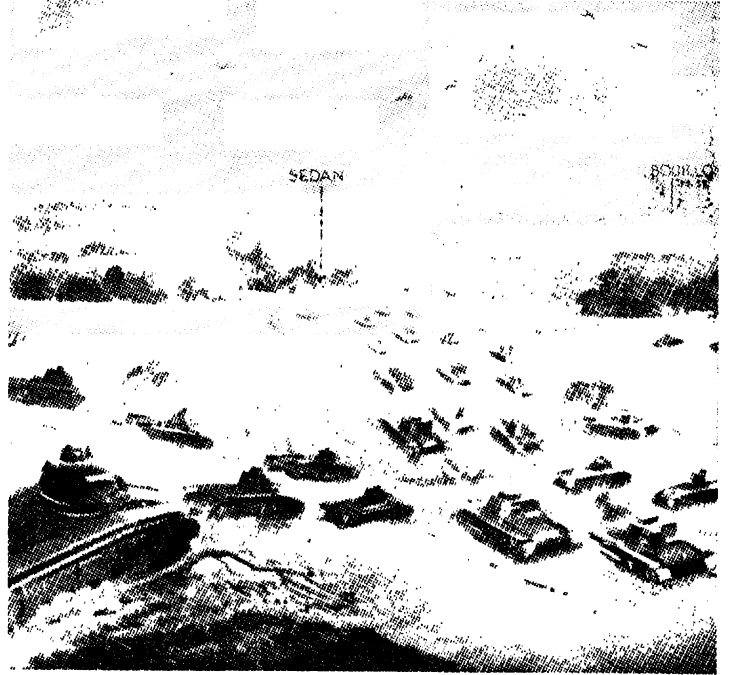
জাপানের নূতন মন্ত্রিসভার গঠন এবং তাহার ফলে নব্য জাপ নীতির পরিণতি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে কি আকার ধারণ করিবে, বর্ত্তমানে ইহাও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর হইতেই জাপানের সুর ঘুরিতে আরম্ভ করে। জাপানীরা ফরাসী হিন্দু চীনের ভিতর দিয়া চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিংয়ে অস্ত্রশস্ত্র চালান বন্ধ করিতে দাবী করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হংকং ও ফরাসী ইন্দো-চীনের উপকূলভাগ জাহাজ দিয়া অবরুদ্ধ করে। ইহার পর তাহারা ইংরেজের কাছে এই দাবী করে যে, ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া চুংকিং পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে, সে রাস্তাও ইংরেজকে বন্ধ করিতে হইবে; কিন্তু এইখানেই দাবী শেষ হয় না। জাপানীরা ইংরেজের কাছে আরও দাবী করে যে, ফুচাও, সানটুয়াও' ওয়েনচাউ এবং নিং পু—এই কয়েকটি বন্দরে ইংরেজের যে সব জাহাজ আছে ইংরেজ যেন সেগুলি সরাইয়া লয়; কারণ ঐ উপকূলভাগে তাহারা কামান দাগিবে।

ইংরেজেরা জাপানের দাবী মানিয়া লইয়াছে। প্রধান কারণ এই যে পূর্ব্বে এশিয়ায় কোন ফ্যাসাদ বাধাইতে ইংরেজ বর্ত্তমানে ইচ্ছা করে না। ব্রিটিশ মন্ত্রীরা বলিতেছেন যে, কি চীন, কি জাপান কাহারও সহিত তাহার বিদ্বেষ নাই, সকলেই তাহাদের সমান মিত্র। কিন্তু জাপানের দাবী মানিয়া লওয়াতে বর্ত্তমান অবস্থায় চীনের স্বাধীনতা-কামীদের প্রতি ইংরেজের এই যে আচরণ চীনারা সে

তুরস্কের একটি প্রাচীণ শহর

আচরণকে মিত্রের আচরণস্বরূপে দেখিয়া উঠিতে পারিবে কি? জাপান চীনের উপকূলভাগ দখল করিবার পর বাহির হইতে চীনের অস্ত্রশস্ত্রের চালান পাইবার তিনটি পথ ছিল। একটি ইন্দো-চীনের ভিতর দিয়া হানয়-য়ুনান রেলপথ, দ্বিতীয়টি ব্রহ্ম-য়ুনানের পথ, তৃতীয়টি হইল রুষিয়ার পথ। এই তিনটির মধ্যে ইন্দো-চীনের পথটি ছিল চীনের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক। এই রেলপথ অনেক দিনের এবং ইহা বেশ মজবুত। এই পথ দিয়া দৈনিক ২ শত টন মাল আনা-নেওয়া যাইত, দ্বিতীয়টি হইল ব্রহ্ম-কুমমিং রোড। ১৯৩৭ সালে জেনারেল চিয়াং কাইসেক এই রাস্তা তৈয়ারী করিতে প্রবৃত্ত হন। তিন লক্ষের অধিক চীনা মজুর এই রাস্তা প্রস্তুতে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই রাস্তা তৈয়ারীর ফলে চুংকিংয়ের সঙ্গে রেঙ্গুনের যোগ সাধিত হয়। এই রাস্তার খুব বেশীমাল আনা-নেওয়া যাইত না। ৭ শত মাইল দীর্ঘ পাহাড়িয়া অঞ্চল দিয়া এই পথ গিয়াছে। উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ীর অভাব এবং বেশী অভাব ট্রেন চালকের। এই পথ দিয়া দৈনিক ৫০ টনের অধিক মাল লওয়া চলিত না। এ সব সত্ত্বেও এই পথ খোলা থাকাতে চীন অনেক সাহায্য পাইতেছিল। এ পথ বন্ধ হইবার পর একমাত্র খোলা থাকিল রুষিয়ার পথ। এই পথ দুই হাজার মাইল দীর্ঘ এবং অত্যন্ত দুর্গম। মরুভূমির ভিতর দিয়া এই পথ গিয়াছে। মাঝে মাঝে ধূলি ঝড় উঠিয়া মোটরের ইঞ্জিন বিগড়াইয়া দেয়। ইহা ছাড়া এই রাস্তাটি এখনও খুব মজবুত নয়।

চীন সম্পর্কে ইংরেজের এই নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করিতে পারে নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজ এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্ম্মানীর পরবর্ত্তী উদ্যম কি আকার ধারণ করে, তাহার উপরই ইংরেজের, শুধু ইংরেজের কেন, সমগ্র জগতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল সত্যই বলিয়াছেন, বর্ত্তমানের এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাহাই হউক, এই যুদ্ধ জগতে যুগান্তর ঘটাইবে, পুরাতনের ধ্বংসের উপর গড়িয়া উঠিবে নূতন এক সভ্যতা।
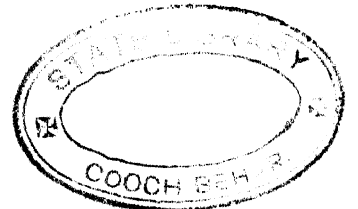
# ইরাকে জাতীয়তার স্বরূপ

**রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল**

বিগত মহাসমরের পর হইতে প্রাচ্যের কয়েকটি প্রদেশ তুরস্ক সুলতানের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া তুরস্ক একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বেশ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল। ইরাক এইরূপ একটি দেশ যাহা ইতিপূর্ব্বে তুরস্কের অধীনে ছিল। কিন্তু মহাসমরের পর ইংরেজের সাহায্যে ইরাক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। প্রথম কয়েক বৎসর ইরাকে ইংরেজ-সরকারের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। এখন যে একেবারেই নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু তবুও ইরাক আজ নানা অসুবিধার মধ্যেও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। স্বতন্ত্র হওয়ার পর ইরাক তুরস্কের গত যুগের সমস্ত নীতি পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছে। প্যান ইসলামিজম ও মুসলিম সংহতি—এই দুইটি অবৈজ্ঞানিক আদর্শ সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্য প্লাবিত করিয়াছিল। ইরাকেও তাহার ঢেউ লাগিয়াছিল। কিন্তু মহাসমরের পর নিকট প্রাচ্যের সর্ব্বত্র সেই আদর্শের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি বুঝিল যে ঐসব বড় বড় আদর্শ দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। জনসাধারণকে দেশের কথা ভাবিতে দেয় নাই। তাই তাহারা প্যান ইসলামিজমের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তার কথা ভাবিতে লাগিল। এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র গঠন করিতে প্রয়াসী হইল। ভারতের যে সব মুসলমান আজিও জাতীয়তার মর্ম্ম কথা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবেন যে, পরাধীন দেশের জন্য জাতীয়তা কত দরকারী। আমাদের নেতারা ভারতে পরাধীনতার নিরাপদ ছায়াতলে বসিয়া দুই জাতির স্বপ্ন দেখিতেছেন, আর আমাদেরই পার্শ্বে অন্যদেশের মুসলমানগণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সম্প্রদায়কে লইয়া জাতীয় ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। মুসলিম সংহতির মদিরাময় আদর্শ আর তাহাদেরকে পরিচালিত করে না। আগে মুসলমান পরে অন্য কিছু—এ আদর্শও তাহারা স্বীকার করে না। সবার উপর দেশ বড় এই মনোভাব আজ তাহাদের সমস্ত কর্ম্মধারার মধ্যে প্রকটিত হইতেছে। তাহারা পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করে নাই, মুসলমানের স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নাই। "দুই জাতির থিওরী" তাহাদেরকে বিভ্রান্ত করে নাই। বরং দেশের সমস্ত অধিবাসী লইয়া তাহারা একটি অখণ্ড জাতি—এই নীতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী। জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আজ নিকট প্রাচ্যের সর্ব্বত্র জাগরণের চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। আমরা যদি তাহাদের নিকট এই শিক্ষা লাভ না করিতে পারি, তবে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন পণ্ডশ্রম হইবে। আজ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ইরাকের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইরাকে যে শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি পরিপূর্ণ জাতীয়তা। ১৯২৪ সালের ১০ই জুলাই শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি লইয়া একটি গণপরিষদ আহূত হয়। এই গণপরিষদই বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র রচনা করে। পর বৎসর ২১শে মার্চ রাজা এই শাসনতন্ত্র অনুমোদন করেন। ইহার কিছুদিন পরে আরও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা ২৯শে জুলাই চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্র ইরাককে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত একটি সুগঠিত জাতিতে পরিণত করিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাপারে বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল অধিবাসীর সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। ইরাক জাতীয়তার সংজ্ঞা কতকগুলি বিশেষ বিধি দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। ইরাকের অধিবাসীরা নিজেদেরকে ইরাকী বলিয়া পরিচয় দেয়। কতকগুলি বিশেষগুণ থাকিলে ইরাকের অধিবাসিগণ ইরাক-জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। এবং সেই সব গুণের অভাব হইলে জাতীয়তা হইতে বঞ্চিত হয়। পূর্ব্বে তুরস্কের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রদেশে মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে আইনগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সকলের জন্য একই আইনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই এক ও সমপর্য্যায়ভুক্ত। চিন্তার স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতা, দল ও উপদল গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক ইরাকীকে দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে ধর্ম্মের বাধা চলিবে না। কিন্তু এই সব অধিকার পূর্ব্বে ছিল না। যেমন ইংলণ্ডের রাজা প্রোটেস্টাণ্ট হইবেন। সেইরূপ ইরাকের রাজা আইনত মুসমান হইবেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত রাজকার্য্যে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার সকলেই পাইবে। ধর্ম্মের পূজাপার্ব্বণ, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কোনওরূপ বাধা নাই। বিবেক ও পূজা-পদ্ধতির পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তবে একটিমাত্র বাধা আছে, তাহা এই যে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সাধারণ নীতির সীমার মধ্যে এই সব স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিতে হইবে।

আজ ভারতে ভাষা সমস্যা লইয়া কি গণ্ডগোলই না হইতেছে। এমন কি ইহা স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইরাকে এই ধরণের কোন সমস্যা নাই, যদিও সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী বহু ভাষা প্রচলিত আছে। আরবী ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা বটে, কিন্তু অন্যান্য ভাষার অনাদর নাই, অথবা দমন করিবার প্রবৃত্তি নাই। আরবীর সহিত পাশাপাশি ভাবে আরও পাঁচটি ভাষা প্রচলিত আছে, যথাঃ—ইরাকী, কুর্দ্দি, কালদিয়ান, হিব্রু, তুর্কি এবং আরমেনিয়ান। এই সব ভাষায় পুস্তক পত্রিকা প্রচারিত হয়। কিন্তু কোথাও ভাষা লইয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইরাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও সুখসুবিধা লইয়া কোন কোন্দল কোলাহল নাই। ইহা সকলেরই এক। নাগরিক অধিকারে সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে সকল অধিবাসী সরকারী চাকুরী পাইতে অধিকারী। বিশেষ কারণ ব্যতীত বিদেশী ব্যক্তিকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। সিনেট ও চেম্বার অব ডিপুটিজ—এই দুইটি সভার সদস্য হইবার অধিকার কেবলমাত্র ইরাকীদের আছে। যাহারা ইরাকী নয়, অথবা ইরাকের নাগরিক অধিকার পায় নাই, এখানে তাহাদের প্রবেশ বন্ধ। অন্য দেশের মুসলমান মুসলিম সংহতির নামে এখানে কোনও সুবিধা করিতে পারিবে না।

ইরাকী জাতি কতকগুলি সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। তাহাদের মধ্যে আরব, কুর্দ্দি, টার্কোম্যান, এই তিনটি প্রধান। প্রাচীন সিরিয়ান, কালদিয়ান, আসিরিয়ান প্রভৃতি জাতির বংশধরগণও ইরাকী জাতির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কেহই নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়। ইহা ব্যতীত প্রায় সাতটি ধর্ম্ম এখানে প্রচলিত আছে, যথাঃ—ইসলাম, খৃষ্টান, য়িহুদী, এজিদিজ, সাবিয়ান, বাহাই, ও ম্যাজিয়ান। জাতীয়তা গঠনের পূর্ব্বে ধর্ম্ম লইয়া যথেষ্ট বিবাদবিসম্বাদ হইত। তুর্কি সুলতান স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই বিবাদকে জাগাইয়া রাখিতেন। কিন্তু এখন ধর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সময় মসজিদে "আজান" ধ্বনি হয়, ঠিক সেই সময় পার্শ্বের গির্জ্জায় অথবা 'সিনাগগে' (য়িহুদীদের) ঘণ্টা ধ্বনি হইতেছে—অথচ কোথাও কোন গণ্ডগোল হয় না। পরম নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। ইরাকীদের নিকট ধর্ম্ম অবান্তর বিষয় নহে। তাহারা বলে ধর্ম্ম ভগবানের সহিত মানবের নৈকট্য আনিয়া দেয়।

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# অচিনদেশের রাজপুত্র

( গল্প )

শ্রীদেবব্রত ঘটক
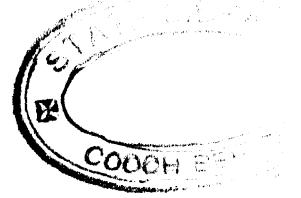
রাজপুত্র, হাতে তার তরোয়াল মাথায় সোনার মুকুট।

সানাইএর যেন আজ ক্লান্তি নেই, সকাল থেকে বেজেই চলেছে। লগ্ন কিন্তু রাত দশটায়।

মিনুর আজ বিয়ে। ভাবতে তার বড় ভাল লাগছে। ঐ যে উঠনে শামিয়ানার তলে ছেলেমেয়েরা নূতন জামাকাপড় প'রে হল্লা করছে, কর্তৃশ্রেণীর ব্যক্তিরা ছুটোছুটি ক'রে তদারক করছেন, আর বন্ধুরা তাকে ঘিরে ভিড় করেছে, সবই যে তারই জন্য। তাকে কেন্দ্র ক'রেই তো আজ এত কলরব, এত উচ্ছ্বাস।

কলা গাছের পাশে দুটো চিত্রিত আসন। একটা মিনুর আর একটা তার বরের।

বর। মিনুর বর। দেখতে সে কেমন? খুব ফরসা? চোখে তার নিশ্চয় চশমা আছে। চশমা না হ'লে পুরুষকে মানায়? আর পুরুষ মানুষ যদি লম্বা না হয়, তাকে কিন্তু বিশ্রী দেখতে লাগে। পুরুষের সৌন্দর্য স্বাস্থ্যে,—নির্ভীক উদার ও কোমল। আচ্ছা, তার বর কেমন? মিনু চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে। ভাবতে চেষ্টা করে উজ্জ্বল মাধুর্যমণ্ডিত এক সুন্দর মুখ, হাসিমুখে সে যেন মিনুর দিকে চেয়ে আছে। মনে হ'তেই মিনুর দেহ শিথিল হয়ে আসে। তার পর সে আর কিছু ভাবতে পারে না।

কখন যে শোভা এসে তার পাশে ব'সে দেখছিল, মিনু টের পায় নি। এক সময় চুপিচুপি শোভা বললে, "তোর খুব ভাল লাগছে আজ, না দিদি?

মিনুর তন্ময়তা ভেঙ্গে যায়। শোভার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "কেন?"

"বাঃ, তোর যে আজ বিয়ে। তোর আনন্দ হবে না? কত রকমের শাড়ি পেয়েছিস, কত গয়না, রুপোর সিঁদুরকৌটা, আলতা, স্নো, পাউডার। তার পর বিয়ের সময়, নমিতাদি বললেন, তুই একটা দামী জিনিস পাবি। কি জিনিস রে দিদি?"

মুখুজ্যে-গিন্নীর বয়স হয়েছে, দেখতে একটু মোটা। সারাক্ষণ পানের রসে ঠোঁট ভিজিয়ে রাখেন। হয়তো সেইজন্যেই পাড়ায় তাঁর রসিকা ব'লে সুনাম। কথাটা কেমন ক'রে তাঁর কানে গেল। জিব দিয়ে পানটা মুখের একপাশে সরিয়ে তিনি ড্যাবডেবে চোখ বড় ক'রে বললেন "ওমা, তুমি জানো না বুঝি? তোমার দিদি যে বিয়ের সময় একটা বড় ডল-পুতুল পাবে। তাকে নাওয়াবে, খাওয়াবে আর সর্বক্ষণ তোমার দিদি তাকে বুকে ক'রে রাখবে।"

ঘরে নানা বয়েসের প্রজাপতির মত বিচিত্র মেয়ে। মুখুজ্যে-গিন্নীর কথায় সকলে উঁচু সুরে হেসে উঠল। হাসি তো নয়, যেন দোতলা থেকে এক-একটা পেয়ালা ভেঙ্গে পড়ছে। শোভা অবাক হয়ে যায়। বলে, "যাঃ বড় হয়ে কেউ বুঝি আবার পুতুল খেলে? আমার তো একটাও নেই।"

"আহা, তবে তো তোমার বড় কষ্ট।" মুখুজ্যে-গিন্নী হেসে ফেলেন। বলেন, "মন খারাপ ক'র না শোভা, দিদির মত একদিন তোমারও বর আসবে।"

"আমি বুঝি তাই বললাম?" ব'লে শোভা রাগ ক'রে উঠে গেল।

মেয়েমহলে আবার সেই হাসি। কিন্তু হাসি কেন? মিনু ভেবে পায় না এর মধ্যে হাসির কি আছে। মুখুজ্যে-গিন্নী তো সত্যি কথাই বলেছেন। স্বামীকে সে ভালবাসবে, সব দিয়ে সে ভালবাসবে, তাঁর অসুখে স্নানাহার ভুলে দিন-রাত সেবা করবে, আপিস থেকে ফিরে এলে ঠাণ্ডা শরবৎ আর কিছু ফল খেতে দেবে, তার পর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে হেঁসেলে গিয়ে ওঁর পছন্দমত রান্না করবে, রাত্রে যতক্ষণ না তাঁর ঘুম আসে মিনু শিয়রে ব'সে আস্তে আস্তে হাওয়া করবে। স্বামীকে খুশী করতে সে যত্নের ত্রুটি রাখবে না। তাঁর কষ্ট হ'লে মিনুর যে ভয়ানক দুঃখ হবে।

মিনুর চোখে জল। নমিতা বিস্মিত হয়ে বলে, "তুই কাঁদছিস যে?"

মিনু মিথ্যা কথা বলে; বলে "চোখে ধুলো পড়েছে।"

"মা-বাবার জন্য দুঃখ হয়। আমার বিয়ের সময় তাদের কথা ভেবে এত কান্না আসত। ভাবতাম, তাঁদের ছেড়ে থাকব কেমন ক'রে। তার পর তোর কথা মনে হ'ত। সেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলেছি, গল্প করেছি সেই মিনুকে আর দেখব না। ভারী কান্না আসত আমার।"

নমিতার হাতে স্নেহকোমল চাপ দিয়ে মিনু বলে, "জানি তুই আমাকে ভালবাসিস। কিন্তু বিয়ের পরে তুই আমাকে একটাও চিঠি লিখিস নি।"

"সে এক মজার কথা।" নমিতা হেসে বলে; "শোন্ বলি।—বিয়ের আগে কেবলই মনে হ'ত না-জানি আমার বর কেমন হবে। হয়তো সে খুব ভাল, খুব সুন্দর কিংবা হয়তো—কেমন যে হবে, ভেবে কূল পেতাম না। আমি কালো, তাই এক-একবার মনে হ'ত আমাকে যদি তার ভাল না লাগে? সে তো নিজে দেখে আমাকে পছন্দ করে নি। ছুটিতে যদি সে কলকাতা থেকে বাড়িতে না আসে? জানিস তো পুরুষ-মানুষ সুন্দর জিনিস চায়। এইসব ভেবে অস্থির হয়ে উঠতাম।"

"তার পর?"

"তার পর দেখলাম, কি সুন্দর আমার স্বামী! আদরে আদরে আমাকে প্রায় কাঁদিয়ে দিলে সে। আমার কালো রূপ তার চোখেই পড়ল না। তখন আমার কারু কথা মনে পড়ল না। খালি মনে হ'ত আমরা দুজন ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই। তাই সে-সময় তোর চিঠি পেয়ে আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল।"

ম্লান হেসে মিনু বলে "তাই বুঝি উত্তর দিস নি?"

মুখ নীচু ক'রে নমিতা বলে, "মেয়েমানুষ বড় স্বার্থপর। দুদিনের পরিচয়ে তাকে কেমন আপন ক'রে নিলাম। মনে হয় সেই যেন আমার সব। এখন ভেবে লজ্জা হয়, অন্তত কয়েক দিনের জন্যেও তো তোকে ভুলে ছিলাম।"

আচমকা মিনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হয়তো আমারও তাই হবে। আমিও হয়তো তোকে ভুলে যাব।"

"আমাকে ভুলে যাবি?" বিস্মিত নমিতা তার পরেই উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে, "তাই তো বলছিলাম, শুধু বেশী দিনের পরিচয়েই বন্ধুত্ব হয় না। দশ দিনেও যাকে আপন করা যায় না, সে হয়তো আর একজনকে এক মিনিটেই আপন ক'রে নেয়। আসল বন্ধুকে মেয়েরা ঠিক চিনে ফেলে।"

মিনু কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর নমিতা আস্তে বললে, "তোকে আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। তোর বর তোকে দেখেই ভালবেসে ফেলবে।"

আ হা, নমিতার কথাটা যেন সত্যি হয়। একটু ইতস্তত করে মিনু বলে, "দেখতে সে কেমন রে? খুব ফরসা?"

"কে, তোর বর? না, তোর চেয়ে অনেক কালো।"

মিনু বিমর্ষ হয়ে যায়। তবে হয়তো চোখে চশমা নেই। সে যা ভেবে রেখেছে হয়তো তার সঙ্গে একটু মিল নেই। নমিতাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হয় না। যে বরকে সে মনে মনে কল্পনা ক'রে রেখেছে সেই থাক্ অমর হয়ে।

নমিতা হয়তো এক্ষুণি সেই মূর্তি ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে। মিনুর তা সহ্য হবে না। যেন তাকে বাঁচাবার জন্যেই ঠাকুরমা ঘরে ঢুকলেন। মিনু ডাক দিল, "ঠাকুমা।"

কি কাজে তিনি এসেছিলেন; ডাক শুনে অবাক হোয়ে গেলেন। মিনুর আজ রাজকন্যার সাজ। পরনে তার জরির চুমকি দেওয়া লাল বেনারসী, যেন কালো আকাশে হাজার তারার মেলা। মাথায় নীল রংএর ওড়না, গালে চন্দনের চারু চিহ্ন, পায়ে সূক্ষ্ম আলতার দাগ, চোখে স্বপ্নের সুপ্তি, সব মিলে সুন্দর একটা কবিতা।

"রাজকন্যা!" কাছে এসে ঠাকুমা বললেন, "অ্যাদ্দিনে বুঝি তোর রাজপুত্র এল"

রাজপুত্র! মিনুর রাজপুত্র!

* * * *

মিনু তখন ফ্রক পরে। সত্যি বলতে, সে তখন ছেলেমানুষ।

কিন্তু ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, মিনুর গায়ে কী জোর! এক ঝটকায় মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে বলে, "না, যাবে না। বোকার মত সেলাই শিখি আর ওরা এই ফাঁকে সব আম পেড়ে নিক। তুমি স'রে যাও।"

"তা শিখবে কেন? রাজার ঘরে গিয়ে রানী হ'য়ে বসবে কিনা তুমি!" সুরমা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, "ঘরকরনার কাজটুকু শিখে রাখলে শ্বশুরবাড়িতে কেউ তোমার নিন্দে করবে না। বরং না শিখলেই শাশুড়ী ঝাঁটা মারবে পিঠে।"

বিদ্রোহী মিনু ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে বলে, "ইঃ, মারবে! দেব তার হাত মুচড়ে।"

বলবার ভঙ্গী দেখে সুরমা হেসে ফেলে। বলে, "কিন্তু এসব শিখে রাখলে ভালই করতিস।"

মায়ের হাসি দেখে মিনুর সাহস বেড়ে যায়। তা ছাড়া নমিতা আড়াল থেকে কেবলই ইশারা ক'রে ডাকছে। তাই দু পা এগিয়ে বলে, "তোমার জেনে দরকার নেই। চললাম আমি।"

"আমার কথা আজ শুনতেই হবে।" বাধা দিয়ে সুরমা বলে, "ধিঙ্গীপনা করেই তো চিরদিন কাটবে না তোমার!"

"চিরদিনের কথা যদি বল মা—"

এমন সময় ঠাকুমা এসে বললেন, "চিরদিন ও এমন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস টানতে পারবে না। ছেলেবেলার কথা তুমি ভুলে যেও না বউ। আমি বলি, দাও ওকে যেতে। যে কদিন পারে একটু ছুটোছুটি করুক।"

সেই স্বরেই সুরমা জবাব দেয়, "কিন্তু দস্যিপনা ক'রে যদি হাত পা ভেঙে যায় কিংবা চোখে খোঁচা লাগে, তবে সাধ ক'রে সে-মেয়েকে বিয়ে করবে কে?"

ঠাকুমা শঙ্কিত হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বিধাতাকে প্রণাম জানান। তার পর একটু যেন রুষ্ট হয়েই বলেন, "আগে থেকেই অমঙ্গল চিন্তা করা ঠিক নয় বউ।"

অগত্যা মিনুকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মিনু যখন কপালে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে ফিরে এল, ঠাকুমা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। কোনও কথা তিনি প্রথমে বলতে পারলেন না। মিনুর কপাল দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে।

ভয়ে ভয়ে মিনু বললে, "আমি কিছু করি নি। বিশুদা আমাকে মিছিমিছি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।"

রান্নাঘর থেকে সুরমা বেরিয়ে আসে, বলে—"হবে না, যে দস্যি মেয়ে, সারাদিন টো টো, এর সঙ্গে ঝগড়া, ওর বাগানে ফল চুরি, মেয়েমানুষের অত দুরন্তপনা ভগবান সইবে কেন।"

"অমন ক'রে বকে না।" ব'লে ঠাকুমা স্নিগ্ধস্বরে মিনুকে বলেন, "এস মা, ফরসা নেকড়া দিয়ে ওটা বেঁধে দিই।"

যাবার সময় সুরমা দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেল, "কাল থেকে তোমার বেরনো বন্ধ। বার পেরিয়ে তের হ'তে চলল, তবু যদি মেয়ের হুঁশ হয়।"

বারান্দায় মাদুর পেতে ঠাকুমা মালা জপেন। অমন যে দুরন্ত মিনু সে-ও তখন ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। আদুরে সুরে বলে, "একটা গল্প বল না ঠাকুমা। সেই যে মৃগয়ায় এসে পথ হারাল এক রাজপুত্তুর, হাতে তার তরোয়াল, মাথায় সোনার মুকুট।"

গল্পটা মিনু অনেকবার শুনেছে। তবু তার তৃপ্তি হয় না। ঠাকুমার মুখ থেকে সে যেন বারবার নূতন ক'রে শোনে, কেমন ক'রে এক রাজপুত্র পথ হারিয়ে ঘুমন্ত-পুরীতে গিয়ে উঠল, কোন্ এক রাক্ষসী রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে সকলকে পাথর ক'রে রেখেছিল, কেমন করে রাজপুত্র ঘুমন্ত রাজকন্যের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বছরের পর বছর কাটাল, তার পর রাজকন্যার শিয়র থেকে আনমনে সোনার কাঠি তুলে খেলা করতে গিয়ে কখন হাত থেকে সোনার কাঠি রাজকন্যার মাথায় খ'সে পড়ল, আর অমনি রাজকন্যা হাজার বছরের ঘুম ভেঙে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে সামনে দেখে দাঁড়িয়ে আছে এক রাজপুত্র।

রাজপুত্রের নাম কিরীটকুমার। কী তার রূপ। তার রূপে চাঁদ লজ্জায় মুখ ঢাকে, চোখের মণি আকাশের তারাকেও হার মানায়, সকাল বেলার প্রথম আলোর চেয়েও তার হাসি মিষ্টি।

বিভোর হোয়ে মিনু শোনে। গল্প শেষ ক'রে ঠাকুমা দুষ্টু হেসে বলেন, "অমনি একটি রাজপুত্র চাই না কি তোর?"

"ধেৎ, অসভ্য।" ব'লে মিনু লজ্জায় রাঙা হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

সেই রাত্রে মিনু স্বপ্ন দেখল; স্বপ্ন দেখল কিরীটকুমারকে। ঘুমন্তপুরীতে নিদ্রাচ্ছন্ন রাজকন্যা। সাপের মত কালো চুল মেঘের মত পালংকে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা গায়ে ফুলের মেলা। ফুলের বিছানায় কন্যা নিঝুম হয়ে ঘুমায়। একসময় রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। কোথায় রাজকন্যা, এ যে মিনু নিজে। আশ্চর্য, এত তার রূপ! সে এত সুন্দর! মিনু অবাক হয়ে যায়, কিরীটকুমার হীরার ডাঁটে ভর দিয়ে তার দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। রাজপুত্রের কী রূপ! কোমরে তরোয়াল ঝোলানো, মাথায় সোনার মুকুট!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার পরে মিনু এক নূতন রকমের আনন্দ অনুভব করে। নমিতার সঙ্গর চেয়েও তৃপ্তিকর, জ্যৈষ্ঠ মাসের আমবাগানের ছায়ার চেয়েও শীতল আনন্দ। তার দেহ মনে স্বপ্ন ও কামনার ছায়া সঞ্চারিত হয়ে যায়। কেবলই মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রকে। আর তার দৃষ্টি মনে পড়তেই লজ্জায় মিনুর চোখ বুজে আসে। রাজপুত্রের মুখ কিন্তু অনেকটা বিশুদার মত।

আনন্দ, ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দে মিনু নীরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। খুশিতে ও আবেশে তার শরীর অবশ হয়ে যায়। কি তার অর্থ, কি তার হেতু মিনু ঠিক জানে না, বুঝিয়ে বলতে সে পারে না কাউকে। বলাও যায় না। এই আনন্দ প্রচার করতে গিয়ে হঠাৎ সে থেমে যায়। গান করতে এখন তার লজ্জা করে।

লজ্জা; একটা মধুর লজ্জা তাকে ঘিরে ফেলে ক্রমে ক্রমে। কারও চোখের দিকে তাকাতে তার সাহস হয় না, অজ্ঞাতে চোখ-দুটো নত হয়ে আসে। কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ক্ষীণ ও কোমল হয়ে আসে। ভাদ্রের নিস্তরঙ্গ নদীর মত দেহলতা তার শান্ত ও গভীর।

মাঝে মাঝে আবার কিছুই ভাল লাগে না তার। ভাল লাগে

না গান, ভাল লাগে না খেলাধ্লো, নমিতার সঙ্গও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। মিন্ যেন অকস্মাৎ সমস্ত জগৎটার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মনে হয়, সকলে তাকে ঠকাবার জন্য সুযোগ খুঁজছে, তার ভার বইতে কেউ যেন রাজী নয়।

অথচ মিনুকে না হ'লে চলে না। সংসারের সব কাজ সে একাই করে। রান্না করা, ছোট ভাইবোনকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, তাদের পড়া দেখিয়ে দেওয়া, বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জামা সেলাই করা, সব সে নিজে করে। খুশি হোয়ে সুরমা বলে, "তুই যে আমাকেও হারিয়ে দিলি। তোর কাজ-কর্ম দেখে শাশুড়ি খুব খুশি হবে।"

মিনুর গাল লাল হয়ে ওঠে। নিজের প্রশংসায় সে বিচলিত হয়। সে যেন কি প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু পারে না। মিনুর পায়ে আজকাল আলতার দাগ, ঝাঁকড়া চুল খোঁপা হয়ে মাথায় শোভা পায়। দীর্ঘ শাড়িতে তার দেহ যেন মুখ ঢেকেছে। চলতে তার পা দুটো শরমে জড়িয়ে যায়। মৃদুস্বরে বলে, "তুমি আজ নমিতাদের বাড়ি গিছলে ঠাকুমা? সে কেমন আছে? এখানে আসে না যে?"

"তোর কথা জিগগেস করলে;" ঠাকুমা বললেন, "ভালই আছে। ও আর বেরয় না। শুনলাম কোথায় নাকি ওর সম্বন্ধ হচ্ছে।"

"কার, নমিতার? কোথায় ঠিক হয়েছে ঠাকুমা?"

"এখনও কিছু হয় নি। তবে ওর বাবা যেরকম ব্যস্ত হয়েছে, হয়তো দু মাসের মধ্যেই ওর বিয়ে হবে। তুই একদিন দেখা ক'রে আয় না।"

মুখ ভার ক'রে মিনু বলে "আমিও কোথাও বেরই না।"

সংসারের কাজ করতে মিনুর ভাল লাগে। প্রচুর উৎসাহে একটার পর একটা কাজ ক'রে যায়। এতে তার ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সুরমাকে কিছু দেখিয়ে দিতে হয় না। বরং সুরমা কোনও কাজে হাত দিলেই মিনু ব'লে ওঠে, "তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি মণ্টুর কান্না থামাওগে।"

অনুনয় নয়, আদেশ। মিনুর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা কঠিন গাম্ভীর্য। সুরমা তার মেয়ের উপর কর্তৃত্ব হারিয়েছে। কিন্তু তবু সে খুশি হয়ে ওঠে। এমনি ক'রেই তো সংসার গুছিয়ে নিতে হয়। এমনি জোর ক'রে না নিলে সহজে কিছুই পাওয়া যায় না। তাকেও তো কষ্ট ক'রে সব পেতে হয়েছে, মিনুকেও তাই পেতে হবে।

দেখতে মিনু ভালই। ফরসা গালে লজ্জা যখন লাল হয়ে মিনুকে ছেয়ে ফেলে, তখন সেই সংকুচিত, কুণ্ঠিত ছন্দে মুগ্ধ হ'তে হয়। দেখে সুরমা, দেখে আর মনে মনে বলে, "লক্ষ্মীর মত মেয়েকে আমার অন্ধ ছাড়া সবাই পছন্দ করবে। এমন রূপ কার!"

কিন্তু কোনও সম্বন্ধ পছন্দ আর হয়ে ওঠে না। যে দু-একটা সম্বন্ধ আসে, সুরমা প্রায় দুয়ার থেকেই বিদায় দেয়। সুরমা পাত্রের মধ্যে একাধারে রূপ, অর্থ, বিদ্যা ও বংশগৌরবের একত্র সমাবেশ দেখতে চায়। অথচ মাত্র একজন মরণশীল মানুষের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলো গুণের সমাবেশ যে সম্ভব নয়, এ কথা কে বোঝাবে তাকে?

ইতিমধ্যে নমিতার বিয়ে হয়ে গেল। নমিতার বরটি সুরমার মতানুযায়ী ঠিক কার্তিক না হ'লেও, কার্তিকের মত বটে। মিনুর জন্যে এরকম জামাই পেলে সুরমার বিশেষ আপত্তি হবে না। তাই সেদিন রাত্রে সুরমা স্বামীকে বললে "মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজছ তো?"

ভুবনবাবু শুয়ে শুয়ে আলবোলা টানছিলেন। সংসারের কোনও কিছুতেই তিনি নেই। কার অসুখ হ'ল, কে কোন্ ক্লাশে পড়ে, মাস্টার প্রত্যেকদিন আসে কিনা, কতজন লোক আছে, কার কি দরকার, এ-সবের হিসাব রাখা তাঁর ধাতে নেই। চিনেছেন শুধু তিনি মক্কেল আর আদালত। ওকালতি তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে। তাই তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, "কার জন্যে?"

"কার জন্যে আবার! মিনু যে দেখতে দেখতে বেড়ে চলেছে, তার দিকে কোনও দিন চেয়ে দেখেছ?"

ভুবনবাবুর হাত থেকে আলবোলাটা পড়ে গেল। বিস্মিত হয়ে তিনি বলেন, "মিনু তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন তার বিয়ে দিয়ে কি হবে?"

"পনের বছর চলছে;" সুরমা রাগ করে বলে, "এখন থেকে যদি না খোঁজ তাহলে বয়েস ভাঁড়িয়ে কুড়ি বছরেও ওর বিয়ে দিতে পারবে না। আর কুড়ি বছরের মেয়েকে কোন্ ছেলেই বা বিয়ে করবে শুনি?"

"তাই তো," যেন ভয়ানক চিন্তিত হয়েছেন এমনিভাবে ভুবনবাবু বললেন, "তাই তো, বড় ভাবনায় ফেললে তুমি। মিনু কি এই বাড়িতেই আছে? তাকে তো কই দেখি না।"

হতাশ হয়ে সুরমা বলে, "তোমার উপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। জানি, তুমি ভুলে যাবে।"

"পাগল, এত বড় দায়িত্বের কাজ কি কখনও ভোলা যায়? তুমি ভেবো না।" বলে ভুবনবাবু পাশ ফিরে তখনই নাক ডাকাতে লাগলেন।

সুরমা কি ভাবল। তারপর সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভুবনবাবু মোকদ্দমার তারিখ ছাড়া আর কিছুই মনে রাখতে পারেন না। কিন্তু সেই রাত্রের কথা তিনি আশ্চর্যভাবে মনে রেখেছেন। শুধু মনে রেখেছেন নয়, দস্তুরমত একটা কাজের মত কাজ করেছেন। সুরমাকে চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন, "সোমবার ওরা দেখতে আসবে। মিনুকে কিছু কিছু কাজ শিখিয়ে দাও এর মধ্যে।"

এমন একটা সম্বন্ধ পেয়ে সুরমা তো আনন্দে আটখানা! হেসে বলে, "মামলার কথা ছাড়া আর তো কোনও খবর রাখ না তুমি। সংসারের সব কাজ তো মিনুই এখন করে। আজকাল ও যে কী শান্তই হয়ে গেছে; কে বলবে ও এক সময় পুরুষের মত গাছে চড়ত।"

"তাই নাকি?" খুশী হয়ে ভুবনবাবু বলেন, "তবে তো কোনও ভাবনাই নেই।"

কিন্তু ভাবনা হল মিনুর। নারায়ণগঞ্জ থেকে কা'রা দেখতে আসবে? সে নিজেও আসবে নাকি? মিনুর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার নাম কি? কিরীটকুমার? নারায়ণগঞ্জের কোন জমিদার নয় তো সে! জমিদার বাড়িতে অজস্র দাসদাসী, দু-তিনটে মোটর; আত্মীয়ে ও আশ্রিতে বাড়ি সরগরম। মিনুর পরনে মহামূল্য শাড়ি, অঙ্গে অমূল্য অলঙ্কার। বাড়ির একপাশে ফুলের বাগান, পাথরের মূর্তি, ফোয়ারার জল, শ্বেতপাথরের বেঞ্চে বসে সে আর তার বর।

তার বর। দুধে আলতার মত তার রং। বিদ্বান ও সুশ্রী। কল্পনায় মিনু শত শত ছবি বারবার ক'রে আঁকে।

শেষ পর্যন্ত সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল বরপণ নিয়ে। সুরমা কপালে করাঘাত করে বলে, "আমার ভাগ্য! নইলে মেয়েকে পছন্দ করেও সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায়?" সত্যিই বিমর্ষ হয়ে পড়ে সুরমা। কিন্তু মিনু এর চেয়েও দুঃখিত; যে-ঘর স্বপ্নে সে গড়ে তুলেছিল, এমনি ক'রে তার সমাধি হ'ল ব'লে। মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে আবার আনন্দে ঝলমল ক'রেও ওঠে মিনু। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই আশঙ্কায় তার বুক কাঁপে। কেন, মিনু তা ঠিক বলতে পারে না।

মন খারাপ হ'লে কিংবা অবসর পেলেই মিনু লুকিয়ে উপন্যাস পড়ে। সেই সব বইই পড়ে, যাতে ভালবাসার কথা

আছে এবং শেষ পর্যন্ত যাতে নায়ক-নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়। শেষের দিকে যদি কেউ ম'রে যায়, কিংবা সামাজিক শাসনের জন্য মিলন যদি না হয়, মিনুর সে সব ভাল লাগে না। ভাল লাগে না আর কান্না পায়। কিন্তু যে উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়, সুখে স্বচ্ছন্দে যারা সংসার করে, সেসব উপন্যাসের উপর মিনুর প্রচণ্ড লোভ। পড়তে পড়তে মিনু নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দুর্গেশনন্দিনী প'ড়ে তার মনে হয়, সে তিলোত্তমা। নির্ভীক বীর জগৎ সিংহকে সে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে মিনুর লজ্জা নেই।

রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় মিনুর ক্লান্তি আসে। ক্লান্তি আর দুঃখ। একদিন এই বাড়ি ছেড়ে তাকে চ'লে যেতে হবে। হয়তো তারা তাকে ভালবাসবে না। হয়তো আমরণ তাকে দুঃখ পেতে হবে। দুঃখ পাবে হয়তো বিনা দোষে। কিংবা হয়তো সবাই ভালবাসবে, হয়তো সে ভালই থাকবে। এমন কি, কদমপুরেরও কথা ভুলে যাওয়া তখন আশ্চর্য নয়।

কদমপুরকে ভোলা যায়, যদি স্বামী তাকে ভালবাসে।

তার স্বামী কে? কি তার নাম? কেমন দেখতে? দেশের মধ্যে সে হবে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আভিজাত্যে সুমহান্, সকলের শ্রদ্ধেয়; যাঁর নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত ও প্রচারিত।

মিনু তাকেই চায়।

মেয়ের বাড়ন্ত গড়ন দেখে সুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভুবনবাবুকে ক্রমাগত তাড়া দিতে লাগল সে, "মেয়ের বয়েস যে হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে। এখন থেকে ভাল ক'রে না খুঁজলে পরে বেগ পেতে হবে।"

ভুবনবাবুও যে এ কথা না জানেন, তা নয়। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু আদালত নিয়েই তিনি ব্যস্ত। কেবল মিনুর বিয়ের কথা ভাবলেই তো চলবে না। সংসারের সমস্ত ভার যে তাঁরই উপর। তা ছাড়া আদালত কামাই ক'রে শুধু পাত্র খুঁজে বেড়ালে এক বছর পরে পাত্র তো দূরের কথা অন্নও জুটবে না। যেহেতু ওকালতি ব্যবসায়ে টাকা আছে এবং টাকা দিয়েই যথার্থ ভাল পাত্র কেনা যায়। তবু জানাশোনা বন্ধুদের তিনি এ সম্বন্ধে একটু আধটু খোঁজ নিতে বলেছিলেন। বললেন, "ব্যস্ত হয়ো না। ব্যস্ত হ'লে চলে?"

সত্যিই ব্যস্ত হবার হেতু ছিল না। দিন কয়েক পরে বর্ধমান থেকে আর একটা সম্বন্ধ এল। ছেলের নাম অমিয়। প্রফেসারি ক'রে দু শ টাকা পায়। সময়মত দু-চারজন বন্ধু নিয়ে অমিয় মিনুকে দেখতে এল।

একখানা শাদা সাধারণ সাড়ি প'রে এলো চুলে খালি পায়ে মিনু ঘরে ঢুকতেই অমিয় হাত তুলে নমস্কার করল। প্রত্যুত্তরে মিনু শুধু আরও মুখ নীচু করতে পারে। অমিয় অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে আশা করেছিল যে, তার স্ত্রী হ'তে চলেছে সে নিশ্চয় সপ্রতিভভাবে মৃদু হেসে প্রতিনমস্কার করবে। এমন ঘৃণ্য সলজ্জ মূর্তি সে কল্পনাও করে নি। বন্ধুরাও ইশারায় নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করলে।

খানিক পরে অমিয় প্রশ্ন করে, "কোন্ ক্লাস অবধি পড়েছেন, ম্যাট্রিক?"

মিনুর হ'য়ে ভুবনবাবু উত্তর দিলেন, ইস্কুলে ও পড়ে নি, কিন্তু বাঙলা জানে। তা ছাড়া রান্নাবান্না, গান-বাজনা, সেলাই-এর কাজ ও ভালই জানে।"

এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। তবু অমিয় মিনুকে বললে, "আপনি এবার যেতে পারেন।"

যাবার আগে মিনু চোখ তুলে একবার অমিয়কে দেখে নিল। সুন্দর, সুন্দর অমিয়। যেমন মুখশ্রী তেমনি মিষ্টি গলার স্বর। নির্জন ঘরে কাপড় ছাড়বার অবসরে মিনুর কল্পনা রাস ছাড়া ঘোড়ার মত উদ্দাম হয়ে ছোটে। অমিয় কালো কিন্তু কুশ্রী নয়। চোখে মুখে বুদ্ধির জ্যোতি। চশমায় তার ব্যক্তিত্ব আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যেন। চশমা ছাড়া অমিয়কে মানায় না। মিনুর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রফেসরের মত মহৎ জীবন কার? সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে বিদ্যা বিতরণ করে, ক্ষুদ্র লাভ, তুচ্ছ স্বার্থ তার মার্জিত শিক্ষিত মনকে কলুষিত করতে পারে না। সত্যি কি সুন্দর অমিয়! আবেশে মিনুর চোখ বুজে আসে।

সেই দিনই অমিয় ফিরে গেল। চিঠি লিখে ভদ্রভাবে জানালে ও মেয়েকে তার পছন্দ হয় নি।

তার পর থেকে ভুবনবাবু উঠে-প'ড়ে লাগলেন। প্রথম দু-চারটে সম্বন্ধ তো এমনি ক'রে নষ্ট হয়েই যায়, তাই ব'লে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। প্রায় সাত আট জায়গার পরে এক জায়গায় প্রজাপতি প্রসন্ন হলেন। এক ফাল্গুন মাসের রাত্রিতে মিনুর বিয়ের শঙ্খ বেজে উঠল।

বরের নাম হরিপদ চক্রবর্তী। সাহেব ব্যাঙ্কে এক শ টাকার কেরানী।

* * * *

'বর এসেছে, বর এসেছে' শব্দে মীনুর চমক ভাঙে; মেয়েরা হুড়মুড় ক'রে ছাঁদনাতলায় বর দেখতে ছোটে। সানাইর সুরে যেন নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়, চীৎকারে হাসিতে কানে তালা লেগে যায়।

বরের পাশে মিনুকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। বর ও বধূর চারিপাশ মেয়েদের কলকণ্ঠে মুখরিত।

উজ্জ্বল আলোয় মিনুর নিজেকে কেমন যেন অশরীরী ব'লে মনে হ'ল। পুরোহিত যখন সুর ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন মীনুর মনে হ'ল তার পাশে বসে আছে রূপকথার রাজপুত্র। চোখে তার চশমা, মাথায় বিয়ের টোপর।

# ইরাকে জাতীয়তার স্বরূপ

(৮ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু দেশ মানুষে মানুষে ভ্রাতৃ ভাব, প্রেম ও ভালবাসা জাগাইয়া দেয়। দেশের জন্য সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগ করিতে হইবে। ভগবানের নামে দেশদ্রোহিতা করা পাপ। চেম্বার অব ডিপুটিজ সিনেট সভার সভ্যগণ যে শপথ গ্রহণ করেন, তাহা ভারতের পাকিস্থানপন্থী মুসলমানগণকে চ্যালেঞ্জ দিতেছে। তাহারা ইসলাম ও ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করে না। তাহারা জাতির নামে শপথ গ্রহণ করে। "দেশের রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিব, দেশের শাসনতন্ত্র পালন করিব এবং দেশ ও জাতির সেবা করিব"—ইহাই ইরাকী সদস্যদের আনুগত্যের শপথ। কোথায় রহিল পাকিস্থান, আর কোথায় রহিল মুসলিম সংহতি। মুসলিম লীগের আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে কোন দেশ স্বাধীন হইতে পারে না,—আর স্বাধীন দেশ পরাধীন হইতে বাধ্য। যে আদর্শে জাতীয় সংহতির স্থান নাই, দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা রচিত হয় নাই, দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে এক করিবার প্রেরণা যাহার মধ্যে নাই, বরং ভেদনীতিরই পরিণতি স্বরূপ যাহার উৎপত্তি তাহা চিরকাল ব্যর্থ হইবে। মুসলিম লীগের আদর্শ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই আমরা মুসলমান সমাজকে বলিতেছি—"পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও! জাতীয় আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া দেশ ও জাতির সেবা করিতে থাক। ইহাতেই মুসলমানের কল্যাণ হইবে।"

# কৃষিজাত বস্তুর বিক্রয় সমস্যা

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

কৃষকেরাই ভারতবর্ষের প্রাণ। তাহাদের অবস্থার উন্নতি অবনতির উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। তাহাদের অবস্থা ভাল হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে; ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইবে; উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের কাজ জুটিবে। কৃষকের উন্নতি বলিতে প্রধানত দুইটি জিনিস বুঝায়। এক হইতেছে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যেখানে বিঘা প্রতি দশ মণ ফসল হয় সেখানে বিশ মণ ফসল জন্মাইবার চেষ্টা করা। আর হইতেছে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা যাহাতে বেশী টাকা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। আমরা এখানে দ্বিতীয় উপায়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কৃষকেরা রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু তাহারা ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না। যে দামে তাহারা জিনিস বিক্রয় করে এবং যে দামে ওই সকল জিনিসের ব্যবহারকারিগণ উহা খরিদ করে তাহার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান রহিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দক্ষিণ গুজরাটের এক গ্রামের কৃষকেরা তিন টাকা পনর আনা মণ হিসাবে দেড় শত মণ গুড় বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা গুড় খাইবার জন্য খরচ করিয়াছিল তাহাদের মণ পিছু দিতে হইয়াছিল ছয় টাকা। এই যে মণ পিছু দুই টাকা এক আনা ইহা লয় কাহারা? এই টাকাটা যায় ব্যাপারী ফড়িয়া পাইকার আড়তদার প্রভৃতির পেটে। চাষী যদি পাট বিক্রয় করে সাড়ে ছয় টাকা মণে, তাহা হইলে ওই পাট কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয় দশ টাকা মণে। বোম্বাই প্রদেশের সুরাট জেলায় আটগাম্ নামক স্থানে ফল উৎপাদনকারীরা নিজেরাই ফল ঝুড়িতে সাজাইয়া ভাল করিয়া প্যাক করিয়া নিকটবর্তী শহরে পাঠায় এবং ইহাতে তাহারা অনেক বেশী মূল্য পায়। এইরূপ একজন ফলবিক্রেতা একদিন ৫৭৯১টি আম বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। একজন ফড়িয়া তাহাকে আমগুলির জন্য ২৭৫৲ টাকা দিতে চাহিল। কিন্তু সে তাহা না লইয়া নিজেই শহরে আম বেচিতে গেল। আমগুলি ৬২৭৸৵০ আনাতে বিক্রয় হইল। অবশ্য বিক্রয় করিতে যাইয়া তাহাকে গাড়ি ভাড়া দিতে হইল, বাজারের ট্যাক্স দিতে হইল, নিজের খাইখরচ লাগিল। এইসব বাবদ তাহার খরচ হইল ২৩৩৷৵০ আনা; খরচ খরচা বাদে তাহার লাভ হইল ৩৭৮৸৵০ আনা। অর্থাৎ ওই ব্যাপারীর কাছে আমগুলি বিক্রয় করিলে সে যাহা পাইত তাহা অপেক্ষা ১০৩৸৵০ আনা বেশী পাইল।

ইহাদের এই আম বিক্রয় প্রণালীর সহিত বিহারের বিক্রয় প্রণালীর তুলনা করা যাউক। এখানে যদি কাহারও আমবাগান থাকে তাহা হইলে আমের মুকুল হইবার পূর্বেই সে অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট এক বৎসরের মতন আমের ফসল বিক্রয় করিয়া দেয়। ধর রামের পঞ্চাশটা আম গাছ আছে। সে পঞ্চাশ টাকা লইয়া হরিকে এক বৎসরের মতন আম গাছের ফল খাইবার স্বত্ববিক্রয় করিয়া দিল। গাছে যখন মুকুল হইল এবং মুকুল হইতে আমের-গুটি বাহির হইল তখন হরি আবার যদুর নিকট আম বাগান এক শ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিল। যদু তিন চার মাস ধরিয়া আম-বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, আম পাকিলে উহা গাছ হইতে পাড়িয়া সেই গ্রামেরই একজন ব্যাপারীর নিকট দুই শত টাকায় সেগুলি বিক্রয় করিল। ওই ব্যাপারী আবার আমগুলি কোনও শহরে লইয়া গেল। শহরের কোনও বড় পাইকার এইগুলি তিন শত টাকায় কিনিয়া লইল। তাহার পর ওই ব্যাপারী রেলে বা ষ্টীমারে করিয়া উহা আরও বড় শহরে চালান দিল। ওই শহরে অপর কোনও পাইকার ওইগুলি চারি শত টাকায় কিনিল। সে আবার পাঁচ শত টাকা লইয়া ওইগুলি ফিরিওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করিল। ফিরিওয়ালারা আবার পথে পথে বিক্রয় করিয়া সর্বসাকল্যে ছয় শত টাকা পাইল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যাহার বাগান সে মাত্র পঞ্চাশ টাকা পাইল, অথচ যাহারা আম খাইল তাহাদিগকে ছয় শত টাকা দিতে হইল। সাড়ে পাঁচ শত টাকা গেল দালালের পেটে। যদি আমের বাগানের মালিকদের অথবা যাহারা মুকুল হইবার পূর্বে বা পরে এক বৎসরের জন্য আমের ফল খরিদ করে তাহাদের কোনও সমবায় সমিতি থাকিত তাহা হইলে ওই সমিতির সাহায্যে তাহারা শহরে আম চালান দিতে পারিত এবং তাহাতে চার পাঁচ শত টাকা লাভ হইত। এই কাল্পনিক দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, ফসল উৎপাদনকারীরা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হইবার প্রধান কারণ হইতেছে ব্যাপারী, পাইকার প্রভৃতি দালালদের মধ্যস্থতা।

যাহারা তুলার চাষ করে তাহারা কেন তুলার ন্যায্য দাম পায় না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেন্দ্রীয় তুলার কমিটি মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণীর মধ্যবর্তিতা সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন।

চাষী ও খরিদদারের মধ্যে যেখানে এতগুলি ব্যাপারী রহিয়াছে সেখানে চাষী কিরূপে ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে?

চাষী উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য মূল্য পায় না তাহার আর একটি প্রধান কারণ হইতেছে ভাল বাজারের অভাব। পশ্চিমবঙ্গে একত্রিশ বর্গমাইলের মধ্যে একটি, উত্তরবঙ্গে সাতান্ন বর্গমাইলের মধ্যে একটি ও পূর্ববঙ্গে ঊনপঞ্চাশ বর্গমাইলের মধ্যে একটি মাত্র বাজার আছে। পাঞ্জাবে এক একটি বাজার গড়ে পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যেকার লোকের জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিহারে গড়ে ত্রিশ বর্গমাইলের মধ্যে একটি হাট আছে। এক একটি হাটে মোটামুটি বার হাজার লোকের জন্য বেচা-কেনা হয়; যদিও হাটে দুই তিন শত লোকের বেশী বেচা-কেনা করিতে যায় না। দূরে দূরে হাট হওয়ার ফলে হাটে বা বাজারে জিনিস পাঠাইবার খরচ পড়িয়া যায় অনেক বেশী।

হাটে পাঠাইতে হইলে অনেক সময়েই গরুর গাড়ির সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু যখন মাঠ হইতে ফসল ওঠানো হয় তখন সকল

চাষীই ফসল বিক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। তখন গরুর গাড়ি বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় না। বাঙলা দেশে এক হাজার মানুষ পিছু সতের খানি এবং বিহার ও উড়িষ্যায় চৌদ্দখানি মাত্র গরুর গাড়ি আছে। মধ্যপ্রদেশে কিন্তু হাজার লোক পিছু একাত্তরখানি গরুর গাড়ি পাওয়া যায়। হাটে বা বাজারে জিনিস পাঠাইতে হইলে শুধু যে গরুর গাড়ির ভাড়া লাগে তাহা নহে আরও নানারকম খরচ কৃষককে বহন করিতে হয়। গাজীয়াবাদ জেলায় এক শত টাকার গম বিক্রি করিতে যাইয়া চুঙ্গি বা অকট্রয় শুল্ক দিতে হয় আট আনা, দাতব্য ফান্ডে দান করিতে হয় এক আনা, ওজন করিবার খরচ দিতে হয় এক টাকা নয় আনা, তোলা দিতে হয় দশ আনা, বস্তার খরচ প্রভৃতিতে খরচ হয় এক টাকা পাঁচ আনা; সর্বসাকল্যে চার টাকা তিন আনা খরচ হইয়া যায়। ইহা ছাড়া আড়তদারেরা কোনও কোনও জায়গায় নগদ দাম দেওয়ার জন্য এক টাকায় এক পয়সা কাটিয়া লয়। ধূলা মাটি লাগার দরুন ঝাড়াই বাছাই করিবার জন্য এবং নানা ছুতায় আরও কিছু কাটিয়া লইয়া থাকে। এই ভয়ে চাষী গ্রামের ব্যাপারীর নিকট যাহা কিছু দাম পায় তাহাতেই ফসল বেচিয়া দেয়। ব্যাপারী ও আড়তদারেরা চাষীকে যে কত রকমে ঠকায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

জিনিসের ওজনে চাষীকে ঠকানো দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিহার কৃষিবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুত ভূতনাথ সরকার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, বিহারের ১৪২৬টি বাজারের মধ্যে ৪৯৭টি বাজারে ৪৮ হইতে ৫৫ তোলার সের, ২০২টি বাজারে ৫৬ হইতে ৬৩ তোলার সের, ৩১৩টি বাজারে ৮০ তোলার সের ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বাজারগুলিতে ৩২ হইতে ১০৫ তোলার সের ব্যবহৃত হয়।

ওজনের সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন প্রকার রীতি প্রচলিত থাকায় নিরক্ষর কৃষকেরা ব্যাপারীদের হিসাবের কারচুপি ধরিতে পারে না। ইহার ফলে তাহাদের অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

কৃষক যে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না তাহার আর একটি কারণ হইতেছে তাহার অর্থাভাব। অধিকাংশ কৃষকেরই মাথার উপর পৈতৃক ঋণের বোঝা চাপিয়া আছে। তাহার উপর আবার বীজ ও সার খরিদ করিবার জন্য অথবা লাঙ্গল ও বলদ কিনিবার জন্য তাহাকে টাকা ধার করিতে হয়। কৃষকেরা কিরূপ শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা ধার করে তাহার একটা হিসাব পাঞ্জাব প্রদেশে লওয়া হইয়াছে। তাহাতে তিনটি জেলায় নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

| উত্তমর্ণ | লায়ালপুর জেলায় | ফিরোজপুর জেলায় | আইক জেলায় |
|---|---|---|---|
| | ধারের এক শত ভাগের কত ভাগ | | |
| মহাজন | ২৮·৮ | ২৭·২ | ৭৪·৭ |
| সমবায় সমিতি | ১৫·০ | ১০·৮ | ৭·২ |
| আড়তদার | ১৫·৬ | ২১·৫ | — |
| জমিদার | ১০·২ | ৩৬·৮ | ৪০·৭ |
| আত্মীয়স্বজন | ৯·৭ | ২·০ | ১৩·৭ |
| অন্যান্য | ২০·৭ | ১·০ | ৪·২ |

ফসল বুনিবার পূর্বেই চাষী ধার করে, আর সেই সময়ে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ফসল উঠিলেই সে ধার শোধ দিবে অথবা সুদের টাকা দিয়া দিবে। খেতে ফসল কাটা হওয়া মাত্রই মহাজন, জমিদার, আড়তদার প্রভৃতি তাগিদ দিতে আরম্ভ করে। চাষীও দেখে যে টাকাটা যত শীঘ্র শোধ দেওয়া যায় ততই সুদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। গ্রামের মহাজন ও জমিদার অনেক সময় নিজেই ফসল কিনিয়া ব্যবসা করে। তাহার কাছ হইতে টাকা ধার লওয়া হইয়াছে বলিয়া কৃষক মনে করে যে তাহারই নিকট ফসল বিক্রয় করিতে সে ন্যায়ত বাধ্য। ওই ব্যক্তিও খাতকের নিকট হইতে যত অল্প দামে পারে জিনিস কিনিয়া লয়। চাষী যদি তাহাতে বেশী প্রতিবাদ করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিপদ আপদের সময় তাহার আর ঋণ পাইবার আশা থাকে না। সংযুক্ত প্রদেশে অনেক চাষী মহাজনের নিকট হইতে কাঁচা হিসাব নামক প্রথায় ধান চাল ধার লয়। চাষীর ঘরে যখন খাবার ফুরাইয়া আসিয়াছে তখন সে মহাজনের নিকট হইতে এইভাবে খাদ্যদ্রব্য ধার লয়। জিনিস দিবার সময় বেশী দাম হিসাবে ধার দেয়, তাহার উপর আবার শতকরা অন্তত পঁচিশ টাকা হিসাবে সুদ ধরে। এই মহাজনেরা টাকা ধারও দেয় না টাকার হিসাবে ধার শোধও লইতে চাহে না। তাহারা জিনিস দিয়া জিনিসই ফেরত লইতে চায়। কিন্তু কৃষকের উৎপন্ন জিনিসের দাম বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম হিসাবে ধরে এবং পাওনা গন্ডার উপর সুদও আদায় করিয়া লয়।

টাকার অভাবে ও মহাজনের অত্যাচারে চাষী সাধারণ বাজারে জিনিস আনিয়া বিক্রয় করিতে গেলেও উপযুক্ত মূল্য পায় না। তাহার কারণ হইতেছে যে, ফসল কাটিবার পরই সকল চাষী একসঙ্গে তাহাদের উৎপন্ন জিনিস আনিয়া বাজারে জড় করে। চাহিদার অপেক্ষা সরবরাহ বেশী হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই জিনিসের দাম অল্প হয়। চাষীদের হাতে যদি টাকা থাকিত, তাহারা যদি মহাজনের দ্বারা উত্যক্ত না হইত, তাহা হইলে বাজারের চাহিদা বুঝিয়া ধীরে সুস্থে জিনিস বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্য পাইত।

ধীরে সুস্থে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার একটি প্রধান অসুবিধা হইতেছে ফসল রক্ষা করা। ধান, গম, ডাল, তিসি প্রভৃতি রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত গোলাঘর থাকা দরকার। গোলাঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হইলে চলিবে না। উহার চালে ফুটা থাকিলে রৌদ্রে জলে ও বাতাসে ফসল খারাপ হইয়া যাইবে। গোলাঘরে ফসল রাখিয়াও চাষী যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে তাহা নহে। ইঁদুর ও অন্যান্য পোকা মাকড় হইতে ফসল রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। এইসকল অসুবিধার জন্যও চাষী তাড়াতাড়ি ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বড় বড় বাজারে বিভিন্ন রকমের ফসল রক্ষা করিবার জন্য কোঠা আছে। এক একটি কোঠায় দেড় শত হইতে তিন শত মণ পর্যন্ত শস্য রাখা যায় এবং উহার ভাড়া মাসিক পাঁচ হইতে দশ টাকা। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এইরূপ কোঠা ভাড়া করা মোটেই সম্ভব নয়। ব্যাপারী, পাইকার ও আড়তদারেরা এইরূপ কোঠা ভাড়া করিয়া ফসল রাখে এবং ওইরূপে রক্ষিত ফসল দেখাইয়া তাহারা যৌথ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়। কৃষকদের পক্ষে এককভাবে এরূপ ধার পাওয়ার সুবিধা নাই। মাঠ হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে শহর বাজারে ফসল লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিতে পারিলে অনেকটা ন্যায্য দাম পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা এতই খারাপ যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে ওইরূপভাবে জিনিস লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই দেশের অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা; বাঙলা দেশে শতকরা সতের ভাগ ও বিহারে তের ভাগ মাত্র রাস্তা পাকা। পাকা রাস্তায় মোটর লরি চলিতে পরে। মোটর লরিতে জিনিস পাঠাইলে খরচ অনেক কম পড়ে বটে; কিন্তু বেশী জিনিস না পাইলে মোটর লরি ভাড়া করা পোষায় না। দু-দশজন কৃষক মিলিয়া একত্রে শহরে জিনিস পাঠাইতে চাহিলে মোটর লরি ভাড়া করাই ভাল। কিন্তু কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়িই ভাল। কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি ষোল মণ ও পাকা রাস্তায় পঁচিশ মণ বোঝা বহন করে। সেই জন্য কাঁচা রাস্তায় জিনিস পাঠাইবার খরচ বেশী পড়ে। রেল গাড়ির ভাড়াও এখানে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক টন গম দুই শত মাইল দূরে পাঠাইতে হইলে সাড়ে সাত টাকা খরচ পড়ে। আর ভারতবর্ষে খরচ পড়ে এগার টাকা। রেলের ভাড়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অল্প জিনিসের উপর

ভাড়ার হার বেশী; সেইজন্য সাধারণ কৃষকের পক্ষে একা একা জিনিস পাঠাইতে অনেক খরচা পড়ে।

কৃষকেরা যাহাতে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য কোনও কোনও স্থানে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া জিনিস বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে তুলা বিক্রয়ের জন্য এরূপ সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সুরাট জেলার সোনসেক গ্রামে যে সমবায় সমিতি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে প্রথমে ১৩জন মাত্র তুলার চাষী যোগ দিয়াছিল। এখন ওই সমিতিতে ৫৫৩জন সদস্য এবং উহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া বিশ হাজার টাকা তোলা হইয়াছে। ওই সমিতি সভ্যদের উৎপন্ন এক-চল্লিশ হাজার মণ তুলা প্রতি বৎসর বিক্রয় করে। বিহার সরকারের উৎসাহে প্রায় দুই শতটি ইক্ষুর চাষীর সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এইসকল সমিতির সাহায্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিশ লক্ষ মণ আক বিক্রীত হইয়াছে। সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত বক্সী মহোদয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিহারের আকের সকল চাষী সমবায় সমিতিতে যোগ দিলে তাহারা বছরে পনর-বিশ লাখ টাকা বেশী লাভ পাইবে। কেন না এখন দালালেরা চাষীদের নিকট হইতে আক কিনিয়া কারখানার মালিক-দের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া ২৪ হইতে ৩০ লাখ টাকা প্রতি বৎসর লাভ করে। চাষীরা সমবায় সমিতিতে যোগ দিলে ওই টাকার মধ্যে নয়-দশ লাখ টাকা সমবায় সমিতির খরচ বাবদ রাখিয়া বাকী সব টাকাই তাহাদেরই ঘরে যাইবে। সমবায় সমিতিতে যোগ দিলে তাহারা নিজেরাই গাড়ি ভাড়া করিয়া সরকার হইতে নির্দিষ্ট দামে কারখানার মালিকদের কাছে আক বিক্রয় করিতে পারিবে। সমিতির কোনও সুদক্ষ চতুর সভ্য জিনিস লইয়া কারখানার কাছে উপস্থিত হইলে দরে ও ওজনে তাহাকে ঠকানো সহজ হইবে না।

কোনও ফসলের উৎপন্নকারীরা যদি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম হইতেছে যে, নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের আক, গম, তামাক প্রভৃতি যে কোনও একটি জিনিসের উৎপাদনকারীদিগকে সমিতির সভ্য করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শহরে কোনও ব্যাপারী বা বড় আড়তের গোমস্তা ওই জিনিস কিনিতে আসিলে তাহাকে বাধ্য হইয়াই সমবায় সমিতির শরণাপন্ন হইতে হইবে। যদি ওই জিনিসের অধিকাংশ উৎপাদনকারী সমিতির সভ্য না হয় তাহা হইলে ব্যাপারী অন্য লোকের নিকট সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের চেয়ে অল্প দামে জিনিস কিনিতে পারিবে। মনে কর রায়পুর, কৃষ্ণপুর ও হরিপুর নামে তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি আছে এবং প্রতি গ্রামে ত্রিশ জন করিয়া কৃষক মতিহারি তামাকের চাষ করে। কলিকাতার আড়তদারের এক গোমস্তা ওই গ্রামে তামাক কিনিতে যাইয়া দেখিল যে, নব্বই জন চাষীর সত্তর জন সমবায় সমিতির নিকট নিজ নিজ তামাক জমা দিয়াছে। সমবায় সমিতি স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পঁচিশ টাকা মণের কমে তামাক বিক্রয় করিবে না। গোমস্তা প্রলোভন দেখাইয়া অন্য বিশজন চাষীর নিকট যে পরিমাণ তামাক খরিদ করিতে পারিবে তাহাতে তাহার কাজ চলিবে না। সেজন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে সমিতির নিকট হইতে উক্ত দরে জিনিস কিনিতে হইবে। কিন্তু সত্তর জনের পরিবর্তে যদি মাত্র ত্রিশ চল্লিশজন চাষী সমিতিতে যোগ দেয় তাহা হইলে ব্যাপারী ও গোমস্তারা তাহাদের প্রয়োজন মত জিনিস সমিতির সভ্য ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিকটেও খরিদ করিতে পারিবে।

সমিতির সভ্যেরা যদি সমিতির নিকট জিনিস জমা না দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে জরিমানা করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পূর্বে যে সোনসেক সমিতির উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ওইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু চাষীরা নিজের নিজের স্বার্থ বোঝে বলিয়া কাহাকেও জরিমানা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্যাপারীরা ফসল কিনিবার আগেই টাকা ধার দেয় বটে; কিন্তু যত টাকা লিখাইয়া লয় তাহা হইতে শতকরা দশ টাকা সুদ বাবদ আগেই কাটিয়া লয়; তাহার পর ওজনও কম করিয়া করে। চাষীর টাকার বেশী প্রয়োজন। সেই জন্য সমবায় সমিতি হইতে বিঘা প্রতি সামান্য কিছু ধার দিলে ভাল হয়। চাষী যখন জিনিস জমা দিবে তখন ওই জিনিসের আনুমানিক মূল্যের সিকি বা অর্ধেক তাহাকে অগ্রিম দেওয়া কর্তব্য।

বাঙলা দেশে পাটের চাষীদের পাট বিক্রয় করিবার জন্য যে সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে সভ্যদের পাট একেবারে দাম দিয়া খরিদ করিয়া লওয়া হইত। এইরূপ করার ফলে সভ্যদের মনে হইত যে তাহারা নিজেদের ঘরে পাট বাঁধিয়া রাখিলে হয়তো সমিতি যে দাম দিতেছে তাহার চেয়ে বেশী দাম পাইত। আবার সমিতিও ইহাতে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; কেন না পাঁচমণী বস্তার দাম ছিল ১৯২৫ সালে এক'শ এগার টাকা ১৯৩১ সালে ওই প্রকারের গাঁট কলিকাতায় বিক্রয় হইয়া-ছিল ত্রিশ টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই দরে। পাট বিক্রয়ের সমবায় সমিতির এই অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা হইতেছে যে, সভ্যদিগকে জমা দেওয়া ফসলের জন্য পুরা দাম দেওয়া উচিত নহে। জিনিস জমা রাখিয়া রসিদ দিতে হয়। ওই রসিদ দেখাইয়া চাষী আনুমানিক মূল্যের অর্ধেক পর্যন্ত সমবায় সমিতির নিকট হইতে ধার পাইতে পারে। তাহার পর ফসল বিক্রয় হইয়া গেলেই ধারের টাকা কাটিয়া লইয়া সভ্যদের বাকী টাকা ফেরত দিতে হয়।

ফসল বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে হইলে সমিতির ভাল ও বড় গোলাঘর থাকা প্রয়োজন। ওইরূপ গোলাঘর তৈয়ারি করিবার জন্য সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা উচিত। সরকার ভাড়া বাবদ কিছু কিছু প্রতি বৎসর সমবায় সমিতির নিকট হইতে পরে আদায় করিয়া লইতে পারেন।

সকল সভ্যের ফসলের জাত যে একই রকমের হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। ধর কোথাও পাট বা আক বিক্রয় করিবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কত বিভিন্ন রকমের পাট ও আক উৎপন্ন হয়। সব রকমের জিনিস নির্বিচারে এক জায়গায় মিশাইয়া রাখিলে উহাতে ভাল দাম কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। এই জন্য সমবায় সমিতির কর্তব্য বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিস স্বতন্ত্র করিয়া রক্ষা করা। কোনও কোনও চাষী ভাল ফসলের মধ্যে মন্দ ফসল মিশাইয়া দেয়। যন্ত্রের সাহায্যে ভাল ফসল হইতে মন্দ ফসল বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল সতর্কতা অবলম্বন করিলে তবে সমবায় সমিতি সাফল্য লাভ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ে উপদেশ দিবার জন্য তিনজন প্রধান ও তিনজন সাধারণ কর্মচারী, একজন ফসলের শ্রেণী বিভাগের জন্য পরিদর্শক ও বারজন সহকারী নিযুক্ত করিয়া-ছেন। ইহারা কোথায় কি জিনিস কি দরে বিক্রয় হয়, কোথায় কিভাবে বিক্রয় করিলে ভাল দাম পাওয়া যায় সে বিষয়ে অনু-সন্ধান করিয়া কৃষকদের মধ্যে ওই সংবাদ প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; কোন্ জিনিসের কতটা পরিমাণ চাহিদা আছে তাহা বুঝিয়া চাষীদিগকে উৎপাদন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। বিহার সরকার একটি আইন করিয়া বাজারে চাষীদিগকে প্রতারণা করার উপায় বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে গোলাঘর স্থাপন করিবার জন্য ও ফসলের শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করা হইতেছে। কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার হইলে এবং সরকার বাহাদুর তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাইবে বলিয়া ভরসা হয়।

# গাঁয়ের মায়া

**(বড় গল্প)**

**শ্রীমনীন্দ্রকুমার দত্ত**

[এ গল্পটি একটি চিত্রকাহিনীর চুম্বক (Synopsis)। সিনেমার কর্তৃপক্ষের নিকট কি ভাবে গল্প উপস্থিত করা হয় তার ধরনটা এ থেকে বুঝতে পারা যাবে। এগুলি কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করবার সময় লেখককে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

(১) ভাষার পারিপাট্য যেন গল্পের ছবি বা ঘটনা থেকে মনকে সরিয়ে না নিয়ে যায়। এই জন্যই ভাষার উপর জোর না দিয়ে অক্ষরের পিছনের ছবিগুলিকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়। তবে গল্পের ধারা ও ভাবের সঙ্গে ভাষার গতি ও ছন্দের মিল রাখবার প্রয়োজন থাকে। যেমন, এ গল্পটি; দরিদ্র ছোট জাত ব'লে পরিচিত বাগদীদের ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে। এদের আড়ম্বর নেই, ঐশ্বর্য নেই। তবু এদেরও আছে সহজ চঞ্চল ছোট পল্লীনদীটির মত কুলকুলু হাসিকান্না, সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা। এদেরও আছে অভাব অভিযোগ। আমাদের অবজ্ঞার দরুণ এরা ভিতরে ভিতরে যেমন নিজেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তেমনি ক্ষয় করে দিচ্ছে বাঙলার শক্তি, বাঙলার সম্পদ, বাঙলার সুখ। গল্পের এই সহজ জীবনের অনাড়ম্বর ধারা যাতে ভাষার ভঙ্গীতে অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ গল্পের গল্প-সম্পদ, গল্পের ঘটনা-বৈচিত্র্য, গল্পের গল্প-রস ছবির মধ্য দিয়ে কি ভাবে ফুটে উঠবে তা যেন পাঠকমাত্রই সহজে বুঝতে পারেন।

(২) অনেকেই সিনেমার জন্য গল্প পাঠাতে গেলে ঘন ঘন চিত্রনাট্যের টেকনিক্যাল ব্যবচ্ছেদগুলি (fade out, fade in, dissolve প্রভৃতি) ব্যবহার ক'রে থাকেন। তাতে পড়তে গেলে প্রতি পদে গল্পের নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি বুঝতে অসুবিধা হয়। টেকনিক্যাল ব্যবচ্ছেদ করবেন চিত্রনাটককার, গল্পলেখক নন।

(৩) ছবি তৈরী হয়ে যাবার পর যে পুস্তিকা সিনেমা হাউসে বিক্রয় হয়, সেগুলোকে কেউ যেন গল্পের চুম্বক (Synopsis) মনে না করেন। সেগুলি গল্পের সংক্ষিপ্তসার মাত্র।]

পাইকডাঙ্গা গ্রাম বলতে এখন বোঝায় অসংখ্য প'ড়ো ভিটে আর তারই শেষে খালের ধারে ছোট্ট একটা বস্তি। খুব বেশী তো দশবার ঘর লোকের বাস।

বনবাদাড়ে ঘেরা প'ড়ো ভিটেগুলোর ভিতর দিয়ে পায়ে চলা যে পথটি এঁকেবেঁকে বস্তির দিকে চ'লে গেছে সে পথ দিয়ে যেতে যেতে গ্রামের পুরনো দিনের সমৃদ্ধির কথা মনে পড়ে কি না জানি না, তবে নারান কাজের শেষে বাড়ি ফেরবার সময় গুণ গুণ ক'রে যে গানটি সহজ মেঠো সুরে গাইছিল, সে গানে ব্যথার ছোঁয়াচ লাগে।

নারানের আগে আগে হেঁটে চলেছে একজোড়া বলদ, কাঁধে জোয়াল। নারানের বাঁ কাঁধে একখানা টাঙ্গির সঙ্গে ঝুলছে একখানা ছোট্ট মই, একগোছা দড়ি, আর হাতে ঝুলছে হুঁকো কল্কে আর হুঁকো ধরাবার জন্য খড়ের নুড়ো। ডান কাঁধে একরাশ শালুক ফুল, লাল নীল শাদা। ডান হাতে গরু তাড়াবার ছোট্ট পাচনবাড়ি।

রাস্তার এক ধারে একটা প'ড়ো বাড়ির উঠনে একটা মরা গাছ। একটা লোক পাশের ডোবা থেকে মাটির কলসী ক'রে জল এনে ঢালছে তার তলায়। লোকটির নাম ভগতদাস।

অনেকদিন আগে তার ছোট বোন আদুরী এই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। করুণ সে কাহিনী। গাঁয়ের তখন সমৃদ্ধি ছিল। গাঁয়ের ডাকাতে কালীর পুজোয় শহর থেকে এসেছিল এক যাত্রার দল। তারই নায়ক মুগ্ধ করে এই সরলা বালিকাকে। একদিন ভোরবেলা দুজনকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারও প্রায় এক মাস পরে বাপের ভিটেয় ফিরে এসে হতভাগিনী আত্মহত্যা করল এই গাছতলায় গলায় দড়ি দিয়ে।

সেই থেকে ভগতদাস পাগল। রোজ সে এই মরা গাছটার গোড়ায় জল দেয়। গাঁয়ের মোড়ল ভৈরব সড়কীর মরা গাঁটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার মতই এ চেষ্টাও বাতুলতা। তবু ভগতের কাজে এক দিনও কামাই হয় না।

ভগতদাস নারানের ভগ্নীপতি। যেতে যেতে নারান গাছটার কাছে দাঁড়াল। গাছটাকে গাঁয়ের লোক বলে ফাঁসি গাছ। যেতে আসতে প্রণাম ক'রে যায়। নারানও প্রণাম করল। তার পর ভগতদাসকে বলল, "চল্, বাড়ি যাই"। ভগতদাস একবার শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চলল জল আনতে।

নারান একটু অপেক্ষা ক'রে চলতে সুরু করল। মুখে গুন গুন করছে গানটী। প'ড়ো ভিটেগুলো পেরিয়ে খাল-ধারের পথ ধ'রে বাড়ির দিকে যেতে যেতে দেখল একটা ছোট্ট মেয়ে একপাল হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। তাকে একটা ফুল দিয়ে, রাসু বাগদীর কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে, গাঁয়ের পুরোত গোঁসাই ঠাকুরের সঙ্গে তার ব্রাহ্মণীর ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে, মোড়লের মেয়ে সুভদ্রার খোঁজ করতে গিয়ে গ্রাম সুবাদে বউদি নফরার বৌএর ঠাট্টায় নাজেহাল হয়ে সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই বিন্দীর উপর হুকুমজারি হ'ল, "তামাক সাজ্।"

বিন্দী নারানের ছোট বোন, ভগতদাসের স্ত্রী। বিন্দী আর তার পাগল স্বামী ভগতদাস নারানের সংসারেই থাকে।

নারানের ডাক শুনে বিন্দী দাওয়ায় এসে দেখলে নারান গোয়ালঘরের সম্মুখে একগাদা শালুক ফুল রেখে গরুগুলোকে বাঁধছে। ফুলগুলো যে মোড়লের মেয়ে সুভদ্রার জন্য এসেছে তা বুঝতে বিন্দীর দেরি হ'ল না। সে তাই কোনও কথা না ব'লে লুকিয়ে ফুলগুলো নিয়ে ঘরের ভিতর চ'লে গেল।

বোনের এই চুরি নারানের দৃষ্টি এড়ায় নি। সে চুপ ক'রে গেল, কারণ ইতিমধ্যেই সে লক্ষ্য করেছে উল্টো দিক থেকে সুভদ্রা ছুটতে ছুটতে আসছে। সুভদ্রা এসে গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়াতেই নারান হাঁক দিলে, "ওরে বিন্দী, রামনাম কর্, রামনাম কর্, শাঁকচুন্নী এসেছে।"

নারান সুভদ্রাকে আদর ক'রে শাঁকচুন্নী বলে ডাকে! সুভদ্রা কিন্তু আজ এসব কথায় মোটেই কান দিলে না, গম্ভীরভাবে শুধু তার শালুক ফুলগুলো দাবি করল। নারান অত্যন্ত ভাল ছেলের মত জানাল, বিন্দী তুলে রেখেছে। ঘরের দিকে যেতে যেতে সুভদ্রা শাসিয়ে গেল, ফুল না পেলে সে সত্যিই শাঁকচুন্নী হয়ে নারানের ঘাড় মটকাবে। নারানও হেসে জবাব দিল, এমনিই সে কোন্ কম করছে।

ঘরে ঢুকেই সুভদ্রা ফুল চাইলে বিন্দীর কাছে। বিন্দীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে প্রশ্ন করল, সুভদ্রা নারানের কে যে নারানের ফুল সুভদ্রার হবে? সুভদ্রা কেবলই প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে লাগল; কিন্তু বিন্দী সখীকে ছাড়বে কেন।

সুভদ্রা শেষে রেগে গিয়ে বললে, সে নারানের শাঁকচুন্নী। ভাল কথায় ফুল না দিলে সে বিন্দী পোড়ারমুখীর ঘাড় মটকাবে।

নারান দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দুই সখীর ঝগড়া দেখে। তার পর ফোড়ন দেয়, "নারদ, নারদ।"

এমনি হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়েই তারা তাদের সহজ জীবন উপভোগ করে। শত সহস্র দুঃখের ভিতর যেখানে যেটুকু আনন্দ আছে, তা যেন নিংড়ে নিতে চায়।

একটু বাদেই এসে হাজির হ'ল নিলুখুড়ো, গাঁয়ের ডাকাতে কালীর পুজারী। গাঁজার কল্যাণে সব সময়েই তার চক্ষু রক্তবর্ণ। কল্কেটি তার কাছছাড়া হয় না কোনও সময়। সব কাজেই তার সমান উৎসাহ। মন্দিরে কালী পুজোও করে এবং প্রয়োজন হ'লে লাঠি ধরতেও জানে।

ক্রমে গ্রামের অন্যান্য যুবকরা এসে একত্র হয়। তারা কোথায় মাছ চুরি করতে যাবে ঢেঁকিঘরে ব'সে তারই পরামর্শ চলে। সুভদ্রা আড়ি পেতে তাদের পরামর্শ শোনে। তার মাথাতেও কি যেন একটা মতলব খেলে যায়।

অনেক রাত্রি। খুব অন্ধকার না হ'লেও অন্ধকার। নারানের দল নৌকো নিয়ে খালের ভিতর দিয়ে এসে হাজির হ'ল গড়ানের ধারে। গড়ানের ওপাশে একখানা জেলে ডিঙ্গি, একটা লোক তাতে শুয়ে ঘুমচ্ছে। নৌকোর ছোট্ট কেরোসিনের আলোটার ছায়া পড়েছে জলে। খালের ধারে একটা চালায় শুয়ে জনকয়েক জেলে। চালার ধারে বড় বড় বাঁশের সঙ্গে কতগুলো জাল শুকতে দেওয়া আছে।

দলের সবাই মিলে নানারকম পরামর্শ করবার পর নারান জলে নামল একটা কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে। তার পর জেলেরা ঘুমচ্ছে দেখে নৌকোর দড়ি কেটে দিয়ে টেনে নিয়ে দূরে বেঁধে দিয়ে এলো। ততক্ষণে দলের সবাই তার ইশারা অনুসারে মাছ চুরি করতে শুরু করেছে।

মাছ চুরি শেষ ক'রে তারা সবে নৌকো ছেড়েছে এমন সময় দূরের ডিঙ্গির জেলেটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চীৎকার ক'রে উঠতেই আর সবাই জেগে উঠে নারানের দলকে তাড়া করল। একদল জলে, একদল ডাঙ্গায়। প্রায় একটা খণ্ড-যুদ্ধবিশেষ। একটু এগিয়ে গিয়ে নারানের দল একটা ধান ক্ষেতের ভিতর নৌকো ঢুকিয়ে নিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল. জেলেরা তার কোনও হদিসই পেল না।

দলটি যখন গাঁয়ে এসে পেঁছিল তখন তাদের দেখে মনে হ'য় যেন দেশ জয় ক'রে ফিরছে। প্রত্যেকের হাতেই বড় বড় মাছ। সমস্বরে গাইতে গাইতে তারা চলেছে একটা বাঁশ-বনের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ দেখা গেল তাদের সামনে একটা বাঁশগাছ নুয়ে এসে প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার উঠে গেল, আর তার উপরে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢেকে এক পেতনী বলছে, "মাছ দে।" ভয়ে সবাই রাম নাম জপতে লাগল। কালীর পুজারী নিলু ঠাকুর নানারকম ধুলোপড়া দিয়েও বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারল না। পেতনী একই কথা ব'লে চলেছে, "মাছ দে", মাছ না দিলে সে পথ ছাড়বে না।

সবাই যখন বেশ ভয় পেয়ে গেছে তখন কিন্তু বাঁশবনের পেতনী একটা ভুল ক'রে বসল। দলের অবস্থা দেখে সেটা ক'রেও হাসি চাপতে না পেরে সে একবার সহজ গলায় হেসে ফেলল। কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে খোনা সুরে আবার তার দাবি জানাতে লাগল।

আর সকলের কান এড়িয়ে গেলেও নারান কিন্তু হাসি শুনেই টের পেয়েছিল যে গাছের উপরে সর্দারের আহ্লাদী অর্থাৎ তার শাঁকচুন্নী সুভদ্রা ছাড়া আর কেউই নয়। কাজেই সে কোন কথা না ব'লে বাঁশ গাছে হাতের টাঙ্গিটা দিয়ে কোপ লাগালে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ-বনের পেতনীর সুর গেল বদলে। সে চেঁচাতে সুরু করল প'ড়ে যাবার ভয়ে। আর নারান ভেংচাতে লাগল তার খোনা সুরের নকল ক'রে —"মাছ নিবিঁনি?"

এমন সময় একটু দূরে মোড়ল ভৈরব সড়কীর গলা শোনা গেল। একটু যেন গোলমাল চেঁচামেচি চলেছে। সবাই রওনা হ'ল সেদিকে।

মোড়ল ভৈরব সড়কী বৃদ্ধ. বয়সের চাপে একটু কুঁজো। হাতে তার বাপের আমলের তেলে পাকানো পিতল ও রুপো দিয়ে বাঁধানো সড়কি।

ভৈরবের চীৎকার থেকে জানা গেল, তারিণী মোড়লের চোখে ধুলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে ছেলে-বউএর হাত ধ'রে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মোড়ল আগে থেকে খবর পেয়ে তাকে ধরে ফেলেছে।

তারিণী দুস্থ চাষী। তার যা জমিজমা অবশিষ্ট ছিল কিছুদিন আগেই জমিদারের লোক বাকী খাজনার বাবদে নিলাম ক'রে নিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা দুস্থ পরিবারের মত তাই সে চলেছিল শহরের চটকলে চাকরির আশায়। মোড়ল জানতে পারলে কাউকে গাঁ ছেড়ে যেতে দেয় না, তাই সে রাত্রের অন্ধকারের আশ্রয় নিয়েছিল।

মোড়ল বলে, জমি না হয় জমিদার নিলাম ক'রেই নিয়েছে, তা ব'লে বাপপিতেমোর ভিটে ছেড়ে তারিণী চ'লে যাবে কোন্ যুক্তিতে?

তারিণী কেঁদে ফেলে, বলে, "নসিব।"

তার চোখের জল দেখেই সর্দারের কথার সুর বদলে যায়। তাকে বোঝায়, "গাঁয়ে থাকলেও যে নসিব, শহরে গেলেও তো সেই নসিব।"

নারান আপত্তি জানায়। বলে, তারা পাইকের বংশধর। পাইকের ছেলে হয়ে কি তারিণী ভিক্ষে করবে? তার পর মোড়লের দিকে তাকিয়ে বলে, "জানি, তোর যদ্দিন খাবার জুটবে, গাঁয়ের কেউ উপসী থাকবে না। তবু তো সে ভিক্ষে।"

মোড়ল চীৎকার ক'রে ওঠে। বলে, "ভিক্ষে? তারিণী আমায় জ্যাঠা বলে না! বল্ হারামজাদা, বল্ তুই আমাকে জ্যাঠা বলিস কি না?"

অকাট্য যুক্তি মোড়লের। তারিণী যখন তাকে জেঠা বলে, তখন সে কিছু দিলে তা ভিক্ষে হয় কি ক'রে? তবু নারানের দল সে যুক্তি মেনে নিতে চায় না। ভৈরবকে অনুযোগ জানায়, যেদিন নায়েব এসে তারিণীর জমি দখল নেয়, সেদিন শত অনুরোধেও ভৈরব বাধা দেবার হুকুম দেয় নি।

জমিদারের লোককে বাধা দেবার কথা শুনেই মোড়ল আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সবাইকে জানিয়ে দেয়, পাইক-ড়াঙ্গার পত্তন করেছে চৌধুরী জমিদার। ভৈরব বেঁচে থাকতে কোনও রকম বেইমানি সে হ'তে দেবে না। আর গাঁ ছেড়ে কেউ চলে যাবার চেষ্টা করলে মোড়ল তাকে খুন করবে।

তারিণী ভয় পেলেও নারান এতে ভয় করে না। সে সকলের অগোচরে তারিণীকে ভরসা দেয়, সর্দারের এলাকার বাইরে সে তাকে পেঁছে দেবেই। আর তারিণীও জানে ভরসা দেবার ক্ষমতা যদি কারও থাকে তবে তা একমাত্র নারানেরই আছে।

দুপুরবেলা, মাঠে মাঠে লাঙ্গল চলেছে। এক হাঁটু জল। তার ভিতর গাঁয়ের ছেলেরা কাদা মেখে ভূত সেজে লাঙ্গল চালাচ্ছে রোয়া গাড়বে ব'লে। নারান, গণশা, কেশো সবাই দলে আছে। নানারকম শব্দ ক'রে গরুগুলোকে বিচিত্র সম্বোধন করতে করতে তারা সার বেঁধে চলেছে। তার মাঝেই তাদের হাসি মসকরা চলে, আর তা নারান আর সুভদ্রাকে নিয়েই বেশী।

দুপুর এলিয়ে পড়ে। লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে গরুগুলোকে নিয়ে সবাই খালের জলে গিয়ে নামে। নিজেরাও চান করে, গরুগুলোকও চান করায়। খালের জল তাদের দাপটে তোলপাড় হয়ে ওঠে।

গাঁ থেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বউ গামছায় খাবার বেঁধে নিয়ে আসে চাষীদের জন্যে। তাদের দলে সুভদ্রা আর বিন্দীও আছে।

সুভদ্রার বাড়ির কোনও চাষী সেখানে ছিল না, সে খাবার এনেছিল নারানের জন্য। কিন্তু বিন্দী ও অন্যান্য চাষীদের ভয়ে সে কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না সে কথা।

কিন্তু ঠাট্টা তাতে কমে না একটুও। সুভদ্রা খুব রেগে গিয়েও শেষে হেসে ফেলে। একটি ছেলে তার হাত থেকে খাবারটা কেড়ে নিয়ে সবাইকে ভাগ ক'রে দেয়, নরানকে দেয় সব চেয়ে বেশী। বলে, তার জন্যই তো সুভদ্রা এনেছে। হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে তারা খেতে থাকে।

দূর থেকে দেখা গেল ভৈরব মোড়ল একটি জীর্ণ শীর্ণ লোককে নিয়ে খালের উপর দিয়ে আসছে। কাছে এসে মোড়ল বললে, ভাগ্যিস সে খেত দেখতে বেরিয়েছিল তাই পথে হঠাৎ তিনকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তিনকু দাগী চোর। এই গাঁয়েই তার বাড়ি। সংসারে তার কেউই নেই। বছর পাঁচেক আগে সে তৃতীয়বার ধরা প'ড়ে জেলে যায় পাঁচ বছরের মেয়াদে। গাঁয়ের লোক তাকে প্রায় ভুলেই গেছে।

তারিণী গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছে মোড়ল সে কথা ভুলতে পারে নি। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না তখন মোড়লের হঠাৎ মনে পড়ল তিনকুর মুক্তি পাবার সময় হয়েছে, তাই শহরে গিয়ে তাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছে। চোর হ'লেও তিনকু তো এই গাঁয়েরই লোক, গাঁয়ে একজনও তো তবু লোক বাড়বে!

একথা কিন্তু মোড়ল স্বীকার করতে রাজী নয়। এবং সেই সত্যি কথাটা লুকবার চেষ্টায় যে বিবৃতি সে দিল, তাতে, পদে পদে গোলমাল ধরা পড়তে লাগল, বিশেষ ক'রে তার মেয়ের কাছে। তবু এ নিয়ে কেউ তর্ক করল না। মোড়ল বুঝল ছেলেরা বুঝতে পেরেছে সে নিজে গিয়ে তিনকুকে নিয়ে এসেছে। ছেলেরাও বুঝল সত্যি ব্যাপারটা। তবু অভিনয়, এবং তা দুই পক্ষেরই।

সেদিন রাত্রিবেলা সবাই এসে একত্র হ'ল ডাকাতে কালীর মন্দিরে। ঠিক করা হ'ল তিনকু জনমজুর খাটবে সর্দারের বাড়িতে থেকে। তবু সর্দার তার জন্য সিঁদকাঠি গড়িয়ে এনে উপহার দিল—তিনকুর জাতব্যবসা যে! তার কল্যাণে মন্দিরে পূজা দেওয়া হ'ল।

তার পর তিনকু সবাইকে শোনায় তার চুরির গল্প, জেলের গল্প। মুগ্ধ হয়ে শোনে সবাই, যেন একজন যোদ্ধার দেশ জয়ের ইতিহাস। তার পর মোড়ল এবং দু'চারজন বৃদ্ধ ছাড়া একে একে সবাই উঠে পড়ে।

নারান মজলিস থেকে এসে সোজা হাজির হ'ল প'ড়ো ভিটেগুলোর মাঝখানে একটা তালপুকুরের ঘাটে। একটু পরে দেখা গেল সুভদ্রাও এসেছে। আগে থেকেই তাদের কথা ছিল।

নারান সুভদ্রাকে জানাল, আজ ঠাট্টা নয়, বিশেষ জরুরী কথা আছে। সুভদ্রাও খুব গম্ভীর হয়ে বসল জরুরী কথা শুনতে। কিন্তু নারানের বলা আর হয় না। হাসি, ঠাট্টা, ঝগড়া, মারপিট, এ সব সে করতে পারে। কিন্তু গম্ভীর ভাবে একটি মেয়েকে বিয়ের কথা বলা, এ তার বড় অসুবিধা। একটু ইতস্তত করে দুবার ঢোক গিলে সে উঠে গিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে এল। হয়তো ঝোঁকের মাথায় সে তখন কথাটা ব'লে ফেলতে পারত, কিন্তু সুভদ্রা সব গোলমাল ক'রে দিলে। বললে, "কাজের কথা না? দাঁড়াও।" ব'লে সেও গিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে এসে সোজা হয়ে ব'সে বললে, এইবার বল্।"

অনেক রকম চেষ্টা করবার পর নারান জানাল, বিন্দী বলেছে আর মাঠে খাবার নিয়ে যেতে পারবে না।

খুব বিপদের কথা। সুভদ্রা নানারকম চিন্তা ক'রে খুব গম্ভীরভাবেই পরামর্শ দিল এ ক্ষেত্রে নারানের বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় নেই।

নানা কথার ভিতর দিয়ে যখন নারান জানাল যে সুভদ্রার মত জানতেই সে তাকে ডেকেছে তখন সুভদ্রা পরিষ্কার জবাব দিল যে সে নারানকে বিয়ে করবে না। কারণ বিয়ে হ'লেই নারান শহরে চ'লে যাবে। নারান তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে গাঁয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। একটি পেট তাই সে ভাল ক'রে চালাতে পারে না, বিয়ে হলে তো অসম্ভব।

আর গাঁয়ে সে থাকবেই বা কেন। দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে নিশ্চিত মরণের জন্য অপেক্ষা করার কোনও

অর্থ থাকতে পারে না। তার চেয়ে শহরের চটকলে কাজ করলে দু বেলা পেট ভ'রে খেতে পারবে। আর গাঁয়ে যাদের আর জনমজুর খাটবার বয়েস নেই তাদেরও হয়তো দরকার মত সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সুভদ্রা বোঝে না! কাজেই ব্যাপারটি দাঁড়ায় ঝগড়ায়।

নারান রাগের মাথায় জানিয়ে দিলে, সুভদ্রা তাকে বিয়ে না করলেও সে গাঁয়ে থাকবে না। সুভদ্রাও জানে সে সঙ্গী না হ'লে নারান কিছুতেই গাঁ ছেড়ে যেতে পারবে না। জানে ব'লেই তাচ্ছিল্যের সুরে ঠোঁট উলটে শুনিয়ে দেয়, তাতে নাকি তার বয়েই যাবে।

নারান খেপে গিয়ে সুভদ্রাকে এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিয়ে চলতে লাগল।

পুকুরটার ধার দিয়েই গাঁয়ে যাবার পথ। সে ঘুরে যেই ও-পাড়ে গেছে, হঠাৎ একতাল কাদা এসে তার গায়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রার হাসি। সে হাসতে হাসতে পুকুরে নেমে ডুব দিল। নারানও একটু ভেবে নিয়ে পুকুরে গিয়ে নামল। তারপর কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে সুভদ্রাকে ধরে ফেললে। মাঝ পুকুরেই তাকে শাসাতে লাগল, "বল বিয়ে করবি কি না"!

সুভদ্রাও রাজী হবে না—নারানও ছাড়বে না। সুভদ্রা তাকে বিয়ে করতে রাজী না হ'লে সে সুভদ্রাকে আজ জলে ডুবিয়েই মারবে।

হঠাৎ সুভদ্রার কান খাড়া হয়ে উঠল। দূরে থেকে শোনা গেল মোড়ল ও অন্যান্য বৃদ্ধেরা কথাবার্তা বলতে বলতে কালীবাড়ি থেকে ফিরছে। সুযোগ বুঝে সুভদ্রা আচমকা একটা আর্ত চীৎকার ক'রে উঠল। মোড়লের দল থেকেও একটা সাড়া পাওয়া গেল। থতমত খেয়ে নারান সুভদ্রার হাত ছেড়ে দিল! সুভদ্রার মুখে তখন একমুখ হাসি,—"কেমন জব্দ!"

সংকুচিত নারান অনুরোধ জানায় "বলিস নি"।

সুভদ্রা বলে, "বলবই তো!" তার পর আবার চীৎকার। নারান উপায় না দেখে সাঁতরে ওপারে গিয়ে একটি ঝোপের আশ্রয় নিল। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে, সুভদ্রা না জানি কি কেলেঙ্কারি করে।

সবাই যখন নিকটে এল তখন অতি ভাল মেয়ের মত চোখদুটো ছানাবড়া ক'রে সুভদ্রা জানাল, সে ঘাটে পা ধুচ্ছিল, হঠাৎ একটা ভূত এসে তাকে পা ধ'রে টেনে একদম মাঝ পুকুরে। সবাই সুভদ্রাকে ধমকাল দুপুর রাতে পুকুরে আসার জন্য। এ পুকুরে যে ভূতের দৌরাত্ম্য তা ত সকলেই জানে।

ঝোপের ভিতর থেকে নারান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

(ক্রমশ)

---

# পথ

**সমীর ঘোষ**

অনেকদিন, অনেক রাত কাটিল ঘরে ঘরে
এবার পথ! তোমার বুকে এনু;
অনেকদিন, অনেক রাত, বরষ বহু পরে
লাগিল চোখে উজল আলো রেণু!
আকাশ বহি রঙের মেলা, লালের খেলা চলে
শুভ্র মেঘ রাঙিয়া ওঠে ধীরে
দিগ্‌বলয়ের নীলের আভা নদীর কালো জলে,
তীরেতে উঠে ঝলকি ফিরে ফিরে!
ওপার-বনে এমন ক্ষণে আপন মনে পাখী
মগন রহে সবুজ গানে গানে;
কিন্তু আমি চলেছে ভাবি আমায় কেবা ডাকি'
আনিল টানি এমন অভিযানে!
দেয়াল দিয়া ঘেরিয়া ঘর তাহার বুকে রহি
কেটেছে কত অজানা মাস, দিন,
কখনো বটে খেয়াল বশে কি জানি আশা বহি
জানালা খানি খুলেছে উদাসীন!
হয়তো তখন সূর্য্য ওঠে, হয়তো ওঠে চাঁদ
শুকতারকা হয়তো চলে যায়;
শালবনীতে বাতাস কাঁপে—নামিল অবসাদ
দোয়েল শ্যামা দিল না শিশ্ হায়!
এমনকালে জানালা খুলে দেখিনু কারে জানো?
সকল ক্ষণে তোমায় ওগো পথ!
দূরে পাইনের গন্ধ দিয়ে আমায় টানো টানো
ঝর্ণাধারা কোথায় পর্বত?
ছোট্ট নদী চলেছে বহি শহরতলী শেষে
সেই সীমানা পারিয়ে যাবো আজ—
হে পথ! মোরে ডাক দিয়েছো আজকে তুমি হেসে
ফুরালো তাই ঘরের সকল কাজ!
অনেকদিন, অনেক রাত, ছন্দহোল হীন—
সহসা আজ রাতের অস্তাচল
তোমার সাথে মিতালী করি আনিল নব দিন—
হে পথ! আমি হোয়েছি চঞ্চল!
তোমার বুকে অনেকদিন, অনেক রাতি পর
আকাশপটে দেখিবো তারাদল;
এগিয়ে চলো হে চঞ্চল! পিছনে ফেলি ঘর
হে পথ! এসো তুলিবো কোলাহল!

# মানবসভ্যতায় "অহিংসা"র স্থান

**শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার**

মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন পূর্ব্বে "প্রত্যেক ব্রিটেনের প্রতি" এই শিরোনামা দিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পত্রখানি তিনি ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধির মারফৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার একটা উত্তরও বড়লাটের মারফৎ গান্ধীজীকে দিয়াছেন। তাঁহারা সৌজন্যসহকারে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মহাত্মাজীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাঁহারা অক্ষম।

সমগ্র ইউরোপ যখন নাজীবাহিনীর পদভরে টলমল, সমুদ্র পরিখাবেষ্টিত ব্রিটেন হিটলারের বিমান বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবনে ব্যাপৃত, তখন ব্রিটিশ জাতির নিকট অস্ত্র ত্যাগের জন্য প্রস্তাব করা বর্ত্তমান জগতে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব। অন্য কেহ এরূপ প্রস্তাবের কথা কল্পনাই করিতে পারিত না। কল্পনা করিতে পারিলেও, তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে সাহস পাইত না, অন্ততপক্ষে দ্বিধা-বোধ করিত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সাধারণ মানব নহেন, অসাধারণ মানব। অসাধারণ মানবেরাই অসাধারণ প্রস্তাব করিতে পারেন। অনুরূপ অবস্থায় বুদ্ধ, খৃষ্ট বা চৈতন্যও খুব সম্ভব ঐরূপ প্রস্তাবই করিতেন। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে জবাব দিয়াছেন, কোন সাধারণ মানব, রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্টও উহা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উত্তর দিতে পারিতেন না।

মহাত্মা গান্ধী কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটই এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই, ভারতের গণশক্তির প্রতিনিধি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিকটও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ কারণেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মাজী চীন, আবিসিনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতিকেও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা উহা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই।

মহাত্মাজী বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানবরূপে বন্দিত। সুতরাং তাঁহার এই প্রস্তাবটি বড়লোকের খেয়াল বা পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বস্তুত, মহাত্মাজী তাঁহার প্রস্তাবের মধ্য দিয়া যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মানব-সভ্যতার একটা জটিল প্রশ্ন, উহার উপর মানবসভ্যতা তথা মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্যও এই প্রশ্নই তুলিয়া মানবসভ্যতাকে ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সফলকাম হন নাই, মহাত্মাজীও সফলকাম হইবেন না। তথাপি প্রশ্নটি রহিয়া যাইবে এবং অনাগত ভবিষ্যতে অন্য কোন মহাপুরুষ আসিয়া উহার সমাধানের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্নটি এই,—মানুষ কি "হিংসা" ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে 'অহিংসার' আদর্শের দ্বারাই জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে? লোকরক্ষা, সমাজস্থিতি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা—সমস্তই কি অহিংসা ও মৈত্রীর দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর? মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন, তাহা সম্ভবপর। সমাজ-স্থিতি রক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সমস্তই অহিংস উপায়ে করা যাইতে পারে এবং সভ্য মানুষকে তাহাই করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামও তিনি এই অহিংস উপায়ে চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, হিংসা ও বলপ্রয়োগ মানুষের পশুত্ব ও বর্ব্বরতার নিদর্শন। আদিম বর্ব্বর মানুষের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিতেছে, ততই সে অধিক পরিমাণে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে। পৃথিবীতে যে সব প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলিও অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শেই অনুপ্রাণিত। আদিম বন্য বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ গায়ের জোর ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মিটাইতে জানিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি যতই উন্নত হইয়াছে, ততই সে গায়ের জোরের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও চরিত্রবলের আশ্রয় লইয়াছে; প্রেম ও অহিংসাকেই উচ্চতম নীতি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। নরমাংস ভক্ষণ, নিহত শত্রুর মাথার খুলি লইয়া গলায় মুণ্ডমালা ধারণ, শত্রুর রক্তপান প্রভৃতি আদিম যুগের প্রথা—সভ্য মনুষ্যসমাজে লোপ পাইয়াছে। মানুষ পরিবার ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অথচ আদিম বর্ব্বর যুগের নিদর্শন, যুদ্ধটাই শুধু টিকিয়া থাকিবে কেন? সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাও বিলুপ্ত হওয়া উচিত। নতুবা আদিম বন্য মানুষ ও সভ্য মানুষে প্রভেদ রহিল কি?

যুক্তির দিক দিয়া কথাগুলি আপাতত নির্ভুল বলিয়াই মনে হয় বটে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, objective reality বা বাস্তব সত্যের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। মানবসভ্যতার একটা বড় ট্রাজেডি এই যে, মানুষ বুদ্ধি ও মেধার দিক দিয়া যেরূপ উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া তদনুপাতে উন্নত হয় নাই, বরং অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস লেখক জনৈক মনীষী এজন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের মানবের বুদ্ধি ও মেধা তীক্ষ্ণতর হইয়াছে, জ্ঞানবিজ্ঞানে সে উন্নত হইয়াছে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া নানা অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া, প্রেম ও অহিংসার মাপকাঠিতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মনুষ্য সমাজের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের মানুষের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মানুষ ঠিক সেইরূপ নিষ্ঠুর, হিংস্র, ঈর্ষাপরায়ণ, পরধনলোভী, দুর্ব্বল-পীড়কই আছে। তারপর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে মানুষ যেটুকু-বা সত্য, অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতির নীতি রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেটুকুও করে না। এখানে মানুষ একেবারে আদিম যুগের বন্য, বর্ব্বর, হিংস্র। বরং আদিম যুগের মানুষের তুলনায় বুদ্ধি ও মেধায় উন্নত হওয়াতে তাহার ক্রূরতা ও হিংস্রতা আরও বেশী ভয়ঙ্কর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সে প্রতিবেশীর সংহার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে, প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুর হইতে যে সব অত্যাশ্চর্য্য রহস্যের সে সন্ধান পাইয়াছে, তাহার দ্বারা শক্তিশালী মারণাস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিতেছে। অর্থাৎ তথাকথিত সভ্য, উন্নত মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বনাশী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ছিন্নমস্তার ন্যায় সে নিজের রুধির নিজেই পান করিয়া পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বুদ্ধির দ্বারা শাণিত এই প্রতিযোগিতামূলক হিংসার খেলায়, অথবা বৈজ্ঞানিক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে যদি মহাত্মা গান্ধীর মত দুই একজন আদর্শবাদী মহাপুরুষ অহিংসা ও প্রেমের জয়গান করেন, তবে কে তাঁহাদের কথা শুনিবে? অহিংসা ও প্রেমের আদর্শে প্রতি যদি কোন মানুষের, সমাজের বা রাষ্ট্রের শ্রদ্ধা থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা কিরূপে সে আত্মরক্ষা করিবে? একজন বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধী প্রেম ও অহিংসার আদর্শের জন্য পশুবলের নিকট আত্মবলি দিতে পারেন, কিন্তু একটা জাতি বা রাষ্ট্র কিরূপে তাহা করিতে পারে? মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবমত যদি কোন জাতি বা রাষ্ট্র হিংসার ভাব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, অস্ত্রত্যাগ করিয়া

আততায়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে হয় সেই জাতি বা রাষ্ট্র আততায়ী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে, অথবা দাসজাতি বা দাসরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। অহিংসার জন্য এই আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনাসক্ত মহাত্মা গান্ধী পুলকিত হইতে পারেন, কিন্তু কোন জাতি বা রাষ্ট্রই ঐভাবে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া প্রেম ও অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইতে পারে না। সেই কারণেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁহার প্রস্তাবে সায় দেন নাই। কেবল আততায়ী জাতি বা রাষ্ট্রের সম্পর্কেই নয়, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। অহিংসা ও প্রেমের আদর্শ রক্ষার জন্য কোন রাষ্ট্রই চোর, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট আত্মসমর্থন করিতে পারে না।

মোট কথা, যতদিন পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র অহিংস না হইয়া উঠিতেছে, ততদিন মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা ও বলপ্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ, বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করা যায়, ইহা বাস্তব জগতের পরীক্ষিত সত্য। প্রেম ও অহিংসার দ্বারা হিংসা ও পশুবলের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর, এরূপ সত্য সর্ব্বক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যাইতে পারে বটে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ২।৪ জন মহাপুরুষের জীবনেও এই সত্য পরীক্ষিত হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, মনুষ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে এখনও উহা সত্য হইয়া উঠে নাই,—কোনকালে হইবে, এরূপ সম্ভাবনাও আমরা দেখি না।

অন্যায়কারী, অত্যাচারী বা আততায়ীকে কি উপায়ে প্রেম ও অহিংসার দ্বারা জয় করা সম্ভবপর, মহাত্মা গান্ধী বহুবার তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষের মনেই দেবভাব নিহিত আছে। ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা যদি অত্যাচারী বা আততায়ীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সেই দেবভাবের উদ্বোধন করা যায়, তাহা হইলেই অহিংসপন্থীর উদ্দেশ্য সফল হইবে, অত্যাচারী বা আততায়ী প্রেমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নত হইবে বা অস্ত্রত্যাগ করিবে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দেবভাবের উপর মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় এইরূপ একান্ত বিশ্বাস সাধারণ মানুষের নাই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরূপ অহিংস পরীক্ষা সফল হইতে পারে, কিন্তু কোন সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতিই এইরূপ একটা 'থিওরি' বা মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রেম, ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা আবিসিনিয়েরা আততায়ী ইতালীর হৃদয় জয় করিতে পারিত না, কিম্বা চেকোশ্লোভাকিয়া বা পোল্যাণ্ড সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হিটলার ও তাঁহার নাজীবাহিনীর অন্তরের "দেবভাব" জাগাইয়া তুলিতে পারিত না।

আমরা এতক্ষণ প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর যুক্তির অনুসরণ করিয়া মানব-সভ্যতায় অহিংসার স্থান ও উহার কার্য্যকারিতার সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করিলাম। এইবার আর একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিব, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধীর এই 'অহিংসা দর্শন' মানবজীবনের পূর্ণ সত্য ব্যক্ত করে না, মানবসভ্যতা এই "নির্ভেজাল" অহিংসানীতির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে না, কোন যুগে গড়িয়া উঠেও নাই এবং যেখানেই এই চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে 'হিংসার' একটা স্থান আছে এবং উহাকে বাদ দিয়া মানুষের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম হইতে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষের পক্ষেও "হিংসা" আত্মরক্ষার প্রধান উপায়, ইহাকে বর্জ্জন করিলে বহু যুগ পূর্ব্বেই মনুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত। প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি যেমন মানব-প্রকৃতির অংশ,—কাম হিংসা ক্রোধ প্রভৃতিও তেমনি উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের বংশ-বিস্তার ও আত্মরক্ষার জন্য ঐ প্রবৃত্তিগুলি অপরিহার্য্য। প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতির তুলনায় কাম, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতিকে নিম্নতর বৃত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনমতেই ঐগুলিকে অনাবশ্যক বলিয়া বর্জ্জন করা বা ধ্বংস করা যায় না। তবে এই সব নিম্নতর বৃত্তির মোড় ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখী করা যাইতে পারে,—অর্থাৎ ঐগুলিকে মহত্তর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে,—যথা দেশরক্ষা, জাতিরক্ষা, মানব-কল্যাণ সাধন ইত্যাদি। আধুনিক মনো-বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় ইহারই নাম sublimation! এইরূপ "উন্নয়নের" ফলেই ক্রোধ, হিংসা, কাম প্রভৃতি শৌর্য্য, বীর্য্য, মধুর রস প্রভৃতিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ঐগুলি নষ্ট হয় না, 'সংশোধিত' হইয়া মানব-কল্যাণে সহায়তা করে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের এইসব বিভিন্ন বৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও তাহাদের মধ্যে সুসংগত সামঞ্জস্য স্থাপনই মানবসভ্যতার পূর্ণ আদর্শ। যে সমাজ বা জাতি কতকগুলি বৃত্তির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেয় এবং অন্যগুলিকে দমন বা অবহেলা করে, তাহাদের অধঃপতন সুনিশ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সময়ে ভারতবর্ষ অতিরিক্ত পরিমাণে অহিংসা প্রেম ও মৈত্রীর সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে শক্তি সামর্থ্য, শৌর্য্য-বীর্য্যের চর্চ্চা করে নাই। ফলে বিদেশী আততায়ী কর্ত্তৃক সে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। অহিংসার আদর্শ ভারতবর্ষে কিরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাহার কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। পাঠানেরা যখন প্রথম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণ করে তখন ঐ অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ঐ সব রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল, বৌদ্ধ শ্রমণেরা রাষ্ট্র ব্যাপারেও কর্ত্তৃত্ব করিতেন। পাঠানেরা নগর আক্রমণ করিলে এইসব বৌদ্ধ শ্রমণেরা বলিলেন, প্রভু বুদ্ধের রাজ্যে হিংসা চলিবে না,—অতএব দুর্গদ্বার খুলিয়া দাও, অস্ত্র ত্যাগ কর, আততায়ীদের আসিতে দাও। ফল কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ সব রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাত্মা গান্ধীও আজ সেই বৌদ্ধ শ্রমণদের মতই আততায়ীর সম্মুখে অস্ত্রত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত,—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের জৈনদের মধ্যে অহিংসা এরূপ বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল যে, তাহারা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রমণ, লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতিতেও বাধা দিত না। ফলে সর্ব্বত্র অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে কোন সমাজ বা জাতি যদি প্রেম, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র হিংসা ও শক্তিচর্চ্চার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেয়, তবে সেই সমাজ বা জাতি প্রকৃতপক্ষে আদিম বন্য-বর্ব্বর সমাজ হইয়া দাঁড়ায়,—যুদ্ধ, নরহত্যা, পররাজ্য জয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন—এই সবই তাহাদের নিত্যকার্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ জাতি বা সমাজের দ্বারা পৃথিবীর ঘোর অকল্যাণ হয়, তাহাদের আদর্শ মানব-সভ্যতার উচ্চাদর্শ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না।

বস্তুত হিংসা ও অহিংসার সুসংগত সামঞ্জস্য সাধনেই মানব-সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শে অহিংসা ও মৈত্রীর যেমন স্থান আছে, আত্মরক্ষার্থ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্য হিংসারও তেমনি স্থান আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বকালের মানবজাতির জন্য তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, কেবলমাত্র প্রেম ও

(শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# মানুষের ঘর

( উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি )

শ্রীহাসিরাশি দেবী

সরোজ বুঝেছিল, আদু বনফুল। সুগন্ধ তার বুকে যথেষ্টই আছে, কিন্তু বনেই মিশে যায় সে গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে। যত্ন আর জল ছিটানোর অভাবে তার রূপও হয়ে ওঠে ধূলিমলিন, যার আবরণে তার সৌন্দর্য্য মুগ্ধ তো করেই না, উপরন্তু সুন্দর বলে তাকে স্বীকার করাই হয়ে ওঠে দুষ্কর।

তাই শারদার দেওয়া 'পুষ্প' নাম শুনে সে হেসে ফেললে। বললে, "দেখ পুষ্প, মামীমা তোমার নাম পুষ্প রাখলেও, যদি ওর আগে আমি একটা ছোট্ট কথা যোগ করে দি, তোমার আপত্তি আছে তাতে?"

আদু বিস্মিত হ'ল। বললে, "কেন? আপত্তি কিসের। কি কথা যোগ করবেন আপনি আমার নামের আগে?"

"ধর, যদি বনফুল, অর্থাৎ পুষ্পের জায়গায় ফুল আর তার আগে 'বন' কথাটা যোগ করে দিই? যদি তোমায় সময় সময় বনফুল বলেই ডাকি?"

আদু চেয়ে দেখলে সরোজের মুখে হাসি; সুন্দর হাসি। আর চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা স্বপ্নাবেশ ভাব যার সঙ্গে সে একটুও পরিচিত নয়। কিন্তু পরিচয় না থাকলেও ভয় করে না, আতঙ্ক জাগে না মনের মধ্যে। বরঞ্চ বেশ লাগে। এ যেন কেমন একটা নূতনতর, কেমন মাধুর্য্যময় অবস্থা!

আদু হেসে ফেললে, সলজ্জ হাসি। বললে, "বেশ তো, ডাকবেন বনফুল বলে। এর জন্যে আবার কি।"

"ডাকব? আজ এখন থেকেই তা হলে ডাকি।"

সরোজের কপালের দু পাশে কাল কুঞ্চিত চুলের গোছা দুলে উঠল। আলো পড়ে চকচকিয়ে উঠল চোখের চশমা। সে উঠে বসল সোজা হয়ে, চেয়ারের কুশন থেকে হাতটা সরিয়ে একখানা স্বরলিপির বই টেনে নিলে হারমোনিয়মের উপর থেকে। কিন্তু সেটা খুললে না। সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে দেখলে আদুর গায়ের হাতকাটা নীল সিল্কের ব্লাউসের সঙ্গে পরনের ফিকে সবুজে রংএর শাড়িখানা চমৎকার মানিয়েছে। নীচের হাতে ওর সোনার সরু চুড়ি, গলায় হার, কানে দুল; সবই আজকালকার প্যাটার্নের অনুযায়ী। পিঠের উপর দুলছে স্তূপীকৃত চুলের রাশি, সে রাশি খোঁপা করে বাঁধা, যেন পূজার নৈবেদ্য। ওর সর্ব্বাঙ্গ থেকে একটা স্নো কি তেলের স্নিগ্ধ সুগন্ধ সমস্ত ঘরটাকে আমোদিত করে তুলেছিল। আদু এখানে এসেছে প্রায় মাসখানেক হতে চলল, কিন্তু এর মধ্যে ওর কি দ্রুত পরিবর্ত্তন! যখন ও এসেছিল, তখনকার আদুর সঙ্গে এখনকার পুষ্পের অনেক প্রভেদ, এই কথাটা মনে করে সরোজ মনে মনে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না কিছুতেই। মনের মধ্যে কাঁটার মত শুধু এই কথাটাই বিঁধছিল যে, পুষ্প যেমন আর যাই হোক, শারদার ভাইঝি, যে শারদাকে সে নিত্য নানারূপে চোখের উপর ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, কানে শুনেছে নিত্য যার ইতিহাস, যার জন্যে অনুভব করছে আর একটি স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মর্ম্মবেদনা—যাকে ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে বিবাহ করেও মামা অবিনাশ স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে নি, তারই সমবয়স্কা, তাঁরই সঙ্গে একসঙ্গে মায়ের কোলে মানুষ, সে সেই ইন্দু।

মায়ের মুখে সরোজ শুনেছে, অবিনাশ ইন্দুকে বিবাহ করেও যে ত্যাগ করেছিলেন তা তার লজ্জাশীলতা ও কালো রংএর দোষে নয়, তা এই নৃত্যগীতপটীয়সী অভিনেত্রীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে। সরোজের মা, অবিনাশের বড় বোন কাত্যায়নীর মতামত অন্তত এই। এই কথাই বড় হয়ে পর্য্যন্ত সরোজ শুনে আসছে তাঁর মুখ থেকে। আর চোখে দেখেছে ইন্দুর অকাল জরাগ্রস্ত শীর্ণ দেহ, হাস্যহীন মুখ, করুণ দৃষ্টি। শুনেছে সে গরিবের মেয়ে; মা বাপ তাকে অবিনাশের হাতে সমর্পণ করে বিদায় নিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে। ইন্দু আজও তাই স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য থাকতেও ননদিনীর আশ্রিতা, গলগ্রহ; কারণ এ বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন তিনিই।

আর একদিকে সরোজ দেখতে পায় অটুট স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল ঐ শারদাকে। আচার ব্যবহারে সে অতি অমায়িক, অসাধারণ। মামা অবিনাশকে ঘিরে সংসারের খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় কাজ পর্য্যন্ত অক্লেশে শেষ করে সে নিপুণ হাতে যে সংসারটি গড়ে তুলেছে—তার কোথাও কোনও অব্যবস্থা কী এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই! সকলের প্রতিই সে মমতাময়ী, স্নেহশীলা। কিন্তু, তবু, তবু সরোজ তাকে শ্রদ্ধা করলেও, ভালবাসলেও ইন্দুর আসনে তাকে আজও ঠিক বসাতে পারে নি। কেন পারে নি, তা সে জানে না, কিম্বা জানলেও হয়ত ঠিক বলতে পারে না। সেই শারদারই ভাইয়ের মেয়ে ওই পুষ্প।

সরোজের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায় কিসের একটা কঠিন আঘাতে। মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, "বড় মাথা ধরেছে, এক কাপ চা আনতে পার বনফুল, বেশ কড়া করে?"

"মাথা ধরেছে!" আদুর বড় বড় চোখ দুটোয় ভেসে উঠল একটা দুশ্চিন্তার ছায়া; বললে, "আপনি একটু বসুন, আমি এখনই চা করে আনছি।"

দরজার পর্দ্দা সরিয়ে সে দ্রুতপায়ে চলে গেল। খানিক পরে চা-এর সরঞ্জাম নিজেই ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে যখন হাজির হল, সরোজ তখনও বসেছিল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। আদুকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবার মাত্র মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েই আবার অন্য দিকে মুখ ফেরালে। চা ঢালতে ঢালতে আদু বললে, "চিনি কিন্তু অল্প দিয়েছি মাষ্টার মশায়।"

অন্যমনস্কভাবে সরোজ বললে, "ওতেই হবে।"

তার পরে চুমুক দিতে আরম্ভ করল চা-এর কাপে। ধুঁয়া উঠছিল কাপের গরম চা থেকে।

আদু সেই দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ওর মনে

পড়ছিল গ্রামের কথা, অন্নদার কথা, আর মেঘলা দিনে কি শীতের রাতে যখন মাটির হাঁড়িতে কাঠের উনুন জেলে বিপিনকে চা করে দিতে হ'ত, তারই কথা। অনেক অতীত স্মৃতি ওর মনের মধ্যে ওতপ্রোত হচ্ছিল হয়তো।

বাধা দিল সরোজের প্রশ্ন।

"তোমার পিসীর অসুখের খবর পেয়েছিলে না, তিনি কেমন আছেন?

"পিসী? কি জানি।"

সরোজ বিস্মিত হ'ল; বললে, "জান না, না জানতে চেষ্টা কর নি?"

আদুর মুখে চোখে লজ্জার লাল আভা ফুটে উঠল; বললে, "না, আমায় কেউ বলে নি কোনও কথা।"

"বলে নি? কেন? সেই যে ছেলেটি তোমাদের গ্রাম থেকে খবর দিতে এসেছিল, সে?"

আদু চমকে দৃষ্টিপাত করল সরোজের মুখের দিকে। সরোজ কি মানিকের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধের কথা জানে? হয়তো জানে, হয়তো বিপিনই তাকে বলে থাকবে। নইলে সরোজই বা হঠাৎ এমনভাবে এ প্রশ্ন করবে কেন! আদু হঠাৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলে না; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে সরোজের মুখের উপর থেকে প্রথমকারের সেই স্বপ্নালসতা কখন যেন কেটে গেছে, তার বদলে ভেসে উঠেছে ক্রূরতা; যে ক্রূরতা মানুষের সবকিছুই যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে ফেলে কষে মেজে নিতে চায়। আদুকেও যেন সে পরীক্ষা করছে তেমনিভাবে।

আদু কিসের একটা আশঙ্কায় শিউরে উঠল। তার মনে হল এতক্ষণ যে সরোজকে সে দেখেছে, এ সে সরোজ নয়; ঔদাস্য এর স্বভাবগত নয়। এও পৃথিবীর সবকিছু বাজিয়ে, ঘষে, মেজে তকতকে, ঝকঝকে করে নিতে জানে, যা জানে না মানিক। মানিককে সে যতটুকু দেখেছিল, যতটুকু চিনেছিল, তাতে বুঝেছিল, সে মানুষকে মানুষ বলেই ভাবতে শিখেছে, দেবত্ব বা দানবত্বের কল্পনাও সে করতে পারে না। তাই সে কারও এতটুকু এক দোষকে, ভুলকে এত বড় করে তার কৈফিয়ৎও চায় না। একটু ইতঃস্তত করে আদু বললে, "আজ যখন আপনার মাথা ধরেছে, তখন গান শেখান থাক না হয়, কালই হবে।"

সরোজ কাপটাকে শূন্যগর্ভ করে নামিয়ে রাখলে টেবিলের উপর; তার পরে পরম নিশ্চিন্তভাবে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "কিন্তু একটা কথা তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ পুষ্প যে গান শেখাতেই আমি এ বাড়ি আসি, অন্য কিছুর জন্যে নয়!"

আদু এবার ঠিক জবাব দিতে পারলে না, উল্টো রকম একটা প্রশ্ন করে বসল। —"কত জায়গায় গান শেখান আপনি, অনেক জায়গায় নিশ্চয়? আমার মত অনেকেই গান শেখে বোধ হয় আপনার কাছে?"

সরোজ হাসল; বললে, "হ্যাঁ, তা শেখে বই কি।"

"শুনেছি আপনি রেডিওতে, রেকর্ডে গান দেন, তাতেও তো অনেক টাকা পান আপনি।"

"হ্যাঁ, তা পাই কিছু বটে, কিন্তু তোমাকে শেখানোর জন্যে মামীমা যা দেবার বন্দোবস্ত করেছেন, তার তুলনায় ঢের কম।"

আদুর মনে পড়ল, তাকে গান শেখানোর বিনিময়ে এইরকম কি একটা মোটা রকম মাইনে বরাদ্দ করার কথা শারদা কিছু দিন আগে বিপিনকে বলেছিল বটে। কথাটা তার কানে অল্প অল্পই এসেছিল, ভাল বুঝতে পারে নি। আজও তার অর্থ তার কাছে খুব পরিষ্কার হল না, অস্পষ্টই রয়ে গেল। স্পষ্ট হয়ে রইল শুধু একটা কথা,—সরোজের কাছে তার মত অনেকেই গান বাজনা শেখে। হয়তো তারাও মেয়েই হবে। তারই মত মেয়ে।

মনের মধ্যে যে অস্বস্তিটা তার খচ্ খচ্ করে বিঁধতে শুরু করল, সেটা সে মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারলে না, অন্য দিকে তাকিয়ে রইল ম্লান দৃষ্টিতে।

এমন সময়ে দরজার বাইরে থেকে শোনা গেল শারদার কণ্ঠস্বর। দরজার পর্দা সরিয়ে সে সহাস্য মুখে দৃষ্টিপাত করলে ঘরের ভেতর; বললে, "কি তোমরা গান গাইছ না যে? সব চুপচাপ কেন?"

আদু বলতে গেল: 'মাষ্টার মশায়ের খুব মাথা ধরেছে পিসীমা।' কিন্তু সরোজ বলতে দিলে না সে কথা; বাধা দিয়ে বলে উঠল হাসি মুখে, সরল হাসিমুখে, "পুষ্প বারণ করছে মামীমা, বলছে —'আজ নয় থাক, কাল হবে।"

"কাল হবে? কেন?"

শারদার প্রশ্নে আদু হেসে ফেললে, বললে, "জানো পিসীমা, মাষ্টার মশায় বড্ড মিথ্যে কথা বলেন। উনি বলছিলেন যে, মাথা ধরেছে, তাই—"

শারদার মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া ভেসে উঠলো। —"মাথা ধরেছে? কেন সরোজ? সারা দুপুর খুব রোদে রোদে ঘুরেছিলে বুঝি?" পর্দা ছেড়ে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মন্থর পায়ে।

—"অসুখ করেছে কি!"

সরোজের কপালে হাতের উলটো পিঠ রেখে সে তাপ পরীক্ষা করলে;—"কই না তো!"

সরোজ বাধা দিলে না, কোনও জবাব দিলে না শারদার কথারও। আদুর মনে হল সে যেন ইচ্ছে করেই একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে। শারদা বললে, "আচ্ছা, আজ নয় গান শেখান থাক না সরোজ; রোজ যে গান শেখাতেই হবে, অসুখ নেই বিসুখ নেই, মানুষের সময় অসময় নেই, সেই বা কেমন কথা। সরোজ তুমি বস বাবা, আমি দেখি, মাথা ধরার ওষুধটা যদি থাকে। এখুনি নিয়ে আসছি।"

শারদা চলে গেল ঘর ছেড়ে, একটু পরে যখন ফিরে এল, তখন ওর হাতে একটা ছোট শিশি, তাতে শাদা আঠার মত কি একটা চটচটে ওষুধ। ওষুধটা আদুর হাতে দিয়ে সে বললে,—"একটু একটু করে সরোজের কপালে ঘসে দাও পুষ্প, যতক্ষণ মাথা ধরা না ছাড়ে। আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে, এখুনি আবার উনি ফিরবেন!"

শারদা চলে গেল ঘর ছেড়ে। ওর যাওয়ায় দরজার

নীল পর্দ্দাখানা দুলতে লাগলো বারে বারে, আর সেই দিকে চেয়ে ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল আদু। সরোজের কপালে ওষুধ ঘষা তো দূরের কথা, তার দিকে তাকাতেও ওর সাহস হচ্ছিল না; কেমন যেন একটা ভয়, একটা সংকোচে তার সমস্ত মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

সরোজ ডাকল, "পুষ্প—"

"কি বলছেন?"

"তোমার পিসীমা কি উপদেশ দিয়ে গেলেন তোমায়?"

"আপনার কপালে ওষুধ দিতে।"

"দেবে না?"

সরোজের সমস্ত মুখে সেই বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব। সেই-দিকে তাকিয়ে আদু আবার কেঁপে উঠল, কিন্তু ওর এ আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারলে না। হাসির সারল্যকে সে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু একে পারে না। তাই উঠে এল আস্তে আস্তে, শিশি থেকে খানিকটা ওষুধ বের করে কপালে ঘষতেও লাগল সরোজের, কিন্তু কম্পিত হস্তে।

চোখ বুজে, আরাম কেদারাটায় হেলান দিয়ে সরোজ পড়েছিল নির্জীবের মত; তার কপালের শিরা উপশিরাগুলো যেন ফুলে উঠেছে, সমস্ত মুখ হয়ে উঠেছে আরক্তিম। সরোজ চুপ করে পড়েছিল, কপালে এসে লাগছিল আদুর ঘন নিশ্বাসের গরম হাওয়া। অনুভব করছিল ওর আঙুল-গুলো শুধু কম্পমান নয়, ঠাণ্ডা, বরফের মত ঠাণ্ডা। এক সময়ে সে চোখ মেলে সোজা হয়ে উঠে বসল। আদু প্রশ্ন করলে, "উঠলেন যে? হয়েছে? ছেড়েছে আপনার মাথা-ধরা?"

"অনেকক্ষণ। এখন ঘুম পাচ্ছে, বাড়ী চললুম। বলো তোমার পিসীমাকে।"

চটি জোড়া পায়ে দিয়ে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

আদুর বেশ মনে হল সে যেন দ্রুত পায়েই চলে গেল ঘর ছেড়ে। যাবার সময় একবার শারদার সঙ্গে দেখা করাটা পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বলে বোধ করল না। ওষুধের শিশি হাতে পাংশুমুখে দরজার দিকে তাকিয়ে আদু চুপ করে বসে রইল। আজ প্রথম, হাঁ, জীবনে আজই প্রথম সে কি একটা আনন্দ, উন্মাদনা অনুভব করেছিল প্রাণের মধ্যে, আবার তার পরেই সে এমন একটা আঘাত পেলে যার বেদনা সে ভুলতে পারছে না।

(ক্রমশ)

# মানব সভ্যতায় 'অহিংসার' স্থান

(২১ পৃষ্ঠার পর)

অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, যুদ্ধমাত্রই পাপ নহে ;—ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, লোক-কল্যাণের জন্য যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। সেক্ষেত্রে অনাসক্তভাবে কর্ম্মযোগীর মত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংসা ও প্রেমের নামে যিনি মনুষ্য-সমাজ বা মনুষ্য-জাতিকে অন্যায়ের নিকট আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিবেন, তিনি মানুষকে বিপথগামীই করিবেন। বৌদ্ধ-অহিংসার ফলে ভারতবর্ষ যখন নিৰ্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন গীতোক্ত এই মহৎ মানব-ধর্ম্ম ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। উহার ফলে ভারতে আবার হিন্দুজাতির নবজাগরণ হইয়াছিল।

বীর্য্যহীন যে অহিংসা, তাহা তামসিত অহিংসা। উহারই আর এক নাম 'ক্লৈব্য'। তার চেয়ে সাত্ত্বিক হিংসা শ্রেষ্ঠ। আমাদের আশংকা হয়, মহাত্মা গান্ধী আজ সেই তামসিক অহিংসার বাণীই প্রচার করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন বটে যে, তিনি শক্তিমানের অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আসলে তাঁহার প্রচারিত অহিংসা দুর্ব্বল ও নিবীর্য্যের তামসিক অহিংসা। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বীর্য্যবানের অহিংসা অথবা সাত্ত্বিক হিংসার আদর্শই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক হিংসা সমাজরক্ষা দেশরক্ষা, লোক-কল্যাণার্থ যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না। মহাত্মা গান্ধী গীতার যে ভাষ্য করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহাতেও তিনি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গীতার মূলতত্ত্বকে বৌদ্ধ বা জৈন অহিংসার ছাঁচে কখনও ঢালা যায় না। মহাত্মা গান্ধী সেই অসাধ্যসাধন করিতে গিয়া ব্যর্থপ্রয়াস করিয়াছেন মাত্র। মহাত্মা গান্ধী নানাদিক দিয়াই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু তিনি যে নিষ্ক্রিয় তামসিক "অহিংসার" আদর্শ প্রচার করিতেছেন, তাহা কখনই মানবজাতির কল্যাণ করিতে পারিবে না। যদি মানুষ তাঁহার ঈপ্সিত পথে কখনও সম্পূর্ণরূপে "অহিংস" হইয়া উঠে, তবে তাহারা আর মানুষ থাকিবে না, দেবতা হইয়া যাইবে, অথবা ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। প্রথম কল্পনা অবাস্তব, দ্বিতীয় কল্পনা যে আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে পোষণ করিতে পারি না তাহা বলাই বাহুল্য।

# মধ্য আসামের মণিপুর রাজ্যে

**(৩)**

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার এম এস-সি

১৯শে অক্টোবর রাত্রিকালে প্রায় ১০টার সময় মণিপুর রোড ষ্টেশনে অবতরণ করলাম। ষ্টেশনে মশার উপদ্রব অতিরিক্ত, তায় স্থানাভাব। নিকটস্থ এক মণিপুরী চটি বা হোটেলে একটি মশারীসহ খাটিয়া ভাড়া ক'রে সেই রাত্রি কাটিয়ে দিলাম।

২০শে অক্টোবর, '৩৮।—আজ সকালে ৫০ আনা ভাড়ায় এক মোটর লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলাম। লরিগুলি মণিপুরের ধান ডিমাপুরে নামিয়ে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে। তাই ইম্ফাল পর্য্যন্ত ১৩৪ মাইল যেতে এত সস্তা ভাড়া। এক মাইল যাবার পর পুলিস ফাঁড়িতে যেতে হ'ল। তারা পাস দেখল। সেখানে এক অসমিয়া দারোগা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পড়ছেন দেখলাম। কলিকাতা হ'তেই মণিপুর দরবারে আবেদন ক'রে পাস নিয়েছিলাম। ঐ ছাড়পত্র মঞ্জুরী হবার তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে মণিপুরে যেতে হবে এবং রাজ্যে মাত্র ৭ দিন থাকতে পাব। তার পর আমাদের যাত্রার পালা। ফাঁড়ি হ'তে আধ মাইল দূরে পথের ডান ধারে কাছাড় রাজাদের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্ন দুর্গ, প্রাচীর ইত্যাদি দেখা গেল। ঐ প্রাচীরের পোড়া ইটগুলি উত্তরবঙ্গের প্রাচীন দুর্গাদিতে ব্যবহৃত পাতলা এবং বড় টালির আকারের।

আমাদের দুপাশে রইল সমতল ধান্যক্ষেত্র; তার মধ্যে মধ্যে অসমিয়াদের গ্রাম, বাঁশের ঝাড়, আর লতাগুল্ম ও বৃক্ষশোভিত অটবী। ১০।১২ মাইল পরে পাহাড় আরম্ভ হ'ল। প্রথমে গভীর খাদ; তারপর ক্রমে প্রশস্ততর খাদের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পাশ কেটে রাস্তা। সানুদেশ থেকে ১৫০০ ফুট পর্য্যন্ত গিরিগাত্রে মধ্যে মধ্যে কাছাড়ীদের ধান্যক্ষেত্র দেখা যায়। ডান পাশে বরাইল গিরিশ্রেণী রেখে আমরা দ্রুত পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ১৫০০ ফুটের উপরে কদাচিৎ নাগাদের জুম খেত দেখা যায়। আমরা নাগা পাহাড়ে প্রবেশ করলাম।

রাস্তায় বাঙালী বা অসমিয়া ওভারসিয়ার বাবুরা কাজ দেখছেন। পোশাক ও আকারে পার্থক্য নেই। কুকি, নাগা, পৈতাধারী গরিব কাছাড়ী ও মণিপুরী ক্ষত্রিয়রাও রাস্তায় কুলীর কাজ করছে। রাস্তার মাঝে মাঝে নেপালী গোয়ালা, বিহারী মুদী দেখা যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে নাগিনী ও নেপালিনী রাস্তা বয়ে চলেছে। তাদের ২।১ জনের পরনে বাঙালীর মত শাড়িও দেখলাম।

২৮ মাইল যাবার পর এল পিপাহিম। দু ধারে বৃক্ষবহুল উপত্যকা ছেড়ে আরও খোলা। উপত্যকা বা খাদ দিয়ে চললাম। তার পর ক্রমে নাগা পাহাড়ের প্রধান শহর কোহিমা ১০।১২ মাইল দূরে থেকে দেখা গেল। দু ধারে ডালাকাটা পাহাড়ের গায়ে রোপা ধান কাটা হচ্ছে। দু পাশের পাহাড়ের সবটা গায়ের উপর ঐরূপে সাজানো terrace বা ডালাক্ষেত। যেন মধ্য সিকিমের দৃশ্য। দূরে ৫।৬ হাজার ফুট উপরে অভ্রস্পর্শী কোহিমা। নাগা বস্তিগুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এক একটা কেল্লাবিশেষ। বেড়ার ভিতর উঁচু মাচাবিশিষ্ট বহু পর্ণকুটীর। বস্তিগুলি পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত, তার নীচে তাদের ধানের ডালাকাটা খেত। প্রত্যেক ডালার উপর দিয়ে এক একটি পার্ব্বত্য নির্ঝর চালানো হয়েছে। তাদের জল এক ডালা উপছে আর এক ডালায় পড়ছে। বাঙালী দোকানদার এরূপ স্থানে সহজেই আপনার পসার জমাতে পারে। আর মধ্য আসামের নানাস্থানে পাহাড়ীদিগকে ডালাকাটা খেতে ধানের আবাদ শেখাতে পারে। এরূপ মধ্যে মধ্যে সমৃদ্ধ জনপদ সৃষ্ট হ'লে তার ব্যবসায়ের পসারও বেড়ে যেতে পারে।

বেলা দশটায় ৪৬ মাইল এসে বাস্ কোহিমা শহরে কিছুক্ষণের জন্য থামল। এখানে বাঙালী বা অসমিয়াকে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত থাকতে দেওয়া হয় না। শহর খুব স্বাস্থ্যকর। এখানে বোধ হয় বাঙালী কেরানী বাবুদের জন্য একটি মধ্য-ইংরেজী স্কুল এবং ২।১টি বাঙালী দোকানও আছে। তদ্ব্যতীত মারোয়াড়ী ও দেশোয়ালীদের ১০।১২টি এবং স্থানীয় নাগা, লোটানাগা বা কুকীদেরও ৪।৫টি দোকান আছে। মিশনারীদের একটি সপ্তম মান (7th Standard) পর্য্যন্ত স্কুলও আছে শুনলাম। নাগারা কতক গৌরবর্ণ, কতক পীতাভ ও কতক কাল। স্ত্রী ও পুরুষ খুব পরিশ্রমী। পুরুষ নাগাদের মাথায় শিখা ও বিবাহিতা নাগিনীর মাথায় লম্বা চুল আছে। অবিবাহিত নাগিনীদের মাথার চুল কপালের দিকে ছোট ক'রে ছাঁটা।

কোহিমা ছাড়বার পর কবরের পাথর (burial stone) আর দেখা গেল না। এই অঞ্চল সহ ডিমাপুর পর্য্যন্ত পাহাড় পূর্ব্বে মণিপুরের অধীন ছিল।

রাস্তায় মাঝে মাঝে মাটি মেশা কয়লার আকর দেখলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে আমার মণিপুরী রাজপুত ড্রাইভার বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী গাইতে লাগল। যথা—

"এস এস নব-জলধর পীতাম্বর
এসে দাঁড়াও বঙ্কিম ঠামে।"

তার পর "আমি চাতকিনী হয়ে ঘরে ঘরে যাব"—ইত্যাদি নানা পদ। মনে হ'ল বাঙলাদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। চালকের সঙ্গে বাঙলাতে একটু কথাবার্ত্তা হ'ল। মণিপুরের সব লোক গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। তবে মণিপুরে যে ২০০।৩০০ মারোয়াড়ী আছে, তাদের মাল বয় ব'লে ড্রাইভাররা হিন্দী কথাই বেশী ব্যবহার করে।

বেলা ১২টার সময় মাও (Mow)তে উপস্থিত হলাম। মাও মণিপুর রাজ্যের একটি থানা। মাও থেকে কতক মাইল যাবার পর ডিমাপুর থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে বরাকনদীর উপত্যকা পেলাম। বরাক বা সুরমা নাগা পাহাড় থেকে বেরিয়ে ৫৬০ মাইল যাবার পর ভৈরব বাজারের নিকট প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র খাতে প'ড়ে মেঘনা হয়েছে। আমাদের পাশে মণিপুরের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ (দশ হাজার ফুট) যাপভো প'ড়ে রইল। ক্রমে উপত্যকা গর্ভে ঈষৎ প্রশস্ত ভূমিতে হলকর্ষিত ধান্যক্ষেত্র দেখা গেল। তা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫০।৬০ মাইল লম্বা। পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাহাড়, তার মধ্যস্থ সমতলপ্রায় ত্রিভুজাকৃতি উপত্যকা-গর্ভ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে দক্ষিণে লোগতাক হ্রদের নিকট ১০।১৫ মাইল প্রশস্ত হয়েছে। মণিপুরী ক্ষত্রিয় তার চাষী ও জমিদার। রাস্তাতে ২।১ জন নেপালী, বিহারী মুসলমান ও নাগা গোপালক এবং চাষীও দেখলাম।

বেলা ৪টায় কানকোপিতে পেঁৗছে এক মণিপুরী ব্রাহ্মণের দোকানে চা খেলাম। তার গায়ে হাফ টুইল শার্ট, পরিধানে কোঁচা ঝোলানো ধপধপে সাদা ধুতি; গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক। ঠিক যেন নবদ্বীপবাসী একজন বৈষ্ণব; চোখের পাতার নাকের দিকটা একটু মোটা মাত্র।

রাত্রি ৭॥টায় ডিমাপুর হ'তে ১৩৪ মাইল দূরে ইম্ফালে পেঁৗছে শ্রীযুক্ত নরেন কর নামক এক বাঙালী ভদ্রলোকের হোটেলে আশ্রয় নিলাম। চার্জ্জ সস্তা, সিট ভাড়া সমেত দুবেলা আহারের জন্য দৈনিক ১৲ টাকা থেকে ২৲ টাকা। চা, জলখাবারের চার্জ স্বতন্ত্র। সেদিন দীপালির রাত্রি, বাজারে জুয়াখেলার প্রকাশ্য ও অফুরন্ত আয়োজন। বাজারের আর এক পাশে মেয়েরা চাল, চিঁড়ে, এণ্ডি, মশারি, কাপড়, তরকারি, মাছ প্রভৃতি বেচছে। বুক থেকে পা পর্য্যন্ত পেঁচানো একখানি চাদর, আর গলার দিকে আর একখানি চাদরও তাদের কারও কারও গায়ে আছে। রংপুর, দিনাজপুরের গ্রাম্য বাহে মেয়েদের অনেকের এই পোশাক দেখা যায়। মণিপুরের মেয়েদের কপালে তিলক, গলায় তুলসীমালা, আর মাথার চুল বাঙালী মেয়েদের মত ২।৩ প্রকারের খোঁপার আকারে বাঁধা।

**২১শে অক্টোবর।—ইম্ফাল** শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ৮০,০০০। ইম্ফাল মণিপুরের রাজধানী। এখানে শীত অল্প

এ স্থান বোধ হয় দেড় হাজার বা দু হাজার ফুট উ‘চু হবে। উত্তাপ ৯০° ডিগ্রী থেকে ৬০° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে। বৎসরে বারিপাত ৩৬" ইঞ্চি। আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর, জলের গুণে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। শহরের এক অংশ ব্রিটিশের, অপর অংশ রাজ্যের সীমানাভুক্ত। ব্রিটিশরাজের গুর্খা ইত্যাদি পল্টনের এক ছাউনি আছে। ব্রহ্মদেশ-গামী টেলিগ্রাফের তার এখান থেকে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেছে। লোগতাক হ্রদের দিকে ৪০ মাইল দূরে ব্রহ্মসীমা আরম্ভ।

আজ সকালে ১০টায় পলিটিক্যাল অফিসারের অফিসে আমাদের আগমন সংবাদ জানিয়ে এলাম। তার পর প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আমজাও সিংহের নিকট উপনীত হয়ে মণিপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম। তিনি তাঁর রচিত মণিপুরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রথম বুলেটিনখানির এক সংখ্যা আমাকে উপহার দিলেন। তিনি ইংরেজীতে বেশ সুপণ্ডিত। আলমারির অভাবে প্রাচীন মণিপুরী অক্ষরে লিখিত পুঁথিগুলি তাঁর ঘরে এক কোণে মেঝেতে স্তূপীকৃত রয়েছে। ঐ লিপির বিবরণ Linguistic Survey of India, Part 3, Vol. II নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। নেপাল দরবারের লাইব্রেরির ন্যায় ত্রিপুরা ও মণিপুর দরবারের এবং সিকিম, ভুটান প্রভৃতির লোম্পার পুঁথিগুলির প্রতিও বাঙলার সুধীদের দৃষ্টি দেওয়া ও তার কতক সংগ্রহ করা উচিত।

পুরাতন রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির গত বিদ্রোহের সময় হ'তে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই বিদ্রোহ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল টিকেন্দ্রজিত কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। বিদ্রোহ দমনের পর প্রাচীন রাজবংশের স্থলে অন্য এক মণিপুরী ক্ষত্রিয়কুমার সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান প্রাসাদের অঙ্গনের এক পাশে গোবিন্দজী, জগন্নাথ-দেবের সুদৃশ্য মন্দির এবং এক বিশাল নাট-মন্দির অবস্থিত। অস্পৃশ্যজ্ঞানে মন্দিরের বারান্দায় পর্য্যন্ত উঠতে আমরা গুর্খা সান্ত্রী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলাম। অদূরে একটি কালীমন্দির আছে। বাঙালীদের স্কুলের পার্শ্বে ভগ্নপ্রায় প্রস্তর নির্ম্মিত আর একটি কালীমন্দির আছে। তার ছাদ ঢালু, চার চালা বিশিষ্ট।

ইম্ফাল বাজারটি বেশ বড়। বাঙালীদের ৭।৮খানি দোকান আছে। মুসলমান সওদাগর আর মারোয়ারীদেরও অনেক দোকান এখানে আছে। মাড়োয়াড়ীদের পরিচালিত একটি সিনেমা ঘরও আছে। হিন্দী সবাক চিত্র সেখানে দেখানো হয়। তবে বাঙালী কেরানী, ডাক্তার, মাস্টার বাবুদের বাবুপাড়া বলে একটি পাড়া আছে। সেখানে লাইব্রেরী আছে, দুর্গাপূজা হয় ও সেই উপলক্ষে বাঙলা শখের থিয়েটারও হয়।

মণিপুরের রাজপুত বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জ্জুনের যে যুদ্ধ হয়, তা ইম্ফালের ৩ মাইল পশ্চিমে তাকুইয়ান নামক ময়দানে হয়েছিল। সেই সময় রাজধানীর নাম ছিল মহেন্দ্রপুর। সেই নামের একটি পাহাড়ও এখানে আছে। প্রাচীন কেল্লার মধ্যে অর্জ্জুনের আসন নামধেয় একটি বড় প্রস্তরখণ্ড আছে, মণিপুর রাজাদের অভিষেককালে একবার তার উপরে উপবেশন করতে হয়।

২২শে অক্টোবর '৩৮।—আজ সকালে তাড়াতাড়ি জলযোগ ক'রে বাস ধরতে ছুটলাম। মধ্যাহ্নভোজন শেষ করবার সময় হ'ল না। সকাল ৯৷৷টার সময় দক্ষিণে লোগতাক হ্রদতীরস্থ মৈরাং গ্রামের দিকে বাস ছাড়ল। ২০ জনের স্থলে ৪০ জন লোক বাসে ভর্ত্তি হয়েছিল, কোন নিয়মকানুন নেই, ৩।৪ মাইল পরে কাঁচা ও বৃষ্টির দরুণ অতিরিক্ত কর্দ্দমাক্ত রাস্তা। কাদাতে মাঝে মাঝে আটকিয়ে বাস ঘুরতে ও উল্টিয়ে যাবার মত হ'তে লাগল। আমরা তখন নেমে বৃষ্টিতে ভিজে চলতে লাগলাম। কাদার রাজ্য কোনও-রকমে পার হ'লে বাস চলে, আমরাও আবার বাসে চাপি। এভাবে ঘণ্টা তিনেক চলবার পর বাস ১৭ মাইল দূরে বিষ্ণুপুর বাজারে উপস্থিত হ'ল। এর ২।১ মাইল উত্তরেই লোগতাক হ্রদ আরম্ভ। আমরা তার পশ্চিম কূলের নিকট দিয়ে যাচ্ছি। মণিপুরের প্রধান উপত্যকা উত্তর-দক্ষিণে ৪০ মাইল লম্বা; বিষ্ণুপুর তার প্রায় মধ্যস্থলে। এখানে উপত্যকা প্রায় ১০।১২ মাইল প্রশস্ত। দুই ঘণ্টা থেমে বাস্ পুনরায় দক্ষিণ দিকে ছাড়ল। বেলা ৪৷৷টায় ২৭ মাইল দূরস্থিত মৈরাং গ্রামে আমরা উপনীত হলাম।

মৈরাং গ্রামে ডাকবাংলো ও ডাক্তারখানা আছে। গ্রামটি লোগতাক হ্রদের প্রায় ভিতরে। হ্রদগর্ভের পশ্চিমপ্রান্তে মাটি তুলে বাড়িগুলির ভিটা ও রাস্তা উ‘চু করা হয়েছে। চারিদিকের জলরাশি কচুরিপানায় ঢাকা। বাজার থেকে ২ মাইল সড়ক ধ'রে যাবার পর লোগতাকের উন্মুক্ত জলরাশি দেখা যায়। বাজারের নিম্নে মাঝে মাঝে উন্মুক্ত স্থানে হ্রদের জলে ঈষৎ স্রোত দেখা যায়। তার মধ্য দিয়ে ছিপ নৌকাগুলি যাতায়াত করছে। হ্রদের চারিদিকে নীল পাহাড়; আবার মধ্য থেকেও ৪।৫টি নীল পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হ্রদের পশ্চিম-দক্ষিণাংশের তীরভূমিতে ব্রহ্ম ও লুসাই পাহাড়ের সীমান্তে কর্ম্মঠ মণিপুরী মুসলমানদের বসবাস।

মৈরাংএর বাজারে ডালপুরী জাতীয় পিঠা, ভাজিং কলা, মুড়ি, মুড়কি, বেগুন ইত্যাদি দেখলাম। যেন বাঙলাদেশেরই একটি বাজার।

বেলা ৫৷৷টায় আবার বাসে চাপলাম। ৪ মাইল আসতেই বেশ রাত্রি হয়ে গেল। স্থানীয় এক দারোগার সাহায্যে এক গ্রাম্য-মণ্ডলের বাড়িতে রাত্রিযাপনের আশ্রয় পেলাম। গ্রামে দারুন ডাঁশ বা মশা। একটা মশারীতে আমরা ৩।৪ জন কোনরূপে রাত কাটালাম। রাত্রে মণ্ডল কিছু ডালের বড়া, ছোলার ডাল ও ভাত আমাদের সামনে রান্না ক'রে আমাদের খেতে দিল। আমাদের সহিত বাস্-চালকের কথা ছিল যে, সন্ধ্যার সময়ই আমাদিগকে ইম্ফালে ফিরিয়ে নিয়ে আনবে। কিন্তু দুর্য্যোগে তা হ'ল না। সারা দিন একরূপ অভুক্তই ছিলাম। যাই হ'ক এই দুর্দ্দিনে এই আতিথেয়তাই আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার ক'রে নিলাম।

সকালে উঠে দেখি সামনে ঘরের ভিটার নীচে ছোট্ট একটু উঠন। তার মধ্যে তুলসীর একটি ভিটা, পাশে কতকগুলি মোরগ-ফুলের গাছ। উঠনের বাইরে ৩।৪ বিঘা ঘেরা জমি। জমিগুলিতে রোপা ধান কাটা হচ্ছে। ঘেরার বাহিরে বাঁশের ঝাড়।

মণ্ডল ও তার গৃহিণী শয্যা ত্যাগ ক'রে তুলসী ভিটায় প্রণাম করল। ঘর ও বারান্দা ঝাঁট দিল। তার পর দাঁতন ক'রে স্নান ক'রে এল। তার পর তামাক সেজে আমাদের সামনে উপস্থিত করলে। ঠিক যেন বাঙলারই একজন কৃষক।

মণ্ডলের ঘরখানি ২।৩টি কামরা বিশিষ্ট একখানি লম্বা দোচালা। শন খড়ের ছাউনি, বাঁশের বেড়া, মাটি-তোলা মেজে তার একপ্রান্তে সামনে বেড়া না দেওয়া এক মণ্ডলাকার বৈঠক-খানা। আমরা সেখানেই রাত্রি যাপন করেছিলাম।

২৩শে অক্টোবর।—আজ সকালে ৭৷৷টায় বাস্ আমাদের নিয়ে পুনরায় ছাড়ল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় দুর্য্যোগের মধ্যেই বেলা প্রায় ১১টায় বিষ্ণুপুর পে‘ছিলাম। এখানে দরবার কর্ত্তৃক পরিচালিত করগেট-টিনের ছাউনি দেওয়া নিত্যানন্দজীর এক মন্দির আছে। তার সামনে খড়ের ছাউনি দেওয়া বিরাট একটি নাট-মন্দির। আমরা মন্দির দর্শন করলাম। বিষ্ণুপুর বাজারের প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে শান্তিপুর নামে একটি টিলা আছে। তার উপরে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির, দেওয়াল ইত্যাদি সমন্বিত একটি ভগ্ন দুর্গ অবস্থিত। তা সপ্তদশ শতাব্দীতে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ওইটেই অধুনা আবিষ্কৃত প্রাচীন কীর্ত্তিস্থানের মধ্যে একমাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত ধ্বংসাবশেষ।

বিষ্ণুপুরের ২।৩ মাইল উত্তরে আমাদের অনুসৃত সড়ক

থেকে কাছাড় রোড পশ্চিমে বেরিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বরখোলা ও শিলচর। আমাদের সঙ্গে ট্রেনে কয়েকজন সিলেটী মুসলমান ব্যাপারী মণিপুরে এসেছিল। তাদের সঙ্গে এইসব পথে গ্রামাঞ্চলে কয়েকবার দেখা হল। তারা গ্রামে গ্রামে বিখ্যাত মণিপুরী ঘোড়া কিনে ২০০।৩০০ যা পায়, তাই নিয়ে ঐ কাছাড় রোডে ফিরে যাবে। শিলচর, সিলেট ও চট্টগ্রামের চা-বাগান ইত্যাদিতে সেগুলি বিক্রয় করবে। শ্রীযুক্ত রামসিংহ বলেন, এই পথেই অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। খৃীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে চীন হ'তে ৩ মাসে চীনের রেসম ব্রহ্মদেশ ও মণিপুর হয়ে এই পথেই আফগানিস্থানে উপস্থিত হ'ত। তার পর সেখান থেকে রোম সাম্রাজ্যে উপস্থিত হ'ত। লোগতাকের মধ্য দিয়ে ইরিল ও মণিপুর বা ইম্ফাল নদী ব্রহ্মের চিন্দুইন নদীতে পড়েছে। সেই পথে এই বাণিজ্য এসে অশ্বপৃষ্ঠে এই ১০০ মাইল রাস্তা পাড়ি দিত। তার পর সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা বয়ে দিল্লিতে উপনীত হ'ত। তার পর পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে ভারতের বাইরে চ'লে যেত। এই ব্যবস্থার পর আজ আড়াই হাজার বৎসর গত হয়েছে, কিন্তু আজও মণিপুর ও ব্রহ্মের এই পথ অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং ওই ব্যবস্থার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাছাড়ের পথে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বা অর্জ্জুন নামধেয় অন্য কোনও উত্তর ভারতীয় রাজপুত্র যে মণিপুরে এসেছিলেন, তা অসম্ভব কিছু নয়।

৪ ঘণ্টা বাদে বিষ্ণুপুরে ছেড়ে আমাদের বাস্ আমাদের রাত্রি ৭টার সময় ইম্ফালে পৌঁছে দিল।

২৪শে অক্টোবর। আজও বৃষ্টি হ'তে লাগলো। সুতরাং সারাদিন বিশ্রাম ও ইতস্তত পায়চারী এবং আলাপ পরিচয়ে কাটিয়ে দিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন বাঙালী আর্টিস্ট ছিলেন। তাঁকে ছবি আঁকতে দেখে "তরুণ মণিপুরী" নামক স্থানীয় ভাষার এক সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শীতলজিৎ সিংহ বি এ আমাদের হোটেলে এলেন। কিছুক্ষণ মণিপুরের দৃশ্য, কৃষ্টি, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ হ'ল। তিনি স্থানীয় একটি হাইস্কুলের শিক্ষক। মণিপুরে ৪টি হাইস্কুল আছে। আর বাঙালী বাবুদের ছেলেদের জন্য আর একটি হাইস্কুল এবং মেয়েদের জন্য একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে। এতদ্ব্যতীত খৃীষ্টান মিশনারী পরিচালিত ৩।৪টি মধ্য ইংরেজী ও ১০।১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ইম্ফাল শহরের বাহিরে আছে। ইম্ফালের বাঙালী হাইস্কুলে প্রায় ২৫০ জন মণিপুরী ছাত্রও পড়ে। এখানে ৩০।৪০ জন মণিপুরী ছাত্র মাতৃভাষারূপে বাঙলাই পড়ে। অন্য স্কুল-গুলিতে তারা মণিপুরী ভাষাই মাতৃভাষারূপে পড়ে। মণিপুরী ভাষায় ৩।৪খানি পুস্তক আছে। ব্যাকরণ এখনও হয় নি। উপত্যকায় প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাসী আছে। মণিপুরী এদের প্রায় আড়াই লক্ষের মাতৃভাষা। আর রাজ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেড় লক্ষ নাগা, কুকী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়িয়া আছে। Lingua franca-রূপে তারা মণিপুরী ব্যবহার করে। তবুও লোকসংখ্যার স্বল্পতাহেতু পুস্তক ক্রেতার অভাবে সাহিত্য, পত্রিকা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি এই ভাষায় অল্পই রচিত হ'তে পারে। ৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা সর্ব্বত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মণিপুরী ভাষা প'ড়ে বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই অপরাপর শিক্ষালাভ করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনও অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশে আজ ভারতময় বাঙালী-বিদায়ের পালা অভিনীত হচ্ছে। তার ছোঁয়াচ এখানেও লেগেছে। শুনলাম স্টেট থেকে সমস্ত বাঙালী কর্ম্মচারী অপসারিত। অসমিয়া সহ্য কিন্তু বাঙালী অসহ্য। এ কোপের উৎস কোথায় তা কে জানে।

শুনলাম বাঙলা ভার্ণাকুলার নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে মণিপুরী ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রের তুলনায় কম নম্বর পায়। তজ্জন্য কোনও কোনও মণিপুরী মাস্টার অগ্রণী হয়ে মণিপুরী প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করেছেন। এর এক মীমাংসা আছে। যে সমস্ত উপজাতীয়গণ বাঙলা ভাষা ভার্ণাকুলার রূপে নেবে তাদের প্রশ্নোত্তরের বিষয়বস্তুর দিকে নজর রেখে নম্বর দিতে হবে, ব্যাকরণ শুদ্ধি এবং ভঙ্গীর দিকে বেশী নজর দেওয়া হবে না। আর ম্যাট্রিকের বাঙলা পরীক্ষায় পরীক্ষক হিসাবে মণিপুরী, কাছাড়ী, সাঁওতালী, মৈথিলী পণ্ডিত কতক কতক নিযুক্ত করতে হবে। কোনও কোনও মণিপুরী শিক্ষক এবং শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, বাঙলা ভাষায় তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ (বৈষ্ণব শাস্ত্র) পড়তে হয়। এ অবস্থায় বাঙলা ভাষা ত্যাগ করলে তাঁদের স্বজাতীয় শিক্ষা দীক্ষার অভাবে অনেক পিছিয়ে থাকতে হবে। বাঙালীরা যদি শিক্ষা, উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে অতুলনীয় উন্নতি সাধন করতে পারে এবং এই সব বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করে, তবে পুনরায় বাঙলা ভাষা সর্ব্বজনপ্রীতি লাভ করতে পারে। সুরমা উপত্যকার মণিপুরীরা (৮৪০০০) বাঙলাকেই তাদের মাতৃভাষা ক'রে নিয়েছে। বর্ত্তমানে ইম্ফাল শহরেই মণিপুরীগণ প্রায় ৩০খানি বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র কিনে পড়ে।

**মণিপুরের ইতিহাস।**—১৮৯০ খৃীষ্টাব্দে রাজা কুলচন্দ্র ও তদীয় সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত রাজ্যশাসনে ইংরেজের অধিকতর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ খৃীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহী দল মণিপুরের সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে যোগ দিতে উত্তেজিত করবার জন্য প্রথমে কুমিল্লা তার পর কাছাড় পাহাড়ের দিকে যায়। কিন্তু মণিপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে তাদের কতক কতককে ধরিয়ে দেয়। উত্তর ব্রহ্মবাসীরা ১৭৪৬ খৃীষ্টাব্দ হ'তে ১৮২৬ খৃীঃ অঃ পর্য্যন্ত মণিপুর ও আসাম উপত্যকা আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করতে থাকে। এই যুদ্ধে মণিপুর মাঝে মাঝে জয়ী হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের সার্ব্বভৌম অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষা করে। এই সময়ে পুনঃ-পুন পরাজিত রণক্লান্ত মহারাজা জয়সিংহ পুত্রের হস্তে রাজ্য-ভার দিয়ে নবদ্বীপধামে বাণপ্রস্থে গমন করেন। মাংসাহার ও হিংসা ত্যাগী বৈষ্ণব ধর্ম্ম কখনও রাজা বা দেশরক্ষীদের ধর্ম্ম হতে পারে না। উড়িষ্যা, মণিপুর ও ত্রিপুরার রাজারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের অত্যল্পকাল পরে পরাধীনতা বরণ করে। বঙ্কিম-চন্দ্র ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম্মই দেশরক্ষীদের ধর্ম্ম হতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালনের জন্য মণিপুরের উচ্চতন সম্প্রদায় আজ মাংসভোজী নয়। কেবল মৎসাভোজী মাত্র।

এই জয়সিংহের রাজত্বকালে ১৭৬১ খৃীষ্টাব্দে রামগোপাল বৈরাগী নামে এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধু মণিপুরে আগমন করেন। তিনি রাজাকে এবং নাগা, কুকী ও মুসলমান ব্যতীত সমুদয় মণিপুরীদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নবদ্বীপে তাঁর কোনও স্মৃতি চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

এই মহারাজা জয়সিংহের পিতামহ গোপালসিংহকে একজন দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট বলা যেতে পারে। তিনি উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কাছাড়, তার পর মণিপুর আর পূর্ব্বে শানদেশ অবধি সমুদয় উত্তর ব্রহ্মদেশ জয় ক'রে স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন। তাঁর সময়ে শান্তদাস মহাপুরুষ নামে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এক সাধু এসে রাজসভায় খুব ক্ষমতাশালী হন গোপাল সিংহের মাতা নাগা জাতীয়া এক রাণী ছিলেন। সেজন হয়ত তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নিকট একা অবহেলা পেতেন। এজন্য প্রাচীন গোড়ামিপূর্ণ প্রথার উচ্ছেদে নিমিত্ত রাজ্যের প্রাচীন পুঁথি, কীর্ত্তি, পূজাপদ্ধতি ও ইতিহাসে অনেক উপকরণ বিনষ্ট করেন। মণিপুরের পরিসংখ্যান বিষয় (Statistical) হিসাবের লেখক ভুল ক'রে এই অপরাধ বাঙাল

প্রচারকের কুমন্ত্রণার উপর চাপিয়েছেন। যাহা হ'ক এক ব্রহ্ম অভিযানে যাবার পথে অবশেষে গোপাল সিংহ তদীয় উপদেষ্টা শান্তাদাস মহাপুরুষ সহ তাঁর এক পুত্র হস্তে নিহত হন। গোপাল সিংহের পূর্ব্বে রাজ্যে দুর্গা, শিব, কালী ইত্যাদির পূজা খুব প্রচলিত ছিল।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পাকুম্বা (স্থানীয় নাম) নামীয় এক মণিপুরের রাজা উত্তর ব্রহ্মের কুবো উপত্যকা অধিকার করেন।

১২৫০ খৃষ্টাব্দে একদল চীন সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করে। তারা পরাজিত হয়ে কতক নিহত ও অবশিষ্ট বন্দী হয়। ঐ বন্দীদের বংশধরগণ সুমাকামেনে বসবাস করে এবং মণিপুরে রেশম পালন শিল্প প্রবর্ত্তন করে।

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতীর হ'তে মণিপুর, উত্তর ব্রহ্ম, শান এবং চীনের য়ুনান প্রদেশ বিজয়ী পঙ নামীয় এক শান সম্রাট ৮ম শতাব্দীতে লোগতাক কূলে মৈরাং গ্রাম ও উহার অধিবাসীরূপে মাই আই নামে এক উপজাতি দেখতে পায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্রগণ এই মণিপুর উপত্যকা সহ ব্রহ্মদেশের নাফ (টেকনাফ?) ও কূলাদন পর্যান্ত অধিকার করে।

অন্ধ্রগণের পূর্ব্বে সম্ভবত অশোক এবং তাঁর পূর্ব্বে কলিঙ্গগণ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিলেট, মণিপুর ও মণিপুরের পূর্ব্বস্থ উত্তর ব্রহ্মের অন্তঃপাতী কুবো উপত্যকা প্রভৃতি অধিকার করে। কুবো উপত্যকার উত্তরাংশকে আজও মৌরীয় বলে। এজন্য ব্রহ্মের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, অশোকের (চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য্য) মাতৃবংশ মৌরীয় উপজাতি এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

তার পরেই একেবারে অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের যুগে যেতে হয়। এই স্মৃতিধৃত ইতিহাস (tradition) খুব অসম্ভব নয়। সংস্কৃত পুস্তকে আছে যে, অর্জ্জুন এক সাগরতীরে অবস্থিত মণিপুর রাজধানীতে উপনীত হন। অর্জ্জুনের মত উত্তর ভারতীয় এক রাজপুত্রের পক্ষে বিশাল লোগতাক হ্রদকে সাগর বলে ভ্রম করা বা চট্টগ্রামের দিকে সাগর সংযুক্ত এক খাঁড়িরূপে মনে করা বিচিত্র নয়।

আর একটি কারণ ভাববার আছে। পূর্ণিয়া জেলার বিরাট ছিল মহাভারতে কথিত উত্তর গো-গৃহ। সেখান থেকে পূর্ব্বে বগুড়া জেলার বিরাট নামীয় ভূখন্ড হয়তো বিরাট রাজার আর একটি গোষ্ঠ ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি) থেকে এ স্থানের দূরত্ব সরল রেখায় ৭৫০ মাইল হবে। এ স্থান থেকে সরল রেখায় আর ৪৫০ মাইল দূরে এই মণিপুর রাজ্য। এসব স্থলে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন না হলেও অর্জ্জুন নামধেয় কোনও উত্তর ভারতীয় রাজপুত্র সেই সুপ্রাচীন যুগে এখানে এসে বিবাহ ও কৃষ্টি সংযোগ স্থাপনা করেছিল এরূপ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ। খৃঃ পূঃ ২য় শতকের চীনের বাণিজ্য পথেরও বিষয় বিবেচনাযোগ্য। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখিয়েছেন যে, বংশনির্ম্মিত ভারতের মোহন বংশীর চীনে প্রবর্ত্তন; চীনা সুরের ভারতে প্রচলন এবং বাঙলায় প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার বড় নদীবাচক গাং শব্দ দ্বারা চীনের ইয়ংসেকিয়াং মেকাং প্রভৃতি নদীর নামকরণ হয়েছে। এতে বুঝায় আসাম পথে উত্তর ভারত ও চীনের একটা যোগাযোগ খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে থেকেই ছিল। আসাম উপত্যকায় ৮ লক্ষ, সদীয়ার প্রাচীন রাজবংশ, মণিপুর, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশের মধ্যে মধ্যে উত্তর ভারতীয় আর্য্যরক্তের ছাপ দৃষ্টান্তেও এই অনুমান দৃঢ়ীকৃত হয়।

লিপি।—বর্ত্তমানে মণিপুরের লিপি বাঙলা ওরফে অসমিয়া ওরফে মৈথিলী। শুধু বাঙলা বললে বোধ হয় অপরাপর ভারতীয়গণ একটু বেজার হন। বর্ত্তমানে রোমান হরফে মণিপুরী অভিধান প্রণয়নের চেষ্টা হচ্ছে।

ভাষা ও রক্ত।—মণিপুরী ভাষীদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। মণিপুরবাসী কুকীদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার এবং নাগারা সংখ্যায় ১ লক্ষ। কুকী ও নাগাদের ভিতর নানা উপভাষা বিদ্যমান; তজ্জন্য এক সম্প্রদায়ের কুকী বা নাগা অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা কোনও কোনও স্থলে বুঝতে পারে না। শ্রীযুক্ত লালতুই দাস কুকী মহাশয়ের মতে লুসাই, কুকী ও মণিপুরীরা মূলজাতি হিসাবে এক। কুকী ও নাগা ভাষা তিব্বত বর্ম্মী ভাষার শাখা প্রশাখা বিশেষ। আবার তিব্বত, বর্ম্মী, থাই (শান ও শ্যাম দেশীয় ভাষা) ও চৈনিক ভাষাগুলির মধ্যে পরস্পর সগোত্র সম্বন্ধ। চৈনিক ভাষার জনক মোঙ্গল ভাষা। মোঙ্গল ও তুর্কী ভাষার মূল উৎস উরল-আলতাই নামক আদি ভাষা—ভাষাবিদ্ স্মিক্‌মুডের এই মত। খাসি, জয়ন্তিয়া, মুন্ডা, মালয়, সেলানেসিয়া প্রভৃতি ওসেনিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষাগুলি মনখেমের ভাষার শাখা প্রশাখা। সুতরাং বর্ত্তমান মণিপুরী ভাষায় তিব্বত-বর্ম্মী, বাঙলা (বা সংস্কৃত) এবং মনখেমের ভাষার সংমিশ্রণ আছে। রক্ত হিসাবেও তাহাই। তবে উত্তর ভারতীয় (আর্য্য) রক্ত মণিপুরের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুলাংশে বর্ত্তমান। বাঙলা দেশেও তাই হয়েছে। তবে পশ্চিম বাঙলায় দ্রাবিড় রক্তও বিদ্যমান।

মণিপুরে গত সেন্সাসে (১৯৩১ খৃঃ) ২২০০ বঙ্গভাষী ছিল। দশ হাজার ব্রাহ্মণ এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে ২১ হাজার ক্ষত্রিয় ছিল। যে সব মণিপুরী উচ্চারণ ও ব্যাকরণ শুদ্ধ বাঙলা অতি দ্রুত (বক্তৃতার আকারে?) বলতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা গত সেন্সাসে প্রায় ১০০০ দেখানো হয়েছে। আমাদের মনে হয় শিক্ষিত মণিপুরী মাত্রেই বাঙলা বলতে ও বুঝতে পারে।

ধর্ম্ম।—মণিপুর রাজ্যে দশ হাজার খৃষ্টান, ২৩ হাজার মুসলমান, দেড় লক্ষ উপজাতীয় এবং কিঞ্চিদধিক আড়াই লক্ষ হিন্দু আছে। লোই নামক এক বৌদ্ধ উপজাতি আছে। বর্ত্তমান অধিবাসীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। নবদ্বীপে মণিপুরী আখড়া আছে; সেখানে তারা নবদ্বীপে কোনও যোগের সময় দলে দলে উপনীত হয়। রাস, দুর্গাপূজা, দীপালি প্রভৃতি তাদের প্রধান উৎসব।

অর্থনৈতিক জীবন।—ইম্ফল শহরে হাইড্রো-ইলেকট্রিক দ্বারা বিজলী উৎপন্ন হয়। রাজ্যে লৌহ খনি আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই মেয়েরা তাঁত বোনে। এণ্ডিও একটি কুটীর শিল্প। মণিপুর রাজ্যের আয়তন ৮৬২০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে পার্ব্বত্য অংশের আয়তন প্রায় ৭০০০ বর্গ মাইল।

পূর্ব্বে মণিপুর রাজগণ ত্রিপুরা, কাছাড়, নাগা ও উত্তর ব্রহ্মের আভা রাজপরিবারগুলির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেন। বর্ত্তমানে বোধ হয় রাজ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অধিক।

প্রত্যাবর্ত্তন।—২৫শে সকাল ৭॥টায় ইম্ফাল ত্যাগ করলাম। আজ নিয়ে মণিপুর রাজ্যে ৬ দিন কাটানো হবে। এখানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র করের হোটেলে এ কয়দিন বেশ নিশ্চিন্তেই কাটিয়েছি। যেপথে এসেছি সেই পথে সারাদিন লরি চলল। আর মাত্র ১২ মাইল পথ যখন বাকী আছে তখন খুব গভীর ও সঙ্কীর্ণ এক খাদের মধ্যে পাহাড় ধ্বসে রাস্তা বন্ধ হওয়াতে আমরা প্রায় ৩ ঘণ্টা আটক ছিলাম। প্রায় ১০০ খানা লরির আমাদের মত অবস্থা হ'ল। চালকদের কাছে দা বা কোদাল নেই। কোনরূপে খালি হাতেই ধ্বসের গাছ, পাথর ও মাটি রাস্তা থেকে সরাল।

মণিপুর রোড স্টেশনে ফিরতে দেরি হওয়াতে সে রাত্রে আর আহারাদি হ'ল না। রাত্রি ১২টার গাড়িতে চেপে পরদিন ১১টায় পান্ডু ঘাটে স্টীমারে আহার নিষ্পন্ন হ'ল। থাই নদীর সেতু তখনো ভাঙ্গা ছিল ব'লে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে কিছু দেরি হয়ে গেল

# বিচিত্র বার্ত্তা
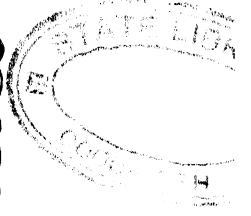
**অল্প বা বহু সন্তান হওয়া খারাপ**

পূর্ব্বের যুগে ছিল সেই নারী ভাগ্যবতী যিনি বহু সন্তানের জননী। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই মতেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। ইংলণ্ডস্থ গ্যালটন ইউজেনিক ল্যাবরেটরীর প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ পিয়ারসন গবেষণা ক'রে বলেছিলেন মানুষের অল্প বা বহু সন্তান হওয়া মা এবং সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর মতে পাঁচের কম এবং আটের বেশী ছেলে মেয়ে না হওয়াই ভাল। বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ক'রে ডাঃ পিয়ারসন মত প্রকাশ করেছিলেন, মানুষের সর্ব্বপ্রথম সন্তান এবং শেষের দিকের সব সন্তানগুলিই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী সাধারণত হয় না। সর্ব্বপ্রথম সন্তান সব থেকে বেশী মারা যায়। দাম্পত্য জীবনের প্রথমভাগে নর ও নারীর বহু বিষয়ের অনভিজ্ঞতাই এর একমাত্র কারণ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানই স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান হয়। চতুর্থ সন্তানের পর যারা জন্মলাভ করে তারা অল্প আয়ুর অধিকারী হয়। ডাঃ পিয়ারসন বলেন, বুদ্ধির বিচার করতে গেলে দেখা যায় প্রথম এবং সপ্তম সন্তানের বুদ্ধি সমান সমান। সব চেয়ে বেশী হাঁদারাম, মাথা পাগলার আবির্ভাব হয় সর্ব্বপ্রথম ও শেষের সন্তানদের মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানরাই সাধারণত চোর ডাকাত হয়। ক্ষয় রোগও নাকি প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে বেশী পাওয়া যায়। আমরা যে সর্ব্বপ্রথম সন্তানদের বংশের প্রদীপ বলে অভিহিত করি তারা কিন্তু বেশীর ভাগই ছানি, চোখের নানা অসুখ নিয়ে জন্মলাভ করে। ডাঃ পিয়াসনের মতে তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানই সর্ব্বদিক থেকে জাতির কল্যাণকামী।

**চোখের জল কি?**

মানুষ শোকে এবং দুঃখে অভিভূত হ'লে চোখের কোণ থেকে জল পড়ে। এই চোখের জল কি, এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক চোখের জলের গবেষণা ক'রে এ বিষয়ে নূতন আলোক সম্পাত করেছিলেন। তাঁর মতে মানুষ যে কোন কারণে শোকাতুর হ'য়ে পড়লে মস্তিষ্কের রক্তের চাপ কমে যায়। রক্তের চাপ কমে যাওয়ার ফলে চিত্তের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্ক কিছু সময়ের জন্য অবশ হয়ে পড়ে। যে উপায়ে মানুষের মাথার রক্তের চাপ কমে যায় সেই পদ্ধতিকেই নাকি চোখের জল বিশেষভাবে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন চোখের জল ও রক্ত একই বস্তু। অশ্রু-নিঃসারক গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ লুপ্ত হয়।

শোকে অভিভূত হয়ে যদি কেউ না কাঁদে তাহলে তাঁর স্বাস্থ্যের দিক থেকে খারাপ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানুষের মাঝে মাঝে কাঁদা উচিত। কান্না থামাতে আমরা ছোট ছেলে মেয়েদের বাধ্য করি সেটা খুবই খরাপ। প্রচুর পরিমাণে চোখ দিয়ে জল বার হ'য়ে গেলে মাথার ভার কমে যায়। বিশেষত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীলোকদের স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্ম হওয়ায় মাঝে মাঝে তাদের কাঁদা বিশেষ প্রয়োজন।

ব্যবহৃত সরবৎ খাবার পাইপ দিয়ে 'রয়েল কোচ' তৈরী করা হয়েছে; প্রদর্শনীতে এই কোচটি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল

**সূত্র-প্রস্তুতকারী উদ্ভিদ**

সাধারণত তুলা, পাট, শণ প্রভৃতি সূত্র-প্রস্তুতকারী উদ্ভিদ। এ ছাড়া আরও উদ্ভিদ আছে যাদের কাছ থেকে সুতা অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কৃষি শিল্পবিদেরা বলেন, আনারসের পাতা থেকে প্রস্তুত সুতাই শক্ত এবং উৎকৃষ্ট। এই সুতা দেখতে সব থেকে বেশী সাদা, রেশমের মত নরম। আনারসের পাতায় প্রস্তুত সুতা থেকেই ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী কাপড় এবং পিনা প্রস্তুত হয়। আমরা যে টোয়াইন সুতা ব্যবহার করি তা আনারসের পাতা থেকেই প্রস্তুত হয়। জর্ম্মান ও জাপানে আনারসের পাতা থেকে পার্চ্চমেণ্টের মত চমৎকার কাগজ তৈয়ার হয়। জর্ম্মানীতে রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে আনারসের পাতা থেকে এক রকম পিজ্‌বোর্ড তৈয়ার হয়। ঐ পিজ্‌বোর্ড এত শক্ত যে রেল গাড়ীর চাকা বা ইঞ্জিনের কোন কোন অংশও নাকি তা দিয়ে প্রস্তুত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে আনারসের পাতা থেকে প্রস্তুত সুতা সব চেয়ে বেশী জল সহনশীল।

# পাগল

(গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

কথাটা গোপন ছিল, বিবাহের পর দিন প্রকাশ পাইল। এমন সময়ই ধরা পড়িল যখন আর কোন প্রতিকার চলে না।

কল্যাণীর মনে খটকা লাগিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারে না। এত দুরদৃষ্টকে সে কি করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে।

শেষ পর্যন্ত দুরদৃষ্টকেই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। এত বড় ছলনা, এত বড় মিথ্যা, এত বড় প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া উঠিতে পারিল না। কেমন যেন সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এত বড় আঘাত সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

যাহারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, যাহারা তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিল, তাহাদের সে অভিসম্পাৎ করিতেও কুণ্ঠিত হইয়া গেল। উঃ! এত বড় বঞ্চনা, এত বড় আঘাত যে সে এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কল্যাণী আর ভাবিতে পারে না, কেমন যেন সব গুলাইয়া যায়।

কল্যাণী আর এ বাড়ির কাহাকেও সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্নান করিবার ছল করিয়া বাথরুমে ঢুকিয়াছে অনেকক্ষণ। স্নান তাহার হয় নাই, চেষ্টাও সে করে নাই। জানালায় যে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনও তেমনি ঝুঁকিয়াই রহিয়াছে।

জানালার নীচে পড়া জমি। জমিটির পর মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। রাস্তার পাশে বাড়ি। বাড়ির পর বাড়ি আর রাস্তা। তারপর সুনীল আকাশে অসংখ্য তারার মালা আর মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা। কল্যাণী নিস্তব্ধ আকাশের দিকে কান পাতিয়া রহিয়াছে। চোখ বাহিয়া নামিয়াছে আবেশ, দেহে এলোমেলোভাবে ছড়াইতেছে ক্লান্তি, মনে জমিয়াছে কালো মেঘ।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। কল্যাণী চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কোন সাড়া দিল না। যেমনি দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। পা' দুইটি তাহার অবশ হইয়া গিয়াছে, মন তাহার মৃত।

আবার জোরে কড়া নড়িয়া উঠিল। তবু কল্যাণী কোন সাড়া দিল না। এ বাড়ির কোন লোকের ছায়া যেন সে দেখিতে চায় না। কোন কণ্ঠ স্বর যেন শুনিতে চায় না। অদ্ভুত—অদ্ভুত তাহার নিষ্ক্রিয় বিদ্রোহ। কোন ভাষাই নাই, কোন প্রকাশ নাই, শুধু সচেতন মনের অচেতন অনুভূতিকে পুড়াইয়া দিয়া যায়।

বারবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন কল্যাণীর শাশুড়ী বিমলা দেবী ডাকিলেন—বৌমা!

কল্যাণী নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া দিল।

বিমলা দেবী বিস্মিতভাবে বলিলেন, এখনও গা' ধোয়া হয়নি মা!

কল্যাণী কোন জবাব দিল না। ঘোমটার সুযোগে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিল।

বিমলা দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল।

বিমলা দেবী যেন আত্মসংবরণ করিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমি ছাদে অপেক্ষা করছি। গা' ধোয়া হলে একবার এস। বিমলা দেবী আর কোন কথা বলিলেন না। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া ছাদে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী শাশুড়ীর আহবান উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি গা' ধুইয়া চুপি চুপি ছাদে চলিয়া আসিল।

বিমলা দেবী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, অনেক কিছু বলিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কল্যাণী যখন ক্লিষ্ট ও করুণ মুখে তাঁহার নিকট আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল তখন তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কল্যাণী খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, আমায় ডেকেছিলেন মা!

বিমলা দেবী চমকিয়া উঠিলেন। কল্যাণীর মুখের দিকে তিনি ভাল করিয়া তাকাইতে পারেন না। অপরাধে, পাপে তাহার মন এতটুকু হইয়া যায়। মনে হয় জানিয়া শুনিয়া তিনি নিরপরাধ একটি মেয়ের যে সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

বিমলা দেবী অকস্মাৎ কল্যাণীকে কোলে টানিয়া লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কল্যাণী একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই। শাশুড়ীকে সে শ্বশুরকুলের মধ্যে মন্দের ভাল বলিয়াই মনে করে, কিন্তু এমন আচরণ আশা করিতে পারে নাই। তাহার মনে যে বিষ বাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা শাশুড়ীর অশ্রুজলে জমিয়া যাইতে লাগিল।

বিমলা দেবী কল্যাণীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, মা, যে মহাপাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। ক্ষমা চাইবারও কোন উপায় নেই।

কল্যাণী কি জবাব দিবে? তাহার জীবনটা যে এ'রা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহা চন্দ্রসূর্যের মতই সত্য—অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই। শ্বশুরকুলের প্রত্যেক লোকের প্রতি তাহার যত আক্রোশ, যত ক্রোধ ও যত অভিযোগই থাকুক না কেন শাশুড়ীকে ঠেলিয়া দিতে পারিল না। শাশুড়ীর আলিঙ্গনে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

বিমলা দেবী খানিক কাঁদিয়া বলিলেন, তোমাকে যদি সেদিন না দেখতুম তবে হয়ত' তোমার এত বড় ক্ষতি করতুম না। তোমায় দেখে আমার কি যে শনি চাপল, মনে হল, তোমায় আনলেই আমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

কল্যাণীর মনে হইল, সে বলে, আপনার মনে শনি চাপল বলে আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন।

কল্যাণী প্রকাশ্যে কিছু বলিল না, যথাসম্ভব বিক্ষুব্ধ মন স্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করিল।

বিমলা দেবী বলিয়া চলিলেন, আমাদের ঐশ্বর্য আছে, মান সম্ভ্রমও আছে ; শুধু নেই শান্তি। তুমি মা সন্তানের জননী নও, তাই আমার দুঃখ বুঝতে পারবে না।' পাগল সন্তানকে নিয়ে সারাক্ষণ কত দুশ্চিন্তায়, কত ভাবনায় যে কাটাই তার ঠিক নেই। আশ্রয় খুঁজেছিলুম মা—সন্তানের স্নেহে এত বড় স্বার্থপর হয়েছিলুম যে পরের কথা একটুও ভাবতে পারি নি।

কল্যাণী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একটু তিক্ত স্বরে বলিল, ছলনা না করে, বিয়ের পূর্বে এ কথা কি আপনাদের জানান উচিত ছিল না মা?

ঃ সেজন্যেই ত' মা অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি। স্বার্থান্ধ হয়ে তোমার প্রতি যে অবিচার অন্যায় করেছি তার আর কোন প্রতিকার ভেবে পাচ্ছি নে। আমাদের অবর্তমানে প্রখরের অসহায় অবস্থা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম।

ঃ আমি কি করে ওঁকে রক্ষা করব?

ঃ পারবে মা পারবে। মেয়েরা সব পারে। তোমাকে যখন পেয়েছি তখন প্রখর আর অসহায় নয়, ভাইদের স্বার্থ-বুদ্ধিতে পথে দাঁড়াবে না, রাস্তায় ময়লা কুড়িয়ে খাবে না।

ঃ আমি পরের মেয়ে বলে নয় আমার সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবেন নি, ভাবলেও কোন মূল্য দেন নি, কিন্তু এ কথা আমি বুঝে উঠতে পারিনে যে, যিনি পাগল তাকে আমি কি করে ভাল করব। উনি যেদিন বেরিয়ে যাবেন সেদিন আমি কি করে ওঁকে আগলাব।

ঃ আমার কেন যেন দৃঢ় ধারণা জন্মাল, বিয়ের পর প্রখর ভাল হয়ে যাবে। লোকেও তাই বলেছিল।

ঃ কিন্তু এ কথা কি কেউ মনে করে দেয়নি যে, বিয়ের পর উনি ভাল না হয়ে আরও ক্ষেপে যেতেও পারেন?

ঃ সন্দেহ হ'য়েছিল মা, কিন্তু বিশ্বাস করতে চাই নি। সব কিছুর চেয়ে আশ্রয় খোঁজাই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে-ছিল। বিমলা দেবী কল্যাণীর হাত ধরিয়া অনুরোধের স্বরে বলিলেন, তোমার উপর যে অন্যায় করেছি তার তুলনা নেই মা, কিন্তু তুমি কি জননীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পার না মা?

হঠাৎ বিমলা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা রেবা ছুটিতে ছুটিতে ছাদে আসিয়া বলিল, মা, শিগ্‌গির এস!

বিমলা দেবী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, কেন? কি হয়েছে!

বড়দা লেক না কোথায় ডুবেছিল। কয়েকজন লোক বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে গেল।

বিমলা দেবী তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রেবাও গেল। কল্যাণী ভাবিয়াছিল যাইবে না, কিন্তু পারিল না, আপনি আপনি পা' দুইটি নামিয়া আসিল।

নীচে যেন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়াছে। একা প্রখরকে তিন চারজন লোকও শান্ত করিতে পারিতেছে না। মেজ ভাই প্রভাত রাগ সামলাইতে না পারিয়া প্রখরকে কয়েক ঘা' লাগাইয়া দিল।

কল্যাণী অগ্রসর হইতেছিল, চমকিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায়, অপমানে যেন সে মরিয়া গেল। এত বড় ভাইকে বিশেষ করিয়া পাগলকে যে এমন নির্দয়ভাবে কেহ মারিতে পারে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সে যেন কিছুই দেখে নাই এমনিভাবে সরিয়া গেল।

বিমলা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, মারিস কেন! একশ' দিন মানা করেছি তবু—

না পাগলকে মাথায় তুলে নাচব। প্রভাত জোরে জোরে বলিল, হাড় জ্বালিয়ে খেল। এমনিভাবে কোন ভদ্রলোক বাস করতে পারে। প্রভাত প্রখরের হাত ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বলিল, চল তোকে ঘরে বন্ধ করে রাখি।

বিমলা দেবী প্রভাতের হাত হইতে প্রখরকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিলেন। প্রখর মারের ভয়েই হোক কিংবা মাকে দেখিয়াই হোক কোন প্রতিবাদ আর করিল না, শান্তভাবে মা'র সঙ্গে চলিয়া আসিল।

প্রখরের স্বভাবের এমনই ধারা। হঠাৎ সে ক্ষেপিয়া যায়, কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না এবং হঠাৎই সে শান্ত হয়। যখন সে ভাল থাকে, তখন তাহাকে পাগল বলিয়া ভ্রমও হয় না। সাধারণ মানুষের মতই থাকে। তবে সে কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথা কয় না, সারাক্ষণ একা একা কি যেন ভাবে, প্রশ্ন করিলে জবাব দেয় না। মুখ দেখিলে মনে হয়, সে যাহা এত গভীরভাবে ভাবে, তাহা তাহার মনে থাকে না।

ঘরটা নির্জন ছিল। কল্যাণী ইচ্ছা করিয়াই চুপি চুপি প্রবেশ করিল। কোন দিন সে এমনিভাবে প্রবেশ করে নাই। কখনও সে স্বামীর সঙ্গে একত্রে এক বিছানায় শোয় না। স্বামী ঘুমাইলে সে ঘরে আসে এবং পৃথক বিছানায় ঘুমায়। যেদিন প্রখর সুস্থ থাকে না সেদিন কল্যাণী অন্য ঘরে ঘুমায়।

প্রখরকে সে শুধু এড়াইয়া চলে না, রীতিমত ভয় করিয়া চলে। প্রখরকে দেখিলে তাহার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠে; রাগে, দুঃখে তাহার বিচারবুদ্ধি যেন লোপ পাইতে থাকে।

প্রখর ঘুমায় নাই। হঠাৎ কল্যাণীকে দেখিয়া বলিল, কে বৌ?

কল্যাণী চমকিয়া দাঁড়াইল। মনটা অকস্মাৎ আবার তিক্ত হইয়া উঠিল।

ঃ শোন! লক্ষ্মীটি—এস!

কল্যাণী কোন সাড়া দিল না।

ঃ এসো লক্ষ্মীটি, আমি বকব না, মারব না, মাইরি বলছি! তুমি বউ, তোমাকে কি আমি কিছু বলতে পারি!

কল্যাণীর যেন হাসি পায়! হাসি চাপিয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল!

প্রখর কল্যাণীর একটা হাত তুলিয়া লইয়া কানের পাশে

নিয়া বলিল, একটু হাত বুলিয়ে দেবে বৌ! কেমন মেরেছে দেখেছ!

কানের পাশটা অনেক ফুলিয়া গিয়াছে। একটু আহত স্বরে কল্যাণী বলিল, কে মেরেছে।

ঃ প্রভাত! ছোট ভাই হয়ে—

কল্যাণীর যেন বুকটা জ্বলিয়া উঠিল, একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, তুমি কেন সহ্য কর!

ঃ আমি! ফিকে হাসি হাসিয়া প্রখর বলিল, আমি পারব কেন। ওরা কত লোক।

কল্যাণী কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, নীরবে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

প্রখর বলিল, আমি ত' লোকদের এড়িয়েই চলি, কিন্তু লোকগুলি কেমন ক্ষেপিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম আমি কিছু বলি না, শেষে আমার কেমন গুলিয়ে যায়।

কল্যাণী বলিল, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আইডিন আনছি, অনেকটা ফুলে গেছে।

কল্যাণী বিমলা দেবীর নিকট গিয়া টিংকচার আইডিন চাহিল।

বিমলা দেবী বলিলেন, এত রাত্রিতে আইডিন দিয়ে কি হবে বৌমা।

কল্যাণী মুখ তুলিতেই প্রভাতকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিল। যাহা বলিতে চাহিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিল না। বলিল, ওঁর কানের কাছটা ফুলে গেছে!—

বিমলা দেবী ব্যস্তভাবে টিংকচার আইডিন আনিতে গেলেন।

প্রভাত একটু শ্লেষ দিয়া বলিল ফুলেছে এই ভাগ্যি, কোন দিন শেষ হয়ে থাকবে। বলুলুম পায়ে শেকল পরাও তবু কানে যাবে না—পাগল ছাগলের প্রতি আবার এত দরদ কেন।

বিমলা দেবী ধমক দিয়া বলিলেন, চুপ কর, মায়ের পেটের ভাই এমন হতে আর দেখিনি।

প্রভাত বলিল, তোমাদের এত আহ্লাদেই গেল। বলু-লুম রাঁচী পাঠাও, নয়ত বন্ধ কর, আমরাও বাঁচি, পাড়ার লোকও বাঁচে—আমি একদিন এমন মার দেব, দেখ পাগলামী কোথায় যায়।

কল্যাণীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে আর আত্মসংযম করিতে পারিল না, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, কি বলুলেন?

বিমলা দেবী বলিলেন, এই নাও আইডিন।

কল্যাণী জবাবের জন্য আর দাঁড়াইল না, আইডিনের শিশিটা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

প্রখর বলিল, এসেছ বৌ, আমি ভাবলুম তুমি বুঝি আর এলে না।

কল্যাণী আইডিন লাগাইতে লাগাইতে বলিল, তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কখ্খনও আর কারও সঙ্গে লাগতে পাবে না।

ঃ আমি ত' সববাইকে এড়িয়েই চলি, লোক আমায় দেখলেই খেপায়।

ঃ তুমি আর বের হ'তে পারবে না।

ঃ কোথাও না?

ঃ না।

ঃ যদি বের হই—তবে।

ঃ তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

ঃ আমি আর কোথাও যাব না।

ঃ মনে থাকবে ত'? কখ্খনও বেরুতে পাবে না। ছাদে বেড়াবে, বাগানে যাবে আর আমার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবে।

ঃ তুমি আমায় নিয়ে যাবে—মিথ্যে কথা।

ঃ মিথ্যে নয়—সত্যি। তুমি কখনও প্রভাতের ঘরে যাবে না বল!

ঃ কেন?

ঃ ও তোমায় দেখতে পারে না, তোমায় একা একা পেলে মারবে।

ঃ আমি যাব না!

ঃ যাবে না, সারাক্ষণ আমার পাশে থাকবে?

ঃ হাঁ!

ঃ কেন?

ঃ ওরা আমায় মারে, খেপায়। তুমি আমায় মার না, খেপাও না!

ঃ আর!

ঃ আর—ভালবাস!

ঃ আমি তোমায় ভালবাসি, কে বলল?

ঃ আমি জানি।

ঃ তুমি জান, বুঝতে পার?

কল্যাণী যেন কেমন হইয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রখরের বুকে মাথা এলাইয়া দিতে দিতে বলিল, তুমি জান, আমি তোমায় ভালবাসি?

প্রখরও যেন কেমন হইয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতই কল্যাণীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। চুম্বন করিয়াই প্রখর ভয় পাইয়া গেল, মুহূর্তের তরে সমস্ত শক্তি যেন শিথিল হইয়া গেল।

কল্যাণী চমকিয়া উঠিল। মনে হইল, আজ রাত্রিই কি শেষ রাত্রি, যদি শেষ রাত্রিই হয়, তবে কি এই রাত্রি অনন্ত হইতে পারে না?

# আজ-কাল

### ছাত্র ধর্ম্মঘট

গত ১৯শে জুলাই এক আদেশ জারী করে' বাঙলা গবর্ণমেণ্ট সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনের ছাত্রদের পক্ষে ধর্ম্মঘট বা ঐ রকম কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগদান নিষিদ্ধ করেছেন। এই আদেশের প্রতিবাদে কলকাতায় ছাত্রেরা ২২শে জুলাই স্কুল কলেজ ছেড়ে শোভাযাত্রা করে' ইসলামিয়া কলেজে যায়; সেখানে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি মিঃ ওয়াসেকের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সময় বাইরে থেকে অন্য ছাত্রেরা এসে সভায় যোগদান করতে চায়; পুলিশ প্রথমে বাধা দিয়ে শেষে তাদের ছেড়ে দেয়। পরে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গুর্খা নিয়ে ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ঢোকেন এবং ছাত্রদের চলে যেতে বলেন। কিন্তু ছাত্রেরা চলে যেতে না চাওয়ায় পুলিশ লাঠি চালায়। ফলে ১৮।১৯ জন হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র আহত হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র এক সঙ্গে প্রহৃত হওয়ায় বাঙলা গবর্ণমেণ্ট বড় গোলমালে পড়েছেন। মিঃ ফজলুল হক এক বিবৃতিতে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের শান্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

### ধরপাকড়

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের গ্রেপ্তারের পর অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনিও গত ১৭ই তারিখে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লীলা রায়, শ্রীরবি সেন এবং চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনকেও ঐ আইনে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ধরপাকড় সর্ব্বত্রই প্রচুর চল্‌ছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের গোপন অধিবেশনের যে সরকারী বিবরণ বেরিয়েছে তাতে বিরুদ্ধবাদী দল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ঐ বিবরণে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাটাই ফলাও করে দেওয়া হয়েছে; অথচ বিরুদ্ধবাদী দলের যুক্তিতর্ক কিছুই দেওয়া হয়নি। তাঁদের মতে এ থেকে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে, এবং এ রকম পন্থা অবলম্বন করে' বিরুদ্ধবাদী দলের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত বিশিষ্ট সদস্য মিঃ পামনানীকে গত ১৭ই জুলাই রোরি ষ্টেশনে দুইজন অজ্ঞাত আততায়ী রিভলভারের গুলিতে হত্যা করেছে। আততায়ীরা এখনো ধরা পড়েনি। মিঃ পামনানী সিন্ধু দাঙ্গা তদন্তে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

### উড়িষ্যা

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্রের বিশ্বাসঘাতকতা প্রায় নিষ্ফল হয়েছে। খালিলকোটের রাজার সঙ্গে মিলে তিনি যে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করছিলেন তার জন্যে কংগ্রেসী দলের লোক বিশেষ ভাঙাতে পারেন নি। ৩৭ জন কংগ্রেসী সদস্যের ৩১ জন ইতিমধ্যেই পণ্ডিত গোদাবরীর কাজের বিরোধিতা জ্ঞাপন করেছেন। মাত্র ৩ জনের বেশী কার্য্যত তাঁর পক্ষে নেই। ইতিমধ্যে তাঁকে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

### কংগ্রেস কর্ম্মপন্থা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নতুন নীতি পুণায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আলোচিত হবে। গান্ধীজীকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি এই অধিবেশনে উপস্থিত হতে রাজী হন নি। শোনা যাচ্ছে, গান্ধী নীতির ভক্তেরা ওয়ার্কিং কমিটির অহিংসা-বর্জ্জন নীতির বিরুদ্ধে পন্থ-প্রস্তাবের মতো একটা প্রস্তাব আন্‌তে পারেন। কিন্তু তা বাস্তবিকই আনা হবে কি না এবং আনলে কতখানি কার্য্যকরী হবে সেটা সন্দেহের বিষয়। একটা দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটে গান্ধীজীর প্রভাব সব চেয়ে বেশী অথচ খবর পাওয়া গেল যে, সর্দ্দার বল্লভভাই-এর সভাপতিত্বে গুজরাটে প্রাদেশিক কংগ্রেসে সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের অনুকূলেই অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেছেন।

গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির ব্যাপারটা যে অনেকটা রহস্যাবৃত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রাজাজী, সর্দ্দারজী প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠদের অন্য পথ নেওয়া, তাঁদের পথ ক্ষতিকর জেনেও এবং ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগে তাঁদের ঠিক পথে আনা সম্ভব ছিল জেনেও গান্ধীজীর প্রতিনিবৃত্তি, গান্ধীজীর নামে এখনো ওয়ার্কিং কমিটির ভাব-সমাধি ইত্যাদি ব্যাপার খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। অনেকে অনুমান করছেন, গান্ধীজী ইচ্ছে করেই নিকট ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পথকে দুই ভাগ করে' নিলেন। এক পথ আপোষের ও প্রয়োজনীয় হিংসার, অন্য পথ সম্ভাব্য সংগ্রামের ও নৈতিক আদর্শের। প্রথম পথ নিলেন তাঁর অনুচরবৃন্দ, দ্বিতীয় পথ নিলেন তিনি নিজে। প্রথম পথ বিপজ্জনক এক্সপেরিমেণ্টের পথ, সেখানে ব্যর্থতার সম্ভাবনা আছে; সেই কারণে গান্ধীজী দ্বিতীয় পথ ধরে' দেশের উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌লেন, এমনকি খানিকটা বাড়িয়েও নিলেন। যদি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের প্রথম পথ কোনো কারণে ব্যর্থ হয় তা হলে গান্ধীজী নিজে এগিয়ে এসে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন এবং ভারতবাসীর পরিচালনা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করবেন।

এ অনুমান সত্যি কি না এখন বোঝ্‌বার উপায় নেই।

## ইওরোপ

### জার্ম্মানী ও বৃটেন

হের হিটলার ১৯শে জুলাই বার্লিনে রাইখষ্টাগে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চলবার তিনি কোনো কারণ দেখেন না, কারণ বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে তিনি ইচ্ছুক নন। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখনো যুদ্ধ না থামান তাহলে বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করে ফেলা হবে। সেই মারাত্মক সংঘর্ষে জনসাধারণেরই ক্ষতি হবে বেশী; কারণ ইংলণ্ডে যাঁরা যুদ্ধ চালাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের অর্থ এবং পুত্রকন্যাদের ইতিমধ্যেই কানাডায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। হিটলার বলেন, মিঃ চার্চ্চিল মনে করতে পারেন যে, সংগ্রামে জার্ম্মানীই পরাজিত হবে; কিন্তু তিনি জানেন যে, পরাজিত হবে বৃটেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে হিটলারের বক্তৃতার উত্তর দিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স। তিনি ২২শে জুলাই এক

বেতার বক্তৃতায় বলেছেন যে, যুদ্ধ বৃটেন বাধায় নি, বাধিয়েছে জার্ম্মানীই। যতদিন না আমাদের এবং অন্যান্যদের স্বাধীনতা নিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন বৃটেন যুদ্ধ চালাবে। হিটলার বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চান না বলেছেন; কিন্তু শান্তি যে ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ইউরোপের অন্যান্য জাতগুলির যে স্বাধীনতার অধিকার আছে—তার আভাষ তাঁর বক্তৃতায় নেই।· লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন যে, হিটলারের যুক্তি হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন; কিন্তু ইংলণ্ডের লড়াই চালাবার সংকল্প তাতে আরো বৃদ্ধি পাবে।

এইবার চূড়ান্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা। জার্ম্মান অভিযান কি আকার নিবে তাই নিয়ে এখন জল্পনা-কল্পনা চল্ছে।

বৃটেনের উপর জার্ম্মান বিমান আক্রমণ সমানভাবে চল্ছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দাবী করছেন যে, তাঁরা প্রত্যহ বেশ কিছু জার্ম্মান বিমান ধ্বংস করছেন। ইংলণ্ডের আশেপাশে জাহাজ ডুবির সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। বৃটিশ নৌ বিভাগের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, জার্ম্মান বিমান ও সাবমেরিনের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়াতেই জাহাজ ডুবির সংখ্যা বেড়ে গেছে; জার্ম্মান আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে' তাঁরা আশঙ্কা করেছেন। বৃটিশ বিমানবহরও জার্ম্মানী ও জার্ম্মান অধিকৃত অঞ্চলের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছে।

পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী নৌ বহরের ক্ষতির জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন।

**বল্টিকে সোভিয়েট**

এ সপ্তাহে সোভিয়েটের রাজ্য-সীমা আরো বিস্তৃত হয়েছে। বল্টিক দেশগুলি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার নব-নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের সদস্যেরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কমিউনিষ্ট গণতন্ত্র স্ব স্ব দেশে প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করেন এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হতে চান। বল্টিক দেশের জনসাধারণ সোল্লাসে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন জ্ঞাপন করে। বল্টিক জমিদার-দের, বিশেষত জার্ম্মান জমিদারদের এতদিনের স্বৈরতন্ত্র গণশক্তির কাছে ধূলিসাৎ হ'ল। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই, এক বিন্দু রক্তপাত ছাড়াই এত বড় সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেল। বল্টিক সোভিয়েটীকৃত হওয়ায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বাড়ল ৬০ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা বাড়ল ৬০ লক্ষ।

**মার্কিন রাজনীতি**

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডেমক্র্যাটিক দলের সম্মেলনে তৃতীয়বারের জন্যে প্রেসিডেণ্ট পদ প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। তৃতীয়বার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে দাঁড়ানো প্রথাবিরুদ্ধ; এজন্যে প্রথমে দু একজন আপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে কেউ আর বিরোধিতা করেন নি। বর্ত্তমান মার্কিন কৃষি সচিব মিঃ ওয়ালেস্ সহ-সভাপতি পদের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়েছেন। তাঁকে মনোনীত করবার ইচ্ছে অনেকের ছিল না; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ইচ্ছার খাতিরে তিনিও শেষ পর্য্যন্ত মনোনীত হন। ডেমক্র্যাটিক দলে মিঃ ওয়ালেস একজন "আইসোলেশনিষ্ট" অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই ইউরোপের যুদ্ধে আমেরিকার জড়িত হওয়ার তিনি বিরোধী।

ডেমক্র্যাটিক সম্মেলনে গৃহীত দলের কর্ম্মসূচীতে বলা হয় যে, তাঁরা আমেরিকাকে ইউরোপের যুদ্ধে জড়িত করবেন না; তবে আমেরিকাকে কেউ আক্রমণ করলে বা মনরো নীতিতে হস্ত-ক্ষেপ কর্লে আমেরিকা লড়াই করবে। সাধারণভাবে তাঁরা গণ-তন্ত্রকে সমর্থন করেন এবং আইনানুযায়ী যতদূর সম্ভব গণতন্ত্রী দেশকে তাঁরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্মেলনে যে বেতার বক্তৃতা করেন তাতে তিনি ঐ নীতিই বিবৃত করেন এবং ডিক্টেটরী শাসনের তীব্র নিন্দা করেন।

ওয়াশিংটনের এক খবরে জানা গেল যে, স্পেন মারফৎ আমেরিকা থেকে জার্ম্মানী ও ইতালীতে প্রচুর তেল যাচ্ছে। রাশিয়া থেকে জার্ম্মানী যত তেল পেয়েছে বা পাবার আশা রাখে তার চেয়ে অনেক বেশী তেল যুদ্ধারম্ভের পর আমেরিকা থেকে জার্ম্মানীতে গেছে।

**জাপানে নতুন মন্ত্রিসভা**

জাপ সৈন্যবাহিনী "নতুন রাজনৈতিক গঠনের" জন্যে চাপ দেওয়ায় জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী—প্রিন্স কোনোয়ে, যিনি চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধান; পররাষ্ট্র সচিব—মিঃ মাৎসুওকা; সমর সচিব—লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল তোজো। শোনা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলিকে বিলুপ্ত করে' এক রকম ফাশিষ্ট শাসন স্থাপন করাই প্রিন্স কোনোয়ের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বেই জাপানে ট্রেড ইনিয়ন উঠিয়ে দিয়ে ফাশিষ্ট ধরণে মালিক-শ্রমিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপানের দাবী অনুযায়ী বর্ম্মা রাস্তা বন্ধ করায় আমেরিকা প্রতিবাদ জানিয়েছে। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক ও চীনা গবর্ণমেণ্ট শক্ত ভাষায় বৃটেনের কাজের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এই কাজের ফলে নিকট প্রাচ্যেও ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে; কিন্তু এভাবে চীনকে ঘায়েল করা যাবে না। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করুক বা না করুক চীন জয়-লাভ করবেই।

বর্ত্তমানে চীনের প্রধান সাহায্যদাতা হচ্ছে সোভিয়েট। বর্ম্মা পথ বন্ধ করা সম্বন্ধে সোভিয়েট নিশ্চয়ই তার মত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে; কিন্তু আমেরিকার মত সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করলেও 'রয়টার' সোভিয়েটের মতামত প্রচার করে নি।

কমন্স সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করে' এক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি মিউনিকের তোষণ নীতিরই পুনরাবৃত্তি নয়? এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে মিঃ চার্চ্চিল বলেন, চীনের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আছে; কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে জাপানের সঙ্গে গোলমাল করা বাঞ্ছনীয় নয়; সেই জন্যেই এই চুক্তিটা সাময়িক তিন মাসের জন্যে।

জাপ বাহিনী দক্ষিণ চীনের চারটি আন্তর্জ্জাতিক বন্দরে অভিযান করেছে। জাপানীদের সাফল্যের ভাসা-ভাসা খবর আস্ছে; কিন্তু অবস্থা স্পষ্ট কিছু এখনো জানা যায় নি।

২২।৭।৪০

—ওয়াকিবহাল

## সিনেমায় রবীন্দ্র-সংগীত

**"আলো ছায়া"** চিত্রের সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের 'ভুবন তো আজ হোলো কাঙাল' গান সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, পঙ্কজ মল্লিক গানটিতে নিজস্ব ঢং চালাইবার জন্য এবং স্থানে স্থানে নিজের ইচ্ছা মতন সুর বানাইয়া লওয়ায় গানটি দর্শকদের নিকট শ্রুতিকটু ঠেকিয়াছে। আমাদের এই অপ্রিয় সত্য মন্তব্যটি সহ্য করিতে না পারিয়া কোন একটি সিনেমা সাপ্তাহিক (ইংরেজি) খুব সম্ভবত 'আলো-ছায়া' চিত্রের মালিকদের খোসামোদের জন্য অথবা চাপে পড়িয়া তাহাদের পক্ষ লইতে গিয়া অশোভন উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এই পত্রিকাটি গায়ের জ্বালা মিটাইতে না পারিয়া খানিকটা প্রলাপোক্তির পর বলিয়াছেন ..."Recently, some uncharitable remarks were made by a critic in respect of a certain song that was adapted for the screen and sung by Pankaj Mullick. We may state here for the information of the critic that we have learnt on authority that a disk of the song was specially made and sent to the poet for his approval. The little deviation was approved by him ".

যে 'অথরিটি'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার মিথ্যার আশ্রয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্পাদককে উস্কাইয়া মন্তব্য লিখাইয়া লইবার হীন মনোবৃত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আমরা বিশ্বভারতী হইতে খোঁজ লইয়া জানিলাম রবীন্দ্রনাথ রেকর্ডটি শুনিয়া তাঁহার গানের এইরকম বিকৃতরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা অমনোনীত করিয়াছেন।

এই রেকর্ড সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া আরও জানিতে পারিলাম যে, রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিক এই গানটি যখন শিখাইতেছিলেন, তখন শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপক তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া পত্র দেন এবং পঙ্কজবাবু সে পত্র রেডিওতে পাঠ করেন ও সংশোধন করিবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সিনেমায় ও রেকর্ডে তিনি সে সংশোধন না মানিয়া নিজের জিদকেই বজায় রাখিয়াছেন।

যাহা হউক, এই মিথ্যা সংবাদের জন্য উক্ত সাপ্তাহিকের সম্পাদককে আমরা দোষ দিই না—দোষ দিই, যাঁহারা এই সংবাদটি দিয়াছেন তাহাদের। তবে সম্পাদক মহাশয়ের উচিত ছিল, এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যাচাই করিয়া লওয়া।

সিনেমায় রবীন্দ্র-সংগীতের বিকৃতি ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত নহে; ইতিপূর্বে আরও বহুবার হইয়াছে, এবং প্রতিবারই রবীন্দ্রনাথ তাহা অনিচ্ছার সহিত অনুমোদন করিয়াছেন কোম্পানীর ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া। কিন্তু এবার তিনি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গায়কের প্রতি নির্মম হইলেও, নিজের গানের প্রতি সুবিচার করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র সংগীত যাঁহারা ভালবাসেন সেই সব শ্রোতারাও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন যে, রবীন্দ্র সংগীতের নামে তাঁহাদের আর ভেজাল শুনিতে হইবে না।

'ঘর-কী-রাণী' চিত্রে মীনাক্ষী ও লীলা চিটনীশ। ছবিটি নিউ সিনেমায় তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াছে

আজকাল দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে রুচির পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, সস্তা জিনিসে তাঁহারা আর ভুলিতে চাহেন না এবং সেই কারণেই রবীন্দ্র-সংগীতের চাহিদা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। সিনেমায় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচলনের যাঁহারা দায়িত্ব লইয়াছেন, তাহাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তার বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভাষা ও সুরের মিল। সেই সুরকে খর্ব করিলে চলিবে না: কারণ সেখানে সুরের গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে কম নহে! কবির গানে কথা ও সুর পরস্পরের এমনই অনুগামী যে, উহাদের সম্পর্ক কাঁচির দুইটি ফলার মতে অবিচ্ছেদ্য। কবির সংগীতের পশ্চাতে যে বাণী তাহা একান্তভাবে কথারও নহে বা সুরেরও নহে—উভয়ের সম্মেলনে যে রসানুভূতি তাহাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গানে যাঁহারা তাঁহার সুরকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করিয়া আপন ওস্তাদী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কবির সংগীতের বাণীকে বিনষ্ট করেন। সেই সংগীত-পালোয়ানদের উদ্দেশ্য করিয়াই সম্প্রতি নিজের গান সম্বন্ধে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি না বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। আমার গান যেন আমার গান বলেই মনে হয় সেইটি তোমরা করো।" সেই সঙ্গে আমরাও বলি যে খোদার উপর খোদকারি না করিয়া নিজেদের রচিত গানের উপর যত খুশি খোদকারি করুন তাহাতে আমাদের কিছু বলবার থাকিবে না।

### আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে একটি খেলাও খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। অনুষ্ঠিত সকল খেলাকে সাধারণ খেলার পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে। ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে এই প্রতিযোগিতার যে সম্মান ছিল তাহা ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিলে অন্যায় করা হইবে না।

### সৈনিক দলের অবসর গ্রহণ

এই বৎসরের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় দানাপুরের লিন্‌কন্‌ সায়ার রেজিমেণ্ট ও কলিকাতার বর্ডার রেজিমেণ্ট, এই দুইটি গোরা সৈনিক দল যোগদান করিয়াছিল। কোন বিশেষ কারণে এই দুইটি দলই প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। বর্ডার সৈনিক দল স্থানীয় দল হইয়াও প্রতিযোগিতায় যোগদান করিল না ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। প্রত্যেক বৎসরেই গোরা সৈনিক দলকে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছে।

### বাহিরের দলের অবসর গ্রহণ

সৈনিক দল ছাড়াও কলিকাতার বাহিরের দুইটি দল কাণপুরের গোল্ডেন স্পোর্টস ক্লাব ও ঢাকার ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং প্রতিযোগিতায় নাম দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করে নাই। কেন যে ইহারা যোগদান করিল না তাহার কারণ ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। এইরূপভাবে বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করায় অনেকের মনেই নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা জাগিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আই এফ এ শীল্ড পরিচালকগণের দোষেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন বাহিরের দলসমূহকে শীল্ড পরিচালকগণ যেরূপ অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করিতে না পারায় বিভিন্ন দলকে প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন ঠিক মত দল গঠন করিতে না পারায় উহারা এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃত কারণ কি তাহা আই এফ এ শীল্ড পরিচালকগণ প্রকাশ করিলে উপরোক্ত কোন্‌টি সত্য তাহা ক্রীড়ামোদিগণ জানিতে পারিবেন এবং শীল্ড পরিচালকগণের সুনামও রক্ষা পাইবে।

### বাঙলার বিভিন্ন জেলার দল

এই বৎসর বাঙলার প্রায় সকল জেলা হইতেই একটি করিয়া দল আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের যোগদানকারী দলের সংখ্যাও অনেক বেশী। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে এই সকল বিভিন্ন দলের পরিচালকগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন দেখিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। খেলোয়াড় তৈয়ারী করার দিকে ইঁহাদের যে কোনরূপ দৃষ্টি নাই তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ যাঁহারা এই সকল দল হইতে ভবিষ্যতে খেলোয়াড় গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারাও হতাশ হইয়াছেন। বিভিন্ন জেলার দবসমূহ খেলায় ক্রমোন্নতি না করিয়া অবনতির দিকে চালিত হইয়াছেন ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন। কলিকাতার খেলোয়াড়গণের ন্যায় বাঙলার বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়গণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্রমশই নিম্ন স্তরের হইতেছে দেখিয়া বাঙলার ফুটবল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইয়াছেন।

### মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ক্রীড়ামোদিগণের মনে এই ধারণাই বিশেষভাবে জাগিয়াছে যে, ফাইন্যালে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দল মিলিত হইবে। এই ধারণা শেষ পর্য্যন্ত সত্যে পরিণত হইবে কি না তাহা এখনও বলা যায় না। মোহনবাগান দল প্রথম খেলায় অতি সহজে খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিং দলকে ৬—০ গোলে পরাজিত করিলেও পরবর্ত্তী রাউণ্ডে বেঙ্গল আর্টিলারী, পুলিশ ও ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করিবে ইহা এখন হইতেই দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। বেঙ্গল আর্টিলারী ও পুলিশ দল মোহনবাগানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যে করিবে সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিপূর্ব্বেকার লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবকে বিজয়ী হইতে দেয় নাই। ইহা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্লাব, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত না করিতে পারিলে ফাইনালে উপনীত হইতে পারে না। অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরও শীল্ড ফাইনালে পেঁছিবার পথে রেঞ্জার্সও বাঙ্গালোর মুসলিম দল বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিবে। তবে রেঞ্জার্স ক্লাবের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ এই দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জনী লামসডেন এখনও পর্য্যন্ত সুস্থ হন নাই। তিনি যে শীঘ্র সুস্থ হইবেন তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাঁহার অবর্ত্তমানে দলের শক্তি খুবই কমিয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালোর মুসলিম দল—যাহারা দুইবার রোভার্স কাপ বিজয়ী হইয়াছিলেন ও ১৯৩৭ সালে এই শীল্ড প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে পরাজয় বরণ করিবেন না। এই দলটি পরাজিত হইলে মহমেডান স্পোর্টিং ফাইনালে উপনীত হইবেন এবং তখন শীল্ড বিজয়ী হইবারও সম্ভাবনাও যথেষ্ট হইবে।

আই এফ এ শীল্ডের বিভিন্ন খেলার ফলাফলঃ—

খুলনা ইউনিয়ন (২) সুবার্ব্বন (১), অরোরা এ্যাথলেটিক (১) বহরমপুর (০), রাজসাহী স্পোর্টিং (১) ই আই আর (০), পুলিশ এ সি (১) কুমারটুলী (০), ই বি আর (২) নর্থ সুবার্ব্বন (০), খুলনা টাউন (৪) বরিশাল (১), তরুণ সমিতি (২) বনবিহারী (১), ভবানীপুর ক্লাব (২) হাওড়া জেলা (১), এরিয়ান্স ক্লাব (২) দোমোহানি (১), স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) বার্নপুর ইউ (০), কাষ্টমস এ সি (১) ফরিদপুর (০), হুগলী সেণ্ট্রাল (১) হাওড়া ইউঃ (০), রেঞ্জার্স ক্লাব (৩), কুটিগান্দি (১), মোহনবাগান (৬), খুলনা ইউনিয়ন (০), বেঙ্গল আর্টিলারী (২) অরোরা (০), পুলিশ এ সি (৩) পেশোয়ার (০), কাষ্টমস (১) উয়াড়ী (০), ভবানীপুর (২) অরুণ সমিতি (০)।

### তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়

ঢাকার এগ্রিকালচার ফার্ম্মের কেমিষ্ট মিঃ চ্যাটার্জ্জির পুত্র শ্রীমান সুভাষচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি কলিকাতার বিখ্যাত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন খেলোয়াড়। ইনি ১৯৩৭ সালে ঢাকা দলের পক্ষে এবং ১৯৩৮ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি এখন এলাহাবাদের এগ্রিকালচার ইনষ্টিটিউটের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলিকাতার প্রথম বিভাগীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ইনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ।

# সমর বার্ত্তা

**১৭ জুলাই।—**

ওরানে ব্রিটিশ নৌবহরের আক্রমণে ফরাসী নৌবহরের ক্ষতির জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটেনের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়াছেন। প্রকাশ, ফরাসী দূতাবাসের কর্মচারীরা দু-এক দিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিবে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রুমানিয়া হইতে বেসারেবিয়াগামী লোকদের প্রতি অসদ্ ব্যবহারের রুমানিয়া-কৃত অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লণ্ডনের ইস্তাহারে প্রকাশ, ব্রিটিশ বোমারু বিমান ময়ালের উপর সফল আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইটালি কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার উপরেও বিফল হাওয়াই হামলার সংবাদ ছিল।

টোকিওর সংবাদ—প্রিন্স কনোয়েকে মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের পথে চীনে সমরসম্ভার প্রেরণ তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখিবার এক চুক্তিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বাক্ষর করিয়াছেন।

**১৮ই জুলাই**

বিমান বিভাগ ও দেশরক্ষা বিভাগ এক ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, রাত্রিকালে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস-এর উপর জার্মন বিমানবহর কিছু তৎপরতার সহিত আক্রমণ চালাইয়া বিভিন্ন স্থানে বোমা ফেলিয়াছে। মাত্র কয়েক স্থানে ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই লোক কিছু হতাহত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ঐ দিন দিবাভাগে জার্মন বিমান স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে হানা দেয়। ফলে কয়েকজন লোক হতাহত হয়। বোমার টুকরায় স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একজন স্ত্রীলোক নিহত হয়।

ডোমেই এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, লিংপুরে অদূরবর্তী চেনহাইর কাছে জাপানী নৌবহর একখানি বৃটিশ জাহাজ আটক করিয়াছে।

ডেলী এক্সপ্রেস পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা হংকং হইতে জানাইয়াছেন, টোকিয়স্থ বৃটিশ দূত পাঁচটি সর্তের ভিত্তিতে চীন জাপানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

**১৯ জুলাই**

অদ্য হের হিটলার রাইখষ্ট্যাগে বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি ভার্সাই সন্ধির সর্তাবলী আঁকড়াইয়া থাকায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর দোষারোপ করেন। যুক্তি ও সাধারণ বিচার বুদ্ধির অধিগম্য বলিয়া তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, তৎপ্রতি ইংল্যাণ্ডের লোকেরা কর্ণপাত না করিলে লণ্ডন, ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করা হইবে বলিয়া হের হিটলার হুমকী দেখান।

ইতালী ও সেগনের মধ্যে ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে চুক্তির আয়োজন হয়। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেনে ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যে সব জাহাজ অন্যায়ভাবে আটক করা হইয়াছে বা ছত্রভংগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যার্পণ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, বৃটেনের আক্রমণে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে বা যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জন্য রীতিমত ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ ও ইতালীয় রণতরীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একটি ইতালীয় ক্রুজার জলমগ্ন হইয়াছে।

দেশ রক্ষা সচিবের একটি ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের এক স্থানে বিমানবহরের কতক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। একটি স্কটিশ সহরে একট অট্টালিকা ধ্বংস হয় এবং কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কতিপয় লোক জখম হয়। দক্ষিণ ওয়েলস-এ কয়েকটি বোমা বর্ষিত হয় ফলে কয়েকজন লোক জখম হয়।

**২০ জুলাই।—**

ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে জার্মন বিমান-বহর হামলা করিয়াছে। গত রাত্রে স্কটল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে দুইবার আকাশযুদ্ধ হয়। ১২০টিরও বেশী জার্মন এয়ারোপ্লেন এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। লণ্ডনের ১৯ জুলাইএর সংবাদ—ইংরেজরাও শত্রুস্থানের বহু স্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছে।

রাইখস্টাগের হিটলার-বক্তৃতার উপসংহারে মার্শাল গোয়েরিং এক বক্তৃতায় হিটলারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন, 'এক বীরত্বপূর্ণ ও অভূতপূর্ব সংগ্রাম শেষ হইয়াছে; সম্মুখে আর এক সমান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম উপস্থিত। ফুরার ব্রিটেনের সাধারণ বুদ্ধির নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে সাড়া দেওয়া না দেওয়ার উপর ওই সংগ্রাম নির্ভরশীল।'

আফ্রিকায় ব্রিটিশরা নানা স্থানে সফল আক্রমণ চালাইয়াছে। রোমের এক ইস্তাহারে গতকল্য ইতালির বারটোলোকিও কলিওনিও' জাহাজটির ইংরেজ কর্তৃক জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

সমুদ্রপথে সমরসামগ্রী আনয়ন বন্ধ হওয়ায় চীন রাশিয়া ও সেচুয়ান প্রদেশ দিয়া স্থলপথে তাহা আমদানি করিবার কথা বিবেচনা করিতেছে।

**২১ জুলাই**

অদ্য প্রাতঃকালে ওয়েলসের কোন এক সহরের উপর জার্মনীর ১৫টি বোমা বর্ষিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের একটি অঞ্চলে জার্মন বিমানসমূহ দুইবার হানা দিয়া ১২টি বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। দোকানপাট ও ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয়। ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপর জার্মন বিমান নীচু দিয়া উড়িয়া আসিয়া বোমা ফেলে। একটি বোমা একটি স্কুলের উপর পড়ে। একজন নিহত ও কয়েকজন জখম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জার্মন নিউজ এজেন্সীর রিগার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, লাটভিয়ান গবর্নমেণ্ট অদ্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লাটভিয়া সোভিয়েট গণতন্ত্রে পরিণত হইবে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে।

প্রাতঃকালে মাল্টায় তিনবার বিমান আক্রমণ চলে। বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে একটি জার্মন বিমান ধ্বংস হইয়া সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়।

**২২ জুলাই**

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, অপরাহ্ণে ৮০টি জার্মন বোমারু ও জঙ্গী বিমানের সহিত ৬টি বৃটিশ বিমানের এক সংঘর্ষ হয়। বৃটিশ বিমানসমূহ একটি জার্মন মেসার্সমিট বিমানকে ভূপাতিত করে এবং কয়েকটিকে জখম করে। জার্মন বিমানগুলি ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

নৌবিভাগ বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার 'ব্রেজেন' ডুবির সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষে তোব্রুক ও এললুবি বিমানঘাঁটিতে ব্রিটিশ বিমান হানা দেয়। ফলে এলগুবিতে তিনটি অগ্নিকাণ্ড হয়।

প্রকাশ যে, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিবেচনার জন্য শীঘ্রই সোভিয়েট সুপ্রীম কাউন্সিলের এক বৈঠক হইবে।

**২৩ জুলাই**

লণ্ডনের অদ্য কমন্স সভায় মিঃ এণ্টনী ইডেন জানান যে স্থানীয় দেশরক্ষা স্বেচ্ছাবাহিনী অতঃপর দেশরক্ষা বাহিনী নামে অভিহিত হইবে। উক্ত বাহিনী এক্ষণে ১৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে সেইজন্য বর্তমানে নূতন লোক ভর্তি করা হইবে না।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

**১৭ জুলাই।—**

**কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার, বিবৃতি, বিজ্ঞাপন, নোটিশ সংবাদ, ফটোগ্রাফ, মন্তব্য, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রভৃতির সংবাদ বা এই আদেশ সম্বন্ধে মন্তব্য সংবলিত কোনও কিছু প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বাঙলার সমস্ত মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকগণের প্রতি বাঙলার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে।**

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বদনগঞ্জ (হুগলি), বারাসত, বহরাগোরা (সিংহভুম), নবীননগর (ত্রিপুরা), কাঁথি, যশোহর, সুনামগঞ্জ, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ, উখরা, সাতঘরা (২৪ পরগণা) প্রভৃতি স্থানে নিখিল ভারত সুভাষ দিবস পালিত হইয়াছে।

সিন্ধু পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত হাসারাম পামনানি শক্কর রোরি স্টেশন হইতে রোরি শহরে যাইবার সময় এক আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

**১৯ জুলাই**

বাঙলার বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ও শ্রমিক কর্ম্মীদিগের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শুক্রবার সায়াহ্নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় ভারত রক্ষা আইনে ধৃত কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**২০ জুলাই।—**

অপরাহ্নে জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবং অর্থসচিব শ্রীযুক্ত এইচ এস সুরাবর্দির সভাপতিত্বে গোরাচাঁদ রোডে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের আউটডোর ডিসপেন্সারির ভিত্তি-স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণান্তে বক্তৃতা করিয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় লখনৌএ যুক্তপ্রদেশ আজাদ মুসলিম সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ তাঁহার অভিভাষণে পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের 'সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার' ত্যাগ করত দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, গোরখপুর, দার্জিলিং, লাহোর, কাশী, ঢাকা, নাগপুর, পাটনা, সাসারাম, কুষ্টিয়া, বহরমপুর, সরিষাবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বর্ধমান, দিনাজপুর, রাজবাড়ি প্রভৃতি বহুস্থানে ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলার জন্য শক্করের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন। সিন্ধু মন্ত্রিমণ্ডলীর জরুরী অধিবেশন হইতেছে।

**২১ জুলাই**

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল রবিবার সকালে তাঁহার দিল্লীস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

ভারত রক্ষা আইন অনুসারে পাঞ্জাব, লাহোর, রাজসাহী, ডাল্টনগঞ্জ, মাদারীপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রায় যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া এবং শাস্তিমূলক বিধানের উল্লেখ করিয়া বাঙলা সরকার সম্প্রতি যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে সোমবার ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের এক সভা হয়। অনুমান দুই ঘটিকার সময় বহু সংখ্যক পুলিশ ও গুর্খা মিলিটারী পুলিশ ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভাটি ভাঙ্গিয়া দেয়। লাঠি চালনার ফলে বহু ছাত্র অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে শত শত নরনারী সমবেত হইয়া তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতিথি অনুষ্ঠান যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে।

**২৩ জুলাই**

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মিঃ এইচ ভি কামাথ ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মিঃ কামাথ জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় আপত্তিকর বক্তৃতা করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

জাতীয় সপ্তাহ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও কিষাণ-নেতা স্বামী সহজানন্দ সংশিলষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠানের সংবাদ, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রকাশ ও সরকারী কার্য্যব্যবস্থার সমালোচনা নিষিদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় সরকার গত ৫ই এপ্রিল ভারত রক্ষা বিধান অনুযায়ী যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, "দৈনিক বসুমতী"র 'বামপন্থী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহা উপেক্ষা করা হইয়াছে—এই অভিযোগে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও মুদ্রাকর এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের বিরুদ্ধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যে মামলা দায়ের হইয়াছিল, সোমবার ম্যাজিস্ট্রেট তাহার শুনানী শেষ করিয়া রায় দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট উভয় আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

গত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যে ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহা ৫৩ জন প্রবাসী ভারতীয়কে ব্রহ্ম দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজনকে নাকি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপ্রদেশ হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে।

ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার বিষয় লইয়া মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কৃষক প্রজা দলের সদস্য সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী গত সোমবার অপরাহ্নে ইসলামিয়া কলেজের মধ্যে পুলিশ যে লাঠি চালনা করে এবং যাহার ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্র আহত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য উক্ত মুলতুবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। মুলতুবী প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই; উহা কেবল আলোচনাতেই পর্যবসিত হয়। সর্ব্বসমেত বারজন মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কে যোগদান করেন। বিভিন্ন বক্তা পুলিশের ঐ লাঠি চালনার তীব্র নিন্দা করেন। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কে-ই বা পুলিশের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং কাহার আদেশ অনুযায়ীই বা গুর্খাদল সহ পুলিশবাহিনী ঐ স্থানে গিয়াছিল?

**২৪ জুলাই**

**মঙ্গলবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট হলওয়েল মনুমেণ্ট স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।**

**প্রধান মন্ত্রী ইহাও ঘোষণা করেন যে, ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন।**

# বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(৭ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা হইতে ৩৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত)

৭ম বর্ষ। শনিবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 3rd August, 1940 । ৩৮শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

**লোকমান্য তিলক—**

গত ১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ভারতের সর্ব্বত্র লোকমান্য বালগংগাধর তিলকের বিংশতিতম স্মৃতিবার্ষিকী

উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পরাধীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে লোকমান্য তিলকের রুদ্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সাধনা ধ্রুবতারকার ন্যায় স্বদেশসেবকদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিবে। লোকমান্যের স্বদেশপ্রেম ছিল অবিমিশ্র এবং উজ্জ্বল, এই জন্য তাঁহার নীতিও ছিল সুপরিস্ফুট। অধীন ভারতে লোকমান্যের ন্যায় রাজনৈতিক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশ বৎসর অতীত হইল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক বিপর্য্যয়ও ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অবলম্বিত নীতির গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দুর্গম পথের অভিযাত্রী ভারতের এই বরেণ্য সাধক একদিন যে সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মাবদানের মহৎ সাধনার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র দেশবাসীকে বার বার শুনাইতে হইবে, বলিতে হইবে এই কথা যে, সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথায় কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না—'সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে' এবং মানুষের মত বাঁচিতে হইলে স্বাধীনতার জন্য সেই প্রয়াসের প্রয়োজন সকলের আগে; কারণ স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার বিকাইয়া দিলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। লোকমান্য তিলকের মহত্তর আদর্শ আমাদিগকে কবে সকল মিথ্যাচার হইতে সত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং শক্তিময় সাধনার প্রভাবে অকেজো উঁচু কথার আড়ালে প্রচ্ছন্ন ভীরুতা এবং দুর্ব্বলতা হইতে জাতি মুক্তিলাভ করিবে তাঁহার অমর আত্মা উর্দ্ধলোক হইতে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

---

**পুণার সিদ্ধান্ত—**

পুণায় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রস্তাবটিই পাশ হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাবের কোন জবাব দেওয়া এ পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নাই; অধিকন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতসচিব মিঃ আমেরী পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি দিবার মত কিছুই নাই। ভারতের অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, এমন মত তিনি স্বীকার করেন না। ভারত-সচিবের এই উক্তি হইতে ইহা আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না যে, কংগ্রেসের দিল্লী প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা করা যে অবিলম্বে আবশ্যক, ইহা তাঁহারা দরকার বোধ করেন না। কংগ্রেসের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিবার কোন গরজ তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কংগ্রেসের মতামত—নিরপেক্ষভাবেই ভারতে

তাঁহাদের নীতি সার্থক করিয়া তুলিবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ মনোবৃত্তি বুঝিয়াও পুণায় দিল্লী-প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী বলেন, "ভাবাবেগে চালিত হইয়া ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিছু করিলে ভুল করা হইবে। কংগ্রেসের প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, তবে তখনকার তুলনায় এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা জানি না, কিম্বা স্থূল দৃষ্টিপাতে বুঝিতে পারিতেছি না; আমরা কংগ্রেসের দাবীর প্রতি উত্তরোত্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষার মনোভাবই দেখিতে পাইতেছি। অথচ রাজাগোপাল আচারী প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই বাস্তব মনোবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহেন নাই। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী বলেন,—'আমরা আমাদের দাবী পরিহার করি নাই। আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়াছি যে, আমাদের দাবীসমূহ গৃহীত হইলে, গ্রেট ব্রিটেন আমাদের আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতা পাইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের দাবী গ্রহণ করেন তো ভালই, কিন্তু যদি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমাদের নিজ পন্থা অনুসরণে কোন বাধা থাকিবে না এবং আমরা তাহা করিব।' রাজাজীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য উপযাচক বৃত্তিই তাঁহার বক্তব্যে পরিস্ফুট। আত্মনির্ভরতার মর্য্যাদাপূর্ণ দৃঢ়তার দৈন্যকে তিনি ভাষার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। গত দশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে যেভাবে নেতাগিরি ফলাইয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় এই নীতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য উপায় তাঁহাদের নাই। কার্য্যকর শক্তিকে উদ্বোধন করিবার দিক দিয়া তাঁহারা যান নাই; সুতরাং আপোষ-নিষ্পত্তির অনিবার্য্যতাই আজ তাঁহাদের দৃষ্টিতে বাস্তব রাজনীতি হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তাঁহাদের নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি।

---

**মতবাদের সংঘর্ষ—**

রাজনীতি বাস্তব লইয়াই বিচার করে। শুদ্ধ অহিংসা খুব উঁচু দরের জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু দেশ শাসন এবং দেশ রক্ষা এ সব ব্যাপারে শুদ্ধ অহিংসা প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র জগতে আজ আসে নাই; কোনদিনও আসিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে এ সত্য আজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, শুদ্ধ অহিংসার স্থান বাস্তব রাজনীতিতে নাই। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধেও উহার প্রয়োগ চলে না; অন্তঃশত্রুর বিরুদ্ধেও উহা কার্য্যকরভাবে প্রয়োগ সম্ভব নহে। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী গোঁড়া অহিংসবাদীদের প্রত্যুত্তরে কয়েকটি সোজা সত্য কথা বলিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি বলেন,—"মহাত্মাজী নিজে এতদিন কি করিয়াছেন? যুদ্ধের জন্য যখন তিনি নিজে সৈন্য সংগ্রহের কাজে যোগদান করিয়াছিলেন, তখন কি

সম্পর্কে মহাত্মাজীর দৃঢ় বিশ্বাস। অতীতে তিনি কি একবার নিজে শ্রমিকদের হাতে মদ তুলিয়া দেন নাই? কিন্তু ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দেয় নাই। চরম লক্ষ্যে বিশ্বাস করা এক কথা, আর বাস্তব হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া অন্য কথা। কাজেই অসামঞ্জস্যের ভয়ে তাঁহাদের পশ্চাৎপদ হওয়ার কোন কারণ নাই।" ওয়ার্কিং কমিটি আজ এই যে সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন, যদি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা তাহা করিতেন এবং পদে পদে অহিংস নীতির শুচিবায়ুতে শঙ্কিত না হইয়া সাহসিকতাপূর্ণ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য্যকর নীতি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা আজ অন্য রকম হইত। সুভাষচন্দ্রের অবলম্বিত নীতির সার্থকতা দক্ষিণী দলকে যে এতদিনেও এইভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইল, ইহাও সুখের বিষয়। আরও কিছুদিন আগে এ সম্বন্ধে চৈতন্য হইলে ভাল ছিল; তাহা হইলে আর সমুদ্র-পার হইতে কর্ত্তারা ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে এতটা ঔদাসীন্য দেখাইতে পারিতেন না। পুণার সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত এই মর্ম্মান্তিকতা আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

---

**চারটি দাবী—**

বাঙলা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে শান্ত করিবার জন্য এখনই যাহা আবশ্যক, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম দাবী এই যে, ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ছাত্রদের উপর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের উপর লাঠি চালনা, ইসলামিয়া কলেজে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তেমন ব্যাপার চিরদিনের জন্য বন্ধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, ইসলামিয়া কলেজের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি বে-সরকারী কমিটি গঠন করিতে হইবে। চতুর্থ দাবী ২রা জুলাই হইতে যাঁহারা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র যে কয়েকটি দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি বাঙলার জনসাধারণেরই দাবী; তিনি জনসাধারণের মুখপাত্রস্বরূপে সেই দাবী প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবৃতি শুধু বোলচালের মধ্যে না রাখিয়া যদি কার্য্যে পরিণত করিবার মতিগতি মন্ত্রীদের সত্যই থাকে, তাহা হইলে এই সব দাবী পূরণ ব্যাপারে বিশেষ কোন গোল দেখা দিবার কারণ থাকে না। বিপন্ন ইসলামের ভুয়া জিগীর তুলিয়া বাঙলার জনমতকে যে আর দমিত করিয়া রাখা যাইবে না, বর্ত্তমানে বাঙলার ছাত্রসমাজ বাঙলার মন্ত্রীদিগকে সে সত্যকে সমীহা করিবার মত শিক্ষা দিয়াছে বলিয়াই আমরা আশা করি। হিন্দু এবং মুসলমানের ভেদবুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া বাঙলার ছাত্রসমাজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে আজ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। মন্ত্রীদের এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের দাবী অবিলম্বে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, তরুণদের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া মানবতার মহত্তর উচ্ছ্বাস উঠিতেছে—এই যৌবন জলতরঙ্গকে কেহ দমননীতির প্রয়োগে রুদ্ধ করিতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িকতার বুলি আওড়াইবার মূলে অভিপ্রায় সম্প্রদায়ের হিত সাধন নয়, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি, বাঙলার মুসলমান ছাত্রসমাজ এই সত্যটি ধরিয়া ফেলিয়াছে, শুধু ধরিয়াই ফেলে নাই, ঐরূপ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাই সব চেয়ে আশার কথা।

**সিরাজ ও মোহনলালের স্মৃতি—**

কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা এই দাবী করিয়াছেন যে, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও হলওয়েল লেনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে সিরাজদ্দৌলা ষ্ট্রীট ও মোহনলাল লেন রাখিতে হইবে। বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রীদের হাতে নয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে, সুতরাং আশা করা যায়, এই দাবী প্রতিপালনে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে না। ক্লাইভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নামটা কলিকাতা শহর হইতে লুপ্ত হইতে দেখিলে, এক শ্রেণীর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বুকে ব্যথা লাগিবে, ইহা আমরা জানি, কিন্তু জগতের বাতাস আজ যে দিকে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে এই আদরের নামটি গোপনে হৃদয়ে রাখিলেই ভাল হয়। আর হলওয়েল? হলওয়েল সাহেবের কোন গুণ ছিল না আমরা বলি না, তাঁহার মিথ্যা সাজাইবার কৌশল জানা ছিল; কিন্তু এ গুণটা বিদেশী রাজনীতির বাজারে এতই সস্তা হইয়া গিয়াছে যে, উহার জন্য হলওয়েল সাহেবের স্মৃতির আর প্রয়োজন হইবে না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে নিজেদের দেশে নিজেদের খরচায় গুণগ্রাহী সমাজ সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা আশা করি, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব এবং বাঙলার স্বাধীনতার জন্য আত্মদাতা বীর মোহনলালের নাম বাঙলার রাজধানী বক্ষ অচিরে অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গে নবজাগরণের সূচনা করিবে।

**দায়ী কাহারা?—**

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙলা দেশ হইতে একটি সৈন্যদল গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার নাম হইবে ষোড়শ বাঙালী পল্টন। বাঙালী অসামরিক জাতি বলিয়া বাঙলার উপর যে কলঙ্ক এতকাল আরোপিত ছিল, ভারত সরকার এতদিন পরে যে তাহা অপসারিত করিলেন, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্বন্ধে বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব যে মনোবৃত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে বাঙালী সৈন্যদল গঠনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা উচিত, পরিষদে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব ওজর তুলেন, খরচ যোগাইবে কে? বাঙলা দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা যেন ভারত সরকারের কত ঔদার্য্য এবং অনুগ্রহের ব্যাপার। বাঙালীকে যখন তাঁহারা জাতে তুলিবেন, তখন পয়সা বাঙালীকে দিতে হইবে না? বাঙালী যে অপাংক্তেয়। ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে সেনা সংগ্রহ এবং সেনা সজ্জার পয়সা ভারত সরকার দিলেও, বাঙলা দেশের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত স্বরাষ্ট্রসচিবের উপলব্ধি হইয়াছে এই দিক হইতে। অথচ এই সঙ্গেই তিনি বাঙালীর জাতীয় মর্য্যাদার জন্য দরদ ফলাইয়াছেন যথেষ্ট। তিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে,—"ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আজ বাঙালীর দুর্দ্দিন পড়িয়াছে। কি কেন্দ্রীয় আইন সভা, কি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, কোথাও বাঙালী ন্যায্য অধিকার পায় না। বাঙালীর অধিকার রক্ষার জন্য বাঙালীকেই উদ্যোগী হইতে হইবে।" বাঙালীর জাতীয় মর্য্যাদার প্রতি স্যার নাজিমুদ্দিনের সহানুভূতির উচ্ছ্বাস নূতন জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার মূলে বাঙালীর বর্ত্তমান মন্ত্রীদের নীতি কতখানি আছে, সে বিবেচনা যদি স্যার নাজিমুদ্দিনের থাকিত, তবে বড় মুখে তিনি ঐ সব কথা বলিতে পারিতেন না—সঙ্কোচ একটু আসিত। সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতির সম্প্রসারণের দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কি বাঙালীকে বাঙালীত্ব ভুলাইয়া কে হিন্দু, কে মুসলমান এই ভাবই এখানে বড় করিয়া তুলেন নাই? এখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতি সেইদিকেই নির্লজ্জভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিচার করিয়া যোগ্য বাঙালী থাকিতে অবাঙালীকে আনিয়া চাকুরী দিবার উদ্যোগ চলিতেছে। সেনা-সংগ্রহের এই ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্র সচিব বাঙলার জাতীয় মর্য্যাদার হানিকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা না করিয়া জাতীয় মর্য্যাদার বিরোধী মনোভাবই দেখাইয়াছেন। ভারত সরকার ঠিক করিয়াছেন যে, বাঙালী পল্টনে শতকরা ৫০ জন মুসলমান গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রথমত হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভেদমূলক নীতির ভিতর দিয়া এমন প্রস্তাব বাঙালীর সংহতির পক্ষে হানিকর। দ্বিতীয়ত, যেমন সেনাদল যোগ্যতার হিসাবে বাঙালীর জাতীয় মর্য্যাদাকর হইত, এমন প্রস্তাব তেমন সেনাদল গঠনের পরিপন্থী। শতকরা ৫০ জন মুসলমান লইতেই হইবে, যেখানে নিয়ম এমন ধরাবাঁধা, সেখানে অযোগ্য ব্যক্তিকেও যোগ্য ব্যক্তি ছাড়িয়া সেনাদলে গ্রহণ করিবার বাধ্যতা আসিয়া বর্ত্তে। ইহার ফলে হয়ত আমরা শুনিতে পাইব যে, বাঙালীদের সামরিক যোগ্যতা নাই। তখন শাসকেরা এই সত্য চাপা দিয়া যাইবেন যে, তাঁহাদের নীতিরই সেই ফল; বাঙালীর অযোগ্যতার নহে।

**বিদ্যাসাগর স্মৃতি—**

গত সোমবার বাঙলা দেশের নানাস্থানে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের ঊনপঞ্চাশৎ স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই পরাধীন দেশে বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুরুষ-

সিংহের আবির্ভাব একরূপে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়! পাণ্ডিত্য, প্রখর বুদ্ধি-শক্তি—সর্ব্বোপরি প্রবল অপরাধীন চিত্ততার অপূর্ব্ব আলোকে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্বের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপে এই মরা জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল জ্যান্ত জীবন, জ্যোতির্ম্ময় জীবন, এমন জীবনের প্রকৃত পরিচয় হইল বৃহত্তর প্রেরণা পরিপূর্ত্তির জ্বালা বা বেদনা। বিদ্যাসাগরের জীবন মানবতার তেমন মহিমামণ্ডিত জ্বালাময় জীবন। তাঁহার সমাজ-সংস্কারমূলক সমগ্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই জ্বালা, প্রদীপ্ত প্রাণের অগ্নিময় আবেগ। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবাসরে সেই আগুনের স্পর্শ যদি আমরা অন্তরে পাই, তাহা হইলে ধন্য হইব; আমাদের মধ্যে সত্যকার জীবনের উদ্বোধন হইবে। 'মৃত্যুমরা মরণ চাহি জীবন জ্যোতির্ম্ময়' বাঙলার কবির এই বাণী সেদিন সমাজে সার্থক হইয়া উঠিবে।

---

**গবর্ণরের গীতাভাষ্য—**

সিন্ধু প্রদেশের গবর্ণর স্যার ল্যান্সলট গ্রেহাম গীতার ইংরেজী অনুবাদ হইতে সিন্ধী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। শুনা যায়, স্যার ল্যান্সলটের কার্য্যকাল আগামী বৎসর শেষ হইবে। ইহার পর তিনি গীতার অনুবাদ শেষ করিবেন এবং সিন্ধীদের মধ্যে বিনা মূল্যে গীতা বিতরণ করিবেন। বাঙলার জাতীয়তার আন্দোলনে একদিন গীতার উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল। আজকাল তরুণেরা অনেকে গীতাকে তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন না, তাঁহারা গীতার মতকে সেকেলে বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যদি গীতাকে উপলব্ধি করিতে একটু আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে আধুনিকতার আলোক ঐ গ্রন্থে অনেক পাইবেন। গীতার অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে উন্নত করিবে। স্যার ল্যান্সলট গ্রেহামকে গীতার সেই সার্ব্বভৌম আদর্শ আকৃষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আইরিশ কবি ইয়েটস্ একস্থানে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, গীতা যে দেশের গ্রন্থ, সে দেশ যে কেমন করিয়া পরাধীন হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হই। গীতা মনুষ্যত্বের জয়গান করিয়াছে, প্রগতির যুগেও যে গীতা পুরাতন হয় নাই, তরুণ বন্ধুরা গীতার আলোচনাতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

---

**মানকুমারী জয়ন্তী—**

গত ২৮শে জুলাই খুলনায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—'মাননীয়া মানকুমারী দেবী যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন বঙ্গ অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ পদ্য-রচনা যে না করিতেন, এমন নয়? হইতে পারে; তবে সে লেখার সঙ্গে বহির্জগতের কোন পরিচয় সম্ভব ছিল না। শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কামিনী রায়ের গদ্য ও পদ্য, সাহিত্য এবং শ্রীমা—স্বাক্ষরকারিণী শ্রদ্ধেয়া মানকুমারী দেবীর কবিতাবলী নব পর্য্যায়ের যুগে বর্ত্তমান লেখিকা-বৃন্দকে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, প্ররোচিত ও প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাই বিশেষ করিয়া ইঁহারা আমাদের সকলের বরণীয়া।" আজ মহিলা সাহিত্যিকগণের অর্ঘ্যোপচারে বাণীর অর্চ্চন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মহিলাদের মধ্যে আধুনিক উপচারে মায়ের পূজার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, যাঁহারা, শ্রদ্ধেয় মানকুমারী তাঁহাদের অন্যতমা। বঙ্গবাণীর সেবিকাগণের অন্যতমা অগ্রবর্ত্তিনী শ্রদ্ধেয়া মানকুমারীর জয়ন্তী উৎসবে আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

---

**স্বদেশ সেবকের সম্মান—**

ময়মনসিংহের উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জয়লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই জয়লাভ অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়, সুতরাং আমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। বাঙলা দেশ প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক এবং ত্যাগ-ব্রতী কর্ম্মীর মর্য্যাদা বুঝিয়াছে, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নির্ব্বাচনে এই পরিচয়টা পাকা হইয়া গেল। দেশসেবার জন্য দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইবার মত সাহস এবং দৃঢ়তা আজ অন্য বিবেচনার চেয়ে যে জাতির কাছে বড় এ সম্বন্ধে যাঁহাদের চিত্তে এখনও সন্দেহ ছিল ময়মনসিংহের উপনির্ব্বাচন তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কার্য্য করিবে।

---

**হলওয়েল স্মৃতি স্তম্ভ—**

হলওয়েল স্মৃতি স্তম্ভ অপসারিত করিবার যে সিদ্ধান্ত প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে, স্মৃতি স্তম্ভটি কোন গীর্জ্জায় লইয়া রাখা হইবে। স্মৃতি স্তম্ভটির ঐতিহ্য মূল্য যে কিছু নাই, ইহা বহু দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, স্থাপত্য মূল্য যে উহার কিছু আছে, কেহই তাহা বলিবেন না। এরূপ অবস্থাতেও স্মৃতি স্তম্ভ বজায় রাখিবার কোন প্রয়োজন আমরা বুঝি না। যদি একান্তই উহা সরাইয়া অন্যত্র রাখিতে হয়, তবে গীর্জ্জার পবিত্র প্রাঙ্গণ নিশ্চয়ই তেমন স্থান নয়। খৃষ্ট ধর্ম্মের যাঁহারা আচার্য্যস্থানীয়, তেমন ব্যক্তিরাই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ স্তম্ভটি ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির সাহায্য করে বলিয়াই, উহা সরান দরকার। যে বস্তু এমন, অপ্রেম বা ভেদবুদ্ধির প্ররোচক, তেমন বস্তুর স্থান নিশ্চয়ই প্রেম এবং পবিত্রতার সাধন ক্ষেত্র মন্দির প্রাঙ্গণে হওয়া উচিত নয়। স্মৃতি স্তম্ভটি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সকলে স্বীকার করেন না, সুতরাং যাহা মিথ্যামূলক সত্যের সাধন ক্ষেত্রে তাহা রাখার অনৌচিত্য সকলে স্বীকার না করিলেও, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই গীর্জ্জা প্রাঙ্গণে উহার স্থান হওয়া অনুচিত। আমাদের মতে গোরস্থানই উহা রাখিবার যোগ্য জায়গা—যদি নিতান্ত উহাকে রাখিতেই হয়।

# তপোবন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এবার গরমের ছুটির পর কালিমপঙ্ পাহাড় থেকে আশ্রমে ফিরে আসতেই, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তাব এল, বিশ্ব-ভারতীর বি এ-র অনার্স ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের তিনি সপ্তাহে দু দিন যদি তাঁর সাহিত্য পড়িয়ে দেন তো তারা একটা মস্ত সৌভাগ্য লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের চিরদিনই বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুতরাং তাঁর বর্তমান দুর্বল শরীরের উপর অত্যাচার হবে জেনেও উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অনেক বৎসর পূর্বে যখন তাঁর শরীর এমন দুর্বল হয়ে পড়ে নি, তিনি কিছুদিন নিয়মিত ক্লাশ নিতেন। শিশুদের পড়ানোতেই তাঁর ছিল আগ্রহ বেশী। শিশুদের শিক্ষা দান ব্যাপারে এদেশে একটা নিদারুণ অবহেলা চ'লে আসছে। যাঁরা শিক্ষায় যোগ্যতা লাভ করেছেন এবং শিক্ষা দান বিষয়ে যাঁদের বিশেষ যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সাধারণত কলেজ-ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদেরই পড়াতে ভালবাসেন, নীচের ক্লাশের এবং তার নীচের ক্লাশের শিশুদের শিক্ষা দান কার্যে তাঁদের মন সরে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ইমারতের ভিত্তি যেমন মজবুত না হ'লে ইমারতটাই কমজোর থেকে যায় তেমনি শিশুদের গোড়া থেকে যদি পাকা বনেদের উপর শিক্ষা না দেওয়া হয় তা হ'লে চিরকালের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে তাদের চিত্তকে দুর্বল ক'রে দেওয়া হয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ শিশু এবং বালকদের শুধু স্নেহের চক্ষেই দেখেন না, তাদের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক সরল শ্রদ্ধা আছে। সেইজন্য শিশুদের কেউ যখন এলোমেলো ভাবে, যেমন খুশি তেমন ভাবে পাঠের বিষয়কে পড়িয়ে দেন, রবীন্দ্রনাথ সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না। এইসব কারণেই তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার প্রস্তাব এলে, তিনি সেটা উপেক্ষা করতে পারেন না।

৮ই জুলাই বিকেলে তিনটার সময় তাঁর নববাসভবন 'চামেলিয়া'র দ্বিতলে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হলেন, তাদের সঙ্গে পাঁচ-ছ জন শিক্ষকও ছিলেন। কবির 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধ নিয়েই ক্লাশ শুরু হ'ল। 'তপোবন' বিষয় বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ সুগম করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তপোবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী, সে বিষয় প্রথম দিন অনেকক্ষণ ধ'রে বুঝিয়ে বললেন। তাঁর সেদিনকার বক্তব্যের নোট অনেকেই নিয়েছেন। তাঁর কাছে যে নোট উপস্থিত করা হয়েছিল তা তিনি দেখে দিলেন। কিন্তু 'দেখে দিলেন' বলতে যা সচরাচর বোঝায়, সে রকম ভাবে দেখে দেন নি। নোটগুলো সামনে রেখে আগা-গোড়া নিজেই কেটে মেজে ঘ'ষে, খোল নলচে বদল ক'রে সম্পূর্ণ মার্জিত ক'রে লিখে দিলেন। এরকম করবার কারণ ছিল। সভাতে কথাচ্ছলে কোনও বিষয় ব্যাখ্যা ক'রে বললে, কথার মধ্যে যুক্তিতর্কের সংযোজনায় যে ফাঁক থাকে সে ফাঁকটা সভার আব-হাওয়ায় শ্রোতৃবর্গ নিজের বোধশক্তি দ্বারা পূরণ ক'রে নিতে পারে, এবং কথা প্রসঙ্গে যেসব বাক্যের (লেখায় যা আপনি বাদ পড়ে) পুনরুক্তি থাকে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেইসব মুখের কথাকেই যথাযথ ভাবে কাটা কাটা ধরনে লিখে সাজিয়ে দিলে সেটিও ঐ সভার বাইরের লোকের পক্ষে বুঝতে বেগ পেতে হয়, অনেক সময় পুনরুক্তির শব্দগুলো এবং উহ্য ভাবগুলো বিষয়বস্তুর উপরে দুর্বোধ্য ভাবের ঝাপসা পর্দা টেনে দেয়। এই কারণেই কোনও গভীর বিষয়ের মৌখিক আলোচনাকে তথাকথিত চলতি ধরনের 'ইণ্টার ভিউ'এর পেটেণ্ট লেবেল দিয়ে ছাপার অক্ষরে জন-সাধারণের কাছে পরিবেশন ক'রে দিলে, যাঁর মুখ হ'তে সেইসব কথা বার হয় তাঁর প্রতি এবং পাঠকের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়। এই কথা স্মরণ ক'রে, নিম্নে 'তপোবন' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা মন্তব্যটি নিজের স্মৃতির সাহায্যে না লিখে তাঁর নোট তাঁকে দিয়ে পাঠকদের কাছে পরিবেশনযোগ্য ক'রে লিখিয়ে নিয়েছি।] —শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

'তপোবন' প্রবন্ধটি তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার ভার আমি নিয়েছি। প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানি নে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করি নে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করি নে। সেখানে যে সব ঋষি তপস্বীদের বাস তাঁরা সমুদ্র পর্বতকে অভিশাপের জোরে কম্পমান ক'রে জোড়হস্তে তাঁদের দ্বারস্থ করতে পারতেন। আবার তাঁদের তপস্যাও অযুত নিযুত বৎসরের তাপে এমন সর্বনেশে হয়ে যেতে পারত যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবার জো হ'ত, শেষকালে দেবতাদের কেঁদে এসে পড়তে হ'ত তাঁদের তেজ ঠাণ্ডা করতে। এমন সব কথা বিশ্বাস করবার আশ্চর্য শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশুনো করবার দরকার নেই।

বৈদিক কালে তপোবন নাম দিয়ে কোনও আশ্রম ছিল এ যদি সত্য হয় তবে কালক্রমে তার লোকস্মৃতি এমন অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়ে উঠতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় নিয়েছিল। অর্থাৎ তপোবনের জনশ্রুতি যখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পনা ছাড়া আর কোথাও ছিল না।

পুরাণের আরও উত্তর কালে তপস্যার বিশেষ কেন্দ্ররূপে তপোবনের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে তার নামও পাই নে কোথাও। আরণ্যক নাম পাওয়া যায়। বোঝা যায় আর্যাবর্তে এক সময় নাগরিক সভ্যতা এসে অরণ্যের উচ্ছেদ ঘটায় নি। পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যায় বনে যাদের বাসা তাদের মন হয়ে যায় বুনো। তারা পশু মেরে খায়, পশু-চর্ম পরে, অসংস্কৃত থাকে তাদের ভাষা।

একদিন ভারতের আর্যাবর্তের বনে যে আর্যরা নিয়েছিলেন আশ্রয়, তাঁদের মনের শক্তি মূঢ় হয়ে যায় নি। তাঁরা গদগদভাষী ছিলেন না, তাঁদের ভাষা এতদূর সংস্কৃত ছিল যে তাতে নৈর্বক্তিক ভাবের তত্ত্বকথা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

সেদিনকার সাহিত্যে যে সমস্ত আলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সাংসারিক প্রয়োজনঘটিত নয়। পরস্পরের প্রয়োজনের কথার একেবারেই কোথাও ব্যবহার ছিল না এ

হ'তেই পারে না। কিন্তু তার কোনো অংশ রক্ষিত হয় নি। অন্য অনেক সভ্যতায় দৈবক্রমে বা ইচ্ছাক্রমে অনেক তুচ্ছ বিষয় টিকে আছে। ভারতে নেই তার একটা কারণ এদেশে তখন লিপির আবিষ্কার হয় নি, গুরু শিষ্যানুক্রমে মুখে মুখে স্মৃতিযোগে বিশেষ চেষ্টায় যাকে চালনা করা গিয়েছে তাই বেঁচে আছে। তার থেকে জানা যাবে কোন্ জিনিসকে আর্য পিতামহেরা কোনোমতেই ভুলতে দিতে চান নি। সে আত্মরক্ষার বিদ্যা নয়, পশুচারণ বা পশুমারণ বিদ্যা নয়,—সাংসারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিদ্যা। উপনিষদে বিদ্যাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বাণী মনে রাখবার যোগ্য। "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ব, বেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষমিতি—অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে" অর্থাৎ ঋগ্বেদে যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এ সমস্তই অপরা বিদ্যা, সেই হচ্ছে পরা বিদ্যা যার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। যে চার বেদ ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রের মূলে তাদেরও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব'লে গণ্য করা হয় নি। অথচ সেগুলি কোনো বিশেষ প্রয়োজনমূলক নয় অর্থাৎ ধনুর্বেদ বা আয়ুর্বেদের মতো ব্যাবহারিক নয়। আর শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্র সমাজের সংস্কৃতিকে বহন করেছে মাত্র, জীবন ধারণের প্রয়োজনে তার মূল্য নেই। এতে স্বাভাবিক বন্য বর্বরতার লেশমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় না। সেই আরণ্যকে ঋষিদের সকলের চেয়ে মহৎ লক্ষ্য ছিল অনন্ত স্বরূপকে আত্মার মধ্যে পাওয়া। মানুষের ইতিহাসে এমন সাধনা আর তো কোনো বনবাসীর মধ্যে কল্পনা করা যায় না। ভারতে প্রথমাগত আর্য ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তপোবন নামক কোনো বিশেষ সংজ্ঞাধারী আশ্রমের সন্ধান পাই বা না পাই আরণ্যক সাধকদের এই যে আশ্চর্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাই, আমার কাছে তপোবন নামটি এরই প্রতীক।

ইট কাঠের আবাস প্রাণহীন, অরণ্যের আবাস প্রাণময়। এইখানে বাসকালে জগতের সকল প্রাণের মধ্যে যে অসীম প্রাণের উৎস আছে, ঋষিরা ধ্যানযোগে তাকে অনুভব করেছিলেন। বলেছিলেন—"যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং;" অর্থাৎ যা কিছু আছে এই সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। এ একটি আশ্চর্য বচন। তবে কি পাথর স্পন্দিত হচ্ছে? লোহা স্পন্দিত হচ্ছে? বিজ্ঞানীরা বলেন হাঁ হচ্ছে, ঋষিরাও বলেছেন হাঁ হচ্ছে। উভয়ের ভাষার প্রভেদ আছে। সর্বকিছুকে যাতে কাঁপাচ্ছে বিজ্ঞানীরা তাকে একটা কোনো নাম দিয়েছেন, বলেছেন সে কাঁপছে বিশ্বব্যাপী তেজে বা তাপে। ঋষি বলছেন কাঁপছে প্রাণে। বললেই আপনার মধ্যে কথাটাকে বুঝতে পারি। অন্য শব্দগুলি শব্দ মাত্র। আমরা আপনার মধ্যে একান্তভাবে জানি স্বতশ্চলৎশক্তি আছে প্রাণেতে, এ একটা শব্দ মাত্র নয় এ একটা অভিজ্ঞতা। ইলেকট্রোন প্রোটোনের পরমাণুবাচক নাম ছিল না কিন্তু 'যদিদং কিঞ্চ সর্বম্' বলতে চরমে তো তাদেরই বোঝায়। তারা তো কাঁপছেই। কোথা থেকে কাঁপন এল, ঋষিরা বলেন প্রাণশক্তি থেকে, সে কথাটা নিজের মধ্যে অব্যবহিতভাবে বুঝতে পেরেছেন। ইলেকট্রোন প্রোটনদের কিছুতে ধাক্কা দিচ্ছে না বাইরে থেকে, তারা নিজের চলমানতা থেকে চলছে। তাকেই বলা হয়েছে প্রাণ এজতি।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করছেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ." সব প্রথমে প্রাণ কার দ্বারা প্রৈতি অর্থাৎ গতিশীলতা পেয়েছে? তার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ," কার ইচ্ছায় ইচ্ছিত মন আপন বিষয়ের দিকে গমন করছে। মনের গতি ইচ্ছার গতি, মন যে ইচ্ছাময়। উপনিষদ্ বিশেষ দুই গতির কথায় বলেছেন একটা হচ্ছে প্রাণের গতি, আর একটা হচ্ছে ইচ্ছার গতি, ইচ্ছাই চলে। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, আবার ইচ্ছার কথা বলা হোলো, বাক্য তো ইচ্ছারই প্রকাশ, তার যথার্থ গতি শব্দের গতি নয়, তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছার গতি। এইজন্যে য়িহুদি শাস্ত্রে বলা হয়েছে সৃষ্টির আরম্ভে ছিল শব্দ—তার মানে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। সব শেষে বলা হয়েছে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুণক্তি। কোন দেবতা চক্ষুকে শ্রোত্রকে জুড়ে দিয়েছেন, এরা বাইরের জিনিস, শক্তির বাহন মাত্র। প্রশ্নের যা উত্তর দেওয়া হয়েছে, তা আরো গভীর রহস্যপূর্ণ। উত্তর এই যে শ্রোত্রের ভিতরে আছে শ্রোত্র, মনের ভিতরে মন, বাক্যের ভিতরে বাক্য। এই যে কান শোনে, মন মনন করে, প্রকাশ করে বাক্য বললে চলবে না কানের ইন্দ্রিয়টা শোনে, মনের যন্ত্রটা ভাবে, বাগিন্দ্রিয় প্রকাশ করে। যে করে সে তার অন্তরতর। সে বাক্য মনের অগোচর।

তপোবনের কথা বলতে গিয়ে এই যে ব্যাখ্যা করা হোলো তার কারণ আমি জানাতে চাই, অরণ্যে যাঁরা সমাহিত চিত্তে চিন্তা করেছেন, তাঁদের চিন্তা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় নয়, সমগ্র অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অগ্নি হ'তে জল হ'তে বিশ্বভুবন হ'তে ওষধি হ'তে বনস্পতি হ'তে পরিপূর্ণতার যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করেছেন এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

পূর্বেই বলেছি পৌরাণিক যুগের আগে তপোবনের ঠিকানা পাওয়া যায়নি। বোধ হয় তখন তপোবন বলে বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো তপস্যার কেন্দ্র চারিদিক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ছিল না। সমস্ত আর্যাবর্ত তখন অরণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল, আর পশুচারণই ছিল মানবের প্রধান উপজীবিকা, ধেনুই ছিল সেই যুগের প্রধান ধনসম্পদ। রাজারা যখন কোনও ঋষিকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে চাইতেন, তখন হাজার বা লক্ষ গরু দান করতেন, ঋষিরা কি করে' তাদের খাদ্য যোগাতেন জানি না। সেই যুগের শাস্ত্রে চাষবাসের প্রাধান্য বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায় না। জনক যখন চাষ করতেন, তখন কৃষি ছিল বিদ্যা, মজুরী নয়, ওর বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই বিদ্যা রক্ষা করা ও প্রচার করা বিশেষ-

ভাবে রাজাদের কর্তব্য ছিল। নগরের উৎপত্তি জনসমবায়ে; যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলে খেয়ে বিপুল লোকসংঘের প্রাণ ধারণ চলতে পারে না। চাষ করে প্রকৃতির খাদ্য উৎপাদন শক্তিকে তাগিদ করতেই হয়। এই প্রয়োজনের প্রেরণায় কৃষি বিদ্যার আবিষ্কার হয়েছিল। এই বিদ্যাকে অনার্যদের হাত থেকে রক্ষা আর্যরা একটা প্রধান কর্তব্য বলেই গণ্য করেছিলেন। রামায়নের মূল কাহিনী যে সীতাকে উদ্ধার করা, অর্থাৎ কৃষি বিদ্যা রক্ষা করা অবলম্বন করে বর্ণিত এই মত আমি অন্যত্র ব্যক্ত করেছি। সীতা শব্দের অর্থ হলচালন রেখা। মানবী গর্ভে সীতার জন্ম নয়, হলচালন রেখা থেকেই জনক রাজা সীতাকে পেয়েছিলেন। রামায়ণের যথার্থ কাহিনীর স্পষ্টতর নিদর্শন এর চেয়ে আর হতেই পারে না। এই সীতার পবিত্র দায়িত্ব রক্ষার জন্য রাজন্যবর্গকে যখন আহ্বান করা হয়েছিল, তখন হরধনু ভঙ্গের পণ স্বীকার করতে হয়েছিল। শৈব ধর্ম অনার্য দ্রাবিড়দের এবং তাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ধর্ম ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে যে সব শিলালিপি আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে পশুপতি শিবের মূর্তির সঙ্গে পশুদের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পৌরাণিক ধর্মে তাঁকে বৃষ বাহন রূপে দেখা যায়। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে চণ্ডীকে দেখা যায় পশুদের রক্ষাকর্ত্রীরূপে।

অরণ্যবাসী আর্যদের ধেনুর সঙ্গেই সম্পর্ক দেখা যায়। ইন্দ্রের বাহন হাতী ও ঘোড়া, অর্থাৎ যে দুটি পশু মানুষের ব্যবহার্য। কিন্তু তাঁদের প্রিয় সঙ্গীরূপে বাঘ ভাল্লুক তো দেখা যায় না, বাঘ দেখা গেছে মহেঞ্জোদাড়োর উৎকীর্ণ মূর্তিতে। পরবর্তী যুগেও শৈবধর্ম দ্রাবিড়দের মধ্যেই প্রধানত প্রচলিত। আরো একটি মনে রাখতে হবে রাবণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের পরাভূত ও অপমানিত করেছিলেন। কথিত আছে তাঁর উপাস্য দেবতা শিবের প্রভাবেই স্বর্গ মর্ত্য জয় করেছেন। সরস্বতী দৃষাদ্বতী নদীর নাম আছে বেদে কিন্তু পবিত্র জ্ঞানে নদী-পূজোর কি কোন উল্লেখ পাওয়া যায়? শিবের মূর্তির সঙ্গে মিলিত আছে গঙ্গা, আর আছে সর্প। সর্প পূজো অনার্যদের। আরো প্রমাণ আছে। দক্ষযজ্ঞে আহূত হয়েছিলেন বৈদিক দেবতারা, শিব হয়েছিলেন অনাদৃত। তাই অনার্যরা এসে মারামারি কাটাকাটি করে যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছিল। শৈবধর্ম তাদেরি ধর্ম যারা আর্যদের যথাসর্ব্বস্ব লুট-পাট করে কেড়ে নিয়ে যেত।

বিশ্বামিত্র রামকে আমন্ত্রণ করলেন, এদের ধনুককে—অর্থাৎ শক্তিকে ভাঙতে। যে ভাঙবে সীতাকে গ্রহণ ও রক্ষা করবে সেই।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ নগরের যুগে, তপোবন ছিল না। কালিদাসের কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দেখলেন সহুরে সভ্যতায় মানুষকে বিলাসিতায় কলুষিত, বঞ্চনাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তুলেছে। মালবিকাগ্নিমিত্র পড়ে দেখলে তখনকার সভ্যতার এই রূপ স্পষ্ট দেখতে পাবে।

কবির হৃদয়ে এবং কাব্যে তপোবনের নির্মল আদর্শ রূপ নিয়ে নামল। তখনকার কালে যে যুগ আপন পুণ্যকীর্তি নিয়ে তিরোহিত তারি স্মৃতিকে তিনি তাঁর অনেক গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তখন আক্রমণকারী শত্রু আসছিল চারিদিক থেকে। দুর্গপরি রক্ষিত নগর নির্মাণ করে তাদের প্রতিহত করবার প্রয়োজন ঘটেছিল। শক্তিকে কেন্দ্র করে' নগরের গঠন হোলো। কিন্তু শক্তির ধর্ম এই, সে পরিমিত সীমায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বেড়ে চলে তার ক্ষুধা। এক শক্তি আর শক্তিকে গ্রাস করে' আপনাকে স্ফীত করে। ক্ষুধার সীমা আছে কিন্তু পেটুকতার সীমা নেই। শক্তি পেটুক, অ-স্বাভাবিক তার লোভ। অরণ্যাশ্রমের জায়গায় এল নগর। নগরে নগরে বেধে উঠ্‌ল কেবলি অসহিষ্ণু শক্তির দ্বন্দ্ব। পরস্পর হতে থাকল বিচ্ছিন্ন বিভক্ত, বাহিরের শত্রু যখন এল তখন তাকে ঠেকাতে পারলে না। তারপর থেকে চির পরাভবে ভারতবর্ষের মাথা নত হয়ে রইল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যাঁরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন শত্রুসংহার করেছেন, তাঁদের উল্লেখ বড় দেখতে পাওয়া যায় না। রাজাদের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদেরই খ্যাতি ছিল। সেইজন্য একে রাজবিদ্যা বলত। বৈদিক যুগের কোনো ইতিহাস নেই, সব ঝাপসা। মাঝে মাঝে এক এক ঋষির কথা, যিনি নূতন মন্ত্র, নূতন যজ্ঞ বা নূতন অগ্নি চয়ন করেছিলেন। এটা ছিল ভারতে আরণ্যক যুগ। এর থেকে আমরা পরবর্তী নাগরিক যুগে আসি। তখন নানা পাপ এসে মানুষের স্বভাবকে আশ্রয় করে। এটা স্বাভাবিক, অন্য দেশের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, নাগরিক সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে স্বভাবের বিকৃতি ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রশ্রয় পেয়ে সভ্যতার ভিত্তি বিদীর্ণ করেছে, শাখায় প্রশাখায় সর্বনাশ বিস্তার করেছে চারিদিকে। নাগরিক সভ্যতার নিদারুণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আজ। দেখছি মানব দানব হয়ে উঠেছে।
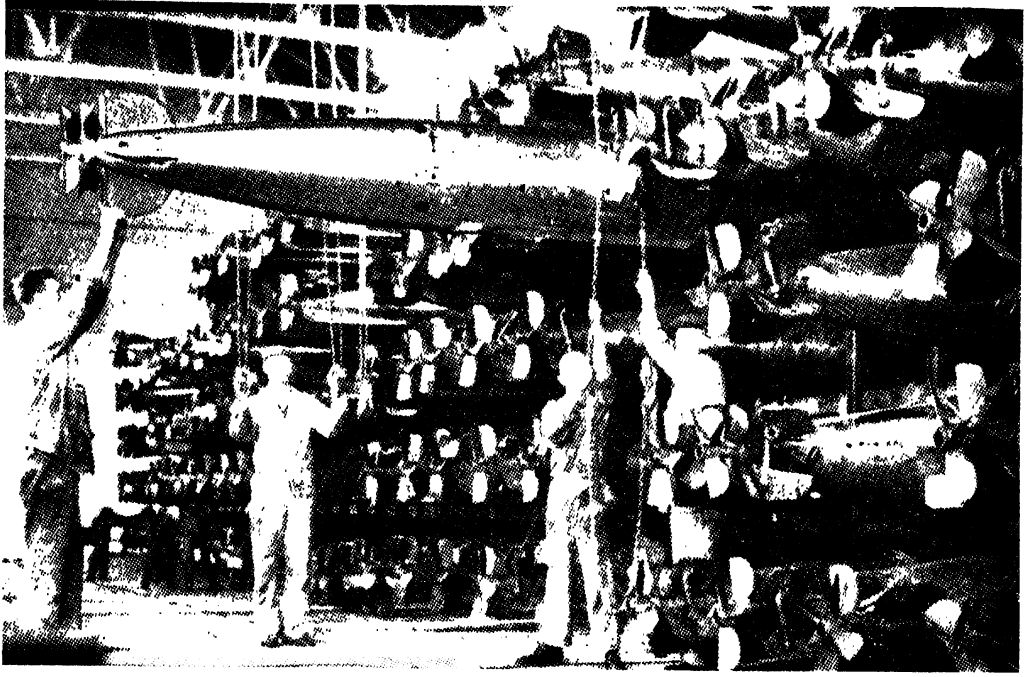
উপরে ঃ—যুদ্ধার্থে নৌ-বাহিনীর প্রয়োজনের পূর্বে টর্পেডোগুলিকে এইভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেকটি টর্পেডোই সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণে ঃ—একটি টর্পেডো কার-খানার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। টর্পেডোর মাথাগুলি উপুড় করিয়া সারিবদ্ধভাবে রাখা হইয়াছে।
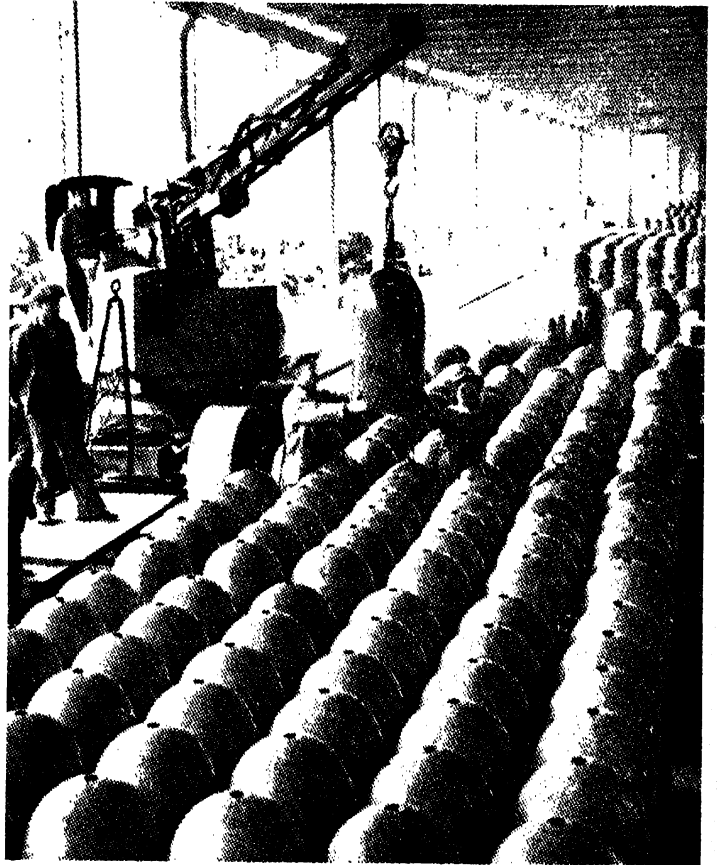
# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১০)

শারদার বাড়ি থেকে বার হয়ে সরোজ বরাবর এসে উঠল একটা ছোট চুনবালি খসা দোতলা বাড়িতে। নীচের তলা তার অন্ধকার; কাঠের পার্টিসন ক'রে ভাড়া দেওয়া। সেখান থেকে ভাড়াটেদের কলগুঞ্জন, কলের জলপড়া, ঝাঁট দেওয়ার শব্দ উপর পর্য্যন্ত উঠে আসছে। সরোজ সেই অন্ধকারেই অভ্যাস মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে; দেখলে কাত্যায়নী কাপড় কাচা স্নান ইত্যাদি সেরে সবেমাত্র পূজায় বসেছেন। ইষ্টদেবতার পূজো। সরোজ এদিক ওদিক মুখ ফেরাল, বললে, "মামীমা, মামীমা কই?"

কিন্তু ইন্দুর সাড়া মিলল না, কোণের ঘরে এসে সে দেখলে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে ইন্দু বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে জড়সড় হয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল; কোণে কোণে জমা অন্ধকারের মধ্যে পশ্চিমের খোলা জানালা বয়ে দিনান্তের যে স্বল্পালোকটুকু ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল তারই সাহায্যে সরোজ দেখলে ইন্দু চোখ বুজে শুয়ে আছে, রক্তাভ মুখের চারিপাশে ছড়িয়ে আছে অসংযত, অবিন্যস্ত চুলের রাশি। ডাকলে, "মামীমা।"

একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়তো, তাই ইন্দু চমকে উঠলো; —"কে?"

"আমি সরোজ।"

"সরোজ? এস ব'স।"

হাত বার ক'রে ইন্দু তার বিছানার পাশটা নির্দ্দেশ ক'রে দিতেই সরোজ সেখানে বসে পড়ল। বললে "আবার কি জ্বর এল মামীমা?"

ওর কন্ঠস্বর সমবেদনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ইন্দু সে সমবেদনাটুকু গায়ে মাখল না; মলিন হেসে বললে, "জ্বর ঠিক নয়, শরীরটা একটু খারাপ করেছে মাত্র।"

উঠে বসতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না; ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ গান শেখাতে যাও নি?"

অন্যমনস্কভাবে সরোজ উত্তর দিলে, "গিয়েছিলাম বই কি।"

"তবে চলে এলে যে?"

"মেয়েটা গান শিখলে না।"

একটু নীরব থেকে সরোজ যেন নিজের মনেই ব'লে উঠল, "এ কাজ ছেড়ে দেব ভাবছি।"

ইন্দু চমকে উঠল, "কেন সরোজ?"

সরোজ হাসতে গেল, কিন্তু পারলে না। চেষ্টা ক'রে বলল, "এসব মেয়ে ঠেঙিয়ে গান শেখানো আমার আর পোষায় না; সামান্য পনের কুড়ি টাকার জন্যে যেন অপমান বোধ হয় ওই সব গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে। এমন মজা যে যত বলছি এ অসাধ্য সাধন হওয়া দুষ্কর, তত ওর পিসী যেন চেপে ধরে বেশী ক'রে আমাকেই; বলে, 'এ কাজটি কিন্তু বাবা দয়া ক'রে তোমায় ক'রে দিতে হবে; পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি না, তাই চট্ ক'রে শিখে নিতে পারছে না; কিন্তু ও শিখবে, নিশ্চয় শিখবে, তখন দেখো।"

"মেয়েটি বুঝি পাড়াগাঁ থেকে নতুন এসেছে শহরে?"

সরোজ থেমে থেমে বললে, "হ্যাঁ, নতুন বই কি; তবে—"

"তবে কি?"

"তবে সে যে বাড়ীতে এসে উঠেছে, আর যাঁর কাছে সভ্য শহুরে হবার ট্রেনিং পাচ্ছে তাতে তার এসব বিষয়ে অনেক আগেই শিক্ষিতা হওয়া উচিত ছিল।"

ওর মুখের উপরে ভেসে উঠল ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ম হাসির রেখা। ইন্দু জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি সরোজ?"

"তার পিসীমার কথা বলছি মামীমা।"

ইন্দু কিছু বুঝতে না পারার মত নিস্পলক দৃষ্টিতে সরোজের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চঞ্চল সুরে সরোজ বললে, "মরুক গে ওসব আলোচনা। আচ্ছা মামীমা, একটা ব্যাপার......" বলেই সে হঠাৎ থামল। ইন্দুর মনে হচ্ছিল সরোজ যেন আজ কি একটা কথা বলবার জন্য তার কাছে এসে বসেছে, কিন্তু ঠিক বলতে পারছে না গুছিয়ে। কিংবা বলবার কথা ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না বলেই ইতস্তত করছে। বললে, "কি কথা বলতে চাও তুমি।"

সরোজ উত্তর দিতে গিয়ে থামল; খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যুদালোকিত রাজপথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তার পরে হঠাৎ যেন কাতরস্বরে বললে, "মামীমা!"

ইন্দু জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল। সরোজের সমস্ত মুখখানা গভীর অন্তর্বেদনায় যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল; মনের অব্যক্ত চঞ্চলতায় সে একবার উঠল সে জায়গা ছেড়ে, বার কয়েক পায়চারী ক'রে এসে পুনরায় বসল সেইখানে। বললে, "আমি একটা অপরাধ করেছি মামীমা, বিশেষ অপরাধ।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করলে, "কার কাছে?"

কম্পিতস্বরে সরোজ বললে, "তোমার কাছে; তাই—"

সে থেমে গেল, কিন্তু ইন্দু থামল না, ওরই কথাটার খেই টেনে অতি সাবধানস্বরে ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "তাই নিশ্চয় ক্ষমা চাইতে এসেছ!"

সরোজ নির্ব্বাক। ইন্দুর হাসি পাচ্ছিল; চেপে, গম্ভীরস্বরে বললে, "কিন্তু অপরাধটা যে কি তাই তো এখনও শুনি নি। না বললে?"

সরোজ জবাব দিলে তীব্রস্বরে, বলব মামীমা, সব বলব। মাকে সব কথা ভেঙে না বলতে পারলেও তোমাকে সব কথা বলতেই হবে, সে আমি জানি।"

একটু থেমে আবার বললে, "তুমি তো জান মামীমা, মামাবাবু কেন বাড়ি আসেন না? ধর্ম্ম না হোক, সমাজ

সাক্ষী রেখে তোমাকে গ্রহণ করেও ত্যাগ করেছেন কেন? তুমি তো জান মামীমা—"

এক মুহূর্তে ইন্দুর সমস্ত মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, চোখে ফুটে উঠল কাতর অসহায় দৃষ্টি। মনের সে চাঞ্চল্য দমন করে দৃঢ়স্বরে বললে, "জানি!"

সরোজ বলে চলল কম্পিতকন্ঠে......দ্রুত নিঃশ্বাসে...... "আমি, আমিও যাই তাদেরই বাড়ি, তাদেরই একজনকে গান শেখাতে; আমি আর কিছু জানি নে, কিচ্ছু জানি নে।"

সরোজ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন এখনই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝি এত বড় পৃথিবীতে তার এ লজ্জা, এ কলঙ্ককালি মাথা মুখ লুকবার এতটুকু স্থানও আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সরোজ নতমস্তকে বসেছিল মুখ ঢেকে। ধীরে ধীরে তার মাথার ওপর এসে থামল একখানি শীর্ণ হাত, সান্ত্বনা-ময় স্পর্শ। সে স্পর্শ ইন্দুর। ইন্দু ডাকল, "সরোজ!"

সরোজ চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারলে না। কিন্তু না পারলেও কানে শুনলে ইন্দুর স্নেহভরা ক্ষীণ কন্ঠস্বর— "আমার ছোটভাই থাকলেও সে হয়তো কোন দিন এই অপরাধই করত। কিন্তু তাই ব'লে কি ক্ষমা পেত না তার দিদির কাছে? নিশ্চয়ই পেত। কারণ সে যে ক্ষমা পাবার জন্যেই দোষ করেছে। তুমিও আমার চোখে সেই ক্ষমা পাবার অধিকারী, তাই, দোষ তোমার যত বড়ই হ'ক, আর যত গুরুতরই হ'ক সরোজ, তার জন্যে আমার কাছ থেকে তোমার পাওনা ক্ষমা, শাস্তি নয়।"

সরোজ বুঝলে, যে শ্রদ্ধা ইন্দু সমস্ত পুরুষ সমাজের উপর থেকে সরিয়ে নিয়েছে তার বিন্দুমাত্রও সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না; তবু এই ক্ষমা, এই স্নেহ লাভই যথেষ্ট। সরোজ মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে ফেলে তাকাল ইন্দুর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। ইন্দু দেখলে ওর চোখের কোলে কোলে জলের রেখা। সে ব্যঙ্গ করলে না; বললে, "যে অপরাধ করেছ তার জন্যে তো হাত নেই সরোজ!"

সরোজ হাসল; মৃত্যুর মত করুণ সে হাসি। বললে, "কিন্তু সে অপরাধের তো ইতি করি নি মামীমা, এখন যে সবে মাত্র শুরু!"

ইন্দু নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। সরোজ তেমনি স্বরে বললে, "তুমি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছ না মামীমা, কিন্তু সত্যই আমার অপরাধের শুরু এখন থেকেই; তাই বলছি এর বুঝি শেষ নেই সমাপ্তিও নেই।"

সরোজ যেন বড় ক্লান্তিতে চোখ বুজল। একটু পরে চমকে তাকাল ইন্দুর দিকে; যেন মন থেকে সমস্ত অবসাদ সে ঝেড়ে ফেলে হালকা হ'তে চায়। বললে, "যে পথে আমি এগিয়েছি জানি সে পথ ভুল, কোনও দিন কোনও লক্ষ্য নিয়ে আমি দাঁড়াতে পারব না তাও জানি, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সব জেনেও আমি ফিরতে পারছি নে, সে পথ থেকে ফেরবার ইচ্ছেও নেই। আমি যাব, মামীমা, আমায় তোমরা ক্ষমা ক'রো, আমি এই পথেই যাব।"

সে উঠে দাঁড়াল ঘর ছেড়ে বার হবার জন্যে, কিন্তু পারল না।। ইন্দু ডাকল, "সরোজ!"

সরোজ ফিরলো।—"কি বলছ?"

ইন্দু বললে, "ব'স কথা আছে।"

সরোজ এসে বসল স্থিরভাবে; মুখে তার গম্ভীর শান্ত ভাব।

স্থিরস্বরে ইন্দু প্রশ্ন করলে, "আমার মনে হয়, তুমি যা বলতে এসেছ, তা ঠিক বলতে পার নি। তাই আমি শুধু জানতে চাই কি তোমার বক্তব্য।"

"বক্তব্য?" একটু থেমে সরোজ বললে, "আমি বিয়ে করব।"

ইন্দু হাসল।—"এ তো আনন্দের কথা, ডাল ভাত খাওয়ার মত নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার; কিন্তু কাকে?"

"যাকে গান শেখাই।"

"বুঝলাম। কিন্তু তার সম্বন্ধেই আমি কিছু জানতে চাই যে। কে সে? তার আগের ইতিহাসই বা কি?"

"আগের ইতিহাস বিশেষ জানি না মামীমা, শুধু জানি সে একটি অম্লান কুসুম, পৃথিবীর কোন কলঙ্কের ছায়া এখনও তাকে স্পর্শ করে নি।"

"কিন্তু তাকে বিয়ে করলেও তোমার মা যদি তাকে বধূ বলে গ্রহণ না করেন?"

সরোজ একথাটা এতক্ষণ এমন ভাবে ভাবতে পারে নি। এইবার সে একটুখানি থমকে গেল; কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলে না; চুপ ক'রে উঠে সে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সম্মুখে কাত্যায়নীকে দেখে। পূজা শেষে তিনি তখন অসুস্থ ইন্দুকে আশীর্বাদ করতে আসছিলেন —স্নেহশীলা জননীর মত। সরোজের মাথা নীচু হয়ে পড়ল, মুখ তুলে সে তাকাতে পারল না মায়ের দিকে। কাত্যায়নী কিন্তু তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, "কে ও, সরোজ না?"

"হ্যাঁ মা, আমি।"

"তুমি এত সকাল সকাল যে, কাজে যাও নি?"

"গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি।"

"ও" বলে কাত্যায়নী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন তার পাশ কাটিয়ে; প্রতিদিনের মত শয্যাশায়িনী ইন্দুর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে কি আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন কে জানে, তার পর সরোজের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, কাল হয়তো তোমায় বলতে সময় পাব না তাই আজ ব'লে রাখছি; কাল তোমায় বিকেলের দিকে বাড়ি থাকতে হবে। কারণ একজনেরা কাল তোমায় দেখতে আসবেন কথা আছে।"

তার কন্ঠস্বর গম্ভীর, এত গম্ভীর যে শুধু সরোজই নয়, ইন্দু পর্যন্ত চমকে উঠল। তারা দুজনেই তাঁর হঠাৎ একথা বলা বা বিবাহ ঠিক করার কোনও হেতু আবিষ্কার করতে না পেরে পরস্পর তাকিয়ে রইল অবাক হ'য়ে। কাত্যায়নী প্রশ্ন করলেন; "কি, কথা বলছ না যে?"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে সরোজ কি বলবার চেষ্টা করল কে জানে, কিন্তু কাত্যায়নী তার কোনও জবাবেরই অপেক্ষা না রেখে সহজস্বরে বললেন, "আর আমার এই বুড়ো বয়েস, কবে আছি কবে নেই। আর তার ওপর কি আর হাঁড়ি ধরতে পারি নিত্যি? যার আশা এতদিন করেছিলাম, সে তো আমার দিকে ফিরেও তাকালে না, বরঞ্চ বিয়ে ক'রে আর একটা হতভাগ্য জীবন পর্যন্ত আমার জীবনের সঙ্গে গেঁথে দিয়ে গেল; এবার তোমার কর্তব্য তুমি কর।"

সরোজকে তিনি আর কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই সেই ঘর পরিত্যাগ করলেন। নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সরোজ, আর তার দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দু। এক সময়ে মুখ তুলে ডাকলে, "সরোজ।"

সরোজ ফিরে তাকাল: তার সমস্ত মুখ মৃতের মত বিবর্ণ। ইন্দু বললে, "আজ তোমার এই অবস্থা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান?"

"কি?"

"তোমার মামা হয়তো আমাকে বিবাহ ক'রেও খুব খারাপ কাজ করেন নি, কেননা তাঁকে কারও আদেশ মেনে নিতে হয়নি। যা ভাল বুঝেছেন করেছেন, যা তাঁর প্রাণ চেয়েছে, তাই খুঁজে নিয়েছেন কারও মতামতের অপেক্ষা না রেখে। কাজেই দুঃখ যা কিছু তা একা আমার হ'লেও তার নয়, তাঁকে কিছুমাত্র দুঃখ পেতে দিই নি এইটুকুই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।" একটু থেমে আবার বললে, "তবু আমার ইচ্ছে, তুমি একবার তাদের এখানে নিয়ে এস বেড়াবার নাম ক'রে, একবার তাদের দেখি।"

সরোজ মুখ তুললে, দেখলে ইন্দুর সমস্ত মুখে চোখে একটা কাতর অনুনয়। সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা, শুধু চটা ওঠা শাদা শাঁখা পরা শীর্ণ হাতদুখানা বুকের উপর জড় করা; আর কোথাও কোন আভরণের চিহ্ন মাত্র নেই। যেন ওই শাঁখা ওইটুকুই অবিনাশের সমস্ত শুভ, সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত আয়ুর মত সযত্নে সে ধ'রে রাখতে চায়, প্রহরা দিতে চায় সতর্ক প্রহরীর মত। যাতে কেউ তাকে তার কাছ থেকে সরাতে না পারে, অবিনাশের মত জোর ক'রে কাছ ছাড়া করতে না পারে। ইন্দু আবার বললে, "আমার বড় ইচ্ছে সরোজ।"

"আচ্ছা আনব।"

বলতে বলতে সরোজ ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল; নিজের ঘরে এসে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে; তার পর ঝুপ ক'রে বসে পড়ল একখানা চেয়ারের উপর; যেন এইমাত্র কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে ফিরছে।

(১১)

সরোজ একদিন সত্য সত্যই যাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল তাদের একজন আদু, অন্যজন শারদা। শারদার পরিধানে একখানা লাল চওড়া পাড় তসরের শাড়ি, সেমিজ, আর তার উপরে সিল্কের চাদর। সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুর ওর আয়তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোটামুটি দৃষ্টিতে তাকে দেখলে মনে হয়, সে একটি সংসারের গৃহিণী। আর তার পাশে আদুকে দেখলে বোঝা যায় সে একটি অফুটন্ত ফুলের কুঁড়ি। বসন্ত আসার বারতাই হয়তো তার জীবনে আজ এসে পৌঁছেছে, বর্ষার খবর সে জানে না।

আদুর পরনে একখানি ফিকে নীল রংএর জরিপাড় শাড়ি, গায়ে হাত কাটা নীল সিল্কের ব্লাউজ। এলোচুলের স্তূপাকার খোঁপা পিঠের উপর দুলছে, কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা কুঙ্কুমের ফোঁটা। গাড়ি হ'তে ওরা নামতেই দরজার হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ইন্দুকে; সমস্ত অসুখ ঝেড়ে মুছে ফেলে সে যেন এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের আহ্বান ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। সরোজ পরিচয় করিয়ে দিলে;—

"ইনিই আমার মামীমা।"

আদু প্রণাম করলে পায়ের ধুলো নিয়ে, কিন্তু শারদা কিছুই করলে না; না নিলে পায়ের ধুলো, না করলে নমস্কার; শুধু নির্বাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল ইন্দুর মুখের দিকে। যেন ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্যই করছে শুধু।

ইন্দু কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যও করলে না: বলেল, "আসুন।"

সিঁড়ি বয়ে ওরা ধীরে ধীরে উঠে এল উপরে, ইন্দুর ঘরে। ঘরটি খুব বড় নয়, মাঝারি আকারে। পূর্ব-পশ্চিমের গোটাকয়েক জানালা খোলা, ওরই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাইরের একফালি সন্ধ্যাকাশ। ঘরের মধ্যে জ্বলছিল একটা দেওয়ালগিরি। দেওয়ালে দেবদেবীর কয়েকটা ছবি খাটানো। একপাশে সামান্য একটা তক্তপোশ, তার উপর সাধারণ একটা বিছানা। সব সামান্য, কিন্তু বেশ সাজানো গোছান।

মেঝের উপর পাতা সতরঞ্চিতে ব'সে শারদা জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে বুঝি তুমি থাক?"

ইন্দু উত্তর দিলে, "হ্যাঁ।"

সংক্ষিপ্ত জবাব। কিন্তু ওরই মধ্যে যেটুকু দৃঢ়তা ওর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল তাকে শারদা যেন অবহেলা করতে পারলে না। এক নিমেষে তার মনে হ'ল এই সামান্য অবস্থায় এই দুঃখ, বেদনার মধ্যেও যে অধিকার ইন্দুর আছে, সে অধিকার তার নেই। অনধিকারী হয়েও সে যে দাবি নিয়ে আজ বড় স্পর্ধা ক'রেই ইন্দুর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে, সে দাবি আর কিছু নয়, ইন্দুকে তার প্রাপ্য জিনিষ থেকে বঞ্চিত করা। এ তার অনধিকার, অবিচার, অত্যাচার।

শারদা নিজের অজ্ঞাতেই যেন একবার চমকে উঠল। ক্ষণিকের জন্য চোখ বুজতেই যেন মনে হ'ল ওর ও বঞ্চিত আত্মা যেন জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত প্রার্থিতকে খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে ওই শুষ্ক, শীর্ণা রোগক্লিষ্ট ইন্দুর রূপ ধ'রে। তাকিয়ে দেখলে, ইন্দু দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, তেমনি সহাস্য মুখে। বললে, "ব'স তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন।"

ইন্দু বসল; এটা ওটা কথাবার্তার পর আদুকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমিই গান শেখ বুঝি আমাদের সরোজের কাছে?"

আদুর উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিল শারদা—"হ্যাঁ। আর বল কেন ভাই, ভাবলাম ও তো এমনি ব'সেই আছে, তার চেয়ে দুটো গান শিখুক যে নিরিবিলি ব'সে দুটো শুনেও মনটাকে হালকা করতে পারব।"

আদু মুখ নীচু করেছিল; ইন্দু একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলে কে জানে। বললে, "একটি গান গাও না খুকু!"

"খুকু নয় ভাই, ওর নাম আছে; আমি রেখেছি পুষ্পরাণী।" "পুষ্পরাণী? নামটি তো বেশ! কেমন—"

কি বলতে গিয়ে দেখলে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সরোজের মা কাত্যায়নী। বললে, "এস দিদি।"

দিদি কিন্তু আর অগ্রসর হলেন না। উঠে এসে প্রণাম করলো শারদা, আদুও। আশীর্ব্বাদের কি একটা কথা উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, "বস।"

শারদা দেখলে যে ঘৃণার ভাব তাঁর মুখের উপর অঙ্কিত দেখবার আশা করেই সে এ বাড়িতে এসেছিল, সে ভাব তার মুখে আঁকা নেই। উজ্জ্বল চোখে ঘৃণাও ফুটে উঠছে না, তার বদলে সেখানে আঁকা রয়েছে শান্ত কমনীয় শ্রী।

সরোজ এদের এখানে পৌঁছে দিয়েই নিজের কাজে বার হয়েছিল। ইন্দু তাই কিছু বলবার আগেই শারদা নিজের পরিচয় দিলে। "অনেকদিন থেকেই তোমার পায়ের ধুলো নিতে আসবার ইচ্ছে ছিল দিদি, কিন্তু আসতে পারি নি; কেন পারি নি তা তো তুমি জান দিদি; কিন্তু আজ সেই কুণ্ঠা সংকোচের বাঁধন ছিঁড়েই চলে এসেছি, আশা আছে অন্তত তোমার কাছে ক্ষমা পাব।"

শারদার মুখে চোখে এমন কি গলার স্বরে পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠছিল কেমন একটা গাঢ় বেদনার ছোঁয়া। কাত্যায়নী তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যেন কথা খুঁজে না পেয়েই চুপ করে রইলেন;—তার পরে বললেন, "বেশ করেছ।"

শারদা যেন আরও অনেক কথা বলবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু কিছুই পারলে না। এর পরে সামান্য দুই একটা কথা ছাড়া আর সে কোনও কথার উত্থাপন না করতে পেরে একথা সে কথার পর বিদায় নিলে।

বাক্‌পটিয়সী শারদার জীবনে আজ যেন এই প্রথম পরাজয়। তাই তার বেদনা সে চেপে রাখতে পারলে না, রাত্রির অন্ধকারে এই পরাজয়ের বেদনায় তার চোখ বেয়ে নেমে এল অজস্র জলের ধারা। ঘরের আলো নিবিয়ে শারদা বসেছিল কোচের উপর। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি। অবিনাশ এখনও ফেরে নি। সামনের খোলা জানালা দিয়ে নীচের বাগানে সদ্য-ফোটা হেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আকাশে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র।

এমনি সময়ে চটির চটপট শব্দ করতে করতে উপরে উঠে এসে দাঁড়াল অবিনাশ—"এ কি, ঘর অন্ধকার যে? আলো কই।"

সুইচ্ টেনে শারদা আলো জ্বালিয়ে দিতেই সমস্ত ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, "এখনও যে জেগে আছ, ঘুমোও নি?"

"না, ঘুম আসে নি।"

শারদা উত্তর দিলে যথাসম্ভব গলা পরিষ্কার ক'রে, কিন্তু অবিনাশের অনুমানকে সে ফাঁকি দিতে পারলে না। অবিনাশের মনে হ'ল শারদার কণ্ঠস্বর যেন কেমন ধরা ধরা, চোখের কোলে কোলেও যেন সদ্য অশ্রুমোচনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অবিনাশ বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল শারদার দিকে; দেখলে সত্যই তার চোখের কোণ বেয়ে জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে। এ কি, শারদা কাঁদছে! সে জীবনে কখনও শারদাকে কাঁদতে দেখে নি।

শারদা কাঁদছে! কিন্তু কেন? শারদা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল; কিন্তু চোখের জল যেন তার আজ হাজার চেষ্টাতেও বাঁধন মানতে চাইছিল না, সব বাঁধ ভেঙ্গে বার হয়ে আসছিল ছুটে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল তোমার, কাঁদছ কেন?

শারদা চোখ মুছে জবাব দিলে, "না, কিছু না।"

"মিথ্যে-কথা বলছ শারদা; কিন্তু মিথ্যে বলে কি সত্যিকে ঢাকা যায়! তার সাক্ষী দিচ্ছে যে তোমার ওই চোখের জল, কেমন, ঠিক নয়?"

শারদা তখনই জবাব দিলে না, দিলে একটু পরে বললে, "মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করেছি একা আমি? তুমি কর নি?"

"আমি? কোথায়?" হাঁপিয়ে উঠে অবিনাশ প্রশ্ন করলে।

শারদার কপালের মাঝখানটা কুঁচকে উঠল। একটু থেমে থেমে, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললে, "সব জায়গায়! ঘরে যার অমন লক্ষ্মীর মত বউ, সে বাইরে ছুটে বার হয় কোন্ আক্কেলে? কিসের আশায় বল তো!"

"ও, এই কথা।" অবিনাশ হো হো ক'রে হেসে উঠলো; "এই সোজা কথাটুকু বলতে এতটা কেঁদে ভাসালে শারদা?"

একটু থেমে কৌতুকের স্বরে বললে, "একটা কথা কি জান শারদা, আমি জানি সব, বুঝিও সব। জানি, যে ঘর আমার জন্যে সদা সর্বদা দরজা খুলে রেখেছে, সেঘর আমার এতটুকু ত্রুটির জন্যে কোনও দিন দরজা বন্ধ করবে না। কিন্তু তাই ব'লে কি আমার এই পথে বার হওয়ার সাহসকে, শক্তিকে বিসর্জন দিতে হবে? তা হয় না। সাহস যতক্ষণ থাকবে, শক্তি যতদিন থাকবে, ততদিন আমি এমনি বাইরে বাইরেই ঘুরব শারদা। তবে যেদিন আমার আর সাহস শক্তি কিছুই থাকবে না, সেদিন আবার ফিরে যাব সেই ঘরে, তাদেরই মধ্যে যারা একমাত্র আমারই ফেরবার আশায় পথের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে।"

এ কথার পর শারদা আর কোনও জবাব দিলে না, উঠে ধীর পায়ে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

আকাশে উঠেছে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার অফুরন্ত জ্যোৎস্না। কানে ভেসে আসছে পথ দিয়ে চলা দুই একখানা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ীর চাকার শব্দ।

**(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)**

# নিউইয়র্ক

**( ভ্রমণকাহিনী—পূর্বানুবৃত্তি )**

**শ্রীরামনাথ বিশ্বাস**

অনেকেই হয়তো শুনেছেন আমেরিকার লোক ধনী। আমারও সেই ধারণা ছিল। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কয়েক দিন থাকার পরই নিত্য নূতন সংবাদ আমি পেতে লাগলাম। শ্রীহট্ট নিবাসী আমেরিকা প্রবাসীরা এবং অন্যান্য প্রবাসী ভারতবাসীরা আমাকে মিস্ মেয়ো লিখিত বইএর একটা পাল্টা বই লিখতে বললেন। এবং সেই অনুযায়ী নানা স্থান, নানা লোকের সংগে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। যে যা বলতেন সবেতেই আমি সম্রাট নাসিরউদ্দীনের মত 'তাই হবে' ব'লে সায় দিতাম, কিন্তু আমার মনের কথা কারও কাছে বলতাম না। ঠিক করেছিলাম, আমেরিকাতে ভাল যা কিছু দেখব দেশে গিয়ে তারই কথা বলব। আমেরিকার দোষের কথা দেশের লোকের কাছে বললে তাতে আমেরিকার ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে আমাদেরই। আজ আমি টাইম্স্ স্কোয়ারের কথা বলব।

টাইম্স্ স্কোয়ার নিউইয়র্ক-এর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। টাইম্স্ স্কোয়ার দুই ভাগে বিভক্ত, আপ্ ও ডাউন। আমি বলব, মর্ত্য ও পাতাল। মর্ত্য বা উপরে ৪২নং স্ট্রীট ও ৫নং অ্যাভিনিউএর সংযোগ স্থলে দিনরাত লোকের ভিড় লেগে থাকে। এমন ভিড় কলকাতার কোথায়ও দেখা যায় না। জনতা নিয়ন্ত্রণের নিয়ম-কানুন সর্বসাধারণ দ্বারা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে পালিত হয়। এতেই জনতার কোনওরূপ অসুবিধার কারণ হয় না। ফুটপাথেও যারা চলে তারা একে অন্যকে বাঁয়ে রেখে চলে। আলোর সাহায্যে ট্রাফিক কনট্রোল হয়; অবশ্য পুলিসও থাকে। পুলিস দুরকমের। যারা পুলিসের সাধারণ পোশাক প'রে যান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে, পথচারীদের নানা বিষয়ে সাহায্য করে, তাদের ছাড়াও একরকম গুপ্ত পুলিস আছে। তাদের দেখি নি, তাদের সম্বন্ধে শুনেছি মাত্র। তারা গুপ্ত পুলিস, ওদেশে বলে 'জিমেন'। তারা আমাদেরই মত পোশাকে থেকে পকেটমার জাতীয় অপরাধীদের সন্ধান ক'রে বেড়ায়। শুনেছি, পথচারীদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করে, ওরা তাদের কাছে ঘেঁষে না। ওদের ধারণা, যারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় তারা পকেটমার জাতীয় নিকৃষ্ট জীব হ'তে পারে না।

এইবার পাতালের কথা বলছি। লণ্ডনের মত এখানেও under ground railway আছে। কিন্তু লণ্ডনের চেয়ে তাতে লোকের চলাচল বেশি এবং স্টেশনগুলিও তুলনায় অনেক বড়। টাইম্স্ স্কোয়ারএর স্টেশনের সংগে চিয়ারিং ক্রসের তুলনা হ'তে পারে না। টাইম্স্ স্কোয়ার হাওড়া স্টেশনের দ্বিগুণ। লোক চলাচল উপরে যেমন নীচেও তেমনি। গাইড আছে, সে পথের সংবাদ দেয়। ভাংগানি নিয়ে কয়েকটি লোক ব'সে আছে, তাদের কাছে একশত ডলার পর্যন্ত বিল ভাংগানো যায়; তার জন্য কোনওরূপ বাটা দিতে হয় না। সুবিধা সব রকমে বিরাজ করছে। একটা দেখবার মতন জায়গা বটে। সেখানে গেলে অন্ততঃ চার ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে হয়।

তবুও জায়গাটার বদনাম আছে। কয়েক দিন নানা লোকের সংগে সেখানে যাওয়া আসা করছিলাম, পরে একদিন একাকী গিয়ে বুঝতে পারলাম বদনাম যা আছে তা কিছু সত্য বটে। মিস্ মেয়ো তখন হারলামের এক-শ বত্রিশ স্ট্রীটে থাকেন জেনে সন্ধানে বার হয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল বলব যে তিনি যেমন ভারতবর্ষের নর্দমা ঝাঁট দিয়ে বই লিখেছিলেন তেমনি হারলামের কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে টাইম্স্ স্কোয়ারের বুক পর্যন্ত ঝাঁট দিয়ে যদি বই লেখেন তবেই বুঝব যে তিনি স্বাধীন লেখিকা। কিন্তু দেখা হয় নি। শুনলাম তিনি কোনও হিন্দুর (অর্থাৎ ভারতবাসীর) সংগে সাক্ষাৎ করেন না। অগত্যা নিগ্রো সেজেই তার সংগে একদিন সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সে কথা পরে বলব।

মর্ত্য আর পাতালের কথা বলেছি, এইবার স্বর্গ বা আকাশের কথা বলি। গংগা নদীর উপর একটা পুল হয়েছে, হাওড়ায় আর একটা হবে। সেরূপ পুল যদি হাওড়া থেকে আরম্ভ ক'রে চন্দননগর পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয় আর তার উপর যদি বোম্বাইএর মত ইলেকট্রিক কার চলে তবে তা দেখতে যেমন হবে, এলিভেটর প্রায় সেইরূপ। এলিভেটরের পুলের উপর লিফ্ট্এ ক'রে ওঠা যায়, পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বয়েও ওঠা যায়। যাদের পেট মোটা তাদের পায়ে হেঁটে এলিভেটরে উঠতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস হেঁটে এলিভেটরে উঠলে পেট কমে। টাইম্স্ স্কোয়ারের কাছে, এরূপ এলিভেটর স্টেশনে বিকাল বেলা এবং রাত্রি দুটোর পর ভয়ানক ভিড় হয়। নূতন জীবনের স্বাদপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরই ভিড় বেশী।

নভেম্বর ডিসেম্বর এবং জানুআরি এই তিনটি মাস নিউ ইয়র্ক নগরীর গরিবলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক। যাদের ঘরভাড়া দিবার ক্ষমতা থাকে না, হোটেলে স্থান পায় না, এই শীতে তাদের বড় কষ্ট। শীত মানুষকে যেমন পরিশ্রমী করে তেমনি শক্তিহীনও ক'রে দেয়। যাদের শক্তিহীন ক'রে দেয়, তারাই বিপদে পড়ে। শীতের তীব্রতায় পথে পথে আশ্রয়ের সন্ধানে হেঁটে যখন একেবারে কাতর হয়ে পড়ে তখন সেই ধনী দেশের গরিব লোকেরা under ground railwayতে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। পাতাল শীতের সময় গরম থাকে। কিন্তু খাবার চেষ্টাতেই তাদের আবার মাটির উপর উঠে আসতে হয়। উপর নীচে যাওয়া আসা করতে দশ সেন্টের দরকার। অথচ দশ সেন্ট খরচ করলে ছোটখাটো গরিব হোটেলে রাত কাটানো যায়। তবু যে গরিবেরা পাতাল প্রবেশ করে, শুনেছি শীত ছাড়া তার আরও কারণ আছে। কিন্তু সে কথা আমার ব'লে দরকার নেই, মিস্ মেয়ো তা' বলতে পারেন। শোনা যায় আমেরিকায় এই শ্রেণীর গরিবদের প্রতিক্রিয়াশীল ( reactionary ) বলে।

চীন দেশের গরিব, ভারতের গরিব, আরবের গরিব, নানা দেশের গরিবদের সংগেই আমি মিশেছি, থেকেছি; কিন্তু আমেরিকার গরিবদের দেখে আমি যেমন ভয় পেয়েছি তেমন কোনও দেশের গরিবদের দেখে পাই নি। ধনীর দেশের গরিবের রকমই আলাদা। তারা যেমনি অবুঝ তেমনি কর্মবিমুখ। অথচ তারা দাবি করে বাঁচবার।

পূর্বেই বলেছি আমেরিকায় বেকারদের জন্য সাপ্তাহিক খাইখরচ বাবদ সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এমন সাহায্য সহজলভ্য নয়, তাতে সুপারিশের দরকার। তা ছাড়া নাগরিকের অধিকার না থাকলে এ সাহায্য পাওয়া যায় না। সুপারিশ ও নাগরিকের অধিকার লাভ ভারতবাসীর পক্ষে যেমন কষ্টকর, ইউরোপীয়দের পক্ষে তত কষ্টকর না হ'লেও সহজে তারাও নাগরিক হ'তে পারে না। এ এক বড় বালাই। গরিবদের বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত ধূম্ররাশি ঊর্ধাকাশে উঠছে, এখন বাকি শুধু অগ্নির বিকাশ। হয়ত একদিন অনুকূল বাতাসের সঞ্চার করবে, আগুনও দেখা দেবে; এবং তখনই প্রকৃতভাবে আমেরিকায়

'By the People, for the People, of the Peopleএর স্বরূপ বিকশিত হবে।

গত বৎসরের হিসাব মতে আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় মাত্র তিন হাজার আছে। নিউ ইয়র্ক, ডিট্রয়, স্টকটন, লুগাই ও ইম্পিরিআ্যাল ভ্যালিতেই তারা থাকেন। অন্যান্য স্থানে যে দু-এক জন আছেন তাঁরাও উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এখন আমি আর সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে নিউ ইয়র্কএর ভারতীয়দেরই কথা বলব।

নিউ ইয়র্কএর হিন্দুদের সংখ্যা পাঁচ-শ থেকে ছয়-শ; এর মধ্যে বাঙালী মুসলমানই শতকরা নব্বইজন। বাকী দশজন অন্যান্য ভারতবাসী। তাতে পাঞ্জাবী, পারসী, বাঙালী হিন্দু সিংহলী আছেন এবং তারা প্রত্যেকেই ভারত থেকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখেই গিয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমানরা আমেরিকাতে নাবিক হয়ে যান এবং জাহাজ থেকে পলায়ন করে চিরতরে আমেরিকায় বসবাস করবার চেষ্টা করেন। যে কয়জন শিক্ষিত হিন্দু আমেরিকায় গিয়েছেন তারাও ফিরে আসবেন বলে মনে হয় না। আমেরিকা সরকার বর্তমানে একটা আইন পাস করেছেন যে, যে সকল বাদামী (brown) ও হলদে (yellow) বিদেশী ১৯২১ খৃীষ্টাব্দের পূর্বে আমেরিকায় গিয়েছে, তারা অর্ধ নাগরিকরূপে গণ্য হবে। অর্ধ নাগরিক মানে হল তাদিকে নির্বাসন (deportation) দেওয়া হবে না। আমেরিকার নাগরিক হলে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় সে সব সুবিধা এরূপ অর্ধ নাগরিকরা পায় না; তবে আমেরিকায় থাকতে পারে মাত্র। কাজকর্ম পাবারও এদের অধিকার নেই, যেমন নাগরিকরা পেয়ে থাকে। এরূপ অর্ধ নাগরিক হয়ে থাকা যে কত কষ্টকর তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই ভাল করে জানেন।

যাঁরা সমুদ্রে বেড়িয়েছেন অথবা নাবিকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছেন তাঁরা হয়তো ভাল করেই জানেন, কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, খালাসী ও তেলওয়ালারা জাহাজে কি কঠোর পরিশ্রম করে। এ সকল চাকরী পেতে আর তা বজায় রাখতে তাদের তিন মাসের মাইনে সারেংকে দিয়ে দিতে হয়। এইভাবে দিয়ে থুয়ে এবং নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে তারা যখন আমেরিকার বন্দরগুলিতে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন স্বতই তাদের পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পালিয়ে যাবার পথ সুগম নয়। প্রথমত আমেরিকার বন্দরগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের অবতীর্ণ হবার পাসই খুব কম দেওয়া হয়। তারপর যারা পাস পেয়েও যায়, তারা যখন তীরে নামে, তখন হয় সারেং নয় টেণ্ডল তাদের সঙ্গে থাকে। এই সারেং বা টেণ্ডল সঙ্গে থাকলে পালিয়ে যাওয়া অতীব কঠিন। তা ছাড়া সারেং ও টেণ্ডলগণ সদাসর্বদা নাবিকদের কাফেরএর দেশে থাকতে মানা করে এবং থাকলে নরকে যাবে বলে ভয় দেখায়। অনেকে সুযোগ পেলেও নরকের ভয়ে পালায় না। যারা নরকের ভয় পায় না, আর যদি সুযোগ পায় তো তারাই পালায় এবং স্বর্গরাজ্যে অন্ততপক্ষে কিছুদিনও বসবাস করে। বাস্তবিক আমেরিকার গৃহবাস, পথঘাট, স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা প্রভৃতি আমাদের পক্ষে অনেকটা স্বর্গেরই মতন।

পূর্বেই বলেছি আমেরিকার ডক থেকে বা'র হতে গেলে চুরি করে বা'র হওয়া যায় না। তবুও আমাদের দেশের লোক পালায়। আল্লা তাদের হৃদয়ে ভক্তি দিয়েছেন, বাহুতে শক্তি দিয়েছেন, মগজে বুদ্ধি দিয়েছেন। আমার মনে হয়, পৃথিবীর লোক যা করতে পারে না, আমাদের দেশের লোক যদি সুযোগ ও সুবিধা পায় তো বোধ হয় তাও করতে পারে। আমি পূর্ববর্ণিত মোল্লা মহারাজের পলায়ন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলছি।

রাত্রি তখন তিনটে, নদীতে ভাঁটা পড়েছে। মোল্লা সাহেব রান্নাঘর থেকে বড় বড় দুটো ডেগ বার করে রসি বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে সেই রসি ধরে নিঃশব্দে নদীতে নেমে পড়লেন। তারপর ভেসে চললেন সমুদ্রের দিকে। আমেরিকার শীতের সাগর। সে যে কি জিনিস তা বোঝানো কঠিন। সেদিন বোধ হয় তাপমান যন্ত্রে এক কি দুই ডিগ্রী উত্তাপ। মোল্লা সাহেবের শরীর অবশ হতে লাগল, আল্লাকে স্মরণ করতে করতে তিনি ভেসে চললেন, মোল্লার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল; অবশেষে মৃত্যুর হাত ধরেই তিনি তীরে গিয়ে ভিড়লেন।

নদী তীরে লোকজন নেই, নীরব নিস্তব্ধ। মোল্লা সাহেব নদী তীরে উঠে শরীরটাকে ঝেড়ে অবসন্ন পায়ের উপর সাহস করে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ডক থেকে বা'র হয়ে একটা কাফেতে গিয়ে এক গিনি ফেলে দিয়ে কাফি চাইলেন। কাফের মালিক এরূপ লোক অনেক দেখেছে, অনেক সাহায্য করেছে। মোল্লাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে, খাইয়ে ঘরের উত্তাপ বাঙলা দেশের উত্তাপের মত করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে-দিল। মোল্লা সাহেব পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর যখন আপন জেলার লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল তখন অকপটে তিনি তাঁর পলায়ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন; এমন কি জাহাজের নাম পর্যন্ত গোপন করলেন না। মুসলমান ভাইএর কাছে সত্য না বললে পাপ হবে ভেবেই বোধ হয় মোল্লা সাহেব সত্য কথা বলেছিলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই যেদিন বুঝলেন যে আমেরিকা থেকে বিদায় করে দেবার জন্য পুলিস তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এই বিপদের মূলে আছে তাঁরই জাতভাই, সেই দিনই তাঁর মাঝে এক বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি হল। তিনি নাম পরিবর্তন করলেন, দাড়ি গোঁফ কাটলেন, কাফেরী টুপি মাথায় দিলেন, ইংরেজী শেখার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে যেতে লাগলেন, নূতন ভাবের নূতন ফুল মোল্লার হৃদয়ে ফুটে উঠল। ফুলের ফল যে কি হয়েছে তার বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি।

নিউ ইয়র্ক নগরীতে কয়েকজন এমন ভারতীয় আছে যারা পূর্বে এই ধরণের লোককে ধরিয়ে দিলে টাকা পেত। কিন্তু নূতন আইন প্রচলিত হওয়ায় অনেকেই একটু নিঃশ্বাস ফেলে মানুষের অবস্থায় ফিরে আসছে। নিউ ইয়র্ক পৌঁছাবার পর অনেক স্বদেশবাসী মোল্লা সাহেবের মত আমাকেও ঘিরে ধরেছিল; কিন্তু যখন জানলে যে আমি যাত্রিরূপে এসেছি তখন তাদের উক্ত প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিলে।

এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যারা আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছে আপনার দেশের লোক হয়ে, আপনার জাতভাই হয়ে সামান্য স্বার্থের জন্য সামান্য বিবাদের জন্য তাদিকে ধরিয়ে দেওয়ার মত অনুতাপের বিষয় আর নেই। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখ হল যখন দেখলাম যাঁরা Fellowship of all the Religions পান তারা এই সব লোককে উপদেশ দিয়েও কখনও সাহায্য করেন না। যাঁরা আমেরিকায় গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন, তাঁরা এদের দেশের লোক বলে ভাবেন না। যাঁরা শিক্ষিত তারা এদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। আমার এই সামান্য কয়দিনের প্রবাসে আমি তাদেরই একজন হয়ে তাদের সঙ্গে ছিলাম বলে তাদের অনেক সৎ পরিবর্তন দেখেছি। আমাদের স্বর্গত প্যাটেল যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি এদের অবজ্ঞা করেন-নি। ফলে প্রতিদিন তিনি পাঁচশত হিন্দুর 'বন্দে মাতরমজী' পেতেন। আমেরিকার লোক অবাক হয়ে ভাবত এরই মধ্যে এই বৃদ্ধের এত অনুগামী জুটল কি করে। আজও অনেকে স্বর্গত প্যাটেলের নাম করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। লোক চায় ভালবাসা, দূরে রাখা নয়। যাঁরা নিজের ভাইকে হীন মনে করে দূরে রাখেন এবং ঘৃণা করেন, তাঁদের কাজের ও কথার কোনও মূল্য নেই, তা তাঁরা যত বড়ই হন।

# গাঁয়ের মায়া

(বড় গল্প)

শ্রীমনীন্দ্রকুমার দত্ত

২

হইচই ক'রে গাঁয়ের পথ ধ'রে ছেলের দল চলেছে। নারান আজ সুসজ্জিত। সামনে একজোড়া বলদ, বিয়ের নজরানা। সুভদ্রা সেদিন রাজী না হ'লেও বিয়ে তাদের ঠিক হয়ে গিয়েছে, আজ বাগ্দান।

মনসা বুড়োর বাড়িতে কিন্তু এই ফাঁকে যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ উলটো ধরনের। এই আনন্দ-কোলাহলের মাঝখানে তার গৃহত্যাগ কেউ লক্ষ্যও করবে না —এই ভরসায় মনসা বুড়ো জিনিস পত্তর সব নৌকায় তুলছে।

হইচই ক'রে সবাই যখন পথ ধ'রে যায় তখন মনসা বুড়ো দাওয়ায় ব'সে একমনে তামাক খাচ্ছে। পাশে খুঁটিতে ঝোলানো নিলামের পরোয়ানা। চোখের জল মুছতে মুছতে বুড়ী ছেলেপুলে নিয়ে নৌকোর দিকে গেল। একটা ছোট্ট মেয়ে এসে মনসা বুড়োকে ডাকল, "বাবা"।

মনসা বুড়ো যেন সংবিৎ ফিরে পেল। মেয়ের কথায় জানল ঠাকুমা ছাড়া সবাই নৌকোয় উঠেছে। মনসা বুড়ো মার ঘরে যেতেই বুড়ী ডুকরে কেঁদে উঠল। এতদিনের ভিটে।

কোনও রকমে তার মুখ চাপা দিয়ে উঠনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় এসে হাজির হ'ল সুভদ্রা। কোনও কথা না ব'লে সে পথ আটকে দাঁড়াল। মনসা বুড়ো একটু চুপ ক'রে থেকে দাওয়ায় টাঙ্গানো নোটিসটি দেখিয়ে দেয়। সুভদ্রা জানায়, সে দেখেছে। তবু সে পথ ছাড়বে না, তবু বলবে গাঁয়ে থাকলে তার বাবা হিল্লে ক'রে দেবে। মোড়ল যে আজ এদের বাঁচাতে গিয়ে এদের অবস্থাতেই এসে পৌঁছেছে সে খবর তো সুভদ্রা জানে না। জানে মনসা বুড়ো, জানে মোড়ল নিজে।

মনসা বুড়োর ছোট্ট মেয়ে ততক্ষণে তুলসী তলায় দিনের আলো থাকতেও প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়ে এল। শেষ প্রদীপ এই ভিটেয়। তার পর তুলসীতলায় প্রণাম ক'রে এসে বাবাকে বললে, "চল্।"

সবাই চলল ঘাটের দিকে। সুভদ্রার শত অনুরোধ বিফল হ'ল। যুক্তিহীন অনুরোধ, তাই। মনসা বুড়ো ভিটেকে ভালবাসে, মোড়লকে ভালবাসে। তবু তাকে যেতে হয়; নিজের পেটের দায়ে, ছেলেপুলের পেটের দায়ে, একটু আশ্রয়ের আশায়। হয় চটকলে, নয় দূরে আসামের চা বাগানে।

ঘাটের পইঠায় পা ডুবিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সুভদ্রা।

মোড়লের বাড়িতে সবাই এসে একত্র হয়েছে, শুধু সুভদ্রাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিন্দী তার সখীদের নিয়ে বেরুল সুভদ্রাকে খুঁজতে, আজ আশীর্বাদ। খুঁজে তাকে পাওয়া যায়। অন্য সকলের আনন্দের চাপে সুভদ্রার দুঃখও চাপা প'ড়ে যায়। আরও চাপা পড়ে কারণ ভৈরবকে সে কষ্ট দিতে চায় না। সে তো জানে এ খবর তার বুকে কতখানি লাগবে।

খালের ধারে একটা গাছের তলায় ব'সে সুভদ্রা একপাল ছেলেমেয়েকে খাওয়াচ্ছিল। সেদিন সুভদ্রা খবর পেয়েছে চরণের বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। চরণ গঞ্জে গেছে টাকার চেষ্টায় মোড়ল বাড়ি নেই। পাছে সে নিজে চরণের বাড়িতে চাল দিতে গেলে তারা কিছু মনে করে এই ভয়ে সুভদ্রা বাড়ি থেকে রান্না ক'রে এনে গোপনে চরণের ছেলেমেয়েদেব খাইয়ে দিচ্ছিল।

গাঁয়ের সকলের সকল রকম সুবিধা অসুবিধার খোঁজই সুভদ্রা রাখে এবং তার কাছ থেকেই মোড়ল খোঁজ পায়।

একটা ছিপ হাতে ক'রে নারানও এসে হাজির হ'ল খাল-ধারে মাছ ধরতে। ততক্ষণে ছেলেমেয়েদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে। সুভদ্রার কাছ থেকে সব কথা শুনে নারান বললে, "তবু সড়কী জেঠা বলবে, গাঁ থেকে কেউ যেতে পারবে না!"

সুভদ্রাও শোনায়, "পারবে না-ই তো। তোর মত সবাই হাভাতে কি না!

সভয়ে নারান প্রশ্ন করে, বিয়ে হ'লে কি সুভদ্রা তাকে পেট ভ'রে খেতেও দেবে না? সুভদ্রা বলে, নারানকে বিয়ে করছে কে!

ইতিমধ্যে নারান লক্ষ্য করল সুভদ্রার পিছন দিক থেকে গোঁসাইঠাকুর আসছে। গোঁসাইঠাকুরের সঙ্গে এদের ঠাকুরদা সম্পর্ক। তাই অত্যন্ত ভাল ছেলের মত সে প্রশ্ন করল, সুভদ্রা কি তা হ'লে গোঁসাইঠাকুরকে বিয়ে করাই সাব্যস্ত করেছে? সুভদ্রা গম্ভীরভাবে জানায়, হাঁ।

গোঁসাইঠাকুর পিছনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এদের কথা শোনে। নারানের চোখে মুখে চাপা হাসি খেলে যায়। সে নানাভাবে গোঁসাই এবং সুভদ্রার ভাবী গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এঁকে চলে এবং সুভদ্রাও গম্ভীরভাবে তার কথায় সায় দিয়ে যায়। বেচারী সুভদ্রা, সে জানেও না গোঁসাই-ঠাকুর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে। কাজেই নারানের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে একসময় যখন সে গোঁসাইকে দেখতে পেল তখন আর সে দাঁড়াতে পারল না, ছুটে পালাতে হ'ল। নারান আর গোঁসাই হাসতে লাগল।

দূরে তখন খালধার দিয়ে নিলুঠাকুর আর ভৈরব গঞ্জ থেকে ফিরছিল। নিলু একটু বেশী উত্তেজিত; মোড়ল তাকে থামাবার চেষ্টা করছে। নারানের কাছে আগুন আছে দেখে

নিলু বসল গাঁজা ধরাতে, গোঁসাই আর মোড়ল এগিয়ে চলল।

নিলুঠাকুরের কাছে নারান শুনল দেনার দায়ে ভৈরব সড়কীর সব কিছু বাঁধা। আর সব দেনাই তার গাঁয়ের পাঁচজনের জন্যে। দু কিস্তি সুদ দিতে পারে নি ব'লে আজ মহাজন তাকে ডেকে নিয়ে শুধু বেইজ্জত করতে বাকী রেখেছে। নিলুর দুঃখ—সে সেই মহাজনকে মা কালীর কাছে বলি দিয়ে পুণ্য অর্জন করতে পারছে না।

সত্যিই চিন্তার কথা। গাঁয়ের সবাই দুঃখের দিনে মোড়লের মুখ চেয়েই থাকে।

অনেকক্ষণ পরে নারান বললে, সে তার জমি বিক্রি ক'রে মোড়লের দু কিস্তি সুদ দেবে। নীলু শুনে বলে, "তার পর?"

নারান বলে, জমি বিক্রি ক'রে এ বছরের মত জমা নেবে। ফসল পেলে সব মিটিয়ে দিয়ে চটকলে চ'লে যাবে।

নিলু বোঝে এ ছাড়া উপায় নেই, তবু রাজী হ'তে পারে না প্রথমটা। বাপ-পিতামোর জমি, মোড়ল যদি জানতে পারে? নারান বলে, মোড়লকে বাঁচাতেই হবে। মোড়ল যদি দেখা শোনা না করত তা হ'লে নারানের জমি থাকত কোথায়? নারান চটকলে গিয়ে পেট চালাতে পারবে, কিন্তু মোড়ল তো তা পারবে না!

শেষ অবধি তাই স্থির হ'ল। কথা হ'ল নিলু সুদের টাকা জমা দিয়ে আসবে মোড়লের নাম ক'রে। কেউ কিছু জানতে পারবে না।

সেদিন নারানের বিয়ে, সারা গাঁ সুদ্ধ একটা উৎসব চলেছে। মোড়লের বাড়ি থেকে সানাইয়ের বাজনা শোনা যাচ্ছে। তখনও বরযাত্রীর দল বরের বাড়ি থেকে যাত্রা করে নি। নারান তাদের নিয়ে দাবায় ব'সে তামাক খাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে বিন্দী এসে হাজির হ'ল। তার পরনে আজ রঙ্গীন ডুরে শাড়ি, পায়ে আলতা। আজ তারই যে সব থেকে বেশী আনন্দের দিন, তার দাদাভাইয়ের বিয়ে—তারই সখীর সঙ্গে।

নারনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বিন্দী বলল, "মনে আছে তো?"

"কি?"

"সুভদ্রা তোমায় বলে নি? দুজনে মিলে বিয়ের আগে মন্দিরে প্রণাম ক'রে আসবার কথা ছিল।"

নারান স্বীকার করল সে ভুলে গিয়েছিল। তার পর স্থির হয়, নারান তার বাড়ির পিছনে আমগাছটির কাছে থাকবে, সুভদ্রা পালিয়ে আসবে জঙ্গলের পথ দিয়ে।

একটু বাদেই সুভদ্রা এল কনের বেশে। নারান আর সুভদ্রা দুজনে চলল মন্দিরে। সুভদ্রার আজ সে চাঞ্চল্য নেই, বোধ হয় লজ্জার চাপে। মন্দিরে পৌঁছে নারান নিলু-ঠাকুরকে ডাক দিল। নিলু পাশে একটা চালায় ব'সে রান্না করছিল। ভিতর থেকেই জবাব দিল, "কে, নারান? আসছি দাঁড়া।"

তার পরই প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ রে, মোড়ল টের পায় নি তো?"

"কি?"

"তুই যে সব বেচে কিনে বাবা দিগম্বর হয়েছিস?"

নারান ভয় পেয়ে যায়, বলে, "না, না, তুমি থাম।"

নিলু জানতে পারে না নারানের সঙ্গে সুভদ্রা। তাই ব'লে যায়, "মোড়ল যদি জানতে পারে—"

সভয়ে নারান বলে, "আহা সুভদ্রা—"

কথা তার শেষ হ'ল না। নিলু ব'লে বসল, "আমারও তো ভয় ওই সুভদ্রাকে। ও বেটি যদি জানতে পারে তুই জমি-জমা বিক্রি ক'রে দিয়েছিস্—"

নারান চীৎকার ক'রে ওঠে। "ঠাকুর—"

নিলু দৌড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সুভদ্রা ততক্ষণে ঝাঁকানি দিয়ে নারানের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটা গাছ ধ'রে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। স্তম্ভিত নিলুর মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। নারান এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার কাঁধে হাত রাখে।

সুভদ্রা ফোঁস ক'রে ওঠে। বলে, "তুই দূর হ, দূর হ, দূর হ। আমি কক্ষণো তোকে বিয়ে করব না।"

নারান তাকে বোঝায় অপরাধীর মত। বলে জমি সে বিক্রি করে নি, বাঁধা রেখেছে। ফসল পেলেই ছাড়িয়ে আনবে।

সুভদ্রা বলে, তবে বিয়েও তাদের তার পরেই হবে।

নারানের সকল অনুরোধ ব্যর্থ হয়। কনের সাজ খুলতে খুলতে সুভদ্রা বাড়ির দিকে চ'লে যায়। অপ্রতিভ নিলু বলে "তুই একটু বস নারান, আমি একবার মোড়লের বাড়ি গিয়ে দেখি।"

সুভদ্রার চেহারা দেখে বাড়িসুদ্ধ লোক অবাক। বিন্দী বুঝল, কি যেন একটা হ'য়েছে। সে তাই কেউ কোনও প্রশ্ন করবার আগেই সুভদ্রাকে ধ'রে নিয়ে ঘরের ভিতর চ'লে গেল। ঘরে গিয়ে সুভদ্রা বিন্দীকে বলল সবাইকে জানিয়ে দিতে যে, অঘ্রান মাসের আগে সে বিয়ে করবে না। শত চেষ্টা ক'রেও বিন্দী তাকে দিয়ে আর কিছু বলাতে পারলে না। মোড়ল শুনে প্রথমটা অবাক হল, তার পর রাগারাগি শুরু করল। সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি ভৈরব পছন্দ করে না।

উৎসবের বাড়ি, ক্রমে হইচই বাড়তে লাগল। এমন সময় এল নিলু ঠাকুর। মোড়লকে এবং অন্যান্য মুরুব্বীদের ডেকে বললে যে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। সুভদ্রা নাকি মায়ের মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে। নিলু ঠাকুর ছুটে আসতেই বলে, "ঠাকুর এখন বিয়ে হ'ত পারে না।" কাজেই বুঝতে হবে ব্যাপারটায় মায়ের হাত আছে। আর তা ছাড়া অঘ্রান মাসই তো ভাল। তখন-লোকের ঘরে খাবার থাকবে, সবাই প্রাণ ভ'রে আমোদ ক'রতে পারবে।

মুরুব্বীরা সবাই সায় দিল। নিলু মোড়লকে আরও বোঝাল, এ নিয়ে যেন সুভদ্রাকে ঘাঁটানো না হয়। দেবদেবীর ব্যাপার সব!

কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ল।

তার পর বর্ষা নামে; বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। পাইক-

ডাঙগার ভাগলক্ষ্মীর চোখের জল যেন অঝোর ধারায় ঝ'রে পড়ছে। গাঁয়ের লোকের ঘরে খাবার নেই, ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে; কচুর গোড়া, গেঁড়ি সিদ্ধ খেয়ে তাদের দিন কাটে। ঘর থেকে বেরবার উপায় নেই।

মোড়লের ভান্ডারও আজ শূন্য। শেষ কণাটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে সে রওনা হয় নিলু ঠাকুরের জন্য, ' নিজের ঘর থেকে নিজে চুরি ক'রে। সুভদ্রা দেখে, দেখে মুখ ফিরিয়ে হাসে।

গাঁয়ের দানেশ পাইক পাঁচ ছটি সন্তানের জন্মদাতা। তার ঘরে জন্ম নেয় আরও একটি শিশুপুত্র। সমস্ত প্রাণ দিয়ে দানেশ তাকে বরণ ক'রতে পারে কি? যে কটি সন্তান তার আছে তাদেরই সে খেতে দিতে পারে না—আশ্রয় দিতে পারে না। তবু শঙ্খ বাজে, তবু হুলুধ্বনি পড়ে; তবু গাঁয়ের লোক এসে জমা হয়, আনন্দ করবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে।

কিন্তু দানেশের মায়ের কান্নায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আজকের দিনে সে নাতিদের মুখে কচুসিদ্ধ তুলে দেবে কি ক'রে? কিন্তু উপায় নেই—গাঁয়ের কারও সেদিন এমন সামর্থ নেই যে এদের সাহায্য করে।

এমন সময় সাহায্য আসে তিনকুর হাত দিয়ে। এক বস্তা চাল সে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে। তার জাত-ব্যবসা চুরি করা, এতে দোষ নেই। সবাই বলে মায়ের বাড়িতে উৎসর্গ ক'রে নিতে, কিন্তু নিলু ঠাকুর রাজী নয়। বলে, সারা গাঁ সুদ্ধই তো মা হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে বেড়াচ্ছেন, এদের দিলেই তো মায়ের পুজো দেওয়া হবে।

আবার এদের মুখে হাসি দেখা যায়। উপস্থিত বিপদ এদের কেটে গেছে, দানেশের ছেলেরা আজ ভাত খেতে পাবে।

তার পর একদিন ভোরবেলা দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার। যতদূর চোখ যায় অথই জল। ভিজে ঘাসে ভিজে পাতায় সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। পথের ধারে হাঁটু জলে ছেলের দল মাতামাতি করছে। চাষীরা বেরিয়েছে মাঠে ধান দেখতে। কিন্তু মাঠে আজ আর ধান দেখা গেল না। ধানের উপরে প্রায় একহাত জল। ধান খেতের ধারে ধারে খালগুলো জেলেরা ইজারা নিয়েছে জমিদারের কাছ থেকে। এত জলে মাছ বেরিয়ে যাবে ব'লে তারা বাঁধ দিয়েছে।

ক্রমে গাঁয়ের সবাই এসে জমা হ'ল উঁচু বাঁধটার উপরে। বেশী কথাবার্তা না ব'লে নারান কোদাল দিয়ে বাঁধ কাটতে শুরু করল। অন্যরাও যোগ দিল তাকে সাহায্য করতে। এমন সময় খবর পেয়ে ভৈরব এসে বাধা দিল। নারান বলে, ভৈরব যেন বাধা না দেয়। ধান বাঁচাবার জন্যে বাঁধ তাদের কাটতেই হবে।

ভৈরব বলে, "তবে লাঠি কেন?"

"কেউ যদি বাধা দেয়!"

"কেউ কে?"

"জেলেরা!"

"জেলে তো মোটে তিন ঘর।"

"ওরা যে জমিদার বাড়ি খবর দিয়েছে।"

"হুঁ, বাড়ি চল্।" ভৈরব হুকুম দেয়।

সমস্বরে সবাই আপত্তি জানায়, "জেঠা!"

ভৈরবও চীৎকার ক'রে ওঠে। "নেমকহারামের দল, এই বাবুদের কৃপায় পাইকডাঙগার পত্তন না?"

"বাঁধ দিয়েছে তো জেলেরা।"

"চুপ কর্। জলকর বাবুদের। বাঁধের মালিক বাবুরা।"

নারান লাফিয়ে জলে নামল। জলের ভিতর থেকে একটা ধান গাছ টেনে তুলে দেখাল, ধান যদি আর একদিন জলের নীচে থাকে তবে সব প'চে যাবে। কিন্তু কোনও অনুরোধই ভৈরবকে নরম করতে পারে না। নিলু বোঝায়, জমিদার হয়তো জানেও না এই বাঁধের জন্য চাষীর ধান নষ্ট হয়। সব শরিকরাই তো থাকে শহরে; প্রজার কথা তারা শোনেই না। ভৈরবের তবু সেই এক কথা, জমিদারের বিরুদ্ধে কোনও কাজ সে করতে দেবে না।

নারান মোড়লকে অনুনয় বিনয় করল, পায়ে ধরল। যখন কোনও ফল হ'ল না তখন হাঁক দিল, "বাঁধ আমরা কাটব জেঠা, শুনব না তোর কথা।"

মোড়ল কাঁধের গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে সড়কি হাতে ক'রে দাঁড়াল। বলল, "জমিদারের নিমক খেয়েছি আমি।"

বিপদে পড়ল নারানের দল। মোড়লের গায়ে তারা হাত তুলতে পারে না। কোদাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, "তবে গাঁয়ের সবাই খাবে কি? তারা বাঁচবে কি ক'রে?"

মোড়ল হেসে জবাব দিলে, "তাই বল্। গাঁয়ে ফিরে চল্, সেখানে পরামর্শ ক'রে স্থির করা হবে কি করা যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নারানই সকলের আগে গাঁয়ের পথ ধরল। রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বালা করছে। বেঁচে থাকবার অধিকারও তাদের নেই? (ক্রমশ)

# জ্ঞানরত্নাকর

ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি;

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনের খাতিরে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি হয়। তাহার পর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ হইতে বাঙলা সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন হওয়াতে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বাঙলা গদ্যের সম্প্রসারণ হয়। রামমোহন রায় এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারের ও বিতণ্ডার বাহন হিসাবেও বাঙলা গদ্য কিছু পরিপুষ্টি লাভ করে। তথাপি প্রাচীনতর ধারার পদ্যবন্ধের প্রভাব এতদূর Instinctive ছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি পদ্যই বাঙলা সাহিত্যের প্রধানতম বাহন ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আখ্যায়িকা, কাহিনী, ইতিহাস, স্মৃতি, সঙ্গীত, চিকিৎসা এমনকি ব্যাকরণ গ্রন্থ অবধি পদ্যে লেখা হইত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফারসীর স্থলে বাঙলা আদালতের ভাষা হিসাবে গৃহীত হওয়ায় গদ্য বন্ধের একাধিপত্যের সূচনা হইল। কিন্তু তবুও কিছুকাল ধরিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর অবধি পদ্যের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়া গেল। এই সময়ে রচিত অনেকগুলি গ্রন্থে গদ্যপদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য এই দুই বন্ধের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গদ্যেপদ্যে রচিত একটি নিবন্ধের কথাই বলিব। বইটি এক হিসাবে একবারে নূতন ধরণের। অনেকটা readers' compondium বা encyclopaedia অর্থাৎ বিশ্বকোষ গোছের বলা যাইতে পারে। নাম জ্ঞান-রত্নাকর। নবকৃষ্ণ বসুর নাম গ্রন্থকার হিসাবে দেওয়া থাকিলেও বইটির অনেকটুকু—পদ্যাংশটুকু দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা। ইঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য বসু। আমি যে বই দেখিয়াছি তাহাতে নামপত্র নাই, কিন্তু শেষে গ্রন্থরচনা অথবা মুদ্রণ সমাপ্তিরকাল দেওয়া আছে—"বৈশাখ, সন ১৭৮০ শক"। সুতরাং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ গ্রন্থ প্রকাশকাল ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না।

জ্ঞানরত্নাকর লিখিবার হেতু ও প্রকার সম্বন্ধে নবকৃষ্ণ বসু মহাশয় গদ্যে পদ্যে যাহা ভূমিকায় বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে সমগ্রভাবে দেওয়া গেল।

"এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষ বহুদিবসাবধি মুসলমান ভূপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবায়(১) ক্রমশঃ নানা প্রকার অত্যাচাররূপ অসি দ্বারা অঙ্গ বঙ্গীয় লোকদিগের শিল্প সাহিত্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের সুকোমল কলেবর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া একেবারে লোপাপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। অধুনা ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয় রাজ-পুরুষগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য পুরঃসর পুনরায় নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হওয়াতে জনসমূহ ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এবং ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যার পুনরুদ্দীপন হইয়া দিন দিন নানা প্রকার হিতকারী পুস্তক সকল প্রকটন হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তক এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় গদ্যচ্ছন্দে প্রকটিত হওয়াতে পদ্যপ্রিয় মহাশয়েরা তৎপাঠে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হয়েন না, বিশেষতঃ অধিকাংশ পদ্যচ্ছন্দে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহাতে রচনা-কর্ত্তারা পদ্য রচনার গৌরবের অনেক লাঘব করিয়াছেন। এই হেতু কোন মহাত্মার অনুমত্যনুসারে জেলা হুগলির অন্তঃপাতি ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী বহুদর্শী বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত মুন্সি কৃষ্ণচৈতন্য বসুজ মহাশয়, সুললিত পদ্যচ্ছন্দে এই নবগ্রন্থ রচনার ভার গ্রহণ করতঃ কবিতা দেবীর গৌরবের অনেক দূর পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং গ্রন্থকার এই পুস্তক মধ্যে অনেক গদ্যচ্ছন্দ উৎকৃষ্ট বোধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় যে সমস্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণের মানসোদিত মহদ্ভাব সকল সময়ে সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা বহু আয়াস করতঃ সেই সকল জ্ঞানরত্ন বহুস্থান হইতে সংকলন করিয়া পুস্তক মণ্ডিত পূর্ব্বক এই জ্ঞানরত্নাকর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুধীবর পাঠক মহাশয়েরা এই রত্নাকর পুস্তক মধ্যে যিনি যে রত্ন প্রার্থনা করিবেন, অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

লোকের মন হইতে অজ্ঞান ধ্বান্ত তিরোহিত হইয়া সাংসারিক বিষয়ে হিতাহিত জ্ঞান ও জগৎপাতার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মে এই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

**গ্রন্থকারস্য।**

নীতি বাক্য সূত্র ধরি, পদার্থ মীমাংসা করি,
নানা গ্রন্থ করি সংকলন।
গুরুশিষ্য প্রশ্নোত্তরে, জানাইতে শিশুবরে,
হিতউপদেশ বিবরণ॥
আদ্যে আদ্যসৃষ্টি মর্ম্ম, মধ্যে মানবীয় ধর্ম্ম,
অন্তে আত্ম তত্ত্ব পরাৎপর।
গদ্য পদ্য নানাচ্ছন্দে, গ্রন্থ নবখণ্ড বন্দে,
নবরত্নে পূর্ণ রত্নাকর॥
কিন্তু মনে এই ভয়, অভিলাষ দূরে রয়,
পাছে হয় কলঙ্ক ভূষণ।
যেহেতু অবোধ লোক, সুখেতে ঘটায় শোক,
কুতর্ক করয়ে অকারণ॥
এ দীনের আকিঞ্চন, রত্নাকরে গুণিগণ,
নানা রত্ন লবেন বাছিয়া।
অন্যে কি সন্ধান পায়, স্বপনে না চিনে তায়,
শুক্তি লয় মুক্তারে ত্যজিয়া॥
অতএব নিবেদন, গ্রন্থ করি বিলোকন,
তাৎপর্য্যে রাখিবা মনোযোগ।

(১) অর্থাৎ হওয়ায়। রামমোহন রায়ের লেখায় 'হইবাতে'।

বিভাব হইবে যথা, সুধী সাধিবেন তথা,
আছে রীতি কি দিব প্রয়োগ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ বসু

এই গ্রন্থ শোধন করিতে আরম্ভ করিয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত বশতঃ সংশোধন করিবার যাদৃশ মানস ছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল না, স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও সামান্য দোষ রহিয়া গেল।"

এই বার গ্রন্থের বিষয় পরিচয় দেওয়া যাক।

জ্ঞানরত্ন নয় রত্নে বিভক্ত। দ্বিতীয়, অষ্টম ও নবম রত্ন গদ্যে রচিত, বাকি রত্নগুলি পদ্যে।

প্রথমে নান্দী—পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন ও গুরুদেবের বন্দনা। তাহার "গ্রন্থারম্ভ" অর্থাৎ গ্রন্থের উপক্রমণিকা স্থানীয় আখ্যায়িকা—উপদেশ নগরের কল্পিত নরপতি পুত্রের শিক্ষা উপলক্ষ্যে সুদেব সিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা। প্রথমে শাস্ত্রাদির মর্ম্মকথন, বেদবিস্তার বিবরণ, সৃষ্টি প্রকরণ, তাহার পর খগোল বৃত্তান্ত, গ্রহাদির স্থিতি নির্ণয় ও সূর্য্যাদির গ্রহণ প্রকরণ। দ্বিতীয় রত্নে—পদার্থবিদ্যা জ্যোতিষ বিবরণ, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি, পৃথিবী গোলাকৃতির প্রমাণ, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির গণনা, চন্দ্রের বিবরণ, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কারণ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্য, মেঘের জন্মবৃত্তান্ত, রামধনুঃ—প্রকাশের প্রকরণ, বায়ু উৎপত্তির বিবরণ, বায়ুর গতি বিবরণ, ঝটিকার প্রকরণ, জল-স্তম্ভের প্রকরণ, সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটা হওনের কারণ, ভূমিকম্প বিবরণ, দেশবিদেশে ভূমিকম্পের ইতরবিশেষ —এই সব জ্যোতিষ (Astronomical) ও প্রাকৃতিক (Physical) বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় রত্নে বর্ণিত হইয়াছে—কাল নিরূপণ, পুরাণোক্ত ভূগোল বৃত্তান্ত ও ভূকম্প বিবরণ, জীবজন্ম বিবরণ, শরীরস্থ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপণ, বেণরাজার উপাখ্যান, বর্ণ-সঙ্কর উৎপত্তি, এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণালক্ষণ। চতুর্থ রত্নে বিবিধ প্রকারের পুরুষের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। পঞ্চম রত্নে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত নায়িকা ও নায়কের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ রত্নে আছে হিতোপদেশের গল্পাংশের ও উপদেশের সার, রাজনীতি বিবরণ, এবং দায়ভাগ, স্ত্রীধন নিরূপণ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা। সপ্তম রত্নে বিবিধ ধর্ম্মমত ও ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। অষ্টম রত্নে রাজপুত্রের বিদ্যাপরীক্ষা ও বিবাহ এবং রাজসভায় বিবিধ দার্শনিক প্রশ্নের—যেমন, ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার। স্বতন্ত্র জীবাত্মা আছেন কি না ইত্যাদির—বিচার বর্ণিত হইয়াছে। নবম রত্নে এই সব প্রশ্নে মীমাংসা, গৃহস্থের কর্ত্তব্য ও ব্রহ্ম উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রকার আদি বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে পাঁচটি ব্রহ্ম সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। "ইতি জ্ঞানরত্নাকর নবম রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। বৈশাখ সন ১৭০৮ শক।"

গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। সপ্তম রত্নে বর্ণিত বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আলোচনায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়ে দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের পড়া ছিল, কেন না দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ দুই খণ্ড জ্ঞান রত্নাকরের অনেক কাল পরে প্রকাশিত হয়। তবে গ্রন্থকার এই বিষয়ে মৌলিকত্বও দেখাইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সারমর্ম্ম যাহা দেওয়া হইয়াছে [পৃ ১৭১-৭৫] তাহাতে বোধ হয় যে গ্রন্থকারের এ বিষয়ে বেশ পড়াশোনা ছিল।

জ্ঞানরত্নাকরের পদ্যাংশ বিশেষত্ববর্জিত। প্রকরণের দোষে প্রায়ই "দীন" ভণিতা আছে। রচনাভঙ্গি পুরাপুরি বর্ণনাত্মক। অলঙ্কৃত গদ্যভঙ্গির নিদর্শনস্বরূপ যুবরাজের শুভ বিবাহ প্রকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"এবম্প্রকার আনন্দোৎসব করতঃ দিবাবসান হইল। অহো! কিবা পরমেশ্বরের অলৌকিক আশ্চর্য্য কৌশল। যখন দিবাধিপতি প্রভাকর নিজ যায়া ( ! ) ছায়া সহ দিবা-রাজ্য ত্যাগ করিয়া, রজনীরাজ্য আক্রমণ করিলেন। যখন দেদীপ্য জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত প্রজাপক্ষে, নৃপ শূন্য রাজ্য অনিবার্য্য বিরহে একেবারে তিমিরাবৃত হইল। যখন গভীর নির্ম্মল সলিল নিবাসিনী, বিরহিনী কুলকামিনী পদ্মিনী প্রিয় বিরহানলে, উত্তাপিতা হইয়া ক্রমে প্রমুদিত হইল। যখন অনুকূল চক্রবাক প্রতিকূল রূপে, একাকী প্রিয়া চক্রবাকী অকূল বিরহ নদীকূলে, রাখিয়া একা বিপরীত কূলে গমন করিল। তখন নিশাধিপতি সুধাকর নক্ষত্র সপ্তবিংশতি মহিষী সংহতি শূন্য সিংহাসনে সানন্দে উপবেশন করিলেন। গগন বিহারী কুজাদি গ্রহ সকলে নিয়োজিত স্থানে সভাসদ রূপে, সুশোভিত হইলেন। তখন অগণ্য তারাগণে অখণ্ড গগনমণ্ডলে, সৈন্য সামন্তরূপে প্রমোদিত হইল। ধূমকেতু কৌতূহলে রাশিচক্র দুর্গম দুর্গোপরি, বিচিত্র বিজয়ী পতাকা স্বরূপ উড্ডীয়মান হইল। এবং সুধাকরের সুস্নিগ্ধরূপ কিরণাবলি দেদীপ্যমান হইয়া, ভুবনস্থ সমস্ত তিমিররাশিকে বিনষ্ট করিল। কিবা রজনী। যথা স্বজন স্বজনী চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বলায় সম্মোহিত হইয়া, পরস্পরা প্রেমালাপ করিতেছে। ক্ষুধিত তৃষিত চকোর চকোরী উল্লাসে আকাশা-ভিমুখ উড্ডীয়মান হইয়া, সুধাকরের নিঃসৃত বিগলিত বিমল সুধাপানে পরিতোষিত হইতেছে। কিবা মনোহর সরোবর সলিলে কতশত কহ্লার কোকনদ কুমুদিনী, প্রিয়মুখাবলো-কনে প্রফুল্লবদনে, মন্দ মন্দ তরল তরঙ্গ হিল্লোলে হেলায় নৃত্য করিতেছে। কিবা বর্নপ্রিয় পাপিহা বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া, অত্যুচ্চ বকুলোপরি প্রিয়সম্বোধনে, ক্রমাগত সপ্তস্বরে প্রিয় প্রিয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। কিবা কোকিলকুল কলরব হুঙ্কার ঝঙ্কারবে, মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু সুললিত শব্দ করতঃ মদন মাদন হইতেছে। কিবা মাধবী লবঙ্গলতা নব মল্লিকার সৌরভামোদিত মৃদুমন্দ মলয় মারুত; প্রবাহে বিরহ বিরহিনী জনমন বিচলিত করিতেছে। কিবা সুখশর্ব্বরী। যথা সারি সারি শুকপাখী অশোক শাখোপরি, আসীন পুরঃসরে অপূর্ব্ব মধুস্বরে, ঋতুরাজ বসন্তের যশ গান করিতেছে। যথা ফুলধনুঃ প্রফুল্লবদনে ফুল্ল শরাসনে, মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন মোহনাদি বাণ, অনুসন্ধান করতঃ প্রেম

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ঘর ও বাহির

(গল্প)

শ্রীজ্যোতি সেন

পাশের ঘর হইতে স্ত্রীর কণ্ঠ এ-ঘরে স্বামীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। পনর বছরের অতি পরিচিত কণ্ঠ, কিছুতেই ভুল করিবার যো নাই। মেডিক্যাল জার্নাল হইতে তাহার মন ছিট্‌কাইয়া পড়িল জীবনযাত্রার পথে, রোগ ও তার প্রতিকারের কথা ভুলিয়া সে নিজেদের কথাই ভাবিতে লাগিল।

আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল।

'ওগো, চা খাবে এস!'

চা অবশ্যই খাইতে হইবে। কিন্তু এত ডাকাডাকি না করিলেই কি নয়, ললিত সাড়া দিল না।

কল্যাণী কাছে আসিয়া কহিল—'ওগো, আর দেরী করো না, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে!'

'যাচ্ছি'—বলিয়া ললিত কল্যাণীর মুখের পানে একবার তাকাইল। তার এই গিন্নিপনা ললিতের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন যথাসময়ে বাঁধাধরা ব্যবস্থা, আর পুরাতন আলাপের পুনরাবৃত্তি। কোন ব্যতিক্রম নাই।

কল্যানীর পিছনে পিছনে ললিত খাওয়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। টেবিলে চা আর খাবার কল্যাণী আগেই সাজাইয়া রাখিয়াছিল, ললিত চেয়ারে বসিলে কল্যাণী তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিল।

ললিতের মনে হইতেছিল—কল্যাণী একেবারে সেই যুগের আদর্শ স্ত্রী। পতি সেবাই যেন তার জীবনের পরম ধর্ম্ম। কিন্তু এত কি! এত বাড়াবাড়ি কেন?

ললিতের গাম্ভীর্য্য ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল—'আজও কাজের ভিড় আছে বুঝি?'

ঐ এক প্রশ্ন! তা ছাড়া কি আর কোন কথা নাই? বুদ্ধিমতী বিদুষী নারীদের মত সে কি কোন উচ্চ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারে না? অন্তত রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, যুদ্ধ কিংবা এই রকম আর কোনও বিষয়ে আলাপ করিলেও ত' চলে। কিন্তু তা' নয়। স্বামী আর সংসার ছাড়া দুনিয়ায় যেন তার আর কোন সমস্যাই নাই। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ এক কথা।

তার দোষই বা কি! ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে সে,—কি-ই বা জানে! কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে, ঐ পর্যন্ত। আধুনিকতার যেটুকু সে এখানে আসিয়া আয়ত্ব করিয়াছে তা'-ও একেবারেই বাহ্যিক, ব্যবহারিক জীবনে নিতান্ত যা' প্রয়োজন তাই।

ললিতকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল—'কি এত চিন্তা করছ?'

ললিত একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর সহজভাবেই সে বলিল—'না, চিন্তা আর কি! কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করছ যে?'

—'অন্যমনস্ক রয়েছ দেখছি।'

—'অন্যমনস্ক! কই? না।'

—'তা'হলে আমার ওপর রাগ করেছ বোধ হয়?'

—'না না না! কি যে বল!'

কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটিল,—বলিল, 'তবে কি চা-টা খারাপ হয়েছে?'

কথাটা বলিয়া কল্যাণী ললিতের মুখের পানে তাকাইল।

ললিত মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল—'চা! চমৎকার—র হ'য়েছে। অনবদ্য—অদ্ভুত!'

—'কিন্তু চায়েতে তুমি এখনো মুখ দাও নি। বাজে কথা বলছ!'

—'মুখ না দিয়েছি—চোখ দিয়ে দেখেছি ত'? চমৎকার দেখতে—খেতেও চমৎকার হবে নিশ্চয়ই। তা' ছাড়া তোমার তৈরী চা কখনো খারাপ হয় না, আমার জানা আছে।'

ললিতের এই সামান্য প্রশংসায় কল্যাণী খুশী ও কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। পালিত জীবের পিঠ নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চাপড়াইয়া দিলেও যেমন তার আনন্দের সীমা থাকে না—কল্যাণীরও যেন ঠিক তাই।

জীবনে প্রাপ্য আদায় করিতে সে মোটেই ব্যস্ত নয়। যা পায় তাতেই সে সন্তুষ্ট। সৌন্দর্য্য বা রসের প্রতিও তাহার স্পৃহা নাই—আর ভাবপ্রবণতা কিংবা উত্তেজনারও ধার ধারে না। সংসারে গা ডুবাইয়া থাকিতেই সে ভালবাসে।

উঃ! কি অসহ্য এই একঘেয়েমী! ললিত হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এই এক ঘেয়েমি হইতে মাঝে মাঝে একটু ছুটি লইলে ক্ষতি কি! ধনীর অলস গৃহিনী, বৈদগ্ধশালিনী চিরকুমারী, কিংবা আধুনিকতা বিলাসিনী কোন তরুণীর সঙ্গে একটু হৃদয়চর্চ্চা করিলে কি এমন অপরাধ হইবে!

ললিত ইহাই ভাবিতেছিল। মনে পড়িল মঞ্জুলিকার কথা। তার কথাই সে ভাবিতে লাগিল। সুন্দরী, বিদুষী ও বুদ্ধিমতী এই মঞ্জুলিকা—বৈদগ্ধশালিনী চিরকুমারী।

কিন্তু ডাক্তার যদি রোগিনীর সঙ্গে হৃদয়চর্চ্চা করে তাহা হইলে লোকের চোখে সেটা দোষনীয় হইবে নাকি!

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল—'আজ ক'টার সময় ফিরবে—কখন খাবে?'

ললিত কহিল—'ফিরতে হয়তো একটা বাজবে—এসেই খাব।'

মঞ্জুলিকা!

হ্যাঁ, মঞ্জুলিকাই পারে একঘেয়েমির অবসাদ দূর করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্যের রাজ্যে লইয়া যাইতে। মঞ্জুলিকাও যে সে জন্য প্রস্তুত তার আভাস সে পাইয়াছে।

সেদিন কথাচ্ছলে ললিত মঞ্জুলিকাকে বলিয়াছিল, আজ বৈকালে সে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে। মঞ্জুলিকা শুনিয়া খুশীই হইয়াছিল। তার অসুখ যে সারিয়া গিয়াছে এবং ডাক্তারের কোন প্রয়োজন আর নাই তা তাদের উভয়েরই অজানা ছিল না। সে গেলে মঞ্জুলিকা অবশ্যই সাগ্রহে তাহাকে গ্রহণ করিবে।

—'ওগো, তোমাকে টেলিফোনে কে ডাকছে।'

—'আমাকে ডাকছে? কে? কি জন্যে?'

—'কথা শুনে ত' মনে হচ্ছে কোন ভদ্রমহিলা। বাড়ীতে কারুর অসুখ বিসুখ বোধ হয়।'

—'জিজ্ঞাসা করলে না কেন?'

কল্যাণী সরলভাবে হাসিয়া বলিল—'জিজ্ঞাসা করব কি। ডাক্তারবাবুকে চায়—। তুমি যাও না গো, ওঁর স্বামীর হয়ত অসুখ করেছে, আহা বেচারা—'

ললিত অবিলম্বে উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। বলিল—'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার ললিতকুমার—বলুন—'

'ললিতবাবু? কি ভাগ্যি আপনাকে পাওয়া গেল।'

'কে আপনি?'

'চিনতে পারছেন না? আমি!... আমি মাধবী।'

'ও! মিসেস্ ঘোষ!'

ললিত মাধবীর উপর বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল—'কি বুদ্ধি! টেলিফোনে কথা বলছে একটু হুঁস নেই।'

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি—আপনি কি খুবই ব্যস্ত?'

'খু-উ-ব না হ'লেও ব্যস্ত বই কি। কেন, আপনার কি দরকার, বলুন।'

'অ্যাঁ? কি দরকার!—আমার?......ও!'

মাধবীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল—'আপনার দরকার বুঝি ফুরিয়েছে! না?'

ললিত দাঁতে দাঁত চাপিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিল। মাধবী বলে কি! তবে কি তার সামান্য প্রীতি সে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছে?

ললিত সহজভাবেই কহিল—'আপনার অসুখ না সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ, অসুখ ত সেরেছে, কিন্তু কি সুখেই যে আছি তা আর কি বলব! আমার স্বামী একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন।'

মাধবীর কথা শুনিয়া ললিতের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কি এমন ঘটিয়াছে যে মাধবীর স্বামী হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে? একটু ভাবের আদান প্রদান—তা' ছাড়া আর কিছু নয়। একটা ঢোক গিলিয়া ললিত কহিল—'তাহ'লে—তাহ'লে কি আমি একবার যাব ওখানে? আমার হয়ত যাওয়াই উচিত। অ্যা? এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। না, কি বল? যাব?'

মাধবী বলিল—'আপনি আর এখানে আসবেন না। যে রকম সন্দেহ বাতিক হয়েছে—আমার ভয় করে। আপনি যদি এই সময়—না থাক, এখন না—এগারটা নাগাদ—যদি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যান—সেখানে দেখা হতে পারে।'

'এগারটায়—মিউনিসিপ্যাল মার্কেট? কিন্তু আমার যে একটু কাজ ছিল মাধবী—মিসেস্ ঘোষ।'—বলিতে বলিতে ললিত থামিল। যাহার উদ্দেশ্যে বলা সে ফোন্ ছাড়িয়া সংযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

ললিত ফিরিয়া আসিলে তাহার চোখ মুখ দেখিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল—'গুরুতর কিছু নয়ত?'

'না না, গুরুতর কিছু নয়—মেয়েদের ত একটুতেই দুশ্চিন্তা আর ভয়—তাই আর কি!'

ললিত মনে মনে প্রার্থনা করিল, হে ঠাকুর—তার ধারণাই যেন ঠিক হয়।

ঠিক এগারটার সময় ললিত মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ঢুকিয়া দেখিল মাধবী তাহারই প্রতীক্ষায় একটা দোকানের সমুখে দাঁড়াইয়া কাঁচের শো-কেসে সযত্নে সাজান শাড়ীগুলির দিকে তাকাইয়া আছে। নিজেও সে এমন সাজিয়াছে যে তাহাকে ঐ শো-কেসের পাশে শাড়ীপরা পুতুলের মতই দেখাইতেছে। ললিত মনে মনে ভাবিল—মানাইয়াছে বেশ।

কিন্তু ইহাকেই ত সে একদিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে,—ইহাকে তার ভালও লাগিয়াছে। সেদিন তার রুচিবিকার কিম্বা মস্তিষ্কের বিভ্রাট ঘটিয়াছিল নিশ্চয়।

মাধবীকে দেখিয়াও সে সেখানে দাঁড়াইল না, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমুখের দিকে অগ্রসর হইল। মাধবী পিছনে পিছনে অনেক দূর গিয়া ললিতকে ধরিল, একটু বাদেই দুইজন মার্কেট হইতে বাহির হইয়া পথে চলিতে লাগিল।

মাধবী বলিল—'মার্কেটে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলাই কিন্তু ঠিক হয়েছে। তোমার এই বুদ্ধির জন্যেই ত আমি—সত্যি তোমাকে আমি তারিফ না করে থাকতে পারছি না।'

কথাগুলি যেমন অন্তঃসার শূন্য, কণ্ঠস্বরও তেমনি কৃত্রিম। ললিত ঠোঁটের কোণে একটু হাসিল, হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'তারপর? এ ছলচাতুরী কেন? উদ্দেশ্যটা কি?'

মাধবীর দুই চোখ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—'ছলচাতুরী! সে কি! তুমি কি বলতে চাও তোমাকে প্রতারণা করা আমার উদ্দেশ্য?'

ললিত একটু থতমত খাইয়া বলিল—'না না, ঠিক তা' নয়,—এ আর কি। অর্থাৎ এটা একটা অছিলা—এই আমি বলতে চাই।'

'ও! তোমার ধারণা আমি একটা অছিলা করে' তোমাকে ডেকে এনেছি?'—বলিয়া মাধবী ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

তারপর শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে পুনরায় সে বলিল—'না, তা' নয়। তুমি যে বলেছিলে—যদি কখনো আমাদের একজনের আর এক জনকে ভাল না লাগে তা হ'লে সেখানেই এর শেষ! সে কথাটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

ললিত অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল কবে সে মাধবীকে এ কথা বলিয়াছে! মাধবী কি তবে তাহাকে অতি আধুনিক গল্পের নায়ক এবং নিজেকে সেই গল্পের নায়িকা বলিয়া কল্পনা করিতেছে? অথবা এটাও তার একটা চাল?

'তা হলে—ব্যাপারটা সত্যি?'

তা না হলে তোমাকে আমাদের বাড়ী যেতে নিষেধ করব কেন? উনি আমাদের রীতিমত সন্দেহ করেন।

ললিত হতবুদ্ধি হইয়া মাধবীর মুখের পানে তাকাইল।

মাধবী পুনরায় বলিল—'কেন যে সন্দেহ করেন জানি না, কিন্তু সন্দেহ যে করেন তা বুঝতে আমার বাকী নেই। এসে অবধি'—

ললিত উষ্ণ হইয়া উঠিল,—'সন্দেহ করবার কিছু নেই—অথচ সন্দেহ করেন,— এ কি অন্যায়?'

'কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের আচরণ দেখে সন্দেহ ত হতেই পারে।'

ললিতের বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল এবং সর্ব্বাঙ্গে একটা কাঁপুনি দেখা দিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া ললিত বলিল—'সন্দেহ বাতিক যদি কারুর থাকে তা হলেই হয়ত সন্দেহ হ'তে পারে। তা না হলে'—

'কিন্তু এর আগে ত উনি এ রকম ছিলেন না। আমার মনে হয়, সিলোন থেকে ফিরে এসে কারুর মুখে উনি কিছু শুনেছেন, তাই বিগ্‌ড়ে গেছেন। আমাকে যে কত জেরা করেছেন তার ঠিক নেই।'

'কি জেরা করেছেন?'

আমার অসুখ খুব বেশী হয়েছিল নাকি,—ডাক্তার ক'বার করে' আসত—রাত্রে ডাক্তার ডাকবার এমন কি প্রয়োজন হয়েছিল, এইসব। এক দিনে এক সঙ্গে সব জিজ্ঞাসা করেন নি—হঠাৎ এক এক দিন এক একটা কথা। অর্থাৎ জেরা করে উনি সব বার করতে চান। আমিও তেমনি জবাবই দিয়ে দিয়েছি।'

'কি জবাব দিয়েছ?'

'বলেছি—অত খুঁটিনাটি আমার মনে নেই।'

চমৎকার! সন্দেহ দূর করা দূরে থাক—আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ললিতের দেহ ও মন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

মাধবী বলিল—'আমার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে উনি আমার ঝিকে জেরা করেছেন, তারপর সেদিন আমি ঘুমিয়ে আছি মনে করে কাকে যেন ফোনে জিজ্ঞাসা করেছেন—তুমি কি রকম ডাক্তার।'

ললিত রুমাল দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া বলিল—'তুমি যদি খোলাখুলি জবাব দিতে তা হলেই ত' ল্যাঠা চুকে যেত। এ যে কদ্দুর গড়াবে তার ঠিক নেই। এর ফল আমার মত একজন ডাক্তারের পক্ষে কি শোচনীয় হ'তে পারে তা ভেবে দ্যাখ।'

'আমি কি তা ভাবিনি! এর ফল তোমার আমার দু'জনের পক্ষেই শোচনীয় হতে পারে।'

'হুঁ!...ব্যাপারটাকে আর বেশী দূর এগুতে দিলে চলবে না। তার আগেই চাপা দিতে হবে। তুমি তাঁর স্ত্রী—তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়ত পারবে।'

মাধবী কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার এই নীরবতা ললিতের অসহ্য বোধ হইল। তাহার মনে

হইল মাধবী নিজের অসুবিধার কথাই ভাবিতেছে এবং সেইজন্যই চুপ করিয়া আছে। মনে মনে ললিত আগুন হইয়া উঠিল। রাগ আর সামলাইতে না পারিয়া সে বলিল—'তুমি যদি তোমার স্বামীকে নিরস্ত না কর তা হ'লে কারুরই ভাল হবে না, তা আমি আগে থেকে বলে রাখছি। আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হলে আমিও ছাড়ব না, আমি তাঁর প্রতিশোধ নেব।

ললিতের কথা শুনিয়া মাধবী অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। তারপর বলিল—'তুমিও যে ক্ষেপে উঠেছ দেখছি!'

ললিত তাহার কণ্ঠ আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিল—'আমার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে আর আমি চুপ করে থাকব!'

মাধবী শান্ত ও সংযত কণ্ঠে কহিল—'ব্যাপারটা কোন্‌দিকে গড়ায় তা' আগে দ্যাখ। না বুঝেই একটা কিছু করে বসলে হিতে হয়ত বিপরীতও হতে পারে। আপাতত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু আমাদের করবার উপায় নেই।'

কথাটা ললিতের সমীচীন বলিয়াই মনে হইল। ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু এই উদ্বেগ লইয়া এক একটি দিন কাটাইতে যে তার এক এক বছরের পরমায়ু নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তা ছাড়া কাজকর্ম্ম করাই হয়ত দুঃসাধ্য হইবে। এত দিনের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় যে পশার হইয়াছে তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভাবিতে ভাবিতে ললিতের মাথা ঘুরিতে লাগিল। অতি কষ্টে সে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—'অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! আমি আর ভাবতে পারি না। তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কোরো—আর সম্ভব হ'লে আমাকে মাঝে মাঝে খবর দিও। আমি চললুম।'—

ললিত টলিতে টলিতে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

রোগী দেখিবার জন্য সে তৈরী হইয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যাওয়া আর হইল না। গিয়া কি করিবে! মাথার মধ্যে রাজ্যের দুশ্চিন্তা লইয়া রোগীর চিকিৎসা করা আর বিপদ ডাকিয়া আনা প্রায় সমান।

সেদিনকার মত তাহার রোগীরা বিনা চিকিৎসায়ই রহিল।

গাড়ী লইয়া ললিত পথে পথে ঘুরিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল আসন্ন বিপদের কথা। কোন মুহূর্ত্তে যে তার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে কিছু ঠিক নাই। মনে মনে সে তার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

খাইতে বসিয়া ললিত কিছুই খাইতে পারিল না।

কল্যাণী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কিছু খেলে না যে? কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ হয়নি ত?'

ললিত মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইল। বলিল—'একটু অজীর্ণ আর কি! বড্ড ঘুরাঘুরি হচ্ছে কিনা, তাই।'

'এতটা তোমার সহ্য হবে না তা আমি আগেই জানি। নিজের শরীর বাঁচিয়ে তবে ত' আর সব! নিজে সুস্থ না থাকলে কি করে তুমি তোমার রোগীদের সুস্থ করবে?'

কল্যাণীর কথা শুনিয়া ললিত অবাক হইয়া রহিল। তার রোগীরা যেন তারই চিকিৎসার মহিমায় সুস্থ হইয়া উঠে! কল্যাণী না জানি তাহাকে কত বড় ডাক্তারই ঠাওরাইয়াছে। সে হয়ত ধারণাও করিতে পারে না যে, তার স্বামী শুধু পৈতৃক বাড়ী, গাড়ী ও চেহারার জোরেই করিয়া খাইতেছে।

কল্যাণী পুনরায় বলিল—'রোগীদের জন্যে তোমাকে আজকাল বড্ড বেশী খাটতে হয়। আমি ত দেখি সর্ব্বক্ষণ তুমি তাদের চিন্তায়ই ডুবে থাক। তাই তোমার শরীরটা ইদানীং খারাপ হয়েছে। তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রাখা দরকার।'

স্ত্রীর এই সহানুভূতি ললিতকে লজ্জিত করিল। এত দিনে সে এই প্রথম তাহার স্ত্রীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া নিজের আচরণের জন্য নিজকে ধিক্কার দিল, যে স্ত্রী দিনের পর দিন অম্লান বদনে তাহার সেবাযত্ন করিতেছে, স্বামীর যোগ্যতা যতটুকুই থাক সেইটুকু সে যথেষ্ট মনে করিয়া স্বামীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে,—নিজকে নিঃশেষে স্বামীর নিকট বিলাইয়া দিয়া নিঃসন্দেহে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে, সেই স্ত্রীকে সে সব দিক দিয়াই ফাঁকি দিয়াছে।

এখন সে নিজে ডুবিতে বসিয়াছে এবং স্ত্রীকেও ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে।

অনুশোচনায় ললিতের সমস্ত হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। স্ত্রীর প্রতি যে অবিচার সে করিয়াছে তার জন্য শাস্তি গ্রহণ করিবার একটা আকুলতা তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল। শাস্তিই তাহার প্রাপ্য এবং তাহাতেই তার শান্তি, এই কথাই সে নিজকে বুঝাইতে লাগিল।

কিছুদিন বাদে ললিত কল্যাণীকে বলিল—'তুমি অদ্ভুত কল্যাণী—সত্যি তোমার তুলনা নেই।'

ললিতের কথা শুনিয়া কল্যাণী বিস্মিত ও চমকিত হইল। এ ধরণের কথা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে ললিতকে বলিতে শোনে নাই। কল্যাণীর ধারণা হইল ললিত অসুস্থ হওয়ায় তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই অস্বাভাবিক কথা বলিতেছে।

কল্যাণী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল—'তুমি কি খুবই অসুস্থ বোধ করছ? অ্যাঁ?'

ললিত মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

কল্যাণী কহিল—'কিন্তু মাথাটা একটু গরম হয়েছে বোধ হয়।'

ললিত হাসিয়া বলিল—'আমার আজকের ব্যবহার তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে, না? তা' আশ্চর্য্য নয়। কোন দিনও' তোমাকে একটা ভাল কথাও বলিনি। কাজের তাগিদে সকাল সকাল বাইরে বেরিয়ে পড়েছি—তারপর ফিরে এসেছি অনেক বেলায়—ক্লান্ত হয়ে—রুক্ষ মেজাজ নিয়ে। এসে দুর্ব্ব্যবহারই করেছি। কিন্তু তার জন্য তুমি কোন দিন একটু অনুযোগও দাওনি।'

—'কি যে বল! অনুযোগ দেবার কি আছে? আমি কি জানি না তুমি কত ব্যস্ত—কত খাট্‌তে হয় তোমাকে! বেশী খাট্‌লে মেজাজ একটু রুক্ষ হয়ই। তার জন্যে আমি কিছু মনে করি না।'

—'তুমি যে কত ভাল তা আমিই জানি। তোমার মত স্ত্রী পাওয়া পরম সৌভাগ্য।'

ললিতের প্রশংসায় কল্যাণী আনন্দে গলিয়া গেল। ভাবে অভিভূত হইয়া কল্যাণী কহিল—'তোমার মত স্বামী পাওয়া তার চেয়েও ঢের সৌভাগ্য। আমিও রীতিমত গর্ব্ব করি।'

ললিত মনে মনে ভাবিল—কল্যাণীর গর্ব্ব হয়ত ভাঙিতে আর দেরী নাই। কথাটা ভাবিতেই তাহার মনে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। স্বামীর কলঙ্ক যখন প্রকাশ পাইবে তখন না জানি কল্যাণী কি করিবে! লজ্জায় ও ঘৃণায় সে হয়ত আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবে না।

নিজের অপমান যাহাই হোক্ কল্যাণীকেও যে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, এই দুঃখেই ললিতের চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে ললিত কল্যাণীকে কহিল—'তোমার গর্ব্ব যদি কখনো আমার দোষেই ভাঙে তা হলে তখন তা সইতে পারবে ত?'

'কেন, ভাঙবে কেন?'

—এই ধর—যদি আমার কোন খুঁত কেউ বার করে—কলঙ্ক রটায়—তখন আমাকে ঘৃণা করবে না ত?'

কল্যাণী তাড়াতাড়ি দুই হাতে নিজের কান দুইটি চাপিয়া

ধরিল। বলিল—'ছিঃ! ও কথা বলতে নেই।'

ললিত বলিল—'যদিই এমন কোন বিপদ আসে,—আসতেও ত পারে— তা হ'লে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে না—বল!

কল্যাণীর মুখখানি মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'তেমন বিপদ যেন না আসে, আর এলেও—না গো না—ও রকম বিপদ আসতে পারে না।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু এ সব কথা বলছ কেন? কি হয়েছে?'

ললিত কহিল,—'কিছু হয়নি। এম্‌নি বলছিলাম। এই একটু ভাবের এ আর কি—একটা উচ্ছ্বাস।'

কথাটা বলিয়াই ললিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সাজ্জারী ঘরে চলিয়া গেল।

বৈকালে ললিতের কাছে যত রোগী আসিল, তাহাদের সকলকেই সে ফিরাইয়া দিল। কাহারো সঙ্গে কথা বলিবার উৎসাহ তার ছিল না, বলিলও না। ঘরে বসিয়া আসন্ন বিপদের ভয়াবহ মূর্ত্তিই সে কল্পনা করিতে লাগিল।

হয়ত কোর্টে মোকদ্দমা উঠিবে—খবরের কাগজে তার বিবরণ ছাপা হইবে—ঘরে ঘরে তাহার আলোচনা চলিবে। তারপর কাহাকেও মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। লোকে আঙ্গুলে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিবে—তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া নানা কথা বলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার গায়ে যেন জ্বর আসিল। জ্বর হইলে গায়ে যেমন তাপ হয় ঠিক তেম্‌নি তাপ। অবসন্নতাও তেম্‌নি।

ললিত বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার শান্তির নীড় হয়ত বিনা দোষেই ভাঙিয়া যাইবে, আর সে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে—কোন রকমেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

ললিত বিছানায় শুইলে কল্যাণী তাহার কাছে আসিয়া বসিল এবং গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কল্যাণীর সেবা যত্ন আরামদায়ক বোধ হইলেও ললিতের সেই সেবা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা দেখা দিল। তাহার মনে হইল ইহা যেন তার পক্ষে চৌর্য্য-বৃত্তি,—কারণ স্বামীত্বের মর্য্যাদা সে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—সুতরাং পত্নীর প্রেমে তার কিছুমাত্র দাবী নাই।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করিবার আগ্রহ ছিল না বলিয়াই হয়ত অন্যান্য নারীর প্রতি তার আগ্রহ দেখা দিয়াছে এবং তারই ফলে আজ এ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এখন হইতে সে স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও চিন্তা মনে স্থান দিবে না—কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, সে উৎসাহ দেখাইবে না,—মঞ্জুলিকাকে ভুলিয়া যাইবে।

ঠিক তখনই তার মঞ্জুলিকার বাড়ী যাওয়ার সময় হইয়াছে। কিন্তু ললিত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। স্ত্রীকে ছাড়িয়া সে আজ কোথাও যাইবে না।

সন্ধ্যার সময় টেলিফোনে তাহার বন্ধু এক ডাক্তার তাহাকে ডাকিল। বিশেষ দরকার। একটা কেস্ আছে। না গেলেই চলিবে না।

ললিত বলিল—'আমি আজ বেরুতে চাই না। শরীর ভাল নেই।

বন্ধুটি বলিল—'জরুরী ব্যাপার। অপারেশন কেস্। তোমাকে সহকারীর কাজ করতে হবে।' তুমি না এলে আমি helpless। আসতেই হবে।'

অগত্যা ললিত রাজী হইল। তাড়াতাড়ি সে পোষাক পরিয়া তৈরী হইল। কিন্তু যেইমাত্র সে বাহির হইবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মাধবীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত।

মাধবীর স্বামীকে দেখিয়া ললিতের মুখখানা রক্তহীন হইয়া উঠিল,—বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

—'নমস্কার!'

—'নমস্কার!'

—'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

—'কিন্তু আমার এখন শুনবার সময় নেই—আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।'

মাধবীর স্বামী মিস্‌টার ঘোষ মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'খুবই ব্যস্ত! উঁ? কিন্তু আমিও আপনার চেয়ে কম ব্যস্ত নই। বেশী সময় নষ্ট করব না। পাঁচ মিনিটেই আমার কথা শেষ করব।'

—'অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ!'

—'না, ঠিক তা' নয়। তবে—'

ললিত বলিল—'তা' হ'লে এখন না, মিস্‌টার ঘোষ! একটা জরুরী কেস্ এটেণ্ড করতে হবে, অযথা সময় নষ্ট করা চলবে না।'

মিস্‌টার ঘোষ একটু বিরক্তির সহিত বলিল—'আপনি যা' অযথা সময় নষ্ট করা বলছেন আমি তা' যাথার্থ সময়ের সদ্ব্যবহার মনে করি। কথাটা আমার কাছে দরকারী এবং জরুরী, অবশ্য একটু অপ্রীতিকর।'

ললিত ক্লিষ্ট হইয়া কহিল—'আমি তা' জানি। কিন্তু আপনি অন্য সময় আসবেন। একটা অপারেশন কেস্ আছে—খুব জরুরী। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে হবে।'—কথাটা বলিয়াই ললিত গিয়া মোটরে উঠিল এবং মুহূর্ত্ত কাল দেরী না করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল অকাশটা যেন তাহার মাথার উপর ঐ মোটরের হুড্‌টার মতই সশব্দে দুলিতেছে এবং আর একটু বাদেই হয়ত হুড়মুড় করিয়া তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

* * * * * *

ঘণ্টা দুই বাদে ললিত বাড়ী ফিরিল।

ঘরে ঢুকিতেই কল্যাণী কাছে আসিয়া কহিল—'সেই যে ভদ্র-লোক—তুমি যাঁকে বসিয়ে রেখে গেলে'—

ললিতের উৎকণ্ঠা যেন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল—সে তার দণ্ডাদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কল্যাণী বলিতে লাগিল—'তিনি কিছুক্ষণ বাদে আমাকে ডেকে বললেন'—

—'কি বললেন তিনি?'

—'তুমি বাড়ী আসামাত্র এই চিঠিখানা তোমাকে দিতে।'

চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া কল্যাণীর হাত হইতে লইয়া ললিত জিজ্ঞাসা করিল—'চিঠিটা তুমি পড়েছ?'

কল্যাণী কহিল, 'না পড়ি নি।'

ললিত আর কোন কথা না বলিয়া চিঠি পড়িবার জন্য তাড়া-তাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে চিঠি খুলিয়া সে ভয়ে ভয়ে পড়িতে লাগিল।—

চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা। প্রথমে আছে খানিকটা ভূমিকা—তারপর কাজের কথা।

আমার স্ত্রীর চিকিৎসার দরুণ ফি ও ওষুদের দাম সমেত আপনার যা' পাওনা হইয়াছে, তার বিল পাওয়া অবধি আমি যেন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। টাকার প্রকাণ্ড অঙ্কটা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে বিলে বোধ করিবা ভুল আছে এবং সেই ভুল ধরিবার জন্য আমি নানারকম অনুসন্ধান করিয়াছি। অবশ্য অনুসন্ধানের পর আমার ভুলই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তথাপি আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ—আপনার টাকাটা আদায় করিবার পূর্ব্বে

আপনি আর একবার বিলটা ভাল করিয়া দেখিবেন কোন ভুল আছে কি না।

দয়া করিয়া আমার আপিসের ঠিকানায় চিঠি দিবেন। আপনার চিঠি পাওয়ামাত্র আমি বিল শোধ করিয়া দিব। মিসেস ঘোষকে আপনি এ বিষয়ে কিছু জানাইবেন না—কারণ তাঁহাকে আমি ইহা জানাইতে চাই না—জানিতে পারিলে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।

আশা করি আপনি আমার ব্যবসায়ীসুলভ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করিবেন। ইতি—

ঘাম দিয়া ললিতের জ্বর ছাড়িল। বিপদের আশংকা তাহার মন হইতে বাষ্পের মত উবিয়া গেল। তাহার মনে হইল তাহাকে ভবিষ্যত বিপদ হইতে সাবধান করিবার জন্যই বিধাতা পুরুষ একটা বিপদের ছল করিয়া সুমুচিত শিক্ষা দিলেন। এ শিক্ষা পাওয়ার একটা প্রয়োজন ছিল।

মনে মনে ললিত ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

* * * * * *

খাইতে বসিয়া ললিত সারাক্ষণ হাসিয়া কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। খাওয়ার পর বলিল—'চল যাই—সিনেমা দেখে আসি।'

কল্যাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার আজ কি হয়েছে—থার্ড শো'তে সিনেমায় যাওয়া তুমি পছন্দ কর না—অথচ যেতে চাইছ—ব্যাপারটা কি?'

—'তোমার যদি ইচ্ছে হয় দেখতে—তাই বলছিলাম। আজ আর রোগী দেখ্তে যেতে হবে না—তোমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে পারি।'

—'না গো, না। আমার এমন উৎকট সখ নেই। তার চেয়ে তুমি বাড়ীতেই থাক—দু জনে বসে গল্প করি।'

দুই জনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

কল্যাণী বলিল, জানালার পর্দ্দাগুলি বদলাইয়া সে নূতন পর্দ্দা লাগাইবে। নতুন চাকরটা গুছাইয়া কাজ করিতে পারে না—দুইটা কাঁচের গ্লাস ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি শীঘ্রই দিল্লী হইতে সিমলায় যাইবে।

কল্যাণীর গল্প শুনিতে শুনিতে ললিতের ঘুম পাইল, তথাপি সে ঘুমাইতে গেল না—কল্যাণীর কাছে বসিয়া রহিল।

সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ললিত উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। মঞ্জুলিকা জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি এলেন না কেন? আমি আপনার জন্য'—

ললিত বলিল—'আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে'—

মঞ্জুলিকা বলিল—'তা' আমি বুঝতে পেরেছি।'

ললিত বলিল—'আমাকে মাফ্ করবেন।'

ফোন ছাড়িয়া ললিত কল্যাণীর কাছে আসিয়া বসিল। কল্যাণী তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কথা বলিতে লাগিল।

---

# মানুষের ঘর

( ৫২ পৃষ্ঠার পর )

শারদা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ রইল তা সে জানে না; যখন জানল তখন দূরে গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজছে।

ধীরে ধীরে সে ঘরে এল। দেখলে, অবিনাশ খাটের উপর শুয়ে ঘুমচ্ছে; মাথার কাছে গোটা দুই বোতল ও গ্লাশ খালি প'ড়ে; ঘরময় একটা উগ্র গন্ধ। শারদা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল; আজ যেন তার প্রথম মনে হ'ল সমস্ত ঘরটায় একটা বিষাক্ত হাওয়া চলাফেরা করছে। আলো নিবিয়ে দরজার পর্দ্দাটা তুলে দিতেই খানিকটা জ্যোৎস্না এসে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল,—খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়াও এল তার সঙ্গে। শারদা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিদ্রিত অবিনাশের দিকে তাকিয়ে। তার পরে ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল অনেকদিন পরে।

অনেক দিন পরে তোশক গদির মায়া কাটিয়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়ে তার মনে পড়ল ছোট বোন অন্নদার কথা। সেও তো বালবিধবা; সেও তো ছোট বেলাতেই সিঁথির সিঁদুর মুছে বাপের ভিটেয় আশ্রয় নিয়েছিল; তবু সে তো ঘর ছেড়ে বার হয় নি এক দিনের জন্যও!

তবে সেই বা এল কেন? সেই ভিটেয় থাকলে যেমন ক'রেই হোক দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত জুটেই যেত নিশ্চয়। যেমন অন্নদার জুট্‌ছে। এই আয়োজন উৎসবের অভিনয়, সমারোহের সরঞ্জাম, কিছুরই তার দরকার হত না!

( ক্রমশ )

---

# জ্ঞান-রত্নাকর

( ৫৯ পৃষ্ঠার পর )

কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণে বিদ্ধ করিতেছেন। এমত সময় ভূপতি সুপাত্র মন্ত্রী প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অদ্য সভায় যুবরাজের সহিত তব কন্যা কামিনীর গন্ধর্ব্বব্যবহারে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হউক।" [পৃ ১৮৬-৮৭]।

উপরের উচ্ছ্বাস সত্ত্বে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকারের সংস্কৃত বিদ্যা বিশেষ অধিগত ছিল না। অন্যত্র "নবগ্রহ সুপ্রসন্নো মস্তু" [পৃ ১৮৩] আছে!

# আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি চারি বৎসর অন্তরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হইয়া থাকে। অন্যান্য বারের নির্বাচন সাধারণত তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হয়, বাহিরের লোকের তাহাতে তেমন আগ্রহ থাকে না এবং প্রার্থীবিশেষের জয়পরাজয়ের উপর অন্য দেশেরও ভাগ্য নির্ভর করে বলিয়া কেহ মনে করে না। বণিক প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রধান যোগসূত্র থাকে বাণিজ্যব্যাপারে; কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডেমোক্র্যাটিক দলের লোক হইল—কি রিপাবলিকান দলের হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বাহিরের লোক মনে করিত বাণিজ্য সূত্রটা ঠিক থাকিলেই হইল। কিন্তু এই-বারের নির্বাচনের গুরুত্ব অন্যরূপ। বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটের প্রভাব আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের উপর পড়িয়াছে এবং এই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের উপর আন্তর্জাতিক ভবিষ্যতও অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের রাজনৈতিক অভিমত কাহারও অজ্ঞাত নাই। তিনি আগাগোড়া অকুণ্ঠভাবে বৃটেন তথা গণ-তন্ত্রকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন এবং নাৎসী ও ফাসিস্ত শক্তির নিন্দা করিয়া-ছেন। শুধু বাক্যে নয়, কার্যেও তিনি মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। নির্বাচনী চাপে পড়িয়া আপাতত তাঁহাকে কিছুটা হাত গুটাইতে হইয়াছে, কারণ বিরুদ্ধপক্ষ রিপাবলিকান দল বলিয়া বেড়াইতেছিল, মিঃ রুজভেল্ট ক্রমশ ইউরোপের যুদ্ধের সহিত আমেরিকাকে বিজড়িত করিতেছেন; কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করিলে অন্তত চারি বৎসরের জন্য তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সেই সময় সাহায্য দানে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে হয়ত এত-খানি বাধা পাইতে হইবে না। এইজন্যই মিঃ রুজভেল্টকে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তৃতীয়বার মনোনীত হইতে দেখিয়া বৃটিশ পক্ষ আজ এতখানি উল্লসিত এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার সহিত ইহার যোগসূত্র আছে বলিয়াই জগদ্বাসী এই ব্যাপারে এত বেশী আগ্রহান্বিত।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ৪৮টি রাষ্ট্র আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই শাসনকার্য চালাইবার জন্য স্ব স্ব গবর্ণমেণ্ট রহিয়াছে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা স্বাধীন। এই রাষ্ট্রগুলি লইয়া যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত তাহার ক্ষেত্রফল ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার বর্গ মাইলের কিছু বেশী এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি।

মিঃ রুজভেল্ট

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট খুবই শক্তি-শালী। ক্রমশঃই ইহার শক্তিবৃদ্ধির দিকে লোকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আইন করিবার ভার কংগ্রেসের উপর। কংগ্রেসের দুইটি পরিষদ আছে—একটি প্রতিনিধি সভা ও অপরটি সেনেট। প্রতিনিধি সভা ছোট তরফ এবং সেনেট বড় তরফ। ছোট তরফের সদস্যসংখ্যা ৪৩৫ এবং বড় তরফের সদস্যসংখ্যা ৯৬। প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ সর্বসাধারণের ভোটে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত

হন। সেনেটে প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন করিয়া সদস্য ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া আসেন। তাঁহাদিগকেও সর্বসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হইতে হয়। প্রতি দুই বৎসর অন্তর সেনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্য বদল হয়। একমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধির বিল ছাড়া আর সব বিলই যে কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। সমস্ত বিলই উভয় পরিষদে পাশ হওয়া চাই। আইন করিবার ভার কংগ্রেসের, কিন্তু শাসন করিবার ভার প্রেসিডেণ্টের। কংগ্রেসে গৃহীত যে কোন বিল তিনি ইচ্ছা করিলে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক কোন বিল বাতিল হইলে কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি পুনরায় ঐ বিল সমর্থন করেন, তবে বিল বলবৎ হয় এবং প্রেসিডেণ্টের আদেশ নাকচ হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থার উদ্ভব কদাচ হয়; কাজেই কার্যত প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা প্রচুর। ফ্রান্স বা অন্য কোন দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কেবল প্রতিনিধি স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিই নহেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই দেশের শাসক। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের দ্বারা কংগ্রেস ও প্রেসিডেণ্টের মধ্যে যেন ক্ষমতা সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; রাষ্ট্রীয় ভারসাম্যের এইরূপ ব্যবস্থা জগতে বিরল। প্রেসিডেণ্ট নিজেই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী; তিনি আর সব মন্ত্রীকে নিজের ইচ্ছা মত বাছিয়া লন। মন্ত্রীরা কেবল তাঁহার নিকটই দায়ী। কাজেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে বলা যায় প্রেসিডেণ্ট চালিত গবর্ণমেণ্ট, উহা পার্লামেণ্টী গবর্ণমেণ্ট নয়। তিনি যাহা কিছু করা দরকার বোধ করেন কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য তাহা সুপারিশ করিতে পারেন। সেনেটের পরামর্শ ও অনুমতি লইয়া তিনি পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারেন। পররাষ্ট্র ব্যাপারে সেনেটেরই প্রাধান্য। তবে কংগ্রেসের অনুমোদন না পাইলে যুদ্ধ ঘোষণা করা চলে না। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা যে কেবল প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেসের উপরই ন্যস্ত এমন নয়,—বিচারবিভাগের হাতেও ক্ষমতা কম দেওয়া হয় নাই। কোন আইন শাসনতন্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করিলে সেই আইনের সেইখানেই শেষ। কংগ্রেস এবং প্রেসিডেণ্টের হাত দিয়া পাশ হইয়া আসিয়া এমন অনেক আইন সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হইয়া গিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা সাধারণত রক্ষণশীল মনোভাব লইয়াই প্রযুক্ত হয়। প্রেসিডেণ্ট যে কেবল সাধারণ শাসনকার্যের জন্যই দায়ী এমন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্থল-বাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষও তিনিই। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার হাতে ক্ষমতা কতখানি।

যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল আছে। একটির নাম ডেমোক্র্যাটিক দল ও অপরটির নাম রিপাবলিকান দল। দুই দলের মধ্যে শেষোক্ত দলের হাতেই শাসন কর্তৃত্ব রহিয়াছে বেশীদিন। বর্তমানে কংগ্রেসে অবশ্য ডেমোক্র্যাট দলেরই প্রাধান্য। প্রতিনিধি সভা ও সেনেটে ডেমোক্র্যাট দলের সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে ২৬১ ও ৬৯ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে ১৬৯ ও ২৩। এতদ্ব্যতীত আরও ছোটখাট দুই চারিটি দল আছে এবং তাহাদের দুই একজন করিয়া প্রতিনিধিও আছে। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট ডেমোক্র্যাটিক দলেরই লোক এবং আসন্ন নির্বাচনেও তিনিই উক্ত দল হইতে তৃতীয়বার প্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হইলেন মিঃ ওয়েলডেল উইলকি।

মিঃ ওয়েলডেল উইলকি

আমেরিকার রাজনীতির উপর দলীয় প্রভাব অতি

অদ্ভুত। অন্যান্য দেশে মন্ত্রিমণ্ডল বদল হইলেও সরকারী কর্মচারী বদল বড় হয় না। কিন্তু আমেরিকায় এক দলের হাত হইতে অন্য দলের হাতে মন্ত্রিত্ব গেলে প্রায় সকল কর্মচারীকেই বরখাস্ত করিয়া তৎস্থলে বিজয়ী দলের সমর্থকদিগকে সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় "রাজনৈতিক মুরুব্বিগণ" ও দলের সাঙ্গোপাঙ্গরা স্থানীয় শাসনব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব খাটান। কোনও দলের কার্যসূচি সর্বত্রই একরূপ নয়; বিভিন্ন রাজ্যে একই দলের কার্যসূচী বিভিন্নরূপে নিরূপিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের রীতিনীতিও একটু বিচিত্র। প্রতি চারি বৎসর অন্তর 'লীপ ইয়ারে' প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হয়। নবেম্বর মাসে নির্বাচন আরম্ভ হইয়া জানুয়ারী মাসে তাহা শেষ হয়। ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা, প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ প্রভৃতি সব কিছুরই জন্য একেবারে বাঁধানির্দিষ্ট তারিখ রহিয়াছে। প্রতিবারেই ঐ নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট কাজ সমাধা হইয়া থাকে। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হয় না, হয় পরোক্ষ ভোটে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যে জনসাধারণ ভোট দিয়া প্রেসিডেণ্টের নির্বাচক ঠিক করে এবং পরে সেই নির্বাচকগণ ভোট দিয়া প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করেন। প্রতিনিধি সভা ও সেনেটে যে রাজ্যের যতজন সদস্য থাকে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচকের সংখ্যাও ততজনই হয়। অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা হয় ৫৩১জন। প্রতিনিধি সভা বা সেনেটের কোন সদস্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচক হইতে পারেন না। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে প্রার্থীকে অন্তত ২৬৬ ভোট লাভ করিতে হয়।

প্রতি চারি বৎসর অন্তে নবেম্বর মাসে প্রথম যে সোমবার পড়ে তাহার পরের মঙ্গলবার প্রতিরাজ্যে প্রেসিডেণ্টের নির্বাচকগণের জন্য ভোট গৃহীত হয়। এইভাবে তাহাদের নির্বাচন শেষ হইলে পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় বুধবারের পরে যে সোমবার আসে, সেইদিন তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যের রাজধানীতে যাইয়া প্রেসিডেণ্টকে ভোট দিয়া আসেন। তার পর জানুয়ারী মাসের ছয় তারিখে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সদস্যদের সম্মুখে উক্ত ভোটের বাক্সসমূহ খুলিয়া ভোট গণনা করা হয় এবং গণনান্তে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পূর্বে নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ৪ঠা মার্চ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করিতেন, এখন নিয়ম হইয়াছে ২০শে জানুয়ারী তারিখেই তাঁহাকে কার্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের এই হইল সাধারণ নিয়ম। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ফলাফল যদিও চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হয় জানুয়ারী মাসে, কিন্তু নবেম্বর মাসে নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টেই অনুমান করা যায় কাহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা। ইহার কারণ ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দল যেমন প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তাঁহাদের প্রার্থী মনোনীত করে, তেমনই নির্বাচকমণ্ডলীর জন্যও তাহারা প্রার্থী মনোনীত করে। উক্ত মনোনীত প্রার্থীরা পূর্বাহ্ণেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তাঁহারা কাহাকে ভোট দিবেন। কাজেই নির্বাচকমণ্ডলীতে যে দলের প্রার্থীসংখ্যা ভারী হয় সেই দলেরই মনোনীত প্রার্থীর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য নির্বাচনী কারসাজীতে হাওয়া উল্টা দিকেও না বহিতে পারে এমন নয়, বিশেষত নির্বাচন ব্যাপারে নানারূপ কেলেঙ্কারী করিতে মার্কিন মুলুক একেবারে সিদ্ধহস্ত। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভোটের সংখ্যা যেখানে কাছাকাছি হয় সেখানেই এইরূপ অপ্রত্যাশিত ফল ফলিতে পারে, নতুবা জানুয়ারী নবেম্বরকে বড় প্রতারিত করে না। অতএব আমরা হয়ত আগামী নবেম্বর মাসে নির্বাচকমণ্ডলীর স্বরূপ জানিয়াই বুঝিতে পারিব, আমেরিকার প্রেসিডেণ্টপদ কাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

---

## রাত্রি

**শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য**, এম-এ, বি-টি

নামিল নয়ন-পক্ষে নিবিড় আঁধার!  
গুঞ্জরিয়া ওঠে সুরে সর্ব্বাঙ্গে উলসি  
রাতের রবাব;—সুরে উঠিছে উচ্ছ্বসি'  
তন্দ্রা-রুদ্ধ নয়নের তৃষ্ণা-পারাবার।  
সুপ্তি-মগ্ন চরাচর; দীপ্তিহীন নভে  
তন্দ্রাতুর গ্রহ-মালা;—দিক্‌চক্রবালে  
পুঞ্জীভূত নিশাস্বপন;—তারি অন্তরালে  
স্তিমিত জীবন-দীপ জ্বলিছে গৌরবে।  
ওগো রাত্রি স্বপ্নময়ি! নামো আঁখিপাতে,  
নামো চিত্ত-রন্ধ্র ভরি';—বন্ধ হোক্ দ্বার,  
নৈঃশব্দ্যের অন্ধকার অর্গল তাহার  
স্মৃতিরে আচ্ছন্ন করি বাজুক্ আঘাতে।  
মেঘল-মেদুর রাত্রি মহাকাল-সাথী,  
মোহময় স্পর্শে কাঁপে জীবনের বাতি।

## এপিসোড

**শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

আকাংখার ক্লান্ত কাল অজস্র, অজস্র অবসর,  
রাত্রির আকাশে হেরি পাণ্ডুচাঁদ ব্যথায় নিঝুম,  
আত্মরতি অবসন্ন ঃ চোখে নামে আফিঙের ঘুম—  
তনুর তটিনী তীরে রচে চলি সম্ভোগ বাসর।  
বেদনার নীল বর্ম্মে তীর্থযাত্রা চলে অবিরাম,  
মুহূর্তের ইতিহাস মুহূর্তেই নিঃশেষিত প্রায়—  
স্মৃতির সুরভি শুধু ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যায়,  
অভিশপ্ত শতাব্দীর নাভিশ্বাস না মানে বিরাম।  
দূর হতে ভেসে আসে সাগরের সোনালি স্বপন,  
হাতছানি দিয়ে যেন কারা মোরে ডাকে বারে বারে,  
আমারে আহ্বান করে দুর্গমের যাত্রা অভিসারে  
—তাদের দেহের ঘ্রাণে মূর্চ্ছাতুর সারা তনুমন।  
হে বিধাতা! মুক্তি দাও, হানো শুধু আলো, আরো আলোঃ  
—স্বপনপরীরা সব প্রেতচ্ছায় কোথায় মিলালো।

# ফেরারী

(গল্প)

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

কালু মদের নেশা ক'রত। একদিন নেশার ঝোঁকে বল্লমের তীক্ষ্ম খোঁচায় বউকে সে খুন ক'রলে।

নেশার ঝোঁকটা কেটে যেতে প্রথমে সে ভেবেছিল থানায় গিয়ে ধরা দেবে, কিন্তু মানুষ খুনের পর ধরা দিলে সে ফাঁসী হয় এ কথাটা মনে পড়তেই সে পিছিয়ে আসে। তাই রাত্রির অন্ধকারে লোকের দৃষ্টির অগোচরে কালু শুধু কয়েকটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজে ফেরার হওয়ার পথই শ্রেয় ব'লে বেছে নেয়।

হঠাৎ ফেরার হওয়া। কোথায় যাবে, কোথায় থাক্‌বে—এ সবই যেন কালুর কাছে একটা সমস্যা। ষ্টেশনে তখন টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে আলো। সামনে সিগন্যালের আলোগুলো কাঁপছে। রাত কত বোঝা যায় না। শুধু বাতাস হাহাকার ক'রে ফিরছে। কালু এদিক ওদিক কয়েকবার পায়চারী ক'রে ভাবলে স্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে যে এখন গাড়ী আছে কি না। কিন্তু স্টেশন মাষ্টার যদি সন্দেহ করে?

সে সোজা লাইন ধ'রে চলতে লাগল। তার মনে পড়ল এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে তার এক পুরাণো বন্ধু থাকে। সে ঠিক ক'রলে তারই ওখানে সে যাবে। তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে, আশ্রয় চাইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে রেল লাইনের ধারে একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা মেরে চাপাগলায় কালু ডাকতে লাগল, রতন—রতন?

—কে, ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন ক'রল।

—ওঠ্‌না আমি কালু।

—ওস্তাদ এত রাত্তিরে!

—রতন দরজা খুলে কালুর সামনে এসে দাঁড়াল। কালু বললে, ভাই একটুখানি আশ্রয়।

—ওস্তাদ তোমার কি হ'য়েছে বলদিকি?

—বল্‌ছি।

রতন ভিতরে বউকে উদ্দেশ ক'রে বললে, কুপিটা জ্বালা তো। রতনের বউ কুপি জ্বালিয়ে এনে সামনে রেখে গেল। কালু পুনরায় বললে, আগে আমায় একটুখানি আশ্রয় দে রতন—

রতন ঘরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, এতো তোমারই ঘরবাড়ি ওস্তাদ। নাও ভেতরে এস—

চল্, ব'লে কালু রতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুক্‌ল।

ভিতরে ঢুকে চুপি চুপি কালু রতনকে ব্যাপারটা বললে। রতন বললে, আরে এই কথা ওস্তাদ। আমার পুকুরের এপারে ঝোপের মধ্যে আমার একখানা চালা বাঁধা আছে, মাছ চুরি ধরবার জন্যে ক'রেছিলুম, সেইখানে থাক্‌বে। তবে—

—তবে আর কি রতন?

—একটা ব্যাপার হ'চ্ছে ওপাশে পুকুর ঘাটে মেয়েছেলেরা বাসনকোসন মাজ্‌তে, গা' ধুতে আসে। তারা যদি দেখতে পায়—

—আমি বেরুব কেন?

—আচ্ছা সে যাই হোক্ হবে। আজ ত শুয়ে পড়, ব'লে পাশের একটা ঘরে রতন কালুকে শুতে নিয়ে গেল।

কালুর দুর্ভাবনা কেটে গেল। হাজার হোক রতন তার পুরাণো আড্ডার লোক।

পরদিন রতনের পুকুর পাড়ে ঝোপের মধ্যে কালু আশ্রয় নিল। রতনের বউ রাঁধে, রতন লুকিয়ে কালুকে ভাত দিয়ে আসে।

সারাদিনে কালুর প্রচুর অবসর। খুনী আসামী সে। বাইরে বেরুবার জো নেই। কোথায় পুলিশের লোক ওৎ পেতে আছে ধ'রে ফেলবে—তাই পেচকের মত অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে থাকা। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই কালু ঘুমিয়ে কাটায়। ঝোপের মধ্যে কোন কিছুর শব্দ হ'লে কান খাড়া ক'রে সে উঠে বসে। কখনও শুয়ে শুয়ে সে স্তব্ধ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যে স্তরের মানুষ, সে স্তরের মানুষ কোনদিন নীল আকাশ সম্পর্কে সচেতন নয়। শুধু দেখতে ভাল লাগে এই পর্য্যন্ত।

বিকালে পুকুরের ওপারে মেয়েরা গা' হাত ধুতে আসে। কালু লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখে। দিনের পর রাত আসে। কখনও আকাশে থাকে অসংখ্য নক্ষত্র, কখনও চাঁদ। বিনিদ্র রজনীতে কালু আকাশের বিচিত্ররূপের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে।

এমনিতরো একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন ফেরারীর।

তবুও ফেরারীকে লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু শূন্য-মনে সময় কাটানো যায় কি ক'রে? রতন দুবেলা ভাত দিতে আসে। ভাত খাইয়েই চ'লে যায়। কাজের মানুষ সে, তাকে দুদণ্ড ব'সে গল্প ক'রতে বলতে পারে না। শুধু মুখ বুজে প্রতিটি মুহূর্ত্তের যন্ত্রণা দিয়ে এই নিদারুণ একাকীত্ব সহ্য ক'রতে হয়।

ওপারে একটি মেয়ে গা' ধুতে আসে। তাকে দেখে কালুর মনে কত কথা ভেসে ওঠে। এমনিক'রে তারও বউ বিকাল হ'লে পাশের পুকুরে গা' ধুতে যেত। কোন অপরাধ ছিল না বেচারীর। অথচ কালু তাকে হত্যা ক'রেছে। কালুর মনে ভেসে ওঠে সেই হত্যাকাণ্ডের ছবি। সরলা বধূ—মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানে না যে তাকে মরতে হবে। ঘরের এককোণে মাতাল স্বামীর ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে সে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছিল আলো। সহসা তার বুকে বল্লমের তীক্ষ্ম ফলাটা সজোরে বসিয়ে দিলে কালু। একবার 'মাগো' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। তারপর বারকয়েক নড়ে উঠে একেবারে শেষ হ'য়ে গেল।.........

শূন্য মনে ঘুরে ফিরে সেই খুনের দৃশ্যটাই ভেসে ওঠে। কালু যদি শুয়ে থাকে ত উঠে বসে আর ব'সে থাকলে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে। অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাঝে মাঝে পাগলের মত চোখ ঘোরায়।

একদিন সন্ধ্যায় রতন কালুকে খেতে দিতে গেলে কালু বললে, রতন ভাই আর আমি পারছি না। এভাবে আর কিছুদিন থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাব।

—কিন্তু কি ক'রবে ওস্তাদ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কালু বললে, ভেবেছিলুম তালটা সামলে নিতে পারব, কিন্তু পারছি না। বিশেষ ক'রে একা থাকতে হ'লে ত পারবই না—

রতন বললে, আমারও তো মনে হয় তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলি ওস্তাদ কিন্তু বাইরে যে অনেক কাজ—

—বুঝতে পারি সব কিন্তু।

ওসব কিন্তু টিন্তু নয় ওস্তাদ। এ সময়ে তোমাকে শক্ত হ'তে হবে। শক্ত না হ'লে তুমি ধরা পড়ে যাবে, ব'লে রতন কালুকে খাইয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

হঠাৎ রতনকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি থেকে উধাও হ'তে হ'ল।

তার বে-আইনী আফিমের কারবার ছিল। এ কারবার সে কালুর কাছ থেকেই শিখেছিল। বর্ত্তমানে তার প্রায় আধমণ আফিমের অর্ডার ছিল—কেন তা যথাসময়ে এসে পেঁছিয় নি তা-ই দেখবার জন্য সে হঠাৎ উধাও হ'য়েছে। যাবার সময় সে বউকে ব'লে গেছে কালুকে যেন যথাসময়ে রান্না ক'রে খেতে দেয়।

রতনের বউ এসে ভাতের থালা নিয়ে হাতের চুড়ি ঠুন্‌ঠুন্ করে বাজায়। কালু মাচা থেকে নেমে গিয়ে থালাটা নিয়ে আসে।

একদিন দুদিন—প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। রতন ফিরল না। রতনের বউকে দেখে দেখে কালুর, কেমন খেয়াল হ'ল। একদিন সন্ধ্যায় সে ভাত দিতে এলে কালু তাকে বললে, বউ একটা গল্প শুনবে?

রতনের বউয়ের ভয় হ'ল কালুর কথা শুনে। তবুও স্বামীর বন্ধু—এই কথা মনে ক'রে সে চুপ ক'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বললে, এগিয়ে এসো না বউ ভাল গল্প—

বউ এগিয়ে এল না। কিন্তু কালু গল্প বলবেই। দিনের পর দিন নির্জ্জনের একাকীত্ব ভোগ করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার সে কখনও যে না ভোগ করেছে সে বুঝতে পারবে না। একাকীত্ব মানুষকে তার মনের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখতে সাহায্য করে, আর মানুষ মনের সেই শূন্য তলদেশ দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠে। তাই একাকীত্ব মানুষকে অতি সহজেই পাগল ক'রে ফেলে।

বউ এগিয়ে এল না দেখে কালু এগিয়ে গিয়ে বউয়ের একখানা হাত ধ'রে ফেললে। বউ চেঁচিয়ে উঠল।

কালু বললে, বউ চেঁচিওনা—আমি তোমায় গল্প শোনাবো।

কেন কি জানি বউ আর চেঁচালো না। হাজার হোক স্বামীর বন্ধু সে। কি বলে দেখাই যাক্ না। কালু বউকে টানতে টানতে মাচার কাছে টেনে নিয়ে গেল। তার-পর নিজে মাচায় উঠে বউকে বললে, তুমি ঐখানে দাঁড়াও আমি গল্প বলি—

বউ এবার মনে মনে হাস্‌ল।

কালু বল্‌তে লাগল, স্বামী আর স্ত্রী দুজনে বেশ নিরিবিলিতে জীবন কাটাতো। স্ত্রী ছিল স্ত্রীর মত স্ত্রী। স্বামী বাড়ি ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে পা ধোবার জল দিত এগিয়ে. গামছাখানি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত পাশে। স্বামী কিন্তু সদাই চোখ রাঙিয়ে থাক্‌ত—

বউ বল্‌লে ও গল্প আমি জানি।

জান জান বউ এ গল্প, ব'লে কালু সবিস্ময়ে বউয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বললে, বলদিকি তারপর কি হ'ল?

বউ বল্‌লে, কেন তারপর এক রাত্তিরে স্বামী মদ খেয়ে এসে বল্লমের খোঁচায় সেই বঁউকে মেরে ফেল্‌লে।

ওঃ, কালু অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

বউয়ের ভয় ক'রে উঠল। সে বললে, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমায় থালা দাও চ'লে যাই—

কালু গোগ্রাসে গিল্‌তে লাগ্‌ল।

বউ ঘরে ফিরে এসে দেখে রতন উপস্থিত।

মস্ত বড় অর্ডারটা রতন নিরাপদে নিতে পেরেছে। তাই তার আনন্দের সীমা নেই। বউ বললে, আচ্ছা বন্ধু তোমার!

—কেন কি হ'য়েছে?

—আমাকে ধ'রে বেঁধে বউ খুনের গল্প শোনাবে, ব'লে আদ্যোপান্ত যা' যা' ঘটেছিল সব একে একে সে স্বামীকে বললে। শুধু বললে না হাত ধ'রে টানার কথা। মেয়েরা এসব কথা পুরুষ মানুষকে কোনদিন বলে না কারণ তা'হলে তারা নাকি সন্দেহ করবে।

রতন বললে, তাহলে পাগল হ'য়ে গেছে বল?

—একেবারে।

—একবার দেখা ক'রে আসব?

—এস—

রতন একটা আলো নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল।

আকাশে তখন উঠেছে অসংখ্য কোটি নক্ষত্র। বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। রতন দূর হ'তে ডাকলে, ওস্তাদ—ওস্তাদ?

কোন সাড়া নেই।

রতন আবার ডাকলে, ওস্তাদ—ও ওস্তাদ?

এবারেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। রতন আলো নিয়ে মাচার ওপরে উঠে গেল। গিয়ে দেখলে ওস্তাদ নেই। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে রতন। তারপর নেমে সোজা বাড়ির ভেতরে বউকে সে বললে, ওস্তাদ নেই—পালিয়েছে—

বউ বললে, বল কি?

রতন দাওয়ার ওপারে ব'সে প'ড়ে বললে, ও পালাবে—এ আমি জানতুম—

পরদিন শোনা গেল, স্ত্রী হত্যা ক'রে যে লোকটা এত-দিন ফেরার ছিল, স্বেচ্ছায় সে লোকটা থানায় এসে ধরা দিয়েছে।

# পুস্তক পরিচয়

**বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস**—ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত। মূল্য ৬৲। প্রকাশক মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ডক্টর সুকুমার সেন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙলা দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আদি যুগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পুঁথি ও পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডক্টর সেন স্বীয় মতকে প্রাধান্য দিবার জন্য ইতিহাসকে কোথাও খর্ব করেন নাই। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং বস্তুগতভাবে করা হইয়াছে। ডক্টর সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা পূর্ববর্তী কোন লেখকের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের কালিকা মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল কাব্য, খেউড়, রেজা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, দাঁড়া কবি, কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, বাউলগান প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখক সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য, লেখক ভাবপ্রবণতাকে কিছুমাত্র স্থান দেন নাই। ঘটনা ও বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া তিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জন্যে পাদটীকায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্য রসানুধ্যায়ীদের পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাঙলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছে।" ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

**দৈনন্দিন**—শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। পরিচয় কার্যালয়, ১৬৮ পৃষ্ঠা; মূল্য দেড় টাকা।

নাগরিক সভ্যতার সহিত মধ্যবিত্ত ঘরের দরিদ্র-জীবনের যে দৈনন্দিন সংগ্রাম, আলোচ্য গ্রন্থের এগারোটি গল্পে তাহা লেখকের বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প, যথা—'পড়শী' 'পূর্ণগ্রাস' 'গল্পের দান' 'পাথেয়' অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যাহাকে মনোরম অথবা সুখপাঠ্য বলা যায় না, যাহা হৃদয়ভেদী কিন্তু হৃদ্য নহে। আমাদের সমাজ-জীবনের এই দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষগুলির অদৃষ্টের সকল প্রকার অভিজ্ঞতারই সর্ব্বস্বহ হইতেছে সাহিত্য। লেখকের রচনায় অকৃত্রিম সৃষ্টিশিল্পীর স্বাক্ষর আছে বলিয়াই সমাজের এই কলঙ্কের পরিচয় বাণীচিত্রে বাস্তবরূপে প্রকাশ লাভ সম্ভব হইয়াছে। এই বইয়ের গল্পগুলি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের যোগ্য। লেখক বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের আসরে নবাগত, কিন্তু লেখা কাঁচা নহে।

**বৈজয়ন্তী**—(রবীন্দ্র-সংখ্যা) সম্পাদক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা।

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ প্রবন্ধ ও কবিতায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন বিষয় লইয়া লিখিয়াছেন—শ্রীকেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে প্রমথ বিশীর প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অজয় ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। এই সংখ্যায় 'বনফুল' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প দুইটি সুখ-পাঠ্য। প্রত্যেক লেখকেরই রচনা বিষয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতায় আলোচ্য সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

**বিবেকবাণী**—শ্রীকণকলতা ঘোষ। ১০এ, কার্ত্তিক বোস লেন, কলিকাতা হইতে অরুণকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

পুস্তিকার লেখিকা ভক্তিপরায়ণা। তাঁহার 'বিবেকবাণী' পাঠ করিয়া অধ্যাত্মরস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই তৃপ্তি লাভ করিবেন।

**শাশ্বতী**—শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক অবিন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭ মুক্তারাম রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

কতকগুলি গান ও কবিতার সমষ্টি। রচনাগুলি সহজ ভাষায় লিখিত ও প্রসাদগুণ সমন্বিত। তথাপি যখন পড়ি—

কস্তুরীমৃগ যথা
আপন অঙ্গ ঘ্রাণে,
আপন হারা, পাগল পারা
ছুটে বেড়ায় বনে বনে

যখন পড়ি—

আজিকে তাহারে যে গো সে কথাটি বলা যায়
এমনি কাজল ঘন সজল বরিষায়

তখন রবীন্দ্রনাথের—

আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম

এবং

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়

মনে পড়িয়া গিয়া দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু যখন পড়ি, 'তুমি আছ'

তাই, আঁখি খুঁজে মরে আঁখি
প্রাণ খোঁজে প্রাণ—
... ... ...
তাই হৃদিরাধা চিরদিন কাঁদিছে গোপনে
যুগে যুগে, কালে কালে, শ্যামহারা প্রেম-বৃন্দাবনে।

তখন আপনিই মন প্রসন্ন হইয়া ওঠে।

বইটির ছাপা পরিচ্ছন্ন, কাগজ মূল্যবান, বাঁধাই ভাল।

**পরিচয়**—(সমাজ সমস্যামূলক নাটক) শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত। কলিকাতা প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-এ মুদ্রিত এবং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান কলিকাতার পুস্তকালয় ও গ্রন্থকার, শ্রীহট্ট। মূল্য বার আনা।

একটি বিপ্লবী যুবকের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচিত। সাধারণত নাটকে আমরা যে ঘটনাবহুল ও নাটকীয় আতিশয্য ও অতিব্যঞ্জনা দেখিতে পাই, এইখানি তাহা হইতে মুক্ত। সহজ ও সাবলীল গতিতে শুধু মূল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘটনা চলিয়াছে, কোথাও তাহা ব্যাহত হয় নাই। কেহ একটি কথাও বেশী বলে নাই, কিম্বা অনাবশ্যক ঘটনা ঘটে নাই, অনাবশ্যক চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই। ইহা ছাড়া লেখক সমস্যাটাকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া দেখিয়াছেন। বইএর ভাষা যেমন অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর, গানগুলিও তেমনি সুরচিত।

বইখানা পাঠ করিয়া পাঠক সমাজও সুখী হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**দেশপ্রাণ**—মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীপ্রমথলাল পাল। কার্য্যালয়, ১৬-বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রাবণ সংখ্যার 'দেশপ্রাণ' প্রবন্ধ গৌরবে এবং কবিতায় সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঋষি দাসের 'কলঙ্ক রেখা' গল্পটি আমাদের বেশ ভাল লাগিল। সম্পাদকীয় মন্তব্য সুচিন্তিত। আমরা এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

**দি সোল অব ইণ্ডিয়া**—বিপিনচন্দ্র পাল। নিউ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা হইতে শ্রীজ্ঞানাঞ্জন বোস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বিপিনচন্দ্রের এই জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পরিচয় পাঠক সমাজে প্রদান করা অনাবশ্যক। পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই সংস্করণে পুস্তকের কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রের সম্পাদক পরলোকগত মনীষী ডব্লিউ, টি, ষ্টেড ১৯১১ সালের 'রিভিউ অব রিভিউজ'পত্রে বিপিনচন্দ্রের মনস্বিতার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, বর্ত্তমান সংস্করণের ভূমিকায় তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ছাপা, বাঁধান এবং কাগজ অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে যাঁহারা গভীরভাবে আলোচনা অনুধ্যানে আগ্রহশীল, বিপিনচন্দ্রের এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা পরম উপকৃত হইবেন। বিপিনচন্দ্রের এই গ্রন্থ ভারতীয় সাধনা এবং সংস্কৃতির দিকদর্শনস্বরূপ, এতদিন পরে এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

**শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ**—প্রথম ভাগ। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী। শ্রীমায়াপুর পোঃ, নদীয়া। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী একজন সিদ্ধ সাধক এবং মহাপুরুষ। তিনি সাধারণ লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত যে সব গল্পের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করিতেন, পুস্তকে সেইগুলি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সাধু মহাপুরুষদের এই সব বাণী স্বভাবতই সুমধুর এবং ভাবপূর্ণ। এইগুলি পাঠে অধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তিদের জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইবে। গল্পগুলির ভাষ্য না করিয়া এ গুলি উল্লেখ করাই আমরা সমধিক উপযোগী মনে করি। কারণ, এগুলি সহজবোধ্য, ভাষ্যের দ্বারা মূলের ভাব বিকৃত হইবার ভয় আছে। গল্পগুলির রস আস্বাদনে মানুষের চিন্তাধারার অবাধ অধিকারকে ক্ষুন্ন না করাই আমরা উচিত মনে করি। কারণ, তাহার মধ্যে মনন আছে, মাধুর্য্য আছে।

(শেষাংশ ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# বিচিত্র বার্ত্তা

**অদ্ভুত আনারস**

প্রকৃতির খেয়ালে জীবজগতে জীব দেহের অস্বাভাবিক স্থানে অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অথবা অদ্ভুত মাংস-পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। অনুসন্ধান করলে উদ্ভিদ দেহের উপরও বিকৃত অংশ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভিক্টর সি টুইটী অস্ত্রোপচার দ্বারা জীব দেহের অস্বাভাবিক স্থানে অতিরিক্ত চক্ষু, নাসিকা, পা প্রভৃতি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন।

সম্প্রতি বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চল থেকে একটি অদ্ভুত আনারস পাওয়া গেছে। সঙ্গে আনারসের ছবিটি দেওয়া হ'ল। সাধারণ আনারসের মাথার উপর যে গুচ্ছাকারে পাতা দেখা যায় এগুলি তার থেকে যে ভিন্ন রূপ তা ছবিটি দেখলেই বেশ বুঝা যায়।
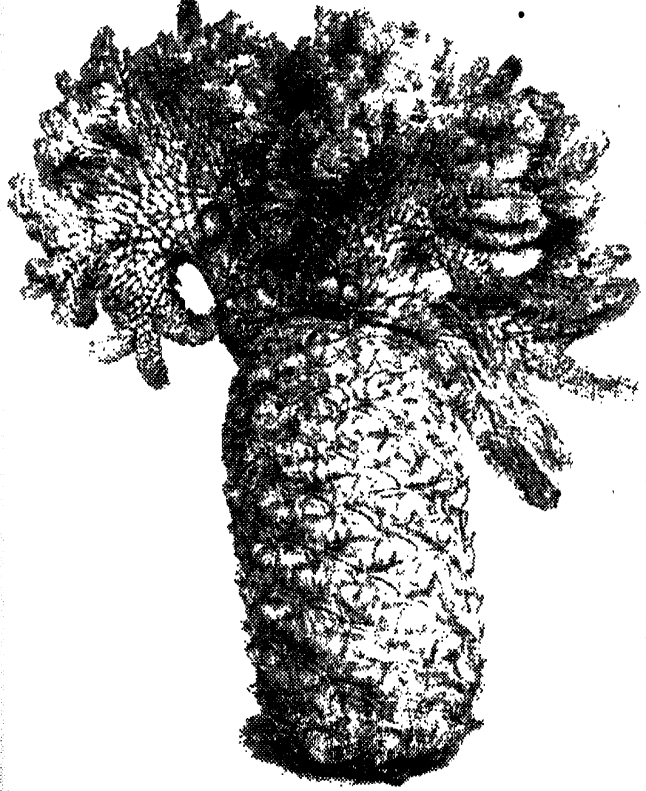
আনারসটির মাথায় গুচ্ছাকারে অদ্ভুত পাতার আবির্ভাব হয়েছে

**বিচিত্র বিবাহ**

পুরুষ বিবাহ করে নারীকে; এবং এই বিবাহকে সর্ব্বদিক থেকে কল্যাণময় করবার জন্য মনুষ্যজাতির মধ্যে আবার বহু বিচিত্র বিবাহের প্রচলন আছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র বিবাহ প্রথার প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলেও একেবারে লোপ পায়নি। এখনও বহু সভ্য দেশ এই কুসংস্কারের গণ্ডি থেকে নিজেদের একেবারে পৃথক রাখতে পারেনি, প্রাচীন সমাজ বিধানকে আঁকড়ে ধরে আছে। এই বিচিত্র বিবাহ উদ্ভিদ, দেবতা, পক্ষী, সর্প, এমন কি জড় পদার্থের সঙ্গেও সম্পন্ন হ'ত। পাঞ্জাব প্রদেশে শাস্ত্রমতে কোন পুরুষ তিনবার বিবাহ করতে পারে না। সেই জন্য আখ বা বাবলা গাছের সঙ্গে প্রথমে পুরুষের বিবাহ দিয়ে তারপর নির্ব্বাচিত কুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ফলে তৃতীয়বার বিবাহ করার যে দোষ তা ঐ বৃক্ষ কন্যা খণ্ডন করে দেয়। পাত্রপাত্রীর কুষ্ঠির মিল না হলে সাধারণত হিন্দু সমাজে বিবাহ ঘটে না। অযোধ্যা প্রদেশে কুষ্ঠির মিল না হলেও বিবাহ চলে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার সঙ্গে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের বিবাহ দিয়ে পরে পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। সেখানকার সাধারণের বিশ্বাস গ্রহের যা কিছু দোষ এতেই কেটে যায়।

গুজরাট ও গোয়াতে কুমারী কন্যারা ফুল গাছকে বিবাহ করে। বিবাহের পর ফুলগাছটিকে স্বামীর মত ভক্তি করে, প্রতিদিন জল দেয় এবং গাছের মৃত্যু হ'লে অশৌচ পালন করে।

কেবল আমাদের দেশে কেন পশ্চিম অঞ্চলের দেশগুলিতেও এইরূপ বিচিত্র বিবাহের প্রচলন আছে। সার্ভিয়ায় আপেল বৃক্ষকে সেখানের কুমারীরা স্বামীরূপে গ্রহণ করে। আপেল বৃক্ষের সঙ্গে মহাসমারোহে বিবাহ দেওয়া হয়।

আফ্রিকার আকাম্বা জাতির রমণীদের দুটি করে স্বামী থাকে। তাদের প্রথম বিবাহ হয় বংশের স্বর্গগত কোন আত্মার সঙ্গে। তারা উভয় স্বামীকে মনে প্রাণে ভক্তি করে এবং ভাল-বাসে। মনুষ্য স্বামীর মৃত্যু হলেও আকাম্বা জাতির রমণীরা বিধবা হয় না।

মিশর, গ্রীস, ফ্রিজিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় মনুষ্য সমাজের মধ্যে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের বিবাহের প্রচলন ছিল। এখনও এইরূপ বিচিত্র বিবাহ কোন কোন স্থানে আছে।

ভারতের বিহার প্রদেশে শ্রাবণ মাসে একদল নাগিনী গ্রামে

গ্রামে ভিক্ষা করে। তারা নিজেদের নাগপত্নী বলে পরিচয় দেয়।

পূর্ব্ব-পশ্চিম আফ্রিকায় শতকরা পঁচিশজন স্ত্রীলোক সে দেশের কোন-না-কোন দেবতাকে বিবাহ করত। ভারতবর্ষে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এবং বহু অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দিরে দেবদাসী থাকে। দেবদাসীরা দেবতাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তারা কোনদিন পুরুষ মানুষকে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে গোয়া প্রদেশে জড় পদার্থের সঙ্গে নারীর বিবাহের প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছিল। সেখানকার নর্ত্তকী-কুমারীরা প্রাচীন নিয়মানুসারে তরবারিকে বিবাহ করার পর নৃত্য-ব্যবসা আরম্ভ করত।

উত্তর আমেরিকাতেও জড় পদার্থের সঙ্গে মানুষের বিবাহ হত।

বর্ত্তমানে এই ধরণের বিচিত্র বিবাহ খুব অল্পসংখ্যক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সভ্যতায় মানুষ অগ্রসর হচ্ছে, পূর্ব্বের কুসংস্কার ক্রমশ লোপ পেতে আরম্ভ হয়েছে।

**আইভরি পরিষ্কারের উপায়**

হাতীর দাঁতের তৈয়ারী খেলনা, চুড়ি, বোতাম প্রভৃতি সাদা রং বেশী দিন থাকে না, ক্রমশ হলদে হয়ে যায়। হলদে রং নষ্ট ক'রে পুনরায় সাদা রং অনায়াসেই ফিরে পাওয়া যায়। সাদা রং ফিরে পেতে হ'লে কাপড় কাচা সোডার জল দিয়ে প্রথমে হাতীর দাঁতের তৈয়ারী জিনিষগুলি ভাল ক'রে পরিষ্কার করতে হয়। ফলে আইভরির উপর তেলচিটে জিনিষটা আর থাকে না। এর পর দশ ভাগ নূন গোলা জলে এক ভাগ নাইট্রিক এসিড মিশিয়ে ব্রুশ দিয়ে জিনিষগুলিকে পরিষ্কার করলেই হাতীর দাঁতের স্বাভাবিক রং পাওয়া যায়। সেফিল্ডের কারিকররা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহার ক'রে জিনিষ পরিষ্কার করে।

---

# পুস্তক পরিচয়

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

**বিষকন্যা**—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

'বিষকন্যা' ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শরদিন্দুবাবুর গল্পের বিষয়বস্তু প্রাচীনকালের ; ভাষা সাধু ও অপ্রচলিত কিন্তু ভাবধারার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত গতি গদ্যের মধ্যে ছন্দের এমন পরিকল্পনা আনিয়াছে যে, অতি আধুনিক মনকেও অভিভূত করে।

'বিষকন্যা'কে ছোট গল্প না বলিয়া উপন্যাসতর বলিলেই বোধ করি ঠিক বলা হইবে। 'সেতু' আর 'অষ্টমসর্গ' উচ্চশ্রেণীর ছোট গল্প। একটি ভাবের বিকাসসাধনই হইতেছে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য। বস্তুত ছোট গল্প ছোটই থাকিবে আর সেটি গল্প হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'বিষকন্যা' আর 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' প্রভৃতির সহিত অপরাপর গল্পগুলির প্রভেদ এইখানে।

'মরু ও সঙ্ঘ'কে নিঃসন্দেহে পুস্তকটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প বলা যাইতে পারে। মধ্য এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে এক ওয়েসিস। প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়ালে সেই ওয়েসিসের ধ্বংস হইল। জীবিত রহিল মাত্র চারটি প্রাণী। দুইটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ; একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক আর একটি অনুমান দেড় বৎসরের বালিকা। বালকটির নাম রাখা হইল 'নির্ব্বাণ' আর বালিকাটির 'ইতি'। তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তি হইল আর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চলিতে লাগিল ভিক্ষুর আদর্শে। কিন্তু প্রকৃতিকে রোধ করা সম্ভব হইল না। সহসা একদিন তাহাদের কৌমার্য্য, তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পরিণত ফলের ন্যায় প্রান্ত হইতে জীর্ণ পুষ্পদলের মত খসিয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ভিক্ষু উচণ্ড কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

নির্ব্বাণ কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিল না। শেষে উচণ্ডের নির্দ্দেশ ও অতিবৃদ্ধ ভিক্ষু স্থবিরের আহ্বানে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চিত্তজয়ের এক বৃথা প্রচেষ্টা করিল। তথাগত সঙ্ঘের বৈরাগ্য-ভস্মের মাঝখানে এক ভঙ্গুর সুকুমার পুষ্প ফুটাইয়া তুলিলেন।

উচণ্ডের কঠোরতা চরমে উঠিল। তিনি ইহাদের শাস্তি বিধান করিলেন ; সঙ্ঘ হইতে নির্ব্বাসন। স্থবির তখনো স্থির করিতে পারিতেছেন না কোনটা বেশী সত্য, সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তিতা না প্রকৃতির নিকট অতি অজানিতে তাহাদের এই পরাজয় স্বীকার। প্রকৃতি আর এক অদ্ভুত খেয়ালের সূচনা করিয়া বসিল ; আবার আকাশের ললাটে তেমনি মসীচিহ্ন দেখা দিল। উচণ্ড তাঁহার বিচার নির্ভুলতার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক ভিক্ষু স্থবিরের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গৌতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

ভাষায় ঐকান্তিক বিশিষ্টতা হইতেছে শব্দের অনপচয়তা। বই-খানিতে হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্বগুলি প্রতিফলিত হইয়াছে অনুপম ভাষার স্বচ্ছ পটে। শরদিন্দুবাবুর প্রচেষ্টা উচ্চ প্রশংসনীয়।

**শ্রীচৈতন্যদেব**—গৌড়ীয়মিশনের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক ও গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ডবল ক্রাউন ষোলপেজি সাইজে আইভরী ফিনিস কাগজে প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-দেবের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতের অবস্থা, সমসাময়িক সমগ্র পৃথিবীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ের তুলনা, নবদ্বীপের বহু তথ্য এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী ও তাহার প্রত্যেক শিক্ষা অতি মনোরম প্রাঞ্জল ভাষায় একশত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থটি গতানুগতিকভাবে রচিত হয় নাই, ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কোনপ্রকার অসার কিম্বদন্তীসমূহ বা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা স্থান পায় নাই। ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত 'শিক্ষাষ্টক' সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি মানচিত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত বহু স্থানের চিত্র এবং পঁয়ষট্টিটি আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছে। অতি অল্প-কালের মধ্যে গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

# আজ-কাল

**কংগ্রেস ও আপোষ**

পুণায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয়ে গেছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অহিংসা-বর্জ্জন প্রস্তাব (ওয়ার্ধা বিবৃতি) এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব (দিল্লী সিদ্ধান্ত) বহু ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। এবার এ-আই-সি-সি'তে নব্যপন্থার পাণ্ডা ছিলেন শ্রীরাজগোপালাচারী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং শ্রীভুলাভাই দেশাই।

কংগ্রেসের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগ্রামের পক্ষে সমাজতন্ত্রীদলের সমস্ত সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থীরা নব্যনীতির আংশিক বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু সেটা হিংসা-অহিংসার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তথা বৃটেনের সঙ্গে আপোষের রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে নয়। গান্ধীপন্থীদের সীমাবদ্ধ বিরোধিতার মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল না, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতায় সেটা বোঝা যায়। তিনি বার বার বলেন যে, গান্ধীজীর কারো প্রতি কোনো আবেদন নেই, সকলেই যেন নিজের নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী ভোট দেন। ওয়ার্কিং কমিটির পন্থা যাতে বাতিল না হয় এ রকম একটা প্রচ্ছন্ন আগ্রহ তাঁর বক্তৃতায় ফুটে ওঠে।

**জওহরলালের প্রস্তাব**

প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক পণ্ডিত জওহরলাল। তিনি, ভুলাভাই দেশাই এবং সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি বহু বাক বিস্তারে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, গান্ধীজীর শুদ্ধ অহিংসার আদর্শে বিশ্বাস না হারিয়েও সাময়িকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যথা আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দমনে ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে হিংসা অবলম্বন করা চলে। আর এতদিন পরে তাঁরা বুঝেছেন যে, গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক নীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রয়োগ করা চলে না, ভাগ ভাগ করে' প্রয়োগ করা চলে—যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলন অহিংসভাবে চালানো উচিত, কিন্তু দেশের বেয়াড়া লোকদের ঠাণ্ডা করতে এবং বিদেশী বাহিনীর অভিযান ঠেকাতে (অবশ্য শেষেরটা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতজী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) হিংসাটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রথম প্রস্তাব ও তার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই।

**রাজাজীর বক্তৃতা**

জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রে গঠিত হলে কংগ্রেস ভারত রক্ষায় সহযোগিতা করবে—এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীরাজাগোপালাচারী। তিনি এবং সর্দ্দার বল্লভভাই স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলেন যে, ভারত রক্ষায় সহযোগিতার মানে হচ্ছে হিটলারের বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা। রাজাজী তাঁর দীর্ঘ ও ব্যাপক বক্তৃতায় গান্ধী-নীতিকে আশ্চর্য্যভাবে কচুকাটা করেন। গান্ধীজী অহিংস থেকেও কিভাবে গত যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করেছেন এবং মাদক বর্জ্জনে বিশ্বাসী হয়েও কবে নিজের হাতে শ্রমিকদের মদ তুলে দিয়েছেন, এই সব পরম আনন্দদায়ক তথ্য তিনি বিবৃত করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্ব ছাটাই করে' বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা আপোষ করে' ফেলা যে তাঁরা অত্যন্ত সমীচীন মনে করেন এ কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। জওহরলাল এই প্রস্তাব গরম গরম বুলি দিয়ে সমর্থন করে' আপোষের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে' দেবার জন্যে (যা ব্যর্থ হলে 'সংগ্রাম' করা প্রয়োজন হবে) রাজাজীর কাছে নিবেদন করলেন; কিন্তু রাজাজী তা গ্রাহ্য করলেন না।

**কিমাশ্চর্য্য**

এই হচ্ছে এ-আই-সি-সি'র বৈঠকের মোট কথা। এ অধিবেশনে কিন্তু কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। আমরা এতদিন শুনেছি, জওহরলাল গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগত নিষ্ঠার জন্যে স্বমত বিসর্জ্জনে কখনো কুণ্ঠিত হন নি; এখন বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর রাজনীতিকে প্রভাবিত করে না। এ থেকে এই সিদ্ধান্তই আসে যে, হয় তিনি (এবং রাজাজী ও সর্দ্দারজী) গান্ধীজীর ইঙ্গিত বা অনুমোদনে এই নতুন পথ ধরেছেন, নয় তিনি রাজনীতি বিষয়ে গান্ধীবাদ কিংবা সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে রাজগোপাল, বল্লভভাই, ভুলাভাই প্রভৃতির বৈষয়িক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেশী সংযুক্ত।

তারপর দেখা গেল, কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে কংগ্রেসের নেতাদের অত্যধিক সচেতনতা। এ-আই-সি-সি'তে কমিউনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তবুও ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা তাদের অস্তিত্ব কোনো সময়েই ভুলতে পারছিলেন না এবং বক্তৃতায় কখনো চোখ রাঙিয়ে (জওহরলাল), কখনো বিদ্রূপ করে' (রাজাজী) তাদের যুক্তি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন। কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে জওহরলালজীর অসহিষ্ণুতা সব চেয়ে বেশী দেখা গেল। তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ করে' বসলেন এবং এই বলে' গাল দিলেন যে, তারা বিদেশী বাঁধাবুলি আওড়ায়—যেন পণ্ডিতজী কথিত "কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্‌ব্লী", "ডিমক্র্যাসি", "ফ্র্যাঞ্চাইজ", মায় কংগ্রেসী "কন্‌ষ্টিটিউশন" খাঁটি স্বদেশী মৌলিক বুলি। সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে এ'দের এই বর্দ্ধিত অসহিষ্ণুতার কারণ কি? —জনসাধারণের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব বিস্তার, না সোভিয়েট লাল ফৌজের অভিযান-আশঙ্কা? অথবা দুই-ই?

আর একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে কংগ্রেস সদস্যদের আশ্চর্য্য বিষয়বুদ্ধি। এক বছর আগে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করবার সময় গান্ধীজীর একনায়কত্ব ছাড়া যাঁদের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল, তাঁরা অনায়াসে আজ চোখ বুজে সেই গান্ধীজীকে তাঁদের ত্রিসীমার বাইরে বিদায় করে' দিয়ে এলেন। এ কি মহাত্মাজীরই মাহাত্ম্য!

**হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ**

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত করবার জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেছেন। ইস্‌লামিয়া কলেজে পুলিশের লাঠিচালনা সম্পর্কে গত ২৩শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরুদ্ধবাদীদল মুলতুবী প্রস্তাব তোলার ঠিক আগেই মিঃ ফজলুল হক ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, ইসলামিয়া কলেজের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা কমিটি নিয়োগ করবেন।

এই ঘোষণার পর শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কারাগার থেকে সুভাষচন্দ্রের মুক্তিসাপেক্ষ হলওয়েল আন্দোলন স্থগিত করেন।

ইস্‌লামিয়া কলেজে লাঠি-চালনায় সমগ্র ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবী-প্রস্তাব যদিও নিষ্ফল হয়, তবু বাইরে বিক্ষোভ ক্ষান্ত হয় নি। ২৪শে জুলাই কলকাতার সমস্ত ছাত্র ধর্ম্মঘট ও সভা করে ঐ লাঠিচালনার

প্রতিবাদ জানায়। ২৭শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগ এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন একত্রে এক সভা করে এবং ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত ও ছাত্রদের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার দাবী করে। ২৮শে তারিখে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। সেখানেও উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বেসরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবী করা হয়। মুসলিম ছাত্রেরা বলছে যে, তারা বাইরের লোকের কথায় নাচছে, এই প্রচারকার্য্য স্বার্থান্বেষীরা চালাচ্ছে; কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। তারা এ'ব্যাপারে নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়েছে।

**এক টাকার নোট**

রুপোর টাকার অভাব মেটাবার জন্যে এবং যারা টাকা জমিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করছে তাদের দমনের জন্যে এ সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বার করেছেন।

**ইংরেজদের সম্বন্ধে অর্ডিনান্স**

ভারতে ইওরোপীয় বৃটিশ প্রজাদের পক্ষে সামরিক কার্য্য আবশ্যিক করে এক অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে।

## ইওরোপ

**বল্কান**

বল্কান নিয়ে এখন নানারকম জল্পনাকল্পনা চলছে। রয়টারের নানা বিবৃতিতে এই কথাটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বল্কানে সোভিয়েট ও জার্ম্মানীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে "টাগ অব ওয়ার" চলছে। কিন্তু তার স্পষ্ট কোন লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি। বরং দেখা যায়, বল্কান থেকে বৃটিশ প্রভাব উচ্ছেদ করবার জন্যেই হিটলার এখন চেষ্টা করছেন। রুমানিয়ার তৈলশিল্প ধ্বংসের জন্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে' যে জার্ম্মান হোয়াইট পেপার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়, সেটা নাৎসী বন্ধু রুমেনিয়ায় এখন প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরই রুমেনিয়ান কর্তৃপক্ষ সব চেয়ে বড় তৈল কোম্পানী বৃটিশ মালিকানাধীন "আস্ত্রা রোমানো"কে সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়েছেন এবং তার তৈল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছেন। বহু ফরাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা রুমেনিয়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃটেনের পক্ষপাতী লণ্ডনস্থ রুমেনিয়ান দূতকে পদচ্যুত করে' অন্য লোককে দূত নিযুক্ত করা হয়েছে। রুমেনিয়ার কাজের জবাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভূমধ্যসাগরে রুমেনিয়ান জাহাজ আটক করেছেন।

হিটলার অবশ্য বৃটেন আক্রমণের সময় বল্কানে শান্তি বজায় রাখতে স্বভাবতই ইচ্ছুক। তাঁর আমন্ত্রণে রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব সালসবুর্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও এইটুকু প্রকাশ পেয়েছে যে, রুমেনিয়ার উপর হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়ার দাবীর একটা ব্যবস্থা করে' বল্কানে শান্তিরক্ষার বিষয়েই হিটলার আলোচনা করেছেন। রুমেনিয়ার মন্ত্রিদ্বয় রোমে গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গেও আলাপ করেছেন। সোভিয়েটের সম্বন্ধে নাৎসী মনে আতঙ্ক থাকলেও এখন নিশ্চয়ই হিটলার বাইরে সোভিয়েট-বিরোধী ভাব দেখাবেন না।

এ সপ্তাহের প্রথমে খবর পাওয়া যায়, সোভিয়েট রুমেনিয়াকে জানিয়েছে তাকে ফাসিজ্‌ম্ ছেড়ে গণতন্ত্রে আসতে হবে। এ সংবাদ বুখারেস্টে অস্বীকৃত হয়। তবে রুমেনিয়ার আচরণ যে সোভিয়েট পছন্দ করছে না তাতে সন্দেহ নেই। রুমেনিয়ার ভিতরে বেসারেবিয়ানদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট রুমেনিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে এক কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং তার প্রতিবিধান না হলে নিজেরা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে' শাসিয়েছেন। বেসারেবিয়া থেকে রেলগাড়ী ও ইঞ্জিন সরিয়ে ফেলার জন্যেও তাঁরা রুমেনিয়ান গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

**বল্টিক**

বল্টিক দেশগুলির সোভিয়েটীকরণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বড় অসন্তুষ্ট হয়েছে। মিঃ সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ বলেছেন যে, ঐ সকল দেশে সোভিয়েট শাসন তাঁরা মানবেন না। ঐ দেশগুলির টাকা-কড়ির লেনদেনও বন্ধ করা হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কাউন্সিল এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন এখন বিবেচনা করছেন।

ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কেও কয়েকটা সংবাদ এসেছে। ফিনিশ সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার দাবী জানিয়ে সোভিয়েট এক চরম-পত্র দিয়েছে বলে' এক সংবাদ রটেছিল; কিন্তু এ সংবাদ অস্বীকৃত হয়েছে। তবে মস্কো বেতারে ফিনিশ সরকারী দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, তাঁরা ফিনিশ শ্রমিকদের গঠিত "সোভিয়েট বন্ধুত্বকামী সমিতি"কে দমন করবার চেষ্টা করছেন। ফিনল্যাণ্ডে ঐ সমিতি দিন দিনই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফিন-ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকানদের অবিলম্বে সরিয়ে আনবার জন্যেও নিউইয়র্ক থেকে 'আমেরিকান লিজন' পাঠানো হয়েছে।

**সোভিয়েট-আফগান চুক্তি**

সোভিয়েট আফগানিস্থানের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-চুক্তি করেছে। আফগান সরকারী কাগজ এতে আনন্দ প্রকাশ করে' বলেছেন যে, এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট ও আফগানিস্থানের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হবে।

**জাপানে ইংরেজ গ্রেপ্তার**

জাপানে ১০ জন বিশিষ্ট ইংরেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রথমে গোপন রাখা হয়েছিল। ধৃত ইংরেজদের মধ্যে একজন—রয়টারের সংবাদদাতা মিঃ কক্স টোকিওর রক্ষীভবনের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছেন। জাপানীরা বলছে, তিনি পুলিশের জেরায় যখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী তখন ঐভাবে আত্মহত্যা করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাপানীরা গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের অভিযোগ করেছে।

**দালাদিয়ে প্রভৃতির বিচার**

ফ্রান্সে মঃ দালাদিয়ে ও অন্য কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও পরিচালনার অভিযোগে বিচার করা হবে। মঃ রেণো ও মঃ মান্দেলকেও ঐ জন্যে অভিযুক্ত করা হবে বলে' শোনা যাচ্ছে।

**প্যান-আমেরিকা**

আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যে সব উপ-নিবেশ আছে তা যাতে অন্য কোনো ইউরোপীয় রাষ্ট্রের হাতে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হয়েছে। হাভানায় প্যান-আমেরিকান সম্মেলনে এ সব বিষয় আলোচিত হচ্ছে। ইউরোপে বিপর্য্যয় ঘটলে আমেরিকায় ইউ-রোপীয় উপনিবেশের উপর আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের যুক্ত তত্ত্বাবধানের প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। নাৎসী গুপ্ত প্রচারকার্য্য দমনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব হয়েছে যে, আমেরিকায় বিদেশী দূত ও কন্সালদের সুবিধা ও আইনের গণ্ডী থেকে মুক্ত থাকার অধিকার সংকুচিত করা হবে।

২৯।৭।৪০

—ওয়াকিবহাল

### সিনেমা-শিল্পে বাঙালী বিদ্বেষ

বরাবরই আমরা আশা করিয়া আসিতেছিলাম যে, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বিষ, আর যাহাই হোক, শিল্পকলাক্ষেত্রে কোনদিন প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ শিল্পকলা-জগতের আবহাওয়া এমনি যে, এখানকার লোকে সংসারের অপরাপর শ্রেণীর লোকাপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদের মনের সহিত বাস্তব জগতের সম্বন্ধ নিবিড় হইলেও বাস্তবের নীচতা কোনদিনই সে মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু আজ তথাকথিত এক শ্রেণীর শিল্পকলাবিদ্‌দের শুভাগমনে চলচ্চিত্র শিল্পক্ষেত্রের আবহাওয়া কলুষিত হইতে বসিয়াছে। ফলে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মিলন ও মঙ্গলরূপে যাহা কিছু চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিবার আশা করা যাইতেছিল, তাহা আর বোধ করি ফলবান হইয়া উঠিতে পারিল না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একদল স্বার্থান্ধ ব্যক্তির বিবেচনাহীনতার ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বিষ সর্বশ্রেণীর ও সকল জাতীয় শিল্পকলাবিদ্‌দের সম্মিলনীক্ষেত্র চলচ্চিত্র জগতকেও পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে!

সম্প্রতি কলিকাতার একখানি ইংরাজী সিনেমা সাপ্তাহিক এরূপ একটি ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ব্যাপারটি কলিকাতারই কোন একটি ষ্টুডিওতে সংঘটিত হইয়াছে, এই কারণে এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। ঘটনাটি হইতেছে এই যে, উক্ত ষ্টুডিওতে একই মালিকের অধীনে একজন বাঙালী ও একজন পাঞ্জাবী আলোকচিত্র শিল্পী নিযুক্ত আছেন। ষ্টুডিওর রসায়নাগারাধ্যক্ষ ভদ্রলোকও পাঞ্জাবী। পাঞ্জাব নিবাসী এই দুই ব্যক্তি যে কোন কারণেই হোক, বাঙালী লোকটিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে না দেওয়ার সঙ্কল্প করে। কিছুদিন পূর্বে একখানি ছবি নির্মাণকালে ইহাদের সে সুযোগ ঘটিয়া যায় এবং ফলে উক্ত ছবিখানি যখন মুক্তিলাভ করে তখন বাঙালী আলোকচিত্রশিল্পী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখেন যে, তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ কাজটি একেবারেই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ মজা এই যে, উক্ত পাঞ্জাবী আলোকচিত্র শিল্পী তার চেয়েও নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পী হইলেও তদপেক্ষা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছেন। সন্দিগ্ধ হইয়া বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর তোলা ছবির টুকরা বাহিরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার চিত্রগ্রহণ মোটেই নিন্দনীয় হয় নাই; রসায়নাগারের কোন কারিকুরিতেই উহা জঘন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রসায়নাগারাধ্যক্ষ পাঞ্জাবী লোকটির কাছে ব্যাপারটি উপস্থিত করিলে সে রাসায়নিক পদার্থের উপর বেমালুম দোষ চাপাইয়া দেয় এবং উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি পরীক্ষা করিবার দাবী করিলে জানা যায় যে, তাহা ইতিমধ্যেই নর্দমাজাত হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিলে তাঁহারা অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লন এবং নিজেদের হাজার হাজার টাকার লোকসানের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দোষী ব্যক্তিকে মাত্র পনের টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। শাস্তির বহর দেখিয়া যদি কেহ এরূপ মনে করিয়া বসে যে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ মোটেই দুঃখিত নন, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—এই নগণ্য শাস্তি প্রশ্রয়েরই নামান্তর বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না, অথবা তাঁহারা ইহার গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক চলচ্চিত্র নির্মাতার দৃষ্টি আমরা ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।
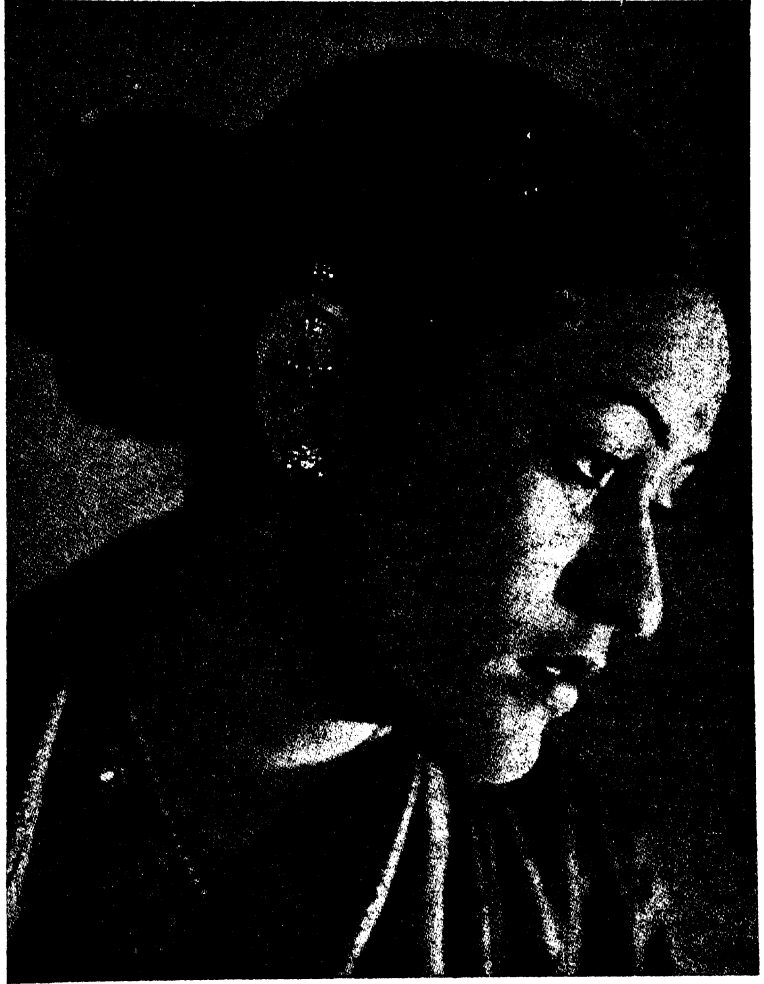
'সন্ত জ্ঞানেশ্বর' চিত্রে কুমারী সুমতি গুপ্তা। ছবিখানি প্যারাডাইস সিনেমায় শীঘ্রই প্রদর্শিত হইবে

### ছায়াচিত্রে ফুটবল খেলা

'How to play football' বলিয়া একটি নূতন শর্ট সম্প্রতি প্রদর্শিত হইতেছে। অরোরা ফিল্মস-এর ইহা নূতন উদ্যম। ছবিটিতে বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কিভাবে ফুটবল খেলিতে হয়, তাহার নানা কায়দা বৈজ্ঞানিক মতে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই সঙ্গে বাঙলার নামকরা খেলোয়াড়দের খেলার বৈশিষ্ট্যটিও প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের জাতীয় খেলা ফুটবল এবং ফুটবল খেলার প্রতি বাঙালীর দুর্দমনীয় আকর্ষণ বহুদিনের। সুতরাং ফুটবল খেলা দেখা যাঁহাদের নেশা তাঁহারা এই ছবি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন এবং যাঁহারা ফুটবল খেলা শিখিতে চান, তাঁহাদের নিকট 'How to play football' ছবিখানি শিক্ষকের কাজ করিবে। স্কুলের ছাত্রদের বিশেষভাবে এই ছবিখানি দেখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতে পারি।

### নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

২রা আগষ্ট, শুক্রবার বাঙলার নটমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ওয়াদিয়া মুভীটোনের 'রাজনর্তকী' চিত্রের চুক্তি অনুসারে দীর্ঘ সময়ের জন্য বোম্বাই যাইতেছেন। তাঁহার বিদায় উপলক্ষে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চগুলিতে যে সকল নাটকে অহীন্দ্র তাঁহার অভিনয়-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্যান্য খ্যাতনামা অভিনেতৃ সম্মেলনে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভায় যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট ইহা অপূর্ব সুযোগ সন্দেহ নাই। অহীন্দ্র চৌধুরীর অভাবে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি কিছুকালের জন্য ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেও, বাঙলার বাহিরে গিয়া তিনি তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা আমরা সকলেই কামনা করি; সুতরাং তাঁহার এই বোম্বাই যাত্রাকে জয়যাত্রা বলিয়াই আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহাকে জানাইতেছি।

## আগামী চিত্র সংবাদ

### কমলা টকীজ—'রাজকুমারের নির্বাসন'

২রা আগষ্ট অহীন্দ্র চৌধুরী ওয়াদিয়া মুভীটোনের 'রাজনর্তকী' ছবির চুক্তি অনুসারে বোম্বাই চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার গৃহীত চরিত্রের সম্পর্কিত অংশের চিত্রগ্রহণ শেষ করিবার জন্য 'রাজকুমারের নির্বাসন' চিত্রের কাজ দ্রুতবেগে চলিতেছে। শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্ত এই ছবিটির পরিচালনা করিতেছেন এবং 'কমলা টকীজের' ইহাই তৃতীয় চিত্র। ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ ফিল্ম প্রডিউসার্সের স্টুডিওতে চলিতেছে।

### মতিমহল থিয়েটার্স—'নিমাই সন্ন্যাস'

মতিমহল থিয়েটার্সের নূতন সামাজিক চিত্র 'ব্যবধানের' সম্পাদনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এবার সুরু হইয়াছে পৌরাণিক কাহিনী 'নিমাই সন্ন্যাস'। ছবিটির চিত্রনাটক রচনা করিয়াছেন শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য এবং পরিচালনা করিবেন শ্রীফণি বর্মা। নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন ছবি বিশ্বাস এবং নিতাইয়ের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলী, শচীমাতার ভূমিকায় নিভাননী, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় রেণুকা রায় ও জগাইয়ের চরিত্রে বোকেন চট্টো অভিনয় করিবেন।

### নিউ থিয়েটার্সের—'ডাক্তার'

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাণীচিত্র ডাক্তারের ট্রেলার সম্প্রতি চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে প্রদর্শিত হইতেছে। ট্রেলারখানি দেখিয়া আমাদের এই ধারণাই হইয়াছে যে, কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণের আয়োজন এই চিত্রে হয় নাই, সেই সঙ্গে এমন কিছু আছে, জাতীয় জীবনে যাহার প্রভাব মঙ্গলকর হইবে। সিনেমাকে কেবলমাত্র আনন্দ বিলাসের উপকরণ না করিয়া জাতিগঠন কার্যে তাহাকে প্রয়োগ করার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বলিয়াছি এবং এই চিত্রে দেশের মঙ্গলজনক কাজকে 'দেশের মাটি' অথবা 'জীবনমরণে'র মত প্রপাগান্ডারূপে না দেখাইয়া একটি রসমধুর কাহিনীর সহিত একটি অপূর্ব যোগসূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে।

বর্তমানে ডাক্তার চিত্রের সম্পাদনা সমাপ্ত হইয়াছে। 'আলোছায়ার' পরেই উহা চিত্রা ও পূর্ণ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে।

নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' চিত্রের একটি দৃশ্যে ভারতী ও জ্যোতিপ্রকাশ। পরিচালকঃ ফণী মজুমদার

### কৃষ্ণা মুভীটোন—'শাপমুক্তি'

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া 'শাপমুক্তির' কাজ যেভাবে সমাপ্তির পথে দ্রুত লইয়া চলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই ছবিটি শেষ হইবে এবং মাসের শেষের দিকে উত্তরা চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইবে।

**আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা**

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইয়া আসিল। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে। স্থানীয় একটি দল যে শীল্ড বিজয়ী হইবে সে বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই। বাঙলার বাহিরের একটি মাত্র দল দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন এখনও পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু এই দল ইষ্টবেঙ্গল দলের ন্যায় একটি শক্তিশালী দলকে পরাজিত করিতে পারিবে ইহা কেহই আশা করেন না। সুতরাং স্থানীয় দুইটি দল যে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় দলসমূহের মধ্যে কোন দুইটি দল ফাইনালে খেলিবে এই আলোচনায় বর্ত্তমানে ক্রীড়ামোদিগণ ব্যস্ত। তালিকার উপরিভাগে অবস্থিত মোহনবাগান দল প্রতিযোগিতার দুইটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলকে শোচনীয়ভাবে অধিক গোলে পরাজিত করায় সকলেই আশা করিতেছেন মোহনবাগান দল সহজেই ফাইনালে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু এই ধারণারও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মোহনবাগান দলকে ফাইনালে পৌঁছিতে হইলে এখনও পর্য্যন্ত পুলিশ ও ইষ্টবেঙ্গল দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতার সময় পুলিশ দল মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিতে পারে নাই। ইহাতে সকলেই মনে করে শীল্ডের খেলায় পুলিশ কখনই মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিতে পারিবে না। এই ধারণা হয়তো অমূলক নহে কিন্তু তাহা হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে পুলিশ দল গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী। গত বৎসরের অর্জ্জিত গৌরব এই বৎসর সহজে তাহারা ছাড়িতে পারে না। শেষ আপ্রাণ চেষ্টা তাহারা করিবেই। এই খেলায় যদি মোহনবাগান বিজয়ী হয় তাহার পরেই সেমি ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল দলের সহিত তাহারা মিলিত হইবে। কি লীগ খেলায়, কি শীল্ড খেলায় যতবার মোহনবাগান দল, ইষ্টবেঙ্গল দলের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিক সংখ্যক বারই মোহনবাগান দল পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং এই বৎসরের শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল, ইষ্টবেঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া সহজে জয়লাভে সমর্থ হইবে ইহা ধারণা করা কোনরূপেই সমীচীন হইবে না। অতএব মোহনবাগান দল সহজে শীল্ড ফাইনালে পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া যাঁহারা দৃঢ় ধারণা করিয়া আছেন তাঁহাদের হতাশ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা বলিতে পারি যে, মোহনবাগান দল যদি পুলিশ ও ইষ্টবেঙ্গল দলকে যথাক্রমে চতুর্থ রাউণ্ডে ও সেমি ফাইনালের খেলায় পরাজিত করিতে পারে, তবে ফাইনালে রেঞ্জার্স বা কাষ্টমস যে কোন দল ইহার সহিত মিলিত হউক না কেন, মোহনবাগান দলকে শীল্ড বিজয়ীর সম্মান হইতে বঞ্চিত করা কঠিন হইবে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমান থাকিলে এই কথা হয়তো বলা চলিত না। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের চতুর্থ রাউণ্ডেই রেঞ্জার্স দলের নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং দল রেঞ্জার্স দলের নিকট শোচনীয়ভাবে দুই গোলে পরাজিত হইবে ইহা অনেকেরই ধারণাতীত ছিল। কিন্তু এই দিনের খেলা যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা জানেন রেঞ্জার্স দলের জয়লাভ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।

**মহমেডান স্পোর্টিং দলের ব্যর্থতা**

লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ, লীগ খেলায় রেঞ্জার্স দলকে যেরূপভাবে বিব্রত করিয়াছিলেন এইদিন সেইরূপ খেলিতে পারেন নাই। কি রক্ষণভাগ কি আক্রমণভাগ সকল বিভাগের খেলোয়াড়গণই নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। খেলার সূচনায় রেঞ্জার্স দল চাপিয়া ধরিলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহাতে মহমেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থনকারিগণ মনে করেন রেঞ্জার্স দলের খেলোয়াড়গণকে ক্লান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো মহমেডান দলের খেলোয়াড়গণ এইরূপ খেলিতেছেন। তাহার পর রেঞ্জার্স দল যখন একটি গোল করিয়া অগ্রগামী হন, তখনও সমর্থনকারিগণ মনে করিতে থাকেন দ্বিতীয়ার্দ্ধে মহমেডান দল ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হইতেই তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন। রেঞ্জার্স দল আক্রমণ করিয়া মহমেডান দলকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করে। এবং পুনরায় একটি গোল করিয়া দুই গোলে অগ্রগামী হয়। মহমেডান দলের খেলোয়াড়গণ ইহার পর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোনই কিছু করিতে পারেন না। খেলার শেষ পর্য্যন্ত রেঞ্জার্স দলই খেলায় প্রাধান্য লাভ করিয়া দুই গোলে বিজয়ী হয়। মহমেডান স্পোর্টিং দল সর্ব্ব বিভাগের খেলোয়াড়গণের ব্যর্থতার জন্য পরাজিত হয়। বাহিরের শক্তিশালী সৈনিকদলসমূহ প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় যাঁহারা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হইবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমানে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। মহমেডান স্পোর্টিং দলের এই পরাজয় হতাশব্যঞ্জক হইলেও বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। শীল্ড প্রতিযোগিতার সূচনায় মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ, কি মহারাণা ক্লাবের বিরুদ্ধে, কি হবিগঞ্জ টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে, কোন খেলাতেই লীগ প্রতিযোগিতার শেষের দিকে যেরূপ অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন নাই। প্রথম দিনের প্রথম খেলায় একান্ত সৌভাগ্যবলেই মহমেডান স্পোর্টিং দল মহারাণা দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেন। দ্বিতীয় দিনেও অতিকষ্টে শেষ সময়ে একটি গোল করিয়া তাঁহারা জয়লাভ করেন। তাহার পর দ্বিতীয় খেলায় হবিগঞ্জ টাউন দলের ন্যায় একটি শক্তিহীন দলকে পরাজিত করিতে তাঁহাদের পেনাল্টি গোলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল এইরূপভাবে শীল্ড প্রতিযোগিতার পর পর দুইটি খেলায় নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করায় আমরা আশঙ্কা করিতে বাধ্য হই যে, মহমেডান স্পোর্টিং দল ফাইনাল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। ফলত তাহাই হইল এবং সেইজন্যই মহমেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয় আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে নাই।

**আই এফ এ শীল্ডের অবশিষ্ট খেলা**

**চতুর্থ রাউণ্ড**

**(১) ইষ্টবেঙ্গল দল অথবা দিল্লী এসোসিয়েশন বনাম ভবানীপুর।**

**(২) মোহনবাগান দল বনাম পুলিশ।**

**(৩) এরিয়ান্স বনাম কাষ্টমস।**

**সেমি ফাইনাল**

**(৪) রেঞ্জার্স দল বনাম ৩নং বিজয়ী।**

**আই এফ এ শীল্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী খেলার ফলাফল**

**মোহনবাগান (৮) : বেঙ্গল আর্টিলারী (০)**
**পুলিশ ক্লাব (৪) : কালীঘাট (১)**
**ইষ্টবেঙ্গল (১) : ই বি আর (০)**
**দিল্লী এসোসিয়েশন (৩) : খুলনা টাউন (০)**

**এরিয়ান্স ক্লাব (১) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)**
**কাষ্টমস (১) : বাঙ্গালোর মুসলীম (০)**
**রেঞ্জার্স ক্লাব (২) : ক্যালকাটা (০)**
**মহমেডান স্পোর্টিং (১) : হবিগঞ্জ টাউন (০)**
**রেঞ্জার্স ক্লাব (২) : মহমেডান স্পোর্টিং (০)**

**পেণ্টাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা**

গত ২৭শে জুলাই হইতে বোম্বাইতে পেণ্টাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতাটি পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যেরূপভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে একত্র করিয়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দল গঠন করা হইয়া থাকে, এই প্রতিযোগিতায় সেইরূপ করা হয় নাই। বোম্বাইর বিভিন্ন দল হইতে প্রতিযোগিতার দলসমূহ গঠন করা হইয়াছে। তবে পরিচালকগণ আগামী বৎসরে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ন্যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়গণকে আহ্বান করিবেন বলিয়া আশা করেন।

অনুষ্ঠান কমিটির আর্থিক অবস্থা এই বৎসর ভাল না হওয়ায় উক্তরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া পার্শীদের কোন ফুটবল দল না থাকায় গোয়ানিজ দলকে পার্শীদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ

**প্রথম রাউণ্ড**

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় রেঞ্জার্স দলের সহিত গোয়ানিজ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। খেলার শেষ সময় রেঞ্জার্স দল পর পর দুইটি গোল দিয়া খেলায় জয়লাভ করে। ম্যাকহাগ এই দুইটি গোল করেন।

**সেমি ফাইনাল**

প্রথম সেমি ফাইনাল খেলায় ইউরোপীয় দল রেঞ্জার্স দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। ইউরোপীয় দলের পক্ষে ওয়েচ রেজিমেণ্টের হিল একাই তিনটি গোল করেন।

দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল খেলায় মুসলীম দল অপ্রত্যাশিতভাবে হিন্দু দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। মুসলীম দল শেষ সময়ের পেনাল্টী গোলে জয়লাভ করে।

ফাইনালে মুসলীম দলের সহিত ইউরোপীয় দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ইউরোপীয় দল বিজয়ী হইবে বলিয়া সকলের ধারণা।

**জুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলা**

জুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলার সপ্তদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় ভারতীয় দল এক গোলে জয়লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় দলের তুলনায় ভারতীয় দলে অধিক সংখ্যক জুনিয়ার খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছিল। সেই কারণে ভারতীয় দলের এই জয়লাভ বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। খেলার দশ মিনিটের সময় ভারতীয় দল বিজয় নিদর্শক গোলটি করেন। নিম্নে উভয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

**ভারতীয় দলঃ**—এম হোসেন (সিটি) ; বি গাঙ্গুলী (অরোরা) এবং এ গড়গাড়ি (এরিয়ান্স) ; বি চৌধুরী (হাওড়া ইউনিয়ন), জুম্মান (ভবানীপুর) এবং গিয়াসুদ্দিন (ইষ্টবেঙ্গল) ; সাজাহান (ইষ্টবেঙ্গল), এস বসু (ই বি আর), এস হোসেন (জর্জ্জ টেলিগ্রাফ), টোবি বসু (কুমারটুলী) এবং এন মুখার্জ্জি (মোহনবাগান)।

**ইউরোপীয় দলঃ**—লসন (ক্যালকাটা) ; এ কার্ভে (ই বি আর) এবং ইড (ড্যালহোসী) ; ফলস্ (পুলিশ), নিকল (ক্যালকাটা) এবং গুড (রেঞ্জার্স) ; এফ মিলস (রেঞ্জার্স), এ জর্ডন (এরিয়ান্স), জে হ্যানসন (ড্যালহোসী), এ বিয়ার্ড (ক্যালকাটা) এবং রাসেল (ক্যালকাটা)।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটারপোলো লীগ প্রতিযোগিতা বিজয়ী বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির খেলোয়াড়গণ

# সমর বার্ত্তা

**২৪ জুলাই।—**

জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও পরিচালনার অভিযোগে ফরাসী আদালতে মঃ দালাদিয়েরের বিচার হইবে বলিয়া প্রকাশ। ফ্রান্সের বর্তমান সৈন্যদল ত্যাগ করার অপরাধে সামরিক আদালতে আরও তিনজন মন্ত্রীর বিচার হইবে। ফ্রান্স-ত্যাগী ফরাসীদিগকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার সিদ্ধান্তও প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষের ঘোষণা—ইতালি যুদ্ধারম্ভ করিবার পর হইতে এ পর্যন্ত ইতালীয়রা ৮০ বার মালটায় হাওয়াই হামলা করিয়াছে। জিব্রালটারের সংবাদ—জিব্রালটারে অসামরিক অধিবাসিগণকে স্থানান্তরকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট অধিকৃত বেসারেবিয়া ও বুকোভিনার প্রায় ৮০ হাজার জার্মন অধিবাসী জার্মানিতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে।

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানিতে পারস্পরিক বিমান আক্রমণ পূর্ববৎ।

এস্তোয়ানিয়ার প্রেসিডেণ্ট কনস্ট্যাণ্টিন প্যায়েট্স পদত্যাগ করিয়াছেন। সেখানে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রশাসনবিধি প্রবর্তিত হইতেছে।

**২৫ জুলাই।—**

আজ প্রায় ৮০টা জার্মন বিমান ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ইংরেজদের বাণিজ্যপোতসমূহের উপর হামলা করে। কাল ইংরেজদেরও বিমানবহর হল্যাণ্ড ও জার্মানির বহুস্থানে হানা দিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, গত তিন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ বিমান বহর জার্মানি ও তদধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর সহস্রাধিকবার আক্রমণ চালাইয়াছে।

কায়রোর সংবাদ—ব্রিটিশ বিমানসমূহ বারদরিয়ার দক্ষিণে ইতালীয়দের গোলাবারুদের এক সুবৃহৎ ডিপোর উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহার এক অংশ উড়াইয়া দিয়াছে। হাইফার সংবাদ—হাইফা শহরের উপর ইতালীয়দের হাওয়াই হামলার ফলে প্রায় ৪৬জন বেসামরিক অধিবাসী নিহত হইয়াছে।

বিমানসচিব লর্ড বিভারব্রুক বেতারে ঘোষণা করিয়াছেন, মার্কিন রাজস্বসচিব মিঃ মর্গেন থো কানাডার বিমান নির্মাণকারী কোম্পানিকে জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজদের জন্য মাসে ৩ হাজার বিমানপোত নির্মাণ করিবে।

**২৬ জুলাই।—**

ইংলিশ চ্যানেলে প্রচণ্ড আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। দুই পক্ষের শত শত বিমান এই যুদ্ধে নিরত ছিল। ব্রিটিশ জাহাজসমূহই ছিল জার্মন আক্রমণের লক্ষ্য। এই যুদ্ধে ইংরেজদের ৫টি ও জার্মনদের ২৮টি এয়োরোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে।

ইটালি জিব্রালটারে এবং ইংরেজরা লিবিয়ায় বিমান আক্রমণ করিয়াছে। ৫টি ইতালীয় বিমান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বুখারেস্টএর সংবাদ—কাল রুমানিয়ার পুলিস রুমানিয়ার তৈলশিল্পে নিযুক্ত ৯জন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পূর্বদিনে তৈলশিল্প ধ্বংসের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী ষড়যন্ত্রের অভি-যোগ সংবলিত যে জার্মন হোআইট পেপার প্রকাশিত হয় তাহাতে এই নয়জনের নাম ছিল।

**২৭ জুলাই।—**

বলকান অঞ্চলের অবস্থা উদ্বেগপূর্ণ। অপরাহ্ণে প্লাজা ভেনিজায় সিনর মুসোলিনির সহিত রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব সাক্ষাৎ করিয়াছেন। হিটলারের সঙ্গেও বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিবের আলাপ আলোচনা হইয়াছে। মস্কো রেডিওর সংবাদ—আমুর নদীতে সোভিয়েট নৌবহরের ব্যাপক মহড়া অবসিত; ক্যাস্পিয়ান সাগরস্থ যুদ্ধজাহাজগুলি বাকুতে সমবেত।

কাল রাত্রে ইংরেজদের বিমানবহর জার্মনদের রেমেন, স্টেরক্রেড, বর্ট্লপ, ক্যাস্ট্রপ, রস্কল, ডার্টমুণ্ড ও ক্যামেনএর তেলের গুদাম ও ১৪টা বিমানঘাঁটিতে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। জার্মনরাও আজ ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

লণ্ডনে ২৭ জুলাই বিমান বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাত্রিকালে দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের কয়েক স্থানে বোমা বর্ষিত হয়। ফলে অনেকগুলি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং উত্তর-পূর্ব স্কট-ল্যাণ্ডেও বোমা বর্ষিত হয়। জার্মানির একটি বোমারু বিমানকে নাকি ভূপাতিত করা হয়।

**২৮ জুলাই।—**

অপরাহ্ণে ইংলিশ চ্যানেল ও ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল প্রায় ৭০টি জার্মন বিমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ফলে ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান ও জার্মন বিমানে সঙ্ঘর্ষ হয়। জার্মানির তিনটি বিমানকে ভূপাতিত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানপ্রবাসী নয়জন বিশিষ্ট ইংরেজকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু গ্রেপ্তারের কারণ কি, এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। নয়জন ধৃত ব্যক্তির মধ্যে রয়টারের টোকিওস্থিত সংবাদদাতাও ছিলেন।

**২৯ জুলাই।—**

জাপানীগণ কর্তৃক ৯জন ইংরেজ গ্রেপ্তারের সংবাদ অদ্য রাত্রিতে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এ সম্পর্কে জাপানের নিকট প্রতিবাদ জানাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ওয়েলসএর উপর বর্তমান যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী এই আক্রমণ চলে। একটি জেলায় ১১টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়: একটি কারখানাবাড়ির সম্মুখের গৃহের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

সোভিয়েট-জার্মন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে ৪০জন জার্মন বিশেষজ্ঞ মস্কো গিয়াছেন।

**৩০ জুলাই।—**

স্যার রবার্ট ক্রেগী গতকল্য টোকিওতে জাপ পররাষ্ট্রসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জাপানের অবশিষ্ট ব্রিটিশ প্রজাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অদ্য এডেনের উপর পুনরায় ইতালীয় বিমান দেখা যায় এবং বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। চারজন দেশীয় অধিবাসী নিহত এবং পনরজন আহত হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ড উপকূলে জার্মন বিমান জোর আক্রমণ চালায়। ডোভার বন্দরের উপর ভীষণ বিমানযুদ্ধ চলে। জার্মানির ২০-খানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

বার্ণ হইতে ইতালীর সংবাদ সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত এক বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফ্রান্সের পতনের জন্য দায়ী বলিয়া বিচারের জন্য ভিসির ফরাসী গবর্নমেণ্ট যে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহাতে যে সব ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইবে, জেনারেল গ্যামেলাঁ (ইনি বর্তমান যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন), মঃ দালাদিয়ের, মঃ রেণো, মঃ ব্লুম, মঃ ম্যাণ্ডেনকট এবং মঃ ল্যাচাম্ব্রে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। উক্ত সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গতকল্য উক্ত বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছে এবং শীঘ্র উহাতে বিচারকার্য আরম্ভ হইবে।

# সাপ্তাহিক সংবাদ



২৪ জুলাই।—

ভারতের রাজকীয় বিমানবাহিনীর অফিসার পদে তিনজন বাঙালীকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত আমেদ ইব্রাহিম ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতরক্ষা আইন।—প্রতাপ পূর্ববৎ। বাঙলা সরকার ১৯৪৩ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত ফরোআর্ড ব্লকের ২য় অধিবেশনের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

ইসলামিয়া কলেজে পুলিশের লাঠিবাজির প্রতিবাদে কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে ছাত্রদের সভা ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি হইয়াছে।

২৫ জুলাই।—

লখনৌএ যুক্তপ্রদেশ আজাদ মুসলিম সম্মেলনে গণ-পরিষদের জন্য জাতীয় সংগ্রামের দাবি এবং পাকিস্থান পরিকল্পনাকারীদিগকে স্বাধীনতার শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদীদের বন্ধু বলিয়া নিন্দিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মুসলিম স্বার্থেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন।

পুণায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আসন্ন অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়সমূহের আলোচনা এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

বোম্বাইএর বাজারে ১৯৩৫ সালে ছাপা এক টাকার নোট ছাড়া হইয়াছে।

২৬ জুলাই।—

পুণায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। মহাত্মাজী অনুপস্থিত।

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব বাণিজ্যসচিব ডাঃ থিন মংকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন।—কংগ্রেসের খ্যাতনামা কর্মী ও ফরওআর্ড ব্লকের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সাধারণের রূপা জমাইয়া রাখার হিড়িকে টাকা আধুলি প্রভৃতির চাহিদা অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত সরকার শীঘ্রই অর্ধেক খাদ মিশ্রিত রূপার আধুলি প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান আধুলিতে ১১ ভাগ রূপা ও ১ ভাগ খাদ থাকে।

২৭ জুলাই।—

পুনায় শ্রীযুক্ত আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আজিকার অধিবেশনে ওয়ার্ধা বিবৃতি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস থাকিলেও দেশের আভ্যন্তর বা বহিরাগত বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধকল্পে কংগ্রেস অবলম্বিত নীতি অহিংস নাও হইতে পারে। গৃহীত প্রস্তাবের এই অংশটিই প্রধান। পুনায় ওআর্কিং কমিটিরও অধিবেশন চলিতেছে।

লখনৌএ শ্রীযুক্ত মাধবশ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু লীগের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় পাকিস্থান পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া বর্তমান সংকটে হিন্দু-দিগকে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

পুনাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কার্যনির্বাহক সমিতি তিনদিন আলোচনার পর কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির দিল্লী প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহাদের চূড়ান্ত অভিমত এক বিবৃতির আকারে প্রণয়ন করিয়াছেন। বিবৃতিতে দিল্লী প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের বিরোধিতা এবং যুদ্ধে কংগ্রেসের কার্যকরভাবে যোগদান প্রতিরোধ করার দৃঢ়তা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

২৮ জুলাই।—

অদ্য সুদীর্ঘ আট ঘণ্টাকাল তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী কর্তৃক উত্থাপিত দিল্লী প্রস্তাবটি ৯৫—৪৭ ভোটে গৃহীত হয়। সবশুদ্ধ সাতটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই উত্থাপন করে সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিষ্টগণ। সংশোধন প্রস্তাবগুলির প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, দিল্লী প্রস্তাব রামগড় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী এবং তাহা দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণের নীতি অনুসরণের চেষ্টা হইতেছে। যথারীতি বিতর্কের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারীর আবেদনে চারটি সংশোধনে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। অবশিষ্ট তিনটি সংশোধন প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর মূল প্রস্তাবটি পূর্বোক্ত ভোটে গৃহীত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত শংকররাও দেও প্রভৃতি কয়েকজন নেতা গতকল্যের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন; তাঁহারা আজ নিরপেক্ষ ছিলেন।

বিতর্কের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি প্রস্তাবটির জন্য পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

অদ্য খুলনায় করোনেশন হলে মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর জয়ন্তী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা মানকুমারী দেবী ১২৭১ সালের ১৩ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৭৬ হইয়াছে।

২৯ জুলাই।—

অদ্য শিলংএর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বহু উপজাতীয় লোক আসামের সমতলভূমিতে আসিয়া পিপ্পী গ্রামে হানা দিয়া আটজন গ্রামবাসীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঊনপঞ্চাশৎ বার্ষিক মৃত্যুতিথি প্রতিপালন উপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বাঙলা সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, মনুমেণ্টটি কলিকাতার কোনও গীর্জা প্রাঙ্গণে অপসারিত করা হইবে।

৩০ জুলাই।—

রাজনৈতিক কারণে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুলনা জেলার অন্তর্গত মাগুরাঘোনা নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস গত সোমবার রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় হুগলী ইমামবারা হাসপাতালে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন।

ভূতপূর্ব রাজবন্দী দীনেশ চক্রবর্তীকে অদ্য প্রাতে ডাবগ্রাম-মুরিংয়ে রেলওয়ে কোয়াটার্সে তাঁহার বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একজন শ্রমিক কর্মী ছিলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, সর্প দংশনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পূর্ব ময়মনসিংহ অমুসলমান কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ৯৬৯২ ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এড হক কমিটির মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ৭৪৬৭ ভোট পাইয়াছেন।

৭ম বর্ষ ] শনিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৭ সাল Saturday, 10th August, 1940. [ ৩৯শ সংখ্যা

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## রবীন্দ্র সম্বর্ধনা—

গত ২২শে শ্রাবণ, বুধবার রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। বৈদিক
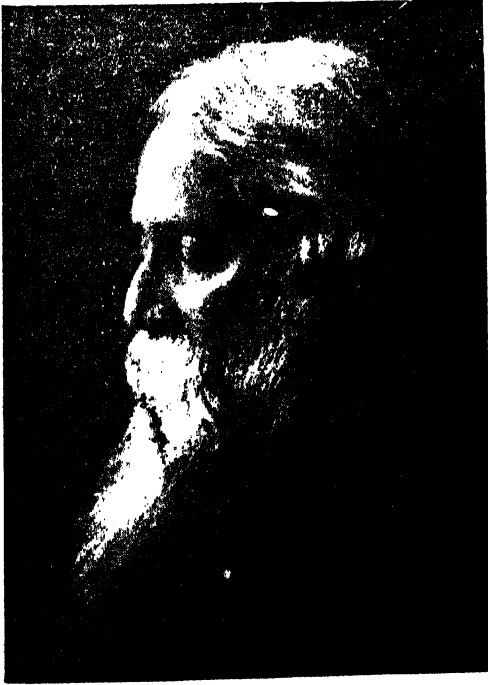
মন্ত্রগীতি সহকারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। শান্তিনিকেতনে সাম-গানের ঝঙ্কার উঠে। ভারতের ঋষিদের তপোবন হইতে একদিন উদাত্ত সাম গান উত্থিত হইয়া বিশ্ববাসীকে অমৃতত্বের বাণী শুনাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে ভারতের বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বিশ্বকবি এবং ভারতের তিনি বাণীমূর্ত্তি। ভারত একদিন বিশ্বের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াই বাণীর বন্দনা করিয়াছিল, ভারতে বাণী মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন বিশ্বাত্মার উপলব্ধির অখণ্ডৈক-রসের আকারে এবং সেই শ্রী বা মাধুর্য্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ভারতের কবির বাণীকে বিশ্বের কাছে মধুর করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব রসের মূল শক্তিও ভারতীয় ঋষির সেই উপলব্ধির মধ্যে রহিয়াছে। আমরা ভারতের কবি এবং সেই হিসাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে বন্দনা করিতেছি।

---

## ঢাকা ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ১৯শে শ্রাবণ রবিবার শেষ রাত্রিতে ঢাকা মেল চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন ছাড়াইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইবার সময় চুয়াডাঙ্গা ও জয়রামপুর ষ্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত হয়। তিনখানা বগীগাড়ীসহ এঞ্জিন পার্শ্ববর্ত্তী খালের মধ্যে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে ৩৭ জন নিহত হয় এবং প্রায় ৯০ জনের উপর জখম হয়। মাজদিয়া দুর্ঘটনার বিভীষিকাপূর্ণ স্মৃতি এখনও লোকের মন হইতে দূর হয় নাই, ইহার মধ্যেই আবার এমন ব্যাপার ঘটায় দেশের সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, এই রেলপথে যে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, বেশীর ভাগই ঘটিয়াছে রাণাঘাট এবং পোড়াদা জংসনের মাঝে এবং ঘটিয়াছে শেষ রাত্রির দিকে। এ প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি, এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, তবে শুনা যায় যে, লাইন ভাঙ্গিয়া ফেলায় হইয়াছিল। কাহারা ফিস প্লেট সরাইয়া ফেলিয়া এইভাবে লাইন ভাঙ্গিল এবং তাহাদের মতলবই বা কি, বুঝিবার উপায় নাই। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে তদন্ত হইয়াছে এবং আরও তদন্ত হইবে, ইহা আমরা জানি; কিন্তু তদন্তই সব কথা নয়,

প্রয়োজন হইল পাকা রকমের প্রতীকারের ব্যবস্থা করা। দুর্ঘটনার ফলে অনেক অমূল্য জীবন আমরা হারাইয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। স্বজনের বিয়োগ-ব্যথার তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার মত সান্ত্বনা-বাণী আমাদের নাই। আমরা চাই, ইহার প্রতীকার হয়। কালে-ভদ্রে এমন দুর্ঘটনা ঘটে, যাহার উপর মানুষের হাত নাই সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু রেল দুর্ঘটনা গত কয়েক বৎসর হইল যেমন ঘন ঘন ঘটিতেছে, তাহাতে দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। যাহাতে ইহার প্রতীকার হয়, তাহা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে করিতে হইবে।

---

**অতীতের অভিজ্ঞতা—**

রেল দুর্ঘটনা নূতন নহে, এখানে ওখানে কয়েকটি হইয়া গেল; সেগুলির গুরুত্ব জনসাধারণের পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইতে ত্রুটি কিছু করা হয় নাই। তদন্তও হইয়াছে, সিদ্ধান্তও হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যত প্রতীকার ব্যবস্থা যথোচিত অবলম্বিত হইয়াছে কি? তদন্তের ফলে হয়ত শুনিতে পাইব যে, কতকগুলি দুষ্টলোকের এই কাজ এবং তাহারা অতি ভীষণ এবং সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির লোক ইত্যাদি; কিন্তু এই সব দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে কয়জন? সাজা পাইয়াছে খুব কম লোকই। পুলিশের প্রশংসার বিষয় ইহা নিশ্চয়ই নয়। কর্ম্মচারী বিশেষের কর্ত্তব্যবোধ বা ত্রুটির জন্য যদি এমন ব্যাপার ঘটিয়া থকে, তাহা হইলে সেগুলি যাহাতে সহজে সম্ভব না হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এখানে দায়িত্ব ব্যক্তিগত অপেক্ষা ব্যবস্থাগত বলিয়াই আমরা বেশী মনে করি। রেল বিভাগের বিধি-ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং কঠোর হস্তে গলদ দূর করা উচিত; পদমর্য্যাদার প্রশ্নের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্যে বড়। তদন্ত হউক, কিন্তু তদন্তের দ্বারা তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ বা সিদ্ধান্ত করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না—প্রয়োজন আসিয়াছে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের।

---

**সরকারী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ—**

শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা না আছে, আমরা একথা বলি না; কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের নামে শিক্ষা সংহার নিশ্চয়ই কেহ চাহে না। বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডল শিক্ষা-সংস্কারের নামে শিক্ষা সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিবাদে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিলটি কিছুদিন চাপা ছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে, বাঙলার হক্ মন্ত্রিমণ্ডল নিজেদের জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দুয়ানী আড্ডা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার নীতি চালাইয়া তাঁহার সেই উক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষোভ তিনি মিটাইবেন, বুঝা যাইতেছে, শিক্ষার অবস্থা যাহাই হউক না কেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিলে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বোর্ড গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চাশজন সদস্য থাকিবেন। এই হিন্দু ৫০ জনের মধ্যে ১৯ জন মুসলমান এবং ২০ জন থাকিবেন হিন্দু; এই ২০ জন হিন্দুর মধ্যে ৫ জন থাকিবেন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের, ৫ জন থাকিবেন শ্বেতাঙ্গ বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ৬ জনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ নাই। এই ৫০ জনের মধ্যে ১৬ জন সদস্য গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কথায় মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ৯ জন সদস্য উভয় আইনসভার দ্বারা মনোনীত হইবেন। আইনসভায় সরকারী দলের প্রাধান্য থাকিবে, সুতরাং এই নয়জনের সকলে না হইলেও অধিকাংশ সরকারেরই সমর্থক হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বোর্ডে সরকারী পক্ষেরই কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতি গঠনের বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। কার্য্যকরী সমিতির ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ছয়জন সরকারী লোক হইবেন, অপর ব্যক্তিরা বোর্ডের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। বোর্ডে সরকারী দলের প্রাধান্য থাকিবে, তখন বোর্ডের নির্ব্বাচিত সদস্যের দ্বারা কার্যকরী সমিতির কর্ত্তৃত্ব সরকার পক্ষেরই করতলগত থাকিবে। বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতির গঠন হইতে এ বিষয়টি জলের মত পরিষ্কার যে, এই বিল পাশ হইলে দেশের শিক্ষ বিভাগীয় সমগ্র কর্ত্তৃত্ব মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে যাইবে এবং তাহার ফলে বাঙলা দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতির দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের অন্যান্য কার্য্য যেমন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, শিক্ষাও নিয়ন্ত্রিত হইবে সেইভাবে, তাহার সোজা অর্থ এই যে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সার্ব্বভৌম আদর্শ আর থাকিবে না, তাহার অর্থ হইল এই যে, প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পদার্থ বাঙলা দেশ হইতে লোপ পাইবে। সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির নামে প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত সংস্কৃতি বাঙলা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের ফলে যে অনর্থ বাঙলা হইতে দূর হইবে বলিয়া দেশের কল্যাণকামিগণ এতদিন আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সে আশাকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য আজ ব্রতী হইয়াছেন। শিক্ষা সংস্কারের নামে হক মন্ত্রিমণ্ডলের এই যে উদ্যম, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক। এই বিল পাশ হইলে, বাঙালী হিসাবে বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে; জাতীয় সংহতির আশা-ভরসাও কোনদিন থাকিবে না, সাম্প্রদায়িকতা হইবে কায়েম। শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী কর্ত্তৃত্ব কোন দেশ বা জাতির পক্ষেই কল্যাণকর নহে। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহা হইলে দলাদলি গিয়া পড়ে, অন্য স্বাধীন দেশে সে কর্ত্তৃত্ব বরং সাময়িকভাবে এতটা অনিষ্টকর হয় না, কারণ সে কর্ত্তৃত্ব রাজনীতিক, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের

সঙ্গে তাহার সঙ্ঘর্ষ সম্ভাবনা থাকে কম; কিন্তু প্রস্তাবিত বিলের নির্দ্দেশানুযায়ী বাঙলায় শিক্ষা বিভাগের যে কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে গিয়া পড়িবে, বিলের উদ্যোক্তৃগণ যতই শুভেচ্ছার দোহাই পাড়ুন না কেন, কার্য্যত ইহার ফলে বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাই বিস্তার লাভ করিবে। দেশের এবং জাতির স্বার্থের এবং সংস্কৃতির পক্ষে অনিষ্টকারিতার দিক হইতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের এই উদ্যম তাঁহাদের অন্য সব ব্যবস্থাকে হার মানাইয়াছে, একথা আমরা বলিবই।

---

**সমগ্র বঙ্গের প্রতিবাদ—**

হক মন্ত্রিমণ্ডলের প্রস্তাবিত কয়েকটি নূতন বিলের বিরুদ্ধে বাঙলার জনমত কিরূপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, গত ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভা হইতে সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সব জনসভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল এবং বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন সংশোধন বিলের প্রতিবাদ হয়। এই তিনটি বিলের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে দেশের শিক্ষা বিভাগের সমগ্র কর্ত্তৃত্ব সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে; কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সংশোধনে পৌরজনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করা হইতেছে এবং চাষী-খাতক আইনের অপপ্রয়োগে বাঙলা দেশের সমাজের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই তিনটি উদ্যমের তত্ত্বকথা হইল দেশের লোকের অধিকারকে নষ্ট করিয়া সর্ব্বতোমুখী সরকারী কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করা এবং তৎপক্ষে প্রয়োজন হইল সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সুফল উপভোগ করাইয়া গৌড়জনকে মুগ্ধ করা। বাঙালীকে যদি আজ জাতি হিসাবে টিঁকিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এই উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার জন্য মনে-প্রাণে প্রবৃত্ত হইতে হইবেই এবং সে প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে স্পর্শ করিবে, তাহার ফলে জটিল অবস্থার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। বাঙলা গবর্ণমেণ্ট যদি মনোযোগী হন, তাহা হইলে এ সমস্যা এখনও এড়াইতে পারেন; কিন্তু আইন সভার ভোটের জোরে দেমাক তাঁহাদের অন্তরে তেমন সুবুদ্ধি জাগাইবার অবসর দিবে কি?

---

**রুষিয়া ও ইংরেজ—**

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব মলোটোভ সম্প্রতি জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বলেন,—"মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্ম্মানী বিপুল সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার প্রধান লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই। সে লক্ষ্য হইতেছে জার্ম্মানীর অভিপ্রেত সর্ত্তে যুদ্ধের অবসান করা। হের হিটলার ১৯শে জুলাই তারিখে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডের নিকট সন্ধির আবেদন জানান। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব, যাহাকে তাঁহারা ইংলণ্ডের আত্মসমর্পণের দাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং উত্তরে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবেন, ইহা খুবই সম্ভব যে, একদিকে জার্ম্মানী এবং ইটালী, অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত ব্রিটেনের মধ্যে এখন তীব্র সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়ের আমরা সম্মুখীন হইব। গত কিছু দিনের মধ্যে ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যে সব বৈর আচরণ করিয়াছে, তাহার পর ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের কোন সন্তোষজনক উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা কঠিন। অবশ্য ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দূত-স্বরূপে নিয়োগে সম্ভবত সোভিয়েটের সহিত সম্পর্কের একটা উন্নতির মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

বলা বাহুল্য, মলোটোভের এই বক্তৃতায় ধরা ছোঁয়া কোন কথা নাই; তবে ইহা সুস্পষ্ট যে রুষিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির অবসরে যেমন করিয়া পারে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবে। মলোটোভ বলেন,—"সোভিয়েটের সীমান্ত এখন বাল্টিক উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার ফলে আমরা বাল্টিক উপকূলে বরফমুক্ত বন্দরসমূহ পাইব।" কিন্তু সোভিয়েটের আশা ইহাতেই তৃপ্ত হয় নাই। মলোটোভ জানাইয়াছেন,—"আমরা সোভিয়েটের জন্য নূতন ও আরও গৌরবময় সাফল্য অর্জ্জন করিব।" কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগ না দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার এই যে নীতি, এই নীতিই হইল বর্ত্তমানে সোভিয়েটের নীতি। সোভিয়েটের এই নির্লিপ্ততার বাণী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিশেষ কোন আশ্বস্তি প্রদান করিতে পারিবে না। সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতার ভিতরে উদ্দেশ্যসিদ্ধিজনিত আত্মতৃপ্তির যে অভিব্যক্তি রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদীমাত্রকেই তাহা আতঙ্কিত করিবে।

---

**গান্ধীজীর সতর্কবাণী—**

মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা আগষ্ট তারিখের 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন,—"ইহা দুঃখের বিষয় যে, মিঃ সোরেনসেনের অতি-অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে ভারত সচিব যে উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছেন, উহা দ্বারা ভারতের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধির অভাব সূচিত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব কে জানিতে পারিয়াছিল? ইহা সত্য যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি আইন-অমান্য আরম্ভ করা স্থগিত রাখার অন্যতম কারণ। আমি পুনঃপুন বলিয়াছি যে, যদি কংগ্রেসকে আইন অমান্য করিতে বাধ্য করা হয়, তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও

সত্যাগ্রহবিজ্ঞান প্রয়োগ-পদ্ধতিবিহীন নহে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসকে পরাজিত করিতে দিতেছেন, দিল্লী প্রস্তাবের ফলে এমন একটা ধারণা অনেকের মনে হইয়াছে, মহাত্মাজী সে সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া বলেন, যদি ঐ সন্দেহ সমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে এরূপ কিছুই নাই, যাহা আমাকে কোন প্রকার ফলপ্রসূ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে বাধা দিতে পারে।' মহাত্মাজীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার গতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ মহাত্মাজীর এই সতর্ক বাণীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। ইংরেজ জাতি প্রকৃত কাজ বুঝে, তত্ত্ব কথার তাহারা ধার ধারে কম। মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-রাজ্যের নৈষ্কর্ম্ম্যের জালে যেভাবে জড়াইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে তাঁহার দিক হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদিগের স্বার্থ নিরাপদই মনে করিতেছে।

---

**সামরিকতায় শঙ্কা—**

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্ত্র লইয়া কিংবা নিরস্ত্রভাবে সামরিক কেতায় কুচকাওয়াজ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণায় এপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রধানত যুক্তি এই যে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক এবং অনেকগুলি রাজনীতিক উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত। ঐগুলি হয় সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ ঘটাইার উদ্দেশ্যে অথবা শাসন ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কুচকাওয়াজ করে। এই ঘোষণায় সেনাদল, পুলিশ প্রভৃতির সরকারী উর্দ্দির অনুকরণে পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের খাকসার দলের সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তেমনভাবে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের বেআইনী তৎপরতা দেখিলে সে প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পূর্ব্বে হইতেই ছিল। সুতরাং সাধরণভাবে এমন আদেশ জারী করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। গবর্ণমেণ্ট সেনা-দল এবং পুলিশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশের শান্তিরক্ষার জন্য তাহাদের শক্তিই পর্য্যাপ্ত। একথা স্বীকার করিয়াও আমরা বলিব যে, দেশের লোকেদের যদি আত্মরক্ষার শক্তি বা সাহস নিজেদের না থাকে তাহা হইলে কোন সরকারই জনে জনের পিছনে পুলিশ বা সেনা পাহারা রাখিতে পারেন না। আত্মরক্ষার জন্য শক্তির চর্চা ছাড়া সামরিক শৃঙ্খলা শিক্ষার অন্য দিকও আছে, ইহাতে যুবকদের স্বভাব সুনিয়মিত হয়, শৃঙ্খলার সহিত মিলিতভাবে কাজ করিতে তাহারা শিখে; উন্নত আদর্শের পথে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটা প্রেরণা তাহারা পায়। নৈতিক শক্তি এই ভাবে তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার অবশ্য বিধান দিয়াছেন যে, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে সব প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করিবেন, এবং নিরাপদ বোধ করিবেন, সে সব প্রতিষ্ঠান চলিতে পারিবে। কিন্তু ইহার ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইল, তাহার অপ-প্রয়োগের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে।

---

**পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্যা—**

১৫ই আগষ্টের অধিক বিলম্ব নাই। হিটলার ১৫ই আগস্টের মধ্যে ইংলণ্ড দখল করিয়া ফেলিবেন, এই ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলারের অভীপ্সিত ইংলণ্ড আক্রমণ এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পক্ষান্তরে হিটলার যে ইংলণ্ড আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ইহাও বিশ্বাস করিতেছেন না বরং তাঁহারা এই কথাই বলিতেছেন যে, ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মানী সত্বরই প্রচণ্ডভাবে বিমান আক্রমণ সুরু করিবে। হিটলারের বিলম্বের কারণ কি? কেহ কেহ বলিতেছেন, জাপানের সঙ্গে হিটলার আগে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া লইতে চাহেন। কিছুদিন হইল জাপানের সুর ক্রমেই জার্ম্মানঘেঁসা হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপীয় পরিস্থিতির নূতন সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপান প্রাচ্যদেশবাসীর মুক্তির জন্য দুশ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের নূতন গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন,—ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘকাল হইতে বৈদেশিক উপনিবেশ হিসাবে শোষিত ও উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে। এশিয়ায় নববিধান প্রবর্ত্তন করিতে গেলে ঐ স্থানকে চিরকাল এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। জাপানের এই মতিগতির সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ ভার্নন বার্টলেট সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—পূর্ব্ব এশিয়ার সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার জন্য অন্তত তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য ব্রিটিশের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যে সেখানকার অবস্থা চরমে উঠিবে, ইহা প্রায় নিশ্চিত। ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া চীনের বাণিজ্যপথ বন্ধ করিয়া ইংরেজ জাপানের দাবী মিটাইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতেই জাপান যে ঠাণ্ডা হইবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরং ঘটনার গতি বিপরীতই দেখা যাইতেছে। জাপানে ইংরেজ প্রজাদের গ্রেপ্তার এবং ইংলণ্ডেও জাপ প্রজা গ্রেপ্তারের ব্যাপারই তাহার প্রমাণ। ব্রিটিশপক্ষ অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেই চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার ফলে জাপানের ক্ষুধাই বৃদ্ধি পাইবে, পরে আমেরিকাকে আগাইয়া আসিতে হইবে, তখন ইংরেজ কি করিবে, ইহা একটা বিশেষ সমস্যার বিষয়। ইটালীর ন্যায় জাপানও যে প্রাচ্য দেশবাসীর মুক্তির দোহাই দিয়া দাঁও মারিবার ফিকিরে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

# ঢাকা মেল দুর্ঘটনার নিদারুণ দৃশ্য
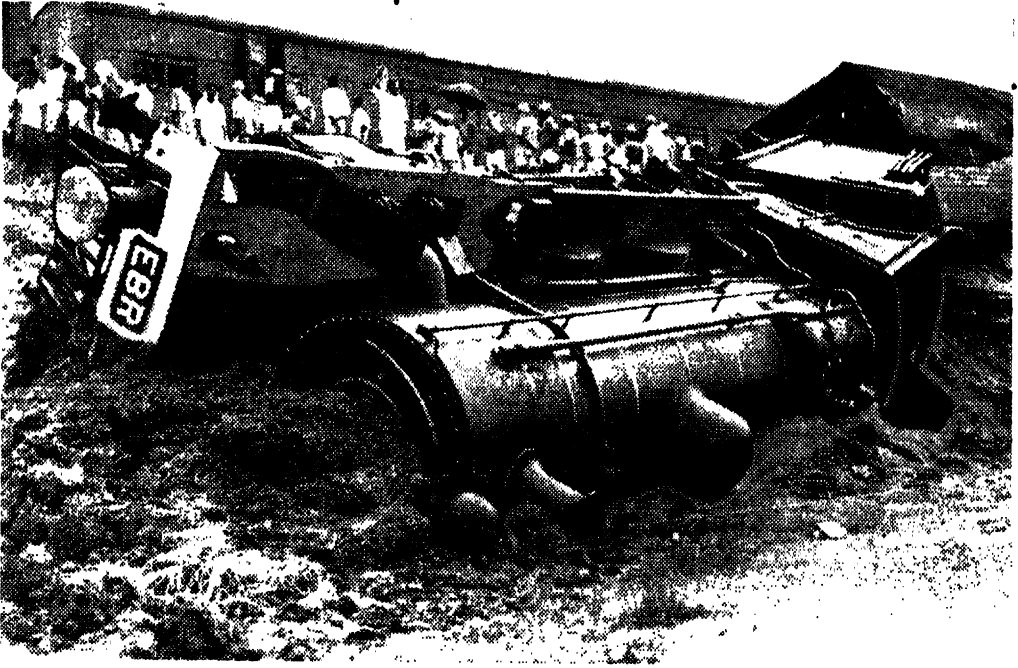
ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় ট্রেণের ইঞ্জিন উল্টাইয়া পড়িয়া মাটিতে বসিয়া গিয়াছে।
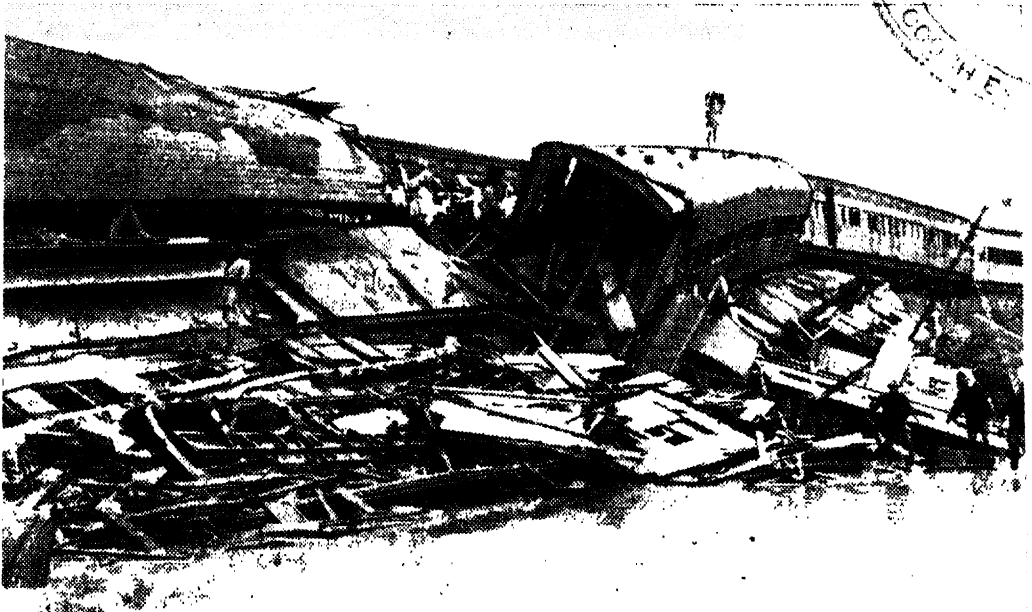
বিধ্বস্ত বগীসমূহের দৃশ্য

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রায় সাহেব ইন্দুভূষণ সরকারের মৃতদেহ। মস্তকের নিকট উপবিষ্ট তাঁহার পুত্র।

# কেমিষ্ট

**শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম, এস-সি**

আমরা কেমিষ্ট কর্মী আমরা বীক্ষণগৃহে সাধনা করি
ধূলিমুঠি তুলি সোনামুঠি করি ধরার দুঃখ দৈন্য হরি।
মানবজাতির নব ইতিহাসে আমাদের দান সবার বাড়া
খাদ্য মদ্য বসনভূষণ কিছু নাহি হয় মোদের ছাড়া।
প্রস্তর হ'তে লৌহ তাম্র ধাতুর করিয়া আবিষ্কার
আমরা গড়েছি কত না নগরী বনভূমি করি পরিষ্কার।
আমাদের গড়া অর্ণবযানে সাত সাগরের রত্ন লভি
কত মহাজাতি নরপ্রগতির যজ্ঞে দিয়েছে দিব্য হবি।
ক্লিওপেট্রার কেশের তৈলে আমরা ঢেলেছি কুসুমবাস
পুষ্প পেলব জুলিয়েট গায়ে দেখিবে মোদেরি রঙান বাস।
গভীর সাগর কীটদেহ হ'তে রক্তবর্ণ যতনে আনি
সিজারের রাজপোষাক উজ্জ্বল করেছি আমরা বর্ণ টানি।
গহন কানন হ'তে কর্পূর গন্ধদ্রব্য খুঁজিয়া কত
মৃতেরে রেখেছি 'মামী'র আকারে জীবন্ত চিরকালের মত।
যে কালিকলম কাগজ লইয়া মানবজাতির অহংকার
কে না জানে তার সকলগুলিই আমরা করেছি আবিষ্কার।
ফলে বল্কলে ট্যানিক এ্যাসিড চিরকাল ধরে আছিল ভবে
তার সনে লোহা-লবণের যোগে কালি হয় মোরা মিলাই যবে।
ঘাস বাঁশ হ'তে কাগজ তৈরী আমরাই করি সুকৌশলে
কাঠ হতে চিনি কৌষেয় বাস আমাদেরি যাদুবিদ্যা বলে।
জ্বরে মরে প্রিয়া শোকাতুর হিয়া প্রিয়ের দুঃখ সহিতে নারি
শাখী বল্কলে লভি কুইনিন চিরতরে মোরা জ্বরেরে মারি।
আলকাতরার উপাদান হ'তে সৃজি ঔষধ তেজস্কর
দূর করিয়াছি শোকতাপবাহী শত আধিব্যাধি ভয়ংকর।
আলকতরার কৃষ্ণতা হ'তে লভেছি কত না কঠিন শ্রমে
রামধনু জিনি বর্ণসুষমা যাহা কেহ কভু ভাবেনি ভ্রমে।
বাঙলার চাষী হৃদয়শোণিতে কত নীল ক্ষেত করিত লাল
তাই ত সে-নীল করিনু বাহির যতনে সাধিয়া অনেক কাল।

যেথা ফলিত না একটি কণিকা এমন অনেক উষর দেশ
আমরা করেছি উর্বর তাই নাহি আজি সেথা দৈন্য লেশ।
গ্রহ তারকায় যত রহস্য, নরদেহে ব্যাধি বীজের নাচ
দেখায় সকলি প্রগতির গতি ক্ষারবালিজাত মোদেরি কাচ।
রেডিয়ম ধাতু কিরণ বৃষ্টি কে দেখেছে বল মোদের আগে
ক্যানসার রোগ আরোগ্য হয় যবে সে কিরণ পরশ লাগে।
দূরান্তরের প্রিয়া পাশে আসে মোদেরি আলোক চিত্রবলে
যুগান্তকারী বিজলীর লীলা এনেছি ভূতলে সাধন ফলে।
খাদ্যের মাঝে এ-বি-সি-ডি-ই ভাইটামিনের আবিষ্কারে
রিকেটী শিশুর মুখে ফোটে হাসি রাতকাণা দেখে অন্ধকারে।
প্রসূতীরা পায় পূর্ণস্বাস্থ্য বেরিবেরি রোগে মরে না লোক
পেলাগ্রা আর স্কার্ভি নাশিয়া ধরারে করেছি বিগত শোক।
এইত সেদিন বহুসাধনায় লভি সন্ধান হরমোনের
জরারে করিয়া জর্জর মোরা বিজয় সেধেছি যৌবনের।
ডিনামাইটও মোরাই গড়েছি—গুঁড়িয়া পাহাড় যাহার বলে
অগম্য পথ সুগম করিয়া সুড়ঙ্গ পথে মানব চলে।
প্রকৃতি-তত্ত্ব সমুদ্ঘাটিতে সাগরমথনে গরল প্রায়
শিবসাথে কিছু অশিব হয়েছে দেখিয়া হৃদয় দহে ব্যথায়।
সবার চাইতে এই দুখ মনে মোদের সত্য আবিষ্কার
হৃদয়হীনের হস্তে পড়িয়া ধ্বংস করিছে সভ্যতার।
রুদ্ধকক্ষে করি আরাধনা বছরের পর বছর ধ'রে
অ্যাসিডে জ্বলিয়া ক্ষারেতে গলিয়া উগ্রবাষ্পে যাই যে ম'রে!
সুখ সম্পদ শোভায় সাজাই বিরাট মানবসমাজ দেহ
তবু কেন হায় কি যে বিধিরোষ, মোদের দুঃখ বোঝে না কেহ!
তীব্রবহ্নি বুকে চাপি যথা পুষ্পে শষ্পে ধরণী সাজে
সহি মোরা শত দৈন্যের জ্বালা জীবন সঁপেছি বিশ্বকাজে।
আমরা কেমিষ্ট, কর্মী আমরা বীক্ষণগৃহে সাধনা করি
ধূলিমুঠি তুলি সোনামুঠি করি ধরার দুঃখ দৈন্য হরি।

# "মানব সভ্যতায় অহিংসার স্থান"

পুলকেশ দে সরকার

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'অহিংসার' প্রবর্ত্তন করিয়া গান্ধীজী অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং স্বাধীন দেশের সমস্যামুক্ত ও পরমনিশ্চিন্ত অধ্যাপকেরা দীর্ঘ দার্শনিক বিবৃতি দিয়া এই মতবাদকে সমর্থন করিয়াছেন। ভারতবাসী হিসাবে এই প্রশংসা-লিপি পড়িয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম সত্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা কখনই নিঃসংশয় ছিলাম না। গান্ধীজীও অহিংসার উপর অনুক্ষণ জোর দিয়া অহিংসার ধারণাকে এমন একটা আধ্যাত্মিক স্তরে লইয়া গিয়াছেন যেখানে বুদ্ধি ও যুক্তি হার মানিতে বাধ্য। ফলে এই অহিংসবাদ ব্যক্তিগত সাধনার ধর্ম্মানুভূতির পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজী ক্ষান্ত নহেন, বৃহৎ মানবসমাজে ইহার প্রয়োগের জন্য তিনি অবিশ্রাম প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

আফ্রিকার অহিংস প্রতিরোধের পর গান্ধীজীর চিন্তাধারা এই অহিংস টেক্‌নিক দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় নাই; কিন্তু তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ অহিংস হইতে পারেন নাই এবং অহিংস স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া দুর্লভ। সম্প্রতি ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। গান্ধীজীর 'বিবেকরক্ষক' রাজাজী ও সর্দ্দারজীর মতো অহিংস-গর্ব্বিত রাজনৈতিকেরা গান্ধীজী সহ অহিংসা নীতিকে বর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও এমন আচরণ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত কিন্তু অহিংসা নীতি ত্যাগ করিতে অক্ষম। ইহাতে বিস্ময় যতখানিই থাকুক না কেন, এই প্রশ্নটা স্বতঃই জাগিতে চাহে, আজ এমন কি হইল যে, অহিংসার চাইতে রাজনীতিই বড় হইয়া উঠিল? ইহাতে মনে হয় যে, সাধারণ লোককে হতবুদ্ধি করিয়া রাখিবার জন্য হয় ইহা মহাত্মা-শিষ্যদের একটা প্রকাণ্ড ভাণ ছিল, নতুবা গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতেই কোথাও একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এমন কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে যাহাতে হিংসার উদ্রেক না হইয়া পারে নাই; তহার অর্থ এই যে, হিংসাটাকে নেপথ্যে রাখা চলে, কিন্তু হিংসার উদ্রেকের অঙ্কুশ পড়িলে হিংসার সাড়া না জাগিয়া পারে না।

অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত বিশুদ্ধ অহিংসার কোন স্পষ্টাস্পষ্টি সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই; পাওয়া যে যায় নাই তাহার মস্ত বড় প্রমাণ এই যে অহিংসার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছে non-violence- জবরদস্তি বা গাজুরি ও হিংস্রতা বা অসূয়া এক জিনিষ নহে। নৈতিক অ-বস্তুকে আত্মার মতো দেহাশ্রয় করিতে হয় বলিয়া অহিংসাও শূন্যোমার্গী হয় নাই; প্রয়োগ ক্ষেত্রে অসহযোগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অহিংসার একক অস্তিত্বের বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সার্থকতা আছে কিনা জানি না, কিন্তু অসহযোগের মধ্যে এই নিরবলম্ব স্বাতন্ত্র্য সার্থকতা আছে। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সফলতায় কতখানি অহিংসা ও কতখানি অসহযোগ সক্রিয় তাহা লইয়া অনর্থক যুক্তি চাতুরীর অবতারণা চলিতে পারে, কিন্তু অসহযোগ যে কিরূপ সক্রিয় প্রতিরোধ তাহা জনসাধারণ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে; অপর পক্ষে অহিংসার সক্রিয়তা রাজাজী সর্দ্দারজীও সঙ্কটকালে নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে করিতেছেন। গান্ধীজীর আন্দোলনের অসহযোগিতাই যে প্রকৃত টেক্‌নিক (বা রীতি) তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। লণ্ডনে অবস্থিত পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী ও নাৎসী ধ্বংসকামী জেনারেল দ্য গলে জার্ম্মান অধিকৃত অঞ্চলের ফরাসীদিগকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন—কোন স্থলেই অহিংস হইতে বলেন নাই।

স্বয়ং গান্ধীজী জার্ম্মান আক্রান্ত পোল্যাণ্ডের সশস্ত্র প্রতিরোধকে 'অহিংস' বলিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে অহিংসার প্রবর্ত্তক বর্ণাশ্রম অভিমানী হিন্দু গান্ধীজী একটি অসাধারণ কার্য্য করিয়াছেন। যন্ত্রণাকাতর রোগজীর্ণ একটি গোবৎসকে অকম্পিত কণ্ঠে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়াছিলেন। দুঃসহ যাতনায় মূক জীবটি পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল, গান্ধীজীর কোমল প্রবৃত্তিতে তাহাই মুহূর্ত্তের কঠোরতা আনিয়া দিয়াছিল। গোবৎসটির যাতনার অবসান হইয়াছিল, গান্ধীজীরও অস্বোয়াস্তি গিয়াছিল, কিন্তু গান্ধীজী বাহ্যিক সহিংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে জিনিষটি প্রমাণ করিয়াও হারাইয়া ফেলিলেন, সেটি হইতেছে এই যে, কোন জিনিষকেই একান্ত করিয়া দেখা চলে না; দেখিলে বিভ্রান্তিই আসে। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজী যাহা করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে হিংসা। কিন্তু কার্য্য দিয়াই তো শুধু বিচার চলিবে না—বিচার করিতে হইবে তাঁহার প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে বুঝিয়া। এই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আচরণ সর্ব্বাংশে অনুকম্পায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, বরং যে বিধ্বংসী মৃত্যুকীটগুলি বৎসটিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, প্রতিহিংসাটা তাহাদেরই উপর প্রযুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু এই মুমূর্ষু জীবটির কাতরতায় বিচলিত গান্ধীজীর একটি মাত্র প্রবৃত্তি সেই স্থলে কার্য্যকরী হইয়াছিল—সেটি গোবৎসটির পরিত্রাণ। সেখানে পথ, রীতি, নীতি তাঁহাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই, সদুদ্দেশ্যটাই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অস্ত্রের প্রয়োগে তিনি বিমুখ হন নাই, কেননা লক্ষ্যটা তাঁহার স্পষ্ট ছিল—অস্ত্রটা গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান গান্ধীর প্রবৃত্তিতে পথটাই জাঁকিয়া বসিয়াছে, উদ্দেশ্য অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে।

গান্ধীজীর কথা যাউক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার মহাশয় মানব সভ্যতায় অহিংসার স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। মানব সভ্যতা মানবসমষ্টি বা সমাজকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ কোন ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মানবসমষ্টির মধ্য দিয়া সভ্যতার বিভিন্ন রূপ দেখা দিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সকল সভ্যতা বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন মনে হইলেও বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অতিপ্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানব সভ্যতা অতি ব্যাপক কথা। মানুষের অতি আদিম সহজ প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্যবাদীদের সাম্যবাদ প্রবর্ত্তনেচ্ছা পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। মানুষের অত্যন্ত প্রাথমিক প্রয়োজন যে খাওয়া এবং খাইয়া বাঁচা, ইহারও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসেরও তেমনি ব্যাপকতা আছে। ইহা মূলত মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিরই একটানা ইতিহাস। মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি সমষ্টিগত জীবনযাপনে বহুলাংশে সাধারণ জীবজগৎ হইতে পৃথক হইয়াছে। ইহারই নাম সমাজতত্ব। এই সমাজতত্বের সাহায্যে মানুষের কেবল অস্ত্র ব্যবহার নহে, অস্ত্র তৈয়ারীর কৌশলও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অস্ত্র তৈয়ারীর কৌশল মানুষের সমাজকে সমাবিষ্ট করে। এই কৌশলেই মানুষ বস্তু উৎপাদন করিয়াছে। এই বস্তু উৎপাদনই সভ্যতার স্তরভেদ। এই বস্তু উৎপাদনের মালিকেরাই বিভিন্ন কালে রাষ্ট্র গড়িয়াছে। এই রাষ্ট্রের সাহায্যেই সংস্কৃতির প্রসার বা নিরোধ হইয়াছে। মানুষের বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান সভ্যতায় ধনবৈষম্যের প্রতিবাদ হিসাবে ধনসাম্যের কথা উঠিয়াছে; তেমনি বিরাট ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি অহিংসার কথা উঠিয়াছে।

কিন্তু কোন জিনিসকে একান্ত করিয়া দেখার বিপদ এইখানেই। সদিচ্ছাটাই বড় কথা নহে। ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটাই শেষ কথা নহে; কেবলমাত্র বিশেষ একটা সামাজিক অবস্থায়ই এই সদিচ্ছা পূরণের প্রয়াস সম্ভব। এক প্রকার আদিম কাল হইতেই এই বৈষম্য চলিয়া আসিয়াছে, আজও তাহার অবসান হয় নাই কিন্তু মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের অবসান আজ আমরা কল্পনা করিতে পারি। ক্রমঃবিকাশের গতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মন্থর। এই বৈষম্য একদিনে যাইবে না। আজও এক জাতির

নামে অপর জাতি ক্ষেপিয়া উঠে। সভ্যতার নামে দুর্ব্বল জাতিকে প্রবল জাতি অধীন করিয়া রাখে। একই জাতির মধ্যে স্বার্থসংঘাত ঘটে; সেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাতীয়তার নামে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র ব্যাপিয়া সমগ্র পৃথিবীকে দুইটি স্বার্থে বিভক্ত করিয়াছে। জাতীয়তার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে যেমন পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থ আছে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থ আছে। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হিংসা প্রতিহিংসার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। কারণ, এস্থলে হিংসা ও প্রতিহিংসা ফল বা কার্য্য মাত্র, কারণ নহে। আমি খাটিয়া মরিব, খাইয়া বাঁচিবারও সংস্থানও জুটিবে না অথচ যাহার জন্য খাটিয়া মরিব তাহার প্রাচুর্য্যের অবধি থাকিবে না, ইহাই তো হিংসার উদ্রেকের যথেষ্ট কারণ। হিংসা উদ্রেকের এই কারণ যতদিন থাকিবে ততদিন হিংসার বদলে অহিংসা প্রতিষ্ঠার কথা বাতুলতা মাত্র। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও যেমন, আন্তর্জ্জাতিক জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি—সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা যতদিন থাকিবে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদী সন্দিগ্ধতা, হিংসা ও হিংস্রতা থাকিবেই; মূল কারণ রাখিয়া লীগ অব নেশন বা অনুরূপ একগুচ্ছ চুক্তির প্রহসন চলিতে পারে, কিন্তু হিংসার অবসান হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার পরিবর্ত্তে ভৌগোলিক সহযোগিতা যতদিন না হইতেছে ততদিন আন্তর্জ্জাতিক হিংসা ও হিংস্রতা থাকিবে: শ্রেণীস্বার্থ পুষ্ট করিবার চেষ্টায় সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্রে যতদিন মালিকানা স্বত্ব সর্ব্বহারা শ্রেণীকে দরিদ্র ও নিব্বীর্য্য করিয়া রাখিতে চাহিবে ততদিন সামাজিক ক্ষেত্রে হিংসার প্রশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সমতা না আসা পর্যন্ত ও সামাজিক এই আরোপিত বৈষম্যের শেষ না হওয়া অবধি হিংসা উদ্রেকের কারণ থাকিবেই। অতএব এই ক্ষেত্রেও অহিংসার বাণী ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র, জাতীয় ক্ষেত্র ছাড়িয়া যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের সান্নিহিত হই তখন আমরা এই দেখিয়া অবাক হই যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করি। আমাদের এই গোপন ও প্রকাশ্য মনোবৃত্তির পিছনে সামাজিক প্রভাব কতখানি সক্রিয় তাহা আমরা জানি না বলিয়াই সরাসরি ধরিয়া লই, মানুষের হিংসা মাত্রেই মৌলিক প্রবৃত্তি। ধনবৈষম্য পরিপূর্ণ সমাজে মানুষের পরশ্রীকাতরতা, কুৎসা, কলহ, আর পাঁচজনকে ঠেলিয়া নিজে বড় হইবার নির্লজ্জ আগ্রহ, চালচলন, অথবা এক কথায় সংস্কৃতি ও সভ্যতা যে রূপ লইবে, ধনসাম্য সমাজে তাহা লইতে পারে না। এই সামাজিক হিংসা হইতেই হত্যা, রক্তপাত, আত্মনাশ ঘটিয়া থাকে; চুরি, বাটপারি, জালিয়াতি, নিন্দা, দুর্নীতি দেখা দেয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্য শ্রেণীবিদ্বেষ, তাহা হইতেই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার বাহন রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র অর্থেই পুলিশ ও মিলিটারী ; পুলিশ ও মিলিটারী অর্থেই লাঠি ও গুলিগোলা; ইহার অর্থই আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা ও দেশরক্ষা; ইহার অর্থই রাষ্ট্রনায়কদের একাধারে প্রসারেচ্ছা ও সংগত সন্দেহ। ইহা হইতেই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহা হইতে মাত্র একটি উপসংহারেই পৌঁছানো যায়। শ্রেণীস্বার্থ বিদ্যমান থাকিতে হিংসা ও হিংস্রতা, কি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কি জাতীয় ক্ষেত্রে কি সামাজিক সম্মিলনে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হিসাবে প্রকাশ পাইবেই। অহিংসার প্রচার তাহা ব্যাহত করিতে পারিবে না। মানব সভ্যতায় যতদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে ততদিন সশস্ত্র প্রতিহিংসাকে উৎখাত করা যাইবে না। অপ্রীতিকর হইলেও ইহাকে না মানিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ অ্যানার্কিস্টরা যেভাবে রাতারাতি শ্রেণীহীন সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খুঁজিয়া ফেরেন ও অস্থির চিত্ততায় বর্ত্তমানের সমাজকে যেখানে সেখানে আঘাত করিয়া প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তোলেন, প্রকৃত নৈষ্ঠিক অহিংসবাদীদের অধৈর্য্যের ফলে সমাজে তেমনি বিপরীত ফলপ্রসব করে। প্রুধোঁ সম্পত্তিকে চুরি বলিয়া দর্শনের দারিদ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন মাত্র এবং কাউণ্ট টলস্টয় জমিদারী বিলাইয়া দিয়া নিজেকে ও সমাজকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন মাত্র—ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজী অসহযোগের অস্ত্র তুলিয়া দিয়া যেমনই ইহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন, অকালে অহিংসার কথা তুলিয়া তেমনই ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। পাঁঠা বলি দেখিতে আতঙ্কিত মানুষ অনায়াসেই পক্ক মাংস খাইতে পারে; জীবনযাপনে প্রতিদিন অনিবার্য্যক্রমে আমরা বহু প্রাণীহত্যা করিয়া থাকি—কিন্তু তাহা অনিবার্য্য বলিয়াই কি হিংসা হইবে না? যদি তাহা না হয় তবে মানব সভ্যতায় হিংসাকে একান্ত করিয়া দেখা চলিবে না; যুদ্ধ নহে—যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে বা যুদ্ধ রূপ পরিণতি বা যুদ্ধ হইতে যে পরিণতি তাহা দিয়াই যুদ্ধ—যুদ্ধের হিংস্রতা, রক্তপাত ইত্যাদির বিচার করিতে হইবে। মানব সভ্যতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যদি কোন শিক্ষা থাকে তবে তাহা ইহাই।

আমাদের দেশে হিংসা অহিংসা লইয়া নেহাৎ কম বিবাদ হয় নাই এবং তাহা বড় অল্প দিনেরও নহে। যে দেশের মহাজনদের সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রাখিবার কল্পনা জাগিয়াছিল, সেখানে এই 'আত্মহত্যা' অতি সহজেই বর্জ্জিত হইয়াছিল। কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া নহে পূর্ব্বপর সকল প্রকার ঋষিকল্প অনুভূতিতেই এই হিংসাকে ঘৃণ্য মনে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মী, জৈনমতাবলম্বী বা বৈষ্ণব ইঁহারা আপন আপন ধারণা অনুযায়ী অহিংসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়াছেন কিন্তু কেবলমাত্র শাক্ত-শৈবেরা নহে, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে অনেকেই পুরাপুরি অহিংস হইতে পারেন নাই, হইতে পারা যায় না বলিয়া। পশ্চিম দেশের মতো প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকের দ্বন্দ্ব আমাদের রাষ্ট্রেও প্রবেশ করিয়াছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে এবং আজ যে রাজা শাক্তমতের আতিশয্যে রক্তের বৈতরণী বহাইয়া দিয়াছেন, কাল আর এক রাজা সেই জীবহত্যাকারীদের (মৃত্যু?) দণ্ড দিয়াছেন। কলিঙ্গ জয় করিয়াই অশোক নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই, রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণদের দমিত করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকেরা মানুষের এই দোলায়মান চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষায় ধর্ম্মের সহিত বলিপ্রথা জুড়িয়া দিয়াছেন। আজও এমন লোক খুঁজিলে পাওয়া যায় যিনি দেবতার কাছে বলি না দিলে মাংস খাইতে পারেন না। ধর্ম্ম বা সংস্কারের কথা বাদ দিলেও আমিষ ও নিরামিষাশীর অস্তিত্বে এই কথা প্রমাণিত হয়, মানুষের হিংসা অহিংসার সমস্যা এতদূর পেঁাছাইয়াছিল যে অতি প্রয়োজন যে বাঁচা, তাহার জন্যও হিংসা ও অহিংসা একটা নীতিকে আশ্রয় করিয়া চলিব কিনা এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অহিংসবাদীরা বিপর্য্যস্ত হইবেন এই জন্য যে, জীবহত্যা না করিয়া তাঁহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। একদল বিকৃত জীবতাত্ত্বিক আছেন যাঁহারা বলেন যে মানুষ মাছ না খাইলে নদী মাছে ভরিয়া যাইত, জল থাকিত না। জীবতত্ত্বকে আমরা অতখানি মূর্খামিতে পরিণত করিতে রাজী নহি। জীবজগতে বাঘে-মহিষে বা মাকড়সা-মাছিতে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু বাঘে যদি মহিষ না খায় বা মাকড়সা যদি মাছি না খায় তবে বিপর্যয় ঘটিবে জীবতত্ত্ব হইতে এমন নীতি যাঁহারা সংগ্রহ করেন তাঁহারা জীবতত্ত্বও বোঝেন নাই, অহিংসাও জানেন না। প্রকৃত পক্ষে, যিনি দই খাইয়া মনে করেন তিনি নিরামিষাশী তিনি অহিংসা সম্বন্ধে যে ভুল করেন, জল থাকিবে না বলিয়া কেবলই মাছ ধ্বংস করিয়া যাইব এই ধারণা যিনি রাখেন, তিনিও হিংসা সম্বন্ধে তেমনই ভুল করেন। প্রয়োজনজাত সংস্কারটাই বড় কথা। আতিশয্যটাই এই ক্ষেত্রে হিংসা। কিন্তু বলিয়াছি, এই আতিশয্য উস্কানি দিতে যতদিন অনুরূপ আবহাওয়া থাকিবে ততদিন অহিংসার সম্বাক্য হিতোপদেশেই স্থান পাইবে। হিংসা করিব না বলিয়া বড় জোর আত্মঘাতের পথ সহজ করিয়া দিতে পারি, অহিংসার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইবে না।

# মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

**শ্রীহাসিরাশি দেবী**

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই শারদা দেখলে বেলা হয়েছে; চারিদিকে রৌদ্রে ভরা। তাকিয়ে দেখলে অবিনাশ বিছানায় নেই। ঝি চাকরদের জিজ্ঞাসা করে জানলে এর মধ্যে অবিনাশ উঠে বাইর গেছে, যাবার সময় বলে গেছে শারদার শরীর খারাপ, তাকে যেন ডাকা না হয়। তাই আদুও ডাকে নি সাহস করে।

সকালের রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে শারদা আজ অনেক দিন পরে নিজের পুরনো রং চটা টিনের ভাঙ্গা তোরঙ্গ খুলে একখানা ঝাপসা, অস্পষ্ট ছোট ফটো টেনে বার করলে। সে ফটোয় কোনও আকৃতি আজ দেখা না গেলেও শারদা বারংবার আলোয় অন্ধকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সেইখানাকেই। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। চোখ বুজতেই মনে হল ওই ঝাপসা ফটোটার মধ্যে যেন ধীরে ধীরে অবিনাশের মুখখানাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অবিনাশ! এই অবিনাশ! যে অবিনাশ কথায় কথায় নিষ্ঠুর আঘাত করে, অভিমানকেও অবহেলা করে চলে যায়, সেই অবিনাশ। চোখের জলে আবার চারিদিক ঝাপসা হয়ে এল; এমনি সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল আদু।

আদুর পিঠে ছড়িয়ে পড়া সদ্যস্নানসিক্ত ভিজে চুলের রাশি। সর্বাঙ্গ ঘিরে সাবানের সুগন্ধ, মুখে পাউডার, পরনে ডুরে শাড়ি। শারদার চোখে জল দেখে আদুর চোখেও ফুটে উঠল অপার বিস্ময়, যেমন বিস্ময় ফুটে উঠেছিল অবিনাশের চোখে। কিন্তু আদুকে কোনও প্রশ্ন করতে হল না, শারদাই জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়ি যাবি পুষ্প?"

"বাড়ি?" আদু যেন হাঁপিয়ে উঠলো; "বাড়ি কেন পিসীমা?"

"কিছু নয় রে, মনটা বড্ড খারাপ হয়েছে, তাই আমিও ঘুরে আসতাম দিনকতক।"

"কতদিন পিসীমা?" থেমে থেমে আদু জিজ্ঞাসা করল।

শারদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আদুর মুখের দিকে। সে যেন তার মুখের উপর তার মনের ইচ্ছা প্রতিফলিত দেখতে চায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শারদা বললে; "যদি কিছুদিনই হয়?"

"কিছুদিন! তার পরে?"

"তার পরে আমার তো এখানে ফিরতেই হবে পুষ্প।"

"আর আমি?" এবার খানিকটা দম নিয়ে আদু জিজ্ঞাসা করলে কথাটা। শারদা জবাব দিলে, "মানুষ ভাবে এক, হয় অন্যরকম। আমি যখন তোমাকে এখানে নিয়ে আসি, তখন ভেবেছিলাম, সরোজের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম, তা হয়তো হবে না। তবে তুমি এখানে শুধু শুধু থেকে কি করবে পুষ্প?"

সকালের রঙিন পৃথিবী যেন আদুর চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে উঠছিল। এইবার সে দরজার এক দিকের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল শারদার মুখের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চেয়ে; তার পরে ডাকলে, "পিসীমা—"

"কেন পুষ্প?"

"অনেক মেয়ে তো লেখাপড়া করেও জীবন কাটায়।"

শারদার মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল; কঠিন স্বরে সে বললে, "তা হয় না আদু; তোমায় বিয়ে করে সংসারী হতে হবে, বাড়ি যেতে হবে। তুমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমি আজই তোমায় বাড়ি দিয়ে আসব।"

শারদা বাক্স বন্ধ করে উঠে গেল সে ঘর ছেড়ে, দরজা ধরে আদু তখনও দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ ভাবে। বুঝি সমস্ত পৃথিবী ওর পায়ের নীচে থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

(১২)

ইন্দু বলেছিল, এক এক প্রকৃতির মানুষ আছে সরোজ, যাদের মনের কথা কিছুতেই মুখে ফোটে না; অথচ মনের শক্তি তাদের এমন প্রবল যে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বড়দি সেই রকমের মানুষ। দরিদ্র কুরূপা মেয়েকেও তিনি ঘরে আনতে রাজী, তবু পুষ্পকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করতে উনি ঘৃণা বোধ করেন।

কথাটা বার বার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতে সরোজ ভাবছিল এখন সে কি করবে, কি করা তার কর্তব্য। যে ইচ্ছার উপর নির্ভর করে শারদা আদুকে তার কাছে গান শেখানোর বন্দোবস্ত করেছিল, তার উপর এতদিনকার একটা সন্দেহের পর্দা দুলতে থাকলেও, কাল যে মুহূর্তে শারদা আদুর হাতে মাথাধরার ওষুধ দিয়ে সরোজের কপালে দিতে বলেছিল সেই মুহূর্তেই সে যবনিকা তার সম্মুখ থেকে সে টেনে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এখন তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে শারদার অভিপ্রায়ের নগ্নমূর্তি। কি ভীষণ, কি বীভৎস সে রূপ। নিজের মনেই সরোজ একবার শিউরে উঠল।

হেমন্তের পড়ন্ত বেলা। পাশের বাড়ির ছাদ ডিঙ্গিয়ে খানিকটা রৌদ্র এসে দালানে লুটোপুটি খাচ্ছিল, টবে ফোটা বেল ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল মৃদু হাওয়ার সঙ্গে। নীচের তলা এখন নিস্তব্ধ, হয়তো বাসিন্দারা সব বিশ্রাম করছেন। উপরের তলায়ও কোনও গোলযোগ নেই; ইন্দু ও কাত্যায়নী ঠাকুরবাড়ি গেছে পুজো দিতে। বাড়িতে একা সরোজ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেহের সঙ্গে মনটাও কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে, তাই সে উঠে

বসল বিছানার উপর, হাত বাড়িয়ে একখানা পুরাতন মাসিকপত্র টেনে নিলে সেল্‌ফ থেকে। নীচে—দরজার কড়া নড়ে উঠল এমন সময়; বড় জোরে, বড় তাড়াতাড়ি।

সরোজ নেমে এল, কিন্তু দরজা খুলেই সে চমকে উঠল। একটা উৎকণ্ঠায়, অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে দেখলে, সামনে দাঁড়িয়ে আদু, একা। বিস্মিত কণ্ঠে সরজো প্রশ্ন করলে, "তুমি যে!"

স্থির স্বরে আদু বললে, "হ্যাঁ, আমিই। আমিই এসেছি আজ। আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"কথা? আমার সঙ্গে? সরোজ যেন হাঁপিয়ে উঠল।

আদু বললে, "হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে; উপরে চলুন।"

সরোজ জবাব দিলে, "কিন্তু আমি ছাড়া তো এ বাড়িতে আর কেউ নেই, সব ঠাকুরবাড়ি গেছে।"

ম্লান হাস্যে আদু বললে, "তার জন্যে আপনার তো ভয় পাবার কারণ নেই, আপনি চলুন।"

সরোজের পাশ কাটিয়ে আদু নিজেই উঠে এল উপরের ঘরে; অগত্যা নীচের দরজা বন্ধ করে সরোজকেও এসে প্রবেশ করতে হল সেই ঘরে যে ঘরে আদু তার পরিত্যক্ত বিছানার একপাশে বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সরোজ একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তার কাছে আদুর এই একলা আসা যেন একটা মস্তবড় প্রহেলিকা বলে বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি বল তো পুষ্প, হঠাৎ তোমার এমন অসময়ে এখানে আসবার কারণ?"

আদু উঠে বসেছিল। দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকেই সে হঠাৎ মুখ তুললে; বললে, "আমি পালিয়ে এসেছি।"

"পালিয়ে!" সরোজের সমস্ত কৌতূহল কেমন যেন একটা গভীর আতঙ্কে ভরে উঠল; "পালিয়ে এসেছ? কেন?"

"সে অনেক কথা।"

একটু থেমে থেমে আদু বললে, "পিসীমা আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চায়, হয়তো আর আনবে না।"

"ভালই তো।"

মুখে একটু হাসি টেনে এনে সরোজ বলতে গেল, "পরের বাড়ি থাকার চেয়ে, সে নিজের বাপের বাড়ি, সেখানে থাকা তো ঢের গৌরবের।"

কিন্তু সরোজ এ কথা বলবার আগেই আদু হঠাৎ সরোজের পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল। বললে, "আমি সেখানে যাব না, আমায় আপনারা আপনাদের এইখানে একটু জায়গা দিন, আমি থাকব, আপনাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।"

সরোজ চমকে উঠল আবার, "কেন পুষ্প, সেখানে যেতে তোমার আপত্তি কিসের?"

আদু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বললে, "ওরা আমায় ধরে বেঁধে বিয়ে দেবে।"

সরোজ গম্ভীর হয়ে গেল, নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে গেল নিজের মনেরই ইচ্ছাটাকে এমন সামনাসামনি হঠাৎ বিকৃতরূপে প্রকাশ হতে দেখে; মনে পড়ল আজ সে দিন-দুই আগে ইন্দুর সম্মুখে দৃঢ়স্বরে জানিয়েছিল, "বিয়ে যদি করতে হয় তবে পুষ্পকেই বিয়ে করবে, নচেৎ সে বিবাহিত হবে না।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিন্তু মার উপরে তার কর্তব্য!"

এ কথার উত্তর সে দিতে পারে নি, ইন্দুর কাছেও না নিজের মনের কাছেও নয়।

জানে, মা তাকে বড় আশা, বড় ভরসা করেই মানুষ করেছিলেন—কিন্তু সে তার প্রতিদান দিতে পারবে না—; সে ক্ষমতা তার নেই! এখনও সে কোনও কথা খুঁজে পেলে না, নীরবে সে আদুর দিকে তাকিয়ে রইল; দেখলে, কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

সরোজ ডাকলে, "আদু!"

আদু মুখ তুললে। সজল চোখে ওর আত্মনিবেদনের ভাষা মূর্ত হয়ে উঠেছে, মুখে অসহায়তার কাতর মিনতি।

সরোজ বললে, "তাঁদের কথায় বিয়ে করতে বুঝি তোমার মত নেই?"

আদু মাথা নেড়ে জানালে, "না।"

"কিন্তু, কেন?"

আদু কোনও উত্তর দিলে না, কেবল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সরোজ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে; তার পরে ডাকল, "আদু!"

পূর্ব পরিচিত নাম; কিন্তু এ নামে সরোজ তাকে কোনওদিন ডাকে নি বলেই আদু চমকে উঠল।

সরোজ বললে, "আমি হয়তো তোমায় বিয়ে করতে পারতুম; এমন কি তুমি কোন ঘর, কোন বংশ থেকে এসেছো, কোন শিক্ষায় শিক্ষিত, সে সব আমার কিছুই মাপ করে দেখবার দরকার হত না, কিন্তু যদি আমার মার মত থাকত!"

আদু কোনও উত্তর দিলে না একথার—।

সরোজ আবার বলে চলল, "আরও একটা কথা! আমার আগে বা পরে, আমাকে ছেড়েও মার যদি আর একটাও কোনও আশ্রয়স্থল থাকত, তাহলেও হয়ত তোমায় আমি এমন করে ফিরিয়ে দিতুম না, কিন্তু আজ আমাকে পারতেই হবে, তা সে যত কষ্টকর, আর যত বেদনাময়ই হোক। কিন্তু এইটুকু তুমি জেনো—এ আঘাত আমি তোমায় দিচ্ছি শুধু তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে, আমার নয়।" সরোজের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

আদু ধরা গলায়, অভিমানাহত কণ্ঠে বললে, "চমৎকার জবাব। কিন্তু আমিও ত জোর করে কিছু চাচ্ছি না, শুধু চাচ্ছি আপনাদের এই আশ্রয়ের একপাশে একটুখানি জায়গা নিয়ে পড়ে থাকতে; ঝি চাকরেও ত থাকে, আমিও না হয় সেই রকম হয়েই থাকব!"

দৃঢ়স্বরে সরোজ বললে, "তা হয় না।"

"কেন হয় না?"

সে অনেক কথা; তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না সে সব।"

আদু এবার শক্ত হয়ে উঠল, "এইই যদি আগের থেকে

জেনেছিলেন, তবে গান শেখাবার অছিলায় মনের মধ্যে এই আশার ইঙ্গিত জাগিয়েছিলেন কেন? কেন এই স্পর্ধা বাড়াবার সময় দিয়েছিলেন আমাকে? কেন?................ কেন?.........আদ্দু আবার কেঁদে ফেললে আকুল হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে। আজ যেন তার সমস্ত জীবনটাকে সে এই কান্নার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায়, ভাসিয়ে দিতে চায় সরোজের সম্মুখে।

সরোজ কিন্তু অটল। ওর মুখে চোখে কোথাও এতটুকু চঞ্চলতার ছায়া নাই, আছে পরম সান্ত্বনার ভাষা। ধীরে ধীরে ও আদ্দুর মাথাটা টেনে নিলে নিজের কোলের উপর; বললে, "সব সময়ে ছেলেমানুষী কারো পক্ষেই শোভা পায় না আদ্দু। চল, তোমায় বাড়ি রেখে আসি।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আদ্দু সোজা হয়ে উঠে বসল, "থাক, এতটুকু দয়ার আর আপনার দরকার নেই; আমি একা এসেছি, একাই যেতে জানি।" উঠে সে দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল ত্বরিতপায়ে।

সরোজ উঠে যেতে চেষ্টা করল তার অনুশরণ করে, কিন্তু পারল না; মনে হল কে যেন ওর পা দুখানায় লোহার বেড়ী পরিয়ে দিয়েছে। একবার শুধু ডাকলে, "পুষ্প" সে কণ্ঠস্বর ঘরময় ঘুরে ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিশে গেল, আদ্দুর কানেও পেঁছাল না।

ঘণ্টা কয়েক পরে সরোজ এসে উপস্থিত হল শারদার বাড়ি; শুনল আদ্দু বাড়ি নেই, কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না।

শারদা ম্লান মুখে বসেছিল মাথায় হাত দিয়ে; সরোজকে দেখে বললে, "দুধ কলা দিয়ে লোকে কালসাপ পোষে কেন জান সরোজ, নিজের মন্দ করতে। আমিও দুধকলা দিয়ে আদ্দুকে কালসাপ পুষেছিলাম, ভেবেছিলাম, গ্রামে থেকে একেবারে জংলী হয়ে আছে, একটু শহরের হালচাল শিখুক; কিন্তু সে আমার এমন অবস্থা করে গেল, যার জবাবদিহি করবার পথ আমার আর রইল না।"

মনের ব্যর্থ আশার কথা বলতে গিয়েও শারদা যেমন চেপে গেল, তেমনি সরোজও বলতে পারলে না যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আদ্দু তারই ওখানে গিয়েছিল, সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায়, কিন্তু সে আশ্রয়টুকু সে তো দেয়ই নি, উপরন্তু বাধাও দেয় নি তার একলা পথে বার হওয়ায়।

এর জন্যে দায়ী হয়ত একলা সেই, শারদা নয়, এমন কি যে চলে গেছে সেই আদ্দুও নয়; মুহূর্তের জন্য সরোজের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কিছুক্ষণ আগে বিদায় দেওয়া আদ্দুর সেই বেদনাকাতর মুখ, সেই সজল চোখের কাতর মিনতি; সে গিয়েছিল নিজেকে সমর্পণ করতে, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে সরোজেরই কাছে, কিন্তু সরোজ তার সে দান গ্রহণ করে নি, ফিরিয়ে দিয়েছে; বদলে দিয়েছে অবহেলার কঠিন আঘাত।

শারদার দৃষ্টিও যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল; সরোজ সেখানে দাঁড়াতে পারল না, অস্থির মন নিয়ে সে বার হয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে; পথে বার হয়ে দেখল অবিনাশের গাড়ী গেটের মধ্যে প্রবেশ করছে।

বিপরীত দিক থেকে তার মুখ দেখা গেল; সরোজ দেখলে সে মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।

সরোজ আর সেদিকে তাকাল না, তাড়াতাড়ি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে এসে একটা খোলা জায়গায় বসে পড়ল; মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল সন্ধ্যার অন্ধকার! তার নিচে কি একটা পাতাবাহার গাছের ছায়া, হাওয়ায় দুলে দুলে খেলা করছিল; পাশে বসে সরোজ।

অদূরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, পথও জনকোলাহল পূর্ণ, কিন্তু তার চোখের সম্মুখে যেন সবই ধীরে ধীরে লেপে মুছে একাকার হয়ে যেতে চায়! অসীম শূন্যে মিশে যেতে চায় সমস্ত।

সরোজ চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ,—কতক্ষণ, সে তা জানে না; যখন বাড়ি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, তখন রাজপথ হয়ে এসেছে জনবিরল, প্রায় নিস্তব্ধ!

বাড়ি যাবার জন্য অগ্রসর হয়ে সরোজ অনুভব করল, আজ যেন তার সমস্ত বুকখানা বড় হাল্কা, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে; যে দুর্বলতা বয়ে বেড়ান তার পক্ষে বড় কষ্টকর, তবু এছাড়া উপায়ও নাই।

বাড়ি ফিরে সে দেখল কাত্যায়নী আর ইন্দু এর মধ্যে কখন বাড়ি ফিরেছে, দুজনেই বসে আছে তার খাবার আগলে, ফিরবার পথ চেয়ে! মুখে চোখে তাদের অন্তরের উৎকণ্ঠা সুস্পষ্ট; সরোজকে ফিরতে দেখে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কাত্যায়নী থেমে গেলেন; প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে সরোজ?"—

শুষ্কস্বরে সরোজ জবাব দিল, "কৈ, কিছু না-ত!"

"তবে.........!"

সচকিতে সরোজ উত্তর দিল, "ও, শরীরটা তেমন ভাল নেই, কিছু খাব না।"

ধীরে ধীরে এসে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল; এই বিছানায় আদ্দুও কিছুক্ষণ আগে শুয়ে গেছে, বালিশে এখনও তারই চুলের গন্ধ মাখামাখি!

সরোজ চুপ করে শুয়ে রইল বালিশে মাথা রেখে। কখন যে চোখের দুই কোণ বেয়ে দুফোঁটা জল ঝরে পড়ল, তা সে জানতেও পারলে না।

( ক্রমশ )

# বৃহত্তর নিউইয়র্ক

ভ্রমণ কাহিনী—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

"দেশ বিদেশের নানা রকমের প্রচারকার্য এখানে অনবরতই চলছে, ছাত্র ছাত্রীর দল সেই প্রচারকার্যের ছোটবড় নানা আকারের বই, দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আপন অর্থের সৎ-ব্যবহার করার জন্য তাই কিনছে এবং মন দিয়ে তাই পাঠ করছে। ছাত্রের দল অনেক সময় ভিড় করে তাদের পাঁচ সেণ্টের কেনা প্রপাগাণ্ডার ছোটবড় বইএর রিভিউ করছে। অনেকেই বলছে, এই যে রাশি রাশি সংবাদপত্র এবং বই কিনছি, তার ফলে আমাদের অনেকের মাথা খারাপ হচ্ছে, অনেকে বিপথগামী হচ্ছে, তার প্রতি-কার কেউ করছে না, সকলেই বলছে ডিমক্রেসী বিপদে পড়েছে। অনেক ছাত্র আবার বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরীক্ষা পাশের পর তাদের কি গতি হবে। কাজ পাবে না, অথচ কাজের খোঁজে ঘুরে মরবে। কারণ কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত চাকরী খোঁজার অভ্যাসটাই তাদের ঘুরিয়ে মারে; অবশেষে নিরাশ হয়ে যক্ষ্মালয়ে আশ্রয় নিতে
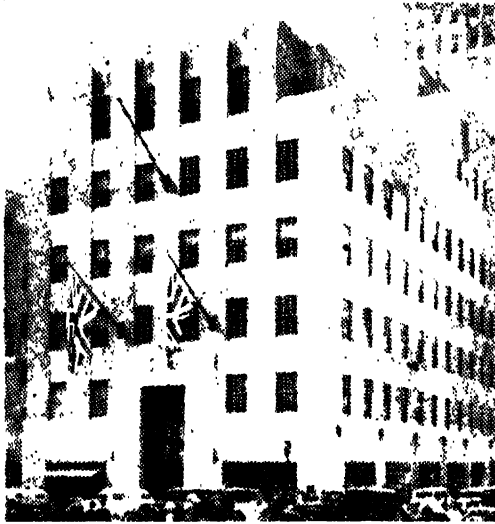
নিউইয়র্কের ফিফ্‌টিয়েথ স্ট্রীট এবং ফিফ্‌থ এভিনিউর মোড়ে বৃটিশ এম্পায়ার বিল্ডিং

হয়। আর যাদের চাকুরী জুটে যায় তাদের দুর্দশার দৃষ্টান্ত দেখা যায় নিউ ইয়র্কের বিয়াল্লিশ নম্বর স্ট্রীটে। অকালেই বার্ধক্য এসে তাদের জরাজীর্ণ করে ফেলে। কিন্তু এর দায়িত্ব কারো উপর চাপাবার উপায় নেই, কারণ বাইবেলে লেখা আছে 'যে সয় সে বয়'। কিন্তু কি যে সহ্য করতে হবে, কিসের জন্য সহ্য করতে হবে; সেই কথা বাইবেল কেন কোন ধর্মগ্রন্থেই বলে দেয় নি।" এই বলে একজন ছাত্র তার বক্তৃতা সমাপ্ত করে আমারই পাশে এসে বসল।

বেলা তখন এগারোটা। সূর্য সবে মাত্র অস্ত গিয়েছে। রাস্তার বাতিগুলি এইমাত্র জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। গৃহাভ্যন্তরের বাতিগুলি বহু পূর্বেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই আলোয় বক্তারা ছোট্ট চিরকুটে লিখিত পয়েণ্ট দেখে বক্তৃতার স্রোত বইয়ে দিতে লাগলেন যেন প্রত্যেকেই জর্জ ওয়াসিংটন আর লিনকনএর মতই নিজেদের কথা বলে যাচ্ছেন। কথার পরে কথার মালা গেঁথে শ্রোতাদের উপহার দেওয়া হলো প্রচুর, তার ফল যে কিছু হয়েছিল তা অন্তত আমার জানা নেই; তবে দিন মজুরদের জীবন যাতে এত সহজেই নির্বাপিত না হয় সেই মঙ্গল কামনা করেই স্বইচ্ছায় অনেকেই কিছু কিছু দান করলেন। উপসংহারে বলা হলো, 'জগতের মানুষ, তোমরা সকলেই মজুর, এই মজুরদের মুখপাত্র 'দৈনিক মজুর'কে সাহায্য করে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দৈনিক মজুর আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা পৃথিবীতে প্রচার করুক, পৃথিবীর লোক জানুক—মজুরও মানুষ তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে, তার মুখের গ্রাস যারা দাগাবাজী করে কেড়ে নেয়, তাদের বিরুদ্ধে বলবার মত শক্তি যে সংবাদ-পত্র রাখে, সেই সংবাদপত্র আমাদের। আমরা সেই সংবাদপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করব। এস বন্ধুগণ আপন আপন পকেট খালি করে দিই।' এই আবেদনের পর অনেকে হয়ত দিয়েছিল, দেবার কথাও। আমেরিকার ছাত্রদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে তারা বাপের টাকা অথবা শ্বশুরের টাকা খরচ করে কলেজে পড়ে না। নিজেরা গতর খাটিয়ে যে অর্থ উপার্জন করে তাই দিয়েই তাদের শিক্ষার খরচ চালায় সেই জন্যেই অন্যায়কে তারা অত সহজে সহ্য করতে শেখেনি।

আমেরিকা ধনীর দেশ বলেই আমরা জানি। কিন্তু সেই ধন ঐশ্বর্যর মধ্যেও দরিদ্রের আর্তনাদ শোনা যায়। 'কুলিউক আয়র্লণ্ড' 'ওয়ার্লড ফেয়ার', রঙ্গমঞ্চ, মিউজিয়ম এসবের আকর্ষণ আমাকে বিপথগামী করে তুলতে পারেনি। আমার যারা সঙ্গী জুটেছিল তারা আমাকে এসব জায়গায় নিয়ে যেত না। তারা আমাকে Bread Line দেখাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল বাইশ নম্বর স্ট্রীটে।

বাইশ নম্বর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে অনেক লোক থাকে। কত লোক থাকে তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। আমি ভারতীয় পর্যটক, হাতে পেন্সিল এবং খাতা দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল। নোট লিখতাম নিজের ভাষায়। তাই আমার লিখবার ধরণটি দেখবার জন্যে চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোক সংখ্যা সম্বন্ধে কারোর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আন্দাজে ধরে নিলাম, ছয়'শ লোক তাতে বাস করে। এদের খাদ্য, বাসস্থান, এ সব দেখবার কৌতূহল বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। একমাত্র কারণ হাতে পেন্সিল এবং খাতা আর সঙ্গের কয়েকজন লোক। কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসলাম। দুদিন পর খাতা পেন্সিল না নিয়ে, টুপিটা বেশ করে চাপিয়ে আমেরিকান ধরণের কথা বলে কয়েকটা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিলাম। তারা বুঝল আমি নিগ্রো। নিগ্রোকে ভয় করবার কিছুই নেই, তাই আমার প্রশ্ন-গুলিকে তারা আর এড়িয়ে গেল না।

বাড়িটাতে বেশ ভাল করে টহল দিলাম। একজনের কাছ হতে একটু কাফি চেয়ে খেলাম, দেখলাম তাতে দুধের ও চিনির

এত অল্পতা যে এ দুটোর অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। খাদ্যও সেই রকমেরই। শোবার যায়গা জেলের কয়েদীদের চেয়েও খারাপ। অবশ্য মনে রাখতে হবে আমেরিকান জেল। Rest Roomগুলি তার চেয়েও অধম। ঐ না ওয়াল্স স্ট্রীট, ঐ না পঞ্চম এভেনিউ, কিন্তু কি শহরের বাইরে? এদের মাঝে কি সভ্যতার আলো পেঁছায় নি? কেন এদের এমন অবস্থা? এরা কি জেল হতে ফিরে এসেছে? এদের বার্ধক্যের পেন্সন দেওয়া হয় না কেন? আমাকে যারা পথ দেখাত, লেকচারের বন্দোবস্ত করে দিত, তারাও এসবের সংবাদ রাখত না। তাদের সে সংবাদ পাবার বোধ হয় সুবিধা হয় নি। আমার কিন্তু হয়েছিল। আমি ওদের মাঝেই দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা বলল, "তারা Builder", বিল্ডার মানে বাড়ি তৈরী করবার মজুর। সমাজের কাজে ওদের কোন প্রয়োজন আছে কি না, তা বুঝবার উপায় নেই, কারণ ওদের কাজের কোন তালিকা দেওয়া হয় নি। এজন্যই এরা পেন্সন পাচ্ছে না। অথচ আমেরিকায় গম পুড়িয়ে দেওয়া হয়, চিনি নষ্ট করে ফেলা হয়, বাগানের ফল বাগানে পচে তবুও কাউকে খেতে দেওয়া হয় না। এ রকম মজার দেশ আর কোথায় আছে?

রেভারেণ্ড কার্ফলিন আমেরিকার একদিক হতে অপরদিক পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে নানারূপে কর্মতালিকা সর্বসাধারণের সামনে হাজির করেছেন। কর্মতালিকার প্রধান বিষয় হচ্ছে কমিউনিস্ট নিপাত করা, ইহুদীদের নির্মূল করা এই দুটিই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। ইহুদী নিপাত করার একমাত্র কারণ, ইহুদী ভীত এবং অপদার্থ। নিলামে জিনিসপত্র বিক্রয়ের এক দোকানে দেখলাম, যে লোকটি নিলাম ডাকছিল ক্রেতার দল তার প্রতি নানারূপে মুখভঙ্গি করে নানা কথা বলছিল। অবশেষে দোকানী রাগ করে বলল, "ভাববেন না আমি ইহুদী, আমি যা, রেভারেণ্ড কার্ফলিনও তাই।" আশ্চর্যের বিষয়, একথা বলার পরই ক্রেতারা নির্বিবাদে জিনিস কেনায় মনোনিবেশ করল। দরিদ্র এবং ধনী ইহুদীদের প্রতি খৃষ্টানদের যেন একটা আক্রোশ রয়েছে, অথচ ইহুদীর মত অন্য যে সকল খৃস্টান খৃস্টানদেরই রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না।

আমেরিকার কমিউনিস্টরা নিতান্তই নিরীহ জীব। এরা চায় নিগ্রোদেরও শ্বেতকায়দের মত সমান অধিকার দিতে। যারা কাজ না পেয়ে শুকিয়ে মরছে তাদের অন্নের সংস্থান করতে। এদের মাঝে আরও কত কি মত আছে তা আমি জানি না; তবে এরা অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের তুলনায় অত্যন্ত ভালমানুষ। এককথায় বলব এরা সর্বসাধারণের উন্নতি চায়। এরা না খেয়ে মরতে রাজি, তবুও নিজের শ্রম অন্যের কাছে, অপরকে হয়রাণ করার জন্য বিক্রি করতে রাজি হয় না। অনেকে এইজন্যে কাজ করবার "কার্ড" হারিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে এদের কিছুমাত্র ভাবনা নেই। এদের প্রভাব ছাত্রসমাজে এমনিভাবে পড়েছে যে আজকাল প্রপাগাণ্ডা করবার জন্য যুবকযুবতিদের অর্থব্যয় করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমেরিকার Student Federation বলে দিয়েছে, রুজভেল্ট হও, হুভার হও, তোমাদের সঙ্গে আমরা নেই। আমাদের উদ্দেশ্য নূতন, পুরাতনকে আমরা আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পারব না।

যখন ছাত্র এবং ছাত্রীরা অবৈতনিক সরকারী স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে' বের হয়, তখন দেখতে পায় তাদের সামনে এক বিরাট অন্ধকার। বাবা মার উপর আর নির্ভর করা যায় না, এদিকে আবার চাকরীর অন্বেষণে পায়ের পাদুকার অভাব হয়। আমেরিকার ভালমন্দ দুটি পথই প্রশস্ত, ধনী লোক নূতন যুবক যুবতীর দিকে আবার অনেক সময় নেকনজরে তাকান এবং নরকের পথে পেঁছিয়ে দেন। বাইরে এসে ফাদার ডিভাইন আর ফাদার কার্ফলিনের মত ভগবানকে ধন্যবাদ দেন। যে সকল ছাত্র বর্ত্তমানে Student Federationএ কাজ করে এবং চালায় তাদের পূর্বজীবন অনেকটা সেরূপই ছিল। যখন এসব ছাত্র এবং ছাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনের কথা লোকসমক্ষে বলে তখন লজ্জা ব'লে অনুভূতি যাদের আছে, তারা একের মুখ অন্যে দেখে না। কথাটা এখানে আর বাড়িয়ে বলা দরকার নেই, এ সম্বন্ধে যদি এর চেয়েও বেশি কিছু কেউ জানতে চান, তবে সানফ্রান্সিস্কো হ'তে প্রকাশিত People World পাঠ করলেই জানতে পারবেন আমেরিকার বুকের উপর ধনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী।

নিউইয়র্কএর মত সুন্দর নগরী এ জীবনে দ্বিতীয়টি দেখি নাই। লোকে পারীর কথা বলে থাকে, কিন্তু পারী নিউ-ইয়র্কের কাছে কিছুই নয় সৌন্দর্যের হিসাবে, আরামের হিসাবে তবুও পারীর নাম প্রচুর রয়েছে। তার একমাত্র কারণ আমাদের দেশের হোমরাচোমরারা হয়ত ভ্রমণ করতে ক্লান্তি অনুভব করেন, নয়ত নিউইয়র্কএর লোকের আচার ব্যবহার পছন্দ করেন না। পারীতে টাকার অভাব লেগেই আছে, নিউইয়র্কে টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু সে টাকা শুধু ধনীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। দরিদ্রের টাকার প্রতি অধিকার বিস্তার করবার সুযোগ সুবিধা নাই। তাই নিউইয়র্ক টাকায় ভর্ত্তি হয়েও দারিদ্র্যে পূর্ণ।

নিউইয়র্ক লণ্ডন হতেও আয়তনে বড়। এই শহরের সকল কথা যদি জানতে হয় এবং দেখে তা উপলব্ধি করতে হয় তবে অন্তত ছয়টি মাস ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানো দরকার। আমার সেই সুযোগ হয় নি। তবে একথা বলতে পারি, সাইকেলে, পায়ে, এলিভেটরে, বাসে এবং সাবওয়ের মারফতে আমি যেভাবে ভ্রমণ করেছি তেমনটি সকলে ভ্রমণ করতে পারে না। এই এত ছুটো-ছুটি করে বুঝতে পেরেছি, দারিদ্র্য কোথা থেকে এসেছে। পাদরী বলছেন মদ খেয়োনা, অথচ মদের দোকান রাত্রদিন চব্বিশ ঘণ্টা খুলে রাখবার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেরূপভাবে যুবক যুবতীদের নানা উপদেশ দেওয়া হয়, অথচ সেই উপদেশের পরিবর্তে তাদের ধ্বংসের পথ এত ব্যাপকভাবে খুলে রাখা হয়েছে যে ওরা অনিচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন প্রতিকার নাই? আছে, তবে যাদের উপর বিপদ আসে তারা নিজেরাই বাঁচবার উপায় করে নিচ্ছে। যদি আমেরিকায় conscription হয়, তবে সাগরের ওপার থেকে নূতন ভাবের নূতন সংবাদ শুনব। কারণ আমেরিকার যুবক যুবতীরা অন্য ধরণের, তারা প্রতিশোধ নিশ্চয়ই নেবে বলে মনে হয়। (ক্রমশ)

# পাগল

( গল্প )

শ্রীফনীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ঘুঘুডাঙ্গার এক মার্চেন্ট অফিসে কেরানীগিরি করি। পলাশপোল হইতে সকাল আটটার গাড়িতে অফিস করিতে যাই আর ফিরিয়া আসি সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত। রেলের গাড়িতে পলাশপোল হইতে ঘুঘুডাঙ্গা দুই ঘণ্টার পথ।

শীতের সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি নামিয়া আসে। সাড়ে পাঁচটায় অফিস হইতে বাহির হইয়া আজ আবার একটু বাজার করিতে হইয়াছে। কাল ইন্দুর ভাইএর বিবাহ। একটা ভাল কাপড় না হইলে কাল হয়তো বেচারীর বিবাহে যাওয়া হইবে না। অবস্থা খারাপ বলিয়া তো আর খালি হাতেও পাঠাইতে পারি না, সুতরাং ভাইএর স্ত্রীর জন্য একটা সস্তা গহনাও কিনিতে হইয়াছে।

গাড়িতে উঠিয়া র‍্যাপারটি ভাল করিয়া জড়াইয়া চির-পরিচিত কোণটিতে বেশ আরাম করিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। গাড়ির ভিতর এই দুই ঘণ্টাই আমাদের অফুরন্ত অবসর। দিনের আরম্ভ হইতেই এই সময়টির জন্য লুব্ধ চিত্তে আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি।

বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলাম। হঠাৎ একটি মৃদু-স্পর্শে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি ঠিক আমারই পাশে বসিয়া একটি অদ্ভুত চেহারার বৃদ্ধ আমার কাঁধের উপর তাহার শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া দিয়া মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া তাহার হাতখানি সরাইয়া দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলাম।

লোকটি কিন্তু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "কান্না কেনরে, কিসের জন্যে বুক চাপড়ানো? আমি তো আর মেয়েমানুষ নই, কাঁদব কেন, অ্যাঁ? হোয়াই শুড আই?"

এমন দুই একটি পাগলের সহিত গাড়ির মধ্যে প্রায়ই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। ছেলেবেলা হইতে পাগল সম্বন্ধে আমার অসীম কৌতূহল। লোকটির অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধ বলিল, "গাড়ি চাপা না ঘোড়ার ডিম! আর যদি ম'রেই থাকে, তাতে তোদের কি! মরেছে, বেশ হয়েছে, আর কোনও চিন্তা নেই।"

বৃদ্ধ তাহার হাত দুইটি শূন্যে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকল চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে একটু থামিয়া আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "দেখ কাউকে ব'লো না যেন। সময় সময় এমন ক'রে চুপ ক'রে থাকতে আমিও পারি না। মাঝে মাঝে এই-খানটায়—"

বৃদ্ধ ইশারায় তাহার নিজের বুকটা দেখাইয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; বলিল, "কিন্তু চোখের জল আমি ফেলি না। হোয়াই শুড আই, অ্যাঁ?"

দুই চোখ দিয়া তখন বৃদ্ধের শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। বুঝিলাম কোনও প্রিয়জনের মৃত্যুতে বৃদ্ধ বড় আঘাত পাইয়াছে। তাহাকে ঠিক যেন পাগল বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। সমবেদনায় তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কেউ মারা গেছে বুঝি?"

বৃদ্ধ যেন হুংকার দিয়া উঠিল,—"চোপরও, চুপ! মারা গেছে, মারা গেছে, কেবল ওই এক কথা! বেঁচে থাকবার কথা কি একটুও মনে পড়ে না?"

তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, "আহা মরবে কেন, বেঁচে থাকুক।"

বৃদ্ধ হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "রাইট ইউ আর। তুমি বড় ভাল ছেলে, আমার প্রতুলের মত ভাল। তোমাকে সব বলব।"

তাহার হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "আমি সবই শুনব।"

বৃদ্ধ বলিল, "পোড়াদার নাম শুনেছ?"

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম।

বৃদ্ধ বলিল, "সেখানকার স্কুলে মাস্টারি করি। সংসারে আমরা দুই বুড়োবুড়ী, ছেলে প্রতুল কলেজে পড়ে, আর আছে মালতী। মালতীকে চেন তো?"

বলিলাম, "মেয়ে বুঝি?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "আমার মা, প্রতুলের বউ, বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে।"

একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিল, "পনের বছরের চাকরির হঠাৎ এক দিনের মধ্যে জবাব হয়ে গেল। বুড়ো মাস্টার দিয়ে নাকি আর কাজ চলবে না। সংসারে একা রোজগার করি, চোখে অন্ধকার দেখলাম। চুপ ক'রে বাড়িতে ফিরে এলাম, কাউকে কিছু বললাম না। কিন্তু ছেলের কাছে কিছুই গোপন থাকল না। আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সে বললে, "তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি।" বিশ বছরের ছেলে রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে অন্ধকার পথে একা বেরিয়ে গেল, কারও কথা শুনল না।"

তাহার হাতটা নাড়া দিয়ে ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তারপর?"

হঠাৎ বৃদ্ধ খেঁকাইয়া উঠিয়া বলিল, "তার পরের কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে না? স্বার্থপর কোথাকার! তার পর না খেয়ে খেয়ে দুই বুড়োবুড়ী আর ওই কচি মেয়েটা মরবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেম।"

একটু পরে বৃদ্ধ আবার উল্লসিত হইয়া বলিল, "কিন্তু দুমাস পরে আর আমাদের দুঃখ রইল না। প্রতুল কলকাতায় এক ওষুধের দোকানে চাকরি পেল। মাঝে মাঝে চিঠিও

আসে, টাকাও আসে। হেঃ হেঃ হেঃ, কত আশা যে সেদিন হয়েছিল।"

একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ভ করিল, চাকরির সংবাদ পেয়ে সবার চাইতে আনন্দ হ'ল আমার মালতী মায়ের। ঘরে ফিরে সে যেন নেচে বেড়াতে লাগল। আমাকে এসে প্রশ্ন করত, 'আচ্ছা বাবা, ও চাকরিতে উন্নতি নেই? মাইনে বাড়ে না?' আমি বলতাম, 'বাড়ে বই কি, প্রতুলের মত ভাল ক'রে কাজ কি সবাই করতে পারে!'

"আমার কথা শুনে মেয়েটার চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বলত, 'মাইনে বাড়লে আমরা আর এখানে থাকব না। এখানকার ঘর দিয়ে জল পড়ে, মায়ের বাতের ব্যথা আজও কমল না, আর আপনার কাশি, সর্দি লেগেই আছে। তার চাইতে কলকাতার সেই ওসুদের দোকানের পাশেই দুটো ছোট ঘর ভাড়া নিলে কারও কোনও কষ্ট থাকবে না; তাই না বাবা?'

"আমি বলতাম, 'হ্যাঁ, বেশ হবে। আর তা ছাড়া ছেলে মেয়ে পড়িয়ে আমি কি দুটো একটা টাকাও আনতে পারব না।'

"আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে শাসনের সুরে মালতী বলত, 'উহু ওইটি হবে না। চুপ ক'রে থাকতে না ভাল লাগে, ঘরে ব'সে রামায়ণ মহাভারত পড়বেন। সকালে বিকালে একটু বেড়াবেন, কিন্তু দুপুরে আর রাতে টুঁ শব্দটি আর করতে পারবেন না ব'লে দিচ্ছি।' তার কথা বলবার ধরন দেখে আমরা হেসে উঠতাম।

"সন্ধ্যার সময় ব'সে ব'সে ঘুমের ঘোরে ঢুলছি, মালতী দৌড়ে এসে বলত, 'বুঝলেন বাবা, মা বলছেন, দুটো ঘরের একটায় রান্না করলে আবার অসুবিধে; ঘরের পাশে ছোট্ট একটা বরান্দা থাকলে কিন্তু বড্ড ভাল হয়।'

"মালতী এলে আমার ঘুম ছুটে যেত। ওর সঙ্গে অমন ক'রে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে আমারও ভাল লাগত। বলতাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চৌবাচ্ছা, কল, পায়খানা তারও দরকার, সব দেখেশুনে নিতে হবে বই কি।"

"এমন ক'রে কয়েক মাস কেটে গেল। প্রতুল সেই যে বাড়ি থেকে গিয়েছে আর আসেনি। কত চিঠি দিয়েছি, আর লিখেছে যে, যুদ্ধের বাজার, ওষুধ হু হু ক'রে কাটছে, এমন সময় ম্যানেজার ছেড়ে দিতে পারে না। এক ফোঁটা মেয়ে ওই মালতী মুখ বুজে প'ড়ে রইল, কথাটি বললে না।

"কিন্তু বুড়ীটা আর পারলে না; একদিন এসে আমায় বললে, 'ওগো তুমি একবার কলকাতায় গিয়ে ওকে দেখে এস। আর এ পোড়া যুদ্ধেরও কি আর শেষ নেই? একটা দিনের জন্যে বাড়ি এলে কি সব রসাতলে যাবে নাকি?'

"তার কথা শুনে মালতী হেসে উঠে বলত, 'কিন্তু মা যুদ্ধের শেষ হ'লে তো ম্যানেজারের আর শেষ হবে না, যুদ্ধের চাইতে ম্যানেজারটাই খারাপ।'

"মালতীর কথা শুনে আমরা হেসে উঠতাম। ছেলেটাকে অনেক দিন দেখিনি, মনটা আমারও খাঁ খাঁ করত। বুড়ীর কথা শুনে বললাম, 'সেই ভাল, কালই আমি রওনা হব। দেখি ব'লে কয়ে ছেলেটাকে সঙ্গে আনতে পারি কি না।'

"কলকাতায় রওনা হবার আগে বুড়ী একটা পুঁটুলি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'কি জানি কাজের ভিড়ে আবার যদি না আসতে পারে। দুটো পিঠে ভেজে দিলাম। পিঠে পেলে ছেলে আমার আর কিছুই চায় না।'

"দুর্গা দুর্গা ব'লে পুঁটুলিটা হাতে ক'রে বেড়িয়ে পড়লাম। সদর পেরিয়ে পিছন ফিরে দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে মালতী। বললাম, 'আমায় কিছু বলবে মা?'

"মাথা নেড়ে সলজ্জভাবে বললে, 'না।'

"খানিক দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি মালতী পিছন পিছন আসছে। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'ওকে কোনও চিঠি দেবে? দাও না লজ্জা কিসের।'

"লজ্জায় মুখটা ওর লাল হয়ে উঠল। আমার হাতের মধ্যে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'পৌঁছেই একটা চিঠি দেবেন, দেরি করবেন না।' বললাম, 'দেব বইকি, নিশ্চয়ই দেব'।"

ইহার পর বৃদ্ধ আর কিছু বলিল না, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। এমন অবস্থায় তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতেও আমার সাহস হইল না।

হঠাৎ বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। শূন্যে হাত ছুঁড়িয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আর যতসব জুয়াচোরের আড্ডা হয়েছে এই কলকাতা শহরে। স্বার্থ-পরেরা পরের ছেলের ভাল দেখতে পারে না। ওর মেসে যেয়ে সবাইকে হাত পায়ে ধরে কত সাধ্যসাধনা করলুম, কেউ একটি কথারও জবাব দিলে না। শেষে গেলাম সেই ওষুধের দোকানে। তারা কি বললে জান?"

বলিলাম, "কি?"

বৃদ্ধ আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "ওষুধ ফেরি করতে গিয়ে নাকি ট্রেন কলিসনে মারা পড়েছে।"

প্রতিটি কথা বৃদ্ধ স্পষ্ট করিয়া বলিল। অস্বস্তিতে আমি আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিও কি এই গাঁজাখুরী সংবাদ বিশ্বাস করলে নাকি?"

কলের পুতুলের মত বলিলাম, "না, না।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। খাসা ছেলে। আরে, সবাই কি আর রেলের গাড়ি চেপে ওষুধ ফেরি করতে যায়? আর ধর যদি কলিসনই হ'য়ে থাকে তাতে কি আর গাড়ি সমেত সবাই মারা পড়ে নাকি!"

বলিলাম, "তাতো বটেই।"

বৃদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল, "দেখ তো, এতটুকু বুদ্ধি যদি ওদের থাকত! যুদ্ধের বাজার, হু হু ক'রে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। হয়তো কোথায় কোনও দূরের গ্রামে গিয়ে পড়েছে। কাজের ভিড়, তায় হয়তো কাছেপিটে নেই পোষ্ট অফিস। দুদিন খবর দিতে পারল না ব'লেই সে গাড়ি চাপা পড়ল? শয়তান, সব শয়তান!"

বৃদ্ধ হুংকার দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে স্তোক বাক্য দিয়া শান্ত করিলাম। প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, বাড়ি ছেড়ে কতদিন আপনি এসেছেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "তা এক মাস হবে।"

বলিলাম, "এর মধ্যে ওদের কাছে কোনও চিঠিপত্র আপনি দেননি?"

বৃদ্ধ বলিল, "হুঁ, দিয়েছি। কি লিখেছি জান? লিখেছি, "মালতী মা, প্রতুল ভাল আছে, আমি ভাল আছি। ম্যানেজার প্রতুলকে খুব ভালবাসে। যুদ্ধের বাজার, জলের মত হু হু করে ওষুধ বিক্রী হচ্ছে। সাহেব ওকে দূরের এক গ্রামে পাঠিয়েছে, সেখান থেকে পলাশ পোলে চিঠি পৌঁছয় না; তোমাদের কাছে চিঠি সে জন্যে সে লিখতে পারে না, সেজন্য দুঃখ করো না মা! আমি তো রোজ খবর পাচ্ছি। আর ওষুধের দোকানের পাশে চমৎকার বাড়ি পাওয়া গেছে। পূব খোলা, হু হু করে বাতাস আসে, পাশে আছে চওড়া বারান্দা কল চৌবাচ্চা, কিছুরই অভাব নেই। তোলা উনুনও তৈরী করেছি। সব ঠিক প্রতুল ফিরলেই তোমাদের গিয়ে নিয়ে আসব।"

কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধ অদ্ভুত স্বরে হাসিতে লাগিল। পরে আমাকে প্রশ্ন করিল, "কিছু মিথ্যে লিখেছি? প্রতুল ফিরলে এসব হতে আর কতক্ষণ, কি বল?" জবাব না দিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

হঠাৎ বৃদ্ধ আমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি তো কত জায়গায় ঘুরছ ফিরছ, কত কাগজপত্র পড়ছ, ওর ঠিকানাটা আমায় বলে দিতে পার? এমন করে এসব বয়ে নিয়ে বেড়াতে আর আমি পারি না।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পকেট হইতে একটা পুঁটলি বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিল। পুঁটলিটার ভিতর হইতে একটা পচা দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আসিল বোধ হয় মায়ের দেওয়া সেই পিঠার পুঁটলি হইবে। তাহার পর অন্য আর একটি পকেট হইতে সযত্নে রক্ষিত একখানি মলিন খাম বাহির করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "মালতীর চিঠি, এখানি যেমন করে হক ওকে তোমার পেঁাছে দিতেই হবে।"

ইহার পর নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলাম না। চিঠিখানি তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কোনও রকমে বলিলাম, "ওদের কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ি ফিরে যান। আপনার ছেলের খোঁজ আমি করব।"

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বোকা ছেলে। প্রতুলকে না নিয়ে একা কি আমি ফিরতে পারি? তার চাইতে বুড়ী বসে বসে দিন গুনুক, মালতী দেখুক তার স্বপ্ন; ওসব হাঙ্গামায় আমি আর যাচ্ছি না বাবা।"

বেলতলার পুল মেরামত হইতেছে। লাল আলো দেখিয়া মাঠের মাঝেই গাড়িটা থামিয়া পড়িল। বৃদ্ধ হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া গাড়ি হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল। পিছন হইতে ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না। মনে ভয় হইল; প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "কোথায় চলেছেন আপনি? শিগগির ফিরে আসুন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।"

বাহির হইতে হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ বলিল, "বাঃ বেশ! এই বুদ্ধি নিয়ে চাকরি করছ? এখানে বুঝি কেউ আর ওষুধ বিক্রি করতে আসে না! আমি গাড়িতে চেপে মজা করি আর সেও পালিয়ে যাক! বেড়ে বুদ্ধি বাবা।"

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "এই অন্ধকার রাত্রে একা আপনি যাবেন না, ফিরে আসুন।"

দূর হইতে বৃদ্ধ বলিল, "বিশ বছরের ছেলে, অন্ধকার রাত্রে সেও একদিন একা বেরিয়েছিল।"

গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না। গাড়ি তখন চলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে মাঠের মাঝে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নয়টা বাইশে গাড়ি আসিয়া পলাশ পোলে পৌঁছিল।

# চাষী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

মুর্খ যারা দুঃস্থ যারা কীর্ত্তি যাদের অখ্যাত।
ভাগ্যে যাদের মিলেনিকো অ আ ক খ'র সাক্ষাতও॥
তারাই মোদের অন্নদাতা কর প্রণাম ঐ চাষীকে।
পারিস যদি শিখতে কিছু ওদের কাছেই যা শিখে॥
ওদের হাতেই গরু, মহিষ, হংস, মোরগ পোষ মানে।
স্নেহ শাসন, ভরণ পোষণ ওরাই মোদের সব জানে॥
নেংটি পরে পান্তা খেয়ে ঐ যে চাষা যায় ধেয়ে।
স্থির নয়নে শান্ত হ'য়ে বারেক তোরা দেখ চেয়ে॥
অধ্যবসায় কাকে বলে বুঝতে যদি কষ্ট লাগে।
ঐ চাষীদের চরণ রেণু মাখতে হ'বে সবার আগে॥
বন বাদারে রাত দুপুরে ওরাই করে মেহনৎ।
সরল সাধু সত্যবাদী ওদের মাঝেই আছে সৎ॥
সংখ্যা গুণে দেখতে গেলে ওরাই দেশের চৌদ্দ আনা।
বাদ বাকী সব খোসাভূষি অপব্যয়ের মুন্সিয়ানা॥
শাক শবজীর ফসল ঘেরা ঐ যে ছোট কুটিরখানি।
পৌঁছিয়ে দে প্রণামটা তোর ওকেই সকল তীর্থ মানি॥

পিনাকী নয়, সতীর রূপে বিদগ্ধ উন্মত্ত পিনাকী। এর থেকে উৎকৃষ্ট মশলা কবিতার আর কী হতে পারে?'

মেয়েটি "সী ভিউ" হোটেলে থাকে। খবর পেয়ে আত্মীয়রা এসে পড়ল। জ্ঞান ফিরেছে। বিশেষ কিছুই হয়নি। জলের আঘাত আর কয়েক ঢোঁক নোনা জল পেটে গিয়েছে মাত্র।

আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম নশুদার আগামী অভিভাষণের জন্য। জানি, তিনি একটা কিছু বলবেন; এই ঘটনার সঙ্গে যার যোগ আছে এমন একটা কিছু। না বললে বুঝতে হবে, এতদিন ধরে নশুদাকে আমরা আদৌ বুঝিনি।

নশুদা বললেন, 'আজ আমার শ্রীপতির কথা মনে পড়ছে। আশ্চর্য্য ছেলে। যাক্ সে সব। চল, হোটেলে ফেরা যাক।'

বুঝলাম, নশুদা দাম বাড়াচ্ছেন। বিনা পারিশ্রমিকের গল্প লেখকের মত বিনা তোষামোদে তিনি কখনও গল্প ছাড়েন না। বললাম, 'কই শ্রীপতির কথা ত কোনদিন বলনি নশুদা'! কে সে? রাত হয়নি বেশী। এত সকালে হোটেলে ফিরে কী হবে! বাস্তবিক মনটা, তোমার একটা গল্প শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।'

এ কথার পরই নশুদা চটে উঠলেন, আর একটা বিড়ি ধরালেন। 'তার মানে, তোরা বলতে চাস্, আমি যে সব কথা বলি সে সব গল্প! তোদের মত নেমকহারাম আমি দেখিনি। সমুদ্র দেখা হয়েছে যথেষ্ট। কালই এলাহাবাদ রওনা হব, মাসিমা কত ক'রে যেতে বলেছেন'।

এলাহাবাদে নশুদা'র কোন মাসিমা থাকেন, এ সংবাদ আমাদের কাছে একেবারে নতুন। কিন্তু আর ঘাঁটালাম না। নশুদা'র নিভে যাওয়া বিড়ির উদ্দেশে খশ্‌খশ্ ক'রে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে ধরলাম। বললাম, 'ছি ছি, কী যে তুমি বল নশুদা! এমনও কী হতে পারে? তোমার সব গল্পই যে সত্যি গল্প, তা কী আমরা জানি না বা বুঝি না! বল, বল,—শ্রীপতি নামটা যেন তোমার মুখে এর আগে কবে শুনেছি'।

'তা শুনতে পারিস', নশুদা বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে বললেন, 'শ্রীপতি আমার পিস্‌তুত ভাই। তবে শোন, ছাড়বি না যখন তোরা। শ্রীপতি যে আমার ভাই তা শ্রীপতির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অবধি আমি জানতাম না। জানিস ত' আমাদের বংশ ছিল কত বড় বনেদী। ইদানীং নানা ব্যাপারে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মাসি, পিসীর সবাইকে এখনও চিনে উঠতে পারলাম না। আর তার ওপর শুনেছি তাদের প্রত্যেকেরই আধ ডজনের ওপর ছেলে মেয়ে অভাব ইত্যাদির তাড়নায় বাঙলা বিহার উড়িষ্যা চষে বেড়াচ্ছে। তাদের চেনা ত আরও দুষ্কর ব্যাপার। সেবার মজঃফরপুর থেকে সমাজ সংস্কারকদের এক মিটিং এ্যাটেন্ড্ ক'রে ফিরছি। শ্রীপতির সঙ্গে দেখা। মানে, সে যে শ্রীপতি এটা পরে জানলাম। আমার জগু পিসীর ছেলে শ্রীপতি। আহা, পিসী মারা গেছেন একচল্লিশ সালের ঝড়ের বছর। শুনে, চোখে জল এল। অমন পিসী আর হয় না, শুনেছি লোকের মুখে। কারণ, আমি তাকে কখনও দেখিনি।

'শ্রীপতি যে শ্রীপতি, তা কী ক'রে চিনলে', আমি আর না থাকতে পেরে জিগ্যেস করলাম।

'সেই কথাই ত বলছি। তোরা শরৎ চাটুয্যের ওর-নাম-কী সেই বইটা পড়েছিস? আরে ঐ যে একটা ডানপিটে ছোঁড়া—চন্দ্রনাথ না কী,—মাছ-টাছ চুরি করল; অবশেষে কোথা থেকে এক দিদি জুটে গেল—পরের উপকার টুপকার খুব করে—কী ওর নাম, বইখানার?'

'শ্রীকান্ত। আশ্চর্য্য শ্রীকান্তর নাম তোমার মনে নেই! চন্দ্রনাথ নয় ইন্দ্রনাথ।'

'তা হবে। জানিস ত বই টই আমি বিশেষ পড়ি না। কে যেন একজন বইখানা দিয়েছিল। বলেছিল, পড়ে দেখো। তা সেই চন্দ্রনাথ—না না ইন্দ্রনাথের মত লোকও আমাদের আশে পাশে আছে, এটা জানতে পারলাম শ্রীপতির সঙ্গে পরিচয়ের পর। অতটা না হলেও, শ্রীপতি আধাআধি ইন্দ্রনাথ। মানে সাপকে 'ও কিছু না সাপ' না বলে সাপই বলে আর সামান্য শিউরেও ওঠে; তবে পরোপকার প্রবৃত্তিতে ও পুরোপুরি ইন্দ্রনাথ। বইটা আমার ভাল মনে নেই। উপন্যাস টুপন্যাসে তেমন রস পাইনা জানিসই ত'!

সিতাংশু বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। তুমি শ্রীকান্ত পড়েছ শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি নশুদা'।'

'বিস্ময়ের কিছু নেই রে। আমি আনন্দমঠও পড়েছি। আনন্দ পাইনি একটুও। যাক্, যা বলছিলাম। গভীর রাতে কোন এক বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামল। জানিস ত তোরা আমি একটু বেশী মিশুক। গাড়ীতে ভিড় থাকা সত্ত্বেও কোনরকমে শোবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম। প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক গল্প ফাঁদলাম, অমনি চারদিক থেকে, বসুন না মহাশয়, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন আসুন এখানে, জায়গা আছে।' সত্যিই যেখানে তিল ধরণের স্থান ছিল না, মন্ত্রবলে সেখানে দু'শ' ছ পাউন্ড ওজনের আমার বসবার জায়গা হয়ে গেল! আর এটা বোধ হয় তোরা ভুলে যাসনি যে, আমি বসবার জায়গা পেলে শুয়ে পড়তে কখনও ভুলিনা। প্রথমে বসলাম, বসামাত্রই আমার পুরোন পেটব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠল। কেউ কেউ কোঁচার খুঁটে হাওয়া পর্য্যন্ত করতে লাগল, আমাকে শুইয়ে দিয়ে। সবাই বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, গল্পটা বুঝি মাঠে মারা যায়। এমন সময় শ্রীপতি উঠল গাড়ীতে, মাস ছয়েকের এক শিশু কোলে ক'রে। অধীর হ'সনা, বুঝিয়ে বলছি সব। ঐ তোদের এক স্বভাব—গল্প বলতে ত পারিসই না, শোনবার টেকনিকটিও আয়ত্ত করিস নি। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রৌঢ়া না হলেও প্রায় বিগত যৌবনা এক স্ত্রী, আধ ডজনের ওপর নানা আকারের ছেলে মেয়ে, বিরাট লটবহর মায় টিয়ে পাখীর খাঁচাটা শুদ্ধ গাড়ীতে উঠলেন। স্ত্রীটির যৌবন উবে যাবার বয়স এ নয়, দেখেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু সন্তান প্রসবরূপ সংসারের গুরু ও মহৎ দায়িত্বের চাপে—সে যাক্। প্রথমে দেখলাম, খাকি, ময়লা সার্ট পরা সুদর্শন একটি ছেলে প্লাটফর্মের ওপর থেকে গাড়ীর ভিতরে অনবরত মাল চালান করছে। তার ভঙ্গী দেখলে মনে হয়, এই-ই

তার কাজ; এই কাজেই পোক্ত হবার জন্য সে এতখানি জীবন ব্যয় করেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু'কোলে দু'টি সন্তানকে চেপে ধরে শুধু হা হা ক'রে চীৎকার করছেন আর এদিক ওদিক ঘুরে শ্রীপতির কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। অবশেষে মালও তোলা হল, গাড়ীও ছাড়ল। ছেলে দু'টিকে কোনরকমে উপরে চালান ক'রে, বুক, ভুঁড়ি আর লোমশ স্থূল দু'টি বাহুর সাহায্যে জনক প্রবর গাড়ীতে উঠলেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসর তার ছিল না। কথায় আছে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এইবার দেখলাম শ্রীপতির কৃতিত্ব। মহিলাটির কোল থেকে শিশুপুত্রটিকে কেড়ে নিল। তারপর এক হাতে একরকম ঠেসে ধরেই গাড়ীতে তুলে দিল। তারপর নিজে ডান কোলে ছেলেটিকে চেপে ধরে বাঁ হাতের সাহায্যে গাড়ীতে উঠে পড়ল। গাড়ী তখন প্রায় প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে আর কী! আশ্চর্য্য শ্রীপতি একটু হাঁপাল না, কপালে এক বিন্দু ঘামও দেখা দিল না, বাহাদুরি নেবার জন্য সামনের দু'টি দাঁত বার ক'রে একটু হাসল না পর্য্যন্ত। আমি পেটের ব্যথা ভুলে গিয়ে উঠে বসলাম। শ্রীপতির বাহুর চাপে ছমাসের শিশু তখন কঁকিয়ে উঠেছে। শ্রীপতি ছেলেটিকে মায়ের কোলে তুলে দিল। কোন কথা না বলে মহিলা বড় বড় দু'চোখ মেলে এমনভাবে তাকালেন যে, কোন কথাই সে দৃষ্টির অর্থের কাছে যথেষ্ট নয়। শ্রীপতি চোখ নামিয়ে নিল।

'সত্যি কথা বলতে কী, শ্রীপতিকে দেখামাত্রই আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। কৌপীনধারী এক বিহারী সাধু প্রচুর পরিমাণে ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে আধখানা বেঞ্চ দখল ক'রে পড়েছিল। ভেবেছিল কেউ ছোঁবে না। কিন্তু দেখলাম ছোক্‌রার দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। সাধুকে মিট্‌মিটে ক'রে চাইতে দেখে, শ্রীপতি এগিয়ে গিয়ে ওর দু'হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সোজা বসিয়ে দিল। এতক্ষণ পর শ্রীপতির গলা শুনলাম। 'কেয়া দেকতে হে'। দেখতা নেই, জেনানা খাড়া হায়'। সাধুর হলুদ বরণ চোখ ক্রমেই রক্তবর্ণ ধারণ করল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। মহিলাটিকে বলল শ্রীপতি, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে আপনি ওখানে বসুন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!' সাধুর দিকে ফিরে হেসে বলল, 'কসুর মাপ কিজিয়ে, ইয়ে কোম্পানীকা গাড়ী হায়, কই আপ্‌কো আস্তানা নেহি।' স্থূলকায় ভদ্রলোক তখনও এক কোণে দাঁড়িয়ে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হয়ে শ্রীপতির বিস্ময়কর কার্য্যের সমালোচনা করছিলেন মনে মনে। শ্রীপতি কাছে আসতেই, 'হ্যাঁ ভাই, আমার বসবার একটা ব্যবস্থা......'। শ্রীপতি বলল, 'নিজেই ক'রে নিন। না পারেন দাঁড়িয়ে থাকুন বাচ্চাগুলোকে ওদের মায়ের কাছে বসিয়ে দিন, জায়গা ক'রে দিয়েছি।' শ্রীপতি আর কোন কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না। এদিকে আসতেই বললাম, 'এইখানে বসনা ভাই। বড্ড ক্লান্ত হয়েছ।' 'ধন্যবাদ। না ক্লান্ত হইনি একটুও। সারাদিন এই পরের ব্যাগার খাটতেই যায়। তবু যদি একটা বিড়ি দিয়েও কেউ আপ্যায়িত করত'। বলেই পকেট থেকে দেশলাই বিড়ি বার ক'রে ধরাল।

'পরিচয় হল। যা ভেবেছিলাম তাই। আমাদের বংশের ছেলে না হলে এমন হয় না।'

লক্ষ্য ক'রে দেখি সিতাংশু মুখ টিপে হাসছে। আমাকেও বহু চেষ্টা ক'রে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হল।

নশুদা বলছেন তখন, 'রাত হল, শ্রীপতির অপমৃত্যুর কথাটা বলেই শেষ করব।'

আমরা সবাই শিউরে উঠলাম। বললাম, "বল কী শ্রীপতি বেঁচে নেই!"

"না। তার মৃত্যু হয়েছে, বেঁচেছে বেচারা। সেই কথাই বলছি। কথা না বলে একটু চুপ করে শোন। অনেক ঘুরে এক জুতোর কারখানায় কাজ নিল। শহরের প্রান্তে বিরাট কারখানা। দুদিন অনাহারে থেকে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে পড়ল আর সামনে যাকে পেল তাকে বলল, 'আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কোথায় থাকেন?' কেউ হাসল, ওর উস্কোখুস্কো চেহারা দেখে কেউ পাগল ভাবল, কেউ ভাবল লেবার ইউনিয়নের গুপ্তচর। অবশেষে ষ্টোর ইনচার্জ্জ হরিদাসবাবুর সামনে পড়ল। তেজের সঙ্গে বলল, 'দেখুন দুদিন আমি কিছু খাইনি। তাই বলে ভিক্ষা চাচ্ছি না। আমি সমর্থ, যে কোন কাজ দিন, পারিশ্রমিক চাই, ভিক্ষা চাই না।' হাজার হলেও বনেদী বংশের ছেলে। হরিদাসবাবু ওর তেজ আর সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলেন। সাহেবকে বলে কয়ে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। হরিদাসবাবু ওকে এত স্নেহ করতেন যে,কারণে অকারণে ওকে বাড়ীর ভিতরে ডেকে আনতেন। হরিদাসবাবুর স্ত্রীকে ও মাসিমা বলত। ঘনিষ্ঠতা আরও একটু বাড়লে, তাঁদের মেয়ে নীলিমাকে নীলি বলেই ডাকতে সুরু করল। বস্তুত ওর চরিত্রে সন্দেহ করবার বা ওকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না। হরিদাসবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই ওর নিমন্ত্রণ থাকে। ওর কথা শুনতে সবাই ভালবাসে, বিশেষ করে নীলিমা। মুগ্ধদৃষ্টিতে শ্রীপতির মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কথাগুলো গিলতে থাকে। শ্রীপতি ওর অতীত জীবনের সমস্ত এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা বলে, একটুও রঙ্ না ফলিয়ে। কারণ, লোকটা নেহাত গদ্যময়, কবিতার ছিঁটেফোঁটাও ওর মধ্যে ছিল না। কিন্তু তবু ওর এই রসহীন প্রাণেও যেন কোথা থেকে কেমন করে একটা অপূর্ব্ব সুরের আমেজ এল। কাব্য করে কী হবে! সোজা কথায় নীলিমাকে যেন ওর ভাল লাগতে লাগল। ক্রমেই বেশী ভাল লাগতে লাগল। ক্রমেই সাহসী হয়ে উঠল,—নীলিমাকে ও স্পর্শ করতে চায়, একান্তে, গোপনে ওর বুকের ওপর নীলিমার ভঙ্গুর দেহলতাকে পিশে ফেলতে চায় ওর মন। নীলিমার দিক থেকে কোন বাধাই উঠত না। কিন্তু বাধা সৃষ্টি হল অন্য দিকে। হঠাৎ শ্রীপতি একদিন শুনল, নীলিমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এবং এক জায়গায় প্রায় ঠিক। কোন এক শুভদিনে তারা নাকি আশীর্ব্বাদ করতে আসছে। শ্রীপতি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়ল আর হরিদাসবাবুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করল। ওদিক থেকে কথা উঠল, হরিদাসবাবু নিজে কত অনুযোগ করলেন, তবু শ্রীপতি কোন কথা বলল না, শুধু ম্লান হাসল।

"নীলিমার বিয়ে হয়ে গেল।"

"হয়ে গেল," গজেন আর নিঃশব্দে থাকতে না পেরে ফেটে পড়ল, "ইস্!"

"হবে না," নশুদা মুখিয়ে উঠলেন, "একি তোর সাপ্তাহিকের গল্প পেয়েছিস্! এ-ই জীবন। এমনটিই ঘটে থাকে। শ্রীপতি মেশিনের মত নির্ভুল কাজ করে। সাহেব খুশী হলেন, মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। শ্রীপতি নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি একা প্রাণী, যা পাই তাতেই আমার ভালভাবে চলে যায়। আরও আমি চাইনা।" হরিদাসবাবু সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন, শ্রীপতির কথা। সাহেব শুনে বললেন, "জেনেরাস্ সোল্! You must take more পন্দরো রুপেয়া......!" হরিদাসবাবু হেসে শ্রীপতির পিঠ চাপ্‌ড়ে বললেন, "সাহেব শুনতে চান্ না, পনেরো টাকা মাইনে বাড়ল তোমার।" কী ভেবে শ্রীপতি সম্মতি জ্ঞাপন করে ফিরে এল। তারপর হঠাৎ আশ্চর্য্যরকম তৎপরতায় শ্রীপতি নিজের সমস্ত বাজে ব্যয় ছেঁটে ফেলল, বিড়ি খাওয়া পর্যন্ত ছাড়ল। অত পরিশ্রম করে এক কাপ চা বা একটা বিড়ি পর্য্যন্ত খেতনা। ভাবতে পারিস তোরা। টাকা জমিয়ে, একদিনের ছুটি নিয়ে ও এল শহরে। ভাল দেখে একজোড়া ইয়াররিং কিনল। চৌষট্টি টাকা কয়েক আনা যেন দাম।"

বলাই বলে উঠল, "এত সংবাদ তুমি সংগ্রহ করলে কোথা থেকে? সেই সময় সেই জুতোর কারখানায় তুমি কাজ করতে নাকি নশুদা!"

নশুদা চটে উঠলেন। "বলি, তোরা শুনবি না বলবি। বল তোরা, আমি শুনি। এই আমি মুখ বন্ধ করলাম।"

কাতরস্বরে বললাম, "নশুদা, ক্ষমা,—গল্পের এই সাংঘাতিক সময়ে পৌঁছে তুমি যদি গল্প শেষ না কর, শ্রীপতির অপমৃত্যু না হয়ে হবে আমাদের।"

"বেশ, শোন তবে মুখ বুজে। ইয়াররিং কিনে এনে লুকিয়ে রাখল স্যুটকেশের এক কোণে। আর রোজ রাতে শুতে যাবার আগে একবার করে দেখত। ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠত তখন দামী পাথর দুটোর মত।

"আর রোজ রাতে বাতি নিভিয়ে যখন বিছানায় আসত, কয়েক ফোঁটা চোখের জল ও ফেলত,—কার উদ্দেশে কে জানে! নীলিমার প্রতি ভালবাসা-সম্মানের অর্ঘ্য না ঈশ্বরের প্রতি বুকভরা অভিযোগ—কে জানে! অবশেষে, নীলিমা একদিন এল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথম সাক্ষাতের মাধুর্য্য আনন্দের থেকে অত্যাচার সৃষ্টি করে বেশী। দেহে মনে এ এক অপরূপ অস্বস্তি। হরিদাসবাবুর বাড়ীর পিছনে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল। সাধারণত মেয়েরাই সেখানে স্নান করত। পুরুষদেরও যাবার বিশেষ কোন বাধা ছিল না। সন্ধ্যায় নীলিমা এল ঘাটে গা ধুতে। শ্রীপতিও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। কাছে এসে বলল; "কেমন ছিলি নীলি! শুকিয়ে গেছিস অনেক।" নীলিমা মুখ নত করে রইল। শ্রীপতি সন্ধ্যার অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখল নীলিমার চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু চক্‌চক্ করছে। "কী হয়েছে, আমাকে বল, অসাধ্য না হলে প্রতীকার হবে।" নীলিমা এইবার মুখ তুলে বলল, "আমার স্বামী মাতাল। মারধোর করেনি। তবু বিয়ের পর এতদিনে সে আমার মুখের দিকে ভাল করে একবার তাকায়ও নি।" শ্রীপতি ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "ও এই! মাতাল, আমার মত গরীব ত নয়। নাঃ, তোবু যা ব্যাপার, এর প্রতীকার আমার সাধ্যাতীত। একী, তোর কানে কিছু নেই যে! মাতাল স্বামী কেড়ে নিয়েছে নাকি!" নীলিমা নিজের কানে একবার হাত বুলিয়ে বলে, "না, বাড়ীতে রেখে এসেছি, যদি পুকুরে পড়ে যায়।" "ভালই হয়েছে," শ্রীপতি এগিয়ে আসে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চৌকো বাক্সটা বার করে। বলে, "তোর বিয়ের সময় আমার হাতে কিছুই ছিল না দেবার মত। কিন্তু তুই চলে যাবার পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়েছে, তোকে একটা কিছু না দিতে পারলে, আমি সারাজীবন শান্তি পাব না। এতগুলি দিন ধরে সঞ্চয় করেছি শুধু, তোর উপযুক্ত কিছু দেবার জন্য। এটা কি তোর অপছন্দ হবে?" নীলিমা বিস্মিত হল, মুগ্ধ হল আর হা হা করে কেঁদে উঠবার একটা প্রবল ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসল। বহুকষ্টে কান্না দমন করে বলল, "তুমি পরিয়ে দাও।" শ্রীপতির হাত কাঁপল; সমস্ত শরীরে একটা ঝড়ের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল। শ্রীপতি যেই হাত নামাল, অমনি নীলিমা ওর দুহাত চেপে ধরল। শ্রীপতি কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস চেপে শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর বলল, "হাত ছাড় নীলি। এতদিন যখন পেরেছি, আজও পারব।" হন্‌হন্ করে হেঁটে শ্রীপতি মিশে গেল অন্ধকারে। তার পরদিন। শ্রীপতি খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল। পুকুরপাড়ে এসে দেখে, নীলিমা বুক অবধি জলে ডুবিয়ে অলসভাবে দুহাতে জল নিয়ে খেলছে। কিছুক্ষণ দৃশ্যটা উপভোগ করল শ্রীপতি। তারপর বলল, "আর নীচে নামিস না। ডুববি তাহলে।" "ভালই ত হয়, তাহলে।" "থাক্, অত ভালয় কাজ নেই। তাড়াতাড়ি আসিস্। তোদের বাড়ীতে যাচ্ছি। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব।" শ্রীপতি ওদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন নীলিমার দেখা পেলনা, তখন ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল। নীলিমা সাঁতার জানত না। ঘাটের দিকে পা বাড়াল শ্রীপতি। এসে দেখে, কেউ কোথাও নেই। শ্রীপতির রক্ত হিম হয়ে এল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খানিকটা এগোতেই দেখে নীলিমার সাড়ির প্রান্ত জলের উপরে ভাসছে। কোন রকমে তুলে এনে নীলিমাকে ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপরে শুইয়ে দিল। বিশেষ কিছুই হয়নি। কয়েক ঢোক জল প্রবল অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গিলতে বাধ্য হয়েছে মাত্র। জ্ঞান ফিরে পেয়েই নীলিমা শাড়ি সম্বৃত করে উঠে বসল। চুলগুলি একবার নাড়া দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলল। হঠাৎ নীলিমা অনুভব করল, তার বাঁ কানের ইয়াররিংটা জলে পড়ে গেছে। "আমার ইয়াররিং—তুমি যেটা দিয়েছিলে!"

শ্রীপতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোকে যখন তুলতে পেরেছি, তখন ইয়াররিংটাও পেতে হবে। পাতালে গেলেও খুঁজে আনব।' সেই অবস্থাতেই, অসম্বৃত বস্ত্রে শ্রীপতি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ডুবে থেকে, জলের উপর ভেসে

ওঠে। নীলিমা জিগ্যেস করে, পেলে? না পাও, থাক্। তুমি উঠে এস!' কিন্তু শ্রীপতি যেন মরিয়া হয়ে উঠল। প্রথমে কয়েকবার নীলিমার কথার উত্তর দিয়েছিল। শেষে আর কোন কথা বলবার শক্তি তার ছিল না। তারপর একবার সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে সেই যে ডুবল আর অনেকক্ষণ অবধি তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নীলিমা ভয় পেয়ে বাড়ীতে গিয়ে সংবাদটা দিল। চারদিক থেকে লোক ছুটে এল। শ্রীপতিকে তোলা হল জল থেকে, পাতাল পর্য্যন্ত তাকে যেতে হয়নি। ডাক্তার বলল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে। ডাঙ্গায় ফিরে আসবার মত দমটুকুও ওর ছিল না।' হরিদাসবাবু বললেন, 'দু'পায়ে কাপড়খানা এমনভাবে জড়িয়ে না গেলে বোধ হয় বাঁচত। সামান্য অতটুকু একটা পুকুরে ডুবে মরবে শ্রীপতি এযে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।' হরিদাসবাবুর স্ত্রী মৃত' শ্রীপতির দিকে একবার তাকিয়েই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। শুধু স্থির, নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা। হঠাৎ হারদাসবাবু ঝুঁকে শ্রীপতির কাপড়ের ভাঁজের মধ্য থেকে ইয়ারিংটা তুলে বললেন, 'এই যে নীলি, তোর ইয়ারিং। আহা বেচারা! হয়ত তোকে যখন তুলে আনে তখনই ইয়াররিংটা ওর কাপড়ে পড়ে আটকে ছিল।' নীলিমা শ্রীপতির বিবর্ণ ভাবলেশহীন মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'যাক্ ইয়াররিংটা পাওয়া গেছে ত'। দুটোই যদি যেত, সে ক্ষতি আমি সহ্য করতাম কী ক'রে? হরিদাসবাবু বোকার মত মেয়ের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।'

সিতাংশু বলল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'তোমার গল্প শুনে মনে হয়, তুমি নিজেই যেন সেই শ্রীপতি—থুড়ি, শ্রীপতির ভূত বা আত্মা।

'বাজে বকিস না জ্যাঠা ছেলে। বিড়ি খেয়ে খেয়ে মুখ তে'তো হয়ে গেল। সিগ্রেটটিগ্রেট থাকে ত একটা বার কর দেখি!'

---

# ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রগতি

(৯৯ পৃষ্ঠার পর)

ইটালীয় অপেরাকে ভাঙিয়ে। হ্যাণ্ডেল (Handel) শেষ জীবনে ইংলণ্ডে এসে বসতি করেন। সেই কারণে হ্যাণ্ডেলিয়ান ভঙ্গীর চর্চ্চা ইংলণ্ডে কিছু প্রসার লাভ করে। যখন সমস্ত য়ুরোপ হ্যাণ্ডেলকে ভুলে গেছে ইংলণ্ড তখনও তার হ্যাণ্ডেলীয়ান রীতিকে ছাড়ে নি।

ইংলণ্ডের গুণীদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে। প্যারি (Parry) এবং স্ট্যানফোর্ড (Stanford)। এরা ইংলণ্ডের সংগীতে একটা উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল মাত্র। এর পরে সত্যই একজন প্রতিভাবান সুরশিল্পীর আবির্ভাব হয়—এডোয়ার্ড এলগার (Edward Elgar)। এ'র রীতি ছিল ষোল আনা রোমাণ্টিক। কতগুলি লোকপ্রিয় ওরাটোরিও (Oratorio), সিম্ফনি ও কনসার্টো ইনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এলগারের সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু প্রতিভার প্রমাণ ছিল না যাতে য়ুরোপের আসরে তার স্থান হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর সাংগীতিক প্রতিভার মধ্যে তিনজন যশস্বী গুণীর নাম করা যায়—জার্ম্মানীর স্ট্রাউস (Strauss), ফিনল্যাণ্ডের সিবেলিয়াস (Sibelius) এবং ইংলণ্ডের রাল্ফ্ উইলিয়াম্স (Ralph Williams)। এদের হাতে সিম্ফনি নিত্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

রাল্ফ উইলিয়ামসের সুরের ভেতর ইংলণ্ডের জাতীয় সত্তার পরিচয় বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। ইংলণ্ডের ছোট গিরিমালা, উপত্যকা, বনানী ও প্রান্তরের প্রতিধ্বনির মত উইলিয়ামসের সুর। ভাটিয়ালি যেমন বাঙলার গাঙের গান—উইলিয়াম্সের সংগীত তেমনি ইংলণ্ডের মাটীর সুরে মাজা।

আধুনিক য়ুরোপীয় সংগীতের দরবারে বিপ্লবের মত পরিবর্ত্তনের একটা ঝড় এসেছে। চেম্বার মিউজিকের আর সে কদর নেই; পিয়ানো বাতিল হতে চলেছে। অমন যে সুরপ্রাণ টোনালিটি তাও আজ নীরস বলে মনে হচ্ছে। এমন কি স্বরের সম্মানও সেখান থেকে নির্ব্বাসিত হবার উপক্রম হয়েছে। শোনবার্গ (Schonber) প্রভৃতি ওস্তাদেরা সরল অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরের বদলে বিলাপের (Wailing) মত চেষ্টাসাপেক্ষ স্বরের প্রবর্ত্তন করেছেন।

এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে য়ুরোপীয় সংগীতের আর একটা রেনেসাঁস আসন্ন। এই সব বিদ্রোহ, ভাঙা গড়া তারই পূর্ব্বলক্ষণ। য়ুরোপীয় সংগীত রোমান্স, আবেগ ও ইন্দ্রজাল ব্যতিরেকী আর একটী রসপীঠের সন্ধানে অধীর হয়ে উঠেছে। নইলে যুগের সংগে তাল রেখে চলতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব। আজ বিজ্ঞান মানুষের শিল্প সাধনার, সংগীতেরও সহায়ক বন্ধু। হয়তো শীঘ্র বাদ্যযন্ত্রেরই এমন একটা অভিনব সংস্করণ হবে যার জোরে সংগীতের রীতিনীতি সমূহ ওলটপালট হয়ে যাবে। তা ছাড়া চিন্তার ক্ষেত্রেও আজ যে বিপর্য্যয় চলেছে; এবং রুচি ও আদর্শের ঘোর রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে সংগীত বিদ্যাকেও নতুন সাজ গ্রহণ করবার লগ্ন উপস্থিত। এবার আশা করা যায় বিজ্ঞানই সংগীতকে নতুন একটী সাজে সাজিয়ে তাকে মানুষের সংস্কৃতির আসরে প্রতিষ্ঠিত করবে।

# বাঙলার সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন

গত ১২ই শ্রাবণ, রবিবার কলিকাতার এক জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন,—"আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল আমরা এই ভরসার স্পষ্ট সূচনা পাইয়াছি। বাঙলার ছাত্র ও যুবক কর্ম্মীদের দৃঢ়তায়, বিশেষ করিয়া মুসলিম ছাত্র সম্প্রদায়ের দৃঢ়তায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যকলাপের বহু পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। এই সব কার্য্যকলাপ হইতে তাঁহাদিগকে বাঙলার জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে না করিয়া আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়াই মনে হইয়াছে। তাঁহারা অন্তত একটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।"

সব দেশেই ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রথমেই বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা আসিয়া পড়ে; এইজন্য যাঁহারা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা ছাত্র সমাজকে বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। পাছে তাঁহাদের স্বার্থের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ হয়, ইহাই তাঁহাদের ভয়। এদেশের আমলাতন্ত্রও এতকাল সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম পাছে প্রসার লাভ করে, এইজন্য তাঁহারা অশান্তি এবং উচ্ছৃঙ্খলা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া ছাত্র সমাজকে কূপমণ্ডুক করিয়া রাখিবার জন্য যত রকমে সম্ভব কড়া বিধি-বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে রিজলী সার্কুলারের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের মারফতে এই হুকুম জারী করা হয় যে, যে সব স্কুল কলেজের ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবে তাহাদের সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে, এমন কি, সেই সব স্কুল কলেজের অ্যাফিলিয়েশন পর্য্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, এই সার্কুলার জারী করিয়া আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। দেশে তাহার ফলে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

হইবার কারণও আছে। ছাত্রেরাই দেশের প্রাণশক্তি; ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তুলিবে তাহারাই। ছাত্র সমাজকে রাষ্ট্রীয় আলোচনা আন্দোলনে যোগ দিতে না দেওয়া দেশের এবং সমাজের স্বার্থ সম্পর্কিত চিন্তার ধারা হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হইল তাহাদিগের মনুষ্যত্বের বিকাশে বাধা দান করা। অন্য কথায়, শিক্ষার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য তাহা হইতেই ছাত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে শুধু পুঁথি কেতাবের কীট এবং গোলাম করিয়া রাখা। দেশের বৃহত্তর রাজনীতিক স্বার্থে জাগ্রত কোন দেশ বা জাতি এমন ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বাঙলা দেশের আত্মা সেইজনাই একদিন রিজলী সার্কুলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাঙালী পরিচয় দিয়াছিল যে, তাহারা পরাধীন হইলেও তাহারা এখনও মরে নাই।

সরকারী আদেশের প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা

অতীতের সে কথা, সে ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবে

না, ইহাও আশা করা উচিত ছিল; কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইল শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের আদেশ জারীতে। আদেশ হইল, ছাত্রেরা মিছিল ও শোভাযাত্রা করিতে পারিবে না, তাহারা কোন রকম রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিলে দণ্ডিত হইবে। আমলাতন্ত্রের যুগের ব্যাপার নয়, জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া যে মন্ত্রীরা বড়াই করেন, তাঁহাদেরই শাসনের আমলে এই আদেশ জারী হইল। লোকের মনে এই ধারণা দৃঢ় হইল যে, কাগজপত্রে আমলাতান্ত্রিক শাসনের অবসান হইলেও মনোবৃত্তিগত সম্প্রসারণের সাহায্যে নিজেদের সুবিধা খুঁজিবার চেষ্টায় যাঁহারা ছিলেন, তরুণ সম্প্রদায়ের দেশের বৃহত্তর স্বার্থমূলক আন্দোলন তাঁহাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধুয়ায় ছেলেদিগের দ্বারা তাহারা নিজেদের কাজ বাগাইয়া লইতে পারিবেন কিন্তু তরুণেরা সে প্রলোভনকে পর্য্যন্ত যে তুচ্ছ করিয়াছে, ইহা আমাদিগকে সত্যই আশান্বিত করিয়াছে। রিজলী সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেয়ে বাঙলার সাম্প্রতিক

ইসলামিয়া কলেজের প্রবেশপথ। ছাত্রদের মিছিল যাহাতে কলেজের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য পুলিশ কর্তৃক ইসলামিয়া কলেজের প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হইলে ভিতর হইতে উক্ত কলেজের ছাত্রগণ প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে

পরিবর্ত্তন বাঙলা দেশের শাসনতন্ত্রে এখনও ঘটে নাই। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মনে করিয়াছিলেন এক সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পিঠ চাপড়াইয়া এবং তাহাদিগকে মধুর মধুর কথায় ভুলাইয়া ছাত্র সমাজের আন্দোলনকে তাঁহারা সংহত হইতে দিবেন না, ফলে নিজেদের নীতি তাঁহাদের নিরাপদ থাকিবে। বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রগণ তাঁহাদের এই আশা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধুয়ার প্রলোভন কম নয়, চাকুরীর লোভ, বিশেষ সুবিধার লোভ এড়ান কঠিন। বাঙলা দেশের মুসলমান ছাত্র সমাজ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চাহিয়া এইদিকে সত্যই আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে।

বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদমূলক নীতি ছাত্র আন্দোলনের এই দিক হইতে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ছাত্র সমাজের এই জাগরণ বাঙলা দেশে নূতন রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধন করিবে, শত অন্তরায়কে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা এখানে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে সকলেই এই আশা করিতেছেন।

মন্ত্রীরা ছাত্রদের আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী বিবৃতি দিয়াছেন, ইসলামিয়া কলেজের লাঠিবাজীর ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে প্রধান মন্ত্রী ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহারা কোন

নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবেন তাঁহারাই জানেন। এ সম্বন্ধে ছাত্র সমাজের কথা সুস্পষ্ট। তাঁহারা অন্ততঃপক্ষে ছাত্রদের মধ্যে কোন ভেদকে স্বীকার করিয়া লইবে না। মধ্যযুগীয় ধর্ম্মগত সংস্কার বুদ্ধি অন্যের পক্ষে থাকিতে পারে, কিন্তু ছাত্রেরা সে বুদ্ধিতে অভিভূত হইবার নয়। এই ব্যাপারে মুসলমান ছাত্র সমাজ বাঙলার গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছে। বাহিরের লোকেরা মনে করিত, বাঙলা দেশের মুসলমানেরা এখনও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই পড়িয়া আছে। জিন্নাই দলের নীতি আরব, তুরস্ক, পারস্য, মিশরের প্রগতিশীল মুসলমান সমাজে ভারতের মুসলমানদের সম্বন্ধে তেমন ধারণাই সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙলা দেশের মুসলমান ছাত্রমণ্ডলী দেখাইয়া-দিল স্বাধীন মোস্লেম রাষ্ট্রনিচয়কে এই সত্য যে, বাঙলার মুসলমান দেশের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয়তার ক্ষেত্রে প্রাচীন কূপমণ্ডুকতার মধ্যে পড়িয়া নাই; অগ্রগতির প্রভাব তাহা-দিগকে স্পর্শ করিয়াছে। বাঙলার মুসলিম ছাত্র সমাজ দেখাইয়া দিল জগৎকে যে, মানুষের অধিকার তাহারা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়। গোলামগিরির আরামের চেয়ে মানুষের অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকার আদর্শই তাহাদের কাছে বড়। এই দিকে বাঙলার ছাত্র আন্দোলন বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রেই একটি বিশিষ্ট ব্যাপার নয়,—সমগ্র ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। ইহার সম্ভাবনা শুধু বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতির উপর ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিন্ধু প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সম্প্রতি যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্মেলন এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ানে যে, সাম্প্রদায়িক-তার সঙ্গে ছাত্রসমাজের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। চীন, স্পেন, মিশর প্রভৃতি স্থানের ছাত্রসমাজের কর্ম্মতৎপরতা অনুমান করিয়া সিন্ধুর ছাত্রগণ জাতীয় সংহতি গঠনের জন্য চেষ্টা করিবেন এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, সিন্ধুর ছাত্রসমাজ সেই সব নেতার এবং জনসাধারণ এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ সূত্র-রূপে কার্য্য করিবে। সিন্ধুর শিকারপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ শিকারপুরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন সুরু করিবেন স্থির করিয়াছেন। এক এক দল ছাত্র অধ্যাপকদের অধীনে গ্রামে গ্রামে গিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচার করিবেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল নিজেরা ছেলেদের এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপে কাজ করিতেছেন। বাঙলার অবস্থা এমন নয়, তাহা সত্ত্বেও বাঙালী ছাত্রেরাই এই প্রচেষ্টার পথ নিজেরা শুধু কথায় নয় কাজের দ্বারা যে দেখাইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সিন্ধুর ছাত্র সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের উপর বাঙলা দেশের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙলা দেশের উন্নতি এবং অগ্রগতি যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা এই আন্দোলনকে অভিনন্দিত করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ বাঙলার ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইবেন। বাঙলা দেশের একটি বিশিষ্ট ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এই আন্দোলন জাগিয়াছে বলিয়া যাহারা ইহার গুরুত্বকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা এই দিক হইতে ভুল করিতেছেন। বাঙলা দেশের সাম্প্রতিক এই ছাত্র আন্দোলনের সূচনার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন এই আন্দোলন অন্যত্র কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের আলীগড় এবং লক্ষ্মৌ মুসলীম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। বাঙলার ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির সাড়া জাগাইয়াছে এই যুক্তপ্রদেশে বিশেষ-ভাবে। যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়ন সভা করিয়া বাঙলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সার্কুলারের প্রতিবাদ করিয়াছে। ছাত্রেরা বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদমূলক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে। বাঙলা দেশের এই ছাত্র আন্দোলন বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে; কিন্তু উহার মূলে শক্তিস্বরূপে রহিয়াছে বৃহত্তর এবং ব্যাপক স্বার্থের অনুভূতি। আদর্শ শুধু বিশিষ্ট ঘটনার বিরুদ্ধতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যেখানে প্রতিকূল অবস্থা সেখানেই উহা বিরুদ্ধতা করিবার শক্তি জাগাইয়া তোলে; শুধু তাহাই নহে, বৃহৎ আদর্শের প্রেরণায় যেখানে ত্যাগ স্বীকার থাকে সেখানে উহা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, বিশিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্তি লাভ করে। বাঙলার হিন্দু মুসলমান ছাত্রেরা বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণার শক্তিতে সুদৃঢ় হইয়া কার্য্যত ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ত্যাগের পথে মিলনকে শক্ত করিয়াছে। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা সুনিশ্চিতভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং এই আন্দোলনের সম্ভাবনা সামান্য নয়, ইহা সুদূরপ্রসারী। সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থবাদে বিচ্ছিন্ন-শক্তি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা অপরিমিত আশার আলোকস্বরূপ। চীন, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে ছাত্র আন্দোলন রাজনীতিকে যেমনভাবে সংহতির সুদৃঢ় শক্তি যোগাইয়াছে এবং যুগান্তর ঘটাইয়াছে, বাঙলার ছাত্রেরাও আজ তেমনই মধ্যযুগীয় অন্ধতা হইতে বিমুক্ত হইয়া দেশের অগ্র-গতির পথে উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা বাড়াইয়া দিয়াছে।
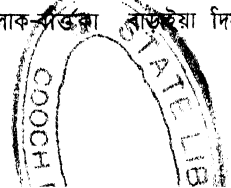
# গাঁয়ের মায়া

(বড় গল্প)

শ্রীমনীন্দ্রকুমার দত্ত

৩

গাঁয়ে তখন সব ছেলেমেয়েরা জমা হয়েছে মোড়লের বাড়ির সামনে অর্জুন গাছটির তলায়। গোমস্তা, দুজন বরকন্দাজ, একজন ঢুলী। ঢুলী বাজাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে মজা দেখছে। কিসের জন্য ঢোল দিচ্ছে জানা যায় নি এখনও।

দূরে গাঁয়ের সবাইকে আসতে দেখে গোমস্তা হাঁকলেন ঢোলের বাদ্যির সঙ্গে—সামনের ৫ই আশ্বিন এক-আনির বাবুর নাতির অন্নপ্রাশন হবে এলাহাবাদের বাড়িতে। সবাই যেন নায়েবের কাছারিতে হাজির হয়ে নজরানা দিয়ে আসে।

নারানের মাথায় খুন চেপে গেল। হাতের টাঙিগটা ধরল শক্ত করে। তারপর এক কোপে ঢুলীর ঢোল দু-টুকরো হয়ে পড়ে গেল। হিংস্র খুনীর চেহারা নারানের। শোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। মোড়ল ছুটে এগিয়ে এল। সুভদ্রা ছুটে এসে নারানের হাত চেপে ধরল, নইলে আরও কি হত কে জানে।

মোড়ল এসে নারানকে গালাগাল করল। গোমস্তাকে বললে, সবাই নজরানা দেবে, এতে তো তাদেরই আনন্দ। গাঁয়ের সবাই চীৎকার করে ওঠে, 'দেব কি করে?'

মোড়ল হেঁকে বলে, 'সে ভাবনা আমার।'

নিস্ফল আক্রোশে নারান গজরাতে থাকে। গোমস্তা তার দলবল নিয়ে সরে পড়ে। গাঁয়ের সবাই রওনা হয় কালীমন্দিরে পরামর্শ করতে। নারানও যায়। না গিয়ে উপায় নেই।

মন্দিরের সামনে বৈঠক বসে। নারান বলে, তারা বাঁচতে চায়। ভৈরব তাদের বাঁচবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বাঁধ কাটা যদি নাই হয় তবে মোড়ল তাদের চটকলে যাবার হুকুম দিক। না খেয়ে তারা কদিন বাঁচবে?

মোড়ল বলে, 'ফসল না হলে চটকল চলবে কিসে?'

'সে কথা ভাববে যারা চটকল তৈরি করেছে। গাঁয়ের লোক ভাববে তাদের পেটের কথা, তাদের তেল নুনের কথা।'

কথা কাটাকাটি হয় অনেক, কিন্তু কোনও কাজ হয় না তাতে। কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। মোড়ল চুপ করে বসে থাকে, মুখে চিন্তার রেখা। নারান, নীলু, গনশা, সবাই বোঝায় কিসের মায়া! সারাটি জীবন তাদের কেটেছে কি করে আহার জুটবে আর ঋণ শোধ হবে তার চিন্তায়। আর কেন! তবু মোড়ল কথা বলে না। মুখখানা তার ক্রমে গম্ভীর হতে থাকে।

হঠাৎ মোড়ল 'কুল্লা' করে ওঠে। বহু দিনের পরিচিত এই হুংকারে পাইকের বংশধরদের রক্ত নেচে ওঠে। চৌধুরী জমিদার এই গাঁয়ের পত্তন করেছিলেন প্রজা শাসন করবার জন্য। ডাকাতি এদের রক্তের সঙ্গে মেশানো। মোড়ল চীৎকার করে বলে, 'ঠাকুর পুজো চড়াও। পাইকের বাচ্ছা, মরতে হলে পাইকের মত মরব। আজ গঞ্জ লুট করব।'

গঞ্জে ডাকাত পড়েছে। মশাল, হৈ চৈ, গোলমাল, মারপিট। ভৈরব দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘাঁটি আগলে। এক মাড়োয়ারীর গুদাম লুট হচ্ছে। কেউ পালাচ্ছে প্রাণভয়ে, কেউ প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেদের যথাসর্বস্ব রক্ষা করতে। ভৈরব দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে প্রাণ কাঁপানি 'কুল্লা' করছে। আজ সে একাই এক শ। তার হুংকারে সারা গঞ্জ যেন কেঁপে উঠছে।

ভিতরে নারানের দল সিন্দুক ভেঙে লুট করছে। বাঁচবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে আজ। গঞ্জের লোক হার মানে এই মরিয়া দলের কাছে।

হঠাৎ একখানা সড়কি এসে পড়ল ভৈরবের বুকে। চীৎকার করে ভৈরব পড়ে গেল। ঘরের ভিতর নারানের দল তখন সবে সিন্দুক খুলেছে।

ভৈরবের চীৎকারে নারান চমকে মুখ ফেরাল, তার পর ছুটল মোড়লকে রক্ষা করতে, খোলা সিন্দুকের টাকা ফেলে। নিলুর লাঠি মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল সে চীৎকারে, তার পর আবার চলল লাঠি। নিলু, নারান, কেশো, গনশা পাগলের মত লাঠি সড়কি টাঙিগ চালাতে চালাতে মোড়লের দিকে এগিয়ে চলল। তাদের ঘন ঘন চীৎকারে আর লাঠির ঠকাঠক আওয়াজে যেন কানে তালা লাগে। গঞ্জের লোক বাধা দিতে পারে না এই মরিয়া দলের আক্রমণকে। তারা পালিয়ে পথ করে দেয় এদের।

আহত মোড়লকে নিয়ে তারা যখন গাঁয়ে ফিরে এল তখন ভোর হয়ে এসেছে। ভৈরবকে কাঁধে নিয়ে ফিরে এল ভগ্ন দল। নারানের কাঁধে ভৈরবের মাথা, বাকী সবাই তাকে বয়ে আনছে। নারানের হাতের টাঙিগটার মাথা আজ নীচের দিকে ঝোলানো।

গাঁয়ে ছেলে মেয়ে সবাই কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল এই দৃশ্য। কারও মুখে কথা নেই, নীরবে চোখের জল পড়ছে।

শুধু দূরে তখন ভগতের গান শোনা যাচ্ছে ফাঁসি গাছটির তলায়। সে গান যেন আজ আরও করুণ, নিরাশার সুর যেন তাতে স্পষ্ট।

গাঁয়ের সবাই তৈরী হচ্ছে চলে যাবার জন্য। এর পরে গাঁয়ে আর থাকা চলে না। সবাই বিদায় নিচ্ছে, কিন্তু চোখের জলে। সুখের না হক, দুঃখের স্মৃতিও তো ছিল এই গাঁয়ের সঙ্গে।

সুভদ্রা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝাবার কি আছে? তারা বলে, মোড়লের অসুখ, তাইতো তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে। সেরে উঠলে তার সামনে দিয়ে গিয়ে তার দুঃখটা আরও বাড়ানো কেন?

মোড়ল সেরে উঠেছে; তবু নারান আর সুভদ্রা বোঝায়

তার বিছানা ছেড়ে ওঠা উচিত নয়। নানা রকম মিথ্যা কথা বলে তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখে।

একে একে সবাই গাঁ ছেড়ে চলে যায়। গোঁসাই ঠাকুর, বিন্দী, ভগতদাস, কেশো, মনসাবুড়ো, তিনকু—সব। নিলু শুধু যাবার আগে মন্দির থেকে বিগ্রহটাকে টেনে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে যায়। বলে, মিথ্যে সে এতদিন এই পাষাণীর পুজো করেছে।

সবাই চলে যায়, শুধু নারান ছাড়া। সুভদ্রাকে ফেলে সে যেতে পারে না। বিন্দী, ভগতদাস এদের নৌকোয় তুলে দিয়ে আনমনাভাবে সে শূন্য গাঁ-টার পথ ধরে ঘুরে বেড়ায়।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ধীরে ধীরে। কোনও বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না আজ। জনহীন শ্মশানের মত গ্রামটার পথ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সুভদ্রা এসে দাঁড়ায় প'ড়ো ভিটেগুলোর মাঝখানে ফাঁসি গাছটার তলায়। একটা প'ড়ো ভিটের ভাঙ্গা দেওয়ালে মাথা রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ভগতদাসের জল দেবার মেটে কলসীটা পড়ে রয়েছে। মনে পড়ে ভগতদাসের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ভৈরবের মত। মরা গাছটাকে সে বাঁচাতে পারে নি।

গাঁয়ের খালটা মাঠের ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে প'ড়ো ভিটে-গুলোর ও-পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। দূরে নৌকো থেকে ভগতদাসের গান ভেসে আসে—বড় করুণ। চোখের সামনে পূর্বপুরুষদের ভিটে মিলিয়ে যাবার আগে তার শেষ গান—শেষ আর্তনাদ। সুভদ্রার চোখের জল আর বাধা মানে না, বাধা দেবার চেষ্টাও সে আর করে না।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখে ঘর অন্ধকার, বাপ তার নাম ধরে ডাকছে। সুভদ্রা জবাব দিয়ে আঙিনায় পা দিতেই চার পাঁচজন লোক দাওয়া থেকে নেমে দৌড়ে চলে গেল। পায়ের শব্দে ভৈরব হাঁক দিল, 'কে?'

সুভদ্রা এগিয়ে এসে দেখল ঘরের খুঁটির সঙ্গে কি একটা কাগজ বাঁধা। সেখানা ছিঁড়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে বললে, 'দেখ তো বাবা, লোকগুলো কি একটা বেঁধে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি বাতিটা জ্বালি।'

প্রদীপ জ্বেলে দেখা গেল সমন। বিখ্যাত লাঠিয়াল ভৈরব সড়কীর বাড়িতে দিনের আলোয় সমন জারি করতে কারও সাহস হয় নি, তাই রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়েছে তারা।

ভৈরব সুভদ্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করল এটা সমন নয়। সুভদ্রা বলল, সে জানে, মহাজন সমন জারি করেছে দেনার টাকার জন্য।

ভৈরব ধমকে দেয়। বলে, 'জমি জোত থাকলে সমন আসেই, মামলা মোকদ্দমাও হয়'।

কিন্তু মেয়ের জেরায় ক্রমে ক্রমে সব কথাই বেরিয়ে পড়ে। তার এত দেনা যে সমস্ত বিক্রি করেও শোধ দেওয়া সম্ভব নয়। বাপের ভবিষ্যৎ ভেবে সুভদ্রার মন কেঁদে ওঠে। তার কাছেই সে শুনেছে, এ জন্মে কারও কাছে দেনা রেখে গেলে পরজন্মে কুকুর হয়ে শোধ দিতে হয়। সুভদ্রার মনে হয় তার দাদা যদি আজ বেঁচে থাকত তবে সে চাকরি করে হোক, চাষআবাদ করে হোক বাপের দেনা শোধ করে দিত। সে মেয়ে বলে কি কিছুই করতে পারবে না?

ভৈরব তাকে মিথ্যে ধমক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করে। বলে, 'গতর থাকতে অমন দেড়কুড়ি দেনাকে ভৈরব সড়কী ভয় করে না। লণ্ঠনটা দে তো, গোঁসাইকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসি কি লিখেছে।'

সুভদ্রা আঁতকে ওঠে। ভয়ে ভয়ে বলে, 'গোঁসাইদাদু বাড়ি নেই। বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেছে।'

ভৈরব হো হো করে হেসে ওঠে। ভাবে সে দুর্বল বলে মেয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। সুভদ্রা যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে আটকে রাখবার। জানে এই জনশূন্য শ্মশানের মত গাঁয়ের চেহারা দেখলে ভৈরবের বুক ভেঙ্গে যাবে, পাগল করে তুলবে তাকে। কিন্তু ভৈরব কোন কথাই শোনে না। লম্বা সড়কিখানা হাতে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, 'বেটী ধরা পড়ে গেলি। গুছিয়ে মিথ্যে কথা কইতেও শিখিস নি।'

যে ঘাট থেকে সবাই বিদায় নিয়ে গেছে সেই ঘাটের ধারে একটা হেলানো গাছের ডালের উপর বসে একা নারান, হাতের টাঙ্গিটা উলটো করে মাটিতে ঠেকানো। টাঙ্গির উপর ভর দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে আছে জলের দিকে।

ধীরে ধীরে পিছন থেকে সুভদ্রা এসে তার কাঁধে হাত রাখল। তার পর পাশে বসে বলল, 'তোকেই বে করব, তোর সঙ্গে শহরে যাব নারান।'

সোৎসাহে নারান বলে, 'শাঁকচুন্নী, যাবি?'

'হ্যাঁ। বাবার অনেক দেনা। আজ মহাজন সমন জারি করেছে। তোর সঙ্গে শহরে গিয়ে গতর খাটাব। তুই কড়ার কর, বাবার দেনা শোধ করে দিবি।'

নারান রাজী হয় সঙ্গে সঙ্গে। সুভদ্রা বলে, আর দেরি কেন। ভৈরব রোগা শরীর নিয়ে গাঁয়ে বেরিয়েছে। সে ফেরবার আগেই তাদের পালাতে হবে।

শেষ বারের মত গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে, গাঁয়ের উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম করে তারা রওনা হল খালের পথ ধরে।

ভৈরব চীৎকার করে চলেছে গাঁয়ের পথ দিয়ে। গোঁসাই নেই, নারাণ নেই, কেশো নেই, ভগত নেই, দানেশ নেই, নিলু নেই, ডাকাতে কালীর মন্দির শূন্য। একদিন যেন সমস্ত গ্রামটা একটা শ্মশান হয়ে উঠেছে। কোনও ঘরে প্রদীপ জ্বলে নি। সব ঘরের দরজা খোলা।

পাগল হয়ে ওঠে ভৈরব। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে আসে। চীৎকার করে, 'সুভদ্রা, সুভদ্রা, বেটী, বেটী!'

সাড়া নেই। ভৈরব একবার দাঁড়াল, তার পর তন্ন তন্ন করে সারা বাড়িখানা খুঁজতে লাগল। শেষে আবার চীৎকার করল, 'সুভদ্রা, সুভদ্রা, বেটী, বেটী—'

ডাক তার মিলিয়ে গেল, কোনও জবাব এলো না। ক্রমে তার মুখ হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল। মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল, 'বেইমান!'

একটু ভেবে নিয়ে ভৈরব সড়কি হাতে নিয়ে ছুটে চলল।

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
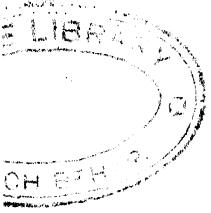
# বৃহত্তম নক্ষত্র "মীরা"

শ্রীরণজিৎ গুপ্ত

রাত্রের নক্ষত্রখচিত আকাশ যুগান্তর ধরে কবিদের করেছে মুগ্ধ এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রাণে জাগিয়েছে অনুসন্ধানের অতৃপ্ত পিপাসা। আকাশের অসংখ্য আলোকবিন্দু—এই নক্ষত্রগুলিকে কেন্দ্র করে অগণিত সৌরমণ্ডল বিরাজ করছে অনন্ত আকাশে—কারণ আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট দেখালেও প্রত্যেকটি নক্ষত্রই এক একটি সূর্য। এদের অনেকেই আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত সূর্যটির চেয়ে অসংখ্য গুণে বড়। এই সৌর জগতের যে সূর্যটিকে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা বৃহত্তম বলে আজ পর্যন্ত স্থির করেছেন তার পরিচয় জানতে কার না আগ্রহ হয়।

সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রকেও ছাড়িয়ে যায়। আবার কখন এত স্তিমিত হয়ে পড়ে যখন অত্যধিক শক্তিশালী দূরবীনের প্রয়োজন হয় ওকে দৃষ্টির আয়ত্তে আনতে।

মীরার এই আভ্যন্তরীণ বেতাল, যার জন্য ওর উজ্জ্বলতার তারতম্য হয় ৬০০ গুণের মত, তার কারণ নির্দেশ করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিছুদিন পূর্বে ক্যানাডার Royal astronomical society তাদের এক পত্রিকাতে এই নক্ষত্রটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছে। জ্যোতিহীন ছোট একটি জুড়ি নক্ষত্রের অস্তিত্ব মীরার এই উজ্জ্বলতা বা
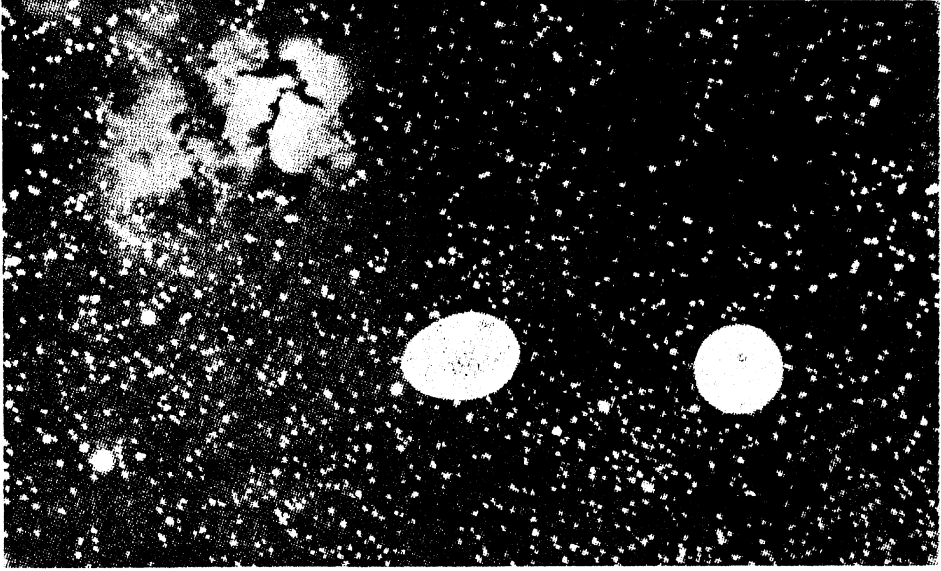
বৃহত্তম নক্ষত্র 'মীরা'। চিত্রে দৃষ্ট বর্তুলাকার অবস্থায় মীরা নক্ষত্ররাজ্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত হয়। ক্রমে আবর্তিত হয়ে চিত্রে প্রদর্শিত সুগোল অবস্থায় পৌঁছলে তা' অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে।

আয়তনে আমাদের সূর্য অপেক্ষা ১২৫ লক্ষ গুণ বড় অথচ ওজনে মাত্র ১০ গুণ ভারী, বৃহত্তম এই নক্ষত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'মীরা'। এর খবর বিজ্ঞান জগতে প্রথম এসে পৌঁছল ১৫৯৬ সালের ১৬ই আগষ্ট। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ফেব্রিসিয়াস এই খবর আনেন। ৩০০ বছরের বেশী হল মীরার অস্তিত্বের খবর বিজ্ঞান জগৎ জেনেছে, কিন্তু তার ভিতরের রহস্য অনেকখানিই আজও অজানা রয়েছে।

মীরার ভিতরের প্রধান রহস্য তার আকৃতি ও উজ্জ্বলতার অস্থিরতা। গড়পরতা প্রত্যেক ৩৩১·৬ দিন অন্তর মীরার উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে। কখন কখন উজ্জ্বলতায় ৬০০ গুণ ঘাটতি বাড়তি পরিলক্ষিত হয়েছে। উজ্জ্বলতায় মীরা কখন বা সৌর জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রমণ্ডলী Big dipperএর

জ্যোতিঃপ্রখরতার তারতম্যের কারণ বলে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। আপাতত এই ব্যাখ্যাটিকেই বিজ্ঞানীরা যুক্তিসংগত বলে মেনে নিয়েছেন।

মীরার এই জুড়ি নক্ষত্রটিকে এখনও দেখা যায়নি। অনুমান করা হয়েছে একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে গোলাকার পথে মীরা ও তার সহচর এক জুড়িনৃত্য করে চলেছে। এই গতির জন্য কখন মীরার জুড়িটি তার আড়ালে পড়ে আবার কখন সে তাকে আংশিকভাবে আড়াল করে। এই জ্যোতিহীন নক্ষত্রটি যখন মীরার সামনে পড়ে তখন তার উজ্জ্বলতার অনেকটা কমতি দেখা যায়। আবার যখন সে পিছনে পড়ে তখন মীরার গোলা কোন বাধা না পাওয়ায় পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় দেখা দেয়।

আবার অন্য একটি মতও আছে—এই বন্ধু নক্ষত্রটি নৈকট্যের দরুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা মীরার উপর প্রচণ্ড জোয়ার সৃষ্টি করে। এই জোয়ারের ফলে মীরার আকৃতি হয়ে পড়ে, ডিমের মত। সুতরাং যখন এই অবস্থায়, লম্বালম্বি-ভাবে মীরা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে তখন ওর উজ্জ্বল্য অনেকটা কম বলে মনে হয়। আবার আড়াআড়িভাবে দেখলে ওর জ্যোতি অত্যন্ত প্রখর হয়ে দেখা দেয়।

মীরার আলো পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে যখন ওর উজ্জ্বলতম অবস্থা তখন ও পৃথিবী থেকে দূরে সরে চলেছে, আবার যখন ওর দীপ্তি অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে পড়ে, তখন ও পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। উজ্জ্বলতার এই তারতম্য ঘটাবার জন্য মীরার উপর একটি ৩০০ থেকে ৪০০ লক্ষ মাইল উঁচু জোয়ারে-ঢেউএর প্রয়োজন। এই ঢেউএর উচ্চতা অত্যন্ত বেশী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উচ্চতা মীরার ব্যাসের দশমাংশেরও কম। মীরার ব্যাস প্রায় ৪৩২ লক্ষ মাইল। মীরার উজ্জ্বলতম দীপ্তি প্রকাশ প্রায় ৩৩১ দিন অন্তর। কখনও বা দেখা গিয়েছে যে, ৩১৬ দিন অথবা ৩৪৩ দিন পরও এই দীপ্তি প্রকাশ পায়। কি করে যে এই গরমিল হয় তার যুক্তিসংগত কারণ এখনও জানা যায়নি।

অনেকে বলেন—মীরার ভারকেন্দ্র একস্থানে স্থির নয়। ওর উপর উত্থিত জোয়ারে ঢেউ-এর পরিমাণ ও গতি অনুযায়ী এই কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। মীরার যে অংশ জুড়িটির নিকটতম সেখানে জোয়ারের বেগ দূরবর্ত্তী অংশের জোয়ারের বেগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

মীরা একটি কঠিন পদার্থ দিয়ে গড়া নয় বলেই এমন ঘটে। এর আয়তন সামান্য চাপের প্রভাবেই পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এর ভারকেন্দ্র ক্রমশই শক্তিশালী জোয়ারের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। এর ফলে মীরা ও জুড়ি নক্ষত্রটির মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তন হয় যারজন্যে ওদের উভয়ের চলার তালে বিভেদ ঘটে।

এই যে বৃহত্তম নক্ষত্রের কথা কিছু আলোচনা করা হলো, অসীম বিশ্বের মহাশূন্যে এর চেয়েও অনেক অভিনব ও অনেক লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্র যে নেই এমন কথা জোর করে বলা চলে না। নক্ষত্রবিশ্বে হয়ত মীরা একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র। বিজ্ঞানের ধারা বয়ে এই নক্ষত্র জগত সম্বন্ধে এমন সব আশ্চর্য খবর এসে পৌঁছেছে যাতে মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। আজ জানা গেছে এই নক্ষত্রের দল ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে কোন এক অদৃশ্য লক্ষ্যের দিকে। মীরাও তার জুড়িটিকে নিয়ে সেই শূন্য পথে যাত্রা সুরু করেছে। মানবের ক্ষীণ দৃষ্টি সীমার বাহিরে এই বিপুল আয়তন বাষ্প পিণ্ডটির অবিশ্রাম দৌড়ের পালা চলেছে অনন্তকাল থেকে। অজ্ঞাত একলক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে যুগ যুগান্তর এই যে বিশ্ব প্রদক্ষিণ, তার বিরাট ছন্দ কল্পনা করতেও বুদ্ধি হার মানে।

## গাঁয়ের মায়া

(১০৯ পৃষ্ঠার পর)

সুভদ্রা আর নারানকে সে ধরবেই, পালাবে কোথায়! তাদের সে শাস্তি দেবেই। এই বেইমানির বদলা সে নেবেই, তার সারা জীবনের আদর্শ যারা ভেঙে দিয়ে গেল তাদের সে খুন করবেই। সে তার বড় মেয়ে আর জামাইকে খুন করেছিল চটকলে যাবার অপরাধে। প্রয়োজন হলে সুভদ্রাকেও সে রেহাই দেবে না।

মাঠের ধার দিয়ে ছুটে চলেছে নারান আর সুভদ্রা। সুভদ্রা আর চলতে পারে না, পা ভেঙে আসে; তবু ভরসা হয় না দাঁড়াতে।

ছুটতে ছুটতে চলেছে ভৈরব, নিদ্রিত গঞ্জের পাশ দিয়ে, কখনও সাঁকো-পার হয়ে, কখনও মেঠো পথ ধরে, মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভৈরব দেখলে ওই দূরে ছুটে চলেছে সুভদ্রা আর নারান! ডাকাতের মত প্রাণ কাঁপানো হুংকার দিয়ে ছুটল ভৈরব।

সভয়ে দাঁড়িয়ে গেল নারান ও সুভদ্রা। নারান বলল, 'ভেগে লাভ নেই শাঁকচুন্নী।'

সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে একটা গাছের তলায় সে ফিরে দাঁড়াল। সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর মত ছুটে আসছে উন্মত্ত ভৈরব। হাতে রুপো বাঁধানো বাপের আমলের সড়কি। ভয়ে সুভদ্রা নারানকে জড়িয়ে ধরল, চীৎকার করে উঠল, 'বাবা।'

ভৈরব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু হাতের সড়কি তুলে নিয়ে লক্ষ্য করল। সুভদ্রা জানে অব্যর্থ তার লক্ষ্য। তাই দুহাতে নারানকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল।

মোড়লের লক্ষ্য ব্যর্থ হল আজ, সড়কি এসে বিঁধল গাছের গুঁড়িতে। ভৈরবের জীবনে এই প্রথম লক্ষ্য ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দুজনের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল।

তার পর হঠাৎ হেসে উঠল পাগলের মত, সারা দেহ তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল হাসির চাপে। হাসতে হাসতেই বলল, 'যা যা, শহরে যা; নিত্যি পচে মর্।'

তার পর পাগলের মত হাসতে হাসতেই সে ফিরে চলল, সুভদ্রা দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল; ডাকল, 'বাবা!'

ভৈরব তাকে ধাক্কা দিয়ে নারানের দিকে ঠেলে দিয়ে পাগলের মতই হাসতে হাসতে চলে গেল।

দূরে দেখা যাচ্ছে ভোরের আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শত শত চিমনি, বিরাট দৈত্যের মত। সুভদ্রা আর নারান এগিয়ে চলেছে সে দিকে।

ক্রমে বাঁশি বাজতে শুরু হল চটকল থেকে, যেন মৃত্যুর আহ্বান। হাজার হাজার লোক জলের স্রোতের মত ঢুকছে কারখানায়। ক্রমে নারান আর সুভদ্রাও মিশে গেল সেই অগণিত লোকের ভিড়ের ভিতর।

আর এদিকে প'ড়ো পাইকডাঙ্গায় উন্মত্ত ভৈরব ঘরে ঘরে মশাল হাতে আগুন লাগিয়ে ফেরে। দাউ দাউ করে গ্রামখানা জ্বলে ওঠে। তারই ভিতর দিয়ে উন্মত্ত ভৈরব ঘুরে বেড়ায়, মুখে তার পাগলের অট্টহাসি।

—সমাপ্ত—

**মানুষের মাথায় কত চুল থাকে?**

মানুষের মাথায় সাধারণত চুলের সংখ্যা কত এ বলা সহজ নয়। ধৈর্য্য ধরে মাথার চুল গুণে এর উত্তর দেওয়ার উৎসাহ খুব কম লোকেরই আছে। সাধারণ মানুষের চেয়ে বৈজ্ঞানিক-দের উৎসাহ এবং ধৈর্য্য সব থেকে বেশী। বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, সাধারণত মানুষের মাথায় লাল চুল থাকে ৩৫০০০, কালো রংয়ের চুল ১৫০০০০ ও কটা রংয়ের চুল ১০৫০০০।

**প্রকৃতির খেয়াল**

কলকাতায় এই অদ্ভুত দর্শন গো-বৎসটির জন্ম হয়েছে। বাছুরটির মুখের উভয় দিকে দুটি ক'রে মোট চারটি চোখ আছে।

**চুল পাকে কেন?**

মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুলে পাক ধরতে থাকে। অনেকের আবার অকালেও চুল পেকে যায়। আবার অনেকের বেশী বয়সেও চুল বেশ কালো থাকে। এর কারণ অনুসন্ধান করে বৈজ্ঞানিকরা মত দিয়েছেন, মানুষের মাথার চামড়া শক্ত হ'য়ে যাওয়ার ফলে চুলের গোড়া পূর্ব্বে যে পরিমাণে রস পেত সে পরিমাণ আর পায় না। এই রসের জন্যেই চুল কালো থাকে এবং রসের অভাবে ক্রমশ সাদা হয়ে যায়। সমুদ্রের লোনা-জলও মাথার চুলকে পাকিয়ে দেয়। যাঁরা সমুদ্রে স্নান করতে অভ্যস্থ তাঁদের সমুদ্রের লোনা জলে স্নান করার পর সাধারণ জলে মাথা ধুয়ে ফেলা উচিত। এতে নাকি খুব তাড়াতাড়ি চুল সাদা হয় না।

**কালো জুতো**

একটা নতুন কিছু দেখলেই অনেকের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। বড় বড় শহরে এভাবেই ফ্যাশানের বহুল প্রচার হয়। ছায়াচিত্রে কোন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে কি কি ফ্যাশানের সাজ সজ্জায় অপূর্ব্ব দেখিয়েছিল একথা দর্শকরা সহজে ভুলতে পারে না। ভুলতে যে পারে না তার প্রমাণ কলকাতায় জামা কাপড়ের দোকানে ঢুকলেই পাওয়া যায়। অভিনেত্রীদের নামে কতরকম ফ্যাশানের জামা, কাপড় এমন কি কপালের টিপ বেরিয়েছে যে তা মনে রেখে বায়নামত বাড়ীতে কোন কিছু নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল।

আমেরিকাতে একবার ফ্যাশান উঠেছিল ছ'টার পর কালো জুতো পরা।

ছেলে, বুড়ো বুড়ী সকলেই মহা উৎসাহে কালো জুতো ব্যবহার করত। ফলে অন্য রংয়ের জুতো প্রায় উঠে যায় এরকম অবস্থা আর কি!

এ ফ্যাসান প্রথম চালায় কালিফর্ণিয়ার জুতো ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির নিয়ম অনুসারে সমিতির কোন সভ্য বিকেল ছ'টার পর কালো জুতো ভিন্ন অন্য কোন জুতো পায়ে দিতে পারতো না। এছাড়া অন্য রংয়ের জুতো পায়ে দিলে আবার জরিমানার ব্যবস্থাও ছিল।

**মানুষের অদ্ভুত ভাষা**

মানুষ জাতির মধ্যে কত অদ্ভুত ধরণের ভাষা রয়েছে! এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের মনের কথা শত চেষ্টা করেও সহজে বুঝতে পারে না। অপরের ভাষা আয়ত্ত্ব করতে যাওয়াও যে কত বিপদ তা একটি ঘটনা থেকেই বেশ বুঝতে পারবেন।

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে অদ্ভুত ভাষা হচ্ছে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের। এখানকার আদিম অধিবাসী-দের নাম ছিল গঞ্চ। এরা শিস দিয়ে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করে। তাদের ভাষাটা শিস দেওয়া। গঞ্চরা নাকি তিন চার মাইল দূর থেকে শিস দিয়ে নিজেদের কথা অপরকে জানায়। গঞ্চদের ভাষার রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে একজন বৈজ্ঞানিক শিসের আওয়াজ শুনে প্রায় দু'মাস আর অপর কোন শব্দ শুনতেই পায়নি।

# আজ-কাল

**ট্রেন দুর্ঘটনা**

রবিবার রাত্রে কলকাতা থেকে ৮০ মাইল দূরে চুয়াডাঙ্গার কাছে ডাউন ঢাকা মেল লাইনচ্যুত হয়ে বহু লোক হতাহত হয়েছে। এ পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ, ৩৫ জন নিহত ও ৯০ জন আহত হয়েছে।

গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ঐ অঞ্চলটাতেই ডাউন ঢাকা মেল দুর্ঘটনা হয়েছিল। সেবার হয়েছিল সংঘর্ষ, এবার লাইনচ্যুতি! গতবার তদন্তে রেল-কর্ম্মচারীদের গাফিলতি প্রকাশ পেয়েছিল, এবার রেলকর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রথম ইস্তাহারে বলছেন কেউ লাইন সরিয়ে নেওয়ায় এই কাণ্ড ঘটেছে। ঢাকা মেল আসার মাত্র ২৬ মিনিট আগেই ঐ পথে অন্য ট্রেন গেছে; সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে বাইরের কারো পক্ষে লাইন সরিয়ে নেওয়া সম্ভব কিনা বিচার্য্য। যাই হোক, এ রকম পৌনঃপুনিক দুর্ঘটনা যখন হচ্ছে, তখন কড়া নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা দায়ী, তাদের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত।

**উপ-নির্ব্বাচন**

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ নির্ব্বাচনমণ্ডলী থেকে ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচনে বাঙলা কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীজ্ঞান মজুমদার এড হকী কংগ্রেসের প্রার্থীকে বহু ভোটাধিক্যে পরাজিত করে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। পূর্ব্ব ময়মনসিংহ এড হকী কংগ্রেসের অন্যতম পুরোধা শ্রীসুরেন ঘোষের ঘাঁটি। সেখানে তাঁদের পক্ষের এই পরাজয় প্রমাণ করেছে, বাঙলার জনমত কোন্ কংগ্রেস নেতাদের প্রকৃত সমর্থক এবং এড হকী কংগ্রেসের লম্বা-চওড়া বুলি সত্ত্বেও তাদের প্রভাব বাঙলাদেশে সত্যি কতখানি।

**হক-মন্ত্রিসভার কার্য্য**

হক-মন্ত্রিসভা বাঙলা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক নতুন বিল আনছেন। বাঙলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে হিন্দুদের টাকায় ও হিন্দুদের উদ্যমে। এখন সেটাকে হক-মন্ত্রিমণ্ডলী (যার প্রকৃতি হচ্ছে স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক) করায়ত্ত করতে চান। প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বে নেওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা ইতিপূর্ব্বেই করেছেন, এখন এই বিলে প্রস্তাব করছেন যে, একটা বোর্ড স্থাপন করে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

জীবনের নানাক্ষেত্রে হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর এই রকম হস্তক্ষেপে বাঙলার হিন্দুরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। গত ৪ঠা আগষ্ট বাঙলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ প্রতিবাদ দিবস প্রতিপালিত হয়। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও হাজরা পার্কে বিরাট জনসভা হয়। সভায় হিন্দুরা দ্বিতীয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন সংশোধন বিল ও সরকারী চাকরীতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানায় এবং বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর হিন্দুস্বার্থহানিকর নীতির অবিরাম বিরোধিতা করবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে।

**গান্ধীজীর ক্ষোভ**

কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন-এর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ এমেরী কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ সেখানকার অবস্থা তেমন কিছু গুরুতর নয়। ভারত সচিবের এই উক্তিতে গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলছেন যে, কংগ্রেস যুদ্ধের সময় আন্দোলন করে' বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করতে চায় না; অথচ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই সংযমকে আমলেই আনছেন না। তাঁরা এই সংযমের অন্যায় সুবিধা নিচ্ছেন (যেমন কর্ম্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার) বলে' কংগ্রেসের সন্দেহ হচ্ছে; এই সন্দেহ সত্যি বলে' যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে গান্ধীজী নিশ্চয়ই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবেন। কিন্তু এ সত্যাগ্রহ তাঁরই মনোনীত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে বৃটেনকে দুঃসময়ে আঘাত করবার ইচ্ছে তাঁর একটুও নেই।

গান্ধীজী আর এক প্রবন্ধে পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী তাঁর অনুগামীদের নির্ব্বিবাদে কংগ্রেস থেকে সরে এসে অহিংস কাজ নিয়ে ব্যাপৃত হতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি গান্ধীবাদীদের চলে যাওয়া পছন্দ করছেন না।

**ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশ**

ভারত-গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং ইউনিফর্ম্ম পরিধান নিষিদ্ধ করেছেন। এর ফলে মুসলিম লীগ, খাকসার, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী হবে।

## ইওরোপ

**সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি**

কয়েকদিন ধরে সোভিয়েট ও জার্ম্মানীর মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নিয়ে যে প্রবল জল্পনা-কল্পনা চলছিল, সোভিয়েট পার্লামেণ্টের অধিবেশনে মঃ মলোটোভের বক্তৃতায় তা প্রশমিত হয়েছে। মঃ মলোটোভ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, জার্ম্মানীর সঙ্গে তাঁদের কোনো বিরোধ হয় নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই! সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি সে পথ বন্ধ করেছে; ইওরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বরং ঐ চুক্তির গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

মঃ মলোটোভ বলেছেন যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্কের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি, আর ইংলণ্ড ইতিপূর্ব্বে যেভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাতে তার সঙ্গে সম্পর্কোন্নতি আশা করা কঠিন; "তবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে দূত নিয়োগে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে সম্পর্কের উন্নতি করবার একটা মনোভাব হয়তো প্রকাশ পাচ্ছে।"

কিছুদিন আগে তুরস্ক এবং ইরাণের দিক থেকে বিদেশী বিমান সোভিয়েট তৈল-কেন্দ্র বাটুম ও বাকুর উপর উড়ে এসেছিল; সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তখন তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; কিন্তু তুর্কী ও ইরাণী গবর্ণমেণ্ট প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তারপর জার্ম্মানী তুরস্ক ও ইরাণের মারফৎ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে এক হোয়াইট পেপার বার করেছিল। মঃ মলোটোভ এই ঘটনার উল্লেখ করে' জার্ম্মান হোয়াইট পেপারকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এখন থেকে সোভিয়েট তার দক্ষিণ সীমান্তের উপর আরো কড়া নজর রাখবে।

মঃ মলোটোভের বক্তৃতায় প্রকাশ, ইতালী ও জাপানের সংগে সোভিয়েটের সম্পর্কের উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। "মহান চীন জাতি"র প্রতি সোভিয়েটের সদ্ভাব অক্ষুন্ন আছে। বল্কানে যুগোস্লাভিয়ার সংগে মৈত্রীর উপর মঃ মলোটোভ খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ফিনল্যান্ড আল্যান্ড দ্বীপকে নিরস্ত্রীকরণে সম্মত হয়েছে এবং সেখানে এক সোভিয়েট কন্সালেট স্থাপিত হয়েছে। তবে ফিনিশ শাসকদের মঃ মলোটোভ এই বলে সতর্ক করে' দিয়েছেন যে, তাঁরা যদি জন-বিরোধী পীড়ন-নীতি চালাতে থাকেন, তাহলে তাঁদের সংগে সোভিয়েটের সম্পর্ক ক্ষুন্ন হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাল্টিক দেশগুলির সোনা আটক করায় মঃ মলোটোভ কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আমেরিকার সংগে সোভিয়েটের সম্পর্কে ভালো কিছু বল্‌বার নেই বলেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, ইওরোপের জন্যে দরদের আবরণে মার্কিন এমেচার সাম্রাজ্যবাদীরা এখন তাদের সাম্রাজ্যবাদী লোভ তৃপ্ত করতে চাইছে।

**ফ্রান্সের পরাজয়**

ফ্রান্সের পরাজয় উল্লেখ করে' তিনি বলেন যে, সামরিক ব্যবস্থার অপকর্ষ ছাড়াও এ পরাজয়ের একটা বড় কারণ হচ্ছে সোভিয়েটের প্রতি ফরাসী শাসকশ্রেণীর উপেক্ষা (জার্ম্মাণী যা করে নি) এবং স্বদেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁদের অবিশ্বাস ও ভীতি।

মঃ মলোটোভের মতে ইংলণ্ডকে ঘায়েল করতে না পারলে জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য সার্থক হবে না; সুতরাং এখন একদিকে জার্ম্মানী ও ইতালী এবং অন্যদিকে আমেরিকার সাহায্যপ্রাপ্ত বৃটেনের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হবে। কিন্তু সোভিয়েট তার নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাক্‌বে।

**বল্টিক ও ফিনল্যাণ্ড**

সোভিয়েট পার্লামেণ্ট ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাকী আছে এস্তোনিয়া। বেসারেবিয়া, উত্তর বুকোভিনা ও বল্টিক দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সোভিয়েটের জনসংখ্যা এক কোটি বেড়ে গেল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে নবগঠিত সোভিয়েট সমর্থক সমিতির এক সভা হেলসিঙ্কিতে পুলিস বলপ্রয়োগে ভেঙে দিয়েছে। এতে সোভিয়েট অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। দুইদিন মস্কোর সমস্ত সংবাদপত্রে ফিনিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করা হয়েছে। ফিনিশশাসকেরা কি বল্টিকের মতো সমাজ-বিপ্লবের আশংকা করছেন?

**রুমেনিয়া**

রুমেনিয়াতে গোলযোগ আবার ধূমায়িত হয়েছে। রুমেনিয়ান গবর্ণমেণ্ট বুলগেরিয়া ও হাঙ্গারীর দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করতে রাজী হয়েছেন এবং বুলগেরিয়ান ও হাঙ্গারিয়ান অধিবাসী স্থানান্তর দ্বারা সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করেছেন। তবে হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়া এ প্রস্তাবে রাজী হবে বলে' মনে হয় না। হাঙ্গারীর মনোভাব স্পষ্টভাবে উগ্র। সে কিংবা বুলগেরিয়া ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে শুধু অধিবাসী সরিয়ে নিয়ে খুশী হবে, এ কথা মনে করবার কারণ নেই। তবে রুমেনিয়ার সংগে তাদের আলোচনা শীগ্‌গিরই আরম্ভ হবে।

কিন্তু রুমেনিয়াবাসী রাজ্য ছাড়তে রাজী নয়। রুমেনিয়ান ফ্যাশিষ্ট দল 'আয়রণ গার্ড' জনসাধারণকে আত্মসমর্পণ না করতে আবেদন জানিয়ে এক ইস্তাহার ছড়িয়েছে। ইস্তাহারে রুমেনিয়ান গবর্ণমেণ্টকে অকর্ম্মণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরোক্ষে নতুন অভিভাবক জার্ম্মানীর উপর দোষারোপ করা হয়েছে। রুমেনিয়ার কৃষকনেতা মঃ মানিউও ঐ মতাবলম্বী। তিনি ট্রান্সিলভেনিয়ার অধিবাসী এবং ঐ অঞ্চল হাঙ্গারীকে প্রত্যর্পণের ঘোর বিরোধী। তিনি প্রতিপক্ষের সংগে আলোচনা করতেও রাজী নন। মঃ মানিউ বলেছেন যে, তাঁকে মন্ত্রী মনোনয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দিলে তিনিই রুমেনিয়ার গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভার নেবেন।

**বৃটেন—জাপান**

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কয়েকজন জাপানীকে আটক করেছেন। বৃটেনে দুইজন, রেঙ্গুণে তিনজন ও হংকং-এ একজন জাপানী গ্রেপ্তার হয়েছে। বৃটেনে ধৃত একজন জাপানীকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জাপানে ইংরেজদের গ্রেপ্তারের পর এই ঘটনায় জাপানীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স আশ্বাস দিয়েছেন যে, ইংরেজদের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে জাপানীদের গ্রেপ্তার করা হয় নি।

**জাপানের অভিপ্রায়**

নতুন জাপ-গবর্ণমেণ্ট এক সুদীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছেন। তাঁদের আসল কথা হচ্ছে এক 'বৃহত্তর প্রাচ্য এশিয়া' প্রতিষ্ঠা করা যার মধ্যে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও ফরাসী ইন্দো-চীনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর কোন্ কোন্ দেশকে তাঁরা করতলগত করবেন তা এখন জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করতে নারাজ। সেটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ইওরোপীয় যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলের জন্যে যে জাপান অপেক্ষা করছে তাতে সন্দেহ কি? তবে যেটুকু ঘোষণা করেছেন তাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও ডাচ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই শঙ্কিত বোধ করছেন. হতভাগ্য অধিবাসীদের কথা বাদই দিলাম।

**জার্ম্মান তড়িৎ-যুদ্ধ**

বৃটেনের উপর জার্ম্মানীর বিমান-আক্রমণ আগের মতোই ঢিমা তালে চল্‌ছে। তবে লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহল বল্‌ছেন যে, জার্ম্মানী শীগ্‌গিরই বৃটেনের উপর তড়িৎ-বিমান আক্রমণ করবে। চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে জার্ম্মানরা সমস্ত ফরাসী উপকূলে দূরপাল্লার কামান বসিয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক জার্ম্মান সৈন্য ফরাসী ও বেলজিয়ান উপকূলে সমবেত হয়েছে। মাঝে এক জার্ম্মান বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, বৃটেনের উপর ফ্রান্স বা পোল্যাণ্ডের অনুরূপ আক্রমণ চালানো সম্ভব নয়, যে রকম আক্রমণ সম্ভব সেই রকম আক্রমণ প্রত্যহ চালানো হচ্ছে। কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে' বলেছেন যে, ঐ বিবৃতি জার্ম্মানদের একটা ধাপ্পা; তারা বৃটিশ জনসাধারণের মনে নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করে অতর্কিত আক্রমণ করতে চায়; এখনো জার্ম্মান অভিযানের সম্ভাবনা রয়েছে।

৫।৮।৪০

—ওয়াকিবহাল
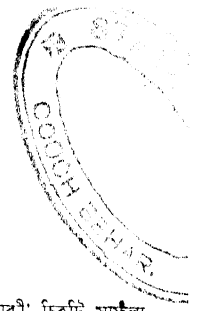
**এম্পায়ারে—"চিংগারী"**

আগামী শনিবার, ১০ই আগষ্ট হইতে এম্পায়ার ছায়াচিত্রগৃহে সুদামা প্রডাকশনের নূতন ছবি 'চিংগারী' (স্ফুলিংগ) প্রদর্শিত হইবে। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পন্ডিতমশাই'-এর কাহিনীকেই কয়েক জায়গায় সামান্য অদলবদল করিয়া এই চিত্রটি গৃহীত হইয়াছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সবিতা দেবী, পৃথ্বিরাজ, ই বিলিমোরিয়া এবং কে দাঁতে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মীরা, খাতুন, সুনলিনী দেবী (সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী), তারাবাঈ, মাষ্টার পান্ডে এবং ভগবান দাস। পরিচালনা করিয়াছেন সর্বোত্তম বাদামী।

শরৎচন্দ্রের 'পন্ডিতমশাই'এর শেষ দিকে যেখানে পন্ডিত-মশাইয়ের একমাত্র পুত্র চরণের মৃত্যুর করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়া বহুদিনের বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর যে মধুর মিলন দৃষ্ট হইয়াছে সেখানে ট্রাজেডীর পরেই যে পরিতৃপ্তি আনিয়া দেয় তাহাই হইতেছে শরৎচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির মাধুর্য—তিনি সেখানে পাঠকদের কাঁদাইয়াও মনে শান্তি দিয়াছেন। কিন্তু 'চিংগারী' চিত্রে শেষ দৃশ্যে অলৌকিক ঘটনার মত মৃত্যুমুখ হইতে চরণকে বাঁচাইয়া দর্শকদের সন্তুষ্টির জন্য মিলনান্ত করা হইল বটে, কিন্তু লেখকের প্রতি কি তাহাতে অবিচার করা হয় নাই?

সবিতা দেবী

বহুকাল পর আমরা পল্লীজীবনের সমস্যামূলক উপন্যাসের একটি কঠিন ভূমিকায় পৃথ্বীরাজের সহজ স্বাভাবিক এবং ভাবব্যঞ্জনাময় অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 'পন্ডিতমশাইয়ে'র চারিত্রিক মাধুর্য পৃথ্বীরাজের অভিনয়ে সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে। মাতৃকলঙ্কের অপবাদে সমাজ কর্তৃক বিতাড়িত বৈষ্ণব-কন্যা গীতার তেজোদৃপ্ত চরিত্রকে সাবিত্রী দেবী তাঁহার বলিষ্ঠ অভিনয়ে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে বলিয়া সমগ্ররূপে 'চিংগারী' চিত্রটি সাফল্য-গৌরব অর্জন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অতিরিক্ত গান দিয়া ছবিটিকে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই, কিন্তু যে কয়খানি গান আছে তাহা সুগীত হইয়াছে, সুরগুলিও সুন্দর। আবহ সংগীতে জ্ঞান দত্তর সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিলাম না, তবে তিনি নিজে যে দুইটি গান গাহিয়াছেন তাহা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'চিংগারী' চিত্রের আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, শরৎচন্দ্রের ডায়ালগ যথাসম্ভব রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

**'রণজিৎ সিংহ' অভিনয় বন্ধ**

গত জুলাই হইতে ষ্টার থিয়েটারে পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হইতেছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই স্থানীয় শিখ সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এই নাটকাভিনয়ে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে উহা বন্ধ করিয়া দিবার দাবী জানান। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে প্রথমে হস্তক্ষেপ না করিলেও শান্তিভংগের আশংকার অজুহাতে গত মংগলবার হইতে সাময়িকভাবে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের বীরত্ব ও শৌর্যমন্ডিত কীর্তি-কলাপের জন্য শিখরা তাঁহাকে যেমন পূজা করিয়া থাকে বাঙালীও তাঁহাকে তেমনই শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়া থাকে। নাটকে রণজিৎ সিংহের চরিত্রের মহত্ত্বকেই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, সুতরাং শিখ সম্প্রদায়ের এইরূপ আচরণ কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না।

**মিনের্ভা সিনেমা—'সোহাগ'**

সারকো প্রডাক্সনসের 'সোহাগ' তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিল। এই চিত্রের প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন কুমার, বিব্বু, মজহর ও আশালতা।

একটি ভিখারিণী বালিকা ও ধনী যুবকের প্রেমকে ভিত্তি করিয়া 'সোহাগের' কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। যে প্রেমে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না, উচ্চ নীচ ভেদ থাকে না এবং ধনী দরিদ্র ভেদ থাকে না তাহা অমরত্ব লাভ করে, বাস্তব জগতের কোনো বাধাই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারে না। 'সোহাগ' চিত্র দয়িতের জন্য প্রেমিকার এই ভালবাসা বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় কুমার ও বিব্বুর অভিনয় মন্দ নয়, তিমিরবরণের সংগীত পরিচালনা তাঁহার পূর্ব খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত বলবন্ত ভট্ট।

**রূপালী সিনেমা, পাঞ্জাবী ছবি**

১০ই আগষ্ট শনিবার হইতে রূপালী ছায়াচিত্র গৃহে পাঞ্চালী আর্ট পিকচারের প্রথম পাঞ্জাবী সামাজিক চিত্র 'যমলা জাট' প্রদর্শিত হইবে। গ্রাম্য পরিবেশে নরনারীর প্রেম ও সহজ জীবনযাপনের দৃশ্যাবলীতে চিত্রখানি চিত্রামোদিগণের আকর্ষণের বস্তু হইবে সন্দেহ নাই। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমাবেশও ভাল হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং বহু স্থানে খারাপ হওয়ায় ছবিখানির মাধুর্যের অনেক হানি ঘটিতেছে।

## আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। একটি ভারতীয় দল শীল্ড বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে। এই সম্মান এই বৎসর এইরূপ একটা দল লাভ করিয়াছে, যাহার জয়লাভ সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার সূচনায় কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই। 'খেলার ফলাফল পূর্ব্ব হইতে কিছুই বলা যায় না' এই কথা যে কতদূর সত্য, তাহা এই বৎসরের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষে সকল ক্রীড়ামোদিকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রতিযোগিতার তালিকা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ক্রীড়ামোদীকেই এরূপ বলিতে শোনা গিয়াছে, মোহন-বাগান কিম্বা মহমেডান স্পোর্টিং এই দুইটি দলের একটি দলকে শীল্ড বিজয়ী হইতে দেখা যাইবে। তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা পর্য্যন্ত এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে। তাহার পর হঠাৎ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রেঞ্জার্স ক্লাবের নিকট পরাজিত হইলে, ক্রীড়ামোদিগণ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আশা ত্যাগ করেন। এই সময় হইতে সকলের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, মোহনবাগান ক্লাবই শীল্ড বিজয়ী হইবে। রেঞ্জার্স ও মোহনবাগান ফাইনালে মিলিত হইবে। হঠাৎ এরিয়ান্স ক্লাব চতুর্থ রাউণ্ডে কাষ্টমস ও সেমি ফাইনালে রেঞ্জার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে উঠিলে, সকলেই চমৎকৃত হইয়া যান। তখন অধিকাংশ ক্রীড়ামোদীকে বলিতে শোনা যায়, "শেষ পর্য্যন্ত এরিয়ান্স ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হইতে পারিবে না।" কেবলমাত্র যাহারা সেমি ফাইনালে রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে এরিয়ান্স ক্লাবের খেলা দেখিয়াছিলেন, তাহারাই বলিতে আরম্ভ করেন, "এরিয়ান্সই শীল্ড বিজয়ী হইবে।" এই সকল দর্শকগণ যে সত্য বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে প্রমাণিত হইল। এরিয়ান্স ক্লাব ফাইনালে লক্ষাধিক দর্শক সমাগমের সম্মুখে সকলকে চমৎকৃত করিয়া শোচনীয়ভাবে ৪—১ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিল। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, দর্শকগণের মধ্যে অনেকে উপলব্ধিই করিতে পারিলেন না। এরিয়ান্স ক্লাব যাহারা এই বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতায় দুইটি খেলায় মোহন-বাগানের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা মোহনবাগানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল, বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। সমবেত বিপুল জনতা যাঁহাদের অধিকাংশ মোহনবাগান দলকে দ্বিতীয়বার শীল্ড বিজয়ী দেখিবার আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, হতাশ হইলে; এমনকি, অনেকে মর্ম্মহত হইলেন। তাঁহাদের অন্তরের বেদনা এতই গভীর হইয়াছিল যে, কেহ কেহ শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক কে দত্তকে আক্রমণের জন্য মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুর চতুর্দ্দিকে জটলা করিয়াছিলেন। অপ্রত্যাশিত ফলাফলই এই সকল ঘটনার কারণ। যে সকল ক্রীড়া-মোদিগণ এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এইটুকুই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, এরিয়ান্স ক্লাব যে একটি ভারতীয় ক্লাব এই কথা তাঁহারা কেন ভুলিয়া যাইতেছেন? এরিয়ান্স ক্লাবের সাফল্য যে ভারতীয় খেলোয়াড়গণেরই সম্মান বৃদ্ধি করিল; তাহা ছাড়া এরিয়ান্স ক্লাব যে বাঙালীর একটি প্রাচীনতম ক্লাব। মোহনবাগান ক্লাবের পূর্ব্বে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের বাঙালী খেলোয়াড় তৈয়ার করিতে এই দলটিই যে অদ্বিতীয়। মোহনবাগান ক্লাবের ন্যায় এই দল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এই পর্য্যন্ত খ্যাতি অর্জ্জন করে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এই দল যে এই পর্য্যন্ত বাঙলার অধিকাংশ বিশিষ্ট দলকে খেলোয়াড় দান করিয়া আসিয়াছে, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এইরূপ একটি দল শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে, ইহাতে বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণের বিশেষ করিয়া বাঙালীর আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া এইবারের শীল্ড প্রতিযোগিতার সূচনা হইতেই এই দলটি প্রত্যেকটি খেলায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে, যে সকল ক্রীড়ামোদী এই দলের খেলা অবলোকন করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন। ফাইনালে এই দলের খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই, এমনকি, অধিকাংশ সময়ই মোহনবাগানের তীব্র আক্রমণে এই দল বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই দলের খেলোয়াড়গণ সুযোগের সদ্ব্যবহার যে করিয়াছেন, ইহা মানিতেই হইবে। খেলার প্রথমার্দ্ধের ছয় মিনিটের সময় এই দলের ডি ব্যানার্জ্জি প্রথম গোল করেন। তিন মিনিট পরে মোহনবাগান দলের এস গুই ঐ গোলটি পরিশোধ করেন। তাহার পর মোহনবাগান দল বিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রথমার্দ্ধে আর একটিও গোল করিতে পারে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের পুনরায় এই দলের ডি ব্যানার্জ্জি দলের দ্বিতীয় গোল করিয়া দলের প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। ফলে ষোল মিনিটের সময় এ ভৌমিক তৃতীয় গোল করেন। তাহার পরেই মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়-গণ একেবারেই হতাশ হইয়া পড়েন। ডি ব্যানার্জ্জি দলের চতুর্থ গোল 'ফ্রিকিক' হইতে করিবার সময় এই জন্যই মোহনবাগান দলের কাহাকেও গোল রক্ষা করিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

এরিয়ান্স দল শীল্ড বিজয়ী হওয়ায় ভারতীয় দলের শীল্ড বিজয়ীর সম্মান বৃদ্ধি পাইল। ১৯১১ সালে মোহনবাগান দল শীল্ড বিজয়ী হইয়া যে গৌরবের সূচনা করিয়াছিল, দীর্ঘ-২৫ বৎসর পরে মহমেডান স্পোর্টিং দল শীল্ড বিজয়ী হইয়া সেই গৌরবের পুনরুদ্ধার করে। ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স দল শীল্ড বিজয়ী হওয়ায় ভারতীয় দলের সেই গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এরিয়ান্স দলের এই কৃতিত্ব আনন্দদায়ক ও প্রশংসনীয়। ১৯১৪ সাল হইতে শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া প্রথম ফাইনালে উঠিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া শীল্ড বিজয়ীর সম্মান লাভ প্রকৃতই কৃতিত্বপূর্ণ। বাঙালীর পরিচালিত একটি বিশিষ্ট দল শীল্ড বিজয়ী হইল, ইহাতে বাঙালী খেলোয়াড়গণের প্রাণে নব উৎসাহ, নব আশা জাগ্রত করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

## এরিয়ান্স ক্লাবের ইতিহাস

১৮৮৭ সালে স্বর্গগত শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রচেষ্টায় উত্তর কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে এরিয়ান্স ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে। সেই হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ২০ বৎসর পরে ১৯১৩ সালে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হইতে সক্ষম হয়। এই সাফল্য এরিয়ান্স ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণের প্রাণে উৎসাহ দান করে। ফলে ১৯১৪ সালে এরিয়ান্স ক্লাব আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইহার পূর্ব্বে এরিয়ান্স ক্লাব ১৯০৮ সাল ও ১৯১০ সালে কুচবিহার কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৩৫ সালে এরিয়ান্স ক্লাব কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়। কারণ ১৯৩২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত পরপর তিন বৎসর উক্ত কাপ বিজয়ী হইবার সৌভাগ্য লাভ করে।

১৯১৪ সালে সর্ব্বপ্রথম এরিয়ান্স ক্লাব কলিকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ১৯১৬ সালে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হয়। সেই হইতে এরিয়ান্স ক্লাব কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনে খেলিতেছে।

১৯২৮ সালে সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সেই বৎসর সারউড ফরেণ্টারের নিকট চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত হয়। ১৯৩৮ সালে পুনরায় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯৩৭ সালে সিমলার ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল এইরূপ অবস্থায় অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করে। ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার সম্পাদক এই জন্য দুঃখ করিয়া এরিয়ান্স ক্লাবের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি একরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, গ্রীণ হার্ড ওয়ার্ডস দল এরিয়ান্স ক্লাবের নিকট পরাজিত হইত যদি না এরিয়ান্স হঠাৎ অবসর গ্রহণ করিত।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত ফুটবল খেলোয়াড়গণের নাম করিতে বাঙালী ক্রীড়ামোদিগণ গৌরব অনুভব করেন, তাহার অধিকাংশই এরিয়ান্স ক্লাবের সভ্য ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইলঃ—রাজেন সেন, প্রকাশ ঘোষ, সামাদ, আর দফাদার, করুণা ভট্টাচার্য্য, মজিদ, কিড ডি সিলভা, বি ডি চ্যাটার্জ্জি, হারাণ সাহা প্রভৃতি।

**ফাইনালে দুইটি দল**

১৯৪০ সালে মোহনবাগান ও এরিয়ান্স দল কিভাবে ফাইনালে উপনীত হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইলঃ—

**মোহনবাগান**

৬—০ গোলে খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিংকে পরাজিত করে।
৮—০ গোলে বেঙ্গল আর্টিলারীকে পরাজিত করে।
২—২; ১—০ গোলে পুলিশকে পরাজিত করে।

**এরিয়ান্স**

২—১ গোলে দোমোহানী ক্লাবকে পরাজিত করিয়া।
৩—০ গোলে বি এন দলকে পরাজিত করিয়া।
১—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করিয়া।
১—১; ২—১ গোলে কাষ্টমসকে পরাজিত করিয়া।
১—০ গোলে রেঞ্জার্সকে পরাজিত করিয়া।

**ফাইনাল খেলা**

এরিয়ান্স (৪) মোহনবাগান (১)

এরিয়ান্স পক্ষে ডি ব্যানার্জ্জি ৩টি ও এ ভৌমিক ১টি গোল করেন। মোহনবাগান দলের এস গুই একটি গোল পরিশোধ করেন।

**উভয় দলের খেলোয়াড়গণ**

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ও এরিয়ান্স দলের পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন।

**মোহনবাগানঃ**—কে দত্ত; টি চৌধুরী, পি চক্রবর্ত্তী; নীলু মুখার্জ্জি, এস পরামাণিক ও প্রেমলাল; এস গুই; এস মিত্র, এ রায় চৌধুরী, এ ভট্টাচার্য্য এন মুখার্জ্জি।

**এরিয়ান্সঃ**—আর ভট্টাচার্য্য; এন মজুমদার ও এ গড়গড়ি; ডি মিত্র, নাসিম ও এন মুখার্জ্জি; এন ঘোষ, এস রাও ডি ব্যানার্জ্জি, এ জর্ডন ও এ ভৌমিক।

**রেফারীঃ**—সি এস এম টেলার।

**ভারতীয় দল সেমি ফাইনালে**

এই পর্য্যন্ত যে সকল ভারতীয় দল আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে খেলিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেঃ—মোহনবাগান ক্লাব সাতবার, মহমেডান স্পোর্টিং দুইবার, চুঁচুড়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন, হাওড়া ইউনিয়ন, এরিয়ান্স, ভবানীপুর।

**ভারতীয় দল ফাইনালে**

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে যে সকল ভারতীয় দল খেলিয়াছে তাহার নাম প্রদত্ত হইলঃ—১৯১১ সালে মোহনবাগান, ১৯২০ সালে কুমারটুলী, ১৯২৩ সালে মোহনবাগান, ১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৮ সালে মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪০ সালে মোহনবাগান ও এরিয়ান্স।

**পূর্ব্ববর্ত্তী শীল্ড বিজয়ীগণ**

১৮৯৩-৯৪ রয়াল আইরিশ, ১৮৯৫ রয়াল ওয়েলস ফুসিলিয়ার্স, ১৮৯৬ ক্যালকাটা এফ সি, ১৮৯৭ ডালহৌসী এ সি, ১৮৯৮ গ্লসেষ্টার রেজিমেণ্ট, ১৮৯৯ সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার রেজিমেণ্ট, ১৯০০ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০১ রয়াল আইরিশ রাইফেল, ১৯০২ ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯০৩-৪ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০৫ ডালহৌসী এ সি, ১৯০৬ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০৭ হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, ১৯০৮-১০ গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯১১ মোহনবাগান এ সি, ১৯১২-১৩ রয়াল আইরিশ রাইফেল, ১৯১৪ কিংস ওন রেজিমেণ্ট, ১৯১৫ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯১৬ ২য় নর্থ ষ্ট্যাফোর্ডস, ১৯১৭ ১।১০ মিডলসেক্স, ১৯১৮ ৭নং ট্রেনিং রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান, ১৯১৯ ১ম ব্যাটেলিয়ান ব্রেক নকসায়ার, ১৯২০ ১ম ব্যাটেলিয়ান ব্ল্যাকওয়াচ, ১৯২১ ৩য় ব্যাটেলিয়ান ওরসেষ্টারসায়ার, ১৯২২-২৪ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯২৫ রয়াল স্কটস ফুসিলিয়ার্স, ১৯২৬-২৮ সেরউড ফরেষ্টার, ১৯২৯ রয়াল আলষ্টার রাইফেলস, ১৯৩০ সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯৩১ হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, ১৯৩২ এসেক্স রেজিমেণ্ট, ১৯৩৩ ডি সি এল আই, ১৯৩৪ কে আর আর এবং ডারহাম (২-২) (খেলা হয় নাই), ১৯৩৫ ইষ্ট ইয়র্কসায়ার, ১৯৩৬ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৭ ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড, ১৯৩৮ ইষ্ট ইয়র্কসায়ার, ১৯৩৯ পুলিশ এ সি।

# সময় বার্ত্তা

**৩১ জুলাই।—**

নিউইয়র্কের সংবাদ—'কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম'এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিনিধি বেতারবার্তায় বলিয়াছেন, কয়েকদিন ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত ফরাসী উপকূলে বহু জার্মান সৈন্যের চলাচল তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন।

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের ৩০ জুলাইএর ইস্তাহারে প্রকাশ, ইংরেজদের বোমারু বিমান উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ও হল্যান্ডের বহু শত্রুস্থানে সফল আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। জার্মানরাও ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বোমা বর্ষণ করিয়া গিয়াছে।

ওআশিংটনের সংবাদ—গভর্নমেন্ট পশ্চিম গোলার্ধের রাষ্ট্রসমূহ ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে বিমানে ব্যবহারযোগ্য পেট্রল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

জাপানে আরও একজন ইংরেজ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পূর্বধৃতদের মধ্যে ৪ জন মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

**১ অগস্ট।—**

বার্লিনের ৩১ জুলাইএর সংবাদ—'ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করা হইতেছে না' এই অনুযোগ এবং 'জার্মানি কবে ব্রিটেন অভিযান শুরু করিবে' এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারী নিউজ এজেন্সি ঘোষণা করিয়াছেন, 'জার্মানি পোল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ঠিক সেইরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ফ্রান্সে যুদ্ধবিরতির পর এই পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ জার্মানি প্রতি দিন, এমন কি প্রতি ঘণ্টায় আক্রমণ চালাইয়া চলিয়াছে।

জাপানে ধৃত ইংরেজদের মোট ছয়জনকে এতাবৎ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

**২ অগস্ট।—**

ফ্রান্সস্থিত আমেরিকান সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মানরা ফ্রান্সের সমগ্র চ্যানেল উপকূলে বহু দূর পাল্লার কামান বসাইতেছে। লণ্ডনে বলা হইতেছে, যোগ্য প্রত্যুত্তরের জন্য ব্রিটেন প্রস্তুত। জার্মান বিমান হইতে গতকল্য রাত্রে ব্রিটেনে ইস্তাহার বর্ষিত হয়। হিটলারের সেদিনকার বক্তৃতাটি তাহাতে উল্লিখিত। জার্মান ও ইংল্যান্ড উভয় রাষ্ট্রে উভয় পক্ষের বিমান আক্রমণ পূর্ববৎ।

সোভিয়েটের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব মঃ মলোটোভ কাল সোভিয়েট পার্লামেন্টে সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েটের সম্পর্ক বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক দিকে জার্মানি ও ইতালি এবং অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত ব্রিটেনের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হইবে; কিন্তু সোভিয়েট তাহার স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে। ব্রিটেন সম্বন্ধে বলেন, যদিও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে দ্রুত নিয়োগ করিয়া ব্রিটেন সোভিয়েটের প্রতি সৎ মনোভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু 'সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্রিটেন যেসব বৈরাচরণ করিয়াছে তাহার পর ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের সন্তোষজনক উন্নতির আশা কঠিন।' জার্মান সম্বন্ধে বলেন, উভয়ের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েটের সঙ্গে মিটমাটের জন্য জাপানের আগ্রহ উল্লেখ করিয়া মঃ মলোটোভ 'মহান্ চীন জাতি'র প্রতি বন্ধুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

হাভাস এজেন্সির সংবাদ—জেনারেল দ গলের অনুপস্থিতিতেই ফ্রান্সের সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

**৩ অগস্ট।—**

মাদ্রিদের সংবাদ—হিটলার সমরনায়কদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। জার্মান অধিকৃত ফরাসী দেশের মধ্যে ডাক, তার ও টেলিফোন বন্ধ করার উদ্দেশ্য—'ব্রিটেনের উপর বিরাট আক্রমণ'এর উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা। উভয় রাষ্ট্রে অল্পাধিক বিমান আক্রমণ চলিতেছে।

আজ লণ্ডনে দেশরক্ষা বিধান অনুযায়ী দুইজন জাপানী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পেত্যাঁ গভর্নমেন্টের প্রাণদণ্ডাদেশ সম্পর্কে জেনারেল দ গলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কাল তিনি লণ্ডনে বলিয়াছেন, 'জয়লাভের পর আমি ভিসির কর্তাদের সহিত মোকাবিলা করিব'।

**৪ অগস্ট।—**

জার্মান বিমানসমূহ ইংল্যান্ডের নানা স্থানে হামলা করিয়াছে। ওয়েলস এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম স্কটল্যান্ডের উপর তাহারা বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এক ইস্তাহারে প্রকাশ, কাল ইংরেজদের বিমানও ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যান্ডের বহু সামরিক স্থানে হামলা করিয়া আসিয়াছে।

১ ও ২ অগস্টএ ভূমধ্যসাগরে ইতালীয়দের সঙ্গে নৌযুদ্ধে নিযুক্ত ব্রিটিশ নৌবহরের কয়েকটি বিমান সার্ডিনিয়া দ্বীপে ইতালীয় বিমান ঘাঁটিতে সফল আক্রমণ করে। লিবিয়ার বন্দর ও বিমান ঘাঁটিতেও ইংরেজরা তিনবার হাওয়াই হামলা করিয়াছে।

টোকিওর সংবাদ—ইংলণ্ডে আরও দুইজন জাপানী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন মহিলা। জাপানে ধৃত ইংরেজদের আরও চারজন মুক্তিলাভ করিয়াছে।

প্যারিস বেতার—জার্মানরা ফরাসী ব্যাঙ্কসমূহের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

**৫ অগস্ট।—**

লণ্ডনের ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা এই যে, ব্রিটেনের উপর জার্মানরা শীঘ্রই প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ শুরু করিবে। গত রাত্রে মধ্য ও পূর্ব ইংলণ্ডে জার্মানরা বোমা বর্ষণ করিয়াছে। গত কাল ইংরেজরাও জার্মান অধিকৃত বহু স্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। প্রকাশ, গত এক মাসে ইংরেজরা শত্রুস্থানে ৩৭০০০ বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এই সময়ে জার্মানরা ব্রিটেনে অনুমান ৭০০০ বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

কায়রোর সংবাদ—ইংরেজদের টহলদার বিমানসমূহের সহিত বির-এল-গোব্বি অঞ্চলে ৫০টি ইতালীয় বিমানের সহিত সংঘর্ষ হয়। শত্রুপক্ষীয় বহু বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

ওআশিংটনের সংবাদ—সেনেটের সামরিক কমিটি ১২—৩ ভোটে অবশ্যক (compulsory) সামরিক শিক্ষার বিল সেনেটে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৮ বৎসর হইতে ৬৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত চার কোটি কুড়ি লক্ষ লোককে অবশ্যক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য।

রেঙ্গুনে ৩ জন ও হংকংএ ১ জন জাপানী দেশরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

**৬ অগস্ট।—**

গত রাত্রে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জার্মানরা বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষতির সংবাদ নাই। কালকের আকাশযুদ্ধে চারটি শত্রুপক্ষীয় বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরেজরাও পরশু রাত্রে রুবে স্টেরক্রেডের তেলের কারখানায় হাওয়াই হামলা করিয়া আগুন লাগাইয়া আসিয়াছে।

মস্কোর ৫ অগস্টের সংবাদ—সুপ্রীম সোভিয়েট লাটভিয়াকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত করিবার লাটভিয়াকৃত অনুরোধ মানিয়া লইয়াছেন।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

**৩১ জুলাই।—**

আজ সকাল নয়টায় (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম) লণ্ডনে সার মাইকেল ওডায়ারের হত্যাকারী শ্রীযুক্ত উধম সিংএর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

তুরস্কের আনকারার সংবাদ—আনাতোলিয়ার মধ্য অধিত্যকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৩০০ জন নিহত ও ১২টি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে।

পেশোয়ারে উপজাতীয়দের দৌরাত্ম ঘটিয়াছে।

পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে শ্রীঅরবিন্দ ও মাদাম আলফাসা বড়লাটের সমর তহবিলে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বোম্বাই-এ সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে শ্রীযুক্ত আজাদ বলিয়াছেন, মহাত্মাজীর নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে কংগ্রেস নিজেই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।......সাম্প্রদায়িক ঐক্য না হইলে জাতীয় যুদ্ধ অসম্ভব ইহা তিনি মনে করেন না।

**১ অগস্ট।—**

আজ সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট হলে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রকেশরী লোকমান্য বালগংগাধর তিলক এবং হিন্দু মুসলমান একতার একনিষ্ঠ সাধক মৌলবি আবদুল রসুলের মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হইয়াছে।

বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে আট দিন আলোচনার পর বংগীয় সমবায় সমিতি বিল গৃহীত হইয়াছে।

**২ অগস্ট।—**

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সি আই ই পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাংহাই-এর সংবাদ—রুশ আশ্রয়প্রার্থী কমিটির সভাপতি মঃ চার্লস মেটসলার চীনা সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হইয়াছেন।

বংগীয় মহাজনী আইন আগামী সেপটেম্বর হইতে বলবৎ হইবে।

চাঁদপুর হইতে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের এক বিবৃতিতে বর্তমান কংগ্রেস ব্রিটিশের আশ্রয়প্রার্থী কাণ্ডারিহীন তরণী রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

**৩ অগস্ট।—**

আজ বাংগালোরএ মহীশূরের মহারাজা হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হওয়ায় পরলোকগত হইয়াছেন।

ঢাকার সংবাদ—মুড়াপাড়া নামক গ্রামে দাংগায় রত এক জনতার উপর গুলিবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন—প্রতাপ পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে। ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বহরমপুর, রাজবাড়ি, বরিশাল, কুষ্ঠিয়া, চট্টগ্রাম, ঝরিয়া, ভাগলপুর, গয়া, আরা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ধরপাকড় খানাতল্লাশ, অন্তরণ, কারাদণ্ড প্রভৃতির সংবাদ আসিয়াছে।

বোম্বাইএর অকোলা জেলায় প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে ভুশোয়ালএ অতিবৃষ্টির ফলে সি পি রেলওয়ের ৪৫০ ফিট রেলরাস্তা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে।

**৪ অগস্ট।—**

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুপ্রীম সোভিয়েট সর্বসম্মতক্রমে লিথুয়ানিয়াকে সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লিথুয়ানিয়ানদের অনুরোধ মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন।

মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে লিখিতেছেন, সর্দারজী তাঁহার সম্মতিক্রমে, বরং তাঁহার উৎসাহেই, স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা সংশয়াপন্ন, সর্দারজীর পথ অনুসরণ করাই তাঁহাদের কর্তব্য। তাঁহার বিশ্বাস, সর্দারজী যেদিন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া মহাত্মাজীরই পথে প্রত্যাবর্তন করিবেন, সেই আনন্দময় দিনে সর্দারজীর সংগে সকলেই মহাত্মাজীর পথে ফিরিয়া আসিবেন। যাঁহারা মনেপ্রাণে অহিংসাবাদী তাঁহাদিগকে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

নিখিল বংগ প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বংগীয় হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আজ এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বাঙলার সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, দ্বিতীয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল প্রভৃতি নির্লজ্জ কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

**অগস্ট।—**

রবিবার শেষরাত্রে ই বি আর-এর চুয়াডাংগা ও জয়রামপুর স্টেশনের মধ্যে ডাউন ঢাকা মেল লাইনচ্যুত হওয়ায় ৩৪জন নিহত ও ৯০জন আহত হইয়াছেন। এঞ্জিন ও ছয়টা বগি লাইনচ্যুত হয়, খানায় পড়িয়া তিনটা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদের কলিকাতায় একাধিক হাসপাতালে রাখা হইয়াছে; অনেকেরই অবস্থা শংকাজনক। এই দুর্ঘটনায় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন। নিহতদের মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক ও ২টি বালক ছিল। একটি বৃদ্ধার মাত্র একখানি হাত ও গলা সহ মাথা এবং একটি পুরুষের মাত্র দুখানা পা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জেলে এখনও মন্দাগ্নিতে ভুগিতেছেন। এই কয়দিনে তাঁহার ওজন পাঁচ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

ইংরেজী 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার প্রথম বার্ষিক উৎসব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বহুবাজারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সম্পন্ন হইয়াছে।

মেরু প্রদেশের বিখ্যাত আবিষ্কারক ডাঃ ফ্রেডারিক কুক পরলোকগমন করিয়াছেন।

**৬ অগস্ট।—**

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা ৩৭এ পৌঁছিয়াছে। হাসপাতালে আরও ৪ জন মারা গিয়াছেন।

বাংগলার নানা স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা সাধারণের উপর জুলুম করিয়া ওঅর ফাণ্ডে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রমাণসিদ্ধ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব এই-রূপ ভয় দেখাইয়া চাঁদা আদায় গভর্নমেণ্ট অনুমোদন করেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইসলামিয়া কলেজের ব্যাপারে তদন্ত করিবার জন্য বাঙলা সরকার বিচারপতি শ্রীযুক্ত আমির আলি ও শ্রীযুক্ত ল্যাথব্রিজকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন।

# পুস্তক পরিচয়

**বিশ্বমানবের লক্ষ্মী লাভ :** সুরেন ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২১০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৮৮। দাম দেড় টাকা।

'বিশ্বমানবের লক্ষ্মী লাভ' বইখানি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইল। লেখক জীবন-বীমা ব্যবসায়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবেই আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত—সাহিত্যের আসরে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ প্রায় হয় নাই বলাও চলে। কিন্তু এই পুস্তকে লেখকের লিখন ভঙ্গীতে এমন একটা আকর্ষণ আছে যাহা আমাদের সহজভাবে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। অথচ ইহা উপন্যাস নহে—রোমাঞ্চকর ঘটনাও নহে, একেবারে নিরস ব্যাপারও বলা চলে। কিন্তু নিরসকে সরস ও সুন্দর করিয়া তুলিবার ক্ষমতা লেখকের ছিল বলিয়াই বইখানি এতখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে। গ্রন্থকার বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন ঘরে-বাইরের নাতি-নাতনীদিগকে। পরিবেশন করিয়াছেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ইতিহাস, অর্থাৎ রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিক অর্থ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিলি ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

প্রবাদ আছে লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলা—ভাগ্যের জোরেই শুধু তাঁহাকে লাভ করা যায়। কিন্তু রাশিয়া লক্ষ্মীকে অচলা করিয়া রাখিতে না পারিলেও তাহাদের নাছোড়বান্দা বৈজ্ঞানিকতন্ত্রের শক্তিতে ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীকেও জব্দ করিয়া রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছে। লক্ষ্মী-ছাড়া সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর চিরদুঃখ দূর করিবার জন্য U.S.S.R.-এর যে নূতন ধরণের বৈজ্ঞানিক যজ্ঞ চলিয়াছে—গ্রন্থকার 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মী লাভে'র মধ্যে তাহাই সরল ও মনোরম ভাষায় গল্পাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঔৎসুক্য ক্রমশ জাগরিত হইয়া উঠিলেও ইংরেজী না জানিয়া বা ইংরেজী বই না পড়িয়া সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই বলিলেও চলে। বিশেষত রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া অল্প বয়স্কদের জন্য বই লিখিবার কল্পনা করাও যেন অপরাধ। কিন্তু সুরেনবাবু এই অপরাধকে অগ্রাহ্য করিয়া যে বইখানি লিখিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় শুধু অল্প বয়স্করাই নহে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠরাও ইহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিশোর-সাহিত্যে ইহা যে একটি প্রথম শ্রেণীর বই হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। ভগবানকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া এবং ধনতন্ত্রবাদের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করিয়া এই সোভিয়েট রাশিয়া কোন্ উপায়ে কোন্ ধাতুতে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা জানিবার যাহাদের আগ্রহ আছে, তাহাদিগকে 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মী লাভ' বইখানি অনেকখানি সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়াই আশা করা যায়। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

**মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়**—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, গোলাপ পাবলিসিং হাউস, ১২নং হরিতকী-বাগান লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থকার রায় বাহাদুর শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারী চিকিৎসা বিভাগে চাকুরী করিয়া এখন পেন্সনপ্রাপ্ত। তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্বোপরি তিনি একজন সাধক এবং বৈষ্ণব ভক্ত। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু গ্রন্থকারের শুধু পাণ্ডিত্য নয়, নিজের অনুভব আছে। এজন্য এমন দুরূহ বিষয়ও তিনি সহজ এবং সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধনার ক্রমিক স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া ঋষি নির্দেশিত পথে কিভাবে শ্রদ্ধাভক্তির সাহায্যে মনোজয় সম্ভব হয়, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। মুখ্যভাবে ভাগবতকে আশ্রয় করিয়াই তিনি পন্থার নির্দেশ করিয়াছেন। এই পথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নির্দেশিত পথ। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবাচার্যগণ, বিশেষভাবে রূপ ও সনাতনী গোস্বামীজীরা এই পথই দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং সাধারণের পক্ষে সুগমও নয়। গ্রন্থকার বাঙলা ভাষায় ভাগবত নির্দেশিত মনোজয়ের পথ দেখাইয়া সেই দিককার অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুধী সমাজ উপকৃত হইবেন। এমন গ্রন্থের যত প্রচার হয় এবং গভীরভাবে এই সব বিষয়ের আলোচনার সাহায্যে বিষয়ানুপ্রবেশের তীক্ষ্ণতা বাঙালী সমাজের যত বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গল। লঘুসাহিত্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তি এই বিষয়ানুপ্রবেশের শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া জাতিকে তরল ভাবপ্রবণ এবং দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে, এজন্য আমরা এমন পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।